উপন্যাসসমগ্র
৫

উপন্যাস সমগ্র

৫

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

"রা-স্বা"

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
পাদপদ্মে বিনম্র প্রণামপূর্বক
নিবেদন

নিবেদন

উনিশশো সাতষট্টির শেষ দিকে যখন আমার প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' বই আকারে প্রকাশ পেল তখন হয়তো বেশ আনন্দই হয়েছিল, কিন্তু আনন্দের চেয়েও যেটা অনেক বেশি হয়েছিল তা হল বিস্ময়। আমি যে শেষ অবধি একটা আস্ত বই লিখে ফেলতে পারব এবং সেটা কোনওদিন প্রকাশ পাবে এটা আমার কাছে অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হত। কারণ তখন খুব খুঁটে খুঁটে, নানা খুঁতখুঁতুনি নিয়ে লেখার অভ্যাস ছিল। এক পাতা, দু'পাতা লিখতেই দিনের পর দিন পেরিয়ে যেত, কিছুতেই মনের মতো লিখে উঠতে পারতাম না, তাই এক-একটা ছোটগল্প লিখতেই তখন দমসম অবস্থা। সাগরময় ঘোষ, বিমল কর এবং অন্য সব সম্পাদকরা তাগাদা দিয়ে তাড়না করে অস্থির করে তুলতেন। তবু কিছুতেই আমার লেখায় গতির সঞ্চার ঘটেনি। প্রথম দশ বছর তো শুধু ছোটগল্প লিখে গেছি। সেই জন্যই উপন্যাসের কথা ভাবতেও ভয় করত। ছোটগল্প লিখতেই যার কোমর ভেঙে দ হয়ে যায় সে উপন্যাস লিখে উঠতে পারবে এমনটা ভাবাই তো সম্ভব ছিল না। অথচ তখন আমার সতীর্থ বন্ধুদের অনেকেই একাধিক উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। কাজেই প্রথম বইয়ের প্রকাশ আনন্দজনক যত না ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি ছিল বিস্ময়কর।

আজ আবার অন্যরকম এক বিস্ময়। হিসেব করে দেখছি, সেই গেঁতো, অলস, দ্বিধাগ্রস্ত আমি তো বেশ কয়েকখানা উপন্যাস লিখে ফেলেছি, এবং তার মধ্যে গুটিকতক উপন্যাস বেশ বৃহদাকারের। এই ঘটনাই এখন আমাকে ভীষণ বিস্মিত করে। আমার 'উপন্যাস সমগ্র'-র পঞ্চম খণ্ড বেরোবে, এটা সাতষট্টিতে অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু ছিল না। তবু হিসেব করে দেখেছি, আমার উপন্যাসের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। 'উপন্যাস সমগ্র' সাত-আট খণ্ডের বেশি এগোবে বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য আজকাল ইউরোপ আমেরিকার সাহিত্যিকদের বইয়ের সংখ্যা আরও কম। আজকাল বিদেশে তথ্যভিত্তিক উপন্যাস লেখার একটা রেওয়াজ হয়েছে। কম লেখার সেটাও একটা কারণ কি না কে জানে। বাঙালি লেখকদের একটু বেশি লিখতে হয় বোধহয় প্রতিবছর পুজোসংখ্যার কারণেই। আমার অধিকাংশ উপন্যাসই বেরিয়েছে বিভিন্ন পুজোসংখ্যায়। আর ধারাবাহিক ভাবেও। এই খণ্ডে তারই কয়েকটি।

বিয়ের পর আমি সংসার পেতেছিলাম বালির সমবায় পল্লিতে। পরে আমার মেয়ের জন্মের পর নতুন করে সংসার পাতা হল বালি দুর্গাপুরে। যেখানে আমাদের বাসায় একদিন একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে এসে হাজির। মাথা ন্যাড়া, রোগা ডিগডিগে চেহারা, বোকাসোকা সেই মেয়েটিকে আমার স্ত্রী কাজের লোক হিসেবেই রেখেছিলেন। আমার মেয়ের বয়স তখন সাত মাস, তাকে চোখে চোখে রাখার জন্যও কাউকে দরকার। মেয়েটি বলেছিল, বাড়িতে তার সৎ মা, অনাদর আর গঞ্জনা ছাড়া সেখানে কিছু পায় না সে। যা-ই হোক, এর কয়েকদিন পর তার বাড়ির লোক তাকে ফেরত নিয়ে যায়।

এই মেয়েটিকে মনে করেই 'সাঁতারু ও জলকন্যা'র নায়িকাকে কল্পনা করে নিয়েছিলাম। বাস্তবের মেয়েটির পরিণতি জানা নেই। 'সাঁতারু ও জলকন্যা'র নায়ক এক দূরপাল্লার সাঁতারু। পদক, পুরস্কার বা খেতাবের জন্য নয়, সে সাঁতার কাটে সাঁতারের নেশায়, জলকে ভালবেসে।

সাঁতারুর বাড়িতে কিছু গভীর অশান্তি ছিল। অবশেষে সে ঠিক করে, একদিন সে তার জীবনের দীর্ঘতম সাঁতার দিতে জলে নামবে। কোনও লক্ষ্যে নয়, সাঁতার দিতে দিতে জলেই নেবে মৃত্যুকে বরণ করে। নায়িকা, ওই গাঁয়ের মেয়েটি সাঁতারুর দাদুর বাড়িতে আশ্রিতা। রোগাভোগা, মাথায় ঘা, ন্যাড়া আকর্ষণহীনা ওই মেয়েটি কিন্তু যৌবনের আশ্চর্য স্পর্শে এক রূপবতী মেয়ে হয়ে উঠেছিল। আর সেই মেয়েটিই একদিন সাঁতারুর পথ আটকে দাঁড়াল।

ছোট্ট এই উপন্যাসটিকে আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু আমি ভাগ্যবান যে, প্রকাশিত হওয়ার পর সেটি কিন্তু সাধুবাদ পেয়েছিল। অপর্ণা সেন ছবি করতেও আগ্রহ বোধ করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, মেয়েটির ওই ট্রানসফর্মেশন ছবিতে দেখানো ভীষণ শক্ত। কথাটা যুক্তিযুক্তই। লেখক অনেক সময়ে যে কল্পনাকে রূপায়িত করতে পারে তাকে দৃশ্যায়ন করা তত সহজ হয় না।

'মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক' উপন্যাসটি নিয়ে আমার একটু ক্ষোভ আছে। বহুদিন আগে একবার শারদীয় আনন্দবাজারের জন্য উপন্যাসটি লিখেছিলাম। তখন শারদীয়র ভারপ্রাপ্ত ছিলেন রমাপদ চৌধুরী। এমনিতে চমৎকার মানুষ, লেখার জন্য বিশেষ তাড়া বা তাগাদা দিতেন না, কিন্তু একটা বিশেষ সময়ে ঝপ করে ঝাঁপ ফেলে দিতেন। লেখককে সোজা জানিয়ে দিতেন, আগামী অমুক দিনের মধ্যে লেখা শেষ করতে না পারলে যতগুলো পৃষ্ঠা দিয়েছেন বা দেবেন ততটাই সম্পূর্ণ উপন্যাস বলে ছাপা হবে। 'মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক' অনেকটাই আমার জীবনের কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা, এবং টানা লিখে শেষ করতে পারলে এর একটা নির্ধারিত উত্তরণও ছিল। কিন্তু রমাপদবাবুর সহকারী এবং আমার বিশেষ স্নেহভাজন রাধানাথ মণ্ডল (কয়েক বছর আগে একটি দুর্ঘটনায় মারা গেছে) একদিন এসে আমাকে বলল, আগামী কালকের মধ্যেই আপনাকে উপন্যাস শেষ করতে হবে। তারপর আর এক পাতাও নেওয়া হবে না। আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, তা হলে আমাকে এবার বাদ দাও। উপন্যাস এখনও অর্ধেকও হয়নি। এই অবস্থায় এটি প্রকাশ করা উচিত হবে না। কিন্তু সেটা হল না। কম্পোজ হওয়া অংশ ফেরত দেওয়া তখন আর তাদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। পরদিন কয়েক পাতা কোনওরকমে লিখে উপন্যাসের দাঁড়ি টানলাম বটে, কিন্তু মনে একটা তেতো স্বাদ রয়ে গেল। মাধবের প্রকৃত পরিণতি দেখানো হল না। আর, একবার কোনও লেখা কোথাও শেষ করে দিলে আমি আর ছেঁড়া অংশ জোড়া দিয়ে উঠতে পারি না। কাজেই এই উপন্যাসটি ওইভাবেই শারদীয়ায় বেরোল, তারপর বই হয়েও। অবাক কাণ্ড হল, উপন্যাসটির অসম্পূর্ণতা নিয়ে কিন্তু কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি আমাকে। অনেকেই উপন্যাসটির সমাপ্তি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি নিষ্ঠুর উপন্যাস। আগাগোড়াই উদ্বাস্তু এক পরিবারের সীমাহীন দুঃখকষ্টের কথা। কিন্তু হয়তো সম্পূর্ণতা পেলে উপন্যাসটিতে অন্য মাত্রা যুক্ত হত।

'কাঁচের মানুষ' উপন্যাসটির কথা প্রায় ভুলেই যাওয়া গিয়েছিল। কোনও পুজোসংখ্যায় লেখা, কোথায় তা মনে নেই, তবে এটি লেখা হয়েছে আমার প্রিয় শহর শিলিগুড়ির প্রেক্ষাপটে। বাবার চাকরির সূত্রে একসময়ে আমরা শিলিগুড়িতে এসেছিলাম। তখন শহর এত বড় হয়নি। ছোট্ট একমুঠো, মিষ্টি একটা শহর। আমার ভাইবোনদের লেখাপড়ার সূত্রে আমরা শিলিগুড়িতেই স্থিতু হয়ে গেলাম। বাবা বদলি হয়ে গেলেও আমাদের পরিবার আর ঠাঁইনাড়া হয়নি। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে সুভাষপল্লিতে আটশো টাকা কাঠা দরে পাঁচ কাঠা জমি কেনা হল। আমার বাবার চাকরির কৌলীন্য থাকলেও পয়সা ছিল না। কারণ তিনি জীবনে কখনও ঘুষ খাননি। ফলে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করে কোনওক্রমে আধখ্যাঁচড়া একটা বাড়িও খাড়া করা হল, যার অর্ধেকটার ছাদ ঢালাই করা যায়নি টাকার অভাবে। বাড়িটি শেষ করতে অনেক সময় লেগে গেল আমাদের। ওই বাড়ির সঙ্গে আমাদের পরিবারের সুখদুঃখের ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। ওই

বাড়িতেই প্রয়াত হন আমার ঠাকুমা, মা এবং বাবা। সুতরাং ওই বাড়িটিই আমাদের উদ্বাস্তু পরিবারটির দ্বিতীয় ভদ্রাসন। পড়াশুনো, চাকরি এবং লেখার সূত্রে আমি দীর্ঘকাল কলকাতাবাসী বলে শিলিগুড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা গভীর হতে পারেনি। কিন্তু ওই শহরের প্রতি আমার আবেগমথিত আকর্ষণ বড় কম নয়। 'কাঁচের মানুষ' একটি সম্পন্ন পরিবারের নানা গল্প ও ঘটনা নিয়ে লেখা। চরিত্রের সংখ্যা বড় কম নয়। তবে অনেকদিন আগে লেখা বলে শিলিগুড়ির সব বর্ণনা এখনকার সঙ্গে হয়তো শতকরা একশোভাগ মিলবে না।

আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়-র পাতায় ধারাবাহিক গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশের একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বহু বছর আগে। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী প্রথম ধারাবাহিকটি লেখার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। একটু দোনোমোনো করে অবশেষে তাঁরই তাগিদে আমি রাজি হয়ে যাই। 'বিকেলের মৃত্যু' নামটি বহুকাল আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র বা ম্যাগাজিন 'একতা'য় প্রকাশিত আমারই একটি গল্পের শিরোনাম থেকে নেওয়া। যখনকার লেখা তখন আমাদের পত্রিকা অফিসের দফতরে কমপিউটার চালু হয়েছে মাত্র। বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত পি টি এস কর্মীরা তখন কমপিউটারেই কম্পোজ করা শুরু করেন। প্রাচীন প্রজন্মের সেইসব কমপিউটার এখন আর নেই। আমার এই উপন্যাসে সেইসব কমপিউটারের ভূমিকা অনেকখানি। লেখার জন্য তখনকার ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত ব্যাপারগুলো জেনে নিতাম। তবু হয়তো টেকনিক্যাল ব্যাপারে কিছু বিচ্যুতি থেকে গেছে। কারণ আজও আমি কমপিউটারে শিক্ষণপ্রাপ্ত হইনি। সেইজন্য আমার পুত্রকন্যা এবং বধূমাতা আমাকে মধুর ভর্ৎসনা করতে ছাড়ে না। গল্পটি একটু অলীক, তবে ঘটনার ঘনঘটা, প্রচুর অ্যাকশন এবং প্রেম আছে। এখনকার পাঠকদের কেমন লাগবে জানি না। যখন লেখা হয়েছিল তখন বোধহয় অনেকেরই তেমন খারাপ লাগেনি।

ফুটবল খেলোয়াড় যেমন বল নিয়ে ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে মাঠের দুরূহ কোণে চলে যায়, যেখান থেকে গোলে শট নেওয়া অসম্ভব। ঠিক সেইরকম লিখতে লিখতে আমিও মাঝে মাঝে এমন জটিল আবর্ত বা অসম্ভাব্যতার খপ্পড়ে পড়ে যাই, যেখান থেকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই যখন আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ আমাকে 'দেশ' পত্রিকায় একবার ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার অনুরোধ জানালেন তখন ঠিক করলাম, এবার সহজ করে লিখব এবং খুব বেশি জটিলতার পথে হাঁটব না। তাই 'মানবজমিন' শুরু করলাম সহজ ভাবেই। ১৯৭৯-র কোনও সময়ে। বাস্তবিকই এই উপন্যাসটি আমি দিব্যি তরতর করেই লিখে গেছি। প্রতি কিস্তির জন্য খুব বেশি উদ্বেগ বা অনিশ্চয়তা ভোগ করতে হয়নি। প্রকাশ শুরু হওয়ার পর টের পেলাম, ধারাবাহিকটি লোকে পড়ছে। টুকটাক চিঠিপত্র আসত, অনেকে পরিণতি জানতে চাইত। বেশ একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে বুঝতে পেরে মজা পেতাম। আমার ধারণা একজন লেখকের সাফল্য বলে কিছু নেই, কোনও স্থির লক্ষ্যে পৌঁছোনোরও ব্যাপার নেই। যতদিন বাঁচে ততদিন তাকে লিখে যেতে হয়। অর্থ, মান, প্রতিষ্ঠা এসব হয়তো আসে, কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির কোনও স্থান নেই তার জীবনে। কাজেই 'মানবজমিন'-এর সামান্য জনপ্রিয়তা আমাকে কখনওই নাড়া দেয়নি। নায়ক দীননাথ কার আদলে তৈরি তা অনেকে জানতে চেয়েছে। একজন ভদ্রমহিলার ধারণা হয়েছিল যে, মণিদীপা আসলে তিনিই। কী করে মানুষকে বোঝাব যে, লেখকের রান্নাঘর বলে একটা ব্যাপার আছে। সেখানে লেখক যে কখন কার সঙ্গে কাকে কতটা মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন আর একটা মানুষ তৈরি করবে তার ঠিক নেই। আর যিনি নিজেকে মণিদীপা বলে মনে করতেন তাঁর সঙ্গে আমার যৎসামান্য পরিচয় ছিল মাত্র, সুতরাং তাঁকে নিয়ে লেখার প্রশ্নই আসে না। আর গল্পে-উপন্যাসে বাস্তব কোনও বিশেষ ব্যক্তির হুবহু চরিত্রায়ণ সঙ্গত নয়। তাতে জটিলতা বা মামলা-মোকদ্দমাও হতে পারে।

এই দীর্ঘ উপন্যাসটি দু'বছরেরও বেশি সময় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন, এতগুলো চরিত্রকে আমি সামলাই কী করে। এ ব্যাপারে বলি, আমি বরাবরই একটু বেশি চরিত্র সন্নিবেশ করতে পছন্দ করি। এমনকী আমার বেশ কয়েকটি ছোটগল্পেও প্রায় উপন্যাসের মতো বহু চরিত্রের অবতারণা ঘটেছে। সংখ্যাধিক চরিত্র নিয়ে লিখতেই বরং আমার বেশি ভাল লাগে।

আমি দুনিয়া চষে বেড়াইনি বটে, কিন্তু বাবার চাকরির সুবাদে বাল্যকালে, অফিসের কর্মসূত্রে এবং সর্বোপরি ঠাকুরের কাজে গোটা দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরি হয়েছে বিস্তর। এখনও ঠাকুরের কাজে আমি বছরে বেশ কয়েকবার পল্লি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াই। ফলে মানুষ কুড়োনো হয়েছে বড় কম নয়। লেখার সময় তাই চরিত্রের অনটন বড় একটা ঘটে না। বলতে কী, লেখার সময় আমি আমার চরিত্রদের স্পষ্ট দেখতে পাই। ফলে তেমন কোনও অসুবিধে হয় না।

তৃষাকে নিয়ে আমাকে বিস্তর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই সাহসী, সংস্কারমুক্ত এবং অহংকারী মহিলাকে আমি কোথায় পেয়েছি। আপাতনিষ্ঠুর বাস্তববাদী এবং খানিকটা স্বার্থকেন্দ্রিক এই মহিলার সবটুকু নিশ্চয়ই একজনের মধ্যে পাওয়া যায়নি। তৃষার মধ্যে তাই অন্তত আমার দেখা তিনটি নারী চরিত্রের মিশ্রণ ঘটেছে। আর খানিকটা কল্পনা তো আছেই।

'মানবজমিন' শেষ হওয়ার পর আমি বইটি চটজলদি প্রকাশ করায় আগ্রহী ছিলাম না। মনে হয়েছিল উপন্যাসটির ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু স্বভাবে অলস এবং লেখনীধারণে অস্পৃহার বশে উপন্যাসটি নিয়ে বসা হচ্ছিল না। আনন্দ পাবলিশার্স এবং পাঠক-পাঠিকাদের তাড়না সত্ত্বেও দিব্যি শুয়ে-বসে-আড্ডা মেরে কালাতিপাত করছিলাম। কিন্তু 'মানবজমিন' যে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সেটা বুঝলাম, মাস দুয়েক যেতে না যেতেই যখন সাগরময় ঘোষ আমাকে তাঁর অফিসঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমাকে এক্ষুনি 'দেশ'-এর জন্য আর একটা ধারাবাহিক শুরু করতে হবে। শুনে আমি থ। বললাম, সাগরদা, এখনও তো হাতের কালি ভাল করে শুকোয়নি। এখনই কেন? সবে তো শেষ হল। উনি বললেন, না, কোনও ওজর-আপত্তি চলবে না। আজই গিয়ে লিখতে বসে যাও। ওপর থেকে তাগাদা আসছে।

বড্ড মুশকিলে পড়ে গেলাম। একটা দীর্ঘ ধারাবাহিকের শেষে হাঁফ ছাড়ার একটা অবকাশও তো দরকার। আমি নাকি অজুহাত খাড়া করার ওস্তাদ। সেই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে গড়িমসি করে করে আরও কয়েকমাস কাটিয়ে বছর খানেকের মাথায় 'দূরবীন' লেখা শুরু করতে হল। তখনও 'মানবজমিন' বই হিসেবে ছাপতে দিইনি। পেস্টিং করা প্রুফ ডাঁই হয়ে আমার ঘরে পড়ে আছে। 'দূরবীন'ও এক দীর্ঘ উপন্যাস। একটি নতুন আঙ্গিক মাথায় এসেছিল, সেই আঙ্গিকেই লেখা। পাঠকরা 'দূরবীন'কেও অনাদর করলেন না। আরও বছর দুয়েক 'দূরবীন' বেরোল, শেষ হল এবং বই হয়ে বেরিয়েও গেল। 'মানবজমিন' তখনও আমার নিজস্ব হিমঘরে। 'দূরবীন' প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে একদিন আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু এসে আমাকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করে বললেন, পাঠকরা এত খোঁজ করছে, চিঠিপত্র আসছে, আর আপনার এত দিনেও বইটা একটু দেখে দেওয়ার সময় হল না? বেশ লজ্জিত হয়ে সেদিনই বাড়ি ফিরে 'মানবজমিন'-এর কপি খুলে বসলাম। তারপর মনে হল, শেষ চ্যাপটারটা একটু লম্বা আর তরল বলে মনে হচ্ছে। একটু ভেবেচিন্তে শেষ পরিচ্ছেদটা সটান বাদ দিয়ে দিলাম। সামান্য দু'-একটা সংশোধন সেরে কপি দিয়ে এলাম আনন্দ পাবলিশার্সে। বই বেরোল এবং একটু সমাদরও হল। 'দূরবীন' যে বছর আনন্দ পুরস্কার পায়, তার পরের বছরই 'মানবজমিন' পায় আকাদেমি পুরস্কার। বলতে হবে, আমি অশেষ ভাগ্যবান। তবে বলে রাখি, বই হয়ে পরে বেরোলেও 'মানবজমিন' আগে লেখা। আমার আলস্য ও এলোমেলো স্বভাবের জন্য এই পরম্পরার গোলমাল। 'মানবজমিন' ও 'দূরবীন' দুটোই বেশ বৃহদাকার। এত বড় বড় উপন্যাস লিখব কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।

অনাদর বা সমাদর যা-ই হোক, আমাকে তো লিখে যেতেই হবে। এটাই আমার ভবিতব্য। সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আমার স্থান কোথায় বা আদৌ স্থান আছে কি না তা জানি না। কেমন লিখি, লেখাগুলো কিছু হয়ে ওঠে কি না তাও তো ভেবে দেখিনি। শুধু সাহস করে লিখে যাই। এই লিখে যাওয়াটুকুই আমার বেঁচে থাকা।

সূচি

সাঁতারু ও জলকন্যা

জলের ঐশ্বর্যকে যেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিল অলক সেদিন থেকেই ডাঙাজমির ওপরকার এই বসবাস তার কাছে পানসে হয়ে গেল। একদা কোন শৈশবে প্লাস্টিকের লাল কোনও গামলায় কবোষ্ণ জলে তাকে বসিয়ে দিয়েছিল মা। জলের কোমল লাবণ্য ঘিরে ধরেছিল তাকে। সেই থেকে জল তার প্রিয়। বাড়ির পাশেই পুকুর, একটু দূরে নদী। ভাল করে হাঁটা শিখতে না শিখতেই সে শিখে ফেলল সাঁতার। সুযোগ পেলেই পুকুরে ঝাঁপ, নদীতে ঝাঁপ। মা'র বকুনি, তর্জন-গর্জন সব ভেসে যেত জলে। যে গভীরতা জলে সেরকম গভীরতা আর কিছুতেই খুঁজে পেত না অলক। খুব অল্প বয়সেই সে আবিষ্কার করেছিল জলের সবুজ নির্জনতাকে। নৈস্তব্ধকে।

জল থেকেই সে তুলে এনেছে বিস্তর কাপ আর মেডেল! মুর্শিদাবাদে গঙ্গায় দীর্ঘ সাঁতার, পক প্রণালীর বিস্তৃত জলপথ, জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা, সব জায়গাতেই অলকের কিছু না কিছু প্রাপ্তি হয়েছে। রাজ্যের হয়ে সে বেশ কিছুদিন খেলেছে ওয়াটারপোলো। ঘরে আলমারির পর আলমারি ভর্তি হয়েছে নানাবিধ পুরস্কারে। কিন্তু অলক, একমাত্র অলকই জানে, কাপ-মেডেলের জন্য কখনওই সে সাঁতার কাটেনি। জলের মধ্যেই তার জগৎ, জলের মধ্যেই তার আত্ম-আবিষ্কার, জলই তার দ্বিতীয় জননী।

জলের কাছে সে শিখেছেও অনেক। তার স্বভাব শান্ত, সে ধৈর্যশীল, কম কথার মানুষ।

তার ছেলেবেলায় একদিনকার একটি ঘটনা। বাড়ির একমাত্র টর্চটাকে কে যেন ভেঙে রেখেছিল। মা তাকেই এসে ধরল, তুই ভেঙেছিস।

অলক প্রতিবাদ করতে পারল না। সে ধরেই নিয়েছিল সত্যি কথা বললেও মা তাকে বিশ্বাস করবে না। একজনের ঘাড়ে টর্চ ভাঙার দায়টা চাপানো দরকার। সুতরাং সে দু'-চার ঘা চড়-চাপড় নীরবে হজম করল, মাথা নিচু করে সয়ে নিল ঝাল বকুনি। ব্যাপারটা মিটে গেল।

পরদিনই অবশ্য টর্চ ভাঙার আসল আসামি ধরা পড়ল। তার দিদি। তখন মা এসে তাকে ধরল, কাল তা হলে বলিসনি কেন যে, তুই ভাঙিসনি?

অলক এ কথারও জবাব দিল না।

মা খুব অবাক হল। চোখে শুধু বিস্ময় নয়, একটু ভয়ও ছিল মায়ের। যাকে বোঝা যায় না, যে কম কথা বলে এবং যার অনেক কাজই স্বাভাবিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না, তার সম্পর্কে আশেপাশের লোকের খানিকটা ভয় থাকে। কী ছেলে রে বাবা!

অলককে নিয়ে মা আর বাবা দু'জনেরই নানা দুশ্চিন্তা ছিল। শান্ত, প্রতিবাদহীন এই ছেলেটিকে তাদের বুঝতে অসুবিধে হত। তার বায়না নেই, খিদে পেলেও মুখ ফুটে খেতে চায় না, সাতটা কথার একটা জবাব দেয়।

পাড়ায় সোমা নামে একটি পাজি মেয়ে ছিল। একদিন সে এবং তার বাড়ির লোকেরা শোরগোল তুলল, অলক নাকি সোমাকে একটা প্রেমপত্র দিয়েছে। খুব অশ্লীল ভাষায়। এই নিয়ে সারা পাড়া তুলকালাম। সোমার বাড়ি ঝগড়ুটে বাড়ি বলে কুখ্যাত। পুরো পরিবার এসে চড়াও হয়ে অলক এবং তার বাপ-মাকে বহু আকথা-কুকথা শুনিয়ে গেল, পাড়ার লোকও শুনল ভিড় করে। অলক জবাব দিল না, একটি প্রতিবাদও করল না। পরে তার বাবা রাগের চোটে একটা

ছড়ি প্রায় তার শরীরে ভেঙে ফেলল পেটাতে পেটাতে। তারপর হাল ছেড়ে দিল।

পরে যখন চিঠির রহস্য ফাঁস হয় তখনও অলক নির্বিকার। সেই চিঠি অলকের হাতের লেখা নকল করে লিখেছিল সোমা নিজেই। কেন লিখেছিল তা সে নিজেও জানে না। বয়ঃসন্ধিতে ছেলে-মেয়েদের মন নানা পাগলামি করে থাকে। সোমা সম্ভবত অলকের প্রেমে পড়ে থাকবে এবং তার মনোযোগ আকর্ষণের নিরন্তর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ওইভাবে প্রতিশোধ নেয়। একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল ঠিকই এবং সেইজন্য সে পরে অনেক চোখের জল ফেলেছে।

কিন্তু যার জন্য এত কিছু, সে সুখে দুঃখে নির্বিকার সাঁতরে চলেছে পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে কিংবা বাঁধানো সুইমিং পুল-এ। ডাঙায় যা ঘটে তার সবকিছুই সে ধুয়ে নেয় তার প্রিয় অবগাহনে। জলই তাকে দেয় আশ্রয়, ক্ষতস্থানে প্রলেপ, বেঁচে থাকার রসদ।

এক-একদিন খুব ভোরবেলা কুয়াশামাখা আবছা আলোয় একা লেকের জলে রোয়িং করতে করতে তার আদিম পৃথিবীর কথা মনে হয়। আগুনের গোলার মতো তপ্ত পৃথিবীর আকাশে তখন কেবলই পরতের পর পরত জমে যাচ্ছে নানা গ্যাস ও বাষ্প। কত মাইল গভীর সেই মেঘ কে বলবে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমা হয়েছিল মেঘ। তারপর ক্রমে ক্রমে জুড়িয়ে এল পৃথিবী। একদিন সেই জমাট মেঘ থেকে শুরু হল বৃষ্টি। চলল হাজার হাজার বছর ধরে। বিরামবিহীন, নিশ্ছিদ্র। জল পড়ে, তৎক্ষণাৎ বাষ্প হয়ে উড়ে যায় আকাশে, ফের জল হয়ে নামে। কত বছর ধরে চলেছিল সেই ধারাপাত কে জানে। তবে সেই বৃষ্টিও একদিন থামল। পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। দেখা গেল সমস্ত পৃথিবীটাই এক বিশাল জলের গোলক। তারপর ধীরে ধীরে জল সরে যেতে লাগল নানা গহ্বরে, ঢালে, নাবালে। মাটি আর জলে আর রোদে শুরু হল প্রাণের এক বিচিত্র লীলা। উদ্ভিদে, জলজ প্রাণীতে, স্থলচরে সেই প্রাণের যাত্রা চলতে লাগল। অলকের মনে হয়, সেই আদিম প্রাণের খেলায় সেও ছিল কোনও না কোনওভাবে। তার রক্তে, তার চেতনায় সেই পৃথিবীর স্মৃতি আছে। সে কি ছিল জলপোকা? শ্যাওলা?

খেলোয়াড়দের নানারকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে থাকে একটু আলাদা রকমের পৌরুষের বোধ, কিছু গ্ল্যামারও। মোটামুটি নামকরা একজন সাঁতারু হওয়া সত্ত্বেও অলকের এইসব বোধ নেই। সে যে একজন সাঁতারু এ কথাটাই তার মনে থাকে না। মাঝে-মধ্যে কেউ অটোগ্রাফ চাইলে সে একটু চমকেই ওঠে। ভারী সংকোচও বোধ করে। মার্ক স্পিৎজ হওয়ার জন্য তো আর সে সাঁতরায় না। জল তার পরম নীল নির্জন, জল তার এক আকাঙ্ক্ষিত একাকিত্ব, জলে সে আত্মার মুখোমুখি হয়।

দুই বোনের মাঝখানে সে, অর্থাৎ অলক। বড় বোন অর্থাৎ দিদি মধুরা এবং বোন প্রিয়াঙ্গি যে যার স্বক্ষেত্রে সফল। বিশেযত মধুরা ছিল যেমন ভাল ছাত্রী তেমনি সে গানে বাজনায় ওস্তাদ। এক চান্সে সে ডাক্তারি পাশ করে গেছে। প্রিয়াঙ্গি এখনও কলেজে, গানে বিশেযত রবীন্দ্রসংগীতে, সে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন তুলেছে। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের তিনটি সন্তানের দু'টিরই এ রকম সাফল্য বেশ একটা বলার মতো ঘটনা। সেদিক দিয়ে তাদের বাবা সত্যকাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা মনীষা যথেষ্ট ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী। মধ্যম সন্তানটি তাদের ডোবায়নি বটে, কিন্তু সে নিজেই এক সমস্যা। সত্যকাম এবং মনীষা দু'জনেই কালচারের লাইনের লোক। দু'জনেরই গানের চর্চা ছিল, অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ছিল। সত্যকাম একটা শৌখিন নাটকের দল চালিয়েছিল দীর্ঘকাল। মনীষা শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় বহু নৃত্যনাট্য করেছে। এই পরিবারে একজন সাঁতারুর জন্মানোর কথা নয়। উপরন্তু যে সাঁতারুর গানবাজনা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ নেই। তবু মনের মতো না হওয়া সত্ত্বেও সত্যকাম এবং মনীষা ছেলেকে আকণ্ঠ ভালবাসার চেষ্টা করেছে। সত্যকাম জেনারেশন গ্যাপ তত্ত্বটা তত্ত্ব হিসেবে মানে বটে, কিন্তু তেমন বিশ্বাস করে না। তার ধারণা ছিল ছেলের বন্ধু হয়ে উঠতে তার আটকাবে না। সে নিজে মিশুক, উদার, অভিনয়পটু। সে নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু পারল না। অলকের চারদিকে যে একটা অদ্ভুত অদৃশ্য কঠিন খোল সেটাই তো ভাঙতে পারল না সে।

হতাশ হয়ে একদিন সে মনীষাকে বলেছিল, ইট ইজ নট জেনারেশন গ্যাপ।

তা হলে কী?

সামথিং মোর আরবান। ও বোধহয় কামুর সেই আউটসাইডার।

মনীষা ফোঁস করে উঠে বলল, তুমি ছাই বোঝো। আমার ছেলেকে আমি বুঝি।

কথাটা মিথ্যে নয়। মনীষা খানিকটা বোঝে। আর বোঝে বলেই তেমন ঘাঁটায় না। আবার মনীষা অলকের অনেকটাই, বেশিরভাগটাই বোঝে না। এই না-বোঝা অংশটা তার অহংকে অহরহ নিষ্পেষিত করে। মা হয়ে ছেলেকে বুঝতে না পারার মতো আর কষ্ট কী আছে?

সত্যকাম দু'বার দুটো সিনেমা ম্যাগাজিন বের করেছিল। ফিল্মে সে বেশ কিছুদিন এক বিখ্যাত পরিচালকের সহকারী থেকেছে। একাধিক বৃহৎ ফাংশনের ইমপ্রেশারিও হয়েছে। এখন সে একটি ইংরিজি দৈনিক পত্রিকার ফিল্ম সেকশনে চাকরি করে। মাইনে যথেষ্ট ভাল, কিন্তু সত্যকাম এটুকুতে খুশি নয়। আরও অনেক বড় হওয়ার কথা ছিল তার, এবং স্বাধীন। সুতরাং এখনও সে হাল ছাড়েনি। মাঝে-মধ্যেই শর্ট ফিল্ম তোলে, ফিচার ফিল্মের স্ক্রিপ্ট করে এন এফ ডি সি-তে ধরনা দেয় এবং প্রযোজক খুঁজে বেড়ায়। টুকটাক দুটো-একটা ছবি সে মাঝে-মধ্যে তুলেও ফেলে। কোনওটাই বাজার তেমন গরম করে না। কিন্তু এসব নিয়ে এবং দিল্লি বোম্বাই করে সত্যকাম খুবই ব্যস্ত থাকে। একটা কিছু করছে, থেমে যাচ্ছে না, এই বোধটাই তার কাছে এখন অনেক। বয়স চল্লিশের কোঠায়, পঞ্চাশের মোহনায়। এখনও বাড়ি হয়নি, গাড়ি নেই, বড় মেয়ের বিয়ের খরচের কথা সব সময়ে মনে রাখতে হয়।

মনীষার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রেডিয়ো এবং টেলিভিশনে প্রোগ্রাম পাওয়া পর্যন্ত থমকে গেছে। মাঝে-মধ্যে গায়। একটা-দুটো রেকর্ড হয়েছিল একদা। মাঝে-মধ্যে ফাংশনে গাইবার ডাক পায়। তবে মনীষার একটা বেশ রমরমে নাচগানের স্কুল আছে। তা থেকে আয় মন্দ হয় না। আয়ের চেয়েও বড় কথা, মেতে থাকা যায়। একটা কিছু করছে, কাউকে কিছু শেখাচ্ছে, এটাও বা কম বোধ কিসের? চল্লিশ সেও পেরিয়েছে। আজকাল অবশ্য এটা তেমন কোনও বয়স নয়। কিন্তু মনীষা আর তেমন কোনও উচ্চাশার হাত ধরে হাঁটে না। তার উচ্চাশা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে দুটো মেয়ের ওপর। মধুরা আর প্রিয়াঙ্গি যদি কিছু করতে পারে তবেই হল। মনীষা এটাও বোঝে মিডিয়োকারদের যুগ এটা নয়। মাঝারিরা চিরকাল মাঝবরাবর মধ্যবিত্ত থেকে যায়, কী প্রতিভায়, কী সাফল্যে। মধুরা মাঝারির চেয়ে অনেকটা উঁচুতে, প্রিয়াঙ্গি অনেকটাই মাঝারি।

অলক কেমন? না, তা মনীষা বা সত্যকাম জানে না। তারা অলকের আনা কাপ-মেডেলগুলো খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখে। দুঃখের বিষয় সত্যকাম সাঁতার জানেই না, মনীষা একটু-আধটু জানে না-জানার মতোই। ছেলে সম্পর্কে সত্যকাম একবার বলেছিল, ও যদি সাঁতারই শিখতে চায় তো বহোত আচ্ছা। চলে যাক পাতিয়ালা বা এনিহোয়্যার, ভাল কোচিং নিক, লেট হিম গো টু এশিয়াড অর ইভন অলিম্পিকস।

মনীষা বাধা দিয়ে বলেছিল, ওসব ওকে বলতে যেয়ো না। আমি যতদূর জানি ও সাঁতার দিয়ে নাম করতে চায় না। প্লিজ, ওকে ওর মতো হতে দাও।

সত্যকাম বুদ্ধিমান। ছেলে আর তার মধ্যে জেনারেশন বা অন্য কোনও গ্যাপ যে একটা আছে, তা সে জানে। তাই সে চাপাচাপি করল না। শুধু চাপা রাগে গনগন করতে করতে বলল, সাঁতার তো খারাপ কিছু নয়। আমি বলছি—

প্লিজ, কিছু বলতে হবে না। লেট হিম বি অ্যালোন।

লেখাপড়ায় অলকের তেমন ভাল হওয়ার কথা নয়। সারা বছর নানা কমপিটিশনে যেতে হলে পড়াশুনো হয়ও না তেমন। কিন্তু বেহালার যে স্কুলে সে পড়েছে বরাবর সেই স্কুলের মাস্টারমশাইরা দেখে অবাক হয়েছেন যে, এক-একবার এক-এক বিষয়ে অলক সাংঘাতিক নম্বর পায়। কোনওবার

ইতিহাসে শতকরা আশি, কখনও অঙ্কে নব্বই, কখনও বাংলায় পঁচাত্তর বা ইংরিজিতে সত্তর। অর্থাৎ কোন বিষয়ের প্রতি যে তার পক্ষপাত সেটা বোঝার উপায় নেই। টেস্টের পর মাস্টারমশাইরা একটা কোচিং খুলে তাতে অলককে ভরতি করে নেন এবং এই বিখ্যাত সাঁতারু ছেলেটিকে যত্ন করে তৈরি করে দেন। তারই ফলে অলক হায়ার সেকেন্ডারি ডিঙোয় ফার্স্ট ডিভিশনে। টায়ে-টায়ে। ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ইচ্ছে ছিল সত্যকামের। অলক রাজি হয়নি। সে গেল নেভিতে ভরতি হতে। হল, কিন্তু ছ' মাস পর ফিরে এসে বলল, ভাল লাগল না। পরের বছর বি এ ক্লাসে ভরতি হল। সাদামাটাভাবে পাশ করে গেল।

চাকরির অভাব অলকের নেই। রেল ডাকে, ব্যাংক ডাকে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও ডাকে। বার দুই-তিন চাকরি বদলাল সে।

দিল্লির ট্রেন ধরবে বলে সকালে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে ডিম-ভরতি মুখে সত্যকাম মনীষাকে বলল, তোমার নাচের স্কুলে নতুন একটা মেয়ে ভরতি হয়েছে। সুছন্দা। এ ভেরি বিউটিফুল গার্ল। পারো তো ওকে অলকের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও।

মনীষা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, তার মানে?

লেট দেম মিক্স। তাতে ছেলেটার খানিকটা চোখ খুলবে, অভিজ্ঞতা হবে, তারপর যদি বিয়ে করতে চায় তো লেট দেম।

কী যে সব বলো না! ছেলে কি গিনিপিগ যে তার ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাবে! ওকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।

একটা লঙ্কাকুচি কামড়ে ঝালমুখে উঃ আঃ করতে করতে উঠে পড়ে সত্যকাম। কিন্তু দিল্লি পর্যন্ত আইডিয়াটা তার মাথায় থাকে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সেও সে বেশ রোমান্টিক। এখনও সে টিন-এজারদের নিয়ে ভাবে। মেয়েদের সঙ্গে তার মেলামেশা ব্যাপক, গভীর এবং সংস্কারমুক্ত।

সত্যকাম দিল্লি চলে যাওয়ার পরদিনই নাচের ক্লাসে সুছন্দাকে একটু আলাদা করে লক্ষ করল মনীষা। মোটেই তেমন কিছু দেখতে নয়। খারাপও নয় তা বলে। কিন্তু আহামরিও বলা যায় না। মনীষা বারবারই সুছন্দার নাচের নানা ভুল ধরতে লাগল। দু'-একবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধমকও দিল।

ক্লাসের পর বাড়ি ফিরেই প্রিয়াঙ্গি্ ডাকনাম ধরে ডেকে বলল, এই ঝুমুর, অলক কোথায় রে?

দাদা! দাদা তো সকাল থেকেই বাড়িতে নেই।

কোথায় যায় রোজ এ সময়ে? আমার নাচ-গানের ক্লাসের কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করে না তো?

তোমার নাচ-গানের ক্লাস! দাদা তো বোধহয় জানেই না তোমার নাচ-গানের ক্লাস কোথায়। কেন মা?

মনীষার মেজাজটা খারাপ ছিল। জবাব দিল না।

কথাটা অবশ্য মনে রাখল প্রিয়াঙ্গি। দুপুরে আবার সন্তর্পণে কথাটা তুলে জিজ্ঞেস করল, দাদাকে কি তোমার সন্দেহ হয়? দাদা সেরকম নয় কিন্তু।

মনীষা এর জবাবে বলল, সুছন্দাকে তো দেখেছিস! কেমন দেখতে বল তো!

কেন, বেশ তো।

কী জানি বাবা, আমিই বোধহয় কিছু বুঝি না।

কেন মা, কী হয়েছে? সুছন্দার সঙ্গে দাদার কি ভাব?

দুই

চাঁপারহাটের দাসশর্মাদের বাড়িতে বনানী নামে যে বামুনের মেয়েটা কাজ করে সে বামুন না বাগদি সে কথাটা বড় নয়। বড় প্রশ্ন হল মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে কোনওরকমে।

বনানীর শোওয়ার জায়গাটা একটু অদ্ভুত। স্বাভাবিক খাট-বিছানা তাকে দেওয়া হয় না। সে শোয় লাকড়ি-ঘরের পাটাতনে। খানিকটা শুকনো খড় পুরু করে পেতে তার ওপর দুটো চট বিছিয়ে তার শয্যা। গায়ে দেওয়ার একটা তুলোর কম্বল আছে তার। আর একটা সস্তা নেটের ছেঁড়া মশারি। ফুটো আটকানোর জন্য নানা জায়গায় সুতো বাঁধা। গেরস্তর দোষ নেই। বনানী তেরো বছর বয়সেও বিছানায় মাঝে মাঝে পেচ্ছাপ করে ফেলে। নিজেই চট কাচে, খড় পালটায়। বড়ই রোগাভোগা সে। তেরো বছরের শরীর বলে মনেই হয় না। হাড় জিরজির করছে শরীরে। হাঁটুতে কনুইয়ে গোড়ালিতে কণ্ঠায় হনুতে হাড়গুলো চামড়া যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে। মাথাটা তার প্রায় সর্বদাই ন্যাড়া। কানে দীর্ঘস্থায়ী ঘা। ঘা কনুইয়ে, মাথায়, হাঁটুতেও। বনানী ফরসা না শ্যামলা তা তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই। রোগা শরীরটায় একটা পাকাপাকি ধূসর বর্ণ বসে গেছে। তার মুখখানা কেমন তাও বলার উপায় নেই। হাড়ের ওপর চামড়ার একটা ঢাকনা, তাতে মনুষ্য অবয়ব আছে মাত্র।

দাসশর্মাদের প্রকাণ্ড সংসার। একশো বিঘের ওপর জমি। দুটো লাঙ্গল, একটা ট্রাক্টর। সারাদিন মুনিশ খাটছে, জন খাটছে, দাসদাসী খাটছে। বেহানবেলা কাক না ডাকতেই দাসশর্মাদের বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়। নিজের পাটাতনের বিছানায় শুয়েই বনানী শুনতে পায় উঠোনে গোরুর দুধ দোয়ানোর চ্যাং-চ্যাং মিষ্টি শব্দ। সন্ধি ঝি উঠোন ঝাঁটাতে থাকে, পৈলেন বালতি বালতি জল ঢেলে গোহাল পরিষ্কার করে, ডিজেল পাম্প চালিয়ে গুরুপদ জল দেয় বাগানে। বশিষ্ঠ দাসশর্মা তারস্বরে তাণ্ডব স্তোত্র পাঠ করতে থাকে। ভোরবেলায় চারদিককার গাছগাছালিতে পাখিও ডাকে মেলা। উদুখলের শব্দ ওঠে। পৃথিবীর হৃৎপিন্ডের মতো চলতে থাকে ঢেঁকি। এ বাড়িতে কত কী হয়!

বনানীর বড় ভাল লাগে এই সংসারটা। কারণ এখানে বেশ পালিয়ে লুকিয়ে থাকা যায়। এত লোকজন চারদিকে যে, তার বড় একটা খোঁজখবর হয় না। প্রথম-প্রথম সে রান্নাঘরে কাজ পেয়েছিল। কিন্তু গায়ে ঘা বলে সেখান থেকে তাকে সরানো হয়। এরপর বামুনের মেয়ে বলে তাকে দেওয়া হয় পুজোর ঘরে। কিন্তু বনমালী পুরুত ক্ষতযুক্ত মেয়ের হাতের জল বিগ্রহকে দিতে নারাজ। বনানীকে তাই সেখান থেকেও সরানো হল। এখন বলতে গেলে তার কোনও বাঁধা কাজ নেই। শুধু এর ওর তার ফাইফরমাশ খাটতে হয়। এই ফাইফরমাশের মধ্যে বেশিরভাগই মুদির দোকানে যাওয়া।

বনানীর বাড়ি এই চাঁপারহাটেই। দাসশর্মাদের বাড়ি থেকে বেশিদূরও নয়। সেখানে তার বাবা আছে, মাসি আছে, মাসির দুটো মেয়ে আছে। মাসিকে মাসিও বলা যায়, মাও বলা যায়। তবে মা বলতে কখনও ইচ্ছে করে না বনানীর। তার নিজের মা মরার পর যখন বাবা মাসিকে বিয়ে করতে গিয়েছিল তখন বাবার কোলে চেপে সেও যায়। বাবার বিয়ে সে খুব অবাক হয়ে দেখেছিল। এমনকী সাত পাকের সময়েও সে বাবাকে ছাড়েনি, কোলে চেপে কাঁধে মাথা রেখে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে বাবার সঙ্গে মাসির শুভদৃষ্টি দেখেছিল। এখনও সব মনে আছে তার। দু'রকম মাছ, আমড়ার চাটনি আর দই খেয়েছিল খুব বাবার কোলে বসে। প্রথম-প্রথম মাসি কি কম আদর করেছে তাকে? চান করাত, খাওয়াত, সাজাত। তারপর একদিন মাসির একটা মেয়ে হল। তারপর আর-একটা। তারপর কী যে হল তা বনানী ভাল বুঝতে পারে না। উঠতে বসতে বনানীর নামে বাবার কাছে নালিশ। তারপর মার শুরু হল। সঙ্গে গালিগালাজ। চান হয় না, খাওয়া হয় না, সাজগোজ চুলোয় গেল। বনানী কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতে লাগল দিন দিন। মাসি তাকে দেখলেই রেগে যায়। প্রথম-প্রথম তবু বাবা একটু আড়াল করত তাকে। পরে বাবাও গেল বিগড়ে। অত নালিশ শুনলে

কার না মন বিষিয়ে যায়? বাড়ির অবস্থা আরও খারাপ হল যখন তার বাবার সঙ্গে মাসির ঘন ঘন ঝগড়া লাগতে লাগল। সে এমন ঝগড়া যে পারলে এ ওকে খুন করে। সেই সময় তার বাবা হাটে গিয়ে নেশা করে আসা শুরু করল। বাড়িটা হয়ে গেল কুরুক্ষেত্র। কত সময় সাঁঝঘুমোনি বনানী মারদাঙ্গার শব্দে সভয়ে উঠে বসে বোবা চোখে বাবা আর মাসির তুলকালাম কাণ্ড দেখেছে। মাসি কতবার গেছে গলায় দড়ি দিতে, তার বাবা কতবার গেছে রেললাইনে মাথা দিতে। শেষ অবধি কেউ মরেনি। এসব যত বাড়ছিল মাসির রাগও তার ওপর তত চড়ে বসেছিল। প্রায় সময়েই বাবা বেরোনোর পর মাসি তাকে তুচ্ছ কারণে মারতে মারতে, লাথি দিতে দিতে ঘর থেকে বের করে দিত। সারাদিন বনানী বসে থাকত বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে। অভুক্ত, কখন বাবা আসবে সেই আশায় পথ চেয়ে থাকা। বাবা আসত ঠিকই, কিন্তু সেই বাবা যে আর নেই তা খুব টের পেত বনানী।

চুরি করে খাওয়া তার স্বভাবে ছিল না কখনও। কিন্তু খিদের কষ্টটা এমন অসহ্য লাগত যে বনানী সামলাতে পারত না। একদিন ছোট বোনের হাত থেকে বিস্কুট নিয়ে খেয়েছিল বলে মাসি তাকে হেঁটমুণ্ডু করে বেঁধে রাখে। আর তাই নিয়ে বাবা খেপে গিয়ে মাসিকে দা দিয়ে কাটতে যায়। আর তারই শোধ নিতে মাসি বনানীকে ভাতের সঙ্গে ইঁদুর-মারা বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। বনানী মরেই যেত, হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবুটি ভাল লোক বলে তাকে বাঁচিয়ে দেয়। এরপরই বাবা ঠিক করে ও বাড়িতে বনানীকে আর রাখা ঠিক হবে না। তবে তার বাবা গগন চাটুজ্যে গরিব মানুষ, বিষয়-আশয় নেই। মেয়ের জন্য তেমন কিছু ব্যবস্থা করার সাধ্য ছিল না তার। তবে বশিষ্ঠ দাসশর্মার সঙ্গে তার খুব ভাব-ভালবাসা। সব শুনেটুনে দাসশর্মা বলেছিলেন, আমার বাড়িতেই দিয়ে দাও। কত লোক থাকে খায়, ওই রোগা মেয়েটা থাকলে কেউ টেরও পাবে না। বামুনের একটা মেয়ে থাকলে ভালই হবে। গুরুদেব আসেন, বামুন অতিথ-বিতিথ আসেন, বামুনের মেয়ে থাকলে সুবিধেও হবে।

বছর দুই আগে একটা পুঁটলি বগলে করে বাপের পিছু পিছু এসে সে এ বাড়িতে ঢোকে। ভারী মজার বাড়ি। চারদিকে কত লোক, কত মেয়েমানুষ, কত ছানাপোনা, কাচ্চাবাচ্চা। বনানী এ বাড়িতে আগেও এসেছে। তখন অন্যরকম ভাব ছিল। এবার এল কাজের মেয়ে হিসেবে। মাথা তাই নোয়ানো, লজ্জা-লজ্জা ভাব। তবে কিনা তার মতো অবস্থার মেয়ের বেশি লজ্জা থাকলে চলে না।

রোগাভোগা সে ছিলই। এখানে এসেও শরীরটা আর সারল না। তবে তার শরীর নিয়ে কারই বা মাথাব্যথা? বনানী ছুটতে পারে না, ভারী কাজ করতে পারে না, হাঁফিয়ে পড়ে। এ বাড়িতে তার যত্ন নেই, অযত্নও নেই। ঝি-চাকরদের সঙ্গেই তার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সে খাওয়া খারাপ নয়। ডাল, ভাত, তরকারি, কখনও-সখনও মাছ, কালেভদ্রে দুধ এবং পালাপার্বণে পিঠে-পায়েস বা পোলাও। বেশ আছে বনানী।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠতে বড় কষ্ট হয় বনানীর। শরীরটা যেন বিছানার সঙ্গে লেপটে থাকতে চায়। মাথা তুললেই টলমল করে। অথচ এই ভোরবেলাটায় বাইরে ফিকে আলোয় পৃথিবীটা দেখলে তার বুক জুড়িয়ে যায়। এ সময়টা তার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।

উঠে প্রথমেই সে বিছানাটা দেখে, পেচ্ছাপ করে ফেলেছে কি না। যদি করে ফেলে থাকে তবে তার মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। আর যেদিন না করে সেদিন তার মনটা বড় ভাল থাকে।

পুকুরধারে পৈঠায় বসে ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে যখন সে কালো জলে ভোর আকাশের ছায়া দেখে তখন তার মনটা কেমন শান্তিতে ভরে ওঠে। তার রোজ এ সময়ে মনে হয়, জলে আকাশে বাতাসে মউ মউ করছে ভগবানের গায়ের গন্ধ! তার মনে হয়, আমি কোনওদিন মরব না।

বশিষ্ঠ দাসশর্মার এক বিধবা দিদি আছে। এ বাড়িতে যেমন কিছু বাড়তি লোক থাকে, ঠিক তেমনই। এইসব বাড়তি লোকের কোনও আদরও নেই, আবার অনাদরও নেই। আছে, থাকে, এইমাত্র। এই বিধবা দিদিটি থাকে একখানা মাটির ঘরে। নিঃসন্তান, একা। সকালের দিকে বনানী তার ঘরে হানা দেয়।

ও লক্ষ্মীপিসি, কী করছ গো?

লক্ষ্মীপিসি এ সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসন পেতে বসে মালা জপেন। সাড়া দেন না। বনানী বালতিতে গোবর গুলে দাওয়াটা নিকিয়ে দেয়। উঠোন ঝেঁটিয়ে দেয়। দাওয়ার কোলে লক্ষ্মীপিসির বেড়াঘেরা রান্নাঘরে গিয়ে কাঠের উনুনে জ্বাল তুলে সসপ্যানে চায়ের জল বসায়।

চা যেই হয়ে যায় লক্ষ্মীপিসির মালার জপও সেই শেষ হয়।

তারপর দু'জনে দুটো কাঁসার গেলাসে চা নিয়ে বসে দাওয়ায়। বেশ গল্পটল্প হয় তাদের। তবে মেয়েমানুষের কথাই বা কী, কূটকচালি ছাড়া! লক্ষ্মীপিসি বসে বসে সংসারের নানাজনের নানা কথা খানিক বাড়িয়ে, খানিক রাঙিয়ে, কখনও-বা বানিয়ে বলতে থাকে। আর বনানী হুঁ হাঁ করে যায়। কোটনামি করলেও লক্ষ্মীপিসি লোকটা তেমন খারাপ নয়। তাঁর একখানা গুণ হচ্ছে, অসাধারণ সেলাইয়ের হাত। সেলাই আর বোনা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেলাই করে আর সোয়েটার বা লেস বুনে তাঁর কিছু আয় হয়। সুতরাং লক্ষ্মীপিসি একেবারে ফ্যালনাও নয়, গলগ্রহও নয়। মাঝে মাঝে পিসি বলেন, আমার যা আছে সব তোকে দিয়ে যাব।

বনানী এ কথাটা ভাল বোঝে না। লক্ষ্মীপিসিরটা সে পাবে কেন? পিসির তো অনেক আপনজন আছে। সে অবাক হয়ে বলে, আমাকে দেবে কেন পিসি? তোমার তো মদন আছে, ফুলু আছে, মণিপান্তি আছে।

আছে! সারাদিনে একবার খোঁজ নিতে দেখিস? এই যা সকালে এসে তুই-ই একটু খোঁজখবর করিস। তোকেই সব দেব আমি। তুই ভাল করে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাবি।

এ কথাটায় একটু শিহরিত হয় বনানী। ডাক্তাররা তার কাছে জাদুকর, ভগবান। ওষুধ হল অমৃতস্বরূপ। সে জানে একজন ভাল ডাক্তার যদি তাকে দেখে ওষুধ দেয় তবে তার এই রোগাভোগা শরীরে রক্তের বান ডাকবে। মণিপান্তিরা যেমন বুক ফুলিয়ে ডগমগ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেরকম ঘুরে বেড়াতে পারবে সেও। একবার এক ডাক্তারই না তাকে ফিরিয়ে এনেছিল মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে! কিন্তু এই জীবনে ডাক্তার দেখানোর কথা বনানী ভাবতেই পারে না। কত টাকা খরচ হয় ডাক্তার দেখাতে!

চুরি করে একবার হেলথ সেন্টারে গিয়েছিল সে। আগের ডাক্তারটি আর নেই। নতুন একজন গোমড়ামুখো ডাক্তার তাকে বিশেষ পাত্তা দিল না। ঘায়ের জন্য একটু মলম দিল, ব্যস। আর একটা কাগজে কী একটু লিখে দিয়ে বলেছিল, এটা জোগাড় করতে পারলে খাস।

কাগজটা এখনও যত্ন করে রেখে দিয়েছে বনানী। একবার বাবাকে দেখিয়েওছিল। বাবা উদাস হয়ে বলল, তোকে বাঁচাবে কে বল? মরতেই জন্মেছিস।

মরতেই যে তার জন্ম এটা বনানী খুব ভাল করে জানে। বেঁচে থাকতে পারে তারাই যাদের বেঁচে থাকাটা অন্য কেউ চায়। যাদের ভালবাসার লোক আছে। বনানীর তো সেরকম কেউ নেই। কে চাইবে যে সে বেঁচে থাকুক?

আর এই রোগা ঝলঝলে শরীর, এটা নিয়েই বা কী করে সে বেঁচে থাকবে তা বোঝে না বনানী। বড্ড অসাড়, বড্ড ঠান্ডা তার শরীর। বর্ষায়, শীতে গাঁটে গাঁটে একরকম ব্যথা শেয়ালের কামড়ের মতো তার হাড়গোড় চিবোয়। এক-এক সময়ে শোয়া থেকে উঠতে পারে না কিছুতেই শত চেষ্টাতেও। জেগে থেকেও এক-এক সময়ে তার মনে হয়, মরে গেছে বুঝি!

বনানী অ আ ক খ শিখেছিল সেই কবে। বাবা তখন মা-মরা মেয়েকে কোলে নিয়ে বুকে মাথা চেপে ধরে কত আদর করে শেখাত। পাঠশালাতেও ভরতি হয়েছিল সে। তারপর মাসি এল। একটা ঝড় যেন সব উলটে-পালটে দিয়ে গেল।

দাসশর্মাদের বাড়িতে বনানী কেমন আছে? বেশ আছে, যতদিন থাকা যায়। কিন্তু সে খুব বোকা-বোকা দেখতে হলেও ততটা বোকা নয়। সে টের পায় বশিষ্ঠ দাসশর্মার এই সুখের সংসার

খুব বেশিদিন নয়। তারা চার ভাই। অন্য তিন ভাইয়ের সঙ্গে বশিষ্ঠর তেমন বনিবনা হচ্ছে না। চারদিকে একটা গুজগুজ ফুসফুস উঠেছে, বাড়ি ভাগ হবে, হাঁড়ি আলাদা হবে, বিষয়-সম্পত্তির বাঁটোয়ারাও হবে সেই সঙ্গে। ক'দিন হল শহর থেকে উকিল আসছে, কানুনগো আসছে।

লক্ষ্মীপিসি মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার ঘরখানা যে কার ভাগে পড়বে! বশিষ্ঠর ভাগে পড়লে রক্ষে। অন্য তিনজনের কেউ হলে ঝাঁটা মেরে তাড়াবে।

এ ভয়টা একটু একটু বনানীও পায়। বাড়ি যখন ভাগ হয় তখন লোকজনও ভাগ হয়। চাকর ঝি মুনিশ জন সব ভাগ হয়। বনানীকে নেবে কে? কেউ কি নেবে? যদি বশিষ্ঠ দাসশর্মা নেয়ও তখন আর এমন বসে কাজে ফাঁকি দিয়ে দিন কাটাতে পারবে কি সে? তখন তো ভাগের সংসারে এত লোক থাকবে না, গা ঢাকা দেওয়াও চলবে না। তখন তাকেও তাড়াবে।

সংসারে কাজেরই আদর, বনানী জানে। তার ইচ্ছেও যায়। কিন্তু পারলে তো! শরীরে যে দেয় না।

মাসি বিষ দিয়েছিল বেশ করেছিল। পুরোটা যদি মুখ চেপে ধরে খাইয়ে দিত, আর হেলথ সেন্টারের সেই ডাক্তারবাবুটি যদি ভাল মানুষ না হত তা হলে একরকম বেঁচে যেত বনানী। বিষটা অল্প ছিল বলে আর বাবা বানিয়ে একটা গল্প বলেছিল বলে থানা-পুলিশ হয়নি। সে মরলে কিন্তু হত। মাসির ফাঁসিই হত হয়তো-বা। তাতে বাবাটা বেঁচে যেত।

এ বাড়ির সামনে দিয়েই বাবা সকাল-বিকেল যায় আসে। আগে আগে ওই সময়টায় রাস্তার ধারে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকত বনানী। বাবাকে দেখলেই আহ্লাদে চিৎকার দিত, বাবা গো!

বাবা খুশি হত কি না বলা যায় না। তবে মরা চোখে তাকাত। একটু দাঁড়াত সামনে। মাথায় একটু হাত দিত। সে সময়ে বাবার কাঁচাপাকা চুল, অল্প সাদাটে দাড়ি, শুকনো মুখ আর জলে-ডোবা চোখ দেখে বড় মায়া হত বনানীর। এই একটা লোক হয়তো চাইত, বনানী বেঁচে থাক।

বাবা এখনও যায় আসে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে গেলে বনানী গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়। দুটো কথা বলে। দেখা হয় মুদির দোকানে বা কয়লার ডিপোয়। একটা-দুটোর বেশি কথা বলে না বাবা। কীই বা বলার আছে! এক-এক সময়ে কি মানুষের কথা একেবারে ফুরিয়ে যায়? নিজের বাবাকে দেখে সেরকমই মনে হয় বনানীর। তার মা যখন মরে যায় তখন সে ছোট্টটি। চঞ্চল দুরন্ত মেয়ে বলে বাবা পায়খানায় যাওয়ার সময়ও তাকে কোলে করে নিয়ে যেত। পাছে ঘরে রেখে গেলে কোনও বিপদ ঘটায়। সেইসব কথা মনে আছে বনানীর। সেই বাবাই তো তাকে বেড়াল-পার করে দিয়েছে এ বাড়িতে।

মরবে বনানী। মরতেই তার জন্ম।

উঠোনে লক্ষ্মীর পায়ের মতো জলছাপ ফেলে পুকুরঘাট থেকে কে যেন ঘরে গেছে।

কী ছোট্ট আর কী সুন্দর নিখুঁত সে পায়ের পাতার গড়ন! বনানী চিহ্ন ধরে ধরে এগোয়। জানে এ পা হল বশিষ্ঠর বড় ছেলে শুভবিকাশের নতুন বউ চিনির।

নতুন বউ মাত্রই ভাল। কী যে অদ্ভুত নতুন বউয়ের গায়ের গন্ধ, মুখের লজ্জা-রাঙা ভাব, রসের হাসি। চিনি তাদের মধ্যেও যেন আরও ভাল। দূর ছাই করে না, হাসিমুখে কথা কয়। তার ঘরের কাছে আজকাল একটু বেশিই ঘুর ঘুর করে বনানী। হুট করে ঘরে ঢোকে না, অত সাহস তার নেই।

আজও দাওয়ায় উঠে কপাটের আড়াল থেকে দেখছিল বনানী। চিনি জানালার ধারে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কষে সিঁদুর দিচ্ছে সিঁথিতে। নতুন বউরা খুব সিঁদুর দিতে ভালবাসে।

চোখে চোখ পড়তেই চিনি হাসল। ডাকল, আয়। ভিতরে আয়!

বনানী ঘরে ঢোকে। দরজার গায়েই দাঁড়িয়ে থাকে।

চিনি ফিরে তাকাল, তোর ঘা-গুলো সারে না, না রে?

না।

চুলকোয়?

মাঝে মাঝে চুলকোয়।

ওষুধ দিস না?

না। মাছি বসে বলে শুকোয় না। নইলে—

তোর মাথা। আমার কাছে একটা পেনিসিলিন অয়েন্টমেন্ট আছে, নিবি? লাগিয়ে দেখ তো কয়েকদিন। না শুকোলে বলিস। আমার দাদাকে লিখে দেব, ওষুধ পাঠিয়ে দেবে। আমার দাদা কলকাতার ডাক্তার।

ডাক্তারদের প্রতি একটা খুব শ্রদ্ধাবোধ আছে বনানীর। চিনি ডাক্তারের বোন জেনে সে খুব ভক্তিভরে চেয়ে রইল।

চিনি উঠে একটা ছোট বাক্স খুলে নতুন একটা টিউব তার হাতে দিয়ে বলল, ঘা ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকনো করে মুছে লাগাবি।

ঘাড় নেড়ে বনানী বলে, আচ্ছা।

তুই নাকি বামুনের মেয়ে?

হ্যাঁ। চাটুজ্জে।

লেখাপড়া শিখেছিস?

না গো, পাঠশালায় পড়তাম। তারপর আর হয়নি।

একটু-আধটু পড়তে পারিস তো?

যুক্তাক্ষর তেমন পারি না।

বিয়েতে আমি কয়েকটা বই পেয়েছি। সবই বাজে বই। ভাবছিলাম কাকে দিয়ে জঞ্জাল সরাব। তা তুই দুটো নিয়ে যা। বুঝিস, না বুঝিস, পড়ার চেষ্টা কর। না পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিস।

নতুন বউ যা বলে সবই তার শিরোধার্য মনে হয়। বনানী বই আর ওষুধ এনে তার পাটাতনের আস্তানায় সযত্নে লুকিয়ে রাখল।

এই মরা-মরা জীবনেও মাঝে মাঝে এরকম ঘটলে একটু কেমন বাঁচার ইচ্ছে জাগে। বই বা ওষুধ, ওগুলো কিছু নয়। আসল হল ওই আদর-কাড়া কথা। প্রাণটা নিংড়ে যেন জল বের করে আনে চোখ দিয়ে। এটুকু, খুব এইটুকু আদর পেলেও বনানীর মনে হয় অনেকখানি পেয়ে গেল সে। আর বুঝি কিছু চাওয়ার নেই।

চিনি আর-একদিন বলল, মাথা সব সময় ন্যাড়া করিস কেন?

ঘা যে!

ঘা সারিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি। তোর খুব ঘেঁষ চুল। অত চুল আমার মাথায় নেই। চুল হলে তোকে বেশ দেখাবে!

ওম্মা গো। বনানী লজ্জায় মুখ ঢাকে। সে বলে আধমরা, তাকে চুল দেখাচ্ছে চিনি-বউ! লজ্জাতেই মরে যাবে সে।

আশ্চর্য! অয়েন্টমেন্টে বেশ কাজ দিতে লাগল। কয়েকদিন খুব যত্ন করে লাগিয়েছিল বনানী। ঘায়ে টান ধরল। মামড়ি খসতে লাগল। কালো হয়ে এল দগদগে ঘায়ের মুখ।

যুক্তাক্ষর বিশেষ ছিল না বলে একটা বই টানা পড়ে শেষ করে ফেলল বনানী। ছোটদের জন্য সহজ করে লেখা বঙ্কিমের রাজসিংহ। কী সুন্দর যে গল্পটা! বনানী আবার পড়ল।

পড়ে খুবই অবাক হয়ে গেল বনানী। একটা বাঁধানো বই যে সে আগাগোড়া পড়ে উঠতে পারবে এ তার ধারণার বাইরে ছিল।

শুধু বেঁচে থাকতে পারলে, কোনওরকমে কেবলমাত্র বেঁচে থাকতে পারলেও জীবনে কত কী যে হয়!

তিন

হেদুয়ায় এলে অলক একবার দাদুর বাড়ি হানা না দিয়ে যায় না।

বাপ আর ছেলের মধ্যে যেমন জেনারেশন গ্যাপ থাকে, দাদু আর নাতির মধ্যে তেমনটা না থাকতেও পারে। বাপ আর ছেলে সব সময়েই সরাসরি সংঘর্ষের সম্ভাবনার মধ্যে থাকে। দাদু আর নাতির সেই ভয় নেই। প্রজন্মগত পার্থক্যটা বেশি হওয়ার দরুনই বোধহয় তাদের মধ্যে এক সমঝোতা গড়ে ওঠে।

অলকের দাদু সৌরীন্দ্রমোহন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ছিলেন। সে আমলে তাঁর পেশায় তেমন পয়সা ছিল না। তবু সৌরীন্দ্রমোহন কিছু টাকা করতে পেরেছিলেন সিনেমা থিয়েটারে কাজ করে এবং একটা ফোটোগ্রাফির স্টুডিয়ো চালিয়ে। স্টুডিয়ো বেচে দিয়েছেন, এখন আর আঁকেন না। বয়স পঁচাত্তর। তিন ছেলে এবং এক মেয়ের বাবা। সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের বাড়িটা কিনেছিলেন পঁয়তাল্লিশ সালে। সেই বাড়ি নিয়েই ছেলেদের সঙ্গে বখেরা।

সৌরীন্দ্রমোহনের মেয়ে সোনালির বিয়ে হয়নি। সোনালি দেখতে ভাল নয়, উপরন্তু তার পিঠে একটা কুঁজ থাকায় বিয়ে বা সংসারের স্বপ্ন সে ছেলেবেলা থেকেই দেখে না। সৌরীন্দ্রমোহন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে বাড়িটা তার নামে লিখে দেন এবং নিজের টাকাপয়সার সিংহভাগটাই তার নামে ব্যাংকে জমা করেন। ছেলেরা গর্জে উঠল, আপনি কি ভাবেন সোনালিকে আমরা দেখব না?

এই ঝগড়া দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবে ছেলেরা লায়েক হয়ে যে যার আলাদা এস্টাবলিশমেন্ট করে চলে গেছে। এমনিতেও আজকাল পৈতৃক বাড়িতে ছেলেরা থাকতে চায় না। সৌরীন্দ্রমোহন জানেন, তার ছেলেরাও আলাদা হতই, সোনালি উপলক্ষ মাত্র।

সুতরাং উত্তর কলকাতার এই বাড়িতে সৌরীন্দ্রমোহন, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে মোট এই তিনটি প্রাণী। ছেলে বা নাতি-নাতনিরা কেউই আসে না। সম্পর্ক একরকম চুকেবুকে গেছে।

এই পুরনো নোনাধরা প্রকৃতিহীন বাড়ি এবং তার অভ্যন্তরের তিনটি প্রাণীর প্রতি অলকের এক ধরনের টান আছে। হেদুয়ায় যখনই তার সাঁতার থাকে তখনই সে একবার দাদু আর ঠানুর কাছে হানা দেয়।

সৌরীন্দ্রমোহন তাঁর এই গম্ভীর ও ঠান্ডা প্রকৃতির নাতিটার ওপর এক প্রগাঢ় মায়া অনুভব করেন। ছেলেদের ওপর থেকে যে স্নেহ প্রত্যাহার করার নিষ্ফল চেষ্টায় ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন তা এই একটি অবলম্বন পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তবে তাঁর প্রকৃতি গম্ভীর বলে বাইরে তেমন প্রকাশ নেই।

সৌরীন্দ্রমোহনের স্ত্রী বনলতা একটু সেকেলে। নাতির তিনি আর কিছু বুঝুন না বুঝুন, শুধু এটুকু বোঝেন যে, ছেলেটা নিজেদের বাড়িতে তেমন ভাল-মন্দ খেতে পায় না। বনলতা একটু ঠোঁটকাটাও বটে। কথায় কথায় তিনি মনীষার উল্লেখ করেন 'নাচনেওয়ালি' বলে। তাঁর ধারণা, নাচনেওয়ালির কি আর সংসারে মন আছে? সে কেবল নেচে আর নাচিয়ে বেড়ায়। বনলতার দৃষ্টিভঙ্গি পুরনো আমলের বলেই তাঁর মূল্যবোধ অন্যরকম। তাঁর মতে, গুছিয়ে সংসার করা, ভাল-মন্দ রাঁধা এবং পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হওয়াই মেয়েদের ধর্ম। সেই বিচারে মনীষা একেবারেই ধোপে টেকে না। বাস্তবিকই মনীষা রান্নাবান্না বা খাওয়া-দাওয়াকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। অনেক সময়ে দোকানের খাবার আনিয়ে এক-আধবেলা চালিয়ে নেয়। রান্নাঘরে বাঁধা পড়লে তো তার চলবে না। বনলতা তাই নাতি এলেই খাবার করতে বসেন এবং পেট পুরে খাওয়ান তাকে। অলক বিনাবাক্যে খেয়েও নেয়।

পিসি সোনালি ইংরিজির এম এ। শারীরিক ত্রুটির ফলেই কি না কে জানে তার মেজাজ সাংঘাতিক তিরিক্ষি। মা-বাপকে সে রীতিমতো শাসনে রাখে। একটু কিছু হলেই সে রেগে আটখানা

হয়, নয়তো কাঁদতে বসে। স্থৈর্য, ধৈর্য, সহনশীলতা তার খুবই কম। কিছুদিন আগে সোনালি একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছে। সময়টা কাটে ভাল। কিন্তু তার একটাই অসুবিধে, টাকা খরচ করার মতো যথেষ্ট উপলক্ষ খুঁজে পায় না। শাড়ি গয়না ইত্যাদিতে তার আকর্ষণ নেই, সে রূপটান ব্যবহারই করে না। তা হলে একটা মেয়ে খরচ করবে কীসে? অনেক সময়ে প্রিয়জন কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার প্রিয়জনই বা কে আছে?

অলককে পেয়ে পিসির সেই অভাবটা মিটল। এই ঠান্ডা সুস্থির ভাইপোটাকে অপ্রয়োজনে দেদার জিনিস কিনে দিয়ে সোনালি প্রায় পাগল করে দিল।

একদিন অলক বিরক্ত হয়ে বলল, আমার জন্য রানিং বুট কিনেছ কেন? রানিং বুট দিয়ে আমার কী হবে?

বিস্মিত সোনালি বলে, কেন, তুই দৌড়োস না?

দৌড়োব কেন? আমি তো সাঁতরাই।

সাঁতারুদের দৌড়োতে হয় না বুঝি? আমাকে স্কুলের গেম-টিচার বলেছিল সাঁতারুদের দৌড়োতে হয়। একসারসাইজ করতে হয়।

ধুস! ওসব কিছুই লাগে না। ঠিক আছে, কিনেছ যখন, মাঝে-মাঝে দৌড়োব।

জলে ভাসে এমন একটা দাবার ছক তাকে একদিন কিনে দিল সোনালি। বলল, জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে খেলবি।

অলক দাবার ছকটা দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, এর যে অনেক দাম!

তাতে কী?— উদাসভাবে বলল সোনালি।

এ ছাড়া দামি পোশাক, ভাল জুতো, হাতঘড়ি এসব প্রায়ই কিনে দেয় সোনালি। আর এইসব দেয়া-থোয়া নিয়ে মনীষা গজরাতে থাকে বেহালায়। তার ধারণা, এইভাবে দাদু-ঠাকুমা আর পিসি অলককে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে! তার প্রশ্ন, কেন? আমরা কি ছেলেকে কিছু কম দিই? কিন্তু মনীষা কখনও এমন কথা অলককে বলতে পারে না যে, ওদের কাছ থেকে নিস না। কথাটা বলা যায় না। শত হলেও ওরা অলকের আপন ঠাকুমা-দাদু, আপন পিসি। কথাটা বললে হয়তো অলক তেমন খুশি হবে না।

এ বাড়িতে সকলেই অলকের প্রিয় বটে, কিন্তু তার আসল আকর্ষণ ঠাকুমা। তার প্রতি ঠাকুমার ভালবাসাটা ক্ষুধার্তের মতো। ভীষণ ঝাঁঝালো, দ্বিধাহীন এবং প্রত্যক্ষ সেই স্নেহ। সে এলে ঠাকুমা কেমন ডগমগ হয়ে ওঠে, অনেক বকে এবং রাজ্যের খাবার করতে বসে যায়। কাছে বসিয়ে অনেক প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

ঠাকুমার প্রতি অলকের আকর্ষণের আর-একটা কারণ হল, জল। সে আবিষ্কার করেছে ঠাকুমাও তার মতোই জল ভালবাসে। ঠাকুমা বলে, সুযোগ পেলে আমি কবে আরতি সাহার মতো ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে যেতাম।...পুরীতে যখন প্রথম সমুদ্র দেখি তখন ভয়ে সবাই অস্থির। আমার একটুও ভয় করল না। নুলিয়া না নিয়েই দিব্যি নেমে পড়লাম জলে।... ছেলেবেলায় যখন পুকুরে ডুবসাঁতার কাটতাম তখনকার মতো আনন্দ বোধহয় আর কোনও কিছুতেই ছিল না।

ঠাকুমা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, ওরা তোকে ঠিকমতো খেতে-টেতে দেয়?

দেবে না কেন?

তোর মা রাঁধে আজকাল?

রাঁধে। মাঝে মাঝে।

রান্নার লোক নেই এখন?

মাঝে মাঝে এক-আধজন রাখা হয়। সে কিছুদিন বাদে ঝগড়া করে চলে যায়। ফের কিছুদিন বাদে একজনকে রাখা হয়। এইরকম আর কী!

তোর অফিসের ভাত রেঁধে দিতে পারে?

অলক হাসে, না। আমি তো দুপুরে অফিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নিই। তুমি অত খাওয়া-খাওয়া করো কেন?

ঠাকুমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সাঁতারে যে অনেক দম লাগে। খাওয়ার দিকে নজর না দিলে বাঁচবি নাকি?

দাদু, ঠাকুমা, পিসির সঙ্গে অলকের এই টান-ভালবাসার কথা খুব ডিটেলসে না জানলেও আন্দাজ করতে পারে মনীষা। অনুমান করতে পারে তার দিদি মধুরা অর্থাৎ নূপুর এবং বোন প্রিয়াঙ্গি অর্থাৎ ঝুমুর। এবং শোধ নেওয়ার জন্যই বোধহয় একসময়ে মনীষা উঠে-পড়ে অলকের যত্ন নিতে শুরু করে। রোজ ভাল ভাল রাঁধতে থাকে, মেটে চচ্চড়ি, মুরগির সুপ, টেংরির ঝোল ইত্যাদি। বিনা উপলক্ষেই একটা টু-ইন-ওয়ান উপহার দিয়ে বসে তাকে তার বাবা সত্যকাম। খুব বেশিরকম আদর দেখাতে থাকে ঝুমুর।

তার চেয়েও মারাত্মক কাণ্ড করে বসে নূপুর। রোজ সকালে উঠে সে ভাইয়ের মেডিকেল চেক-আপ শুরু করে দেয়। আর তাই করতে গিয়েই একদিন সে বিকট চেঁচিয়ে ওঠে, মা! বাবা! শিগগির এসো!

সবাই যথাবিধি ছুটে এসে জড়ো হয় এবং নূপুর ঘোষণা করে, অলকের হার্ট বড় হয়ে গেছে। হি নিডস ইমিডিয়েট মেডিকেল অ্যাটেনশন। সাঁতার বন্ধ।

কথাটা মিথ্যেও নয়। নূপুর নিজেই যখন একজন মস্ত হার্ট স্পেশালিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করাল অলককে তখন তিনিও বললেন, হার্ট বিপজ্জনক রকমের এনলার্জড। সম্ভবত সার্জারি কেস।

খবর পেয়ে অলকের সাঁতারু বন্ধুরা চলে এল। এলেন কোচ নিজেও। দু'দিন বাদে ন্যাশনাল ওয়াটারপোলো শুরু হবে। অলক বেঙ্গল টিমের অপরিহার্য খেলোয়াড়। কোচের না এসে উপায় কী! তবে এনলার্জড হার্টের কথায় তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, সাঁতারুদের হার্ট তো বড় হওয়ার কথা, যেমন হয় লং ডিসট্যান্স রানারদের। যাই হোক আপনারা ভাববেন না। খেলোয়াড়দের আলাদা ডাক্তার আছে, আমি তাঁকে আনাচ্ছি।

তিনি এলেন এবং একটু পরীক্ষা করেই অলককে বিছানা থেকে টেনে তুলে বললেন, যাঃ, জলে নাম গে। কিস্যু হয়নি। তোর কলজে বড় হবে না তো কি পাঁঠার কলজে বড় হবে?

সেই থেকে বাড়ির যত্ন আবার কমে গেল। কিন্তু দুই বাড়ির তাকে নিয়ে এই কমপিটিশনটা মনে রইল অলকের। কিছু বলেনি কখনও, কিন্তু মাঝে মাঝে সে আপনমনে হেসে ফেলে। কিন্তু এই 'অসুখ অসুখ' রবে তার একটা ক্ষতিও হল। দিদি নূপুর যেদিন তার হার্ট বড় হয়েছে বলে ঘোষণা করল, সেদিন থেকেই সে ভীষণ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছিল। বাঁ বুকে একটা অস্বস্তি এবং সেই সঙ্গে মনের মধ্যে ভয়। সেই অলীক অসুস্থতার মানসিক ধাক্কাটা বড় কম নয়। অসুখ হওয়াটা বড় কথা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি বড় হল অসুখ-অসুখ ভাবটা। কেন এই শরীর ধারণ তা অনেক ভেবে দেখেছে অলক। ব্যাধিময়, ব্যথাময়, নশ্বর এই শরীর নিয়ে মানুষের কত না ভাবনা। কিন্তু এই শরীরখানা দেওয়া হয়েছে এটাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্যই, বসিয়ে রাখা বা আরাম করার জন্য তো নয়।

শরীরের সহনশক্তিরও কোনও সীমা নেই। কিছুকাল আগের একটা ঘটনা। ঝুমুর তার সঙ্গে সাঁতার শিখতে লেক-এ যেত। ফুটফুটে মেয়ে, সাঁতারের পোশাকে তাকে বেশ রমণীয় দেখাত। লেক-এর ধারে-কাছে বদ ছেলের অভাব নেই। একদিন গুটি পাঁচেক ছেলে ফেরার পথে তাদের পিছু নেয়।

প্রথমটায় টিটকিরি, দুটো-একটা অশ্লীল কথা ও ইঙ্গিতের পর তারা আরও একটু বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। রুখে দাঁড়াল ঝুমুর। তার চেঁচামেচিতে ছেলেগুলো একটুও ভড়কাল না, বরং একজন

এসে টপ করে তার হাত ধরে এক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি—

অলক খুব বেশি কিছু করেনি। সে গিয়ে ছেলেটার হাত ধরে ফেলেছিল। হয়তো সে কিছুই করত না, হয়তো করত। কিন্তু সে কিছু করার আগেই সেই ছেলেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। সে যে ঝুমুরের দাদা, প্রেমিক নয়, ওটা হয়তো তারা আন্দাজ করেনি। ফুটফুটে সুন্দর একটা মেয়ের সঙ্গে একজন শক্ত-সমর্থ পুরুষকে দেখেই সম্ভবত তাদের ঈর্ষা হয়ে থাকবে। একটু ছোট ইন্ধন দরকার ছিল তাদের।

অলক মারতে পারত উলটে। তার গায়ে যথেষ্ট জোর। কিন্তু সে মারেনি। শুধু ঠেকানোর চেষ্টা করেছিল। ঠোঁট ফাটল, নাক ফাটল, কপাল ফাটল, বুকে পিঠে লাগল শতেক ঘুসি ও লাথি। নীরবে সহ্য করে গেল অলক। শুধু এই ফাঁকে ঝুমুর দৌড়ে গিয়ে ক্লাবে খবর দেওয়ায় অলকের বন্ধুরা ছুটে আসে এবং পালটি নেয়। কিন্তু সে অন্য গল্প। শুধু এটুকু বলতে হয় যে, সেই কচুয়া ধোলাই থেকে অলক শিখেছিল যে, শরীর অনেক সয়।

দাদাকে ওরকম নির্বিকারভাবে মার খেতে দেখে ঝুমুরের বিস্ময় আর কাটে না। মারপিটের সময় সে একঝলক অলকের দু'খানা চোখ দেখতে পেয়েছিল। সেই চোখের বর্ণনা সে বোধহয় কোনওদিনই সঠিক দিতে পারবে না। ভয়হীন, নিরাসক্ত, উদাসীন অথচ উজ্জ্বল সেই চোখ দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, কতগুলো ইতর ছেলের হাতে অলক মার খাচ্ছে। তা ছাড়া অলকের মুখে এবং চোখে একটা আনন্দের উদ্ভাসও দেখেছিল ঝুমুর।

কথাটা সে কাউকে বলেনি কখনও। কিন্তু অলককে সেই থেকে মনে মনে কেমন যেন ভয় পায় ঝুমুর। তার মনে হয়, দাদা স্বাভাবিক নয়। হয়তো পাগল। সঠিক অর্থে পাগল না হলেও মনোরোগী। আর তা যদি না হয় তো খুব উঁচু থাক-এর কোনও মানুষ।

মেয়েদের সঙ্গে অলকের সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক। বিভিন্ন মিট-এ মেয়ে সাঁতারুদের সঙ্গে দেখা হয়, আলাপ বা আড্ডা হয়, ঘনিষ্ঠতা ঘটে। তা ছাড়া ফ্যানরা আছে, আছে সাঁতারুদের বোন বা দিদি।

জানকী কেজরিওয়াল ছিল বড়লোকের আহ্লাদী মেয়ে। মোটামুটি ভালই সাঁতরাত। তাদের ছিল নিজস্ব সুইমিং পুল, একজন ব্যক্তিগত কোচ। এলাহি ব্যাপার। দেখতেও মন্দ ছিল না জানকী। একটু ঢলানি স্বভাব ছিল, এই যা।

সে একটু ঢলেছিল জানকীর দিকে, লোকে বলে। দিল্লিতে একটা ট্রায়ালের ব্যাপার ছিল। জানকী খারিজ হয়ে খুব কান্নাকাটি বাধিয়েছিল সেখানে। মায়াবশে একটু সান্ত্বনা দিতে হয়েছিল অলককে। সেই থেকে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে যায়। জানকীর বাবার কোম্পানির একটা রেস্ট হাউজ় আছে হাউজ় খাস-এ। জানকী 'আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে, সুইসাইড করতে ইচ্ছে হচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে চলো' এসব বলতে বলতে একরকম টেনে নিয়ে গেল সেইখানে। জানকীর দুঃখ কী ছিল বলা মুশকিল, তবে একেবারে চূড়ান্ত কাণ্ডটা ঘটানোর আগে অবধি সেই দুঃখ-দুঃখ ভাবটা তার যাচ্ছিল না। সারা রাত দু'জনে এক বিছানায় কাটানোর পর সকালে অলক জানকীকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল, তোমার শরীরের মধ্যে শরীর ছাড়া আর কিছু নেই?

বস্তুত সারা রাত ধরে জানকীর মধ্যে ডুব দিয়ে অলক একটা কিছু খুঁজেছিল। এমন কিছু যা ভোগে ক্লান্তি আনে না, যা কিছুটা দেহাতীত, কিছুটা রহস্যাবৃত। জীবনের প্রথম সংগম তাকে প্রায় কিছুই দিল না।

এরকম কয়েকবার ঘটেছে অলকের। মেয়েদের ব্যাপারে তার আগ্রহ থাকলেও উদ্যম নেই। সে কারও পিছনে ঘোরে না। কিন্তু জুটে যায়। প্রতিবারই সংগম-শেষে এক হাহাকারে ভরে যায় অলক, এক বিতৃষ্ণা ও বিষণ্ণতায় তার শরীর ভেঙে পড়ে। সে কেন অনুভব করে এক পরাজয়ের গ্লানি?

এটা কোনও পাপবোধ নয়। সে অনুভব করে কোনও শরীরেরই তেমন গভীরতা নেই যাতে ডুবে যাওয়া যায় আকণ্ঠ। জলের মতো শরীর নেই কেন কোনও মেয়ের?

এক বন্ধুর অ্যারেঞ্জমেন্টে তারা অর্থাৎ সাঁতারুদের একটা দল সেবার গেল সরকারি লঞ্চে চেপে সুন্দরবনে বেড়াতে। দু'দিনের চমৎকার প্রোগ্রাম। খাও, দাও, জঙ্গল দেখো, গান গাও বা ঘুমোও। আছে আড্ডা, তাস, ড্রিংকস।

শুধু জলে নামা ছিল বারণ। মোহনার নদী এমনিতেই লবণাক্ত, তার ওপর কুমির, কামট, হাঙরের অভাব নেই। ডেক-এ দাঁড়িয়ে আদিগন্ত জল আর প্রগাঢ় অরণ্য দেখতে দেখতে কেমন অন্যরকম হয়ে গেল অলক্। গভীর জল, গভীর আকাশ, গভীর অরণ্য।

শেষ রাতে একদিন চুপি চুপি উঠে পড়ল অলক। মাঝদরিয়ায় নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে লঞ্চ। চারদিকে শীতের কুয়াশা, নিথর জল, অদূরে অরণ্যের গভীরতা। এক অলৌকিক আবছায়ায় চারিদিক মায়াময়।

ঝাঁপ দিলে জলে শব্দ হবে. তাই একটা দড়ি ধরে ধীরে ধীরে জলে নেমে গেল অলক। কুমির হাঙর, যাই থাক, জলে সে কখনও ভয় খায় না। শীতের ভোরে ঠান্ডা নোনা জল যখন তার শরীরে কামড় বসাল তখনও তেমন খারাপ লাগল না তার। দু'হাতে জল টেনে সে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল তিরবেগে। কোথায় যাচ্ছে তা জানে না।

জানে না, আবার জানেও। কুয়াশামাখা সেই সমুদ্রগামী বিস্তীর্ণ নদীর মধ্যেই ছিল সেই অলৌকিক। তার জন্যই অপেক্ষায় ছিল। সেই ডাকই শুনে থাকবে নিশি-পাওয়া অলক।

ক্ষয়া এক চাঁদ অলক্ষে অস্তাচল থেকে নামিয়ে দিয়েছিল তার আলোর কিছু জাদু। সেই আলোয় কুয়াশায় ঘনীভূত হয়ে উঠল জল থেকে এক অপরূপ উত্থান। অলক তখন লঞ্চ থেকে অনেক দূরে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভেসে যাচ্ছে আয়াসহীন। হঠাৎ দেখল অদূরে জলের ওপর সোনালি নীল রুপোলি গোলাপি মাখানো এক অপরূপ জলকন্যা। আনমনে ভেসে আছে জলের ওপর। চোখ সুদূরে। এলো সোনারঙের চুল উড়ছে হাওয়ায়।

কয়েক পলক মাত্র। তারপরেই কুয়াশা এসে ঢেকে দিল তাকে। চাঁদ ডুবল।

জলের ওপর স্রোতের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভেসে থাকল অলক। এইজন্যই ভূতগ্রস্তের মতো তার এতদূর আসা? কে ডাকল তাকে? কেন?

খুব ক্লান্ত হাতে-পায়ে উজান ঠেলে যখন সে লঞ্চে এসে উঠল তখনও সকলেই ঘুমে। গা মুছে, শুকনো কাপড় পরে আবার কম্বলের তলায় গিয়ে ঢুকল অলক। কিন্তু ঘুম হল না। সারা দিনটাই কেটে গেল আনমনে।

সেই শুরু। কিন্তু শেষ নয়। মাঝে-মধ্যে তাকে দেখেছে অলক। ভোরবেলার নির্জনতায় লেক-এ রোয়িং করার সময়। গঙ্গায়। গোপালপুর অন সি-তে। নীল সোনালি রুপালি গোলাপির এক অদ্ভুত কারুকার্য।

ভুল। অলক জানে ভুল। বিশ শতকের এই ভাটিতে কে বিশ্বাস করবে জলকন্যার কথা? জলের বিভ্রম তাকে দেখায় ওই মরীচিকা। সে জানে। তবু দেখে। বারবার দেখে।

চার

আজকাল বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি, কুটকচালি বড্ড বেড়েছে। সারাদিন বাড়িময় শেকল আর ফিতে টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে কানুনগোর লোক। আর বশিষ্ঠ মাঝে মাঝে বিকট গলায় চেঁচিয়ে জানান দিচ্ছে, পাপ! পাপ!

বনানী শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ পড়ে দু'চোখ ভরা জল নিয়ে উঠল। তারপর চিনি-বউয়ের কাছে গিয়ে বলল, যুক্তাক্ষর শেখাবে আমাকে?

চিনি-বউ ঠোঁট টিপে হেসে বলল, শিখেই তো গেছিস। একটা আদর্শলিপি নিয়ে আসিস, দেখিয়ে দেব। খুব যে বই-পড়ার নেশা হয়েছে তোর!

কী ভালই যে লাগে!

বাড়িতে বড় অশান্তি চলছে। চেঁচামেচির কামাই নেই। বিশাল সংসার, অনেক বাসন-কোসন, সোনাদানা, অনেক জিনিস। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে কথায় কথায় লেগে যাচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে, বউতে বউতে। এমনকী ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত বাদ নেই।

বনানীর একটা চমকা ভয় ধরে আজকাল। কী যে হবে! কোথায় যে যাবে!

লক্ষ্মীপিসিরও মেজাজ ভাল নয়। প্রায়ই বলে, আগুন লাগল। এখন দেখ, কতদূর পোড়া যায়।

আমার কী হবে পিসি?

তোর তো সুখের জীবন। এক আঘাটা থেকে আর-এক আঘাটায় গিয়ে উঠবি। তোর আর কী! বিপদ হল আমাদের, যাদের ঘটিবাটি আগলে দিন কাটে। সংসার যে কী নরক রে বাবা!

বর্ধমানে কী কাজে গিয়েছিল চিনি-বউয়ের দাদা। ফেরার সময় ইচ্ছে হল বোনের শ্বশুরবাড়িটা দেখে যেতে। তাই এসে হাজির এক শীতের সকালবেলায়।

চিনি-বউয়ের ঘরে চা গেল, চিঁড়েভাজা গেল, নারকোল কোরা গেল, ডিমসেদ্ধ গেল।

বনানীরও খুব ইচ্ছে হল যেতে। ডাক্তার মানুষ, যদি একটু তাকেও দেখে।

প্রথমটায় সাহস হল না। আজকাল তার ঘা নেই, ন্যাড়া মাথায় তিন মাসের চুল গজিয়েছে। চিনি-বউ মিথ্যে বলেনি। তার আর কিছু না থাক, চুলের ঘেঁষটা ভাল।

একটা বেড়াল তাড়ানোর ভান করে অবশেষে গেলও বনানী। লোভ সামলাতে পারল না।

চিনি-বউয়ের দাদা ছেলেমানুষ। ডাক্তার বলে মনেই হয় না। একটা কাঠের চেয়ারে বসে সিগারেট খেতে খেতে বোনের সঙ্গে খুব কথা কইছে।

বনানীকে দেখে চিনি-বউ বলল, আয়, ভিতরে আয়। এই দেখ আমার দাদা।

দাদা বলতে চিনি-বউয়ের চোখে অহংকার ফুটল বেশ।

ঝলঝলে মরা শরীরটা নিয়ে বনানী চিনি-বউয়ের ডাক্তার দাদার সামনে দাঁড়াল। দরজা ঘেঁষেই।

মেয়েটা কে রে?

ও হচ্ছে বামুনের মেয়ে।

চিনি-বউয়ের দাদা এ কথা শুনে খুব হাসল। তারপর বলল, ওটা কারও পরিচয় হল নাকি? বামুনের মেয়ে না কায়েতের মেয়ে তাই বুঝি জানতে চাইছি?

চিনি-বউ লজ্জা পেয়ে জিভ কাটল। তারপর বলল, ওর নাম হল বনানী। বাপটা মাতাল, সৎমা দু'চোখে দেখতে পারে না। এ বাড়িতে কুকুর-বেড়ালের মতো পড়ে থাকে। চেহারাটা তো দেখছিস। পনেরো বছর বয়স কেউ বলবে?

পনেরো বছর কথাটা বনানীর নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু হিসেব করলে তাই দাঁড়ায়। তেরো বছর বয়সে এসেছিল এ বাড়িতে। পনেরোর বেশিই হবে এখন। আজও ঋতুমতী হয়নি। মেয়েমানুষ বলে বোঝাও যায় না তাকে।

চিনি-বউয়ের দাদা তখন ডাক্তারের চোখে দেখল তাকে খানিকক্ষণ। তারপর বলল, ম্যালনিউট্রিশনটাই প্রধান। টনসিল আছে বলে মনে হচ্ছে। এই, তুই এদিকে আয় তো!

বনানীর বুকের মধ্যে আশা, ভরসা, আনন্দ ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ডাক্তাররা তো প্রায় ভগবান!

পরে সে জেনেছিল, চিনি-বউয়ের দাদার নাম শুভ্র। শুভ্র দাস। সেদিন তার বুক পিঠে চোঙা ঠেকিয়ে, চোখের পাতা টেনে, পেট টিপে অনেক কিছু দেখেছিল। মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে না। তবে ব্লাড আর ইউরিনটা দেখলে বোঝা যেত।

ওই পর্যন্ত হয়ে রইল সেদিন। একজন ডাক্তার তাকে দেখল, কিন্তু কেমন ভাসা-ভাসা ভাবে। কোনও নিদান দিল না।

দাসশর্মাদের বাড়িতে তুলকালাম লাগল এর কিছুদিন পর থেকেই। ভাগাভাগি, টানাটানি, চিল-চেঁচানি, মারপিটের উপক্রম হল কতবার। অবশেষে উঠোনে তিনটে আজগুবি বেড়া উঠল। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল।

বনানী পড়ল বশিষ্ঠর ভাগেই। ছোট ভাই কেষ্টর ভাগে পড়ল লক্ষ্মীপিসি। লক্ষ্মীমন্ত একটা সংসারের এমন ছিরি হল ক'দিনের মধ্যেই যে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

লাকড়িঘরের পাটাতনের ঠাঁইটুকু বনানীর রয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু খাটুনি বাড়ল বেদম। তার ওপর অবস্থা পড়ে যাওয়ায় বশিষ্ঠর গিন্নি কালী ঠাকরুন রোজ বলা শুরু করল, ওই অলক্ষুনেটাকে তাড়াও। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে? আর কি আমাদের সেই অবস্থা আছে?

ভয়ে বনানী নিজে থেকেই খাওয়া কমাল। শরীরে যতদূর দেয় ততদূর বা শরীর নিংড়ে তার চেয়েও বেশি খাটতে লাগল। ধান আছড়ানো অবধি বাদ দিল না।

চিনি-বউ বলল, তুই এখানে টিকতে পারবি না। আমিও বরের কাছে বর্ধমানে চলে যাচ্ছি। তুইও পালা।

কোথায় পালাব? আমার যে যাওয়ার জায়গা নেই।

চিনি-বউ একটু ভেবে বলল, আচ্ছা দাঁড়া। রোববার দাদা আসবে। একবার পরামর্শ করি দাদার সঙ্গে।

শুভ্র দাস রোববারে এল এবং চিনি-বউয়ের সঙ্গে তার কথাও হল।

বনানী দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছিল উঠোনে।

অবশেষে চিনি-বউ ডাকল। আর সেইদিনই শুভ্রদাদাব সঙ্গে বনানী চলে এল কলকাতায়। ঝি-গিরি করতে।

বাবাকে বলে এসেছিল রওনা হওয়ার আগে।

বাবা উদাস মুখে বলল, তুই তো মরতেই জন্মেছিস। যা গিয়ে দেখ। বাবুটি কি ডাক্তার?

হ্যাঁ গো বাবা, বড় ডাক্তার।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর চিকিচ্ছে করবে?

করতে পারে।

বশিষ্ঠ তোকে রাখবে না, আমাকেও বলেছে। এ বরং ভালই হল।

ভাল হয়েছিল কি না কে জানে। বাবার জ্যোতিহীন চোখ, পাঁশুটে ক্ষয়া মুখখানা ভাবতে ভাবতেই সে শুভ্রবাবুর সঙ্গে গাঁ ছেড়ে কলকাতায় এল। খুপরি খুপরি তিন-চারখানা ঘর নিয়ে বাসা। ভারী কষ্ট এখানে মানুষের। সবচেয়ে বড় কষ্ট বোধহয় ছোট্ট জায়গার মধ্যে নিজেকে আঁটিয়ে নেওয়া।

তবু তা একরকম সয়ে নেওয়া যায়। সিঁড়ির তলায় সেই চটের বিছানা, কলঘরে স্নান, ছাদে উঠে কাপড় শুকোনো এসব অভ্যাস করে নিতে সময় লাগত না। কিন্তু ততটা সময় দিল কই শুভ্রবাবুর বউ কল্যাণী? কল্যাণী বউদি প্রথম দিনই বলে ফেলেছিল, এ তো টি বি রুগি, কোত্থেকে ধরে আনলে?

নাক সিঁটকে সেই ঘেন্নার চাউনি কি সহজে ভোলা যায়? বনানী সিঁটিয়ে গেল সেই চোখের সামনে। শরীর নিয়ে তার নিজেরই লজ্জার শেষ নেই। তাতে আবার মুখের ওপর খোঁটা।

দিন সাতেকের মাথায় তাকে নিয়ে শুভ্র আর কল্যাণীর মধ্যে বেশ মন কষাকষি বেধে গেল। বাড়িতে আরও লোক ছিল। শুভ্রবাবুর বাবা আর মা। বনানীর ব্যাপারে তারাও খুশি নয়।

মুশকিলে পড়ল শুভ্র। বনানীকে ফের চাঁপারহাটে রেখে আসতে হবে। আর বনানীর সমস্যা হল, চাঁপারহাট গিয়ে সে ফের উঠবে কোথায়? তার যে সেখানে আর জায়গা নেই।

ঠিক এইসময়ে শুভ্র একদিন পাশের বাড়িতে বনানীকে নিয়ে তার সমস্যার কথা গল্প করেছিল। সে-বাড়িতে একটি আইবুড়ো মেয়ে আছে, ভারী খেয়ালি। সে বলল, রোগ-টোগ যদি না থাকে তবে আমাদের বাড়িতে দিতে পারো। মা-বাবার একজন সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়। তবে রোগ থাকলে দিয়ো না।

বনানীর বাস উঠল আবার। ঠেক থেকে ঠেক ঘুরে ঘুরে তার মনের মধ্যে এখন জন্তুর মতো একটা ভয় দেখা দিয়েছে। শুধু বেঁচে থাকাটাই যে এ দুনিয়ায় কী কঠিন ব্যাপার! মাথার ওপর একটা ঢাকনা, দু'বেলা দুটো বাসিপান্তা যা হোক জুটে যাওয়া, এটাই এক মস্ত প্রাপ্তি তার কাছে। ভগবানকে সে কদাচিৎ ডাকে। তার মনে হয়, ভগবান এক মস্ত মানুষ, তার মতো গরিব ভিখিরির ডাকে কান দেবেন না। কিন্তু এইবার শুভ্রবাবুদের বাসার পাট চুকে যাওয়ার সময় সে এক দুপুরে ভগবানকে খুব ডাকল, এবার যে-বাড়ি যাচ্ছি তারা যেন আমায় ঘেন্না না করে, হে ভগবান।

পুঁটুলি বগলে নিয়ে সে যখন সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়িতে ঢুকল তখন প্রথম দর্শনেই বাড়িটা তার ভাল লেগে গেল। কম লোক, ঠান্ডা শব্দহীন সব ঘর, বেশ নিরিবিলি। বুড়ো-বুড়ি আর তাদের আইবুড়ো একটা মেয়ে। বড় ভয় করছিল বনানীর। তাকে এরা পছন্দ করবে তো! যদি না করে তা হলে সে কোথায় যাবে এর পর?

পিঠে কুঁজওয়ালা মেয়েটাকে দেখে বুক শুকিয়ে গেল বনানীর। চোখে খর দৃষ্টি, মুখটা থমথমে গম্ভীর, কেমন যেন।

সোনালি তখন সবে স্কুল থেকে ফিরেছে। মেজাজটি কিছু গরম। বেশ ঝাঁঝের গলায় বলল, যদি তোর গলা কেটে ফেলি তা হলে টুঁ শব্দ করবি?

বনানী এর জবাবে কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, না।

যদি চিমটি কাটি তা হলে চেঁচাবি?

বনানী ভয়ে ভয়ে বলল, না তো!

যদি কাতুকুতু দিই তা হলে কখনও হাসবি?

বনানীর মাথা গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। গায়ে ঘাম দিচ্ছে। কী পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেছে! সে ফের মাথা নেড়ে বলল, না।

এ বাড়িতে থাকতে গেলে রোজ পেস্ট আর ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে হবে, রোজ সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে স্নান করতে হবে, নোংরা থাকলে কাপড়কাচার মুগুর দিয়ে মাথায় মারব, বুঝলি?

হ্যাঁ।

মাথায় ক'হাজার উকুন নিয়ে এসেছিস?

বেশি নয়।

ইস্, বেশি আবার নয়! ওই উলোঝুলো চুলে লাখে লাখে উকুন আছে। মুখে মুখে কথা বলার অভ্যাস নেই তো? চোপা করলে চুলের মুঠি ধরে ছাদে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেব।

এবার বনানী ততটা ভয় পেল না। তার মনে হল যতখানি তর্জন-গর্জন হচ্ছে ততদূর খারাপ এ মেয়েটা নয়। সে হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, আচ্ছা।

চুরি করে খাস?

না তো।

পয়সা-টয়সা সরাবি না তো?

না।

সব তাতেই যে সায় দিয়ে যাচ্ছিস? পরে যদি স্বরূপ বেরোয় তখন দেখবি মজা।

থেকে গেল বনানী। এতকাল সে যত বাড়িতে থেকেছে— মোট চারটে, তার মধ্যে এইটে সবচেয়ে ভাল। কুঁজওলা মেয়েটার নাম সোনালি। এ বাড়িতে তারই অখণ্ড দাপট। বুড়োবুড়ি বিশেষ সাতে-পাঁচে নেই। সেই সোনালি তাকে একখানা আলাদা ঘর দেখিয়ে দিল। সে ঘরে চৌকি আছে, পাতলা একটা তোশক আছে, একটা বালিশ আর বিছানায় একখানা তাঁতের নকশি চাদরও। এতখানি বনানী স্বপ্নেও ভাবেনি। তার বিছানার স্মৃতি কেবল চট আর খড়ের। নিজেদের বাড়িতে ছিল মাচান। তাতে একসময়ে একটু বিছানা হয়তো-বা ছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যে পেচ্ছাপ করার দোষে মাসি এসে চটের বিছানার ব্যবস্থা করে।

বহুদিন বাদে বনানী ফের বিছানা পেল। সেইসঙ্গে পেল আস্ত একখানা গন্ধ সাবান, এক গোলা বাংলা সাবান, এক শিশি তেল, দু'গজ রিবন, একখানা চিরুনি, টুথব্রাশ আর পেস্ট, ছোট্ট এক এক কৌটো পাউডার, দুটো নতুন জামা আর একখানা পুরনো শাড়ি— এইসব। সোনালিপিসি দিতে জানে বটে, এত দেয় যে বনানী দিশেহারা হয়ে যায়। সে বলেই ফেলল, অত দিয়ো না পিসি, আমার অত লাগে না।

এ বাড়িতে পরিষ্কার থাকতে হবে। নোংরা থাকলে চুলের ঝুঁটি ধরে তাড়াব। বাসি কাপড় ছাড়বি, পায়খানায় যেতে জামাকাপড় ছেড়ে যাবি, হাতমুখ সব সময়ে যেন ঝকঝকে পরিষ্কার থাকে। দাঁত ব্রাশ করতে পারিস না?

পারে না। কিন্তু পারল শেষ পর্যন্ত।

ভয় ছিল বিছানায় পেচ্ছাপ নিয়ে। আজকাল আর বিশেষ একটা হয় না। তবু মাঝে মাঝে করে ফেলে। সোনালি টের পেলে কী যে করবে! ভয়ে ভয়ে জল খাওয়া কমিয়ে দিল সে। রাতে শোওয়ার সময় ভগবানকে বলত, দেখো, যেন আজ না হয়।

সারাদিন প্রাণপণে কাজ করত বনানী। কাজ অবশ্য বিশেষ কিছুই নেই। ঠিকে ঝি আছে, ঠিকে রান্নার লোকও আছে। সে শুধু ঘরদোর সাফসুতরো রাখে, ঝাড়পোঁছ করে। দোকানপাট করতে হয়। এ বাড়িতে আলমারি ভরতি বই, তাক ভরতি বই। ধুলো ঝাড়তে গিয়ে সে মাঝে মাঝে এক-আধখানা নামিয়ে বসে বসে খানিকটা করে পড়ে নেয়।

ব্যাপারটা একদিন সৌরীন্দ্রমোহনের নজরে পড়ল।

তুই বাংলা পড়তে পারিস?

পারি।

বাঃ। আমার চোখে ছানি বলে পড়তে পারি না। খবরের কাগজটা পড়ে শোনা তো।

সামনের ঝুল-বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া সৌরীন্দ্রমোহনের পায়ের কাছে বসে বেলা দশটার রোদে খবরের কাগজ পড়া বনানীর এ জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা। নীচে দিয়ে রিকশা যায়, লোক যায়, চারদিকে ঝকঝক করে শহর, আর সে বসে বসে এক অদ্ভুত পৃথিবীর নানা অদ্ভুত খবর দুলে দুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। মানে বোঝে না সবসময়, কিন্তু মনে ছবির পর ছবি ভেসে উঠতে থাকে।

এইরকমই এক সকালে যখন সে সৌরীন্দ্রমোহনকে কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে, তখন রাস্তা থেকে একটা গমগমে গলার ডাক এল, দাদু!

সৌরীন্দ্রমোহন সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আয় অলক, আয়। কেরালা থেকে কবে ফিরলি?

এই তো।

জীবনে যত পুরুষমানুষ দেখেছে বনানী কারও সঙ্গেই এর মিলল না। আসলে পুরুষ আর মেয়েমানুষের তফাতটাও তেমন করে এ পর্যন্ত মনের মধ্যে উঁকি মারেনি তার। আর সে নিজে? সে পুরুষ না মেয়ে, তা নিজের শরীরে এ তাবৎ টের পায়নি সে।

কিন্তু ওই যে লম্বা শক্ত গড়নের অদ্ভুত শান্ত ও অন্যমনস্ক মুখশ্রীর ছেলেটি টকাটক সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল, একে দেখেই বনানীর ভিতরে যেন ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ল ঘরবাড়ি, গাছপালা দুলতে লাগল ঝড়ে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, বাজ পড়তে লাগল উপর্যুপরি।

নিজের রোগা ক্ষয়া শরীরটা এই প্রথম কারও চোখ থেকে আড়াল করার জন্য ছাদে পালিয়ে গেল সে।

অনেক পরে যখন দিদিমার ডাক শুনে নেমে এল তখন সেই ছেলেটি বসে লুচি আর মাংস খাচ্ছে। তার দিকে দৃক্‌পাতও করল না। খেয়ে-দেয়ে চলে গেল।

ও কে গো দিদিমা?

দিদিমা উজ্জ্বল মুখে হেসে একগাদা পুরনো খবরের কাগজ খুলে পাঁচ-সাতখানা ছবি তাকে দেখিয়ে বলল, এ হল আমার নাতি। মস্ত সাঁতারু। কত নামডাক। এই দেখ না, কাগজে কত ছবি বেরোয় ওর।

একটা মানুষ এল এবং চলে গেল, কিন্তু সে টেরও পেল না তার এই ক্ষণেকের আবির্ভাব আর-একজনকে কীভাবে চূর্ণ করে দিল ভিতরে ভিতরে। জীবনে এই প্রথম বনানী ভয়ংকরভাবে টের পেল যে, সে মেয়ে। প্রথম জানল, শুধু দুটো খাওয়া আর মাথার ওপর একটু ছাদ, এর বেশি আরও কিছু আছে। তার ভিতরে দেখা দিল লজ্জা, রোমাঞ্চ এবং আরও কত কী!

একা ঘরে রাতের বেলায় তার ঘুম আসছিল না। চোখ জ্বালা করছে, বুকের ভিতর ঢিবঢিব, মাথাটা কেমন গরম, গায়ে বারবার কাঁটা দিচ্ছে। বারবার অলকের চেহারাটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

সেই রাত থেকে তার বিছানায় পেচ্ছাপ করা বন্ধ হয়ে গেল। পুরোপুরি। মাত্র এক মাসের মধ্যে ঋতুমতী হল সে। খুবই আশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটতে লাগল।

জীর্ণ শরীরটাকে নিয়ে বড় লজ্জা ছিল বনানীর। বেঁচে থাকার তেমন কোনও ইচ্ছাশক্তি কাজ করত না। সে জানত মরার জন্যই তার এই জন্ম। কিন্তু এখন তার ভিতরে এক প্রবল ইচ্ছাশক্তি বাঁধ ভাঙল।

একদিন ঘুম থেকে উঠে ফ্রক পরে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছিল। হঠাৎ সোনালি এসে দাঁড়াল কাছাকাছি। তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, বাঃ রে মুখপুড়ি, তোকে বেশ দেখাচ্ছে তো! চুরি করে খাচ্ছিস নাকি আজকাল?

বনানী আজকাল ঠাট্টা বোঝে। শুধু হাসল।

সোনালি চোখ পাকিয়ে বলল, ফ্রক পরে বারান্দায় দাঁড়াস কেন ধিঙ্গি মেয়ে? পাড়ার ছোঁড়াগুলো দেখলে সিটি মারবে। যা, বাথরুমে যা।

শুনে বনানীর চোখ কপালে উঠল। তাকে দেখে ছেলেরা সিটি দেবে! তাকে দেখে!

সে দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকে একা একা হিঃ হিঃ করে পাগলের মতো হাসতে লাগল। মাগো! সোনালি পিসিটা একদম পাগল। একদম পাগল। এ মা! কী বলে রে!

শূক থেকে প্রজাপতির জন্ম যেমন অদ্ভুত তেমনই অদ্ভুত কিছু ঘটতে লাগল বনানীর শরীরেও। ঝলঝলে সেই রোগা শরীরে কোথা থেকে ধীরে ধীরে জমে উঠছিল পলির স্তর, উর্বরতা।

পাঁচ

দাদা, একে চিনিস?

অলক দীর্ঘ ক্লান্তিকর এক ওয়ার্ক-আউটের পর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে সটান শুয়ে পড়েছিল। চোখ জুড়ে আসছিল অবসাদে। ঝুমুরের ডাকে চোখ তুলল। ঝুমুরের সঙ্গে একটি মেয়ে।

না তো!

ও তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

অলক ভাল করে তাকিয়ে বুঝল, বাজে কথা। মেয়েটির চোখে বিস্ময় বা কৌতূহল নেই। আছে একটু অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, সংকোচ। তবে মেয়েটি সুন্দরী। বোধহয় নাচে। বেশ ছমছমে শরীর। হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিট।

ও। বসুন।

মেয়েটি বসল না। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঝুমুর বলল, ওর নাম সুছন্দা। দারুণ নাচে।

অলক মেয়েটিকে দেখছিল। দেখার জন্য নয়, বোঝবার জন্য। কিছু কিছু মেয়ে নিশ্চয়ই আছে যারা অলকের সঙ্গে আলাপ করতে চায়, ভাব করতে চায়, প্রেম-ভালবাসা গোছের কিছু করতে চায়। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে মনে হয়, এ তাদের দলে নয়। একে ধরে আনা হয়েছে।

অলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, আমি ভীষণ টায়ার্ড। প্লিজ সুছন্দা, কিছু মনে করবেন না।

সুছন্দা কিছু মনে করল কি না কে জানে, তবে ঝুমুর ভীষণ অপমান বোধ করে বলে উঠল, ও কী রে দাদা! একটু আলাপ কর। তোকে দেখতেই এল!

অলক মুখ তুলে সুছন্দার দিকে মৃদু হেসে বলল, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ জমবে না। একটু পরেই কথা ফুরিয়ে যাবে। আলাপ করতে একটা টিউনিং দরকার। আমার সঙ্গে আপনার সেই টিউনিং হবে না।

মেয়েটা লাল হল, কাঁদো-কাঁদো হল, তারপর একটিও কথা না বলে চলে গেল।

কী করলি দাদা! ছিঃ!— ধমক দিল ঝুমুর।

অলক কথা খুব কম বলে কিন্তু সুছন্দাকে অত কথা একসঙ্গে বলে সে নিজেই অবাক হয়েছিল। এত কথা তো তার আসে না কখনও। বরং মেয়েটিই একটি কথাও বলেনি।

সুছন্দাকে ভুলে যেতে অলকের বেশি দিন লাগেনি। সারা বছর তার হাজারটা কমপিটিশন, ট্রায়াল, মিট, কোচিং। হাজারটা মুখের সঙ্গে রোজ মুখোমুখি হতে হয়। কত মনে রাখা যায়?

কয়েক মাস আগে লেক-এ একটা ওয়াটার ব্যালের রিহার্সাল চলছিল। অলক জলের ধারে বসে একটা কোল্ড ড্রিংকস খাচ্ছে আর আলগা চোখে রিহার্সাল দেখছে। এমন সময় ব্যালের গ্রুপ থেকে একটা মেয়ে দল ভেঙে উঠে এসে হেড গিয়ারটা খুলে অলকের দিকে চেয়ে বলল, চিনতে পারছেন?

অলক অবাক হল না। একটু হাসল। বলল, আপনি না নাচতেন?

এখনও নাচি। মনীষাদির কাছে। এ বছর ওয়াটার ব্যালেতেও নেমেছি।

বাঃ বেশ!

বলে অলক আবার কোল্ড ড্রিংকসটা মুখে তুলল।

মেয়েটা তার ভেজা কস্টিউম নিয়েই একটা ফাঁকা চেয়ারে মুখোমুখি বসে বলল, আপনি অত ঠোঁটকাটা কেন?

আমি!— বলে অলক খুব ভাবতে লাগল।

মেয়েটি হাসল। বলল, অবশ্য কথাগুলো খুব সত্যি। পরে ভেবে দেখেছি, টিউনিং না থাকলে কথা আসে না।

অলক সংক্ষেপে বলল, হুঁ।

এইভাবে সুছন্দার সঙ্গে আলাপ। আবার আলাপও ঠিক নয়। কারণ অলককে সাঁতার উপলক্ষে দু'দিন বাদেই চলে যেতে হল বোম্বাই। ফিরে এসে পনেরো দিনের মাথায় হুবহু একভাবে দেখা হয়ে গেল।

কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো? অনেক দিন দেখিনি আপনাকে।

বোম্বাই।

সাঁতার দিতে?

ওই আর কী।

সুছন্দা হাসল, আপনার সঙ্গে সত্যিই আমার টিউনিং হচ্ছে না।

জবাবে শুধুই একটু হাসল অলক।

আর তিনদিন বাদে আমাদের প্রোগ্রাম। আসবেন?

দেখি যদি থাকি কলকাতায়।

অলক থেকেছিল। ওয়াটার ব্যালেটা উতরেও গিয়েছিল ভাল। কিন্তু অত রং আর রোশনাইতে একগাদা মেয়ের ভিড়ে সুছন্দাকে সে চিনতেই পারল না।

পরদিন শোওয়ার সময় ঝুমুর রীতিমতো ঝাঁঝালো গলায় বলল, সুছন্দা খুব তোর কথা বলছিল।

ও।

কোথায় আলাপ হল বল তো! লেকে সেই ওয়াটার ব্যালেতে, না?

হুঁ।

কী মেয়ে বাবা!

কথাটা কেন বলল ঝুমুর, তা বুঝল না অলক। তবে প্রশ্নও করল না। ঘুমিয়ে পড়ল।

সত্যকাম একদিন রাত্রে ঘোষণা করল, দারুণ প্রোডিউসার পেয়ে গেছি মনীষা! স্টোরিও এসে গেছে। ফাটিয়ে দেব। আই নিড সাম নিউ ফেসেস। হেলপ করবে?

করব না কেন? কেমন রোল?

হিরোইন।

মনীষা নির্বিকার মুখে বলল, ঝুমুরকে নাও না! মানাবে।

আরে যাঃ। ও হয় না।

তা হলে নূপুর?

তোমার সেই ছাত্রীটি সুছন্দা! ওকে বলে দেখো না!

মনীষা ঠোঁট ওলটাল। তারপর বলল, সুছন্দাকে খুব পছন্দ দেখছি! কখনও ছেলের বউ করতে চাইছ, কখনও নায়িকা!

শি ফিটস দা রিকোয়ারমেন্টস।

মনীষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই দেখছি।

সংসারের সম্পর্কগুলো এমন সব সূক্ষ্ম ভারসাম্যতার ওপর নির্ভর করে যে, একটা মাছি বসলেও পাল্লা কেতরে যায়। সুছন্দার প্রতি সত্যকামের এই পক্ষপাত মনীষার সংসারে একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারত। কিন্তু মনীষা আর সত্যকামের সম্পর্ক অত সূক্ষ্ম জিনিসের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন কারণে তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে অনেকটা বোঁদা, ভোঁতা এবং ঈষৎ নিরুত্তাপ। সত্যকামের নারীঘটিত অ্যাডভেঞ্চারের কথা মনীষা জানে বা আঁচ করে। আবার মনীষারও কিছু

পরপুরুষের ব্যাপার ছিল, যা হাতেনাতে ধরেও সত্যকাম তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। সম্ভবত সেগুলো সঞ্চয় করে রেখেছে দরকারমতো কাজে লাগাবে বলে। দু'জনের কাছেই দু'জনের গুপ্ত কথা সঞ্চিত থাকায় কেউ কাউকে ঘাঁটায় না বিশেষ।

সুতরাং সুছন্দার কাছে প্রস্তাবটা গেল এবং সে ও তার আধুনিক মনোভাবাসম্পন্ন সংস্কারমুক্ত মা-বাবা উৎসাহের সঙ্গেই সম্মতি দিল। লোকেশন বাঁকুড়া, কালিম্পং আর হরিদ্বার। তিনমাস শুটিং-এর পর সুছন্দা এতটাই বদলে গেল বা প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে উঠল যে চেনা লোকেরাও আর যেন এই অহংকারী, বাচাল, ছলবলে, পাকা ও ন্যাকা মেয়েটাকে চিনে উঠতে পারে না। সেই সিরিয়াস, লাজুক, রোমান্টিক, স্বল্পভাষী মেয়েটা সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ।

বিষাক্ত চোখে মনীষা কয়েকদিন নাচের ক্লাসে সুছন্দাকে খুঁজল। পেল না। সুছন্দা পাকাপাকিভাবে তার স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। হন্যে হয়ে ঘুরছে ছবির কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্য। পার্টি দিচ্ছে ঘন ঘন। বোম্বে ঘুরে এল কয়েকবার।

শীতের শেষ রাতে লেক-এর জলে কোনও সাঁতারুই থাকে না। যারা রোয়িং করে তারাও আসে আর-একটু পরে। এই শেষ রাতে আসে শুধু অলক। প্রথম কিছুক্ষণ দুরন্ত দু'হাতে বৈঠা মেরে উন্মত্ত গতিতে রোয়িং করে নেয় সে। তারপর কুয়াশায় আধো-আড়াল চারিদিককার এক মোহময়তা ঘনীভূত হতে থাকে জলে। নীল জলে সেই ভোরবেলাকার আবছায়া, কুয়াশা, চাঁদ বা তারা থেকে চুরি-করে-আসা মায়াবী আলোয় তৈরি হতে থাকে প্রিয় বিভ্রম। একসময়ে দীর্ঘ ও সরু, তিরের মতো বেগবান নৌকোটিকে সে থামায়। নিঃশব্দে গ্রিজমাখা শরীরে নেমে যায় জলে।

রোজ নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে এইরকম নির্জনতায়, এমনই বিজনে জল থেকে উঠে আসে জলকন্যা।

সেদিনও অলক দু'হাতে জল কেটে শব্দহীন ঘুরে বেড়াচ্ছিল অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে। আকস্মিক পিছনে জলের এক মৃদু আলোড়ন টের পেল সে।

অলক জলের মধ্যে লাটিমের মতো একপাক ঘুরল তিরবেগে।

সরু একটা সাদা রোয়িং বোটের মুখ কুয়াশা চিরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। তার ওপর জলকন্যা। সাদা, পরির মতো পোশাক, বৈঠায় দুই গোলাপি হাত।

জলকন্যা?

জলকন্যা মানুষীর গলায় ডাকল, অলক!

বিভ্রম ভেঙে গেল অলকের। কিছুক্ষণ খুবই হতাশ হয়ে চেয়ে রইল সে।

অলক! তোমার সঙ্গে যে ভীষণ দরকার। প্লিজ!

অলক জবাব দিল না। তবে ধীর হস্তক্ষেপে সাঁতরে এসে নিজের নৌকায় উঠল। কয়েক লহমায় বৈঠা চালিয়ে নৌকো এনে ভিড়িয়ে দিল ক্লাবের ঘাটে, পিছনের দিকে দৃকপাতও না করে ভিতরে ঢুকে ভেজা পোশাক পালটে যখন বারান্দায় এল, তখন সুছন্দা তার জন্য একটা ফাঁকা টেবিলে অপেক্ষা করছে। শীতের শেষরাতে তার এই অস্বাভাবিক আবির্ভাব নিয়ে অলক কোনও প্রশ্ন করল না বলে কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল সুছন্দা।

তবে অলক সুছন্দার দিকে শান্ত, গভীর ও প্রায় অপলক এক জোড়া চোখে চেয়ে রইল।

গত কয়েকমাসে পুরুষের চোখের নানাবিধ চাউনিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সুছন্দা। তবু অলকের ওই নিরুদ্বেগ, ভাষাহীন, প্রশ্নহীন চোখ তাকে লেসার বিমের মতো স্পর্শ করেছিল হয়তো। বারবার সে অস্বস্তিতে মাথা নুইয়ে বা অন্যদিকে চেয়ে এড়াতে চাইছিল সেই চাউনি।

অবশেষে সে বলল, আমি শুনেছিলাম জলের মধ্যে থাকলে নাকি তুমি অন্যরকম হয়ে যাও। আজ দেখলাম সত্যি। মনে হচ্ছিল তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সাঁতরাচ্ছ।

অলক একটু হাসল মাত্র। জবাব দিল না। সে জানে এ কথা বলতে সুছন্দা আসেনি।

সুছন্দা তার কার্ডিগানের দুটো বোতাম খুলল, ফের একটা লাগাল। তারপর নিজের চুলে একটুক্ষণ হাত বুলিয়ে বলল, তুমি আজ সকালের গাড়িতে দিল্লি যাচ্ছ শুনে ভোরবেলা এখানে এসে তোমাকে ধরেছি। আমার ভীষণ বিপদ।

অলক তেমনি এক অকপট চাউনিতে চেয়ে আছে।

সুছন্দা মাথা নুইয়ে বলল, আমার ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে জানো তো! ভীষণ খারাপ। কেউ আমাকে চাইছে না। বোম্বে কলকাতার কোনও প্রোডিউসারই কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে না। ঘোরাচ্ছে। অথচ ফিল্ম কেরিয়ার ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতেও পারছি না।

অলক শান্ত স্বরে বলল, চা খাবে?

খাব।

অলক চায়ের কথা বলে এসে ফের বসল।

সুছন্দা খুব আকুল গলায় বলল, অলক, প্লিজ আমার একটা উপকার করবে? তোমার বাবা একজন বিগ প্রোডিউসার পেয়ে গেছেন। অনেক টাকার প্রোডাকশন। বিগ বাজেট। আমি খবর পেয়েছি একটা ভাল রোল আছে, এখনও কাস্টিং হয়নি।

অলক তেমনি অকপটে চেয়ে থাকল। চা এল, সে একটা চুমুক দিয়ে ফের মুখ তুলল। আবার চেয়ে রইল।

সুছন্দা মুখ নামিয়ে বলল, জানি তুমি কী ভাবছ। তোমার বাবাই আমাকে সিনেমায় নামিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছে আমি নিজেই অ্যাপ্রোচ করতে পারি। কিন্তু তুমি জানো না যে, আমাদের রিলেশনটা ঠিক আগের মতো নেই।

কেন?

সামথিং হ্যাপেন্‌ড্‌। যদি শুনতে চাও তো বলতে পারি। শুনবে?

যদি বলতে চাও।

হি হ্যাড এ ক্রাশ অন মি। ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। আমি বাধা দেওয়ায় খেপে যান।

কথাটা যে মিথ্যে তা সুছন্দার মুখে-চোখেই লেখা আছে। অলক অনেকদিন আগেই টের পেয়েছিল, তার বাবা সত্যকাম প্রায় বিনা চেষ্টাতেই সুছন্দাকে যেমন পেতে চেয়েছিল তেমনই পেয়ে গেছে। কিছু বাকি নেই।

অলক কথা না বলে চায়ে দুটো-একটা মৃদু চুমুক দিল।

সুছন্দা চোখভরা জল নিয়ে বলল, তুমি বোধহয় বিশ্বাস করলে না!

অলক ফের হাসল।

সুছন্দা খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, আচ্ছা, স্বীকার করলাম উই হ্যাড অ্যাফেয়ার্স।

অলক খুব ধীরে তার চায়ে আর-একবার চুমুক দিল। যখন মুখ তুলল তখন তার উজ্জ্বল মুখ ধূসরতায় মাখা।

সুছন্দা মাথা নিচু করে বসে রইল। চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ছিল টেবিলে। চায়ের কাপেও। সুছন্দা তার রুমালে চোখ মুছল অনেকক্ষণ বাদে। নিজের কপালটা টিপে ধরে বসে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর বলল, উনি আমাকে বিয়ে করতেও চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। তারপর নানা খিটিমিটি, আমাদের ঝগড়া হয়ে গেল খুব। তারপর থেকেই রিলেশনটা বিটার। কিন্তু আমি সেটা ভুলে যেতে চাই। আমার অবস্থা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। তুমি যদি ওঁকে একটু বলো। একটা চান্স। আমি প্রাণপণে করব। তুমি বললেই হবে। তোমার বাবার কাছে তুমি দেবদূত।

অলক উঠল। একটিও কথা না বলে, বিদায়-সম্ভাষণ না করে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে তার স্কুটারে উঠল। স্টার্ট দিল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, বলে দেখব।

মানুষের হীনতার কথা অলক জানে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথাও। মানুষ নিজেকে কতখানি ছোট হয়ে যেতে দেয় তা সে দেখেনি কি? তাই সত্যকাম বা সুছন্দার ওপর তার ঘৃণা এল না। শুধু তার মনে হল কোনও কার্যকারণ সূত্রে সুছন্দা তার মা হয়। ভাগ্য ভাল, সত্যকাম তাকে ভোগ করার আগে বা পরে অলকের সঙ্গে তার কোনও দৈহিক সম্পর্ক হয়নি।

বাপ-ব্যাটায় বড় একটা দেখা হয় না, কথা হয় না। দিল্লি যাওয়ার আগে অলক একটা ছোট্ট চিরকুট লিখে রেখে গেল সত্যকামের টেবিলে, সুছন্দা কিছু প্রত্যাশা করে। ইন রিটার্ন।

সুছন্দা আবার নামতে পারল সিনেমায়।

কিন্তু ঘটনা সেটা নয়। সুছন্দা বা সত্যকাম কেউ জানল না, এই ঘটনার পর অলক কেমন শুকিয়ে গেল ভিতরে ভিতরে। মেয়েদের সঙ্গে দৈহিক মিলনের সব সুযোগ সে ফিরিয়ে দিতে লাগল এরপর থেকে। ভীষণ ভয় হত তার। বড় সংকোচ।

নূপুর যথারীতি বিয়ে করল এক ডাক্তারকেই। ঝুমুর অনেক নাচিয়ে অবশেষে পাকড়াও করল এক মোটর পার্টসের ব্যাবসাদারকে। বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। সত্যকাম আজকাল প্রায় সবসময়েই বাইরে। মনীষা একা। বড্ড একা। এই ভ্যাকুয়াম কীভাবে ভরে তোলা যায় ভাবতে ভাবতে সে গান আর নাচ নিয়ে পড়ে রইল অহর্নিশি। তারপর তার মনে হল নির্জনতার ভূতটা বাড়ি থেকে যাচ্ছে না।

সুতরাং একদিন মনীষা তার ঠান্ডা, মূক ছেলের ওপর চড়াও হয়ে বলল, তুই ভেবেছিসটা কী শুনি?

অলক মায়ের দিকে তেমনি অকপটে চাইল, যেমনটা সে সকলের দিকে চায়।

মনীষা বলল, চাকরি তো ভালই করিস।

অলক একটু হাসল।

কী ঠিক করেছিস? বিয়ে করবি না নাকি? মা-বাপের প্রতি কর্তব্য নেই?

অলক জবাব দিল না।

কিছু বলবি তো? হ্যাঁ কিংবা না!

অলকের মুখে সেই অর্থহীন মৃদু হাসি। চোখে একইরকম অকপট, প্রশ্নহীন, ভাষাহীন চাউনি। মনীষার মনে হয়, তার এই ছেলেটা মাঝে মাঝে সত্যিই বোবা হয়ে যায়। শুধু মুখে বোবা নয়, ওর মনটাও বোবা হয়ে যায় তখন। আর এইসব সময়ে নিজের ছেলের দিকে চাইলে মনীষার বুকের মধ্যে একটা ভয়ের বল লাফাতে থাকে। ধপ ধপ ধপ। কেবলই মনে হয়, ও একটা ঘষা কাচের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট, আবছা, রহস্যময়।

ছেলের সঙ্গে দূরত্বটাকে সত্যকাম জেনারেশন গ্যাপ বলে মেনেই নিয়েছে। নানা কাজকর্ম এবং ধান্দায়, সর্বোপরি নানা গোপন আনন্দে সে একরকম আলাদা করে নিতে পেরেছে নিজেকে। তার মতে, জীবনধারণ এই একবারই। পরজন্ম নেই, কর্মফল-টল সব বাজে কথা। ভগবান-টান নিয়ে সে কখনও ভাবেনি, তাই মানার প্রশ্নই ওঠে না। আর ওইভাবে নিজের ছেলের সঙ্গেও তার দূরত্বটা হয়েছে নিরেট।

কিন্তু মনীষাব তো তা নয়। সত্যি বটে, নূপুর আর ঝুমুরের সঙ্গে তার যে সখীত্ব ছিল, যে সমঝোতা, তার হাজার ভাগের একভাগও অলকের সঙ্গে নেই। কিন্তু সে কখনও হাল ছাড়ে না। মেয়ে দুটো পরের ঘরে চলে যাওয়ায় ফাঁকা বাড়িতে অলককে সে আজকাল অনেক বেশি লক্ষ করে। যত লক্ষ করে তত ভয় বেড়ে যায়।

সত্যকামের রোজগার বাড়ছে, খ্যাতি বাড়ছে, বাড়ছে চারিত্রিক বদনামও। পঞ্চাশ-ছোঁয়া এই বয়সটাও বড় মারাত্মক। ভাটির টান যখন লাগে তখন মানুষ ভোগসুখের জন্য পাগল হয়ে যায়।

জানে তো আর বেশি সময় হাতে নেই, বেশিদিন আর নয় শরীরের ক্ষমতা।ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান হারিয়ে তখন সে কেবল খাই-খাই করে খাবলাতে থাকে চারপাশের ভোগ্যবস্তুকে। সত্যকাম চুলে কলপ দিচ্ছে, রংচঙে জামা গায়ে চড়াচ্ছে, সেন্ট মাখছে গায়ে।

মনীষা বিষ-চক্ষুতে নীরবে দেখে যাচ্ছে সব কিছু। দু'জনের মধ্যে অসীম ব্যবধান তৈরি হচ্ছে অলক্ষে।

সত্যকাম লাইফস্টাইল পালটাচ্ছে বলে আজকাল সন্ধের পর বাড়িতে থাকলে একটু ড্রিংকস নিয়ে বসে এবং মনীষাকেও ডেকে নেয়। স্বামী-স্ত্রী মিলে ড্রিংক করা বেশ একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চার মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে।

মনীষার ব্যাপারটা খারাপও লাগে না। সে অল্পই খায়। সত্যকাম নেশা করে।

একদিন এরকম ড্রিংক করার মুখে সত্যকাম বলল, তোমাকে আজকাল খুব ব্রুডিং মুডে দেখি।

মনীষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দেখো তা হলে? যাক বাবা, বাঁচা গেল!

সামথিং রং?

না। সবই ঠিক আছে।

অলককে নিয়ে কোনও প্রবলেম নয় তো?

মনীষা কেন কে জানে সত্যকামের সঙ্গে অলকের বিষয়ে কথা বলতে ভালবাসে না। তার মনে হয় এ বিষয়ে আলোচনা করার যথার্থ অধিকার সত্যকামের নেই। কেন যে এরকমটা মনে হয় তার ব্যাখ্যা মনীষা কখনও করতে পারবে না।

সে বলল, না না। অলককে নিয়ে প্রবলেম হবে কেন?

অলক প্রবলেম হলেই বা সত্যকামের কী, না হলেই বা কী? সে তরল আনন্দে ভেসে গেল।

কিন্তু সেই রাতে শোয়ার সময় হঠাৎ সত্যকামের মনে পড়ল, একসময়ে সে সুছন্দার সঙ্গে অলককে ভিড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। এমনকী সুছন্দাকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাবও দিয়েছিল সে।

অথচ—

একা একা খুব হাসল সত্যকাম আপনমনে। দুনিয়াটা যে কী হয়ে গেল! ওফ্! যদি সত্যিই সুছন্দাকে বিয়ে করত অলক? তা হলে কী হত?

মনীষা জিজ্ঞেস করল, ওরকম হাসছ কেন?

খুব নেশা হয়েছে বুঝলে! দুনিয়াটাই অন্যরকম লাগছে।

অন্যরকম লাগানোর জন্যই তো নেশা করো তুমি।

তা ঠিক, তবে এতটাই অন্যরকম হওয়া ঠিক নয়।

অন্যরকম মানে কীরকম তা বুঝিয়ে বলো!

সত্যকাম গম্ভীর হয়ে গেল। আর কিছুই বলল না। সে মনে মনে সুছন্দাকে অলকের পাশে দাঁড় করাল। সুছন্দার মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুর। শিউরে উঠে সত্যকাম ছবিটা মুছে ফেলল।

ছয়

বনানীর এক অদ্ভুত সুখকর অস্বস্তি শুরু হল।

সৌরীন্দ্রমোহন, বনলতা, সোনালি সকলেই আজকাল কেমন যেন বিস্ময়ভরে এবং বিমূঢ়ের মতো তার দিকে তাকায়। তারা এমন কিছু দেখে বনানীর মধ্যে, যা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ঠিকে ঝি একদিন বলে উঠল, ও মা, এ যে অশৈলী কাণ্ড গো! সেই পেটমরা মেয়েটা যে একেবারে ধান ফুটে খই হল গো।

গয়লা দুধ দিতে এসে হাঁ করে তাকে দেখে। দেখে সৌরীন্দ্রমোহনকে খেউড়ি করতে এসে বিশে নাপিত। দেখে পাড়াপড়শি। প্রত্যেকের চোখেই অবিশ্বাস।

বনানীর আয়না লাগে না। অন্যের চোখেই সে আজকাল নিজেকে দেখতে পায়।

বাস্তবিকই আয়নার দিকে তাকায় না বনানী। কী দেখবে তা নিয়ে তার যত ভয়। সে যে বদলে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু বদলটা কেমন হল তা সে জানতে চায় না।

সোনালি পছন্দ করে না বলে সে পারতপক্ষে বারান্দায় যায় না। নিজেকে সে প্রাণপণে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতেই চেষ্টা করে। তার জীর্ণ শরীরে প্লাবন আসার এই ঘটনা তার কাছে এখনও তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। একা, ঘরে বসে মাঝে মাঝে নিজের স্তনভার অনুভব করতে করতে সে লজ্জায় ঘেমে ওঠে। স্নানঘরে পুরন্ত উরু, গভীর নাভি, মসৃণ হাতের গঠন দেখে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়। অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, ভগবান!

একদিন সোনালি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এই সর্বনাশী রূপ এতকাল কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলি রে হারামজাদি? তুই যে বহু সংসারে আগুন লাগাবি!

রূপ! রূপের কথা বনানী আজকাল বিশ্বাস করে।

সোনালি ফতোয়া দিল, খবরদার সাজবি না। লোকের সামনে ধিঙ্গির মা সিঙ্গি হয়ে গিয়ে দাঁড়াবি না।

বনানী ম্লান মুখে বলে, কারও সামনে যাই নাকি?

সোনালি বড় বড় চোখে চেয়ে থেকে বলে, মনে কোনও পাপ নেই তো রে মুখপুড়ি? খুব সাবধান কিন্তু!

পাপ! বনানী পাপের কথা ভাবতে গিয়ে বড্ড অস্থির হয় মনে মনে। একা ঘরে টপ টপ করে চোখের জল পড়ে। পাপ! পাপ কি না তা তো সে জানে না। কিন্তু ওই যে একজন এসেছিল একদিন, তারপর বহুদিন আর আসেনি, ওই একজন লোক তার জীবনের সব এলোমেলো করে দিল। কেন এল ও? কিছুতেই যে বনানী ওকে মন থেকে, চোখ থেকে মুছে দিতে পারে না!

প্রায় ছ'মাস বাদে আবার বনানী পড়ল ভূমিকম্পে, ঝড়ে, বজ্রপাতে।

দুপুরবেলা। বুড়োবুড়ি ঘুমোচ্ছে। সোনালি ইস্কুলে। এমন সময় কলিং বেল-এর শব্দ।

বনানী ভাবল, পিয়োন বুঝি। নীচে নেমে দরজা খোলার আগে সে নিয়মমতো জিজ্ঞাসা করল, কে?

আমি। আমি অলক। কে, পিসি নাকি? শিগগির দরজা খোলো, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

বনানী দরজা খুলল না। তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে গায়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গেল ভীষণ জোরে।

মা গো!

শব্দে বনলতা নেমে এলেন, ও মা! এ কী রে? কী হল তোর?

ওদিকে কলিং বেল বেজে যাচ্ছিল, সঙ্গে অলকের গলা, কী হল? ও পিসি?

বনলতা দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আয় দাদা, আয়। দেখ তো কী কাণ্ড! মেয়েটা আছাড় খেয়েছে, কী যে করি! হাত পা ভাঙল কি না।

হাঁটু, গোড়ালি, কনুই, তিন জায়গাতেই প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিল বনানী। এমন ব্যথা যে তার মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল যন্ত্রণায়। তবু অলক ঢুকতেই সে ফের 'মা গো' বলে একটা আর্ত চিৎকার করে দুড়দাড় সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরে এসে বুক চেপে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

সে পারবে না। সে আর বেঁচে থাকতে পারবে না। সে মরে যাবে।

বালিশে মুখ চেপে সে পাগলের মতো কাঁদতে লাগল। পাপ! পাপ! নিশ্চয়ই পাপ? সে যে মরে যাবে।

ঘরে কেউ এল। মাথায় হাত রাখল।

দিদিমার গলা পাওয়া গেল, খুব লেগেছে তোর? দেখি কোথায় লাগল। কাঁদছিস কেন? কাঁদিস না। আমি ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি।

না। মাথা নাড়ল বনানী।

একটু বরফ লাগা ব্যথার জায়গায়। ফ্রিজ থেকে এনে দিচ্ছি।

লাগবে না দিদিমা। সেরে গেছে ব্যথা।

দিদিমা অর্থাৎ বনলতা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুই পালিয়ে আসছিলি কেন বল তো! ভয় পেয়েছিলি?

বনানী কী করে বলবে যে, হ্যাঁ ভয়, ভীষণ ভয়।

বনলতা একটু হেসে বললেন, মেয়েমানুষের ভয় থাকা ভাল। হড়াস করে যে দরজা খুলে দিসনি সেটা ভালই করেছিস। অলকের বদলে গুন্ডা বদমাশও হতে পারত তো।

বনলতা চলে গেলে একা ঘরে বনানী আক্রোশে পা দাপাতে দাপাতে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, গুন্ডাই তো! গুন্ডা! ডাকাত! কেন এল ও? কেন এল? আমার যে পাপ হচ্ছে! আমার যে ভীষণ পাপ হবে। আমি এখন কী করব? ছাদে উঠে ঝাঁপ দেব? ফিনাইল খাব? মুখে কালি মাখব?

বনানী কিছুই করল না। শুধু কাঁদল। উপুড় হয়ে। অনেকক্ষণ।

তারপর তড়বড় করে উঠে বসল হঠাৎ। ভীষণ অবাক হয়ে ভাবল, আচ্ছা, এই যে আমি ওরকমভাবে পড়ে গেলুম, ব্যথা পেলুম, কাঁদলুম, কই ও তো একবারও এল না আমাকে দেখতে। বাড়ির ঝি বলে কি এতটাই ফেলনা! একটা মানুষ তো! সে ব্যথা পেলে একটু দেখতে আসতে নেই বুঝি?

ভাবতে ভাবতেই আবার বুক ঢিবঢিবিয়ে উঠল তার। মাথা নেড়ে আপনমনে বলল, থাক বাবা। না এসে ভালই হয়েছে। ও এসে সামনে দাঁড়ালে আমার ঠিক হার্টফেল হবে।

শরীরের ব্যথা তেমন সত্যিই টের পাচ্ছিল না বনানী। অলক ঘণ্টা দুয়েক থেকে চলে গেল। বিকেল হল। সন্ধের মুখে বনানীর কনুই নীল হয়ে ফুলে উঠল। হাঁটু আর গোড়ালিতেও তাই। অসহ্য টাটানি।

সৌরীন্দ্রমোহন এলেন, বনলতা এলেন, এল সোনালিও।

বনানী কাতর স্বরে বলল, তোমরা যাও না! আমার কিছু হয়নি।

সোনালি কঠিন গলায় বলল, সেটা আমরা বুঝব। চুপ।

ডাক্তার শুভ্র দাস এসে বনানীকে দেখল। প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বলল, হ্যাঁ রে বনা, যে মেয়েটাকে বর্ধমানের গাঁ থেকে তুলে এনেছিলাম তুই ঠিক সেই মেয়েটাই তো? তোকে যত দেখি তত আমার অবিশ্বাস হয়। তোর বাবা যদি দেখে তো মূর্ছা যাবে।

সবাই আজকাল এরকম সব কথা বলে বনানীকে। বনানীর সুখ না দুঃখ হয় তা বলতে পারবে না সে। তবে ভারী অস্থির, উত্তেজিত বোধ করে সে।

রাত্রিবেলা ব্যথায় মলম মালিশ করতে এল সোনালি। আঁতকে উঠে বসল বনানী, তুমি কেন? মালিশ আমিই করতে পারব। দাও আমাকে।

সোনালি ধমক দিয়ে বলল, খুব হয়েছে। কনুই ফুলে ঢোল, ওই হাতে উনি মালিশ করবেন!

তা বলে ঝিয়ের পায়ে হাত দেবে? পাপ হবে না আমার?

ঝি! ঝি কোন দুঃখে হতে যাবি? তোকে আমি পুষ্যি নিয়েছি মনে মনে। আজ রাতে আমার সঙ্গে শুবি।

ও মাগো! পারব না। পায়ে পড়ি।

এই কমপ্লেক্স কেন তোর? তোকে তো আমরা ছোট ভাবি না, তবে তুই কেন ভেবে মরিস? রাত্রে ব্যথা বাড়লে কে দেখবে তোকে?

লজ্জায় মরে গেল বনানী। আর মনে মনে বলল, হে ভগবান, এই বাড়ি থেকে যেন আমাকে কখনও তাড়িয়ো না। এরা বড় ভাল।

তিন-চারদিন পর দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে বনানী চুল শুকোতে গেল ছাদে। রোদ্দুরে পিঠ আর চিলেকোঠার ছায়ায় মুখ রেখে কোলে বই নিয়ে বসে পড়া তার খুব প্রিয়। মাঝে মাঝে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশে হেমন্তের খণ্ড-মেঘ ভেসে ভেসে যায়, চিল ওড়ে, চিলেকোঠার ছাদে বসে কাক ডাকাডাকি করে। ভারী শান্তি পায় সে মনে।

বনানী হঠাৎ শুনতে পেল সিঁড়ি দিয়ে একজোড়া পায়ের শব্দ উঠে আসছে।

চকিত হল সে। বাড়িতে তারা সাকুল্যে তিনটি প্রাণী এই নির্জন দুপুরে। ছাদে তবে কে আসবে?

সতর্ক হওয়ার বা নিজেকে লুকিয়ে ফেলার সময় পেল না বনানী। হঠাৎ ছাদে এসে দাঁড়াল দীর্ঘ, ছিপছিপে সেই সাঁতারু। একদম মুখোমুখি। সোজা তার চোখে চোখ। ভয়ে বনানী উঠে দাঁড়িয়ে শিউরে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

বনানী নিশ্চল হয়ে গেল। কিন্তু ভিতরে সেই ঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাত। চোখ আঠাকাঠিতে আটকানো পাখির মতো লেগে আছে ছেলেটার চোখে।

হঠাৎ ছেলেটা আশ্চর্য এক প্রশ্ন করল, তুমি কে বলো তো?

বনানী জবাব দেওয়ার জন্য নয়, আর্তনাদ করার জন্য হাঁ করেছিল। কিন্তু কোনও শব্দ হল না। বুকে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে ভয়ংকর দোলায়। মাথার মধ্যে অদ্ভুত রেলগাড়ির ঝিক ঝিক শব্দ হচ্ছে।

ছেলেটা তাকিয়ে আছে। স্থির শূন্য একরকম পাগলাটে দৃষ্টি। ফের বলল, কে তুমি? কোত্থেকে এলে? কেন?

বনানীর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, আমি কেউ না। আমি নেই। আমি কখনও জন্মাইনি। আমাকে ছেড়ে দিন।

পারল না। গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না। ছাদের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে সে শুধু বোবা চোখে চেয়ে রইল ছেলেটার দিকে।

বললে না তুমি কে? কী চাও?

বনানীর বুকে কথার বুদবুদ ভেসে ওঠে, আমি! আমি কিছুই চাই না। শুধু দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, মাথার ওপর একটু ঢাকনা...

ছেলেটা এগিয়ে এল কাছে। বনানী উদ্‌ভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত, বোবা। তবু লক্ষ করল, ছেলেটার মাথা উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো লাল, মুখখানায় শুকনো ভাব।

ছেলেটা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, বলবে না?

বনানী বলল, অনেক কথা বলল সে। কিন্তু কোনও কথাই মুখে এল না। অনুচ্চারিত সেই সব কথা তার বুকে ঘুরতে লাগল অন্ধের মতো। সে বলল, বলছি তো, শুনতে পাচ্ছেন না কেন? আমার গায়ে ঘা ছিল, ন্যাড়া মাথা, রোগাও ছিলুম বড়, বিছানায় পেচ্ছাপ করতুম। চাঁপারহাটের চাটুজ্যেদের মেয়ে আমি। বাবা খুব ভালবাসত আমায়। তার কোলে চেপে বিয়েতে যাই। তারপর কী যে সব হল! বলছি, শুনতে পাচ্ছেন? ছেড়ে দিন, মরি বাঁচি আবার সেখানেই ফিরে যাব। পাপ কি সয় গো ধর্মে? এ বাড়িতে ঝিয়ের বেশি আর কিছু হতে চাইনি তো। পাপ করলে তাড়িয়ে দেবে। তবু পাপ তো হলই। বেশি চেয়ে ফেললুম যে মনে মনে। এবার চলে যাব। চলে যাব।

সেই বিশাল পুরুষ যখন আর এক পা এগোল তখন বনানীর চোখ ভরে টস টস করে নেমে এল জল। মা গো! আর সয় না তো! আর সয় না তো!

চকিতে মনে পড়ল পিছনে রেলিং, তার ওপাশে অবাধ তিন তলার শূন্যতা। একটু দুলিয়ে দিলেই হয় নিজেকে।

আর কী করার ছিল বনানীর? অবোধ, ভাষাহীন ভয়ে আপাদমস্তক অসাড় বনানী নিচু রেলিং-এর ওপর দিয়ে নিজেকে ঠেলে দিল পিছনের দিকে। মা গো!

সাত

পক প্রণালীতে একবার একজোড়া বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপ তার সঙ্গে অনেকক্ষণ সাঁতার কেটেছিল। অলক ভয় পায়নি। জলে তার কোনও কিছুকেই ভয় নেই। হাঙর, কুমির, কামট কাউকেই নয়। জলে যদি কোনওদিন তার মৃত্যু হয় তবে সে এক অনন্ত অবগাহনের আহ্লাদ বুকে নিয়ে যাবে।

আজ হেমন্তের এক কুয়াশামাখা সকালে একটি মৃতদেহের মতো চিত হয়ে জলে স্থির ভেসে ছিল অলক। আকাশের রং এখনও কুয়াশার সাদা আর আঁধারের কালোয় মাখা ছাইরঙা। আজ তার সেই সাপদুটোর কথা খুব মনে পড়ছিল। তার দু'পাশে চার-পাঁচ গজের মধ্যেই দুই যমজ ভাইয়ের মতো প্রকাণ্ড সেই সাপদুটো কিছুক্ষণ পাল্লা টেনেছিল। সামনে গার্ডের নৌকোয় প্রস্তুত ছিল রাইফেল, হারপুন, শার্ক রিপেলন্ট, আরও সব অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু অলক গার্ডদের ডাকেনি। সাপদুটোকে পাল্লা টানতে দিয়েছিল তার সঙ্গে। ওই সাবলীল গতি, জলের সঙ্গে ওই মিশে থাকা একাত্মতা দুটো সাপের কাছ থেকে শিখে নিচ্ছিল সে। যেমনটা সে বার বার শিখেছে মাছ ও কুমির, হাঙর বা কামটের কাছেও।

ভয় হল, যখন জল থেকে ডাঙায় উঠল, তখন। অত কাছাকাছি কিছুক্ষণ দুটো মারাত্মক বিষধর সাপ তার সঙ্গে সাঁতার দিয়েছে সে কথা ভেবে গা শিউরে উঠেছিল তার। জলে অলক অন্যরকম। জলের অলক আর ডাঙার অলক যেন দুটো মানুষ।

আজ হেমন্তের সকালে চিত হয়ে স্থির হয়ে জলে ভেসে আকাশের দিকে চেয়ে অলক দু'রকম নিজের কথা ভাবল। ভাবল দুটো সাপের কথা। তারপর ভাবনা মুছে গেল মাথা থেকে।

মাঝে মাঝে তার সব ঘুমিয়ে পড়ে। মাথা ঘুমোয়, মন ঘুমোয়, দৃষ্টিশক্তি ঘুমোয়।

মা গো!

একটা অদ্ভুত করুণ টানা বাঁশির স্বরের আর্তনাদ শুনে ঘুম ভাঙল অলকের। সে সচকিত হতে গিয়েও হেসে ফেলল।

মেয়েটা কি পাগল? রেলিং-এর ওপর যেন ভেজা কাপড়ের মতো নেতিয়ে পড়ল। তারপর... মা গো-ও-ও...! সেই আর্তনাদ কখনও ভুলবে না অলক।

আলো ফুটেছে। অলক ধীরে ধীরে পাড়ে এসে উঠল।

ক্লাবের বারান্দায় আজও বসে আছে সুছন্দা। প্রায়ই থাকে।

অলক গা মুছে পোশাক পরে এসে মুখোমুখি বসল।

সুছন্দা আজও চোখের দিকে তাকাতে পারে না তার। টেবিলে আঁকিবুকি কাটে আঙুল দিয়ে।

অলক!

বলো।

কী ঠিক করলে?

কিছু না।

আমাকে আর কত নির্লজ্জ হতে বলবে তুমি? বিয়ের পর আমি তোমার সঙ্গে যে-কোনও জায়গায় চলে যেতে রাজি আছি। কথা দিচ্ছি কখনও আর সিনেমায় নামব না। সব ছাড়ব, সব ভুলে যাব।

ডাঙা। ডাঙায় উঠলেই যত জটিলতা, যত কিছু যন্ত্রণা। অলক চুপচাপ বসে রইল সুছন্দার দিকে স্থির চোখে চেয়ে।

সুছন্দার চোখ দিয়ে আজও টস টস করে জল পড়ছিল। মাথা নিচু করে সে বলল, যা হয়ে গেছে তা কি খুব সাংঘাতিক কিছু অলক? ওরকম তো কতই হয়। তোমারও কি হয়নি কোনও মেয়ের সঙ্গে? ভেবে দেখো। সে মেয়ে কি তবে নষ্ট হয়ে গেছে?

অলক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

কিছু বলবে না? ভিতরে ভিতরে আমি যে শেষ হয়ে আসছি। এই টেনশন কতদিন সইতে পারব আমি?

স্কুটারে তার পিছনে বসে সুছন্দা খুব নিবিড় করে বেষ্টন করল তাকে।

অলক! প্লিজ, অলক!

বাতাসে আর স্কুটারের শব্দে কথাগুলো উড়ে গেল। অলক শুনল না। বা শুনলেও গা করল না।...

সত্যকাম আজকাল সকালের দিকেই যা খানিকক্ষণ বাড়িতে থাকে। তারপর বোধহয় বেরিয়ে যায়। রাত্রে মাতাল হয়ে ফেরে, ফিরে আরও মাতাল হয়। সকালে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ মনীষার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। সে ঝগড়া এমনই বে-আব্রু, এমনই নির্লজ্জ যে মনে হয় দু'জনেই একটা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

আর এগোনোর রাস্তা নেই তাদের। একটা নিরেট দেয়ালে ঠেকে গিয়ে তারা অক্ষম মাথা কুটে মরে।

সুছন্দাকে পৌঁছে যখন বাড়ি ফিরল অলক তখন মনীষা আর সত্যকাম রোজকার মতোই ঝগড়া করছে। চেঁচিয়ে নয়, তবে বেশ উঁচু গলায়। সত্যকাম ডিমের পোচ টোস্টে বিছিয়ে নিয়ে খেতে খেতে এবং মনীষা চা করতে করতে।

সত্যকাম বলছে, কেন? তোমার ছেলে সুছন্দাকে বিয়ে করবে না কেন? শি ইজ কোয়াইট অলরাইট। বিউটিফুল, কোয়ায়েট, কোয়ালিফায়েড। এর চেয়ে বেশি কী আশা করো তুমি?

কোন মুখে বলছ ওসব কথা? তোমার লজ্জা করে না? ওই প্রসটার সঙ্গে অলকের বিয়ে দেব আমি? তুমি ভেবেছটা কী?

ওসব আনডিগনিফায়েড টার্ম ব্যবহার করছ, তোমারই লজ্জা করা উচিত। আজকাল ক'টা মেয়ে ইনোসেন্ট আছে বলতে পারো? আর ইউ ইওরসেলফ্ ইনোসেন্ট? তোমার দুটো মেয়ের একটাও কি বিয়ের আগে ইনোসেন্ট ছিল? আর তোমার ওই গাছের মতো আকাট ছেলে, তার খবরই বা তুমি কতটুকু রাখো? ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে, বুঝলে?

ইনোসেন্ট নয় সে এক কথা, কিন্তু সুছন্দা ইজ ইনভলভড উইথ ইউ। ইভন ইউ স্লিপ উইথ হার।

ঝগড়ার সময় অশ্লীল ইঙ্গিতগুলি দু'জনেই ইংরিজি ভাষায় করে। এটা রোজই লক্ষ করছে অলক।

সত্যকাম গলা তুলে বলল, নেভার। কোন শালা ওকথা বলে? আই ট্রিট হার অ্যাজ মাই... মাই...

থাক, আর সাধু সেজো না। কিছুই আমার অজানা নেই।

সত্যকাম ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, আর চতুরলালের সঙ্গে ঝুমুরের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অত চুলকুনি কেন তোমার সে কি আমি জানি না ভেবেছ? ঝুমুরের চেয়ে ও বিশ বছরের বড়। বাট ইউ জাম্পড অ্যাট দা প্রোপোজাল। চতুরের গাড়িতে করে তুমি কোথায় কোথায় যেতে তার একখানা লগবুক আমার আছে। বেশি সাধ্বী সেজো না।

মনীষার ফোঁপানির শব্দ ওঠে, প্রতিবাদের নয়।

এই সকালে দুটো বিষধর সাপ পরস্পরের ওপর তাদের সমস্ত বিষ উজাড় করে নিঃস্ব হয়। সারা দিন ধরে আবার জমিয়ে তোলে বিষ, আবার ওগড়াবে বলে। একই পদ্ধতি।

অলক টের পায়, ওদের আর এগোবার রাস্তা নেই। দেযালে ঠেকে গেছে।

হেঁচকি-তোলা ধরা গলায় মনীষা বলে, এত মেয়ে থাকতে সুছন্দাকেই কেন অলকের বউ করতে চাও?

আই অ্যাম গোয়িং টু মেক হার এ বিগ স্টার। কিন্তু মেয়েটা বড্ড বেশি চঞ্চল। এর-ওর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আজেবাজে প্রোডিউসারের পাল্লায় পড়ে যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওর কেরিয়ার। অথচ শি ইজ ভেরি প্রমিজিং। একটা জায়গায় স্থির না হলে ওর কেরিয়ার তৈরি হবে না। তোমার ওই হাঁ-করা বোকা ছেলেটাকে বোধহয় ও ভালবাসে। বিয়ে হলে আমার দু'দিকেই সুবিধে। ওকে তৈরি করতে পারব, তোমার ছেলেরও হিল্লে হবে। ইট ইজ নট এ ব্যাড প্রোপোজাল।

অবশেষে মনীষা চুপ করে। সত্যকাম চা খায় এবং হাসিমুখে বেরিয়ে যায়। সে জিতে গেছে।

আজ বহুকাল বাদে পক প্রণালীর সেই দুটো প্রকাণ্ড সাপের কথা ভেবে অলক শিউরে ওঠে ভয়ে। গা ঘেঁষে দু'দিকে তার সমান্তরাল সাঁতরে চলেছে দুটো ভয়ংকর বিষধর।

তিন দিন বাদে মনীষা একদিন চড়াও হয় অলকের ওপর, তুই ভেবেছিসটা কী?

কী ভাবব?

তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তা জানিস?

না।

সুছন্দার সঙ্গে।

কথাটা বলে কিছুক্ষণ অপলক চোখে চেয়ে ছেলের মুখে একটা প্রতিক্রিয়া খুঁজল। সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখ, শূন্য ও অকপট চোখ, সুখ দুঃখ কিছুই খেলা করে না ওর মুখে। ওর বাবা বলে, গাছ। তাই হবে। আগের জন্মে বোধহয় গাছই ছিল।

একা একা ফিরে গিয়ে মনীষা একা একা কাঁদতে বসে। সে জানে, সত্যকাম কী চায়। বোকা নির্বোধ ছেলেটা টেরও পাবে না তার আড়ালে ওই শয়তান সত্যকাম আর শয়তানি সুছন্দা কী লীলা করে যাবে। যে-কোনও ছুতোয় ঘরে ওই অলক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সত্যকাম। মনীষা শুনেছে, সুছন্দাও অলকের পিছু পিছু ঘুরঘুর করে। মনীষা কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না ঘটনাটা। ঘটে যাবে। যদি তার নিজের নৈতিক জোর থাকত তা হলে পারত আটকাতে। চতুরলালের ঘটনাটা তো আর মিথ্যে নয়। মস্ত ইমপ্রেসারিও। মনীষাকে সে-ই ইনডোর স্টেডিয়ামের বিশাল ফাংশনে চান্স করে দিয়েছিল। লতা, আশার মতো গায়িকাদের সঙ্গে এক সারিতে তো বসতে পেরেছিল সে। তার জন্য একটু দাম দিতে হবে না? সত্যি বটে, ঝুমুরের সঙ্গে লটকে না পড়লেও পারত চতুর। কিন্তু পড়লেই বা দোষটা কী এমন হয়েছে? চতুরের কত কানেকশন, কত বড় বড় ফাংশন অর্গানাইজ করে। ঝুমুরটাকে ঠিক তুলে দেবে ওপরে।

সেই একটুকু অপরাধের এই শাস্তি। এই প্রায়শ্চিত্ত।

একা একা মনীষা অনেক কাঁদল। এই যে বহু-ব্যবহৃত শরীর, যৌবন যায়-যায়, এর কি তেমন কোনও আলাদা শুদ্ধতা আছে? ক'দিন আর? দশ-বিশ বা পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর একদিন ধুকধুকুনি থামবে। কিছু লোক কাঁধে নিয়ে গিয়ে কেওড়াতলায় জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে। কী দাম এর?

ডাঙায় বড় ক্লান্তি বেড়ে যায় অলকের। আজকাল তার কেবলই মনে হয়, এক অনন্ত জলাশয় তার দরকার। দরকার নিরেট নির্জনতা। ফোম রবারের চেয়েও নরম ঠান্ডা জলে অন্তহীন এক সাঁতার। একদিন ধীরে ধীরে ক্লান্ত অলককে জলই মিশিয়ে নেবে নিজের বুকে। জলে মিশে যাওয়া ছাড়া আর কী করার আছে তার? সে নিজেই এক শান্ত জলাশয়ের মতো নিস্তরঙ্গ, শীতল। সে রাগে না, উত্তেজিত হয় না।

না, হয়েছিল। জীবনে মাত্র একবার। বোধহয় মাত্র ওই একবারই। দাদুর বাড়ির ছাদে সেদিন

আচমকা উঠে গিয়ে মেয়েটাকে মুখোমুখি পেয়ে যায় সে। কেন যে সেদিন তার ওই রাক্ষুসে রাগ ঝড় তুলল বুকে!

দোষ নেই অলকের। ওকে যে বহুবার দেখেছে অলক জলে ভেসে থাকতে। ভোরের সুন্দরবনে, গোপালপুরের সমুদ্রে, শেষ রাতে লেক-এর কুয়াশামাখা নীল জলে। জলকন্যা কেন উঠে আসবে ডাঙায়? কেন সে পরের উচ্ছিষ্ট খাবে? কেন হবে পরান্নভোজী? কেন সে চুল শুকোবে রোদে বসে? এইসব প্রশ্নই সে করতে চেয়েছিল। জানতে চেয়েছিল, তুমি কে? তুমি আসলে কে?

মেয়েটা কেন যে অমন ভয় পেয়ে গেল! বুঝতেই পারল না অলক কী বলতে চায়। এক বোবা ভয়ে রেলিং টপকে...

সেই ঘটনার বহুদিন বাদে আজ দাদুর বাড়িতে এল অলক।

প্রথমে টের পেল ঠাকুমা। ঠাকুমাই তাকে বরাবর সবচেয়ে ভাল টের পায়। বনলতা বললেন, অত রোগা হয়ে গেছিস কেন? চোখের কোল বসে গেছে! রাতে ঘুম হয়?

অলক হাসল। তারপর বলল, এবার এক লম্বা সাঁতারে যাচ্ছি, বুঝলে?

কত লম্বা? ক'মাইল?

ঠিক নেই।

তার মানে?

এখনও ঠিক হয়নি কিছু। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা সাঁতার।

পারবি? দরকার নেই।

দেখা যাক না। মানুষ তো সব পারে।

বেলা এগারোটার রোদে বারান্দায় বসে সৌরীন্দ্রমোহন কোলে প্যাড আর স্কেচ- পেনসিল নিয়ে বসেছিলেন। সামান্য রেখায় একটি-দু'টি ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন আনমনে।

অলককে দেখে বললেন, বোস তো ওই মোড়াটায়। তোর একটা স্কেচ করি।

একটু সময় নিলেন সৌরীন্দ্রমোহন। কিন্তু ফুটিয়ে তুললেন অসাধারণ। অলকের শূন্য চোখ, শীর্ণ হয়ে আসা মুখ, চোখের নীচে বসা—সব এল ছবিতে।

মাথা নেড়ে সৌরীন্দ্রমোহন বললেন, না, তোর চেহারাটা ঠিক এরকম নয়।

অলক হাত বাড়িয়ে প্যাডটা নিয়ে দেখল। বলল, এরকমই। এই তো আমার হুবহু মুখ।

একটা সিকনেস ফুটে উঠেছে না ছবিতে? তুই তো হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিট।

ছবিটায় কোনও ভুল নেই, দাদু।

সৌরীন্দ্রমোহন তবু সন্দিগ্ধভাবে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অলকের মুখটা ফের দেখলেন ভাল করে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, স্টিল সামথিং ইজ রং। ভেরি মাচ রং। একটা কিসের যেন ছায়া পড়েছে তোর মুখে। এরকম তো নয় তোর মুখ! এবকম তো হওয়ার কথা নয়!

সংশয়টা বাড়তে দিল না অলক। উঠে এল বারান্দা থেকে।

সিঁড়ির দিকে মুখ করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেয়েটা দাঁড়ানো। মুখে সেই বোবা ভাব, চোখ-ভরা ভয়। আজ পালাল না। চেয়ে রইল। অলক নিজে প্রায় বোবা। এ মেয়েটা কি তার চেয়েও বোবা?

কে জানে কেন মেয়েটার সঙ্গে আজ একটু খুনসুটি করতে ইচ্ছে হল অলকের। এমন ইচ্ছে তার কোনওদিন হয়নি। ইচ্ছেটা হল বলে ভারী অবাকও হল অলক। একটু হাসল সে।

কী খুকি, আজ যে বড় পড়লে না? আমি এলেই তো তুমি হয় সিঁড়ি থেকে, না হয় ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। আজ কী হল?

মেয়েটা জবাব দিল না। মুখটা সামান্য ফাঁক, ঘন শ্বাস পড়ছে, চোখদুটো স্থির, অপলক।

আবার একটু হাসল অলক। বড় সুন্দর মেয়েটা। জলকন্যা বলে মনে হয়েছিল অলকের। সেই দুপুরে যখন ছাদ থেকে রেলিং টপকে পড়ে যাচ্ছিল তখনই বিভ্রম ভেঙে অলক বিদ্যুতের গতিতে

গিয়ে ওকে প্রায় শূন্য থেকে চয়ন করে আনে। আর ভুল করবে না অলক।

সে স্মিত মুখে বলল, ভয় নেই। আমাকে ভয় পেয়ো না। যাচ্ছি।

মেয়েটা জবাব দিল না।

কিট ব্যাগ কাঁধে অলক ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। শেষ ধাপে পা রাখল।

হঠাৎ ওপর থেকে প্রশ্ন এল, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

অলক মুখ তুলল। মেয়েটা সিঁড়ির রেলিং-এ ঝুঁকে চেয়ে আছে তার দিকে।

যাচ্ছি কোথাও। কেন?

তুমি আর আসবে না?

অলক অবাক হল। মেয়েটা কি কিছু টের পেয়েছে? পাওয়ার কথাই তো নয়। সৌরীন্দ্রমোহন হয়তো পেয়েছিলেন। আর্টিস্টের চোখ তো। কিন্তু স্পষ্ট করে ধরতে পারেননি। এ মেয়েটা কি পেল?

না, সেটা সম্ভব নয়। তাই মেয়েটার দিকে চেয়ে অলকের হঠাৎ সত্যি কথাটাই বলতে ইচ্ছে হল। বললে ক্ষতি কী?

না, আর আসব না।

মেয়েটা অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল। মুখটা সরে গেল আড়ালে।

অলক ভীষণ অবাক হল। আর্তনাদ করল কেন? অলক আসবে না, তাতে ওর ক্ষতি কী?

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে থেকে অলক সদরের দিকে এগোয়।

একটু দাঁড়াও।

সবিস্ময়ে ফিরে তাকায় অলক।

মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে।

কৌতুকের হাসি মুখে নিয়ে অলক বলল, কী চাও?

প্রায় দৌড়ে নেমে এসেছে বলে মেয়েটা হাঁফাচ্ছে। বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছো? জলে? আমাকে সঙ্গে নেবে? নাও না!

অলক হাঁ করে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে, আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?

জলে। আমিও তো মরতেই চাই। অনেক পাপ হল যে!

মরবে! মরবে কেন?

আমার তো মরতেই জন্ম।

কে বলল ও কথা?

আমি জানি। আমার বাবাও বলত, তুই তো মরতেই জন্মেছিস।

অলক খানিকক্ষণ বিস্ময়ে চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আমি আর আসব না এ কথা তোমাকে কে বলল?

জানি যে। তোমার চোখ দেখে, মুখ দেখে টের পাইনি বুঝি?

তোমার পাপ হয়েছিল? কিসের পাপ?

ভীষণ পাপ। তোমার দিকে তাকাতুম যে! পিনি বারণ করেছিল।

অলক এত হেসে উঠল যেমনটি সে জীবনেও হাসেনি। তারপর সামলে গিয়ে বলল, মরার খুব জরুরি দরকার বুঝি?

মেয়েটা অলকের মুখের দিকে তেমনি ডাগর দুই চোখে নিষ্কম্প তাকিয়ে ছিল। বলল, শুধু বেঁচে থাকতেই যে কত কষ্ট। তুমি তো জানো না, দুটো ভাত, মাথার ওপর একটু চালা, এটুকুও জোটে না যে কিছুতেই। এর বাড়ি থেকে তাড়ায়, ওর বাড়ি থেকে তাড়ায়। কবেই মরতুম গলায় দড়ি দিয়ে।

তা সেটা করোনি কেন?

একদিন স্টেশনে বটকেষ্টকে দেখলুম যে। চোখ নেই, নাক নেই, হাত নেই, পা নেই, শুধু মুখ আর নাকের জায়গায় দুটো ফুটো। ও কি মানুষ? একটা মাংসের ঢেলা। তবু বেঁচে আছে তো? ভয় হল, বাঁচা কত শক্ত। শুধু বেঁচে থাকাই কত শক্ত। ইচ্ছে যায় না বলো বেঁচে থাকতে? বটকেষ্টরও যদি ইচ্ছে যায় তো আমার দোষ কী?

তবে মরতে চাও কেন?

তুমি যে আর আসবে না। তুমি না এলে কী হবে জানো?

কী হবে?

আবার রোগা ল্যাকপ্যাকে হয়ে যাব আমি। শরীরে ঘা বেরোবে। কত কী হবে। তুমি এলে বলেই তো আমি সেরে গেলুম।

অলক এ যেন এক রূপকথার গল্প শুনছে। এরকম কেউ তাকে কখনও বলেনি তো! অলকের চোখ জ্বলতে লাগল। শ্বাস গাঢ় হল।

মেয়েটার চোখে স্বপ্নাতুর এক বিভোর দৃষ্টি। সম্মোহিতের মতো। প্রগাঢ় এক স্বরে বলল, তাই ভাবলুম, ও তো চলে যাচ্ছে। এবার তো আমি মরবই। তা হলে ওর সঙ্গে যাই না কেন?

বুক মথিত করে একটা শ্বাস বেবিয়ে এল অলকের। দীর্ঘ এক সাঁতার অপেক্ষা করছে তার জন্য। অপেক্ষা করছে নদী, মোহনা, সমুদ্র। তারপর জলই টেনে নেবে তাকে. জলে মিশে যাবে সে, যেমন চিনি মিশে যায়। তবে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে জল। সে মেয়েটার দিকে চেয়ে আরও কিছু আবিষ্কার করে নিচ্ছিল।

খুব কষ্ট পেয়েছ তুমি?

মেয়েটা একটু হাসল, কী যে কষ্ট! তবু কী জানো? শুধু বেঁচে থাকাটাও কিন্তু ভীষণ ভাল। শুধু যদি বেঁচে থাকা যায় তাহলেও কত কী হয়! মরব মরব করেও আমার যে বেঁচে থাকতে কী ভালই লেগেছে ক'টা দিন। উফ, কোনওরকমে বেঁচেছিলুম বলেই না একদিন হঠাৎ তোমার দেখা পেলুম। কত কী হয়ে গেল! তুমি ঠিক যেন ভগবান।

অলক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ভারী অন্যমনস্ক, চিন্তিত।

যাবে না?

ভারতবিখ্যাত সাঁতারু আজ জীবনে প্রথম অনুভব করল, ডাঙায় যেন প্লাবনের মতো জলের ঢল নেমে এসেছে। ফোম রবারের চেয়েও নরম, সফেন, ঠান্ডা জল তাকে আকণ্ঠ ঘিরে ধরল আজ।

বনানী বলল, যাবে না?

সাঁতারু ডাঙার প্লাবনে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃদু হেসে বলল, যেতে দিলে কই?

মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক

এক: আহাম্মকের জন্মবৃত্তান্ত ও পরমাণু বোমার প্রভাব

এ এক আহাম্মকের জীবনচরিত।

জন্মমাত্রই আহাম্মকটা বুঝতে পেরেছিল, জীবনটা খুব সুখের হবে না। কারণ সে যখন গেঁয়ো এক আঁতুড়ঘরের মাটির মেঝেয় চাটাইয়ের ওপর চিত হয়ে পড়ে থেকে তারস্বরে নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করছিল তখন তার মাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় চলছিল উঠোনে তুলসীতলায়। তার বাউন্ডুলে বাপ তখন গাঁ থেকে অনেক দূরে এক জলসায় বাঁশিতে বেহাগ বাজাচ্ছে। আর আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরও ঘুটঘুট্টি করে এক মিশকালো মেঘ তৈরি হচ্ছিল সৃষ্টি ভাসিয়ে নিতে।

তার জন্মলগ্ন কেমন ছিল তা কে বলবে? তার জন্মপত্রিকায় গ্রহসংস্থান নিয়ে কেউই তখন বা পরবর্তীকালে মাথা ঘামায়নি। তবে গ্রহানুকূল্য কিছু নিশ্চিত ছিল তার। নইলে বিক্রমপুরের সুখ্যাত বজ্রযোগিনী গ্রামের বিশ্রুত মল্লিক পরিবারের ছোট তরফ জয়ধ্বজের কনিষ্ঠ পুত্রের দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করার স্পর্ধা তার কিছুতেই হত না।

বজ্রযোগিনী বিখ্যাত গ্রাম। অতীশ দীপঙ্কর এই গ্রামেরই লোক বলে কথিত আছে। তবে বিক্রমপুর ধনী জমিদারদের চারণভূমি নয়। অতিশয় বানভাসি দেশ বলে সেখানে কৃষিকর্মের ওপর মানুষের নির্ভরতা ছিল না। বর্ষা ঋতুতে এবং পরবর্তী কয়েক মাসেও লোকজনের নৌকো ছাড়া দ্বিতীয় পরিবহণ ছিল অগোচর। ফলে বিক্রমপুরের লোককে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে এবং রুজি-রোজগারের জন্য প্রবাসবাসও ছিল তাদের অনিবার্য।

ছোটতরফ জয়ধ্বজ মল্লিক স্বদেশিয়ানায় দীক্ষা নেওয়ার দরুন চাকরিকে বিষ্ঠাতুল্য মনে করতেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে গিয়ে ভুসিমালের ব্যাবসা করতে থাকেন এবং মোটামুটি ধনী বলে খ্যাতি লাভ করেন। ধন উপার্জন এক কথা আর ধনের সদ্ব্যবহার আর-এক কথা। দ্বিতীয় বিষয়ে জয়ধ্বজ খুব বিচক্ষণ ছিলেন না। তাঁর আর্জিত ধন তাঁরই তিন পুত্রের অধঃপাতে যাওয়ার রাস্তাটিকে আরও অবারিত করে দিচ্ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বর এমনিতে ভাল মানুষ এবং কিছুটা গোঁয়ার হলেও তাঁর এক কিম্ভূত বাতিক ছিল। তা হল হিপনোটিজম শিক্ষা। এর জন্য তিনি বহু ম্যাজিসিয়ান, তান্ত্রিক ও সাধুর কাছে তালিম নেন এবং তাদের মোটারকম দক্ষিণা দেন। হিপনোটিজম শিখতে তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা সর্বত্র ভ্রমণ করে বেড়াতেন। শেষ অবধি বিলেত পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কতদূর শিখেছিলেন বলা মুশকিল। তবে বাপের তবিলে একটা বড় রকম খাবলা তাঁর দিক থেকেই এসেছিল। দ্বিতীয় সর্বেশ্বর ছিলেন ধুরন্ধর প্রকৃতির। মেজো ছেলেরা ধুরন্ধর হয় বলে একটা কিংবদন্তিও আছে। বিক্রমপুরে 'মাঝলা শয়তান' বলে একটা কথা প্রচলিতই ছিল। সর্বেশ্বর তার বাপের কারবার দেখত এবং যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করত। তৃতীয় বিশ্বেশ্বর অন্য কোনও গুণের আধার না হলেও সংগীত ও বিশেষ করে বাঁশি বাজিয়ে সে আমলেই খুব সুনাম পেয়েছিল। জয়ধ্বজের তিনটি পুত্রই শিক্ষিত। বাপের সঙ্গে তাদের বয়সের পার্থক্যও খুব বেশি ছিল না। জয়ধ্বজের বয়স যখন পঞ্চাশ তখন সিদ্ধেশ্বরের একত্রিশ, সর্বেশ্বরের ত্রিশ ও বিশ্বেশ্বরের উনত্রিশ। তিনজনেই বয়স্ক,

দু'জন বিবাহিত, মেজোজন সন্তান-সন্ততিসম্পন্ন এবং সে ছাড়া অন্য দু'জনেই উপার্জন বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা ও উদ্যোগহীন।

আমাদের আহাম্মকটির জন্মপত্রিকা কখনও তৈরি হয়নি। সুতরাং তার গ্রহানুকূল্য বা গ্রহের বৈগুণ্য সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানার উপায় নেই। তার জন্মের কিছুক্ষণ পরেই এক প্রবল বৃষ্টিতে গোটা পরগণা এমনভাবে জলের তলায় চলে গেল যে মাস দুই আর ডাঙা দেখাই গেল না। তার মায়ের দাহকার্য সেদিন তিন-চারবার ব্যাহত হয়। কিন্তু এখানেই অশুভ লক্ষণের শেষ নয়।

এখন জন্মদিনটির কথাই বলা যাক। শোক-সন্তপ্ত পরিবার যখন আহাম্মকের মৃগীরোগী পিসিকে নবজাতকের পাহারায় রেখে নানারকমভাবে বিলাপ করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে শিশুটিকে শেয়ালে নিয়ে যেতে পারত, হুলো বেড়াল এসে তার গলার নলি কেটে দিয়ে যেতে পারত, ধেড়ে ইঁদুর এসে টুকে দিতে পারত হাত-পা বা চোখ। তার চেয়েও বিপদের কথা, নিচু ভিতের সেই আঁতুড়ঘরে বৃষ্টির তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়তে পারত গোক্ষুর বা কেউটে। তার চেয়েও বেশি অমোঘ ছিল যা, তা হল বৃষ্টির জল ঢুকে পড়তে পারত ঘরে।

বস্তুত শেষোক্ত বিপদটিই ঘটেছিল আহাম্মকের। মৃগীরোগী পিসি একা একটেরে ঘরে নবজাতককে পাহারা দেওয়ার সময় তার সদ্যমৃতা মায়ের প্রেতকে দেখতে পেয়ে মূর্ছা যায়। সেইসময় প্রবল বৃষ্টিতে চারদিক ভাসাভাসি, সেই বৃষ্টির জল কয়েক লহমায় ফুলে ফেঁপে উঠে আঁতুড়ঘরের ভিত ধরে ফেলল। তারপর ছাপিয়ে গেল।

আহাম্মকটিকে যখন তোলা হল চ্যাটাই থেকে তখন তার অর্ধেক শরীর ভেজা, শীতে কাঁপছিল থরথর করে, ঠোঁটদুটো নীল এবং গলার স্বর নিস্তেজ।

পিসিকে সকলে দোষারোপ করছিল বটে, কিন্তু পিসিকে দোষ দেওয়া যায় না। আহাম্মকের এই পিসিটি স্বামী-পরিত্যক্তা। সে আমলে এরকম ঘটনা হামেশা ঘটত, স্বামী ঘরে না নেওয়ায় দুঃখে-দুঃখে জর্জরিত পিসির মৃগীরোগ দেখা দিয়েছিল। উপরন্তু আঁতুড়ঘরে ভূত দেখার ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ এর পরেও আহাম্মকের মৃতা মায়ের প্রেত সে-বাড়ির বহুজন দেখেছে।

মল্লিকবাড়ি বিশাল এবং বহুভাগে বিভক্ত। শরিকদের অনেকেই ভিন্ন হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন, তবু যাঁরা ছিলেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখনই মল্লিকবাড়িতে কম করেও দশটি পরিবার। ছোট তরফ জয়ধ্বজ নারায়ণগঞ্জে রীতিমতো বড় বাড়ি করেছেন। তাঁর কারবারও সেখানে। তবু দেশের বাড়ির মায়া তাঁর এমনই গভীর ছিল যে, নিজের পরিবারকে তিনি নারায়ণগঞ্জে স্থানান্তরিত করেননি।

আহাম্মকটি সেই বিশাল বাড়িতে কিছু অনাদরেই পালিত হতে লাগল। জন্মলগ্নে মাতৃহারা হলে যে-কোনও শিশুরই কিছু অযত্ন অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু জয়ধ্বজের স্ত্রী চিররুগ্না হওয়ায় শিশুটির দিকে নজর দেওয়ার তেমন কেউই ছিল না। মৃগীরোগী পিসি শিশুটি সম্পর্কে একটু ভীত হয়ে পড়েছিল। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে এই শিশুটির ওপর ভূতের ভর রয়েছে। না হলে সদ্যোজাত শিশু কি অত জোরে চেঁচায়? না কি অত বড় বড় করে তাকায়? না কি অত দুধ একবারে খেতে পারে? না কি অত মোটাসোটা এবং বড়সড় হয়?

এ ব্যাপারে পিসির সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা একমত নই, আহাম্মকটি ভূতে-পাওয়া নয়, এমন কথা আমরা বলছি না। কিন্তু শিশুটির কান্নার যে জোরালো শব্দটি শোনা যেত তার কারণ তার অপরিসীম ক্ষুধা। তাকে নিয়মিত দুধ খাওয়ানোর জন্য কেউ তো মোতায়েন ছিল না। জয়ধ্বজের স্ত্রী, অর্থাৎ শিশুটির ঠাকুমা, বিছানায় শুয়ে শুয়েই শিশুটির দিকে তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব, নজর রাখতেন। তিনিই বাড়ির কোনও দাসী বা শরিকদের কারও বউকে ডেকে শিশুটিকে খাওয়ানোর কথা বললে এবং উদ্দিষ্ট মহিলা বা দাসীর হাতে সময় থাকলে এবং দুধের জোগাড় ও দুধ গরম করার মতো

ইন্ধন পাওয়া গেলে শিশুটির কপালে খাওয়া জুটত। বলাই বাহুল্য, সেটা যথেষ্ট ছিল না, মাতৃস্তন্যের পিপাসা তার থেকেই যেত। সে তারস্বরে এই সংবাদটিই পৃথিবীর কাছে নিবেদন করতে চাইত মাত্র। আর এ কথা কে না জানে যে, ক্ষুধার চিৎকারই পৃথিবীতে সবচেয়ে জোরালো? বড় বড় যে চোখের অভিযোগ উঠেছে তা তার মায়ের সূত্রে পাওয়া। ভদ্রমহিলার চোখদু'টি ছিল বাস্তবিকই বিশাল। ছেলেটি যে মোটাসোটা ছিল তা কিন্তু মোটেই নয়। তবে অন্যান্য শিশুর তুলনায় তার কাঠামোটি বড় ছিল মাত্র।

শিশুটির মায়ের শ্রাদ্ধ মিটে যাওয়ার তিন দিন পর শিশুর বাপ ফিরে এলেন এবং মোটামুটি নিস্পৃহভাবে স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনলেন এবং আরও নিস্পৃহভাবে পুত্রমুখ দর্শন করলেন। লোকটির মধ্যে দার্শনিকতা ছিল জন্মগত। সব দেখেশুনে একবার শুধু স্বগতোক্তি করলেন, একজন গেছে, আর-একজন এসেছে। লাভে লোকসানে মাথায় মাথায়।

স্ত্রী-বিয়োগে লোকটির দুঃখিত না হওয়ার কারণ বোঝা দুঃসাধ্য নয়। স্ত্রী ছিলেন অসম্ভব কোপন-স্বভাব ও ঝগড়ুটে। লোকটার জীবনে শান্তি ছিল না। তবে পুত্রমুখ দর্শনে তাঁর আরও একটু খুশি হওয়া উচিত ছিল। কারণ বিয়ের সাত বছরে তাঁর কোনও সন্তান হয়নি। এইটিই তাঁর একমাত্র সন্তান। তাও মেয়ে নয়, ছেলে। লায়াবিলিটি নয়, অ্যাসেট। আসলে বিশ্বেশ্বর ছিলেন শিল্পী মানুষ। সাংসারিক বন্ধন তাঁর কাছে বাধাস্বরূপ ছিল। তাই পুত্র তাঁকে তেমন মায়ায় ফেলতে পারেনি। জন্মমাত্র মাকে হারিয়ে, আকস্মিক জলে ডুবে যেতে যেতে দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে এবং ক্ষুধার্ত চিৎকারে পাড়া কাঁপিয়ে দিয়েও পারেনি। তিনি বাঁশি ও কণ্ঠসংগীত দুইয়েতেই পারদর্শী ছিলেন। পুত্রমুখ দর্শনের সাতদিনের মধ্যে ঢাকা রেডিয়োতে গান গাইতে চলে যান। শিশুটি একরকম পরের দয়াতেই পড়ে রইল। তার দুই জ্যাঠার মধ্যে বড়জন বিয়ে করেননি। মেজোজন বিয়ে করে নারায়ণগঞ্জেই সংসার পেতেছিলেন, কারণ সেখানে রান্নাবান্না ও ঘরকন্নার জন্য লোক দরকার ছিল। শিশুটির ভাগ্য সেদিক দিয়েও বিড়ম্বিত বলা যায়।

বেওয়ারিশ এই শিশুটি বাড়ির অন্যান্য বালক-বালিকার খেলার পুতুলের মতো হয়ে উঠেছিল। তারা তাকে গাল টিপে, পেটে চিমটি কেটে, নাক-মুখ চেপে ধরে, আদর করে নানারকম উৎপীড়ন ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে করতই। শিশুটি যে বিনা প্রতিবাদে তা হজম করত এমন নয়। কিন্তু তার পক্ষে সওয়াল করারও তো বিশেষ কেউ ছিল না। একদিন একটি বালিকা শিশুটিকে নিয়ে ছাদে ওঠে এবং তারপর আচার চুরি করার কথা মনে পড়ায় তাকে ছাদে এক কোণে ফেলে রেখে নীচে নেমে আসে। কিন্তু আচার চুরি করার পর খেলুড়িদের ডাকে গঙ্গা-যমুনা খেলতে চলে যাওয়ায় ছাদে পরিত্যক্ত শিশুটির কথা তার মনে ছিল না।

আহাম্মকটা তখন হামাগুড়ি দিতে শেখেনি, তবে চিত-উপুড় হতে শিখে গেছে। ছাদের কর্কশ শানে কিছুক্ষণ ক্ষতবিক্ষত হয়ে এবং চিৎকার করে ফল না হওয়ায় সে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেওয়ার চেষ্টায় উপুড় ও চিত হতে হতে অর্থাৎ গড়াতে গড়াতে বহুদূরে গিয়ে রেলিং-এ ঠেকে যায়। ফের পালটা গড়াতে শুরু করে। এইভাবে বহুক্ষণের চেষ্টায় সে সিঁড়ির মুখে চলে আসে।

শক্ত জান তার। একদম প্রথম সিঁড়ি থেকে তার শরীরটা বলটান খেতে খেতে অন্তত দশ ধাপ গড়িয়ে যায়। প্রত্যেকটা সিঁড়িতেই রক্তের ছাপ রেখে গিয়েছিল সে। শেষ দিকটায় তার জ্ঞান ছিল না।

এই অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করেছিল সেই মৃগীরোগী পিসি। প্রথমটায় পিসির হাতে-পায়ে সাড় ছিল না। এটা যে ভুতুড়ে কাণ্ড সে বিষয়ে তার সন্দেহ থাকার কারণ নেই। মৃতা মা-ই যে তার শিশুকে অনাদর ও স্নেহবঞ্চিত পার্থিব জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে তাও কি বলে দিতে হয়?

সেইদিনই নাগাসাকি ও হিরোসিমায় পরমাণু বোমা ফাটে। লোকে আজও বলে, সেই পরমাণু বোমা পৃথিবীর উপরিভাগে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে সবকিছুই অন্যরকম হয়ে

গেছে, বদলে গেছে। মানুষের স্বভাব, চরিত্র, জিনিসের দাম, ঐতিহ্যের মূল্য সবকিছুতেই একটা পরিবর্তন আনল সেই দু'টি পরমাণু বোমা। যার একটির নাম ফ্যাট ম্যান আর একটির নাম লিটল বয়।

সম্ভবত তারই প্রভাবে পিসি সেই রক্তাক্ত বীভৎস দৃশ্য দেখেও মূর্ছা গেল না, বরং ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। আর নেওয়ামাত্রই অচেতন শিশু বুক কাঁপিয়ে একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল। পিসি তার গালটি নিজের গালে চেপে ধরে বলল, আহা রে!

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পরমাণু বোমার প্রভাবেই আহাম্মকটা তার জীবনে প্রথম একটি কোল পেল। একটি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ কোলের অভাবেই না আমাদের যত আপত্তি!

তবে কোনও সুখই জীবনে নিরবচ্ছিন্ন নয়। শিশুটি একটি কোল পেল বটে, কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আর-একটি কোল হারাল। আর সেই কোল হল জন্মভূমি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামার কিছু পরেই দেশের স্বাধীনতা ও তৎসহ দেশবিভাগের গুজব ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই মল্লিকবাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল প্রায়। কয়েকজন গোঁয়ারগোবিন্দ, কতিপয় আশাবাদী ও জনাকয়েক নিরুপায় লোক ছাড়া গোটা গ্রামটাই মুক্তকচ্ছ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটল।

চিন্তিত জয়ধ্বজ দেশের বাড়িতে এসে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ তাঁর অভিপ্রেত বটে, কিন্তু এত বড় কারবার রাতারাতি গুটিয়ে ফেলা তো সম্ভব নয়। আর গুটিয়েই বা লাভ কী?

আহাম্মকটি তখন মাত্র হাঁটতে শিখেছে। পৃথিবীর কোনও কিছুকেই তখনও সে প্রশ্ন করতে শেখেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মৌলিক প্রশ্ন সে তুলেছিল, দেশভাগের সময় গণভোট নেওয়া হয়েছিল কি না এবং দেশের শতকরা কতজন লোক দেশভাগকে সমর্থন করেছিল! লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের রুজি-রোজগার, বাস্তু ও অনেক কিছু পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়েছিল কি না! কতিপয় সুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থানরত মানুষ অর্থাৎ তথাকথিত নেতৃবৃন্দের এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার গণতন্ত্রসম্মত কি না। যে দেশের মানুষ বিনা প্রতিবাদে বা নিষ্ফল আক্রোশে প্রায় সবকিছুই মেনে নেয় সেই ভারত ছাড়া অন্যত্র এরকম দেশভাগ সম্ভব ছিল কি না! সবচেয়ে বড় কথা এত বড় হ্যাপা সামলানোর জন্য যথোচিত ব্যবস্থা দুই দেশেই নেওয়া হয়েছিল কি না।

অবশ্য এই সবক'টি প্রশ্নেরই উত্তর যে নেতিবাচক তা আহাম্মকটিরও বুঝতে বেশি দেরি হয়নি।

মল্লিকবাড়িতে পাকিস্তানি পতাকা ওড়ানো হয়েছিল। অবশ্য খুবই অনিচ্ছা ও ভয়ের সঙ্গে। কয়েকটি মুসলমান যুবক বারবার হানা দিয়ে দেখে যাচ্ছিল পতাকাটি নামিয়ে ফেলা হয়েছে কি না। না, পতাকা নামানো হয়নি। তার কারণও ছিল না। মল্লিকবাড়ির লোক পতাকার মূল্য বুঝত না। একটা কিছু উড়ছে এটাই বিস্ময়কর।

জয়ধ্বজ পাকিস্তান না ভারত কোথায় অবস্থান করবেন সে বিষয়ে পাকা সিদ্ধান্ত নিতে না পেরেই নারায়ণগঞ্জে ফিরে গেলেন। তবে তাঁর মধ্যম পুত্র তাঁকে সৎ পরামর্শ দিল, এদিকটা আমি সামলাই, আপনি ওদিকে গিয়ে একটা বাড়িঘর যা হোক খাড়া করুন। তা করতে করতে আমি কারবার গুটিয়ে গিয়ে জুটবখন। কারবার গোটানোর প্রস্তাবে জয়ধ্বজ দ্বিধাগ্রস্ত। এই বয়সে আর এক কারবার গুটিয়ে ভিন্ন পরিবেশে গিয়ে নতুন কারবার খোলার মতো উদ্যম তার অবশিষ্ট নেই। তিনি বললেন, কারবার থাক। কলকাতায় একটা আশ্রয় খাড়া করে আসি। দরকার হলে গিয়ে যাতে মাথা গোঁজা যায়।

জয়ধ্বজ তখন নগদ টাকার যথেষ্ট টানাটানিতে পড়েছেন। তিনি টাকা বসিয়ে রাখতে ভালবাসেন না, টাকাকে খাটাতেন। অর্থাৎ লগ্নি করতেন। তাঁর সব টাকাই তখন কারবারে খাটছে। তাছাড়া নগদ

টাকার বেশিরভাগই চলে যেত বড় ছেলের বিলেত-বাসের খরচে। প্রায় টানা দশ বছর সিদ্ধেশ্বর বিলেতে আছে। সেখানে সে কী শিখছে বা কী করছে তা জয়ধ্বজ বিস্তারিত জানতেন না। তবে অর্থোপার্জন যে করছে না এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। যার ফলে মাসান্তে তাঁকে মোটারকম টাকা পাঠাতে হত। ফলে নগদ টাকায় বেশ টান পড়েছিল। জয়ধ্বজ আরও একটা বোকামি করেছিলেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তিনি দেশে বিস্তর জমিজমা খরিদ করেন এবং মল্লিকবাড়ির লাগোয়া একটা বাস্তুজমি কিনে সেখানে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণের জন্য আগাম কিছু মার্বেল পাথর ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী কিনে রাখেন। সেই টাকাগুলি প্রায় জলে গেল। এখন পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ কলকাতায় গিয়ে একটা বাড়িঘর খাড়া করতে হলে টাকা দরকার। সুতরাং জয়ধ্বজ বাধ্য হয়ে কিছু সোনা বিক্রি করলেন। এবং কিছু আদায় উসুল করে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো আদায় জোগাড় করে পশ্চিমবঙ্গে রওনা হলেন। যাওয়ার আগে মধ্যম পুত্র সর্বেশ্বর বলল, বাবা, বিদেশে যাচ্ছেন, ওকালতনামা দিয়ে যান। নইলে কারবারে অসুবিধে হবে। কথাটা যুক্তিযুক্ত। জয়ধ্বজ আপত্তি করলেন না, ওকালতনামা বা পাওয়ার অফ এটর্নি দিয়ে গেলেন।

জয়ধ্বজ অবশ্য কোনওদিনই কলকাতা পৌঁছতে পারেননি। কোথায় পৌঁছেছেন সে বিষয়েও কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত একজন কর্মচারী ছিল। তারও কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সকলেই ধরে নিল, জয়ধ্বজ ডাকাতের হাতে খুন হয়েছেন। হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেশভাগের সময় দেশত্যাগের হিড়িকে যে ডামাডোল পড়ে গিয়েছিল, তার সুযোগে গাঁ গঞ্জে খালে বিলে প্রচুর লোক ডাকাতি করতে নেমে পড়ে। তবে জয়ধ্বজের নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে কতিপয় আশাবাদীর কথাও প্রণিধানযোগ্য। এঁদের ধারণা জয়ধ্বজের হঠাৎ বৈরাগ্য আসে এবং তিনি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যান। যাওয়ার আগে সঙ্গী কর্মচারীটিকে সব টাকা-পয়সা দান করে গিয়েছিলেন। সেই কর্মচারীটি কলকাতায় গিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ সৌভাগ্যের উদয়ে সেই কর্মচারীটি নিজের পূর্বপরিচয় মুছে ফেলে নতুন মানুষ হয়ে গেছে। বিগতযৌবনা স্ত্রী ও অপোগণ্ড সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সে আবার একটি বিয়ে করেছে। সিঁথিতে তার এখন তিনতলা বাড়ি, গ্যারেজে গাড়ি। নৈরাশ্যবাদীদের একদল এ কাহিনির দ্বিতীয় অংশকে অবিশ্বাস করে না। তারা বলে, কর্মচারীটি আসলে জয়ধ্বজকে খুন করে টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বড়লোক হয়েছে। ধরা পড়ার ভয়ে সে তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। আশাবাদীদের এক অংশ বলে যে, না, তা নয়। কর্মচারীটিও জয়ধ্বজের সঙ্গে সন্ন্যাসী হয়েছে।

যাই হোক, জয়ধ্বজের মৃত্যু বা বেঁচে থাকা যে রহস্যাবৃত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জয়ধ্বজ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলেতে খুবই বিপদে পড়ে গেলেন। হিটলার যখন লন্ডনে নাগাড়ে বোমা ফেলেছিল তখনকার চেয়েও তাঁর বিপদ বেশি হয়ে দাঁড়াল দেশ থেকে টাকা বন্ধ হওয়ায়। আগে তিনি মাসে একখানা চিঠি দিতেন। টাকা বন্ধ হওয়ায় সপ্তাহে তাঁর দুটো করে জরুরি চিঠি আসতে লাগল। সর্বেশ্বর বেশিরভাগ চিঠিই না পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। অবশেষে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠিতে তিনি জানিয়ে দিলেন, আর টাকা পাঠানো সম্ভব নয়। কারণ দেশ ভাগ হয়েছে, জয়ধ্বজ নিরুদ্দেশ এবং কারবারের অবস্থা খুবই সঙ্গিন।

কারবারের অবস্থা সঙ্গিন কি না তা বলা শক্ত। তবে বুদ্ধিমান সর্বেশ্বর নারায়ণগঞ্জে অবস্থান করা সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করেননি। তিনি ধীরে ধীরে ব্যাবসা গোটাতে লাগলেন। হুন্ডির মাধ্যমে কিছু কিছু করে টাকা কলকাতায় পাঠাতে লাগলেন। সে টাকা ব্যাংকে জমা হতে লাগল।

বজ্রযোগিনী গ্রামে বিশাল মল্লিকবাড়ির অবস্থাটি প্রায় হানাবাড়ির মতো। শরিকদের মধ্যে দু'টি পরিবার ছাড়া আর কেউই নেই। এরই মধ্যে একদিন বিনা আড়ম্বরে আহাম্মকটির ঠাকুমা ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর জন্য শোক করার বিশেষ কেউ ছিল না। খবর পেয়ে সর্বেশ্বর এসে মায়ের শ্রাদ্ধ করে গেলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জয়ধ্বজের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়নি বলে তাঁর

স্ত্রী সিঁথিতে সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা নিয়েই চিতায় ওঠেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়িটা আরও ফাঁকা হয়ে হাঁ-হাঁ করতে লাগল। আহাম্মকটির বিপদ আরও বাড়ল। সে আর তার পিসি ছাড়া তাদের অংশের বাড়িতে আর কেউ নেই। পিসির মৃগীরোগ দেখা দিলে আহাম্মকটিকে দেখাশোনার কেউ ছিল না। পিসির মূর্ছা যতক্ষণ না ভাঙত ততক্ষণ সম্পূর্ণ দৈবের নির্ভরতায় আহাম্মকটিকে পড়ে থাকতে হত। এই অবস্থায় বার দুই খাট থেকে পড়ে গেছে, নিজের বিষ্ঠা এবং প্রস্রাব খেয়েছে, পিঁপড়ে মশা এবং অন্যান্য পোকামাকড়ের দংশন সহ্য করেছে।

তবে এ কথাও ঠিক, সেই অতি শৈশবেও সে বুঝতে পেরেছিল, জীবনটা খুব সুখের হবে না। নিতান্তই অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সে খুব তাড়াতাড়ি আত্মনির্ভরশীল হতে থাকে। মাত্র ন' মাস বয়সে সে দাঁড়াতে শিখে যায়। এক বছর বয়সে সে হাঁটতে থাকে। ব্যথা-বেদনায় সে আর সহজে কাঁদত না, ক্ষুধা সহ্য করতে পারত।

আহাম্মকটিকে তার পিসি কালক্রমে খুবই গভীরভাবে ভালবেসে ফেলে। বাসারই কথা। পিসির সন্তান নেই। আহাম্মকটির নেই মা। এই অবস্থায় পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে তাদের দেরি হয়নি।

আহাম্মকটির উড়নচণ্ডী বাবাও এই সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবনটা আর আগের মতো সুখের নেই। কেমন যেন একটু বেসুর বাজছে। বেসুর বাজছিল ঠিকই। তার কারণ পিছনে আর নিশ্চিন্ত ও অফুরন্ত টাকার প্রস্রবণটি নেই।

বিশ্বেশ্বর অতএব নারায়ণগঞ্জের গদিতে হানা দিলেন এবং দাদার সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হল। কথাবার্তাগুলি অবশ্যই খুব সহৃদয়ভাবে হয়নি। কারণ সর্বেশ্বর স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিলেন যে, বাবার কারবারের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই। সব বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে তিনি কলকাতা রওনা হয়েছিলেন এবং তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ। সুতরাং কারবারের আয় থেকে ভাগ চাওয়া বৃথা।

এ কথায় খুব আকস্মিকভাবে বিশ্বেশ্বর সুরের আকাশ থেকে বাস্তব অবস্থার মাটিতে আছড়ে পড়লেন। ঝগড়া-বিবাদও সাধ্যমতো করলেন বটে, কিন্তু ফলোদয় হল না। অগত্যা দেশের বাড়িতে ফিরে তিনি সিন্দুক, আলমারি, বাক্স প্যাঁটরা হাতাতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, কোথাও তেমন বিক্রয়যোগ্য মূল্যবান কিছু পেলেন না। কারণ, ইতিপূর্বে তিনি যখন সংগীতকে হাটে মাঠে বাটে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময়ে বিচক্ষণ সর্বেশ্বর বার দুই তিন দেশের বাড়িতে হানা দিয়ে মূল্যবান জিনিসগুলির সদ্‌গতি করে গেছেন। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, তৈজসপত্রের চেয়ে নগদ টাকা এখন অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং তৈজসপত্র জমিয়ে রাখা এখন বৃথা।

আকস্মিক অভাবে পড়ে বিশ্বেশ্বর চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। উড়নচণ্ডী হয়ে ঘুরে বেড়ানো তাঁর মাথায় উঠল। তাঁর মদ্যপানের অভ্যাস ছিল, বারবনিতা এবং বাইজিদের পিছনেও যথেষ্ট অর্থব্যয় করতেন। কিন্তু এখন সেই অতীত জীবন তাঁর কাছে স্বপ্নবৎ অসত্য বলে মনে হতে লাগল। অর্থোপার্জন তাঁর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত কাজ, আবার অর্থাভাবও তিনি সহ্য করতে পারেন না।

দোটানায় পড়ে অত্যধিক মানসিক ক্লেশ সহ্য করতে করতে তিনি নানারকম কথা বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলেন। একা একা নানারকম অঙ্গভঙ্গিও করতেন। এটা অবশ্য পরমাণু বোমার প্রভাবও হতে পারে। কিছু লোক তাই বলত।

দুই: সর্বেশ্বরের কলকাতা যাত্রা ও রহিম শেখের আগমন

শোনা যায় সর্বেশ্বর স্ত্রীকে বোরখা পরিয়ে এবং নিজে লুঙ্গি ও ফেজ টুপি পরে কলকাতা যাত্রা করেন। তাঁর ছয়টি সন্তানকেও মুসলমানি পোশাক পরিয়ে নিতে ভুল করেননি। পথে দাঙ্গাপ্রবণ কিছু এলাকা নিরাপদে পার হয়ে তিনি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় পা দিয়ে বেশ পরিবর্তন করে নেন। তিনটি জমাট দইয়ের হাঁড়ি ও ক্ষীরের মালসা থেকে লুকোনো প্রায় একশো ভরি সোনার গয়না বের করে সর্বেশ্বরের স্ত্রী তা পেটকোঁচড়ে বেঁধে নিলেন। পরিত্যক্ত দই ও ক্ষীর খাওয়ার জন্য তাঁদের পুত্র-কন্যারা বায়না ধরেছিল। স্বামী-স্ত্রী ধমক দিয়ে তাদের চুপ করান।

বলাই বাহুল্য, সর্বেশ্বর নারায়ণগঞ্জের কারবার খুবই সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিতে পেরেছিলেন। কাউকে এক পয়সা হিস্যা দিতে হয়নি। পুরনো কর্মচারীরা গাঁইগুঁই করায় তিনি তাদের কিছু নগদ বিদায় দিয়েছিলেন মাত্র।

সর্বেশ্বর যখন কলকাতায় পা -দেন তখন তাঁর বয়স একত্রিশ কিংবা বত্রিশ বছর। নতুন করে জীবন শুরু করার পক্ষে এমন কিছু বেশি বয়স নয়। সর্বেশ্বরের ব্যবসায়িক বুদ্ধিটিও ছিল তীক্ষ্ণ। হাতে বেশ কিছু টাকাও ছিল তাঁর সহায়।

বেনিয়াটোলার গলিতে এক দূর সম্পর্কের শালার বাড়িতে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। আকস্মিক অতিথি-আগমনে শালা এবং শালার বউ মোটেই খুশি হননি। কিন্তু সর্বেশ্বর কিছু টাকার ছবি দেখাতেই শালা ও শালার বউয়ের গোমড়া মুখে কালো মেঘে বিদ্যুতের খেলার মতো হাসি ফুটল।

সর্বেশ্বর টাকার মূল্য জানতেন, ব্যবহার জানতেন, নিয়ন্ত্রণও জানতেন। টাকায় যে পৃথিবীর অধিকাংশ সুখ সুবিধাই ক্রয় করা যায় এ তত্ত্ব তাঁর জানা ছিল। শালার বাড়িতে অবস্থানকালে তিনি যে দরাজ হাতে খরচ করতেন তা নয়। তবে তিনি যে সম্পন্ন ব্যক্তি, সর্বহারা রিফিউজি নন, এ সত্যটা গোপন রাখেননি। তাতেই কাজ হল। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা টাকা দেখায়, দানছত্র খুলে বসে না।

বিস্তর ঘোরাঘুরি ও নিরন্তর প্রচেষ্টায় সর্বেশ্বর বড় বাজারে রুমালের পাইকারি কারবার খুললেন। বসা ব্যাবসা। বিশেষ ঘোরাঘুরি নেই, মেহনতও কম, ঝুঁকি আরও কম। শিয়ালদহের কাছে গলু ওস্তাগর লেনে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠে গেলেন। তারপর থেকে একটি নিরাপদ জীবনযাপন করতে লাগলেন। তাঁর ঠিকানা বা হদিশ দেশের বাড়ির লোকেরা বহুদিন পায়নি।

এখন সর্বেশ্বরের প্রসঙ্গ চাপা থাকুক। কারণ আহাম্মকের জীবনে তাঁর আর আপাতত কোনও ভূমিকা নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সর্বেশ্বর টাকায় ক্রয়যোগ্য কিছু সুখ এবং তজ্জনিতই কিছু দুঃখ নিয়ে কলকাতায় কালাতিপাত করতে লাগলেন।

ওদিকে এরই মধ্যে একদিন বজ্রযোগিনী গ্রামের মল্লিকবাড়িতে ডাকাত পড়ল। পড়াই স্বাভাবিক। চারদিকে প্রায়ই তখন ডাকাতি হচ্ছে। এতদিন মল্লিকবাড়িতে কেন ডাকাত পড়েনি, সেইটেই প্রশ্ন।

এমনকী আহাম্মকের পিসি এই প্রশ্নটা ডাকাতদের করেও ফেলেছিল। ঘটনাটা হল, একদল ডাকাত প্রথাসিদ্ধ মশাল বল্লম দা ইত্যাদি নিয়ে এক মধ্যরাত্রে মল্লিকবাড়ি চড়াও হল। তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না, বাধা দেওয়ার কারণও কিছু নেই। কিন্তু ডাকাতদের হাবভাব খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়, তেমন হাঁকডাকও করছিল না। বরং তাদের বেশ ক্লান্ত ও বিরক্ত বলে মনে হচ্ছিল। কয়েকজন ডাকাত তো রীতিমতো হাই তুলে চোখ রগড়াচ্ছিল। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। নাগাড়ে কয়েক মাস প্রতি রাত্রে ডাকাতি করে করে তাদের উৎসাহে খুবই ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। উপরন্তু মল্লিকবাড়িতে ডাকাতি করতে আসা যে নিতান্ত পণ্ডশ্রম এও তারা বাড়িতে ঢুকেই বুঝে যায়।

যাই হোক, কোথাও লুণ্ঠনযোগ্য তেমন কিছু না পেয়ে একজন ডাকাত আহাম্মকের পিসির গলায় রাম দা ধরে জিজ্ঞেস করে, কোথায় কী আছে সুলুক সন্ধান দে।

পিসি হাউমাউ করে কেঁদে-কেটে বলে, যখন সব ছিল তখন কোথায় ছিলে তোমরা বাবারা? তখন এলে তো এমন শুধু হাতে ফিরতে হত না!

ন্যায্য প্রশ্ন। ডাকাতটা জবাব দিতে না পেরে একটা হাই তুলল। সম্ভবত সেই হাই-ই তার জবাব। অর্থাৎ, ডাকাতি করে করে গায়ে গতরে ব্যথা হয়ে গেল মা, দিনের পর দিন লোকে আর কত পারে! তোমাদের বাড়ি যে আসব তারও তো একটা হিসেব আছে! এলেই তো হল না। আর সব বাড়ি সেরে তোমাদের পালা এলে তবে তো আসতে হবে!

এই ডাকাতির ঘটনা একটা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণ হলেন বিশ্বেশ্বর। ডাকাত দেখে একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে সেই যে ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কোঁ কোঁ করে কাঁপতে শুরু করেছিলেন, সেই কাঁপুনি ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর ভোর অবধি আর থামেনি। বলা বাহুল্য, ডাকাতরা কাউকে খুন জখম করেনি। শুধু রাগের চোটে লাথি মেরে কিছু তৈজসপত্র ফেলেছে আর যৎসামান্য কিছু ভাঙচুর করেছে। ঘটি বাটি গোছের কিছু জিনিস তারা নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু তাতে গৃহস্থের ক্ষতি হলেও তাদের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা নেই। তবু বিশ্বেশ্বর কেন যে ভয় পেয়েছিলেন তা বোঝা দুষ্কর।

পরদিন সকালেই বিশ্বেশ্বর স্থির করে ফেললেন যে, অবিলম্বে ভারতবর্ষে চলে যেতে হবে। এখানে প্রাণ সংশয়।

গ্রামে হিন্দুর সংখ্যা কমে এসেছে। কিছু লোক মাটি কামড়ে পড়ে আছে বটে, কিন্তু সকলেরই উসুখুসু ভাব। মল্লিকবাড়িতে ডাকাতি হওয়ার পর অস্বস্তি এবং উদ্বেগ আরও বাড়ল।

বিশ্বেশ্বরের সিদ্ধান্ত রটে যেতে দেরি হল না। মল্লিকবাড়ির ছোট তরফের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছে, এটা খবর হিসেবে তেমন রগরগে নয়। কিন্তু গাঁয়ের মুষ্টিমেয় হিন্দুর কাছে এটা দুঃসংবাদ। বিশ্বেশ্বর কেউকেটা নন, কিন্তু তিনি থাকলে একটা সংখ্যার জোর তো হয়। সংখ্যাই আসল। তিনি চলে গেলে একজন হিন্দু কমে যাবে।

বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সম্বল বিশেষ ছিল না। মেজদা সর্বেশ্বর নারায়ণগঞ্জের ব্যাবসা তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে গেছেন। বহু চেষ্টাতেও তাঁর ঠিকানা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। জয়ধ্বজ নিরুদ্দেশ। বড়দা সিদ্ধেশ্বরের কোনও খবর নেই। বিশ্বেশ্বর প্রায় কপর্দকহীন, কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজনও বিশেষ নেই। সুতরাং হিন্দুস্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও যাওয়াটা বাস্তবে ঘটিয়ে তুলতে পারছিলেন না। আগেই বলা হয়েছে, বিশ্বেশ্বরের বাস্তববুদ্ধি বিশেষ ছিল না। একটু ভাবের মানুষ। ভাবের মানুষেরা ভাবের মধ্যেই আনন্দ পায়, প্রতিশোধ নেয়, অপ্রাপ্যকে লাভ করে, বাস্তব তাদের কাছে দুর্বোধ্য এবং বর্জনীয়।

যাই হোক যাব-যাচ্ছি করে বিশ্বেশ্বর শেষ অবধি গাঁয়েই পড়ে রইলেন। বিশাল মল্লিকবাড়ির প্রায় সবটাই ফাঁকা। এক অংশে বিশ্বেশ্বর, তাঁর রোগগ্রস্ত দিদি ও নিতান্তই নাবালক পুত্র। অন্য এক অংশে তাঁর এক জ্যাঠতুতো দাদা, তাঁর স্ত্রী ও একটি হাবাগোবা মেয়ে। দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল। বিশ্বেশ্বর একা একা বিড়বিড় করতেন এবং হাটে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন বেঁটে খাটো এবং গম্ভীর চেহারার একজন লোক এল। তখন ভোরবেলা এবং চারদিক শরতের রোদে ভারী প্রসন্ন। লোকটি কাঁধ থেকে একটা তোরঙ্গ উঠোনে নামিয়ে তার ওপর বসে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। তার পরনে একটা চেককাটা লুঙ্গি এবং গায়ে হাতাওয়ালা একটা গেঞ্জি। সামান্য দাড়ি আছে, তবে গোঁফ কামানো। লোকটি অপরিচিত। হাবভাব সন্দেহজনক। বিশ্বেশ্বর তাকে দেখে ভয় খেয়ে দিদিকে গিয়ে বললেন, একটা লোক এসেছে, গতিক সুবিধের নয়। লোকজন ডাক তো!

দিদির মৃগীরোগ থাকলেও বিশ্বেশ্বরের মতো ভিতু নয়। আহাম্মককে কোলে নিয়ে দিদি গিয়ে লোকটার মুখোমুখি হল।

কাকে চাই আপনার?

একটু জল খাওয়াবেন মা? অনেক দূর থেকে আসছি। আমার ঘটি আছে।

বলে লোকটা উঠে তোরঙ্গ খুলে একটা ঘটি বের করল। তারপর বলল, ফজরের নমাজটা পড়া হয় নাই। একটু ওজু করে নিই আগে।

পিসি জল এনে দেয়। রহস্যময় লোকটা হাত-মুখ ধুয়ে নমাজ পড়তে থাকে মল্লিকবাড়ির উঠোনে। আহাম্মক আর তার পিসি হাঁ করে দৃশ্যটা দেখে।

নমাজের পর লোকটা একটু জিরিয়ে নিয়ে বলল, বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নাই?

আছে। কেন বলুন তো!

একটু ডেকে দেন। কথা আছে।

অগত্যা বিশ্বেশ্বরকে গুটি গুটি গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়াতে হল।

লোকটা তোরঙ্গ খুলে এক বান্ডিল কাগজ বের করে বিশ্বেশ্বরের হাতে দিয়ে বলল, সব দেখেশুনে নেন!

বিশ্বেশ্বর খুবই ঘাবড়ে গেছেন। তবু বিজ্ঞের মতো ভ্রু কুঁচকে হাতের বাণ্ডিলটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি শিক্ষিত বটে, তবে সাংসারিক ব্যাপারে কোনও আগ্রহ না থাকায় অনেক কিছুই তাঁর অজানা রয়ে গেছে। কাগজপত্রগুলোকে জমির দলিল ও চুক্তিপত্র বলেই তাঁর মনে হল। বললেন, এটা কী?

লোকটা বলল, আমার নাম রহিম শেখ। বাড়ি বর্ধমান। কিছু জমিজমা আছে সেখানে, পাকা বাড়ি। সেই বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির জয়ধ্বজ মল্লিকের অংশ বদল করে নিয়েছি। কাগজপত্রে সব লেখা আছে।

বিশ্বেশ্বরের মাথায় বজ্রাঘাত হল। বললেন, সে কী? আমার বাবা তো নিরুদ্দেশ! বদল করল কে?

আপনি জয়ধ্বজ মল্লিক মশাইয়ের ছেলে?

হ্যাঁ।

আফসোসের কথা। এ বাড়িতে আপনি আছেন তিনি তো বলেন নাই।

কে বলেনি?

সর্বেশ্বর মল্লিক মশাই।

সেজদা? তাকে আপনি কোথায় পেলেন?

তিনি কলকাতায় থাকেন। দালালের মাধ্যমে যোগাযোগ।

কিন্তু তিনি সম্পত্তি বিনিময় করবেন কী করে? সম্পত্তি তো তাঁর একার নয়।

জয়ধ্বজ মল্লিকের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তাঁর আছে।

পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কথাটা যেন জীবনে প্রথম শুনছেন এমনভাবে চেয়ে রইলেন বিশ্বেশ্বর।

রহিম শেখ প্রকৃত দুঃখিতভাবেই বলল, কাগজপত্র সব ঠিক আছে, বদলের ব্যাপারে কোনও গোলমাল নাই। তবে আপনি যে এখানে থাকেন সে কথাটা ওঁর বলা উচিত ছিল।

বিশ্বেশ্বর বসে পড়লেন। বললেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

তবে বুঝতে তাঁকে হল। গাঁয়ের মাতব্বরেরা সকলেই দলিল-টলিল দেখে রায় দিল, জয়ধ্বজ মল্লিকের সম্পত্তি রহিম শেখেরই পাওনা। কোনও গোলমাল নেই।

কিন্তু রহিম শেখ লোকটি যথার্থই ভাল। রাত্রে সে বিশ্বেশ্বরদের অংশে নীচের তলার একটা অব্যবহৃত ঘরে রইল। বিশ্বেশ্বরের দিদি রান্না করে তাকে পাঠাল। লোকটা নিজের সানকিতে ভাত

খেতে খেতে বিশ্বেশ্বরকে বলল, আপনাদের ভিটেছাড়া করার কিচ্ছু নাই। আমার পরিবার ছোট। তাছাড়া আপনার বাবা নিজস্ব বাড়ি করার জন্য যে জমিটা কিনেছিলেন আমার ইচ্ছা সেখানেই বাড়ি করে থাকি। আপনারা দু'-পাঁচ বছর এখানে অনায়াসে থাকতে পারেন।

বিশ্বেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রহিম শেখ থাকতে বলছে, সে ভাল। কিন্তু থাকবেন যে, খাবেন কী? চাষেব জমি থেকে যে সামান্য আয়ে সংসার চলছিল তাও যে রহিম শেখের দখলে। সহোদর ভাই যে এত বড় শক্রতা করতে পারে তা তাঁর স্বপ্নের অগোচর ছিল।

বিশ্বেশ্বর সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না। পরদিন সকালে যখন শয্যা ত্যাগ করলেন, তখন তাঁর চোখ টকটকে লাল, গায়ে জ্বর এবং একটু অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন। মাঝে মাঝে সজোরে বলে উঠছেন, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি! পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি!

এ কথা সবাই বুঝল, বিশ্বেশ্বরের দুর্বল মন এত বড় আঘাত সইতে পারছে না। আমাদের আহাম্মকটির নাম রাখা হয়েছিল মাধব। মাধবের বয়স এই ঘটনার সময় তিন সাড়ে তিন বছর। রহিম শেখের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেল। প্রায়দিনই সকালবেলায় পিসি তার কোঁচড়ে মুড়ি বেঁধে দিত। সেই মুড়ি খেতে খেতে টুকটুক করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসত নীচে, রহিম শেখের ঘরে। দু'জনে কিছু গল্পসল্প করত।

ক্রমে দেখা গেল, রহিম শেখ মানুষটিকে যতটা ভাল মনে হয়েছিল লোকটা তার চেয়েও ভাল। প্রকৃত ধর্মভীরু এবং দয়ালু মানুষ। পাছে পরিবার নিয়ে এলে বিশ্বেশ্বরকে ভিটেছাড়া করতে হয়, সেই ভয়ে সে বছরখানেক নিজের পরিবারকে আনল না। জয়ধ্বজের কেনা জমিটায় একটা টিনের ঘর দাঁড় করানোর পর দেশ থেকে বউ আর চারটে বাচ্চাকে নিয়ে এসে সেখানেই থাকতে লাগল। কিন্তু রহিমের মহত্ত্বের শেষ এখানেই নয়। বিশ্বেশ্বরের যে তার জন্যই হাঁড়ির হাল হয়েছে এটা বুঝে নিয়ে সে নিজে চাষবাস করে কিছু ধান চাল তাদের দিত। বলতে কী, সেটাই ছিল বিশ্বেশ্বরের এবং তার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রধান সম্বল।

মাধবের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন সে মানুষ চিনতে শিখে গেছে। হিন্দু ও মুসলমানের তফাত সে তখন ভালই বোঝে। সেই বয়সেই মাধব নিজের জামাকাপড় নিজে কেচে নেয়, খাবার না জুটলে বায়না করে না! কখনও কোনও অবস্থাতেই সে কাঁদে না, ভূত বা অন্যান্য অলৌকিক জিনিসকে ভয় খায় না, কোনও জিনিসের অপচয় করে না। সেই বয়সের পক্ষে তার সাবালকত্ব বিস্ময়কর হলেও অস্বাভাবিক নয়, কারণ তার বাবা বিশ্বেশ্বর তখন একরকম পাগল হয়ে গেছেন। পিসির ফিটের ব্যামো তো আছেই। এই অবস্থায় নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে না জানলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হত। মানুষ নিতান্ত অবোধ অবস্থাতেও অস্তিত্বের সংকট টের পায়। চাপে পড়লে সে অস্তিত্বের খাতিরে নানা অসাধ্য সাধন করে ফেলে।

বাল্যকালের সেই সুন্দর সময়টা মাধবের বড় কষ্টে কেটেছে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট ছিল ক্ষুধা। ভাতের অভাব থাকার দরুন মাধব প্রাকৃতিক ফলমূল সংগ্রহ করে যতটা পারে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করত। পেয়ারা, কুল, জাম, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ঋতুর ফল সেইসব ঋতুতে তার পুষ্টির জোগান দিত। তা বলে সেগুলো যে অনায়াসলভ্য ছিল তা নয়। মাধবকে প্রায়ই এসব চুরি করতে হত। ঠিক কোন বয়সে সে চুরি করতে শেখে তা আজ আর তার মনে নেই। কিন্তু যখন তার প্রায় দশ বছর বয়স তখন গাঁয়ের এক্রাম আলি তাকে একবার থানায় জমা করে দিয়ে আসে। এক্রামকে দোষ দেওয়া বৃথা। তার পুকুর থেকে প্রায়ই মাছ চুরি যেত। চোর ধরা পড়ে। মাধব। সেবার এক্রাম শুধু ধমক দিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর চুরি যায় এক্রামের একটা গোরু। ফের মাধব। এরপর মাধব চুরি করে এক্রামের ফুফুর একটা কাঁসার ঘটি। ঘটিটা বুড়ি ঘাটে ফেলে এসেছিল। ফিরে গিয়ে দেখে নেই। একটু খুঁজতেই মাধবদের বাড়ি থেকে ঘটিটা বেরোয়।

থানায় জমা হলেও মাধবকে হাজতবাস করতে হয়নি। রহিম শেখ গিয়ে বলা-কওয়া করায় এবং ছোট বলে দারোগার দয়া হওয়ায় সে ছাড়া পেয়ে যায়।

জ্যোৎস্নারাত্রিতে থানা থেকে ফিরছিল মাধব আর রহিম। রহিম তাকে বলছিল, চুরিধারি লোকে করে বটে, কিন্তু কাজটা বিজ্ঞজনোচিত নয়। এ কাজের জন্য অন্যরকম জান ও জবান লাগে। শয়তানকে গুরু ধরতে হয়। তুমি বাবা, শয়তানের মানুষ নও! এইটুকু বয়স থেকে তোমাকে জানি।

মাধব খুব ভয় খেয়েছিল। থানা-পুলিশের কথা সে শুনেছে বটে, অভিজ্ঞতা এই প্রথম, এক্রাম যখন তাকে থানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে প্রাণপণে হাত ছুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে আর হাঁপিয়েছে। ভয়ে তার গলা বসে গিয়েছিল। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। থানায় তাকে একজন সেপাই রুল দিয়ে দুটো গুঁতো আর কোমরে একটা লাথি মেরেছিল। ভয়ে তখন সে কেন যে অজ্ঞান হয়ে যায়নি সেটাই বিস্ময়ের।

রহিম তাকে বলল, ছোটলোকের ছেলে তো তুমি না। এ কাজ কি তোমার সয়? ছোটলোকদের পাপ সয়, তাদের জন্মই তো ওর মধ্যে।

সেই বয়সে অন্যসব ছেলের মতোই মাধব গল্প শুনতে ভীষণ ভালবাসত। ফিটের ব্যামোওলা পিসি তার সেই গল্প-ক্ষুধা তেমন মেটাতে পারত না। তবে পিসির কাছ থেকে সে নিজেদের অতীত ইতিহাস শুনে দুটো স্বপ্ন প্রায়ই দেখত। এক হল, দাদু জয়ধ্বজ মল্লিক পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এসেছেন। অন্যটা হল, বড় জ্যাঠা বিলেত থেকে বড়লোক হয়ে ফিরে এসেছেন।

তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এরা দু'জনেই একদিন ফিরে আসবেন এবং তাদের দুঃখের দিন শেষ হবে।

অবশ্য এও ঠিক, সুখ দুঃখ ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝত না মাধব। সে জন্মেছেই এক প্রগাঢ় দারিদ্র্যের অবস্থায়। জ্ঞান বয়সে সুখের দিন সে দেখেনি। কাজেই দুঃখ বা অভাব তার গায়ে লাগত না। একটা কামরাঙা বা মাদার ফলের মধ্যেও সে অমৃতের স্বাদ পেত, কদন্নে তার অরুচি হত না, উপহাস যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা তা তার কখনও মনে হয়নি।

একটু বেশি বয়সেই সে স্কুলে যেতে লাগল এবং পড়াশুনোটা যে একটা বাজে ব্যাপার এটা বুঝে ফেলতে তার একটুও দেরি হল না। সে স্কুল পালাত, স্কুল কামাই করত। এ ব্যাপারে তাকে শাসন করার লোক না থাকায় তার সুবিধেই হয়েছিল।

মাধবের প্রতি আর কেউ নজর না রাখলেও রহিম শেখ রাখত। এই পরিবারটির প্রতি তার কিছু সহানুভূতি বরাবরই ছিল। বড় অসহায় পরিবার। রহিম শেখ নিজে সামান্য লেখাপড়া জানে, কিন্তু বিদ্যা জিনিসটার প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। নিজের ছেলেমেয়েদের সে এ ব্যাপারে একটুও প্রশ্রয় দিত না। মাধবকে সে একদিন ধরে বলল, তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো বাবা! ফাঁকিটা দিচ্ছ কাকে? ভদ্রলোকের খাতায় নাম তুলতে হবে না তোমাকে?

আমার ভজরং ভজরং করে বসে বসে পড়তে ভাল লাগে না।

আমারও তো চাষবাস করতে ভাল লাগে না। কেবল ইচ্ছে করে দাওয়ায় বসে তামাক খাই আর আবু হোসেনের খোয়াব দেখি। ও বললে হবে না। আমার ছেলেগুলো পড়ে, তুমি তোমার পুঁথিপত্র নিয়ে ওদের কাছে চলে এসো রোজ। দঙ্গলে মিশলে পড়া হয়ে যাবে। মুড়ি কদমা দেবোখন, খেয়ো।

রহিম শেখের চার ছেলেই মাধবের চেয়ে বয়সে বড়, পড়েও উঁচু ক্লাসে, তবে তাদের সঙ্গে বেশ ভাব মাধবের। ছেলেগুলো সহবত জানে, শান্ত স্বভাব এবং বুদ্ধিমান। বাপের মতো তাদের চরিত্রেও দয়ামায়া আছে। চারজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল বুড়ান। তার একটা পোশাকি নাম ছিল বটে, কিন্তু বুড়ান নামটাই চলত। চার ভাইয়ের মধ্যে তার প্রকৃতিতেই কিছু দুষ্টুমি ও চঞ্চলতা ছিল। পড়াশুনোয় মন কম। মাধবের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হওয়া সত্ত্বেও তাদের বন্ধু হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। মাধব রোজ ভোরবেলা উঠে রহিম শেখের বাড়ি পড়তে যেত। এই পড়তে যাওয়ার পিছনে কারণ একটাই। মুড়ি কদমার আশ্বাস। মাধবদের বাড়িতে জলখাবারের প্রথা প্রায় উঠেই গিয়েছিল।

মুড়িরও তখন অনটন। ভাতেরও নিশ্চয়তা নেই। সকালবেলাটায় দারুণ খিদে কুমিরের মতো পেটে কামড়ে ধরত। সেই কামড় দিনভর সহ্য করার চেয়ে একটু পড়াশুনো বরং ভাল। চাচি অর্থাৎ রহিম শেখের বউ মানুষটা ভারী নির্জীব, রোগাভোগা এবং নিশ্চুপ ধরনের। সারাদিন তার গলার আওয়াজ পাওয়া যেত না। কিন্তু মুড়ি কদমার ব্যাপারে তার ভুল হয়নি কখনও। অবশ্য রোজ কদমা থাকত না, বদলে বাতাসা বা নকুলদানা জুটত। কিছুই খারাপ লাগত না মাধবের। সবই চমৎকার সবই অপূর্ব। মুড়িটা তার কোঁচড়ে ঢেলে দিয়ে যেত হানা, রহিম শেখের মেয়ে। চার ছেলের পর দুটি মেয়ে। তাদের মধ্যে বড় হল হানা। মাধবের চেয়ে সে ছোটই হবে। তবে বেশি তফাত নয়। রহিম শেখের সে বড় আদরের মেয়ে। চোখের মণি। তাই কিছুটা জেদি আর আবদেরে। সানকি থেকে কোঁচড়ে মুড়ি ঢালবার সময় সে রোজ মাধবকে মুখ ভেঙাত।

মূল বজ্রযোগিনী গ্রাম থেকে তাদের বাসস্থান ছিল একটু দূরে। মূল গ্রাম প্রায় মাইল খানেক দূর। মাঝখানটায় জলা জমি, চাষের খেত ইত্যাদি ছিল। এই পথটুকু হেঁটে পার হয়ে স্কুলে যেতে হয়। এই পথের আশেপাশেই ছিল মাধবদের জমি। এখন সেই জমি চাষ করে রহিম শেখ।

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে তারা দেখল, বাঁ ধারের মাঠে কিছু লোক জড়ো হয়েছে। খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। তারা অর্থাৎ মাধব ও রহিম শেখের ছেলেরা দৌড়ে মাঠে নামল দেখতে।

দৃশ্যটা ভয়ংকর। রহিম শেখ মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। পায়ে শক্ত বাঁধন। তাকে সাপে কামড়েছে, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। চোখ ওলটানো, একটা অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

দৃশ্যটা কয়েক সেকেন্ড স্থির চোখে দেখল মাধব। তারপর আচমকা তার বুকে খাঁ খাঁ করে উঠল একটা ভয়। সাংঘাতিক ভয়। রহিমের ছেলেরা যখন তাদের বাপজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করছে তখন মাধব কাবাডির খেলুড়ির মতো একদমে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিল। সে এক দিকবিদিকশূন্য দৌড়। কোথায় যাচ্ছে তা সে জানত না। শুধু মনে হয়েছিল কোথাও পালিয়ে যাওয়া দরকার।

তিন: রহিম শেখের মৃত্যু ও ইব্রাহিমের আগমন

রহিম শেখের মৃত্যু ঘটল খুবই অনাড়ম্বরভাবে। বাড়িতে শোকার্ত কান্না এবং প্রতিবেশীদের সমবেদনা সবই হল নিয়মমাফিক। কিন্তু মল্লিকবাড়ির প্রতিক্রিয়াটা ছিল আরও গভীর। বিশ্বেশ্বর পাগলাটে হলেও একেবারে বোধশূন্য নন। রহিম শেখের মৃত্যু যে তাঁর পরিবারের ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের পথে ঠেলে দিল সেটা তিনি ভালরকমই বুঝেছিলেন। দু'দিন কথাবার্তা বন্ধ রইল তাঁর। পিসি বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাধব সাপের ওপর আক্রোশবশত একটা ট্যাঁটা হাতে করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রহিমের মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই তার শালা ইব্রাহিম এসে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভার নিল। বলাবাহুল্য সে রহিম শেখের মতো উদার ও ভাল মানুষ ছিল না। সে এসে বিশ্বেশ্বরকে সোজাসুজি বলল, এবার তো বাড়ির অংশটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে মশাই।

বিশ্বেশ্বর জুলজুল করে ইব্রাহিমের লম্বাপানা মুখটার দিকে চেয়ে বিগলিত হাসি হেসে বললেন, রহিম আমার সহোদর ভাইয়ের মতো ছিল।

আজ্ঞে। তিনি তো আর নেই। অপোগণ্ড সব বাচ্চাকাচ্চা রেখে গেছেন। তাদের ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে। আমরা এ বাড়িতে এসে উঠব। ও বাড়ি বিক্রি হবে। আপনাকে এক মাস সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে ব্যবস্থা দেবেন।

বিশ্বেশ্বর সারাদিন বাইরের সিঁড়িতে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন অভিভূতের মতো। বোধহয় জীবনের অনিশ্চয়তার কথা ভাবছিলেন।

রহিম শেখের মৃত্যুর পরও মাধব রোজই তার বাড়ি যেত। তার মুড়ি কদমা আর জুটত না। হানা মুখ ভেঙাত না। রহিমের ছেলেরাও আর তাকে বিশেষ আমল দিত না। তবে বুড়ান তাকে বলত, তোরা আমাদের সঙ্গে থাক।

মাধবের এ প্রস্তাবে অমত ছিল না। সে তখন কিশোর বয়স্ক। হানা তখন বয়সের টানে লকলকিয়ে উঠছে। তার একটা মোহ জন্মাচ্ছিল। বড় হয়ে সে মুসলমান হবে এবং হানাকে বিয়ে করবে।

ইব্রাহিম তাদের এক মাস সময় দিয়েছিল। কিন্তু রহিম শেখের বউ কুলজান বিবি অর্থাৎ মাধবের চাচি একদিন তাকে ডেকে বলল, তোরা কোথায়ই বা যাবি? আমি ভাইজানকে বলবখন আরও কিছুদিন সময় দিতে।

এ কথায় এত আনন্দ হয়েছিল মাধবের, তেমন আনন্দ তার সারাজীবনেও খুব বেশি হয়নি।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বা অচেনা পৃথিবীর দিকে পা বাড়াতে যে মাধবের বিশেষ ভয় ছিল তা নয়। অভাবের চিন্তাও তার মনে স্থান পায়নি। কিন্তু এই চেনা গ্রাম এবং চেনা পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে তার বুকটা খাঁ খাঁ করত।

বিশ্বেশ্বরের দুশ্চিন্তা ও শোক ছিল দেখার মতো। তিনি সকাল থেকে রাত অবধি কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন আর হা-হুতাশ করতেন। কখনও মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতেন চুপচাপ। তারপর হঠাৎ একদিন মাঝরাতে উঠে শাবল নিয়ে বাড়ির এখানে সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগলেন।

পরদিন সকালে উঠে মাধব তার বাবাকে আবিষ্কার করল দক্ষিণদিকের দালানের নীচের এক কুঠুরিতে। শাবল এবং কোদাল দিয়ে তিনি সেই ঘরের মেঝেতে হাত তিনেক গভীর এক গর্ত করে ফেলেছেন এবং ঘর্মাক্ত কলেবরে হ্যা-হ্যা করে হাঁফাচ্ছেন।

অবাক হয়ে মাধব বলল, বাবা, এ কী?

বিশ্বেশ্বর ঠোঁটে আঙুল তুলে চাপা গলায় বললেন, লুকোনো টাকাপয়সা খুঁজছি। চুপ!

মাধব খিক করে হেসে ফেলল।

বিশ্বেশ্বর হাঁফিয়ে পড়েছিলেন। মাটিমাখা হাতে একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, চতুর্ভুজ মল্লিক খুব কৃপণ ছিলেন। মেলা টাকা ছিল তাঁর। যখ হয়ে আজও পাহারা দিচ্ছেন, বুঝলি!

মাধব চতুর্ভুজ মল্লিকের কথা শুনেছে। তার দাদুর দাদু। চতুর্ভুজ মল্লিক যে টাকা লুকিয়ে রাখত এ গল্প বহুল-প্রচারিত। তাই অবিশ্বাস তো হলই না বরং তার রক্ত নাচতে লাগল উত্তেজনায়। শাবল নিয়ে সে গর্তে লাফিয়ে নামল।

এরপর কয়েকটা দিন বাপ-ব্যাটায় মিলে নীচের তলার ঘরগুলোকে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ল। একেবারেই যে কিছু পাওয়া গেল না তা নয়। পূর্বদিকের একটা চোরকুঠুরির মেঝের নীচে বাস্তবিকই একটা বাঁধানো খোপ ছিল। অনেকটা চৌবাচ্চার মতো। তার মধ্যে একটা কাঠের বাক্সে রামায়ণের একটা হাতে লেখা পুঁথির কিছু ঝুরঝুরে পাতা আর একটা পিতলের পিলসুজ পাওয়া গেল।

গুপ্তধন পাওয়া না গেলেও নেশাটা ছিল মারাত্মক। পাওয়া যাবে— এই আশায় অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো জোর এসে যেত গায়ে।

কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি এত বেশি মাত্রায় হয়েছিল যে একদিন ইব্রাহিমের চোখে পড়ে যায়। খুব হম্বিতম্বি করল ইব্রাহিম, ই কী কথা! বাড়িটাকে যে একেবারে খাল বানিয়ে ফেললেন, অ্যাঁ! ব্যাপারখানা কী বলুন তো!

ব্যাপারখানা যে কী তা তো আর ইব্রাহিমকে বলা যায় না। বিশ্বেশ্বর অপরাধী মুখ করে চুপ থাকল।

ইব্রাহিম পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে এনে মহা শোরগোল তুলে ফেলল। বিশ্বেশ্বর যে ইচ্ছে করেই বাড়ি জখম করে তাদের জব্দ করার চেষ্টা করছে সেটা প্রমাণ হয়ে যেতে দেরি হল না। রহিম শেখের বড় ছেলে গুড়ানও মামার পক্ষ নিল। এ বাড়ি তাদের, এর কোনও ক্ষতি করার হক বিশ্বেশ্বরের নেই। তাঁরা যেন একমাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

আর থাকা এমনিতেও সম্ভব ছিল না। কারণ রহিম শেখের মৃত্যুর পর সামান্য খুদকুঁড়োর জোগানেও টান পড়ছিল। গ্রামে পড়ে থাকলে ভিক্ষামাত্র সার হবে। তার ওপর ভদ্রাসনই যখন অন্যের দখলে তখন আর থাকা যায় কীভাবে?

সুতরাং শীতকালের এক ভোরবেলা তিনটি প্রাণী বেরিয়ে পড়ল। তিনজনেরই মাথায় বা বগলে বাক্স-প্যাঁটরা এবং পুঁটুলি। মূল্যবান কিছু নয়, সামান্য তৈজস। তাদের লক্ষ্যস্থল বর্ধমানে রহিম শেখের গ্রাম। সেখানে রহিম শেখের বাড়ি এবং জমিজমা সর্বেশ্বরের দখলে। সুতরাং সেখানে গেলে সর্বেশ্বরের একটা খোঁজ পাওয়া যাবেই। আর তার খোঁজ পাওয়া গেলে আশ্রয়ও জুটে যাবে।

কিন্তু বাস্তবত ঘটনা সেরকম ঘটল না। ট্রেনে বা স্টিমারে উঠতে হলে টিকিট লাগে। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের কাছে টিকিট কেনার মতো টাকা ছিল না। সুতরাং বিনা টিকিটে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েই তাদের ধরা পড়তে হল। বিস্তর নাকানি-চোবানি খেয়ে ছাড়া পেলেন বটে কিন্তু গোটা অচেনা দুনিয়াটাই তাঁর কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল।

মাধবও বুঝতে পারছিল, দুনিয়াটা বেশ কঠিন ঠাঁই। তবে কিনা কাঠিন্যের সঙ্গে তার পরিচয় আজন্ম। কাজেই বারবার গলাধাক্কা খেয়ে এ গাড়ি থেকে নেমে, ও গাড়িতে উঠে, প্ল্যাটফর্মে রাত কাটিয়ে, কলের জল খেয়ে পেট ভরিয়েও সে এই প্রথম ভ্রমণের আস্বাদ বেশ পাচ্ছিল। ঘটনা ঘটছে, নতুন মানুষ দেখা যাচ্ছে, ট্রেনে বা স্টিমারে চাপছে, আনন্দ কি কিছু কম?

গ্রাম ছেড়ে বেরোবার দশদিনের মাথায় তারা বর্ধমানে পৌঁছল। তিনজনেরই প্রাণ তখন কণ্ঠায় ঠেকে আছে।

একটা সুবিধে অবশ্য ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিল। পথে বিপাকে পড়ে তারা তিনজনেই ভিক্ষে করতে শিখে যায়। তার মানে এ নয় যে ভিক্ষা সুলভ। কিন্তু আড় ভাঙা বলেও তো একটা কথা আছে। ভদ্রঘরের লোকের পক্ষে, বিশেষত বিশ্বেশ্বরের মতো শিক্ষিত লোকের ভিক্ষে করা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।

বর্ধমান স্টেশনে তিনজনে যখন লাতন হয়ে বসে আছে, ভবিষ্যৎবিহীন এক অন্ধকারে, তখন মাধব হঠাৎ তার বাবাকে বলল, গান গাইলে হয় না বাবা?

গান! গান কিসের?

গান গাইলে লোকে শোনে। পয়সা দেয়।

বিশ্বেশ্বর যে একসময়ে গান গাইতেন এটা তাঁর মনেও ছিল না। চর্চার অভাবে গলা বসে গেছে, দমেও টান পড়েছে। কিন্তু পয়সার আশায় মানুষ কী না করতে পারে? বিশ্বেশ্বর গান ধরলেন। ছোটখাটো ভিড়ও জমে গেল।

পয়সা যে তেমন কিছু পড়ল তা নয়। তবে সেই বেলাটা দিব্যি ভাত জুটে গেল তিনজনের। ভিনদেশে পা দিয়ে এই প্রথম পারিশ্রমিক উপার্জন করলেন তিনি।

রহিম শেখের বাড়ির গাঁয়ে পৌঁছোতে তাদের আরও দিন দুই লাগল। বর্ধমান স্টেশন থেকে রহিমের গ্রাম বেশি দূরে নয়। মাত্র মাইল পাঁচ-ছয় রাস্তা। তবু সময় লাগল সাহস সঞ্চয় করতে। সেখানে যে আশ্রয় জুটবে এমন আশা আর তাদের বিশেষ কিছু ছিল না। তবু চেষ্টার শেষ রাখতে নেই বলে যাওয়া।

যাকে মাটকোঠা বলে রহিম শেখের বাড়ি হল তাই। তবে তার একটা বেশ সম্পন্ন চেহারা আছে। মাটির দেওয়ালগুলি মসৃণ, উঠোন দাওয়া সব নিকোনো। বাড়িটাও তো বড়ই। উঠোন ঘিরে দুটো

দোতলা আর একটা একতলা মেটে ঘর। ধানের গোলা, গোয়াল সবই আছে।

বিশ্বেশ্বর মেজদাকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। বউদিকেও ডাকলেন। একতলা ঘরটা থেকে এক আধবয়সি বউ বেরিয়ে এসে ভিখিরিপারা তিন মূর্তিকে দেখে বিরস মুখে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাইছ? এখন কিছু হবে না।

বিশ্বেশ্বর চটে উঠে বললেন, এ আমার দাদার বাড়ি।

তোমার দাদা!

আমার দাদা সর্বেশ্বর মল্লিক।

বউটা জিব কেটে ভিতরে ঢুকে গেল। এবার বেরোল এক মাঝবয়সি রোগাভোগা চেহারার লোক। তার লম্বা কালো কুচকুচে দাড়ি, বাবরি চুল, পরনে আলখাল্লার মতো পোশাক। কপালে সিঁদুরের মস্ত ফোঁটা। তবে চোখের নজরটা তেমন কঠিন নয়। একটু নরম।

সর্বেশ্বরবাবুর ভাই? কই তাঁর তো ভাই আছে বলে শুনিনি!

আমরা সব দেশের বাড়িতে ছিলাম। এই আসছি।

কিন্তু বাবু তো কিছু বলে রাখেননি আমাদের।

তিনি কোথায়?— বিশ্বেশ্বর ধমকে ওঠেন।

তিনি এখানে থাকেন না, কলকাতায় থাকেন।

তবে এ বাড়িতে কে থাকে? তার বউ বাচ্চা নেই এখানে?

আজ্ঞে না। তাঁরা সব কলকাতায়। এখানে আমি থাকি, পাহারা দিই. গোরু দেখি। চাষবাসও দেখতে হয়।

বিশ্বেশ্বর দমে গেলেও তেজের গলাতেই বললেন. ওহে শোনো, এই সন্ধেবেলা আমরা সব ক্লান্ত হয়ে এসে পড়েছি, এখন তো আর কলকাতায় ছুটতে পারি না। ঠিকানাও জানি না কেউ। আর জানলেও সেই শহরে নতুন গিয়ে বাসা খুঁজে বের করা আমাদের কম্ম নয়। একখানা ঘর খুলে দাও, একটু মাথা গুঁজি আপাতত।

লোকটা বারবার চোখ দিয়ে তাদের জরিপ করার চেষ্টা করছিল আর দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, দেখুন, একটা কথা আছে। বাবু বলে দিয়েছে, কেউ খোঁজখবর করতে এলে যেন কিছু না বলি। তার তো শত্তুরের অভাব নেই।

বিশ্বেশ্বর বললেন, শত্রু? শত্রু কিসের? এ বাড়িতে আমারও হিস্যা আছে। আমার বাপের সম্পত্তির সঙ্গে রহিম শেখের সম্পত্তি পালটাপালটি করা হয়েছে। ইয়ার্কি পেয়েছ?

বিশ্বেশ্বর ভিতু মানুষ বটে, কিন্তু পথশ্রম, ক্লান্তি, হতাশা এবং অনিশ্চয়তা থেকে তাঁর একটা মরিয়া ভাব এসে গিয়েছিল।

লোকটা কী বুঝল কে জানে। নরম গলাতেই বলল, এসে যখন পড়েছেন তখন থাকুন দুটো দিন। শনিবার তাঁর আসার কথা আছে। এলে মোকাবিলা করে নেবেন। রহিম শেখকে কি আপনি চেনেন?

ভাল চিনি। যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সে ছিল আমার মাথার ওপর ছাতার মতো। সে চলে গিয়ে ইস্তক হাঁড়ির হাল।

লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে, রহিম কি বেঁচে নেই?

না। তাকে সাপে কামড়েছিল। মরে গেছে।

লোকটা স্তম্ভিত হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর দুঃখিতভাবে মাথাটা একটু নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বারবার বলেছিলুম পাকিস্তানে যেয়ো না। তোমার নিয়তি ওত পেতে আছে এখানে। কথা শুনল না। এইটুকু বেলা থেকে চেনাজানা, বড় ভাল লোক।

লোকটা দোতলা কোঠার নীচের তলার একখানা ঘর খুলে দিল।

প্রাসাদোপম যে বাড়িতে মাধবের জন্ম হয়েছে সেই বাড়ির তুলনায় এই মাটকোঠা কিছুই নয়,

তবু দীর্ঘ পথশ্রম, ভয় ও অনিশ্চয়তার পর ঘরের খোলা দরজাটা যেন মায়ের কোলে ডাক দিয়েছিল তাকে। তাজমহল কি এর চেয়ে ভাল?

কিন্তু মুশকিল বাধল শনিবার। সকালের দিকেই একটা অচেনা লোক এসে হাজির। চেহারায় বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে যথেষ্ট মিল। কাঁচা-পাকা চুল, মোটা গোঁফ, পরনে ফিনফিনে ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি। চোখমুখ অত্যন্ত ধূর্ত। দেখেই মাধব বুঝতে পারল, এ সেই মেজো জ্যাঠামশাই সর্বেশ্বর। এঁকে সে জ্ঞানবয়সে দেখেনি।

সর্বেশ্বর শুরুটাই করলেন গলার স্বরে বজ্রপাতের শব্দ তুলে, এ কী! এরা কারা? এরা এখানে কেন?

নিজের সহোদর ভাইকে তাঁর না চেনার কথা নয়। মাধবের পিসিও তাঁর আপন দিদি। কিন্তু তিনি প্রথমেই একটা অপরিচয়ের অভিনয় শুরু করেছিলেন আতঙ্কে। আতঙ্ক হওয়ারই কথা। ধর্মত ন্যায্যত জয়ধ্বজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিনি একা নন। বিনিময়ের মাধ্যমে পাওয়া সম্পত্তিও তাই তাঁর একার হতে পারে না। সুতরাং ভাগীদার দেখে তিনি মাথার ঠিক রাখতে পারেননি।

বিশ্বেশ্বর উঠোনে বসে রোদ পোয়াচ্ছিলেন। দাদাকে দেখে উঠে একটা প্রণাম করে বললেন, চিনতে পারছ না? দাঁড়াও, নাপিত ডেকে খেউরিটা হয়ে নিই। পথের যা ধকল গেছে বলার নয়। অনেক দিন দেখাও নেই।

কিন্তু সর্বেশ্বর এসব কথায় কান না দিয়ে উচ্চস্বরে 'কানাই, কানাই' বলে ডাকতে লাগলেন। কানাই অর্থাৎ সেই দাড়ি আর বাবরিওলা লোকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখ কান সজাগ রেখেছিল। ভালমানুষের মতো সামনে এসে দাঁড়াতেই সর্বেশ্বর তার ওপর ফেটে পড়লেন, এটা কি ধর্মশালা নাকি? এদের ঢুকতে দিয়েছে কে? অ্যাঁ! কোন সাহসে ঢুকল এখানে?

কানাই ঘাবড়াল না। বেশ মোলায়েম গলায় বলল, ইনি কি আপনার ভাই নন?

সর্বেশ্বর আর-এক পরদা গলা চড়িয়ে চেঁচালেন, ও কথা থাক। আগে বল ঢুকতে দিলি কেন? আমি বারণ করেছিলাম কি না তোকে যে কাউকে এ বাড়িতে ঢুকতে দিবি না!

সে তো বলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু ইনি এসে বললেন যে আপনি এনার মায়ের পেটের দাদা। হয়রানও হয়ে পড়েছিলেন খুব। তা ভাবলাম সত্যিই যদি বাবুর ভাই-ই হয়ে থাকে তবে তাড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। বাবু শুনলে রাগ করবে।

সর্বেশ্বর ভাই কথাটা একদম সহ্য করতে পারছিলেন না। খেপে গিয়ে বলে উঠলেন, ফের ওসব কথা! ভাই আবার কিসের রে! অ্যাঁ! ওসব কথা ওঠে কেন? বাড়ি আমার নামে, আমার নামে দলিল, আমার সম্পত্তি, এখানে উটকো লোক কেন মাথা গলাবে?

বিশ্বেশ্বর কেমন বেকুব বনে গেলেন এসব কথা শুনে। তাঁর মুখ দিয়ে কথা আসছিল না। শুধু জুলজুল করে চেয়ে ছিলেন দাদার দিকে। মাধবের পিসি বোগাভোগা লোক এবং চিরদিনই একটু চুপচাপ। তার মৃগীরোগের প্রকোপটা ইদানীং বেড়েছে। মাঝে মাঝেই ফিট হয়। মেজো ভাইয়ের অগ্নিমূর্তি দেখে সেও কেমন বাক্যহারা। কিন্তু মাধবের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অন্যরকম। মেজো জ্যাঠার এইসব কথাবার্তা শুনে তার হঠাৎ চোঁ চোঁ এক খিদে ধরে গেল পেটে। সম্ভবত সেটা ভাবী উপবাসের আগাম ইঙ্গিত। জ্যাঠা তাড়িয়ে দিলে তাদের ফের পথে বেরোতে হবে এবং পথে বেরোলে আবার কলের জল বা ভিক্ষে। সম্ভবত এই চিন্তাটাই তার পেটের মধ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করে থাকবে। সে হঠাৎ দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োতে লাগল। ঠিক এরকমভাবেই সে দৌড়েছিল রহিম শেখের মৃত্যুর সময়ে। মাধব কোনওদিনই তার এই আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। ঘাবড়ে গেলে বা তীব্র শোকের কারণ ঘটলে তার ভিতরে এক ভয়ার্ত পলায়ন ছাড়া আর কোনও বোধ কাজ করে না।

দৌড়োতে দৌড়োতে সে যেখানে গিয়ে থামল সেটা একটা মস্ত উঠোন। সামনে একটা উদুখল

আর বাছুর বাঁধা দড়ি। একটা খ্যানখ্যানে বুড়ি চড়া গলায় বলে উঠল, কে রে? কোন বাড়ির ছেলে তুই!

মাধব যে কোন বাড়ির ছেলে তা সে নিজেও জানে না। বাস্তবিক সে কি কোনও বাড়ির ছেলে? পৈতৃক বাড়ি বলে যেটাকে সে জানত তাদের সেই বজ্রযোগিনী গ্রামের বাড়ি তারা থাকতেই রহিম শেখের বাড়ি হয়ে যায়। সর্বেশ্বর জ্যাঠার বাড়িও যে তার বাড়ি নয় এটা সে শিশু হয়েও বুঝতে পারছে।

সে বুড়িটার কথার জবাব দিতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিল। মাথাটা কেমন ঘোলাটে।

বুড়িটা কুলোয় করে কিছু একটা ঝাড়ছিল উঠোনে বসে। এবার উঠে এগিয়ে এসে মাধবের মুখখানা ভাল করে দেখে বলল, এ বাবা! এ যে গ্যাদড়া নোংরা ছেলে গো! এই, কোথা থেকে আসছিস? অ্যাঁ! যাঃ যাঃ যাঃ—।

মাধব বুড়িটার দিকে তাকাল। বুড়িরা যেমন হয় তেমনই। তবে এর রংটা বেশ ফর্সা। মুখটা রাগী-রাগী। মাধব বুঝল, বুড়ি লোক সুবিধের নয়। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ভুল করে ঢুকে পড়েছি ঠাকুমা, যাচ্ছি।

যাঃ যাঃ! কী নোংরা বাবা! বাঙাল নাকি তুই?

মাধব মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, তারা বাঙাল।

বুড়ি বলল, বাব্বাঃ কী ভাষা— হাউ মাউ খাঁউ!

মাধব জানে তাদের ভাষা বুঝতে এদিককার লোকের অসুবিধে হয়। বাঙাল বলে সবাই নাক সিঁটকোয়। কিন্তু সে এ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। রহিম শেখ আর তার ছেলেরা এক ধরনের ভাষায় কথা বলত বটে, কিন্তু মাধব সেটা শেখেনি।

উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে সে ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটা ভাল করে দেখল। মস্ত পাকাবাড়ি। ঝকঝকে চেহারা। পিছনদিকে বাড়ির লাগোয়া একটা পুকুর আছে। বাইরের দিকটায় একতলা দালানে ওঠার চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'ধারে বাঁধানো রক। দুটো রকই বারান্দার মতো বড় আর চওড়া। একটা রক-এ একজন ফরসাপানা লোক বসে আছে, তার সামনে পাঁচ-সাতজন লোক দাঁড়ানো। খুব গভীর কোনও শলাপরামর্শ চলছিল।

কী নিশ্চিত, কী নির্বিঘ্ন এদের জীবন! কী বড়লোক! এদের বাড়িতে কি তার বয়সি কোনও ছেলে নেই যার সঙ্গে ভাব পাতানো যায়! ভাবতে ভাবতে বাড়িটার দিকে আর-একবার ঈর্ষার চোখে চেয়ে মাধব ধীর পায়ে আবার তার জ্যাঠার বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল।

সর্বেশ্বর সারাটা দিন দোতলার ঘরে উঠে বসে রইলেন। নামলেন না, কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বললেন না। আলাদা উনুন জ্বেলে কানাইয়ের বউ তাঁর জন্য রান্না করে ওপরে পৌঁছে দিয়ে এল। তাঁর নিজের দিদির রান্না পর্যন্ত তিনি খেলেন না। বিশ্বেশ্বরের মুখে একটা ভারী নির্বোধ ভাব সেঁটে রইল সারাদিন। তাঁর দিদিরও ভয়-ভয় ভাবটা যাচ্ছিল না। কী হবে, কী ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিল না তারা।

দুপুরের দিকে কানাই তাদের ঘরে এসে চাপা স্বরে বলল, দেখলেন তো, আমি এই ভয়েই আপনাদের জায়গা দিতে চাইনি। লোক চিনি কিনা।

বিশ্বেশ্বর আকুল হয়ে বললেন, কিন্তু ভাই, আমি লোক খারাপ নই।

আপনার কথা বলছি না, আপনার দাদার কথা বলছি। উনি লোক সুবিধের নন।

কিন্তু আমরা এখন কী করব? আমাদের সব সম্পত্তি দাদা রহিম শেখকে এই সম্পত্তির বিনিময়ে লিখে দিয়েছে।

সবই বুঝলাম। কিন্তু সম্পর্কটা যদি উনি না রাখতে চান তা হলে কী করার আছে?

বিশ্বেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। তাঁর দিদি, অর্থাৎ মাধবের পিসি বিনোদবালা অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে বললেন, আমরা সর্বেশ্বরের সম্পত্তির অংশ চাই না। শুধু ক'টা

দিন থাকব। এই যে ছোট ছেলেটা, এর মা নেই। আমি বুকে করে এত বড়টি করেছি। সর্বেশ্বরের নিজের ভাইপো। এ ছেলেটা পথে কত কষ্ট পেয়েছে। এসব কথা আমিই না হয় ওকে বুঝিয়ে বলি গে।

কানাই জিব কেটে দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে বলে, ও কাজও করবেন না। বাবু এখন রেগে নিজের চুল নিজে ছিঁড়ছেন। তা ছাড়া ঝাড়ুনি বুড়িকে খবর দেওয়া হয়েছে। সেও এল বলে।

বিনোদবালা অবাক হয়ে বলে, সে আবার কে?

এলেই বুঝবেন। দারুণ ঝগড়াটে এক মাগি। মুখ যেন আঁস্তাকুড়ে। তার অনেক ব্যাবসার মধ্যে একটা হল ঝগড়া করে বেড়ানো। চার কাটা চাল আর পাঁচ সিকে পয়সা পেলে যে কারও হয়ে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করে আসে। সে দারুণ ঝগড়া। কানে আঙুল দিতে হয়।

ও বাবা! এরকমও হয় নাকি?

আরও আছে। এখানকার এম এল এ মশাই গতকালই গাঁয়ে ফিরেছেন। বাবু তাঁর কাছেও খবর দিয়েছেন। সন্ধেবেলা তিনিও আসবেন ব্যাপার দেখতে। তাঁর পার্টিতে বাবু টাকা দেন তো।

বিনোদবালা আর বিশ্বেশ্বর এত অবাক হলেন যে কিছুক্ষণ তাঁদের মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। শেষে বিনোদবালা বললেন, আমাদের তাড়াতে এত ব্যবস্থা! বলো কী কানাই! আমরা ছারপোকার অধম মানুষ। সর্বেশ্বর মশা মারতে যে কামান দাগছে।

আমার তো দোষ নেই মা ঠাকরুন। বাবু যেমন হুকুম করেছেন তেমনই করেছি। তাও আপনারা টিকতে পারবেন না।

বেলা ভাল করে পড়বার আগেই সর্বেশ্বর ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় নীচে নামলেন এবং কোনওদিকে দৃকপাত না করে এবং কারও সঙ্গে একটিও কথা না বলে চলে গেলেন। তাঁর মুখ থমথম করছিল।

সর্বেশ্বর চলে যাওয়ার আধঘণ্টা বাদেই যে ঘটনাটি ঘটল তা মাধবের জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। মজারও বটে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই হঠাৎ উঠোনের পশ্চিম দিকের আগড় ঠেলে তিনটি মেয়েমানুষ এসে ঢুকল। একজন বয়স্কা, থলথলে চেহারা, পরনে থান। আর দু'জনের বয়স কম, তবে চেহারা বেশ মজবুত এবং কাটখোট্টা ধরনের। তিনজনেরই চোখ গোল এবং মুখের ভাব ভয়ানক কঠিন।

উঠোনে পা দিয়েই বয়স্কা মহিলা হঠাৎ একটা বাজখাঁই হাঁক দিলেন, কোথায় রে গু-খেগোর ব্যাটাবেটিরা, আয় তো সামনে ভাতারখাগি মাগখেগো রাঁড় আর বদমাশ! আয় সামনে, ঝেঁটিয়ে আজ যমের বাড়ি পাঠাই...

সেই অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালাগালের কোনও কূলকিনারা নেই। মানুষের ভাষা যে এরকম কুৎসিত হতে পারে তা বিশ্বেশ্বর বা বিনোদবালার ধারণা ছিল না। তাঁরা দাওয়া থেকে কোনওরকমে ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন ভয়ে। ঝাড়ুনি দাওয়ায় উঠে তার কেঁদো পা দিয়ে দরজায় দমাদম লাথি মারতে মারতে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে ফেলল। বিস্তর লোক জমে গেল উঠোনের চারপাশে। লোক দেখে ঝাড়ুনির উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দ্বিগুণ-তিনগুণ বেড়ে গেল। কখনও নেচে, কখনও লাফিয়ে, গলার স্বর নানারকম করে কত যে বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই।

মাধব দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুরোটা খুব মন দিয়ে শুনছিল। মাঝে মাঝে খিক খিক করে হেসেও ফেলছিল সে। ওপর থেকেই সে দেখতে পেল ঝাড়ুনি একনাগাড়ে ঘণ্টাখানেক বকার পর থেমে মেয়ে দুটোর একটিকে চাপা স্বরে বলল, পুঁটি ধর না রে। একটা পান মুখে দিয়ে নিই।

অমনি পুঁটি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল, ওরে ও শালা-শালিরা, হেগো পোঁদ ঘষে দিই তোদের মুখে...

মাধব খুব হাসতে লাগল শুনে। পুঁটি এক-আধবার কী একটু ভুল করে ফেলতেই ঝাড়ুনি ধমক দিয়ে বলে উঠল, ও কী! ঠিক করে বল। বারভাতারি নয়, বারোভাতারি। কুট নয়, বল কুঠ হবে, কুঠ হবে। আর পা দাপানো বন্ধ হচ্ছে কেন রে বারবার? কবে শিখবি এসব? আমি ম'লে?

মাধব বুঝল, ঝাড়ুনি আসলে একজন শিল্পী। দুটো মেয়ে হচ্ছে তার ছাত্রী।

ওরকম কতক্ষণ চলত তা বলা মুশকিল। তবে সন্ধে যখন ঘোরালো হয়ে এসেছে সেই সময়ে ভিড়ের ভিতর একটু গুঞ্জন উঠল আর ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। মাধব দেখল, ভিড় সরিয়ে সেই রকে-বসা ফর্সা লোকটা আসছে। সঙ্গে পাঁচ-সাত জন লোক। কানাই শশব্যস্তে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তার বউ কয়েকটা মোড়া পেতে দিল উঠোনে। ঝাড়ুনি আর তার দুই শিষ্যা লোকটাকে দেখেই তাড়াতাড়ি সরে পড়ল কোথায়।

লোকটা কানাইকে বলল, ওঁরা এখনও আছেন?

আজ্ঞে, ঘরে দোর দিয়ে আছেন।

ডাক, ডাক শিগগির। আমার সময় নেই। আজ রাতের গাড়ি ধরতে হবে। কাল অ্যাসেমব্লি।

লোকটা যে মাতব্বর তা বুঝতে মাধবের দেরি হল না।

কানাই গিয়ে রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে বলল, ও দাদাবাবু, মা ঠাকুরান, বেরিয়ে আসুন। এম এল এ মশাই এসেছেন। আমাদের কেশব মিত্তির মশাই গো।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করার পর দরজা খুলে বিশ্বেশ্বর বেরিয়ে এলেন। চোখেমুখে গভীর ভয় এবং দিশাহারা ভাবটা কানাইয়ের হ্যারিকেনের আলোতেও বোঝা গেল।

কেশব মিত্র খুবই বুদ্ধিমান লোক। মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা না দিয়ে মিষ্টি করেই বললেন, আপনারা সব কোথা থেকে আসছেন!

আজ্ঞে, দেশের গ্রাম থেকে। বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী।

কেশব মিত্র মাথা নেড়ে বললেন, সে ভাল। কিন্তু হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে বলা নেই কওয়া নেই দখল নিতে চাইছেন কেন?

দখল!— বলে বিশ্বেশ্বর টালুমালু করে চারদিকে চেয়ে দেখে বললেন, দখল তো নয়। একটু আশ্রয়।

আশ্রয় তো অন্য জায়গাতেও আছে। সরকার উদ্বাস্তুদের জন্য অনেক রকম স্কিম করেছেন। সেখানে যান। খামোখা এক গেরস্তর ঘরে এরকম হামলা করা তো ঠিক নয়।

ইনি আমার দাদা। আপন সহোদর ভাই।

কোনও প্রমাণ আছে?

এ কথায় বিশ্বেশ্বর সাত হাত জলের তলায় পড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, না। প্রমাণ কী থাকবে! এক মায়ের পেটে জন্মেছিলেন, এই মাত্র।

কেশব মিত্র ভ্রূ কুঁচকে বললেন, সে হলেও বলি, দাদার রক্ত-জল-করা বাড়ি-ঘর দখল করার রাইট তো ভাইয়েরও থাকে না।

দখল করিনি তো!

কিন্তু পজিশন তো নিয়ে ফেলেছেন। আইনে সেটাও মস্ত পয়েন্ট। শেষ অবধি যদি দাবি তোলেন তখন কী হবে?

দাবি তুলব না। শুধু কয়েকটা দিন থাকব। আমরা বড় হয়রান হয়ে এসেছি। জিরোনো দরকার।

কেশব মিত্র রাগলেন না। তবে কঠোর হয়ে বললেন, সর্বেশ্বরবাবুকে আমি বহুদিন চিনি। ভাল লোক। শুনেছি দেশের বাড়িতে ভাইরা তাঁকে থাকতে দেয়নি। বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন যদি তিনি ভাইদের আশ্রয় দিতে না চান তবে আমি তার দোষ দেখি না।

বিশ্বেশ্বর অনেক কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তাঁর নার্ভ এ সময়ে ফেল করে। তিনি হঠাৎ

দাওয়ায় বসে পড়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন। বিনোদবালা মূর্ছা গেলেন ঘরের মধ্যে।

কেশব মিত্র যা বুঝবার বুঝে নিয়েছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে। কয়েকটা দিন বরং বিশ্রাম নিন। আমি সর্বেশ্বরবাবুকে বলে রাজি করাব। তবে স্থায়ীভাবে এখানে থাকার পরিকল্পনা করবেন না। তাতে ফল ভাল হবে না।

এই বলে সদলবলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ভিড়টাও আস্তে আস্তে সরে গেল।

সেই রাত্রে আর রান্না করার মতো শক্তি ছিল না বিনোদবালার। জ্ঞান ফিরে আসার পর শয্যা নিতে হল। বিশ্বেশ্বর দাওয়ায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। কানাই এক ধামা মুড়ি আর একটা বাটিতে খানিকটা ঝিঙে পোস্ত দিয়ে গেল, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা সমেত।

মাধব সেই প্রথম তরকারি দিয়ে মুড়ি খায়। তার খারাপ লাগেনি। আসলে সেই বয়সে তার কোনও খাবারই খারাপ লাগত না। খাবার জিনিস হলেই হল।

পরদিন মাধব কানাইকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কানাইদা, এম এল এ কাকে বলে?

ও বাবা! হাতে মাথা কাটে। ওরাই তো আইন বানায়। দেশ চালায়।

কেশব মিত্র কি খুব বড়লোক?

বিরাট অবস্থা। নামে বেনামে কত জমি! আগে বিশালাক্ষী পুজোয় ওদের বাড়ি নরবলি হত। খুব জাগ্রত দেবতা।

নরবলি?

হ্যাঁ গো, নিজের চোখে দেখা।

এখনও হয়?

না। বন্ধ হয়ে গেছে। মেলা ঝক্কি তো। তেমন বাচ্চা ছেলে পাওয়াও যায় না আজকাল।

বাচ্চা ছেলে বলি দেওয়া হত নাকি?

তবে! তিন থেকে পাঁচের মধ্যে বয়স হবে, নধরকান্তি হবে, খুঁত থাকলে চলবে না। মেলা বায়নাক্কা। হরি পাড়ুই নামে একটা লোক ছিল, সেই গিয়ে ভিন.গাঁ থেকে দেখেশুনে ছেলে তুলে আনত।

মাধবের মুখ শুকিয়ে বুক ঢিপঢিপ করছিল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, এখন আনে না?

হরি মরে গেছে বছর কত হল। ছেলেধরা বলে এমন পেটাল নীলপুরের লোকেরা, বেচারা রক্তবমি করতে করতে মরে গেল। সেই থেকে নরবলি বন্ধ। তবে এখনও পুতুল গড়ে বলি হয়।

কেশব মিত্র কি খুব রাগী?

রাগী বটে তবে মানী মানুষ। খামোখা চটেন না।

আমাদের ওপর কি রাগ আছে?

তা আছে বলতে পারো। কাজটা তোমরা ভাল করোনি। তবে কেশববাবু অবিবেচক নন। দেশের নেতা তো বটে। আমরা সব তাঁরই তো প্রজা। তিনি অনেকটা আমাদের বাপের মতো। যদি তোমার বাপ গিয়ে জুতমতো ধরেন ওঁকে, তবে একটা হিল্লে করেই দেবেন।

বাবার যে মাথার ঠিক নেই।

গুঁতোর চোটে ঠিক হয়ে যাবে। বাবু তো আজ ভালয়-ভালয় বিদেয় হলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পরের শনিবার বাবু গিন্নিমাকেও সঙ্গে আনবেন। তিনি এলেই সব চিতপটাং।

জেঠিমা কি খুব রাগী?

সাক্ষাৎ কাঁচাখেগো।

কাঁচাখেগো কী?

এলেই বুঝবে। কলির তো সবে সন্ধে। তবে বলে দিচ্ছি, বাবু আর গিন্নি এক হয়ে তোমাদেব তিষ্ঠোতে দেবে না। বাবু পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন দালান তুলবে কি মাগনা?

দেবে না যে তা মাধবও জানে। জ্যাঠাজেঠি সম্পর্কে তার কোনও মোহ নেই। জন্মাবধি সে তার কোনও আত্মীয়স্বজন তেমন দেখেনি বললেই হয়। তবে জ্যাঠার এই বাড়িটা তার খুব ভাল লেগে গেছে। দালান-কোঠা নয় বটে, কিন্তু ভারী গেঁয়ো, ভারী আপন একটা ভাব আছে বাড়িটার মধ্যে। বেশ একখানা সবুজ খেত আছে পুবের দিকে। তার চারধারে মেলা গাছগাছালি ভারী ঠান্ডা আর গভীর একটা মমতায় মাখানো। সবচেয়ে যেটা বড় কথা, এই বাড়িতেই রহিম চাচা থাকত, চাচি থাকত, গুড়ান জুড়ান বুড়ান হানা সব এ বাড়িতে জন্মেছে। ভাবতেই যেন মনে হয়, ওদের দেখতে পাবে যে-কোনও সময়ে। রহিম চাচা বুঝি মাঠের চাষ করতে গেছে, চাচি রান্নাঘরে তার বিখ্যাত মাছের ছালুন রাঁধছে, দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে আছে হানা, উঠোনে ছোটাছুটি করে খেলছে বুড়ান আর জুড়ান। গুড়ান গম্ভীর মুখে দাওয়ায় বই খুলে বসে আছে।

গোরুটা আদুরে স্বরে হাঁক দিল, হাম্বা।

ভারী ঠান্ডা গোরু। চোখ দুটো মায়ায় মাখানো। বোধহয় এটা রহিম চাচারই গোরু। নইলে এই ঠান্ডা স্বভাব হয়!

কথাটা সে কানাইকে জিজ্ঞেস করে ফেলল, এ গোরুটা কি রহিম চাচার?

কানাই মাথা নেড়ে বলে, রহিম যখন গেল তখন এটা ছিল বাছুর। এখন বড় হয়েছে।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পৃথিবীতে রহিম চাচার মতো এমন আপন একটা মানুষ সে আর দেখেনি। তার গোরুটাকেও মাধবের আপনজন বলে মনে হতে লাগল।

জ্যাঠা আর জেঠি এসে তাদের এ বাড়ি থেকে তাড়াবে। তবে তার এখনও এক সপ্তাহ দেরি আছে। তাই দুশ্চিন্তাটা মাধবের মাথায় বেশিক্ষণ রইল না। সে সকালবেলায় ঘুরে ঘুরে নতুন করে বাড়িটা দেখতে লাগল। দেখার অবশ্য বেশি কিছু নেই। ওপরের একটা ঘরে তক্তপোষে বিছানা পাতা। জ্যাঠামশাইরা এলে এখানে শোন। টেবিল চেয়ারও আছে কয়েকটা। অন্য ঘরগুলো ফাঁকা ফাঁকা। পশ্চিম ধারের জমিতে নতুন ইটের মস্ত দুটো পাঁজা, তার পাশে বালি আর কুঁচো ইট পাথরের দুটো ঢিবি। নীচের একটা ঘরে কয়েক বস্তা সিমেন্ট থাক করে সাজানো। জ্যাঠামশাই রহিম চাচার পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন দালান তুলবেন বলে প্রস্তুতি চলছে। মাধবের ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। রহিম চাচার পুরনো বাড়ি ভেঙে জ্যাঠামশাই যখন দালান তুলবে তখন আর বাড়িটাকে তার আপন বলে মনে হবে না।

পশ্চিমের ঘরের একটা কুলুঙ্গিতে কয়েকটা আশ্চর্য জিনিস পেল মাধব। কয়েকটা কড়ি, একজোড়া পেতলের মাকড়ি আর ভাঙা কাচের চুড়ির কয়েকটা টুকরো। অবশ্যই হানার। জিনিসগুলো শুঁকে সে হানার গায়ের গন্ধ পেল। তারপর চুপচাপ বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। সেই বজ্রযোগিনী গ্রাম, হানা, মুড়ি-কদমা, ভালবাসা।

জিনিসগুলো সে যত্ন করে রেখে দিল নিজের কাছে। যদি কখনও হানার সঙ্গে দেখা হয় তো দেবে।

বর্ধমান শহরের কাছে বলেই বোধহয় গঙ্গানগর গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ। পাকা দোকানপাট আছে, রোজ বাজার বসে, বেশ কিছু বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে, গাঁয়ের মধ্যে কয়েকটা পাকা রাস্তাও আছে। একটা মেয়েদের আর একটা ছেলেদের ইস্কুল, লাইব্রেরি, ক্লাব, বসতি বেশ ঘন। সারাদিন কাজ নেই বলে মাধব ঘুরে ঘুরে দেখে। বজ্রযোগিনীর সৌন্দর্য ছিল অন্যরকম। গঙ্গানগরের সেরকম নয়। তবে এ গ্রামটাও বেশ ভাল লেগে যায় মাধবের। খুব পুরনো একটা কালীবাড়ি আছে। চারদিকে বট-অশ্বত্থের জড়ামড়ি, তার ঘন ঘুটঘুট্টি ছায়ার নীচে ঠান্ডা পাথরের মন্দির। বেশি বড় নয়, কিন্তু সুন্দর কারুকাজ করা গা। আর আছে রাঘব সিংহের গড়। সেটা এক বড়সড় ধ্বংসস্তূপ। এসব দেখে মাধব আর ঘুরে ফিরে বার বার কেশব মিত্রের বাড়ির কাছে চলে আসে। তার অপরিণত মন বলে, কেশব মিত্রের মতো ক্ষমতাবান এবং বড়লোকই পারে তাদের সব বিপদ কাটিয়ে দিতে। যদি

এ বাড়ির কোনও অল্পবয়সি ছেলের সঙ্গে ভাব করা যায়? নেই কি কেউ তেমন?

তিন-চার দিন ঘোরাঘুরির পর এক দুপুরে ফের এসে মিত্রবাড়ির নাটমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মাধব। মস্ত বাড়ি। জানালা দরজা বেশির ভাগই বন্ধ। দেখলেই বোঝা যায় এ বাড়িতে বেশি লোক থাকে না। একজন মাঝবয়সি বিধবা মেয়েমানুষ নাটমন্দির ঝাঁট দিচ্ছিল।

তার সঙ্গে প্রথমে কথা বলতে একটু ভয়-ভয় করল মাধবের। তাই সে গুটি গুটি গিয়ে নাটমন্দিরের একটা কোনায় বসল। বেশ বড় বাঁধানো তকতকে মেঝে, ওপরে টিনের আটচালা।

মেয়েমানুষটা তাকে টেরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, এই, কোন বাড়ির ছেলে রে তুই? কী জাত?

আমরা!— একটু থতমত খেয়ে মাধব বলে, আমরা কায়স্থ। সর্বেশ্বর মল্লিক আমার জ্যাঠামশাই হন।

বাঙালদের বাড়ির ছেলে? হুঁ, তোদের কি আর জাতধর্ম আছে রে! বামুন কায়েত বাগদি সব একাকার। ডিমসুতো দিয়ে পইতে বানিয়ে রাতারাতি কত বাঙাল বামুন হয়ে যাচ্ছে! নেমে বোস বাছা, আমি এখন মেঝে ধোয়াব।

মাধব সঙ্গে সঙ্গে নেমে একটু দূরে মাটির ওপর বসল। মেয়েমানুষটি কুয়ো থেকে বালতিতে জল টেনে এনে মেঝে ধোয়াতে লাগল। পরিশ্রম কম নয়।

মাধব এ বাড়ির যে-কারও সঙ্গে ভাব করার জন্য আঁকুমাঁকু করছিল ভিতরে ভিতরে। তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে গলার স্বর একটু তুলে বলল, আমি জল টেনে দেব পিসিমা?

মেয়েমানুষটা একবার সন্দিহান চোখে তার দিকে চেয়ে দেখে বলল, পয়সা পাবি না কিন্তু!

না, পয়সা লাগবে না। আপনার কষ্ট হচ্ছে তাই বলছিলাম।

কষ্ট বলে কষ্ট! পাম্পটা চালালেই বকবক করে জল উঠে আসে, কিন্তু তাই কি চালাবে বুড়ি! হুঁ, কেশব মিত্রের মা না! পিঁপড়ের পোঁদ টিপে গুড় বের করে। তা যা, তুলবি তো দে তুলে কয়েক বালতি।

মাধব ছুটে গিয়ে জল তুলতে লাগল। বয়সের তুলনায় সে দীর্ঘকায় এবং অভাব অনটন উপবাস সত্ত্বেও প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বেশ শক্তপোক্ত ছেলে। কয়েক বালতি জল টেনে দিতে তার গায়ে লাগল না।

মেয়েমানুষটা খুশি হয়ে বলল, সন্ধের পর আসিস। কালীকেত্তন হবে। ভোগ হবে। প্রসাদ পেয়ে যাবি।

মাধব মাথা নাড়ল। তবে বেশি উৎসাহ বোধ করল না। প্রসাদের ব্যাপারটায় তার সন্দেহ আছে। অনেক জায়গাতেই সে দেখেছে, অচেনা বাচ্চাকাচ্চাদের একটু বাতাসা দিয়ে বিদেয় দেওয়া হয়। আসল প্রসাদ থাকে বড়দের জন্য।

সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, এ বাড়িতে আমার মতো বয়সের কোনও ছেলে নেই?

কেন রে?

এমনি। বন্ধু পাতাব।

ও বাব্বা! বন্ধু পাতাবি? তা এ বাড়ির ছেলে তোর সঙ্গে বন্ধু পাতাতে যাবে কেন? তারা সব কলকাতার সাহেবি কেতার ইস্কুলে পড়ে। গটগট করে হাঁটে। কী সব চলন বলন! তুই তাদের বন্ধু হবি কী রে?

কথাটা যুক্তিযুক্ত। মাধব বুঝল।

মেয়েমানুষটা ফের জিজ্ঞেস করল, সর্বেশ্বর তোর কে হয় বললি?

জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাই?— বলে ফের সেই সন্দিহান দৃষ্টি, তা তোর এই দশা কেন? তার তো শুনি মেলা টাকাপয়সা। দালানকোঠা তুলবে শিগগির। তার ভাইপো হয়ে তোর এই ভিখিরিপানা চেহারা কেন?

মাধব এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জবাব জানে না। তবু কিছু বলতে হয় বলে সে সত্যি কথাটাই বলে ফেলল, জ্যাঠামশাই আমাদের দেখতে পারে না। শিগগির তাড়িয়ে দেবে।

বলিস কী? আপন জ্যাঠা?

একদম আপন।

তা তোরা যাবি কোথায় তাড়িয়ে দিলে?

ঠিক নেই।

তাড়াবে কেন?

আমরা সব হুট করে এসে পড়েছি তো, তাই।

বাঙালদেশে ছিলি বুঝি?

হ্যাঁ। বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী।

আর কেউ নেই তোদের?

আছে। দাদু আর বিলেতের জ্যাঠা। তারা এসে পড়বে শিগগির। এলে আর কষ্ট থাকবে না। ফের বজ্রযোগিনীতে ফিরে যাব।

ভিতরবাড়ি থেকে চিলের স্বরে একটা ডাক এল, ও কাদু-উ!

মেয়েমানুষটা চলে গেল তাড়াতাড়ি। মাধব চুপচাপ বসে রইল মাঠে। ভাবতে লাগল। ভাবনার অবশ্য ছিলও মাধবের। কানাই সকালেই একখানা পোস্টকার্ড দেখিয়েছে বিশ্বেশ্বরকে, এই দেখুন, কলকাতা থেকে বাবুর চিঠি।

বিশ্বেশ্বর হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখেছে?

লিখেছেন, ঘরের চাল-ডাল যেন আর আপনাদের দেওয়া না হয়। জোর করে বাড়িতে ঢুকেছেন বলে যেন পুলিশে একটা ডায়েরি করিয়ে রাখি। আর আপনারা যদি অন্য জায়গায় চলে যেতে রাজি থাকেন তবে যেন রাহাখরচ বাবদ পঞ্চাশটা টাকা আপনাদের দিয়ে দিই।

এ কথা শুনে বিশ্বেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন সকাল থেকে। বিড় বিড় করছেন, পুলিশ! পুলিশ আসবে! পঞ্চাশ টাকা!

মাধব পুলিশকে ভয় পায় না। তার সবচেয়ে বড় ভয় হল, চাল-ডাল বন্ধ হওয়া নিয়ে। তার মানে আজ রাত থেকে আর খাবার জুটছে না।

বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না বলে মাধব মিত্র-বাড়ির সামনের মাঠটায় চুপচাপ হাঁ করে বসে রইল। বিকেলের দিকে কয়েকটা ছেলে এসে তাকে সরিয়ে দিয়ে দুটো বাঁশ পুঁতে নেট টাঙিয়ে ভলিবল খেলতে শুরু করল। মাধব হাঁ করে সেই খেলা দেখল। সন্ধে হয়ে এল, সে তবু নড়ল না। কালী-কীর্তনের আসরে যখন লোক আসতে শুরু করল, নাটমন্দিরে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো, তখন মাধব উঠে গিয়ে আসরের এক কোণে বসে পড়ল। গান-বাজনা যাই হোক একটা কিছু তো হবে। সময়টা কাটানো নিয়ে কথা। তার চেয়েও বড় কথা খিদেটাকে ভুলে থাকা যাবে কিছুক্ষণ।

ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে কেশব মিত্র যখন আসরে ঢুকলেন তখন তাঁর দু'পাশে দু'টি ভারী ভাল চেহারার ছেলে আর মেয়েকে দেখতে পেল মাধব। ছেলেটা তারই বয়সি। ফুটফুটে চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, বড়লোকের ছেলে। মেয়েটা কিছু ছোট। সেও সুন্দরী বটে তবে রংটা একটু চাপা। আর ভারী দেমাকি চালচলন। একটা লাল টুকটুকে ফ্রক তার পরনে, কোমরে সোনালি রঙের জরির একটা পট্টি। ঘাড় অবধি চুল। চারদিকে চঞ্চল চোখে চাইছে আর দাদাকে কী যেন চাপা গলায় বলছে আর খিলখিল করে হাসছে। এ বয়সের মেয়েরা কারণে বা অকারণে খুব হাসে, এটা লক্ষ করেছে মাধব।

কেশববাবুর ছেলেটাকে সে খুব মন দিয়ে লক্ষ করছিল। পরনে নীল রঙের একটা হাফপ্যান্ট আর সাদা হাফহাতা শার্ট। খুব ফর্সা তার গায়ের রং। মুখখানা বেশ গম্ভীর। না, এরকম ছেলের সঙ্গে

মাধবের বন্ধুত্ব হওয়ার নয়। তার মতো ছেলেরা এদের মতো বড়লোকের বাড়িতে চাকর খাটে। এরা তাকে পাত্তাই দেবে না। মাধব তৃষিতের মতো ছেলেটার দিকে চেয়ে রইল।

মাধবের নিজের চেহারা কেমন তা সে আজও জানে না। এই বয়স অবধি সে কদাচিৎ আয়নায় নিজের মুখ দেখেছে। চুল কাটার পয়সা জোটে না বলে প্রায়ই তার চুল ঘাড় ছাড়িয়ে যায় এবং জট ধরে। মাথায় তেল শেষ কবে দিয়েছে মনে পড়ে না। গায়ে সাবান মাখার ব্যাপারটা তার কাছে স্বপ্নের মতো। তার পরনে একটা বহুকালের পুরনো দড়ি বাঁধা প্যান্ট আর গায়ে একটা বগল ছেঁড়া মোটা গেঞ্জি, এ ছাড়া তার পোশাক বলতে কিছুই আর নেই। পুজো পার্বণেও তার নতুন জামা বা প্যান্ট জুটেছে বলে মনে পড়ে না। ছেলেটার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের কথা ভাবতেই মাধবের ঘেন্না করল। তার হাতে পায়ে হাঁটুতে কত ক্ষত শুকিয়ে কালচে দাগ হয়ে আছে, দীর্ঘস্থায়ী পাঁচড়া দগদগে হয়ে থাকে হাতে পায়ে, বড় বড় নখের মধ্যে নীল ময়লা। গায়ে যে একটা চিলসে গন্ধ হয়েছে, সেটা সে আজকাল নিজেও টের পায়। খুব উৎকট না হলে নিজের গায়ের বা মুখের গন্ধ মানুষ সাধারণত টের পায় না। সে পড়াশুনো করে না, তেমন খেলাধুলো জানে না। তার কোনও অহংকারও নেই। সে বাঙাল।

নিজের ওপর মাধবের সেদিন যে ঘেন্নাটা জন্মাল সেটাই হয়তো তার সামাজিক শ্রেণিচেতনার প্রাথমিক উন্মেষ। সেই শ্রেণিচৈতন্যের প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হল আশ্চর্য রকমের। সেদিন সে প্রসাদ নিল না। আসর শেষ হলে কেশববাবুর সুন্দর ছেলেটার দিকে জ্বালাভরা চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে এল।

যথারীতি বাড়িতে রান্না হয়নি। তবে কানাই করুণা পরবশ কিছু মুড়ি দিয়ে গিয়েছিল। পিসি সেই মুড়ি যত্ন করে রেখেছিল তার জন্য। কানাই তাকে শিখিয়েছে, শুখা মুড়ি জল দিয়ে ভিজিয়ে খেলে ভাতের মতোই লাগে। পূর্ববঙ্গে এরকম ভাবে মুড়ি খাওয়ার চলন নেই। মাধব তবু সেই রাত্রে জল ঢেলে মুড়ি মেখে খেল। কিছুই তার খারাপ লাগে না। ভেজা মুড়িও চমৎকার লাগল।

খেতে খেতে সে পিসিকে বলল, কেশববাবুর বাড়িতে কালী-কীর্তন ছিল, বুঝলে! গিয়েছিলাম।

প্রসাদ দিল?

দিচ্ছিল। নিইনি।

কেন রে!

লজ্জা করল। ওরা এত বড়লোক।

খুব বড়লোক নাকি?

খুব। ছেলেটা যা দারুণ দেখতে না! সাহেবের মতো। কী পোশাক!

পিসি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কত লোক কত সুখে আছে।

সেই রাত্রে মাধব অনেক স্বপ্ন দেখল। ভয়ের স্বপ্ন।

চার: জ্যাঠাইমার আগমন ও মাধবের বন্ধুলাভ

জ্যাঠাইমাকে মাধব কখনও দেখেনি। দেখলেও অতি শৈশবে। মনে নেই। সপ্তাহটা খুবই ভয়ে ভয়ে কাটছিল তাদের। কারণ প্রতিদিনই কানাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল, হুঁ হুঁ, আসছেন রোববার সকালে। দেখবে মজা! চেনো না তো গিন্নিমাকে! ঝাড়ুনি পর্যন্ত তার কাছে ছেলেমানুষ!

কানাই রোজই সকালে একবার করে বিশ্বেশ্বরকে মনে করিয়ে দেয়, চাল দেওয়া বন্ধ করতে বলে দিয়েছেন বাবু। এবার নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা দেখুন।

বিশ্বেশ্বর আর ব্যবস্থা কী-ই বা দেখবেন! অচেনা জায়গায় ভিক্ষেমিক্ষে করেছেন বটে, কিন্তু এ

হল তাঁর দাদার গাঁ। এখানে ভিক্ষে করলে বিচ্ছিরি শোরগোল হবে। কাজেই কানাইয়ের কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন।

কিন্তু কানাই লোকটা কিছু অদ্ভুত ধরনের। মুখে তার অবিরল 'না না' সত্ত্বেও সে কিন্তু রোজই চাল-ডালের একটা ব্যবস্থা করে দেয়। একটু বেলায় তার বউ ঘোমটা টেনে একটা ডালায় কিছু চাল, একটু ডাল আর সামান্য আনাজপাতি, ছোট একটা মাটির ভাঁড়ে একটু তেল, এক খামচা নুন আর কয়েকটা কাঁচালঙ্কা দাওয়ায় রেখে মাধবের পিসিকে বলে, নাও গো।

এই 'নাও গো' ডাকটুকুর জন্য তারা তিনজন— অর্থাৎ মাধব, বিশ্বেশ্বর আর বিনোদবালা ভোররাত্রি থেকে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে থাকে। রোজই মনে হয়, আজ যদি না ডাকে?

কানাই অবশ্য এসব নিজের ঘর থেকে দেয় না। সর্বেশ্বরের ধানের গোলা আর আনাজের খেত থেকেই দেয়। তবু দেয় তো! না দিলে কী হত?

রবিবার সর্বেশ্বর আর তাঁর গিন্নি আসবেন। শনিবার সকালে উঠে বিশ্বেশ্বর খুব কাহিল মুখে দাওয়ায় বসে একদৃষ্টে একটা কলার ঝাড়ের দিকে চেয়ে বড় বড় শ্বাস ছাড়ছিলেন। এ সময়ে কানাই একটু গলা খাঁকারি দিয়ে তাঁর পাশে এসে বসল।

তা কিছু ঠিক করলেন?

বিশ্বেশ্বর ডান হাতখানা উলটে দিয়ে বললেন, কী ঠিক করার আছে? আবার পথে বেরোতে হবে আর কী!

দেশে কতটা জমিজমা ছিল আপনাদের?

বিশ্বেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, জমিজমা বেশি ছিল না। আমাদের ছিল ব্যাবসা। ভাল ব্যাবসা।

সেটাও কি সর্বেশ্বরবাবু দেখতেন?

হ্যাঁ। মেজদাই ছিল সর্বেসর্বা।

কানাই একটু মুচকে হেসে বলে, নামখানা একেবারে সার্থক, কী বলেন?

বিশ্বেশ্বর চুপ করে রইলেন।

কানাই বলল, আপনারা কেন যে এমন ন্যাতানো মানুষ তা বুঝি না। একটু রোখটোখ থাকবে তবে না পুরুষ!

বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, রোখ কিসের?

কানাই একটু রাগের গলায় বলল, আপনার দাদাটিকে আমি খুব চিনি। একেবারে হাড়ে হাড়ে। এ মানুষ যে আপনাদের পথে বসিয়ে এসেছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তবে আইন ওর পক্ষে। কিন্তু আপনারা যদি একটু চোটপাট করতেন তবে বোধহয় এভাবে তাড়াতে সাহস পেত না।

চোটপাট করব! ও বাবা! আমি ঝগড়া করতে জানিই না। একবার নারায়ণগঞ্জে একটু বচসা হয়েছিল। তাতেই এমন গো-হারা হেরে যাই।

দূর মশাই! ঝগড়ায় আবার হারজিত কিসের? ঝগড়ার নিয়ম হল, চুপ মেরে যেতে নেই, আলফাল যা মনে আসে বলে যেতে হয়। গলাটায় তেজ থাকলেই হল। তাতেই ভয় খায় লোকে।

কিন্তু আমি যে পারি না।

কাল সকালে ওনারা আসছেন, মনে আছে তো!

হ্যাঁ।

শুধু হ্যাঁ বললে তো হবে না, একটা কিছু তো করতে হবে! আমি বলি কী ওরা বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র আপনি আর দিদি ঠাকরুন খুব জোর চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন। বলার আপনাদের ঢের আছে। সব মনে করে করে চেঁচিয়ে বলতে থাকবেন। দেখবেন কাজ হবে।

বিশ্বেশ্বর করুণ স্বরে বললেন, পারব কি?

আগে থেকেই হাল ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? চেষ্টা করেই দেখুন না। আর দিদিকেও একটু তৈরি করে রাখুন।

দিদি পারবে না। ওর মৃগী ব্যারাম আছে।

সে তো আরও ভাল। সময়মতো যদি ঝগড়ার মাঝখানে ফিট হয় তবে পাঁচজনে আহা-উঁহু করবে, পক্ষও নেবে। তাতে একটা সুবিধেই। আপনিও পাঁচজনকে সাক্ষী মেনে বলতে পারবেন, এই যে দিদি ফিট হল এর কারণটা কী? কারণ ওই সর্বেশ্বর, আপন মায়ের পেটের ভাই। বাপের সম্পত্তি সব গ্রাস করে নিজের ভাই-বোনকে পথের ভিখিরি করে ছেড়ে দিয়েছে। এইসব আগড়ম বাগড়ম যা খুশি বলে যাবেন। মোটকথা থামবেন না। চালিয়ে যাবেন। কথার পিঠে হিসেব করে কথা বলারও দরকার নেই। এ তো আর চাপান ওতোরের কবির লড়াই নয়। এ হল ঝগড়া। ও ওর কথা বলবে, আপনি আপনার কথা বলে যাবেন। নাগাড়ে চলবে। আমরা ঝাড়ুনির গাঁয়ের লোক তো, আর কিছু না হোক ঝগড়া জিনিসটা জানি।

বিশ্বেশ্বর একটু সন্দিহান হয়ে বললেন, তোমার মতলবখানা কী বলো তো কানাই, বড় যে ঝগড়া শেখাচ্ছ!

কানাই বেজার মুখে বলল, কারও ভাল করতে নেই মশাই। এর মধ্যে আবার আমার মতলবখানা কী দেখলেন? আপনারা বিদেয় হলেই তো আমার বাঁচোয়া, বাবু কলকাতায় থাকে, আমি জমি জিরেত বাড়ি গোরু দেখাশোনা করি। তাতে তো আমারই পোয়াবারো। দু' হাতে লুটতে পারি। এর মধ্যে আপনারা জুটলে তো আমার অসুবিধেই হওয়ার কথা। তবু তাড়াতে চাইছি না কেন?

বিশ্বেশ্বর যুক্তিটা বুঝলেন। বললেন, তাই তো!

কলিযুগ তো। একটা লোক যে আর-একটা লোকের ভাল চাইতে পারে এটা আর আজকাল লোকের বিশ্বেস হতে চায় না।

বিশ্বেশ্বর ভারী অপ্রস্তুত হয়ে হেঁ হেঁ করে বিগলিতভাবে বললেন, না না, তুমি যে ভাল লোক এ আমরা প্রথম দিনই বুঝেছিলাম। জায়গা দিয়েছ, খেতে দিচ্ছ। নিজের দাদা তো মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, চিনতেই চাইল না।

কানাই খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশ্বেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, একটা কথা বলে দিচ্ছি, উচ্ছেদ জিনিসটা খুব সহজ কাজ নয়। আপনি যদি জোঁকের মতো লেগে থাকেন এখানে তবে আপনার দাদার বাবাও আপনাকে চট করে তুলতে পারবে না। তবে গালমন্দ সইতে হবে। অপমান গায়ে মাখলে চলবে না। একটা সুবিধেও আপনার আছে। বাবু নিজে গাঁয়ে থাকে না বলে তেমন জোর নেই ওঁর। যে নিজে জমির ওপর বাস করে না তার দখলের জোরটাও কম।

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ খুব ভয়ে-ভয়ে আমতা-আমতা করে বলেন, যদি ইয়ে, বুঝলে কানাই, যদি মারে?

মারবে? কে মারবে?

দাদা!

মারবে কী মশাই? এ কি মগের মুল্লুক? দেওয়ানি কেস, সেখানে ফৌজদারি হবে কেন?

দেওয়ানি কেস যে সেই মহাভারতের আমল থেকেই ফৌজদারিতে গড়িয়ে আসছে তা বিশ্বেশ্বর জানত না এমন নয়, তবে বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন।

কানাই আর বিশ্বেশ্বরের এই কথাবার্তা মাধব আগাগোড়া দাওয়ায় বসে হাঁ করে শুনেছে। শুনে-টুনে ভয় যে তার না হয়েছে এমন নয়। বিশ্বেশ্বরকে সে জানে। ঝগড়া কাজিয়ার লোক নয়। ভিতুও খুব। তার পিসি বিনোদবালাও নির্জীব মানুষ। এরা দু'জনে মিলে কাল সকালে ঝগড়া করবে ভাবতেই তার ভীষণ হাসি পেতে লাগল। আড়ালে গিয়ে আপন মনে একা একা হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ করে খুব একটা চোট হাসল সে।

বিশ্বেশ্বর সারাদিনই আপনমনে বসে ভাবলেন আর মাঝে মাঝে বলে উঠলেন, যদি মারে! অ্যাঁ! যদি মারে?

মাধব চুপি চুপি জ্যাঠার বাগানে ঢুকে ছোলার গাছ থেকে কিছু শুঁটি আর কয়েকটা পেঁয়াজকলি আর কিছু কড়াইশুঁটি চুরি করে বেরিয়ে পড়ল। গাঢ় সবুজ রঙের ছোলা আর মটর পেঁয়াজকলি দিয়ে এত ভাল লাগে যে বলার নয়।

ঘুরে ফিরে ওই কেশব মিত্রের বাড়ির কাছে তাকে রোজই একবার আসতে হয়। এই প্রকাণ্ড বাড়িটার সম্পন্ন চেহারা আর লক্ষ্মীশ্রী তাকে ভীষণ আকর্ষণ করে। একদিকে ধানের মরাই, পিছনে বাঁধানো ঘাটওয়ালা পুকুর, নাটমন্দির, বড় বড় দালান, থাম, সিঁড়ি যেন সৌন্দর্যে মাখা।

বাইরের মাঠটায় আজ ছোট নেট খাটিয়ে কেশব মিত্রের ছেলে আর মেয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছিল। মাধব তাদের দেখে ফের মুগ্ধ হয়ে গেল। এরা মানুষ না দেবশিশু? মেয়েটা আজ গোলাপি সালোয়ার-কামিজ পরেছে, ছেলেটার পরনে দুধ-সাদা হাফপ্যান্ট আর কলারওলা গেঞ্জি। ছোটাছুটি করে খেলছিল বলে দু'জনেরই মুখ লাল, কপালে ঘাম।

খুব কাছে যেতে সাহস পেল না মাধব। নাটমন্দিরের এক ধারটায় বসে দূর থেকে দেখতে লাগল। আরও দু'-চারটে ভদ্র চেহারার ছেলেমেয়ে কোর্টের পাশে ঘাসে বসে আছে। দান এলে খেলবে। কেশববাবুর ছেলেটাকে দিনের আলোতেও খুব ভাল করে দেখে নেয় সে। হ্যাঁ, চেহারা বটে। রূপকথার রাজপুত্র বুঝি এ রকমই হয়। একটু যদি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারত! একটু যদি ছুঁতে পারত ওকে! বড় লোভ হল মাধবের। বল কুড়িয়ে দিতে কি ডাকবে? যদি নিজে গিয়েই কুড়িয়ে দেয় মাধব তা হলে রাগ করবে না তো!

কিন্তু ভেবে কিছু ঠিক করার আগেই খেলা শেষ করে র‍্যাকেট দুই সঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভাই-বোনে ভিতরে চলে গেল। এখন হয়তো ওরা দুধ খাবে। ঘন দুধ, তাতে সর ভাসছে, তলায় জমে আছে থকথকে চিনি। ভাবতেই মাধব জিবের ঝোল সড়াৎ করে টেনে নিল মুখের মধ্যে। বহুকাল আগে সে দুধ খেয়েছিল, মনে আছে। সর বড় ভাল জিনিস।

আজও সেই ঝি-টা নাটমন্দির ধোয়াতে এসেছে। চেহারাটা কিছু কাহিল দেখাচ্ছিল। গলায় ফেট্টি জড়ানো। কাশছে। মাধবকে দেখে বিনা ভূমিকায় সটান এসে বলল, সেদিনের মতো একটু জল আজও টেনে দিবি, বাবা? বুকে বড় ব্যথা।

মাধব লাফিয়ে উঠল, দেব পিসি।

দে বাবা। একটা পেয়ারা দেবখন।

মাধব হেসে মাথা নেড়ে বলল, কিছু চাই না। আমার তো কোনও কাজ নেই, জল টানতে কী?

তুই ইস্কুলে যাস না বুঝি?

না। দেশে থাকতে যেতাম।

মাধব জল তুলে দেয়। ঝি-টা নাটমন্দির ধোয়ায়।

আজ এখানে কী হবে পিসি?

মিটিং হবে। আজ আর প্রসাদ নেই।

কিসের মিটিং?

ওসব জানি না বাবা। কিছু মাথা-মাথা লোক এক হয়ে গুজুর-গুজুর করে। একে কাঠি দেয়, তাকে কাঠি দেয়, ওসব তোর আমার জেনে কাজ কী? সেদিন কি পেসাদ পেয়েছিলি?

প্রসাদ পাইনি তো!

পাসনি? সে কী রে? শসা ছিল, পাটালি গুড়ের বাতাসা ছিল, কমলালেবু ছিল।

আমি নিইনি।

কেন? দেয়নি তোকে?

আমিই নিইনি। লজ্জা করছিল।

তুই তো আচ্ছা ছেলে রে বাঙাল! প্রসাদ কি না নিতে আছে?

একটা কথা বলবে পিসি? কেশববাবুর ছেলের নাম কী?

ভাল নাম জানি না বাবা। কৌশিক না কী যেন। তবে ডাকে চিতু বলে। মেয়ের নাম বুঝি লোপামুদ্রা না কী যেন। তার ডাকনাম চিমটি। তোর অত খাতনে কাজ কী? ওসব বড়লোকের বেটাবেটির কাছ থেকে তফাত থাকবি। ওরা বড় ভাল নয়। চিমটি কি সোজা মেয়ে? ভীষণ লাগানি-ভাঙানি স্বভাব। দিন রাত এর কথা তাকে লাগাচ্ছে, তার কথা একে। চিতু সে তুলনায় ভাল। ভোলেভালা ছেলে। কেবল বসে ছবি আঁকে আর বই পড়ে।

ছবি আঁকা কাকে বলে তা জানেই না মাধব। গাঁয়ের স্কুলে অবশ্য একটা ছবি আঁকার ক্লাস হত। কখনও যায়নি মাধব। সেটা থাকত শেষ দিকে। মাধব টিফিনেই পালাত।

কিন্তু ছবি আঁকা নিশ্চয়ই একটা সাংঘাতিক ব্যাপার! বই পড়াও!

মাধব দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাত খেয়ে একটা কাঠকয়লার টুকবো জোগাড় করে মাটির দেওয়ালে কিছু ছবি আঁকার চেষ্টা করল। একটা গাছ, সূর্য আর পাখি অনেকটা এঁকেও ফেলতে পারল সে। তবু সে জানে, চিতুর মতো হওয়া খুব শক্ত। খুবই কঠিন। পথে অনেক বাধা। আসলে চিতুর মতো হওয়া যায় না। চিতুর মতো হতে গেলে চিতু হয়েই জন্মাতে হয়।

রাত্রে মাধবের খুব ভাল ঘুম হল না। সকালবেলায় সর্বেশ্বর জ্যাঠা আর তাঁর বউ আসবেন। দারুণ ঝগড়া হবে।

না, ঝগড়ার জন্য মাধবের কোনও ভয় ছিল না। বরং উলটোটাই। ঝগড়া হবে বলে তার মজা লাগছিল।

মাধব ঝগড়া দেখবে বলে ভোরবেলায় উঠোনের এক ধারে খড়ের গাদায় উঠে বসে ছিল। ভারী নিরাপদ জায়গা। বিপদ বুঝলে গর্ত করে সেঁধিয়ে যাওয়া যায়।

জ্যাঠাইমা আর জ্যাঠামশাই এলেন একটু বেলায়। সঙ্গে পাড়ার কিছু লোক। দূর থেকেই তাদের উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল।

রিকশা থেকে নেমে জ্যাঠাইমা যখন উঠোনে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে দেখে মাধবের তেমন ভয় হল না। চেহারাটা মোটাসোটা বটে, তবে থলথলে। রিকশা থেকে নেমে উঠোন পর্যন্ত আসতেই হাঁফিয়ে পড়েছেন! মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে দম নিয়ে জ্যাঠাইমা বললেন, কোথায় সে? ডাকো তো!

সর্বেশ্বর জ্যাঠামশাই গলা খাঁকারি দিয়ে একটু উঁচু স্বরে ডাকলেন, কানাই! ও কানাই! ওই যে কে এসে দখল নিয়ে বসতে চাইছে তাকে ডাক তো!

মাধব বুঝল, জ্যাঠামশাই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কটাও স্বীকার করতে চাইছেন না। গাঁয়ের আট-দশ জন লোক বশংবদ ভঙ্গিতে তাঁদের পিছনে দাঁড়াল। এদের সামনে আত্মীয়তা স্বীকার করলে অসুবিধে হবে। নিজের ভাই আর দিদিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা তো লোকে ভাল চোখে দেখবে না। মাধব সেই বয়সেও এটা বুঝতে পেরেছিল নিতান্তই সংস্কারবশে।

কানাইকে ডাকতে হল না। বিশ্বেশ্বর বেরিয়ে এলেন। ইদানীং দাড়ি কামানো হচ্ছে না বলে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়েছে মুখে। চুলগুলো ফণা তুলে আছে মাথায়। গায়ে একটা ভুসো রঙের তুলোর কম্বল। খুবই ব্যাজার দেখাচ্ছিল তাঁকে। তবে ভদ্রতাবোধ হারাননি। দাওয়া থেকে নেমে এসে বউদির পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, বউদি, কেমন আছেন?

জ্যাঠাইমা আচমকা কথা নেই বার্তা নেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন, এ আপনাদের কীরকম ব্যবহার? অ্যাঁ! কীরকম ব্যবহার? দেশেরটা তো দু'হাতে খেয়েছেন, জিনিসপত্র বেচে আখের গুছিয়েছেন! আমরা কপর্দকহীন হয়ে কোনওরকমে এখানে এসে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করেছি সেটাও আপনাদের সহ্য হচ্ছে না? কী চান আপনারা? ছেলেপুলের হাত ধরে আমরা পথে গিয়ে দাঁড়াই!

মাধব পর্যন্ত এই কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। কথাগুলো ডাহা মিথ্যে বলে নয়। মিথ্যে কথা ছাড়া ঝগড়া হয়ও না। কিন্তু জ্যাঠাইমা এমন কান্না আর দুঃখ মিশিয়ে এত সুরে তালে কথাগুলো বললেন যে, মাধবেরও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল। অন্য লোকের বিশ্বাস তো হবেই।

বিশ্বেশ্বর বাক্যহারা হয়ে পড়েছিলেন। কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাবা যে হারবে তা মাধবেরও জানা ছিল, কিন্তু ঝগড়ার শুরুতেই এমন চুপ মেরে যাবে এটা সে আশা করেনি।

বিশ্বেশ্বর দাড়ি চুলকোতে লাগলেন। ঢোক গিলতে লাগলেন।

কানাই খড়ের গাদার পাশ থেকে হঠাৎ খক্কর খক্কর করে গলা খাঁকারি দিল। সেই শুনে বিশ্বেশ্বরও গলাটা ঝেড়ে নিয়ে হঠাৎ বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, এ বাড়ি আমার! এ বাড়ি থেকে কোন শালা আমাকে তোলে আমি দেখে নেব। ওই সর্বেশ্বর মল্লিক আমার বাবাকে লোক লাগিয়ে খুন করিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা গাপ করেছিল। ওই সর্বেশ্বর মল্লিক বেনামে আমাদের সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে এসেছে। আমাদের পথের ভিখিরি করে দিয়ে পালিয়ে এসেছে এইখানে। সর্বেশ্বর খুনি, পিতৃঘাতী, চোর...

মাধব মুগ্ধ হয়ে গেল। গা গরম হয়ে ওঠায় তার বাবা গা থেকে তুলোর কম্বলটা খুলে ফেলেছে। গায়ে শতচ্ছিন্ন গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে পাঁজরের জিরজিরে হাড় দেখা যাচ্ছে। রোগা শরীরে মাঝে মাঝে তিড়িং করে লাফও দিচ্ছেন বিশ্বেশ্বর।

কিন্তু ঠিক জমে ওঠার মুখেই ঝগড়াটা আচমকা থেমে গেল। জ্যাঠাইমা 'ও বাবা গো, বুকটা... বুকটা...' করতে করতে বুকে হাত চেপে কুঁজো হয়ে বসে পড়লেন। তারপর তাঁর শরীরটা গড়িয়ে পড়ল উঠোনে।

বিশ্বেশ্বরের লাফালাফি আর চেঁচানিতে সর্বেশ্বর এমন হতবুদ্ধিই হয়ে গিয়েছিলেন যে, নিজের স্ত্রীর পতন ও মূর্ছা প্রথমটায় তাঁর নজরেই পড়েনি।

নজরে পড়েনি বিশ্বেশ্বরেরও। তিনি নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিলেন। তখন তাঁর কথাগুলোও কিছু সৃষ্টিছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, আমাদের বাড়িতে তিনশো মণ সোনা ছিল, সব বেচে দিয়ে এসেছে ওই শয়তান... মাটি খুঁড়ে আমরা একটা পিলসুজ ছাড়া কিছুই পাইনি... সাতমহলা বাড়ি আর পাঁচশো বিঘা ধানি জমি গাপ করেছে... আমি গান্ধীজির কাছে যাব, পণ্ডিত নেহেরুকে চিঠি লিখব... ব্রিটিশদের কাছে যাব... সুপ্রিম কোর্টে মামলা করব... ইত্যাদি। নাচতে নাচতে তিনি লাকড়ির ঘরে গিয়ে কানাইয়ের কুড়ুলটা নিয়ে এলেন এবং মাথার ওপর তুলে অকারণে ঘোরাতে লাগলেন।

এদিকে সর্বেশ্বরের স্ত্রী শোভনাসুন্দরীকে ধরাধরি করে তুলে দাওয়ায় শোয়ানো হয়েছে। খবর পেয়ে একজন ডাক্তার এসে সেই চেঁচামেচির মধ্যেই তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন, সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক। এক্ষুনি হাসপাতালে নেওয়া দরকার।

শোভনাসুন্দরীকে নিয়ে লোকজন চুপচাপ বিদায় হয়ে গেল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর নাগাড়ে চেঁচাতেই লাগলেন। চোখ লাল, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে, ছেঁড়া গেঞ্জি আরও খানিকটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে, গা থকথক করছে ঘামে। বিনোদবালা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ভয়ে জড়োসড়ো। মাধব খড়ের গাদা থেকে নামতে সাহস পাচ্ছে না। কানাই পর্যন্ত কাছে এগোতে ভরসা করছিল না। তবে সেই শেষ অবধি গিয়ে আচমকা জাপটে ধরে বিশ্বেশ্বরকে পেড়ে ফেলল। কুড়ুলটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, আর নয়। এবার ক্ষ্যামা দিন। ওঁরা সব বিদেয় হয়েছেন।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! নিরীহ, বিবাদবিমুখ, মুখচোরা বিশ্বেশ্বরের ভিতর একটা বাঁধ হঠাৎ ভেঙে ঘৃণা, আক্রোশ, প্রতিহিংসা এমনভাবে বেরিয়ে আসছে যে তা ঠেকানোর কোনও উপায়ই কেউ করতে পারল না।

কানাই শুধু মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে বলছিল, যে কাণ্ড করলেন তাতে পুলিশ না এসে যায় না।

এখন চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ জিরোন। পুলিশ এলে বিস্তর বকাবে।

কোনও এক রহস্যময় কারণে পুলিশ কিন্তু এল না। জ্যাঠামশাই বা জ্যাঠাইমা বা তাঁদের পক্ষে লোকেরাও কেউ আর এমুখো হল না। তবে পাড়া-প্রতিবেশীরা জড়ো হয়েছিল মেলাই। তাদের মধ্যে কয়েকজন সাহসী যুবক বিশ্বেশ্বরকে ধরে প্রায় চ্যাংদোলা করে ঘরে নিয়ে শোয়াল এবং বিনোদবালা তাঁর মাথায় জল ঢালতে লাগল।

সেদিন বিকেলে গাঁয়ের রাস্তায় বেরিয়েই মাধব টের পেল, সে বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছে। পাঁচজনে তাকাচ্ছে তার দিকে, কিছু বলাবলিও করছে। মাধব জীবনে এই প্রথম টের পেল তাদের মতো লোকের দিকেও মানুষেরা তাকায় বা তাদের নিয়ে আলোচনা করে। এক রকম ভালই লাগছিল তার। জীবনে একেবারে তুচ্ছ হয়ে বেঁচে থাকাটা কিছু নয়। তার চেয়ে তুলকালাম কিছু করে সকলের নজরে থাকাও ভাল।

বাজারের কাছটায় একটা বাঁধানো বটগাছের তলায় কয়েকজন বুড়ো মানুষ গুলতানি করছিল। রোজই করে। তাদের মধ্যে একজন আজ হঠাৎ তাকে দেখে ডাকল, এই খোকা, শোন।

মাধব এগিয়ে গেল, কী বলছেন?

তুই কি মল্লিকদের ছেলে?

হ্যাঁ।

সর্বেশ্বর তোর কে হয়?

জ্যাঠামশাই।

বাঃ, জ্যাঠা একখানা বাগিয়েছিস বটে। তা তোর জ্যাঠার কাণ্ডখানা কী বল তো! শুনলুম, নিজের বাপকে কেটে নাকি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে!

মাধবের মাথাটা চড়াক করে উঠল। কথাটা তার সকালে তেমন খেয়াল হয়নি। কিন্তু এরকম একটা কথা তার বাবা বিশ্বেশ্বর তার জ্যাঠাকে বলেছিল বটে। কী করে যে বিশ্বেশ্বরের মাথায় কথাটা এসেছিল তা কে জানে! তবে বলেছিল ঠিকই ঝোঁকের মাথায়। হয়তো এরকম একটা অস্পষ্ট সন্দেহ বিশ্বেশ্বরের মনের মধ্যে বহুকাল ধরে ছিল। এতদিন প্রকাশ পায়নি। ঝোঁকের মাথায় এখন বেরিয়ে গেছে।

মাধব সত্যি কথাই বলল, আমি জানি না।

কিন্তু তোর বাবাই বলল যে! অতগুলো লোকের সামনে সকালবেলায় দাঁড়িয়ে কি তোর বাবা মিথ্যে করে বলল? কই তোর জ্যাঠামশাই বা জ্যাঠাইমা তো কোনও প্রতিবাদ করল না। ঠিক কথাটা বল না!

দাদু জয়ধ্বজ খুন হয়েছেন এ কথাটা মনেপ্রাণে মাধব কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করলে তার চলবেও না। দাদু পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই কোনও রহস্যময় কারণে তিনি আত্মগোপন করে আছেন। একদিন হঠাৎ দেখা দেবেন এবং তাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

মাধব তাই মাথা নেড়ে বলল, দাদু মরেনি। সাধু হয়ে গেছে। শিগগির আসবে।

বুড়োরা হাঁ করে তাকে তাকিয়ে দেখল। একজন বলল, আ মোলো, এ যে আবার উলটো কথা বলে!

আর-একজন বলল, আরে না। হিন্দুর ছেলে, চট করে কি বাপকে মারতে পারে? ও হল আলাদা রক্ত।

আরে, রাখো তোমার হিন্দু। বাঙাল দেশে ও রকম কত হচ্ছে আকছার। ওখানকার হিঁদু আবার হিঁদু নাকি!

মাধব এইটুকু শুনেই সেখান থেকে সরে পড়ে। বাঙালদের অনেক দোষ।

আজও বাড়ির সামনে নেট টাঙিয়ে চিতু আর চিমটি ব্যাডমিন্টন খেলছিল। তবে আজ মাত্র

দু'জনই, অন্য কেউ ছিল না। গাঁয়ের ক্লাবে আজ স্পোর্টস ছিল, বিকেলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন আর সেই সঙ্গে থিয়েটার। বাচ্চারা সব সেইখানে গিয়ে জুটেছে আজ। মাধব যায়নি। তাকে ঢের বেশি টানছিল চিতু আর চিতুদের এই বাড়ি।

ভাইবোন খেলতে খেলতে হাপসে পড়েছে। বিশেষ করে চিমটি। কোমর ধরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে হি হি করে হাসছে দাদার দিকে চেয়ে। আর বলছে, উঃ, আর পারছি না। বাব্বাঃ, যা জলতেষ্টা পেয়েছে।

চিতু রাগ করে বলে, এই জন্যই মেয়েদের সঙ্গে খেলতে নেই, জানিস তো! মেয়েরা কিছু পারে না।

আচমকা চিতুর চোখ পড়ল মাধবের দিকে। বলে উঠল, এই, তুই খেলতে পারিস?

হাঁ করে চেয়ে ছিল মাধব। চোখে মুগ্ধ সম্মোহিত ভাব। চিতু যখন তার সঙ্গে কথা বলল তখন তার বিশ্বাসই হল না ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ সময় গেল তার বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে। এ কথা ঠিক যে সে ব্যাডমিন্টন খেলতে জানে না। কিন্তু চিতুকে কি সে কথা বলা যায়? চিতুর জন্য সে এই মুহূর্তে প্রাণ অবধি দিতে পারে।

মাধব ঘাড় নেড়ে বলে, পারি।

আয়। এই চিমটি, তোর র‍্যাকেটটা ওকে দে তো!

হাত বাড়িয়ে র‍্যাকেটটা নেওয়ার সময় সে চিমটির গা থেকে ভারী অদ্ভুত একটা সুগন্ধ পেল। এত সুন্দর গন্ধ সে জীবনে পায়নি। বজ্রযোগিনী গাঁয়ের স্কুলে একটা ছেলে মহাভৃঙ্গরাজ তেল মাখত। আর পালে-পার্বণে মহিম শেখের বাড়িতে আতরের তুলো সবাই কানে গুঁজে রাখত। সেইসব সুগন্ধ তার মনে আছে। আর জানে কিছু চুলের গন্ধ। কিন্তু চিমটির গায়ের গন্ধ অন্যরকম। এ যেন অন্য এক পৃথিবীর গন্ধ, যেখানে মাধব কখনও যায়নি, যেতে পারবেও না কোনওদিন।

মাধব খেলতে জানে না। কিন্তু তার দম অফুরন্ত। পাখির পালকে তৈরি হালকা শাটল ককটা ঠিক কোন জায়গায় ফেলতে হবে তার জানা ছিল না। কত জোরে মারতে হবে তাও সে জানে না। গায়ের জোরে মারতে গিয়ে সে প্রথমেই ককটাকে আকাশে ওড়াল। পরের বার ফেলল দশ হাত বাইরে।

চিতু বিরক্ত হয়ে বলে, এই যে বললি জানিস। কিছুই তো জানিস না।

মাধব ভয় পেয়ে বলে, পারব। একটু শিখিয়ে দাও।

অন্য কোনও ছেলে হলে তাকে তাড়িয়ে দিত। চিতুর মনটা নরম। তাড়াল না। বরং হাসল। বলল, এ কি একদিনে শেখা যায়? মিথ্যে কথা বললি কেন বল তো!

মাধব বলতে পারত, তোমার জন্য। তোমার জন্য মিথ্যে কথা তো সামান্য, আরও অনেক কিছু করতে পারি আমি।

কিন্তু সেকথা কি আর বলা যায়! মাধব শুধু লাজুক হাসি হাসল।

তবে প্রচণ্ড অধ্যাবসায়, প্রচণ্ডতর মনোযোগ এবং আগ্রহের বশে সেই একদিনেই খেলাটা প্রায় বারো আনা শিখে ফেলল সে। শিখতেই হবে, নইলে চিতু তাকে কাল খেলায় নেবে কেন?

কিছুক্ষণ খেলেই অবশ্য চিতু খেলা থামাল। বলল, আজ আর নয়।

মাধব বলল, নেটটা গুটিয়ে দেব?

দে। তুই কোন বাড়ির ছেলে? আগে দেখিনি তো!

খুব যত্নের সঙ্গে নেটটা খুলে ভাঁজ করতে করতে মাধব বলে, ওই সর্বেশ্বর মল্লিকের বাড়ি। উনি আমার জ্যাঠামশাই।

চিতু সর্বেশ্বরকে চিনল না। বলল, অনেক দূর তোদের বাড়ি?

বেশি দূর নয়। কাল আবার আসব তো?

আসিস।

খেলায় নেবে?

নেব।

মাধবের মনে হল, সারা জীবনে এর চেয়ে ভাল একটা দিন আর আসেনি। এত সুখ সে কখনও বোধ করেনি। এমন জেগে থেকেও স্বপ্নের মতো ঘটনা ঘটে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও এই তার প্রথম। তার মনে হয়েছিল, এর চেয়ে অলৌকিক আর কী হতে পারে?

মাধবের সেই সুখের দিনটিতেই বিশ্বেশ্বরের পাগলামির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল। সুখের এক অচেনা হাওয়ায় বেলুন হয়ে ভাসতে ভাসতে সে যখন বাড়ি ফিরল তখন বিশ্বেশ্বর সারা গায়ে মাটি মেখে শাবল দিয়ে উঠোনের এক কোণে গর্ত করছেন আর বিড় বিড় করে বলছেন, এইখানেই লুকিয়ে রেখেছে... তিনশো মণ সোনা... তিনশো মণ... বাবার লাশটা কোথায় গেল? অ্যাঁ! বাবার লাশ!

বিনোদবালা হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন। কানাই দাওয়ায় বসে বিড়ি টানতে টানতে চিন্তিতভাবে চেয়ে ছিল। পুরো দৃশ্যটাকে দৃশ্যমান করছিল একটা ধোঁয়াটে হ্যারিকেন।

সুখ ও দুঃখের এ রকম মুখোমুখি সংঘর্ষও মাধবের জীবনে বেশি ঘটেনি। সে হাঁ হয়ে চেয়ে রইল। বিশ্বেশ্বর আধপাগলা ছিলেনই, এখন পুরোপুরি পাগল।

পাঁচ: মাধবের আবার বিদ্যারম্ভ ও বিশ্বেশ্বরের নতুন জগৎ

বিশ্বেশ্বর সারা রাত ঘুমোলেন না। দাওয়ায় বসে বকবক করতে লাগলেন। ঘরে এসে মাঝে মাঝে দেয়ালে লাথি মেরে দুমদাম শব্দ করলেন। হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন আপনমনে। কেউ ভাল করে ঘুমোতে পারল না।

পরদিন সকালে কানাই গিয়ে ঝাড়ুনিকে ডেকে আনল। ভূতে পেলে, বিছে কামড়ালে, কিছু হারিয়ে গেলে গাঁয়ের গরিব লোকেরা ঝাড়ুনিকে ডাকে। তার মেলা গুণ। ভূত ছাড়ায়, বিষ নামায়, হারানো জিনিসের সন্ধান দেয়।

মাধব অবাক হয়ে দেখল ঝাড়ুনির তাদের ওপর কোনও রাগটাগ নেই। দিব্যি স্বাভাবিক মুখেই এসে উঠোনে দাঁড়াল। পরে সে শুনেছে, ঝাড়ুনি পয়সা নিয়ে ঝগড়া করে বটে কিন্তু সেটা রাগ বা বিদ্বেষ থেকে নয়।

ঝাড়ুনি একটা নাপিত ডাকতে বলল। তার কথামতো নাপিত এসে বিশ্বেশ্বরের তালুতে চৌকো করে একটা অংশ কামিয়ে ফেলল। সেখানে ওষুধের চাপান দিয়ে মন্ত্র পড়ে ঝাড়ুনি চলে যাচ্ছিল। বিশ্বেশ্বর জ্বল জ্বল করে চেয়ে ছিলেন, এতক্ষণ কিছু বলেননি। এখন হঠাৎ উঠে গিয়ে ঝাড়ুনির পিছনে কঁ্যাৎ করে একটা জোর লাথি মেরে বললেন, হারামজাদি!

ঝাড়ুনি পড়ে গিয়ে উঠে বিশ্বেশ্বরের গালে একটা থাবড়া মেরে বলল, ঝাঁটা মারি তোর মুখে, গু-খেকোর ব্যাটা!

মাধব হি হি করে হেসে ফেলল।

ঝাড়ুনি চলে যাওয়ার পর বিশ্বেশ্বর খুব গম্ভীর মুখে তুলোর কম্বলটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবখানা এমন যেন খুব জরুরি কাজে বেরোচ্ছেন।

বিনোদবালা দৌড়ে এসে মাধবকে একটা ঠেলা দিয়ে আর্তস্বরে বলে ওঠে, যা যা, তোর বাপের পিছু পিছু যা। কোথায় যাবে, কী করবে ঠিক নেই। কাউকে বুঝি মেরেই বসে।

মাধব বিশ্বেশ্বরের পিছু নিল। তবে বিশ্বেশ্বর তেমন বিপজ্জনক কিছু করলেন না। খুব গম্ভীর মুখে পিছনে হাত দিয়ে এবং একটু ঝুঁকে গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে খুব

মনোযোগ দিয়ে রাস্তার পাশের কোনও বাড়িকে লক্ষ করেন। কোনও গাছের নীচে এসে ওপর দিকে চেয়ে কী যেন খুব মন দিয়ে দেখতে থাকেন। বাজারে ঢুকে প্রায় সব ব্যাপারির কাছেই গিয়ে দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র নিরিখ করেন। এইভাবেই চলতে থাকল। বাবার পিছু নিতে গিয়ে হাঁফ ধরে গেল মাধবের। সে বলল, বাবা! ও বাবা! বাড়ি চলুন।

দাঁড়াও, কাজ আছে।

পাগলদের কাজের অন্ত থাকে না, এ কথা মাধব অভিজ্ঞতা বলে জানে। কাজেই সে এক সময়ে বিশ্বেশ্বরকে ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়ল।

বিশ্বেশ্বর একবার মাধবের দিকে চাইলেন পিছন ফিরে। ডান হাতি ঢালু জমি বেয়ে নেমে একটা পুকুরের পাড় ধরে ছেলেটা চলে যাচ্ছে। তিনি জানেন, এটা তাঁরই ছেলে। কিন্তু চিন্তার বিচ্ছিন্নতাবশত তিনি নিজেকে সুস্পষ্ট 'আমি' বলে অনুভব করতে পারছিলেন না। ফলে, 'আমার ছেলে' এই বোধটাও তাঁর আর অবশিষ্ট ছিল না। তবে এই ছেলেটিকে দেখলেই তাঁর কথা দু'টি মনে পড়ে যাবে 'আমার ছেলে'।

চারদিকে চেয়ে বিশ্বেশ্বর বুঝলেন তিনি একটা ভারী নতুন জায়গায় এসে পড়েছেন। এখানে কোনও কিছুর সঙ্গেই আর কোনও কিছুর সম্পর্ক নেই। চারদিকে যা কিছু দেখছেন সবই বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্করহিত। যেমন তিনি আকাশ চেনেন, পুকুর চেনেন, গাছ চেনেন, রাস্তা কাকে বলে জানেন, কিন্তু এগুলো এখানে কেন রয়েছে, এসবগুলো মিলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় তা আর তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়।

একটা বাঁধানো গাছতলার নীচে কয়েকজন বুড়ো মানুষ বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন হাতছানি দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে ডাকল। বিশ্বেশ্বর ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইলেন। হাতছানি দেওয়াটার অর্থ তাঁর বোধগম্য হল না। তবে আশ্চর্যের বিষয় তিনি নিতান্ত অভ্যাসবশে এগিয়ে গেলেন।

বুড়োরা সরে একটু জায়গা করে দিল বসার জন্য। একজন ভারী খাতিরের গলায় বলল, আরে বসুন, বসুন। আপনিই তো সর্বেশ্বরের ছোটভাই, তাই না?

বিশ্বেশ্বর খুব সন্দেহের চোখে চেয়ে রইলেন। একটা গাছ, তার তলায় কয়েকটা লোক কেন বসে আছে সেটা তিনি বুঝলেন না। এভাবে বসে থাকার মানে কী? তিনি তবু বসলেন এবং একজন ধূমপায়ী বুড়োর দিকে নিঃসংকোচে হাত বাড়িয়ে বললেন, একটা সিগারেট দিন তো, খাই।

লোকটা একটু থতমত খেল এবং অনিচ্ছের সঙ্গেই একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কথাটা কি তা হলে সত্যি? আপনার বাবাকে ওই সর্বেশ্বর মল্লিকই লোক লাগিয়ে খুন করায়!

সিগারেটটা তাঁর বেশ লাগছিল খেতে। তিনি নীরবে বসে টেনে যাচ্ছিলেন। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। একজন বুড়ো কানের কাছে মুখ এনে বলে, বলি ও কর্তা!

বিশ্বেশ্বর ভিতরে-ভিতরে খুব একটা দেমাক বোধ করছিলেন। এই শালারা কিছু জানে না। ভাবতেই তাঁর খুব হাসি পেল এবং তিনি হাসতে গিয়ে গলায় ধোঁয়া আটকে কিছুক্ষণ কাশলেন। তারপর ফের হি হি করে হাসতে লাগলেন দুলে দুলে। তিন বুড়ো হাসি দেখে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। একজন বলল, পাগল নাকি!

তোর বাবা পাগল।— বলে বিশ্বেশ্বর উঠে খুব গম্ভীরভাবে হাঁটতে লাগলেন। চারদিকে চেয়ে এই নতুন জগৎটাকে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। সামনেই একটা পুকুর দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এটা যে পুকুর এটা তিনি জানেন। কিন্তু এখানে পুকুরটা থাকার মানে কী? কেন এটা এখানে রয়েছে? ভাবতে ভাবতেই তিনি পুকুরের দিকে মুখ করে পেচ্ছাপ করতে বসলেন এবং বললেন, জল বাড়িয়ে দিয়ে গেলাম। এখন খা শালারা জল তুলে।

পেচ্ছাপ করে বেশ আনন্দ হল তাঁর। মনে হল একটা কাজের মতো কাজ করা গেছে। এরকম

কাজ আরও কিছু করা যায় না? ভাবতে ভাবতে তিনি সামনেই একটা চলন্ত রিকশা দেখে হাত তুলে বললেন, রোখকে রোখকে।

রিকশাটা থামল। বিশ্বেশ্বর উঠে পড়লেন। বস্তুত তিনি বহুকাল রিকশায় চড়েননি। তাঁর খুবই ভাল লাগতে লাগল।

রিকশাওলা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

চলো, একটু ওদিকটা ঘুরে আসি।

রিকশাওলা সন্দিহান চোখে সওয়ারির দিকে তাকাল। বিশ্বেশ্বরের চেহারা রিকশায় ওঠার মতো নয়। পকেটে পয়সা আছে বলে মনেও হয় না। কাজেই সে জিজ্ঞেস করল, ভাড়া দেবেন তো!

ভাড়া! খুব হাসি পেল বিশ্বেশ্বরের। ভাড়া কিসের? ভাড়াটা আবার কিসের? শালারা বোঝে না। তিনি তো কোথাও যাবেন না। একটু ঘুরে আসবেন মাত্র। তাতে ভাড়ার কথা ওঠে কেন?

রিকশাওলা তেড়িয়া হয়ে বলল, নেমে যান তো দাদু। নামুন।

বিশ্বেশ্বর নামবার পাত্র নন। গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন।

বেশ একটা চেঁচামেচি আর গন্ডগোল পাকিয়ে উঠল। কিন্তু তবু রিকশায় বসে থাকতে বিশ্বেশ্বরের খুবই ভাল লাগছিল। কিছু লোক রিকশা ঘিরে ধরে চেঁচামেচি করত ঠিকই, কিন্তু তাদের অগ্রাহ্য করে তিনি চারদিকে চেয়ে তাঁর নতুন জগৎটিকে দেখছিলেন। তাঁর মনে হল জীবনে আর দুঃখ করার মতো কিছুই নেই। এখন তিনি যা খুশি করতে পারেন।

এইভাবেই বিশ্বেশ্বর আর সকলের সঙ্গে এক মাটিতে থেকেও একটা আলাদা জগতে বসবাস শুরু করলেন। রোজই তিনি আগের দিনের কথা ভুলে যেতেন। রোজই যা করতেন, মনে হত, এ ভারী নতুন কিছু একটা করা গেল।

যেদিন বিশ্বেশ্বর তাঁর নতুন জগতের মধ্যে প্রবেশ করলেন সেইদিন মাধবও এক নতুন জগতের সন্ধান পেল।

সেইদিন বিকেলে সে যথারীতি হাজির হয়েছিল চিতুদের বাড়ির মাঠে। অনেক ছেলেপুলে ভিড় করেছিল কোর্টের চারদিকে। সেই ভিড় দেখে মাধবের বুক দমে গেল। আজ আর চিতু খেলতে ডাকবে না তাকে।

কিন্তু মাধবের ভাগ্য ভালই বলতে হবে। ছেলেদের মধ্যে র‍্যাকেট নিয়ে একটা ঝগড়া বেঁধে উঠল। মারপিট লাগার উপক্রম। একটা গোঁফওয়ালা ষণ্ডামতো লোক চেঁচামেচি শুনে ভিতরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে উঠল, অ্যাই চোপ! বেরো, বেরো এখান থেকে। কান ধরে বেড়াল-পার করে দেব একেবারে।

সেই রক্তচক্ষু আর বজ্রগর্জন এবং সেই পেল্লায় চেহারা ও গোঁফ এমনই ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যে, চোখের পলকে ছেলেগুলো হাওয়া হয়ে গেল। চিতু একা বেকুবের মতো নিজের কোর্টে দাঁড়িয়ে আছে। আজ চিমটিও নেই। চিতু একদম একা।

লোকটা গনগন করতে করতে ফের ভিতরবাড়িতে চলে যাওয়ারও অনেকক্ষণ পরে মাধব কোর্টের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি খেলব?

চিতু তার দিকে চেয়ে হাসল। সে হাসি যে কী সুন্দর তা বলার নয়। বলল, আয়।

পাখির পালকে তৈরি একটা কলকের মতো দেখতে পলকা জিনিস আর জাল লাগানো বড় হাতার মতো ব্যাট যে কী অফুরন্ত আনন্দ দিতে পারে তা খেলতে গিয়ে বুঝল মাধব। আসলে খেলাটা তো নয়, তার আনন্দের উৎস ছিল ওই চিতু।

খেলার পর আজও মাধব নেট গুটিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, কাল আবার আসব তো?

চিতু মাথা নেড়ে বলে, কাল তো আমরা কলকাতায় চলে যাচ্ছি।

মাধবের ভিতরে যেন একটা আলো নিভে গেল। করুণ স্বরে সে বলল, আবার কবে আসবে?

তার কিছু ঠিক নেই। তুই যেন কোন বাড়ির ছেলে!

সর্বেশ্বর মল্লিক। ওই ওদিকে।— হাত তুলে একটা দিক নির্দেশ করল মাধব।

চিতু চিনল না। তবে মাথা নেড়ে বলল, র‍্যাকেট আর নেট আমার ঘরে পৌঁছে দিবি আয়।

মাধবের যেন বিশ্বাস হল না। চিতু তাকে তার ঘরে ডাকছে! সত্যিই ডাকছে? সে ভুল শুনছে না তো!

চিতুর পিছু পিছু নেট আর র‍্যাকেট নিয়ে যখন এই স্বপ্নের বাড়িটার দোতলায় উঠছিল মাধব তখন তার চোখের পলক পড়ছিল না। বজ্রযোগিনী গাঁয়ে তাদের বাড়ি আরও বিশাল ছিল বটে, কিন্তু তার এমন শ্রী ছিল না। জ্ঞান হয়ে অবধি সে দেখেছে নোনাধরা দেয়াল, ঝুলে আচ্ছন্ন ঘর, ফাটা চটা ওঠা মেঝে, ভাঙা রেলিং, আসবাবপত্র নিতান্তই সামান্য। চিতুদের বাড়ি ঝকঝকে, তকতকে। কত জিনিস। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই সে দেয়াল-ঘড়ির টং শব্দ শুনতে পেল।

যে ঘরে চিতু তাকে নিয়ে এল সেই ঘরে একধারে মস্ত একটা পালঙ্ক। কালো পালিশওলা সেই পালঙ্কে পদ্মফুলের নকশা। বিছানায় বুক অবধি লেপ টেনে শুয়ে আছে চিমটি। হাতে খোলা বই। সাড়া পেয়ে তাকাল।

এই দাদা, ও কে রে? কালকের সেই ছেলেটা না?

হ্যাঁ।

ওর নাম কী? এই, তোর নাম কী রে?

মাধবচন্দ্র মল্লিক।

মাধবচন্দ্র! হিঃ। হিঃ।

চিতু ধমক দিল, হাসার কী হল?

ওইটুকু ছেলে তার নামে আবার চন্দ্র। এই, তুই কী পড়িস?

মাধব লাজুক মুখে মাথা নেড়ে বলে, পড়ি না।

এ জবাবে অবাক হল না চিমটি। এ রকম বহু ছেলে পড়ে না। তবু সে জিজ্ঞেস করে, এ বি সি ডি জানিস?

জানি।

অ আ?

জানি?

অক্ষর লিখতে পারিস?

তা পারি।

ওমা! তবে তো অনেক জানিস!

মাধব চিমটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তোমার কী হয়েছে? শুয়ে আছো যে!

চিমটি একটু অবাক হল এ প্রশ্নে। যেন তার কুশল জিজ্ঞাসা করাটাও মাধবের একটা স্পর্ধা। তবে চিমটি একটু করুণ করে হাসার চেষ্টা করে বলল, জ্বর। নিরানব্বই। নিরানব্বই কী বল তো?

জ্বরের মাপ তো। থার্মোমিটারে ওঠে।

তুই তো অনেক কিছু জানিস। কমলালেবু খাবি?— বলে চিমটি পাশের একটা গোল টেবিল থেকে একটা কমলালেবু তুলে হাতটা বাড়িয়ে বলল, নে।

মাধব লজ্জা পেয়ে মাথা নেড়ে বলে, আমার লাগবে না। তুমি খাও।

আমি সারাদিন খাচ্ছি। তিনটে বিচি গিলে ফেলেছি খেতে গিয়ে। হিঃ হিঃ।

হাসিটা এত সুন্দর যে মুখ থেকে খুঁটে তুলে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মাধব কমলালেবু খুব লজ্জার সঙ্গে নিল। তবে খেল না। মুঠোয় করে রইল।

চিমটি বলল, তুই আর কী পারিস?

আমি!— বলে মাধব মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। সে পারে অনেক কিছু। আবার পারে না-ও অনেক কিছু। কোনটা বললে মেয়েটাকে খুশি করা যাবে তা সে ভেবে পেল না। তাই বেশি চিন্তা না করেই বলল, আমি সাঁতার কাটতে পারি, ছুটতে পারি, গাছ বাইতে পারি, পাখি ধরতে পারি, বাসন মাজতে পারি।

দূর বোকা! অ্যারিথমেটিক পারিস? বল তো তিন সাতে কত হয়?

একুশ। ও তো নামতা।

তা হলে যে বললি পড়িস না!

পড়তাম। দেশে থাকতে। এখন আর পড়ি না।

কেন পড়িস না?

কেউ পড়তে বলে না তো!

তোর কেউ নেই?

আছে। পিসি আর বাবা।

কোন বাড়িতে থাকিস?

সর্বেশ্বর মল্লিকের বাড়ি।

সেটা আবার কে?

আমার জ্যাঠামশাই।

কোন বাড়িটা বল তো!

দরগার কাছে। মাটির বাড়ি।

ও মা! ও তো রহিম শেখের বাড়ি!

ওটাই। রহিম চাচা মরে গেছে।

চিমটি লেপ ফেলে উঠে বসল, মরে গেছে! কবে?

এক বছর হবে। সাপে কামড়েছিল।

ইস!

চিমটির চোখ ছলছল করতে থাকে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, তুই হানাকে চিনিস?

হানার নামে মাধবের বুকটা দোল খেয়ে গেল। সেই মুড়ি কদমা, সেই মুখ ভেঙানো। বলল, চিনি। তুমি চেনো?

ওমা! চিনব না কেন? হানা আমাদের বাড়ি রোজ ছাগলের দুধ দিয়ে যেত। কত খেলতাম আমরা! তুই ওদের চিনলি কী করে?

দেশের বাড়িতে।

রহিম চাচার বাড়ি যারা কিনেছে তারা তো বাঙাল।

আমাদের ঢাকায় দেশ।

তাই তোর কথাগুলো যেন কেমন!

মাধব খুব লজ্জা পায়। একটু হাসে।

লুডো খেলতে পারিস?

মাধব ঘাড় নাড়ে। পারে।

তা হলে কাছে এসে বোস মেঝের ওপর।— বলে লুডোর ছকটা বালিশের পাশ থেকে নিয়ে সামনে বিছানার ওপরেই পাতল চিমটি। তারপর হঠাৎ বলল, এঃ তোর গায়ে যা গন্ধ না! ভূত পালায়। স্নান করিস না?

করি।— মাধব খুব অপ্রস্তুত হয়ে বলে।

তা হলে গায়ে ওরকম চিমসে গন্ধ কেন?

চিতু এতক্ষণ একটা চেয়ারে বসে জিরোচ্ছিল। কিছু অন্যমনস্ক গম্ভীর কথা তার কানে যাচ্ছিল না। এখন হঠাৎ বোনকে ধমক দিয়ে বলল, গন্ধ সহ্য হয় না তো খেলতে ডাকছিস কেন? ওরা তো তোর মতো সাবান দিয়ে চান করে না!

চিমটি গুটি সাজাতে সাজাতে বলে, ঠাকুমা তোকে এ ঘরে দেখলে খুব বকবে। ঠাকুমার যা শুচিবাই!

তা হলে আমি চলে যাই?

না, বোস। ঠাকুমা দোতলায় উঠতে পারে না। কোমরে বাত তো।

তোমার মা বকবে না তো?

চিমটি মাথা নাড়ে, না। মা কাউকে বকে না। তোর ভয় নেই।

মাধব যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ স্বপ্নের মতো, ঘোরের মতো একটা কিছু ঘিরে ছিল তাকে। এত কাছাকাছি চিমটি আর চিতুকে দেখবে, তাদের সঙ্গে খেলবে, তাদের ঘরে ঢুকবে এ তার সব ধারণার বাইরে ছিল। সারাক্ষণ এক স্বর্গের গন্ধ পেল সে, স্বর্গের শব্দ শুনল।

খুব বেশিক্ষণ নয় অবশ্য। দু'দান খেলতেই চিমটির চোখ ছলছল করতে লাগল। নিজেই নিজের গায়ের তাপ দেখল হাতের উলটোপিঠ দিয়ে। শ্বাস গরম কি না পরীক্ষা করল নিজের হাতে শ্বাস ফেলে। শঙ্কিত-হৃদয় মাধব চেয়ে ছিল তার দিকে। জিজ্ঞেস করল, জ্বর আসছে তোমার?

বোধহয়। মাথাটা ধরেছে। তুই এখন যা। আমরা যখন আবার আসব তখন আসিস।

তুমি জ্বর গায়েই কাল চলে যাবে?

চিমটি করুণ গলায় বলে, স্কুল আছে না!

পারবে যেতে?

দেখি। আমি তো গাড়ির পিছনের সিটে শুয়ে থাকব।

তোমাদের গাড়ি আছে?

দুটো। তোকে চড়াব একদিন। আমি যখন চালাতে শিখব তখন।

মাধব মাথা নাড়ল। কমলালেবুটা বুকে নিয়ে উঠে পড়ল।

চিতু চেয়ারে বসে একটা বই দেখছিল। তার দিকে চেয়ে বলল, তুই স্কুলে পড়িস না কেন?

স্কুলে?— বলে খানিকক্ষণ ভাবল মাধব। তারপর বলল, আমাকে নেবে না।

কেন নেবে না?

মাইনে দিতে হবে না? কে দেবে বলো!

তোরা খুব গরিব, না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা যা। সামনের শনিবার দেখা করিস।

তুমি আসবে?

আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই শুক্রবার আসি। সোমবার খুব ভোরবেলা চলে যাই।

এরা যে একটু অন্যরকম তা বুঝতে পারছিল মাধব। তার মতো হা-ভাতে ছেলেকে এরা পাত্তা দেয় না। কিন্তু এরা দিল। কেন দিল তা বুঝতে পারে না সে। শুধু বুঝতে পারে এরা অন্যরকম।

চিতু আর চিমটি যে অন্যরকম সে বিষয়ে মাধবের সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই। তার কারণ হল, চিতু ও চিমটির বাবা কেশব মিত্র এম এল এ এবং একজন নেতা হওয়ার দরুন তাঁর বাড়িতে হরবখত নানা রকম লোকের আনাগোনা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই চিতু আর চিমটি নানা রকমের লোক দেখতে অভ্যস্ত। ফলে মানুষ সম্পর্কে তাদের তেমন কঠোর ভেদবুদ্ধি নেই। উপরন্তু চিতু ও চিমটির দাদামশাই এবং মামারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত ধার্মিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। মামাবাড়িতেও তারা সর্বদা অর্থী প্রার্থীদের অন্তহীন আনাগোনা দেখেছে। মানুষ সম্পর্কে তাদের শুচিবায়ু তো নেই-ই,

উপরন্তু গরিব নাচার কাউকে দেখলে তারা একটু বেশি সহৃদয় হয়ে ওঠে।

এই ঘটনার মাসখানেকের মধ্যেই মাধব স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। সম্পূর্ণ ফ্রি এবং বইখাতাও স্কুল থেকে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে সে চিতুর কিছু পুরনো জামা-প্যান্ট পেয়ে গেল। আর চিমটি তাকে দিল একখানা সাবান।

কারও কারও মনে হতে পারে যে, এ হল ইচ্ছাপূরণের গল্প। সে রকম মনে হওয়াটা খুব স্বাভাবিকও। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মাধব আছে। তাদের চিতু বা চিমটির মতো শুভানুধ্যায়ী হুট করে কেউ জুটে যায় না। তারা স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। পুরনো জামা-প্যান্ট বা সাবানও পেয়ে যায় না। এসব গল্পেই সম্ভব। এবং এর পর হয়তো মাধব পরীক্ষায় ফার্স্টও হতে থাকবে, চাই কি চিমটির সঙ্গে প্রেমও ঘটে যাবে, যেমনটা গল্পে ঘটে আর কী!

এ কথা ঠিকই, মাধব নামক আহাম্মকটির জীবনের এই অংশে এ রকম একটু ইচ্ছাপূরণের ঘটনা আকস্মিকভাবেই ঘটে যায়! কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এবং মাধবের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির হিসাব শেষ হলে কী দাঁড়ায় সেইটিই আমাদের মতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ছয় : সর্বেশ্বরের বিপদ ও বিশ্বেশ্বরের নানা অভিজ্ঞতা

শোভনাসুন্দরী আকস্মিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সর্বেশ্বর যে ঘোরতর বিপদে পড়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। ভাগ্যক্রমে কেশব মিত্র সেদিন গ্রামে ছিলেন, তাই তাঁর গাড়িতে শোভনাসুন্দরীকে বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। দিন দশেক হাসপাতালে থেকে কিছু সুস্থ হলে সর্বেশ্বর তাঁকে কলকাতা নিয়ে যান।

সুস্থ হওয়ার পর কলকাতা যাওয়ার সময় ট্রেনের কামরাটা তাঁরা ফাঁকা পেলেন। শনিবার বিকেলের ট্রেনে কলকাতা যাওয়ার ভিড় থাকে না। ট্রেনের কামরাতেই শোভনাসুন্দরী সর্বেশ্বরকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেন, হ্যাঁ গো, ঠাকুরপো ওসব কী বলছিল?

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, কী বলছিল?

কেন তুমি কি শোনোনি!

সে পাগলাটা কী সব আগড়ম বাগড়ম বকছিল তার কি কিছু ঠিক আছে? এই তো লোক মারফত খবর পেলাম সেটা নাকি পুরো পাগল হয়ে গেছে। ন্যাংটা-চ্যাংটা হয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

তা হোক। ঠাকুরপো তো একটু আধ-পাগলা ছিলই। কিন্তু কথাগুলো যে সর্বনেশে। এক গাঁ লোক তা শুনেছে। তুমি নাকি লোক লাগিয়ে শ্বশুরমশাইকে খুন করিয়েছ! বাবা গো! ভাবলে যে গা শিউরে ওঠে!

সর্বেশ্বর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেল। শোভনাসুন্দরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীকে লক্ষ করছিলেন। এই মানুষটির সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘর করার ফলে তিনি এঁর সবরকম ভাব ও ভাবান্তর জানেন। সুতরাং লক্ষণটা তাঁর ভাল ঠেকল না।

সর্বেশ্বর ভারী দুর্বল গলায় বললেন, কী যে বলো! তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

শোভনাসুন্দরী মাথা নেড়ে বললেন, আমি ঠাকুরপোর কথা বিশ্বাস করিনি, তুমি ভেবো না। কিন্তু আজ একটা সত্যি কথা আমাকে বলবে?

বলব না কেন! তোমার কাছে আমি কি কোনওদিন কিছু লুকিয়েছি?

আমার মনে আছে শ্বশুরমশাই যখন টাকা নিয়ে কলকাতা রওনা হবেন বলে তৈরি হচ্ছেন তখন তুমি তাঁকে অতগুলো টাকা নিয়ে বেরোতে নিষেধ করেছিলে। উনি তোমার নিষেধ শোনেননি। উনি যখন সত্যিই রওনা হয়ে গেলেন তখন তোমার মুখ-চোখ যেন কেমনধারা। একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব। বাপের জন্য চিন্তা হচ্ছিল তা বুঝি, কিন্তু তোমার মুখ-চোখে সেরকম

উৎকণ্ঠার ভাবটা ছিল না। তখন লক্ষ করেছিলাম, কিন্তু তেমন কিছু তলিয়ে ভাবিনি। সেদিন হঠাৎ ঠাকুরপোর কথা শুনে কেন যেন মনে হল, কী জানি বাবা!

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, মনে হল? বলো কী!

শোভনাসুন্দরী স্বামীর চোখের দিকে চেয়ে ছিলেন। বললেন, শ্বশুরমশাইয়ের ভাল-মন্দ যা কিছু হয়েছে তার জন্য তুমি দায়ী নও জানি। কিন্তু তখন তোমার ওরকম ভাবখানা হয়েছিল কেন?

বাঃ, বাবার জন্য চিন্তা হবে না?

শোভনাসুন্দরী স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তাঁর স্বামী সত্যি কথা বলছেন না। তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, চিন্তাই যদি হবে তা হলে অত টাকা ওঁকে নগদে নিতে দিলে কেন? হুন্ডি কাটার অসুবিধে কী ছিল? উনি তো তোমাকে হুন্ডির কথা বলেছিলেন।

সর্বেশ্বর হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, বললেই তো হল না! পরদিন সকালে উনি বেরোবেন, আর মোটে আগের দিন সন্ধেবেলা টাকা জোগাড় হল। অতগুলো টাকার হুন্ডি কি হুট করে হয়! মেয়েমানুষ তুমি, অত কথায় কাজ কী?

শোভনাসুন্দরী তবু স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন।

এ কথা ঠিক যে এসব কথাবার্তা থেকে শোভনাসুন্দরীকে ভাল মানুষ বলে মনে হলেও তিনি মোটেই তা নন। স্বামীকে এভাবে জেরা করার পিছনে তাঁর একটা ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুত শোভনাসুন্দরী সর্বেশ্বরের উপযুক্ত স্ত্রী। তাঁর স্বামী এ যাবৎ যেসব কুকর্ম করে ভাই-বোনকে সর্বস্বান্ত করেছেন তাতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। এমনকী তিনি সর্বেশ্বরকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্ররোচনাও দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর কোনও কাজ তাঁর অগোচরে থাকবে এটা তাঁর কাছে অসহ্য। জয়ধ্বজের কলকাতা রওনা হওয়ার সময় এবং পরের কয়েক দিন যে সর্বেশ্বর খুব অস্থিরতা ও অপরাধবোধের মধ্যে কাটিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সঠিক কারণটা কী তা শোভনাসুন্দরী আজও জানেন না। তবে কারণ যে একটা আছেই এবং সেটা যে বেশ গুরুতর তাতে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। শোভনাসুন্দরী আপাতত অবশ্য চুপ করে গেলেন। বাড়ি ফিরে আসার কয়েকদিন পর গায়ে খানিকটা জোরবল পেয়ে শোভনাসুন্দরী একদিন স্বামীকে বললেন, দেখো, আমার বুকের ওপর যেন ওরা বসে আছে!

আতঙ্কিত হয়ে সর্বেশ্বর প্রশ্ন করলেন, কারা?

ঠাকুরপো আর ননদ ঠাকরুন। আমার ভিটে থেকে যতদিন ওদের না তাড়াতে পারো ততদিন আমার বুকের ব্যামো কমবে না। ওদের কথা ভাবলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। যদি আমাকে বাঁচাতে চাও তো ওদের তাড়াও।

সর্বেশ্বরের তাতে অমত নেই, বরং খুবই মত আছে। কিন্তু কেন জানি না তিনি একটু ভয় খেয়েছেন। কারণ বিশ্বেশ্বরকে তিনি চিরকালই অত্যন্ত নিরীহ ও নির্বিরোধী বলে জানেন। গান, মদ এবং মেয়েমানুষের কিছু নেশা বিশ্বেশ্বরের ছিল বটে কিন্তু সেটা সঙ্গদোষ, নিষ্কর্ম জীবন এবং প্রচুর টাকা হাতে থাকার ফলে ঘটেছিল। আদতে লোকটা মাটির মানুষ। সেই বিশ্বেশ্বর যে ওরকম খেপে যেতে পারে এটা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। বিশ্বেশ্বরের ওই রুদ্রমূর্তি দেখেই তাঁর স্ত্রীর হৃদ্‌রোগের আক্রমণ ঘটে। তাঁরও ঘটতে পারত। কেন যে ঘটেনি সেইটেই আশ্চর্যের বিষয়। কানাই প্রায় প্রতি সপ্তাহেই চিঠি লিখে জানাচ্ছে যে, বিশ্বেশ্বর দিনে দিনে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। পাগলামির এখন চূড়ান্ত অবস্থা। এ খবর পেয়ে সর্বেশ্বরের ভয়টা আরও বেড়েছে।

স্ত্রীর কথার জবাবে সর্বেশ্বর বললেন, দেখি। থানা-পুলিশ করতে হবে দেখছি।

শোভনাসুন্দরী স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে মুখের ভাব লক্ষ করছিলেন। তাঁর এই স্থিরচক্ষুর দৃষ্টি সর্বেশ্বর কোনওদিনই বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেন না। শোভনা বললেন, থানা-পুলিশ করতে চাও তো করো। দেরি করছ কেন? দেরি করলে আর ওদের ওঠাতে পারবে ভেবেছ? গাঁয়ে

আমাদের শত্রুর অভাব নেই। তাদের সঙ্গে সাঁট করে ওরা চেপে বসবে জমির ওপর।
সর্বেশ্বর বললেন, হুঁ।
হুঁ মানে? তুমি গা করছ না কেন? ননদ ঠাকরুনটিকে বড সোজা পাত্রী ভেবো না। মাঝে মাঝে ভিরমি খায় বলে সবাই ভাবে গোবেচারা। তা কিন্তু নয়। শাশুড়ির গলায় একটা আঠারো-ভরির বিছেহার ছিল, দু'হাতে দুটো অনন্ত, দশ গাছা চুড়ি। সেগুলো উনি ছাড়া আর কে হজম করতে পারে? মরার সময় উনিই কাছে ছিলেন।
সর্বেশ্বর এ কথাটা পাশ কাটালেন। তিনি ভালই জানেন এই কৃতিত্ব তাঁর দিদি বিনোদবালার নয়। তিনি নিজেই মাঝে মাঝে বজ্রযোগিনীতে হানা দিয়ে সেইসব গয়নার সদ্‌গতি করে এসেছেন। তবে শোভনাসুন্দরীকে বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। মেয়েমানুষকে সব কথা বলতে নেই। শুধু বললেন, হুঁ।
এবারও শোভনা তাঁর স্বামীর মুখ নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, সর্বেশ্বর তাঁর কাছে কী যেন আর-একটা গুপ্ত কথা লুকোলেন। এ জিনিস তিনি কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই হঠাৎ ভিন্ন একটা পন্থা অবলম্বন করলেন। আচমকা চোখের তারা উলটে নিমীলিত নয়নে উর্ধ্বপানে চেয়ে বললেন, ভগবান জানেন, তোমার মনে কী আছে, কেনই বা তুমি ভয় পাচ্ছ। ঠাকুরপো যা বলল তা যদি সত্যিই না হবে তা হলে তোমার এত ভয়ের কী, তাও তো বুঝি না।
সর্বেশ্বর বিষয়ী এবং বুদ্ধিমান হলেও তাঁর কিছু মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করেছিল। তিনি আর গোপনীয়তার ভার একা বহন করতে পারছিলেন না। তাই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু খাটো গলায় বললেন, বলছি। কাজটা তেমন খারাপও করিনি। একটু সাবধান হয়েছিলাম মাত্র। বাবা যে গেঁজেটায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ভরেছিলেন সেটা আমি রাত্রে সরিয়ে নিয়ে টাকা বের করে তাতে কাগজ ভরে দিই। জানতাম পথে ডাকাতি হবেই। তা ছাড়া বাবা যে টাকা নিয়ে কলকাতা যাচ্ছেন, এ খবরও কর্মচারীরা রাখত। টাকার কথাটা চাউর হয়ে গিয়েছিল।
শোভনাসুন্দরী উঠে বসলেন। তাঁর বুকের ভার অনেকটা নেমে গেছে। খুব ভালমানুষের মতো মুখ করে বললেন, খারাপ কাজ কেন হবে! ঠিকই করেছ, কিন্তু আমাকে বললে তো পারতে।
বলিনি একটু লজ্জা করছিল বলে। কিন্তু দেখলে তো, সেই ডাকাতি হলই।
ডাকাতি যে হয়েছিল তা ঠিক জানো?
না। তবে আর কী হতে পারে?
কিন্তু সে তো বহুকাল আগেকার ঘটনা। এখন তোমার অত ভয়-ভয় ভাব কেন?
সর্বেশ্বর একটু চিন্তা করে বললেন, বাবাকে আমি খুন করাইনি। শত লোভ থাকলেও ও কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। কিন্তু বিশ্বেশ্বর টাকার কথাটা তুলছে। বলছে টাকাটা আমিই গাপ করেছি। তাই ভাবছিলাম, কোনও খবর-টবর পেয়েছে কি না। পাওয়ার কথা নয়, তবু কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।
শোভনা হেসে বললেন, কুলোপানা চক্কর দেখেই ভয়! এইজন্যই বলে বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। ঠাকুরপো অভাবে-অনটনে ওরকম হয়ে গেছে, তাই সব ব্যাপারেই অন্যকে সন্দেহ করছে। ও নিয়ে ভেবো না। বর্ধমানে গিয়ে থানায় একটা ডায়েরি করো। দরকার হলে মোটা ঘুষ দাও। ওদের তুলতেই হবে।
সর্বেশ্বর বিষয়ী এবং বুদ্ধিমান। স্ত্রীকে সমীহ করলেও স্ত্রী-বুদ্ধিতে চলেন না। তাঁর মনে হল, থানা-পুলিশ করার আগে অন্যভাবে একটু চেষ্টা করা উচিত। তাই তিনি একদিন সন্ধেবেলা কেশব মিত্রের ভবানীপুরের বাড়িতে হানা দিলেন।
কেশব মিত্র তাঁকে যথোচিত আপ্যায়ন করলেও সব শুনে কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন,

বিশ্বেশ্বরবাবুকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। উনি যে আপনার সহোদর ভাই, এ কথাটা আপনার অনেক আগেই আমাকে বলা উচিত ছিল। একজন পাগল, একজন বিধবা আর একটা বাচ্চা ছেলেকে তাড়ানোর ব্যাপারে যদি আপনাকে সাহায্য করি তা হলে গাঁয়ে আমার বদনাম রটে যাবে। মানুষ নিয়ে আমার কারবার। ও আমি পারব না।

কিন্তু এ যে জবরদস্তি, জুলুম!

কেশব মিত্র খুব সহৃদয় ভাবে বললেন, জুলুম বলে ভাবছেন কেন? আপনার বাড়ি সারা বছর তো ফাঁকাই পড়ে থাকে। ওরা একখানা ঘর নিয়ে আছে থাক না। ছেলেটাকে আমি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। দেখা যাক যদি মানুষ হতে পারে।

এ কথায় সর্বেশ্বর মনে মনে আরও চটলেন। তাঁর ভয়ও বাড়ল। বললেন, এভাবে যদি দখলি স্বত্ব চলে আসে?

তাই কি আসতে পারে? যদি আসেও তখন মামলা করবেন, আমরা ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব।

আপনি কি জানেন আমার ভাইয়ের ব্যবহারে আমার স্ত্রীর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল! মরেই যেতেন।

সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার ঘটে গেছে। কিন্তু পাগলের কথায় কী যায় আসে বলুন!

শুধু কি কথা! আমার ভাই একটা কুড়ুল নিয়ে আমাদের কাটতে এসেছিল। তার বিস্তর সাক্ষী আছে। আপনি জেনে রাখুন আমার ভাই কস্মিনকালেও পাগল ছিল না। আমাদের ওপর ওরকম হামলা করার পর বদনাম আর পুলিশের ভয়ে পাগল সাজছে। আসলে পাগল ও নয়।

কেশব মিত্র একটু ভাবনায় পড়লেন। সর্বেশ্বরকে চটিয়ে তাঁর লাভ নেই। প্রতি বছর সর্বেশ্বর পার্টি ফান্ডে টাকা দেন। গ্রামের স্কুল, লাইব্রেরি ও ক্লাবেও বেশ কিছু টাকা দিয়েছেন। এগুলো যে এক ধরনের ঘুষ তা কেশব ভালই জানেন। তবে এ ধরনের ঘুষ খেতেই হয় এবং যে ঘুষ দেয় তাকে খাতির না করেও উপায় নেই। একটি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও কেশব নিজের সিদ্ধান্তে যথেষ্ট অটল থাকতে পারছিলেন না। একটু নরম গলায় কেশব বললেন, বিশুবাবু যে ভায়োলেন্ট হয়ে পড়েছিলেন তা শুনেছি। আপনি তবু পুলিশে না গিয়ে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ কেস অনায়াসে হতে পারত।

সর্বেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আপনারা যদি এর বিহিত ব্যবস্থা করতে পারেন তো খুব ভাল। নইলে আমি ওই বাড়ি জমি সব বিক্রি করে দেব বলে ঠিক করেছি। বুঝতে পারছি ওখানে শেষ অবধি থাকা যাবে না।

কেশব মিত্র একটু হাসলেন। বললেন, অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি যখন বলেছি, দেখব, তখন ঠিকই দেখব। পরশু রবিবার। ওইদিন আমি গাঁয়ে যাচ্ছি। আপনিও আসুন। একটা ফয়সালা করে দেওয়ার চেষ্টা করব।

কিন্তু ফয়সালা যাঁর সঙ্গে তিনি এখন যাবতীয় ঐহিক হিসাব-নিকাশের বাইরে ভিন্নতর এক উচ্চতায় বাস করছেন। গায়ে তুলোর কম্বল, পরনে ফেরতা দেওয়া এক শতচ্ছিন্ন ধুতি, গালে বিজবিজে দাড়ি, লম্বা নখের কোলে নীল ময়লা। এই পৃথিবীর মশা, পিঁপড়ে, কুকুর তাঁকে কামড়ায়, মাছি শোষণ করে ক্ষত, তিনি ততটা টের পান না।

প্রথম যেদিন তাঁকে বাজারের কাছে একটা কুকুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করল সেদিন তিনি খুবই চিৎকার করেছিলেন বটে। কিন্তু সেই চিৎকার ততটা ভয়ের নয়, যতটা বিস্ময়ের। এখন পৃথিবীকে নতুন রকম করে তাঁকে চিনতে হচ্ছে। বাজারের এক মিষ্টির দোকানি তাঁকে দয়াপরবশ একখানা বাসি জিলিপি খাইয়েছিল। দোকানের বাইরে পাতা বেনচে বসে জিলিপিটা খেয়ে তিনি এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করলেন। এরকম সম্পূর্ণ আনন্দ তিনি জীবনে কদাচিৎ পেয়েছেন। মানুষের কোনও আনন্দই পরিপূর্ণ নয়; তার কারণ নানা স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের ভাবনা সেই আনন্দের সঙ্গে রাহুর

মতো লেগে থাকে। সব মানুষই তো স্মৃতিতাড়িত এবং প্রবৃত্তিচালিত। শুধু পাগলেরা ততটা নয়। বিশ্বেশ্বরের অসংলগ্ন স্মৃতি তেমন তাড়না করে না তাঁকে, ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁর ঘুচে গেছে। তাই আজকাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দকেও তিনি পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেন।

জিলিপিটা খাওয়ার পর যখন পা-টা বেনচ থেকে নামিয়েছেন তখন পা পড়ল এক হ্যাংলা কুকুরের লেজে। ঘেঁউ করে উঠে সেটা তৎক্ষণাৎ বিশ্বেশ্বরের বাঁ পা কামড়ে ধরল। চিৎকার দিয়ে বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে নিজের পা-টা তুলে দেখছিলেন। গভীর ক্ষত। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পা। তিনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। এটা কী হল? ভাল হল, না মন্দ?

যখন বাড়ি ফিরলেন তখন বিনোদবালা তাঁর অবস্থা দেখে চিৎকার করে ওঠায় বিশ্বেশ্বর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, না না, একটা পা ঠিক আছে। এ পা-টায় কিছু হয়নি।

বস্তুত তাঁর মনে হয়েছিল, একটা পা অক্ষত থাকাটাই মস্ত লাভ।

বাঁ পায়ের সেই ক্ষতের কোনও চিকিৎসা হয়নি। কানাই ঝাড়ুনিকে ডেকে আনায় সে কিছু তুকতাক করে দিয়ে গেছে। বুড়ো হোমিয়োপ্যাথ বিনয়ভূষণ কয়েকটা পুরিয়া দিয়েছেন। ব্যস। সেই ক্ষত এখন পেকে দুনিয়ে উঠেছে। ভন ভন করে মাছি ওড়ে সেখানে। বিশ্বেশ্বরের হাঁটতে কষ্ট হয়।

তবু যে নতুন জগতের সন্ধান বিশ্বেশ্বর পেয়েছেন তার সন্ধানে রোজ ভোর না হতেই তিনি নেংচে নেংচে বেরিয়ে পড়েন। এ জগতে আকাশ মাটি গাছপালা, মানুষের বসত সবই আছে। কিন্তু কেমনই যেন সবকিছুই একাকার। এদের বিচ্ছিন্ন এবং আলাদা সত্তাকে তিনি বোধ করতে পারেন না। এদের পারস্পরিক যোগসূত্রটিও নেই। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করার সময় তাঁর আবছা মনে পড়ে, বহুকাল আগে কিছু মানুষ তাঁকে সহবত শিখিয়েছিল। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা চিনিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলের চোখের সামনে এই পেচ্ছাপ করাটা ভাল না মন্দ তা তিনি বুঝতে পারেন না। তবে কেউ গালাগাল দিলে বা মারতে এলে তিনি তৎক্ষণাৎ পশুবৎ সংস্কারবশে পালিয়ে যান। বুঝতে পারেন কাজটা ঠিক হয়নি। কিন্তু এই উপলব্ধি বেশিক্ষণ থাকে না। এক ঘণ্টা বাদেই হয়তো আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে ফেলেন। তাঁর নতুন জগতে স্মৃতির কোনও ভাব নেই।

আজ শীতের সকালে বিশ্বেশ্বর হাই স্কুলের পিছনে একটা ঢিবি আবিষ্কার করলেন। কতগুলো সবজে-সাদা কাঁটাগাছে আচ্ছন্ন এই ঢিবিটায় উঠতে উঠতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা পাহাড় নাকি রে? এটা কি পাহাড়?

কাকে জিজ্ঞাসা করলেন তা তিনিও জানেন না। কিন্তু বিশ্বেশ্বর প্রশ্নের জবাব ঠিকই পেয়ে যান। কেউ অলক্ষে থেকে জবাব দেয়। হ্যাঁ, এটা পাহাড়। তুমি পাহাড়ে ওঠো।

বিশ্বেশ্বর ঢিবিটায় উঠে রাজার মতো কোমরে হাত দিয়ে চারদিকে তাকালেন। বহু দুব বিস্তৃত নিজের রাজ্যপাট দেখে খুশিই হলেন তিনি। তুলোর কম্বলটায় নাক ঝাড়লেন। হঠাৎ বহুকাল আগেকার বিস্মৃতপ্রায় একটা কথা তাঁর মনে এল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, গুইজ্যাতি গুইজ্যাতি কইরা ঠেকচাফিখানা নিল. . আরে গুইজ্যাতি গুইজ্যাতি কইরা ঠেকচাফিখান নিল...

এ এক গেঁয়ো বউমানুষের কথা; কোনও বাটপাড় কুলগুরু কানে মন্ত্র দেওয়ার ছলে কান থেকে মাকড়ি খুলে নিয়েছিল। সেই বৃত্তান্ত। কথাটা মনে আসার কোনও কারণ নেই। তবু বিশ্বেশ্বর কথাটা দুনিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। যেন এটাই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জরুরি বার্তা। সকলের শোনা উচিত।

কিন্তু মুশকিল স্কুলের ছেলেগুলোকে নিয়ে। ওই তারা আসছে। বিশ্বেশ্বর খুবই বিপন্নভাবে টালুমালু করে চারদিকে তাকাতে থাকেন।

এই পাগলা! এই পাগলা! এই পাগলা! এই হালার পুত! —ছেলেগুলো চেঁচাতে থাকে।

নিরস্ত্র বিশ্বেশ্বর একটা ঢেলা কুড়িয়ে নেন। কিন্তু সেটা ছুড়বার আগেই একটা সাহসী ছেলে

এগিয়ে এসে তাঁর গা থেকে কম্বলটা টেনে খুলে নিয়ে যায়।

এই হালার পুত! এই কুত্তার বাচ্চা! এই শুয়োরের—

বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বিশ্বেশ্বর তার পিছু নিয়ে ঢিবি থেকে নামতে থাকেন। কিন্তু ব্যথায় অবশ বাঁ পায়ের জন্য পেরে ওঠেন না। ছেলেটা কম্বলখানা খোলা মাঠের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায়।

বিশ্বেশ্বর খুদে শয়তানগুলোর দিকে চেয়ে একটা চেনা মুখ দেখতে পান। ছেলেটা মাধু না! মাধুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিসের তা তাঁর ভাল মনে পড়ে না। তবে ছেলেটাকে তাঁর খুব চেনা লাগে।

মাধব বাবাকে দেখছিল। করুণ মুখ, ছলছলে চোখ। বাবার ওই অপমানটা তার খুব খারাপ লাগে। কিন্তু তার কিছু করার নেই। এতগুলো ছেলের সঙ্গে সে তো পারবে না। সে গিয়ে কম্বলটা কুড়িয়ে নিঃশব্দে বাবার হাতে দিয়ে বলে, বাড়ি যাও না বাবা!

বাড়ি যাব? কেন?

যাও। না হলে এরা তোমার পিছনে লাগবে। এদিকে আর এসো না।

কোনদিকে যাব?

বাড়ি! বাড়ি! বাড়ি চেনো না?— মাধব রেগে গিয়ে বলে।

কার বাড়ি?

আমাদের বাড়ি।

আমাদের বাড়ি? আচ্ছা যাই।

এইমতো দিন কাটে বিশ্বেশ্বরের। খুব খারাপ কাটে না।

একটা পুরনো ছেঁড়া পাটির ওপর চট ও কাঁথা কানি পেতে বিনোদবালা তাঁর জন্য মাটির ওপর যে বিছানাটা করে দেয় সেটায় সহজে শুতে চান না বিশ্বেশ্বর। শোওয়া আর স্নান করা তাঁর কাছে বড় কষ্টকর। শুলে দুনিয়ার অনেক মজা মাঠে মারা যায়। স্নান করতে গেলে দম বন্ধ লাগে, গা জ্বালা করে।

স্নানের সময় বিশ্বেশ্বর বড় গণ্ডগোল করেন বলে সেই সময়টায় কানাই এসে ধরে। বিনয় ডাক্তার বলেছে, কুকুরের কামড়ের জায়গাটা রোজ ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে দিতে। কানাই একটু ফিনাইল জোগাড় করেছে। রোজ ক্ষতস্থানটা স্নানের আগে ফিনাইল দিয়ে ধোয় সে। বিশ্বেশ্বর 'বাবা রে! গেলাম রে! মেরে ফেলল রে!' বলে ষাঁড়ের মতো চেঁচান। কানাই চিৎকারে কান না দিয়ে ক্ষতটা মন দিয়ে দেখে আর আপন মনে বলে, বিষটা এখনও রয়েছে। হুঁ ফুলেছে কতটা! পচ পচ করছে পুঁজে! একটু রক্তশোষণ করতে পারলে হত। তা ইনি কি আর তা করতে দেবেন!

বিনোদবালা বলেন, কানাই, তুমি বাবা আর জন্মে আমার ছেলে ছিলে। তুমি না থাকলে কী যে হত!

কানাই ক্ষতস্থান পরীক্ষা করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে বলে, ছেলে তো ছিলাম মা ঠাকরুন, কিন্তু বাবু এসে ছেলেগিরি বের করবে। শুনছি রবিবার আসছে। কেশববাবুকে ধরে একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না এবার।

বিনোদবালা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্তিমিত কণ্ঠে বলেন, বউ কেমন আছে খবর পেয়েছ?

ভালই আছে। নিজের ভাবনা ভাবো, তেনাদের কথা না ভাবলেও চলবে।

দুপুরে বিনোদবালা বিশ্বেশ্বরকে জোর করে শুইয়ে রাখেন। ব্রহ্মতালুতে ঝাড়ুনির দেওয়া একটা পুলটিশ লাগিয়ে দেন। শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকেন বিশ্বেশ্বর, ওরে বাবা রে! এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার! ওঃ! এঃ! ইঃ!

কে যেন চুপিসাড়ে ডাকে, বাবা!

বিশ্বেশ্বর চোখ চেয়ে ঘুলঘুলির মতো জানালায় সেই ছেলেটাকে দেখতে পান। ছেলেটা তাঁর কে যেন হয়!

কে রে?

ও বাবা, আমলকী খাবে?

বিশ্বেশ্বর উঠে পড়েন, আছে নাকি? চল যাই। তুই ছেলেটা বড় ভাল।

মাধব বিশ্বেশ্বরকে নিয়ে বেরোয়। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, বাবা, শোনো, আর কখনও স্কুলের কাছে যাবে না।

কোন স্কুলের কাছে?

যেখানে আজ গিয়েছিলে।

যাব না? আচ্ছা। কী খাওয়াবি বললি যে!

চলো। বাগানে ওই দিকটায় একটা গাছ আছে। মেলা আমলকী।

স্কুল মাধবের ভাল লাগে না। টিফিনে সে পালায়। আজ পালিয়েছে অন্য কারণে। স্কুলের একটা ছেলে তাকে বলেছে, রবিবার তোর জ্যাঠামশাই আসছে। শুনেছিস? তোদের গাঁ থেকে তাড়াবে। সালিশি বসছে।

সেই থেকে মাধব ভয় খাচ্ছে। এরকম একটা ভয় তার ছিল। তাড়ালে আবার পথ। আবার ভিক্ষে।

সে বলল, বাবা, জ্যাঠামশাই আসছে।

জ্যাঠামশাই? ভাল।

আমাদের তাড়িয়ে দেবে।

তাই নাকি? ভাল।

কোথায় যাব তা হলে আমরা?

সে যাবখন।

কোথায়? আমাদের তো থাকার জায়গা নেই।

নেই! বলে কী রে!

বিশ্বেশ্বর প্রসঙ্গটা স্পষ্ট বুঝতে পারেন না, কিন্তু একটা আন্দাজ পান। কী যেন ঘটেছিল। খুব ভয়ংকর এক ঘটনা। স্মৃতি টলোমলো করতে থাকে।

মাধব গাছে উঠে আমলকী পাড়ে। বিশ্বেশ্বর কুড়িয়ে একটি মুখে দিয়ে মুখ বিকৃত করেন। বড্ড টক আর কষায়। কিন্তু ফেলেন না। খেতে থাকেন।

সর্বেশ্বর রবিবার দুপুরে যখন এসে পৌঁছল তখন কেশব মিত্রের নাটমন্দিরে জোর সালিশি চলছে। প্রায় সকলেই সর্বেশ্বরের পক্ষে। কেশব মিত্রের বডিগার্ড সেই মস্তান মতো লোকটির নাম রতন অধিকারী। সে পরিষ্কার বলে দিল, সর্বেশ্বরবাবু শত হলেও স্থানীয় লোক। বিশ্বেশ্বরবাবু তাঁর ভাই হলেও উটকো লোক। উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। এঁর জন্য সর্বেশ্বরবাবু গাঁ ছাড়লে গাঁয়েরই বদনাম। তা ছাড়া রিফিউজিদের জন্য কলোনি রয়েছে। সেখানে বিশ্বেশ্বরবাবুর যাতে জায়গা হয় তা কেশববাবু দেখবেন।

অগত্যা সেই সিদ্ধান্তই হল। সহজ সরল ও যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত।

সাত : বিশ্বেশ্বরের মাথায় চকিত বিদ্যুতের খেলা এবং দু'টি অপমৃত্যু

মিটিং শেষ হতে দুপুর শেষ হতে চলল। সর্বেশ্বর দুপুরে কেশব মিত্রের বাড়িতেই খেয়ে একটু গড়িয়ে নিলেন। তারপর রতন অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বেশ্বরকে গ্রাম-প্রধানদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিতে রওনা হলেন।

রতন অধিকারীকে সঙ্গে নেওয়ার কারণ হল, রতন বর্ধমান শহরের কুখ্যাত গুন্ডা। সর্বত্রই সে

ছায়ার মতো কেশব মিত্রকে অনুসরণ করে। অসম্ভব সাহসী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির এই লোকটি যে-কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে।

কিন্তু সেদিন সর্বেশ্বরের মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। তাঁর বার বারই কিছু পুরনো কথা মনে পড়ছিল। তাঁরা তিন ভাই। হরিহরাত্মা না হলেও তিন ভাইয়ে কোনওদিন বনিবনার অভাব হয়নি। পিঠোপিঠি ভাই বলে একটু ঝগড়াঝাঁটি হত ঠিকই, কিন্তু এক সঙ্গে বেড়ে ওঠার দরুন তিন ভাইয়ের মধ্যে এক ধরনের বিরল বন্ধুত্বও ছিল। বজ্রযোগিনী গ্রামের মাঠ ঘাট পুকুর সর্বত্রই তাঁরা তিনজন বহু স্মৃতি ফেলে এসেছেন। কিন্তু একটা কথা সর্বেশ্বর খুব ছোট থাকতেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় এবং ছোটজন বাস্তববুদ্ধি-বর্জিত। বড়জনের যেমন ছিল হিপনোটিজমের শখ, ছোটজনের তেমনই ছিল সংগীতের প্রতি টান। কোনওটাই সংসারী এবং বিষয়ীর কোনও কাজে লাগে না। তবু বাল্যকালে তিনি তাঁর এই দুই বাস্তববুদ্ধিহীন সহোদরকে ভালবাসতেন।

সেই ভালবাসার কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই সর্বেশ্বর খুব আই-ঢাই বোধ করছিলেন।

রতন অধিকারী মন্ত্রবৎ একটু প্রাপ্তিযোগের আশা করছিল। তাই সে সর্বেশ্বরকে একটু ভেজানোর জন্য বলল, আপনার এই ভাইটি কোথা থেকে এল বলুন তো!

সর্বেশ্বর অন্যমনস্ক ছিলেন। প্রশ্নটা শুনে আচমকা জবাব দিলেন, কেন? মায়ের পেট থেকে।

কিম্ভূত উত্তর। রতন একটু হেসে বলল, সে তো জানি। কিন্তু এতদিন ছিল কোথায়? পাকিস্তানে নাকি?

হ্যাঁ। দেশের বাড়িতে।

কিছু মনে করবেন না মশাই, বাঙালরা একটু খচ্চর হয়। আপনার এই ভাইটি কিন্তু একটি তে-এঁটে খচ্চর। পরিণামও তেমনি। কুকুরে কামড়ে একেবারে ফালা ফালা করেছে।

ঘটনাটা সর্বেশ্বর শুনেছেন কিন্তু খুশি হননি। তার মনে হচ্ছিল, ওরা বড় কষ্ট পেয়েছে। একটা শ্বাস ছেড়ে সর্বেশ্বর বললেন, খচ্চর তো বটেই।

উনি কি বরাবরই এরকম ভায়োলেন্ট টাইপের?

না, তা ঠিক নয়। বরং উলটোটাই ছিল। কেন যে সেদিন মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাগাড় দিল!

তাড়িয়ে দিন মশাই, তাড়িয়ে দিন। এসব লোক গাঁয়ের পক্ষে বিপজ্জনক। কখন কাকে কুপিয়ে বসে, কার মাথা ফাটায় তার ঠিক কী?

সর্বেশ্বর তাড়াতেই যাচ্ছেন। তাই বললেন, আপনিও একটু সাহায্য করবেন। করলে আজই ঘটিবাটি যা আছে সব সমেত বের করে দেব।

এ কথায় রতন একটু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, সাহায্য মানে! কেশবদা তো আমাকে বলেই দিয়েছে, একদম তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসবি।

কিন্তু ঠিক যেরকম সহজে কার্যোদ্ধার হবে বলে ভেবেছিলেন তাঁরা ততটা সহজ হয়নি।

রতন আর সর্বেশ্বর যখন এদের উচ্ছেদ করতে যাচ্ছেন তখন বিশ্বেশ্বর তাঁর বিছানায় চুপ করে বসে ছিলেন। পায়ের ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড টাটানির চোটে বিশ্বেশ্বর স্থির থাকতে পারছিলেন না। বড্ড উৎপাত করছে মাছিরা। ভ্যান ভ্যান করে সারাক্ষণ পায়ের চারধারে ঘুরছে, উঠছে, বসছে, সুড়সুড়ি দিচ্ছে। 'যাঃ যাঃ' বলে মাছি তাড়াতে তাড়াতে জ্বালাতন হয়ে বিশ্বেশ্বর উঠে বসে চারধারে তাকালেন। ঘরের অন্য ধারে আর একখানা চাটাইয়ের ওপর শতেক ন্যাকড়া জোড়া দেওয়া একটা চাদরের মতো জিনিসের ওপর পড়ে ঘুমোচ্ছে বিনোদবালা আর মাধব।

বিশ্বেশ্বর দেখেশুনে বুঝতে পারলেন, এরা বড় গরিব। তাই ভারী রাগ করে বললেন, ধুস শালা।

একটা খুব বড় বাড়ির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। চারদিকে অনেকখানি জমি ঘিরে উঁচু পাঁচিল, সেখানে মেলা লোক। অঢেল টাকা। তারপর কী যেন হল। খুব গোলমাল বেঁধে গেল চারদিকে।

একটা লোক যেন কোথায় গিয়েছিল, সে আর ফিরল না। আর-একটা লোক যেন কোথায় পালাল, তারপর সেই বিশাল বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেল। আর টাকা পয়সা পাওয়া যেত না।

বিশ্বেশ্বর খুব কষ্টে উঠলেন এবং দাওয়ায় এসে চুপ করে বসে রইলেন। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। বড় ঠান্ডা। বিশ্বেশ্বর তুলোর কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসলেন। চোখটা বুজে আসছে ক্লান্তিতে। তাঁর গানের কথা মনে পড়ছে, ভারী সুন্দর সব সুর ছিল। কোথায় গেল! বিশ্বেশ্বর চোখ বুজে হঠাৎ আজ একটু গুনগুন করে উঠলেন। শব্দটা বেশ লাগল তাঁর। কোথা থেকে আসে শব্দটা! বাঃ বেশ তো! ফের একটু গুনগুন করলেন, তারপর মৃদু স্বরে গাইতে লাগলেন। বিস্মৃতপ্রায় কথা, ভুলে যাওয়া সুরের রেশ তাঁকে আন্দোলিত করছিল। পায়ের টাটানিটা কিছু কম বোধ করলেন তিনি।

হঠাৎ দুটো লোক উঠোনে এসে দাঁড়াল। বিশ্বেশ্বর একটু জড়োসড়ো হয়ে বসলেন। জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন লোক দুটোর দিকে। এদের মধ্যে একটা লোককে তিনি চেনেন। খুব চেনা লোক। লোকটাকে দেখেই বিশ্বেশ্বরের কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। ভয়ও পেলেন। আরও জড়োসড়ো হয়ে বসলেন তিনি।

রতন এগিয়ে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখে ক্রূর দৃষ্টি। বলল, এই যে বিশ্বেশ্বরবাবু, পাগলামির খেলা আর কতদিন চলবে?

বিশ্বেশ্বর জানেন তাঁর নাম বিশ্বেশ্বর। তাই লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন। কী বলতে হবে তা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। আজকাল তাঁর একটা মুশকিল হয়েছে। মনে অনেক কথা আসে, কিন্তু মুখ দিয়ে অন্য কথা বেরোয়। যা বলতে চান তা কিছুতেই বলে উঠতে পারেন না। এর জন্য বড় কষ্ট হয় তাঁর।

লোকটাকে বিশ্বেশ্বরের খুব ভয় করতে লাগল। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, গুইজ্যাতি গুইজ্যাতি কইরা ঠেকচাফিখান নিল...

ওসব ন্যাকা-বোকা সেজে আর লাভ নেই, বুঝলেন? এই কানাই! কানাই!

কানাই তার ঘরে প্রস্তুত হয়েই ছিল। ডাক শুনে বেরিয়ে এসে খুব অমায়িক হেসে বলল, রতনদা যে! ওঃ, বাবুও এসে গেছেন।

রতন বলল, এদের সব ঝাটিপাটি সমেত এখান থেকে বার করতে হবে। তৈরি থাকিস।

আজই নাকি?

আজই এখুনি। আমি গিয়ে গদাইয়ের গোরুর গাড়িটা পাঠিয়ে দেব। তুলে নিয়ে বর্ধমানে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

বিশ্বেশ্বর একটু নড়েচড়ে বসলেন। দ্বিতীয় লোকটাকে দেখে তাঁর যেন কী একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন না।

সর্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরকে লক্ষ করছিলেন। বয়সে বিশ্বেশ্বর তাঁর চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট। কিন্তু চেহারাটা ভারী বুড়িয়ে গেছে। কাঁচা পাকা চুল আর দাড়িতে মুখটা প্রায় ঢাকা। শরীরও ঝটকে গেছে অনেক। চোখে অস্বাভাবিক এক উজ্জ্বলতা। বাঁ পা ফুলে ঢোল হয়ে আছে, ক্ষতস্থান থেকে রস গড়াচ্ছে। মাছি উড়ছে। সহোদরের এই করুণ অবস্থা দেখে তাঁর বুকে একটা দীর্ঘশ্বাস ঘনিয়ে উঠল। একবার তাঁর ইচ্ছে হল বলেন, থাক. ওরা এখানেই থাক। অনেক কষ্ট পেয়েছে। আহা।

কিন্তু বললেন না।

রতন খুব হম্বিতম্বি করছিল, কী মশাই, আজও একটু গা-জোয়ারি দেখাবেন নাকি? আমার নাম রতন অধিকারী, বুঝলেন? স্রেফ কেটে দামোদরে ভাসিযে দেব!

চেঁচামেচিতে বিনোদবালা আর মাধব উঠে পড়েছে। বতনের রুদ্রমূর্তি দেখে বিনোদবালা এসে

তাড়াতাড়ি বিশ্বেশ্বরকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, ওর শরীর ভাল না। মাথাটাও খারাপ হয়েছে। ওকে কিছু বলবেন না। আমরা চলে যাব।

মাথা খারাপ না হাতি! ওসব ঢের দেখা আছে। আপনারা সব কাঁথাতানি যা আছে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আর ও মশাই বিশ্বেশ্বরবাবু, আজ আর কুড়ুল-ফুড়ুল দেখাবেন না। এসব আমার ঢের দেখা আছে। অন্য জায়গায় গিয়ে বীরত্ব ফলাবেন, এখানে নয়।

বিশ্বেশ্বরের মাথায় আচমকাই বিদ্যুৎ খেলে গেল। কুড়ুল! কুড়ুল! তিনি স্পষ্ট মনে করতে পারলেন, দ্বিতীয় লোকটা তাঁর দাদা সর্বেশ্বর। হাড়ে হারামজাদা লোকটা তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছে। তাঁকে উচ্ছেদ করে ভয় দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তায় ভরা দুনিয়ায় ছেড়ে দিতে চাইছে। এই শালা... এই শয়তান... বিশ্বেশ্বরের চোখের সামনে একটা ঝকঝকে কুড়ুল যেন নাচতে লাগল।

মাথায় উপর্যুপরি বজ্রপাত ঘটে গেল বিশ্বেশ্বরের। এক ধূসর মলিন অতীতের গর্ভ থেকে প্রেতের দীর্ঘ হাতের মতো বহু গ্লানি ও অপমান এসে তাঁকে স্পর্শ করছিল। সেইসব হাত তার শরীরের ভিতরের যন্ত্রপাতি মুচড়ে দিচ্ছে, খুবলাচ্ছে। তিনি বদলে যাচ্ছেন। মাথার ভিতরে প্রচণ্ড শব্দে কী যেন ফাটছে। চোখের সামনে বিদ্যুতের নীল শিখা, ঝলসে উঠছে বারবার।

রোগা ও জীর্ণ শরীর থেকে তুলোর কম্বলটা ফেলে বিশ্বেশ্বর হঠাৎ এক আদিম মানুষের মতো উঠে দাঁড়ালেন। খোঁড়া পায়ের ব্যথা তিনি একটুও টের পেলেন না। তাঁর মুখ থেকে শুধু একটা শব্দ ছিটকে বেরোল, কুত্তার বাচ্চা!

দুর্ভাগ্যবশে কানাইয়ের সেই কুড়ুলটা তার দাওয়ায় সযত্নে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। সকালেই কানাই কাঠ কেটেছে। বিশ্বেশ্বর এক লাফে উঠোনে নেমে দূরত্বটুকু চোখের পলকে অতিক্রম করলেন। কুড়ুলটা তুলে নিলেন সিদ্ধ হাতে। যেন এই অস্ত্র তিনি বহুবার ব্যবহার করেছেন পৃথিবীর যাবতীয় বিপথগামী ক্ষত্রিয়দের নিধন করতে।

একজন রোগজীর্ণ পাগলের যে এত দ্রুতগামী হাত-পা থাকতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেনি রতন। বিশ্বেশ্বর যখন তীব্র কুঠার মাথার ওপর তুলে এক হা-হা শব্দে বাতাস প্রকম্পিত করে উঠোনে লাফিয়ে নামলেন তখন রতন নিতান্ত অভ্যাস ও সংস্কারবশে আত্মরক্ষার তাগিদে 'ওরে বাবা!' বলে একটা আর্তনাদ করে ঝাঁপিয়ে সরে গেল তাঁর পথ থেকে।

নিরস্ত্র ও প্রতিরোধহীন সর্বেশ্বর ভাল করে ঘটনাটি বুঝতেই পারেননি। আকস্মিকতায় হাঁ করে চেয়ে ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, বিশ্বেশ্বর রতনকেই মারতে চাইছে।

গায়ে যতখানি শক্তি অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু বিশ্বেশ্বর সঞ্চারিত করেছিলেন তাঁর কুড়ুলে। উজ্জ্বল ইস্পাতের ফলাটা রোদে ঝিকিয়ে উঠে আকাশ থেকে দুরন্ত আক্রোশে নেমে এল।

সর্বেশ্বর একটা জান্তব শব্দ করলেন মাত্র। কুড়ুল তাঁর মাথাটাকে প্রায় দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছিল। ছিটকে উঠল রক্ত ও ঘিলু। মাটিতে পড়ে সর্বেশ্বর বারকয়েক বলির পাঁঠার মতো টানা মারলেন।

বিশ্বেশ্বর থামলেন না। কুড়ুলটা তুলে আবার এবং আবার এবং আবার গেঁথে দিতে লাগলেন সর্বেশ্বরের শরীরে।

বিনোদবালা মূর্ছা গেলেন। রতন অধিকারী উঠোনের এককোণে প্রকাণ্ড এক শিশুর মতো হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে গুঁড়ি মেরে বসে মুখখানা বিস্ময়ে তোম্বা করে দৃশ্যটা দেখছিল। কানাই কাঠ হয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে। কানাইয়ের বউ এক ভাষাহীন আর্ত আঁ-আঁ চিৎকারে ভরে দিচ্ছিল চারদিক।

মাধব এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিল চোখের পাতা একবারও না ফেলে। সম্ভবত সে শ্বাসও নেয়নি। ভাঙা একটা পুতুলের মতো তার জ্যাঠামশাই পড়ে আছেন উঠোনে। শিশির আলতা যেন গড়িয়ে

যাচ্ছে চারধারে। কুড়ুলের একটা ধক ধক শব্দ যেন পৃথিবীর গভীর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে কি না তা সে অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না। তার হাত-পা ঠক ঠক করে কাঁপছিল।

বিশ্বেশ্বর চেঁচাচ্ছিলেন, আরও খাবি? আরও খাবি? আরও খাবি?

তাঁর কণ্ঠস্বরে এক ভয়াবহ আক্রোশ ও ক্রোধ থাকায় বড় বিকট শোনাচ্ছিল সেই চিৎকার। তবে ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছিল বিশ্বেশ্বরের গলা। বড় বড় শ্বাস পড়ছিল। রক্ত ঘিলু ও হাড়ের টুকরো ছিটকে পড়েছে চারধারে। একটা আস্ত মানুষের সযত্নে লালিত শরীর কতই না ঠুনকো!

বিশ্বেশ্বর কুড়ুলটা ফেলে ধীরে ধীরে একটু নেংচে দাওয়ায় গিয়ে বসলেন। হাতে-পায়ে রক্তের ছিটে। চোখের চাউনি কিছু ঘোলাটে। হাঁফাচ্ছিলেন। তুলোর কম্বলটা একটু ঝেড়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসলেন। অস্ফুট স্বরে বার বার বলছিলেন, আরও খাবি? যাঃ, খাওয়া শেষ! খাওয়া একদম শেষ!

গ্রামশুদ্ধ লোক যখন ভেঙে পড়ল উঠোনে বিশ্বেশ্বর তখনও খুব নির্বিকার ছিলেন। পুলিশ যখন তাঁকে নিয়ে যায় তখনও তাঁর মুখে কৃতকর্মের জন্য কোনও অনুশোচনা দেখা যায়নি।

এরপর তিনদিন ধরে মাধব এমন একটা ঘোরের মধ্যে রইল যে, নিজের চারপাশটা ভালভাবে অনুভবই করতে পারেনি। কেমন যেন ছায়াবাজির মতো সব লোকজন আসছে যাচ্ছে, দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিনোদবালার বিলাপ ও কান্না বা কানাই ও তার বউয়ের 'হায় হায়' শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু মাধবের মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয়নি। তিনদিন সে এক আচ্ছন্নতার মধ্যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখায় আলো-আঁধারির মধ্যে কাটাল। নিজের চোখে সে যা দেখেছে তা কি বিশ্বাসযোগ্য? তার বাবা— নিরীহ, নির্বোধ, পাগল বাবা এ কাজ করল কী করে?

বিশ্বেশ্বরের অবশ্য বিচারে ফাঁসি বা যাবজ্জীবন হয়নি, আদালতকে সাজা দেওয়ার সময়ও দেননি বিশ্বেশ্বর। থানার লক-আপেই তাঁর জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। পুলিশ সবে কেস তৈরি করতে শুরু করেছিল। মামলা উঠবে। বিশ্বেশ্বরকে সেই সময়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। শেষ দিকটায় বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। মৃত্যু এসে সেই যন্ত্রণায় প্রলেপ দিয়ে গেল।

বাপকে মাধব কোনওদিনই বাপ হিসেবে ভালবাসেনি। সে সুযোগ সে পায়নি কখনও। বিশ্বেশ্বর বাবার মতো আচরণ করতেন না তো। দায়িত্বও কিছু পালন করেননি। কিন্তু দীর্ঘকাল একসঙ্গে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে তারা বেঁচে ছিল। পাগল, উপার্জনে অক্ষম, ভিতু এই মানুষটির প্রতি আর-একজন মানুষ হিসেবেই একটা টান ও মায়া জন্মেছিল। এই মাত্র। সুতরাং বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুতে সে তেমন শোক পেল না। খুব বিশাল কোনও অভাবও বোধ করল না।

বিশ্বেশ্বর সারা জীবনে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ করেননি বটে, কিন্তু তাঁর এই শেষ কাজটি খুবই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে সর্বেশ্বরের পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রামের বাড়ির দখল নিয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য হয়নি। এমনকী কেউ আসতও না। ধীরে ধীরে জ্যাঠামশাইয়ের এই অনেকটা জমি সমেত বাড়িখানা মাধবদের বাড়িই হয়ে যাচ্ছিল। পুরোটা মাধবদের নয় অবশ্য। কানাইয়েরও দখল আছে।

বিশ্বেশ্বর মারা যাওয়ার পর কানাই একদিন বিনোদবালাকে বলল, মা ঠাকরুন, এ তো দোষের বাড়ি হয়ে গেল। বাবুর আত্মা এ বাড়িতে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, টের পাও?

বিনোদবালা মাথা নেড়ে বলেন, পাই বাবা। সবসময়ে পাই। সবু, বিশু দু'জনকেই টের পাই। দেখিও ওদের। কাল রাতেও তো বিশু এসে শিয়রে বসে ঘ্যান ঘ্যান করছিল, ও দিদি, চান করব না। ভাত দাও।

কানাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, বড় ভাল ছিল লোকটা। কেন যে অমন খেপে গেল। তা দোষের বাড়ি হয়ে একরকম ভালই হয়েছে। সহজে কেউ কিনতে চাইবে না।

কেউ কিনতে চাইছে নাকি?

তা নয়। তবে বাবুর বউ আর ছেলেরা বাড়ি জমি বেচার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

তা হলে কী হবে?

ভাবছ কেন? গাঁয়ের বাড়ির খদ্দের তো আর শহর থেকে আসবে না। গাঁয়ের লোকেই কিনবে। তারা কেউ কিনতে চাইছে না। তবে বাড়ি বিক্রি না হোক চাষের জমি কিনে নেবে লোকে।

বিনোদবালা স্বস্তির শ্বাস ফেলেন।

ইটের পাঁজার গায়ে শ্যাওলা পড়ল। বালির স্তূপ আর পাথরকুচি মিশে যেতে লাগল মাটির সঙ্গে। ঘরে রাখা সিমেন্টের বস্তায় সিমেন্ট জমাট বেঁধে গেল। সবই ঘটল খুব আস্তে আস্তে, দীর্ঘ সময় ধরে। সেই সময়ের প্রবহমানতায় মাধবের পৃথিবীও বদলায় একটু-একটু করে।

একদিন এক ঘনঘোর বর্ষার দিনে স্কুলে যাচ্ছিল মাধব। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। এক হাতে বই অন্য হাতে হাওয়াই চটি নিয়ে জল ভাঙছিল মাধব। মাঠের মধ্যিখানে সেই ঢিবিটা জলের ওপর জেগে আছে। একধরনের কাঁটাগাছে আচ্ছন্ন।

মাধব থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। চেয়ে রইল। ওইখানে তার বাবা বিশ্বেশ্বর এসে বসতেন। ছেলেরা বড় খ্যাপাত, যন্ত্রণা দিত। ঢিবিটার দিকে চেয়ে মাধবের চোখে জল এল না। বুকে মোচড়ও দিল না। চারদিকে নিমগ্ন মাঠের মধ্যে ওই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ঢিবিটা দেখে তার মনে হচ্ছিল, মাথাটা একটু ওপরে তোলা থাকলে লোকে দেখতে পায়। চারদিকেই দুঃখের জল। তাতে ডুবে থাকার কোনও মানেই হয় না।

অনেকক্ষণ মাধব ঢিবিটার দিকে চেয়ে রইল। বেশি উঁচু নয়, তবু জলের ওপর জেগে থাকার মতো উঁচু। এই একটুখানি উচ্চতা বড় দরকার।

সর্বেশ্বর খুন হওয়ার পর এই গাঁয়ে তারা প্রায় একঘরে। কেউ তাদের বাড়িতে আসে না, তারাও যায় না কারও বাড়ি। পাগল এবং খুনি বিশ্বেশ্বরের ছেলে বলে তার বদনাম। বহুকাল কেশব মিত্রের বাড়ি যায় না সে। চিতু আর চিমটিকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়। তাদের মাঝখানে এক ধূসর ব্যবধান আজ।

মাধব স্কুলবাড়ির দালানে এসে ওঠে। ছেলেরা আজ বিশেষ কেউ আসেনি। মাস্টারমশাইদের মধ্যেও অনেকে অনুপস্থিত। ক্লাসঘরগুলো ফাঁকা।

মাধব তার ক্লাসঘরে গিয়ে নিজের জায়গাটিতে বসল। ভেজা জামা-প্যান্ট গায়ে শুকোচ্ছে। মাথা থেকে জল পড়ছে টপটপ করে। শীত করছে একটু-একটু। তবু সে জানে তার জ্বর হবে না। তার শরীর অত ঠুনকো নয়। অনেক জলঝড় সে পেরিয়ে এসেছে।

স্কুল বসবার ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং । আজ ছাড়াছাড়ি নেই। পাঁচ-সাতটি ছেলে কাকভেজা হয়ে জড়োসড়ো শরীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে অন্ধকার ক্লাসঘরে। মাধবও বসে থাকে। তার সঙ্গে কেউই প্রায় কথা বলে না। সে একটু আলগা, একটু আলাদা। চুপচাপ বাইরের দিকে চেয়ে ছিল মাধব। আকাশ আরও কালো হয়ে এল। বৃষ্টি নামল ঝেঁপে। ছেলেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে, গল্প করছে। তার সঙ্গে কথা বলার কেউ নেই।

মাস্টারমশাই রোল কল করছেন। মাধবের নাম সবার শেষে। সে সাড়া দেয়। তারপর ফের বসে থাকে চুপচাপ। বসে বসে সে ঢিবিটার কথা ভাবে।

স্কুল সেকেন্ড পিরিয়ড পর্যন্ত চলে কোনওক্রমে। তারপর ছুটির ঘণ্টা বাজে। চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে যায় প্রকাণ্ড স্কুলবাড়ি।

শুধু মাধব বসে থাকে একা তার ক্লাসঘরে। ঘোর অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ঘরখানা ভুতুড়ে হয়ে যেতে থাকে। মাধব জানে তার কোথাও যাওয়ার নেই। কোথাও ফেরার নেই। বসে বসে সে শুধু ঢিবিটার কথা ভাবে।

কতক্ষণ বসে ছিল মাধব তা তার খেয়ালও ছিল না। যখন বিকেলে এক অকালসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, চারদিক ঘুটঘুট্টি হয়ে উঠল তখন মাধব ধীর পায়ে বেরিয়ে এল স্কুল থেকে।

রাস্তায় হাঁটুভর জল দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই। মাধব ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। সন্ধ্যার একটু রেশ তখনও ঘন মেঘের আড়াল থেকে ফিকে একটা আভা ছড়াচ্ছিল। সেই রহস্যময় আলো-আঁধারিতে চারদিকে এক গভীরতা তৈরি হয়েছে। এক বিষণ্ণতার মায়াজাল।

মাধব জলের মধ্যেই দাঁড়ায়। ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দু'বেলা ভাল করে ভাত জোটে না। পরনে একটার বেশি দুটো জামা বা প্যান্ট নেই। মাটির ঘরে এই বর্ষায় সাপ চলেফিরে বেড়ায়, নটনট করে ঘোরে বিছে। এইসব মেনে নিয়ে সে বেঁচে আছে। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে কত আশা আকাঙ্ক্ষাই যে সর্বদা টগবগ করে ফোটে!

ঊর্ধ্বমুখ মাধবের গালে চোখে কপালে খরশান বৃষ্টির ফোঁটা এসে বিদ্ধ করে। কোন দূর আকাশ থেকে কোন স্বর্গ থেকে আসে জল! তাকে নিষিক্ত করে দেয়। বইখাতা ভেজে। জামাকাপড় ভিজতে থাকে।

জল ভেঙে মাধব হাঁটতে থাকে। তার মনে হয়, এই যে বেঁচে থাকা এরকম বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু এমন একদিন হবেই, সে বাড়ি ফিরে দেখতে পাবে, তার হারানো দাদু ফিরে এসেছেন। বাক্স ভর্তি টাকা, নাতির জন্য জামাকাপড়, আরও কত কী! কিংবা বড় জ্যাঠাই হয়তো এসেছেন। তাকে আর পিসিকে নিয়ে যাবেন লন্ডনে।

কিছুই বলা যায় না তো। মাধব বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

কাঁচের মানুষ

লাভ স্টোরের বারান্দায় পা ঠেকিয়ে সাইকেলটা দাঁড় করাল ঝিন্টু। কাউন্টারের ওধারে তার মেজদা বিটু একজন খদ্দেরকে হাত নেড়ে কী যেন খুব নিবিষ্টভাবে বোঝাচ্ছিল। আরও দু'জন দাঁড়িয়ে শুনছিল মন দিয়ে। খদ্দেরদের একজন গোপাল মুখার্জি— রেলের টিকিট কালেক্টর, দ্বিতীয় জন বিষ্ণু সমাদ্দার— গুদামবাবু। বিটু যার সঙ্গে কথা বলছে তাকে চিনতে পারল না ঝিন্টু।

মেজদা! এই মেজদা!

বিটু একবার তাকাল। বিরক্ত না নির্লিপ্ত তা বোঝা গেল না। তবে বিটুর মুখে একটা স্থায়ী উদাসীনতা আছে। কোন কথা শুনছে, কোন কথা শুনছে না তা ওর ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝা যাবে না কিছুতেই।

ঝিন্টু বলল, পেইন! পেইন! বউদির!

বিটু শুনল কি না বা বুঝল কি না তা বোঝা গেল না। তবে নিজের বউকে দেখাশোনা করার অনেক লোক বাড়িতে আছে। তার বাবা, মা, দাদা-বউদি, ভাইপো, ভাইঝি, ভাই। বিটু খবরটা শুনল মাত্র, তারপর আবার খদ্দেরকে হাত নেড়ে বোঝাতে লাগল।

ঝিন্টু বারান্দা থেকে পা তুলে পেডালে চাপ দিল। খবরটা তার দেওয়ার কথা ছিল, দিয়েছে। এখন সে ফ্রি। তার নিচু হ্যান্ডেলের রেসিং সাইকেলটা ভাল রাস্তা পেলে দারুণ চলে। এরকম সাইকেল এ শহরে দু'-তিনটির বেশি নেই। ছ' মাস আগে বাবা তাকে এটা কিনে দিয়েছিল। তবু আগের সাইকেলটার কথা তার খুব মনে পড়ে। না, সেটা খুব ভাল জাতের সাইকেল ছিল না। অতি সাধারণ। তারা চার বন্ধু সাইকেলে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিল। ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাডু, কেরালা, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ হয়ে তাদের ফেরার কথা ছিল। নাগপুরের কাছে দুপুরবেলা দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটা লরি তার সাইকেলটাকে পিষে দিয়ে গেল। তার বাঁ হাতটা ভাঙল, মাথায় চোট হল দারুণ। দিন দশেক হাসপাতালে পড়ে থেকে সে অবশেষে ফিরে এল। বাকি রাস্তাটা তাকে আসতে হল ট্রেনে এবং একা। তার তিন বন্ধু সাইকেলে যাত্রা শুরু করে সাইকেলেই যাত্রা শেষ করে। এই সাইকেলটা সেই সাইকেলের চেয়ে অনেক বেশি দামি এবং ভালও। কিন্তু এটা যে সেটা নয়, সেই ভাঙাচোরা সাইকেলটা মহারাষ্ট্রের কোন জংলা জায়গায় পড়ে পড়ে লক্কড় হয়ে যাচ্ছে, সেই কথা ভেবে আজও তার মাঝে মাঝে খুঁত খুঁত করে মনটা। কান্না পায়। সেই সাইকেল তাকে অনেকটা রাস্তা পার করে দিয়েছিল তো!

ঝিন্টুর এত নরম মনের ছেলে হওয়ার কথা নয়। সে বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়, কলেজের অপরিহার্য ক্রিকেট খেলোয়াড়, শহরের সেরা পাঁচজন অ্যাথলিটদের মধ্যে একজন, টেবিল টেনিসেও তার হাত দুর্দান্ত। এই মফস্‌সলে অবশ্য স্পেসিফিকেশনের বালাই নেই। কলকাতা হলে এত বহুমুখী প্রতিভা কল্কে পেত না। সেখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়ালড়ি। যে ক্রিকেট খেলে সে ক্রিকেটেই জান লড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে তাকানোর ফুরসত পায় না। যে ফুটবল খেলে তার দম ফুটবলের জন্যই নিংড়ে দিতে হয়। কিন্তু এ শহর তো কলকাতা নয়, এখানে খেলাধুলো কারও পেশা হয়ে ওঠে না কখনও। এখানে যে কেউ যা-খুশি খেলে এবং কেউ খুব বেশি ওপরে ওঠে না। ঝিন্টুর একটিই শখ আছে। গোটা পৃথিবী সাইকেলে ঘুরে আসবে।

সেবক রোডের দিকে মোড় নিতেই পিছনে একটা স্কুটার তাড়া করল। ঝিন্টু মুখ ফিরিয়ে দেখল, অলক আগরওয়াল। তার দিকে একবার হাত তুলে হাসল। তারপর ধেয়ে এল।

অল্প বয়সের এইটেই ধর্ম। স্পিড। আরও স্পিড। এবং কম্পিটিশন। ঝিন্টু তার রেসিং সাইকেলটাকে উড়িয়ে দিল। পিছনে অলক।

আগের মতো সেবক রোড এখন আর ফাঁকা রাস্তা নয়। দোকানপাট, রিকশায় ছয়লাপ। পদে পদে জ্যাম। তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝিন্টু গলে যেতে লাগল, ডাইনে বাঁয়ে আশ্চর্যরকম অ্যাঙ্গেলে হেলে ও দোল খেয়ে খেয়ে। অলকের ছোট চাকার স্কুটারে অতটা ব্যালান্স নেই। পারল না।

কিছুদূর গিয়ে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে যায় ঝিন্টু। মাঝে মাঝে ভারী সব লোড-করা লরি মার মার করে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায় দ্রুতগতি গাড়িও। এগুলোর সঙ্গে ঝিন্টু পারবে না জানে। তবু সে সাইকেলটায় একটা দামাল গতি তুলে দেয়। সাইকেল আর ঝিন্টু, ঝিন্টু আর সাইকেল। একাকার।

২

পুরনো জেলখানার পাশে একটা লাশকাটা ঘর ছিল। কবে সেই ঘর ভেঙে দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। কিন্তু আশ্চর্য এই কংক্রিটের যে টেবিলটায় পোস্টমর্টেম হত সেটা আজও দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে ভেঙে-পড়া দেয়াল, টুকরো ইট, ফাঁকে ফাঁকে আগাছা, তারই মধ্যে চারটে পায়ে আস্ত টেবিলটা দাঁড়িয়ে। চোখ পড়লেই বুকের ভিতরটা ঝাঁৎ করে ওঠে। সকলের হয়তো হয় না। পিন্টুর হয়। আসতে যেতে রোজ তার ওইদিকে চোখ পড়ে। আজও পড়ল। চলন্ত রিকশা থেকে সে অপলক চোখে কিছুক্ষণ দেখল, যতক্ষণ দেখা যায়।

এই টেবিলটাকে অনেকবার নানাভাবে সে স্বপ্ন দেখেছে। বাঁদিকে কাছারি, কাছারির পাশে কাঁচা নর্দমা, ডানধারে জেলখানার উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের পাশেই ওই পুরনো লাশকাটা ঘরের ধ্বংসাবশেষ। এখানে সবাই আজকাল আবর্জনা ফেলে। দুর্গন্ধে নাকে রুমাল দিতে হয়।

একদিন পিন্টুরও এই টেবিলে শুয়ে কাটাকুটি হওয়ার কথা ছিল। কপালটা কি তার একটু ফেবারে?

রাজনীতি ছাড়া কোনও মানুষ বাঁচতে পারে বা বেঁচে আছে বলে পিন্টু বিশ্বাস করে না। কোনও না কোনওভাবে সব মানুষই রাজনীতি করে। কেউ জেনে, কেউ না জেনে। পিন্টু বরাবর যা করেছে তা জেনেই করেছে। সে রাজনীতিতে নামে কলেজে থাকতে। তখন থেকেই তার খ্যাতি। কুখ্যাতিও। পিন্টু এও বিশ্বাস করে, রাজনীতি করতে গেলে কখনও সখনও গা-জোয়ারির দরকার হয়, দরকার হয় সমাজবিরোধী মার্কামারা ছেলেদেরও। নিরামিষ রাজনীতি বলে কিছু নেই, কিছু হয় না। কাজেই সে রাজনীতিতে নেমেছিল আস্তিন গুটিয়েই। ফলে কলেজে থাকতেই মোটামুটি তাকে লোক ভয় খেতে শুরু করে।

ফুন্টসোলিং থেকে ফেরার পথে মধু চা-বাগানের কাছে চিরুর দল তাদের জিপে হামলা করেছিল। নাহক হামলা। পিন্টুর মাথায় রড লেগেছিল। জলপাইগুড়ি হাসপাতালে আসবার পথে কয়েক লিটার রক্ত বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। মরতে মরতে বেঁচে ফিরে আসে পিন্টু। তারপর চিরুর ওপর হামলা চালায়। কিছুদিন শহর খুব গরম করে রেখেছিল দুই পক্ষ। তখন মনে হয়েছিল হয় চিরু না হয় পিন্টু শিলিগুড়ি দখল করবে। কার্যত তার কিছুই হয়নি। চিরু এখন সরকারি ট্যুরিস্ট লজ আর এম ই এস-এ মাছ মুরগি সাপ্লাইয়ের ঠিকাদারি করছে, বেচছে দেদার বিদেশি জিনিস। আর পিন্টু? সে এখন তার বাবার জুনিয়র হয়ে ওকালতি জমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। জীবনের ধারাটাই অন্যভাবে বইতে লাগল। রাজনীতি হল বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে থাকার মতো। যতক্ষণ পিঠে চেপে আছ ততক্ষণ ভাল, পড়লেই বাঘে খেয়ে নেবে।

পিন্টু এখন আর তেমনভাবে রাজনীতি করে না। সোজা কথায় বলতে গেলে, সে এখন কল্কে পায় না। তবে একসময়ে তার যে হাঁকডাক এবং প্রতাপ ছিল তার কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে। লোকে তাকে হ্যাটা করে না। অনেকে সেলাম বাজায়।

পিন্টুর বয়স এখন ত্রিশ। নতুন করে জীবন শুরু করার পক্ষে বয়সটা এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু আসল সমস্যা হল, নতুন জীবনটা গড়ে উঠবে কী নিয়ে? কীরকমভাবে? রাজনীতি ছাড়া তার কাছে আর সবকিছুই 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'-র মতো। সে জানে রাজনীতির জন্যই তার এই জীবনধারণ। কিন্তু সে এও জানে না, রাজনীতির অচলায়তনে নতুন কোনও ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা তার আর নেই। দলে এখনও নাম লেখানো আছে। দলের মিটিং-এ তার ডাকও পড়ে, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে তাকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয় না আজকাল।

বেঁচে থেকেও নিজের মৃত্যু এইভাবেই প্রত্যক্ষ করে পিন্টু।

কলেজের মোড়ে পানের দোকানের সামনে যে রিকশা দাঁড় করাতে হবে তা রিকশাওলা জানে। পিন্টুকে নামতে হয় না, দোকানদার তাকে দেখেই পিলাপাতি কালাপাতি দিয়ে পান সেজে নেমে এসে এগিয়ে দেয়। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে।

পিন্টু এই শ্রদ্ধার ভাবটা খুব নজর করে দেখে। শ্রদ্ধা কোথাও কমে যাচ্ছে কি না, বা আর কারও প্রতি বেড়ে উঠছে কি না এটা তার জানা দরকার। এই যে রিকশাওলাকে কিছু বলতে হয় না, শুধু পিন্টু উঠে বসলেই রিকশা নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে থাকে, পানের দোকানে দাঁড় করায় বা বাসায় নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেয়, এর ব্যত্যয় হলেই পিন্টুর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এসব ছোটখাটো ঘটনা হল মিটার। জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি মাপবার যন্ত্রবিশেষ।

এল আই সি, স্টেট ব্যাংক, সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, কোর্ট, এসডিও অফিস যেখানেই সে যায় কোথাও তার নিজেকে পরিচয় দিতে হয় না। পিন্টু নিজে গিয়ে দাঁড়ালে বা পিন্টুর নাম করে কেউ গেলে এখনও এই টাউনে অনেক কার্যোদ্ধার হয়ে যায়। মরা হাতি এখনও লাখ টাকা।

দোকানের অদূরে একটা গাছতলায় কয়েকজন ছেলেছোকরা গ্যাঞ্জাম করছিল। পিন্টুকে দেখে এগিয়ে এল।

পিন্টুদা শুনেছেন?

পিন্টু বোঁটা থেকে একটু চুন চেটে নিয়ে বলে, কী?

ফুডের চ্যাটার্জি সাহেব আবার কাল রাত থেকে ঘেরাও হয়ে আছে। ফুড কর্পোরেশনের ম্যানেজার চ্যাটার্জিসাহেব প্রায়ই ঘেরাও হন। এ যুগের পক্ষে লোকটা নিদারুণ 'মিসফিট'। ঘুষ-টুস খান না, কর্মচারীদের একটু ডিসিপ্লিনে রাখতে চেষ্টা করেন, তার চেয়েও বড় কথা চুরি আটকানোর চেষ্টা করেন। ফলে মাসে দু'-একবার তাঁকে ঘেরাও হতে হয়। খবরটা তাই নতুন নয় বটে, কিন্তু পিন্টুর খিঁচ অন্যখানে। খবরটা যে যথাসময়ে পায়নি। আজকাল টাউনে কোনও ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পিন্টুর কানে কেউ পৌঁছে দেয় না, আগে যেমন দিত। যে-কোনও ঘটনাতেই পিন্টুর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। আর আজকাল? সে সময়মতো কোনও খবরই পায় না।

সামনেই ফুড কর্পোরেশনের অফিস। পিন্টু রিকশায় বসেই অফিসের সামনে ভিড় দেখতে পেল। খুব নিস্পৃহভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। ভিতরে কোনও তাগিদ অনুভব করল না। ফুড কর্পোরেশনের ইউনিয়নে চারটে ভাগ। বড় ভাগটি তাদের— অর্থাৎ তার দলের। কিন্তু কেউ তাকে ডাকেনি, তার পরামর্শ চায়নি।

পিলা আর কালাপাতি জর্দার ধার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। পিক ফেলে পিন্টু অস্পষ্ট গলায় বলল, চল।

রিকশা চলতে থাকল।

৩

ব্রহ্মকুমার গাঙ্গুলিকে এ শহরের সবচেয়ে বড় উকিল বলা যাবে কি না তা বলা মুশকিল, তবে তিনি যে সবচেয়ে বড়দের একজন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই সবচেয়ে বড় উকিলদের সংখ্যা খুব বেশিও নয়। মেরে কেটে চার-পাঁচজন। এবং তাঁদের মধ্যে সকলেই বৃদ্ধ এবং প্রবৃদ্ধ। উপেন বিশ্বাসের বয়স আশি ছাড়িয়েছে। তবু সক্ষম আছেন বলে কোর্টে প্রায় রোজই হাজিরা দেন। বেশিরভাগ সময়েই বসে ঝিমোন। মামলা চালায় জুনিয়ররা। নিরাপদ সরকার ছিয়াত্তরে পা দিয়েছেন। আজকাল আদালতে আসতে চান না। প্রায়ই ছেলের কাছে আমেরিকার হিউস্টনে চলে যান এবং কয়েকমাস করে থেকে আসেন। কেস প্রায় নেন না বললেই চলে। গৌর ব্যানার্জি কিছুটা অ্যাকটিভ। বয়স তিয়াত্তর। ব্রহ্মকুমারের একমাত্র সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রদ্যোৎ সেন তেমন বৃদ্ধ নন, মাত্র পঞ্চান্ন বা ছাপ্পান্ন। উকিলও ভাল। কিন্তু শোকতাপ পেয়ে ইদানীং বড্ড নিঝুম হয়ে গেছেন, কোনও কাজেই উৎসাহ নেই।

আর যেসব উকিল আছে তারা উঠতি, ঝলবলে খলখলে। এখনও কারওরই ভাল পসার জমেনি। বুড়ো আর যুবোদের মধ্যে পেশাগত এই প্রজন্মের ফাঁকটুকুতে যে ভ্যাকুয়াম আছে সেখানেই ব্রহ্মকুমারের স্থান। তিনি যথেষ্টই রোজগার করেন, উদয়াস্ত তাঁর সময় নেই। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি তাঁর মেশিন চালু থাকে। তাঁর তেমন কোনও শখ নেই, আহ্লাদ বা প্রমোদ নেই, তিনি কোথাও ভ্রমণে যান না, তা ছাড়া তাঁর কোনও নেশা নেই। তাঁর একটাই নেশা— মামলা। কত টাকা তিনি মাসে রোজগার করেন তার সঠিক হিসেব তাঁর নিজেরও জানা নেই। তবে কম করেও দশ থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে। টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে, জমা হচ্ছে না খরচ হয়ে যাচ্ছে তা তাঁর স্ত্রী বলতে পারবেন। তিনি কিছুই জানেন না সংসার কীভাবে চলে। স্ত্রীই সবকিছু চালিয়ে নেন, সংসারকে এবং তাঁকেও। তিনি আজকাল সুখাদ্যের স্বাদ টের পান না, সুন্দরী ও কুৎসিত নারীর তফাৎ বুঝতে পারেন না, মাত্র উনষাট বছর বয়সেই তাঁর কামবোধ লুপ্তপ্রায়।

সকালবেলায় ব্রহ্মকুমার তাঁর বাইরের ঘরে বসেই তাঁর তৃতীয় পুত্র পিন্টুকে গালাগাল করছিলেন, অপদার্থ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ফাজিল, ভূত। তার কারণ জলপাইগুড়িতে পরশুদিন একটা মামলার হিয়ারিং ছিল। কথা ছিল পিন্টু কেসটা অ্যাটেন্ড করবে। কিন্তু সে তা করেনি এবং সে কথা বাপকে জানায়নি পর্যন্ত।

মক্কেলদের দিকে চেয়ে ব্রহ্মকুমার বলছিলেন, এই এরাই সব আধুনিক কালের ছেলেমেয়ে। এদের হাতে দেশ আর দশের ভার দিয়ে যেতে হবে আমাদের। বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ বছর পর দুনিয়াটার কী হাল হবে ভাবতে পারেন?

জলপাইগুড়ির মক্কেল করুণভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একধারে। ফাঁক পেয়ে বলল, সামনের পনেরো তারিখে ডেট পড়েছে। এবারটায় আপনি নিজে যাবেন তো উকিলবাবু?

যেতেই হবে। তুমি তেরো-চোদ্দো তারিখে একবার তাগিদ দিয়ে যেয়ো। আর মুহুরির কাছে আমার এনগেজমেন্ট বুক আছে, তাতে শুনানির তারিখ আর নামধাম লিখে রেখে যাও। কোনওক্রমে যাতে ভুল না হয়।

মামলার ব্যাপারে ব্রহ্মকুমারের ভুল হয় কদাচিৎ, তিনি তো এই প্রজন্মের দায়দায়িত্বহীন বাপের হোটেলের অন্নধ্বংসকারী ছেলেছোকরা নন। যখন বিয়ে করেছিলেন তখনও ল-এর ছাত্র, রোজগারের নামে ঢু ঢু, তবু বাপের হুকুমে টোপর পরতে হয়েছিল। বাপের হুকুম কী জিনিস তা এরা সব বুঝবে না, তখন বাপই ছিল আইন, বাপই সুপ্রিম কোর্ট, প্রিভিকাউন্সিল। খেঁদি পেঁচি কাকে গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন বিগ বস তা বুঝতে পারছেন না বলে ভয়ে শুভ দৃষ্টির সময় চোখ পর্যন্ত খোলেননি। আর এই পিন্টুকে বিয়ে করার কথা বলে বলে মুখে ফেকো উঠে গেল, কথাটা শুনতে

পায় বলেই মনে হয় না। অথচ ছেলেটার বিয়ে দরকার। রাজনীতি করতে গিয়ে দাগা খেয়েছে, আইনেও মন নেই। এই অবস্থায় বিয়ের বাড়া ওষুধ নেই। কিন্তু ওষুধ না গিললে কী করবেন তিনি?

বাচ্চা চাকরটা এসে খবর দিল, মা একটু ডাকছেন বাবু।

ব্রহ্মকুমার আঁতকে উঠে বলেন, এখন ডাকছে কী রে? কত মক্কেল দেখছিস না!

আজ্ঞে খুব দরকার।

পরে হবে, পরে। এখন যা।

চাকরটাকে ব্রহ্মকুমার স্টেশন থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। উত্তরবঙ্গের বছরওয়ারি বন্যায় বছর চারেক আগে গোটা পরগনা ভেসে গিয়েছিল। শিলিগুড়ি উঁচু ভিতের শহর, কখনও ডোবে না, রাজ্যের লোক এসে পঙ্গপালের মতো ঝাঁপ ফেলল শহরে। স্টেশন, গুমটি, চালা, স্কুল কলেজ সব জায়গায় লোক। সেইসময় পুরনো বাজার থেকে মাসকাবারি বাজার করে ফেরার পথে স্টেশনে এ এস এম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশ-কাল-পরিস্থিতি নিয়ে দুটো কথা বলছিলেন দাঁড়িয়ে। বাচ্চা একটা সাত-আট বছরের গোপাল গোপাল চেহারার ছেলে কাছেই দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে কাঁদছিল। ছেলেটার দিকে বিরক্ত চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন ব্রহ্মকুমার। এমন সময় পাশেই একটা দঙ্গল থেকে একটা আদুর-গা লোক বিগলিত মুখে এগিয়ে এল। গায়ে-পড়া অসহ্য রকমেব আলাপি কিছু লোক আছে দুনিয়ায়। এদের আস্পদ্দার শেষ নেই। হুট বলে যখন তখন শ্রেণিভেদ ভুলে যার-তার সঙ্গে মনের কথা বলতে লেগে যায়। এ লোকটাও তেমন। চক্রবর্তী আর তাঁর কথা হচ্ছে, মাঝখানে উদয় হয়ে লোকটা বলল, এই যে ছেলেটা দেখছেন না বাবু এর বাপ নেই। মা একটা পাগলি। তা ছিল মায়ে-পোয়ে একরকম, কিন্তু আজ সকাল থেকে মা-টারও তল্লাশ নেই। কোথায় চলে গেছে পাগল মানুষ। ছেলেটা কেঁদে কেটে সারা হচ্ছে। তা বাবু নেবেন নাকি ছেলেটাকে? ঘরে দোরে থাকবে, কাজকম্ম করবে, মানুষ হয়ে যাবে একরকম।

ব্রহ্মকুমারের রেগে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু একটু সংসারী বুদ্ধি তখন খেলল মাথায়। তাঁর স্ত্রীর একটু বাতের লক্ষণ আছে। হাঁটু আর পায়ে কোনও বাচ্চা ছেলে উঠে মাড়িয়ে দিলে আরাম পান। কিন্তু সেরকম বাচ্চা তাঁর বাড়িতে কেউ নেই। এটাকে নিলে সেই কাজ হয়। লোকটাকে ব্রহ্মকুমার জিজ্ঞেস কবলেন, জাতে কী রে?

আজ্ঞে, বারুজীবী। ভালই, জলচল।

গার্জিয়ান কেউ নেই?

আমি গ্রাম সম্পর্কে কাকা। আর কেউ নেই।

ব্রহ্মকুমার লোকটার নামধাম টুকে নিলেন। তারপর ছেলেটাকে নিয়ে এলেন বাসায়। প্রথম প্রথম তিন-চারদিন খুব কাঁদত। খেতে চাইত না, খেলতে চাইত না। পরে আস্তে আস্তে এমন বশ মানল যে আর বলার নয়। ভেলু না ফেকু কী একটা নাম যেন ছিল আগে। এ বাড়িতে আসার পর নাম দেওয়া হয়েছে জনার্দন। ছেলেটা একটু খেতে ভালবাসে। কোমরের কষি খুলে যায়। ভোজনে চ জনার্দন স্মরণ করে ওই নামটা বোধহয় পিন্টুই দিয়েছিল। সেই থেকে জনার্দন।

মায়া মোহের কথা শাস্ত্রে যা বলা আছে তা যে অতিশয় খাঁটি তা উকিলবাবু বেশ টের পান। এই জনার্দনকে দিয়েই টের পান। কুড়িয়ে পাওয়া এই ছেলেটার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, কিছু নেই তবু একটা ভারী মায়ার টান এসে গেছে। এখন যদি জনার্দনের মা এসে ছেলেকে দাবি করে বসে তবে ছাড়তে ভীষণ কষ্ট হবে।

ব্রহ্মকুমার জনার্দনের দিকে চেয়ে বললেন, তোর মা'র এমন কী জরুরি দরকার বল তো যে মক্কেল ছেড়ে যেতে হবে?

জনার্দন মাথা নেড়ে বলল, সে জানি না।

এক মক্কেল আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, শুনেই আসুন না উকিলবাবু, আমরা বসছি।

বসুন তা হলে।—বলে ব্রহ্মকুমার উঠলেন, বেলা প্রায় পৌনে দশটা হল। কোর্টে একটু বেলা করেই যান। তবু তারও বেশি সময় নেই।

৪

সুমনা জানেন, স্বামীটিকে ডেকে তেমন কোনও লাভ নেই। কারণ খুব দুঁদে উকিল হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মকুমারের বাস্তব বুদ্ধি অতিশয় সীমাবদ্ধ। বিপদের সময় ব্রহ্মকুমারের একমাত্র ভূমিকা হল চেঁচামেচি করে অন্যদের ডাকাডাকি করা। এবং অবাস্তব সব পরামর্শ দেওয়া।

বিপদ বলতে অবশ্য তেমন কিছু নয়। তার মেজো বউমার ব্যথা উঠেছে। সুমনা নিজে বহুবার মা হয়েছেন। কাজেই অভিজ্ঞতার অভাব তাঁর নেই। এ অবস্থায় কী করতে হয় না-হয় সবই তাঁর নখদর্পণে। তা ছাড়া কেষ্ট মিত্রের নার্সিং হোম-এ নাম লেখানো আছে।

কিন্তু মুশকিল হল তাঁর মেজো বউমা সোমার হার্ট ভাল নয়। কলকাতার বড় ডাক্তারও দেখে বলেছে, বেশি ধকল সইতে পারবে না। সন্তান প্রসব না করলেই ভাল।

ডাক্তারদের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে জীবন অচল। সুতরাং তা কদাচিৎ মানা হয়।

কিন্তু সুমনা ভাবছেন, এক্ষেত্রে মানাই বোধহয় ভাল ছিল। ব্যথা ওঠার পর থেকেই সোমার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুকে ভীষণ ধড়ফড়ানি এবং ক্ষীণ একটু ব্যথাও। ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই। ভরসা জনার্দন আর ব্রহ্মকুমার। শুধু নার্সিং হোম-এ নিয়ে ফেলে রেখে আসলেই চলবে না, ব্যাপারটা বুঝেও আসতে হবে। বড় বউমা মঞ্জরী কাছে থাকলেও খানিকটা ভরসা পেতেন সুমনা। সে গেছে লাটাগুড়ি চা-বাগানে বাপের বাড়ি, তার মায়ের এখন-তখন অবস্থা বলে আজ সকালেই ভাই এসে নিয়ে গেল। দুই ছেলে আর এক মেয়েকে রেখে গেছে। এখন তারাও সবাই স্কুলে।

চিনচিনে ব্যথাটা উঠতেই সোমাকে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করিয়েছেন তিনি। এ সময়ে হাঁটাহাঁটি করলে প্রসব সহজ হয়। কিন্তু ভিতরের বারান্দায় কয়েকবার এপাশ ওপাশ করেই সোমা বুক চেপে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে। ঝিন্টুকে পাঠিয়েছেন বিটুকে খবর দিতে। কিন্তু সেও এসে পৌঁছয়নি এখনও। সুমনা পরিস্থিতিটা ভাল বুঝছেন না।

ব্রহ্মকুমার ব্যস্তবাগীশ লোক। চোখ কপালে তুলেই বাইরের ঘর থেকে ধেয়ে এসে বললেন, কী হয়েছে কী? তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় নেই।

শোনো, চেঁচামেচি কোরো না। বউমার ব্যথা উঠেছে।

ব্যথা!

প্রসবের ব্যথা। বাড়িতে ছেলেরা কেউ নেই। তুমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো এক্ষুনি।

কথাটা শুনেই ব্রহ্মকুমার চেঁচাতে লাগলেন, কোথায় থাকে সব নবাব-নন্দনেরা? কোথায় যায়? এটা কি হোটেলখানা নাকি? এখন হার্ট ফেল-টেল করলে কে দায়ী হবে?

সুমনা স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে তাঁকে ভস্ম করে দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করে বললেন, ষাঁড়ের মতো চেঁচালে বউমার আরও শরীর খারাপ হবে, খেয়াল আছে?

ব্রহ্মকুমারও স্ত্রীর দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, তোমরা আমাকে পেয়েছটা কী বলতে পারো? এক ঘর মক্কেল ছেড়ে এখন আমি ছুটব গাড়ি আনতে?

তাতে দোষটা কী হল? মক্কেলরা কেউ পালাবে না। সারাজীবন কেবল মক্কেল-মক্কেল করে গলা শুকোলেই তো হবে না। সংসারে আরও পাঁচজনের প্রতি কর্তব্যও আছে।

ব্রহ্মকুমার আদালতে সওয়াল-জবাব মারফত রোজই বিস্তর ঝগড়া কাজিয়া করে থাকেন। বস্তুতপক্ষে মামলা মানেই তো দু' পক্ষের ঝগড়া। সেই ঝগড়ায় তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই

জেতেনও। কিন্তু মুশকিল হল সংসারের ঝগড়ায় তিনি কিছুতেই এঁটে ওঠেন না। সেইজন্য পারতপক্ষে সুমনার সঙ্গে তিনি বিতর্ক এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ঝগড়া না করলেও রোষকষায়িত লোচনে স্ত্রীকে বিদ্ধ করতে ছাড়েন না ব্রহ্মকুমার। বলেন, কর্তব্য কেবল এক আমারই? বাঃ, বেশ।

সুমনা ব্রহ্মকুমারের রোষদৃষ্টিকে একটুও গ্রাহ্য না করে বললেন, সংসারের দায়-দায়িত্ব আমি ঘাড়ে না নিলে বাইরের ঘরে বসে ঠ্যাং নাচানো বেরিয়ে যেত। কিন্তু এখন এত কথার সময় নেই, ঘরে সিরিয়াস রুগি। দয়া করে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো।

ব্রহ্মকুমার বিরক্তির গলায় বলেন, গৌর কন্ট্রাক্টরকে তো বলাই আছে তার গাড়িটা দরকার হতে পারে। কাউকে দিয়ে তাকে একটু খবর পাঠালেই তো হয়।

সুমনা মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। একটু রাঙাও হলেন কি? গলাটা এক পরদা নেমে গেল। বললেন, গৌর তোমার পেয়ারের লোক, তুমি খবর পাঠাও গে। কিন্তু সে থাকে সেই এক নম্বর ডাব গ্রামে, মাইল তিনেক দূর! অতদূর গিয়ে গাড়ি আনতে আনতে ভালমন্দ একটা কিছু না হয়ে যায়!

তা হলে?

তা হলে কী সেটা জানার জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠালাম। একটু বেরিয়ে দেখো কাছাকাছি কারও গাড়ি পাও কি না। রিকশায় নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না। তোমার মক্কেলদের কারও গাড়ি-টাড়ি নেই?

ব্রহ্মকুমার হঠাৎ উদ্ভাসিত হন। তাই তো! জলপাইগুড়ির মক্কেলটি যতদূর মনে হয় গাড়ি করেই এসেছে। লোকটা এখনও চলে যায়নি বোধহয়।

দেখছি।—বলে ব্যস্তসমস্ত ব্রহ্মকুমার বেরিয়ে গেলেন। জলপাইগুড়ির মক্কেল বারান্দায় মুহুরির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় এনগেজমেন্ট বুক-এ মামলার তারিখ লেখাচ্ছে। সেরকমই কথা।

লোকটার নাম মনে পড়ল না। ব্রহ্মকুমার বললেন, ওহে—

লোকটা ফিরে তাকাল, আমাকে বলছেন?

ইয়ে, আপনার গাড়ি আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই তো।

ব্রহ্মকুমার দেখলেন, নতুন ঝকমকে অ্যামব্যাসাডার।

ইয়ে, আমার পুত্রবধূকে একটু নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে। সিরিয়াস অবস্থা।

মক্কেল ব্যস্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৌঁছে দিচ্ছি। এ আর বেশি কী কথা?

আড়াল থেকে সুমনা দৃশ্যটা দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ি পালটাতে গেলেন। সোমার ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন, বউটা নিঝুম হয়ে পড়ে আছে।

বউমা।

উঁ?

চলো। একটু তৈরি হয়ে নাও। গাড়ি জোগাড় হয়েছে।

একটু কাতর শব্দ করে সোমা উঠল।

কেমন লাগছে বউমা?

বুকের ভিতরটায় ভীষণ ভার।

শাড়ি কি আমি পরিয়ে দেব?

না। পারব।

তা হলে আর দেরি কোরো না। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ব্রহ্মকুমার আবার গিয়ে বাইরের ঘরে বসেছেন। সুমনা একখানা পাট-ভাঙা শাড়ি পরতে পরতে স্বামীর কথা ভাবছিলেন। যা রোজগার তাতে একটা গাড়ি কেনা কিছু শক্ত নয় ব্রহ্মকুমারের পক্ষে। বাড়িতে একটা টেলিফোনও বড্ড দরকার। কিন্তু এসব প্রয়োজনের কথা ব্রহ্মকুমার কানে তোলেন

না। কথা উঠলেই বলেন, ওসব স্ট্যাটাস সিম্বল-এ আমার দরকার নেই।

টাকাপয়সা অবিশ্যি সবই সুমনার হেফাজতে। কিনলে তিনিই কিনতে পারেন। কিন্তু নিজেকে ততটা স্বাধীন বলে আজও ভাবতে শেখেননি সুমনা। ব্রহ্মকুমারের মত না হলে সেটা সম্ভব নয়। শুধু গত বছর অনেক বলে কয়ে মত আদায় করে একটা ফ্রিজ কেনা সম্ভব হয়েছে মাত্র। আর গ্যাসের উনুন। সংসার এখনও ব্রহ্মকুমারের আয়েই চলে। বড় দুই ছেলে রোজগার করে বটে কিন্তু এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য রকমের টাকা সংসারে দেয় না। না দিলে সুমনা কীই-বা করতে পারেন?

শাড়ি পরা হয়ে গেল। সোমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, বউমা হল?

হয়ে এল মা। ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছি।

ঠাকুর প্রণাম করে যাও এসে। মক্কেলের গাড়ি, বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা চলবে না।

জনার্দনকে ডেকে বললেন, রান্না অর্ধেক করে রেখে যাচ্ছি। আজ বাবুর খাওয়ার খুব কষ্ট হবে। মাছভাজা আর ডাল দিয়ে ভাত দিস। গাছ থেকে একটা গন্ধলেবু এনে কেটে দিস। দেখিস, সর্দারি করে আবার গ্যাস জ্বালাতে যাবি না খবরদার। আর একবার সিলিন্ডার বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলি মনে আছে তো!

তুমি এ বেলা ফিরবে না মা?

ফিরব বইকি। পৌঁছে দিয়েই ফিরব। সব একটু দেখেশুনে রাখিস বাবা। আর বিটু ফিরলে বলিস তখনই যেন নার্সিং হোমে চলে যায়।

নতুন গাড়িটার অভ্যন্তরে যখন উঠে বসলেন সুমনা তখন তাঁর একটু হিংসে হল। এরকম একখানা গাড়ি ব্রহ্মকুমার অনায়াসেই কিনতে পারেন। কিন্তু লোকটার বড় জেদ, বড় গোঁ। যেন গাড়ি কিনলেই ট্র্যাডিশন ভাঙা হবে, বড়লোকি দেখানো হবে আর ছেলেদের অধঃপাতে যাওয়ার রাস্তা করে দেওয়া হবে।

বিটুকে দোকান থেকে তুলে নেবেন কি না একবার ভাবলেন সুমনা। কিন্তু ভেবে মনে হল, কাজটা যুক্তিযুক্ত হবে না। বউয়ের প্রতি বিটুর বিশেষ দায়িত্ববোধ আছে বলে সুমনার মনে হয় না। তা ছাড়া ও সঙ্গে গিয়ে কীই-বা করবে? সোমার সঙ্গে বিটুর বিয়ে দেওয়াটা হয়তো ভুলই হয়েছে। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় আর পাত্রী খুঁজেও পাওয়া গেল না। বিয়ে না দিয়েও উপায় ছিল না। বেশিরভাগ পরিবারেই একটু-আধটু কেলেংকারি থাকে। বড় বউমা মঞ্জরী আর মেজো ছেলে বিটু এই সাদামাটা পরিবারে সেই দাগটাই দেগে দিতে গিয়েছিল প্রায়। মন্টুর সঙ্গে মঞ্জরীর সবে বিয়ে হয়েছে তখন। বছর না ঘুরতেই দেওর আর বউদির সম্পর্কটা বড্ড বেশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে পড়েছিল। মন্টু চাকরি করত মালদায় স্টেট ব্যাংকে। আসা-যাওয়া ছিল। তবে টানা থাকত না। বউ নিয়ে যাওয়ারও খুব আগ্রহ ছিল না। মন্টু একটু অন্যরকম। সাধু সাধু ভাব। অবসর পেলেই ধর্মের বই পড়ে। সাধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। মঠে মন্দিরে যায়। একা একা গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারবদ্রী, কাশী, গয়া ঘুরে বেড়ায়। ওই ছেলের বউ যদি এদিক ওদিক করে তবে আর সুমনা দোষ দেবেন কাকে? আর বিটু তখন দুর্দান্ত পুরুষ। ব্যাডমিন্টনে জেলার চ্যাম্পিয়ন। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলে রানার্স আপ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া চোখা, চালাক, ছলবলে যুবক। সিনেমায় নামবার জন্যও তোড়জোড় করছিল। এ ছেলের সঙ্গে যে-কোনও যুবতীর ঢলাঢলি খুব স্বাভাবিক। দোষের মধ্যে বিটুটার লেখাপড়া তেমন এগোয়নি। বি এসসি-টা কিছুতেই পাশ করতে পারল না। তাতেও বাধেনি। একদিন মঞ্জরীর কোলে মাথা রেখে বুঝি শুয়ে ছিল সন্ধেবেলায়। অন্ধকার ঘরে ফোঁপানির শব্দ পেয়ে জানালার ফোকর দিয়ে দৃশ্যটা দেখে ফেলে যূথী। যূথী এসে মাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দৃশ্যটা দেখায়। অন্ধকার বলে তেমন কিছু দেখতে পাননি সুমনা। তবে কিছু গাঢ় কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন।

বিটুর একটা অসাধারণ গুণ আছে। মাতৃভক্তি। পারতপক্ষে কখনও সে সুমনার অবাধ্য হয়নি

কখনও। খুব শিশুবেলা থেকেই সে মায়ের ন্যাওটা। সুমনা বিপদ দেখে ছেলের সেই দুর্বলতা কাজে লাগালেন। বিয়ের প্রস্তাবে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল বিটু। রাগারাগিও করেছিল। কিন্তু সুমনা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে শয্যা নেওয়ায় আর বেশি প্রতিরোধ করতে পারেনি। হয়তো সে বুঝেছিল যে, বউদির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা বাড়ির লোকে জানে। মত দিতেই পাত্রী খোঁজা হয়েছিল ঝড়ের বেগে। সোমা চা-বাগানের মেয়ে। মা-বাবা নেই, মামার কাছে অনাদরে মানুষ। বড় মায়া হয়েছিল মেয়েটাকে দেখে।

মায়া এখনও একটু আছে। বিটুটা বড় অনাদর করে ওকে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বিয়ে, তা সফল হয়েছে সন্দেহ নেই। মঞ্জরী আর বিটু একই বাড়িতে আজও বাস করে। কিন্তু দু'জনেই পরস্পরের প্রতি একেবারেই উদাসীন। বিটুর ব্যাডমিন্টন গেছে, দুরন্তপনা গেছে, স্মার্টনেস গেছে। বিয়ের পর থেকেই কেমন যেন আনমনা, কেমন যেন ছন্নছাড়া ভাব ওর। সেই বিটুকে আর চেনা যায় না। ব্রহ্মকুমার একটা দোকান করে দিয়েছেন, বিটু এখন সেই দোকান নিয়েই পড়ে থাকে।

সোমা খুব ক্ষীণ স্বরে কোঁকাচ্ছিল। সুমনা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, খুব কষ্ট হচ্ছে?

বুকটা কেমন করছে মা।

ব্যথাটা?

তেমন নয়। শুধু চিনচিন করছে।

ব্রহ্মকুমারের মক্কেল সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসা। মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে একবার চেয়ে বলল, মিত্র সাহেবের নার্সিং হোম তো! এসে গেছি।

সুমনা বউমাকে নিয়ে নামলেন।

৫

স্টকে অনেক জিনিস নেই। আনতে হবে। দুটো বেবি ফুড, একটা সিরিয়াল, দু'রকম হোল মিল্ক, দু' ধরনের ক্রিম, একটা বিশেষ ব্র্যান্ডের ব্লেড, আরও অনেকরকম জিনিস। চালু জিনিস টক করে বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু আনাতে গেলেই দেখা যায়, প্রতি পিস জিনিসের ওপর কিছু দাম চড়িয়ে বসে আছে পাইকার। আজকাল জিনিসের দাম বাড়ে মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে। ম্যানুফ্যাকচারার বা পাইকারকে পাবলিক ফেস করতে হয় না। খুচরো খদ্দেরদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয় রোজ এই তার মতো খুচরো দোকানদারদের।

এই তো গত সপ্তাহে তিনটাকা ডজন দরে ব্লেড নিলাম। এর মধ্যেই সাড়ে তিন!

কোম্পানি দাম বাড়ালে আমরা কী করব বলুন?

কই সম্পদ স্টোরে তো বাড়েনি! এই তো কালই কলেজের নয়নবাবু তিন টাকা দরে কিনে নিয়ে গেলেন।

কিংবা

মশাই কি ব্ল্যাক করছেন নাকি?

কেন বলুন তো!

বেবি ফুডটার তো টিনের গায়েই লেখা আছে, রিটেল প্রাইস নট টু একসিড—

লেখা তো থাকেই। আমরাও জানি। কিন্তু হোলসেলার যদি বেশি নেয়—

না মশাই, এটা একটা কথার কথাই নয়। এ সোজা ব্ল্যাক।

সারাদিনই বিটু এবং বিটুর মতো দোকানদারকে মুখ বাজিয়ে যেতে হয়। কতগুলো স্টক কথা আছে। সেগুলোয় কাজ না হলে মিনমিন করতে হয়। পুরোনো স্টক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ

একরকম। নতুন স্টক আনলেই হাঙ্গামা। লোকে বোঝে না একটা চালু দোকানের দোকানদার অনর্থক বেশি দাম চেয়ে নাম খারাপ করতে চায় না। তাই বিটুকে ফের মুখের তুবড়ি ছোটাতে হয়।

বিটু কি ক্লান্তি বোধ করে? হতাশা? বিরক্তি?

না। বিটু জানে সে আর কোনওদিনই ভারতের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হতে পারবে না। বিটু জানে সে আর কখনও হতে পারবে না কোনও সিনেমার নায়ক। বিটু জানে পৃথিবীতে ভালবাসা বলে আর কিছু নেই। আছে শুধু অন্তহীন কেনা বেচা। আছে লাভ লোকসান নামক কিছু উত্তেজনা।

প্রবীর।

বলুন বিটুদা।

বিটঠলভাইয়ের আড়তে গিয়ে মালগুলো নিয়ে আয়। লিস্ট করে রেখেছি।

যাচ্ছি।

স্টক মিলিয়ে দেখেছিস তো! আর কিছু লাগবে?

এ সপ্তাহটা চলে যাবে। গ্লিসারিন সাবানটা কম আছে। নুডলসের প্যাকেট আর নেলপালিশটাও।

লিস্টে ওগুলোও লিখে নে। পরের সপ্তাহে দাম বাড়তে পারে। স্টক রাখা ভাল। আর সম্পদ স্টোর্সে ব্লেডের দামটা জেনে আসিস তো। তিন টাকা ডজন দিচ্ছে কী করে পৌনে তিন টাকায় কিনে?

ঠিক আছে।—বলে প্রবীর নামক উনিশ-কুড়ি বছরের দীন এবং বিনয়ী চেহারার ছেলেটি খুব নরম স্বরে বলে, একবার বাড়ি যাবেন না দাদা?

বাড়ি! কেন?

ঝিন্টু কী বলে গেল শোনেননি?

ঝিন্টু! ওঃ!

একবার যাবেন না?

এখন না। যাবখন। তুই মালগুলো নিয়ে আয়।

দশটা বেজে গেছে। অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ বসে গেছে। এই সময়টায় খদ্দের কিছু কম। গিন্নিবান্নি গোছের কয়েকজন খদ্দের আসতে পারে। তাদের সুখময়ই সামলাতে পারবে। দোকানটা আগের চেয়ে একটু বড় হওয়াতে এখন দু'জন সেলসম্যান রাখতে হয়েছে বিটুকে। সুখময় নতুন। বয়স কম, একটু অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে দাম বলতে ভুল করে। ওজন করার হাতও পাকা নয়। তা ছাড়া বড্ড কামাই করে। ওর ভরসা বড় একটা করা উচিত নয়। তবে এ সময়টায় সুখময়ই সামলাতে পারবে।

বিটু সকালে দোকানে আসে বলে বাড়িতে খবরের কাগজ পড়ার সময় পায় না। তাই দোকানে সে একখানা করে কাগজ রাখে। শিলিগুড়িতে কলকাতার খবরের কাগজ আসে বিকেলের দিকে প্লেনে। কাজেই বিটুকে স্থানীয় দৈনিকটি রাখতে হয়। চার পৃষ্ঠার কাগজ তবে সব রকম খবরই থাকে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে।

প্রথম পৃষ্ঠায় বিটুর পড়ার কিছু নেই। রাজনীতি, বক্তৃতা আর দুর্ঘটনার খবর। সে খোলে খেলার পৃষ্ঠায় ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানশিপে প্রকাশ পাডুকোন সেমি-ফাইনালে হেরে গেল।

এখন তার নিজেরই বিশ্বাস হয় না যে, অনেক দিন আগে জব্বলপুরে সে এই প্রকাশের সঙ্গে খেলেছিল। খুবই ভাল খেলেছিল সে। তবে স্ট্রেট সেটে হারতে হয়েছিল তাকে। কেন হেরেছিল তা হারের দিন বুঝতে পারেনি সে। নিজস্ব অ্যাটাকিং গেম খেলে সে অগ্নিবর্ষী সব স্ম্যাশ-এ মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছিল সেদিন। পায়ের কাজও ছিল ভাল। প্লেস করেছিল নানা কোণে বুদ্ধি খাটিয়ে। কিন্তু মুশকিল হল প্রকাশ একটুও অ্যাটাকিং গেম খেলেনি, শুধু অনায়াস দক্ষতায় তার স্ম্যাশগুলো

তুলে তুলে দিচ্ছিল। বারবার লম্বা মার মেরে তাকে ঠেলে দিচ্ছিল বেস লাইনে। স্ম্যাশ করে তার ফলো-আপ করতে গিয়ে বেদম হয়ে পড়ছিল বিট্টু। দ্বিতীয় গেমেই বুঝতে পেরেছিল তার বিরুদ্ধে খেলছে একটি রোবট। রোবট ক্লান্ত হয় না, ঘাম ঝরায় না, রোবটের খেলায় আছে নির্ভুল ধারাবাহিকতা। বিট্টু পারবে কেন? বহুদিন ধরে খেলাটা বিশ্লেষণ করে দেখেছে সে। আধুনিক ব্যাডমিন্টনে বা যে-কোনও খেলারই মূল কথা হল স্ট্যামিনা, ফিটনেস এবং কন্ট্রোল। প্রকাশের সঙ্গে, দীপু বা রমেন ঘোষ, পার্থ গাঙ্গুলি বা অরুণ ব্যানার্জি কার সঙ্গেই বা খেলেনি বিট্টু? বিভিন্ন টুর্নামেন্টে এক-আধজন অল ইন্ডিয়া খেলোয়াড়কে সে প্রায়ই পেয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। খুব বড় অঘটন ঘটাতে না পারলেও এক-আধবার জিতেও গেছে। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি-ফাইনালে সে হারিয়েছিল তৎকালীন চ্যাম্পিয়নকে। ফাইনালে হেরে গেল উঠতি যে খেলোয়াড়ের কাছে সেই খেলোয়াড় টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

সুখময় এক কাপ চা এনে সামনে রাখল।

বিট্টু চায়ে একটা চুমুক দিয়ে প্রকাশের খবরটা আবার পড়ল।

বিদেশে সত্যজিৎ রায় যদি প্রাইজ পায়, রবিশংকর যদি বাহবা কুড়োয়, প্রকাশ পাড়ুকোন যদি জেতে, হকিতে ভারত সোনা আনে অলিম্পিক থেকে, ক্রিকেট যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারায় এবং গাভাসকার যদি ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙে একমাত্র তখনই নিজেকে কিছুক্ষণ ভারতীয় বলে মনে হয় বিট্টুর। আর কোনও সময়ে এটা হয় না।

এখনও হচ্ছিল না। প্রকাশ সেমি-ফাইনালে হেরে গেছে। হেরে তো বিট্টুও যেতে পারে। হারার জন্য তো প্রকাশকে পাঠানো হয়নি!

আরে আসুন ভট্‌চায্যিদা! কী খবর?

একটা মশার ক্রিম দাও তো বিট্টু। তোমার খবর কী?

এই তো, চলে যাচ্ছে।

গেলেই ভাল। তোমার বউয়ের কি বাচ্চা-কাচ্চা হবে নাকি?

বিট্টু একটু বিনয়ের হাসি হাসল।

ভট্‌চায ওডোমসের দাম দিতে দিতে বলে, এই তো প্রথম, না?

না। আগেও একবার হয়ে হয়ে গেল।

আহা রে। সবই ভবিতব্য।

আপনার কলকাতা যাওয়ার একটা কথা শুনেছিলাম না?

আজই যাচ্ছি। আর সেইজন্যই তো ওডোমস কেনা। বুঝলে আজকাল ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে পর্যন্ত দারুণ মশার উৎপাত।

জানি। আগে ছিল ছারপোকা।

আজকাল মশা। কলকাতাতেও ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে মশা। আগে মফস্‌সলে মশা ছিল, কলকাতায় ছিল না। আজকাল উলটো। কেন জানো?

না।

গাঁয়ে-গঞ্জে ফসলের পোকা মারতে বিষ দেয়, তাতে মশাও সাফ হয়ে গেছে। কলকাতায় তো আর তা নেই। যে শালার বিয়েতে যাচ্ছি সে থাকে যাদবপুরে। সেখানে যে কী মশা, না দেখলে বিশ্বাস করবে না। গত পুজোয় গিয়েছিলাম, রোদে বসে দাড়ি কামাচ্ছি, দেখি পায়ের পাতায় একসঙ্গে সার দিয়ে দশ থেকে বারোটা মশা বসে ভোজ খাচ্ছে।

বিট্টু বিনয়ের সঙ্গে হাসল। আগড়ম বাগড়ম কথা দোকানিকে শুনতেই হয়। নিয়ম।

যাওয়ার সময় ভট্‌চায বলে গেল, দেশে অ্যাডমিনস্ট্রেশন বলে আর কিছু নেই, বুঝলে। যা কন্ডিশন তৈরি হয়েছে তাতে মানুষ বেশিদিন টিকবে না। ওই মশা মাছিই থাকবে।

চায়ের তলানিটুকু গলায় ঢেলে বিটু আবার খবরের কাগজ খোলে। খেলার পাতা। বাংলা-বিহার রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের খবর পড়তে থাকে। টিকটিক করে একটা কিছু নড়ে তার ভিতরে। ঝিন্টু খবর দিয়ে গেছে সোমার পেইন উঠেছে। তার একবার যাওয়াটা বোধহয় দরকার। কাজটা শক্তও নয় কিছু। রিকশায় গেলে তিন-চার মিনিট।

বিটু!

মফফ্‌সল শহরের এই এক দোষ। বেশির ভাগ লোকই চেনা। বিটু ব্যস্ত হয়ে বলে, আরে দুলুদি! আসুন! ময়নাগুড়ি থেকে কবে এলেন?

পরশু। তোর কী খবর? শুনলাম বউয়ের বাচ্চা হবে!

বিটুকে কথা বলে যেতে হয়। কী বলছে তা সবসময়ে বিটু বুঝতেও পারে না। অর্থহীন সংলাপ সম্পূর্ণ না ভেবে-চিন্তে চালিয়ে যায়। কিন্তু বলে খুব কনফিডেন্স নিয়ে। বাকযন্ত্রের এরকম অপব্যবহার বুঝি আর হয় না।

বিটু পরিষ্কার বুঝতে পারে, এই যারা আসে, কথা বলে, জিনিস কেনে তারা কেউ পুরনো বিটুকে মনে রাখেনি। যে বিটু একসময়ে প্রকাশ পাড়ুকোনের সঙ্গে খেলেছিল, যে বিটুর সিনেমায় নায়ক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরা বিটুকে চেনে কেবল দোকানদার বলে।

দুলুদি একখানা ক্রিমের টিউব কিনল। তারপর বলল, কালই চলে যাচ্ছি।

কালই? কেন ক'দিন থেকে যান না!

না রে। কর্তাকে তো জানিস। আমি ছাড়া চলে না।

বিটু খবরের কাগজটা ফের টেনে নেয়।

কিন্তু পড়তে পারে না। বারবারই টিকটিক করছে কী একটা। সোমা! সোমার পেইন উঠেছে। সেটা বড় কথা নয়। মেয়েদের তো বাচ্চা হয়েই থাকে।

তবে সোমার একটু বুকের দোষ আছে। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছিল। বাচ্চা হতে গিয়ে বিপদ ঘটতে পারে। তার কি একবার যাওয়া উচিত?

আজকাল গভীর একটা আলস্য এসেছে বিটুর। শরীরে নয়, মনে। কিছুই যেন তাকে চমকে দেয় না, নড়াতে পারে না। সংসারে যা-ই ঘটুক তার মনে একটুও বুজকুড়ি কাটে না কোনও ঘটনা। নিজের এই নির্লিপ্ততা দেখে নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয় বিটু। দু'-তিন বছর আগেও যে-বিটু এ শহরে দাবড়ে বেড়াত তার সঙ্গে আজ এই বিটুর দেখা হলে কেউ কাউকে চিনতেই পারবে না।

৬

শাশুড়ির অসুখ, একটু দেখতে যাওয়া উচিত। কিন্তু মন্টু বুঝতে পারে না সে গিয়েই বা কী করবে। মঞ্জরী তাকে বারবার বলে গেছে বটে, অফিসের পরই সোজা গিয়ে মহানন্দার মোড় থেকে মিনিবাস ধরবে। ভুল যেন না হয়। মা তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

শাশুড়ির বোধহয় শেষ অবস্থা। কিন্তু তিনি মন্টুকে দেখতে চান কেন সেটাই প্রশ্ন। ভয় অবশ্য তাঁর একটা আছে। জামাইয়ের বৈরাগ্যব্যাধির কথা তিনি জানেন। যদি জামাই কখনও সংসার ছেড়ে হিমালয়-টিমালয়ে লম্বা দেয় তো তাঁর মেয়েটির কী দশা হবে।

মন্টু তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি যে, এই বিশাল জীবজগতে হরেক প্রাণের নিত্যি নতুন খেলায় কোথায় একটি প্রাণ নিবে গেল, কোথায় আর-একটি জ্বলে উঠল তাতে জগতের ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। যে একবার এই জগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে সে-ই জানে ব্যক্তিগত মৃত্যু কোনও ঘটনাই নয়। যেমন নয় বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী নাই বা হল মন্টু, যদি আজই অফিস থেকে

ফেরার পথে সে অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় তা হলে কি দুনিয়া অচল হয়ে যাবে? না কি দিন কাটবে না মঞ্জরীর? পৃথিবীতে অপরিহার্য তো কেউ নয়।

উনি অবশ্য এসব খুবই মন দিয়ে শোনেন। আবেগে চোখের জল মুছে বলেন, তুমি বড় জ্ঞানী বাবা, বড় জ্ঞানী। তবে কী জানো, আমরা সংসারী মানুষ, তত্ত্ব দিয়ে সংসারীদের কি বিচার হয়?

মন্টু টের পায় বৈরাগ্য তো নয়ই, বরং সংসার এবং বিষয় তাকে এক মস্ত অজগরের মতো পাকে পাকে জড়াচ্ছে আরও। দেব না দেব না করেও অফিসারের পরীক্ষা দিয়েছিল মন্টু। এক চান্সে হয়ে গেল। মালদা থেকে সটান পাঠিয়ে দিল শিলিগুড়ি। মন্টুর ইচ্ছে ছিল, সংসার থেকে একটু দূরে থাকে। বিশেষ করে মঞ্জরীর কাছ থেকে। স্ত্রী-সঙ্গকে সে পাপ মনে করে না বটে, কিন্তু স্ত্রী সঙ্গে থাকা মানেই ধ্যান থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। ভ্যানর ভ্যানর ভ্যাজর ভ্যাজর নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিযোগ অনুযোগ নালিশ ও পরনিন্দা শুনতে শুনতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় সে। অবিরল তার ভিতরে এক রক্তক্ষয় হতে থাকে। শিলিগুড়িতে বদলি না হলে খুব ভাল হত। সে চেয়েছিল সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বদলে এই বদলির চাকরি একরকম ভাল। সে নিজে রেঁধে খেত। একলা ঘরে বসে নিত্য পূজা পাঠ করে কাটিয়ে দিতে পারত। শিলিগুড়িতে আসতে হল বোধহয় কর্মফল কাটাতে।

বেলা সাড়ে দশটা বাজতে চলল। এখনও অফিসে হাজিরায় বিস্তর ফাঁক। অধিকাংশ কাউন্টার এবং টেবিলেই লোক নেই। আমানতকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। অধৈর্যের নানা শব্দ আসছে।

মন্টু একটু চিন্তিতভাবে চারদিকে তাকায়। ভারী অস্বস্তি বোধ করে। ধর্মের মধ্যে নানা কথা থাকে। সবই প্র্যাকটিক্যাল কথা। একটা হল, যথাসময়ে যথাবিহিত কর্তব্যটি করো। মন্টু এক মিনিটও দেরিতে অফিসে আসে না। ডিসিপ্লিন কথাটার মূলে আছে ডিসাইপেল কথাটা। শিষ্যত্ব। আগের দিনে গুরুগৃহে শিষ্যত্ব নিয়ে বহু কষ্টে শিখতে হত আত্মশাসন। এখন কে কাকে শেখায়, আর কেই বা শেখে!

মন্টুর পাশের টেবিলে টেলিফোন। বার সাতেক বাজার পর করচৌধুরী টেলিফোনটা তুলল। অনেক আগেই তুলতে পারত। বসে বসে খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল।

গাঙ্গুলি, আপনার ফোন।

মন্টু হাত বাড়িয়েই ফোনটা নাগালে পায়। শাশুড়ির কিছু হয়ে গেল নাকি?

মিত্র নার্সিং হোম থেকে বলছি। আপনার মা কথা বলবেন।

মা! কী হয়েছে মা?

সুমনার ঘাবড়ানো গলা পাওয়া গেল, মেজো বউমাকে ভরতি করে দিলাম।

কেন, পেইন উঠেছে নাকি?

হ্যাঁ, কিন্তু হার্টটাও বোধহয় ভাল না। ডাক্তার ই সি জি করাতে নিয়ে গেছে। একজন হার্ট স্পেশালিস্টকে খবর দেওয়া হয়েছে। একবার আসতে পারবি?

পারব। ঘণ্টাখানেক পরে গেলে হবে তো?

তা হবে। বিটুকে খবর দিয়ে দিয়ে আনতে পারিনি। পারলে তাকেও নিয়ে আসিস।

ঠিক আছে।

আমি তা হলে বাড়ি চলে যাই?

যাবে? যাও না।

তোর বাবাকে ভাতটুকু বেড়ে দিয়ে আসতে পারিনি। জনার্দন কী দিতে কী দেয়! ছেলেমানুষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যাও। তোমার ওখানে আর কাজই বা কী?

তুই কিন্তু আসিস বাবা। ডাক্তারের কাছে অবস্থাটা একটু বুঝে যাস।

মন্টু ফোন রেখে দিল। মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল তার। সোমা মেয়েটিকে বড় স্নেহ করে সে। বড় দুঃখী মেয়ে। দুঃখীদের মুখে ভগবানের ছাপ থাকে। এ কথা ঠিক যে দুঃখ ব্যাপারটা মানুষ পছন্দ

করে না। ধর্মের উদ্দেশ্যই হল দুঃখকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু এমন কিছু দুঃখ আছে যা আনন্দের চেয়েও গভীর। যে দুঃখের ভিতর দিয়ে ভগবান ধরা দেন তা কি পরিত্যাগযোগ্য?

মন্টু সংসার-উদাসীন বটে, কিন্তু সোমা আর বিটুর সম্পর্কটা সে টের পায়। বিটুটা একদম অন্যরকম হয়ে গেছে। দোকান ছাড়া আর কোনও দিকেই মন নেই। বউটার প্রতি তার কোনওদিনই কোনও মনোযোগ নেই। অথচ মেয়েটা বিয়ের আগেও এক দুঃখের জীবন যাপন করে এসেছে। বিয়ের পরও তাই। কী যে হবে! এত আনাদরেই বুঝি মেয়েটার শরীর সারে না। ওই অনাদরই বুঝি জন্ম দিয়েছে দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগের।

এক-একদিন সে সোমাকে উপনিষদ বোঝায় বা গীতা শোনায় এবং ব্যাখ্যা করে। মেয়েটা ভাশুরকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করে বটে কিন্তু এইসব ধর্মগ্রন্থ পাঠে তেমন আগ্রহ বোধ করে না। কেমন শক্ত হয়ে জোর করে বসে থাকে মাত্র।

ভাইয়ের বউ হলেও সোমাকে মা বলেই ডাকে মন্টু। বেশির ভাগ মহিলাকেই সে মাতৃ সম্বোধন করে। মা ডাকের মতো আর ডাক নেই। যে ডাকে তারও শুদ্ধি হয়, যে শোনে তারও শুদ্ধি হয়। একদিন সে সোমাকে বলল, মাগো, তোমার কি ধর্মে বিশ্বাস নেই?

সোমা অনেকক্ষণ চুপ করে গোঁজ হয়ে বসে থেকে বলল, ঠিক বুঝতে পারি না।

কেন মা? কোনটা শক্ত?

সবটাই ভীষণ শক্ত মনে হয়।

মন্টু মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে বলে, ধর্মের মতো সহজ স্বাভাবিক আর কিছুই নয়। এ তো বাক্সে তুলে রাখার জিনিস না, এ নিত্য চর্চার ব্যাপার। যদি ধর্মকে জীবনের সব আচার আচরণের মধ্যে অনুবাদই না করা গেল তবে ধর্ম দিয়ে মানুষের কোনও লাভ নেই। ধর্ম একটা ফলিত জিনিস, একটা হওয়ার ব্যাপার। শুধু শুনলে শক্ত তো লাগবেই। কিন্তু যদি করে দেখো যদি চর্চা করো তাহলে দেখবে শ্বাস চলার মতো স্বাভাবিক।

সোমা তর্ক করেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করেছিল শুধু।

মেয়েটা তর্ক জানে না, ঝগড়া জানে না, কুচুটেপানা নেই, এক অবোধ ভীরু চাউনি আছে শুধু। মেয়েটাকে কেন যে বিটু অত অবহেলা করে! বিটু আর মঞ্জরীকে নিয়ে যে গুজবটা আছে তা সবই জানে মন্টু। যুথীর কাছে শুনেছে, মায়ের কাছেও খানিকটা। বাকিটা আন্দাজ করে নিতে তার কষ্ট হয়নি। কিন্তু মন্টু এমন এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছে যেখানে ঈর্ষার জ্বলুনি নেই, রাগ নেই, দখলদারি নেই। সে ঘটনাটি শুনেই ওদের ক্ষমা করেছে। সে জানে কৃতকর্মের জন্য মানুষের অনুশোচনা না এলে বাইরের গঞ্জনা দিয়ে কর্মফল কাটে না।

মন্টু হাফ-ডে ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে উঠে পড়ল। গিয়ে ঢুকল এজেন্ট কর্মকার সাহেবের ঘরে।

ছুটি! হঠাৎ ছুটি কেন গাঙ্গুলি?

একটু দরকার আছে। বাড়ির লোকের অসুখ।

কার? আপনার ওয়াইফের?

না, ভাইয়ের স্ত্রীর।

ভাই মানে বিটু তো? তার বউ তো আমাদের সোমা! তার আবার হল কী?

বাচ্চা হবে। হার্টটাও ভাল না।

আপনি জানেন না সোমাকে আমি এইটুকু থেকে দেখেছি। আমিও চা-বাগানের ছেলে তো। ওর মামা আর আমি বানারহাট স্কুলে পড়তাম। ওর মামা অবশ্য আমার চেয়ে বছর কয়েকের সিনিয়র।

তাই নাকি! বলেননি তো কখনও?

আপনি তো মশাই সদ্য বদলি হয়ে এলেন। আপনার পর আমি এসে জয়েন করেছি। বলার

সুযোগ হয়নি বলে বলিনি। সোমার হার্টের অসুখ ছিল জানতাম না তো! অবশ্য হতেই পারে। যা অত্যাচার ওর ওপর করত।

মন্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সোমার সঙ্গে যখন বিটুর সম্বন্ধ হচ্ছিল তখনকার একটি ঘটনা মন্টুর খুব মনে পড়ে। একদিন বিকেলের দিকে সোমার মামা এসেছেন বিয়ের কথাবার্তা বলতে। হঠাৎ জামার বোতাম খুলে পৈতেগাছা বের করে হাতে জড়িয়ে নিয়ে জোড়হাত করে কেঁদে ফেলে বলে উঠল, আমার ভাগনিটাকে সংসারের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করুন। এর বেশি আর কিছু বলার নেই আমার।

বড় কষ্ট হয়েছিল মন্টুর। নিজের স্ত্রীর কথা ভদ্রলোক ভেঙে বলেননি। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ওই ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

কর্মকার জরুরি কাজ সারতে সারতে বললেন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

মন্টু বসল।

কর্মকার কাগজপত্র সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, আপনি তো ধার্মিক মানুষ বলে সবাই বলে। আমার ছেলের কুষ্ঠিটা একদিন একটু বিচার করে দেবেন?

মন্টুব হাসি পেল। ধর্ম আর জ্যোতিষকে অনেকেই এক করে দেখে। অনেকে আবার ভাবে, ধর্ম মানেই অলৌকিক ঘটনাবলি। এই অজ্ঞতার বুঝি শেষ নেই। সে বলল, আমি জ্যোতিষচর্চা করিনি তো কখনও!

সে কী মশাই? জ্যোতিষ না জানলে ধর্ম করেন কিসের?

মন্টু একটু হাসল, ধর্ম আর কীই-বা করি বলুন? তবে জ্যোতিষের সঙ্গে ধর্মের তেমন কোনও যোগাযোগ আছে বলে জানি না। ও একটা আলাদা শাস্ত্র, খানিকটা বিজ্ঞান, খানিকটা অনুমান। অদৃষ্ট মানে যা দৃষ্ট নয়, যা অগোচর। আমার তো মনে হয় সৎ কাজ করে গেলে তার ফল পাওয়া যায়ই। সৎকর্মীর কখনও অমঙ্গল হয় না। একদিন আগে আর পাছে।

কুষ্ঠি বলে কিছু বিশ্বাস করেন না?

করি। তবে প্রাচীন শাস্ত্রে যে ক'টা গ্রহের উল্লেখ আছে তা ছাড়াও আরও গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে পরে। সুতরাং জ্যোতিষ শাস্ত্র পূর্ণাঙ্গ নয়।

যাঃ, আপনি যে একেবারে জল ঢেলে দিলেন মশাই। আমি ভাবছিলাম একদিন আপনাকে নিয়ে জমিয়ে বসব কুষ্টি-ফুষ্টি পেতে।

না, আমি ওসব তেমন জানি না।

ঠিক আছে। তা হলে একদিন ধর্ম আলোচনাই শোনান আমাদের। আমার বাড়িতে। আমার স্ত্রী আবার ভীষণ সন্তোষী মা'র ভক্ত।

আজকাল অনেকেই।

হুজুগ, না?

তা একরকম বলা যায়।

শুক্রবারে তো মশাই উপোস-টুপোস করে সে এক পেল্লায় কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

মন্টু বিনীতভাবে একটু হাসল।

কর্মকার মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি চলে যান। সোমা কি নার্সিং হোম-এ আছে?

হ্যাঁ। মিত্র নার্সিং হোম-এ।

বিকেলের দিকে একবার যাবখন।

৭

ড্রেনের ওপর বাঁশের চ্যাটাইয়ের সাঁকোটা ঝিন্টুর খুব অদ্ভুত লাগে। একটু উঁচু রাস্তা থেকে এবড়ো খেবড়ো জমি নেমে গেছে। তারপরই মস্ত ড্রেন। তার ওপর সাঁকো। যখন নতুন ছিল একরকম। এখন জরাজীর্ণ। বাঁধন খুলে গেছে, বাচ্চা ছেলেরা বাঁখারি টেনে বের করে নিয়ে খেলা করেছে, সাঁকোটার ওপর এখন বিপজ্জনক গর্ত। সাইকেলে পার হওয়া খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু ঝিন্টুকে সেকথা কে বোঝাবে? সে ওই উঁচু রাস্তা থেকে সাইকেলে গড়িয়ে প্রচন্ড স্পিডে নেমে আসে। ধুলো উড়িয়ে, মচাক মচাক শব্দ তুলে সাঁকোটা পার হয় প্রায়ই।

পর্ণা রাগ করে, খুব বাহাদুরি, না! একদিন যখন উলটে পড়বে তখন তো প্রেস্টিজ পাংচারড।

সকলেরই যেমন থাকে তেমনি ঝিন্টুরও একজন আছে। পর্ণা। খুব ডাঁটিয়াল মেয়ে। কাউকে পাত্তা দিত না এতকাল। ঝিন্টুর সঙ্গেই প্রথম। তবে ডাঁটিয়াল হলেও পর্ণারা গরিব। বেশ গরিব। শহরের একটু বাইরে গরিবদের পাড়ায় সরে এসে বাড়ি করতে হয়েছে ওর বাবাকে। বাড়িটাও তেমন দেখনসই নয়। পাকা ঘর, টিনের চাল। পর্ণার বাবা যে কী করে তা বলা মুশকিল। সোজা কথায় বলা যায় ধান্দাবাজ। যেখানেই কোনও কাজ কারবার হচ্ছে সেখানেই গিয়ে ঢুঁ মারা ভদ্রলোকের স্বভাব। এই ধান্দাতেই সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তার মধ্যেই দেখা যায় জ্যোতিষচর্চা করছেন, হোমিয়োপ্যাথি করছেন, বাড়ির দালালি করছেন।

পর্ণা ঝিন্টুর চেয়ে নিচুতে পড়ে। মুখখানায় শ্রী আছে। চোখ দু'খানা ভারী মায়াবী। ঝিন্টুর বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল ওকে। আজও লাগে। তা বলে যে পর্ণার সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধতে হবে এমন নয়। ঝিন্টুর একটু আপত্তি আছে পর্ণারা বাবাকে নিয়ে। ফোর টুয়েন্টি শ্বশুর তার পছন্দ নয়। তার ওপর পর্ণারা কায়স্থ। অন্য জাতের বউ বাড়িতে নিয়ে তুললে তুলকালাম হবে। তাই ঝিন্টু ওসব ভাবে না। ভাববার দরকার নেই। তার বিয়ে এখনও ঢের দেরি।

পর্ণাদের বারান্দায় পা ঠেকিয়ে সাইকেল দাঁড় করিয়ে ঘন ঘন দু'বার ঘন্টি দিল ঝন্টু। পর্ণা আজ কলেজে যাবে না, কথা ছিল।

পরদা সরিয়েই পর্ণা বলল, এই! মাংস খাবে?

কিসের মাংস?

আহা! কিসের আবার, খাসির। আমি রাঁধছি।

ওরে বাবা। তুমি রাঁধছ। তার মানে খাসিটার মরেও সুখ নেই।

ইয়ারকি কোরো না। বোসো, আসছি।

ঝিন্টু ঘরে ঢুকে চারদিকে রোজকার মতো চেয়ে দেখল। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বলে একটা উদ্ভট প্রবাদ আছে। প্রবাদটার অবশ্য কোনও মানে হয় না। ঝিন্টুর তো মনে হয় প্রচুর শাক দিয়ে এক টুকরো মাছ অনায়াসেই ঢাকা যায়। ড্যাম ইজি। তবু পর্ণাদের এই ঘরে ঢুকলে তার প্রবাদটা মনে পড়বেই। কারণ এই ঘরে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার একটা প্রাণান্তকর প্রয়াস তার চোখে পড়ে। দেয়াল থেকে বেশি বালি মেশানো পলকা পলেস্তারা খসে যাচ্ছে, চৌকাঠের কাঠ ফাটছে, জানালা দরজার রং চটে যাচ্ছে, তবু বাঁধানো এমব্রয়ডারি ঝোলে দেয়ালে, লেস লাগানো ঢাকনায় ঢাকা হয় সস্তার টেবিল, নড়বড়ে চৌকির বিছানায় বেশ ঝকঝকে বেডকভার পাতা। এলেবেলে একটা কাচ বসানো আলমারিতে গুচ্ছের মাটির পুতুল। এসবই ঝিন্টু একটু বাঁকা চোখে এবং সকৌতুকে লক্ষ করে। গরিবদের ঘরে দেখা যায় পরদাটা বাহারি হবেই। পর্ণাদেরও তা-ই। ভারী উজ্জ্বল সব উদ্ভট ফুলছাপা পরদা ঝুলছে।

পর্ণা নয়, ঘরে ঢুকলেন ওর ফোর টুয়েন্টি বাবা। হাতে ঘটিভরা জল, পরনে ভেজা গামছা, চোখে ধান্দাবাজের চাউনি।

এই যে, বোসো বোসো। পর্ণা বোধহয় রান্নাঘরে।

দেখা হয়েছে।

হয়েছে? বাঃ।

ভদ্রলোক ঘটিটা ঘরের কোণে রাখলেন। কাঁধ থেকে নিংড়ানো ধুতিটা চট করে বারান্দার তারে মেলে দিয়ে একটা লুঙ্গি গলিয়ে ফের ঘরে ঢুকে গিঁট মারতে মারতে বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে সেদিন সারদা ক্লথ হাউসে দেখা। তুমি নাকি ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যাচ্ছো!

ইচ্ছা আছে।

বেশ বেশ। সাইকেল গেলে বোধহয় পাসপোর্ট লাগে না, না?

লাগে।

পৃথিবীটা খুব বড়। বিশাল। যাও, দেখে এসো। আমাদের লাইফে অ্যাডভেঞ্চার বলে তো কিছু নেই। ওনলি টু পাইস। আচ্ছা, বিটুর বউয়ের নাকি হার্টের কীসব ট্রাবল শুনছিলাম!

হ্যাঁ।

এদিকে তো আবার প্রেগন্যান্সি। বড় মুশকিল। ভেরি ডেলিকেট কেস। আমি একটা ওষুধ রেখেছি বেছে। নিয়ে যাবে নাকি? প্রসবের ব্যথা উঠলেই দিতে হবে।

উঠেছে।

উঠেছে? সর্বনাশ! কবে?

আজ সকালে। এতক্ষণে বোধহয় নার্সিং হোম-এ নিয়েও গেছে।

ইস্ পালসেটিলা থার্টিটা সকালেই পড়া উচিত ছিল। একেবারে পাকা আমের আঁটির মতো প্রসব হয়ে যেত। নার্সিং হোম-এ কি হোমিয়োপ্যাথি চলবে?

ঝিন্টু জানে লোকটা ধূর্ত। সবাই জানে। বউদির জন্য মা নিশ্চয়ই ওর কাছে ওষুধ চায়নি। কিন্তু ধান্দাবাজটা নিজেই একটা যোগসূত্র খুঁজছে। কাছে ঘেঁষতে চাইছে। এরকম শ্বশুর হলে ঝিন্টুকে আত্মহত্যা করতে হবে।

ঝিন্টু পা নাচিয়ে বলল, হোমিয়োপ্যাথি একটা বোগাস জিনিস।

লোকটা চটল না। দেয়ালের গায়ে লটকানো কাঠের ফ্রেমের মধ্যে তেড়াবেঁকা আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নির্বিকার মুখে বলল, হোমিয়োপ্যাথি হল পরমাণু তত্ত্ব। তোমরা অ্যাটমিক এজ-এর ছেলে হয়ে পরমাণুর শক্তি মানো না?

পরমাণুর সঙ্গে হোমিয়োপ্যাথির কোনও মিল নেই। পরমাণু একটা এনার্জি আর হোমিয়োপ্যাথি একটা ধাপ্পাবাজি।

পর্ণার বাবা যে চটবেন না তা ঝিন্টু জানে। এইসব ধান্দাবাজরা সহজে চটে না। চটলে এদের চলে না। তা ছাড়া চটবেই বা কেন, এর তো কোনও আদর্শবোধ নেই, ব্যক্তিত্ব নেই।

পর্ণার বাবা হাতের মাদুলিটা সেট করে নিয়ে বলল, অনেকেই বলে বটে, তারা জানে না। জিনিসটা জানলেই তবে বোঝা যায়—

এই ঝিন্টু, চলে যাওনি তো?— বলতে বলতে পর্ণা ঘরে ঢুকল। বাবাকে দেখেও বিশেষ গ্রাহ্য করল না। হাতে একটা ছোট প্লেট। তাতে ধোঁয়া-ওঠা অনেকটা মাংস।

ঝিন্টুর ভারী কষ্ট হল দেখে। অত মাংস সে এমনিতেই খাবে না। কিন্তু অতটা নিয়ে এসেছে তাও চক্ষুলজ্জাবশে। মাংসের কেজি এখন বাইশ বা চব্বিশ টাকার কম নয়। সম্ভবত পর্ণাদের বাড়িতে পাঁচশো গ্রামের বেশি আসেনি। ওদের ফ্যামিলি মেম্বার তো কম নয়। তবু সেই টান টান পরিমাণ থেকে যতটা পারে তুলে এনেছে শুধু গরিব বলে প্রমাণিত না হওয়ার জন্যই।

ঝিন্টু মাথা নেড়ে বলল, মাংস খেয়েই কাল রাত থেকে পেট আপসেট। দেখলেই গা শিরশির করে। নিয়ে যাও সামনে থেকে।

পর্ণা ফ্যাকাসে হয়ে বলে, খাবে না? এ মা!

কী বললাম তা হলে? খাওয়ার উপায় নেই। তবে গন্ধটা দারুণ ছেড়েছে। রিমার্কেবল। ঘ্রাণেই অর্ধভোজন হয়ে গেল।

ইস দেখো তো!

ফোর টুয়েন্টিটা আর দাঁড়াল না। চট করে ভিতরবাড়িতে সেঁধিয়ে গেল।

পর্ণা বলল, তা হলে রেখে আসি?

প্লিজ রেখে এসো।

কত কষ্ট করে করলাম! খেলে না।

আহা, যদি তেমন কপাল হয় তবে তোমার রান্নাই তো হোল লাইফ খেতে হবে।

কী আমার সুখের কথা রে! হোল লাইফ ওর জন্য রাঁধতে হবে! ইঃ বয়ে গেছে।

আর আমাকে যে সে রান্না কষ্ট করে খেতেও হবে সেটাও কি কম কথা?

পর্ণা মাংস রেখে আসতে গেল। একটু বাদে আঁচলে মুখের তেলঘাম মুছতে মুছতে ঘরে এসে বলল, বিটুদার বউয়ের নাকি পেন উঠেছে? বাবা বলছিল।

তোমার বাবাটা পর্ণা, মাইরি একটা ফোর টুয়েন্টি।

অ্যাই! ভ্যাট ওসব বলতে নেই।

আমাকে হোমিয়োপ্যাথি বোঝাচ্ছিল।

তা বোঝাক না। শুনে গেলেই তো হয়। কম-জানা হোমিয়োপ্যাথরা একটু বেশি বকবক করেই।

ঝিন্টু হেসে ফেলল। বলল, তা বটে।

তোমার মেজো বউদির চোখ দু'খানা কিন্তু ফ্যান্টা।

বউদিটা খুব আনহ্যাপি।

শুনেছি। বিটুদা নাকি একটু নেগলেক্ট করে।

এ শহরে কারও কোনও সিক্রেট থাকে না কেন বলো তো! সবাই সকলের ঘরের কথা জানে!

সোমা বউদির কথা তুমিই বলেছ আমাকে মশাই।

কবে?

একদিন সাইকেলের রডে আমাকে বসিয়ে আনছিলে তিলক ময়দানে ফাংশনের পর। রিকশা পাওয়া যায়নি সেদিন। মনে আছে?

ওঃ, মে বি।

তখন তোমার রডওলা সাইকেলটা ছিল। পুরোনোটা।

একটু মাথা নাড়ল ঝিন্টু। চোখের সামনে ঝক করে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য। মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গায় রাস্তার ধারে আগাছার জঙ্গলে সাইকেলটা আজও কি পড়ে আছে? জং ধরছে তাতে? মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে?

মনটা ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে গেল। ঝিন্টু উঠে বলল, চলি পর্ণা।

কোথায় যাচ্ছ এখনই?

যাই একটু শহরটা টহল দিই গে।

এত টহল দাও কেন বলো তো! সাইকেল যে তোমার শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেল। দু' চোখে দেখতে পারি না তোমার সাইকেল।

ওয়ার্ল্ড ট্যুর করে ফিরে এলে যখন খবরের কাগজে নাম বেরোবে তখন বুঝবে সাইকেলের মহিমা।

সাইকেল আমার সতীন।

হাসতে হাসতে ঝিন্টু উঠল।

বাইরে তো ঘরের অবরোধ নেই। অবারিত পৃথিবী। উত্তরে ওই দেখা যায় পৃথিবীর উত্তুঙ্গ ঢেউ। হিমালয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকঝক করে জ্বলছে রোদে। পাহাড় ঝিন্টুকে ডাকে। তাকে ডাক পাঠায় সমুদ্র। জঙ্গল। মাঠ। প্রান্তর। দেশ ও বিদেশ। সাইকেল তাকে ডেকে নিয়ে যাবে দূর দূরান্তে। একদিন খুব বেশি বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগেই সে নাগপুরের কাছে সেই জায়গাটায় যাবে। খুঁজবে। বহু খুঁজতে হবে তাকে। তবু খুঁজে দেখবে তার পুরনো সাইকেলখানা তখনও সেখানে পড়ে আছে কি না।

দুঃসাহস ছাড়া কেউ এভাবে বাঁশের চ্যাটাইয়েব সাঁকো দ্বিতীয়বার প্রবল গতিতে পার হয় না। তারপর এক দুরূহ অসম্ভব চড়াই ভেঙে খানাখন্দ পার হয়ে সে উঠে আসবে রাস্তায়। ঝিন্টুকে শিলিগুড়ির লোকেরা যে সাইকেল জাগলার বলে, তা এমনিতে নয়। রোজ এইভাবেই সাইকেলে এই পথটুকু নামে এবং ওঠে ঝিন্টু। লোকে অবাক মানে। কিন্তু তারা দেখেনি, ঝিন্টু কলেজের পাঁচ-সাতটা সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় উঠে যেতে পারে সাইকেলে। এক-দেড় ঘণ্টা অনায়াসে সাইকেল স্থির রেখে বসে থাকতে পারে সিটে। গোলপোস্টের ক্রসবারের ওপর সাইকেল চালিয়ে লোককে তাক লাগিয়েছে ঝিন্টু। চালিয়েছে তারের ওপর। সাইকেল তার অঙ্গীভূত স্বাভাবিক, সহজাত। পৃথিবীতে সাইকেল আবিষ্কার না হলে ঝিন্টু বোধহয় জন্মগ্রহণই করত না।

পিছনের চাকায় একটু হাওয়া কম আছে। কাঞ্চার দোকানে হাওয়া ভরে নিল সে।

পাম্প করতে করতেই সে রিকশায় আর-একজন ফোর টুয়েন্টিকে যেতে দেখল। ধর্ম-গেঁড়ে, ধান্দাবাজ, পুরুষত্বহীন। লোকটা তার বড়দা মন্টু। ছেলেবেলা থেকেই ঝিন্টু শুনে আসছে তার বড়দার মধ্যে নাকি বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকট, একদিন লোকটা নাকি সাধু হয়ে যাবে। আজও হয়নি, আজও হব-হব করছে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, ভাল চাকরি, ব্যাংক ব্যালান্স, শরীরে সুখের মেদ। তবু লোকটা নাকি হাফ-সাধু হাফ-গেরস্থ। খুবই হাসি পায় ঝিন্টুর। মাঝে মাঝে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, ঈশ্বর আছেন জলে, আছেন অগ্নিতে, আছেন প্রতি পরমাণুতে... ইত্যাদি। এ আর-এক হোমিয়োপ্যাথি। আছে তো বুঝলাম বাবা, কিন্তু মালটিকে বের করে দেখাও চাঁদু। গদগদ স্বরে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে 'আছেন' বললেই তো হবে না।

ধর্ম-বাতিকের জন্য লোকটার বোধহয় সেক্স-ফোর্সও কমে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। আর সেইজন্য বড় বউদি একসময়ে তিতিবিরক্ত হয়েই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ধরে পড়েছিল মেজদা বিটুকে। কেলেংকারিয়াস কান্ড আর কাকে বলে! শহরে ঢি ঢি। সেই ছিছিক্কারেও এই ধর্মের ষাঁড়ের চৈতন্য হল না। দিব্যি নির্বিকার ঠান্ডা মেরে নানা বাতিক করে যাচ্ছে।

আজকাল ধরেছে সেজো বউদি সোমাকে। আহা, সোমার বড় দুঃখ। সোমা বড় হতভাগিনী। সোমা বড় একা। তাই সোমা-উদ্ধার করতে বেদ বেদান্ত গীতার কচকচি ঝেড়ে যাচ্ছে। ঝিন্টুর পাপী মন। তার সন্দেহ হয়, লোকটার মধ্যে অবরুদ্ধ সেক্স একটা নির্গমনের পথ খুঁজছে। সোজা পথে বেবোতে পারছে না। অতএব বাঁকা পথ। সোজা কথায় বিকৃতি। বোধহয় সোমার সাহচর্যে লোকটার মানসিক ভাবে যৌনতৃপ্তি হয়। এরকম হতেই পারে।

রিকশাটা ঘ্যাচ করে থামল।

এই, এই ঝিন্টু!

ঝিন্টু সাইকেল ঝড়াকসে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, কী বড়দা?

কোথায় যাচ্ছিস?

সাইকেলে হাওয়া দিচ্ছিলাম।

বউমার খবর শুনেছিস তো?

শুনেছি।

অবস্থা খুব ভাল নয়।

কেমন অবস্থা?

অপারেশন মানে সিজারিয়ান করা দরকার। কিন্তু হার্টের কন্ডিশন ভীষণ খারাপ।

ঝিন্টু একটু ভাববার ভান করে বলল, তা আমাদের কী করার আছে?

করার নেই?

ঝিন্টু বাধো বাধো গলায় বলে, মানে বলছিলাম, আমরা তো লে ম্যান, মেডিক্যাল ম্যানরা যা করার তা তো করবেই। খামাখো আমাদের ব্যস্ত হওয়া দরকার কী?

বড়দা একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর বলল, বিটুকে খবর দিয়েছিলি?

দিয়েছি।

এল না কেন?

কিছু বলল না তো।

আমি নার্সিং হোম-এ যাচ্ছি। তুই বিটুকে ধরে নিয়ে আয়।

ঝিন্টু এ ব্যাপারটা একদম বোঝে না। কারও অসুখ হলে আত্মীয়রা অকারণ অস্থির হতে থাকে! কিন্তু বোঝে না যে, তারা ডাক্তার না হলে অসুখের ব্যাপারটা তাদের হাতে নেই। অনেক সময় ডাক্তার হলেও নেই। মেডিকেল সায়েন্সও সীমাবদ্ধ জিনিস। তবু নিজেরা উদ্বিগ্ন হবে এবং সবাইকে খুঁচিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। বউদি নার্সিং হোম-এ আছে, চিকিৎসাও হচ্ছে। তবু একে ডাক, ওকে ডাক। বিরক্তিকর।

সাইকেলে উঠে ঝিন্টু বলল, যাচ্ছি।

দোকানটার নাম লাভ স্টোর কে রেখেছিল যেন! তার বাবাই। হ্যাঁ, যৌবনে যখন কলকাতায় ল' পড়তেন তখন তাঁর এক গরিব বন্ধু লাভ স্টোর নামে এক দোকান খুলে ধাঁ করে বড়লোক হয়ে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি থেকেই নামটা রাখা। ইংরিজিতে সাইনবোর্ড, সুতরাং লোক ভাবে, লাভ মানে প্রেম। আসলে তো জানে না ওই লাভ-এর ধ্বনি-সাদৃশ্যের বাংলা শব্দটির মানে হল নাফা বা মুনাফা। তার মধ্যে কোনও রোমান্টিক ব্যঞ্জনা নেই। এল ও ভি ই নয়, নিতান্তই ল-এ আকার আর ভ।

৮

ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টি বাজছে। ঝিন্টু।

মেজদা, বউদি নার্সিং হোম-এ। এখনও যাওনি যে!

বিটু ঝিন্টুর দিকে তাকাল। বলল, গিয়ে কী হবে?

ঝিন্টু বিরক্ত মুখে বলে, বড়দা তোমাকে বলতে বলল যে, বউদির অবস্থা খারাপ। তোমার একবার যাওয়া দরকার।

খারাপ? কীরকম খারাপ?

খুব খারাপ, হার্ট ট্রাবল হচ্ছে।

বিটু হাতের খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে বলল, সেদিনই তো ই সি জি করানো হয়েছে। নরম্যাল। আজ আবার কী হল?

জানি না। আমি যাচ্ছি। তুমি চলে এসো।

দাঁড়া দাঁড়া। দোকান ফেলে এখনই যাওয়ার উপায় নেই। দুপুরে যখন বাড়িতে খেতে যাব তখন নার্সিং হোম হয়ে যাব। আর যদি তেমন বুঝিস তবে সাইকেলে করে এসে খবর দিয়ে যাস। বুঝলি?

ঝিন্টু সাইকেলটা রেখে নেমে এসে বলল, দোকান আমি দেখছি। তুমি গিয়ে ঘুরে এসো।

পারবি?

এ আবার না পারার কী? সুখময় আর প্রবীর তো আছেই।

প্রবীর নেই। তাকে মাল আনতে পাঠিয়েছি। সুখময়টা নভিস।

তবু আমি পারব। তুমি যাও।

বিটু বুঝল, কেস জটিল। ভ্যাবলার মতো বোধবুদ্ধিহীন চোখে কিছুক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, মরে-ফরে যায়নি তো অলরেডি?

আরে না। তা হলে আমি এত নরম্যাল থাকতাম নাকি?

পিন্টু কোথায়?

সকালে বোধহয় বউদিকে বাসে তুলে দিতে গিয়েছিল। তারপর এখনও ফেরেনি।

বিটু উঠে বলল, তা হলে বোস। আমি তোর সাইকেলটা নিয়ে যাচ্ছি।

সাবধানে চালিয়ে যেয়ো।

কেন সাবধান হওয়ার কী আছে?

এটা তো তুমি চালাওনি কখনও। গিয়ার সিস্টেম। টপ করে স্পিড উঠে যায়। তার ওপর যা রাস্তা!

তুই পারলে আমিও পারব।

একটু ঝাঁঝের গলায় কথাটা বলে বিটু বেরিয়ে এল। সেদিনকার ছোকরা সব বিটুকে সাইকেল চেনাচ্ছে। ঝিন্টুর বয়সে বিটুও কিছু কম সাইকেলবাজ ছিল না। শুকনা থেকে একবার সাইকেলে পাহাড়ে অবধি অনেকখানি উঠে গিয়েছিল। সত্য বটে আজকাল সে আর সাইকেল চালায় না। তার স্কুটার আছে। তবে সেটা কয়েকদিন হল খারাপ হয়ে গ্যারেজে পড়ে আছে।

বিটু সাইকেলে উঠেই বুঝল, ঝিন্টু কিছু বাজে কথা বলেনি। সাইকেলটায় আচমকাই স্পিড ওঠে। ঝিন্টু রাখেও যত্নে। নিয়মিত তেল-টেল দেয়, ঝাড়ে মোছে। এই-ই ওর স্বভাব। যা কিছু ওর আছে সব জিনিসের প্রতিই ওর প্রগাঢ় যত্ন। পারতপক্ষে নিজের জিনিসে ও কাউকে হাত দিতে দেয় না। বিটুকে যে সাইকেলটা দিল তার কারণ হল বিটু তার স্কুটার ওকে প্রায় চড়তে দেয়।

নিউ মার্কেট অবধি ভিড়েও বেশ চলে এল বিটু। মোড় ঘুরবার সময় ঘ্যাচাং করে পেছনের চাকাটা একটা রিকশার সঙ্গে বেঁধে গেল। বিটু পা ঠেকিয়ে পতন আটকাল বটে, কিন্তু লক্ষ করতে দেরি হল না যে পিছনের চাকার একটা স্পোক বেঁকে গেছে। দামি সাইকেল।

রিকশাওলাটা বেকুবের মতো চেয়ে ছিল। বিটু এবং তার ভাইদের বোধহয় খানিকটা চেনে।

সাইকেল থেকে নেমে রাগে অন্ধ বিটু চটাং করে চড় কষাল বেকুবটার গালে।

বাপ রে!— বলে লোকটা মুখটা চেপে ধরল দু'হাতে।

বিটু বাঁ হাতে চুলের মুঠিটা ধরে আরও দু'-চারটে রদ্দা কষাতেই লোক জমে যেতে লাগল চারদিকে।

শুয়োরের বাচ্চা! গাঁজা খেয়ে রিকশা চালাস?

মারটা একটু বেশি হয়ে গেল বুঝি। বিটু চুলটা ছাড়তেই লোকটা মাটিতে বসে পড়ল, তারপর হিক্কা তোলার মতো একটা অদ্ভুত জান্তব শব্দ তুলতে লাগল গলায়।

এতক্ষণ লক্ষ করেনি বিটু, রিকশায় একজন অল্প বয়সি মেয়ে বসে আছে। অদ্ভুত সুন্দর চেহারা। মেয়েটার মুখে কেমন ঘাবড়ানো সাদা ভাব। অপলক চোখে দৃশ্যটা দেখে ও বাক্যহারা হয়ে, চোখের পলক অবধি ফেলছে না।

লোকজন রিকশাওলাটাকে টেনে ওঠানোর চেষ্টা করল। একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, কী হয়েছে বিটুদা?

দ্যাখ না শুয়োরের বাচ্চা ঝিন্টুর দামি সাইকেলটা বরবাদ করে দিল।

ঝিন্টুর সাইকেল? ও বাবা। দেখি দেখি, এঃ, স্পোকটা একদম গেছে।

বিটু মেয়েটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেও লজ্জা পেল মনে মনে। একটু চিনতেও পারল। পরশু কি তার আগের দিন লাভ স্টোরে একটা টমেটো কেচাপ আর নুডলস কিনতে এসেছিল। শহরে বোধহয় নতুন। আগে দেখেনি।

একটা খদ্দের বোধহয় হাতছাড়া হয়ে গেল তার। যদি অবশ্য মেয়েটা তাকে চিনে থাকে।

বিটু ফের সাইকেলে ওঠার সময়েও লক্ষ করল, রিকশাওয়ালা মাটিতে বসেই আছে। উঠতে পারছে না। হিক্কার মতো শব্দটা হচ্ছে।

কিন্তু বিটু আর অপেক্ষা করল না। সাইকেলে উঠে পড়ল। বাঁকা স্পোক ফ্রেমে ঘষটাচ্ছে। অস্বস্তিকর একটা শব্দ। স্পিড নিচ্ছে না। হ্যান্ডেল কাঁপছে। বিটু নামল। সামনেই সুশীলদেব বাড়ি। বারান্দায় উঠে হাঁক মারল, বেলা, এই বেলা।

সুশীলের ছোট বোন ছুটে এসে বলে, বিটুদা?

এই সাইকেলটা তোদের বাড়ি রেখে যাচ্ছি। ঝিন্টু এসে পরে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা। তুলে রাখব ঘরে।

বিটু রাস্তায় এসে রিকশা নিল।

এ শহরের রিকশাওয়ালারা তার হাতে কিছু কম মার খায়নি। বেয়াদবি করলেই চড়টা চাপড়টা অনায়াসে কষিয়েছে। তখন কোনও অনুশোচনা হত না, মনে কষ্ট হত না। এখন কিন্তু একটু হল। অ্যাক্সিডেন্টে দোষ যতটা রিকশাওয়ালার, ততটা তারও। কিন্তু না মারলে রাগটা যেত না। ঝিন্টুর দামি সাইকেল ও কাউকে ধরতে দেয় না, তাকেও খুব সদিচ্ছার সঙ্গে দেয়নি। তার ওপর সেও যে এক সময়ে একজন দারুণ সাইকেলবাজ ছিল তা আর তেমন বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না ঝিন্টুর কাছে।

ঝিন্টু সাইকেল ভালই চালায়, বিটু জানে। ঝিন্টু আরও অনেক কিছুই ভাল জানে। ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস। কতটা ভাল তা অবশ্য পরীক্ষা করে দেখেনি বিটু। শুনেছে। এবার নাকি ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যাওয়ারও তোড়জোড় করছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে জমা হল বিটুর।

নার্সিং হোম-এর ফটকেই রোদে দাঁড়িয়ে আছে মন্টু। মুখে-চোখে সাংঘাতিক উদ্বেগের ছাপ।

বিটু রিকশা থেকে নামতে নামতে বলল, কী রে?

অবস্থা খুব খারাপ।

কতটা খারাপ?

স্পেশালিস্ট এসে দেখে গেছে। বলেছে, চান্স ফিফটি-ফিফটি। হার্ট দুর্বল বলে সিজারিয়ানও করা মুশকিল।

বিটু এসব শুনল উদাস মুখে।

মন্টু বলল, বাবাকে বোধহয় একটা খবর দেওয়া দরকার।

বাবাকে কেন?

একবার এসে দেখে যেত।

দেখতে কি দেবে?

কী জানি।

বিটু মাথা নেড়ে বলে, দেবে না। ওকে রেখেছে কোথায়?

ও টি-তে। অক্সিজেন দিচ্ছে। বিমলকে একটু খবর দিবি?

বিমল?

ওই যে কন্ট্রাক্টর। দারুণ হোমিয়োপ্যাথ শুনেছি।

এখন এই অবস্থায় হোমিয়োপ্যাথি?

হোমিয়োপ্যাথি সকলে সবার শেষেই করায়। যখন অ্যালোপ্যাথি ফেল করে।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু মিত্র কি অ্যালাউ করবে?

করবে। আফটার অল ক্ষতি তো নেই।

দেখি।

বিটু আবার একটা রিকশায় উঠল। রিকশাওলাটা ঝুঁকে পেডাল মারছে। পিছন থেকে দেখে একটু চমকে উঠল বিটু। এইটে সেই রিকশাওলাই নয় তো, যাকে একটু আগে সে মেরেছে? ভাল করে দেখার জন্য ঝুঁকে বসল বিটু। তারপর বুঝল, না। এ নয়। এ অনেক বাচ্চা। তবে চেহারায় তেমন বৈশিষ্ট্য থাকে না বলে এদের সকলকেই কেমন যেন একরকম লাগে।

৯

সুমনা কাপড় ছেড়ে সবে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, পিন্টু এল।

কোথায় যে থাকিস!

কী হল মা?

সোমাকে এই নার্সিং হোম-এ ভর্তি করে দিয়ে এলাম। হার্টের ব্যথা উঠেছে। কী যে হবে! আলায় বালায় কোথায় ঘুরিস বল তো! সেই বড় বউমাকে বাসে তুলে দিতে কোন সকালে বেরিয়েছিস, আর এই ফিরলি! যা গিয়ে একটু মুখটা দেখিয়ে আয় নার্সিং হোম-এ। তোকে দেখলে একটু তটস্থ হবে সবাই।

পিন্টু জানে মা ঠিকই বলছে। এখনও সে গিয়ে দাঁড়ালে শিলিগুড়ির লোক তটস্থ হয়। তবে এই প্রভাব কতদিন থাকবে তা বলা কঠিন। এখন যুগ দ্রুত পালটায়। পরের জেনারেশনের ঢেউ এসে আগের জেনারেশনের সব চিহ্ন মুছে দেয়। সে যদিও নিতান্তই যুবাপুরুষ তবু যুবকতররাও এসে গেছে। রাজনীতি আজকাল এত মস্ত কেরিয়ার। চাকরির চেয়ে বহুগুণে ভাল জিনিস। সুতরাং আজকাল রাজনীতিতে বেজায় ভিড়। দলে দলে এসে জোটে। তীব্র প্রতিযোগিতা। এই বাজারে প্রভাব প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখা শক্ত।

পিন্টু বলল, যাচ্ছি। ছোট বউদির অবস্থা কি খারাপ নাকি?

কী জানি বাবা, রোগা মেয়ে। বাচ্চা হওয়ার ধকল সইতে পারা কি চাট্টিখানি কথা! তার ওপর হার্টের ব্যামো। বিয়ের আগে ভাল করে খোঁজখবর করা উচিত ছিল। হুট করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল, এখন পস্তাও।

কথাটা শুনে পিন্টু খুশি হল না। একটু ঝাঁঝ দিয়ে বলল, নিজের মেয়ে বলে একটু ভেবে দেখো তো। তা হলেই দেখবে আর দুঃখ থাকবে না। পরের মেয়ের হরেক দোষ।

তোকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না। এখন যা, গিয়ে দেখ কিছু করতে পারিস কি না?

ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

পিন্টু বাইরে এসে ফের রিকশা থামাল একটা। একটা বিধ্বস্ত লাশকাটা ঘরের ধ্বংসস্তূপে কংক্রিটের টেবিলটা আজও দাঁড়িয়ে আছে— এই দৃশ্যটা সে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না আজ। ছোট বউদিটা কি বাঁচবে? চান্স খুব কম। কিন্তু মেয়েটা বড় ভাল ছিল। দেমাক-টেমাক নেই, দেওরদেরও ভাসুরের মতো করে সম্মান-টম্মান করত। আসলে বোধহয় খুব ভিতু। গরিবের ঘরের অনিশ্চয়তা থেকে, নিপীড়ন থেকে হঠাৎ এক সম্পন্ন পরিবারে অধিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রেণিগত দূরত্বটা ঘোচাতে অসুবিধে হচ্ছিল বোধহয়। খুব খাটে মেয়েটা। রোগা শরীর আর দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র নিয়েও প্রাণপাত পরিশ্রম করে। কুয়ো থেকে জল তোলা, কাপড় কাচা, গুল দেওয়া নিজে থেকেই করে যেত। অত কাজ করার দরকার নেই তার। বোধহয় নিজেকে ভুলে থাকার জন্য করে। পিন্টু ফেরে অনেক রাতে। কোনওদিনই রাত বারোটার আগে খায় না। বরাবর তার ভাত ঢাকা দেওয়া

থাকে। এই বউদিটি সেই নিয়ম ভেঙে প্রতি রাতে তাকে গরম ভাত খাওয়ায়। প্রথম প্রথম তাকে আপনি-আজ্ঞে করত, পিন্টু ধমক দিয়ে ছাড়িয়েছে। বউদি হলেও বয়সে পিন্টুর চেয়ে ঢের ছোট। তবু নববর্ষে বা বিজয়ায় বয়সে ছোট বউদিকে সে প্রকৃত ভক্তিভরে প্রণাম করে।

কে জানে কেন, এ বাড়িতে পিন্টুর একটু অনাদর আছে। বিটু যেমন মায়ের প্রাণ, তেমনি বাবার আদুরে। বড়দা মন্টুকেও সকলে খুব সুনজরে দেখে। শুধু পিন্টুই না ঘরকা, না ঘাটকা। একটু উড়নচণ্ডী, বারমুখো, পলিটিক্সবাজ ছেলে বলেই হয়তো। কিংবা কে জানে কী। সংসারের আদরের বড় তোয়াক্কাও করে না পিন্টু। সে চায় জনসাধারণের আদর, সমর্থন এবং ভোট। মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ ইত্যাদি তার কাছে ফালতু হয়ে গেছে কবে থেকে। সংসার হচ্ছে একটা বদ্ধ জলাশয়। তাতে জল পচে, গন্ধ হয়। বাইরের জগৎ হচ্ছে সমুদ্রের মতো বিশাল। পচন নেই, আবদ্ধতা নেই, অবিরল ঢেউ আর ঢেউ।

তবু সংসারে এই একটা মানুষ যে তাকে একটু আদর জানায় সেটাই বা ভোলে কী করে পিন্টু? সে তো অকৃতজ্ঞ নয়।

রিকশা থেকে একটু ঝুঁকে পড়ল পিন্টু, এই দাঁড়া! দাঁড়া! কী হয়েছে রে?

একটা রিকশাকে ঘিরে মেলা ভিড়। পিন্টু নেমে পড়ল।

একটা মুখচেনা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, পিন্টুদা! যাক বাবা, বাঁচা গেল।

কী হয়েছে?

একটা রিকশাওলাকে একটু আগেই বিটুদা কয়েকটা চড়চাপড় দিয়েছিল। ব্যাটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

চড়চাপড় দিল কেন?

সাইকেলে ধাক্কা দিয়েছিল।

পিন্টু দু'হাতে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে যায়। রিকশাওলাটা মাটিতে পড়ে আছে। কেউ জলটল দিয়েছিল মুখে। মাথা মুখ জামা সব ভেজা। ভিড়ের মধ্যে সুন্দরমতো একটা মেয়ে খুব অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

পিন্টু ভিড়কে একটা ধমক দিল, হাঁ করে মজা দেখছেন সবাই? যান যান পাতলা হোন। অ্যাই এদিকে এসে ধর তো, আমার রিকশায় তুলে দে।

পিন্টুর কাছে এসব জলভাত। পলিটিক্স করে করে তার মনের জড়তা ভেঙে গেছে। শহরে বা যেখানেই যা কিছু ঘটুক সে চট করে যথাকর্তব্য করতে এবং দায়িত্ব নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। রিকশায় লোকটাকে তুলে পিন্টু তাকে জড়িয়ে ধরে বসল।

মেয়েটা এগিয়ে এসে বলল, শুনুন, ওকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

কেন বলুন তো?

আমি ওর রিকশায় ছিলাম। আমি পুলিশে একটা ডায়েরি করতে চাই।

পিন্টু বিনা দ্বিধায় বলল, করবেন। আমি ওকে হসপিটালে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

আপনার নামটা?

পিন্টু, পিন্টু গাঙ্গুলি।

ভিড়ের ভিতর থেকে দু'-চারজন বলে উঠল, আরে আরে আমাদের পিন্টুদা, পিন্টুদাকে সবাই চেনে দিদি, ভাববেন না।

পিন্টু বলল, আপনি?

আমি শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশের লেকচারার। নতুন এসেছি।

পিন্টু একটু মুচকি হেসে বলল, মনে থাকবে। এই রিকশা, চল।

পুলিশে ডায়েরি করবে। এঃ। পিন্টু আপনমনেই একটু মুখ ভেঙাল। রিকশাওলাটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর উনি স্টাইল মেরে দাঁড়িয়ে মুখে প্যাথস ফোটাচ্ছেন, এই তো সিমপ্যাথি।

সিমপ্যাথি থাকলে আগে পুলিশের কথা না ভেবে চিকিৎসার কথা ভাবতিস।

লোকটা একটু গোঙাল। কেমন করুণ কাতর শব্দ।

পিন্টু লোকটাকে ভাল করে ধরে রইল। ঘাড়টা লটপট করছে। বিটুটা যে দিন দিন কী হচ্ছে!

পিন্টু শুনেছে, জাপানে রাস্তায় ঘাটে ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হলে কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়া করে না। দু'পক্ষই গায়ের ধুলো ঝেড়ে পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে যে যার পথে চলে যায়। ভারী সুসভ্য জাত। আর এখানে সকলেই সকলের প্রতি মুখিয়ে আছে। কিছু হলেই খ্যাঁক।

পিন্টু এও জানে, রিকশাওলাদের ওপর এরকম নির্যাতনের পিছনে কারণটা অর্থনৈতিক। ছোটলোককে ভদ্রলোকেরা হ্যাটা করবেই। যদি এরা সংগঠিত হত, শ্রেণিগতভাবে কিছু মর্যাদা পেত, তা হলে এরকমটা ঘটতে পারত না। রিকশাওলাদের একটা ইউনিয়ন আছে বটে। কিন্তু রিকশা যেমন কমজোরি যান, রিকশাওলাদের ইউনিয়নটাও সেইরকম।

হাসপাতালের দিকে যেতে যেতে পিন্টু সমাজব্যবস্থার হাজারও ফুটোর কথা ভাবতে থাকে। কবে যে পলিটিকসে প্রাণ আসবে, কবে যে জেগে উঠবে দেশটা, কবে যে সচেতন হবে মানুষ!

হাসপাতালে রুগি ভর্তি করা পিন্টুর কাছে কোনও সমস্যা নয়। আউটডোরের ডাক্তার দেখে-টেখে বলল, হেড ইনজুরি বলে মনে হচ্ছে।

কেসটা কি সিরিয়াস?

দেখা যাক। ভর্তি তো করে নিই। নামধাম জানেন?

না। কেয়ার অফ পিন্টু গাঙ্গুলি করে দিন। জ্ঞান হলে নাম বলবে।

ডাক্তারের ভ্রুকুটিকুটিল মুখখানা অনেকক্ষণ ধরে চোখের সামনে ভাসল পিন্টুর। কী যেন নাম বলল মেয়েটা? শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ইংলিশের লেকচারার। একটু স্পিরিটেড মেয়ে কি? খোঁজ নিতে হবে।

রিকশাওলাটার যদি ভাল-মন্দ কিছু হয় তা হলে রাস্তার লোক কেউই বিটুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে যাবে না। কিন্তু মেয়েটা গড়বড় করতে পারে। আহাম্মক বিটু বড্ড বেমক্কা মেরে বসেছে কমজোরি আধবুড়ো লোকটাকে।

১০

ব্রহ্মকুমার রায়টা খুব নির্বিকারভাবেই শুনলেন। তাঁর মক্কেল জিতেছে। কিন্তু যাকে এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জেতালেন ব্রহ্মকুমার সে একটি ঘড়েলস্য ঘড়েল। চোতা দলিল আর ব্রহ্মকুমারের গলাবাজির জোরে একটা পুরো সুপুরিবাগান গাপ করে নিল। ওই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর একগাল ভ্যাটকানো হাসি নিয়ে বসে আছে। তবে কে কীরকম তা আর ভাবেন না ব্রহ্মকুমার। মক্কেলমাত্রই লক্ষ্মী। মক্কেল মানেই সজ্জন।

ব্রহ্মকুমার কাগজপত্র ব্রিফ কেস-এ ভরলেন। আর-একটা শুনানি ছিল আজ। ডেট পিছিয়ে দিয়েছেন। নার্সিং হোম-এ একবার না গেলেই নয়। সংসারে বড্ড ঝামেলা। শুধু মামলা মোকদ্দমা নিয়ে থাকতে পারতেন তো বেশ হত।

বাইরে আসতেই মক্কেলটা ঢিপ করে প্রণাম করল।

জোর লড়ে দিলেন উকিলবাবু।

ব্রহ্মকুমার জোর করে একটু হাসলেন। লোকটার পিছনে আর-একজন চামচা গোছের লোক। তার হাতে মস্ত সন্দেশের বাক্স। মক্কেল বাক্সটা নিয়ে ব্রহ্মকুমারের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, একটু

মিষ্টিমুখ করবেন। সুপুরিও দিয়ে যাবখন কিছু।

দিয়ো।

বাঁধা রিকশাওলা খগেন এগিয়ে এল গাড়ি নিয়ে। ব্রহ্মকুমার উঠলেন।

তাঁর মেজো বউমাটি ভাল না মন্দ সঠিক জানেন না ব্রহ্মকুমার। কথা-টথা বিশেষ বলেননি কখনও। তবে মেয়েটির গলার আওয়াজ কদাচিৎ পাওয়া যায়। যারা চুপচাপ থাকে তাদের একটু সমীহ করেন ব্রহ্মকুমার। তবে তিনি লোকমুখে শুনেছেন, মেয়েটি ভালই। তাঁর স্ত্রী সুমনা কারওই বিশেষ প্রশংসা করেন না। কিন্তু তিনিও এই মেয়েটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলেন না। তিনি আরও শুনেছেন, তাঁর ছেলে বিটুর সঙ্গে বউমার সম্পর্ক ভাল নয়। কিন্তু ব্রহ্মকুমার এর বেশি আর কিছুই তেমন জানেন না। তাঁর ছেলে মেয়ে বউ এরা সব অস্পষ্ট কিছু অবয়ব, আধচেনা কিছু মানুষ মাত্র, সম্পর্কও নিতান্তই ক্ষীণ।

লাভ স্টোরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ব্রহ্মকুমার রিকশা থামিয়ে নামলেন। দোকানটা বেশ ঝকঝকে। প্রচুর জিনিস। কিন্তু কাউন্টারে ঝিন্টু কেন?

ঝিন্টুকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মেজদা নার্সিং হোম-এ গেছে। আমি দোকান দেখছি।

ও।— বলেই ব্রহ্মকুমারের কথা ফুরিয়ে গেল। ছেলের সঙ্গে আর কী কথা বলা যায় তা ভেবেই পেলেন না।

কিছু বলবে বাবা?

না, এই একটু খোঁজ নিয়ে গেলাম। বিক্রিবাটা কেমন?

খুব ভাল।

খদ্দের তো নেই দেখছি।

এ সময়টায় খদ্দের হয় না। সন্ধেবেলা দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না।

তাই নাকি? বাঃ।

আবার রিকশায় এসে বসলেন ব্রহ্মকুমার। কিন্তু খগেনটা কোথায়?

এই তো ছিল। বিড়িটিড়ি খেতে গেল নাকি? চারদিকে তাকিয়ে খগেনকে খুঁজতে লাগলেন ব্রহ্মকুমার। কোথায় যে যায়!

রিকশাটা আপনা থেকেই একটু পিছিয়ে গেল। তারপর থামল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই খগেন এসে সিটে চেপে বসল আবার। টাটকা বিড়ির গন্ধ পেলেন ব্রহ্মকুমার।

হুট করে কোথায় গিয়েছিলি?

কয়েকজন ডাকল, একটা হাঙ্গামা হয়েছে।

হাঙ্গামা? কিসের হাঙ্গামা?

একজন রিকশাওলাকে খুব মেরেছে। হাসপাতালে দিতে হয়েছে। বিকেলে রিকশা স্ট্রাইক হতে পারে।

কে মারল?

বিটুবাবু।

বিটু? বলিস কী?

তাই তো বলছে সবাই।

ব্রহ্মকুমার ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

কেন মেরেছে জানিস?

সাইকেলের সঙ্গে নাকি ধাক্কা লেগেছিল।

ব্রহ্মকুমার বললেন, সাবধানে চালাস। তোরাও বড্ড রেকলেস। এমন চালাস যে মনে হয় তোরা বুঝি ট্রাক ড্রাইভার।

মনে মনে ব্রহ্মকুমার ছেলের উদ্দেশে বললেন, গর্ভস্রাব! গর্ভস্রাব!

নার্সিং হোম-এ নামতেই তিন ছেলে এগিয়ে এল।

কী খবর রে?

মন্টু বলল, ভাল নয়।

ভাল! ভাল বলে কি কিছু আছে তাঁর জীবনে? নিজের মনে যে একটু নিজের কাজ নিয়ে থাকবেন, তার উপায় নেই। সংসার খাবলা মারে, নিয়তি এসে চিমটি কাটে, দুর্ভাগ্য আড়ালে হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকে। বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, কাকে বলে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছিস!

বিটুকে একটু বিবর্ণ দেখায়। মিনমিন করে বলে, ঝিন্টুর দামি সাইকেলটার বারোটা বাজিয়েছে। তাই দু'-একটা চড়চাপড় দিয়েছিলাম রেগে গিয়ে।

কী সব শুনছি। স্ট্রাইক-ফাইক হবে নাকি।

পিন্টু বলল, ও নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি জগার সঙ্গে কথা বলেছি।

জগা কে?

রিকশা ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

কী বলল?

রিকশাটার পারমিট ছিল না। রিকশাওলাটাও নতুন। কেউ তেমন চেনে না। ম্যানেজ করা গেছে।

ব্রহ্মকুমার সন্দেশের বাক্সটা নিয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বড় ছেলের দিকে বাক্সটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখ।

এর পরেই তাঁর কথা ফুরিয়ে গেল। কী বলতে হবে বা কীরকম মুখভাব করতে হবে তা বুঝতে পারছেন না। ভ্রু কুঁচকে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফোটানোর চেষ্টা করলেন। ফুটল কি না কে জানে।

হঠাৎ জলপাইগুড়ির মক্কেলের কথা মনে পড়ল। পিন্টুর দিকে চেয়ে ছেলেদের বললেন, জলপাইগুড়ির মামলাটায় তোকে অ্যাটেন্ড করতে বলেছিলাম না!

পিন্টু অধোবদন হল। কিন্তু ব্রহ্মকুমার আর কিছু বলতে পারলেন না।

ছেলেদের তিনি কখনও শাসন করেননি। কী করে বকাবকি করতে হয় সেই প্রসেসটাই জানেন না।

তিন ছেলে ও তাঁর মধ্যে এক অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। অস্বস্তিকর নীরবতা। যেন চারজন আগন্তুক পরস্পর পরিচয়বিহীন দাঁড়িয়ে আছে।

১১

ডাক্তারের কপালে চিনচিনে ঘাম। চোখে উদ্বেগ। দু'টি নিপুণ হাত রক্তাক্ত গহ্বর থেকে একটা মানুষের ছানাকে বের করে আনল। একজন দক্ষ নার্স হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল বাচ্চাটাকে।

হার্ট?

ও-কে।

পালস?

ও-কে।

যাক, বেঁচে গেল বউটা। এ যাত্রায় বেঁচে গেল। বিটুকে ডাক্তার সাবধান করে দেবেন, আর যেন বাচ্চা না হয়।

ডাক্তার খুব দ্রুত হাতে সেলাই করতে লাগলেন!

বড়লোকেরা সহজে মরে না। তাদের জন্যি নার্সিং হোম, দামি ওষুধ, ভাল ডাক্তার, ভাল খাদ্যদ্রব্য। গরিবেরা হাসপাতালে যায়। যেখানে অনন্ত ও গভীর এক নরক। ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তার কুকুর ও বেড়াল, পড়ে আছে মেঝেময় মল-মূত্র-বমি, বেড প্যান দেওয়ার লোককে কখনও ডেকে পাওয়া যায় না, ইউরিন্যাল বা বাথরুমে যাওয়ার পথ থই থই কবছে মলমূত্রে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে ইনফেকশন ঘটছে, সেখানে এমন সব খাবার দেওয়া হয় যা গরিবেও গলা দিয়ে নামাতে পারে না। দু'-একজন ডাক্তার আছে, যারা ওই নরকেও মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে। আছে কয়েকজন নিষ্ঠাবতী নার্স। কিন্তু তারা হাস্যকর রকমের সংখ্যালঘু। ওই অনন্ত ও গভীর নরকে বসে তারা ঈশ্বরকে ডাকে।

ডাক্তার বাসু হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি জানেন। আর জানেন বলেই এই শহরে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক চিকিৎসার জায়গা তিনি খুঁজে নিয়েছেন। এই নার্সিং হোম যাঁর তিনিও বাসুর সিনিয়র ডাক্তার। ডাক্তার মিত্রর সঙ্গে বাসুর এই নিয়ে কথা হয়। বাসুর বয়স কম, রক্ত তেজি, অন্যায় অবিচারের নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব তাঁর মধ্যে এখনও প্রবল। মফস্‌সলের আর এক হাসপাতালে তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে লট-কে লট দামি ওষুধ পাচার হয়ে যাওয়ার দুষ্টচক্র ভাঙতে এবং রোগীর পথ্য নিয়ে মামদোবাজি রুখতে তিনি কোমর বেঁধে লাগেন। ফলে তাঁরই অধস্তন কর্মচারীরা দল বেঁধে একদিন চড়াও হল। অকথ্য গালাগাল, চড়চাপড় আর প্রাণনাশের হুমকি খেয়ে তিনি হতভম্ব। শেষ অবধি কলকাতায় গিয়ে হেলথ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে সব বলে বিহিত চান। মন্ত্রী করুণ হেসে বলেছিলেন, সবই জানি, করার কিছু নেই। আপনি বরং ট্রান্সফার নিয়ে নিন। চুজ ইয়োর স্পট।

বাসু সেদিনই বুঝেছিলেন, এ দেশে সৎকর্মীরা বড় একা, বড় বেশি সংখ্যালঘু এবং নিরাপত্তাহীন। যে দুষ্টচক্র চিকিৎসা জগৎকে ঘিরে বেড়ে উঠছে তাকে ভাঙতে হলে অনেক বড় শক্তিমান কাউকে দরকার। তাঁর মতো লোককে দিয়ে হবে না।

শিলিগুড়িতে বাসুর দু'বছর হয়ে গেল। একটু চড়া মেজাজ, ঠোঁট কাটা এবং দাম্ভিক বলে তাঁর দুর্নাম আছে। আবার অতিশয় দক্ষ এবং নিষ্ঠাবান শল্যবিদ বলেও খ্যাতি আছে। এ সবই বাসু জানেন। কিন্তু নিজেকে বদলানোর কোনও প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না।

অপারেশনের পর ডাক্তার তাঁর বাক্স খুললেন, রক্তমাখা অ্যাপ্রন ছাড়লেন। ভ্রু কুঁচকে তাকালেন অপারেশন থিয়েটারের দরজার মাথায় রামকৃষ্ণ-সারদার যুগ্ম মস্ত ছবির দিকে। তিনি ঠাকুর-দেবতা-ধর্মগুরু মানেন না। ডাক্তার মিত্র মানেন। নার্সিং হোমের প্রায় সর্বত্রই ওই দু'টি ছবি সাজানো।

রুগিকে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হল। বাসু হাত-মুখ ধুয়ে ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে এলেন।

লবিতে বাপ আর তিন ছেলে গাড়লের মতো দাঁড়ানো। দু'বছর এ শহরে বাসুর বাস। তিনি এঁদেব চেনেন।

প্রথম কথা বললেন ব্রহ্মকুমার, ডাক্তার বোস, মেয়েটা বাঁচবে তো?

বাঁচবে।

বাচ্চাটা?

বেঁচে যাবে। চিন্তা নেই।

ব্রহ্মকুমার একটা মস্ত স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন।

ডাক্তার বাসুর মুডটা যথানিয়মেই খারাপ। রিসেপশনের লগবুকে সই করতে করতে বললেন, কিন্তু একটা কথা। বউটাকে আপনারা ভীষণ নেগলেক্ট করেছেন। ওর হার্টট্রাবলটা ক্রনিক। আপনাদের তো টাকার অভাব নেই। ইচ্ছে করলে কলকাতা থেকেও ট্রিটমেন্ট করিয়ে আনতে পারতেন। তা হলে এত টেনশন হত না, আমাদেরও জীবন-মৃত্যুর খেলা খেলতে হত না।

হার্টের অবস্থা যে এত খারাপ তা বুঝতে পারিনি। বিশ্বাস তো দেখছিল। কিছু তেমন বলেনি।

বিশ্বাস? ডাক্তার বিশ্বাসের চেয়ে হাতুড়েও ভাল। যাকগে, সেম প্রফেশনের লোকদের সম্পর্কে নিন্দে করতে নেই। তবে আমি আবার মনে মুখে আলাদা হতে পারি না।

সই করে বিটুর দিকে তাকালেন বাসু। ছেলেটার চেহারায় অতীতের একটা জৌলুস দেখা যায়। এখন কেমন যেন মনমরা। তবে একসময়ে ব্রাইট ছিল। বাসু তার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো ওর হাজব্যান্ড। আপনারই তো দায়িত্ব ছিল ওর প্রপার ট্রিটমেন্ট করানোর।

বিটু মাথা নোয়াল। জবাব দিল না।

এনিওয়ে, এবার থেকে নজর রাখবেন। আমি নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার সেনগুপ্তকে খবর দিয়ে রেখেছি। উনি এখানে থাকেন না। সপ্তাহে দু'দিন প্লেনে কলকাতা থেকে এসে ক্লাস নিয়ে যান। আজ তাঁর আসার ডেট। উনি বিকেলের দিকে এসে দেখে যাবেন।

হঠাৎ পিন্টু বলে উঠল, এ শহরে একজন ভাল হার্ট স্পেশালিস্ট নেই, এটা খুব লজ্জার কথা।

ডাক্তার বাসু পিন্টুর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ খুবই লজ্জার কথা। আপনি আরও লজ্জিত হয়ে পড়বেন যখন শুনবেন যে, মফস্‌সলের অনেক হাসপাতাল বা হেলথ সেন্টারে কোয়ালিফায়েড ডাক্তারই নেই। ওষুধ নেই, নার্স নেই, ঝাড়ুদার নেই, কম্পাউন্ডার নেই।

জানি। আমি মফস্‌সলে ঘুরি না নাকি?

হ্যাঁ ঘোরেন। কিন্তু পলিটিক্স করতে ঘোরেন।

তা হলে কী করব?

ডাক্তাররা যাতে মফস্‌সলে কাজ করতে পারে তেমন কন্ডিশন তৈরি করুন। খুব শক্ত তো নয়। তাদের ওষুধ দিন, এনভিরনমেন্ট দিন, নিরাপত্তা দিন। দেখবেন সব পালটে গেছে। ডাক্তাররা কাজ করতে চায় না এমন তো নয়।

জানি।

আপনারা পয়সার জোরে যে সুবিধেটা পাচ্ছেন তা তো আর সবাই পায় না। নার্সিং হোম বা বেশি ফি দিয়ে ডাক্তার দেখানো সব অ্যাফোর্ড করতে পারছেন, কিন্তু হাসপাতালটা গিয়ে দেখে আসুন একবার। হার্ট-স্পেশালিস্টের কথা বলছেন, একজন ভাল হার্ট-স্পেশালিস্টকে এ শহরে আনলেও আপনাদের মতো কিছু পয়সাওলা লোকই তাকে বিজনেস দিতে পারবেন, গরিবেরা পারবে না।

পিন্টু বাসুর দিকে কটমট করে একটু চেয়ে থেকে বলল, ডাক্তার বাসু, আমি আপনাকে জানি। আপনি গরিবের জন্য করেন, বিনা পয়সায় রুগি দেখেন, খুব ভাল। কিন্তু এ শহরে যেসব ডাক্তার আসে তাদের মধ্যে কয়টা মানুষ বলুন তো? বেশির ভাগই আসে টাকা লুটতে। এ শহরে দু'বছর প্র্যাকটিস করলেই লাল হয়ে যায়। ডাক্তার কর, ডাক্তার পাল এরা সব আসলে কসাই। কর দু'বার পাবলিকের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়েছে, তবু শিক্ষা হয়নি। প্লিজ, ডাক্তারদের হয়ে ওকালতি করবেন না।

ব্রহ্মকুমার এই বিতর্কটি পছন্দ করছিলেন না। হঠাৎ ছেলের কাঁধে একটা থাবড়া মেরে বললেন, হয়েছে হয়েছে, চুপ করো। যে যত মুখ্যু তার তত লম্বা লম্বা স্পিচ। উনি এই বড় একটা অপারেশন করে বউমাকে বাঁচালেন, আর তুমি ওকে লেকচার দিচ্ছ। যাও এখান থেকে।

পিন্টু একটু থতমত খেয়ে গেল। বাপকে সমীহ করে, তাই আর কথা বাড়াল না। গুটিগুটি "যাচ্ছি" বলে কেটে পড়ল।

ক্লান্ত চোখে ডাক্তার বাসু চেয়ে ছিলেন ব্রহ্মকুমারের দিকে।

ব্রহ্মকুমার অমায়িক হেসে বললেন, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। পলিটিক্স করে করে মাথাটা গেছে। অতি অপদার্থ। মানী লোককে মান দিতে শেখেনি।

বাসু একটু হাসলেন, পিন্টুবাবুকে আমি জানি।

দোষ আমাদেরই হয়েছে ডাক্তারবাবু। সময়মতো চিকিৎসা করানোর দরকার ছিল। আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এ আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে।

ডাক্তার বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, আমি একটু হাসপাতালে যাব।

তটস্থ ব্রহ্মকুমার বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা।

বাসুর প্র্যাকটিস খুবই ভাল। দিনে দুটো-তিনটে অপারেশন থাকে বিভিন্ন নার্সিং হোম-এ। নিজস্ব চেম্বারে রুগির অভাব নেই। এই শহরে বাসু হলেন সার্জেনদের রাজা। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটা প্রচার আছে যে, তিনি নির্লোভ, টাকাপয়সার খাঁই নেই। উপরন্তু বাসু ব্যাচেলর। সেই জন্য যারা টাকা দিতে পারে তারাও কাঁচুমাচু মুখ করে গরিব সাজে। সুতরাং বাসুর টাকা তেমন হয় না। ফলে তাঁর সমকক্ষ ডাক্তাররা গাড়ি-বাড়ি করে ফেললেও তাঁর কিছুই হয়নি। এমনকী একটা স্কুটার কিনতেও তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে। এক মাড়োয়ারি খদ্দের স্কুটারটা মাগনা দিতে চেয়েছিল। উপহার। বাসু নেননি। পরে অনেক ঝোলাঝুলি করে সেই মাড়োয়ারি স্কুটারটা নামমাত্র দামে গছিয়ে ছাড়ল।

বাসুর মতো অন্যমনস্ক লোকের যে স্কুটার জাতীয় বিপজ্জনক যান চালানো উচিত নয় তা তিনি নিজেও জানেন। কিন্তু এই শহরে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গা দিনের মধ্যে পঁচিশ বার দিনে ও রাতে টানা মারা তো সহজ কথা নয়। প্রথম প্রথম হাঁটতেন। পরে রিকশার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু মন্থর রিকশা তাঁর পেশার পক্ষে উপযুক্ত বাহন নয়। স্কুটার সেদিক দিয়ে খুবই উপযোগী। কিন্তু বাসু সারাক্ষণ নানা চিন্তায় এমন আচ্ছন্ন থাকেন যে, স্কুটার চালাতে তাঁর নিজেরও একটু ভয়-ভয় করে। কিন্তু উপায়ই বা কী?

যতক্ষণ স্কুটারটা চলে এবং তার উপর বাসু সওয়ার থাকেন ততক্ষণ তাঁর একটা টেনশন হয়। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে সমস্ত শরীর ও মন সজাগ ও পথ-অভিমুখী রেখে তিনি ছোটখাটো দূরত্ব পার হন। এবং যাত্রাশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। সেই কারণেই স্কুটারটার সঙ্গে আজও তাঁর সঠিক বনিবনা হয়নি।

হাসপাতালের চত্বরে স্কুটার থামতেই আবার নতুন টেনশন। এক দঙ্গল রিকশাওয়ালা এসে ঘিরে ফেলল।

ডাক্তারবাবু মাহিন্দরকে মেরে লাট করে দিয়েছে।

না বাঁচালে বহুত ঝঞ্ঝাট হয়ে যাবে বাবু।

আমরা বদলা নেব। বিটুবাবুর খুব তেল হয়েছে।

লাভ স্টোর জ্বালিয়ে দেব।

বাসু খুব ক্লান্ত বোধ করেন। কিছু একটা হয়েছে। রোজই হয়। স্কুটারটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে সমবেত ক্রুদ্ধ রিকশাওয়ালাদের দিকে চেয়ে ঠান্ডা গলাতে শুধু বললেন. আমি দেখছি। তোমরা শান্ত হয়ে বোসো।

ওয়ার্ডে যেতেই মিত্রা নার্স বলল, এমারজেন্সিতে একটা কেস আছে, স্যার। মনে হয় সার্জিক্যাল কেস।

রিকশাওয়ালা কি?

হ্যাঁ। ওই যে বাইরে সব জড়ো হয়েছে। এতক্ষণ চেঁচামেচি করছিল।

কীরকম দেখলেন?

হেমারেজ হচ্ছে। কোমা।

দেখছি। আর কোনও কেস?

একটা স্নেক বাইট আছে। আর-একটা বোন ফ্র্যাকচার। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে বার্ন কেসটার সেকেন্ডারি ইনফেকশন দেখা দিয়েছে।

কোয়াইট এক্সপেক্টেড।

বাসু এমারজেন্সিতে এসে দেখলেন লোকটাকে মেঝেয় কম্বলের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। জ্ঞান নেই। গোঙানোর একটা শব্দ হচ্ছে। কশে রক্ত।

বাসু হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ি দেখলেন। তারপর বুকে স্টেথো বসিয়ে এবং নানারকম নাড়াচাড়া করে অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর উঠে দাঁড়ালেন। ঝটকা মার সহ্য করতে পারেনি লোকটা। অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, অনির্ণীত নানারকম রোগ, দুশ্চিন্তা শরীরটাকে অনেক আগে থেকেই খেয়ে রেখেছে। এসব লোক বেঁচে থাকে মাত্র পঁচিশ পারসেন্ট। অস্তিত্বে শতকরা পঁচাত্তর ভাগই মরা। বাসু প্রতিদিন শয়ে শয়ে পঁচাত্তর ভাগ মরা মানুষকে দেখতে পান রিকশা টানছে, মোট বইছে, ভিক্ষে করছে, বেকার বসে আছে। শরীরে স্বাস্থ্য নেই, চোখে দীপ্তি নেই, মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল নয়।

এ লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা বাসু কেন করবেন? বাঁচাতে হলে অনেক মেহনত যাবে। প্রথম কথা, এর রক্ত দরকার। প্রচুর রক্ত। ব্রেন ড্যামেজ যদি হয়ে থাকে তবে চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হবে অবজারভেশনে। ইনটেনসিভ কেয়ার বলে এখানে কিছু নেই, কিংবা যা আছে তাকে ইনটেনসিভ কেয়ারের ক্যারিক্যাচার বলা যায়। সামান্য একজন রিকশাওয়ালার জন্য এতটা কেন করতে যাবেন বাসু? আরও কোটি কোটি ভারতবাসীর মতো এরও মৃত্যু ঘটে যাক অর্থহীন ভাবে। এ মরলে কার কতটা ক্ষতি? হঠাৎ বাসুর মনে পড়ল, রিকশাওয়ালারা বিটুর কথা বলছিল। বিটু একে মেরেছে। একটু আগে বিটুর বউকে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন বাসু। আর বিটুর হাতেই মার খেয়ে এ বেচারা ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে।

না, তা হলে লোকটাকে এভাবে মরতে দেওয়া যায় না। বড়লোকেরা টাকা আর প্রভাবের জোরে বাঁচে। গরিবেরা মরে এ দুইয়ের অভাবে। বাসু তাদের মরা ঠেকাতে পারল না। কিন্তু বিটুর হাতে মার-খাওয়া লোকটাকে না বাঁচালে একটা অপরাধ থেকে যাবে।

বাসু নার্সকে ডেকে একটা বেড-এর ব্যবস্থা করতে বললেন।

১২

নামের সঙ্গে মন্টুদের পদবি এমন জুড়ে গেছে যে আর ছাড়াতে পারে না গৌর কন্ট্রাক্টর। চেষ্টাও করে না। পৈতৃক পদবি বিশ্বাস। পারসিদের পদবি ছিল না, পেশা অনুযায়ী যেমন তেমন পদবি নিয়েছিল তারা। তাই কন্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, সোডাওয়াটার বটল ওপেনারওয়ালা ইত্যাকার নানা বিচিত্র পদবিতে তারা ভূষিত। গৌরেরও না তাই হয়ে যায়!

কন্ট্রাক্টরি করলেও গৌর একসময়ে মধ্যপ্রদেশের এম এল এ ছিল। রাজ্যসভায় যাওয়ার কথা হয়েছিল একবার। গৌর দু'বার অল ইন্ডিয়া মোটর র‍্যালি জিতেছিল। গৌর তারও আগে পাহাড়ে উঠত। বেশ দুরূহ কয়েকটা শৃঙ্গ সে জয় করেছে। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, প্লে বয়, বুদ্ধিমান ও প্রায় অবিশ্বাস্য সাহসের অধিকারী গৌর অবশেষে ঠিকাদারিতে থামবে এটা কেউ আশা করেনি। শিলিগুড়িতে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। অনেকগুলো ভাইবোন। অভাবের সংসার থেকে গৌর একদিন উধাও হল। তার সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি আছে। মধ্যপ্রদেশে সে সোনার খনি বা গুপ্তধন পেয়েছে, বোম্বাইতে একটা ঘোড়দৌড়ে কয়েক লাখ টাকা পিটেছে, উদ্বাস্তু রিলিফের টাকা মেরেছে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য গৌর এসব কিছুই করেনি। মধ্যপ্রদেশ জায়গাটা সে বেছে নিয়েছিল নিজের চারণভূমি হিসেবে। এই রাজ্যে লোক কম প্রচুর অনাবাদি জমি ও গহিন জঙ্গল আজও আছে। এ রাজ্যের অধিবাসীরা অধিকাংশই বহিরাগত। গৌর এ রাজ্যে এসে কয়েকজন প্রবাসী ও প্রভাবশালী বাঙালির আনুকূল্য পেয়ে যায়। প্রতিভাবানদের খুব সামান্য সাহায্য হলেই চলে। গৌরেরও চলল। মোট দশ-

বারো বছর মধ্যপ্রদেশে ছিল সে। তার মধ্যেই ওই এম এল এ হওয়া অবধি ছিল। এর থেকেই তার এলেম অনুমান করা যায়।

শিলিগুড়িতে সুমনাদের বাস ছিল গৌরদের বাড়ির কাছেই। এ দু'জনের বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল ছেলেবেলা থেকেই। সুমনাও জানতেন, গৌরও জানত। কিন্তু বাউন্ডুলে গৌর ফিরলই না সময়মতো। সুমনার বিয়ে হয়ে গেল ব্রহ্মকুমারের সঙ্গে।

গৌর ফিরল যখন সুমনার কোল ভরে দু'-দু'টি বাচ্চা এসে গেছে। ফিরেই গৌর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিলিগুড়ির ভাণ্ডার লুটতে। মাত্র দু'-তিন বছরে নিজস্ব বুদ্ধি ও ভুজবলে গৌর এমন উঁচু থাকের ঠিকাদার হয়ে বসল যে, মাড়োয়ারি বেনেরা পর্যন্ত অবাক। আজ গৌরের চার-পাঁচখানা গাড়ি, শ'খানেক লরি, চারখানা পেল্লায় বাড়ি, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এবং দিঘায় হোটেল, হিলকার্ট রোডে মস্ত মোটর পার্টসের দোকান, নিউ মার্কেটে টি ভি এবং ইলেকট্রনিকসের শোরুম, আরও নাকি করবে কী সব। বিয়ে করেনি। টাকা রোজগারই একমাত্র নেশা।

এমনিতে গৌর অতিশয় সজ্জন মানুষ।

সুমনার বিয়ের তিন বছর বাদে গৌর একদিন দেখা করতে এল। সুমনা লজ্জায় সামনে যাননি প্রথমে। ব্রহ্মকুমার বড্ড বেশি ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করায় গেলেন।

এ মানুষটা তাঁর স্বামী হতে পারত, এ কথা ভাবাও যে এখন পাপ!

গৌর বেশ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ সুমনার দিকে চেয়ে ছিল। তারপর বলল, বেশ হয়েছ তো! একদম অন্যরকম।

সুমনা লজ্জা পেয়ে পালাচ্ছিলেন।

গৌর বলল, লজ্জা পেয়ো না, এখন লজ্জা পাওয়ার মানে হয় না।

সুমনার অনেক কথা বলার ছিল। খুব বকতে ইচ্ছে করছিল লোকটাকে, একটা জীবন এই যে অন্যের বউ হয়ে কাটাতে হচ্ছে তাঁকে এটা তো একটা অপমানই।

পরে বিরলে গৌর একদিন সুমনার কাছে এসেছিল।

মিতু সুমনার ডাকনাম। সেই নাম ধরে ডেকে বলল, দোষ আমারই। কিন্তু আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরলে পারতে।

কী হত তাতে? তুমি মধ্যপ্রদেশের অত কাজ ছেড়ে আমাকে বিয়ে করতে আসতে?

আসতাম। বিয়ের জন্যই তৈরি হচ্ছিলাম। হঠাৎ বাড়ির চিঠি গেল তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

তখন কী করলে?

কী আর করব! জীবনের অর্থটাই হারিয়ে গেল। আর বিয়ে করারও কোনও মানে হয় না। কাউকে তো আর বউ বলে নেওয়া যাবে না।

সুমনা খুব কাঁদলেন এ কথায়।

গৌর চলে যাওয়ার আগে বলল, শিলিগুড়িতে ফিরে এলাম তোমার জন্যেই। তোমাকে পেলাম না ঠিকই, তবে কাছাকাছি থাকারও সুখ আছে।

থাকো। কোথাও চলে যেয়ো না পাগলাসাহেব।

যাব না।

সত্যিই বিয়ে করবে না?

না। বলেছি না, বিয়ে করা অর্থহীন হবে। ওরও তো একটা রচনা আছে।

গৌর যে বিয়ে করল না এটা সুমনার এক মস্ত জয়। বলতে গেলে তাঁর একমাত্র জয়। গৌর যে খুব আসে বা তাঁদের মধ্যে যে গোপনে অনেক কথা হয়, তা কিন্তু মোটেই নয়। গৌর ব্যস্ত মানুষ, হিল্লি-দিল্লি করতে হয়। তবে আড়াল থেকে এই পরিবারটিকে গৌর ঠিকানা দিয়েছে অনেক। ব্রহ্মকুমারের যখন প্রসার ছিল না তখন গৌরই তাঁকে প্রতিষ্ঠা পেতে সবচেয়ে সাহায্য করেছে।

গৌরই করে দিয়েছে ব্রহ্মকুমারের বাড়িখানা। গৌর আরও কত কী করেছে তার হিসেব নেই। সুমনা যে-কোনও প্রয়োজনেই আজও নিঃসংকোচে গৌরের কাছে হাত পাতেন। একটি অধিকারবোধ কাজ করে। মাঝে মাঝে তিনি জিব কেটে ভাবেন, আমার কি দুটো স্বামী?

গৌর সেরকম ভাবে না। তার মনটা অনরকম। প্রেমার্ত সে কোনওদিনই নয়। আসলে সুমনার প্রতি তার এক নিরঙ্কুশ অধিকারবোধ ছিল। শরৎচন্দ্রের নভেলে এরকম অনেক দেখা যায়। সেই বাল্য-প্রণয়ের ব্যাপারটা সুগন্ধের শূন্য শিশিতে কেমন করে যেন একটু লেগে থাকে।

বিটুর বাচ্চা হয়েছে, এ খবরটা গৌর পেল তার মোটর পার্টসের দোকানে বসে। নার্সিং হোম থেকে ফোন করেছিল পিন্টু।

গোরাকা, তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি।

গৌর খুবই ব্যস্ত ছিল। সামনেই এক মিলিটারি অফিসার বসা। বিজনেস টক হচ্ছে। একটু সতর্ক গলায় বলল, খারাপ কিছু নয় তো!

আরে না। মেজোবউদির একটা বাচ্চা হয়েছে।

ও। সোমা কেমন আছে?

ভাল।

ওর না সেই হার্টের কী একটা গন্ডগোল ছিল?

হ্যাঁ। ডাক্তার বাসু সেফলি ব্যাপারটা ট্যাকেল করেছেন।

কোনও কমপ্লিকেশন নেই তো?

না।

এই পিন্টুকে পুষ্যি নিতে চেয়েছিল গৌর। সুমনা দেননি। তিনি মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, পুষ্যি আবার ঘটা করে নেবে কেন? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে তা হলে। তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তা তো কিছু লোক জানে। তার চেয়ে নিজের ছেলে বলে ধরে নাও, ওর যাতে ভাল হয় দেখো, সেইটেই ভাল।

গৌর যুক্তিটা বুঝেছিল। পুষ্যি নেওয়াটা কাজের কথা নয়। পিন্টুকে সেই থেকে গৌর আলাদা রকমের প্রশ্রয় দেয়। শখের জিনিস কিনে দেওয়া, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, সাইকেল বা স্কুটারে বা গাড়িতে চাপানো— এসব পিন্টুর ছেলেবেলায় গৌর অনেক করেছে। রোজ একবার ছেলেটাকে না দেখে থাকতে পারত না। পিন্টু একটু বড় হওয়ার পর তার স্কুল কলেজের মাইনে বইখাতা জামাকাপড় এবং হাতখরচ সবই ছিল গৌরের দায়িত্ব। রাজনীতিতে পিন্টুর তালিমও গৌরের কাছে। গৌরের সঙ্গে পিন্টুর সম্পর্ক পরস্পরের অজান্তেই বাপ-ব্যাটায় দাঁড়িয়ে গেছে। আজও গৌরকেই যা একটু পোঁছে পিন্টু।

গৌর পিন্টুর মুখখানা একটু ভাবল। বুকটি ভরে গেল মায়ায়। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, ভাল খবব। বিকেলের দিকে একবার নার্সিং হোম-এ যেতে পারি।

আর শোনো গোরাকা। একটা বিপদ হয়েছে।

কী বিপদ?

বিটু আজ একটা রিকশাওয়ালাকে খুব মেরেছে' লোকটা এখন হাসপাতালে। বাঁচতে পারে, নাও পারে। মনে হচ্ছে লোকটা মরে গেলে একটা জোর হাঙ্গামা হবে।

গৌর একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তোরা কি হাত-ফাত না চালিয়ে থাকতে পারিস না! ভদ্রতা সৌজন্য মায়া-দয়ার পাট যে তুলে দিলি!

আহা, আমাকে বকছ কেন? আমি আর এখন ওসব করি?

নিজে হাতে না করলেও তোর দল করে। যাকগে, কী হয়েছে পরিষ্কার করে বল। পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে?

এ কেস পুলিশের খাতায় উঠবেই। তবে এখনও এনকোয়ারি হয়নি। হলে মুশকিল।
তা আমাকে কী করতে হবে?
আমি তার কী বলব? যা ভাল বুঝবে করবে।
আমি এসব ভাল বুঝি না। তুই বরং একবার থানায় যা। দেখ ডায়েরি হয়েছে কি না। এক্ষুনি যা।
হলে কী করব?
আমাকে ফোন করিস। রিকশা ইউনিয়ন থেকে এসেছিল?
না। তবে রিকশাওয়ালা মেলা জড়ো হয়েছে হাসপাতালে, শুনলাম।
হবেই। এখন যা বলছি করগে যা।
আর একটা কথা। শচী চক্রবর্তী নামে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির এক লেকচারার আছে। চেনো?
না। চিনবার মতো নাকি?
সে একটু জল ঘোলা করতে পারে। তেজি মেয়ে।
গৌর একটু শঙ্কিত গলায় বলে, কেন? তুই কি তার সঙ্গে তর্কাতর্কি কিছু করেছিস নাকি?
না। মেয়েদের সঙ্গে আমি কখনও ঝগড়া-টগড়া করি না। সেকেন্ড-গ্রেড সিটিজেনদের সঙ্গে কেউ তর্ক করে জাত খোওয়ায়?
গৌর একটু হাসল। তারপর বলল, মেয়েটা দেখতে কেমন?
খুব চোখা।
বয়স?
বেশি নয়। ছুকরি।
সে কি ওই রিকশায় ছিল?
হ্যাঁ। সেটাই তো শুনলাম।
বিটু হঠাৎ রুস্তম সাজতে গেল কেন? তোদের ভাইদের রক্ত আর ধাত এত গরম কেন বল তো? গরিব একটা রিকশাওয়ালার ওপর এইসব করার কোনও মানে হয়?
সেইটেই তো কথা গোরাকা। মানুষ যে কেন এত রি-অ্যাক্ট করে বুঝি না। বিটুকে তো জানো। টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড। ও যে কখন কী করবে তার ঠিক নেই। এমনিতে তো ঠান্ডা, শান্ত, ভদ্র।
গৌর গম্ভীর গলায় বলল, জানি। বিটুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস। আর লাভ স্টোর একবেলার জন্য বন্ধ করে দিতে বল। আজ যেন আর না খোলে।
কেন বলো তো!
পাবলিকের হাতের নাগালে থাকার দরকার কী?
এ কথায় পিন্টু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হেসে বলল, আরে গোরাকা, তুমি মারধরের ভয় পাচ্ছ নাকি? ওসব হবে না। হলেও থোড়াই পরোয়া করি। পাবলিক এখনও আমাদের সমঝে চলে। আর বিটু মারদাঙ্গা কিছু কম করেনি।
করেছে বলেই ভয়। অনেকের রাগ পোষা আছে।

১৩

শচী শিলিগুড়িতে নতুন। শহরটা সে ভাল চেনেও না। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস শহর থেকে অনেক দূরে, সেই রামমোহন রায়পুরে। সেখানেই তার কোয়ার্টার, মাঝেমধ্যে বাস ধরে চলে আসে কেনাকাটা করতে। শহর মাত্রই ভাল লাগে শচীর। লোকজন, দোকান পসার, জমজমে ভাব। রামমোহনপুরে বড্ড একটেরে একঘেয়ে লাগে। পড়াশুনো ছাড়া দ্বিতীয় কোনও

অবসর বিনোদন নেই। মাত্রই মাস চারেক হল সে এসেছে, এখনও তেমন চেনাজানাও হয়নি সকলের সঙ্গে।

একা থাকতে তার কোনও অসুবিধে হয় কি না তা জিজ্ঞেস করেছিলেন এক বয়স্ক কলিগ।

শচী বলেছিল, হয়। একঘেয়ে লাগে।

উনি বললেন, না, সে কথা বলছি না, একঘেয়ে তো লাগবেই। আমি বলছিলাম, আপনি যুবতী মেয়ে, একা, বিপদের আশঙ্কা করে না?

শচী একটু হেসেছিল। এরা তো আর অতীতটা জানে না। শচী চক্রবর্তী ভয় পাবে কী শচীই তো কত মানুষের ভয়ের কারণ ছিল একদা। যখন সে সক্রিয় রাজনীতি করত এবং ছিল মোটামুটি সাহসী, মুখর ও প্রবল অনুভূতিশীল। থানা ঘেরাও করা বা পুলিশের উদ্যত বন্দুকের সামনে এগিয়ে যাওয়া কোনও ব্যাপার ছিল না তার কাছে। দু'বার সে গ্রেফতার হয়েছিল। তার মধ্যে একবার তাকে দেড়মাসের মতো জেল খাটতে হয়েছে।

এসব খুব বেশিদিনের কথাও নয়।

তবে বছর খানেক হল, শচী অনেকটা জুড়িয়ে গেছে। ঘোর বামপন্থী শচী ভূত-ভগবান-ভাগ্য মানে না। প্রচণ্ড আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী। লতানে স্বভাব তার একেবারেই নেই। বাঙালি ছেলেদের সম্পর্কে সে এতই উন্নাসিক যে, আজ অবধি কোনও বাঙালি ছেলের প্রেমে পড়ার কথা সে ভাবতেও পারেনি। বিয়ে ব্যাপারটাকে এখনও অবধি সে প্রচণ্ড ঘেন্না পায়।

শচী রাজনীতিতে যেমন উগ্রপন্থী ছিল, ব্যক্তিগত রুচি এবং মেজাজেও তেমনি উগ্রপন্থী। তার সঙ্গে যে-ই একটু মিশেছে সে-ই বুঝেছে যে এটি একটি ঠান্ডা বোমা। সাবধানে না চললে যে-কোনও সময়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

আজ রিকশা-সাইকেল সংঘর্ষের পর যে কুৎসিত ব্যাপারটা ঘটে গেল তা শচীর জীবনে একেবারে নতুন ঘটনা। এরকম পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। সে হকচকিয়ে গিয়েছিল বলে বিটু আজ বেঁচে গেছে। কিন্তু দরিদ্র রোগা বুড়ো রিকশাওয়ালার ওপর ওই মারের দৃশ্যটা শচীর মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

মারকুট্টা ছেলেটার নাম জেনে নিয়েছে শচী। যে ছেলেটা রিকশাওয়ালাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে তার নামও। শচী ছাড়বে না।

আর-একটা রিকশা ধরে সে সোজা থানায় চলে এল।

সর্বত্রই শচী নিজেকে জাহির করতে পারে। তার চোখ, ধারালো মুখ, মুখে কাঠিন্যের রেখা, দৃপ্ত ভঙ্গি এসবের মধ্যেই তার অন্তর্নিহিত সেই উগ্রতা প্রকাশ পায় যাকে কেউ সহজে উপেক্ষা করতে পারে না। ভিড়ের মধ্যেও তাকে আলাদা করে চিনে নেয় লোকে। মাতাল, বদমাশ, পাড়ার মস্তান বা রকবাজেরা সহজে তাকে ঘাঁটায় না। তাকে কখনও বিরক্ত করেনি তার সহপাঠীরা।

থানায় সে ঢোকামাত্র খাতির পেল। একজন সুদর্শন সেকেন্ড অফিসার তাকে বসাল, পরিচয় জানল এবং কেসটা লিখে নিল।

শচী জিজ্ঞেস করে, আপনারা বিটুকে কখন অ্যারেস্ট করবেন?

এনকোয়্যারির পর।

এনকোয়্যারি কখন হবে?

সেকেন্ড অফিসার ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। জিপটা একটু বেরিয়েছে। ওটা ফিরলেই।

আমি শুনেছি বিটুবাবুর বাবা বেশ প্রভাবশালী উকিল এবং পরিবারটাও বোধহয় টাকাপয়সাওলা। কিন্তু আমার অনুরোধ এগুলো যেন আপনাদের ইনফ্লুয়েন্স না করে।

সেকেন্ড অফিসার একটু হাসল। বলল, আমরা সরকারি চাকরি করি। আমাদের ওপর হাজার

রকমের প্রেশার। এসব তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তবু বলছি, আমরা যথাসাধ্য করব। বিটু আর পিন্টুকে আমি চিনি। পিন্টু তো প্রায়ই থানায় আসে।

শচী একটু চিন্তিতভাবে বলল, এখানে একটা ডেইলি পেপার আছে না?

আছে।

খবরটা আমি তাদেরও জানাতে চাই।

ঠিক আছে। তবে আপনি না জানালেও জেনে যাবে। থানা থেকেই ওরা খবর নেয় রোজ।

শচী উঠল। রিকশা অপেক্ষা করছিল তার জন্য। রিকশাওয়ালা একটি ছোকরা। সে জানে যে, শচী তাদেরই একজন সহকর্মীর জন্য লড়তে নামছে। শচী সিটে উঠে বসতেই ছোকরাটি বলল, কিছুই হবে না দিদি। বিটুবাবুদের পয়সা আছে। ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে।

শচী বলল, জানি। তবু ছাড়ব না। তোমরাও ছেড়ো না।

আমাদের মধ্যে এককাট্টা ভাবটা নেই তো।

তোমাদের তো ইউনিয়ন আছে।

আছে। কিন্তু বিটুবাবুদের কিছু করতে পারবে না। ইউনিয়নের লিডাররা পিন্টুবাবুর বন্ধু।

শচী কিছু বলল না। তবে ভাবল। এক জায়গায় একটা পুরনো পরিবার বহুদিন বসবাস করার ফলে শেকড়বাকড় গেড়ে ফেলেছে। প্রভাব প্রতিপত্তি টাকার জোরও কম নয়। হয়তো কিছুই করা যাবে না এদের। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

হাসপাতালের সামনে বেশ একটু ভিড়। জনা ত্রিশেক রিকশাওয়ালা জড়ো হয়েছে। চেঁচামেচি নেই, তবে চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

শচী নামতেই একজন এগিয়ে এল। একটু মস্তানের মতো চেহারা। গায়ে লাল স্যান্ডো গেঞ্জি। গলায় কার-এ বাঁধা একটা চৌকো তাবিজ। পরনে ময়লা লুঙ্গি। বয়স বছর ত্রিশেক।

দিদি, আপনি কিন্তু সাক্ষী দেবেন।

শচী অবাক হয়ে বলল, কেন দেব না?

অনেকেই শেষ অবধি ভয় খেয়ে যায় তো।

আমি কাউকে ভয় পাই না। লোকটা কেমন আছে?

ডাক্তার বাসু দেখছেন। ভাল ডাক্তার। তবে কেউ কিছু বলছে না।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করা যায় না?

লোকটা হাত তুলে দেখাল, ওই দিকে আউটডোরের ঘর আছে। ওখানেই চলে আসবেন। আপনি গিয়ে বসুন।

হাসপাতালের অবস্থা এই প্রথম দেখল শচী। যথেষ্টই খারাপ। তবে তৃতীয় বিশ্বে তো এরকমই হওয়ার কথা।

ডাক্তারের ঘরখানা একেবারেই বে-আব্রু এবং শ্রীহীন। এখানে কোনও চিকিৎসা বা রোগী পরীক্ষা হয় বলে মনেই হয় না। শচী একটা শক্ত কেঠো চেয়ারে বসে আঁচল দিয়ে মুখের সামান্য ঘাম মুছল। একটা লড়াইয়ের গন্ধ আছে বলে সে যথেষ্ট চনমনে বোধ করছে। টনটন করছে বিষদাঁত। সে ছোবল তুলেছে। ছোবলটা লক্ষ্যবস্তুতে সে বিঁধিয়ে দেবেই।

শান্তভাবেই অপেক্ষা করতে লাগল শচী। হাতব্যাগ থেকে একখানা বই বের করে পড়তে লাগল। 'টেরোরিস্টস অর মারসিন্যারিজ' নামে একখানা পেপারব্যাক! সদ্যই কিনেছে। টেররিজম-এর মধ্যে যে পেশাদার ভাড়াটে মনোভাব ঢুকেছে তা-ই প্রতিপাদ্য বিষয়। অশান্ত পৃথিবীর সর্বত্রই চলছে সন্ত্রাস, হত্যা, গন্ডগোল এবং তার পিছনে মদত দিচ্ছে অন্ধ ব্যবসায়ী, ড্রাগ পাচারকারী, অসাধু ক্ষমতালোভী। শচী সবই মোটামুটি জানে।

পড়তে পড়তে ডুবে গিয়েছিল। ডাক্তার বাসু চেয়ারের শব্দ তুলে বসতে শচীর চটকা ভাঙল।

বাসুকে এক নজরে জরিপ করে নিল শচী। বিষণ্ণ চেহারা। তবে সুপুরুষ।

আপনিই ডাক্তার বসু?

বাসু প্রথমে কোনও জবাব দিল না। নীরবে একটু চেয়ে রইল শচীর দিকে। তারপর বলল, বসু আমার পদবি নয়। আমার নাম বাসুদেব ব্যানার্জি। লোকে ডাক্তার বাসু যে কেন বলে তা আমিও ভেবে পাই না।

শচী একটু লজ্জা পেয়ে বলে, মাফ করবেন।

আরে না, লোকে যা বলে তা বলতে দোষ কী? তবে আপনি ডাক্তার বসু বলায় ভুলটা ভেঙে দিলাম। এবার বলুন, কী জানতে চান?

আমি ওই লোকটার খবর নিতে এসেছি। রিকশাওয়ালা।

মার্জিনাল কেস। তবে—

তবে কী?

ইনজুরি তো ফ্যাটাল নয়। সমস্যা হল ভাইটালিটি নিয়ে। শরীরে জীবনশক্তি বলে কিছু নেই।

এটাকে নিশ্চয়ই পুলিশ-কেস হিসেবে নিয়েছেন?

দু'হাতের তেলো ডলে একটা অসহায় ভঙ্গি করে বাসু বলল, আমি তার কী জানি? পুলিশকে খবর দেওয়ার দায়িত্ব আমার নয়, হাসপাতালের।

আমি ওর রিকশায় ছিলাম। আমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে।

বাসু আবার তার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু স্বরে বলল, আপনি কি অ্যাকশন চান?

চাই। বিটু না কী যেন লোকটার নাম, তাকে আমি জেলে পাঠাতে চাই। মেডিক্যাল রিপোর্টটা আপনি কীরকম দেবেন তার ওপর সব নির্ভর করবে।

বাসু এবার হাসল। মৃদু স্বরে বলল, রিপোর্ট হবে। তার আগে আমার যা কাজ তা আমাকে করতে হবে। বিটুর জেল হওয়ার চেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট লোকটাকে বাঁচানো। আপনার ব্লাড গ্রুপ কী তা জানা আছে?

ও গ্রুপ।

খুব ভাল। আপনার রিকশাওয়ালার কিছু রক্ত দরকার। আপাতত আপনি ওর জন্য কিছুটা রক্ত দিতে পারেন।

শচী একটু বিবর্ণ হল। সে যথেষ্ট সাহসী ও ডাকাবুকো বটে, কিন্তু ছুঁচকে সে ভয় পায়। রক্তের রং দেখলে তার গা শিরশির করে। একটু থেমে ভেবে নিল শচী। তারপর বলল, ঠিক আছে।

বাসু ক্লান্তিতে একটু পিছন দিকে হেলে বসল। চোখ বুজে নিস্পন্দ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর স্তিমিত গলায় বলল, আপনি বোধহয় একটু নার্ভাস টাইপ।

না। আমি রক্ত দিতে পারব।

হিরোইকসের দরকার নেই। ও গ্রুপ খুব কমন গ্রুপ। আপনি না দিলেও ওরা বন্ধুরা দেবে। হয়ে যাবে।

শচী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, প্রয়োজন হলে আমিও দিতে পারি।

বাসু তার দিকে চেয়ে বিমর্ষ মিয়োনো গলায় বলল, হাসপাতালের অবস্থা কীরকম তা তো নিশ্চয়ই জানেন?

দেখছি, খুব খারাপ।

হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ, চিকিৎসা খারাপ, ওষুধ খারাপ, পরিবেশ খারাপ, আর তার চেয়েও খারাপ হল এখানকার খাবার। খুব গরিবেরও খেতে কষ্ট হয়।

তাও জানি।

আপনার রিকশাওয়ালাটির যখন জ্ঞান ফিরবে এবং নরম্যাল ডায়েট নিতে পারবে তখন তার

কিছু পুষ্টিকর খাবার দরকার হবে। পারবেন কিছু কিনে দিতে?

নিশ্চয়ই পারব। কী লাগবে বলুন?

এখন নয়। এখন ওকে ড্রিপ দেওয়া হয়েছে। যদি লোকটা বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে তা হলে দু'-তিন দিন পর আপনি আমার কাছ থেকে একটা লিস্ট নিয়ে যাবেন। ভয়াবহ কিছু নয়। দামি কিছুই লাগবে না। কিছু ফল, কয়েকটা ওষুধ, একটু প্রোটিন আর দুধ।

নিশ্চয়ই। আমার নাম শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। আমার ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে যাব।

বাসু অবাক হয়ে বলল, ঠিকানা দিয়ে কী করব? আপনি যদি নিজে থেকেই রোগীর খবর নেন তবে হবে।

ডাক্তার বাসু ছোকরা নয়, তবে বয়স খুব বেশিও নয়। এই বয়সেই মুখে গভীর বিষাদের রেখা কেন তা বুঝতে চেষ্টা করছিল শচী। তারপর সে ডাক্তার বাসুকে যা বলল তা সম্পূর্ণ বাস্তব এক হিসেবি কথা। সে বলল, রিকশাওয়ালার জন্য আমার যা যা করা উচিত তা শুনলাম। কিন্তু যে লোকটা ওকে মেরেছে তার কি কিছুই কর্তব্য নেই?

ডাক্তার বাসু তার ম্লান চোখ তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আমি যাকে সামনে পাই তাকেই কিছু-না-কিছু করার কথা বলি। কার কোনটা কর্তব্য তা সবসময়ে মনে থাকে না। বিটুকে দিয়ে যদি করাতে চান তাও পারেন। কেউ একজন করলেই হল। বোধহয় ওর ফ্যামিলির জন্যও কাউকে কিছু করতে হবে, নইলে তারা মরবে না খেয়ে।

হ্যাঁ, সেটাও বিটুদেরই করা উচিত।

বাসু একটা অসহায় কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কে করাবে?

পুলিশ।

বাসু চুপ করে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আপনি কি সোশ্যাল ওয়ার্কার?

একরকম।

তা হলে হয়তো আপনি পারবেন। কে করবে, কার করা উচিত তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু কাউকে তো করতেই হবে। সেই দায়িত্বটা আপনি নেবেন? নিলে ভাল হয়। আমার মাইনে বা প্র্যাকটিসের রোজগার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, থাকলে—

শচী একটু আগ্রহ বোধ করল বাকিটা শুনতে, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করা অভদ্রতা হবে বলে চুপ করে রইল।

বাসু মাথা নেড়ে বলে, কিছুই থাকে না। মানুষের প্রয়োজন আর চাহিদা এত বিপুল যে, কিছুই করতে পারি না।

শচী একটু নম্র হয়ে বলল, এটা তো একার কাজ নয়। অনেকের কাজ। সরকারের দায়িত্ব। আপনি নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে কত মানুষের উপকার করবেন?

বাসু গভীর হতাশার গলায় বলল, কেউ তো দায়িত্ব নেয় না। কাউকে বলেও কিছু লাভ হয় না। এই হাসপাতালের পিছনে যে বিরাট টাকা খরচ হয় তাই দিয়ে চমৎকার চলতে পারত। ওষুধ, খাবার, যন্ত্রপাতি কিছুই যে কেন পাওয়া যায় না হাসপাতালে! একজন ঝাড়ুদার বা মেথরও ঠিকমতো কাজ করে না।

ডাক্তার বাসুর গভীর হতাশা শচীকে একটু স্পর্শ করল। লোকটির মধ্যে এখনও দয়ামায়া আছে। এখনও পোড় খায়নি, শক্তপোক্ত হয়ে ওঠেনি বেচারা।

শচী বলল, আমার যেটুকু করার করব। তবে আমি অনেক দূরে থাকি।

অত দূর থেকে খুব বেশি কিছু করা যাবে না।

আপনি কোথায় থাকেন?

একবার বোধহয় বলেছি আপনাকে, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে। আপনি এত অন্যমনস্ক কেন? ডাক্তারের অন্যমনস্ক হওয়াটা কিন্তু বিপজ্জনক।

বাসু অবাক হয়ে শচীর দিকে চেয়ে বলল, আমি আর অন্য সব ব্যাপারে অন্যমনস্ক হলেও চিকিৎসার ব্যাপারে নই। আজ অবধি কেউ এ কথা বলেনি।

যাদের মধ্যে আনমাইন্ডফুলনেস থাকে তাদের সব ব্যাপারেই সেটা ফুটে ওঠে।

বাসুর ফর্সা রঙে একটু লালচে আভা লাগল। তবে কিছু তেমন বললেন না, শুধু বলল, ও, তা হবে।

শচী উঠল, আজ যাচ্ছি।

১৪

ঝিন্টু তার আদরের সাইকেলটার দুর্দশা দেখছিল হাঁটু গেড়ে বসে। লাভ স্টোরের সামনে। এই স্পোক এখানে পাওয়া যাবে না। সারাই করে নিতে হবে।

একটু অপরাধী মুখ নিয়ে বিটু দৃশ্যটা দেখছিল। ঝিন্টু তার চমৎকার সাইকেলটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

ঝিন্টু সাইকেলটা একটু তুলে চাকাটা ঘোরাল। না, রিম টাল খায়নি। খেলে ফ্রেমের গায়ে লাগত। স্পোকগুলো মোটামুটি ঠুকে সোজা করে দিয়েছে সারাইকার। আপাতত চালানো যাবে। তবে নিখুঁত জিনিসটার একটা খুঁত হয়ে গেল। ঝিন্টুর চোখ ফেটে জল আসছিল। শরীর রি রি করছে রাগে। দাদা না হলে হাত চালিয়ে দিত। তবে মনে মনে যে অবিরল গালাগাল দিয়েছিল, শালা ঢ্যামনা, সাইকেল চালাতে জানে না তবু শালা ওস্তাদি দেখাবে। ব্যালান্স নেই, শরীর ঢ্যাপসা, রিফ্লেক্স নেই, দু'নম্বরি একটা দোকানদার, তোর এত আস্বা কিসের? ইঃ, বউয়ের বাচ্চা হয়েছে! উনি একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটলেন সাইকেলটার বারোটা বাজাতে।

সাফাই হিসেবে বিটু অবশ্য ভাইকে অনেক স্তোক দিয়েছে। ঝিন্টু একটাও কথা বলেনি।

বিটু নেমে এল দোকান থেকে।

বুঝলি ঝিন্টু, লোকটাকে খুব মেরেছি। খুব।

ভাল। আমি যাচ্ছি।

তোর সাইকেল আমি কিনে দেব।

লাগবে না! দেনেওলা বহুত দেখেছি।

রাগছিস কেন? সাইকেল আমারও ছিল।

জানি। ব্যালান্স নেই, সাইকেল চালাতে জানো না, তবু চড়তে গেলে কেন?

বিটু একটু গরম হয়ে বলে, দেখ, বড় বড় কথা বলিস না। সাইকেলবাজ আমি তোর চেয়ে কম ছিলাম না।

ছিলে তো ছিলে। তাতে কী? এখন তো বসে বসে আর খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছ। সাইকেলে তোমার চড়াই উচিত নয়।

বিটুর রাগ হঠাৎ ওঠে। তার কারণ বহুবিধ। এক হল, যে বুড়ো রিকশাওয়ালাকে সে মেরেছে তার অবস্থা ভাল নয় বলে একটা খবর রটেছে। হাঙ্গামা লাগা বিচিত্র নয়। তার ওপর বাচ্চা হওয়া নিয়ে টেনশন, তার ওপর দোকান নিয়ে টেনশন।

বিটু রাগে গড়গড় করে উঠল, মুখ সামলে কথা বলিস কিন্তু ঝিন্টু, ভাল হবে না।

ঝিন্টু সেদিনকার ছেলে, একরত্তি। কিন্তু তেজ তার কিছু কম নয়। মুখটা তুলে বিটুর দিকে চেয়ে সমান দাপটের গলায় বলল, যাও, যাও, বেশি দাদাগিরি ফলাতে এসো না। কাকে ভয় দেখাচ্ছ?

খুব বাড় বেড়েছে তোর! অ্যাঁ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

তোমাকে আমি কিছুই বলিনি, আগ বাড়িয়ে ভালমানুষি দেখাতে এসেছ কেন? জানো, এই সাইকেলটার দাম কত? কিনে দেবে! এ বড় কিনে দেনেওলা লোক! ব্রহ্ম গাঙ্গুলির পয়সায় ফুটানি করে বেড়াচ্ছ আবার কিনে দেবে।

বিটু আচমকাই ভাইয়ের চুলের মুঠির জন্য হাত বাড়াল, ডান হাতে তুলল থাবড়া।

চোখের পলকেই ঝিন্টু সাইকেলটা টেনে আনল দু'জনের মাঝখানে। বিটু কিছু দ্বিধা করেছিল। একটু আগেই এক রিকশাওয়ালাকে মেরেছে সে। কাজটা ভাল হয়নি।

কী হত বলা যায় না। কিন্তু কিছু হওয়ার আগেই একটা রিকশা এসে লাভ স্টোরের সামনে থামল। চটপটে পায়ে একটা মেয়ে নেমে এসে বিটুর দিকে অতিশয় কঠিন চোখে চেয়ে বলল, আপনি বিটু গাঙ্গুলি?

বিটু ঝিন্টুকে মারার জন্য যে হাতখানা তুলেছিল তা নামিয়ে এনে বলল, হ্যাঁ।

আমাকে চিনতে পারছেন?

না তো!

একটু আগে আপনি যে রিকশাওয়ালার ওপর দারুণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন আমি তার রিকশায় ছিলাম। আমার নাম শচী চক্রবর্তী।

বিটুর রিফ্লেক্স অনেক কমে গেছে। কেমন ভোঁদামার্কা হয়ে গেছে তার মাথা। কেমন যেন হতচকিত হয়ে বলল, ও।

আপনার নামে আমি পুলিশে একটা রিপোর্ট করেছি। তারা অ্যাকশান নেবে কি না জানি না। যদি না নেয় তা হলে আমি আপনার বিরুদ্ধে পোলিটিক্যাল অ্যাকশান নেওয়ার চেষ্টা করব।

বিটু মেয়েটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। তার মুখের ওপর এরকম ভাবে কথা বলছে, মেয়েটা কে?

ঝিন্টু সাইকেলে কনুইয়ের ভর রেখে দৃশ্যটা দেখছিল। এটা ঠিকই মেজদাকে সে পছন্দ করছে না। রাগ এখনও দাউ দাউ জ্বলছে ভিতরে। কিন্তু মেজদার অপমানটাও সে তো আর দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না।

ঝিন্টু হঠাৎ বলল, শুনুন দিদি, আমি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। তবে আপনার সাবজেক্টে নয়। আপনাকে চিনি। নতুন এসেছেন, একসময় পলিটিক্স করতেন, সব জানি। কিন্তু এভাবে রাস্তায় ঘাটে চোখ রাঙানোটা ঠিক নয়। আপনি চলে যান।

শচী ঝিন্টুর দিকে তাকাল। ছেলেটাকে তার চেনা ঠেকল না। বলল, তুমি এর মধ্যে কথা বলছ কেন?

ঝিন্টু ইঙ্গিতে বিটুকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, আপনার ভিকটিম আমার দাদা, সহোদর ভাই। আমাদের সব ভাইকেই শহরের সবাই চেনে। কেউ কখনও চোখ রাঙায় না।

শচী রাগে জ্বলে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। তবু গলা ঠান্ডা রেখে বলল, কেন রাঙায় না বলো তো? তোমরা কি গুন্ডা?

গুন্ডা-ফুন্ডা নই। ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোক বলেই রাস্তার লোক আমাদের চোখ রাঙায় না।

শচী তবু মাথা ঠান্ডা রাখল, তুমি জানো তোমার দাদা কী করেছে? একটা রোগাভোগা রিকশাওয়ালাকে এমন মেরেছে যে সে এখন কোথায় পড়ে আছে, বাঁচবে কি না ঠিক নেই!

ঝিন্টু একটু ভড়কে গেল। গণ্ডগোল একটু হয়েছে সে জানে। সেই গণ্ডগোলে তার আদরের সাইকেলটাও চোট হয়েছে। কিন্তু এতটা সে জানত না।

অবাক হয়ে ঝিন্টু বলল, কে বলল?

কে বলবে? আমি হাসপাতাল থেকেই আসছি।

শচীর রিকশাওয়ালা ছোকরা ছেলেটা নেমে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হঠাৎ সে বলল, দিদি ঠিকই বলেছেন। লোকটার অবস্থা খারাপ।

ঝিন্টু বলল, কে দেখছে? ডাক্তার বাসু?

শচী জবাব দিল, হ্যাঁ।

ঠিক আছে, খোঁজ নিচ্ছি।

নাও। ভাল করে নাও।

ভাববেন না দিদি, আমরা ভদ্রলোক। রিকশাওয়ালার তেমন কিছু হলে আমরা দায়িত্ব নেব।

শচী বিটুর দিকে চেয়ে বলল, সেই কথাটাই বলতে আসা। ডাক্তার বাসু একটা প্রেসক্রিপশন করে দিয়েছেন। কয়েকটা ওষুধ আর ইনজেকশন, এগুলো হাসপাতালে পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে কিনতে হবে। রিকশাওয়ালারা চাঁদা তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে বোধহয় হবে না। যদি আপনারা ভদ্রলোকই হবেন তা হলে অন্তত লোকটার চিকিৎসার ভার নিন।

বিটু হাত বাড়িয়েছিল, তার আগেই ঝিন্টু ছোঁ মেরে প্রেসক্রিপশনটা শচীর হাত থেকে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। আমরা দেখছি।

শচী বিরক্তির গলায় বলল, ডাক্তার বাসু ওষুধগুলোর জন্য অপেক্ষা করছেন। একটু তাড়াতাড়ি দেখলে ভাল হয়।

বিটু মিইয়ে গেছে এটা ঠিক। আজই তার বাচ্চাটা জন্মেছে। এই দিনটায় যত অঘটন না ঘটলেও পারত। মাথাটা তার কেমন যেন নিরেট লাগছিল।

শচীর দিকে চেয়ে বিটু অতিশয় নরম গলায় বলল, দেখুন, আমার একটা ভুল হয়ে গেছে। মানুষ সব সময়ে ইচ্ছে করে সব কাজ করে না। হয়ে যায়।

শচী একটু ভ্রু কুঁচকে লোকটাকে দেখল। এক সময়ে লোকটা বেশ হ্যান্ডসাম ছিল, সন্দেহ নেই। সম্ভবত স্পোর্টসম্যান ছিল। শরীরটা পেটানো, শক্তপোক্ত, শচীর রাগটা এক পরদা নেমে গেল। তবু যথেষ্ট ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, রিকশায় আমি বসে ছিলাম। ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছি। রিকশাওয়ালার কোনও দোষ ছিল না। আপনি সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে পারেননি, অথচ ও বেচারা মার খেয়ে মরল।

সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে পারেননি কথাটা কানে খট করে লাগল বিটুর। সে অবশ্য রাগল না। বলল, ব্যালান্স তো সব সময়ে রাখা যায় না। যাই হোক, আমার ভাই যা বলেছে তাই হবে। লোকটার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করব।

ঝিন্টু হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলল, কিন্তু মেজদা, উনি যে পুলিশে রিপোর্ট করেছেন তার কী হবে?

শচী অবাক হয়ে বলল, পুলিশে রিপোর্ট তো করাই উচিত।

ঝিন্টু মাথা নেড়ে বলল, পুলিশ যদি অ্যাকশন নেয় তা হলে আমরা লোকটার চিকিৎসা করাব কেন? পুলিশকে দিয়েই করান গে।

শচী এই উদ্ধত যুবকটির কথা শুনে বুঝল, ছেলেটা সোজা নয়। বলল, তা হলে কী করবে?

আমরা চিকিৎসাও করাব আবার জেলও খাটব তা তো হয় না। আপনি থানায় গিয়ে কেসটা উইথড্র করুন, বাদবাকি যা করার আমরা করব।

যদি না করি?

তা হলে আমাদের দায়িত্ব নেই।

শচী হাত বাড়িয়ে বলল, প্রেসক্রিপশনটা আমাকে ফেরত দাও।

ঝিন্টু পকেট থেকে সজোরে প্রেসক্রিপশনটা বের করে একরকম ছুড়ে দিয়ে বলল, অতই যদি দরদ তা হলে নিজের পকেট থেকে খরচ করুন।

শচী অসহায় রাগে মূক হয়ে গেল।

বিটু মৃদু স্বরে বলল, প্রেসক্রিপশনটা আমাকে দিন।

না থাক। যা পারি আমিই করব।

রাস্তায় দু'-চারজন দাঁড়িয়ে গেছে এবং ভিড় জমে যাওয়ার লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠছে দেখে শচী আত্মসংবরণ করল। আসলে ঠিক এভাবে অ্যাপ্রোচ করাটাও বোধহয় ঠিক হয়নি। রাগ এবং ঝোঁকের বশে সে এরকম হুট করে এদের মুখোমুখি হয়েছে।

শচী বিটুর দিকে ফিরে বলল, আপনি কোনও কথাই বললেন না। আমি আপনার মুখ থেকে জবাবটা শুনতে চেয়েছিলাম, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবে না।

বিটু কথাটা শুনল, কিন্তু তবু কেমন যেন ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইল।

তারপর বলল, ভুল হয়ে গেছে। আমার মেজাজটার কিছু ঠিক নেই।

তারপর ঝিন্টুর দিকে চেয়ে বলল, তুই এখান থেকে যা তো। চ্যাটাং চ্যাটাং অনেক কথা বলেছিস। যা।

বিটুর চাপা আক্রোশ তার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছিল। ঝিন্টু আর কথা বাড়াল না। সাইকেলে উঠে চলে গেল।

শচী এসে রিকশায় উঠল। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বাস ধরবে।

১৫

বিকেল পাঁচটা নাগাদ গৌরের জিপ গাড়িটা এসে লাভ স্টোরের সামনে থামল। গৌর নেমে এল।

বিটু!

আরে, কাকা! কী খবর, কিছু লাগবে?

গৌর গম্ভীরভাবে বলে, তুই দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যা।

কেন?

বাড়ি গিয়ে বই-টই পড়। আজ দোকানে থেকে কাজ নেই।

কেন বলুন তো! বিকেলেই তো বিক্রিবাটা।

রিকশা ইউনিয়ন থেকে স্ট্রাইক কল করেছে। মিছিল বেরোবে। সিচুয়েশন খারাপ হতে কতক্ষণ? পুলিশ অ্যাকশন নেবে, খবর পেয়েছি।

বিটুর ফর্সা মুখটা আচমকাই লাল হয়ে উঠল। রাগে, অপমানে গরগর করে উঠে সে বলল, কেন, লোকটা কি মরে গেছে?

মরে যে যায়নি সে তোর কপাল ভাল বলে। ডাক্তার বাসু বুক দিয়ে আগলে না থাকলে এতক্ষণে হয়ে যেত। তা কমও কিছু হয়নি। আমি হাসপাতালে খবর নিয়ে এসেছি। অক্সিজেন স্যালাইন চলছে।

বিটু মাথা নেড়ে বলল, আমি দোকান বন্ধ করব না। যা হয় হোক। দোষ যখন করেই ফেলেছি একটা, ফলও পেতে হবে।

অত বীরত্ব ভাল নয়। এটা ট্যাকটিক্সের যুগ। ফিলজফির নয়। যা বলছি শোন। বাড়ি যা। না যদি যাস তবে তোর মা বাবা এসে চেঁচামেচি শুরু করবে।

স্ট্রাইক কল হল, পিন্টু জানে না?

জানে। জেনে কী করবে?

পিন্টুর তো হোল্ড আছে।

ছিল। এখন নেই। পলিটিক্সে হোল্ড রাখা অত সোজা নয়। তুই তো আর খবর রাখিস না।

বিটু কেমন হাল-ছাড়া গলায় বলল, ঠিক আছে। আপনি যান, আমি দেখছি।

গোঁয়ার্তুমি করিস না কিন্তু। হাঙ্গামা হলে ঠেকানোর কেউ নেই। মিছিল এই রাস্তা দিয়েই যাবে। বাঘাযতীন পার্কে জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। যদি চাস তো জিপটা রেখে যেতে পারি। ড্রাইভার তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

আমি নিজেই যেতে পারব কাকা. আপনি চলে যান।

আর একটা কথা। পুলিশ তোকে আজ হোক কাল হোক, অ্যারেস্ট করবেই। অ্যারেস্ট করতে এলে রেজিস্ট করিস না। পুলিশের কর্তাকে আমার বলা আছে। অ্যান্টিসিপেটরি বেইলও নিয়ে রাখছি।

বিটু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে শুনল। জবাব দিল না।

তুই কীসে যাতায়াত করিস?

একটা বাঁধা রিকশা আছে।

সেটা কই?

সে তো রাত ন'টায় নিতে আসবে।

তা হলে কীসে বাড়ি ফিরবি?

আর একটা রিকশা ধরে নেব।

গৌর বিরক্ত গলায় বলে, তোর মাথায় কথাটা ঢুকছে না নাকি? বললাম না স্ট্রাইক কল হয়েছে। রাস্তা থেকে সব রিকশা তুলে নিয়েছে। বাস-টাসও বন্ধ হয়ে যাবে এরপর।

তা হলে হেঁটেই চলে যাব।

ভেবে দেখ। জিপটা রেখে যাব?

না। তার দবকার নেই।

একা ফিরবি, লোকের মাথা এখন গরম। সামনাসামনি কিছু না করলেও দূর থেকে ইট-ফিট মেরে দিতে পারে।

এখনও লোকের এত সাহস হয়নি কাকা।

ওই অহংকারেই তুই গেলি। ভাবছিস বিটু মস্তান এখনও মস্তানই আছে। বোকা কোথাকার, তোদের যুগ বহু দিন আগে শেষ হয়ে গেছে। আমি বলি, এই সিচুয়েশনে বীরত্ব দেখানোটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। পাবলিক খেপলে কোনও বীরত্বই টেকে না।

এই বলে গৌর জিপগাড়িতে গিয়ে উঠল। চলে গেল।

বিটু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। দোকানে খদ্দের অনেকক্ষণ আসেনি। রাস্তায় বাস্তবিকই কোনও রিকশা দেখা যাচ্ছে না। আবহাওয়াটা কি একটু থমথমে?

বিটু লাভ স্টোরের সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল। দোকানে নিজের প্রিয় জায়গাটিতে বসে ভাবতে লাগল।

কেন মারলাম লোকটাকে? কোনও ভাইট্যাল কারণও তো ছিল না। লোকটার বয়স বেশি, রোগা, গাঁইয়া, মারার তো কারণও নেই। আজ সে প্রথম বাবা হল, আর আজই এই ঘটনা? বাচ্চাটা কি তা হলে অপয়া?

কর্মচারীরা একটু গা-ছাড়া ভাবে বসে আছে। সুখময় আর প্রবীর দু'জনেই নিরীহ প্রকৃতির, ভিতুও।

বিটু দু'জনকে ডেকে বলল, প্রবীর, সুখময়, তোরা বাড়ি চলে যা। এ বেলা আর আসতে হবে না।

প্রবীর অবাক হয়ে বলে, কেন দাদা?

দোকান বন্ধ করে দেব।

এখনই?

না, একটু বাদে। কিন্তু তোদের থাকার দরকার নেই।

হাঙ্গামা হবে নাকি?

হতে পারে।

তা হলে আপনিই বা থাকবেন কেন?

আমার একটু খুচরো কাজ আছে। হিসেব মিলিয়ে যাব। তোরা যা।

একটু দোনোমোনো করল দু'জন। তারপর সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। বিটু একা। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বাইরের লোক চলাচল দেখল বিটু। তারপর উঠে রোলিং শাটারটা টেনে নামিয়ে দিল। দোকান থেকে বেরোনোর ওই একটাই পথ।

ভিতরটা সঙ্গে সঙ্গে ভেপসে উঠল। সামান্য ভেন্টিলেশন দিয়ে তেমন বায়ু চলাচল নেই। পাখাটা খুলে বিটু তার হিসেবের খাতা নিয়ে বসল। সে একজন সফল দোকানদার, তার বেশি কিছু নয়। শুধু কেনা-বেচা। এইভাবেই একদিন জীবন শেষ হয়ে যাবে।

বছর তিনেক আগে একবার বন্ধুদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছিল বিটু। তারপর আর বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়নি। কেদার-বদ্রীর স্মৃতি তিন বছরেই ঝাপসা হয়ে এসেছে। এক বদ্ধ জলাশয়ে, নিত্যকার চেনা মানুষজনের মধ্যে একই প্যাটার্নের জীবন যাপন করতে করতে মানুষের কি পচন ধরে? তার মধ্যে নানা উন্মার্গগামিতা মাথাচাড়া দেয়?

দেয়, নইলে সে কেন এতটা অস্বাভাবিক?

তার এক মস্ত যন্ত্রণা হল সোমা। যাকে সে ভালবাসে না, যার প্রতি তার•কোনও আসক্তি নেই, তার সঙ্গে দিনের পর দিন এক ঘরে রাত কাটানো যে কী শক্ত! অথচ সোমা মেয়েটা খারাপও নয়। অনাদরে মানুষ হয়েছে বলে ওর প্রতি স্বাভাবিক একটু করুণাও হতে পারত তার। কিন্তু তাও হয়নি। মায়ের মুখ চেয়ে বিয়ে করতে হয়েছিল। ব্যস, ওইটুকুতেই তার কর্তব্য ফুরিয়ে গেছে।

বদ্ধ দোকানঘরের মধ্যে ফ্যানের হাওয়ায় আবদ্ধ বাতাসই ঘুরে ঘুরে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে দিচ্ছে। হিসেবটা ঠিকমতো করতে পারছে না সে।

বাচ্চাটা চেয়েছিল সোমাই। একদিন কেঁদেকেটে বলেছিল, যদি আমাকে তোমার প্রয়োজন না-ই থাকে তা হলে অন্তত আমাকে একটা অবলম্বন দাও। একটা বাচ্চা হোক, তাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে পারব। নইলে গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে।

সেই সুবাদে এই বাচ্চা। সোমার হার্ট ভাল নয়। বাচ্চা এখনই হোক তা ডাক্তাররাও চাননি। বাসু একবার বলেছিলেন, আগে হার্টটা ঠিক করে আসুন তারপর ওসব হবে।

বাইরে কার গলা না?

বিটু বাতি নিবিয়ে দিল। তারপর উঠে গিয়ে শাটারে কান পাতল।

মনে হচ্ছে ঝিন্টু আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

ঝিন্টু কাকে বলল, দোকান তো বন্ধ দেখছি। কিন্তু তালা তো বাইরে লাগানো নেই!

ভিতরে নেই তো?

মেজদা! এই মেজদা!

বিটু ভাবল, জবাব দেবে না। তারপর সিদ্ধান্ত পালটে শাটারটা টেনে খানিক ওপরে তুলল।

কী রে?

দোকান বন্ধ করেছিস নাকি?

গৌর কাকা তাই তো বলে গেল।

বন্ধ করে ভাল করেছিস। জোর হাঙ্গামা হতে পারে। তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে মা পাঠিয়ে দিল।
বিরক্ত বিটু বলল, আমি নিজেই যাচ্ছি। তোরা আয়।
নিজে পারবি না। বহু লোক জড়ো হয়েছে বাঘাযতীন পার্কে। লেকচার হচ্ছে। বাজার গরম।
শুনেছি। গৌরকাকা বলে গেছেন
দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছে মেলা।
তাতে কী?
তোর বাড়ি যাওয়াটা উচিত। মা-বাবা ভাবছে।
পুলিশ এসেছিল?
এখনও আসেনি। চল, আর দেরি করিস না।
বিটু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। একটু ভাবল। তারপর বলল, চল।
সন্ধ্যাবাতিটাও দেওয়া হল না।
ওসব পরে ভাবিস।
বিটু দোকানে তালা দিচ্ছিল নিচু হয়ে, এমন সময় একটা মস্ত ইট এসে লাগল ঠং করে রোলিং শাটারের গায়ে।
বিটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। কার এত সাহস?
ছায়ামূর্তির মতো সটাসট সরে গেল ঝিন্টু আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা।।
আর তখন মাঝারি মাপের একখানা ইট উড়ে এসে জমে গেল বিটুর কপালে।
টুঁ শব্দটিও করতে পারল না বিটু। ধড়াস করে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল।

১৬

বহুকাল বাদে গৌর কন্ট্রাক্টর মুখোমুখি হল সুমনার।
ছেলেরা আজ কেউ বাড়ি নেই। ব্রহ্মকুমার নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। তারপর হাসপাতালে গেছেন আহত রিকশাওয়ালার বিলিব্যবস্থা দেখতে। সেখান থেকে নিউ মার্কেট যাবেন বিকেলের বাজার করতে। ফিরে এসে মক্কেল নিয়ে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে দেবেন কাছারিঘরে।
সুমনা আজ বড্ডই একা।
গৌরের জিপ যখন বাইরে থামল তখন সুমনা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। এই বয়সেও গৌরকে দেখলে বুক কাঁপে। লজ্জায় রাঙা হন।
দরজাটা খুলে দিয়ে বললেন, এসো।
কর্তাটি কই?
বেরিয়েছে।
রিকশা ছাড়া বেরোল কী করে?
হেঁটেই।
হাঁটা তো ভালই। তোমার কর্তা দিনকে দিন তো স্থবির হয়ে যাচ্ছে। কেবল টাকা রোজগার ছাড়া কোনও ব্যায়াম নেই। এভাবে চললে তো ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে।
সেই চিন্তায় বুঝি ঘুম হচ্ছে না? কী খবর বলো তো! পাশের বাড়ির ছেলেটা এসে বলে গেল, বিটুকে নাকি মারধর করতে পারে!
গৌর গম্ভীর হয়ে বলে, তোমার এ ছেলেটা মানুষ হল না সুমনা। একটি একগুঁয়ে গাড়ল।

সুমনা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, ছেলেটা কার দেখতে হবে তো?

গৌর নীরবে সুমনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, হঠাৎ বুঝি মনে পড়ল কথাটা?

হঠাৎ পড়বে কেন? সব সময়েই মনে হয়।

তোমার কোনও পাপবোধ নেই তো?

সুমনা মাথা নাড়লেন, না, নেই। কেন থাকবে বলো? ওদের একজনও যে তোমার সেটাই আমার সান্ত্বনা। নইলে তোমার ওপর খুব অবিচার করা হত। সে কথা যাক, কী করবে এখন বলো তো?

গাড়লটাকে তো বললাম, দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে আসতে, এখনও আসেনি?

না।

থানা পুলিশ নিয়ে ভয় নেই। ম্যানেজ করা যাবে। কয়েকটা দিন ওকে কোথাও পাঠানো যায় না?

যাবে কি?

তোমার কথা নাকি খুব শোনে?

শোনে। আবার শোনেও না। অত বড় ছেলেকে কি আর ইচ্ছেমতো চালানো যায়! তুমি ভিতরে এসে বোসো। চা করে দিই।

বসব? এখন কি আর বসবার সময় আছে?

একটু বোসো। ফাঁকা বাড়িটায় কেমন ভার লাগছে বুকটা। আচ্ছা বিটুর কি বিপদ?

আরে না। তোমার ছেলেরা কিছু কম গুন্ডা নয়। পিন্টু, বিটু, ঝিন্টু এরা কি কিছু কম হাঙ্গামা করেছে?

ভয় তো সেখানেই। বিশেষ করে বিটু। বিয়ের পর এখন একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আগে ওকে নিয়েই ছিল আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিটুই ছিল তোমার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ব্রাইট।

সুমনা আবার লাল হলেন। মেয়েদের কতই গোপন কথা থাকে। দুনিয়া জানতে পারে না, কিন্তু তলায় তলায় কত বাঁধ ভাঙে, ভূমিক্ষয় হয়, ঝড়-বাদলায় মাতাল হয়ে যায় অভ্যন্তর। ও কি পাপ হয়েছিল তাঁর? গৌরকে আর তো কিছুই দেওয়া যায়নি। ওই একটি সন্তান শুধু। এমন কী পাপ হয়েছিল?

পাপ পুণ্য কর্মফলের হিসেব করে কি শেষ করা যায়? ও হতেই থাকে, হয়েই যেতে থাকে। কে যে পাপ পুণ্যের বিচার করে কে জানে?

সুমনা মাথা নিচু করে ছিলেন। খুব ধীরে মাথাটা তুলে বললেন, কী হল বলো তো? এত ব্রাইট ছিল, কেন অমনধারা হয়ে গেল?

গৌর খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তেমন খারাপও তো কিছু হয়নি। বলতে পারো, সিনেমার নায়ক বা অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তা না-ই হল. মদ মেয়েমানুষের দোষও ডেভেলপ করেনি। তাছাড়া মস্ত গুণ, মাতৃভক্ত। মায়ের উপর টান থাকলে সব কাটিয়ে উঠবে।

সুমনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ নাতি হল আমার। তোমারও। কত আনন্দের দিন। আর কী সব হচ্ছে দেখো! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো। বোসো তো, চা করে আনি।

তোমার কাজের লোকটা কোথায়?

নার্সিংহোমে গেছে বউমার খাবার নিয়ে। খেতে তো আর পারবে না আজ। তবু পাঠিয়ে দিলাম।

গৌর বসল।

সুমনা রান্নাঘরে গিয়ে সযত্নে চা করলেন দু' কাপ। প্লেটে বিস্কুট আর চানাচুর সাজিয়ে নিয়ে

এলেন ট্রে-তে করে। গৌর খুব চানাচুর, ঝালমুড়ি তেলেভাজা ভালবাসে। ওইসব করেই পেটে আলসার বাঁধিয়ে বসেছিল।

খাও।

গৌর কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। তেমনি আনমনেই চা খেল।

কী ভাবছ বলো তো!

কত কী! তোমার কথা, আমার কথা, আমাদের কথা। তোমরা ছাড়া আমার আপনজন আর কে আছে বলো সুমনা?

আপনজনের কথা আর বোলো না। পুরুষেরা থোড়াই আপনজনদের তোয়াক্কা করে। কর্তাটাকে তো দেখছি, আমরা থেকেও নেই।

১৭

বিটুকে ইটটা যে নির্ভুল লক্ষ্যে ছুড়ে মেরেছিল সে কোনও রিকশাওয়ালা নয়। ঝিন্টু তাকে ভালই চেনে। পালপাড়ার লাট্টু। নয়া মস্তান। মেঘদূত সিনেমা হল-এ যারা টিকিট ব্ল্যাক করে তাদের সর্দার। হংকং মার্কেটে দুটো স্টল দিয়েছে। বিরাজবাবুর কাছ থেকেই যখন দোকানটা নেয় বিটু তখন লাট্টুও চেষ্টা করেছিল। তখন থেকেই বিটুর সঙ্গে খটাখটি। মিনি বাস-এর জন্য ব্যাংকের লোন পেতে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিল। ঝিন্টুর জন্য লোনটা হয়নি। সেই রাগও আছে।

ঝিন্টু গোটা ষাটেক লোককে চক্রাকারে এগিয়ে আসতে দেখতে পেয়েই ঝাঁপ খেয়ে সরে যায়। সে বুঝতে পেরেছিল ওরা মারলে বিটুকেই মারবে।

ইট খেয়ে বিটু যখন লাট হয়ে পড়ল তখন ঝিন্টু আর তার দুই বন্ধু কী করবে ঠিক করতে পারছিল না। লাট্টু পালায়নি। সজ্ঞানেই এগিয়ে এল পড়ে থাকা বিটুর কাছ বরাবর।

লাট্টু ঝিন্টুর দিকে চেয়ে বলল, ফোট, নইলে কলজে খিঁচে নেব।

ঝিন্টু একটু কাঁপা গলায় বলল, ওকে মারছিস কেন?

তাতে তোর বাবার কী? ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

খুন করতে চাস?

চাইলে কী করবি?

লাট্টু এর ফল ভাল হবে না।

যাঃ যাঃ বে, এই লালু, দে তো শালাকে ভরে।

লালুকেও চেনে ঝিন্টু। মহাবীরস্থানের কাছে বাড়ি। একনম্বর হেক্কোড়। ঠোঁট চোয়াল হিংস্র।

ঝিন্টু পালাতে পারত। গায়ের জোরে না হোক, ছুটে এদের আজও হারিয়ে দিতে পারে সে। কিন্তু সব কিছুরই তো একটা শেষ আছে।

ঝিন্টু কিন্তু ভাবনা চিন্তা না-করেই এগিয়ে গেল। তারপর আচমকা লাফিয়ে একটা লাথি কষাল সোজা লালুর বুকে। শব্দটা হল সাংঘাতিক। মড়াৎ।

ঝিন্টুর পা বিখ্যাত। সাইকেলে চড়ে এবং দু' পায়ের আরও বহু ব্যায়ামের পর দু'খানাতেই সাংঘাতিক জোর।

লালু বুকটা চেপে ধরে একটা কোঁক শব্দ করে মাতালের মতো কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েই পড়ল।

তারপর কী হল ঝিন্টুর আর মনে নেই। বিস্তর দ্রুত পা হাত ঘুসি ইট ইত্যাদির মধ্যে একটা ক্যালোডিওস্কোপ কোনও প্যাটার্নই স্থির নয়।

তবে ঝিন্টুর জ্ঞান রইল না।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন বাসু ডাক্তার তার মুখের দিকে চেয়ে চিন্তিতভাবে বসে আছেন।

কোথায় লেগেছে ঠিক বুঝতে পারছে না ঝিন্টু। মনে হচ্ছে শরীরের কোনও অংশই বাকি নেই। মাথা থেকে পা অবধি শরীরটা কোথাও অবশ, কোথাও ফোড়ার মতো যন্ত্রণা।

বেশ কয়েক মিনিট লাগল মাথার ধোঁয়াটে ভাবটা কাটতে।

ডাক্তার বাসু বললেন, তোমাদের আজকের দিনটাই খারাপ। না?

কেন? কী হয়েছে?

কত কী তো হল।

মেজদা! মেজদা কি শেষ?

বাসু মাথা নাড়লেন, না, শেষ কি এত সোজা? একটা মানুষ বড় অল্পে শেষ হয় না। একটু সময় নাও। পুলিশ অপেক্ষা করছে জেরা করার জন্য।

আমার বাবা কোথায়?

তিনিও আছেন।

লালুকে আমি একটা লাথি মেরেছিলাম বাসুদা।

বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, মাথা ঠান্ডা রাখো। লালুকে তুমি লাথি মেরেছিলে কি না তা তো কেউ জানে না। পুলিশকে তোমার অত কিছু বলার দরকার নেই। শুধু বোলো বিটুকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি মার খেয়েছ।

ঝিন্টু একটু হেসে বলল, আমি উকিলের ছেলে, কী বলতে হবে তা জানি। আউট অফ রেকর্ডস আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, লালুর অবস্থা কী?

পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভেঙেছে। যদি ভাঙা হাড় ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে থাকে তবে কেস খুব সিরিয়াস। সাধারণত পাঁজরের হাড় ভিতর দিকেই ভেঙে ঢোকে। কাল সকালের আগে কিছু বোঝা যাবে না।

আর লাট্টু? ওর কিছু হয়নি?

লাট্টু কে?

ওই যে মেজদাকে ইট মেরেছে। লম্বা, ছিপছিপে, হাড়কাঠ চেহারা। মেঘদূতে টিকিট ব্ল্যাক করে, দেখেননি?

বাসু হাসলেন, না আমি সিনেমা দেখার সময়ও পাই না।

আমার চোট কতখানি বাসুদা?

কয়েকদিন ভুগবে। বিটুকে মারল কেন জানো?

না বাসুদা, আজকাল কে যে কাকে কেন মারে তার কোনও ঠিক নেই। লাট্টুর খাড় ছিল। অনেক কারণ।

যাক গে। তুমি পাঁচ মিনিট শুয়ে চোখ বুজে মনটাকে ঠিক করে নাও। পুলিশ আসছে।

আমি কি আন্ডার অ্যারেস্ট?

না, এখনও নও।

বাসু চলে গেলেন, পুলিশ এল। ঝিন্টু পুলিশ ইন্সপেক্টরকে ভালই চেনে। তাদের বাড়িতেও গিয়েছে কয়েকবার।

এই যে ঝিন্টুবাবু কী খবর?

ভাল।

প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?

পারব।

গণ্ডগোলটা লাগল কী করে?

গণ্ডগোল লাগেনি। লাট্টু হঠাৎ মেজদাকে ইট মারল। মেজদা তখন দোকান বন্ধ করছিল। ইনফ্যাক্ট মেজদাকে দোকান থেকে আমিই টেনে বের করেছিলাম।

লাট্টুর ঠিকানা জানো?

হাসালেন স্যার, লাট্টুর ঠিকানা সবাই জানে।

ইন্সপেক্টর একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, তা বটে। তবে এখন এখানে সে নেই। অ্যাবসকন্ডিং।

হংকং মার্কেটে ওর স্টল আছে।

সেখানেও খোঁজা হয়েছে।

তা হলে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

তোমার দাদা বিটুর সঙ্গে ওর কোনও শত্রুতা ছিল?

লাভ স্টোরের ঘরটা লাট্টু নিতে চেয়েছিল। তখন কিছু হয়ে থাকলে থাকতে পারে।

লাট্টু পলিটিক্স করে কি না জানো?

না। তবে গুন্ডা-বদমাশদের পলিটিক্যাল কভার তো একটা থাকবেই।

সেটাই হয়েছে মুশকিল। একজন লিডার অ্যান্টিসিপেটারি বেইল চেয়েছেন ওর জন্য।

তা হলে কেস কেঁচেই গেল।

না না, অত সহজে কাঁচবে না, আমরা তো আছি।

মেজদা কোনও স্টেটমেন্ট দিতে পেরেছে?

না। জ্ঞান এখনও ফেরেনি।

ওকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন। আর সেজদা পিন্টু যদি কিছু জানে।

তোমার সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে, সুতরাং যা হয়েছে তার একটা ডিটেল স্টেটমেন্ট কাল এসে নেব। তোমার সঙ্গে বোধহয় তোমার দুই বন্ধুও ছিল, তাই না?

হ্যাঁ। তারা কোথায় তা অবশ্য জানি না। মারপিটের সময় কে যে কোথায় ছিটকে গিয়েছিল কে জানে। ওদের কোনও খবর জানেন?

না। ইনজিয়োরড অবস্থায় তিন জনকে পাওয়া গিয়েছিল। তুমি, বিটু আর লালু।

ঝিন্টু চোখ বুজল। একটু শঙ্কিত গলায় বলল, আমার সাইকেলটা ছিল। সেটা আস্ত আছে?

ইনস্পেক্টর একটু হাসলেন, সাইকেল ঠিক আছে। ভয় নেই।

ইনস্পেক্টরের দিকে চেয়ে ঝিন্টু একটু হাসল। তৃপ্তির হাসি। পৃথিবীতে তার সাইকেলখানার চেয়ে মূল্যবান সামগ্রী আর কীই বা আছে?

শোনো ঝিন্টু, আমি চাই না তোমার ওপর আর কোনও হামলা হোক। লালুকে তুমি যে লাথিটা মেরেছ সেটা ফেটাল হতে পারত। এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। যদি লালুর কিছু হয় তবে কেসটা জটিল হয়ে যাবে।

আমি কী করব? লালুকে না-মারলে যে লালুই আমাকে মারত।

সে তো জানি। আমি বলি কী, তুমি তোমার স্টেটমেন্টে লালুকে মারার কথাটা কবুল কোরো না। তোমার বাবা অবশ্য সবই সাজিয়ে দেবেন। তবু বলে গেলাম।

ইনস্পেক্টর চলে যাওয়ার পরই ব্রহ্মকুমার ঘরে ঢুকলেন। চারদিকে চেয়ে হাসপাতালের বিলিব্যবস্থার প্রতি একটু নাসিকাকুঞ্চন করে ছেলের দিকে তাকালেন।

ব্রহ্মকুমারের একটিই সমস্যা। ছেলেদের সঙ্গে তিনি সহজভাবে কথা বলতে পারেন না। আসলে সওয়াল জবাব ছাড়া অন্যরকম কথার অভ্যাসটাই তাঁর চলে গেছে।

কী রে? অ্যাঁ! কী সব হচ্ছে! তোরা সব কী গণ্ডগোল করেছিস?

ঝিন্টু বাবার দিকে চেয়ে রইল করুণভাবে। বলল, বাবা, আমরা কিন্তু কিছু করিনি।

করোনি! অ্যাঁ। করোনি! তা হলে রিকশাওয়ালাটাকে বিটু মেরেছিল কেন? অ্যাঁ।
তুমি কি ভাবছ মেজদাকে রিকশাওয়ালারা মেরেছে?
তাই তো শুনছি। লাটু না কী যেন নাম!
সে রিকশাওয়ালা নয়। ব্ল্যাকার।
ও-ই হল। এসব ভাল কথা নয়। তোর এখন কেমন লাগছে?
ভাল। আমার কিছু হয়নি।
কিন্তু হতে পারত। সাংঘাতিক হতে পারত। তোমরা দুই ভাই আজ মারাও যেতে পারতে।
মরিনি তো! বাবা, মা কোথায়? আসেনি?
তাকে খবর দেওয়া হয়নি। প্রেশার বেড়ে যেত শুনলে।
তুমি ভয় পেয়ো না বাবা। আমরা সামলে উঠব।
বিটুটার এখনও জ্ঞান নেই।
ডাক্তার কী বলছে?
বাসু তো বলছে চিন্তা নেই। কিন্তু কত রক্ত গেছে। তার ওপর তুই আবার কাকে লাথি মেরেছিস। পুলিশ কেস।
ও কিছু নয়। সে তো বিকেলে মেরেছি। পুলিশ বলল, ওটা স্টেটমেন্টে উল্লেখ না করতে।
ব্রহ্মকুমার সামান্য উষ্মার সঙ্গে বললেন, গুন্ডাদের খেপিয়ে দিলে তারা কি তোমাদের সহজে ছাড়বে?
তাদের পরিবারে ঝিন্টুই একমাত্র লোক যে ব্রহ্মকুমারের সঙ্গে মোটামুটি জড়তাহীনভাবে কথা বলতে পারে। ব্রহ্মকুমারের বোধহয় এই কনিষ্ঠ পুত্রটির উপর একটু বিস্ময়কর টান থেকে গেছে। ঝিন্টু তাই ব্রহ্মকুমারের চোখের দিকে চেয়েই বলল, লাটু এমন কিছু মস্তান নয় বাবা। ওকে ভয় খাওয়ার কিছু নেই। দেখলে না, মেজদাকে সামনে থেকে অ্যাটাক করার সাহস পর্যন্ত নেই। আগে খাড়া হই সাতদিনের মধ্যে ওকে শিক্ষা দিয়ে দেব।
ব্রহ্মকুমার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললেন, নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়াটা সবচেয়ে বড় অপরাধ। ওসব যারা করে তারা করুক। তোমাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী? লাটু একটা অন্যায় করেছে, তার জন্য পুলিশ যা করার করবে।
বাঃ, আর আমরা ছেড়ে দেব?
তোমরা একদম গণ্ডগোল করবে না। এটা আমার অর্ডার, বুঝলে?
ঝিন্টু বাবাকে চেনে। খেপলে চণ্ডাল, ভাল থাকলে গঙ্গাজল। সে একটু হেসে বলল, ঠিক আছে বাবা। তবে পুলিশ কিছু করবে না। ধরলেও লাটুকে ছেড়ে দেবে। তখন কী হবে?
সে তখন দেখা যাবে।
ব্রহ্মকুমার উঠলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, তোমার মা এখনও খবরটা জানেন না। জানলে কী হবে বুঝতে পারছি না।
বিটুর জ্ঞান ফিরেছে অনেকক্ষণ। সে শক্ত মালে তৈরি। বহু জলঝড় তার ওপর দিয়ে গেছে একসময়। ঘায়েল হলেও সে নিস্তেজ হয়ে বা নেতিয়ে পড়েনি।
অনেকটা রক্ত গেছে। মাথার ক্ষতটাও বেশ গভীর। তবু জ্ঞান ফেরার পর থেকেই সে ছটফট করছে, আমাকে ছেড়ে দিন। বাড়ি যেতে দিন।
ডাক্তার বাসু চিন্তিতভাবে বললেন, বাড়ি যাওয়াটা রিস্কি হবে বিটুবাবু। অন্তত আজকের রাতটা রেস্ট নিন। হেড ইঞ্জুরিতে অবজারভেশনে রাখাটা ভীষণ জরুরি।
আমার কিছু হয়নি। ছেড়ে দিন।
কতটা রক্ত গেছে জানেন?

আমি প্রতি মাসে একবার ব্লাড ডোনেট করি। শরীরে অনেক ফালতু রক্ত থাকে ডাক্তার বাসু, আমি জানি। ইট-ফিট আমি অনেক খেয়েছি। ছাত্র আন্দোলন করেছি না! দু'বার ছুরি খেতে হয়েছিল।

তা হলে তো আপনার অভিজ্ঞতা অনেক।

হ্যাঁ। তাই তো বলছি দু'-চার লিটার রক্ত চলে গেলেও আমার কিছু হবে না।

ডাক্তার বাসু একটু হাসলেন। বড়লোকদের তেমন কিছু হয় না তা তিনি জানেন। তাদের শরীরে যথেষ্ট বাড়তি রক্ত থাকে। তারা মরে অতি ভোগে, রোগগ্রস্ত হয়ে।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের তিনতলায় কেবিনে দুটো বিছানাওলা এই ঘরখানাই হাসপাতালের শ্রেষ্ঠ ঘর। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ঘরের অবস্থা এতই খারাপ যে, কোনওরকম ইনফেকশনই ঠেকানোর উপায় নেই। এই ঘরেই রাখা হয়েছে বিটুকে। পাশের বেডে হাতে নল, মুখে নল আর একজন রুগি। অচেতন।

ডাক্তার বাসুকে একজন লোক দরজার কাছ থেকে ডাকল, স্যার।

কী হল আবার?

ওই পেশেন্টের বউ এসেছে।

বউ? ডাকো।

ডাক্তার বাসু হঠাৎ বিটুকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই পেশেন্টকে চিনতে পারছেন?

না তো! কে?

মনে পড়ছে না? আজ দুপুরে যাকে আপনি মেরেছিলেন সেই রিকশাওয়ালা।

বিটু কেমন ফ্যাকাসে মেরে গেল। তারপর ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখল। বেডের মাথার ওপরকার বাতিটা নেবানো। মুখটা আবছামতো।

একটু কাঁপা গলায় বিটু বলল, ও কি বাঁচবে?

বাঁচত না। রিকশাওয়ালা তো হাসপাতালের মেঝেয় পড়ে থাকত, কেউ অ্যাটেন্ড করত না, ওষুধ পড়ত না, মরে যেত। তবে আমি কেসটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম।

বিটু কাঁপা গলায় বলল, ডাক্তার বাসু, আমি জানি আপনি ভীষণ ভাল লোক।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, এ দেশে কোনও ভাল লোক নেই। আমিও নই। ভাল থাকার চেষ্টা হয়তো কেউ কেউ করি। কিন্তু যে সিস্টেমের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয় তা আস্তে আস্তে আমাদের খারাপ করতে থাকে।

বিটু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, জানি। সিস্টেমের কথা খুব জানি।

বিটু জানবে না তো কে জানবে? বেঙ্গল টিমের স্কোয়াডেও যে শেষ অবধি চান্স পায়নি আর-একজন কমজোরি খেলোয়াড় খুঁটির জোরে জায়গা করে নিয়েছিল বলে। কোচিং নিতে ইন্দোনেশিয়া যেতে চেয়েছিল। পারেনি। সে প্রকাশের মতো খেলোয়াড় ছিল কি না কে জানে, কোচিং নিলে বোঝা যেত। আজকাল ব্যাডমিন্টন আর টেবিল টেনিসে শিলিগুড়ির খেলোয়াড়েরা সারা ভারতেই সুযোগ পাচ্ছে। কেউ কেউ খুবই নাম করেছে। তাদের আমলে শিলিগুড়ির এত গুরুত্ব তো ছিল না। সিস্টেমই ডুবিয়েছিল বিটুকে।

বিটু সভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে ডাক্তারকে বলল, আপনি কি ইচ্ছে করেই আমাকে ওর ঘরে রেখেছেন?

ডাক্তার বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ইচ্ছে করে রেখেছি বললে বাড়াবাড়ি হবে। তা নয়। আসলে এই ঘরখানাই হাসপাতালের সবচেয়ে ভাল ঘর। পেয়িং বেড। একজন রিকশাওয়ালার এখানে থাকার কথাই নয়। আমি নিজের রিস্কে রেখেছি। আর একটা বেড ছিল, আপনার সার্জিকাল কেস বলে এখানেই রাখতে হল। পরে দেখলাম ব্যাপারটা বেশ মজার। আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী একই ঘরে।

বিটু বালিশে কনুই রেখে উঠে বসল। বলল, ওর জন্য যা খরচ করতে হয়েছে সব আমি দেব ডাক্তারবাবু।

দেবেন।

শচী চক্রবর্তী নামে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর আজ আমাকে গিয়ে এ ব্যাপারটা নিয়ে ধমক চমক করছিল। অ্যাগ্রাসিভ টাইপের ভদ্রমহিলা।

জানি। উনি আজ এখানেও এসেছিলেন। রিকশার সওয়ারি ছিলেন তিনিই।

পুলিশে উনিই রিপোর্ট করে এসেছেন, বললেন।

ডাক্তার বাসু হাসলেন, পুলিশ নীচে অপেক্ষা করছে বিটুবাবু।

অপেক্ষা করছে! কেন, আমাকে অ্যারেস্ট করবে নাকি?

বোধহয়। আর সেইজন্যই আজ রাতে আমি আপনাকে ছাড়তে চাইছিলাম না।

বিটু একটু চিন্তিত হয়। তারপর বলল, বাবা কি সব জানে?

আপনার বাবাও নীচে আছেন। আপনি অ্যারেস্ট হলেও জামিন পেয়ে যাবেন। সেটা প্রবলেম নয়। প্রবলেম হল হ্যারাসমেন্ট। আপনি পায়ে হেঁটে বেরোলে পুলিশ হয়তো থানায় নিয়ে যাবে। সেটা ভাল হবে না।

কিন্তু এখানে যে আমার ঘুম হবে না।

আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে দেব। আনফিট অবস্থায় আপনাকে ছাড়লে আমার বদনামও হবে। অবশ্য বন্ড দিয়ে আপনি যে-কোনও সময়েই চলে যেতে পারেন।

এই সময়ে দরজায় এক শীর্ণকায়া যুবতী এসে দাঁড়াল। কালো চোখ, গলা বসা, পরনে একখানা সস্তা ছাপা শাড়ি। কাঁখে একটা বাচ্চা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই এসেছে।

ডাক্তার তার দিকে চেয়ে বললেন, কাঁদছ কেন? সব ঠিক আছে।

ও কোথায় ডাক্তারবাবু? একটু দেখা করে যাব।

দেখা তো হবে না। ওই যে শুয়ে আছে দরজা থেকেই দেখে নাও। কথা তো বলতে পারবে না।

জ্ঞান আছে?

জ্ঞান ফিরেছে। এখন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

মেয়েটা দোরগোড়ায় বসে পড়ল। বাচ্চাটা ককিয়ে উঠল। মেয়েটা বলল, খুনই হয়ে গিয়েছিল, সবাই বলছে যে!

না, তেমন কিছু নয়।

তবে অত সব নল কিসেব?

ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওষুধ দেওয়া হয়েছে শিরা দিয়ে।

বাঁচবে তো?

না বাঁচলে এসে আঁশবটি দিয়ে আমার গলাটা কেটে দিয়ো।

আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। গলা কাটতে হলে সেই গুন্ডাটার কাটতে হয় যে ওকে ওরকম মেরেছে।

বিটুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল দেখে ডাক্তার একটু হাসলেন। তারপর মেয়েটাকে বললেন, এই যে বাবুকে দেখছ একে কেমন লোক বলে মনে হয়?

মেয়েটা বিটুর দিকে জলভরা চোখে তাকাল। আঁচলে চোখটা মুছে নিয়ে বলল, ভদ্দরলোক।

একেও কারা যেন মেরেছে। মাথা ফেটে গেছে।

মেয়েটা কিছু বলল না।

ডাক্তার বাসু মেয়েটার দিকে চেয়ে বললেন, এরকম কত কী হয়ে যায়। বাচ্চাটাকে কিছু খাইয়েছ?

মেয়েটা মাথা নিচু করে বলল, এটাকে খাওয়াতে পারি। বুকের দুধ খায় তো। কিন্তু অন্যগুলো পেটে কিল মেরে আছে।

তোমার ক'টা বাচ্চা?

তিনটে। ওবেলা রান্না হয়নি। লোকটা তো তিনদিন জ্বরে পড়ে ছিল। আজ জ্বর গায়েই বেরিয়েছিল। এতগুলো লোক উপোস। আমি যে বাড়িতে কাজ করি তারা আগাম টাকা দেবে না।

ডাক্তার বাসু পকেট থেকে টাকা বের করলেন, যা তাঁকে প্রায়ই করতে হয়। গোটা কুড়ি টাকা মেয়েটার হাতে দিয়ে বললেন, দু'-চারদিন আমার কাছ থেকে নিয়ে চালিয়ে নিয়ো।

মেয়েটা টাকাটা হাতে ধরে বলল, রিকশাওয়ালারা চাঁদা তুলে কিছু দিয়েছে ডাক্তারবাবু।

কত দিয়েছে?

গুনিনি। গোনার মতো মনের অবস্থা ছিল না। পেট কোঁচড়ে বেঁধে রেখেছি। বেশি হবে না। দশ-বিশ টাকা।

ঠিক আছে। দু'-চার দিন চালিয়ে নাও। এখন বাড়ি যাও। রান্নাবান্না করে বাচ্চাদের খাওয়াও গে। তোমার বরের জন্য চিন্তার কিছু নেই। ভাল হয়ে যাবে।

কথা বলবে না?

আজ নয়। কাল বিকেলে এসো। কথা বলতে পারবে।

বউটা বসে বসে খানিকক্ষণ চোখ মুছল। তারপর কাউকে কিছু না-বলে যান্ত্রিকভাবে চলে গেল।

ডাক্তার বাসু বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, আমাকে রাউন্ডে যেতে হবে। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকুন।

আমার বাবা তো কই দেখা করতে এলেন না?

আসবেন। ছোটজনের সঙ্গে এখন হচ্ছে।

ছোটজন!—বিটু অবাক হয়ে বলল, ছোটজন কে?

ঝিন্টু। আপনার চেয়ে মার সে বেশিই খেয়েছে। সিরিয়াস নয়, তবে ভুগবে ওই বেশি।

ঝিন্টু মার খেল কেন?

আমি তো স্পটে ছিলাম না। কে বলবে কেন আপনারা মার খেলেন!

আমি কেন মার খেয়েছি তা আন্দাজ করতে পারি। কোনও রিকশাওয়ালার বুকের পাটা হবে না আমাকে ইট মারবে।

আপনার কি অনেক শত্রু?

শত্রু? হ্যাঁ, অনেক। আমার শত্রুর অভাব নেই। অন্তত বারোজন মাড়োয়ারি আর গুজরাটি আর পাঞ্জাবি আমার দোকানটা নিতে চেয়েছে। আপনি কি জানেন ইটটা কে মেরেছিল?

লাট্টু না কার নাম যেন শুনছিলাম।

লাট্টু? বুঝেছি। এর আগেও আমাকে থ্রেট করেছে। লাট্টুর পিছনে অন্য লোক আছে। কিন্তু ওরা ঝিন্টুকে মারল কেন? ঝিন্টু তো কিছু করেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বলল, ঝিন্টু আপনার মারের বদলা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর বিটু খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল চোখ বুজে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। রিকশাওয়ালার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে। বিটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ নয়। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

উঠে বসে বিটু অনুভব করল, তার তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। শরীরটা একটু দুর্বল ঠিকই। তার শরীরের ভিত শক্ত কাঠামোয় তৈরি। এই দুর্বলতা তার কাছে কিছুই নয়।

বিটু বিছানা ছেড়ে নামল এবং কয়েক পা হেঁটে দেখল। চমৎকার। কোনও জড়তা বোধ করছে

না সে, মাথা টলমল করছে না, চোখে ঝাপসা দেখছে না। মাথায় একটা গভীর ব্যথা টনটন করছে। সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়।

বিটু ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

পুলিশ নীচে অপেক্ষা করছে হয়তো কিন্তু তারা সকলে বিটুকে চেনে না।

তা ছাড়া এমন কিছু সতর্কও তারা থাকবে না। কারণ বিটু বড় অপরাধী নয়।

বিটু একতলায় নেমে চারদিকে চেয়ে দেখল। রাত সাড়ে ন'টা। ভিড়ভাট্টা নেই। দু'জন কনস্টেবল সিঁড়ির মুখে বসে আছে।

বিটু তাদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল। তাকে কেউ তেমন গ্রাহ্য করল না।

রাস্তায় নেমে সে দেখল, রিকশা চলছে। বিকেলে ওরা একটা মিছিল করেছিল ঠিকই। তবে ধর্মঘট হয়নি। সে একটা রিকশা থামাল। ছেলেটা চেনা, মন্টু।

বাড়িতে পৌঁছে দে।

মন্টু অবাক হয়ে বলল, আরে বিটুদা! আপনার কী হয়েছে?

ইট লেগেছে। সে অনেক কথা। দারুণ খিদে পেয়েছে। চালা।

মন্টু জোরে চালাতে গেল। কিন্তু পয়লা ঝাঁকুনিতেই মাথাটা ঝন করে ওঠায় বিটু ককিয়ে উঠে বলল, একটু আস্তে। ঝাঁকুনি লাগলে ফের হেমারাজ হবে রে।

পিন্টু যখন ফিরল তখন সুমনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ রে, কী সব শুনছি?

কী শুনছ?

বিটু আর ঝিন্টুর কী হয়েছে?

পিন্টু মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু না। লাটু গুন্ডা নাকি একটু হামলা করেছিল। অল্প চোট লেগেছে।

ওরা কি হাসপাতালে?

হ্যাঁ। কাল-পরশুই ছেড়ে দেবে।

তা হলে তো ভালরকমই চোট লেগেছে। আমাকে সব কথা খুলে বলবি?

বললেই তো কাঁদতে-টাঁদতে শুরু করবে।

আমি তত নরম মেয়ে নাকি রে? তোদের মতো চার-চারটে গুন্ডাকে পেটে ধরতে হয়েছে। মারদাঙ্গা কম করেছিস তোরা? এখন বুক শক্ত হয়ে গেছে। বল তো কী হয়েছিল?

লাটু ইট মেরেছিল বিটুকে।

কেন?

অনেকদিন ধরেই রাগ জমে আছে। পিছনে কিছু টাকাওয়ালা লোক আছে। তারাই কাজটা করিয়েছে।

আর ঝিন্টু?

ওটার তো কাণ্ডজ্ঞান নেই। খালি হাতে লাটুর সঙ্গে লড়তে গেছে।

লাটু কে?

একটা উঠতি মস্তান।

তার ঘাড়টা তোরা মুচড়ে ভেঙে দিতে পাবিস না?

দেব। গা-ঢাকা দিয়েছে। তুমি ভেবো না মা।

ঘটনাটা তোর গৌর কাকা জানে?

গৌরকা সব জানে। এ শহরে যা যখন হয় গৌরকা তখনই জেনে যায়।

তার হাতে তো অনেক লোক।

পিন্টু মাকে একরকম টেনে ঘরে এনে বলল, তুমি আজ খুব রেগে আছ মা।

সুমনা রাগে গমগম করছেন। আর দু'চোখ জলে ভরা। সোফায় বসে বললেন, আমার দু'-দুটো ছেলেকে যে মেরেছে তাকে কি সহজে ছেড়ে দেব? তুই একটা রিকশা ডাক, আমি হাসপাতালে যাব।

ডাকছি। খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও। আজ বহুত পেরাসনি গেছে। বিটু সেই রিকশাওয়ালাকে মেরেছিল বলে দারুণ গণ্ডগোল। শেষে ইউনিয়নের নেতা-ক্রেতাকে ধরে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছি।

সুমনা উঠে ছেলেকে খাবার বেড়ে দিয়ে বললেন, তোরা আর আমাকে শান্তি দিলি না। আজ আমার একটা নাতি হল, তা আনন্দ আর করব কখন? সন্ধেবেলা গিয়ে একটু দেখে আসা উচিত ছিল।

পিন্টু চটপট খেয়ে উঠে পড়ল।

বেরোবার মুখেই একটা রিকশা এসে থামল বাড়ির সামনে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা বিটু নেমে দাঁড়াল।

মা!

সুমনা ছেলের দিকে চেয়ে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

বিটুই এসে মাকে ধরল, কাঁদছ কেন? কিছু হয়নি আমার। দেখো না, হাসপাতাল থেকে চলে এলাম।

মাতৃভক্ত বিটুকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন সুমনা।

১৮

আউটডোরে আজ প্রচণ্ড ভিড়। ডাক্তার বাসুর হিমশিম অবস্থা। এক-একদিন রোগ ভোগ দুর্ঘটনা এত বেড়ে যায় যে, দম ফেলার সময় থাকে না।

ডাক্তার বাসু তবু এই পেশাটিকে উপভোগ করেন। কদাচিৎ কোনও রুগি রোগমুক্ত হয়ে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসে। সেরকম ঘটনা ঘটেই না। মানুষ স্বভাবত অকৃতজ্ঞ। মানুষ স্বভাবত বিস্মৃতিপরায়ণ। কিন্তু ডাক্তার-- একজন সত্যিকারের ডাক্তার সর্বদাই উপভোগ করতে পারেন নানা বিচিত্র রোগভোগের সঙ্গে তাঁর লড়াই।

ডাক্তার বাসুদেব আজ ক্লান্ত ছিলেন। আজকাল ক্লান্তি ক্রমেই বাড়ছে। মানুষের রোগভোগ নিয়ে তাঁর চিন্তা প্রবল বটে, কিন্তু নিজের শরীরের খবর অনেককাল নেওয়া হয়নি।

হাসপাতালে আর বেড খালি নেই। তবু অন্তত ছ'জন রুগি ভর্তি করা একান্ত দরকার। তার মধ্যে দুটো বোধহয় ক্রিমিন্যাল কেস। তবু চেষ্টা করা যেত। কিন্তু জায়গা না থাকলে কী করতে পারেন বাসু? বেড নেই, মেঝেতেও আর জায়গা নেই। অন্তত আরও শ খানেক বেড যদি পাওয়া যেত। কত লোককে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে রোজ।

ডাক্তারের ক্লান্তি কেন এত গভীর তা মানুষ বুঝতে পারবে না। ডাক্তার বাসু কতকাল যে ভাল করে ঘুমোননি, কতকাল পুষ্টিকর খাবার খাননি, কোনও আমোদ প্রমোদ করেননি, একটাও সিনেমা দেখেননি, গান শোনেননি। শুধু রোগ আর রোগ তাঁকে ঘিরে আছে চব্বিশ ঘণ্টা।

মাঝরাতে টেলিফোন পেয়ে চলে আসতে হয় বিছানা ছেড়ে। হাসপাতালে, নার্সিং হোম-এ। বিয়ে করেননি বলে বাঁচোয়া, নইলে বোধহয় বউ ডিভোর্স করত।

আউটডোরের সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও আজ বাসু রুগি দেখে গেলেন আরও ঘণ্টাখানেক। এরপর হাসপাতালে দু'টি এবং নার্সিং হোম-এ একটি জরুরি অপারেশন। দুপুরে আজ খাওয়া জুটবে না হয়তো। ব্রেকফাস্ট বলতে দুটো টোস্ট আর সঙ্গে কালো কফি। পেটের মধ্যে একটা অস্বস্তি হচ্ছে কখন থেকে। তবু এই খিদের কষ্টটা সহ্য করতে হবে। খালি পেটে ডাক্তার বাসুদেব অপারেশন ভাল করেন।

শেষ রুগিকে বিদেয় করে উঠতে যাবেন, হঠাৎ দেখলেন, লম্বা বেঞ্চের একটি প্রান্তে সপ্রতিভ সুন্দরী এক তরুণীকে।

চিনতে পেরে একটু হাসলেন বাসু। আরে! আপনি কখন?

ঘণ্টা দেড়েক ধরে বসে আছি, যদি আপনার চোখে পড়ে।

বাসু লজ্জিত ভাবে বললেন, বড্ড ভিড় ছিল আজ। একটু যদি আওয়াজ দিতেন!

শচী উঠে এসে মুখোমুখি বসে বলল, ডিস্টার্ব করা উচিত নয় বলে করিনি। একজন ব্যস্ত ডাক্তারকে অন্যমনস্ক করে দিলে রুগির বিপদ। আমার দরকারটা তেমন জরুরিও নয়।

বলুন কী করতে পারি?

আমি সেই রিকশাওয়ালাটার জন্য কিছু ফলটল এনেছিলাম। পাঠিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে দু'-একটা ওষুধ।

ভাল করেছেন।

কাল বিটু আর ঝিন্টুদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পুলিশে খবর দিয়েছি বলে ওরা খুব অসন্তুষ্ট।

বাসু হাসলেন, জানি।

আমার কি আর কিছু করার আছে?

১৯

দিন সাতেক বাদে এক সন্ধেবেলা ব্রহ্মকুমার তাঁর অফিসঘরে মক্কেলদের সঙ্গে মোকদ্দমা নিয়ে তুমুল আলোচনায় ব্যস্ত, সুমনা রান্নাঘরে তাঁর নিজের জায়গায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা। কোণের একখানা ঘরে মশারির নীচে সোমা কাত হয়ে শুয়ে তার নবজাতকের মুখখানা নিবিড় চোখে দেখছে আর দেখছে। নিষ্পলক। আশা যেন আর মিটতেই চায় না। মঞ্জরী তার নিজের ঘর গোছাচ্ছিল, সাহায্য করছিল জনার্দন। দিন কয়েক বাপের বাড়িতে যেতে হয়েছিল মায়ের অসুখের খবর পেয়ে। মা এ যাত্রা বাঁচল। ঘরদোর সৃষ্টিছাড়া নোংরা হয়ে রয়েছে কয়দিনে। মন্টু, বিটু, পিন্টু, ঝিন্টু কেউ বাড়িতে নেই। এ সময়ে থাকেও না।

ব্রহ্মকুমার এক মক্কেলকে খুব ধমকাচ্ছিলেন। সে এক ঝুড়ি কচু নিয়ে এসেছে উকিলবাবুর জন্য। নিতান্ত গেঁয়ো লোক। যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে। কিন্তু কচু দেখে মেজাজটা ব্রহ্মকুমারের বিগড়েছে। তিনি কচু দু'চোখে দেখতে পারেন না। ছেলেরাও পছন্দ করে না। কে খাবে?

ব্রহ্মকুমার বলছিলেন, এ কি কচু খাওয়ার সিজন হে? ওসব তুমি নিয়ে যাও। আমাদের হেঁসেলে ওসবের বিশেষ চলন নেই।

বলতে বলতে ব্রহ্মকুমারের হঠাৎ মনে হল, শরীরের মধ্যে একটা কী যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন একটু বে-এক্কেয়ার লাগছে মাথাটা। উনষাট বছর বয়সের কথা খেয়াল থাকে না সবসময়। এখন হঠাৎ খেয়াল হল।

উকিলবাবু! আপনার কি শরীর খারাপ?

ব্রহ্মকুমার কথাটার জবাব দিলেন না। মাথাটা চড়াত করে একটা পাক খেল। টেবিলটা দু'হাতে

ধরে সামাল দিলেন। তারপর তাঁর মনে হল, দুনিয়ার খেলা তাঁর দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। শরীরে একটা ঘাম দিচ্ছে। মাথাটা খুব দ্রুত আর-একটা চক্কর দিতেই চোখ অন্ধকার হয়ে গেল।

মাথাটা আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মকুমার আর দেরি করলেন না। উঠে দাঁড়ালেন।

দু'জন মক্কেল এসে তাড়াতাড়ি ধরল দু'দিক দিয়ে, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।

ব্রহ্মকুমার ভিতরবাড়িতে আসতেই প্রথম চেঁচাল জনার্দন, বাবামশাইয়ের কী হয়েছে?

তারপর দৌড়ে এলেন সুমনা।

ব্রহ্মকুমার বিছানায় শুয়ে কলকল করে ঘামছেন। হাঁসফাঁস করছেন। চোখের দৃষ্টি যেন কেমনধারা।

কোনওরকমে বললেন, ছেলেদের খবর পাঠাও। আর বেশিক্ষণ নয়।

সুমনা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। মঞ্জরী কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জনার্দন ছুটল দাদাদের খবর দিতে। একজন মক্কেল নিজের গরজেই বলল, আমার মোটরবাইক আছে, বাসু ডাক্তারকে ধরে আনি গিয়ে।

খুব কষ্টে দেয়াল ধরে ধরে উঠে এল সোমা।

বাবা! আপনার কী হয়েছে?

যাচ্ছি মা। ভাল থেকো।

সোমা তার নিজের মতো করে শ্বশুরকে ভালবাসে। সে উবু হয়ে বসে কাঁদতে লাগল।

ব্রহ্মকুমার আর-একটা চক্করে পড়লেন। চোখে ধাঁধা দেখছেন। মাকড়সার জাল যেন আবছা করে দিয়েছে দৃষ্টি। ওপরে পাখা ঘুরছে, কিন্তু তিনি বাতাস টের পাচ্ছেন না।

সুমনা মাথায় গলায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রহ্মকুমার স্ত্রীর দিকে চাইলেন, তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না। যা আছে সব দেখে রেখো।

এরকম করছ কেন? কেন ওসব ভাবছ?

টের পাচ্ছি। মানুষ মৃত্যুকে খুব টের পায়। একটু জল দাও, বড্ড তেষ্টা।

অনেকটা জল খেলেন ব্রহ্মকুমার।

মঞ্জরী বেরিয়ে গেল, একে ওকে খবর দিতে। বাচ্চা কাঁদছে বলে সোমাকেও যেতে হল।

ফাঁকা ঘর পেয়ে ব্রহ্মকুমার বললেন, শোনো সুমনা, আমার কাছে কিছু গোপন নেই। বিটু আমার ছেলে নয়, জানি। তবু তাকে কখনও অনাদর করিনি। করেছি বলো? তোমাকেও কখনও...

সুমনার পায়ের নীচে মাটি দুলে উঠল, মাথায় বজ্রপাত ঘটতে লাগল মুহুর্মুহু।

শেষ সময়টায় অসত্যের আড়ালটা সরিয়ে দিলাম। তোমাকে জানানো দরকার যে আমি সব জানি। ক্ষমা করেছি।

সুমনা এমন স্থির ও ঠান্ডা হয়ে গেলেন যে তাঁকে প্রস্তরমূর্তির মতো মনে হচ্ছিল।

ব্রহ্মকুমার চোখ বুজলেন। তলিয়ে যাচ্ছেন, কোথায় যেন এক গভীর গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন, নিরালম্ব বায়ুভূত, মরার পর কী হবে তা বুঝতে পারছেন না। অস্ফুট একটা চিৎকার করলেন, আঃ...

সুমনার চটকা ভাঙল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, কী হল? কী হল তোমার?

চোখ থেকে টপ টপ করে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ল ব্রহ্মকুমারের মুখের ওপর। ব্রহ্মকুমার সাড়া দিলেন না।

সাইকেলের একটা ঘন্টির শব্দ হল। তারপরই বাড়ি কাঁপিয়ে ঝিন্টু ঢুকল ঘরে।

বাবা! বাবার কী হয়েছে? এঃ এ তো সিরিয়াস অবস্থা দেখছি!— বলেই ঝিন্টু আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

খবর পেয়ে দ্বিতীয়জন যে এল সে বিটু। লাভ স্টোর্সে এখন খদ্দেরের দারুণ ভিড়। তার মধ্যেই জনার্দন গিয়ে খবর দিল বাবামশাইয়ের সাংঘাতিক অবস্থা।

বিটুর বিশ্বাস ছিল তার বাবা ব্রহ্মকুমারের আয়ু খুব দীর্ঘ, অসুখ বিসুখ কখনওই করে না। সে প্রথমটায় খবরটা বিশ্বাসই করেনি।

কিন্তু ব্রহ্মকুমারের ঘর্মাক্ত মুখ, শ্বাসকষ্ট আর শরীরের পাক খাওয়া দেখে সেও কেমন হয়ে গেল। তার মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ।

মন্টুকে খবর দিতে পারেনি জনার্দন। সে একটা এনকোয়ারিতে বাইরে গেছে। পিন্টুরও কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। বোধহয় সে একটা মোকদ্দমা তার বাবার হয়ে লড়তে জলপাইগুড়ি গেছে!

জনার্দন হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে বলল, গৌর কন্ট্রাক্টরকে খবর দিয়ে এসেছি, দুই দাদাকে পেলাম না।

সুমনা বিপন্ন চোখে চেয়ে রইলেন, কী করবেন? তাঁর তো কিছু করার নেই।

মোটরবাইকের শব্দ তুলে মক্কেল ফিরে এল।

বাসু ডাক্তার কল-এ বেরিয়েছে। অন্য ডাক্তার কাউকে কাছেপিঠে ধরতে পারলাম না। তবে বাসুর বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছি। আমি বলি কী, নার্সিং হোম বা হাসপাতালে নিলে ভাল হয়।

সুমনা বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, কী করবি?

বিটু মাথা নাড়ল, দেখছি।

বাসু এলেন বিটু বেরোবার মুখেই, স্কুটারটা ধীরেসুস্থে স্ট্যান্ডে খাড়া করে ঢুকলেন ঘরে। মুখটা বরাবরই গম্ভীর আর হাস্যহীন। বাসুর ওপরেই যেন দুনিয়ার সব ভার চেপে আছে। লোকটাকে তেমন পছন্দ করে না বিটু। অনেকেই করে না। কিন্তু ডাক্তার ভাল। দারুণ ভাল। বাসু একটিও কথা না বলে ব্রহ্মকুমারকে পরীক্ষা করতে লাগল।

নাড়ি, বুক, প্রেশার।

আর সেই সময়টুকু সকলের চোখ নিষ্পলক চেয়ে রইল বাসুর দিকে।

ডাক্তার বাসুদেব ব্যানার্জি কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন ভগবান। ভাগ্যনিয়ন্তা। ভাবীকাল।

ব্রহ্মকুমারের সঠিক জ্ঞান ছিল না। মাঝে মাঝে অস্ফুট আওয়াজ করছিলেন। সেই সঙ্গে শরীরটা মোচড় খাচ্ছে মাঝে মাঝে।

বাসু নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে একটা অ্যাম্পুল বের করলেন। ইনজেকশান ভরলেন। তারপর ওষুধটা ঠেলে দিলেন ব্রহ্মকুমারের হাতে।

হাসিমুখে সুমনার দিকে চাইলেন তারপর।

সুমনাও চেয়ে আছেন, কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় হচ্ছে।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, অতটা গম্ভীর হওয়ার কিছু নেই। কিছুই তেমন হয়নি ওঁর। পেটে প্রচুর গ্যাস। তাই থেকে প্রেশার বেড়েছে। রাতটা ঘুমোতে দিন। কাল সকালে আমি আবার আসব।

কোনও ভয় নেই?

না, তবে ডিমেনশিয়া হতে পারে। হয়তো একটু স্মৃতিভ্রংশ ঘটবে, তবে সাময়িক। ভয় পাবেন না। এসব কেস-এ হয়।

বাসু উঠলেন। ক্লান্ত, ধীর পায়ে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সুমনা ব্রহ্মকুমারের মশারিটা টাঙাতে টাঙাতে বিটুকে বললেন, আর কাউকে ডাকবি?

বিটু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি চাইলে ডাকতে পারি, কিন্তু বাসুর ওপর ডাক্তার নেই।

জানি। তবু কেমন যেন মনে হয়, শুধু গ্যাস থেকে কি এতটা হবে?

ডাক্তারির আমিও তো কিছু জানি না মা। কী বলব?

সুমনা মশারি গুঁজলেন। বাসু প্রেসক্রিপশন রেখে গেছেন একটা। সেটা বিটুর হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে আয়।

বিটু বেরিয়ে গেল।

সুমনা পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জিপের নির্ভুল শব্দ শুনতে পেলেন। বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল, গৌর আসছে।

জিপটা থামতেই গৌর লাফ দিয়ে নামল।

কী খবর?

ভাল।

জনার্দন যে গিয়ে বলল, শেষ অবস্থা!

না। সিরিয়াস কিছু নয়। বাসু ডাক্তার দেখে গেছে।

বাসু! ওঃ তা হলে চিন্তা নেই।

আমার একটু কথা আছে।

কথা! বলো।

ঘরে এসো। আমার ঘরে।

গৌরকে নিজের ঘরে এনে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলেন সুমনা।

সর্বনাশ হয়েছে।

কী সর্বনাশ হয়েছে সুমনা?

ও তো সব জানে।

কে? ব্রহ্ম?

হ্যাঁ।

গৌর হঠাৎ হেসে উঠল, জানবে না কেন?

তার মানে?

গৌর সুমনার দিকে হাসিমুখেই চেয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, সব কি গোপন করা যায় সুমনা?

তার মানে?

ব্রহ্ম একদিন আমাকে বলেছিল।

কী বলেছিল?

সে অনেক কথা। সব তোমার শুনে কাজ নেই। কিন্তু তোমার বর আমাকে চার্জ করেনি, রাগ দেখাননি, কিছু না। শুধু সে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে সব জানে বা আন্দাজ করে।

সুমনার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে।

আমার তা হলে কী হবে? কী করে ওর ঘর করব?

যেমন করছ তেমনই করবে। কিছু ইতরবিশেষ হবে না। ব্রহ্মও তো জানে, সে তোমাকে সময় দিতে পারে না, বেচারার প্রেম ভালবাসাটাও আসে না, অ্যান্টিরোমান্টিক লোক। হি ইজ এ ডিফল্টার অ্যাজ এ হাজব্যান্ড। সুতরাং তার বউ যদি সামান্য দ্বিচারিণী হয় তো কী করার আছে?

কিন্তু আমি? আমি কী করে ওকে মুখ দেখাব?

পারবে। জীবন তো একটাই, যা পেয়েছ আঁজলা ভরে তুলে নিয়েছ। পাপ-টাপ বলে কিছু নেই সুমনা।

তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন এসব কিছুই নয়। এরকম হওয়াই বুঝি স্বাভাবিক। আমি তোমার বউ হলে বলতে পারতে এ কথা?

গৌর হঠাৎ গম্ভীর হল। চোখ নামিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল, না সুমনা, তুমি

আমার বিবাহিতা স্ত্রী হলে হয়তো এরকম উদার হতে পারতাম না। সেদিক দিয়ে ব্রহ্ম অনেক বড় মাপের মানুষ। কিন্তু কেন পারতাম না জানো? তুমি বলেই। আর তোমার সঙ্গে যে পরকীয়া করেছি তারও কারণ হল, তোমাকে আমার হাফ-বউ বলেই তো ধরতে হয়। একটু সময়ের গণ্ডগোলে পিছলে গেল লগ্নটা, নইলে—

সুমনার চোখে টলটল করছে জল, যদি বিটু কখনও জানতে পারে?

গৌর উদার গলায় বলল, আজকালকার ছেলে তাদের মানসিকতা আলাদা। হয়তো স্পোর্টিংলিই নেবে। আমার তো মনে হয়, বিটু অলরেডি এরকম কিছু আন্দাজও করেছে।

সুমনা চোখ কপালে তুলে বলেন, সে কী! আমি তা হলে মরে যাব। বুঝলে? মরে যাব।

গৌর একটু তিক্ত মুখ করে বলে, শোনো সুমনা, গোপন করার লজ্জা আর ভয় বড় মারাত্মক। ওই টেনশন সহ্য করা যায় না, তার চেয়ে জানাজানি হয়ে গেলে খোলসা হওয়া যায়।

বিটু তোমাকে কী বলেছে?

মাঝে মাঝেই তো বলে, গৌরকা তুমি আমার বাবা হলে বেশ হত।

তুমি কি কখনও কিছু বলেছ?

না। আমি কি পাগল?

তা হলে?

বিটুর মুখ সে তো নিজেও দেখতে পায়। ও-মুখে কার ছাপ আছে তা কি এতই কঠিন যে ধরা যায় না?

যায়? আমি তো ওর মুখে আমার ছাপ দেখি।

সেও আছে। দু'জনেই আছি আমরা বিটুর ভিতরে।

সুমনা কথা বলতে পারলেন না। মুখ চাপা দিলেন আঁচলে।

গৌর বলল, বয়স হয়ে গেল সুমনা, এসব নিয়ে আর খামোখা মন খারাপ কোরো না। যা ভাল মনে হয়েছিল করেছি। এখন যা হওয়ার হবে। আমরা তো আর বেশিদিন থাকব না।

তুমি বুঝবে না মায়ের কতখানি লজ্জা সন্তানের কাছে।

লজ্জা একটু তো থাকবেই। তোমরা সামাজিক মানুষ। কিন্তু আমার ওসব নেই। আমি বাস করি আদিম পৃথিবীর মানসিকতায়। তখন বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানই ছিল না। সকলেই সকলের ভোগ্য আর ভোগ্যা ছিল। আমার সমাজ নেই।

অনেকক্ষণ হল দরজা বন্ধ করে আছেন। আর ভাল দেখায় না। সুমনা গিয়ে ছিটকিনিতে হাত দিলেন।

তাঁর হাতের ওপর গৌরের হাত এসে পড়ল।

বড্ড গা ঘেঁষে উত্তপ্ত লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

কী হল? দরজা খুলতে দাও।

দাঁড়াও, শেষ পাপটুকু করে নিই।

এই বলে হঠাৎ সুমনার ওষ্ঠাধরে চুম্বন করে গৌর। দীর্ঘ প্রগাঢ় এক চুম্বন।

সুমনা বাধা দিলেন না। কোনওদিনই দেননি। দু'জন পুরুষের মধ্যে তিনি বরাবর দ্বিধাবিভক্ত। কার পাল্লা ভারী বলা মুশকিল।

গৌর বলল, শোনো সুমনা, ম'রো না। তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে একটা কিছু কাণ্ড করার কথা ভাবছ। ম'রো না, প্লিজ। তুমি মরলে আমাকেও মরতে হয়। তোমাকে আমি বড্ড বেশি ভালবাসি।

সুমনা এ কথার জবাব দিলেন না। দরজা খুললেন।

সামনেই মঞ্জরী দাঁড়ানো, মুখটা কেমন যেন।

সুমনা লজ্জা পেলেন না। মাথা উঁচুতে রেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবে?
বাবা কি কিছুই খাবেন না?
না।
ড্রিপ দিতে লোক এসেছে। বাসু পাঠিয়ে দিয়েছেন।
চলো যাচ্ছি।
যখন স্বামীর বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন সুমনা তখনও নিজেকে অশুচি লাগল না তাঁর। দু'জন লোক স্ট্যান্ডে বোতল ঝুলিয়ে ব্রহ্মকুমারের হাতে ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল। ফোঁটা ফোঁটা ড্রিপ চলে যেতে লাগল শরীরে।
সুমনা শুনতে পেলেন, বাইরের ঘরে গৌর উঁচু গলায় কথা বলছে বিটুর সঙ্গে। তারপর জিপগাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হল। গাড়িটা বহুদূর চলে গেল।
সুমনা ভাবলেন, মরব কেন? শেষ পর্যন্ত দেখব। তারপর মরণ তো আছেই, কে খণ্ডাবে?
ট্যাঁ করে কেঁদে উঠল নবজাতক। একটু হাসলেন সুমনা। এই সংসার ছেড়ে কোথায় যাবেন তিনি?

২০

ডাঃ ব্যানার্জি।
বাসু টেবিল থেকে উপরে মুখখানা তুললেন। আউটডোর শেষ করে রাউন্ড সেরে এসে ফাঁকা ঘরটায় বসেছিলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলতে পারেন না।
সামনে দাঁড়িয়ে শচী।
আরে আপনি? কী খবর?
আমি আপনার খবর নিতে এসেছি। কেমন আছেন সত্যি করে বলুন তো!
আমি! আমি তো অ্যাবসোলিউটলি ভাল আছি।
শচী মাথা নেড়ে বলল, না, আপনি ভাল নেই।
কে বলল?
আমিই বলছি।
বাসু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু নয়। একটু টায়ার্ড এই যা।
আপনি বড্ড খাটেন।
একটু খাটতে তো হয়ই।
কেন?
এ দেশে কিছু লোক ক্রনিক অলস। তাই বাকি কিছু লোককে ডবল খাটতে হয়। উপায় নেই। বসুন।
বসব না। আপনার তো ছুটি হয়ে গেছে, এবার উঠুন।
উঠব? কোথায় যেতে হবে?
বাড়ি।
বাসু হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, সেখানেই বা কী আছে? একজন চাকর। ব্যস।
শচী গম্ভীর হয়ে বলল, ডাক্তার ব্যানার্জি, আপনি নিজেকে শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু সেটা বুঝতে পারছেন না।
খাটলে কি লোকে শেষ হয়? আমি তো কাজের মধ্যেই বেশ থাকি।

আর কাজ নয়। বিশ্রাম। উঠুন।

দাঁড়ান মিস চক্রবর্তী। এখনও একটা ভিজিট বাকি। ব্রহ্মকুমার গাঙ্গুলি ইজ সিক। আজ সকালে তাকে দেখতে যাওয়ার কথা। আউটডোর থাকায় সকালে হয়ে ওঠেনি।

শচী অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বিয়ে করলে আপনার বউ নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত।

বাসুদেব হাসলেন। শরীরটাকে টেনে দাঁড় করাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

টায়ার্ড। ভীষণ টায়ার্ড।

মিস চক্রবর্তী, কোনও দরকার ছিল কি?

শচী গম্ভীর মুখে বলল, ছিল। কিন্তু আপনাকে দেখে ভারী মায়া হচ্ছে। যাক, পরে বলা যাবে।

বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, হাতে এখনও কিছু সময় আছে। বলুন না!

আপনার রুগি আগে! দেখে আসুন।

এসে তো আর আপনাকে পাব না।

শচী মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, সাধারণ মেয়েদের মতো আমার বিশেষ লজ্জা-টজ্জা নেই। আমি একসময়ে একস্ট্রিমিস্ট ছিলাম, জানেন কি?

জানি।

অ্যাকশনে ছিলাম।

তাও জানি।

আমি একটি ছেলের সঙ্গে ইনভলভড হয়েছিলাম তখন। পুলিশ তাকে গুলি করে মারে। আমার দু'হাতের মধ্যেই সে মারা যায়।

এটা জানতাম না। সরি।

শচী মাথা নেড়ে বলল, আমার সেন্টিমেন্ট নেই। যা হয়েছে তা হয়েছে। আমি বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে ভালবাসি।

বাসু চুপ করে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, বর্তমান মানেই হচ্ছে অতীতের ক্রম-পরিণতি। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমানকে মানা যায় না। ওটা ক্রনোলজিক্যাল নয়, সায়েন্টিফিক নয়।

স্বীকার করছি। কিন্তু আমার মানসিকতা ওইরকম।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু কথাটা কী?

শচী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, আজ থাক। কথাটা আর একদিন হবে।

বাসুদেব আপত্তি করলেন না। অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে বললেন, কিন্তু বলবেন। ভুলে যাবেন না।

শচী মাথা নেড়ে বলল, ভুলব না।

শচী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন বাসু। তারপর স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ব্রহ্মকুমার আজ ভাল আছেন। মুখ-চোখ স্বাভাবিক। রক্তচাপ নেমে এসেছে। ড্রিপ খুলে নেওয়া হয়েছে।

বাসু সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, খিদে পাচ্ছে তো?

পাচ্ছে।

সব খাবেন। ঝালমশলা কিছু কম। সাতদিন রেস্ট নিন। তারপর পুরোপুরি কাজে নেমে পড়বেন।

আমার যে ইম্পর্ট্যান্ট মামলা আছে ডাক্তার।

পিন্টু তো আছেই। ও দেখবে।

পিন্টু!— বলে চুপ করে রইলেন ব্রহ্মকুমার। তারপর বললেন, বেশ তাই হোক।

বাসুদেব বাড়ি ফেরার পথে টের পেলেন তাঁর মনের মধ্যে একটা গুঞ্জন হচ্ছে। শচী কিছু বলতে চায়। খুব সাধারণ কথা কি? কোনও রোগ? কোনও সমস্যা? কী?

ডাক্তার বাসু বুঝতে পারলেন না।

স্নান করে খেয়ে একটু শুলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা আঠা হয়ে লেগে গেল। আজকাল বড্ড ঘুম পায়।

ঘুমিয়ে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন বাসু। শচীর বিয়ে হয়ে গেছে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে তাঁকে দেখাতে এসেছে। সঙ্গে ছোকরা স্বামী, তার বুকে একটা ছ্যাঁদা। রক্ত পড়ছে। অভ্যাসবশে ডাক্তার বাসু স্বপ্নেও ক্ষতটার দিকে চেয়ে রইলেন। রক্ত দরকার, এর এক্ষুনি রক্ত দরকার।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন বাসু। মাথাটা বড্ড ঝিমঝিম করছে। উঠে কিছু না ভেবেচিন্তেই পোশাক পরলেন।

চাকর এসে বলল, বাবু বেরোচ্ছেন?

হ্যাঁ। ফিরতে রাত হবে।

স্কুটারে তেল ভরে নিলেন পেট্রল পাম্প থেকে। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অনেকটা দূর।

শেষ দুপুরে রাস্তায় তেমন ট্র্যাফিক নেই। বাসুদেব বিনা বাধায় চলে এলেন ক্যাম্পাসে। দু'-চারজনকে জিজ্ঞেস করে শচীর কোয়ার্টারের হদিশ পাওয়া গেল। একটা বিল্ডিং-এর দোতলায় দু'ঘরের ফ্ল্যাট।

দরজা খোলা। পরদা ঝুলছে।

আসতে পারি?

জবাব নেই।

আসতে পারি?

জবাব নেই।

বাসু পরদাটা সরালেন। ভিতরে কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। বাসু ঢুকলেন।

অজস্র বই আর বই। বিছানা, জামাকাপড়, রূপটান কোনওটাই তেমন গুছিয়ে রাখা নয়। তবু মেয়েলি ঘর বোঝা যায়।

বাসু বিছানার ওপরেই বসলেন। একটা হাই উঠল। দুটো, তিনটে। বাসুর আজকাল এটা হয়। কোথাও বসলেই ঘুম পায়। ভীষণ ঘুম। বাসু কখন ঘুমিয়ে পড়লেন টেরই পেলেন না।

শচী গিয়েছিল বাগানে। বাসার পিছন দিকে ফাঁকা জমিতে সে বাগান করেছে। একগোছা গোলাপ হাতে ঘরে ঢুকেই সে থমকাল। বুকটা কি ধক করে উঠল তার?

তারপর সে একটু হাসল। গোলাপগুলো টেবিলে ছুড়ে দিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে বাসুর জুতোজোড়া খুলে পা দুটো তুলে দিল বিছানায়। তারপর মায়াভরে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আপনমনে বলল, ওর চিকিৎসা কে করে তার ঠিক নেই! উনি আবার পরের চিকিৎসা করবেন!

বাসু গভীরতর ঘুমে তলিয়ে গেছেন। কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত।

শচী গিয়ে দরজাটায় ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর বাসুর দিকে চেয়ে মুখ টিপে একটু হাসল।

বাসুর চেতনা থাকলে হাসিটার গভীর অর্থ অন্যমনস্ক বাসুরও বুঝতে ভুল হত না।

বিকেলের মৃত্যু

সাহেবরা বলে লাঞ্চ, কেরানিরা বলে টিফিন। সে যাই হোক, ঠিক দুপুরবেলা একটু আলগা সময় পাওয়া যায়। এই সময়টা বসে বসে শশা, ছোলাসেদ্ধ আর টোস্ট খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ থাকে না লীনার। তার সিট ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। সাহেবের সেক্রেটারি হওয়ার অনেক ঝামেলা। বেশিক্ষণ দূরে, আউট অফ ইয়ারশট থাকার নিয়ম নেই, সব সময়েই একটা কাঁটাওয়ালা চেয়ারে বসে থাকার মতো।

লীনা ঘড়ি দেখে টিফিন-টাইম শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে সবে তার স্টেনলেস স্টিলের টিফিন-বাক্সটা খুলেছে, এমন সময় ইন্টারকম বাজল।

সাহেবের গলা, একটু আসুন তো।

লীনা উঠে সুইং-ডোর খুলে ঢুকল। সাহেবের ঘরটা বিশাল বড়। দেয়াল থেকে দেয়াল অবধি মেজে জোড়া নরম মেজেন্টা রঙের কার্পেট। ইংরিজি এল অক্ষরের ছাঁদে মস্ত একটা টেবিল। ওপাশে গাঢ় সবুজ রঙের বড় রিভলভিং চেয়ার।

কিন্তু সাহেব অর্থাৎ ববি রায় অর্থাৎ কোম্পানির একনম্বর ইলেকট্রনিক ম্যাজিসিয়ান এবং দু'নম্বর টপ বস চেয়ারে বসা অবস্থায় নেই। রোগা, কালো, মোটামুটি ছোটখাটো চেহাবার অস্থিরচিত্ত লোকটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। বাইরে বিশেষ কিছু দেখার নেই। এয়ার কন্ডিশনের জন্য কাচে আঁটা জানালা। ওপাশে একটা সরু রাস্তার পরিসর, তারপর আবার বাড়ি। বাড়ি আর বাড়িতে চারদিক কণ্টকিত এই মিডলটন স্ট্রিটে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকার মানেই হয় না।

ইয়েস স্যার।

ববি রায় ফিরে তাকালেন। সকাল থেকে এই অবধি বার চারেক দেখা হয়েছে। চারবারের কোনওবারই মুখে মেঘ ছিল না। এখন আছে। ববি রায় হচ্ছেন সেই মানুষ, যাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছে তাঁর কাজ, তাঁর কম্পিউটার ও অন্যান্য অত্যাশ্চর্য যন্ত্রপাতি, তিনি এতই খ্যাতিমান যে তাঁকে একবার লন্ডন থেকে একরকম কিডন্যাপ করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ববি রায়ের যেতে হয় আমেরিকা থেকে শুরু করে চিন-জাপান অবধি। কখনও শিখতে, কখনও শেখাতে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ববি রায় নিশ্চয়ই কোম্পানির কাছ থেকে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা বেতন বাবদ পান, আরও কয়েক লক্ষ টাকা কোম্পানি হাসিমুখে বহন করে ট্যুর বাবদ। ববি রায় বোধহয় আজও ভেবে ঠিক করতে পারেননি যে, এত টাকা দিয়ে তিনি প্রকৃতই কী করবেন। কোম্পানি তাঁকে লবণ হ্রদে বিশাল বাড়ি করে দিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য গাড়ি এবং দিন-রাতের জন্য দু'জন শফার, কলকাতার সর্বোত্তম নার্সিং হোমে পুরো পরিবারের কোম্পানির খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, টেলিফোন বা ইলেকট্রিকের বিল, গাড়ি সারানোর খরচ কিছুই ববি রায়ের পকেট থেকে যায় না। কোম্পানি তাঁকে শুধু দেয় আর দেয়। কোম্পানি বোকা নয়। ববি রায়ও কোম্পানিকে তেমন কিছু দেন যা কোটি কোটি টাকার দরজা খুলে দিচ্ছে, উন্মোচিত করছে নতুন নতুন দিগন্ত।

দ্বিতীয়বার লীনাকে বলতে হল, স্যার, কিছু বলছিলেন?

বসুন।— গলাটা গম্ভীর।

লীনা অবাক হল। তাকে কখনও ববি রায় বসতে বলেননি।

লোকটার জন্ম ফরাসি দেশে, ভারতীয় দূতাবাসের অফিসার বাবার সূত্রে। জীবনের প্রথম বিশটা বছর কেটেছে বিদেশে। সুতরাং লোকটা যে ভাল বাংলা জানবে না এটা বলাই বাহুল্য। ববি রায় কদাচিৎ মাতৃভাষা বলেন। এবং বলেন অনেকটা সাহেবদের বাংলা বলার মতোই।

বস হিসেবে লোকটা ভাল না মন্দ তা আজও বুঝতে পারেনি লীনা। মাত্র তিন মাস আগে সে এই অতি বৃহৎ মাল্টি-ন্যাশনালে বরাতের জোরে চাকরিটা পেয়ে গেছে। তবে তিন মাসে সে এটা লক্ষ করেছে যে, ববি রায়ের তাকে খুব কমই প্রয়োজন হয়। ববি বছরে বার দশেক বিদেশে যান। ববি রায় ডিকটেশন দেওয়া পছন্দ করেন না। নিজের কাজ ছাড়া বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে লোকটি নিতান্তই অজ্ঞ। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই বিপুল পড়াশুনোর চাপে লোকটির ইন্দ্রলুপ্তি ঘটতে চলেছে। প্রবল রকম অন্যমনস্ক। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা চোখে পড়ে, তা হল লোকটার এক অবিরল অস্থিরতা। লীনা দেখেছে, লোকটা কথা বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে বার বার উঠে পড়েন, টেবিলের উপর রাখা ছাইদানি, পেনসিল বক্স, এটা ওটা বার বার এধার ওধার করেন, বার বার চুলে হাত বোলান, নিজের কান টানেন, নাকের ডগাটা মুঠো করে চেপে ধরেন। এত দায়িত্বশীল এবং উচ্চ পদে আসীন কোনও মানুষের পক্ষে এই অস্থিরতা একটু বেমানান।

এখন ববি রায়কে আরও একটু অস্থির দেখাচ্ছিল। লীনাকে বসতে বলে তিনি চেয়ারের পিছনে অনেকটা পরিসর জুড়ে চঞ্চল এবং দ্রুত পায়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে দু'হাতের মুঠোয় মাথার চুলগুলো চেপে ধরলেন। সিলিং-এর দিকে চোখ।

লীনার মনে হল, এই চঞ্চলমতি লোকটি এইভাবেই চুল টেনে টেনে নিজের মাথায় প্রায় টাক ফেলে দিয়েছেন।

হঠাৎ ববি রায় লীনার দিকে তাকিয়ে অতিশয় বিরক্তির গলায় প্রশ্ন করলেন, হোয়াই গার্লস?

লীনা একেবারে ভোম্বল হয়ে চেয়ে রইল। লোকটা বলে কী রে?

এবার লীনার ফোঁস করার মতো অবস্থা হল। লোকটা বোধহয় তাকে এবং মহিলা সমাজকে অপমান করতে চায়। সে মেরুদণ্ড সোজা করে এবং মুখটা যথেষ্ট ওপরে তুলে বলল, আই ফাইন্ড মেন মোর ডিসগাস্টিং মিস্টার রয়। প্লিজ ওয়াচ হোয়াট ইউ সে।

ববি রায় তেমনি শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। লীনার কথাটা বুঝতে পেরেছেন বলেই মনে হল না। কিন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং অস্বচ্ছন্দ বাংলা বললেন, আপনার মেয়ে হওয়ার কী দরকার ছিল? অ্যাঁ! হোয়াই আই অলওয়েজ গেট এ গার্ল অ্যাজ সেক্রেটারি?

এরকম প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে লীনা খুব দুরূহ কল্পনাতেও তা আন্দাজ করতে পারে না। এত অবাক হল সে যে জুতসই দূরের কথা, কোনও জবাবই দিতে পারল না।

ববি রায় আচমকা লীনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং পিছন ফিরে সোজা জানালা বরাবর হেঁটে যেতে যেতে বললেন, ইট গিভস মি ক্রিপস হোয়েনএভার দেয়ার ইজ এ গার্ল ডুয়িং মেনস জব।

লীনা এবার যথেষ্ট উত্তপ্ত হল এবং সপাটে বলল, ইউ আর এ মেল-শৌভিনিস্ট। ইউ আর এ-এ..

ববি রায় ফের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজের প্রস্তরমূর্তির মতো। মিনিটখানেক শব্দহীন।

লীনা উঠতে যাচ্ছিল। লোকটাকে তার এত খারাপ লাগছে!

প্রস্তরমূর্তির থেকে আচমকাই লোকটা ফের স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো ঘুরে দাঁড়ালেন। কী যেন বিড় বিড় করে বকছেন, শোনা যাচ্ছে না। পৃথিবীর মহিলাদের উদ্দেশে কটুকাটব্য নয় তো? হয়তো খুবই অশ্লীল সব শব্দ! লীনা কণ্টকিত হল রাগে, ক্ষোভে এবং অপমানে।

এখন কি তারও উচিত পৃথিবীর অকৃতজ্ঞ পুরুষজাতির উদ্দেশে বিড়বিড় করে কটুকাটব্য করা? কী করবে লীনা? এই অপমানের একটা পালটি নেওয়া যে একান্তই দরকার।

ববি আবার অতি দ্রুত পায়ে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। তারপর টেবিলটার কোণের দিকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। টক করে একটা সুইচ টিপলেন। টেবিলের ওই অংশটায় একটা ভিডিয়ো ইউনিট লুকোনো আছে, লীনা জানে। কমপিউটারের সঙ্গে যুক্ত এই ইউনিটটা বিস্তর তথ্যে ভরা আছে। কিন্তু ববি কী চাইছেন তা লীনা বুঝতে পারছে না।

স্প্রিং-এ ভর দিয়ে খুদে ইউনিটটা ডুবুরির মতো উঠে এল ওপরে।

ববি অতি দ্রুত অভ্যস্ত আঙুলে চাবি টিপলেন। পরদায় ঝিক করে ফুটে উঠল একটা ফটো। নীচে নাম, লীনা ভট্টাচার্য। আবার চাবি টিপলেন ববি। পরদায় হরেক নম্বর আর অক্ষর ফুটে উঠতে লাগল যার মাথামুন্ডু লীনা কিছুই জানে না। সম্ভবত কোড।

ববি ভ্রূ কুঁচকে খুব বিরক্তির চোখে স্ক্রিনের দিকে চেয়ে ছিলেন। কী দেখলেন উনিই জানেন। তবে মুখখানা দেখে মনে হল, যা দেখলেন তাতে মোটেই খুশি হলেন না।

অপমানের বোধ লীনার প্রবল। কারও বায়োডাটা বা ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস তার সামনেই চেক করা কতদূর অভদ্রতা এই লোকটা তাও জানে না। কিংবা ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করতে চাইছে লোকটা!

ববি রায় সুইচ টিপে ভিডিয়ো বন্ধ করে দিলেন এবং সেটা আবার ডুবে গেল টেবিলের তলায়।

ববি রায় মাথা নেড়ে বললেন, দেখা যাচ্ছে একমাত্র মোটরগাড়ি চালাতে জানা ছাড়া আপনি আর তেমন কিছুই জানেন না।

এই নতুন দিক থেকে আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না লীনা। আজ লোকটার হল কী? মাথা-টাথা গন্ডগোল হয়ে যায়নি তো! এইসব উইজার্ডরা পাগলামির সীমানাতেই বাস করে। প্রতিভাবানদের মধ্যে অনেক সময়েই পাগলামির লক্ষণ ভীষণ প্রকট।

কিন্তু কথা হল, লোকটার এত বড় বড় কাজ থাকতে হঠাৎ লীনাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার পড়ল?

লীনা দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্থির করল। প্রতি-আক্রমণ করার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন নিজেকে সংহত, একমুখী ও গনগনে করে তোলা। লীনা একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, মিস্টার বস,—

কিন্তু ববি তার কথা শোনার জন্য মোটেই আগ্রহী নন। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফের জানালার কাছে চলে গেলেন। হাতটা ওখান থেকেই তুলে লীনাকে চুপ থাকবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর পুরো এক মিনিট নীরবতা পালন করে ঘুরে দাঁড়ালেন।

মিসেস ভট্টাচারিয়া, গাড়ি চালানোর রেকর্ডও আপনার খুব খারাপ। গত এক বছরে তিনটে পেনাল্টি। ভেরি ব্যাড। আপনার দাদা একজন এক্স-কনভিক্ট। ইউ লাভ পোয়েট্রি অ্যান্ড মিউজিক। দ্যাটস অফুল। হরিবল। ইউ হ্যাভ ইমোশন্যাল ইনভলভমেন্ট উইথ এ ভ্যাগাবন্ড।

পর পর বজ্রাঘাত হলেও বোধহয় এর চেয়ে বেশি স্তম্ভিত হত না লীনা। তার সমস্ত শরীরটা যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল অপমানে। এমনকী সে মুখ পর্যন্ত খুলতে পারছে না। মনে হচ্ছে, লক জ।

ববি চড়াই পাখির মতো চঞ্চল পায়ে ফের জানালার কাছে চলে গেলেন।

লীনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।

দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে সে বলল, ইউ আর এ স্কাউন্ড্রেল মিস্টার রয়। এ ডাউনরাইট স্কাউন্ড্রেল। আই অ্যাম লিভিং।

ববি রায় কথাটা শুনতে পেলেন বলে মনেই হল না। কোনও বৈলক্ষণ নেই। প্রস্তরমূর্তির মতো আবার নীরবতা।

লীনার শরীর এত কাঁপছিল যে, দরজা অবধি যেতে পারবে কি না সেটাই সন্দেহ হচ্ছে।

ভারী দরজাটা খুলে লীনা প্রায় টলে পড়ে গেল নিজের চেয়ারে। বসে খানিকক্ষণ দম নিল। শরীর জ্বলছে, বুক জ্বলছে, মাথা জ্বলছে। কিছুক্ষণ সে কিছু ভাবতে পারল না। টাইপরাইটারে একটা রিপোর্ট অর্ধেক টাইপ করা ছিল। সেটা টেনে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল লীনা। নতুন দুটো কাগজ কার্বন দিয়ে লোড করল। ইস্তফাপত্র।

কী-বোর্ডে আঙুল তুলতে গিয়েও থমকে গেল লীনা। কী বলছিল লোকটা? গাড়ি চালানোতে তিনবার পেনাল্টি? দাদা এক্স-কনভিক্ট? কবিতা ও গানের প্রতি আসক্তি? একজন ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে প্রেম?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এসব খবর একে কে দিয়েছে? পুলিশও তো এত কিছুর খোঁজ নেয় না কোনও সরকারি কর্মচারীর! এ লোকটা জানল কী করে?

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল লীনা। কী করবে? গিয়ে লোকটার কলার চেপে ধরবে? কী করে জানলেন আপনি এত কথা? আর কেনই বা?

ইন্টারকমটা পিঁ করে বেজে উঠল। লীনা ঘৃণার সঙ্গে তাকাল টেলিফোনটার দিকে। ববি রায় আর কী চায়? আরও অপমানের কিছু বাকি আছে নাকি?

লীনা একবার ভাবল ফোনটা ধরবে না। তারপর ধরল। অত্যন্ত খর গলায় সে বলল, ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। আই অ্যাম লিভিং।

ববি রায় কিছু বললেন না প্রথমে। নীরবতা। গিমিক?

লীনা টেলিফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ববি রায়ের গলা শোনা গেল, একবার ভিতরে আসুন।

না। যথেষ্ট হয়েছে।

খুব ক্লান্ত গলায় ববি বললেন, গার্লস আর সেম এভরিহোয়ার। নেভার সিরিয়াস। অলওয়েজ ইমোশন্যাল।

আপনি মেয়েদের কিছুই জানেন না।

হতে পারে। কিন্তু কথাটা জরুরি। খুব জরুরি।

আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

প্লিজ।

লীনা ঝফাং করে ফোনটা রেখে দিল। একবার ভাবল, যাবে না। তারপর মনে হল, শেষবারের মতো দেখেই যায় ব্যাপারটা।

ববি রায়ের ঘরে ঢুকে লীনা দেখল, প্রশান্ত মুখে লোকটা চেয়ারে বসে আছে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। কিন্তু অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে না।

লোকটা কিছু বলার আগেই লীনা বলল, আপনার কম্পিউটারে আমার সম্পর্কে কয়েকটা ভুল ইনফরমেশন ফিড করা আছে। প্রয়োজন মনে করলে শুধরে নেবেন। প্রথম কথা, আমি মিসেস নই, মিস। আমার দাদা এক্স-কনভিক্ট নন, পোলিটিক্যাল প্রিজনার ছিলেন। আর ভ্যাগাবন্ড—

ববি রায় হাত তুলে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলেন লীনাকে। তারপর বললেন, ইররেলেভেন্ট।

আমি জানতাম না যে, আপনারা আমার পিছনে স্পাইং করেছেন। জানলে কখনও এই কোম্পানিতে জয়েন করতাম না।

ববি রায় অত্যন্ত উদাসীন চোখে চেয়ে ছিলেন লীনার দিকে। বোঝা যাচ্ছিল, লীনার কথা তিনি আদৌ শুনছেন না।

আচমকা লীনার কথার মাঝখানে ববি রায় বলে উঠলেন, ইট ইজ অ্যাবসোলিউটলি এ ম্যানস জব।

তার মানে?

ববি রায় নির্বিকারভাবে সামনের দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু আর তো সম্ভব নয়। সময় এত কম!

আপনি একটা কাজ করবেন মিস্টার রয়?

উঁঃ?

আপনি ইমিডিয়েটলি কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে দেখা করুন। ইউ আর নট উইদিন ইয়োরসেলফ।

ববি রায় লীনার দিকে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে বললেন, না, অত সময় নেই। টাইম ইজ দি মেইন ফ্যাক্টর। দে উইল স্ট্রাইক এনি মোমেন্ট নাউ। নো ওয়ে। নাথিং ডুয়িং।

ইউ হ্যাভ গন আউট অফ ইয়োর রকার।

ববি রায় মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে লীনার কথাটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর আকস্মিকভাবে বললেন, মিসেস ভট্টাচারিয়া—

লীনার প্রতিবাদে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল। তবু সে কণ্ঠ সংযত রেখে বলল, মিসেস নয়, মিস।

মে বি, মিস ভট্টাচারিয়া, আপনি কি বিশ্বাসযোগ্য?

লীনা ডান হাতে কপালটা চেপে ধরে বলল, ওঃ, ইউ আর হরিবল।

প্রশ্নটা খুবই গুরুতর। আপনি কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য?

লীনা ব্যঙ্গ করে বলল, আপনার কম্পিউটার কী বলে?

কম্পিউটার বলছে, ইট ইজ অ্যাবসোলিউটলি এ ম্যানস জব।

হোয়াট জব?

আপনি মোটরবাইক চালাতে জানেন?

না।

ক্যান ইউ রান ফাস্ট?

জানি না।

আপনি কি সাহসী?

আপনার কম্পিউটারকে এসব জিজ্ঞেস করুন।

কম্পিউটারের ওপর রাগ করে লাভ নেই। কাজটা জরুরি! আপনি পারবেন?

লীনার রাগটা পড়ে আসছিল। হঠাৎ তার মনে হল, ববি রায় তাকে সত্যিই কিছু বলতে চাইছেন। কাজটা হয়তো-বা জরুরিও।

লীনা ববি রায়ের দিকে চেয়ে বলল, আপনি সংকেতে কথা বললে আমার পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়।

ববি রায় কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে লীনার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, এখানে নয়। উই মে মিট সামহোয়্যার আউটসাইড দিস অফিস।

তার মানে?

ববি রায় টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে ঝুঁকে বসে বললেন, ওরা এ ঘরে দুটো 'বাগ্' বসিয়ে রেখেছিল।

বাঘ?

বাঘ! আরে না। বাগ্ মানে স্পাইং মাইক্রোফোন। ইলেকট্রনিক।

ওঃ।

আমি দুটো রিমুভ করেছি। কিন্তু আরও দু'-একটা থাকতে পারে। এখানে কথা হবে না।

লীনা ভয়ে বলল, কারা বসিয়েছিল?

জানি না। তবে দে নো দেয়ার জব।

আমাকে কী করতে হবে তা হলে?

একটা জায়গা ঠিক করুন। আজ বিকেল পাঁচটার পর—

না। আমার থিয়েটারের টিকিট কাটা আছে।

ববি থমকে গেলেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর মানুষটার মুখে এক আশ্চর্য হাসি ফুটল। ববিকে কখনও কোনও দিন হাসতে দেখেনি লীনা। সে অবাক হয়ে দেখল, লোকটার হাসি চমৎকার। নিষ্পাপ, সরল।

পরমুহূর্তেই হাসিটা সরিয়ে নিলেন ববি। খুব শান্ত গলায় বললেন, যাবেন। আফটার দি ফিউনারেল।

তার মানে?

আজকের থিয়েটারটা আপনাকে স্কিপ করতে অনুরোধ করছি। যে-কোনও সময়েই ওরা আমাকে খুন করবে। সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমি অনেকদিন ধরেই এসব বিপদ নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু দেয়ার ইজ সামথিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইমিডিয়েটলি আফটার মাই ডেথ।

লীনা এত ভয় খেয়ে গেল যে চোখের পাতা ফেলতে পারল না। লোকটা কি সত্যিই পাগল?

ববি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে বলুন তো! না, দাঁড়ান। এ ঘরে কথা না বলাই ভাল। আপনি একটা কাজ করুন। আমাকে আপনার চেনা জানা কারও ফোন নম্বর একটা কাগজে লিখে দিন, আর আপনি সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। এখন আড়াইটে বাজে। আমি আপনাকে সাড়ে তিনটে নাগাদ ফোন করব।

ব্যাপারটা একটু ড্রামাটিক হয়ে যাচ্ছে না তো?

হচ্ছে। রিয়াল লাইফ ড্রামা। কিন্তু সময় নষ্ট করবেন না। যান।

লীনা উঠল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমার রেজিগনেশন লেটারটা—?

ববি রায় আবার হাসলেন। বললেন, আই অ্যাম রাইটিং মাই ডেথ সেনটেন্স।

লীনা বেরিয়ে এল। ব্যাগ গুছিয়ে নিল। তারপর টেলিফোন নম্বরটা একটা চিরকুটে লিখে যখন ববির ঘরে ঢুকল তখন ববি টেবিলে মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন।

মিস্টার রায়।

ববি মাথা তুললেন না। শুধু হাতটা বাড়ালেন। ভুতুড়ে ভঙ্গি।

লীনা চিরকুটটা হাতে দিতেই হাতটা মুঠো হয়ে গেল।

লীনা করিডোরে বেরিয়ে এল। দু'ধারে বড় অফিসারদের চেম্বার। লাল কার্পেটে মোড়া করিডোর ফাঁকা। দু'-একজন বেয়ারাকে এধার-ওধার করতে দেখা যাচ্ছে। পিতলের টবে বাহারি গাছ।

কেমন গা শিরশির করল লীনার। লিফটে নেমে সে একটা ট্যাক্সি নিল। তারপর সোজা হাজির হল তার বাড়িতে। টেলিফোনের কাছাকাছি চেয়ার টেনে অপেক্ষা করতে লাগল।

ফোনটা এল ঘণ্টাখানেক পর।

মিসেস ভট্টাচারিয়া—

মিসেস নয়, মিস।

কোথায় মিট করব বলুন তো!

রাস্তায়। গড়িয়াহাট রোড আর মেফেয়ার রোডের জংশনে। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।

গুড। ভেরি গুড। পাঁচটায় তা হলে?

হ্যাঁ।

লীনার মনে পড়ল, ববি যখন হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা নিয়েছিলেন তখন হাতটা একটু কাঁপছিল।

॥ ২ ॥

বাড়িটা এত ফাঁকা, এত ধু ধু ফাঁকা যে লীনার কাপ ডিশ ছুড়ে ভাঙতে ইচ্ছে করে।

বেসিনে গিয়ে সে দু'হাত ভরে জল নিয়ে চোখে মুখে প্রবল ঝটকা দিচ্ছিল। মাথাটা ভোম হয়ে আছে, কান জ্বালা করছে, মনটা কাঁদো-কাঁদো করছে। কোনও মানে হয় এর?

লোকটা যে বিটকেল রকমের পাগল তাতে সন্দেহ আছে কোনও? লীনাকে ভয়-টয় খাইয়ে একটা ম্যাসকুলিন আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছে না তো? না কি প্র্যাকটিক্যাল জোক? রঙ্গ-রসিকতার ধারে কাছে বাস করে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু ববি রায় যে একটু চন্দ্রাহত তাতে সন্দেহ নেই।

লীনাদের বাড়িটা দোতলা। গোটা আষ্টেক ঘর। একটু বাগান আছে। এ বাড়িতে প্রাণী বলতে তারা এখন তিনজন। মা, বাবা আর লীনা। দুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না। শুধু রাখাল আর বৈষ্ণবী। তারাই কেয়ারটেকার, তারাই ঝি চাকর, রাঁধুনি। বয়স্কা স্বামী-স্ত্রী, নিঃসন্তান। একতলার পিছন দিকের একখানা ঘরে তারা নিঃশব্দে থাকে। ডাকলে আসে, নইলে আসে না। নিয়ম করে দেওয়া আছে।

শরৎ শেষ হয়ে এল। দুপুরেও আজকাল গরম নেই। রাত্রে একটু শীত পড়ে আর উত্তর দিক থেকে হাওয়া দেয়। লীনা মস্ত তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল, ঘাড় মুছল। ঠান্ডা জলের প্রতিক্রিয়ায় গা একটু শিরশির করছে।

ঘড়িতে পৌনে চারটে। পাঁচটার সময় ববি রায়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। থিয়েটার শুরু হবে সাড়ে ছ'টায়। দেড় ঘণ্টা সময় হাতে থাকছে। তা হলে পাগলা ববি কেন তাকে থিয়েটার বাদ দিতে বলছে?

কে জানে বাবা, লীনা কিছু বুঝতে পারছে না।

দোলন এসে অ্যাকাডেমি-তে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে তার জন্য। দোলনের ফোন নেই। দোলনকে খবর দেওয়ার কোনও উপায় নেই। সিমলের মোড়ে গদাইয়ের চায়ের দোকানে খবর দিয়ে রাখলে সেই খবর দোলন পায়। কিন্তু এখন সেই সিমলে অবধি ঠ্যাঙাবে কে? একটা গাড়ি থাকলেও না হয় হত।

গাড়ি যে নেই এমনও নয়। দু'-দু'খানা গাড়ি তাদের। পুরনো অ্যাম্বাসাডারটা তো ছিলই। সম্প্রতি মারুতিটা এসেছে। কিন্তু সে দু'খানা তার মা আর বাবার। দু'জনেই জবরদস্ত কাজের লোক। লীনার একদা বিপ্লবী দাদা বিপ্লব করতে না-পেরে টাকা রোজগারে মন দিয়েছিল। ভাল ইঞ্জিনিয়ার সে ছিলই। ব্যাবসা করতে নেমেই টুকটাক নানা যোগাযোগে এত দ্রুত বড়লোক হতে লাগল যে, এ বাড়িতে বাপ আর ছেলের মধ্যে শুরু হয়ে গেল চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সোরাব-রুস্তম। তারপর দাদা বিয়ে করল, বিশাল বাড়ি হাঁকড়াল এবং বাপ-মা-বোনকে টা-টা গুডবাই করে চলে গেল। দাদার বোধহয় তিন-চারখানা গাড়ি। একদা-বিপ্লবীকে এখন পেয়েছে এক সাংঘাতিক টাকার নেশা। হিংস্র, একরোখা, কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্থোপার্জন। সেই ভয়ংকরী আকর্ষণের কাছে দুনিয়ার আর সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন তো দূরের কথা, নিজের বউ-বাচ্চার প্রতিও তার কোনও খেয়াল নেই। বিশাল বিশাল কনস্ট্রাকশনের কাজ নিয়ে কলকাতা থেকে সৌদি আরব পর্যন্ত পাড়ি দিচ্ছে। দেশ-বিদেশ ঘুরছে পাগলের মতো। বিপ্লবী দাদাকে পাগলের মতো ভালবাসত লীনা, কিন্তু এই দাদাকে সে চেনেই না।

দাদার কাছে গাড়ি চাইলেই পাওয়া যাবে। লীনা জানে। কিন্তু চাওয়ার উপায় নেই। বাবা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র করবে। কী করে যে দোলনকে একটা খবর দেওয়া যায়! ট্যাক্সির কোনও ভরসা নেই। আর উত্তর কলকাতায় যা জ্যাম! এখন বেরোলে পাঁচটার মধ্যে ফেরা যাবে কি না সন্দেহ।

লীনা এক কাপ চা খেল। তারপর হলঘরের ডিভানে শুয়ে একখানা ইংরিজি থ্রিলার পড়ার চেষ্টা করল। হল না।

বাড়িটা বড্ড খাঁ খাঁ করছে। যতদিন দাদা ছিল এত ফাঁকা লাগত না। এ বাড়ির লোকেরা শুধু টাকা চেনে। শুধু টাকা। তার বাবারও ওই এক নেশা। দিন রাত টাকা রোজগার করে যাচ্ছে। তারও মস্ত ব্যাবসা কেমিক্যালসের। মা পর্যন্ত বসে নেই। মেয়েদের জন্য একটা এক্সক্লুসিভ ইংরিজি ম্যাগাজিন বের করেছে। তা-ই নিয়ে ঘোরতর ব্যস্ত।

এদের কারও সঙ্গেই সম্পর্ক রচনা করে তুলতে পারেনি লীনা। ছেলেবেলা থেকেই সে এই ব্যস্ত মা-বাবার কাছে অবহেলিত। নিজের মনে সে বড় হয়েছে। ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও যে কতখানি শূন্যতা একজনকে ঘিরে থাকতে পারে তা লীনার চেয়ে বেশি আর কে জানে? এমনকী ওই যে ভ্যাগাবন্ড দোলন, সেও এই শূন্যতাকে ভরে দিতে পারে না। গরিবের ছেলে বলে নানা কমপ্লেকস আছে। হয়তো মনে মনে লীনাকে একটু ভয়ও পায়। বেচারা!

লীনা চাকরি নিয়েছে টাকার প্রয়োজনে তো নয়। এই আট ঘরের ফাঁকা বাড়ি তাকে হানাবাড়ির মতো তাড়া করে দিন রাত। সকাল-সন্ধে মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয় দেখা না-হওয়ার মতোই। দু'জনেই নিজের চিন্তায় আত্মমগ্ন, বিরক্ত, অ্যালুফ। সামান্য কিছু কথাবার্তা হয় ভদ্রতাবশে। যে যার নিজস্ব বলয়ের মধ্যে বাস করে। লীনা ইচ্ছে করলে বাবার কোম্পানিতে, দাদার কনসার্নে বা মায়ের ম্যাগাজিনে চাকরি করতে পারত। ইচ্ছে করেই করেনি। গোমড়ামুখো মা-বাবার সংশ্রবের চেয়ে অচেনা বস বরং ভাল।

কপাল খারাপ। লীনা এমন একজনকে বস হিসেবে পেল, যে শুধু গোমড়ামুখোই নয়, পাগলও।

ওয়ার্ডরোব খুলে লীনা ড্রেস পছন্দ করছিল। দেশি, বিদেশি অজস্র পোশাক তার । সে অবশ্য আজকাল তাঁতের শাড়িই বেশি পছন্দ করে।

বেছে-গুছে আজ সে জিনস আর কামিজই বেশি পছন্দ করল।

সাজতে লীনার বিশেষ সময় লাগে না। মোটামুটি সুন্দরী সে। রূপটান সে মোটেই ব্যবহার করে না। মুখে একটু ঘাম-তেল ভাব থাকলে তার মুখশ্রী ভাল ফোটে, এটা সে জানে। পায়ে একজোড়া রবার সোলের সোয়েডের জুতো পরে নিল। গয়না সে কখনওই পরে না, ঘড়ি পরে শুধু।

হাতে পনেরো মিনিট সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়বে লীনা। ওল্ড বালিগঞ্জ থেকে হেঁটে যেতে দশ মিনিটের মতো লাগবে। সে একটু আস্তে হাঁটবে বরং।

ব্যাগ থেকে একটা চুয়িংগাম বের করে মুখে পুরে নিল লীনা। কাঁধে ব্যাগ। বেরোবার জন্য ঘড়িটা দেখে নিল। আরও দু'মিনিট। বুকটা কি একটু কাঁপছে?

দুর্বলতা বা নার্ভাসনেস দূর করতে সবচেয়ে ভাল উপায় হল একটু ব্রিদিং করা। তারপর শবাসন। শরীর ফিট রাখতে লীনাকে অনেক যোগব্যায়াম আর ফ্রি হ্যান্ড করতে হয়েছে। এখনও করে।

লীনা বাইরের ঘরে সোফায় পা তুলে পদ্মাসনে বসে গেল। কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে ব্রিদিং করে নিল। ঠিক দু'মিনিট।

বাইরে রোদের তেজ মরে এসেছে। বেলা গুটিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। লীনা কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে হাতে দোলাতে দোলাতে হাঁটতে লাগল।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে লীনা দাঁড়াল। এ তার চেনা জায়গা। গোটা অঞ্চলটাই তার চেনা। ছোট থেকে এইখানেই সে বড় হয়েছে।

লীনা দাঁড়িয়ে রইল। সময় বয়ে যেতে লাগল। টিকটিক টিকটিক।

পাঁচটা।... পাঁচটা দুই।... পাঁচটা পাঁচ।... পাঁচটা দশ। পাঁচটা পনেরো।

লীনা ঘড়ি দেখল। না, তার কোনও দায় নেই অপেক্ষা করার। সময় ববি দিয়েছিলেন। ববি কথা রাখেননি।

সুতরাং লীনা এখন যেখানে খুশি যেতে পারে।

থিয়েটার সাড়ে ছ'টায়। হাতে এখনও অনেক সময় আছে। লীনা ফিরে গিয়ে বাড়ি থেকে কিছু একটা খেয়ে আসতে পারে। খিদে পাচ্ছে।

লীনা ফিরল। নির্জন রাস্তাটা ধরে সামান্য ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে লাগল। পিছনে বড় রাস্তা থেকে যে কালো গাড়িটা মোড় নিল সেটাকে লক্ষ করার কোনও কারণ ছিল না লীনার।

মসৃণ গতিতে সমান্তরাল ছুটে এল গাড়িটা। নিঃশব্দে।

লীনা কিছু বুঝবার আগেই প্রকাণ্ড বিদেশি গাড়িটার সামনের দরজা খুলে গেল। একটা হাত বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে এসে লীনার ডান কবজিটা চেপে ধরল। সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই চকিত আকর্ষণে তাকে টেনে নিল ভিতরে।

আঁ-আঁ-আঁ—

চেঁচাবেন না। প্লিজ।

আ-আপনি?

লীনা তালগোল পাকানো অবস্থা থেকে শরীরটাকে যখন সোজা ও সহজ করল গাড়িটা আবার বাঁয়ে ফিরে অন্য রাস্তা ধরেছে। স্টিয়ারিং হুইলে এক এবং অদ্বিতীয় সেই পাগল। ববি রায়।

এর মানে কি মিস্টার রায়?

প্রিকশন।

তার মানে?

আমি কি মানে-বই?

তার মানে?

আপনার মাথায় গ্রে-ম্যাটার এত কম কেন?

লীনা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আপনার আই-কিউ কেন জিরো?

ববি রায় গাড়িটায় বিপজ্জনক গতি সঞ্চার করে বললেন, আইনস্টাইনের আই-কিউ কত ছিল জানেন?

না।

আমিও জানি না। তবে মনে হয় জিরোই। জিনিয়াসদের আই-কিউ দরকার হয় না। আই-কিউ দরকার হয় তাদের, যারা কুইজ কনটেস্টে নামে।

আপনি কি জিনিয়াস?

অকপটে বলতে গেলে বলতেই হয় আমার মাথার দাম আছে। এ কস্টলি 'হেড' মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনার মাথায়—

মিসেস নয়, মিস।

ওই একই হল। আপনার মাথায় গ্রে-ম্যাটার খুব কম।

আপনি গাড়ি থামান। আমি নেমে যাব।

ববি রায় জবাব দিলেন না। পাত্তাও দিলেন না। পার্ক সার্কাসের পার্ক ঘুরে গিয়ে ডানধারে একটা রাস্তা ধরলেন। নির্জন রাস্তা।

কোথায় যাচ্ছেন?— লীনা রায় চেঁচিয়ে উঠল।

বয়ফ্রেন্ড।

তার মানে?

বয়ফ্রেন্ড মানে দরকার নেই। কিন্তু বানানটা দরকার। বি ও ওয়াই এফ আর আই ই এন ডি। ক'টা অক্ষর হল?

মাই গড! আপনি কি সত্যিই পাগল?

ঠিক ন'টা অক্ষর আছে। কিন্তু আমাদের কম্পিউটারের ঘর আটটা। সুতরাং আপনাকে একটা অক্ষর ড্রপ করতে হবে। ফ্রেন্ড-এর আই অক্ষরটা বাদ দিন। শুধু এফ আর ই এন ডি হলেই চলবে।

তার মানে?

আপনি কি ফাটা রেকর্ড? তার মানে তার মানে করে যাচ্ছেন কেন? একটু চুপ করে সিচুয়েশনটা মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করুন।

লীনা চোখ বুজে কম্পিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর চাপা স্বরে বলল, আই হেট ইউ।

ধন্যবাদ। কিন্তু বানানটা শিখে নিন। বয়ফ্রেন্ড— ঠিক যেমনটি বললাম।

লীনা সোজা হয়ে বসে বলল, আমি জানতে চাই, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

ববি রায় তার দিকে ভ্রুক্ষেপও না-করে বললেন, আপনি কম্পিউটার অপারেট করতে পারেন?

জানি না।

নো প্রবলেম।— বলে ববি রায় তাঁর হাওয়াই শার্টের বুক-পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লীনার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

ওটা কী?

এটাতে হিন্ট দেওয়া আছে। কম্পিউটার চালু করে প্রথমে কোডটা ফিড করবেন। তারপর ইনফরমেশন ডিমান্ড করবেন।

আমি পারব না।

পারতেই হবে। পারতেই হবে। পারতেই—

মিস্টার রায়, আমি আপনার স্লেভ নই। আপনার আচরণ বর্বরদের মতো। আপনি—

ভেরি ইজি। কম্পিউটার ইন ফ্যাক্ট একটা ট্রেইন্ড বাঁদরেও অপারেট করতে পারে। যদিও আপনার গ্রে-ম্যাটার কম, তবু এ কাজটায় তেমন ব্রেন-ওয়ার্কের দরকারও নেই।

মিস্টার রায়—

ঠিক সাত দিন বাদে কোডটা বদলাতে হবে। খুব ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার। সাত দিনের মাথায়—

মিস্টার রায়, গাড়ি থামান! আমি নেমে যাব।

এবার ববি রায় লীনার দিকে তাকালেন। ভ্রু একটু ওপরে তুলে বললেন, সামনেই ইস্টার্ন বাইপাস। এ জায়গা থেকে ফিরে যাওয়ার কোনও কনভেয়ান্স নেই।

তা হোক। কলকাতায় আমার একা চলাফেরা করে অভ্যাস আছে।

ববি রায় নীরবে গাড়িটা চালাতে লাগলেন। বিশ্রী এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। অত্যন্ত ঘিঞ্জি বস্তি এবং নোংরা পরিবেশের ভিতর দিয়ে প্রকাণ্ড গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে চলেছে। কিন্তু ভিতরটা শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত আর গদি নরম বলে তেমন কষ্ট হচ্ছে না লীনার।

ববি রায় বেশ কিছুক্ষণ বাদে বললেন, আমি একটু বাদেই নামব। আপনি এই গাড়িটা নিয়ে ফিরে যাবেন।

লীনা চমকে উঠে বলল, গাড়ি নিয়ে?

কেন, আপনি তো গাড়ি চালাতে জানেন!

জানি, কিন্তু আমি কেন গাড়ি নিয়ে ফিরব?

এ গাড়িটা আপনার নামে অফিসের লগ-বুকে আজ থেকে অ্যালট করা হয়েছে।

কিন্তু কেন?

ববি রায় নির্বিকার মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কেন. গাড়িটা পছন্দ নয়?

উঃ, আমি কি পাগল হয়ে যাব?

এটা বেশ ভাল গাড়ি মিসেস ভট্টাচারিয়া, খুব ভাল গাড়ি। তেলের খরচ কোম্পানি দেবে। চিন্তা করবেন না।

লীনার মাথা এতই তালগোল পাকিয়ে গেছে যে, সে এবার 'মিসেস ভট্টাচারিয়া' শুনেও আপত্তি করতে পারল না। আসলে সে কথাই বলতে পারল না।

ববি রায় ইস্টার্ন বাইপাসে গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরালেন। চওড়া ফাঁকা মসৃণ রাস্তা। দিনান্তের ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারদিকের চরাচর। কুয়াশা জমে উঠেছে চারদিকে।

লীনা দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল।

ববি রায় মাথা নাড়লেন, ওভাবে খোলে না। সুইচ আছে মিস ভট্টাচারিয়া। কিন্তু ওসব শিখে নিতে খুব বেশি গ্রে-ম্যাটারের দরকার হবে না। এই যে, এইখানে সুইচ, চারটে দরজার জন্য চারটে সুইচ।

ওঃ, মাই গড।

এত ভগবানকে ডাকছেন কেন বলুন তো! এখনও কিন্তু আপনি তেমন বিপদে পড়েননি।

তার মানে?

ববি রায় এবার হাসলেন। লীনা এই স্বল্প আলোতেও দেখল, এই রোগা খ্যাপাটে কালো লোকটার হাসিটা ভীষণ রকমের ভাল।

ববি রায় হাসিটা মুছে নিয়ে বললেন, তবে বিপদে পড়বেন। হয়তো বেশ মারাত্মক বিপদেই, নিজের কোনও দোষ না-থাকা সত্ত্বেও।

তার মানে?

ওঃ, আপনার আজ একটা কথাতেই পিন আটকে গেছে। 'তার মানে' ছাড়া অন্য কোনও ডায়ালগ কি মাথায় আসছে না?

না। আমি এসবের মানে জানতে চাই।

অত কথা বলার যে সময় নেই আমার। আমার সময় বড্ড কম। খুন হয়ে যাওয়ার আগে আমাকে তাড়াতাড়ি আমার সব কিছু গুটিয়ে নিতে হবে।

আপনি কেবল খুন-খুন করছেন কেন?

ববি রায় একটা প্রকাণ্ড শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি রোমান্টিক বাঙালির মতো মৃত্যুচিন্তা করি না মিসেস ভট্টাচারিয়া—

মিসেস নয়, মিস—

ইররেলেভেন্ট। বয়ফ্রেন্ড মনে থাকবে?

না থাকার কী আছে! আর ফর ইয়োর ইনফরমেশন আমি কম্পিউটারের একটা কোর্স করেছিলাম। আমার বায়োডাটায় সে কথা লেখা ছিল।

তা হলে তো আপনার আই-কিউ বেশ হাই! অ্যাঁ!

লীনা রাগে চিড়বিড় করল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

ববি রায় বললেন, এ গাড়িটা নিয়ে এখন থেকে অফিসে যাবেন। সেফ গাড়ি। কাচগুলো বুলেট-প্রুফ।

বাড়িতে কী বলব?

বলবেন, অফিস থেকে গাড়িটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে। সেটা মিথ্যেও নয়।

আর কী করতে হবে?

ববি রায় হাসলেন, আপনি তো কবিতা লেখেন! আমার ওপর একটা এপিটাফ লিখবেন। কেমন?

॥ ৩ ॥

ববি রায় যেখানে গাড়িটা থামালেন সে জায়গাটা লীনার চেনা। ডান ধারে ওই দেখা যাচ্ছে যুবভারতী স্টেডিয়াম, ছড়ানো-ছিটানো লোকালয়।

ববি রায় বললেন, রাস্তাঘাট তো আপনি ভালই চেনেন। গাড়ি নিয়ে একা ফিরে যেতে পারবেন তো!

পারব। কিন্তু—

কিন্তু, তবে, তার মানে, এই সব শব্দগুলোকে বর্জন করতে হবে। এ দেশের লোকেদের কোনও কাজই এগোতে চায় না ওই সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব আর ভয়ের দরুন।

লীনা ফুঁসে উঠে বলল, আপনি যে একটা ইচ্ছেমতো মিস্ট্রি তৈরি করছেন না, তা কী করে বুঝব?

মিস্ট্রি তৈরি করব? কেন, ববি রায়ের কি এতই বাড়তি সময় আছে?

সেটাই বুঝতে পারছি না।

ববি রায় মাথা নেড়ে বললেন, মিস্ট্রি হয়তো একটা তৈরি হয়েছে, তবে সেটা আমি তৈরি করিনি।

লীনা গলায় যথেষ্ট রাগ পুষে রেখে বলল, তা হলে শেষ অবধি আমাকে করতে হবে কী? একটা কোডেড ইনফরমেশন কম্পিউটার কিল করা তো?

ববি রায় মাথা নাড়লেন, না। ইনফরমেশনটা কিল করতে হবে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবেই।

'তার মানে' বলতে গিয়েও লীনা নিজেকে সামলে নিল।

ববি রায় বললেন, আমার মৃত্যু কোথায় কীভাবে হতে পারে তা তো আপনার জানার কথা নয়। আমি হাইডিং— হাইডিং মানে কী বলুন তো?

আত্মগোপন করা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা সহজ বাংলাও আছে না! গা-ঢাকা না কী যেন!

আছে।

আমি গা-ঢাকা দিচ্ছি। অফিস পুরোপুরি আপনার হাতে। বি কেয়ারফুল।

এইটুকু বলেই ববি রায় সুইচ টিপলেন, ড্রাইভারের দিককার দরজা খুলে গেল, ববি রায় নেমে দাঁড়ালেন। দরজা বন্ধ করার আগে লীনার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে বললেন, এ গাড়ির অটোমেটিক গিয়ার। পুরোপুরি ইলেকট্রনিক। স্মুদ ড্রাইভ।

কিন্তু আপনি কথাটা শেষ করেননি।

কোন কথাটা?

ঠিক কখন আমাকে কম্পিউটার ইনফরমেশন কিল করতে হবে।

ওঃ ঠিক খবর পেয়ে যাবেন। মৃত্যুকে লুকোনো যায় না। চলি।

লীনা রাগে বিস্ময়ে দেখল, লোকটা দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে চোখের পলকে কোথায় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তা গাড়ির ভেতর থেকে ভাল বুঝতেই পারল না লীনা।

এই বেশ বড়সড় অটোমেটিক অচেনা গাড়িটাই বা কেন জগদ্দলের মতো চাপিয়ে গেল তার ঘাড়ে তাই বা কে বলবে!

এই নির্জন রাস্তায় বসে চিন্তাভাবনা করা এবং সময় কাটানো বিপজ্জনক। লীনা ড্রাইভারের সিটে বসল, গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করতে লাগল। হচ্ছিল না, বুকটা কাঁপছে লীনার।

আচমকাই তাকে আপাদমস্তক শিহরিত করে একটি পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, ওঃ ডার্লিং, ইউ ফরগট দা কী।

অভিভূত লীনার কয়েক সেকেন্ড লাগল ব্যাপারটা বুঝতে, কিন্তু কথা-বলা গাড়ির কথা সে শুনেছে, মনে পড়ল।

ড্যাশবোর্ডে প্রায় একটা জেট প্লেনের টার্মিনালের মতো নানারকম আলোর নিশানা। অন্তত গোটা কুড়ি ডায়াল। খুঁজে-পেতে চাবিটা বের করল লীনা।

গাড়ি চমৎকার শব্দহীন স্টার্ট নিল। তারপর অতি মসৃণ গতিতে ছুটতে শুরু করল।

মাঝে মাঝে সেই মোলায়েম পুরুষকণ্ঠ বলতে লাগল, ডারলিং ডোন্ট ফরগেট দি গিয়ার, টাইম টু চেঞ্জ... ওঃ সুইট সুইট ডারলিং, ইউ ক্যান হ্যান্ডেল এ কার... নাউ ডোন্ট প্রেস দি ব্রেক সো হার্ড, ইট গিভস মি এ ব্যাড জোল্ট... উড ইউ লাইক সাম মিউজিক লাভ? প্রেস দি ব্লু বাটন...

এই বকাবাজ কণ্ঠটিকে বন্ধ করার উপায় জানা নেই লীনার, সে দাঁতে দাঁত টিপে যতদূর সম্ভব গতিতে গাড়িটা চালাতে লাগল। এখনও সময় আছে। অ্যাকাডেমিতে গিয়ে দোলনকে ধরা যাবে।

মোলায়েম দাড়ি, মধ্যম দীর্ঘ, ছিপছিপে, প্যান্ট আর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরা কাঁধে ঝোলাব্যাগ। অ্যাকাডেমির ফটকের ভিতরে উদাসীন মুখ নিয়ে দোলন দাঁড়িয়ে।

গাড়িটা পার্ক করে দরজা খুলে নামতে যাবে, পুরুষকণ্ঠটি বলে উঠল, লাভ, ইউ হ্যাভ ফরগটন দি কী।

লীনা চাবিটা ড্যাশবোর্ড থেকে খুলে নিল। রিং-এ দুটো চাবি, একটা দরজার।

দোলন!

দোলন গোল গোল চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, আরিব্বাস? তুমি এ গাড়ি কোথায় পেলে?

অফিস দিয়েছে।

বেড়ে অফিস তো? ঘ্যাম গাড়ি।

শো শুরু হতে আর বাকি নেই। চলো।

দোলন অনিচ্ছের সঙ্গে গাড়িটা থেকে চোখ ফিরিয়ে বলল, অফিস তোমাকে গাড়ি দেয়?

দিল তো!

তুমি তো শুনেছি মিস্টার রায়ের অফিস-সেক্রেটারি। সেক্রেটারিরা কি গাড়ি পায় লীনা? তার ওপর ওরকম দুর্দান্ত গাড়ি?

লীনা হেসে বলল, এমনিতে দেয়নি, অনেক ব্যাপার আছে। পরে বলব।

দু'জনে বাগানের ভিতর দিয়ে হল-এর দিকে হাঁটছিল, হঠাৎ দোলন বলল, তুমি আমার পক্ষে বড্ড বড় লীনা, বড্ড হাই।

তুমি এত কমপ্লেক্সে ভোগো কেন? বলছি তো সব বুঝিয়ে বলব, শুনলে দেখবে, আমি এখনও একজন নিতান্তই ছাপোষা সেক্রেটারি মাত্র।

দোলন জবাব দিল না। নাটক দেখার সময় ও কোনও কথা বলল না। কাঁটা হয়ে বসে রইল।

নাটক শেষ হলে লীনা বলল, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দোলন প্রায় আঁতকে উঠে বলল, ওই গাড়ি নিয়ে উত্তর কলকাতায়? মাপ করো লীনা। ঢের বাস আছে, চলে যাব।

উঃ, তুমি যে কী প্রিমিটিভ না! আচ্ছা, অন্তত এসপ্লানেড পর্যন্ত তো চলো।

গাঁইগুঁই করে দোলন রাজি হল।

কিন্তু গাড়িতে উঠতেই বিপত্তি। চাবিটা সবে ঢুকিয়েছে লীনা, গাড়ি অমনি বলে উঠল, আই সি ইউ হ্যাভ এ ফ্রেন্ড ডারলিং।

দোলন প্রায় বসা-অবস্থাতেই লাফিয়ে উঠবার চেষ্টা করল, এ কী? কে?

লীনা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, ভয় পেয়ো না। এসব ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস। আমেরিকান বড়লোকদের জন্য জাপান বানায়।

দোলন নির্বাক বিস্ময়ে বসে রইল।

পুরুষকণ্ঠ ভারী অমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করল, ইজ ইট এ বয়ফ্রেন্ড ডারলিং? গুড ইভনিং বয়ফ্রেন্ড। হ্যাভ এ নাইস টাইম।

লীনার পরিষ্কার মনে আছে ববি রায় যতক্ষণ গাড়িটা চালাচ্ছিলেন তখন কণ্ঠস্বরটি স্তব্ধ ছিল। ববি নেমে যাওয়ার সময়ে বোধহয় দুষ্টুমিটুকু করে গেছেন।

বয়ফ্রেন্ড কথাটা দু'বার ধাক্কা দিল লীনাকে, বয়ফ্রেন্ড! যদি ববি রায় মারা যায় তা হলে—

লীনা, এ গাড়ি সত্যি তোমাকে অফিস থেকে দিয়েছে?

বললাম তো! বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে। তবে তুমি খুব বিগ বিগ ব্যাপারের মধ্যে চলে গেছ বলে মনে হচ্ছে।

না, দোলন। বিগ ব্যাপার নয়। তবে আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। তোমাকে একদিন সব বলব।

কী দরকার লীনা?

কথার মাঝখানে হঠাৎ পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, হোয়াট ইজ ইয়োর বার্থ-ডে বয়ফ্রেন্ড?

দোলন হঠাৎ লীনার হাত চেপে ধরে বলল, আমার মনে হচ্ছে গাড়ির পিছনের সিটে কেউ লুকিয়ে আছে। আলোটা জ্বালো তো।

লীনা একটু চমকে উঠল এ কথায়। খুঁজে-পেতে আলোর বোতামটা পেয়েও গেল।

না, পিছনের সিটে কেউ নেই। একদম ফাঁকা।

লীনা লাইটটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, এমন ভয় পাইয়ে দাও না মাঝে মাঝে!

তোমার গাড়ি আমার জন্মদিন জিজ্ঞেস করছে কেন?

না হয় করলই, তাতে তোমার পিছনের সিটে কেউ লুকিয়ে আছে বলে মনে হল কেন?

কেন মনে হল? কারণ আমার জন্মদিন আজ। সন্দেহ হচ্ছিল, আমার চেনা কোনও বন্ধুবান্ধবকে তুমি গাড়িতে লুকিয়ে এনেছ যে আড়াল থেকে রসিকতা করে যাচ্ছে।

আজ? হিয়ার ইজ মিউজিক ফর ইউ বয়ফ্রেন্ড।

'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' বাজতে লাগল লুকনো স্পিকারে। দোলন বাক্যহারা হয়ে গেল।

লীনা কিন্তু ভ্রু কুঁচকে ভাবছিল। দোলনের জন্মদিন কবে যে তা সে নিজেও এতকাল জানত না। সুতরাং এই গাড়ির ইলেকট্রনিক মগজেরও জানবার কথা নয়। তবে কি কোনও সংকেত? বার্থ ডে? ক'টা অক্ষর হচ্ছে? ঠিক আটটা, কম্পিউটারের আটটা ঘর, পরবর্তী কোড।

তোমার বস কেমন লীনা?

কেমন? কেন, ভালই।

মানে কত বয়স-টয়স?

আর ইউ জেলাস?

আরে না, বলোই না!

পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে।

ম্যারেড?

কী করে জানব?

খুব স্মার্ট না?

লীনা হেসে ফেলল, ইউ আর রিয়েলি জেলাস। শোনো তোমাকে একটা কথা বলি। ববি রায় বিশ্ববিখ্যাত লোক। ইলেকট্রনিক উইজার্ড। আমি কেন, পৃথিবীর কোনও মেয়ের দিকেই মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় লোকটার নেই। যদি ম্যারেড হয়ে থাকে তবে ওর স্ত্রীর মতো হতভাগিনী কমই আছে।

বুঝলাম।

লোকটা দেখতে কেমন জানতে চাও? লম্বায় তোমার চেয়ে অন্তত দু'ইঞ্চি কম। কালো, রোগা, ছটফটে। দেখলে মনেই হবে না যে লোকটা জিনিয়াস।

এসপ্লানেড এসে গেল। দোলন কেমন স্বপ্নোত্থিতের মতো নামল। লীনার দিকে একবার তাকিয়ে হাতখানা একবার তুলে দায়সারা বিদায় জানিয়ে ভিড়ে মিশে গেল।

আগামীকাল লীনার অফিসে যাওয়ার কথা আগে থেকেই হয়ে আছে দোলনের। কাল লীনা মাইনে পাবে। দু'জনের সন্ধের খাবারটা পার্ক স্ট্রিটে খাওয়ার কথা।

নিরাপদেই বাড়ি ফিরে এল লীনা। শুধু সারাক্ষণ ওই পুরুষকণ্ঠের টীকা-টিপ্পনী সয়ে যেতে হল। কাল সকালে চেষ্টা করে দেখবে কীভাবে ওটা বন্ধ করা যায়।

বাড়িতে দুটো গ্যারেজ। গাড়িটা সুতরাং গাড়ি-বারান্দার একধারে রাখতে হল লীনাকে।

যখন ঘরে এল লীনা তখন হঠাৎ রাজ্যের ক্লান্তি এসে শরীরে ভর করল। একটা দিনে কত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে গেল। কোনও মানে হয়? এখনও মনে হচ্ছে বোধহয় স্বপ্ন।

খাওয়ার টেবিলে লীনার সঙ্গে তার বাবার দেখা হতেই ভ্রু-কুঞ্চনসহ প্রশ্ন, তুমি কার গাড়ি নিয়ে এসেছ?

অফিসের।

অফিস তোমাকে গাড়ি দিচ্ছে কেন?

একটা জরুরি কাজে কিছু ঘোরাঘুরি করতে হবে, তাই।

তা বলে এত দামি গাড়ি?

লীনা বিরক্তির গলায় বলল, গাড়িটা তো আর দান করেনি, ধার দিয়েছে।

কেন? অ্যাম্বাসাডার ফিয়াট মারুতি, এসবও তো ছিল।

আমি অত জানি না, দিয়েছে ব্যবহার করছি!

বাবা একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার দাদার হয়তো এরকম গাড়ি আছে। তুমি তার কাছ থেকে—

লীনা প্লেট ছেড়ে উঠে বলল, সন্দেহ হলে খোঁজ নিতে পারো, তবে ওটা দাদার গাড়ি নয়।

তোমার বস ববি রায়কে আমি কাল টেলিফোনে জিজ্ঞেস করব।

কোরো।

ঠিক আছে। খেয়ে নাও।

লীনা বৈষ্ণবীর দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, খাবারটা আমার ঘরে দিয়ে এসো।

মা অন্যধার থেকে মেয়ের দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, তোমার রাগ করা উচিত নয়। এত বড় একটা আধুনিক গাড়ি অফিস থেকে তোমাকে দেবে কেন?

ইউ আর জেলাস।

লীনা সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরে বসেই খেল লীনা। বৈষ্ণবী এঁটোকাঁটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর সে তার ব্যাগ খুলে কার্ডটা বের করল। ববি রায়ের দেওয়া। কম্পিউটার ক্রিয়াশীল করার কিছু সংকেত, ববি রায়ের ছাপা ফোন নম্বর ইত্যাদি।

কার্ডটা ওলটাতেই চমকে গেল লীনা, শুধু চমকাল না, তার সারা শরীর রাগে রি রি করে কাঁপতে লাগল। ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল মুখ-চোখ। সে অত্যন্ত জ্বালাভরা চোখে চেয়ে ছিল ডটপেনে লেখা একটা লাইনের দিকে, আই লাভ ইউ।

না, এর একটা বিহিত করা দরকার। দাঁতে দাঁত পিষে লীনা গিয়ে লিভিংরুমে টেলিফোনটা এক ঝটকায় তুলে ক্রুদ্ধ আঙুলে ববি রায়ের নম্বর ডায়াল করল।

ওপাশ থেকে একটা নিরাসক্ত গলা বলে উঠল, ববি রায় ইজ নট হোম... ববি রায় ইজ নট হোম।

লীনা তীব্র স্বরে বলল, দেন হোয়ার ইজ হি?

উদাসীন গলা বলেই চলল, ববি রায় ইজ নট হোম... ববি রায় ইজ নট হোম...

আই হেট হিম।

ববি রায় ইজ নট হোম।

লীনা একটু থমকাল। সে যতদূর জানে, এ দেশে এখনও টেলিফোনে রেকর্ডেড মেসেজ-এর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ববি রায়ের বাড়ির টেলিফোনে রেকর্ডেড মেসেজই শোনা যাচ্ছে। অবশ্য ইলেকট্রনিকসের জাদুকরের পক্ষে এসব তো ছেলেখেলা।

লীনা ঘরে ফিরে এল এবং ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোল।

পরদিন সকালে যখন অফিসে বেরোতে যাবে লীনা, তখন দিনের আলোয় গাড়িটা ভাল করে দেখল সে। জাপানি গাড়ি। এর কত লাখ টাকা দাম তা লীনা জানে না। কিন্তু এত দামি গাড়ি তার হাতে এত অনায়াসে ছেড়ে দেওয়াটারও মানে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে লীনা, চাবিটা ঘোরানো মাত্র সেই মোলায়েম পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, গুড মর্নিং ডারলিং. আই লাভ ইউ।

অসহ্য! লীনা পাগলের মতো যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করল, গলাটাকে বন্ধ করার জন্য, পারল না।

তারপর চুপ করে বসে রাগে বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর মাথার মধ্যে যেন খট করে একটা আলো জ্বলে উঠল। তাই তো, আই লাভ ইউ, এটা তো প্রেমের বার্তা নয়। আই লাভ ইউ-তে যে মোট আটটা অক্ষর।

লীনা একাই একটু হাসল। মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল। গাড়ি ছাড়ল সে।

অফিসে এসে নিজের ঘরখানায় বসে একটু কাগজপত্র গুছিয়ে নিল সে। তারপর উঠে ববি রায়ের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

ঢুকেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল সে।

একটা লম্বা চেহারার যুবক শিস দিতে দিতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কী যেন খুঁজছে, খুব নিশ্চিন্ত ভঙ্গি।

লীনা হঠাৎ ধমকে উঠল, হু আর ইউ?

যুবকটিও ভীষণ চমকে উঠল। শুধু চমকালই না, সটান দুটো হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল, যেন কেউ তার দিকে পিস্তল তাক করেছে। তারপর হাত দুটো নামিয়ে বলল, ও, আপনার তো পিস্তল নেই দেখছি।

॥ ৪ ॥

বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন লীনা রাগের গলায় বলল, না, আমার পিস্তল নেই। কিন্তু আপনি কে? এ ঘরে আপনার কী দরকার?

ছেলেটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, পিস্তল আমারও নেই। কিন্তু আমার যা কাজ তাতে একটা পিস্তল থাকলে ভাল হত। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

লীনা অবাক হয়ে ছেলেটাকে ভাল করে দেখল। বয়স পঁচিশের মধ্যেই। ছিপছিপে খেলোয়াড়োচিত মেদহীন চেহারা। তবে বুদ্ধির বিশেষ ছাপ নেই মুখে। মুখশ্রী বেশ ভাল। পরনে জিনস আর একটা সাদা কুর্তা।

লীনা টেবিল থেকে ইন্টারকম টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলল, আপনি যে-ই হোন, ট্রেসপাসার। আমি অফিস সিকিউরিটিকে ফোন করছি। যা বলার তাদের কাছে বলবেন।

প্লিজ! কথাটা শুনুন।
কী কথা?
আমি ট্রেসপাসার ঠিকই, কিন্তু আমার কোনও খারাপ মতলব ছিল না।
লীনা ভ্রু কুঁচকে বলল, আপনি অফিসের টপ সিকিউরিটি জোনে ঢুকেছেন। আপনি এ ঘরে ঢুকে সার্চ করছিলেন। আপনাকে পুলিশে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।
ছেলেটা একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে কাহিল গলায় বলল, কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর কাজ করতেই যে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল!
লীনা ভ্রু কুঁচকেই ছিল। গম্ভীর গলায় বলল, কী কাজ?
বলাটা কি ঠিক হবে?
তা হলে সিকিউরিটিকে ডাকতেই হয়।
বলছি বলছি। কিন্তু প্লিজ, আমাকে বিপদে ফেলবেন না।
লীনা ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, যা বলার সংক্ষেপে বলুন।
ছেলেটা রীতিমতো ঘামছিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে বলল, আমি একজন লাইসেন্সড প্রাইভেট ডিটেকটিভ।
শুনেছি। তারপর?
আমার অফিসটা ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায়।
লীনা একটা প্যাড টেনে চট করে নোট করে নিতে লাগল।
প্রায় এক বছর হল অফিস খুলে বসে আছি। মক্কেল জোটে না। বেকার মানুষ, কী আর করব! তবে বুঝতে পারছিলাম এ দেশে ডিটেকটিভদের ভাত নেই। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ডিটেকটিভ হওয়ার বড় শখ ছিল। গাদা গাদা গোয়েন্দা গল্প পড়ে পড়ে—
আপনার জীবনটা সংক্ষেপ করে কাজের কথায় আসুন।
আসছি। বলছিলাম যে, অনেকদিন কাজকর্ম কিছু জোটেনি। হঠাৎ কাল সকালে অফিসে এসে একখানা খাম পেলাম। ভিতরে পাঁচটা একশো টাকার নোট। আমার নিজস্ব কোনও বেয়ারা বা অফিস বয় নেই। একজন ভাগের বেয়ারা জল-চা এনে দেয়। কে যে খামটা কখন রেখে গেছে তা সে বলতে পারল না।
খামের ওপর আপনার নাম লেখা ছিল?
ছিল। টাইপ করা।
তারপর?
কাল বিকেলের দিকে একটা ফোন এল। আমার নিজস্ব ফোনও নেই। পাশে একটা সাপ্লায়ারের অফিস আছে, তাদের ফোন। ফোন ধরতেই একটা গম্ভীর গলা বলে উঠল, টাকাটা পেয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু কিসের টাকা? লোকটা বলল, আরও টাকা রোজগার করতে চান? বললাম, চাই। লোকটা তখন বলল, তা হলে একটা ঠিকানা দিচ্ছি। সেখানে কাল সকাল ন'টার মধ্যে চলে যাবেন। ববি রায় নামে একজনকে খুব নিখুঁতভাবে খুন করতে হবে।
লীনার হাত থেকে ডটপেনটা খসে পড়ে গেল।
ছেলেটা আবার রুমালে কপাল মুছল। একটু কাঁপা গলায় বলল, ম্যাডাম, সবটা আগে শুনুন।
লীনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বলুন।
আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, এ কাজ আমি পারব না। লোকটা বলল, পারতে হবে। নইলে বিপদে পড়বেন। কাজটা খুব সোজা। ন'টা থেকে দশটা অবধি ববি রায় একা থাকে। তার সেক্রেটারি আসে দশটায়। ঘরে ঢোকবার সময় দরজায় নক করবেন না। সোজা ঢুকে পড়বেন। তখন ববি রায় নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে কোনও কাজ করবে। আপনাকে লক্ষও করবে না। ববি রায়, বাস্তব জগতে কমই

থাকে। একখানা ভাল ড্যাগার নিয়ে যাবেন, দু'দিকে ধারওয়ালা। পেটে বা বুকে পুশ করবেন। বডিটা ডেস্কের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবেন। হাতে অবশ্যই দস্তানা পরে নেবেন।

আপনি রাজি হলেন?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, না। রাজি হচ্ছিলাম না। কিন্তু লোকটা বলল, কাজটা আপনি করবেন বলে ধরে নিয়ে আমরা অলরেডি পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। টেবিলে ফিরে গিয়ে আপনি টাকাটা পেয়ে যাবেন। বলেই ফোনটা কেটে দিল।

পেয়েছিলেন?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, পেয়েছিলাম। সাদা খামে কড়কড়ে পাঁচ হাজার টাকা। বেয়ারা এবারও বলতে পারেনি খামটা কে রেখে গেল। বলা সম্ভবও নয়। ও বাড়িতে পায়রার খোপের মতো রাশি রাশি অফিস, হাজার লোকের আনাগোনা।

টাকাটা পেয়ে আপনি কী ঠিক করলেন?

কী ঠিক করব? আমি জীবনে কখনও খুনখারাপি করিনি। মিস্টার রায়কে খুন করার জন্য আমাকে কেন লাগানো হল আমি তাও বুঝতে পারছি না। তবে আমার কৌতূহল হয়েছিল। খুব কৌতূহল। আমি ঠিক করলাম, আজ এসে ববি রায়ের সঙ্গে দেখা করে যাব। লোকটা কে বা কী, কেন ওকে খুন করার জন্য এত টাকা কেউ খরচ করতে চাইছে তা জানার জন্যই আজ আমি এসেছিলাম। এসে শুনলাম উনি নেই। তাই—

তাই তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লেন?

ছেলেটা একটুও লজ্জা না পেয়ে বলল, ওই একটা কাজ আমি খুব ভাল পারি। মশামাছির মতো যে-কোনও জায়গায় ঢুকে যেতে পারি। কেউ আমাকে আটকাতে পারে না।

বুঝলাম। কিন্তু এ ঘরে আপনি কী খুঁজছিলেন?

ওটা আমার একটা মুদ্রাদোষ। যেখানেই যাই সেখানেই কাগজপত্র নথি খুঁজে দেখা আমার স্বভাব। কী যে খুঁজছি তা ভাল করে জানিও না।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, আপনার কথা আমি একটুও বিশ্বাস করছি না।

অবিশ্বাস্যই বটে। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই আমার কার্ড দেখুন। খোঁজখবর নিন। আমি জেনুইন ইন্দ্রজিৎ সেন, প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

আপনি অপেক্ষা করুন। সিকিউরিটি এসে আপনাকে সার্চ করবে।

সার্চ! সে তো আপনিই করতে পারেন। এই দেখুন না!— বলে ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পকেটের সামান্য কয়েকটা জিনিস বের করে টেবিলে রাখল। মানিব্যাগ, চাবি, রুমাল, নামের কার্ড, ডটপেন, আতস কাচ আর অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের একটা স্ট্রিপ।

এ ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই। আপনি দেখতে পারেন খুঁজে।

পুরুষমানুষের বডি সার্চ করা মেয়েদের পক্ষে শোভন নয়।

তা অবশ্য ঠিক। তবে আমাকে বিশ্বাস করলে ঠকবেন না।

লীনা বিশ্বাস করল না। ইন্দ্রজিতের কার্ডে ছাপা ফোন নম্বরে ডায়াল করল।

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লায়ার্স।

লীনা শুনতে পেল একটা বেশ ভিড়াক্রান্ত অফিসের গণ্ডগোল ভেসে আসছে ফোনে। সে একটু উঁচু গলাতেই জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, মিস্টার ইন্দ্রজিৎ সেনকে একটু ডেকে দিতে পারেন?

ধরুন, দেখছি।

লীনা ফোন ধরে রইল।

একটু বাদেই গলাটা বলল, না এখনও আসেনি। কিছু বলতে হবে?

না, ধন্যবাদ। আপনাদের অফিসটা কত নম্বর ধর্মতলায়?

ত্রিশ নম্বর।

ধন্যবাদ।

লীনা ফোনটা রেখে দিল।

ইন্দ্রজিৎ তার দিকে চোরের মতো চেয়ে ছিল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, বিশ্বাস করলেন?

না। ওই ফোন নম্বরে হয়তো আপনার লোকই বসে আছে। অথবা ইন্দ্রজিৎ সেনের নাম ভাঁড়িয়ে আপনি অন্য কেউ হতে পারেন।

ছেলেটা বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। হয়ও।

লীনা মৃদু একটু হেসে বলল, তা হলে আমার এখন কী করা উচিত?

উচিত পুলিশে দেওয়া। কিন্তু আমি তো কিছুই লুকোইনি। ইচ্ছে করলে আপনি আমার সঙ্গে এখন আমার অফিসে গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। সেখানে অন্তত একশো লোক আমাকে জেনুইন ইন্দ্রজিৎ সেন বলে আইডেনটিফাই করতে পারবে।

নিতান্তই ছা-পোষা চেহারার এই লোকটাকে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে ইচ্ছে হল না লীনার। তবে সে একে একেবারে ছেড়েও দেবে না। লীনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে। আমি পরে খোঁজ নেব। আপনি আসুন।

লোকটা দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেই লীনা সিকিউরিটিকে ফোন করল, ববি রায়ের সেক্রেটারি বলছি। জিনস আর সাদা কামিজ পরা একজন বছর পঁচিশের লোক এইমাত্র বেরিয়ে গেল। তাকে আটকান। সার্চ হিম, ক্রস একজামিন হিম প্রপারলি। আইডেনটিফাই করুন। ভেরি আর্জেন্ট।

লীনা উঠে দরজাটা লক করল। তারপর সুইচ টিপে ভিডিয়ো ইউনিটটা বের করে আনল গুপ্ত চেম্বার থেকে। তারপর কোড দিল, বয়ফ্রেন্ড।

পরদায় ফুটে উঠল, নো অ্যাকসেস। ট্রাই সেকেন্ড কোড।

লীনা চাবি টিপল, বার্থ ডে।

পরদায় ফুটল, নো অ্যাকসেস। ট্রাই থার্ড কোড।

লীনা আবার কোড দিল, আই লাভ ইউ।

পরদায় ফুটে উঠল, কনগ্র্যাচুলেশনস, ইউ হ্যাভ ডান ইট।

এর মানে কী কিছুই বুঝতে পারল না লীনা। দাঁতে দাঁত চেপে রাগে সে ফুঁসতে লাগল। ববি রায় কোনও প্র্যাকটিক্যাল জোক করে গেছেন কি?

নো অ্যাকসেস! লীনা টপ করে লেখাটা মুছে চাবি টিপল, নো অ্যাকসেস।

পরদায় ফুটে উঠল, দ্যাটস ক্লেভার অফ ইউ মিসেস ভট্টাচারিয়া!

লীনা দু'হাতে কপাল চেপে ধরে বলল, ও গড। লোকটা কী ভীষণ পাজি।

স্কাউন্ড্রেল! স্কাউন্ড্রেল!

ভিডিয়ো ইউনিটটা আবার যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে লীনা ববি রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের চেম্বারে বসল। ভাবতে লাগল। মাথাটা গরম। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ফোনটা বাজতেই তুলে নিল লীনা, হ্যালো।

সিকিউরিটি বলছি। লোকটার নাম ইন্দ্রজিৎ সেন। সার্চ করে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। বাড়ি পাইকপাড়ায়, অফিস ধর্মতলায়। লোকটার বিরুদ্ধে কোনও স্পেসিফিক চার্জ থাকলে বলুন, পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দেব।

নেই। ওকে ছেড়ে দিন।

লীনা কিছুক্ষণ ভূতগ্রস্তের মতো বসে রইল। তারপর উঠে আবার ববি রায়ের ঘরে ঢুকল। দরজা লক করে ভিডিয়ো ইউনিট নিয়ে বসে গেল। বয়ফ্রেন্ড। বার্থ ডে। আই লাভ ইউ। নো অ্যাকসেস।

পরপর একই উত্তর দিয়ে গেল যন্ত্র।

শেষ উত্তরটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল লীনা, দ্যাটস ক্লেভার অফ ইউ মিসেস ভট্টাচারিয়া।

একটু বিদ্রুপ আর তাচ্ছিল্য মেশানো মন্তব্যটা বিছের হুলের মতো বিঁধে রইল লীনার মনের মধ্যে। হামবাগ, ইনসোলেন্ট, মেগালোম্যানিয়াক।

বেশ কিছু চিঠিপত্র টাইপ এবং কয়েকটা মেসেজ পাঠানোর ছিল লীনার। বসে বসে চুপচাপ কাজ করে গেল। টিফিন খেল। এরই ফাঁকে একবার অ্যাকাউন্টসে ফোন করল। যে-কোনও অফিসারের গতিবিধি অ্যাকাউন্টসই দিতে পারে। ওদের কাছে সকলের টিকি বাঁধা।

মিস্টার রায় কি কলকাতায় নেই? উনি আমার জন্য কোনও মেসেজ রেখে যাননি।

হ্যাঁ, উনি আজ ভোরের ফ্লাইটে বম্বে গেছেন। তারপর ইউরোপে যাচ্ছেন আজ রাতে।

ইউরোপে কোথায়?

প্রথমে প্যারিস, তারপর আরও অনেক জায়গায়।

ধন্যবাদ।

লীনা আরও কিছুক্ষণ কাজ করল। এক ফাঁকে ক্যাশ-কাউন্টার থেকে বেতন নিয়ে এল।

পাঁচটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট তখন রিসেপশন থেকে ফোন এল, দোলন এসেছে। অপেক্ষা করছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লীনা। ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

বেরোতে যাবে, ঠিক সেই সময়ে মারাত্মক ফোনটা এল।

হ্যাল্লো।

হ্যালো, আমি মিস লীনা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আমিই লীনা। বলুন।

আপনি ইন্দ্রজিৎ সেনকে চেনেন?

কে ইন্দ্রজিৎ?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিৎ সেন?

ওঃ হ্যাঁ। স্মল টাইম প্রাইভেট আই। কী ব্যাপার?

ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমি ওর পাশের অফিসে কাজ করি। ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লায়ার্স। আমি ওর বন্ধু। আজ দুপুরে অফিসে এসে ও আমাকে বলল, ওর যদি কিছু হয় তা হলে যেন আপনাকে একটা খবর দিই।

লীনা একটু শিহরিত হল, কী হয়েছে?

ইন্দ্র মারা গেছে।

অ্যাঁ!

দুপুরে কেউ এসে স্ট্যাব করে গেছে। দরজার তলা দিয়ে করিডোরে রক্ত গড়িয়ে আসায় আমরা টের পাই।

লীনার হাত কাঁপছিল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। কোনওক্রমে জিজ্ঞেস করল, সত্যিই বেঁচে নেই?

না। অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে। পুলিশ এসে একটু আগে ডেডবডি নিয়ে গেল। আপনি কি ওর কেউ হন?

না।

গলাটা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, আপনার সঙ্গে কোনও ইন্টিমেসি ছিল না?

মোটেও না। আজ সকালে মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপ।

ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। এগারোটা নাগাদ অফিসে এসে ও আমাকে করিডোরে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বলে, আমার একটা বিপদ ঘটতে পারে। শোনো, যদি আমার কিছু হয় তা হলে এই চিরকুটে যার নাম আর ফোন নম্বর দেওয়া আছে তাকে একটা খবর

দিয়ো। বোলো, উনি যেন আমার অফিসে একবার আসেন।

কিন্তু কেন? আমি তো ওকে ভাল করে চিনতামও না।

জানি না, ম্যাডাম। তবে ও এমনভাবে কথাটা বলেছিল যাতে মনে হয়, আপনি ওর খুব কাছের কেউ। যাকগে, আপনি কি আসতে পারবেন?

লীনা অতি দ্রুত ভাবতে লাগল। কিন্তু কিছু স্থির করতে পারল না।

লোকটা নিজেই আবার বলল, শুনুন ম্যাডাম। আমি অফিসে সাড়ে ছ'টা অবধি থাকব। সাড়ে পাঁচটার পর অফিসে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। ইন্দ্রজিতের ঘর পুলিশ সিল করে দিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের অফিসের রেকর্ড-রুমের ভিতর দিয়ে ওর ঘরে যাওয়ার একটা ছোট্ট ফোকর রয়েছে। পুলিশ ওটা দেখতে পায়নি।

কিন্তু আমি গিয়ে কী হবে তা তো বুঝতে পারছি না।

সে আপনি ঠিক করবেন। ইন্দ্রজিৎ আমার খুব বন্ধু ছিল। ওর শেষ অনুরোধ রাখতে আমি এই রিস্কটুকু নিতে পারি। যদি আপনি চান তা হলে ওর ঘরে ঢুকবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না।

ঠিক আছে। তবে জানিয়ে রাখলাম, আমি সাড়ে ছ'টা অবধি অফিসে থাকব। আমার নাম দুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

লীনা ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে রইল। এসব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? সত্যিই মারা গেছে লোকটা? খুন!

লীনা টান হয়ে বসে কিছুক্ষণ নীরবে ব্রিদিং করল। তারপর উঠে পড়ল।

রিসেপশনে দোলন চোর-চোর মুখ করে বসে আছে। এই অফিসের ফান্ডা একটু বেশি। দোলন যখনই আসে তখনই অস্বস্তি বোধ করে। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে সবসময়েই কাতর হয়ে থাকে দোলন। ওই গহ্বর থেকে ওকে আজও টেনে বের করতে পারেনি লীনা।

দু'জনে নীরবে বেরিয়ে এল। বাইরে রোদ মরে আসছে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে একটু।

দোলন!

উঁ!

একটা জায়গায় যাবে?

কোথায়?

ধর্মতলা স্ট্রিটের একটা অফিসে।

ধর্মতলায় আবার তোমার কী কাজ?

লীনা মাথা নেড়ে বলল, কী যে কাজ তা জানি না। কিন্তু চলোই না। তুমি থাকলে ভাল হবে।

আজ আমাদের কী প্রোগ্রাম ছিল, লীনা?

গঙ্গার ধারে বেড়ানো, পার্ক স্ট্রিটে ডিনার।

সেগুলো কি বাতিল করছ?

আরে না, বাতিল করব কেন? ধর্মতলায় আমার কয়েক মিনিটের কাজ। তুমি গাড়িতে বসে থেকো। আমি চট করে ঘুরে আসব।

তোমার ওই ভুতুড়ে গাড়িতে একা বসে থাকব! ও বাবা!

চাবি খুলে নিলে গাড়ি কোনও কথা বলবে না। ভয় নেই।

ত্রিশ নম্বর ধর্মতলা খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধে হল না লীনার। বাড়িটা পুরনো। ভারী ঘিঞ্জি। সরু সিঁড়ি উঠে গেছে ঊর্ধ্বপানে।

তিনতলার ল্যান্ডিং-এ উঠে লীনা ঘড়ি দেখল। পৌনে ছ'টা। বেশির ভাগ অফিসই বন্ধ। করিডোর নির্জন। শুধু শেষ প্রান্তে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে সাইনবোর্ড। ইউনাইটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লায়ার্স। তার আগে আর-একখানা ঘর। তার বাইরে টুলের ওপর একজন পুলিশ বসে আছে। পুলিশ দেখে একটু সাহস হল লীনার।

লীনা দরজায় দাঁড়াতেই একটা লোক চমকে মুখ তুলে তাকাল। বয়স বেশি নয়। ইন্দ্রজিতের মতোই। স্বাস্থ্যহীন, রুগ্ন চেহারা। মুখখানায় গভীর বিষাদ।

আপনিই কি মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ।

আসুন।— লোকটা উঠে দাঁড়াল।

লীনা ঘরে ঢুকে চারদিকটা দেখল। চেয়ার-টেবিলে ছয়লাপ। অনেক স্টিলের আলমারি। অফিস-টফিস যেমন হয় আর কী!

লোকটা একটু ভীত গলায় বলল, ধরা পড়লে আমার জেল হয়ে যাবে, তবু ইন্দ্রর কথাটা ফেলতে পারছি না। আসুন, রেকর্ড-রুম ওই পিছন দিকে।

লীনার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। না জেনেশুনে সে বোকার মতো কোনও ফাঁদে পা দিচ্ছে না তো!

লোকটা অফিসের চেয়ার টেবিল আলমারি ক্যাবিনেট ইত্যাদির ফাঁক দিয়ে গোলক ধাঁধার মতো পথে লীনাকে একদম পিছন দিকে আর-একটা ঘরে এনে হাজির করল। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে বলল, এই ঘর।

লীনা অবাক হয়ে দেখল, একটা বদ্ধ কুঠুরি। মেঝে থেকে সিলিং অবধি শুধু স্টিলের তাক। আর তাতে রাশি-রাশি ফাইলপত্র।

আসুন। —বলে লোকটা দুটো তাকের মাঝখানে সরু ফাঁকের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর খুব সাবধানে কাঠের পার্টিশান থেকে একখানা পাটা সরিয়ে আনল।

এই দরজা। যাবেন ভিতরে? ভয় করছে না তো! আমার কিন্তু করছে।

লীনা অবিশ্বাসের চোখে ফাঁকটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ডেডবডি তো ভিতরে নেই।

না। তবে রক্ত আছে। মেঝেময়।

ও বাবা!

মিস ভট্টাচার্য, আমি বলি কি আপনি তবু একবার ভিতরটা ঘুরে আসুন। মনে হয় আপনাকে খুব জরুরি কিছু জানানোর ছিল ওর।

লীনা চোখ বুজে কিছুক্ষণ দম ধরে রইল। তারপর ফাঁকটা দিয়ে ইন্দ্রজিতের অফিসে ঢুকল। ছোট্ট একখানা ঘর। ছয় বাই আট হতে পারে। লীনাদের বাথরুমও এর চেয়ে ঢের বড়। ঘরে একখানা ডেস্ক আর একটা স্টিলের আলমারি।

পিছন থেকে দুর্গাচরণ ফিসফিস করে বলল, সাবধানে পা ফেলবেন।

লীনা সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরে একটা গা-গুলোনো গন্ধ।

প্লিজ, কোনও শব্দ করবেন না। ডেস্কের নীচের ড্রয়ারে একটা লেজার বই আছে। ওর যা কিছু ইনফরমেশন ওটাতেই থাকত।

লীনা নিঃশব্দে ডেস্কের নীচের ড্রয়ারটা খুলল। লেজার বইটা বের করে আনল। দুর্গাচরণের রেকর্ড-রুমে ফিরে এসে পাতা ওলটাতে লাগল।

দুর্গাচরণ পাশেই দাঁড়িয়ে। তার শ্বাস কাঁপছে, হাত কাঁপছে।

লেজার বইটা একরকম ফাঁকা। প্রথম পাতাতেই একটা এন্ট্রি। জনৈক বি রায়ের কাছ থেকে পারিশ্রমিক বাবদ পাঁচশো টাকা পাওয়া গেছে। পর পর বি রায়ের নামে আরও কয়েকটা এন্ট্রি।

দুর্গাচরণ বলল, বি রায় ছিলেন, বলতে গেলে, ইন্দ্রজিতের একমাত্র মক্কেল।

বি রায় কে?

দুর্গাচরণ মাথা নেড়ে বলল, চিনি না। কখনও দেখিনি। তবে পুরো নাম ববি রায়।

ববি রায়!— লীনা অবাক গলায় প্রতিধ্বনি করল।

দুর্গাচরণ মাথা নেড়ে বলল, সম্ভবত লীনা ভট্টাচার্য নামে কোনও এক মহিলার পেছনে গোয়েন্দাগিরির জন্য ববি রায় ওকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

মাই গড!

বোধহয় আপনিই!

লীনা জবাব দিতে পারল না।

॥ ৫ ॥

দুর্গাচরণ হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিয়ে বলল, মনে হয় এই ইনফরমেশনটুকু আপনাকে জানানোর জন্যই ইন্দ্র আপনাকে একবার এখানে আসতে বলেছিল।

লীনা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, কিন্তু আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগানোর মানে কী?

তা তো জানি না। তবে ইন্দ্র প্রায়ই বলত, ববি রায় অতি বিপজ্জনক লোক। তার সঙ্গে খুব সমঝে চলতে হয়।

বিপজ্জনক? কতখানি বিপজ্জনক?

দুর্গাচরণ খাতাটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, এর ওপর আমাদের হাতের ছাপ থেকে যাওয়াটা উচিত হবে না। দাঁড়ান, আমি এটা জায়গামতো রেখে আসি।

ফোকর দিয়ে দুর্গাচরণ ইন্দ্রজিতের ঘরে ঢুকে গেল। লীনা টের পেল, তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, রাগে-উত্তেজনায় মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে। তার সম্পর্কে অত ইনফরমেশন তা হলে এভাবেই সংগ্রহ করেছিল ববি রায়। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

দুর্গাচরণ ফিরে এসে তক্তা দিয়ে ফাঁকটা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, মিস ভট্টাচার্য।

কেন বলুন তো?

আমার সন্দেহ হচ্ছে ইন্দ্রর মৃত্যুর সঙ্গে ববি রায়ের একটা যোগ আছে। ইন্দ্রজিতের তো ববি রায় ছাড়া কোনও মক্কেল ছিল না।

কিন্তু উনি তো বললেন, ববি রায়কে খুন করার জন্য ওকে পাঠানো হয়েছিল।

দুর্গাচরণ মৃদু একটু হেসে বলল, হতেও পারে, না-ও হতে পারে। ডিটেকটিভরা সত্যি কথা কমই বলে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে হাঁটছিল। বাইরের অফিস-ঘরটায় এসে লীনা করিডোরটার দিকে সভয়ে তাকাল। পুলিশটা বসে বসে ঢুলছে।

আমি যাচ্ছি।

আসুন, দরকার হলে যোগাযোগ করবেন।

লীনা করিডোর পার হয়ে লম্বা সিঁড়ি ধীর পায়ে ভেঙে নেমে এল।

অত্যন্ত বিবর্ণ মুখে দোলন গাড়িতে বসে আছে।

কী হয়েছে লীনা? তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?

লীনা স্টিয়ারিং-এ বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল। অবরুদ্ধ কান্নাটাকে কিছুতেই আর আটকাতে পারল না।

কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?

লীনা জবাব দিল না।

দোলনের একবার ইচ্ছে হল ওর পিঠে হাত রাখে। হাতটা তুলেও আবার সংবরণ করে নিল। মনে হল, কাজটা ঠিক হবে না।

লীনা, কী হয়েছে বলবে না?

প্রাণপণে কান্না গিলতে গিলতে লীনা বলল, তোমাকে একদিন সবই বলব, দোলন। তবে আজ নয়।

কেউ তোমাকে অপমান করেনি তো, লীনা?

লীনা চোখ দুটো রুমালে মুছে নিয়ে বলল, করেছে, ভীষণ অপমান করেছে। কিন্তু আই শ্যাল টিচ হিম এ গুড লেসন।

দোলন একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি যখন ভিতরে গিয়েছিলে তখন এখানেও একটা ঘটনা ঘটেছে।

কী ঘটেছে?

আমি চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছিলাম হঠাৎ কাচের শার্শিতে একটা লোক টোকা দিল। আমি সুইচ টিপে দরজাটা একটু ফাঁক করতে লোকটা বলল, ওইখানে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে একটু ডেকে দিতে বললেন।

সর্বনাশ! তুমি কী করলে?

আমি ভাবলাম নির্ঘাত তুমিই ডাকছ। তাই তাড়াতাড়ি নেমে এগিয়ে গেলাম। দরজাটা বন্ধ করে যাইনি, কারণ খুলতে তো জানি না।

তারপর কী হল?

এদিক-ওদিক খুঁজে তোমাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখলাম, লোকটা খোলা দরজা দিয়ে গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে কী করছে। আমি ছুটে আসতে না আসতেই লোকটা পট করে পালিয়ে গেল।

কোথায় পালাল?

ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেল!

কীরকম চেহারা?

বলা মুশকিল। মাঝারি হাইট, মাঝারি স্বাস্থ্য।

মুখটা ফের দেখলে চিনতে পারবে?

একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। ভাল করে লক্ষ করিনি।

উঃ, দোলন! তুমি যে কী ভীষণ ভুলো মনের মানুষ!

দোলন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, কিন্তু চুরি করার মতো তো গাড়িতে কিছু ছিল না।

লীনা গাড়ি স্টার্ট দিল। ভিড়াক্রান্ত ধর্মতলা স্ট্রিট এড়িয়ে সুরেন ব্যানার্জি রোড হয়ে ময়দানের ভিতরে নিয়ে এল গাড়ি।

হঠাৎ গাড়ির লুকোনো স্পিকার থেকে পুরুষের সেই কণ্ঠস্বর বলে উঠল, মিরর, মিরর, হোয়াট ডু ইউ সি?

লীনা চমকে উঠল, তারপর রিয়ারভিউ আয়নার দিকে তাকাল, কিছুই দেখতে পেল না তেমন। রাজ্যের গাড়ি তাড়া করে আসছে।

পুরুষকণ্ঠ উদাস গলায় একটা বিখ্যাত ইংরেজি কবিতার একখানা ভাঙা লাইন আবৃত্তি করল, দি মিরর ক্র্যাকড ফ্রম সাইড টু সাইড, দি কার্স ইজ আপন মি ক্রাইড দি লেডি অফ শ্যালট...

লীনা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, অসহ্য।

তোমার গাড়ি একটু পাগল আছে, লীনা।

পাগল নয়, শয়তান।

পুরুষকণ্ঠ: কান্ট ইউ ড্রাইভ এ বিট ফাস্টার ডারলিং? ফাস্টার?... টেক ইট লাভ...

মিরর! ড্রাইভ ফাস্টার! এর অর্থ কী? লীনা রিয়ারভিউতে একবার চকিতে দেখে নিল। একখানা মারুতি, দুটো অ্যাম্বাসাডার খুব কাছাকাছি তার পিছনে রয়েছে। তার বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি? করলেই বা তা গাড়ির ইলেকট্রনিক মগজ কী করে জানতে পারবে?

লীনার মাথা আবার গুলিয়ে গেল। একটা ট্র্যাফিক সিগন্যালে থেমে আবার যখন গাড়ি চালাল সে তখন স্পিড বাড়িয়ে দিল।

দ্যাটস ও কে ডারলিং! ইউ রান সুইট!... ওঃ ইউ আর ড্রাইভিং রিয়াল ফাস্ট ডারলিং! কিপ ইট আপ...

গঙ্গার ধার বরাবর একটু নির্জন জায়গা দেখে গাড়িটা দাঁড় করাল লীনা। তারপর দোলনের দিকে তাকাল।

দোলন তার দিকেই চেয়ে ছিল। বলল, কী ব্যাপার বলো তো!

লীনা মাথা নাড়ল, কিছু বুঝতে পারছি না।

দোলন চিন্তিত মুখে বলল, একটা কালো মারুতি কিন্তু সেই থেকে আমাদের পিছু নিয়ে এসেছে।

ঠিক দেখেছ?

ঠিকই দেখেছি। কিন্তু এখানে এসে আর সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না।

লীনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তবু বুঝতে পারছি না। যদি কেউ ফলো করেই থাকে তা হলে গাড়িটা তা বুঝতে পারবে কী করে?

জানি না। এখন চলো, খোলা হাওয়ায় একটু বসি। তোমার খুব বেশি টেনশন যাচ্ছে।

সকালবেলা যখন সিকিউরিটি ব্যারিয়ার পার হচ্ছিলেন ববি রায় তখন সিকিউরিটি চেক নামক প্রহসনটি তাঁর কাছে সময়ের এক নির্বোধ অপচয় বলে মনে হচ্ছিল। বেশ কিছুদিন আগে লন্ডন থেকে রোম যাওয়ার পথে যখন তাঁদের প্লেনটি আকাশপথে ছিনতাই করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয় তখনও ববি রায় দেখেছিলেন, সিকিউরিটি চেক ব্যাপারটার কত ফাঁক-ফোকর থাকে।

হিথরোর শক্ত বেড়া পার হয়ে চার ইহুদি যুবক সশস্ত্র উঠেছিল প্লেনে। খুব বিনীতভাবেই তারা হাইজ্যাক করেছিল বিমানটি, কোনও বাচালতা নয়, চারজন চার জায়গায় উঠে দাঁড়াল, হাতে উজি সাব-মেশিনগান। কাউকে ভয় দেখায়নি, চেঁচামেচি করেনি, গম্ভীর মুখে শুধু কোন পথে যেতে হবে তা বিমানসেবিকা মারফত জানিয়ে দিয়েছিল পাইলটকে।

নির্দিষ্ট জায়গায় প্লেন নামল। চার ইহুদি যুবক কোনও অন্যায় দাবি দাওয়া করল না। শুধু একজন যাত্রীকে প্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে প্লেনটিকে মুক্তি দিয়ে দিল। সেই যাত্রী ছিলেন ববি রায়।

সেই থেকে প্লেনে ওঠার সময় প্রতিবার সিকিউরিটি চেক-এর সময় তাঁর হাসি পায়।

আজ যখন সিকিউরিটির অফিসার তাঁর অ্যাটাচি কেসটা খুলে দেখেটেখে ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন ববি রায় তাকে খুব সহৃদয়ভাবে বললেন, ওর লুকোনো একটা চেম্বার আছে, সেটা দেখলেন না?

অফিসার হাঁ, লুকনো চেম্বার?

ববি রায় অ্যাটাচি কেসটা নিজের কাছে টেনে এনে হাতলের কাছ বরাবর একটা বোতামে চাপ দিয়ে তলাটা আলগা করে দেখালেন।

অফিসার আমতা-আমতা করে বলল, কী আছে ওতে?

ববি রায় একটা চকোলেট বার করে দেখালেন, নিতান্তই একটা চকোলেট বার, তবে ইচ্ছে করলে ডিজম্যান্টল করা সাব-মেশিনগান বা রিভলবার বা গ্রেনেড অনায়াসে নেওয়া যায়। হয়তো কেউ নিয়েছেও, হয়তো রোজই নেয়।

অফিসার খুবই বিপন্ন মুখে চেয়ে থেকে বলল, অ্যাঁ মানে— আচ্ছা, আমরা এর পর থেকে আরও সাবধান হব।

বিরক্ত ববি রায় অ্যাটাচিটা ছেড়ে দিলেন। শরীর যখন সার্চ করা হল তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ করলেন, এরা তাঁর জুতোজোড়া লক্ষই করল না।

ভালই হল। জুতোর নকল হিল-এর মধ্যে রয়েছে পৌনে চার ইঞ্চি মাপের একটা লিলিপুট পিস্তল। দুটো অতিরিক্ত গুলির ম্যাগাজিন।

লাউঞ্জে বসে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ববি রায় যাত্রীদের লক্ষ করতে লাগলেন। তাঁকে যে আগাগোড়া অনুসরণ করা এবং নজরে রাখা হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ববি রায়ের। যারা তাঁকে নজরে রাখছে, তারা নিতান্তই খুনে। এদের কোনও আত্মাভিমান বা দেশপ্রেম নেই, ভাড়াটে খুনে মাত্র। এরা হয়তো ববি রায়কে বাগে পাওয়ার জন্য একটা প্লেনকে হাইজ্যাক করবে না। কিন্তু সাবধানের মার নেই।

যাত্রীদের সংখ্যা অনেক। সকলকে সমানভাবে লক্ষ করা সম্ভব নয়। গোটা লাউঞ্জটাকে কয়েকটা কাল্পনিক জোন-এ ভাগ করে নিলেন ববি। তারপর জোন ধরে ধরে লোকগুলোকে লক্ষ করে যেতে লাগলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পর দুটো লোককে চিহ্নিত করলেন ববি রায়। দু'জনেই শীতের জ্যাকেট পরেছে। পরনে চাপা ট্রাউজার। কাঁধে একজনের স্যাচেল ব্যাগ। অন্যজনের হাতে একটা ডাক্তারি কেস।

লোকদুটো তাঁর দিকে একবারও তাকায়নি।

প্লেনে ওঠার সময় ববি রায় লোকদুটির পিছনে রইলেন। কোথায় বসে, তা দেখতে হবে।

বিশাল এয়ারবাসে কোনও লোকের হদিশ রাখা খুবই শক্ত। তার ওপর আজকাল প্লেনে ফার্স্ট ক্লাস আর অর্ডিনারি ক্লাস আলাদা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ববি রায়ের টিকিট ফার্স্ট ক্লাসের। নিজের প্রকোষ্ঠে ঢুকবার আগে ববি রায় হোঁচট খাওয়ার ভান করে একটু সময় নিলেন। লোক দুটো প্লেনের বাঁ ধারে পনেরো নম্বর রো-র জানালার দিকের সিট নিয়েছে বলে মনে হল।

ববি রায় উদ্বিগ্ন হলেন না। এর আগেও বহুবার তিনি বিপদে পড়েছেন। একাধিকবার তাঁকে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হয়েছে। প্যারিসে এক টেররিস্ট দলের জন্য একবার তাঁকে আগুনে-বোমাও বানিয়ে দিতে হয়েছিল পিস্তলের মুখে বসে। ছেলেগুলো খুবই বোকা, তারা বুঝতে পারেনি বোমা তৈরি হয়ে গেলে সেটা ববি রায় তাদের ওপরেই ব্যবহার করতে পারেন।

এক কাপ কফি খেয়ে ববি রায় বোম্বে পর্যন্ত টানা ঘুমোলেন। সকালের ফ্লাইট ধরতে সেই মাঝরাতে উঠে পড়তে হয়েছে।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল অবধি কোনও ঘটনা ঘটবে না, এটা ববি রায় জানতেন। ট্যাক্সিতে ববি রায় জুতোর ফাঁপা হিল থেকে লিলিপুটটাকে বের করে পকেটে রাখলেন।

একবার আন্তর্জাতিক বিমানে উঠে পড়লে তাঁর অনুসরণকারীরা বোধহয় তাঁর নাগাল পাবে না। যা কিছু তারা করবে প্লেনে ওঠার আগেই। ফাইভ স্টার হোটেলের নির্জন স্যুইট এসব কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী সন্দেহ নেই।

ববি রায় তাঁর নির্দিষ্ট হোটেলে আগে থেকে বুক করা ঘরে চেক-ইন করলেন। গরম জলে ভাল করে স্নান করলেন, ব্রেকফাস্ট খেলেন। খবরের কাগজে চোখ বোলালেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সমুদ্রও দেখলেন। সবচেয়ে বেশি লক্ষ করলেন, নীচের ব্যালকনিটায় কেউ নেই।

তারপর খুব ধীরে-সুস্থে পোশাক পরলেন। অ্যাটাচি কেস ছাড়া তাঁর সঙ্গে কোনও মালপত্র নেই।

দরকারও হয় না। প্যারিসে তাঁর একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সবই আছে সেখানে।

কিন্তু এই অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে বেরোলে অনুসরণকারীদের সন্দেহ হতে পারে যে তিনি হোটেল ছেড়ে পালাচ্ছেন। ববি রায়ের যতদূর ধারণা, তাঁর অনুসরণকারীরা এই ফ্লোরে ঘর নিয়েছে। অপেক্ষা করছে। লক্ষ রাখছে।

কলিংবেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন ববি।

আমার দুই বন্ধুর এই হোটেলে চেক-ইন করার কথা। কেউ কি করেছে এর মধ্যে?

বেয়ারা মাথা নাড়ল, দু'জন সাহেব পঁচিশ নম্বর ঘরে এসেছেন। মিস্টার মেহেরা আর মিস্টার সিং।

ববি রায় উজ্জ্বল হয়ে বললেন, ওরাই, ঠিক আছে।

কোনও খবর দিতে হবে, স্যার?

না। আমি নিজেই যাচ্ছি।

বেয়ারা চলে গেলে ববি রায় উঠে অ্যাটাচি কেসটা খুলে আর-একটা গুপ্ত প্রকোষ্ঠ থেকে খুব সরু নাইলনের দড়ি বের করলেন। অ্যাটাচি কেসটা দড়িতে ঝুলিয়ে ব্যালকনি থেকে খুব সাবধানে নামিয়ে দিলেন নীচের ব্যালকনিতে।

তারপর শিস দিতে দিতে দরজা খুলে বেরোলেন। পচিশ নম্বর ডানদিকে, সিঁড়ির মুখেই। ববি জানেন।

পঁচিশ নম্বরের দরজাটা যে সামান্য ফাঁক তা লক্ষ করলেন ববি রায়। ভাল, খুব ভাল। ওরা দেখছে, ববি রায় খালি হাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং এখনই পিছু নেওয়ার দরকার নেই। শিকারকে তো ফিরে আসতেই হবে।

লিফটের মুখে দাঁড়িয়ে তবু ববি রায়ের ঘাড় শিরশির করছিল। যদি এইসব রাফ স্বভাবের খুনি সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার চালায় এখন?

না, অত মোটা দাগের কাজ করবে না। করিডোরে ব্যস্ত বেয়ারাদের আনাগোনা রয়েছে। ওরা অপেক্ষা করবে।

লিফটে ঢুকে ববি রায় নীচের তলার সুইচ টিপলেন, লিফট থামতেই চকিত পায়ে নেমে পড়লেন। পকেট থেকে একটা স্কেলিটন চাবি বের করে একটা স্যুইটের দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন।

এবং তারপরই বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে। ঘরে লোক আছে। বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে। শোওয়ার ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে। অথচ বারান্দায় তাঁর অ্যাটাচি কেস। কিন্তু ভাববার সময় নেই। ববি রায় সাবধানে শোওয়ার ঘরের দরজাটা সামান্য খুললেন।

ঘুম জড়ানো গলায় এক বাপ তার ছেলের সঙ্গে কন্নড় ভাষায় কথা বলছে।

ববি রায় দরজায় নক করলেন।

হু ইজ ইট?

হোটেল ইন্সপেক্টর, স্যার। ইজ এভরিথিং ক্লিন?

ইয়াঃ!

লেট মি সি স্যার? মে আই কাম ইন?

কাম ইন।

ববি রায় ঘরে ঢুকলেন। চারদিকটা দেখলেন, ব্যালকনিতে গিয়ে দ্রুত দড়িটা খুলে পকেটে রাখলেন। অ্যাটাচি কেসটা তুলে নিয়ে চলে এলেন।

ইটস ওকে, স্যার। থ্যাংক ইউ।

অঃ রাইট।

ববি রায় বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলেন নীচে। হোটেলের বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরলেন।

হোটেলের বিলটা দেওয়া হল না। সেটা পরে পাঠালেও চলবে। আপাতত ভিন্ন একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার।

থ্রি স্টার একটা হোটেলে এসে উঠলেন ববি রায়। একটু ভিড় বেশি। তা হলেও অসুবিধে কিছু নেই। তিনি সব অবস্থায় মানিয়ে নিতে পারেন।

দরজা লক করে ববি রায় পোশাক ছাড়লেন। তারপর ঘুমোলেন দুপুর অবধি।

ধীরেসুস্থে লাঞ্চ খেলেন হোটেলের রেস্তোরাঁয়, ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তিনি কি নিরাপদ? তিনি কি সম্পূর্ণ নিরাপদ? তা হলে একটা অস্বস্তি হচ্ছে কেন?

ববি রায় বিশাল রেস্তোরাঁর চারদিকে একবার হেলাভরে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

তারপর আবার যথেষ্ট ক্ষুধার্তের মতোই খেতে লাগলেন নিশ্চিন্তে।

না, ববি রায় তাঁর দু'জন অনুসরণকারীকে বোকা বানালেও সব বিপদ ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। বোধ হয় ফাইভ স্টার হোটেলের লবিতে ওদের লোক ছিল। হদিশ পেয়েছে।

বাঁ দিকে চারটে টেবিলের দূরত্বে বসে আছে দু'জন। সেই দু'জন।

॥ ৬ ॥

খাওয়া শেষ করে ববি রায় উঠলেন, অতিশয় ধীর-স্থির এবং রিল্যাক্সড দেখাচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু ববি রায়ের ভিতরে যে কম্পিউটারের মতো মস্তিষ্কটি আছে তা ঝড়ের বেগে কাজ করে যাচ্ছিল।

লবিতে বা বাইরে ওদের নজরদার আছে। সুতরাং হোটেলের বাইরে ওদের মোকাবেলা করা শক্ত হবে। তার চেয়ে হোটেলের ভিতরেই একটা ফয়সালা করে নেওয়া ভাল। নাছোড় এ দু'টি লোককে না ছাড়ালে চলবে না।

খুব ধীর পায়ে গুনগুন করে বিদেশি গান গাইতে গাইতে ববি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন, ঘর খুললেন, দরজা বন্ধ করলেন, তারপর দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এসব কাজে যথেষ্ট ধৈর্যের দরকার হয়।

কিন্তু প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরও কিছুই ঘটল না।

ববি রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার দরজা খুলে বেরোলেন। করিডোর ফাঁকা। আততায়ীদের চিহ্নও নেই।

তা হলে?

ববি ধীর পায়ে হোটেল থেকে বেরোলেন। বোম্বেতে তাঁর বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু আছে। একবার ফোন করলেই সাগ্রহে তারা তাঁকে এসে তুলে নিয়ে যাবে। পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তিনি পেয়ে যেতে পারেন। ববি রায় যে এক মূল্যবান মস্তিষ্ক এ কথা আজ কে না জানে! কিন্তু ববি রায় এও জানেন যে, ওভাবে কেবল বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু কে বা কারা তাঁর পিছু নিয়েছে, কেনই বা, এসব কোনও দিনই জানা যাবে না। বিপদের বীজ থেকেই যাবে।

বোম্বে শহরে ট্যাক্সি পাওয়া সহজ। ববি ট্যাক্সি নিলেন। কোথায় যাবেন তা কিছু ঠিক করতে পারলেন না, চক্কর দিতে দিতে অবশেষে মেরিন ড্রাইভে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে নামলেন। সমুদ্র তাঁর চিরকালের প্রিয়। সমুদ্র তাঁর মাথাকে পরিষ্কার করে দেয়, তাঁকে চনমনে করে তোলে।

ফুটপাথ থেকে লাফ দিয়ে বাঁধের ওপর উঠে পড়লেন ববি রায়। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে সমুদ্রের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ভূখণ্ড। সেই আক্রোশে সমুদ্র ফুঁসে উঠে লক্ষ ফণায় ছোবল মারছে অবিরাম। তলায় রাশি-রাশি কংক্রিটের টুকরো ফেলে সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। প্রবল তাড়নায়

সমুদ্রের আছড়ে পড়া জল তীক্ষ্ণধার লক্ষ বিন্দু হয়ে ছুটে আসছে ওপরে। খরশান ফোয়ারার মতো. বাত্যাতাড়িত বৃষ্টির মতো ভিজিয়ে দিচ্ছে পথচারীকে।

ববি রায় সামান্য ভিজে গেলেন। জল ঘুরছে, দোল খাচ্ছে, ফেনিল হয়ে যাচ্ছে অবিরল পরিশ্রমে। তবু বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই।

বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে চারপাশে। ববি রায় যতদূর লক্ষ করলেন, তাঁর পিছু নেয়নি কেউ। কিন্তু ববি রায় জানেন, নজর ঠিকই রাখা হয়েছে তাঁর ওপর।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁধ শেষ হয়ে গেল। সামনেই চমৎকার একটি সি-বিচ। এই অবেলাতেও কত লোক স্নান করছে। বড় বড় ছেলেরা নির্লজ্জ ল্যাংটো হয়ে ঢেউয়ের মধ্যে দৌড়োচ্ছে। উড়ছে রঙিন বল। বড় বড় বর্ণালি ছাতার তলায় ঠান্ডা পানীয় নিয়ে বসে আছে মেয়ে এবং পুরুষ।

ববি রায় একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসলেন। একটা ঠান্ডা পানীয় নিলেন। তারপর সমুদ্রের দিকে চেয়ে প্রায় সব কিছুই ভুলে গেলেন।

পানীয়টি শেষ হয়ে গেল এক সময়ে। ববি রায় ঘড়ি দেখলেন। তাড়া নেই। উঠলেন।

চড়া রোদ এবং তপ্ত বালিয়াড়ি থেকে উঠে আসা কম্পমান তাপে একটু ঝাপসা লাগল। তবু ববি রায় চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলেন একটু দূরে আর-একটা ছাতার তলা থেকে দু'জন লোক উঠে পড়ল। এরা সেই দু'জন নয়, তবু এরাও মৃত্যুর প্রতিনিধি। ববি রায় জানেন।

পিছনের টেবিলে আরও একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। ববি রায় তাকে লক্ষ করেননি। একটি মিষ্টি মেয়েলি কণ্ঠ বলে উঠল, হিঃ, নিড এ কম্প্যানিয়ন?

ববি রায় ফিরে মেয়েটিকে দেখলেন। নিম্নাঙ্গে একটা সাদা হাফপ্যান্ট গোছের, ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা টিশার্ট, নীল সাদা আড়াআড়ি স্ট্রাইপের। দুটি উন্নত স্তন গেঞ্জি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। মেয়েটি ফরসা, বোধহীন লোল হাসি তার মুখে, চোখে লোভ। নইলে এক ধরনের সৌন্দর্যও ছিল। দেখতে তেমন খারাপ নয়। কোমরের চওড়া বেল্টে একটা পেতলের অক্ষর নজরে পড়ল ববির, সি। বয়কাট চুল হাওয়ায় আলুথালু।

ববি একটু শিস দিলেন, তারপর বললেন, কাম অন।

সব মানুষই কি নয় কম্পিউটারের মতো? কিছু ডাটা ফিড করা থাকে। সেই মতো চলে, যেমন ওই ভাড়াটে খুনিরা, তেমনি এই কলগার্লটি।

তিনি নিজে?

কে জানে, তিনি নিজেও হয়তো তাই।

বাড়ানো হাতে কোমরটা পেয়ে গেলেন ববি। শরীরটা যথেষ্ট নমনীয়, যথেষ্ট শক্তি রাখে। বয়সটাও ওর ফেবারে। কিছুতেই কুড়ির ওপর নয়।

তৃষ্ণার্ত গলায় মেয়েটি বলল, লেট আস হ্যাভ এ ড্রিংক ফার্স্ট, আই অ্যাম থার্স্টি।

আই নো।

মালাবার হিলসের দিকে অনির্দেশ্য হাত তুলে মেয়েটি বলল, আই হ্যাভ এ জয়েন্ট ওভার দেয়ার। হেইল এ ক্যাব।

ববি রায় এসবই জানেন, কোনও বার-এ যাবে। খদ্দেরের পয়সায় মদ খাবে। ডিনার খেতে চাইবে। নিয়ে যাবে নিজস্ব ঘরে। পকেট ফাঁকা করে ছেড়ে দেবে। রুটিন।

ববি এসবে অভ্যস্ত নন, কিন্তু মেয়েটাকে কভার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্তত একটা ডাইভারশন।

ট্যাক্সি সামনেই ছিল, দু'জনে উঠতেই মেয়েটি ঝুঁকে চাপা স্বরে ড্রাইভারকে একটা নির্দেশ দিল। ববি রায় সেটা চেষ্টা করেও শুনতে পেলেন না। সমুদ্র গজরাচ্ছে, হুড়হুড়িয়ে বইছে হাওয়া।

ববি হেলান দিয়ে আরাম করেই বসলেন। সর্বদাই তাঁকে বেঁচে থাকতে হয় বর্তমান নিয়ে। তাঁর

ভাবাবেগ বলে কোনও বস্তু নেই, ভয় তাঁর ভিতরে তেমনভাবে কাজ করে না, তাঁর ভিতরে কাজ করে অঙ্ক এবং কেবলমাত্র অঙ্ক।

ছোট ফিয়াট গাড়িটা যখন গুড়গুড় করে চলছে তখন মেয়েটা ববির একটা হাত মুঠো করে ধরল। ববি বাধা দিলেন না দিতে ইচ্ছে হল না বলেই, তবে হাতখানার ভাষা অনুভূতির ভিতর দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নরম ও উষ্ণ হাতখানা কি আগ্রহী? না কি ভীত? দ্বিধাগ্রস্ত?

তোমার নাম কী?

চিকা।

নামটা তো বেশ ভালই।

তোমার নাম?

ববি।

হাতটাকে আরও একটু নিবিড়ভাবে চেপে ধরলেন ববি। হাতটা কি তাকে কোনও তথ্য দিচ্ছে? দেওয়ারই কথা। পৃথিবীর সব জিনিসই সর্বদা কিছু না কিছু তথ্য দেবেই। শুধু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে তা বুঝে ওঠাই যা শক্ত।

গাড়িটা মালাবার হিলস বেয়ে উঠছে। অতি চমৎকার দৃশ্য চারদিকে। অত্যন্ত অভিজাত, নিরিবিলি, খোলামেলা।

ববি চিকার দিকে ঘুরে তাকালেন, এসব কাজের পক্ষে তোমার বয়স বড্ড কম।

চিকা সামান্য চমকে উঠল কি? ববির দিকে চেয়ে অকপট বিস্ময়ে বলল, কোন সব কাজ?

ববি স্বগতোক্তির মতো বললেন, মেয়েদের যে কতভাবে ব্যবহার করে মানুষ! শুধু জন্মানোর দোষে মেয়েদের কত না কষ্ট!

বড্ড এলোমেলো হাওয়া, ঢেউয়ের শব্দ। চিকা বোধহয় ববির কথা ভাল শুনতে পেল না। কিন্তু ববির দুঃখিত মুখের দিকে চেয়ে কিছু অনুমান করে নিল। ঝুঁকে প্রায় ববির গালে শ্বাস ফেলে বলল, তুমি কি দুঃখী মানুষ? বউ ছেড়ে গেছে বুঝি? আহা, বউ ছেড়ে গেলে প্রথম-প্রথম বড় কষ্ট হয়।

ববি মৃদু হেসে বললেন, ইউ আর এ মাইন্ডরিডার।

একটা নীল ফিয়াট পিছু নিয়েছে তা রিয়ারভিউ আয়নায় দেখেছেন ববি।

চিকা একটু ঘন হয়ে বসল। ববি নিজে পারফিউম মাখেন না কখনও। কিন্তু ফরাসি দেশে তিনি পারফিউমের নানা বিচিত্র ব্যবহারের কথা জানেন। কিছু পারফিউম আছে যা কামোত্তেজক। এই মেয়েটির শরীর থেকে ঠিক সেরকমই কোনও গন্ধ আসছিল, যা নাসারন্ধ্রকে স্ফীত করে এবং রক্তকণিকায় একটা অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে দেয়, দ্রুত করে দেয় হৃদস্পন্দন।

চিকা তাঁর কাঁধে মাথা রাখতেই ববি রায় মৃদু স্বরে বললেন, ইউ আর ইন ডেঞ্জার মাই ডিয়ার।

মেয়েটি চকিতে মাথা তুলল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট?

মেয়েটিকে বালিকাই বলা যায়। এখনও শরীর ততটা পুরন্ত নয়। চোখে-মুখে এখনও পাপের ছায়া গাঢ় হয়ে বসেনি। জীবনটা এখনও এর কাছে নিতান্তই খেলা-খেলা একটা ব্যাপার। যদিও এই বয়সেই পেশাদার এবং সাহসিনী হয়ে উঠেছে তবু ববির ইচ্ছে হল না একে কভার হিসেবে ব্যবহার করতে।

ববি ওর হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, আই অ্যাম নট এ গুড পিক, মাই ডিয়ার। এরপর যখন খদ্দের ধরবে একটু দেখেশুনে ধোরো।

মেয়েটি রাগল না। অবাক হয়ে বলল, তুমি কি পাগল? তোমাকে তো আমার অনেকক্ষণ ধরেই ভাল লাগছিল। কেমন দুঃখী, একা, মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছিলে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম তোমার বউ পালিয়ে গেছে। তখনই আমার মনে হল, তোমার জন্য কিছু করতে হবে। আমরা একসঙ্গে মাতাল হব, নাচব, ফুর্তি করব। এর মধ্যে বিপদের কী আছে?

ট্যাক্সি ধীর হয়ে এল। তারপর একটা ঝা-চকচকে বার কাম রেস্তোরাঁর সামনে থামল। ববি রায় দেখলেন, এ হচ্ছে একেবারে নষ্টভ্রষ্ট ছোঁড়াছুঁড়িদের বেলেল্লাপনা করার মতো জায়গা। একটা নির্জন গলির মধ্যে।

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে ববি মেয়েটির হাতে হাত ধরে ঢুকে গেলেন ভিতরে। নীল ফিয়াটটা নিশ্চিত থেমেছে কাছেপিঠে। ববি রায় ঘাড় ঘোরালেন না। আলো এত মৃদু যে, বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকলে ধুটঘুট্টি অন্ধকাব বলে মনে হয়। মেয়েটি হাত ধরে টেনে নিয়ে না গেলে ববিকে কিছুক্ষণ হাতড়াতে হত চারদিকে।

কোণে একটা ফাঁকা একটেরে কিউবিকল। মেয়েটি খুব কাছ ঘেঁষে শরীরে শরীর লাগিয়ে বসল। রেস্তোরাঁয় খদ্দের নেই বললেই হয়।

কী খাবে? পুরুষেরা তো হুইস্কিই খায়। আমি খাব ভোদকা।

ববি শুধু বললেন, এনিথিং ইউ সে।

কাচের দরজাটা ঠেলে দু'জন লোক ঘরে ঢুকল। চারদিকে তাকাল। তারপর আবছা অন্ধকারে কোথাও বসে গেল।

মেয়েটি মৃদু স্বরে বলল, ইটস এ ম্যাড জয়েন্ট। রাতের দিকে এ জায়গাটা একেবারে ক্রেজি হয়ে যায়।

হ্যাঁ, এ হচ্ছে যৌবনের জায়গা। আমার মতো বুড়োদের নয়।

মেয়েটি ববির গালে একটা ঠোনা দিয়ে বলল, তুমি মোটেই বুড়ো নও। বোসো, আমি টয়লেট থেকে আসছি।

চিকা উঠে যেতেই ববি রায় দুটো জিনিস লক্ষ করলেন। চিকা তার হ্যান্ডব্যাগ সঙ্গে নিয়ে গেছে। সেটা স্বাভাবিকও হতে পারে। মেয়েদের অনেক সাজগোজের জিনিসও হ্যান্ডব্যাগে থাকে। দ্বিতীয়ত চিকা ড্রিংকসের অর্ডার দিয়ে যায়নি। টয়লেট কোনদিকে তা ববি রায় জানেন না, চিকা গেল ডানদিকে। বাইরে বেরোনোর দরজাও ওইদিকেই।

ববি রায় পরিস্থিতিটা বুঝে নিলেন চোখের পলকে। ঠিক কম্পিউটারের মতোই। নির্জন এই রেস্তোরাঁ তাঁর কবরখানা হয়ে উঠতে পারে, যদি সতর্ক না হন তিনি।

ববি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আর তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, পিছনের কিউবিকলে একটা নড়াচড়ার শব্দ হল। ববি কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে ঘুরে মুখোমুখি হলেন দুটো লোকের।

এক সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ মাত্র সময় পাওয়া যায় এসব ক্ষেত্রে। ওই চকিত মুহূর্তেই ববি রায় বুঝে নিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা আদ্যন্ত পেশাদার, নিরাবেগ, অভিজ্ঞ খুনি।

কিন্তু তারা আক্রমণ করার আগেই যে ববি রায় আক্রমণ করবেন এটা বোধহয় ওরা ভাবতেও পারেনি। আর সেই বিস্ময়ের সুযোগটাই নিলেন ববি রায়।

তাঁর বুটের ডগা যখন প্রথম খুনির হাঁটুতে খটাং করে গিয়ে লাগল তখন হাড় ভাঙার নির্ভুল শব্দ পেলেন ববি রায়।

ওয়াঃ—বলে লোকটা ভেঙে পড়তে-না-পড়তেই দ্বিতীয় লোকটির দিকে লাফিয়ে উঠে বাইসাইকেল চালানোর মতো পা দু'খানাকে শূন্যে তুলে লাফিয়ে যে লাথিটা চালালেন সেটা এড়ানোর কোনও নিয়মই জানা ছিল না লোকটার। এত দ্রুত কেউ পা বা হাত চালাতে পারে তা এ দেশের পেশাদাররাও বোধহয় এখনও ভেবে উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় লোকটা শব্দ করল না। পিষ্ট ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে কার্পেটে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

প্রথম লোকটা হাঁটু চেপে বসা অবস্থায় এক অদ্ভুত ভয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ববির দিকে। ববি

একটু ঝুঁকে হাতের কানা দিয়ে তার মাথায় মারলেন। লোকটা ঢলে পড়ে গেল।

কয়েকজন বেয়ারা কিছু আন্দাজ করে এগিয়ে আসছিল এদিকে। ববি দাঁড়ালেন না, চোখ-সওয়া অন্ধকারে কয়েকটা টেবিল তফাতে সরে গেলেন।

টয়লেটের দরজায় দাঁড়িয়ে চিকা, ঘটনাস্থলের দিকে চেয়ে ছিল। এগোল না।

ববি রায় দরজার কাছ বরাবর এগিয়ে গেলেন। একবার ফিরে তাকালেন। কেউ তাঁকে লক্ষ করছে কি? করুক, এখন আর ক্ষতি নেই।

ববি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সেই ট্যাক্সিটা এখনও অপেক্ষা করছে। ববি রায় পিছনের দরজা খুলে ভিতরে উঠে বসলেন।

চলো।

ট্যাক্সি চলতে লাগল। ববি রায় তিক্ততার সঙ্গে ভাবলেন, এইভাবে সারাক্ষণ বেঁচে থাকার কোনও মানে হয়? এই শারীরিকভাবে বেঁচে থাকা এবং অবিরল দ্বৈরথ এটা কোনও ভদ্রলোকের জীবন নয়।

আপাতত পিছনে কোনও উদ্বেগজনক ছায়া নেই। কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিরাপদ। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ নয়।

মেরিন ড্রাইভে ট্যাক্সি বদলালেন ববি। তারপর হোটেলে ফিরলেন।

এখানে নিশ্চয়ই আরও দু'টি ছায়া তার জন্য অপেক্ষা করছে!

করুক, ববি রায় তাদের সময় দেবেন।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। ববি ঘরে ঢুকবার আগে সামান্য দ্বিধা করলেন। দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে একটু অপেক্ষা করলেন। কিছু ঘটল না।

ঘরে ঢুকে আলোগুলো জ্বেলে দিলেন, কেউ নেই।

অ্যাটাচি কেসটা গুছিয়ে নিলেন ববি। তারপর রিসেপশনে এসে বিল মেটালেন।

পাঁচতারা হোটেলটায় যখন নিজের ঘরে ফিরে এলেন ববি তখন রাত প্রায় ন'টা।

রাত সাড়ে ন'টায় লীনার ঘরের ফোন বেজে উঠল।

হ্যাল্লো।—একটি আহ্লাদিত কণ্ঠ বোম্বাই থেকে বলে উঠল, কেমন আছেন মিসেস ভট্টাচারিয়া? গাড়ি কেমন চলছে?

এত অবাক হল লীনা যে কথাই জোগাল না মুখে।

শুনুন মিসেস ভট্টাচারিয়া, আমার ফরেন ট্রিপটা বোধহয় ক্যানসেল করতে হচ্ছে। কিন্তু এখনও আমার ফেরার উপায় নেই।

লীনার সমস্ত শরীর রাগে বিদ্বেষে ক্ষোভে ঠকঠক করে কাঁপছিল। চাপা হিংস্র স্বরে সে বলল, ইউ... ইউ স্কাউন্ড্রেল, আপনি ওকে খুন করলেন? আপনাকে আমি পুলিশে দেব।

কাকে খুন করলাম মিসেস ভট্টাচারিয়া?

আপনি জানেন না?

মিসেস ভট্টাচারিয়া, যাকে রোজই দু'-চারটে করে খুনখারাপি করতে হয় তার পক্ষে সব ক'জন ভিকটিমকে মনে রাখা কি শক্ত নয়?

ওঃ, ইউ আর হোপলেস!

এখন, নিজেকে একটু গুছিয়ে নিন। মনে করুন, আপনি একজন কম্পিউটার। তথ্য ছাড়া আপনার মধ্যে কোনও আবেগ বিদ্বেষ ক্ষোভ কিছুই নেই। শুধু তথ্যটি দিন মিসেস ভট্টাচারিয়া। কে খুন হল?

আপনি তাকে ভালই চেনেন। আপনি তাকে আমার পিছনে লাগিয়েছিলেন গোয়েন্দাগিরির জন্য। আপনি তাকে—

মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনি কি কুইজ মাস্টার? অবশ্য মেয়েদের ক্ষেত্রে মাস্টার হয় কি না আমি জানি না। মেইড বা মিস্ট্রেস হবে হয়তো। বাইদি বাই, আপনি ইন্দ্রজিতের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

সে খুন হয়েছে?

হয়েছে এবং তাকে খুন করেছেন আপনি।

ববি বিনা উত্তেজনায় বললেন, আপনি তার ডেডবডি দেখেছেন?

না, কিন্তু সবাই দেখেছে। তার অফিসে এখনও রক্ত পড়ে আছে।

খুনটা কখন হল?

বিকেলে।

কাজটা আমার পক্ষে একটু শক্ত মিসেস ভট্টাচারিয়া।

তার মানে?

আপনি যে কেন সব কথারই এত মানে জানতে চান! কাজটা বেশ শক্ত মিসেস ভট্টাচারিয়া, কারণ বম্বে থেকে কলকাতায় কাউকে খুন করার মতো ডিভাইস আমার মতো জিনিয়াসও আজ অবধি তৈরি করতে পারেনি।

আপনি বোম্বে থেকে কথা বলছেন?

হ্যাঁ মিসেস ভট্টাচারিয়া, বিশ্বাস না হয় আপনি লাইন কেটে দিয়ে কলব্যাক করতে পারেন।

আপনি সত্যিই বোম্বেতে?

হ্যাঁ। এবার ঘটনাটা একটু সংক্ষেপে বলুন তো, ফ্রিলগুলো বাদ দেবেন। চোখের জল, আহা-উঁহু, সেন্টিমেন্ট এসব কোনও কাজের জিনিস নয়। টেলিফোনের বিল বাড়বে।

আপনি... আপনি একটা...

তিন সেকেন্ড পার হয়ে গেল মিসেস ভট্টাচারিয়া।

মিসেস নয়। মিস...

আরও দু' সেকেন্ড...

আপনি এরকম কেন বলুন তো?

আরও তিন সেকেন্ড...

॥ ৭ ॥

লীনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, উইল ইউ প্লিজ স্টপ কাউন্টিং মিস্টার রায়?

কাউন্টিং হেল্পস, ইউ নো। সবকিছুই কাউন্ট করা ভাল। নাউ, আউট উইথ ইয়োর স্টোরি।

লীনা ভিতরকার দুর্দম রাগটাকে ফেটে পড়া থেকে অতি কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল, চোখ বুজে এবং ভীষণ জোরে টেলিফোনটা চেপে ধরে। সবেগে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, অল রাইট। বলছি।

লীনা বলল এবং ওপাশে ববি রায় একটিও শব্দ না করে শুনে গেলেন। শব্দহীন ফোনে কথা বলতে বলতে লীনার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, লাইন কেটে গেল নাকি!

শুনছেন?

শুনছি। বলে যান।

বিবরণ শেষ হওয়ার পর ববি রায় বললেন, লোকটার মরা উচিত ছিল অনেক আগেই। এ

ডাউনরাইট স্কাউন্ড্রেল। সেই খাতাটা এখন কোথায় বলতে পারেন?

কেন?

খাতাটার জন্য কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে।

দ্যাট উইল ডু এ লট অফ গুড টু ইউ। লোকটাকে আপনি আমার পিছনে লাগিয়েছিলেন কেন তা জানতে পারি?

ওনলি অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট, মিসেস ভট্টাচারিয়া। আমার সেক্রেটারি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য কি না তা জানার দরকার ছিল।

আমার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার মধ্যে কোন অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট থাকতে পারে মিস্টার নোজি পারকার?

আমি আপনার পার্সোনাল লাইফে ইন্টারেস্টেড নই মিসেস ভট্টাচারিয়া। ইন ফ্যাক্ট আপনার পার্সোনাল লাইফটা খুবই ডাল, ড্র্যাব, আনড্রামাটিক এবং শেমফুল।

ইউ... ইউ ..

কিন্তু আপনার লাইফটা হঠাৎ একটা ড্রামাটিক টার্ন নিতে পারে মিসেস ভট্টাচারিয়া। ড্রামাটিক অ্যান্ড ডেঞ্জারাস। আপনার সেই রোমিওটি কোথায়? তার যদি অন্য কোনও কাজ না জুটে গিয়ে থাকে, ইফ হি ইজ স্টিল এ ভ্যাগাবন্ড, তা হলে ওকে আপনার বডিগার্ড হিসেবে ইউজ করুন না কেন! নিতান্ত কাওয়ার্ডরাও প্রেমে পড়লে অনেক সাহসের কাজ করে ফেলে।

কথায় আছে অধিক শোকে পাথর। লীনার এখন সেই অবস্থা। এইসব গা-জ্বালানো কথায় সে যতখানি রাগবার রেগেছে। আরও রেগে যাওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব! প্রত্যেক মানুষেরই তো একটা বয়লিং পয়েন্ট থাকে, তারপরে আর গরম হওয়া তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং লীনা পাথর হয়ে গেল। এবং খুব শান্ত হিমেল গলায় বলল, হোয়াই শুড আই নিড এ বডিগার্ড?

বিকজ ইউ আর ইন মরটাল ডেঞ্জার, মাই ডিয়ার।

ড্রপ দি ডিয়ার বিট। আমি আপনার একটি কথাও বিশ্বাস করছি না। আমি আজই রিজাইন করছি, এক্ষুনি।

তাতেই কি বাঁচবেন?

আপনার মতো অভদ্র, বর্বরের সঙ্গে কাজ করতে আমি ঘেন্না করি। আপনি আমাকে ভয় দেখানোর ছেলেমানুষি চেষ্টা করছেন। আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।

আর কয়েক সেকেন্ড ধরে থাকুন এবং শুনুন। প্লিজ।

আমি আপনার কোনও ব্যাপারেই থাকতে চাই না। আপনি আমাকে একগাদা ভুল কোড দিয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে মজা করেছেন। ইয়ারকির একটা শেষ থাকা উচিত মিস্টার রায়।

তিন মিনিটের ওয়ার্নিং হল এবং ববি এক্সটেনশন চেয়ে নিলেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, ভুল কোড নয়। দেয়ার ইজ এ কোড অলরাইট। তবে পারমুটেশন কম্বিনেশন করে বের করতে হবে। একটু মাথা খাটাতে হয় মিসেস ভট্টাচারিয়া, একটু মাথা খাটালেই...

ঝপাং করে টেলিফোন রেখে দিল লীনা। তারপর রাগে ক্ষোভে আক্রোশে একা একা ফুঁসতে লাগল।

ফোনটা রেখে ববি রায় একটু কাঁধ ঝাকালেন।

পিছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, কাজটা ভাল হচ্ছে না স্যার।

ববি বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি যে চিংড়ি মাছটা খাচ্ছ তার দাম কত জানো?

না স্যার।

আমিও জানি না। কিন্তু দেড়শো টাকার কম হবে না।

ও বাবা! বাকিটুকু কি খাব স্যার? দাম শুনে যে ভারী লজ্জা হচ্ছে।

ববি রায় চিন্তিতভাবে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, শুধু কি চিংড়ি? চিকেন ছিল না? রুমালি রোটি? চিকেন অ্যাসপ্যারাগাস স্যপ?

ভারী লজ্জা করছে স্যার।

করছে তো?

করছে।

তা হলে আমি যা বলি বা করি তা মুখ বুজে মেনে নেবে। বুঝলে?

ইন্দ্রজিৎ সেন চিংড়ির আর-একটা টুকরো মুখে দিয়ে বলল, মেনে না নিয়ে উপায় কী? তবু বলছি মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আপনি ভাল কাজ করছেন না। আপনার মর‍্যালে একটু লাগা উচিত ছিল।

ফের?

ভেবে দেখুন স্যার, আপনার অ্যাডভারসারিরা মোটেই সুবিধের লোক নয়। তারা ইনফরমেশনের জন্য খুন অবধি করতে পারে।

কাউকে না কাউকে তো বিপদে পড়তেই হবে। সবাইকে বাঁচিয়ে কি চলা যায়?

তবু উনি আফটার অল একজন মহিলা।

আমার কাছে মহিলাও যা, পুরুষও তা। ওনলি পার্সন।

আপনি কিন্তু স্যার, একটু ক্রুয়েল-হার্টেড আছেন। ওই যে ফোনে বললেন, আমার অনেক আগেই মরা উচিত ছিল ওটা থেকেই বোঝা যায় আপনার মায়া-দয়া নেই।

ইন্দ্রজিৎ, ইউ আর স্টিল ইটিং দ্যাট চিংড়ি। টেস্টফুল, হেলথ-গিভিং, কস্টলি। তোমার কৃতজ্ঞতাবোধ নেই?

আমি চিংড়িটার আর কোনও স্বাদ পাচ্ছি না স্যার।

তোমার মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না ইন্দ্রজিৎ। মনে হচ্ছে, ইউ আর ইমমেনসলি এনজয়িং ইয়োর মিল।

ইন্দ্রজিৎ আর-একটা টুকরো মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে বলল, এদের রান্না যে ভীষণ ভাল স্যার। এনজয় করতে চাইছি না, তবু খাওয়াটা থামাতেও পারছি না। ক্যালকাটা টু বম্বে ফ্লাইটে কিছুই খাওয়াল না স্যার। শুধু দু'খানা প্লাস্টিকে মোড়া বিস্কুট আর কফি। বড্ড খিদেও পেয়েছিল। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স যে কী কেপ্পন হয়ে গেছে কী বলব স্যার! তাই খিদের মুখেই খাচ্ছি। তবে স্বাদ অনেকটাই কম লাগছে স্যার।

ববি রায় ভ্রু কুঁচকে ইন্দ্রজিতের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, ইজ শি স্মার্ট?

বেশ স্মার্ট।

তুমি মার্ডারটা যেভাবে সাজিয়েছ তা কি ফুলপ্রুফ?

ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে দুঃখিতভাবে বলল, পৃথিবীতে কিছুই ফুলপ্রুফ না স্যার।

মেয়েটা সন্দেহ করবে না তো?

এখনও তো করেনি। কিন্তু আমার খুন হওয়াটা কেন সাজাতে হল সেটাই তো বুঝতে পারছি না, স্যার।

তোমার খুব বেশি বুঝবার দরকার কী?

তা অবশ্য ঠিক স্যার। তবে সকালে যে আমি লীনা দেবীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু পুরোপুরি আমার দোষ নয় স্যার। উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিসে এসে পড়েছিলেন।

সেইজন্যই তোমার খুন হওয়াটা দরকার ছিল হাঁদারাম।

কিন্তু খাতাটা ওকে দেখালেন কেন স্যার? ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল যে, আমিই ওর পিছনে স্পাইং করছি।

সেটারও দরকার ছিল। তুমি বুঝবে না। খাচ্ছ খাও।

ইন্দ্রজিৎ চিংড়ি শেষ করে পুডিং খেতে খেতে বলল, কাজটা ঠিক হল না স্যার।

কোন কাজটা?

মেয়েটাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা।

ইন্দ্রজিৎ, তুমি একটা সত্যি কথা বলবে?

বরাবরই বলে আসছি।

তুমি মেয়েটার প্রেমে পড়োনি তো?

ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজে বলল, এদের পুডিংটা রাজা। ওফ, কী স্বাদ!

আর ইউ ইন লাভ উইথ দ্যাট গার্ল?

ইন্দ্রজিৎ চোখ নামিয়ে বলল, মেয়েটার চোখ দুটো ভারী ভাল।

বুঝেছি।

ববি রায় কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন। তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, ক্রাইসিসটা যদি কাটে, তা হলে ইউ মে গো অ্যাহেড উইথ দ্যাট গার্ল।

থ্যাংক ইউ স্যার।

কিন্তু ক্রাইসিসটা কাটবে কী করে? ববি রায় আবার চিন্তিতভাবে ঘরজোড়া নরম কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে করতে বললেন, আমি মৃত্যুকে এড়াতে পারি না আর। কিছুতেই না। জাল অনেক ছড়িয়ে পাতা হয়েছে। শোনো ইন্দ্রজিৎ...

বলুন স্যার।

আমার মৃত্যুর আগে ইনফরমেশনটা কিল করা চলবে না। কিন্তু আমার মৃত্যু ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তা কিল করতে হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?

পারছি স্যার।

ভুল করলে চলবে না ইন্দ্রজিৎ।

ভুল হবে না স্যার।

আমাকে খুন করার পর মেয়েটাকে ওরা খুন করার চেষ্টা করতে পারে। অন্তত দে উইল পাম্প হার ফর ইনফরমেশন। টেক কেয়ার ইন্দ্রজিৎ। মেয়েটা যেন খামোখা না মরে।

কিন্তু আপনি কখন খুন হবেন স্যার?

ববি রায় অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন। জানলার পরদা সরিয়ে বাইরে চেয়ে বললেন, ওই যে সব দূরে দূরে বাড়ি রয়েছে, ওখান থেকে টেলিস্কোপিক রাইফেল তাক করে গুলি চালানো হতে পারে।

ও বাবা!

ববি রায় ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমার খাবারে বিষ মেশানো হতে পারে।

মাই গড!

ইন ফ্যাক্ট, ইন্দ্রজিৎ, তুমি এতক্ষণ ধরে যেসব সুস্বাদু খাবার খেলে তার মধ্যে সায়ানাইড থাকলে আমি অবাক হব না।

ইন্দ্রজিৎ করুণ মুখ করে বলল, স্যার, এইভাবেই কি প্রতিশোধ নিচ্ছেন! খাইয়ে, তারপর ভয় দেখিয়ে?

ববি রায় আনমনে পায়চারি করতে করতে বললেন, আরও কতরকম পথ খোলা আছে ওদের কাছে। শুধু সময়টা জানতে পারলে ভাল হত।

হ্যাঁ স্যার। আমাদেরও কত কাজের সুবিধে হয়ে যায় তা হলে। একটা কথা বলব স্যার?

বলো।

ডিটেকটিভদের রিভলভার বা পিস্তল না থাকলে ভাল দেখায় না।
তুমি আমার পিস্তলটা চেয়েছিলে, না?
হ্যাঁ স্যার। যদি মরেই যান তা হলে পিস্তলটা অন্তত...
তোমার তো লাইসেন্স নেই ইন্দ্রজিৎ।
না থাক। ওটা আমি লুকিয়ে রাখব।
আমার মৃত্যু অবধি অপেক্ষা করো, ইন্দ্রজিৎ।
তাতে কী লাভ স্যার? আপনি মরলে পুলিশ ডেডবডি সার্চ করে ওটা নিয়ে যাবে।
এবার কাকে ক্রুয়েল-হার্টেড মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ?
আপনাকেই স্যার।
কেন?
যে নিজের মৃত্যুটাকেও ওরকম হেলাফেলা করে তার মতো নিষ্ঠুর আর কে আছে?
তুমি আঁচিয়ে এসো, ইন্দ্রজিৎ।
যাচ্ছি স্যার। একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনার গলায় ওই অদ্ভুত সোনার চেনটা কেন স্যার?
ওটা চেন নয়।
তা হলে?
স্যাক্রেড থ্রেড। পৈতে।
তার মানে?
ছেলেবেলায় আমার একবার পৈতে দেওয়া হয়েছিল। মা বলেছিল, এ ছেলে তো পৈতে গলায় রাখবে না, ছিঁড়ে গেলে ফেলেই দেবে। তাই সোনার পৈতে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে আছে। কিন্তু আর সময় নেই ইন্দ্রজিৎ, আমাদের এবার উঠতে হচ্ছে।

বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপটা দিয়ে এল লীনা। তারপর স্টিরিয়োতে গান শুনল বহুক্ষণ। ইংরিজি, রবীন্দ্রসংগীত, সরোদ।

অস্থিরতা তবু কমল না।

সে ডাল, ড্র্যাব, আনড্রামাটিক এবং শেমফুল জীবন যাপন করে? সে এতই সস্তা? এত খেলো? লোকটা তাকে ভাবে কী?

ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা জল খেল লীনা। তারপর পেপারব্যাক থ্রিলার খুলে বসল। কোনও লাভ নেই এসব করে, সে জানে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো এখন অসম্ভব।

বই রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল লীনা। বেশ ঠান্ডা লাগছে। গায়ের গরম চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিল সে। ভুতুড়ে নিস্তব্ধ বাড়িতে সে একা জেগে। কোনও মানে হয় না।

ববি রায়? ববি রায়কে সে এতটুকু সহ্য করতে পারছে না। ওই বাফুন, ওই ক্লাউন, ওই বর্বরটাকে আর সহ্য করা সম্ভবও নয় তার পক্ষে। বলে কিনা, তার মরটাল ডেঞ্জার আসছে!

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল লীনা। মাথার ভিতরে টিক টিক করে উঠল। আজ বিকেলে কি তাকে সত্যিই কেউ অনুসরণ করেছিল? যদি করে থাকে, কেন? কেনই বা খুন হল ইন্দ্রজিৎ সেন?

এসব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই।

কিন্তু জবাব তো একটা লীনার চাই।

ঘরে এসে লীনা টেবলল্যাম্প জ্বেলে বসে গেল। একটা কাগজে পূর্বাপর ঘটনাবলী সে সাজিয়ে লিখতে লাগল। বড্ড অ্যাবরাপ্ট। হঠাৎ করে ববি রায়ের তাকে ডেকে পাঠানো এবং তারপর থেকে

যা কিছু ঘটেছে সবই অস্বাভাবিক এবং দ্রুতগতি। কিন্তু একটা প্যাটার্ন কি ফুটে উঠছে?

সে ববি রায়ের দেওয়া কোডগুলো পরপর লিখল। বয়ফ্রেন্ড থেকে শুরু করে বার্থ ডে, আই লাভ ইউ। পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে বলেছিল লোকটা। কী ছাই পারমুটেশন কম্বিনেশন করবে সে? এর কোনও মানে হয়?

তবে লীনা বুঝতে পারল, রহস্য যদি কিছু থেকেই থাকে তবে তা আছে ওই কম্পিউটারের গর্ভেই। কিন্তু সঠিক কোড না পেলে কম্পিউটার তো মুখ খুলবে না।

তা হলে?

টেবিলের ওপর হাতে মাথা রেখে ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত লীনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে টের পেল, ঘাড় টনটন করছে, হাত ঝনঝন করছে।

নিয়মমাফিক ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম আর আসন করে সে খুব গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

সাজগোজ সেরে আজ অনেক আগেই অফিসে বেরিয়ে পড়ল সে।

ববি রায়ের ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজা লক করল লীনা। তারপর কম্পিউটার টার্মিনালের সামনে বসল।

বয় লাভ।

নো অ্যাকসেস।

দাঁতে দাঁত টিপে ভাবতে লাগল লীনা। বয়ফ্রেন্ড। আই লাভ ইউ। বার্থ ডে। কী বদমাশ লোকটা! কী অসভ্য! এ মা! বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আই লাভ ইউ করে তারপর বার্থ ডে মানে বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার সংকেত! ছিঃ ছিঃ।

আনমনে লীনা কিছুক্ষণ বসে রইল। লোকটা কি পারভার্ট?

সারা সকাল নানারকম কম্বিনেশন করে দেখল লীনা। কম্পিউটার কোনও সংকেতই দিতে পারল না।

তা হলে কি চিট করেছে লোকটা? তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে?

ববি রায়ের ঘরে অনেকবার টেলিফোন বাজল। সুভদ্র সেক্রেটারির মতো লীনাকে কোকিলকণ্ঠে নানাজনকে জানাতে হল যে উনি আউট অব স্টেশন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

বিকেলের দিকে আজও আসবে দোলন।

তারা বেড়াবে। কোথাও খাবে। সিনেমা দেখবে ঘোরবে।

কিন্তু রোমান্টিক বিকেলটা টানছিল না আজ লীনাকে। টানছিল ববি রায়ের ভিডিয়ো ইউনিট। আর কোড।

কিন্তু কোড আর কিছু বাকি নেই।

লীনার মাথাটা একটু পাগল-পাগল লাগছিল শেষ দিকে। ভিডিয়ো ইউনিটটার দিকে চেয়ে সে বলল, আই হেট ইউ, আই হেট ইউ ববি রায়।

বিদ্যুৎচমক! ববি রায়! আট অক্ষর।

লীনা দ্রুত চাবি টিপল। ববি রায়।

ভিডিয়ো ইউনিটে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল।

লীনা অবাক হয়ে দেখল, ইংরিজি অক্ষরে লেখা, বম্বে রোড ধরে ঠিক পঁচিশ মাইল চলে যাও। বাঁদিকে একটা মেটে রাস্তা। গাড়ি যায়। তিন মাইল। একটা বাড়ি। নাম নীল মঞ্জিল। খুব সাবধান। রিপিট, খুব সাবধান। কেউ যেন তোমাকে অনুসরণ না করে। এই মেসেজটা এক্ষুনি কিল করে দাও, প্লিজ।

লীনা মুখস্থ করে নিয়ে, মেসেজটা কিল করে ভিডিয়ো ইউনিট বন্ধ করল।

দোলন এসেছে। রিসেপশন থেকে ফোনে জানাল।

ট্যাক্সিতে বসে ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যার?

মালাবার হিলসের দিকে। একটা বার-কাম রেস্টুরেন্টে।

বোম্বাই প্রহিবিটেড শহর, স্যার। এখানে বার-কাম রেস্টুরেন্ট নেই।

আছে। প্রাইভেটলি আছে। যেখানে যাচ্ছি সেটা খুবই প্রাইভেট জয়েন্ট। হয়তো আমাদের ঢুকতে দেবে না।

তা হলে কী করবেন?

তোমাকে প্লেন ভাড়া দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছি কেন হাঁদারাম? বুদ্ধি খাটিয়ে এসব সমস্যার সমাধান করার জন্যই তো?

তা বটে। কিন্তু কাজের আগে ওরকম ফাঁসির খাওয়া খাওয়ালেন, এখন যে শরীর আইঢাই করছে, ঘুমও পাচ্ছে।

খাওয়ালাম মানে? জোর করে খাইয়েছি নাকি? তুমিই তো এসে প্রথম কথাটাই বললে, স্যার, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। জাহাজ পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারি। বলোনি?

বলেছি! খিদেও পেয়েছিল। তখন তো স্যার জানতাম না যে খাওয়ার পর আবার কপালে দুঃখু আছে।

বেশি খাও কেন ইন্দ্রজিৎ? বাঙালিরা বড্ড বেশি খায়, তাই কাজ করতে পারে না।

ইন্দ্রজিৎ অমায়িক গলায় বলল, গরিবের তো ওটাই দোষ স্যার, মাগনা খাবার পেলেই দেদার খায়। তবে ভাববেন না স্যার, পারব। ওখানে কি মারপিট হবে? তা হলে অবশ্য...

তোমার মারপিটের ধাত নয় ইন্দ্রজিৎ। আমি জানি। কিন্তু বিপদ ঘটলে অন্তত দৌড়ে পালাতে হতে পারে।

সেটা পেরে যাব। পালানোটা আমার ধাতে খুব সয়।

ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে বসলেন। অনেক রাত হয়েছে। মেরিন ড্রাইভ ফাঁকা। হু হু করছে হাওয়া আর সমুদ্রের কল্লোল। গাড়ি অতি দ্রুত পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছিল।

কত দূরে স্যার?

বেশি দূরে নয়। নার্ভাস লাগছে না তো ইন্দ্রজিৎ?

না স্যার। তবে আপনার মোডাস অপারেন্ডিটা বুঝতে পারছি না।

আগে থেকে বুঝবার দরকার কী?

আমার ভূমিকাটা কী হবে?

তোমার ভূমিকা খুব সাধারণ। যদি কিছু হয় তা হলে তুমি পালাবে এবং যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পুলিশে একটা খবর দেবে। মিসেস ভট্টাচারিয়াকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবে।

উনি মিসেস নয় স্যার, মিস।

অল দি সেম।

একটু ঝুঁকে ববি ড্রাইভারকে রাস্তার নির্দেশ দিলেন। গাড়ি বাঁক নিল। একটু বাদে যেখানে ববি গাড়িটা দাঁড় করালেন সে জায়গাটা রেস্টুরেন্টের সম্মুখ নয় বটে, কিন্তু সেখান থেকে রেস্টুরেন্টটার দরজা দেখা যায়। দিনের বেলায় যেমন ঝা-চকচকে লেগেছিল এখন সেরকম লাগছে না। বাইরে আলোর কোনও খেলা নেই, উজ্জ্বলতা নেই। বরং যেন একটু বেশি অন্ধকারই লাগছিল, একটিমাত্র বালবের আলোয়।

ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ববি রায় নামলেন।

এসো ইন্দ্রজিৎ।

দু'জনে দ্রুত পায়ে এগোল। কয়েকটা নিঝুম গাড়ি পার্ক করা রয়েছে রাস্তার দু'ধারে। গাড়ির চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ মোটরবাইক আর স্কুটার। রাস্তায় কোনও লোকই নেই।

রেস্টুরেন্টের দরজা আঁট করে বন্ধ। একজন গরিলার মতো চেহারার লোক দরজার পাশে অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়ানো, পাথরের মূর্তির মতো।

শান্তভাবে, একটু ঝুঁকে উর্দিপরা একটা হাত বাড়িয়ে গরিলা তাদের বাধা দিল। খুবই নিম্ন, কিন্তু গম্ভীর গলায় বলল, ভিতরে যাওয়া বারণ। তোমরা কী চাও?

গরিলা ইংরিজি বলে, তবে ভাঙা ভাঙা এবং ভুলে ভরা। তবে ভঙ্গিটা বুঝিয়ে দেয় যে, ইংরেজির জন্য নয়, তাকে রাখা হয়েছে আরও গুরুতর কাজের জন্য।

ববি রায় ভারী অমায়িক হেসে বললেন, কাস্টমার।

হোয়াট কাস্টমার? গো অ্যাওয়ে।

ববি রায় পকেটে হাত দিলেন। একখানা ভাঁজ করা পঞ্চাশ টাকার নোট প্রস্তুত ছিল। গরিলার হাতে সেটা চোখের পলকে চালান হয়ে গেল।

গরিলা ভ্রু কুঁচকে বলল, নো কিডিং।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ধরল গরিলা। উদ্দণ্ড নাচ-গান চেঁচামেচির শব্দ তেড়ে এল ভিতর থেকে। কানের পরদায় ধাক্কা দিল উন্মত্ত ড্রামের আওয়াজ। দু'জনে টুক করে ঢুকে গেল ভিতরে।

ধোঁয়া, শব্দ, ক্যালেডিয়োস্কোপিক আলোর খেলায় যৌবনের প্রলাপ সমস্ত ঘরটাকে, যেন ভেঙেচুরে ফেলছে। পায়ের তলায় সুস্পষ্ট ভূমিকম্প। চোখ জ্বালা করে, মাথা পাগল-পাগল লাগে। অন্ধকার ও আলোর এমনই পাগলা সমন্বয় এবং দ্রুত অপস্রিয়মাণ নানা রং যে ভিতরটায় প্রকৃতই কী হচ্ছে তা বোঝা যায় না। তবে মেঝের অনেকটা পরিসর ফাঁকা করে তৈরি হয়েছে নাচের জায়গা। সেখানে ভুতুড়ে অবয়বের বহু মেয়ে আর পুরুষের শরীর বাজনার আদেশে সঞ্চালিত হচ্ছে বহু ভঙ্গিমায়।

ইন্দ্রজিৎ প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কানে এল ববি রায়ের কঠিন স্বর, চলে এসো, সময় নেই।

কোথায় স্যার?

কাম অন। আই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট গার্ল।

ইন্দ্রজিৎ আর শব্দ করল না। ববি রায়ের পিছু পিছু এগোতে লাগল। গাঁজা, চণ্ডু, চরস, মদ কী নেই এখানে? নেশার জগৎ যেন কোল পেতে বসে আছে।

ববি রায় নৃত্যপর নর-নারীর ভিতর দিয়ে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সোজা কথায়, তাঁকেও মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে নেচে নিতে হচ্ছিল। ইন্দ্রজিৎ অতটা পেরে উঠছিল না। তার আর ববি রায়ের মাঝখানে দোল-খাওয়া ঝুল-খাওয়া নানা শরীর এসে পড়ছে। কখনও মেয়ে, কখনও পুরুষ, কখনও জোড়া।

হাঁফাতে হাঁফাতে ইন্দ্রজিৎ বলল, স্যার, আমি যে আপনার মতো নাচতে জানি না, এগোব কী করে?

ববি রায় তার দিকে দৃকপাত না করে বললেন, সামটাইম উই ডোন্ট ড্যান্স ইন্দ্রজিৎ, বাট উই আর মেড টু ড্যান্স। তোমাকে নাচতে হবে না, ধাক্কা দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে চলে এসো। দে ওন্ট মাইন্ড।

নাচের ফ্লোরটা অনায়াসে পেরিয়ে গেলেন ববি। আর সঙ্গে সঙ্গেই একজন বিশাল চেহারার যুবক তড়িৎগতিতে এসে তার একটা হাত ধরে ফেলল শক্ত পাঞ্জায়, ওয়েট এ মোমেন্ট প্লিজ, আর ইউ এ মেম্বার? দিস প্লেস ইজ ওপেন ফর পাবলিক ওনলি আপ টু সেভেন পি এম। আফটার সেভেন ইটস ফর মেম্বারস ওনলি।

ববি রায় চিন্তিত মুখে যুবকটির দিকে তাকিয়ে খুব ভদ্র গলায় বললেন, না, আমি মেম্বার নই। তবে আমার এক বন্ধু আমাকে এখানে নেমন্তন্ন করেছিল। তার নাম চিকা।

দৈত্যাকার যুবকটি কি একটু ধন্দে পড়ে গেল? সামান্য একটু দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সে মাথা নেড়ে বলল, চিনি না। কে চিকা?

খুব সুন্দর একটি মেয়ে।

চিকা বলে কেউ এখানে নেই।

ববি রায় অত্যন্ত অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তার সঙ্গে যে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। রোম্যান্টিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

যুবকটি ববি রায়কে ক্রুর চোখে অপাঙ্গে দেখে জরিপ করে নিচ্ছিল। হঠাৎ বলল, এখানে তুমি ঢুকলে কী করে?

চিকা বলেছিল, ডোরম্যানকে ঘুষ দিলে ঢোকা যায়।

মাই গড, ইউ ব্রাইবড দা ডোরম্যান?

আই ডিড।

ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

কোথায়?

এদিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার একটা চোরা পথ আছে। ডোন্ট স্পয়েল দা শো। গেট আউট অফ হিয়ার।

ইন্দ্রজিৎ পিছন থেকে একটু কাঁপা গলায় বলল, তাই চলুন, স্যার।

ববি রায় ইন্দ্রজিতের দিকে ফিরে খুব শীতল গলায় ইংরেজিতে বললেন, যাও, আমাদের ফোর্সকে সিগন্যাল দাও। তারা এবার ঢুকে পড়ুক।

এ কথায় যুবকটি যেন হঠাৎ কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। ববির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বিবর্ণ মুখে বলল, তুমি পুলিশের লোক? কিন্তু... কিন্তু আমরা তো প্রাইভেট। পুলিশকে আমরা কখনও ফাঁকি দিই না...

ববি একটা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, যাও ইন্দ্রজিৎ, ডেকে আনো।

যুবকটি টপ করে এগিয়ে এসে ইন্দ্রজিতের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, জাস্ট এ মোমেন্ট। চিকাকে তোমাদের কী দরকার?

ববি রায় হিম-শীতল গলায় বললেন, দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস, মিস্টার হাসলার। গিভ মি হার হোয়ার অ্যাবাউটস।

দেন হোয়াট? উইল ইউ লিভ?

আই শ্যাল।

কাম উইথ মি।

যুবকটি ঘরের শেষ প্রান্তে একটি কাউন্টারের পিছনে একখানা কাচে ঢাকা ঘরে তাদের নিয়ে গেল। কাচের ঘর বলেই বাইরের শব্দ ভেতরে ঢোকে না।

যুবকটি দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ববির দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে বলল, তোমার আইডেনটিটি কার্ড দেখাও।

ববি যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে তাকে সম্মোহিত করার অক্ষম একটা চেষ্টা করতে করতে পকেটে হাত দিলেন।

ইন্দ্রজিৎ ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। সে জানে, ববি রায়ের ডান পকেটে রিভলভার থাকে। সে আরও জানে, ববি রায় যখন-তখন যা-খুশি করে ফেলতে পারেন। লোকটার হার্ট বলে কিছু নেই।

কিন্তু চোখ খুলে ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে দেখল, ববি রায় একটা আইডেনটিটি কার্ড যুবকটির নাকের ডগায় খুলে ধরে আছেন। তারপর সেটাকে পকেটে পুরে বললেন, ড্রাগ জয়েন্ট বাস্ট করা

আমার উদ্দেশ্য নয়। চিকার বিরুদ্ধেও অভিযোগ কিছু নেই। সে আমাকে একটা ব্যাপারে একটুখানি সাহায্য করবে। ব্যস।

যুবকটি অবিশ্বাসের চোখে ববি রায়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর টেবিল থেকে একটা প্যাড নিয়ে দ্রুত হাতে একটা ঠিকানা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে ববি রায়ের হাতে দিয়ে বলল, নাউ গেট আউট। প্লিজ।

ববি রায় নির্লজ্জের মতো যুবকটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আর ডোরম্যানকে যে ঘুষটা দিতে হয়েছে সেটার কী হবে?

যুবকটি দ্বিরুক্তি করল না, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকাটা দিয়ে দিল।

ববি রায় চলে আসতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন। যুবকটি তখনও সন্দেহকুটিল চোখে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। ববি রায় অমায়িকভাবেই বললেন, আমি জানি, তুমি চিকাকে এখন টেলিফোন করে সাবধান করে দেবে। আমি হয়তো এই ঠিকানায় গিয়ে ওকে পাব না। কিন্তু মনে রেখো, আই ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক। আই শ্যাল বি ব্যাক বিফোর লং।

এই হুমকিতে কতদূর কাজ হল কে জানে। তবে যুবকটি কোনও জবাব দিল না। যেমন চেয়ে ছিল তেমনই অপলক চেয়ে রইল। তার পাথুরে দৃষ্টিতে কোনও ভাবের প্রকাশ নেই। খুনিদের দৃষ্টিতে থাকেও না।

ট্যাক্সিওয়ালা ঘুমোচ্ছিল। ববি রায় তাকে মৃদু স্বরে ডেকে জাগালেন। মোটা টাকার চুক্তিতে ট্যাক্সিওয়ালা যদৃচ্ছ যাওয়ার কড়ারে রাজি হয়েছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, অব কাঁহা সাব?

বান্দ্রা।

ট্যাক্সি চলল। ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন।

স্যার, আমিও কি আপনার মতো একটু ঘুমিয়ে নেব?

আমি ঘুমোচ্ছি না, ইন্দ্রজিৎ। সহজে আমার ঘুম আসে না।

আমার আসছে।

তুমি ঘুমোও।

ইন্দ্রজিৎ একটা হাই তুলে বলল, স্যার, আপনি কি একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন না?

না। মনে রেখো, এখন আমার পালানোর পথ নেই। এয়ারপোর্টের রাস্তায় ওরা অ্যামবুশ করবে। হোটেলের ঘরে হানা দেবে। রাস্তায় আক্রমণ করবে। আমার এখন একটাই পথ খোলা। ওরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া।

আপনি আমাকে বলছিলেন যে, এরা ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়া গ্রুপ। এরা একা কাজ করে না। এদের অর্গানাইজেশন বিরাট। তা হলে আপনি একা কী করবেন, স্যার?

বোকা ছেলে! আমি যে কিছু করতে পারব তা তো বলিনি। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে বলে করে যাচ্ছি। বাংলায় কী একটা কথা আছে না, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!

আছে স্যার। কিন্তু আপনার কি বাঁচবার কোনও আশাই নেই?

মনে তো হচ্ছে না। ইন্ডিয়ান মাফিয়ারা ততটা এফিসিয়েন্ট নয়। অর্গানাইজেশনও দুর্বল। তাই আমি এখনও বেঁচেবর্তে আছি। আর শুধু মারলেই তো হবে না। আমার কাছ থেকে একটা ইনফরমেশনও যে ওদের বের করে নিতে হবে।

তা হলে আপনার কোনও আশাই নেই দেখছি।

ঠিকই দেখছ।

তা হলে এইবেলা রিভলভারটা আমার কাছে দিয়ে দিন না! দরকার হলে আমিই চালিয়ে দেব গুলি।

তোমাদের বাংলায় আরও একটা কথা আছে ইন্দ্রজিৎ, বাঁদরের হাতে খন্তা।

আছে স্যার।

তোমার হাতে রিভলভারও যা, বাঁদরের হাতে খন্তাও তাই।

তা হলে একটু ঘুমোই স্যার! শরীরটা টিস টিস করছে। একটা কথা স্যার, আপনি লোকটাকে একটা আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়েছিলেন। ওটা কিসের কার্ড?

ববি রায় প্রশ্নটার জবাব দিলেন না। ইন্দ্রজিৎ হতাশ হয়ে চোখ বুজল। ট্যাক্সি যখন বান্দ্রায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তখন দেড়টা বেজে গেছে। পাড়া নিঃঝুম।

মস্ত একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে ববি আর ইন্দ্রজিৎ একটু স্তব্ধ হয়ে রইল।

এবার স্যার?

শাট আপ। এসো।

ববি রায় কাগজটা খুলে আবার দেখলেন। চিকন মেহেতা। লালওয়ানি অ্যাপার্টমেন্টস। সাততলা।

লিফটে উঠে ববি রায় বললেন, চিকা রেডি আছে, বুঝলে ইন্দ্রজিৎ?

থাকবেই তো স্যার। আপনার সঙ্গে অত ভাব-ভালবাসা।

ইয়ারকি কোরো না ইন্দ্রজিৎ। বাঘের খাঁচায় ঢুকতে যাচ্ছ, এটা মনে রেখো। চিকাকে ওরা অ্যালার্ট করেছে। দারোয়ান যখন রাত দেড়টায় কাউকে ঢুকতে দেয় তখন বুঝতে হবে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখা হয়েছে। ঘুমটা ঝেড়ে ফেলে অ্যালার্ট হও।

লিফট সাততলা উঠে এল নিঃশব্দে। ববি রায় এবং ইন্দ্রজিৎ নেমে এল। করিডোর নানা দিকে চলে গেছে। ববি রায় দাঁড়িয়ে দিক ঠিক করে নিলেন।

বাঁদিকে করিডোরটা গিয়ে দুটো দিকে মোড় নিয়েছে। ডান দিকে চিকা ওরফে চিকনের ফ্ল্যাট।

বোম্বেতে এখন এরকম ফ্ল্যাটের ভাড়া কত স্যার?

আকাশপ্রমাণ।

তা হলে মহিলা বেশ মালদার বলতে হবে।

তা বটে।

ববি ডোরবেল-এ আঙুল রাখলেন।

দু'বার বাজাবার পর ভিতর থেকে ঘুম-জড়ানো মেয়েলি গলা শোনা গেল, হু ইজ ইট?

এ ফ্রেন্ড। ববি।

হু ইজ ববি?

এ কাস্টমার. ম্যাডাম। ওয়েলদি কাস্টমার।

শীট! আই শ্যাল কল দা পলিস।

ডোন্ট বদার। দিস ইজ পলিস। ওপেন আপ।

ভিতরটা একটা চুপ মেরে রইল।

তারপব চিকা বলল, কী চাও? আমি তো কিছু করিনি।

তা হলে ভয় কী? দরজা খোলো। আমার কয়েকটা কথা আছে।

ওয়েট, লেট মি ড্রেস।

একটু বাদে দরজা খুলে যখন চিকা দেখা দিল তখন তার চোখে ভয়, বিস্ময়, ঘুম তিনটেরই চিহ্ন রয়েছে।

ববি চাপা স্বরে ইন্দ্রজিৎকে বললেন, বিশ্বাস কোরো না। বোম্বে দিল্লি এখন অভিনয়ে কলকাতার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। এ মেয়েটি দারুণ অভিনেত্রী।

মেয়েটি দারুণ সুন্দরীও স্যার।

চিকা ববির দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, উই মেট ইন দা ইভনিং, ইজন'ট ইট?

রাইট। কাম ইন। হোয়াই ইউ হ্যাভ এ ফ্রেন্ড!

আমার এই বন্ধু একেবারেই জলঘট। ভয় নেই।

চিকার ফ্ল্যাট অসাধারণ সুন্দর। নরম একটা ঘোমটা পরানো আলোতেও দামি আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তা কোটিপতিদের ঘরে থাকে।

ববি রায় বসলেন। ইন্দ্রজিৎও।

তারপর ববি রায় বললেন, নাউ টক বিজনেস।

॥ ৯ ॥

চিকা সোফায় একগুচ্ছ ফুলের মতো এলিয়ে বসে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, হোয়াট বিজনেস?

ববি চিকার দিকে চেয়ে তাকেও সম্মোহিত করার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বললেন, ওরা কে?

কারা?

যারা আমাদের সি-বিচ থেকে ফলো করেছিল?

কারা ফলো করেছিল?

দু'জন লোক।

আমি জানি না, শুধু জানি, তুমি আমাকে ডিচ করে পালিয়ে গিয়েছিলে।

মিস চিকন মেহেতা, আমি জানি তোমাকে ওরা আমাকে ডাইভার্ট করার জন্য কাজে লাগিয়েছিল মাত্র। তুমি ওদের দলের কেউ নও।

চিকা তার রোবটা একটু ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, আমাকে কেউ কাজে লাগায়নি। চিকা অত চিপ নয়।

টক সেন্স চিকা, আমি তোমাকে এখনই তুলে থানায় নিয়ে যেতে পারি।

পারো না, তুমি পুলিশের লোক নও।

ববি যে তর্কযুদ্ধে এঁটে উঠছেন না, এটা বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিৎ ফিসফিস করে বলল, আপনার আইডেনটিটি কার্ডটা বের করুন না স্যার, রিভলভারটাও।

চুপ করো বুদ্ধু।

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে গেল। কিন্তু সেটা ধমক খেয়ে নয়, চোখের কোনা দিয়ে সে একটা খুব শব্দহীন সঞ্চার টের পেল। দক্ষ ডিটেকটিভের মতোই চমকে না উঠে খুব ধীরে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, চিকার বেডরুমের দরজা খুলে গেল। অন্ধকার ঘর থেকে দুটো আবছায়া মূর্তি দরজার ফ্রেম জুড়ে দাঁড়াল।

স্যার।

আঃ ইন্দ্রজিৎ!

দয়া করে ঘাড়টা একটু ঘোরাবেন স্যার? বিপদ গভীর।

ববি তাকে আমল না-দিয়ে চিকার দিকে চেয়ে বললেন, কী করে বুঝলে যে আমি পুলিশ নই?

জবাবটা চিকা দিল না, কিন্তু জবাবটা এল ববি রায়ের পিছন থেকে। পরিষ্কার ইংরেজিতে।

আমরা জানি মিস্টার রায়।

দু'জন লোকের একজন খুব ধীর পায়ে বেরোনোর দরজার দিকে সরে গেল। অন্যজন চিকার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। দু'জনেরই একটা করে হাত পকেটে।

ববি বিরক্তির চোখে পর্যায়ক্রমে দু'জনের দিকে তাকালেন। তারপর হতাশ গলায় বললেন, এবা তো তারা নয়, যারা আমাকে সি-বিচ থেকে ফলো করেছিল।

চিকার পিছনে দাঁড়ানো লোকটা মৃদু হেসে বলল, তাদের পক্ষে হসপিটালের বিছানা ছেড়ে এখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না মিস্টার রায়। দু'জনেরই কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর।

ববি রায় বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। বিষণ্ণ গলায় বললেন, ওরা নভিস, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরা নও।

না, মিস্টার রায়, আমরা সম্পূর্ণ পেশাদার। উই নো আওয়ার বিজনেস।

ববি রায় পিছনে হেলান দিয়ে খুব আয়েস করে বসলেন। বললেন, দেন টক বিজনেস।

চিকা উঠল। খুব লীলায়িত ভঙ্গিতে শরীরের সমস্ত উঁচুনিচু জায়গাগুলিকে খেলিয়ে আড়ামোড়া ভাঙল। একটা মিষ্টি হাই তুলে বলল, কারও ড্রিংকস চাই?

কেউ জবাব দিল না।

শুধু ইন্দ্রজিৎ চাপা গলায় বলল, স্যার মাগনা একটু ব্র্যান্ডি মেরে নেব? শুনেছি ব্র্যান্ডি খুব বলকারক। নার্ভাসনেসও কেটে যায় ব্র্যান্ডিতে।

না ইন্দ্রজিৎ, তোমাকে খুব নরমাল থাকতে হবে।

তা হলে একটা সিগারেট ধরাই?

ওরা ধরাতে দেবে না। পকেটে হাত দিলেই গুলি চালাবে।

ও বাবা! তা হলে দরকার কী? স্মোকিং আমি চিরতরেই ছেড়ে দিচ্ছি স্যার।

ববি লোকটার দিকে চেয়ে ছিল। চিকা ববির দিকে অর্থপূর্ণ একটু হাসি আর কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে যেন ভেসে ভেসে শোওয়ার ঘরে চলে গেল। ক্লিক শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

চিকার পরিত্যক্ত জায়গায় লোকটা বসল। তারপর বলল, দু'খানা হাত এমনভাবে রাখো যাতে সবসময় দেখা যায়। হঠাৎ কোনও মুভমেন্ট কোরো না। বি ভেরি কেয়ারফুল, উই আর নার্ভাস পিপল।

ববি শান্ত স্বরে বললেন, জানি, আই নো এভরিথিং অফ দিস ট্রেড। নাউ টক বিজনেস, তোমার নাম কী?

কল মি বস।

ববি হঠাৎ ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, শোনো ইন্দ্রজিৎ, যতদূর মনে হচ্ছে এরা বাংলা জানে না।

আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার।

তাই বলে রাখছি, যা-ই ঘটুক না কেন তোমাকে কিন্তু পালাতেই হবে।

পালাব? সেই কপাল করে এসেছি স্যার? দরজায় যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে খোলা রিভলভার।

জানি ইন্দ্রজিৎ। একটা সময় আসবে যখন দু'জনকেই আমি আমার দিকে ডাইভার্ট করতে পারব। যদি পারি তা হলে তুমি খুব সামান্য সময় পাবে পালানোর, কয়েক সেকেন্ড মাত্র। পালিয়ে কোনও হোটেলে গিয়ে উঠবে। তারপর মিসেস ভট্টাচারিয়াকে ফোন করবে।

মিসেস নয় স্যার, মিস।

একই কথা। যেটা ভাইটালি ইম্পর্ট্যান্ট তা হল মেসেজটাকে কিল করা।

কিন্তু কোডটা স্যার?

আমার নাম। নামটাই কোড। আর একটা কথা। পালাতে পারলে কাল সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরে যেয়ো। লুক আফটার মিসেস ভট্টাচারিয়া। শি ইজ ইন ডেনজার।

বস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার চমৎকার সাহেবি উচ্চারণের ইংরেজিতে বলল, নিজেদের মধ্যে কথা বলে লাভ নেই, সময় নষ্ট হচ্ছে।

ইন্দ্রজিৎ লোকটাকে খুব ভাল করে জরিপ করে নিয়ে মাথা নেড়ে বাংলায় বলল, আপনি পারবেন না স্যার, লোকটার চেহারা দেখেছেন? হাইট ছ'ফুট এক ইঞ্চি তো হবেই। কাঁধ দু'খানা ওয়েট-লিফটারের মতো, হাত দু'খানা বক্সারের, পেটে কোনও চর্বি নেই।

তার চেয়েও খারাপ ওর চোখ দু'খানা, ইন্দ্রজিৎ। চোখের দিকে তাকাও, পাক্কা খুনির চোখ।

দু'জনেরই স্যার। দরজার কাছে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাকেও একবার দেখুন।

দু'জনকেই দেখা হয়ে গেছে। চুপ করো।

বস ভ্রু কুঁচকে পর্যায়ক্রমে দু'জনকে দেখে নিচ্ছিল। তারপর ববির দিকে চেয়ে বলল, প্রথমে তুমি ওঠো, দেওয়ালের কাছে চলে যাও, দু'হাত উপরে তুলে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও।

ববি বাধ্য ছেলের মতো উঠলেন এবং নির্দেশমতো দাঁড়ালেন।

বস তার স্যাঙাতের দিকে চেয়ে বলল, ফ্রিস্ক হিম।

দ্বিতীয় লোকটা অত্যন্ত দক্ষ ও অভ্যস্ত হাতে ববির পকেট-টকেট হাতড়ে দেখল, তেমন কিছু নেই।

তোমার লিলিপুট পিস্তলটা কোথায়?

হোটেলে ফেলে এসেছি।

বস একটু চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে। বোসো। ওই দ্বিতীয় লোকটি কে?

আমার সঙ্গী।

বস এবার ইন্দ্রজিৎকেও অনুরূপ নির্দেশ দিল। তার কাছে অবশ্য একটা পকেট-নাইফ পাওয়া গেল। একটা রবার হোস-এর টুকরোও, দ্বিতীয়টা মানুষকে ছোটখাটো আঘাত করার পক্ষে চমৎকার। মাথায় মারলে যে-কেউ কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখবে।

বস ববি রায়ের দিকে চেয়ে বলল, এবার কাজের কথা মিস্টার রায়। আমরা কোডটা চাই।

কিসের কোড?

বস হাসল, তুমি শান্তি চাও, না যুদ্ধ চাও?

স্বাধীনতা চাই। আমাদের ছেড়ে দাও।

কথায় কথা বাড়ে। তুমিও অ্যামেচার নও মিস্টার রায়। তোমার অতীত নিয়ে আমরা অনেক রিসার্চ করেছি। ইলেকট্রনিকসে তুমি বিশ্বের পয়লা দশজনের মধ্যে একজন। তুমি যে-কোনও রাডারকে ইলেকট্রনিক তন্তুজাল দিয়ে আচ্ছন্ন আর অকেজো করে দিতে পারো, তুমি যে-কোনও সুপার কমপিউটারের মাইক্রোচিপ বানাবার ক্ষমতা রাখো, তার চেয়েও বড় কথা, তুমি যে ক্রাইটন যন্ত্র বানানোর ক্ষমতা রাখো তা হাজার মাইলের মধ্যে যে-কোনও পরমাণু বোমাকে তার নিজের বেস-এই বিস্ফোরিত করতে পারে। তুমি অতিশয় বিপজ্জনক লোক মিস্টার রায়।

ববি রায় একবার ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি একটি বেসরকারি মাল্টি-ন্যাশনালের সামান্য কর্মচারী মাত্র। ইলেকট্রনিকসে আমার কিছু হাতযশ আছে ঠিকই, কিন্তু তুমি যা জেনেছ তা হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি। একসময়ে আমি ইলেকট্রনিকস নিয়ে অনেক খেলা খেলেছি বটে, কিন্তু এখন কেবলমাত্র চাকরি করি। চাকরির বাইরে কিছু নয়।

চাকরিটা তোমার ক্যামোফ্লেজ মিস্টার রায়। আমরা সব জানি।

তোমরা আসলে কারা?

আমরা চটে গেলে তোমার শত্রু, খুশি থাকলে তোমার বন্ধু। যুদ্ধ চাও, না শান্তি চাও?

তোমরা কি ভারতীয় মাফিয়া?

বলতে পারো।

তোমাদের বস কে?

জেনে লাভ কী? আমাদের বস অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তুমি তার টিকিরও নাগাল পাবে না। তুমি কি আজেবাজে কথা বলে সময় কাটাতে চাইছ? লাভ নেই। আমরা তোমাদের দু'জনকে অজ্ঞান করে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব। আমাদের ডেরা খুব ভাল জায়গায় নয় মিস্টার রায়। সেখানে একটা টরচারিং চেম্বারও আছে।

থাকাই স্বাভাবিক। কোডটা বললে কি আমরা মুক্তি পাব?

আমরা অত বোকা নই। কোডটা বলার পর আমরা কলকাতায় আমাদের এজেন্টকে জানাব। সে কোডটা ফিড করবে এবং কমপিউটারের মেসেজ নিয়ে ভেরিফাই করবে। এ কাজে সময় লাগে মিস্টার রায়। ততদিন তুমি আর তোমার বন্ধু আমাদের মহামান্য অতিথি।

এই ফ্ল্যাটেই কি আমরা থাকব?

না, তোমাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে।

ভাল ব্যবস্থা কি? বাথরুম পরিষ্কার? ঘরে কার্পেট এবং টিভি আছে তো? রাঁধুনি কেমন? আমার এই বন্ধু খুব পেটুক।

লোকটা হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, তুমি বড্ড বেশি সময় নিচ্ছ মিস্টার রায়। আমরা তোমাকে আর সময় দিতে পারব না।

ববি রায় চাপা স্বরে বললেন, ইন্দ্রজিৎ তৈরি হও।

বস উঠে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে ববি রায় বসা অবস্থা থেকে হঠাৎ মেঝেয় গড়িয়ে পড়লেন। সোফা ও সেন্টার টেবিলের মাঝখানকার সংকীর্ণ পরিসরে।

ইন্দ্রজিৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, কারণ জীবনে আর-কখনও কোনও লোককে সে ডাঙায় সাঁতার কাটতে দেখেনি। আর কী নিখুঁত স্ট্রোক আর গতি! ববি রায় যে ডাঙায় এমন অসাধারণ সাঁতার দিতে পারেন কে জানত? কার্পেটের ওপর পড়েই তিনি চোখের পলকে মেঝের অনেকটা পেরিয়ে গিয়ে বসের গোড়ালিতে কী একটা কারুকাজ করলেন। বস চেঁচিয়ে উঠে এক পায়ে লাফাতে লাগল।

দরজার পাহারাদার নাঙ্গা পিস্তল হাতে ছুটে আসতেই উত্তেজিত ইন্দ্রজিৎ এক লাফে দরজায়।

পালাতে সে সত্যিই ওস্তাদ। দরজাটা খুলে বেরিয়ে যেতে তার কি এক ন্যানো সেকেন্ডও লেগেছে? আলোর গতিবেগকেও কি হার মানায়নি?

ববি রায় যদি ডাঙায় সাঁতার কাটতে পারেন তো ইন্দ্রজিৎও পারে সিঁড়িতে স্কি করতে। বাস্তবিকই সাততলা উঁচু থেকে অতগুলো সিঁড়ি সে একজন সুদক্ষ স্কি-বাজের মতোই পেরিয়ে এল।

একতলায় নেমে সে বোকার মতো তাড়াহুড়ো করল না। এসব বাড়িতে দারোয়ানরা সারা রাত চৌকি দেয়। সুতরাং সে খুব শান্তভাবে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

সে জানে, ববি এতক্ষণে খুন হয়ে গেছেন। তবে খুন হওয়ার আগে খুনিদের বিস্তর নাকাল করেছেন নিশ্চিত। বহুত ঝামেলাবাজ লোক।

কিন্তু ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিতের হঠাৎ মনে হল, ববি যদি কোডটা ওদের না বলে থাকেন তা হলে হয়তো এখুনি খুন হবেন না। পরে হবেন।

যাই হোক, আপাতত খুনিরা ইন্দ্রজিতের পিছু নেয়নি, দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেবে।

ইন্দ্রজিৎ একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল, একটা হোটেলে পৌঁছে যেতে তার বিশেষ সময় লাগল না। তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পেয়ে গেল কলকাতার লাইন। লীনার ঘরে টেলিফোন বাজার নির্ভুল শব্দ হচ্ছে।

তিনবার বাজতেই ওপাশ থেকে মেয়েলি গলা বলে উঠল, হ্যালো!

মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ, কে বলছেন?

আমি ববি রায়ের এক বন্ধু।

বন্ধু! কী ব্যাপার বলুন তো?

ব্যাপার ভাল নয় মিস ভট্টাচার্য।

ওঁর কি কিছু হয়েছে?

উনি গভীর বিপদে পড়েছেন।

মারা গেছেন কি?

দৃশ্যটা আমি চোখে দেখে আসিনি। তবে বিশেষ বাকিও নেই। উনি আপনাকে একটা খবর দিতে বললেন। কোডটা হল ববি রায়। মেসেজটা এক্ষুনি কিল করা দরকার। পারবেন?

আপনার নামটি কী বলুন তো?

আমার নাম? আসল নাম, না ছদ্মনাম জানতে চান? আসল নামটা এখন বলা যাবে না মিস ভট্টাচার্য। তবে ছদ্মনামটা হল— দাঁড়ান, একটু ভেবে বলি— আমার ছদ্মনামটা হল মহেন্দ্র সিং।

আপনারা দু'জনেই কি জোকার? গলাটা চেনা লাগছে কেন বলুন তো?

টেলিফোনে তো সকলের গলাই একরকম লাগে।

মোটেই নয়। যাক গে, ববি রায়ের সঙ্গে কি আপনার আর দেখা হবে?

ভগবান জানেন।

কারা ওঁকে মারার চেষ্টা করছে?

জানি না, তবে আপনিও সাবধান থাকবেন। আপনি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছেন মিস ভট্টাচার্য। ববি রায় অত্যন্ত খারাপ লোক, জেনেশুনে একজন মহিলাকে এরকম বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া কাপুরুষের কাজ।

দেখা হলে ববি রায়কেও কথাটা বলবেন। হি ইজ এ কাওয়ার্ড।

বলব ম্যাডাম। কিন্তু কোডটার কী হবে? মেসেজটা যে কিল করা দরকার।

ববি রায়কে এ কথাও বলবেন যে আফটার এ লং ওয়াইল্ড গুজ চেজ কোডটা আমিই ভেবে বার করি। ওই মেগালোম্যানিয়াকটা যে নিজের নামটাকেই কোড হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে এটা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল।

আপনি তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী!

ওকে এ কথাটাও বলে দেবেন যে মেসেজটা আজ বিকেলেই আমি কিল করে দিয়েছি।

থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এর জন্য ববি রায় নরকে বসেও আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।

ওর আশীর্বাদে আমার দরকার নেই। লেট হিম গো টু হেল।

হি ইজ গোয়িং ম্যাডাম। এতক্ষণে....

লীনা সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

আজ তার ঘুম আসেনি। চোখের পাতা সে এক করতে পারছে না বিছানায় শোওয়ার পর থেকেই।

মাঝরাতের এই ভুতুড়ে টেলিফোনে ঘুমের সামান্য রেশটাও কেটে গেল।

উঠে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, ঠান্ডা বাতাসের হিলিবিলি অনুভব করল শরীরে। অনেকক্ষণ।

ববি রায় কি তা হলে মারাই গেছেন? সত্যি?

কেউ মরলে তার কি দুঃখ পাওয়া উচিত নয়? যাই হোক, লোকটা তার কোনও ক্ষতি তো করেনি। একটু-আধটু অপমান করেছে মাত্র। তার জন্য কি লোকটার মৃত্যুতে নির্বিকার থাকা সম্ভব?

কম্পিউটারের রহস্যময় মেসেজটির কথা ভাবছিল লীনা, কোথায় সেই বোম্বে রোড, কোথায় কোন ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরের নীল মঞ্জিল? কার দায় পড়েছে সেখানে যাওয়ার?

লীনা দেখছিল রাস্তায় কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে। রোজই থাকে। গ্যারাজের অভাবে কত লোক রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখে।

কিন্তু হঠাৎ লীনার মনে হল, একটা গাড়ির ভিতরে অন্ধকারে একটা সিগারেটের আগুন ধিইয়ে উঠল।

লীনার শরীর শিউরে উঠল হঠাৎ।

॥ ১০ ॥

শেষ রাতে লীনার ঘুম হল বটে, কিন্তু সেই ঘুম দুঃস্বপ্নে ভরা, যন্ত্রণায় আকীর্ণ। বহুবার চটকা ভেঙে চমকে জেগে গেল সে। আবার অস্বস্তিকর তন্দ্রা এল। শেষ অবধি পাঁচটার সময় বিছানা ছাড়ল সে। কিছুক্ষণ আসন আর খালি হাতের ব্যায়াম করল। কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করল শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে।

তবু চনমনে হল না সে। মনটা কেন যেন ভীষণ ভার। আজ নড়তে চড়তে ইচ্ছে করছে না।

খুব কড়া কালো কফি খেল সে দু'কাপ। গরমে জিব পুড়ে গেল, কিন্তু কফির কোনও শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারল না সে।

একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে পায়ে চটি গলিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফটকের কাছে এল। কাল রাতে যে-গাড়িটাকে দেখা গিয়েছিল সেটা যে কোনটা, তা দিনের আলোয় চিনতে পারল না, ছোট গাড়ি, সম্ভবত ফিয়াট। এর বেশি আর কিছুই আন্দাজ করা যায়নি বারান্দা থেকে।

অবশ্য লীনার মনে হল, সে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। মধ্যরাতে কত লোক কত কাজে বেরোয়। সেরকম কিছুই হবে। মহেন্দ্র সিং নামক জোকারটি অবশ্য তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। সেরকম সতর্কবাণী কি ববি রায় কিছু কম উচ্চারণ করেছে?

ববি রায়। এই চারটি অক্ষর ভাবতে আজ ভারী কষ্ট হল লীনার। যেসব পুরুষেরা মেয়েদের দাবিয়ে চলে, যাদের পৌরুষের অহংকার হিমালয়-প্রমাণ, যারা অতিশয় একদেশদর্শী সেইসব পুরুষ শৌভেনিস্টদেরই একজন হলেন ববি রায়। তবু লোকটাকে যদি সত্যিই কেউ খুন করে থাকে তবে আরও অনেক রাত্রি ধরেই লীনা ঘুমোতে পারবে না। বার বার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙবে।

বাড়িতে থাকতে ভাল লাগছিল না লীনার। আজ সে সময় হওয়ার অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে বলে তৈরি হয়ে নিল।

আজ ব্রেকফাস্ট টেবিলে বহুকাল বাদে তার মা বলল, লীনা ডিয়ার, তোমাকে একটু রোগা দেখাচ্ছে কেন? বেশি ডায়েটিং করছ নাকি?

এ কথা শুনে লীনা ভারী কৃতজ্ঞ বোধ করল। যা হোক, তার মা তা হলে তাকে লক্ষ করেছে। তবে খুশি হল না লীনা, বলল, থ্যাংক ইউ ফর টেলিং।

তাদের বাড়িতে বাঁধানো বঙ্কিম, বাঁধানো রবীন্দ্রনাথ, বাঁধানো শরৎচন্দ্র আছে, তবু তাদের পারিবারিক বন্ধন বলে কিছু নেই। এ বাড়িতে কারও অসুখ হলে সেবা করতে নার্স আসে বা নার্সিং হোম-এ যেতে হয়। কারও কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা বা সংকট দেখা দিলে তা শুনবার মতো সময়

কারও নেই। সবাই এত স্বাধীন ও সম্পর্কহীন যে লীনার মনে হয় সে মরে গেলে এ বাড়ির কেউ কাঁদবে কি না।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেওয়ার আগে লীনা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ববি রায়। চারটি অক্ষর আবার মনে বিষাদ এনে দিল আজ।

গাড়িটার জটিল প্যানেলের দিকে আনমনে চেয়ে রইল লীনা, বোধহয় বোয়িং ৭৬৭-এর প্যানেলও এরকমই। এত যন্ত্রপাতি, এত বেশি গ্যাজেটস একটা মোটরগাড়িতে যে কী দরকার!

গ্লাভস কম্পার্টমেন্টটা কোনওদিন খোলেনি লীনা। কী আছে ওটার মধ্যে?

লীনা অলস হাতে খোলার চেষ্টা করল। খুলল না, ওপরে একটা লাল বোতাম রয়েছে। সেটায় চাপ দিল লীনা, তবু খুলল না।

চিন্তিতভাবে একটু চেয়ে রইল সে। এই বুদ্ধিমান গাড়িটার সঙ্গে তার একটা সখ্য গড়ে উঠেছে ঠিকই। যদিও গাড়িটা পুরুষের গলায় কথা বলে, তবু প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জকে মহিলা ভাবতেই ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয়েছে লীনাকে। এ গাড়িটা সুতরাং মেয়েই। এই সখীর সব রহস্য লীনা ভেদ করেনি বটে, কিন্তু আজ এই গ্লাভস কম্পার্টমেন্টটা তাকে টানল। ববি রায় কি একবার বলেছিলেন যে, ওর মধ্যে একটা রিভলভার বা পিস্তল আছে? ঠিক মনে পড়ল না।

একটু নিচু হয়ে প্যানেলের তলাটা দেখল লীনা। নানা রঙের নানারকম সুইচ। গোটা চারেক হাতলের মতো বস্তু। কোনটা টানলে বা টিপলে কোন বিপত্তি ঘটে কে জানে!

লীনা গ্লাভস কম্পার্টমেন্টের তলায় সুইচের মতো একটা জিনিস চেপে ধরল আঙুল দিয়ে। প্রথমটায় কিছুই ঘটল না, তারপর হঠাৎ শ্বাস ফেলার মতো একটা শব্দ হয়ে, আস্তে করে ঢাকনাটা খুলে গেল।

ছোট্ট একটা বাক্সের মতো ফোকর, ভিতরে মৃদু একটা আলো জ্বলছে। লীনা উঁকি দিয়ে দেখল, ভেতরে একটা প্ল্যাস্টিকের ম্যাটের ওপর ঠান্ডা একটা সুন্দর পিস্তল শুয়ে আছে। পাশে একটা প্যাকেটগোছের জিনিস।

লীনা পিস্তল-বন্দুক ভালই চেনে। তার বাবার আছে, মায়ের আছে, দাদার আছে। এক সময়ে লীনা নিজেও শুটিং প্র্যাকটিস করেছে কিছুকাল। হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা সে বের করে আনল।

বেশ ভারী, ৩২ বোরের পিস্তল। ক্লিপের ভিতর দিয়ে গুলির ক্লিপ লোড করতে হয়। দুটো অতিরিক্ত ক্লিপও রয়েছে ভিতরে। প্যাকেটের মধ্যে লীনা সে-দুটোও বের করে এনে দেখল। আর দেখতে গিয়ে পেয়ে গেল একটা চিরকুট। একটা প্যাকেটের মধ্যে সযত্নে ভাঁজ করে রাখা।

চিরকুটটা সামান্য কাঁপা-হাতে খুলল লীনা। ববি রায়ের হাতের লেখা অতিশয় জঘন্য। পাঠাদ্ধোর করাই মুশকিল। ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন সাধারণত এইরকম অবোধ্যভাবে লেখা হয়ে থাকে, যা কম্পাউন্ডার ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

লীনা অতিকষ্টে প্রথম বাক্যটা পড়ল, এবং তার গা রি-রি করে উঠল রাগে। লেখা: মিসেস ভট্টাচারিয়া, ইফ ইউ আর নট অ্যান ইডিয়ট অ্যাজ আই হ্যাভ অ্যান্টিসিপেটেড দেন ইউ উইল ফাইন্ড দিস নোট উইদাউট মাচ ট্রাবল।

রাগের চোটে চিরকুটটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল লীনা, তারপর মনে পড়ল, ববি বোধহয় বেঁচে নেই। যদি লোকটা মরেই গিয়ে থাকে তবে খামোখা রাগ করার মানে হয় না।

লীনা চিরকুটটা তার ব্যাগে পুরল। পিস্তল এবং গুলির ক্যাপ আবার যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

অফিসে পৌঁছে লীনা আগে সমস্ত মেসেজগুলো চেক করল। কয়েকটা চিঠিপত্র ফাইল করল। কিছুক্ষণ টাইপ করতে হল। কয়েকটা ফোনের জবাব দিয়ে দিল, তারপর ববির ঘরে ঢুকে দরজা লক করে দিল সে।

চিরকুটটা বের করে আলোর নীচে ধরল সে। অনেকক্ষণ সময় লাগল বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে চিরকুটটার পাঠোদ্ধার করতে পারল। ইংরিজিতে প্রথম বাক্যটার পবে লেখা; আপনি যদি কোডটা পেয়ে থাকেন তবে নীল মঞ্জিলের কথা জেনে গেছেন। যদি না পেয়ে থাকেন তবে ধরে নিতে হবে আমার বরাত খারাপ। আর, আমার বরাত যদি ততদূর ভাল হয়েই থাকে, অর্থাৎ আপনি যদি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই কোডটা আবিষ্কার করে ফেলে থাকেন তবে বাকি কাজটাও দয়া করে করবেন। মনে রাখবেন, অপারেশন নীল মঞ্জিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আরও মনে রাখবেন, মোটেই ইয়ারকি করছি না, আমার মৃত্যুর পর আপনার বিপদ বেড়ে যাবে। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ আমার ওপরেই ওদের নজর থাকবে বেশি। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর... ঈশ্বর আপনার সহায় হোন। আপনার মস্তিষ্ক যথেষ্ট উন্নতমানের নয়, জানি, তবু নীল মঞ্জিলের জন্য আপনাকে বেছে নেওয়া ছাড়া আমার বিকল্প ছিল না। আপনি নির্বোধ বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে যদি আবার ভিতুও হয়ে থাকেন, তবে ববি রায়ের আর কী করার থাকতে পারে? এই নোটটা অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলবেন।

লীনা চিরকুটটা পোড়াল বটে, কিন্তু তার আগে রাগে আক্রোশে সেটাকে ছিঁড়ে কুচিকুচি করল। মস্ত ছাইদানের ভিতর সেগুলোকে রেখে একজন বেয়ারার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে এনে তাতে আগুন দিল। আর বিড়বিড় করে বলল, গো টু হেল! গো টু হেল! আই হেট ইউ! আই হেট ইউ!

কিন্তু রাগ জিনিসটা বহুক্ষণ পুষে রাখা যায় না। তা একসময়ে প্রশমিত হয় এবং অবসাদ আসে।

নিজের চৌখুপি ঘরটায় চুপচাপ বসে থেকে লীনা রাতের অনিদ্রা আর রাগের পরবর্তী অবসাদে ঝুম হয়ে বসে রইল। নীল মঞ্জিলের জন্য ওই হামবাগটা তাকে বেছে নিয়েছে! ইস্, কী আস্পা! উনি বললেই লীনাকে সব কিছু করতে হবে নাকি? লীনা কি ওঁর ক্রীতদাসী? সে দশটা-পাঁচটা চাকরি করে বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

রোজকার মতোই দোলন এল বিকেল পাঁচটায়, লীনা নেমে এল নীচে। দু'জনে গাড়িতে চেপে বসল।

লীনা, আজও তুমি ভীষণ গম্ভীর।

গম্ভীর থাকার কারণ ঘটেছে, দোলন।

ঘটেছে নয়, ঘটে আছে। তোমার গাম্ভীর্যটা প্রায় পার্মানেন্ট ব্যাপার হয়ে গেছে। আজকাল তোমার কাছে আসতে ভয় করে।

তাই বুঝি! ঠিক আছে, চাকরিটা আগে ছেড়ে দিই তখন দেখবে আমি কেমন হাসিখুশি।

চাকরির জন্যই কি তুমি গম্ভীর? এই যে শুনলাম, তোমার রগচটা বস এখন কলকাতায় নেই!

নেই, কিন্তু না থেকেও আছে। ইন ফ্যাক্ট আমার বস হয়তো এখন ইহলোকেই নেই।

দোলন একটু চমকে উঠে বলল, বলো কী?

খবরটা এখনও অথেনটিক নয়। উড়ো খবর।

তাহলে কী হবে লীনা?

কী করে বলব?

তোমার চাকরিও কি যাবে?

তা কেন? আমি কি ববি রায়ের চাকরি করি? আমি কোম্পানির এমপ্লয়ি। পুরনো বসের জায়গায় নতুন একজন আসবে।

তাহলে তুমি গম্ভীর কেন? ববি রায় তো তোমাকে খুব অপমান করতেন শুনি, সে বিদেয় হয়ে থাকলে তো ভালই।

চুপ করো তো বুদ্ধু! গাড়ি চালাতে চালাতে বেশি কথা বলতে নেই।

তা বটে।

লীনার চোখ জ্বালা করছিল। বুকটা এখনও ভার।

নকল দাড়িগোঁফ যে এত খারাপ জিনিস তা জানা ছিল না ইন্দ্রজিতের। আঠা যত শুকোচ্ছে তত টেনে ধরছে মুখের চামড়া। চুলকোচ্ছেও ভীষণ। তা ছাড়া এইসব দাড়িগোঁফের মেটিরিয়ালও নিশ্চয়ই ভাল নয়। বিশ্রী বোটকা গন্ধ আসছে। দুর্গাচরণ বলছিল, এইসব দাড়িগোঁফ সংগ্রহ করা হয় মৃতদের দাড়িগোঁফ থেকে। দুর্গাচরণটা মহা ফক্কড়।

গোঁফের একটা চুল নাকে বারবার ঢুকে যাচ্ছে। কয়েকবার হ্যাঁচ্ছো হয়েছে ইন্দ্রজিতের। পাগড়িটা মাথায় এঁটে দিয়ে দুর্গাচরণ বলেছিল, শোন বুদ্ধু, কোনও শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারের গাড়িতে উঠবি না। তোর ছদ্মবেশটা শিখদের মতো হলেও তুই তো আর ওদের ভাষা জানিস না, বিপদে পড়ে যাবি।

খুবই সময়োচিত উপদেশ, সন্দেহ নেই। কিন্তু কপাল খারাপ হলে আর কী করা যাবে! গোটা পাঁচেক ট্যাক্সি ট্রাই করার পর যেটা তার নির্দেশ মতো যদৃচ্ছ যেতে রাজি হল সেই ড্রাইভারটা শিখ। বেশ বুড়ো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি। সাদা পাগড়ি, চোখে চশমা।

পাঞ্জাবি ভাষায় জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

ইন্দ্রজিৎ ইংরেজিতে বলল, লং টুর। মেনি প্লেসেস।

ড্রাইভার কথাটা ভাল বুঝল না। শুধু বলল, অংরেজি?

এরপর আর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেনি বুড়ো। তবে সারাক্ষণ রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে সন্দেহাকুল চোখে তার দিকে নজর রাখছিল।

লীনার অফিসের সামনে বেলা সাড়ে চারটে থেকে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ইন্দ্রজিৎ। সেই ফাঁকে বুড়ো স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিল খানিক। বাঁচোয়া।

ইন্দ্রজিৎ একবার ভাবল, ববি যদি মরেই গিয়ে থাকেন তাহলে আর এইসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দরকার কী? তারপর ভাবল ববি রায় তাঁকে এই কাজের জন্য কাঁড়িখানেক টাকা দিয়েছেন। গত ছ' মাস ধরে ওই লোকটার দৌলতেই সে খেয়ে পরে বেঁচে আছে। মরে গিয়ে থাকলেও লোকটার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করাটা তার উচিত হবে না।

পাঁচটার পর লীনা গাড়ি নিয়ে বেরোতেই ইন্দ্রজিৎ বুড়োকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, ফলো দ্যাট কার।

বুড়ো অবাক হয়ে বলল, কেন?

আঃ ডোন্ট টক।

বুড়ো বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই গাড়ি ছাড়ল। আপনমনেই বকবক করতে লাগল।

ইন্দ্রজিৎ যতটুকু বুঝল, বুড়ো বলছে, অন্য ছোকরার সঙ্গে ছোকরির মহব্বত আছে তো তোমার কী বাপু? দুনিয়াতে কি ছোকরির অভাব? আর ও গাড়িওয়ালি ছোকরি তোমাকে পাত্তা দেবেই বা কেন?

ইন্দ্রজিতের কান লাল হয়ে গেল।

কলকাতা শহরে কোনও গাড়ির পিছু নেওয়া যে কী ঝামেলার কাজ, তা আর বলার নয়। জ্যামে গাড়ি আটকাচ্ছে, ঠেলাগাড়ি, রিকশা উজবুক মানুষ এসে ক্ষণে ক্ষণে গতি ব্যাহত করছে। বুড়োটা তেমন গা করছে না। সব মিলিয়ে একটা কেলো। তদুপরি লীনার গাড়িটা অতিশয় মসৃণ দ্রুতগতির গাড়ি।

তবু শেষ পর্যন্ত লেগে রইল ইন্দ্রজিৎ।

ওরা গঙ্গার ঘাটে নেমে ঘাসের ওপর বসল। ইন্দ্রজিতের ইচ্ছে ছিল, ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার মধ্যে বসে থেকে ওদের ওপর নজর রাখা।

কিন্তু বুড়োটা এ রকম অনিশ্চয় সওয়ারির হাতে আত্মসমর্পণ করতে নারাজ। রীতিমতো খিঁচিয়ে উঠে বলল, ভাড়া মিটিয়ে দাও, তারপর ছোকরির পিছা করো। আমি বাহাত্তুরে বুড়ো এইসব চ্যাংড়ামির মধ্যে নেই।

অগত্যা ভাড়া মিটিয়ে ইন্দ্রজিৎ গাড়লের মতো নেমে পড়ল।

ববি রায় তার ওপর লীনার রক্ষণাবেক্ষণের ভারই শুধু দেননি, এমন কথাও বলেছেন যে, সে ইচ্ছে করলে লীনার সঙ্গে প্রেম করতে পারে।

মেয়েটা দেখতে আগুন। কিন্তু বাধা হল, ওই ছোকরাটা। নিতান্তই অনুপযুক্ত সঙ্গী। কিন্তু মেয়েরা যখন একবার কাউকে পছন্দ করে বসে তখন তাদের গোঁ হয় সাংঘাতিক।

একটু দূরত্ব রেখে ইন্দ্রজিৎও ঘাসের ওপর বসল। তার পরনে স্যুট। বসতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর ঠান্ডা পড়ায় ঘাসে একটু ভেজা ভাব। অন্ধকার নামছে। কুয়াশা ঘনিয়ে উঠেছে। এই ওয়েদারে গঙ্গার ঘাটে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মতো উন্মত্তরা ছাড়া আব কে বসে থাকবে?

ইন্দ্রজিতের যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে আজ। ভোরবেলা প্লেন ধরতে সেই রাত থাকতে উঠতে হয়েছে। কলকাতায় পৌঁছতে যথেষ্ট বেলা হয়েছে, প্লেন লেট করায়। কুয়াশা ছিল বলে সময়মতো প্লেন নামতে পারেনি। ফলে, এখন ইন্দ্রজিতের একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

লোকটাকে দেখেছ লীনা?

দেখেছি।

কী মতলব বলো তো!

বুঝতে পারছি না। তবে ওর দিকে তাকিয়ো না।

লোকটা কি বিপজ্জনক?

হতে পারে। তুমি বোসো। আমি আসছি।

কোথায় যাচ্ছ লীনা?

গাড়ি থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসছি।

লীনা দ্রুত পায়ে গিয়ে গাড়িতে ঢুকল। তারপর গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট খুলে পিস্তলটা বের করে আনল। আঁচলে ঢাকা দিয়ে পিস্তলটা নিয়ে এসে দোলনের পাশে বসে পড়ে বলল, এবার তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কী কাজ?

লোকটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, ও এখানে কী করছে!

তার মানে?

যাও না। ভয় নেই। আমার কাছে পিস্তল আছে।

পিস্তল!— বলে হাঁ করে রইল দোলন।

ঠিক এই সময়ে একজন লম্বা ভদ্র চেহারার তরুণ কোথা থেকে এসে গেল। লীনার দিকে তাকিয়ে বলল, এনি ট্রাবল ম্যাডাম? আই অ্যাম হিয়ার টু হেলপ ইউ।

॥ ১১ ॥

ববি রায় জানেন কখন, ঠিক কখন পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়। ইন্দ্রজিৎকে পালানোর সময় দেওয়ার জন্য যে ডাইভারশনের দরকার ছিল তার চেয়ে অনেকটাই বেশি হয়ে গেল। বস-এর গোড়ালিতে হাতের কানা দিয়ে যে ক্যারাটে চপ বসিয়েছিলেন ববি রায় তাতে যে লোকটার পায়ের হাড় ভেঙে যাবে তা কে জানত!

বস যখন জান্তব একটা চিৎকার করতে করতে সারা ঘর এক পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ঠিক সেই সময়ে তার বুদ্ধু অ্যাসিস্ট্যান্ট খুবই বশংবদ পায়ে এগিয়ে এল। হয়তো বা বস-এর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ববি রায়কে ছিঁড়ে ফেলবার সদিচ্ছা নিয়েই।

হাতে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও তা চালানো বারণ বলে লোকটা রিভলভারটা উলটে নিয়ে বাঁট দিয়ে মারল মাথায়। লাগলে ববি রায়ের খুলি চৌচির হত। কিন্তু ববি কার্পেটে শোয়া অবস্থাতেই লোকটার হাতে অনায়াসে লাথি চালিয়ে রিভলভারটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

ভারতীয় গুন্ডারা আজ অবধি সত্যিকারের পেশাদার হল না। শুধু মোটা দাগের কাজ ছাড়া তারা কিছুই জানে না। বস-এর এই সহকারীটি আড়েদিঘে ববির দেড়া, গায়ে যথেষ্ট পেশী এবং মোটা হাড়ের সমাবেশ। রীতিমতো ভীতি উৎপাদক চেহারা। ঘুসিটুসি নিশ্চয়ই ভাল চালায়।

ববি পর পর তার তিনটে ঘুসি কাটিয়ে দিলেন শুধুমাত্র মাথাটা এদিক সেদিক চটপট সরিয়ে। যে-কোনও শিক্ষিত মুষ্টিযোদ্ধাই জানে যে, প্রতিপক্ষের ঘুসি কাটাতে হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে, এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ সময়ে, চোখের পলকে। পর পর তিনটে ঘুসি হাওয়ায় ভেসে যাওয়ায় লোকটা এমন বেসামাল ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল যে ববি তাকে উলটে মায়াভরে মাত্র একটি ঘুসি মারলেন। লোকটা পাহাড় ভাঙার শব্দ করে, মেঝে কাঁপিয়ে, চেয়ার টেবিল নিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। আর তখন বস নিজের গোড়ালি চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে অবিশ্বাসের চোখে ববিকে দেখছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চেয়ে ববি রায় বুঝলেন, তিনি জয়ী। তবু নিজের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, এটা যা ঘটল তা অনেকটা যাত্রা-থিয়েটারের মতো ব্যাপার। তাঁর প্রতিপক্ষ ভালই জানে যে সাতঘাটের জল খাওয়া ববি রায়কে মাত্র দুটো গুন্ডা দিয়ে টিট করা যাবে না। সুতরাং রি-ইনফোর্সমেন্ট তারা রাখবেই। কিন্তু তারা কোথায় ওত পেতে আছে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

ববি বস-এর দিকে চেয়ে ইংরিজিতে বললেন, এ খেলার একটা নিয়ম আছে, বস।

কী নিয়ম?

আমি তোমাকে এই অবস্থায় রেখে যেতে পারি না। তুমি সচেতন অবস্থায় থাকলে টেলিফোনে সাহায্য চাইতে পারো বা আমার পিছনে লোক লাগাতে পারো। এ খেলার নিয়ম হচ্ছে, হয় প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলো, না হয় তো অজ্ঞান করে দাও।

লোকটা অতিশয় কাতর মুখ করে বলল, আমার নড়বার সাধ্যই নেই। গোড়ালি ভেঙে গেছে।

ববি একটা রিভলভার তুলে নিলেন। বললেন, তবু নিয়ম। মাথার পিছনে ছোট্ট একটা চাঁটি। তারপর তুমি অনেকক্ষণ ঘুমোবে।

নাঃ! প্লিজ।

ববি মৃদু একটু হাসলেন। নিয়ম মানে না এ কেমন খেলোয়াড়?

মাথার খুলিতে মারা একটা আর্ট। অপটিমামের একটু বেশি হলেই কংকাশন। মারতে হয় ওজন করে, খুব মেপে, খুব সাবধানে।

বস স্থির দৃষ্টিতে ববিকে দেখছিল। লক্ষ করছিল ববির সমস্ত নড়াচড়া। মৃদু স্বরে সে হঠাৎ বলল, লাভ নেই মিস্টার রায়। আমাকে মারলেও আমাদের জাল কেটে বেরোনো অসম্ভব।

ববি অত্যন্ত সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে বললেন, আমি জানি। শুধু জানি না তোমরা কিসের কোড আমার কাছে চাও।

বস অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে উঠে একটা সোফায় বসল। তারপর বলল, আমেরিকা থেকে তুমি একটা যন্ত্র চুরি করেছিলে।

ববি রায় অবাক হয়ে বললেন, কিসের যন্ত্র?

ক্রাইটন।

ববি মাথা নাড়লেন, খবরটা ভুল।

বস স্থির দৃষ্টিতে ববিকে নিরীক্ষণ করে বলল, খবরটা ভুল ঠিকই। তুমি যন্ত্রটা চুরি করোনি, কিন্তু তার নো-হাউ জেনে নিয়েছিলে।

ববি উদাস গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ক্রাইটনের মতো সফিস্টিকেটেড জিনিস তৈরি করতে কত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লাগে জানো? আর কতজন হাইলি-কোয়ালিফায়েড লোক?

বস মাথা নাড়ল, আমি বিজ্ঞানের লোক নই।

জানি। বিজ্ঞানের লোকেরা ওরকম বোকার মতো কথা বলে না।

কিন্তু তোমার কাছে আলট্রাসোনিক ক্রাইটন যে আছে তা আমরা ঠিকই জানি।

ভুল জানো। ভারতবর্ষে এমন কোনও কারখানা নেই যেখানে ক্রাইটন তৈরি করা যায়। আর শোনো বোকা, ক্রাইটনের বিশেষণ হিসেবে কখনও আলট্রাসোনিক কথাটা ব্যবহার করা যায় না।

বস গনগনে চোখে চেয়ে বলল, তুমি কি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ?

না, তোমার মতো গাড়লেরা কতটা বিজ্ঞান জানে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তোমার প্রভু বা প্রভুরা বোধকরি তোমার মতোই গাড়ল, যদি না তারা আমেরিকান বা ফরাসি হয়ে থাকে।

সেটা যা-ই হোক, আমরা শুধু জানতে চাই, ক্রাইটনটা কোথায় আছে।

প্রথম কথা, ক্রাইটন নেই। দ্বিতীয় কথা, থাকলেও জেনে তোমাদের লাভ নেই। বাঁদরের কাছে টাইপরাইটার যা, তোমাদের কাছে ক্রাইটনও তাই।

শোনো রায়, তোমার সেক্রেটারি মিস ভট্টাচারিয়া আমাদের নজরবন্দি। চব্বিশ ঘণ্টা তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। আমরা একদিন না একদিন তাকে ক্র্যাক করবই।

ববি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ব্যথিত গলায় বললেন, তাকে নজরবন্দি করে কী হবে? তোমরা কি ভাবো ববি রায় সামান্য বেতনভুক তার এক কর্মচারীর কাছে ক্রাইটনের খবর দেবে? ববি রায় তার সেক্রেটারিদের তত বিশ্বাস করে না।

তবু আমরা তাকে ক্র্যাক করবই, যদি তোমাকে না পারি।

ববি এবার ঘড়ি দেখে বললেন, তোমাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। আর নয়। এবার তোমাকে আমি ঘুম পাড়াব। তারপর আমার কয়েকটা কাজ আছে।

বস এই সময়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। ববি খুব হিসেব-নিকেশ করে তাঁর অপটিমাম শক্তিতে রিভলভারের বাঁটটা বসিয়ে দিলেন বস-এর মাথায়।

বস যথারীতি কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল মেঝেয়।

ববি দ্রুত পকেট সার্চ করলেন। কোনও কাগজপত্র নেই। তার স্যাঙাতের পকেটও পরিষ্কার। ববি গিয়ে চিকার ঘরের দরজা খুললেন।

ঘরে কেউ নেই। কিন্তু বাথরুম থেকে জলের শব্দ আসছে।

ববি ঘরটা ভাল করে দেখলেন। কোনও ইন্টিরিয়র ডেকরেটারকে দিয়ে সাজানো হয়েছে। ছবির মতো ঘর। ওয়ার্ডরোবটা খুলে ববি দেখলেন, ভিতরে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশটা দামি ড্রেস হ্যাঙারে ঝুলছে। দরজার ওপরে একটা ডার্টবোর্ডে লক্ষ করলেন ববি, মাঝখানের বৃত্তে অন্তত পাঁচটি ডার্ট বিঁধে আছে। চিকা যে চমৎকার লক্ষ্যভেদী তাতে সন্দেহ নেই। একটা ওয়াইন ক্যাবিনেটে বিদেশি মদের এলাহি আয়োজন। এমনকী এক বোতল রয়্যাল স্যালুট অবধি রয়েছে।

ববি ওয়াইন ক্যাবিনেটের ঢাকনাটা বন্ধ করলেন। আর ঠিক সেই সময়েই বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল। ববি চোখ বুজে ফেললেন। একেবারে নগ্ন মেয়েমানুষ দেখতে তাঁর অ্যালার্জি আছে।

চিকা গুনগুন করে গান গাইছিল। কী গান তা বুঝলেন না ববি। বোধহয় কোনও উষ্ণ বিদেশি পপ গান।

চিকা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল তখনও সে ঘরের অতিশয় মৃদু আলোয়

ববি রায়কে লক্ষ করেনি। সুতরাং ববিকেই জানান দিতে হল।

মৃদু স্বরে ববি বললেন, পুট অন সামথিং মাই ডিয়ার।

চিকা আতঙ্কিত আর্তনাদ করে ঘুরে দাঁড়াল। চোখে দুঃস্বপ্নের অবিশ্বাস। মুখ হাঁ।

ববি ফের ইংরেজিতে বললেন, যা হোক একটা কিছু পরো হে সুন্দরী। আমাদের মেলা কথা আছে। মেলা কাজ।

চিকা চোখের পলকে একটা রোব পরে নিল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এটা কী করে সম্ভব? তোমার তো এতক্ষণে—

ববি মৃদু হেসে বললেন, বলো। থামলে কেন?

বিস্ময়টা আস্তে আস্তে মুছে গেল চিকার চোখ থেকে। একটু মদির হাসল সে। তারপর গাঢ় স্বরে বলল, সুপারম্যান।

ববি রায় দেখছিলেন, মেয়েটি কী দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল। তাঁর হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল।

চিকা তার বিছানায় বসে অগোছালো চুল দু'হাতে পাট করতে করতে বলল, আমি জানতাম তুমি ওদের হারিয়ে দিলেও দিতে পারো।

ওরা কারা?

চিকা ঠোঁট উলটে বলল, রাফিয়ানস।

তোমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী?

চিকা তার রোবটা খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে ঈষৎ উন্মোচিত করে দিয়ে বলল, কিছু না। এইসব গুন্ডা-বদমাশরা মাঝে মাঝে আমাদের কাজে লাগায় মাত্র।

তুমি ওদের চেনো?

চিকা তার বক্ষদেশ এবং পায়ের অনেকখানি অনাবৃত করে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বলল, শুধু একজনকে। বস।

বস আসলে কে?

গ্যাং-লিডার। বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চল বস শাসন করে। তুমি যদি ওকে মেরে ফেলে থাকো তাহলে তোমার লাশ সমুদ্রে ভাসবে।

আমি অকারণে খুন করি না। ওরা আমার কাছে কী চায়?

আমি জানি না। ওরা একটা কোড-এর কথা বলছিল।

আর কিছু নয়?

চিকা মৃদু হাসল। তারপর বলল, সুপারম্যান, চিকা কি একেবারেই ফ্যালনা? তোমার কি একটুও ইচ্ছে করছে না চিকার মধ্যে ডুবে যেতে? কিংবা তুমি হোমোসেকসুয়াল নও তো!

না চিকা। আমি হোমোসেকসুয়াল নই। কিন্তু যে লোকটিকে প্রাণের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হচ্ছে তার কাছে সুন্দরী মেয়ের শরীর অগ্রাধিকার পায় না।

আজ রাতে আমার শরীরের অতিথি হয়ে দেখো, মৃত্যুভয় তুচ্ছ মনে হবে।

চিকা রোবটা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খুলে ফেলল।

ববি চোখ বুজলেন। বললেন, ডোন্ট মেক মি হেট ইউ চিকা। আমি ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখতে পারি না।

চিকা রোবটা আবার গায়ে দিয়ে বলল, বুঝেছি। তুমি চাও পোশাকটা নিজের হাতে খুলতে।

ঠিক তাই।

তাহলে খোলো সুপারম্যান।

বলে চিকা এগিয়ে এল।

বাইরের ঘরে দরজাটা খুব ধীরে ধীরে খুলে গেল এবং একটি দৈত্যাকার যুবক দরজা জুড়ে দাঁড়াল। চোখে প্রখর দৃষ্টি। মুখখানা লাল টকটকে।

চিকা!

চিকা চোখের পলকে ববি রায়ের কাছ থেকে তিন হাত ছিটকে সরে গেল।

মোট চারজন ঢুকল। একে একে।

নিঃশব্দে।

ববি রায় নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনি জানেন, কোন সময়ে তাঁর হার হয়েছে। পরাজয়। এই হচ্ছে পরাজয়।

তবু চারজন সশস্ত্র লোকও ববির যথার্থ প্রতিপক্ষ নয়। ইতিপূর্বে সংখ্যাধিক প্রতিপক্ষের হাত থেকে বহুবার তাঁকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু ববি লক্ষ করলেন, চিকা তার বিছানার পাশের ছোট্ট বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা বাক্স থেকে একটা ডার্ট তুলে নিল। চিকার হাতটা ওপরে উঠল এবং এত দ্রুত নিক্ষেপ করল জিনিসটা যে হাতখানাকে ক্ষণেকের জন্য মনে হল ওয়াশ-এর ছবি।

ববি দ্রুত ঘুরে গেলেন। কিন্তু তবু এড়ানো গেল না। ডার্ট-এর তীক্ষ্ণ মুখ এসে গভীরভাবে গেঁথে গেল বাঁ কাঁধ আর ঘাড়ের সংযোগস্থলে। ছিটকে গেল রক্তবিন্দু। ববি সামান্য একটা শব্দ করলেন।

তারপরই মাথায় একটা তীব্র আঘাত।

চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। ববি রায় জানেন, কখন পরাজয় স্বীকার করতেই হয়।

ওয়ান টু ওয়ান হলে ইন্দ্রজিৎ ভয় খায় না। সে লড়তে প্রস্তুত। প্রতিপক্ষ যদি একা হয়, তবে সে যত বলশালীই হোক, তার হাত এড়ানো শক্ত নয়। বিশেষ করে পালানোর প্রতিভা ইন্দ্রজিতের সত্যিই সাংঘাতিক। বলশালী লোকেরা, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করেছে, তেমন জোরে দৌড়তে পারে না।

কিন্তু ইন্দ্রজিতের বিস্ময় অন্যত্র। সে দিব্যি গঙ্গার ঘাটে বসে নিরাপদ দূরত্ব থেকে লীনা ও দোলনকে নজরে রাখছিল এবং তাদের সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার কথা ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে তার মনে হল লীনা আর দোলন ছোকরা অকারণে তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। তারপরই লীনা গিয়ে ফস করে গাড়ি থেকে কী একটা নিয়ে এল। আর তার পরই একটা ঢ্যাঙা পালোয়ানের আবির্ভাব।

কোনও মানে হয় এর? কথা নেই বার্তা নেই ছোকরাটা এসেই ইন্দ্রজিতের দামি কোটের কলারটা ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল। কবজির কী সাংঘাতিক জোর!

এখানে কী হচ্ছে! অ্যাঁ?

ইন্দ্রজিৎ এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তরই দিল। তবে চিঁ চিঁ করে। ইংরিজিতে।

গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি।

খুব জোর একটা নাড়া দিয়ে ছোকরা বলল, হাওয়া খাচ্ছ না আর কিছু!

ডান হাতে পটাং করে একটা চড় কশাল ছোকরা। আর তাতে চোখে লাল নীল তারা দেখতে লাগল ইন্দ্রজিৎ। ওয়ান টু ওয়ান বটে, কিন্তু তার প্রতিপক্ষ যে একাই এতজন তা আগে জানা ছিল না ইন্দ্রজিতের।

ববিকে সে বহুবার অনুরোধ করেছে দু'-একটা প্যাঁচ-পয়জার শেখানোর জন্য। কিন্তু কাজপাগল লোকটা শেখায়নি। ববি জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট। দুর্দান্ত বক্সারও ছিল একসময়ে। ছোটখাটো চেহারা বলে মালুম হয় না, কত বড় বড় দৈত্য-দানবকে কাত করতে পারে।

কিন্তু ববির কথা মনে হতেই খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল ইন্দ্রজিৎ। ছোকরার হাতে ইঁদুরকলে ধরা অবস্থাতেই সে হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে ছোকরার তলপেটে চালিয়ে দিল।

কাজ হল চমৎকার। ছোকরা তাকে এক মুহূর্তের জন্য আলগা করে দিল।
ইন্দ্রজিৎ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটতে লাগল।
কিন্তু রাস্তায় পা দিতে না দিতেই একটা ট্যাক্সি ঘ্যাঁস করে এসে একদম সামনে দাঁড়িয়ে গেল।
ক্যা! ভাগ রহে হো? বেওকুফ!
ইন্দ্রজিৎ দেখল, সেই বুড়ো ট্যাক্সিওয়ালা। স্বজাতি এক শিখ যুবকের এরকম হেনস্তা দেখে বীরের জাত সর্দারজির ক্ষোভ হয়ে থাকবে। সিটের তলা থেকে একটা কৃপাণ বের করে বুড়ো নেমে এল। বয়স সত্তর হলে কী হয়, তেজ যুবকের চেয়ে বেশি।
কিন্তু ততক্ষণে লীনা, দোলন আর যুবকটি গাড়িতে উঠে পড়েছে।
ইন্দ্রজিৎ চট করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।
বুড়ো সর্দারজি মুক্ত কৃপাণটি পাশে রেখে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে বলল, পিছা করুঁ?.
হাঁ।
সর্দারজি তার নিজস্ব ভাষায় যা বলল, তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, ছুকরির তো বহুত এলেম দেখছি। এক ছুকরির পিছনে তিন-তিনজন বেওকুফ! আরে গবেট, মেয়েমানুষের মধ্যে আছেটা কী? মাংসের ডেলা ছাড়া আর কী পাও তোমরা?
এই দার্শনিক মন্তব্যসমূহে মাথা নেড়ে এবং হুঁ হাঁ করে সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কীই-বা করার আছে ইন্দ্রজিতের?
প্রশ্ন হল, ছোকরাটা কে? হঠাৎ তার আবির্ভাব ঘটলই বা কেন?

* * *

অন্য গাড়িতে লীনা, দোলন আর ছেলেটা পাশাপাশি বসে।
লীনা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?
সাদা পোশাকের পুলিশ। আমরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন থাকি।
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল।
কেন নিয়েছিল তা বলতে পারেন?
না। তবে—
তবে?
না, তেমন কিছু নয়।
আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি ম্যাডাম। পুলিশকে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না ঠিকই, কিন্তু পুলিশ কতটা হেল্পফুল তা তারা জানে না বলেই।
লীনা অমায়িক হেসে বলল, বোধহয় লোকটা আমার প্রেমে পড়েছে।
চৌরঙ্গীতে ছেলেটা নেমে গেল।

॥ ১২ ॥

লীনা আজ রাত্রে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছিল। প্রথম কথায় নীল মঞ্জিল বলে আর একটা বিপজ্জনক কানামাছি খেলায় সে নামবে কি না। নামলেও তার ভূমিকা কী হবে?
দ্বিতীয় চিন্তা হল, ববি রায় আদৌ মরেছেন কি না। মহেন্দ্র সিং লোকটাই বা আসলে কে? কম্পিউটারের কোড হিসেবে কতগুলো ভুল কথা তাকে কেন শিখিয়ে গিয়েছিলেন ববি?

রিভলভারটা সত্যিই তার কাজে লাগবে কি না। গঙ্গার ঘাটে হঠাৎ-আবির্ভূত সেই যুবক সত্যিই কি সাদা পোশাকের পুলিশ?

প্রশ্ন অনেক। কিন্তু একটারও সদুত্তর পাওয়ার কোনও উপায় তার নেই। ববি রায়ের বাড়িতে সে অনেকবার টেলিফোন করেছে। কেউ ধরেনি। অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ববি রায়ের বাড়িতে কেউ থাকে না। তাঁর কোনও পরিবার পরিজন নেই। দু'জন দারোয়ান আছে, তারা ফোন ধরে না, বাড়ি তালাবন্ধ বলে। অফিস থেকে সে আরও জেনেছে, ববি ট্যুরে গেছেন, এর চেয়ে বেশি অফিস আর কিছু জানে না।

বাড়িতে লীনার কোনও আপনজন নেই। দাদা খানিকটা ছিল, এখন দাদাও ভয়ংকর রকমের পর।

তবু দাদাকেও ফোন করেছিল লীনা। তার দাদা দীর্ঘদিন পশ্চিম এশিয়া সফর করে সদ্য ফিরেছে। কিন্তু সন্ধের পর দাদা আর স্বাভাবিক থাকে না। সম্পূর্ণ মাতাল গলায় কথা বলতে শুরু করায় বিরক্ত লীনা ফোনটা রেখে দিল। আজকাল সন্ধের পর সফল পুরুষদের প্রায় কাউকেই স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। এত মদ খেয়ে কী যে হয়!

আজ বিকেলে গঙ্গার ঘাট থেকে পালিয়ে আসার পর সে আর দোলন কিছুক্ষণ একটা রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা মেরেছে। তখন লীনা নীল মঞ্জিলের কথা তুলেছিল। দোলন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেছে, তোমার বস যদি মারা গিয়েই থাকেন তবে কেন একটা ডেড ইস্যুকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইছ?

আমার মন কী বলছে জানো? ববি মারা যাননি।

কী করে বুঝলে? সিক্সথ সেন্স?

বলতে পারো।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু নেই।

কিন্তু একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে।

তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু রিস্ক কতটা?

কী করে জানব?

তা হলে ওটা ভুলে যাও লীনা।

তুমি কি ভিতু দোলন?

অবশ্যই। নীল মঞ্জিল হয়তো তোমার বস-এর বাগানবাড়ি। তোমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে...

ছিঃ দোলন। ববি পাগল ঠিকই, কিন্তু ওরকম নন। তোমাকে তো অনেকবার বলেছি, ববি মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকান না। কথায়-কথায় অপমানও করেন। লোকটাকে সেইজন্যই আমি এত অপছন্দ করি।

আচ্ছা, আচ্ছা, মানছি তোমার বস খুব সাধু ব্রহ্মচারী মানুষ। কিন্তু তা বলে নীল মঞ্জিল যে খুব নিরাপদ জায়গা এটা মনে করারও কারণ নেই।

লীনা দোলনের কথাটা চুপ করে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তার মনে সেই থেকে একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো বিঁধে আছে। অফিসের বাইরে কোনও কাজ করতেই ববি তাকে বাধ্য করতে পারেন না। কিন্তু লোকটার স্পর্ধিত নির্দেশের মধ্যেও যেন একটা অসহায় আর্তি আছে।

তার মা আর বাবার পার্টি থাকায় আজ একাই ডিনার খেল লীনা। ডিনার সে প্রায় কিছুই খায় না। একটুখানি সুইট কর্ন-সুপ আর আধখানা রুটি। হাসিহীন বৈষ্ণবী খাবারের তদারকি করছিল।

এই নিরানন্দ বাড়ি মাঝে মাঝে লীনার হাঁফ ধরিয়ে দেয়। তার বিপুল স্বাধীনতা আছে, সেকথা ঠিক, কিন্তু এত অনাদর এবং এত ঠান্ডা সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকা যে কী যন্ত্রণার!

ঘরে এসে স্টিরিয়ো চালিয়ে দিল লীনা। কিছুক্ষণ ঝাঁইঝমাঝম বাজনার সঙ্গে একা একা নাচল ঘরময়।

তবু কেন যে মনটায় এত অস্বস্তি, এত জ্বালা, কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে তার। কী যেন একটা গোলমাল হচ্ছে।

হঠাৎ বৈষ্ণবী এসে দরজার কাছ থেকে ডাকল, দিদিমণি।

লীনা ঈষৎ কঠিন হয়ে বলল, কী বলছ?

তোমার একটা চিঠি এসেছিল আজ। টেলিফোনের টেবিলে রাখা ছিল। দেখলাম তুমি নাওনি। এই নাও।

লীনা চিঠিটা নিল। খামের ওপর অতিশয় জঘন্য হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানা। কিন্তু হাতের লেখাটা দেখেই কেঁপে উঠল লীনা। সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ।

বৈষ্ণবী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে রইল লীনা। বোম্বের শীলমোহর অস্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু হস্তাক্ষর কার তা তো লীনা জানে।

বিবশ হাতে খামের মুখটা ছিঁড়ল সে। একটা ডায়েরির ছেঁড়া পাতায় সম্বোধনহীন কয়েকটা লাইন। প্রায় অবোধ্য। তবু হাতের লেখাটা খানিকটা চেনা বলে কষ্ট করেও পড়ে ফেলল লীনা।

ইংরেজিতে লেখা : হয়তো এটাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। নীল মঞ্জিলে আপনি আবার সমস্যার মুখোমুখি হবেন। কিন্তু ঘাবড়াবেন না। তেমন বিপদ বুঝলে লাল বোতামটা টিপে দেবেন। মাত্র তিন মিনিট সময় থাকবে হাতে। মাত্র তিন মিনিট, অন্তত তিনশো মিটার দূরে সরে যেতে হবে ওর মধ্যে। পারবেন?

কোনও মানেই হয় না এই বার্তাটির। কিন্তু কাগজটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে লীনার চোখ হঠাৎ জ্বালা করে জল এল।

গভীর রাত অবধি আজকাল তার ঘুম আসে না। কিন্তু হাতের কাছে ঘুমের ওষুধ থাকা-সত্ত্বেও সে কখনও তা খায় না।

আজও সে জেগে থেকে শুনতে পেল গাড়ির শব্দ। ফটক খোলার আওয়াজ। তার মা আর বাবা সামান্য বেসামাল অবস্থায় ফিরল। সিঁড়িতে দু'জনে উঠল তর্ক করতে করতে।

তার বাবা রীতিমতো চেঁচিয়ে বলল, সুব্রত ইজ আ নাইস গাই।

তার মা বলল, ওঃ নোঃ! হি ইজ আ স্কাউন্ড্রেল।

লীনা ব্যাপারটা জানে। সুব্রত নামে একটি সফল মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে বাবা আগ্রহী। সুব্রত নিজেও আগ্রহী লীনাকে বিয়ে করতে। বহুবার এ বাড়িতে হানা দিয়েছে লোকটা। খারাপ নয়, কিন্তু এত বেশি ড্রিংক করে যে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়াই মুশকিল।

আজ সুব্রতর কথা ভাবতে হাসি পেল লীনার। সুব্রত বড়লোক বাপের ছেলে। হাইলি-কানেকটেড। তাদের সঙ্গে একটা কলাবোরেশনের চেষ্টায় আছে লীনার বাবা। বিয়ে হলে কাজটা সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু লীনা সুব্রতকে বিয়ে করবে কেন? তার তো কখনও আগ্রহই হয়নি।

লীনা দোলনের কথা ভাবতে লাগল। দোলন একদিন মস্ত বড় মানুষ হবে, এটা লীনার স্থির বিশ্বাস। তার চেয়েও বড় কথা, দোলন হবে তার বশংবদ। ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ তাদের মধ্যে কখনওই হবে না। লীনাকে দোলন এখন থেকেই ভয় পায়।

অস্থির হয়ে লীনা উঠল। তার বাবা আর মায়ের আলাদা আলাদা ঘর নিঝুম হয়ে গেছে। সারা বাড়িটাই এখন ঘুমন্ত, নিস্তব্ধ।

লীনা বারান্দার রেলিং ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

আজও রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি। লীনা চেয়ে রইল, যদি কোনও গাড়িতে আজও সিগারেটের আগুন দেখা যায়!

সিগারেটের আগুন দেখা গেল না বটে, কিন্তু লীনার হঠাৎ মনে হল, একটা ছোট গাড়ির মধ্যে যেন সামান্য নড়াচড়া। কেউ আছে এবং জেগে বসে আছে।

লীনা সামান্য কাঁপা বুক নিয়ে ঘরে চলে এল।

তাকে অকারণে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন ববি। হয়তো ঘটনাগুলি ক্রমে বিপদের আকার ধারণ করবে। কিন্তু লীনা কিছুতেই আজ ববির ওপর রাগ করতে পারল না।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে। এই নিরাপদ নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে সে কি সুখী? এর চেয়ে একটু বিপদের মধ্যে নেমে পড়া যে অনেক বেশি কাম্য।

সে নীল মঞ্জিল রহস্য ভেদ করতে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ল লীনা।

পরদিন অফিসে যথাসময়ে পৌঁছে লীনা অবাক হয়ে দেখল, তার জন্য রিসেপশনে সেই লম্বা চেহারার ছিপছিপে সাদা পোশাকের পুলিশ ছোকরাটি অপেক্ষা করছে।

তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

লীনা বুঝতে না পেরে বলল, কেন বলুন তো?

আমি জানতে এসেছিলাম যে, সেই লোকটা আর আপনার পিছু নিয়েছে কি না। আপনি ইনসিকিওরড ফিল করছেন না তো?

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমার অফিসের ঠিকানা পেলেন কী করে?

ছোকরা মৃদু হেসে বলল, আমি পুলিশে কাজ করি, ভুলে যাচ্ছেন কেন? পুলিশকে সব খবরই রাখতে হয়।

লীনা একটু কঠিন গলায় বলল, একটা সামান্য ঘটনার জন্য আপনার এতটা কষ্ট স্বীকার করারও দরকার ছিল না। পুলিশের কি আর কাজ নেই?

ছোকরা তবু দমল না। হাসিটা দিব্যি মুখে ঝুলিয়ে রেখে বলল, এটাও তো কাজ।

লীনা বলল, ধন্যবাদ। আমাকে কেউ আর ফলো করছে না। নিজের নিরাপত্তা আমি নিজেই দেখতে পারি।

এই বলে লীনা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল লিফটের দিকে। ভ্রু কোঁচকানো, মাথায় দুশ্চিন্তা।

ছোকরাটা এগিয়ে এসে ডাকল, মিস ভট্টাচার্য, একটা কথা।

আবার কী কথা?

কিছু মনে করবেন না, গতকাল আপনার হাতে একটা পিস্তল দেখতে পেয়েছিলাম।

লীনা সাদা হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না তো।

আপনি জিনিসটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।

লীনা নিজেকে সামলে নিতে পারল। বলল, আঁচলের আড়ালে কী ছিল তা বোঝা অত সহজ নয়। আপনি ভুল দেখেছেন।

ছেলেটা খুব অমায়িক গলায় বলল, আমি কোনও অভিযোগ নিয়ে আসিনি। শুধু জানতে এসেছি ওই পিস্তলটার জন্য আপনার লাইসেন্স আছে কি না। ফায়ার আর্মসের ব্যাপারে আমরা একটু বেশি সেনসিটিভ।

আমার কাছে কোনও পিস্তল ছিল না।

ছেলেটা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, মিস ভট্টাচার্য, পিস্তলটা আপনি আঁচলের আড়াল থেকে অত্যন্ত কৌশলে আপনার হাতব্যাগে ভরে ফেলেছিলেন। সেটা হয়তো এখনও আপনার হাতব্যাগেই আছে।

লীনা জানে, আছে। ব্যাগটা কাঁধ থেকে ঝুলছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি ভারী। ব্যাগটা অবহেলায় একটু দুলিয়ে লীনা মধুর করে হেসে বলল, থাকলে আছে। আপনার আর কিছু বলার না থাকলে এবার আমি আমার ঘরে যাব; আমার দেরি হয়ে গেছে।

ছেলেটা সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, মিস ভট্টাচার্য, আমি যদি আপনি হতাম তা হলে পিস্তলটা পুলিশকে হ্যান্ডওভার করে দিতাম। একটা পিস্তলের জন্য আপনাকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হতে পারে।

লীনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি।

অটোমেটিক লিফটে ঢুকে সুইচ টিপে দিল লীনা। ছোকরার মুখের ওপর দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

ওপরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে লীনা ব্যাগ খুলে পিস্তলটা বের করল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একেবারে নতুন ঝকঝকে পিস্তলটা দেখতেও ভারী সুন্দর। এই বিপজ্জনক জিনিসটা ববি কেন তাকে দিয়ে গেলেন তাও বুঝতে পারছিল না লীনা। এতই কি বিপদ ঘটবে তার?

ববির নামে এক পাহাড় চিঠি এসেছে। সেগুলো খুলে যথাযথ ফাইল করতে লাগল লীনা। ফোন আসতে লাগল একের পর এক। ব্যস্ততার মধ্যে লীনার অনেকটা সময় কেটে গেল।

দুপুরে লাঞ্চ ব্রেক-এর সময় আবার ফোন এল।

হ্যাল্লো।

মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ।

আমি মহেন্দ্র সিং।

কে মহেন্দ্র সিং?

আমি ববি রায়ের সেই বন্ধু যে আপনাকে বোম্বে থেকে ফোন করেছিল। মনে আছে?

লীনা দাতে ঠোঁট টিপে ধরল। ববির বন্ধু। তারপব বলল, হ্যাঁ, মনে আছে। মহেন্দ্র সিং আপনার ছদ্মনাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি খুবই বিপন্ন।

তার মানে?

বলছি। কিন্তু কথাটা ফোনে বলা যায় না। আপনার সঙ্গে কি একা দেখা করা সম্ভব?

লীনা সতর্ক হয়ে বলল, আপনি কি কোথাও আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাইছেন?

যদি বলি তাই?

তা সম্ভব নয়।

আমি খুব নিরীহ লোক।

আপনি কেমন তা জেনে আমার লাভ নেই। দেখা করতে হলে আপনি আমার অফিসে আসতে পারেন বা বাড়িতে। অন্য কোথাও নয়।

মহেন্দ্র সিং যেন একটু হতাশ হল। স্তিমিত গলায় বলল, তাহলে আপনাকে ফোনেই একটু সাবধান করে দিই। আপনার অফিসে যে ছোকরাটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে খুব সুবিধের লোক নয়।

এ কথায় লীনা অবাক হল। তারপর রেগে গেল। বলল, তার মানে কি আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন?

রাগ করবেন না মিস ভট্টাচার্য, আপনার ওপর নজর রাখতে স্বর্গত ববি রায় আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন। অন্তত আরও দিন সাতেক কাজটা আমাকে করতেই হবে। তারপর অবশ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। স্বর্গত ববি রায় তো আর পেমেন্ট করতে পারবেন না, ফলে আমার কাজও শেষ হয়ে যাবে।

ববি রায় কি সত্যিই মারা গেছেন?
আমি তাঁর লাশ দেখিনি। কিন্তু যাদের খপ্পরে পড়েছেন তাদের হাত থেকে সুপারম্যানদেরও রেহাই নেই।
লীনা কথা বলতে পারল না, আজ তার সত্যিই ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল বুকের মধ্যে। কষ্টটা কিসের তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না সে।
মিস ভট্টাচার্য।
বলুন।
ববি রায় অতিশয় খারাপ লোক।
আপনি তাঁর কেমন বন্ধু?
নামমাত্র।
আমার তো মনে হয় আপনিও খুব খারাপ।
যে আজ্ঞে। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?
পারেন।
ওই ছোকরা আপনার কাছে কী চায়?
তা জেনে আপনার কী হবে?
ছোকরাকে একটু জরিপ করা দরকার।
লীনা একটু ভেবে নিয়ে বলল, ছেলেটা বলছে যে ও পুলিশে চাকরি করে।
মোটেই বিশ্বাস করবেন না যেন।
করছি না। আমি তত বোকা নই।
আর কী চায়?
জানি না, তবে মনে হয় আপনার মতো এই ছোকরাও আমার ওপর নজর রাখছে। আমার ওপর নজর রাখার লোকের অভাব নেই দেখছি!
মিস ভট্টাচার্য, আপনি একটু সাবধান হবেন।
ধন্যবাদ। আমি যথেষ্ট সাবধানি।
আমি অবশ্য পিছনে আছি।
না থাকলেও ক্ষতি নেই।
লীনা ফোন রেখে দিল।
নীল মঞ্জিলে অভিযান করতে হলে এইসব নজরদারদের এড়ানো ভীষণ দরকার। লীনা ভাবতে বসল।
কাল শনিবার অফিস ছুটি। লীনা কালই নীল মঞ্জিলে যাবে।

॥ ১৩ ॥

গভীর সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠা অনেকটা গভীর জল থেকে উঠে আসার মতো। অপ্রাকৃত এক ছায়া থেকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থতার ঘোর-লাগা আলো। ববি সংজ্ঞাহীনতা থেকে যখন সচেতনতায় ফিরছিলেন তখনও তাঁর ভিতরে আরও একজন কেউ যেন সতর্ক প্রহরায় ছিল। না হলে সংজ্ঞাহীনতার মধ্যেও তিনি নিজেকে টের পাচ্ছিলেন কেমন করে?
যে জেগে ছিল সেই কি তাঁর বিকল্প সত্তা, যাকে তিনি বহুবার অনুভব করেছেন তাঁর প্রথাসিদ্ধ জেন মেডিটেশনের সময়? ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাক-বেল্ট ববি যখনই তাঁর ইন বা সহনশীলতার অভ্যাস

করেছেন, যখনই ইয়ান বা দেহ ও মনের সমগ্র শক্তিকে করতে চেয়েছেন একীভূত, তখনই কি বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি নিজের দেহ থেকে? যে-দেহ আঘাত পায় তার থেকে ভিন্ন হয়ে নির্বিকার থাকার অভ্যাসই তাঁকে দিয়েছে এক দার্শনিক সদাসঙ্গীকে। সে তাঁরই ওই বিকল্প সত্তা। ইন মানেই নম্রতা, জলের চেয়েও কমনীয় হওয়া, সমস্ত কঠিন আঘাতকে গ্রহণ করা নিজের গভীর সহনশীলতায়। শেষ অবধি কোনও আঘাতই আর আহত করে না। গায়ে ছুঁচ ফোটালেও নিশ্ছিদ্র থেকে যায় ত্বক। বড় অল্প দিনের অল্পায়াস সাধনা তো নয়। ইন আর ইয়ান-এর সেই সমন্বয় বহুদিন ধরে, গভীর অধ্যবসায়ে অধিগত করতে হয়েছে ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাক-বেল্টকে।

ববির জ্ঞান ফিরল। টান টান হয়ে উঠল তাঁর চেতনা। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই চেতনার আলো। ববি নিঃঝুম হয়ে পড়ে থেকে তাঁর ইয়ানকে খুঁচিয়ে তুললেন। দেহ ও মন। দেহ আর মনের সমস্ত শক্তিকে জড়ো করতে লাগলেন একটি জায়গায়, মস্তিষ্কে।

প্রথম প্রশ্ন: তিনি কোথায়?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: তিনি কতটা আহত?

তৃতীয় প্রশ্ন: তাঁর পরিস্থিতি কতটা খারাপ?

চতুর্থ প্রশ্ন: কতদূর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো যায়?

পঞ্চম প্রশ্ন: কতদূর শান্তভাবে তিনি পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেন?

প্রশ্ন আরও আছে। অনেক প্রশ্ন। তবে সেগুলো আপাতত মুলতুবি থাকতে পারে।

তবে এক বছর আগে একদিন নিউ ইয়র্ক থেকে কনকর্ড ফ্লাইটে প্যারিসে ফিরেছেন ববি। জেট ল্যাগ এবং অন্যান্য ক্লান্তি তো ছিলই। প্যারিসে সদ্য নিজের ছোট ও উষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টে জানুয়ারির শীতে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে কফি খাচ্ছিলেন। এমন সময় লোকটা এল। দরজা খুলে একজন শীর্ণকায় লম্বা বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ববি অবাক। বাঙালি ভদ্রলোক শীতে কাঁপছিলেন। গায়ে প্রচুর গরম জামা সত্ত্বেও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন শীতে। কথা বলতে পারছিলেন না! এমনকী নিজের পরিচয়টুকু পর্যন্ত না। ববি তাঁকে ধরে এনে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসিয়ে দিলেন। সামান্য ব্র্যান্ডি মিশিয়ে একপাত্র কফিও।

ভদ্রলোক কফিটুকু সাগ্রহে পান করলেন, পকেট থেকে একটা হোমিয়োপ্যাথির শিশি বের করে কয়েকটা গুলি মুখে ফেলে পরিষ্কার ফরাসি ভাষায় বললেন, আমার নাম রবীশ ঘোষ।

রবীশ ঘোষ নামটা ববি রায়ের স্মৃতিতে কোনও তরঙ্গ তুলল না। এ নাম তিনি শোনেননি।

রবীশ বললেন, আমি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি।

বলুন কী করতে পারি?

রবীশ কোটের পকেট থেকে তাঁর পাসপোর্ট বের করে ববির হাতে দিয়ে বললেন, এছাড়া আমার একটা আইডেনটিটি কার্ডও আছে। যদি চান—

ববি পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বয়স কত?

একাশিতে পড়েছি।

ববি ঠান্ডা গলায় বললেন, এই বয়সে কেউ মিথ্যে কথা বলে না বড় একটা। আপনাকে অবশ্য ষাট-টাটের বেশি মনে হয় না।

রবীশ মাথা নেড়ে বললেন, না, একাশিই। আমি এ দেশে শেষবার এসেছি বছর পনেরো আগে। এখন চব্বিশ পরগনা বা হাওড়ার সামান্য শীতই আমার সহ্য হয় না। প্যারিসের শীত আমার মতো বৃদ্ধের কাছে কতখানি ভয়াবহ তা কল্পনা করুন। তবু আসতে হয়েছে। গত চার দিন প্যারিসে বসে আছি শুধু আপনার জন্যই। চারদিকে বরফ আর বরফ, বেরোতে পারি না।

দরকারটা কি এতটাই জরুরি?

সাংঘাতিক জরুরি।

আপনি ফরাসি ভাষায় কথা বলছেন, এখানে কখনও দীর্ঘদিন ছিলেন?

বহুদিন। একটানা পনেরো বছর।

আমি কিছুটা বাংলা জানি। আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন।

রবীশ তৎক্ষণাৎ বাংলায় বললেন, সেটাই নিরাপদ। আপনি নিশ্চয়ই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কাণ্ডকারখানার কথা জানেন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার, টেলিফোন লিংক ইত্যাদি ছাড়াও এরা আর একটা কাজ করে। গোয়েন্দাগিরি।

ববি বিস্মিত হয়ে বললেন, এ কথা তো আজকাল বাচ্চারাও জানে। স্যাটেলাইটরা গোয়েন্দাগিরির জন্যই আকাশে রয়েছে।

রবীশ হাসলেন, বয়সের দোষ, মায়ের কাছে মাসির গল্প করছি। আপনি জানবেন না তো কে জানবে? কথা হল, আমাদের ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশেরও দু'-একটা স্যাটেলাইট আছে। ভূসমলয় স্যাটেলাইট। অর্থাৎ—

ববি হাত তুলে বললেন, বুঝতে পারছি। বলুন।

কিন্তু স্পাইং করার যোগ্যতা আমাদের দুর্বল স্যাটেলাইটের নেই। তাই আমি দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করছি মার্কিন এবং রুশ উপগ্রহগুলি থেকে ইনফরমেশন সংগ্রহ করার উপায় আবিষ্কার করতে।

ববি কিছুক্ষণ খুব স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তার মানে তো চুরি?

রবীশ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, চুরি নয়। চোরের ওপর বাটপাড়ি। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের প্রতিটি বর্গফুট জায়গার ছবি এবং খবর রুশ ও মার্কিন উপগ্রহগুলি অবিরাম সংগ্রহ করে যাচ্ছে। এক স্যাটেলাইট থেকে আর এক স্যাটেলাইট রিলে করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের দেশে, যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে মনিটারিং করে চলেছেন দিনরাত। আপনি তো জানেন, ঘাসের নীচে পড়ে থাকা একটি ছুঁচের খবরও এই সব স্যাটেলাইটের কাছে গোপন থাকে না।

সে কথা ঠিক।

আমাদের উপগ্রহের সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমাদেরও কিছু ইনফরমেশন দরকার। নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদেই দরকার। ওরা যখন আমাদের অজান্তেই আমাদের দেশের সব খবর গোপনে সংগ্রহ করে নিতে পারে তখন ওদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে তা চুরি হবে কেন? কাজটা খুব শক্ত আমি জানি। ওদের স্যাটেলাইটে এমন লকিং ডিভাইস আছে এবং এমনই ওয়েভ-লেংথে ওরা খবর পাঠায় যা ভেদ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের তো অতিকায় এবং সুপারসেনসিটিভ ডিস্ক অ্যান্টেনা নেই। মনিটারিং সিস্টেমও প্রিমিটিভ। দীর্ঘদিন ধরে আমি চেষ্টা করেছি একটা কোনও উপায় আবিষ্কার করতে। একেবারে ব্যর্থ হয়েছি বলা যায় না। কিন্তু শেষরক্ষা হয়তো হবে না। আমার বয়স একাশি, আমি দৌড় প্রায় শেষ করে এনেছি। আর তাই আপনার কাছে আসা।

আমার কাছে কেন?

রবীশ বুদ্ধের মতো প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বললেন, আমি বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের জগতের খবর সবই রাখি। আপনি এই বয়সে যে প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তা বিজ্ঞানীদের অজানা নেই। আমি আপনার মোট চারটে পাবলিশড পেপার পড়েছি। পড়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। যেটুকু প্রকাশ করেছেন, তারও বেশি বিদ্যা আপনার ভিতরে আছে, আমি জানি। ইলেকট্রনিক্স আমারও বিষয়। কলকাতার কাছেই একটা গোপন জায়গায় আমি একটি মনিটরিং সেন্টার তৈরি করেছিলাম। পুরোপুরি ক্যামোফ্লেজড এরিয়া।

আপনাদের সরকার এসব জানেন?

রবীশ মাথা নেড়ে বললেন, আমরা কেউ কেউ ভারত সরকারের একান্ত বিশ্বাসভাজন। সরকার

আমাদের কাজের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন না, আমরা সেটা পছন্দ করি না বলেই। কিন্তু আমরা যা টাকা চাই তা বিনা বাক্যব্যয়ে এবং বিনা প্রশ্নে মঞ্জুর করে দেন।

বুঝেছি। তারপর বলুন।

মুশকিল হল, এতকাল আমার দু'জন সহকর্মী ছিল। আমাদের কোনও সিকিউরিটি গার্ড ছিল না। শুধু ইলেকট্রনিক ওয়ার্নিং সিস্টেম রয়েছে। ইচ্ছে করেই আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে লোকের চোখ না আকৃষ্ট হয়। আমরা তিনজন ছাড়া কেউ ছিল না ওখানে। এক-একজন আট ঘণ্টা করে রাউন্ড দি ক্লক কাজ চালু রাখতাম। কেউ অ্যাবসেন্ট হলে অবশ্য কাজ বন্ধ রাখতে হত। একদিন এক সহকর্মীকে কলকাতায় তার ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। মাথায় গুলি, হাতে ধরা নিজের রিভলভার, পরিষ্কার আত্মহত্যা। অথচ আত্মহত্যা করার কোনও স্পষ্ট কারণ ছিল না। সুখী মানুষ, বউ আর একটা ফুটফুটে ছেলে নিয়ে সংসার। তবে তার স্ত্রী বলল, মাঝে মাঝে টেলিফোনে কে যেন শাসাত যে, কথামতো না চললে তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে মেরে ফেলা হবে। ওই টেনশন সম্ভবত লোকটা সহ্য করতে পারেনি। তাই নিজে মরে ছেলেকে চিরকালের মতো নিরাপদ করে দিয়ে গেল।

আর আপনার দ্বিতীয় সহকর্মী?

সে তার দেশের বাড়িতে ফিরে গেছে গত মাসে। স্পষ্ট করে কিছু বলেনি, কিন্তু আমার সন্দেহ, সেও ওরকমই কোনও বিপদে পড়েছিল। তারও ছেলেমেয়ে আছে।

আর আপনি?

আমার কেউ নেই। ব্যাচেলর।

আপনাকে কেউ ভয় দেখায়নি?

বৃদ্ধ আবার হাসলেন, সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা। মরতে আমার ভয় নেই। শুধু ভয় আমার মৃত্যুর পর প্রোজেক্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। যাতে আর কারও হাতে না পড়ে তার জন্য প্রোজেক্টটা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থাও আমি রেখেছি। কিন্তু সেটা তো চরম ব্যবস্থা।

আপনার প্রস্তাবটা কী?

যদি দয়া করে আমাদের অসম্পূর্ণতা এবং ঘাটতিটুকু আপনি পূরণ করে দেন। হয়তো বছরখানেক লাগবে। তারপর আপনি আবার আপনার স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবেন। আপনার জন্য আমাদের অফার স্কাই-হাই নয়। আমাদের দেশ গরিব। আপনি যদিও বিদেশের নাগরিক, তবু ভারতবর্ষ আপনার মাতৃভূমি, আপনি বাঙালিও। আমি শুধু আপনাকে এই অনুরোধটুকু করতে এই বয়সে এতদূর ছুটে এসেছি।

ববি রায় রাজি হননি। বৃদ্ধকে একরকম ফিরিয়েই দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ আবার এলেন। আবার। আর একাশি বছর বয়স্ক তদগতচিত্ত এই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের ভিতরে কোনও চালাকি আর ছলচাতুরি নেই বলে ববি রায়ের লোকটার প্রতি সহানুভূতি হতে লাগল।

তারপর একদিন রাজি হলেন। দেখাই যাক অনুন্নত ভারতবর্ষে এই বৃদ্ধ কী এমন কলকবজা তৈরি করেছেন যা উন্নত উপগ্রহের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির লকিং ডিভাইস ববির অজানা নয়। তাঁর ধুরন্ধর মস্তিষ্ক এই সব রহস্যকে জলের মতো পরিষ্কার করে নিতে পারে। কিন্তু মাথা দিয়েই সব হয় না। চাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। চাই নো-হাউ। চাই সহকারী।

রবীশ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন অন্য কোনও চাকরি বা কাজের ছুতোয় যেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন। সেটা কোনও সমস্যাই হল না। কলকাতায় শাখা আছে এমন একটি মাল্টি-ন্যাশনালে ববি চাকরি নিলেন। ববির মতো লোক চাকরি চাওয়ায় কোম্পানি চমৎকৃত হল, বর্তে গেল। তাঁকে স্থাপন করা হল কোম্পানির প্রায় মাথায়।

রবীশ তাঁকে দমদমে রিসিভ করেননি। স্বাভাবিক সতর্কতা, দেখা করেছিলেন সাত দিন পর। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, একটা বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেনের দু'নম্বর কোচে। দ্বিতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আরও সাত দিন পর, বালি-দুর্গাপুরের এক বাড়িতে। তারপর একদিন নানা ঘোরালো পথে, নানা আঘাটা ঘুরে, সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের চোখে ধুলো দেওয়ার নানা বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে, রবীশ তাঁকে নিয়ে হাজির করলেন নীল মঞ্জিলে।

বিশাল বাগান ঘেরা একটা নিঃঝুম বাড়ি। ধারে কাছে লোকালয় নামমাত্র। বাগানের মধ্যে গাছের চেয়ে আগাছাই বেশি। চারদিকে উঁচু দেওয়ালে ইলেকট্রিক ফেনসিং। ফটকে অটো লক। গাছপালা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎবাহী সরু তার পেতে রাখা। আছে বিচিত্র অ্যালার্ম এবং মিনি-মাইন। আছে বুবি ট্র্যাপ। কয়েকবার হয়তো চেষ্টা করেছিল চোর ডাকাতেরা, বিচিত্র কাণ্ড কারখানা দেখে ভয় খেয়ে আর কেউ এ মুখো হয় না।

এ সবই রবীশের কাছে শুনল ববি রায়।

নীল মঞ্জিল এক পুরনো বাড়ি। সম্ভবত কোনও ধনবান ব্যক্তির বাগানবাড়ি ছিল। ছাদে নানা রকমের অ্যান্টেনা। ভূগর্ভের ঘরে মনিটরিং সেন্টার।

ববি সবই দেখলেন। অতিশয় মনোযোগ দিয়ে। খুব খুশি হলেন, এমন বলা যায় না। তবে এই বৃদ্ধ যে এতকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

মিস্টার ঘোষ, আমি অতিমানব নই, আমার অতিমস্তিষ্কও নেই। তবে আপনার কাজ দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এমন হতেও পারে, কিছুদিন চিন্তাভাবনা করলে আমি আপনার এইসব ডিভাইসকে খানিকটা ইমপ্রুভও করতে পারি। বিদেশি উপগ্রহকে পেনিট্রেট করা হয়তো-বা সম্ভবও হবে। কিন্তু আপনি কীরকম ইনফরমেশন চান?

সবরকম। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা চাই তা হল, কার অস্ত্রভাণ্ডারে কত রকম অস্ত্র জমা হচ্ছে। বিশেষ করে পরমাণু বোমা।

ববি হেসেছিলেন, জেনে কী হবে?

রবীশ তাঁর সেই অসামান্য হাসিটি হেসে বললেন, ববি, আমি আপনার সম্পর্কে অনেক জানি।

কী জানেন?

আমি জানি আপনি ক্রাইটন নো-হাউ জানেন। ক্রাইটন এমনই ডিভাইস যা যে-কোনও পরমাণু ওয়ারহেডকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে। যদি এ দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও পরমাণু বোমা কোথাও উদ্যত হয়ে থাকে তবে ক্রাইটন তা বিস্ফোরিত করে দিতে পারে তার বেস-এ।

পারে, কিন্তু তার জন্য একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে।

জানি। আমরা আমাদের পরবর্তী স্যাটেলাইটে ক্রাইটন যোগ করে দেব। আমাদের উদ্দেশ্য ও কাজের লক্ষ্য পরিষ্কার। যদি আমরা স্যাটেলাইটগুলো থেকে এমন কোনও ইঙ্গিত পাই যে, আমাদের দেশ আক্রান্ত হতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের উপগ্রহকে নির্দেশ দেব স্থির লক্ষ্যে ক্রাইটনকে তার তরঙ্গ বিস্তার করতে।

ববি একটা বড় শ্বাস ফেললেন। রবীশ অনেকটাই ভেবেছেন, বৃদ্ধ বৃথা জীবন কাটাননি।

কাজ হচ্ছিল দ্রুতগতিতে। গত কয়েক মাস ববিকে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে নীল মঞ্জিলে। প্রতিবারই বিচিত্র ঘুরপথে, কখনও ছদ্মবেশেও।

একদিন আচমকা ববি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এত সতর্কতার কারণ কী? সিকিউরিটি? আপনার মাদ্রাজের সহকর্মী হয়তো এতদিনে পাকে পড়ে মুখ খুলে ফেলেছে।

রবীশ খুব বিষণ্ণ মুখে অধোবদন হলেন। তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন, না, মুখ খুলবার উপায় তার নেই।

তার মানে?

হি ডায়েড এ ন্যাচারাল ডেথ। অবশ্য অ্যারেঞ্জড ন্যাচারাল ডেথ।

ববি মাথা নাড়লেন। বললেন, গুড, দ্যাটস গুড।

এ স্কেয়ার্ড ম্যান ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস।

মাত্র গত সপ্তাহে এক সকালে রবীশের ফোন আসবার কথা ছিল, এল না, ববি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই ফোন করলেন।

একটা ভারী গলা জবাব দিল, কাকে চাই?

রবীশ ঘোষ।

আপনি কে?

ওঁর এক বন্ধু।

রবীশ ঘোষ মারা গেছেন।

কীভাবে?

এ কেস অফ মার্ডার। আপনার পরিচয়—

ববি ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

রবীশ! সৌম্য, কর্মপ্রাণ রবীশ। ববির ভাবাবেগহীন মনেও চমকে উঠল একটা গভীর শোকাহত ভালবাসা।

আপাতত ববি একটা কাঠের পাটাতনে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর প্রতিটি হাত ও পা আলাদা আলাদা ভাবে অতিশয় শক্ত দড়ি দিয়ে চারটে গজালের সঙ্গে বাঁধা। নড়ার উপায় পর্যন্ত নেই।

এরা জানে কীরকম নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয়।

ববি শরীরকে নরম করে রাখলেন। হাত-পায়ে এতটুকু টান দিলেন না। সামান্য শক্তিক্ষয়ও নিরর্থক। শরীর তাঁর বশীভূত। মন তাঁর বশীভূত। শরীর ও মনের সেই সমন্বয় এক অলৌকিক ইন ও ইয়ানকে জাগ্রত করে দেয়।

ববি চুপ করে পড়ে রইলেন। একটা চৌকো ঘর, অন্ধকার। বাইরে অবশ্যই প্রহরী রয়েছে। ববির জন্য এরা বিস্তারিত আয়োজন করে রেখেছে।

ববি আস্তে আস্তে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। মন, একীভূত হও, শরীর বশীভূত হও। জাগো জেন।

॥ ১৪ ॥

বিকেলের ম্লান আলোয় রবীশের মৃত্যুনীল মুখ দেখেছিলেন ববি। একাশি বছরের তদ্গত বৃদ্ধকে মৃত্যুতেও প্রশান্ত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল। যখন তাঁকে গুলি করা হয় তখন বোধহয় নিজের জানালার ধারের আরামকেদারায় বসে রবীশ আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। আততায়ীরা যখন ঘরে ঢোকে তখনও রবীশ বোধহয় পালানোর চেষ্টা করেননি। জানতেন পালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন তা শান্তচিত্তে গ্রহণ করাই ভাল। তবে রবীশ যে প্রতিরোধ করেননি তা নয়। আরামকেদারার ধারে তাঁর ঝুলে পড়া হাত থেকে একটা ছোট রিভলভার খসে পড়েছিল মেঝেয়। বিপদের মধ্যে কাল কাটাতে হত বলেই বোধহয় অস্ত্রটা সব সময়ে সঙ্গে রাখতেন কিন্তু ব্যবহার করার অবকাশ পাননি।

এ সবই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন ববি। আর পুলিশ তাঁকে অজস্র জেরা করে যাচ্ছিল তিনি কে, রবীশের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ইত্যাদি। পুলিশ যে ঝামেলা করবে তা তিনি জানতেন,

তবু রবীশের মৃতদেহটি একবার স্বচক্ষে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারেননি।

দিন দুই বাদে আর একবার গেলেন ববি। একটু রাতের দিকে। রবীশের ঘরের তালা একটা স্কেলিটন-কী দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, তাঁর জন্য রবীশ কোনও বার্তা রেখে গেছেন কি না। অবশেষে পাওয়া গেল। ছোট্ট একটা পকেট-টেপরেকর্ডারে ক্যাসেটটা লোড করা ছিল। প্রথমে দু' মিনিট একটা কনসার্ট বাজল। তারপর রবীশের গলা পাওয়া গেল। ফরাসি ভাষায় বললেন, ববি, আপনাকে ওরা আবিষ্কার করবেই। সাবধান!

রবীশের মৃত্যুর পরই ববি বুঝলেন, তিনি ভারমুক্ত। নীল মঞ্জিলের বাকি কাজ করার দায় তাঁর নয়। তিনি এবার এ ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন। বিদেশে অনেক বড় প্রোজেক্ট তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি জানতেন, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর ওপর কেউ নজর রাখছে। তাই তিনি লীনাকে...

ববি এখন স্থির হয়ে পড়ে আছেন কাঠের পাটাতনে। যন্ত্রণার এখন কোনও স্থিরবিন্দু নেই। ববি সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত শরীরে। অপেক্ষা করছেন। কাঠের উদোম পাটাতনটা যথেষ্ট কর্কশ। ববির প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু অসম্ভব সহনশক্তি দিয়ে নিজেকে স্থির রাখছেন ববি। কবজি ও পা ইলেকট্রিকের তার দিয়ে বাঁধা। একটু নড়লেই তার বসে যাবে মাংসের গভীরে।

একটা দরজা খোলার শব্দ হল কি? ঘরে সামান্য আলো ছড়িয়ে পড়ল। ববি দেখলেন একটা মস্ত বড় গুদাম ঘরের মতো ঘর। একধারে চটে মোড়া অনেক প্যাকিং বাক্স।

একটা লোক এগিয়ে এল কাছে।

ববি চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন।

লোকটা নিচু হয়ে তাঁকে একটু দেখল। চোখের পাতা ধরে টেনে পরীক্ষা করল চোখের মণি। তারপর স্মেলিং সেন্ট-এর একটা শিশি ধরল নাকের সামনে।

ববি একটু শিউরে উঠে চোখ মেললেন।

সামনে দৈত্যাকার সেই যুবক। ভারতীয়দের গড়পড়তা চেহারা এরকম সাধারণত হয় না। ছেলেটা সম্ভবত বাস্কেটবল বা ওই জাতীয় কিছু খেলত। চমৎকার আঁট শরীরের বাঁধুনি।

ববি চোখ চাইতেই ছেলেটা বলল, সরি।

সরি?

ছেলেটা ইংরেজিতে বলল, তুমি বিখ্যাত লোক। তবু নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে এনেছ।

তোমরা আমার কাছে কী চাও?

একটা ঠিকানা। আর একটা কোড।

কেন চাও?

আমরা প্রোজেক্টটা ধ্বংস করে দেব।

কেন করবে?

ববি, আপনার এতে স্বার্থ কী? আপনি কেন এর সঙ্গে জড়াচ্ছেন নিজেকে? আপনি বলে দিন, আমরা আপনাকে সসম্মানে প্লেনে তুলে দেব। আপনি প্যারিসে চলে যাবেন।

ববি সামান্য একটু ভ্রু তুলে বললেন, এতই সহজ?

আপনার ক্ষতি করে আমাদের লাভ কী?

ববি গম্ভীরভাবে বললেন, প্রোজেক্টটা ধ্বংস করলেও যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আবার তা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সুতরাং আমাকে ছেড়ে দেওয়া তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

ছেলেটা একটু চিন্তিতভাবে ববির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ববি, আপনার সেক্রেটারি লীনা ভট্টাচারিয়া আমাদের নজরে রয়েছেন। আজ হোক, কাল হোক, তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাবেন। আমাদের পক্ষে প্রোজেক্টটা নষ্ট করে দেওয়া শক্ত হবে না।

ববি সামান্য ক্লান্ত স্বরে বললেন, তোমরা শুধু প্রোজেক্টটা ধ্বংস করতে চাইলে এত কষ্ট স্বীকার করতে না। তোমরা ওর সিক্রেটটাও চাও।

যুবকটির মুখে কখনও হাসি দেখা যায় না। সর্বদাই যেন চিন্তান্বিত। মাথা নেড়ে বলল, আমি কোনও সিক্রেটের কথা জানি না।

তুমি ক্রীড়নক মাত্র। যারা জানবার তারা ঠিকই জানে।

যুবকটি ধীর স্বরে বলল, ববি রায়, প্রাণ বাঁচানোর একটা শেষ সুযোগ তুমি হাতছাড়া করছ। আমার পর যারা তোমাকে অনুরোধ করতে আসবে তারা ইতর লোক, প্রায় পশু।

ববি মৃদু স্বরে বলল, ওদের আসতে দাও।

যেমন তোমার ইচ্ছা।

যুবকটি চলে গেল।

ববি উপুড় হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে শোয়া অবস্থায় বুঝতে পারছিলেন, এই রকম ল্যাবরেটরির মরা ব্যাঙের মতো পড়ে থেকে কিছুই করা সম্ভব নয়। অন্তত একটা হাতও যদি মুক্ত করা যেত।

দরজা দিয়ে দু'জন ঢুকেছে। এগিয়ে আসছে।

ববি চোখ বুজলেন। ইন আর ইয়ান। ইন আর ইয়ান। শরীর ও মন বশীভূত হও। এক হও। এ দেহ সমস্ত আঘাত সহ্য করতে পারে। জল যেমন পারে। বাতাস যেমন পারে।

ববি এক বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করে ধ্যানস্থ হলেন।

চেতনার একটা মৃদু আলো শুধু জ্বলে রইল তাঁর ভিতরে।

রবারের হোস-এর ছোট্ট টুকরো দিয়ে ওরা মারছে। চটাস চটাস শব্দ হচ্ছে পিঠে, পায়ে, সর্বাঙ্গে। যেখানে লাগছে সেখানেই যেন আগুনের হলকা স্পর্শ করে যাচ্ছে।

জাগ্রত হও, জেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে ঝড় বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে।

দুটো লোক থামল।

ববি চোখ মেললেন, হয়ে গেল?

লোকদুটো অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল ববির দিকে। তাদের অভিজ্ঞতায়, এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। সাধারণত এরকম মারের পর লোকে গ্যাঁজলা তুলে অজ্ঞান হয়ে যায়।

বিস্ময় ক্ষণস্থায়ী হল। দুটো মজবুত চেহারার নৃশংস প্রকৃতির লোক কেসের থেকে খুলে আনল নিরেট রবারের ভারী মুগুর। যাকে ইংরেজিতে 'কশ' বলে।

এবার ববি নিজের শরীরের ঢাকের বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন। দুম দুম।

কতক্ষণ সংজ্ঞা ছিল না কে বলবে? যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল তখন ববি টের পেলেন, তাঁর হাত ও পায়ের বাঁধন খোলা। তবে এখনও তিনি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন কাঠের তক্তার ওপর।

শরীরটা যেন আর তাঁর নয়। এত অবশ, অসাড়, দুর্বল লাগছিল নিজেকে যে, চোখের পাতাটুকু খোলা পর্যন্ত কঠিন কাজ মনে হচ্ছে। কিন্তু এরা ভুল করছে। ববিকে ওরা চেনে না। শরীরই যে সব মানুষের শেষ নয়, শরীরকে ছিন্নভিন্ন করলেও যে কোনও কোনও মানুষকে ভেঙে ফেলা যায় না, সেই জ্ঞান এদের নেই।

ববি কোনও বোকামি করলেন না। হঠাৎ উঠে বসলেন না বা হাত-পা ছুড়লেন না যন্ত্রণায়। তিনি শুধু উপুড় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ব্যথা বুঝে কাত হয়ে শুলেন। হাত পা ও সমস্ত শরীরকে যতদূর সম্ভব শান্তভাবে ফেলে রাখলেন। যতদূর মনে হচ্ছে কোনও হাড় ভাঙেনি। ভাঙলে বমির ভাব হত, চোখে কুয়াশা দেখতেন। তবে শরীরের ওপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে গেছে সেটাও হাড় ভাঙার চেয়ে কম নয়।

চমৎকার কাজ করছে তাঁর মাথা। ববি নিজেকে বিশ্রাম দিয়ে শুধু মাথাটাকে চালনা করলেন। বৃদ্ধ রবীশ ও তাঁর দুই সহকর্মী যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করেও সবটা পারেননি। রবীশ বৃদ্ধ হলেও কঠিন ঝুনো মানুষ। নীল মঞ্জিল তাঁরই মস্তিষ্কের ফসল। তাঁর জিব টেনে ছিঁড়ে ফেললেও কোনও তথ্য বের করা সম্ভব ছিল না। তাঁর অন্য দুই সহকর্মীকে ববি চেনেন না। সম্ভবত তাঁদের কেউ কোথাও অসাবধানে মুখ খুলেছিলেন।

নীল মঞ্জিলের ঠিকানা এখনও প্রতিপক্ষ জানে না। জেনেও বিশেষ লাভ নেই। সেখানকার সুপার কম্পিউটার বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির বেড়াজাল ভেদ করে প্রকৃত তথ্য জানা খুবই কঠিন, তবু যদি কোনও বিশেষজ্ঞকে ওরা কাজে লাগায় তবে একদিন হয়তো-বা নীল মঞ্জিলের রহস্য ভেদ করা অসম্ভব না-ও হতে পারে। আজ অবধি কেউ বৃহৎ শক্তির অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের গর্ভ থেকে তথ্য চুরি করতে পারেনি। রবীশ সেই কাজে বহুদূর এগিয়েছেন। তাঁকে আরও অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন ববি। এর মধ্যে ববিকে বহুবার বিদেশে যেতে হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি গোপনে আমদানি করতে। এ কাজে ববি খুবই অভ্যস্ত। কখনও নিজে, কখনও আন্তর্জাতিক চোরাই চালানদারদের মাধ্যমে জিনিস এসেছে। কিছু বেসরকারি শিপিং কোম্পানি টাকার বিনিময়ে ববিকে সাহায্য করেছে। প্রত্যেকটা পর্যায়ে কাজ বার বার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে নথিবদ্ধ করার পর তা সাইফারে লিপিবদ্ধ করেছেন রবীশ। কম্পিউটারে জটিল কোডের আবছায়ায় নির্বাসিত করেছেন তাদের। সবটা ববিও জানেন না।

কিন্তু জানতে হবে। রবীশের মৃত্যু-ম্লান মুখচ্ছবি ববির চোখের সামনে আজও অম্লান ভেসে ওঠে। একাশি বছর বয়সেও মানুষ কতখানি সঞ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ! কতখানি শক্ত! বিকেলের ছাইরঙা আলোয় রবীশের উপবিষ্ট মৃতদেহ তাঁর নিজের জয়ই ঘোষণা করছিল ভারী বিনয়ের সঙ্গে।

ববি খুব ধীরে ধীরে মাথাটা তুললেন। তারপর ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন। লক্ষ করলেন, এই পাষণ্ডেরা তাঁকে এখনও পুরোপুরি মারতে চায় না বলেই বোধ হয় একটা নাঙ্গা টেবিলের ওপর এক জগ জল আর একটি ঢাকা থালি রেখে গেছে।

রবি প্রথমে কাঁপা দুর্বল হাতে জগটা তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন।

পিঠ আর পায়ের চামড়া ফেটে চিরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ফুলে আছে ক্ষতবিক্ষত শরীর। তবু ববি টের পেলেন, তাঁর খিদে পেয়েছে। প্রচণ্ড খিদে। সম্ভবত গত ষোলো-সতেরো ঘণ্টা তিনি কিছুই খাননি।

খুবই দুর্বল হাতে খাবারের ঢাকনাটা খুললেন ববি। কোনও হোটেল থেকে আনা তৃতীয় শ্রেণির থালি। দু' মুঠো ভাত, দু'খানা রুটি, দু'-তিনটে সবজি আর সামান্য দই।

ববি খুব ধীরে ধীরে খেলেন।

তারপর উঠে দুর্বল পায়ে সামান্য কয়েক পা হাঁটলেন। বুঝলেন, চোট সাংঘাতিক। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন বিদ্যুৎ-শিখার মতো তীব্র যন্ত্রণা লক লক করে উঠছে।

ববি বসে হাঁফাতে লাগলেন। জল আর খাবারের ক্রিয়া আরও কিছুক্ষণ চললে হয়তো সবল বোধ করবেন।

কাঠের পাটাতনটার ওপর ফের শুয়ে পড়লেন। এবার সংজ্ঞাহীনতা নয়, প্রগাঢ় ঘুমে চোখ আঠা হয়ে লেগে এল।

ঘুম ভাঙল সামান্য একটা শব্দে। সম্ভবত রাত গভীর হয়েছে। গুদামের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার।

ববি উঠে বসলেন। পায়ের দিকে দরজাটা কি খুলে যাচ্ছে? কেউ ঢুকছে?

ববি তাঁর কর্তব্য স্থির করে নিলেন চোখের পলকে। এরা যদি তাঁকে আবার বাঁধে মুশকিল হবে। তিনি অন্ধকারেই তক্তা থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে আন্দাজে এগোতে লাগলেন।

দরজাটা বেশ বড়। দুটো বিশাল কাঠের পাল্লা। একটা পাল্লা ফাঁক করে একজন লোক একটা

লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল। বিশাল গুদামঘরের অবশ্য সামান্যই আলোকিত হল তাতে। লোকটার অন্য হাতে একটা লোহার পাঞ্চ। ববি বেয়াদপি করলে পাঞ্চ চালাবে।

ঘরে ঢুকে সোজা এগিয়ে এল লোকটা তক্তার দিকে। তারপর জায়গাটা শূন্য দেখে থমকাল। চকিতে ঘুরে লণ্ঠনের আলোয় ববিকে খুঁজবার চেষ্টা করল।

তারপর কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা প্রবল আঘাতে লণ্ঠনসমেত চার হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেল।

ববির পা অত্যন্ত দুর্বল, ব্যথাতুর। তাতে একরকম ভালই হয়েছে। যে কারাটে কিকটা ববি মেরেছেন লোকটার মাথায় সেটা সবল পায়ে মারলে লোকটার মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারত।

ববি হাতড়ে হাতড়ে লোকটার কাছে গেলেন। তাঁর নিজের পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছু নেই। এই অবস্থায় বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক। ববি নিপুণ হাতে লোকটার গা থেকে ট্রাউজার্স আর হাওয়াই শার্ট খুলে নিলেন। পা থেকে চটিও। ববির গায়ে একটু ঢোলা হবে কিন্তু আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।

ট্রাউজারের পকেটে কিছু টাকা আছে। আর আছে একটা দেশলাই।

হাই মেহদি! হোয়াটস দ্য ম্যাটার?

দরজাটা খুলে সেই দৈত্যাকার যুবকটি এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা তীব্র আলোর টর্চবাতি। আলোটা সোজা এসে পড়েছে মেঝেতে শয়ান লোকটার ওপর।

দরজার পাল্লার আড়াল থেকে ববি হাতটা তুললেন।

মাত্র একবারই চপ করে একটা শব্দ হল। বিশাল দৈত্য কুঠার-ছিন্ন মস্ত গাছের মতো ভেঙে পড়ল মেঝের ওপর।

ববি টর্চটা কুড়িয়ে নিলেন। কাজে লাগবে।

দৈত্যের পকেট থেকে ববি রায় এক বান্ডিল নোট পেয়ে গেলেন। বেশ কয়েক হাজার টাকা। আর দুটো জিনিসও পেলেন। গাড়ি চালানোর লাইসেন্স আর গাড়ির চাবি।

বাইরে বেরিয়ে ববি চারদিকটা সতর্ক চোখে দেখলেন। জায়গাটা একটা মস্ত গো-ডাউন এলাকা। শুনশান নির্জন। রাস্তাঘাট নোংরা। প্রচুর লরি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফিয়াট গাড়িটা সামনেই দাঁড় করানো। দরজায় লক নেই। ববি উঠলেন। স্টার্ট দেওয়ার আগে জায়গাটা আঁচ করার চেষ্টা করলেন একটু। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

অন্তত মাইলখানেক দূরে আসবার পর ববি চওড়া রাস্তা পেয়ে গেলেন। যথেষ্ট চনমনে বোধ করছেন ববি। তবে সর্বাঙ্গের যন্ত্রণা ও বিষিয়ে ওঠা ক্ষতস্থান তো সহজে ভুলবার নয়।

ববি যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন আরও মাইল তিনেক যাওয়ার পর। একটা নার্সিং হোম। গাড়ি নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

রিসেপশনে যে ঘটনাটা বানিয়ে বললেন ববি, তা চমৎকার। তিনি জুয়ার আড্ডায় গুন্ডাদের পাল্লায় পড়েছিলেন। প্রচণ্ড মার খেয়েছেন। প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসেছেন। চিকিৎসা দরকার।

রিসেপশনের ক্লার্কটি সখেদে বলল, নো বেড স্যার।

ববি অত্যন্ত অবহেলায় ভাঁজ করা দুটো একশো টাকার নোট কাউন্টারে রাখলেন, ইয়োরস। আই নিড ট্রিটমেন্ট, রেস্ট, স্লিপ... প্লিজ...।

লোকটা নরম হল।

আধঘণ্টার মধ্যেই চমৎকার ছোট্ট একটা কেবিন পেয়ে গেলেন ববি। একজন নার্স এসে তাঁর ক্ষতস্থানে ওষুধ দিল। ইনজেকশন করল। এক কাপ কড়া কফিও চাইলেন ববি। পেয়ে গেলেন। তারপর ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়লেন অক্লেশে।

খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল ববির। আরও অনেকক্ষণ তাঁর বিশ্রাম নেওয়া উচিত, তিনি জানেন। দরকার ওষুধ এবং পথ্যেরও। কিন্তু অত সময় তাঁর হাতে নেই।

খুব ভোরবেলা লীনার ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। আসলে ঘুম নয়। চটকা। লীনার ঘুম হচ্ছে না আজকাল। বার বাব দুঃস্বপ্ন দেখে, আর ঘুম ভেঙে যায়।

হ্যালো।

বহুদূর থেকে একটা ফ্যাসফ্যাসে ভুতুড়ে গলা বলল, আই ওয়ান্ট মিসেস ভট্টাচারিয়া।

লীনা ইংরেজিতে বলল, আমাব মা এখন ঘুমোচ্ছেন। আপনি কে বলুন তো?

আমি লীনা ভট্টাচারিয়াকেই চাইছি।

আমিই লীনা।

মিসেস ভট্টাচারিয়া! আর ইউ ইন ওয়ান পিস? থ্যাংক গড!

হঠাৎ সর্বাঙ্গ এমন কাঁটা দিয়ে উঠল লীনার। এ কি মৃত্যুর পরপার থেকে আসা টেলিফোন? এও কি সম্ভব?

গলায় কী যে আটকাল লীনার, কিছুতেই কথা বলতে পারছিল না। শুধু একটা অস্ফুট ফোঁপানি তার গলা থেকে আপনিই বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মিসেস ভট্টাচারিয়া, আমি... আমি একটু উন্ডেড। খুব বেশি নয়। কিন্তু একটু সময় লাগবে রিকভার করতে। অ্যাট লিস্ট আরও চব্বিশ ঘণ্টা। আই অ্যাম ইন এ ব্যাড শেপ।

আর ইউ অ্যালাইভ? রিয়েলি অ্যালাইভ?

ভেরি মাচ।.

॥ ১৫ ॥

লীনা কিছুতেই, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, তার গলায় আনন্দের কাঁপনটিকে থামাতে পারল না। গাঢ় শ্বাস ফেলে বলল, কী হয়েছিল আপনার? কোনও অ্যাক্সিডেন্ট?

না, মিসেস ভট্টাচারিয়া। এ সিম্পল কেস অফ প্রহার।

কারা আপনাকে মারল, আর কেন?

পয়সা পেলে তারা সবাইকেই মারে। প্রফেশনাল ঠ্যাঙাড়ে। মারাঠি ভাষায় যাদের বলা হয় দাদা। দাদা মানে জানেন?

জানি, দাদা মানে গুন্ডা।

কলকাতাতেও দাদা আছে মিসেস ভট্টাচারিয়া। আপনি কোনও রিমোট জায়গায় কিছুদিনের জন্য পালিয়ে যান।

কেন, বলুন তো! পালানোর মতো কী হয়েছে?

ইউ আর ইন ডেঞ্জার, চাইল্ড।

ড্রপ দি চাইল্ড বিট। আমি কাউকে ভয় পাই না।

বোকা-সাহস দিয়ে কিছু হয় না মিসেস ভট্টাচারিয়া। ট্যাক্টফুল হতে হয়।

আপনি আমাকে বোকা ভেবে কি স্যাডিস্ট আনন্দ পান? জেনে রাখুন, আপনি আমার চেয়ে বেশি চালাক নন।

ববির দীর্ঘশ্বাস টেলিফোনে ভেসে এল। আরও স্তিমিত গলায় ববি বললেন, চালাকিতে আমি বরং আপনার চেয়ে কিছু খাটোই হব। কিন্তু আমার অ্যানিম্যাল ইন্‌সটিংক্ট খুব প্রবল। তাই মরতে মরতে আমি বার বার বেঁচে যাই। আপনার ওই ইন্‌সটিংক্টটা নেই।

থাকার কথাও নয় মিস্টার বস।

আপনাদের অনেক কিছু নেই মিসেস ভট্টাচারিয়া। তাই আপনি অত্যন্ত ইজি টারগেট। ওরা যদি আপনাকে ক্রাশ করে তা হলে আমার কী আর ক্ষতিবৃদ্ধি বলুন! আমি চাইলেই আর একজন স্মার্ট এফিসিয়েন্ট সেক্রেটারি পেয়ে যাব। কিন্তু ক্ষতিটা হবে যদি আপনার কাছ থেকে ওরা এন এম-র হদিশটা পেয়ে যায়। তাই বলছি, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিন।

এন এম? সেটা আবার কী?

আর একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করুন, বুঝতে পারবেন। আপনি যে ব্রেনলেস এ কথা আমি বলছি না। গ্রে-ম্যাটার কিছু কম, এই যা। কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকুও যদি অ্যাক্টিভেট করা যায় তা হলে একজন মোটামুটি বোকাকে দিয়েও কাজ চলতে পারে। আপনি যদি ওই গ্রে-ম্যাটারগুলোকে...

ওঃ, ইউ আর হরিবল। এন এম মানে কি নীল মঞ্জিল? আমি আজই যে সেখানে যাচ্ছি!

ববি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান করুন যেন কেউ আপনার টেলিফোনে ট্যাপ না করে থাকে। দয়া করে এন এম-এর কথা ভুলে যান, ওর ত্রিসীমানায় আপনার যাওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু কেন?

ইউ আর আন্ডার অবজারভেশন মাই ডিয়ার। স্ক্র্যাম কিড, স্ক্র্যাম।

একটু তিক্ত স্বাদ মুখে নিয়ে বসে রইল লীনা। হাতে বোবা টেলিফোন। ববি লাইন কেটে দিয়েছেন।

অনেকক্ষণ বাদে বিবশ হাতে টেলিফোনটা ক্র্যাডলে রাখল লীনা। তারপর সারা শরীরে এক গভীর অবসাদ নিয়ে উঠল। আজ একটু অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছে ছিল তার। নীল মঞ্জিল নামক জায়গাটিকে আবিষ্কার করতে যাবে। ববি সেই প্রস্তাবে জল ঢেলে দিলেন।

জল ঢেলে দিলেন আরও অনেক কিছুর ওপর। ববি বেঁচে আছেন জেনে যে আবেগটা থরথরিয়ে উঠেছিল বুকের মধ্যে, লোকটা মার খেয়েছে শুনে যে করুণার উদ্রেক হয়েছিল, সবই ভেসে গেল সেই জলে।

মার খেয়েছে ঠিক হয়েছে। খাওয়াই উচিত ওরকম অসভ্য লোকের।

কথা ছিল আজ তার সঙ্গে দোলনও যাবে। ঠিক ন'টায় দোলন আসবে। তারপর একসঙ্গে বেরোনোর কথা।

প্রোগ্রামটা পালটাতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে তারা?

লীনা আর শুতে গেল না। দাঁত মাজল, ব্যায়াম করল, স্নান করল।

বেলা ন'টার একটু আগেই চোব-চোর মুখে ভয়ে ভয়ে ফটক পেরিয়ে দোলনকে ঢুকতে দেখল লীনা। সে তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তেরছা হয়ে আসা কবোষ্ণ রোদ গায়ে শুষে নিচ্ছে। দোলনের হাবভাব দেখে হেসে ফেলল। গোবেচারা আর কাকে বলে!

এসো দোলন, ব্রেকফাস্ট খাওনি তো?

খেয়েছি।

বাঃ, আর আমি যে তোমার জন্যই বসে আছি না-খেয়ে! কী খেয়েছ?

ওঃ, সেসব মিডলক্লাস ব্রেকফাস্ট। আবার খাওয়া যায়।

বাঁচালে। শোনো, আজ আমাদের সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে না।

দোলনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হচ্ছে না! কেন বলো তো?

আমার বস বারণ করেছে।
বসটা কে? ববি তো পটল তুলেছেন!
মোটেই না। বেঁচে আছে।
বাঁচা গেল। কেউ মরেছে-টরেছে শুনলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।
ব্রেকফাস্ট টেবিলে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লীনার। দোকান খুলতে যাচ্ছেন বলে মা খুব ব্যস্ত। ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে দেখতে প্রোটিন বিস্কুট আর ওটমিল খাচ্ছিলেন।
মা, এই যে দোলন!
কে বলো তো?
আমার বন্ধু।
ওঃ, দ্যাট চ্যাপ! বসুন আপনি। আজ তো সময় নেই, অন্যদিন ভাল করে আলাপ হবে।
এই বলে খাবার একরকম অর্ধসমাপ্ত রেখে মিসেস ভট্টাচার্য বেরিয়ে গেলেন।
দোলন সপ্রতিভ হয়ে বলল, আমাকে উনি তেমন পছন্দ করলেন না কিন্তু।
জানি। তোমার বেশি লোকের পছন্দসই হওয়ার দরকারও নেই। একজন পছন্দ করলেই যথেষ্ট।
সেও কি করে?
সন্দেহ হচ্ছে?
একটু সন্দেহ থেকেই যায় লীনা। তুমি কত বড় ঘরের মেয়ে।
আই হেট দিস সেট আপ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো! চলো, বেরিয়ে পড়ি। আজ চমৎকার রোদ উঠেছে। চনচনে শীত। এরকম দিনে একদম নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।
ব্রেকফাস্ট খেয়ে দু'জনেই উঠে পড়ল।
গাড়িটা নেবে লীনা?
নিশ্চয়ই। গাড়ি ছাড়া মজা কিসের? তবে অন্য গাড়ি। ফিয়াট। বাবা দিল্লি গেছে, বাবার গাড়িটাই নিচ্ছি।
গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করে আনল লীনা। দোলন আর সে পাশাপাশি বসল। তারপর বেরিয়ে পড়ল।
তুমি কখনও বারুইপুর গেছ?
বহুবার। আমার এক পিসি থাকে যে।
চলো তা হলে পিসিকে টারগেট করি আজ।
চলো. বহুকাল পিসিকে দেখতে যাইনি। বারুইপুর দারুণ জায়গা।
দক্ষিণের দিকে গাড়ি ছেড়ে দিল লীনা। ক্রমে গড়িয়া-টড়িয়া পেরিয়ে গেল। রাস্তা ফাঁকা এবং চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চারধারে।
লীনা!
কী?
একটা গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে ফলো করছে আমাদের। দেখেছ?
না তো! ওই কালো গাড়িটা? মনে হচ্ছে পন্টিয়াক।
অনেকক্ষণ ধরে দেখছি।
দাঁড়াও, আমাদেরই ফলো করছে কি না একটু পরীক্ষা করে দেখি। সামনে একটা ডাইভারশন দেখা যাচ্ছে না?
ওটা কাঁচা রাস্তা। কোথায় গেছে ঠিক নেই।
তবু দেখা যাক। আমরা তো বেশি দুর যাব না। একটু গিয়েই ফিরে আসব।
বলতে বলতে লীনা গাড়িটাকে ডানধারের রাস্তায় নামিয়ে দিল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা

নামল বটে, কিন্তু তারপরই খটাং একটা শব্দ হল পিছনে। হু-উস করে হাওয়া বেরিয়ে গেল ডানদিকের চাকা থেকে।

লীনা! কী হচ্ছে বলো তো!

সামওয়ান ইজ শুটিং অ্যাট আস।

তা হলে মাথা নামিয়ে বোসো। ওঃ বাবা, এরকম বিপদে জীবনে পড়িনি।

লীনা তার হ্যান্ডব্যাগটা খুলে পিস্তলটা বের করে নিয়ে বলল, সেভ ইয়োর লাইফ ইন ইয়োর ওন ওয়ে। আমি ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব।

লীনা এক ঝটকায় দরজাটা খুলে নেমে পড়ল। আজ তার পরনে স্ল্যাক্স আর কামিজ, তাই চটপট নড়াচড়া করতে পারছিল সে। দরজাটা খোলা রেখে তার আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে সে পিস্তল তুলল।

মাত্র হাত দশেক দূরে পন্টিয়াকটা বড় রাস্তায় থেমে আছে। দু'জন লোক অত্যন্ত আমিরি চালে নেমে এল গাড়ি থেকে। পরনে দু'জনেরই গাঢ় রঙের প্যান্ট আর ফুল-হাতা সোয়েটার। দু'জনেই নিরস্ত্র।

লীনা তীব্র স্বরে বলল, আই অ্যাম গোয়িং টু শুট ইউ রাসক্যালস।

দু'জনেই ওপরে হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে বলল, ডোন্ট শুট প্লিজ। উই ওয়ান্ট টু টক।

একজনকে চিনতে পারল লীনা। সেই সাদা পোশাকের পুলিশ।

কী চান আপনারা?

আমরা শুধু আপনার পিস্তলটা বাজেয়াপ্ত করতে চাই। আর কিছু নয়।

সেটা সম্ভব নয়। আর এগোলে আমি গুলি চালাব।

না মিস ভট্টাচার্য, আপনি গুলি চালাবেন না। পুলিশকে গুলি করা সাংঘাতিক অপরাধ।

আপনারা পুলিশ নন। ইমপস্টার।

আমরা যথার্থই পুলিশ। আই ডি-র লোক।

তার প্রমাণ কী?

আমাদের আইডেনটিটি কার্ড দেখবেন?

ওখান থেকে ছুড়ে দিন। কাছে আসবেন না।

একজন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লীনার দিকে ছুড়ে দিল।

রোদে একটা ঝকঝকে বিভ্রম তুলে কার্ডটা ছুটে এল লীনার দিকে। তারপর লীনা কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা পটকা ফাটবার মতো আওয়াজ হল। সামান্য একটু ধোঁয়া এবং অদ্ভুত গন্ধ।

লীনা কেমন যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল। নড়তে পারল না।

পরমুহূর্তেই দু'টি লোক কাছে এসে দাঁড়াল তার। একজন পিস্তল কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে। অন্যজন ভারী মায়াভরে লীনাকে ধরে দাঁড় করাল।

যে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছিল সে গাড়ির মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দোলনের দিকে তাকাল।

দোলনের অবস্থা সত্যিই লজ্জাজনক। সে ফিয়াটের সামনের সিটের স্বল্প-পরিসর ফাঁকের মধ্যে উবু হয়ে বসে অসহায়ভাবে চেয়ে আছে।

বেরিয়ে আসুন।

দোলন কাতরস্বরে বলল, আমি তো কিছু করিনি।

লোকটি খুব মোলায়েম গলায় বলল, না। আপনি কিছুই করেননি। সেইজন্য আপনাকে আমরা ধরছিও না। বেরিয়ে আসুন।

দোলন বেরিয়ে এল।

লোকটা দোলনের কাঁধে একটা হাত রাখল। মৃদু হেসে বলল, এ ব্রেভ ম্যান, কোয়াইট এ ব্রেভ ম্যান।

তারপরই লোকটার ডান হাত দোলনের নাকের কাছে একটা চমৎকার জ্যাব মারল। নক-আউট জ্যাব। মুষ্টিযোদ্ধারাও যা সামাল দিতে পারে না দোলন তা কী করে সামলাবে?

সামনের সিটেই পড়ে গেল দোলন। চিৎপাত হয়ে।

লোকটা দরজাটা বন্ধ করে দিল। কাছাকাছি লোকজন বিশেষ নেই। যারা আছে তারা বেশ দূরে।

দু'জন লোক লীনাকে একরকম বহন করে নিয়ে এল পন্টিয়াকে। গাড়িটা এর মধ্যে কলকাতার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা উঠতেই তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করল।

গোটা ব্যাপারটা ঘটে যেতে ছ'-সাত মিনিটের বেশি লাগেনি।

বেশিক্ষণ নয়, মিনিট দশেক বাদেই লীনার চেতনা সম্পূর্ণ ফিরে এল। সে দেখল প্রকাণ্ড গাড়ির পেছনের সিটে অস্বস্তিকর রকমের নরম ও গভীর গদিতে সে বসে আছে। দু'পাশে দু'জন শক্ত সমর্থ পুরুষ।

লীনা হঠাৎ একটা ঝটকা মেরে উঠে পড়ার চেষ্টা করল, বাঁচাও! বাঁচাও!

দু'জন লোক পাথরের মতো বসে রইল দু'পাশে। বাধা দিল না।

কিন্তু লীনা কিছু করতেও পারল না। তার কোমর একটা সিট বেল্ট-এ আটকানো।

আপনারা কী চান?

সেই সাদা পোশাকের ছদ্ম-পুলিশ বলল, আমরা নীল মঞ্জিল যেতে চাই মিস ভট্টাচার্য। আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আজ আপনার সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল।

আমি ও-নাম জন্মেও শুনিনি।

শুনেছেন মিস ভট্টাচার্য। আজ সকালে ববি রায়ের সঙ্গে আপনার টেলিফোনে যেসব কথা হয়েছে তা টেপ করা আছে আমাদের কাছে।

আপনারা আমার টেলিফোন ট্যাপ করেছিলেন?

না করে উপায় কী? ববি রায়কে আমরা বাগে আনতে পারিনি বটে, কিন্তু আমাদের সেখানে যেতেই হবে।

আমি পথ চিনি না।

মিস ভট্টাচার্য, মেয়েদের নানারকম অসুবিধে আছে। আপনি নিশ্চয়ই বিপদে পড়তে চান না।

আমি আপনাদের ভয় পাই না। আমি চেঁচাব।

লাভ নেই। এ গাড়ি সাউন্ড-প্রুফ। বাইরে থেকে ওয়ান-ওয়ে গ্লাস দিয়ে গাড়ির ভিতরে কিছু দেখাও যায় না। আপনি বুদ্ধিমতী, কেন চেঁচিয়ে শক্তিক্ষয় করবেন?

আপনি পুলিশ নন।

না হলেই বা। আপনার কী যায় আসে? ববি রায়ের সিক্রেট নিয়ে আপনি কেন মাথা ঘামাচ্ছেন?

দোলন! দোলনের কী হল?

কিছু হয়নি। চিন্তা করবেন না। তবে বলে রাখি ও লোকটা কিন্তু আপনার বিপদে বাঁচাতে আসেনি।

লীনা এত বিপদের মধ্যেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পুরুষরা সবাই সমান।

গার্লস আর ইডিয়টস। ডাউনরাইট ইডিয়টস। দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে ববি আর একটা ট্র্যাংক কল করলেন। আবারও কলকাতায় এবং ডিম্যান্ড কল।

ইন্দ্রজিতের ঘুম-ঘুম গলা পাওয়া গেল একটু বাদে, হ্যাল্লো।

শোনো ইন্দ্রজিৎ, দেয়ার ইজ এ গুড নিউজ ফর ইউ। আমি এইমাত্র আবিষ্কার করেছি যে তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গাড়ল নও, সম্ভবত তোমার চেয়েও গাড়ল আছে। অন্তত দেয়ার ইজ এ কিন কমপিটিশন। এবং সে একটি মেয়ে।

ইন্দ্রজিতের ঘুম চড়াক করে কেটে গেল। প্রায় আর্তনাদ শোনা গেল টেলিফোনে, আপনি? আপনি বেঁচে আছেন স্যার? মাইরি, ভূত নন তো!

আমি ভূত হলে তোমার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার। শোনো, আমাকে আর এক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতার প্লেন ধরতে হবে। তবু হয়তো সময়মতো পৌঁছোতে পারব না। ইন দা মিন টাইম তুমি যার কাছে বোকামিতে হেরে গেছ তার বাড়ি চলে যাও। শি হ্যাজ বাঙ্গলড্ এভরিথিং।

কে স্যার? লীনা?

ওঃ ইউ আর রাইট। থ্যাংক ইউ। যতদূর মনে হয়েছে মিসেস ভট্টাচারিয়া বিপাকে পড়বেন। ভদ্রমহিলাকে ফেস করার দরকার নেই। জাস্ট ফলো হার।

ফলো! ও বাবা, আমার যে গাড়ি নেই।

তোমার অনেক কিছুই নেই ইন্দ্রজিৎ, আমি জানি। কিন্তু গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। টাকা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। যা বলছি করো।

বিপদটা কি খুব সিরিয়াস স্যার? আমার কিন্তু সেই ভাইট্যাল জিনিসটাও নেই।

কোনটা? বুদ্ধি? বুদ্ধির দরকার নেই গাড়ল, দরকার শুধু বুলডগের মতো টেনাসিটি আর অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট।

বুদ্ধি নয় স্যার। ভাইট্যাল জিনিসটা হল রিভলভার।

তোমার না থাকলেও চলবে। মিসেস ভট্টাচারিয়ার আছে। সময় নেই, ছাড়ছি।

একটা কথা স্যার। উনি কিন্তু মিসেস নন, মিস...

ববি ফোন রেখে দিলেন। আর চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম পেলে বড় ভাল হত। কিন্তু কপালে নেই।

ববি নার্সিং হোমের চার্জ মিটিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন। তিরবেগে গাড়ি চলল এয়ারপোর্টের দিকে।

বোম্বে থেকে ভায়া নাগপুর কলকাতার ফ্লাইটে যথেষ্ট ভিড় হয়। ববি সম্ভবত জায়গা পাবেন না। স্বাভাবিকভাবে পাবেন না, কিন্তু অস্বাভাবিক পন্থায় পেয়ে যেতেও পারেন।

নিজের শারীরিক কষ্টের দিকটা ততটা বোধ করতে পারছেন না ববি। সম্ভবত পেথিডিন ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়া এখনও রয়েছে। আর রয়েছে তীব্র উদ্বেগ। মেয়েটা যে কেন নীল মঞ্জিলের কথাটা ফোনে বলে দিল। ওর টেলিফোন ট্যাপ করা হয়েছে, সে বিষয়ে ববি নিশ্চিত। ঘুমন্ত বোম্বের রাস্তায় পোড়া রবারের গন্ধ ছড়িয়ে ববি রায় ফিয়াটটাকে শুধু ওড়াতে বাকি রাখলেন।

এয়ারপোর্ট। ববি জানেন, এই ফ্লাইটটা গন্ডগোলের। এই ফ্লাইটে এমন দু'-একজন থাকতেও পারে যারা ববিকে বিশেষ পছন্দ করবে না।

ববি সুতরাং সহজ পথে গেলেন না। লাউঞ্জের ভিড়াক্রান্ত অঞ্চলটা এড়িয়ে তিনি একটু একা রইলেন। লক্ষ রাখলেন এম্বার্কেশন টিকিটের কাউন্টারে। জনা পঞ্চাশেক লোকের লাইন। কাউন্টার খুলতে এখনও হয়তো মিনিট দশ-বারো দেরি আছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ববিকে। হঠাৎ দেখা গেল সেই দৈত্যাকার যুবক এবং আর

একজন আধা সাহেব গোছের লোক হন্তদন্ত হয়ে কাউন্টারের দিকে গেল।

ববি জানেন ওদেরও টিকিট নেই। ওরা চেষ্টা করবে শেষ মুহূর্তে টিকিট কাটবার। যদি অবশ্য অন্যরকম বন্দোবস্ত না থেকে থাকে।

ববির দ্বিতীয় ধারণাই সত্য। দু'জনে লাইনে দাঁড়াল। হাতে টিকিট।

আনন্দে হাতে হাত ঘষে ববি ইংরিজিতে বললেন, চমৎকার।

পাশ থেকে একজন বুড়োমতো বিদেশি লোক হঠাৎ ধমকের স্বরে ইংরিজিতে বলে উঠল, কী চমৎকার? অ্যাঁ! চমৎকারটা আবার কী? ইটস এ লাউজি কান্ট্রি, ইটস এ লাউজি এয়ারলাইনস অ্যান্ড ইউ আর লাউজি পিপল। জানো প্লেন আজও আধ ঘণ্টা লেট!

দ্যাটস এ গুড নিউজ।

ববি স্থানত্যাগ করলেন।

দৈত্যাকার যুবকটির কাঁধে যখন আলতো করে টোকা দিলেন ববি তখনও জানতেন না প্রতিক্রিয়াটা এরকম হবে। লোকটা ফিরে ববির দিকে তাকিয়ে প্রথমে স্ট্যাচু হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তারপর তার চোয়ালটা ঝুলে পড়ল নীচে।

ববি চাপা গলায় বললেন, একটা আপসরফায় আসবে? আমি মারদাঙ্গা এবং হিরোইকস একদম পছন্দ করি না।

দৈত্য এবং তার সঙ্গী কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর দৈত্য দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কীরকম আপসরফা?

কথাটা একটু আড়ালে হলে ভাল হয়। সাপোজ ইউ গো টু দি ইউরিন্যালস?

দৈত্যটা একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, কোনও চালাকি করলে তুমি খুব বিপদে পড়বে।

ববি মুখখানা করুণ করে বললেন, দি অডস আর ভেরি মাচ এগেইনস্ট মি।

তুমি কাল রাতে আমার পকেট থেকে—

ববি মাথা নেড়ে বললেন, জানি, জানি, আমি টাকাটাও ফেরত দিতে চাই।

দৈত্যটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, চলো।

এ সময়টায় ইউরিন্যাল ফাঁকাই থাকে। তিনজন যখন ঢুকল তখন মাত্র একজন উটকো লোক প্রাতঃকৃত্য সারছিল। সে বেরিয়ে যেতেই দৈত্যটা হঠাৎ প্রকাণ্ড থাবায় ববির বাঁ কাধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এবার বলো বাছাধন!

দ্বিতীয়জনের হাতে যেন জাদুবলে দেখা দিল একটা রিভলভার।

ববি রায় অত্যন্ত খুশির হাসি হাসলেন। এরকমই তো চাই। ঠিক এইরকমই তো চাই।

দৈত্যকে হাতে রেখে ববি প্রথম রিভলভারওয়ালার ঠিকানা নিলেন, তার বাঁ পা নব্বই ডিগ্রি উঠে গেল সমকোণে এবং শরীরকে একটি তৈলাক্ত দণ্ডের উপর ঘুরিয়ে অপ্রত্যাশিত ক্যারাটে কিকটি সংযুক্ত করে দিলেন আততায়ীর মাথায়। এত দ্রুত যে কিছু ঘটতে পারে তা লোকটা কল্পনাও করেনি কখনও। তার রিভলভার গিয়ে সিলিং-এ ধাক্কা খেয়ে খটাস করে মেঝেয় পড়ল এবং তারও আগে লোকটা নিজের ভগ্নস্তূপ হয়ে ঝরে পড়ল মেঝেয়।

দৈত্যটা এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ববি তাকে আদেশ করলেন, লোকটাকে তুলে পায়খানার মধ্যে ভরে দাও। কুইক...

কিন্তু দৈত্য তখনও এই অশরীরী কাণ্ডটাকে মাথায় নিতে পারেনি। তাই অবাক হয়ে ববির দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারল না।

কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় ববির হাতে নেই। তিনি খুবই দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর ওয়ালজ নাচের মুদ্রায় প্রায় শত মাইল বেগে তিন ফুট এগিয়ে গিয়ে ঘুসিটা চালালেন দৈত্যের থুতনিতে।

ভূমিকম্প এবং মহীরূহ পতনের শব্দ সৃষ্টি করে দৈত্য পড়ে গেল।

ববি তার টিকিটটা কুড়িয়ে নিলেন। আর দু'জনকে ছেঁচড়ে নিয়ে দু'টি ছোট ঘরে ভরে দিলেন। ভাগ্য ভালই ববির। যে মিনিট তিনেক সময় ব্যয় হল তার মধ্যে কেউ ইউরিন্যালে ঢোকেনি।

রিভলভারটা ববি তুলে নিলেন বটে, কিন্তু পকেটে ভরলেন না। আর একটি ছোট ঘরে সেটি কমোডের মধ্যে নিক্ষেপ করে বেরিয়ে এসে লাইনে দাঁড়ালেন।

যে ওজনের মার দিয়েছেন দু'জনকে তাতে ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের আগে চেতনা ফেরার কথা নয়। অবশ্য কপাল খারাপ হলে কত কী তো ঘটতে পারে।

ঘটল না অবশ্য। এম্বার্কেশন কার্ড নিয়ে ববি রায় গিয়ে এক কাপ কফি খেলেন। ইউরিন্যালটা একবার দেখে এলেন। দু'টি ছোট ঘর এখনও বন্ধ, কোনও অঘটন ঘটেনি।

একটু বাদেই সিকিউরিটি চেক-এর ঘোষণা শুনতে পেলেন ববি। তাঁর ঢোলা পোশাক এবং না-কামানো চিবুক বোধহয় সিকিউরিটির লোকেরা বিশেষ পছন্দ করল না। কিন্তু ববির পকেটে টাকা আর রুমাল ছাড়া কিছু নেই দেখে ছেড়ে দিল।

প্লেন আকাশে উড়বার পর ববি স্বস্তি বোধ করলেন। ক্ষুধার্তের মতো খেলেন ব্রেকফাস্ট এবং নাগপুরের আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

কলকাতায় যখন প্লেন নামল তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সোয়া এগারোটা। কত কী ঘটে যেতে পারে এব মধ্যে, কত কী...।

ববি লীনার নম্বর ডায়াল করলেন। বাড়ি নেই।

ববি তাড়াহুড়ো করলেন না। আগে দাড়ি কামালেন, দাঁত মাজলেন, তারপর জীবাণুনাশক মিশিয়ে গরম জলে স্নান করলেন। তটস্থ বাবুর্চি চমৎকার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিল। অম্লানবদনে ববি দ্বিতীয়বার প্রাতরাশ সারলেন। সারাদিন খাওয়া হয় কি না হয় কে জানে!

দু'-একটা ছোটখাটো জিনিস পকেটে আর হাতব্যাগে পুরে নিলেন ববি। তারপর ভোক্সওয়াগনটা বের করলেন গ্যারাজ থেকে।

এমন সময় একটা অ্যাম্বাসাডার এসে বাড়ির সামনে থামল এবং অতিশয় উত্তেজিত ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নেমে এল ইন্দ্রজিৎ। তার দুটো চোখ বড় বড়, মুখখানা লাল।

স্যার!

বলো ইন্দ্রজিৎ।

আপনি এসে গেছেন! বাঁচালেন। ব্যাড নিউজ স্যার, ভেরি ব্যাড নিউজ।

ববি চোখ ছোট করে ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, ইজ শি কিল্ড?

কোনও সন্দেহ নেই।

কী হয়েছে সংক্ষেপে বলো।

আপনার ফোন পেয়েই আমি আমার এক চেনা গ্যারাজ থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করি। পার ডে আড়াইশো টাকা প্লাস তেল আর মবিল...

ওটা বাদ দাও, তারপর বলো।

মিস ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে ঠিক সাতটায় হাজির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। উইদাউট ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড উইদাউট ইভন এ প্রপার কাপ অফ টি...

কাট দি ব্রেকফাস্ট।

ওঃ আপনি তো আবার অন্যের খাওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করেন না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ঠিক ন'টায় ওই ছেলেটি আসে, দোলন। মিস ভট্টাচার্য আর দোলন একটা ফিয়াট নিয়ে বেরোয় ন'টা চল্লিশ নাগাদ। এবং একটা পন্টিয়াক গাড়ি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ফলো করতে শুরু করে।

তুমি কী করলে?

আমিও পন্টিয়াকটাকে ফলো করতে থাকি তবে একটু ডিসট্যান্স রেখে। আপনি তো জানেনই স্যার যে আমার রিভলভার নেই।

তারপর কী হল?

গড়িয়া ছাড়িয়ে আরও কয়েক মাইল যাওয়ার পর মিস ভট্টাচার্য কেন কে জানে, গাড়িটা হঠাৎ একটা কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই পন্টিয়াক থেকে গুলি ছুটল। পিছনের একটা টায়ার ফেঁসে গিয়েছিল। আর লীনা— কী বলব স্যার-- ঝাঁসীর রানি, রানি ভবানী, জোয়ান অব আর্ক, দেবী চৌধুরানি ছেঁকে তৈরি মেয়ে স্যার।

কী করল সে?

গাড়ি থেকে নেমে এসে পিস্তল নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি চালাতে লাগল।

মাই গড।

একটু দূরে ছিলাম তাই ঠিক বলতে পারব না ব্যাপারটা কী হয়েছিল। তবে একটু বাদেই দেখলাম গুন্ডাদের গুলিতে মেয়েটা পড়ে গেল...

ননসেন্স! ওকে গুলি করবে কেন গাড়লেরা? ওকে মারলে তো সবই গন্ডগোল হয়ে যাবে।

আগেই বলেছি স্যার, আমি একটু দূরে ছিলাম। খুব স্পষ্ট করে দেখিনি। তবে মনে হল মেয়েটা উন্ডেড। গুন্ডারা গিয়ে ওকে ধরে গাড়িতে তুলে হাওয়া।

কোনদিকে গেল তারা?

আমি ফলো করিনি স্যার। দোলন নামে সেই ছোকরাকে গুন্ডারা ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে গিয়েছিল। আমি দোলনকে রেসকিউ করি। কিন্তু তার কাছ থেকে তেমন কোনও ইনফরমেশন পাইনি। ছোকরাটা আমার চেয়েও কাওয়ার্ড।

হুঁ। তোমার চেয়ে বোকা এবং তোমার চেয়েও কাওয়ার্ড যে আছে তা আমার জানা ছিল না। এনিওয়ে লীনাকে কোথায় নিয়ে গেছে তার খানিকটা আন্দাজ আমার আছে। গাড়িতে ওঠো। ইউ আর গোয়িং ফর এ রাইড।

স্যার, একটা কথা।

কী কথা?

গোলাগুলি চলবে নাকি?

চলতে পারে।

তা হলে আমার হাতেও একটা অস্ত্র থাকা দরকার।

না, বুদ্ধু! তোমার হাতে অস্ত্র দেওয়া মানে আমার নিজের বিপদ ডেকে আনা।

আমি কোনওদিন বন্দুক পিস্তল হাতে পর্যন্ত নিতে পারিনি।

ভালই করেছ।

ববি গাড়ি ছাড়লেন। সল্টলেকের রাস্তায় গাড়িটা বিদ্যুৎবেগে ছুটতে লাগল।

স্যার।

বলো।

গাড়িটা মাটির দু'ইঞ্চি ওপর দিয়ে যাচ্ছে। টের পাচ্ছেন?

চুপ করে বসে থাকো।

এ গাড়িতে সিট-বেল্ট থাকা উচিত ছিল।

আছে, লাগিয়ে নাও।

ইন্দ্রজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলল, আমি নাস্তিক ছিলাম। কিন্তু এখন আর নই। মা কালী বাবা মহাদেব, রক্ষা করো!

ববি ঘুরপথ নিলেন না। সহজ এবং সবচেয়ে শর্টকাট ধরে তীব্রগতিতে এগোতে লাগলেন। ক্রমে

বিবেকানন্দ সেতু পার হয়ে বোম্বে রোডে এসে পড়লেন।

স্যার।

বলো।

আপনি কি—?

কী?

বললে আপনি রেগে যাবেন না তো স্যার?

তা হলে বোলো না।

বলছিলাম আপনি কি বাই এনি চান্স ওই মেয়েটিকে একটু পছন্দ করেন?

ববি দু'-দুটো লরিকে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ টালমাটাল হয়ে আবার সামলে নিয়ে বলল, গুলিতে নয় আমরা মরব অ্যাকসিডেন্টে। স্যার একটু সামলে—

তুমি কিছু বলছিলে ইন্দ্রজিৎ?

বললেও তা উথড্র করে নিচ্ছি, স্যার।

শোনো, গার্লস আর ইডিয়টস। এই মেয়েটি যদি পর্বতপ্রমাণ বোকা না হত তা হলে আমাদের এইভাবে আজ নাকাল হতে হত না। মেয়েটা হয়তো মরবে, কিন্তু তার আগে একটা মস্ত সর্বনাশ করে দিয়ে যাবে।

ইন্দ্রজিৎ একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি অত্যন্ত পাষাণ-হৃদয়ের লোক, স্যার।

হ্যাঁ। আমার কোনও সেন্টিমেন্ট নেই।

তাই দেখছি।

সেই ছোকরাটার কী হল? দোলন না কে যেন।

হোপলেস কেস স্যার। ছোকরাকে আমি এসপ্লানেড অবধি একটা লিফট দিয়েছিলাম। ছোকরাটা এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে আমাকে একটা থ্যাংক ইউ অবধি বলল না।

সেটাই স্বাভাবিক, ইন্দ্রজিৎ। বাঙালিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ভীষণ কমে যাচ্ছে। একদিন হয়তো দেখা যাবে বাঙালি মাত্রই মেয়েছেলে। কেউ শাড়ি পরে, কেউ বা প্যান্ট শার্ট বা ধুতি পাঞ্জাবি। বাট বেসিক্যালি সবাই স্বভাবে চরিত্রে মেয়েছেলে।

আপনি উত্তেজিত হবেন না স্যার, সামনে একটা পেট্রলট্যাংকার... ওরে বাবা...

ইন্দ্রজিৎ চোখ বুজে ফেলল। একটা প্রবল বাতাসের ঝাপটা আর গাড়িতে একটা ভীষণ ঝাঁকুনি টের পেল সে। তারপর চোখ খুলে দেখল, পরিষ্কার রাস্তায় গাড়ি মসৃণ ছুটছে।

আপনি কি মোটরকার জাম্পিং জানেন স্যার? ট্যাংকারটাকে কাটালেন কী করে?

কাটালাম দু'চাকায় ভর করে। পিছনের ডানদিকের চাকা রাস্তায় ছিল না।

মা কালী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী!

আচমকাই বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ডাইভারশনে ঢুকে পড়লেন। রাস্তাটা এক সময় পাকা ছিল, এখন খানাখন্দে ভরা।

ইন্দ্রজিৎ।

স্যার।

বাতাসে পেট্রলের গন্ধ পাচ্ছ?

ইন্দ্রজিৎ বাতাস শুঁকে বলল, না।

আমি পাচ্ছি। ওরা এই পথেই গেছে।

লীনাকে যেখানে আনা হল সেই জায়গাটা লীনা চিনতে পারল না। তবে নিশ্চয়ই খিদিরপুর ডক-এর কাছাকাছি কোনও অঞ্চল। লীনা জাহাজের ভোঁ শুনতে পেল একবার।

ঘিঞ্জি একটা নোংরা বসতি ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়িটা একটা মস্ত পুরনো বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়ল। নিশ্চয়ই এককালে জমিদারবাড়ি ছিল। এখনও পাথরের পরি আর ফোয়ারা রয়েছে। বাগানে প্রচুর ডালিয়া ফুটে আছে।

গাড়িবারান্দার তলায় গাড়িটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে দরজা খুলে দিল।

ছদ্ম-পুলিশ যুবকটি বলল, এরপর থেকে আর আমাদের কিছুই করার থাকল না মিস ভট্টাচার্য।

তার মানে?

॥ ১৭ ॥

আপনি যদি আমাদের নীল মঞ্জিলের ঠিকানা দিয়ে দিতেন তা হলে আমরা আপনাকে রিলিজ করে দিতে পারতাম। কিন্তু খামোখা জেদ ধরে থেকে আপনি নিজের বিপদ ডেকে আনলেন।

লোকটা নেমে দাঁড়াল। একটা রূঢ় পুরুষালি হাত এসে লীনাকে প্রায় হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিল গাড়ি থেকে। লীনা নিজেকে সামলাতে পারল না। গাড়ির দরজায় হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ল রাস্তার পাথরে। হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গেল কি না কে জানে! লীনা ব্যথায় কাতরে উঠল, উঃ মাগো!

কিন্তু সেই আর্তনাদে কান দেওয়ার মতো কেউ তো ছিল না। পুরুষালি হাতটাই তার বাহু সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ফের দাঁড় করাল। এবার লোকটাকে দেখতে পেল লীনা। ষাঁড়ের মতো মোটা ঘাড় আর মাঠের মতো চওড়া বুকওয়ালা এক বিদেশি। গায়ে একটা লাল টকটকে টি-শার্ট, পরনে কালচে ট্রাউজার্স। তার হাতে জাহাজের ছবিওয়ালা উল্কি।

লোকটা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, কাম অন, মিট ডেভিড।

লোকটা কি জাহাজি? হলেও হতে পারে। লীনা জাহাজি বিশেষ দেখেনি। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, রাসক্যাল, মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানো না?

লোকটা ঝকঝকে দাঁত আর গোলাপি মাড়ি বের করে হেসে বলল, আই অ্যাম এ হোমোসেক্সুয়াল। আই ডোন্ট বদার ফর গার্লস। বাট দেয়ার আর আদারস হু উইল লাইক ইউ ইন বেড... কাম অন...

প্রায় হেঁচড়ে লীনাকে সিঁড়ির ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে দাঁড় করিয়ে দিল লোকটা।

ছোট একখানা ঘর। ঘরে বিশেষ কোনও আয়োজনও নেই। শুধু একখানা কাঠের সস্তা টেবিল এবং তার দু'ধারে মুখোমুখি দুটো চেয়ার। ওপাশের চেয়ারে একজন লোক বসে আছে। এই পরিবেশে লোকটা নিতান্তই বেমানান। তার কারণ লোকটার চেহারা দার্শনিকের মতো। গায়ের ফরসা সাহেবি রং রোদে-জলে তামাটে মেরে গেছে। মাথার চুল পাতলা। চোখের নীল তারা দু'টির ভিতরে এক সুদূর অন্যমনস্কতা রয়েছে। লম্বা মুখ। শরীরটা মেদহীন এবং একটু রোগাই। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই।

উঠে দাঁড়িয়ে লোকটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইংরিজিতে বলল, গ্ল্যাড টু সি ইউ, মিস। প্লিজ বি সিটেড।

এই পর্যন্ত চমৎকার। লীনা লোকটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে কি না তা নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ল।

সে হাত বাড়াল না। তবে চেয়ারে বসে ইংরিজিতে বলল, তোমরা কী চাও? কেন আমাকে ধরে এনেছ?

লোকটা একটু চিন্তিতভাবে লীনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আর ইউ ইন লাভ উইথ ববি রায়?

এ কথায় কেন যেন হঠাৎ ঝাঁ করে উঠল লীনার মুখ নাক কান। সে ঝামরে উঠে বলল, না, কখনও নয়। আই হেট হিম।

লোকটা তবু চিন্তিতভাবে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর আনমনে একটু মাথা নেড়ে অত্যন্ত ভদ্র, নরম এবং প্রায় বিষণ্ণ গলায় কবিতা পাঠের মতো করে ইংরিজিতে বলল, ববি রায় অত্যন্ত, আবার বলছি, অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। সব মেয়েরই উচিত তার সংস্রব থেকে দূরে থাকা এবং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া।

কিন্তু কেন?

ববিই কি আপনাকে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়নি?

দিয়েছে। লোকটা পাষণ্ড।

ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম। শুধু তাই নয়, ববি একজন চোর, খুনি ও আন্তর্জাতিক গুন্ডা। ববি চোরাই চালানদারদের সর্দার। আমি জানি, ববি একজন বিশ্ববিখ্যাত ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্টও বটে। কিন্তু সেসব বিদ্যা সে লাগায় গোয়েন্দাগিরিতে এবং খারাপ কাজে। সে তার মস্তিষ্ক বিক্রি করে বড়লোক হতে চায়। পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্র আছে যারা ববিকে মারার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার পুরস্কার দিতে চায়। ববিকে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মিস ভট্টা... ভট্টা...

লীনা বলল, লীনা উইল ডু।

লোকটা হেসে বলল, লীনা, ববি যে সিক্রেটটা তার কম্পিউটারে লুকিয়ে রেখেছিল সেটা তুমিই কিল করেছ। কিন্তু তাতে আমাদের দরকার নেই। সিক্রেটটা তুমি জানো। তুমি জানো নীল মঞ্জিলটা ঠিক কোথায়। যদি দয়া করে ঠিকানাটা বলে দাও, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সেখানে কী আছে?

লোকটা গম্ভীর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে লীনার দিকে আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমরা তাও সঠিক জানি না। কিন্তু ববি রায়কে টার্মিনেট করার একটা চুক্তি আমরা নিয়েছি।

টার্মিনেট!— বলে লীনা লোকটার দিকে চেয়ে রইল। তার বুকে তো কই সেতারের ঝংকার বেজে উঠল না। বরং ববির নাতিদীর্ঘ ছিপছিপে চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আনমনা, ব্যস্তবাগীশ ববি, নারীবিদ্বেষী ববি, ঠোঁটকাটা ববি। তাকে এরা মেরে ফেলবে?

লোকটা খুব মনোযোগ দিয়ে লীনার মুখের ভাব পাঠ করে নিচ্ছিল। মৃদু হেসে বলল, অবশ্য সেটা আজই হবে। ববি কী করেছে জানো? বোম্বেতে সে আমাদের অন্তত পাঁচ জন লোককে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আমাদের সবরকম প্রতিরোধ ভেঙে পালিয়েছে। বোম্বে এয়ারপোর্টে আমার এক বন্ধুকে আজ সকালেই সে এমন মার মেরেছে যে, লোকটা মারা গেছে সেরিব্রাল হেমারেজে। ববি এখনও পলাতক। আমরা তাকে ভীষণভাবে চাই মিস লীনা। কিন্তু ববির সঙ্গে পরে আমাদের বকেয়া চুকিয়ে নেব। তার আগে তার সাধের নীল মঞ্জিলটা আমরা ধ্বংস করে দিতে চাই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, নীল মঞ্জিলে কী আছে?

লোকটা আবার একটা শ্বাস ফেলে বলল, ববি সেখানে পৃথিবীর মহত্তম সর্বনাশের আয়োজন করছে। শোনো মিস লীনা, সব টেকনিক্যাল জারগন তুমি বুঝবে না। তোমাকে শুধু জানাতে চাই যে, ববি আজ সকালে বোম্বে টু ক্যালকাটা ফ্লাইটটা অ্যাভেল করেছে। আমাদের লোক চব্বিশ ঘণ্টা ববির বাড়ির ওপর নজর রাখছিল। মাত্র আধঘণ্টা আগে সে আমাদের টেলিফোনে জানিয়েছে যে,

ববি তার বাড়িতে পৌঁছে গেছে। আমাদের ধারণা সে কিছুক্ষণের মধ্যেই নীল মঞ্জিলে যাবে। আর সেখানেই আমরা আজ ববি রায়কে পৃথিবী থেকে মুছে দেব।

তা হলে তোমরা ববি রায়কেই কেন ফলো করছ না?

তার কারণ, সেখানে আমাদের মাত্র একজন লোক মোতায়েন আছে। তার পক্ষে ববি রায়ের সঙ্গে পাল্লা টানা অসম্ভব। হয় ববি তাকে খুন করবে, না হলে চোখে ধুলো দেবে। ববিকে আমরা খুব ভাল চিনি, মিস লীনা। তা ছাড়া আমরা ববির আগেই নীল মঞ্জিলে পৌঁছোতে চাই।

লীনা ঠোঁট কামড়াল। ববি কলকাতায়। সেই ফ্যাসফ্যাসে ভুতুড়ে গলা আজ ভোর রাতেই তো টেলিফোনে শুনেছিল লীনা। লোকটা ছিল নার্সিং হোমে। দারুণ রকমের জখম। তা হলে কোন মন্ত্রবলে লোকটা পৌঁছে গেল কলকাতায়?

মিস লীনা, আমাদের হাতে কিন্তু বিশেষ সময় নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীনা। আর যাই হোক, এদের হাতে লোকটাকে মরতে দেওয়া যায় না।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, বলব না।

মিস লীনা, তুমি ববি রায়ের প্রেমে পড়োনি তো? তোমাকে দেখে তত বোকা কিন্তু মনে হয় না।

আবার ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল লীনার নাক মুখ কান। রক্তোচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে লাগল শরীর। সে চোখ বুজল। দাঁতে দাঁত চাপল। তারপর বলল, না।

তা হলে ববির প্রতি তুমি এত দুর্বল কেন? আমি তো তোমাকে বলেছি যে, ববি একজন চোর, গুন্ডা, তার কোনও নীতিবোধ নেই, সে হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, জানি না কেন। তবে বলব না।

মিস লীনা, আমি অকারণে কঠোর হতে চাই না। আমরা মরিয়া মানুষ, তোমার সাহায্য চাইছি।

লীনা লোকটার দিকে তাকাল। দার্শনিকের মতো ভাবালু ও সুন্দর মুখশ্রী-বিশিষ্ট এই বিদেশিকে তার খারাপ লাগছিল না। ভদ্র, নম্র কণ্ঠস্বর, চোখের চাউনিতে কিছু ধূসরতা। কিন্তু এটাও ওর সত্য পরিচয় নয়। ছদ্ম-দার্শনিকতার অভ্যন্তরে লুকোনো রয়েছে ভাড়াটে সৈন্যের উদাসীন হননেচ্ছা। মানুষ মারা বা মশা মারার মধ্যে কোনও তফাত নেই এর কাছে।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না।

মিস লীনা বিশ্বাস করো, আমাদের হাতে সত্যিই সময় নেই।

আমি বলব না।

মিস লীনা, আর একবার ভাবো।

না, না, না—

তা হলে দুঃখের সঙ্গে তোমাকে কিন্তু পশুর হাতে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তারা পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছে। নারীমাংসলোভী, কামুক, বর্বর।

লীনা আপাদমস্তক শিউরে উঠে বলল, না—

উপায় নেই মিস লীনা। মুখ তোমাকে খুলতেই হবে।

লোকটা একটা বেল টিপল। আর মুহূর্তের মধ্যে সেই লাল গেঞ্জি পরা লোকটা এসে লীনার পাশে দাঁড়াল। তারপর লীনা কিছু বুঝে উঠবার আগেই তাকে একটা ডল পুতুলের মতো তুলে নিল দু'হাতে।

লীনা আর্ত চিৎকার করল বটে কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। এরকম প্রকাণ্ড মানুষ সে জীবনেও দেখেনি। কোনও মানুষের শরীরে যে এরকম সাংঘাতিক জোর থাকতে পারে তাও সে কখনও কল্পনা করেনি।

লোকটা তাকে একটা ঘরে এনে ছেড়ে দিল। ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর একটা ম্যাট পাতা। ছ'জন দানবীয় চেহারার লোক শুধুমাত্র খাটো প্যান্ট পরে অপেক্ষা করছে ছ'টা টিনের চেয়ারে।

লোকটা লীনাকে কিছু বুঝতেই দিল না। চোখের পলকে তার কামিজ ছিঁড়ে ফেলল কাগজের মতো, ছিঁড়ে ফেলে দিল চুড়িদারের পায়জামা। শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরা লীনা উন্মাদের দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে দেখল।

কী হবে? আমার কী হবে? কী করবে এরা?

ছ'টা লোক উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। লাল গেঞ্জিওয়ালা লোকটা লীনার কানের কাছে শ্বাস ফেলে বলল, আমি হোমোসেক্সুয়াল না হলে...

পিঠে একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল লীনা। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার আগেই একটা প্রকাণ্ড হাঁটু চেপে বসল তার কোমরে। একটা হ্যাঁচকা টানে উড়ে গেল ব্রা।

লীনা চেঁচিয়ে উঠল, বলছি! বলছি! প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দাও।

হয়তো তবু ছাড়ত না। এদের মনুষ্যত্ব বলে কিছু তো নেই। কিন্তু ঠিক এই সময়ে দার্শনিক লোকটা এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। একটা হাত ওপরে তুলে বলল, ড্রেস হার।

লোকগুলো কলের পুতুলের মতো সরে গেল আবার। ছেঁড়া পোশাকটাই কুড়িয়ে নিল লীনা। দু'চোখে অবিরল অশ্রু বিসর্জন করতে করতে, ফুঁসতে ফুঁসতে সে পোশাক পরল।

চলো, মিস লীনা। সময় নেই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রকাণ্ড পন্টিয়াকটা লীনার নির্দেশমতো ছুটতে শুরু করল। উন্মাদের মতো গতিবেগ। লীনার দু'ধারে এবার দু'জন। সেই দার্শনিক আর লাল গেঞ্জি। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে সেই দু'জন, যারা তাকে ধরে এনেছে।

বোম্বে রোড ধরে কতটা যেতে হবে তা কম্পিউটারের বাণী উদ্ধৃত করে বলে গেল লীনা। পাকা ড্রাইভার সুনির্দিষ্ট একটা জায়গায় এসে বাঁ ধারে একটা ভাঙা রাস্তায় ঢুকে পড়ল। চারদিকে গাছপালা, লোকালয়হীন পোড়ো জায়গা।

দার্শনিক খুনি হঠাৎ বলে উঠল, ওই তো!

সামনে একটা বাগানঘেরা বাড়ি। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের ওপর বৈদ্যুতিক তারের বেড়া। ফটকে অটো-লক।

গাড়ি ফটকের সামনে থামতে দার্শনিক লোকটা নামল। ফটকটা দেখে নিয়ে একটু চিন্তিত মুখে গাড়িতে ফিরে এসে তার সঙ্গীদের উদ্দেশে অতিশয় দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল।

লাল গেঞ্জি নেমে লাগেজ বুট খুলে একটা অ্যাটাচি কেস বের করে আনল। লীনা গাড়িতে বসেই দেখল, দার্শনিক লোকটা অ্যাটাচি খুলে ছোটখাটো নানা যন্ত্রপাতি বের করে ফটকের ওপর কী একটু কারসাজি করল। একটু বাদেই ফটক খুলে গেল হাঁ হয়ে।

খুব ধীরে ধীরে গাড়িটা ঢুকে পড়ল বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে। ফটকটা আবার বন্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

তারপর যা ঘটল তা সাধারণত মিলিটারি অপারেশনেই দেখা যায়। অত্যন্ত তৎপর লোকগুলো চটপট কয়েকটা সাব-মেশিনগান নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল প্রস্তুত হয়ে।

দার্শনিক লোকটা গাড়ির দরজা খুলে বলল, এসো মিস লীনা।

মানসিক বিপর্যয়টা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি লীনা। তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। এই নারীজন্মকে সে ধিক্কার দিচ্ছিল মনে মনে। সে মরতে ভয় পেত না, কিন্তু যে শাস্তি তাকে দিতে চেয়েছিল তা যে মৃত্যুরও অধিক। শুধু মেয়ে বলেই এরা তাকে এভাবে ভেঙে ফেলতে পারল। নইলে পারত না।

লীনা টলমলে পায়ে নামল। চারদিকে পরিষ্কার রোদ। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। শান্ত, নির্জন, নিরীহ পরিবেশ। কিন্তু একটু বাদেই এখানে ঘটবে রক্তপাত, বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে বারুদের গন্ধ..

বাড়ির সদর দরজাটাই বিচিত্র। একটি ইস্পাতের মোটা পাত আর তার গায়ে একটা স্লট।

কয়েকটা অত্যন্ত খুদে আলপিনের মাথার মতো বোতাম রয়েছে স্লটের নীচে।
মিস লীনা, এটা একটা ইলেকট্রনিক দরজা। তুমি কি কোড জানো?
না। আমি আর কিছু জানি না।
জানো মিস লীনা। তুমি কয়েকটা কোড জানো। এই যে পিনহেড দেখছ এটাতে কোড ফিড করা যায়। বলো মিস লীনা।
লীনা অসহায়ভাবে চারদিকে একবার তাকাল। তারপর কে জানে কেন তার চোখ ভরে জল এল। চোখ বুজে ফেলতেই নেমে এল সেই অশ্রুর ধারা। সে চাপা স্বরে শুধু একটাই কোড উচ্চারণ করল, আই লাভ ইউ।
লোকটা দ্রুত হাতে বোতাম টিপে গেল একটার পর একটা।
আশ্চর্যের বিষয় স্টিলের দরজাটা নিঃশব্দে বলবিয়ারিং-এর খাঁজের ওপর দিয়ে সরে গেল।
এসো মিস লীনা। তুমি আরও কোড জানো। এখানে সব কোডই কাজে লাগবে।
লীনা ঘরে ঢুকল। প্রথম ঘরটায় অন্তত চারটে ভিডিয়ো ইউনিট। তার সামনে রয়েছে চাবির বোর্ড। কিন্তু কেউ নেই কোথাও।
লোকটা লীনার দিকে চেয়ে বলল, ভেরি আপটুডেট, ভেরি সফিস্টিকেটেড।
কী?
তুমি সুপার কম্পিউটারের কথা জানো?
শুনেছি।
এ সব হল তারই কাছাকাছি জিনিস। ববি ইজ এ জিনিয়াস। কিন্তু জিনিয়াস যদি বিপথগামী হয় তা হলে তার মৃত্যু অনিবার্য।
তোমরা ববিকে মারবে কেন? তোমরা নীল মঞ্জিল ভেঙে দাও, কিন্তু ওকে মারবে কেন?
ওকে মারতেই হবে মিস লীনা। ওকে মারার জন্য আমি সাত হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছি।
কিন্তু কেন?
কারণ, ববির মৃত্যু চায় পৃথিবীর কয়েকটি শক্তিমান রাষ্ট্র। আমি তাদের প্রতিনিধি মাত্র।
শোনো, ববির অনেক দোষ জানি। কিন্তু কাউকে মেরে ফেলা কি ভাল?
মিস লীনা, তুমি ববির প্রেমে পড়োনি তো?
না, না, কখনওই নয়।
বলল লীনা। তবু কেন যে তার মুখ চোখ কান সব ফের ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। কেন যে রক্তের স্রোত পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে লাগল ধমনীতে ধমনীতে।

সেগুন গাছ তুমি চেনো ইন্দ্রজিৎ?
সেগুন! সে আর শক্ত কী?
চেনো? বাঃ, বলো তো ওই গাছটা কী গাছ?
অফকোর্স সেগুন।
বাঃ, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কেন জানো ইন্দ্রজিৎ? এ দেশে গাড়লেরাই উন্নতি করে, বুদ্ধিমানেরা মার খায়।
তা বটে স্যার, কিন্তু আমি তেমন নিরেট গাড়ল নই। আমার মনে হচ্ছে গাছ নিয়ে আপনার কিছু ভাব এসেছে। কবিতা লেখার পক্ষে অবশ্য সেগুন বেশ জুতসই শব্দ। বেগুন দিয়ে মেলে, লেগুন দিয়ে মেলে।

তবু এ গাছটা সেগুন নয়, শাল।

স্যার, এই অসময়ে আপনি আমাকে বটানি বোঝাচ্ছেন কেন?

বটানি নয়, স্ট্র্যাটেজি। যতদূর অনুমান, শত্রুপক্ষ নীল মঞ্জিল পেনিট্রেট করেছে এবং কয়েকটা সাব-মেশিনগান আমাদের স্বাগতম জানাতে প্রস্তুত। সুতরাং ঢোকার আগে শত্রুপক্ষের অবস্থান জেনে নেওয়া ভাল। তুমি গাছ বাইতে পারো ইন্দ্রজিৎ?

আমি স্যার, কলকাতার ছেলে, গাছ পাব কোথায় যে বাইব?

তাও বটে। তা হলে গাড়িতেই বসে থাকো। আমি ওই সেগুন গাছটায় একটু উঠব। কিন্তু গ্লাসটা দাও তো।

ববি দূরবিনটা বুকে ঝুলিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাস্তার পাশে দাঁড় করানো ভোক্সওয়াগনটায় চুপ করে বসে রইল ইন্দ্রজিৎ। যেদিকে ববি গেলেন সেদিকে প্রায় নির্নিমেষ চেয়ে রইল সে।

হঠাৎ তার মনে হল ওপর থেকে ঝপ করে জঙ্গলের মধ্যে কী একটা পড়ে গেল। সম্ভবত ববির দূরবিন। ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে জিনিসটার কাছে ছুটে গেল। ঘন বুক সমান ঘাসের মধ্যে অবশ্য কিছু দেখতে পেল না। তাই ওপর দিকে তাকিয়ে চাপা জরুরি গলায় ডাকল, স্যার! স্যার! আপনার দূরবিনটা যে পড়ে গেছে, সেটা টের পেয়েছেন?

ববিকে সে ডালপালার ফাঁক দিয়ে আবছা ভাবে দেখতেও পাচ্ছে। লোকটা ওপরে উঠছে। খুব বেশিদূর ওঠেনি। দূরবিনটা নিয়ে না গেলে লোকটা কিছুই দেখতে পাবে না ওপর থেকে।

সে আবার ডাকল, স্যার! স্যার! থামুন। আপনি ভুল করছেন।

ববি থামলেন। তারপর ডালপালার কিছু শব্দ হল। উৎকণ্ঠিত ঊর্ধ্বমুখ ইন্দ্রজিৎ সহসা দেখতে পেল, একটা কেঁদো মদ্দা হনুমান তার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে।

ইন্দ্রজিৎ সভয়ে বলল, সরি স্যার। থুড়ি, শুধু সরি।

হনুমানটা একটু দাঁত খিঁচিয়ে আবার গাছে উঠতে লাগল। ঘাস জঙ্গলের মধ্যে একটা শুকনো ডাল খুঁজে পেল ইন্দ্রজিৎ। দূরবিন নয়, হোঁতকা হনুমানটার চাপে ডালটা ভেঙে পড়েছিল।

ইন্দ্রজিতের অনুমান ভুল হল বটে, কিন্তু খুব বেশি ভুল নয়। কারণ মদ্দা হনুমানটা জীবনে এমন প্রতিদ্বন্দ্বী আর দেখেনি। ফুট বিশেক ওপরে ওঠার পর সে পাশের সেগুন গাছে হুবহু তারই মতো দ্রুত ও অনায়াস ভঙ্গিতে আর-একজনকেও গাছ বাইতে দেখল। এবং আশ্চর্যের কথা, প্রতিদ্বন্দ্বী হনুমান নয়, মানুষ। এবং আরও আশ্চর্যের কথা, লোকটা বিড় বিড় করে বলছিল, নীচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরবে... ওঃ বাবা কিছুতেই তাকাব না।

বাস্তবিকই ববির প্রচণ্ড ভার্টিগো। দোতলা থেকেও ববি নীচের দিকে তাকাতে পারেন না।

দূরদর্শী রবীশ পঁচিশ ফুট ওপরে সেগুন গাছের তিনটি মজবুত ডাল জুড়ে একটি মাচান বেঁধেছিলেন। সম্পূর্ণ আড়াল করা চমৎকার ওয়াচ টাওয়ার। এখানে বসে বাড়িটা অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

ভার্টিগোয় আক্রান্ত ববি প্রায় চোখ বুজে মাচানের ওপর উঠে এলেন। হাঁফটাফ তাঁর সহজে ধরে না। কিন্তু কালকের ওই অমানুষিক মারের ব্যথা এখনও দাঁত বসিয়ে আছে সর্বাঙ্গের কালশিটেয়। ববি মাচানে বসে প্রথমেই পকেট থেকে সিরিঞ্জ আর একটা পেথিডিনের অ্যাম্পুল বার করলেন। তারপর বাঁ হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে ওষুধটা চালিয়ে দিলেন ভিতরে। এখন ব্যথাটাকে না মারলে তিনি যুঝতে পারবেন না, অবশ্য যদি লড়াইটা ইতিমধ্যে হেরে না গিয়ে থাকেন।

দূরবিনটা চোখে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন ববি। তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণেও শুধু একটা মস্ত পন্টিয়াক গাড়ি ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না। ববি তাড়াহুড়ো করলেন না। ওত পেতে বসে রইলেন। যদিও সময় বয়ে যাচ্ছে তবু অন্য উপায় নেই।

কিছুক্ষণ পর একটা ঝোপের আড়াল থেকে একজনকে বেরিয়ে আর-একটা ঝোপের আড়ালে যেতে দেখতে পেলেন ববি। তারপর একটা পেয়ারা গাছের ডালে আর-একজনকে আবিষ্কার করা গেল। ছাদের রেলিং-এর আড়ালে আর-একজন। চতুর্থজন ফটকের পাশে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়ানো। প্রত্যেকের হাতেই উজি সাব-মেশিনগান। আর কাউকে দেখা গেল না। একটা পন্টিয়াক গাড়িতে এর বেশি লোক আনা সম্ভবও নয়। পঞ্চম জন নিশ্চয়ই লীনাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে।

ববি প্রায় চোখ বুজে নেমে এলেন।

ইন্দ্রজিৎ!

স্যার, এসে গেছেন তা হলে? আমি ভাবছিলাম আপনি টারজানের মতো লতা ধরে ঝুল খেয়ে অলরেডি ভিতরে পৌঁছে গেলেন বুঝি!

শোনো ইন্দ্রজিৎ, চার-চারটে সাব-মেশিনগানকে এড়ানো বিশেষ রকমের শক্ত কাজ।

ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণ হয়ে গিয়ে বলল, বিশেষ বিপজ্জনকও।

আমাদের গাড়িটা অবশ্য সম্পূর্ণ বুলেট-প্রুফ। আমরা ইচ্ছে করলে ওদের অগ্রাহ্য করে ঢুকে যেতে পারি। কিন্তু ওরা গুলি চালালে যে লোকটা লীনাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে সে সতর্ক হয়ে যাবে। সে লীনাকে তখন ব্যবহার করবে হোস্টেজ হিসেবে।

তা হলে কী করবেন স্যার?

আমি ভাবছি, কী করে শব্দটা এড়ানো যায়। একটিও গুলির শব্দ হলে চলবে না।

না স্যার, গুলি জিনিসটা ভালও নয়।

তুমি টারজানের কথা বলছিলে না?

বলেছিলাম স্যার, তবে উইথড্র করে নিচ্ছি।

উঁহু, উইথড্র করার কিছু নেই। টারজানের মতো ঢুকে লাভ নেই। আমাদের ঢুকতে হবে ইঁদুরের মতো। বাড়ির পিছন দিকে একটা নালা আছে। বড় নর্দমা, এসো, ওটা দিয়েই ঢুকতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ গাড়ি থেকে নামল। বলল, আপনার সঙ্গে কাজকারবার করা মানেই প্রাণ হাতে করে চলা। আমার বউ থাকলে আজই বিধবা হত।

না, ইন্দ্রজিৎ তোমার বউ চিরকুমারীই থেকে যাবে। এসো। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই।

নর্দমা দিয়ে যে আমি কখনও কোথাও ঢুকিনি স্যার।

প্রয়োজনে ডিটেকটিভদের ছুঁচের ফুটো দিয়েও ঢুকতে হয়। গর্দভ, এটা নোংরা নর্দমা নয়।

কথা বলতে বলতে দু'জনে হাঁটছিল। বাড়ির পিছন দিকটায় অসমান জংলা জমি। কাঁটাঝোপ। বিছুটি বন। ভারী নির্জন। গাঁয়ের গোরুরাও এদিকে চরতে আসে না।

বাড়ির পিছন দিকে এসে একটা বুক সমান ঘাসজঙ্গলে ঢুকলেন ববি। পিছনে ইন্দ্রজিৎ। নর্দমার মুখটা জঙ্গলে একরকম ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ববি হিপ পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা ছুরি বের করে ঝপাঝপ কিছু ঘাস কেটে মুখটা পরিষ্কার করলেন।

ইন্দ্রজিৎ বলল, কিন্তু স্যার, নর্দমার মুখে যে শিক লাগানো। ঢুকবেন কী করে?

ববি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কোটের পকেট থেকে ছোট্ট প্লায়ারের মতো একটা যন্ত্র বের করলেন। জং ধরা শিক সেই যন্ত্রের দাঁতে চোখের পলকে কুড়ুক ফড়ুক করে কেটে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে ববি ভিতরে ঢুকলেন। পিছনে ইন্দ্রজিৎ।

সামনে বিস্তর ঝোপঝাড়ের দুর্ভেদ্য আড়াল। ববি তারই ফাঁক দিয়ে সামনেটা নিরীক্ষণ করে নিলেন। চাপা গলায় বললেন, ইন্দ্রজিৎ, পিছনের দিকে দু'ধারে দু'জন পাহারা দিচ্ছে। একজনকে আমি কাবু করতে পারব। অন্যজনকে তুমি পারবে?

না স্যার। এমন ঠান্ডা মাথায় কথাগুলো বলছেন, যেন কাজটা একেবারে জলভাত।

তুমি কি কাওয়ার্ড ইন্দ্রজিৎ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সাব-মেশিনগানওয়ালা লোকের সঙ্গে খালি হাতে পাল্লা টানতে গেলে আমি চূড়ান্ত কাওয়ার্ড।

ববি সামান্য ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে লোকদুটোকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে নজরে রাখছিলেন।

ইন্দ্রজিৎ, এই সুযোগ। একজন রাউন্ড দিতে আড়ালে গেল।

দেখতে পাচ্ছি স্যার। কিন্তু—

ববি ব্যস্ত গলায় বললেন, শোনো ইন্দ্রজিৎ, এই বাগানে ইলেকট্রনিক বার্গলার অ্যালার্মের তার পাতা আছে। কোনও তার ছুঁয়ো না। সাবধান।

ববি ঘাসজঙ্গলে ডুব দিলেন। আর তারপর ইন্দ্রজিৎ শুধু বাতাসের হিলিবিলির মতো একটা ঢেউ দেখতে পেল তৃণভূমিতে। তারপর একটা ঝোপের আড়ালে উঠে দাঁড়ালেন ববি। লোকটার এই অন্যায্য সাহস দেখে ইন্দ্রজিৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অস্ত্রধারী লোকটা তার দিকে তাকাল।

ইন্দ্রজিৎ নড়বার আগেই কুইক-ফায়ার অস্ত্রটিতে ঝাঁঝরা ও দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে পারত। লোকটা সাব-মেশিনগানটা তুলেও ছিল। কিন্তু তারও আগে ঝোপের আড়াল থেকে একটা বাজপাখি যেন উড়ে গেল লোকটার দিকে।

কী হল, তা বুঝতেও পারল না ইন্দ্রজিৎ। শুধু দেখল, অস্ত্রধারী চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে এবং ববি তাকে টেনে ঘাসজঙ্গলের দিকে নিয়ে আসছেন।

দ্বিতীয় পাহারাদারকে ববি নিলেন অত্যন্ত গাঁইয়ার মতো। লোকটা রাউন্ড সেরে ফিরে আসছিল। ববি ঝোপের আড়াল থেকে হাত তুললেন। হাতে একখানা আধলা ইট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভীষিকা ফাস্ট বোলারের মতোই ইটখানাকে ছুড়লেন ববি। লোকটার কপালটা কেটে হাঁ হয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে শান্ত হয়ে গেল লোকটা। ববি তাকেও ঘাসজঙ্গলে ঢুকিয়ে দিয়ে হাতছানি দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে ডাকলেন।

আপনি স্যার, অমিতাভ বচ্চন ধর্মেন্দ্র আর মিঠুনের ককটেল।

তারা কারা?

আমাদের ন্যাশানাল হিরো।

তাই নাকি?

আপনার মধ্যে একটু ব্রুস লি-রও টাচ আছে।

ধন্যবাদ। এখন চলো। আরও দুটোকে ম্যানেজ করতে হবে। তাদের মধ্যে একটা আস্ত একখানা গরিলা।

আপনি আগে চলুন স্যার। একটা কথা। দুটো সাব-মেশিনগানের একটা কি আমি নিতে পারি?

ভয় পাচ্ছ ইন্দ্রজিৎ?

না স্যার, আপনাকে সম্মান দিচ্ছি।

সাব-মেশিনগান তুমি স্পর্শও করবে না। ওসব ভদ্রলোকের অস্ত্র নয়। এসো।

ববি ধীরে ধীরে এগোলেন। দেয়াল ঘেঁষে।

যে লোকটার চেহারা সত্যিই গরিলার মতো, সে দু'খানা থামের মতো পা দু'দিকে ছড়িয়ে প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়ানো।

ববি হঠাৎ অনুচ্চ একটি শিস দিলেন। লোকটা বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়াল। তারপর অবিকল একই দ্রুততায় তুলল তার অস্ত্র।

ববির অস্ত্র নেই কিন্তু তিনি নিজেই এক অস্ত্র। প্রথম একখানা আধলা ইট মারলেন ববি। তারপর

শরীরটিকে কুণ্ডলীকৃত স্প্রিং-এর মতোই তিনি পাক খাইয়ে ছুড়ে দিলেন। এবং সোজা গিয়ে পড়লেন লোকটার বিশাল বুকের ওপর।

জীবনে এরকম অসম লড়াই দেখেনি ইন্দ্রজিৎ। বেশ লিলিপুটের সঙ্গে ব্রবডিংন্যাগের লড়াই। কিন্তু কে দানব এবং কে বামন, তা লড়াই দেখে বোঝা যাচ্ছিল না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গেল, ববি লোকটার ঘাড় এক হাতে ধরে অন্য হাতে তাকে ঠেলে বৃত্তাকারে দৌড় করাচ্ছেন নিজের চারধারে। এ দৃশ্য পঞ্চাশ টাকা টিকিট কেটেও দেখা যাবে না। ইন্দ্রজিৎ প্রাণভরে দেখতে লাগল।

তারপর ববি লোকটাকে হঠাৎ ছেড়ে দিলেন। লোকটা কেমন যেন টলতে লাগল। ববি এরপর লড়াইটা শেষ করলেন থুতনিতে খুব সযত্ন-রচিত একখানা ঘুসি মেরে। দানবটা ভূমিশয্যা নেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ছিল। ঘুসিখানা খেয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে উপুড় হয়ে 'আউট' হল।

ববি ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললেন, ছাদে আর একজন আছে। কিন্তু আপাতত তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। নাউ, এন্টার দা ড্রাগন।

এ বাড়িতে ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখার জন্য একটা গর্ভগৃহ ছিলই। সেই পাতাল-ঘরটিকে একটি সুপ্রসর মনিটারিং কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন রবীশ। অত্যন্ত সুরক্ষিত, অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ঘর। অন্তত পঞ্চাশটা টার্মিনাল। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির একটি জটিল ধাঁধা।

টার্মিনালগুলির সামনে বসে আছে লোকটা। একটার পর একটা চাবি টিপছে, নব ঘোরাচ্ছে, আর ভিডিয়োতে ভেসে উঠছে নানা ছবি। শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট কিছু কণ্ঠস্বর। নানা রঙের প্যাটার্ন ফুটে উঠছে ভিডিয়ো ইউনিটগুলিতে। অকস্মাৎ দৃশ্যমান হল একটা বিপুলায়তন গিরিখাত। দ্রুত সরে গেল। দেখা গেল অস্পষ্ট একটা ভূখণ্ড। লোকটা একটা চাবি টিপতেই ছবিটা স্থির হল। ফের একটা কলকাঠি নাড়তেই ছবিটা দ্রুত জুম করে এগিয়ে এল। তারপর অত্যন্ত খুঁটিনাটি সব জিনিস দেখা যেতে লাগল। একটা মস্ত গম্বুজওয়ালা বাড়ি, চারদিকে শস্যক্ষেত্র।

লোকটা ফিরে তাকাল লীনার দিকে। তারপর গভীর বিস্ময়ে বলে উঠল, মাই গড!

লীনা সভয়ে চেয়ে রইল লোকটার দিকে।

লোকটার চোখে পাগলের মতো দৃষ্টি। সম্পূর্ণ অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে সে বলল, দে হ্যাভ পেনিট্রেটেড দা স্যাটেলাইটস!

লীনা এর জবাবে কী বলতে পারে? বিশেষত তাকে তো কোনও প্রশ্নও করা হয়নি।

লোকটা স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগল, মার্কিন এবং রুশ স্যাটেলাইটগুলো যা দেখছে তার সবই হুবহু ফুটে উঠছে টার্মিনালে! এ কি বিশ্বাসযোগ্য? মিস লীনা, ববি রায়ের আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। আই প্রোনাউন্স হিম গিল্টি অফ ইন্টারন্যাশনাল এসপিয়োনেজ, ডাবল এজেন্টিং অ্যান্ড ব্রিচ অফ ফেইথ। হিজ ওনলি পানিশমেন্ট ইজ ডেথ...

জল্লাদের কাজটা কি তুমিই করবে?

ঘরে বজ্রপাত হলেও এর চেয়ে বেশি চমকাত না লীনা। ইস্পাতের দরজাটা আধো খোলা। দরজায় ববি। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে মুখোমুখি তাকাল ববির দিকে।

ববি রায়!

হ্যাঁ।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, তুমি ববি রায় নও। আমি হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখছি।

দেখছ। ববি রায় তো দুঃস্বপ্নই। তুমি একটু আগেই আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছ, আমি সেটা শুনেছি। তোমার পিছনে কারা আছে এবং তুমিই বা কে?

লোকটা মুখে কোনও জবাব দিল না। কিন্তু তার ডান হাতখানা আকস্মিকভাবে ওপরে উঠল এবং একটি বিদ্যুৎশিখার মতো কিছু ছুটে গেল হাত থেকে।

ববি স্প্রিং-এর পুতুলের মতো মেঝেয় বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক এরকমভাবে কোনও মানুষের শরীর যে ক্রিয়া করতে পারে, তা জানা ছিল না লীনার। লোকটা কি আসলে মানুষ নয়? রোবট?

ফ্লাইং নাইফটা স্টিলের দরজায় লেগে খটাস করে মেঝেয় পড়ল।

ববি অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন, যাকে মারার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়, তাকে মারতে পারাটাও কঠিন কাজ।

লোকটা সম্পূর্ণ ভূতগ্রস্তের মতো ববির দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানতাম তুমি বিপজ্জনক। পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি হাইটের ববি রায় যে ধুরন্ধর লোক তা আমাকে জানানো হয়েছে। মিস্টার রায়, বাইরে আমার চারজন সশস্ত্র পাহারাদার ছিল, তাদের চোখ তুমি এড়ালে কী করে?

ববি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চোখ এড়াব সেরকম কপাল করে কি আমি জন্মেছি? আমি ততটা ভাগ্যবান নই। চারজনের মধ্যে তিনজনের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে।

লোকটা হাঁ করে চেয়ে রইল ববির দিকে। তারপর বলল, কিন্তু জোয়েল? ওই দানব যে হেভিওয়েট বক্সার!

ববি মাথা নাড়লেন, দুঃখিত। একজন হেভিওয়েট বক্সারকে এতটা অপমান করা আমার ঠিক হয়নি।

লোকটা মাথা নাড়ল, বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না। এর মধ্যে কোনও একটা চালাকি আছে।

বলতে বলতে লোকটা ঠেলে রিভলভিং চেয়ারটা সরিয়ে দিল।

ববি, আমি তোমাকে খুন করতে এসেছি। আর খুন আমাকে করতেই হবে... আমি জন দি টেরর।

ববি নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠান্ডা গলাতেই বললেন, আমি তোমাকে চিনি ডার্টি জন। মানবসমাজের পক্ষে তুমি এক নোংরা আবর্জনা। তুমি প্রতিভাবান খুনি ছাড়া আর কিছু নও।

জন খুব ধীরে এগিয়ে গেল।

ততোধিক ধীরে ববি এগোলেন। ববি জানেন, জন আর পাঁচজনের মতো নয়। শরীর ও মনের ওপর তারও নিয়ন্ত্রণ সাংঘাতিক। মানুষ তখনই লড়াই জেতে যখন শরীর ও মন দুইকেই সে একত্রিত করতে পারে। তখন নিজেই সে এক ভয়াবহ অস্ত্র। অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অজেয়। ইন আর ইয়ান। ইয়ান আর ইন।

লীনা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, শুনুন বস। প্লিজ। আপনাকে ও মেরে ফেলবে।

ক্ষুরধার নিষ্পলক চোখে ববি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন, মিসেস ভট্টাচারিয়া, আপনি ঘরের বাইরে যান। ইন্দ্রজিৎ আপনাকে ওপরে নিয়ে যাবে।

আমি আপনাকে মরতে দিতে পারি না।

আমি অমর।

কিসের একটা ধাক্কা খেয়ে লীনা ছিটকে পড়ল মেঝেয়। একটু বাদে বুঝল, পরিসর তৈরি করার জন্য জন তাকে সরিয়ে দিয়েছে মাত্র।

ববি ওত পেতে অপেক্ষা করছিলেন। জন তার কারাটে কিকটি চালিয়ে দিল ববির কোমরে।

বেড়ালের মতো শূন্যে লাফিয়ে উঠলেন ববি। আর মাটিতে পড়ার আগেই পা বিদ্যুতের বেগে নেমে এল জনের মুখে।

কিন্তু জন অন্তত চার ফুট বাঁয়ে সরে গেছে ততক্ষণে। ববি মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার হাতের কানার কোপটি বসাল ববির ঘাড়ে।

কী চমৎকার ভারসাম্য লোকটার শরীরে! ববি একটা ডিগবাজি খেয়ে চলে গেলেন পিছনে।

॥ ১৮ ॥

ক্ষতবিক্ষত শরীরে ববি অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে শারীরিক ও মানসিক লড়াই চালিয়েছেন। প্রতিপক্ষদের মধ্যে বিবেকহীন দৈত্য ও পেশাদার খুনির সংখ্যাই প্রবল। এতক্ষণ যে বেঁচে আছেন ববি, তা কেবল দৈবের বশে। কিন্তু আস্তে আস্তে ববির ক্ষতমুখগুলি বিষিয়ে উঠছে। কেটে যাচ্ছে ওষুধের ক্রিয়া। ববির রিফ্লেক্স ভাল কাজ করছে না। চোখে মাঝে মাঝে ঝাপসা দেখছেন।

প্রতিপক্ষ শুধু প্রবলই নয়, এ পর্যন্ত সর্বোত্তম। লড়াইটা জেতা ববির পক্ষে সাংঘাতিক প্রয়োজন। সুস্থ থাকলে কোনও সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এখন ববির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন বাড়তি জল ঢুকে পড়েছে। হাত তুলতে, পা তুলতে দেড়গুণ-দ্বিগুণ সময় লাগছে। পিঠ থেকে একটা ব্যথা উরু অবধি অবশ করে দিচ্ছে। মাথার ভিতরে প্রবল যন্ত্রণা। আর এ লড়াই লড়তে হচ্ছে শূন্যে লাফিয়ে, জমিতে পড়ে, শরীরে চূড়ান্ত ভারসাম্যের ওপর। এক চুল, এক পলের এদিক ওদিক হলেই একটি হাই পাওয়ার কিক বা কারাটে চপ খেয়ে চোখ ওলটাতে হবে।

প্রায় পনেরো মিনিট কেউ কাউকে ছুঁতে পারল না। লড়াই রইল সমান-সমান। কিন্তু আসলে সমান-সমান নয়। ববি যে আস্তে আস্তে নিজের শরীরের কাছে হার মানছেন তা তিনিও বুঝতে পারছিলেন। আর সেটা বুঝতে পারছিল তাঁর বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষও। ট্রাংক কল-এ সে জানতে পেরেছে ববি ওয়্যারহাউসে কী পরিমাণ পিটুনি গ্রহণ করেছেন তাঁর শরীরে। সারা রাত ঘুম বলতে গেলে হয়নি। প্রতিপক্ষ এয়ারপোর্টের ঘটনাও জানে। সে জানে, ববিকে এই বাড়ির ভূগর্ভের ঘরে আসতে তিন-তিনটে সাব-মেশিনগানধারী গুন্ডার মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার মধ্যে একজন হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা। সুতরাং লোকটা ববিকে যতখানি পারে পরিশ্রান্ত করে তুলছিল। লোকটার নিজের রিফ্লেক্স চমৎকার। নড়াচড়া বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন। তাই আহত পরিশ্রান্ত ববিকে সে আক্রমণের পর আক্রমণ রচনা করতে দিয়ে নিজেকে বারবার চকিতে সরিয়ে নিচ্ছিল।

ববি বুঝলেন, এভাবে পারা যাবে না। লড়াই তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ববি হঠাৎ বৃত্তটা ভেঙে এবং এ লড়াইয়ের নিয়মের তোয়াক্কা না করে আচমকাই সোজা সরল পথে লোকটার কোমর লক্ষ করে জোড়া পায়ে লাফিয়ে পড়লেন।

চমৎকার হালকা ও চকিত লাফ। স্বাভাবিক অবস্থায় এই আকস্মিক দিক পরিবর্তনের ফলে লোকটা দিশাহারা হয়ে যেত। নিশ্চিত পরাজয় লেখা ছিল তার কপালে।

কিন্তু ভাগ্য মন্দ ববির। লোকটা ববির ওই বিভীষণ আক্রমণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল চিতাবাঘের তৎপরতায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত এক খোলা হাতের কোপ বসিয়ে দিল ববির মাথায়। হাতের কানার সেই দুর্দান্ত মার ববির মাথার খুলিতে ফেটে পড়ল। ববির চোখের সামনে সহসা ফুলঝুরির মতো আলোর বিন্দু নাচতে লাগল। অসাড় অবসন্ন দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে ববিকে অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে দেখল। তারপর মুখ তুলে লীনার দিকে চাইল। ফিসফিস করে বলল, এ লোকটা মানুষ না অতিমানুষ তা কি তুমি জানো মিস লীনা?

লীনা অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল, মানুষ। একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, তুমি জানো না। তুমি জানো না এ লোকটা বম্বেতে আমার গ্যাং-এর হাতে ধরা পড়ার পর যে মার খেয়েছে তা দশটা লোককে ভাগ করে দিলেও তারা বোধহয় সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না। এ লোকটা আহত অবস্থায় আমার দু'জন অত্যন্ত শক্ত সমর্থ লোককে ঘায়েল করে পালায়। মাত্র কয়েক মিনিট আগে এ লোকটা আমার তিনজন সশস্ত্র সঙ্গীকে হারিয়ে এবং সম্ভবত অজ্ঞান বা হত্যা করে আমার পিছু নিয়েছে। তিনজনের মধ্যে একজন যে হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা তা তার চেহারা দেখে তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ। এর পরেও যেভাবে আমার সঙ্গে লড়ছিল তাতে যে-কোনও সময়ে আমাকে মেরে ফেলতে পারত। এ লোকটা মানুষ নয়, মিস লীনা।

লীনা কোনও জবাব দিল না। টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে থরথর করে কাঁপছিল। এই ভীষণ পুরুষালি জীবন-মরণ লড়াই সে তো জন্মেও দেখেনি। এত হিংস্র, বর্বর, নিষ্ঠুর কিছু তার অভিজ্ঞতায় নেই। তার অস্তিত্ব আজ নাড়া খেয়ে গেছে ভীষণ।

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর দেয়ালের চারদিকে কী যেন একটু খুঁজল আপনমনে। লীনার দিকে দৃকপাতও করল না। কিন্তু লীনা তাকে লক্ষ করছিল। লোকটা দেয়ালে একটু উঁচুতে ডিং মেরে পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কী যেন একটা অনুভব করল। লীনা লক্ষ করল, দেয়ালের গায়ে একটা লাল বোতাম।

লোকটা নিচু হয়ে মেঝের ওপর কিছু খুঁজল। তারপর একটা হাতলের মতো জিনিস ধরে টানতেই ম্যানহোলের ঢাকনার মতো একটা চৌকো ঢাকনা খুলে এল। লোকটা একটা টর্চ বের করে ভিতরটা দেখে নিল। নামল না। ঢাকনাটা আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে ভিডিয়োগুলো সব অফ করে দিল।

লীনা ধীরে ধীরে ববির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। নাড়ি চলছে। একটু ক্ষীণ। শ্বাসটা যেন অনিয়মিত।

লোকটা লীনার দিকে ফিরে বলল, মিস লীনা, কোনও মহিলার সামনে তার ভালবাসার লোককে আমি খুন করতে চাই না।

লীনা জলভরা চোখ তুলল। চারদিকটা যেন ভাঙাচোরা। লোকটা যেন আবছা এক সিল্যুট।

লোকটা বলল, কিন্তু এই কাজটা করার জন্যই আমাকে কয়েক হাজার মাইল আসতে হয়েছে। আর এ কাজটায় ইনভলভড লক্ষ লক্ষ টাকা। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ববির মতো বিশাল মানুষের মৃত্যুও হবে মহান। ওই যে দেয়ালে লাল বোতামটা দেখছ ওটা হল এই বাড়ির সুইসাইড কোড। বোধহয় দু'মিনিটের ফিউজ আছে। আমার মনে হয়, তুমি ওকে ছেড়ে পালাবে না। যেমন তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে যেতে হবে মিস লীনা। ওই লাল বোতামটা টিপে দিলেই আমার মিশন শেষ।

লীনার লাল বোতামের কথা মনে পড়ল। তেমন বিপদ বুঝলে লীনাকেই বোতামটা টিপতে বলেছিলেন ববি রায় তাঁর চিঠিতে।

লীনা আতঙ্কিত গলায় বলে উঠল, প্লিজ! প্লিজ! আমাদের চলে যেতে দিন।

মিস লীনা, তুমি চলে যেতে পারো। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। ববিকে একা তার মহান মৃত্যু বরণ করতে দাও। সে তার নিজের সৃষ্টির সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এর চেয়ে সুন্দর আর কীই বা হতে পারে! আর তুমিও যদি ওর সঙ্গে সঙ্গে মহৎ হতে চাও তা হলে তো আমার কিছু করার নেই।

মনুষ্যত্ব বলে কি কিছু নেই?

আছে মিস লীনা, আমি জানি আছে। কিন্তু আমাদের মতো মানুষ, যাদের বেঁচে থাকা মানেই প্রতি পদে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা, তাদের কাছে ও ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আমরা মনুষ্যত্ব মানে বুঝি, হয় বাঁচো, না হয় মরো। তুমি বেশ ভাল মেয়ে লীনা, দেখতেও চমৎকার। এমন একটা সুন্দর মেয়ের এরকম পরিণতি আমি চাই না। কিন্তু কিছু করার নেই। গুড বাই...

লীনা কিছু বলার আগেই লোকটা চকিতে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে এক লাফে দরজায় পৌঁছেই চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল লীনা। এভাবে মরবে ববি? এরকমভাবে কি ওকে মরতে দেওয়া যায়? ওর কত ভুল যে শুধরে দেওয়ার আছে লীনার।

ক'মিনিটের ফিউজ? লোকটা বলল, দু'মিনিট, ববিও সেরকমই যেন কিছু জানিয়েছিল তাকে। মাত্র দু'মিনিট। লাল বোতামটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভে চলে গেছে সংকেত। যেখানে অপেক্ষারত এক শক্তিশালী বিস্ফোরক হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে উৎকর্ণ হয়েছে। তার কানে সংকেতটা পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে ব্রু-উ-উ-ম-ম-ম্-ম্...

লীনা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হাতলটা খুঁজল। ওই ঢাকনার তলাতেই রয়েছে সেই উৎকর্ণ বিস্ফোরক। লীনাকে তা অকেজো করতেই হবে। হাতলটা মেঝের সঙ্গে মিশে আছে। লীনা তার লম্বা নখ ঢুকিয়ে দিল খাঁজে। তারপর খুঁটে তুলবার চেষ্টা করল। নখটা উলটে গিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। লীনা গ্রাহ্যও করল না।

হাতলটা উঠে এল ঠিকই। কোলাপসিবল হাতল, মেঝেয় মিশে থাকে, বোঝাও যায় না। হাতলটা ধরে টানতেই ঢাকনাটা সরে এল। হালকা ফাইবারের তৈরি জিনিস, ভারী নয়। আলগা ঢাকনাটা তুলে দূরে ছুড়ে ফেলল লীনা। তারপর গর্তটার মধ্যে নেমে পড়ল।

ঠিক এ সময়ে একজোড়া পা দৌড়ে এল ঘরে।

মিস ভট্টাচারিয়া, আপনি কী করছেন?

লীনা লোকটার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, আপনি ববির বন্ধু না শত্রু?

বন্ধু, ভীষণ বন্ধু! আমি ইন্দ্রজিৎ সেন, প্রাইভেট আই।

তা হলে ছুরি কাঁচি যা আছে দিন। ভীষণ দরকার।

এই যে নিন। ছুরি আমার সবসময়ে থাকে। শুধু রিভলভার...

লীনা যে গর্তে নামল তা মোটেই গভীর নয়। তার কাঁধ অবধি বড় জোর। নীচে একটা জটিল যন্ত্র। অনেক তার। অনেক স্ক্রু এবং বল্টু। কী করবে লীনা? সে পাগলের মতো একটার পর একটা তার কেটে ফেলতে লাগল ছুরি দিয়ে।

ঠিক পনেরো সেকেন্ডে ওপরে উঠে এল জন। দরজার বাইরে পা দিয়েই সে দেখল, বিশাল দানবটার সংজ্ঞা ফিরেছে। উঠে বসবার চেষ্টা করছে ঘাসের ওপর।

জন গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। সময় নেই। একদম সময় নেই।

দানবটা উঠে বসল। মাথায় হাত দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল, সে কোথায় এবং তার কী হয়েছে। আর তখনই সে জনকে দেখতে পেল গাড়ির জানালায়।

জন! এই জন!

জন একটু ইতস্তত করল। তারপর কী ভেবে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিল।

জন! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

জনের সময় নেই। অ্যাকসেলেটরে পা দাবিয়ে দিল সে।

দানবটা আচমকাই কুড়িয়ে নিল তার কারবাইন। তারপর নলটা ঘুরিয়ে আধ সেকেন্ডের একটা বার্স্ট চালু করল। কানে তালা দেওয়ার মতো বাতাসে তরঙ্গ তুলে এক ঝাঁক গুলি গিয়ে উড়িয়ে দিল পিছনের দুটো টায়ার।

জন নেমে এল গাড়ি থেকে, বোকা! গাধা! হোঁতকা!

জনের ডান হাতটা একবার— মাত্র একবারই অতি দ্রুত আন্দোলিত হল। বাতাসে শিস আর রোদে ঝলক তুলে থ্রোয়িং নাইফটা ছুটে এল। দানবটা কিছু বুঝে উঠবার আগেই সেটা আমূল, বাঁট পর্যন্ত গেঁথে গেল বাঁ দিকের বুকে। ঠিক যেখানে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান।

লোকটা অবিশ্বাসের চোখে একবার নিজের বুকের দিকে তাকাল।

জন হরিণের পায়ে দৌড়োচ্ছে। পালাবে? দানবটা তার কারবাইন বিবশ হাতে তুলল। লক্ষ্য স্থির নেই, এমনকী চোখেও সে ভাল দেখছে না। তবু ট্রিগার চেপে ধরল সে।

ট্যাট ট্যাট ট্যাট... রা রা রা রা রা করে উজাড় হয়ে যেতে লাগল সাব-মেশিনগান।

সেই ঝাঁকবাঁধা গুলির তোড়ে জন প্রায় দু'-আধখানা হয়ে গেল। উড়ে গেল তার হাতের একটা আঙুল, শরীরের নানা অংশ ছিটকে পড়ল নানাদিকে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই সে বিভক্ত হয়ে গেল শতধা। যখন মাটিতে পড়ল তার অনেক আগেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

দানবটা কয়েকবার হেঁচকি তুলল। তারপর ফিসফিস করে বলল, আট্টা গুড বয়। ইউ নেভার ডিচ এ ফ্রেন্ড... ওকে?

তারপর দানবটা চোখ বুজল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আর শ্বাস নিতে পারল না।

দৃশ্যটা দেখল একজন। যে ছাদে ছিল। দুটো সাহেবকে একে অন্যের হাতে খুন হয়ে যেতে দেখে সে আর অপেক্ষা করল না। নেমে এল।

মৃত দুই সাহেবের পকেটে হাত দিয়ে সে দুটো ওয়ালেট বের করে নিল। বেশ পুরুষ্টু ওয়ালেট। তারপর হাতের অস্ত্রটা একটা ঝোলায় পুরে নিয়ে সে দ্রুত ফটক পেরিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

'স্যার, স্যার...' বলে কে যেন প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল।

গভীর ঘোরের মধ্যেও সেই ডাকটা ববির কানে পৌঁছোল। খুব ক্ষীণভাবে।

স্যার, আমরা মরে যাচ্ছি... আমরা আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি স্যার, যে আগ্নেয়গিরি এখুনি ইরাপ্ট করবে।

ববির ঘোরটা কাটল। মাথায় হাত দিয়ে তিনি 'ওঃ' বলে কাতর একটা আওয়াজ করলেন। মুখের ওপর একটা চেনা মুখ ঝুলে আছে। ইন্দ্রজিৎ। এত বড় বড় চোখ ইন্দ্রজিতের।

ববি দুর্বল গলায় বললেন, কী বলছ?

রেড বাটন প্রেস করে বদমাশটা পালিয়েছে এক মিনিট হয়ে গেল। কিছু করুন স্যার। দিদিমণি সব তার কেটে ফেলেছেন।

ববি এবার চমকে জেগে উঠলেন, ডেটোনেটর অ্যাক্টিভ! সর্বনাশ! কিন্তু আমি যে—

আপনি উঠবেন না। শুধু বলুন কী করতে হবে?

ববি দেখতে পেলেন, মেঝের চৌকো গর্তের মধ্যে নেমে পাগলের মতো তার কেটে কেটে ওপরে জড়ো করছে লীনা।

ববি চেঁচিয়ে বললেন, লীনা!

লীনা পাগলের মতো চোখে ফিরে তাকাল।

ববি শান্ত স্বরে বললেন, এক্সপ্লোসিভের মাথায় একটা নীল বোতাম আছে। সেটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে প্যাঁচ খুলে টান দিলেই একটা সরু ডার্ট বেরিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি করুন।

ববির দিকে চেয়েই লীনা শান্ত হল। মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল।

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করছিল, আর পাঁচ সেকেন্ড... চার সেকেন্ড... তিন সেকেন্ড... দুই সেকেন্ড...

লীনা নীল বোতামটা তার ওড়না দিয়ে চেপে ধরে বাঁ দিকে প্রাণপণে মোচড় দিচ্ছিল। একটু ধীরে ঘুরছিল প্যাঁচ। বড় শক্ত।

আর এক সেকেন্ড...

লীনা একটা টান দিয়ে ডার্টটা বের করে ফেলল।

ইন্দ্রজিৎ কানে আঙুল দিয়ে চোখ বুজে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধু বলল, জিরো...

লীনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গর্তটার মধ্যেই।

ইন্দ্রজিৎ কান থেকে হাত নামাল, ঘড়ি দেখল, তারপর দু'হাত তুলে চেঁচাতে লাগল, জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা, জয় বাবা মহাদেব... স্যার, আমি যদিও নাস্তিক, কিন্তু ফর দি টাইম বিয়িং... জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী, হর হর মহাদেব...

ববি দু'বার উঠবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তার শরীরের গভীর ক্ষতগুলি টাটিয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে স্নায়ুতন্তুজাল। বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ হচ্ছে।

তৃতীয়বার উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ববি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

বাঘিনীর মতো উঠে এসে লীনা উপুড় হয়ে পড়ল ববির ওপর। না, শ্বাস চলছে, নাড়ি চলছে। তবে বড় দ্রুত। ববির গায়ে হাত রেখে লীনা বুঝল, অন্তত একশো দুই তিন ডিগ্রি জ্বর।

অবস্থাগতিক দেখে ইন্দ্রজিৎও ববির কাছে হাঁটু গেড়ে বসল, কেমন বুঝছেন?

এখনই কোনও নার্সিং হোম-এ নেওয়া দরকার।

নো প্রবলেম। চলুন ধরাধরি করে ওপরে তুলি। আমাদের গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করা আছে। আমি চট করে নিয়ে আসব গিয়ে।

দু'জনে একরকম চ্যাংদোলা করে ববিকে ধীরে ধীরে ওপরে নিয়ে এল।

দরজার বাইরে পা দিয়েই যে দৃশ্যটা দেখল দু'জনে তাতে লীনা একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে চোখ ঢাকল। আর ইন্দ্রজিৎ এমন হাঁ হয়ে গেল যে বলার নয়।

লীনার চিৎকারেই বোধহয় ববির জ্ঞান দ্বিতীয়বার ফিরল। ওরা বারান্দায় শুইয়ে দিয়েছিল তাঁকে। তিনি এবার ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। দু'টি রক্তাক্ত দেহ অনেকটা তফাতে পড়ে আছে। এই দৃশ্যটাই সম্ভবত ববির ভিতরে কিছু উদ্দীপনা সঞ্চার করে দিল। তিনি দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

লীনা তখনও চোখ ঢেকে কাঁপছে, টলছে।

ববি অনুচ্চ স্বরে বললেন, লীনা, এরা দু'জন বেঁচে থাকলে আমাদের কারও শান্তি থাকত না। এ দেশের সরকারেরও নয়। যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে।

লীনা চোখ থেকে হাত সরিয়ে ববির দিকে তাকাল। চোখ ভরা জল। হঠাৎ এই অবস্থাতেও সে একটু হাসল, আমার নামটা তা হলে মনে পড়েছে আপনার!

ববি চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, পড়েছে। আর ভুলব না।

ইন্দ্রজিৎ বিস্ময় কাটিয়ে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে এল।

ববি মাথা নেড়ে বললেন, এখনই নয়। যাও ইন্দ্রজিৎ, ছাদটা দেখে এসো। ওখানে একজন স্নাইপার মজুত ছিল। যদিও আমার ধারণা সে পালিয়ে গেছে।

ইন্দ্রজিৎ দৌড়ে ওপরে গেল তারপর ফিরে এসে বলল, কেউ নেই স্যার।

পিছনের বাগানে যে দু'জন পড়ে আছে তাদের একটু খবর নাও। যদি জ্ঞান না-ফিরে থাকে তবে হাত আর পা বেঁধে সেলার-এ ঢুকিয়ে দরজায় তালা দাও।

এসব কাজে ইন্দ্রজিৎ খুবই পাকা এবং নির্ভরযোগ্য। দু'জন সংজ্ঞাহীন লোককে বেঁধে মাটির নীচে একটা অতিরিক্ত ঘরে বন্ধ করে আসতে তার সব মিলিয়ে পঁচিশ মিনিট লাগল।

ববি কলকাতায় এক্স-সার্ভিসমেনদের একটা সিকিউরিটি এজেন্সিকে ফোন করলেন। তারা এসে নীল মঞ্জিলের নিরাপত্তার ভার নেবে এবং দু'জন বন্দিকে তুলে দেবে পুলিশের হাতে। পুলিশকেও তারাই নিয়ে আসবে এখানে।

ববি আর-একটা ফোন করলেন। ট্রাংক কল। দিল্লির প্রতিরক্ষা দফতরে।

লীনা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, আপনার এখনই মেডিক্যাল অ্যাটেনশন দরকার। কলকাতা অনেক দূর। কেন সময় নষ্ট করছেন? আপনার পিঠের জামা রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

ববি লীনার দিকে ঘুম-ঘুম ক্লান্ত চোখে চেয়ে বললেন, ওরা নীল মঞ্জিলের সমস্ত ভার আমাকে দিতে চাইছে।

বিরক্ত লীনা বলল, ওসব পরে শুনব। এখন চলুন।

ববি ধীরে ধীরে হেঁটে গাড়িতে এসে উঠলেন। পিছনের সিটে লীনা তাঁর পাশে বসল। ইন্দ্রজিৎ গাড়ি ছেড়ে দিল।

ববি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ধীরে ধীরে টলতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ রিয়ারভিউ মিররে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল। বলল, শুয়ে পড়ুন স্যার। আপনাকে সাংঘাতিক সিক দেখাচ্ছে। দিদিমণির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ুন। আমি তাকাব না।

রিয়ারভিউ মিররটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রজিৎ।

ববির উপায় ছিল না। শরীরটা আপনা থেকেই গড়িয়ে পড়ে গেল লীনার কোলে।

লীনার শরীরে একটা বিদ্যুৎ বহুক্ষণ ধরে বয়ে যেতে লাগল। শিউরে শিউরে উঠল গা। তারপর ধীরে ধীরে এক প্রগাঢ় মায়ায় সে ববির মুখে হাত বুলিয়ে দিল।

ববি নিস্তেজ গলায় বললেন, কিন্তু ওই যে ভ্যাগাবন্ড— তার কী হবে?

লীনা ফিসফিস করে বলল, দোলন? উই ওয়ার নেভার ইন লাভ। আমরা শুধু গত এক বছর ধরে পরস্পরের প্রেমে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছি মাত্র। কিছু হয়নি। আমরা পারিনি।

আর এবার?

লীনা শিহরিত হল মাত্র। তারপর বলল, আমি কিন্তু আর মিসেস ভট্টাচারিয়া নই।

ববি হাসলেন। তারপর বললেন, হাউ অ্যাবাউট মিসেস রায়?

মানবজমিন

পুতুলরাণী হাপিস হয়ে যাওয়াতেই হাফ-খরচা হয়ে গেল নিতাই। কৌপিন ধরল, জটা রাখল। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। লোকে নাম দিল খ্যাপা নিতাই।

খ্যাপা নিতাই এখন ওই বসে আছে শিমুল গাছের তলায়। রক্তাম্বরের কোঁচড়ে পো-দেড়েক মুড়ি। সকাল থেকেই আজ রোদ আর বাতাসের বড় বাড়াবাড়ি। উত্তরে হাউড় বাতাস এসে কলকল করে কথা বলছে গাছের পাতার সঙ্গে, মাঝে মাঝে টানা দীর্ঘশ্বাস তুলে যাচ্ছে ডালপালায়। খসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শালের শুকনো পাতা। নিতাইয়ের চারদিকে থিরিক থিরিক নেচে নেচে কয়েকটা শালিখ আর কাক অনেকক্ষণ ধরে মুড়ির ভাগা চাইছে। এক মুঠ মুড়ি মুখে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ একটা ভাবনা এল মাথায়। সামনেই শোলার হ্যাট মাথায় সাইকেলে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে মদন ঠিকাদার নতুন রাস্তা তৈরির কাজ তদারক করছে। দুরমুশ করা মাটির ওপর ইট সাজানো শেষ হয়েছে। এখন ঝুড়ি ঝুড়ি পাথরকুচি ঢালছে কামিনরা।

নিতাই ভাবল, শালারা করছেটো কী? তার হাঁ-করা মুখের দরজায় কোষভরা মুড়ি থেমে ছিল অসাবধানে, অন্যমনস্কতায়। পাজি বাতাস এসে এক থাবায় বারো আনা মুড়ি উড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলল চারদিকে। নিতাই বেকুবের মতো চেয়ে কাণ্ডটা দেখল, তারপর মুঠোভর যেটুকু মুড়ি ছিল তাও উড়িয়ে দিয়ে বলল, খা শালারা পঞ্চভূত!

বাকি মুড়ি কোমরে বেঁধে উঠে গেল নিতাই। সামনের গড়ানে জমি ধরে নেমে গিয়ে মদনের দু'-তিন হাত পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোমরে হাত রেখে মাতব্বরের মতো উত্তর-দক্ষিণে টানা নতুন রাস্তাটার ঘেয়ো চেহারা দেখল। অবশ্য কাজ শেষ হলে এতটা ঘেয়ো দেখাবে না। তখন গাড়ি যাবে, মানুষ, গোরু, কুকুর হাঁটবে। গলা খাঁকারি দিয়ে সে খুব নরম গলায় বলল, মদনবাবু, এই এত এত রাস্তা তৈরি করা কি ভাল হচ্ছে?

মদন ঠিকাদার আলকাতরার মতো কালো, লম্বা। মস্ত গোঁফ আছে তার। ভীষণ রাগী চেহারা। একবার ফিরে তাকাল মাত্র। চোখে আগুন।

নিতাই তাতে ভয় খায় না। সেও সাধক, তান্ত্রিক। বলল, দুনিয়াময় যদি রাস্তাই বানায় মানুষ, কেবল বাড়িঘর বানিয়ে বানিয়েই যদি জায়গা ভরাট করে, তবে চাষবাসই-বা হবে কোথায়, মানুষ খাবেই-বা কী? কথাটা ভেবে দেখবেন একটু? আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি, একেবারে মুখ্যু নই।

মদন একটি কথাও বাজে খরচ করে না। ভারী গম্ভীর মানুষ। যারা কম কথা বলে, যারা প্রয়োজনের চেয়েও কম কথা বলে তাদের লোকে কী জানি কেন একটু ভয় পায়। মদন কখনও কাউকে মারেনি ধরেনি, গালাগালও করেনি বড় একটা, তবু কুলি-কামিন থেকে বন্ধুলোক পর্যন্ত তাকে একটু খাতির দেখিয়ে চলে। খ্যাপা নিতাইয়ের কথারও কোনও জবাব দেয় না মদন। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার কাজ দেখতে থাকে।

মদন জবাব না দিল তো বয়েই গেল নিতাইয়ের। কিন্তু সাহস করে একটা মস্ত তত্ত্বকথা যে মদন ঠিকাদারকে বলতে পেরেছে সে তাতেই ভারী খুশি হল। ফের ঢিবির ওপর উঠে শিমুলের ছায়ায় জমিয়ে বসল সে। একটা কাকের দিকে চেয়ে বলল, নিতাই কাউকে উচিত কথা বলতে ছাড়ে না, হ্যাঁ।

আজ সকালে খুব ঘন কুয়াশা ছিল। শেষ রাত থেকে বাঁদুরে টুপি আর তুষের চাদরে জাম্বুবান সেজে দক্ষিণের টানা বারান্দায় কাঠের ভারী চেয়ারখানায় বসে আছে শ্রীনাথ। তার চোখের সামনেই কুয়াশার আড়ালে রোগা-ভোগা ন্যাড়া মাথা কমজোরি সূর্যেব উদয় হল। তারপর অবশ্য কুয়াশা কেটে ঝাঁ ঝাঁ রোদ ফুটেছে। শ্রীনাথ টুপি আর চাদর খুলে ফেলেছে অনেকক্ষণ। বাগানে উবু হয়ে বসে বসে এ গাছ সে গাছের পায়ে ধরে, গায়ে হাত বুলিয়ে বাবা-বাছা বলে সেবা দিচ্ছে। রোদের তাপে আর পরিশ্রমে গেঞ্জি ভিজে ঘাম ফুটে উঠল। ফর্সা রং এখন টমেটোর মতো টুকটুকে। কনুই পর্যন্ত মাটি মাখা, সারা মুখে ধুলোবালি। শেষ শীতে পালঙের শিষ হঠাৎ লাফিয়ে ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে হাত দেড়েক। তারই আড়াল থেকে দেখতে পেল, বারান্দার সামনের দিকে কোণে একটা সাদা কাপ ডিশ দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে কে যেন। দু' হাতে তালি বাজিয়ে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে আসে শ্রীনাথ। বারান্দার নীচে চায়ের কাপটার তলাতেই একটা মস্ত গো-হাড় কামড়াচ্ছে খ্যাপা নিতাইয়ের কুকুর ইস্পাত। ব্যাটা চায়ের কাপটা শুঁকেটুকে দেখেনি তো! চা রেখে গেছে, কিন্তু তাকে ডেকে দিয়ে যায়নি। শ্রীনাথ চায়ের কাপে জ্বর দেখার মতো হাত ছুঁইয়ে দেখল, নিমঠান্ডা। এর চেয়ে বেশি এ বাড়ির লোকের কাছে সে আশাও করে না। আস্তে আস্তে ঠান্ডা চা-ই খেয়ে নেয় শ্রীনাথ। অভিমান বা রাগ করে লাভ নেই। বউ, মেয়ে, ছেলে, এরা সবাই তার আপনজনই তো। আদরযত্ন করার ইচ্ছে থাকলে এমনিতেই করত। এখন এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে সে কিছুই আর নতুন করে ঢেলে সাজাতে পারবে না।

নিতাইয়ের কুকুরটা কুঁই-কুঁই করে এখন তার পায়ের ফাঁকে মুখ গুঁজে আদর কাড়বার চেষ্টা করছে। গো-হাড় চিবোচ্ছিল, ঘেন্নায় পা তুলে বসে শ্রীনাথ। কিন্তু নেই-আঁকড়া কুকুরটা কি তাতে ছাড়ে? শ্রীনাথ বলল, হাড়টা তো এনে ফেলেছ বাপ, কিন্তু আবার যে সেটা বাইরে গিয়ে রেখে আসবে সে বুদ্ধি নেই। সাধে কি কুকুর বলেছে!

ফটক ঠেলে বদ্রী ঢুকল। গায়ে জহর কোট, পাজামা, হাতে ফোলিও ব্যাগ, চতুর গোঁফ। সোজা এসে রোদে-তাতা বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসল। ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বের করতে করতে বলল, প্রমথবাবুর জমিতে বর্গা রেজিস্ট্রি হয়ে আছে। ওঠানো যাবে না। তবে বর্গার দরুন দাম কিছু ছাড়তে রাজি আছেন।

শ্রীনাথ বলে, আমি নিজে চাষ করাব। বর্গাদার দিয়ে হবে না।

সে আপনি করুন না! বর্গার আইন তো তাতে পালটে যাচ্ছে না। চাষ আপনি করালেও সেই তে-ভাগাই হবে। বর্গা পাকা ঘুঁটি।

শ্রীনাথ সবই জানে। গভীর শ্বাস ফেলে বলল, এ তো ধান চাষ নয়। আমি করব ভেষজের চাষ!

উকিলবাবুকে সব বলেছি। উনি বললেন, হওয়ার নয়।

বর্গাদার কে? দেখা করেছিলি তার সঙ্গে?

সে এক তেরিয়া ধরনের ছেলে। তবে বলছিল, প্রমথবাবুর কাছ থেকে হাজার পাঁচেক টাকা পেলে আদালতে গিয়ে বলবে যে, চাষ সে করত না। কিন্তু উকিলবাবু সেই ফাঁদে পা দিতে নিষেধ করেছেন। ওরা যখন-তখন কথা পালটায়। টাকা খাওয়ার পর আদালতে দাঁড়িয়ে উলটো কথা বললে কিছু করার থাকবে না।

শ্রীনাথ খানিক ভেবে বলে, তুই বরং কোনও চাষির জমি দ্যাখ, যে নিজে চাষ করে। বর্গার গন্ধ যেন না থাকে।

বদ্রী মাথা নেড়ে বলে, সে দেখব। কিন্তু কাছে-পিঠে হবে না।

দূরেই যাব।

অনেক দূর হলেও যাবেন? সেখানে নিজে গিয়ে চাষ করানো মানেই স্থায়ীভাবে থাকা।

থাকতে তো হবেই।

চাষ করাবেন বলছেন, তার মানে তো আবার সেই বর্গার খপ্পরেই পড়ে গেলেন।
চাষ করাব না। ভাবছি নিজেই করব।
হাল গোরু সব কিনবেন? তার ওপর বলদের দেখাশোনা, লাঙলের মেরামতি, আরও কত কী সব করতে হবে। চাকরি করে কি পারবেন অত সব?
পারব। চাকরি করার ইচ্ছে থাকলে আর জমি করতে যেতাম নাকি? ভেষজের চাষে লাভও যেমন, তেমনি লোকের উপকারও হবে।
বদ্রী চারদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় সাবধানে বলে, বউঠান সঙ্গে যাবেন বলে তো বিশ্বাস হয় না। সেখানে একা থেকে অসুখে পড়লে?
শ্রীনাথ চায়ের খালি কাপটা প্লেটের ওপর উপুড় করে ঘোরাতে ঘোরাতে হেসে বলে, এখানে অসুখ করলেই বা দেখছেটা কে? এখানেও একা, সেখানেও একা। তুই দ্যাখ।

দুধের মধ্যে সর ভাসলে ভারী ঘেন্না পায় সজল। রোজ তার দুধ ছাঁকনিতে ভাল করে ছেঁকে দেওয়া হয়। আজও তাই দিয়েছিল মেজদি মঞ্জুলেখা। তবু এক কুচি সর কীভাবে রয়ে গিয়েছিল তাতে। ওয়াক তুলে খুব চেঁচামেচি করেছে সজল। তাইতেই মায়ের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে মেজদি।
শোওয়ার ঘরের মস্ত বিছানাটা বলটান দিয়ে রাখা হয়েছে। পাহাড়-প্রমাণ উঁচু সেই বিছানা আর খাটের বাজুর মধ্যে যে খাঁজটুকু, সেইখানে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে মঞ্জুলেখা। মায়ের চিমটিতে তার ডান গাল ফুলে লাল হয়ে লঙ্কাবাটার মতো জ্বলছে। এই গাল নিয়ে সে লোকের সামনে বেরোয় কী করে এখন? তাই এক পুকুর দুঃখের মধ্যে ডুবে কাঁদছে মঞ্জুলেখা। এ সময়ে খিঁচ করে চুলে একটা টান পড়ল। একবার। দু'বার। দূর থেকে সজল ছিপ ঘুরিয়ে বঁড়শি মারছে চুলে। মুখটা তুলে মঞ্জুলেখা বলল, মরিস না কেন তুই?
সজল ছিপটা সামলে নিয়ে হি হি করে হেসে বলল, মাকে গিয়ে বলে দেব?
বল গে যা। কচু করবে।
যাচ্ছি তা হলে। বলব, মেজদি আমাকে বলেছে, তুই মর।
সজল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বিছানার খাঁজ থেকে উঠে পড়ল মঞ্জুলেখা। তাড়াতাড়ি এলো চুলে খোঁপা বেঁধে নিল। চুপিসারে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর মস্ত বাগানের গাছপালার মধ্যে পালিয়ে গেল।
সজল মায়ের কাছে নালিশ করবে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল উঠোনে। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে আকাশের ঘন নীলের দিকে চাইল। দেখল শীতের অফুরান রোদে ঘর ছেড়ে বেরোনোর ডাক। আস্তে আস্তে শ্লথ হয়ে গেল তার পা।
বাগানের চারধারে শক্ত বেড়া আছে। উঠোনের চারধারে আছে নিচু ঘের-পাঁচিল। ফটক ঠেলে খ্যাপা-নিতাই ঢুকে এল। বাগান থেকে সদ্য তুলে আনা একটা মস্ত রাঙা মুলো তার হাতে। সঙ্গে ইস্পাত। চেঁচাতে চেঁচাতে বলছে, গরম রুটি ডাল আর কাঁচা মুলো... ডাল রুটি কাঁচা মুলো, এর ওপর কথা হয় না।
নিতাইয়ের ওপর এ বাড়ির কেউ খুশি নয়। একটা বাড়তি লোক খামোখা ঘাড়ের ওপর বসে খায়, থাকে। মন করলে কিছু কাজে আসে, পাগলামি চাড়ান দিলে কেবল বসে বক বক করে। রোজ রাতে পুতুলরাণীর একটা ছবি আঁকে কাগজে। তারপর মন্ত্র পড়ে বাণ মারে।
নিতাইকে ভারী ভাল লাগে সজলের। এই একটা লোক যার কোনও সময়েই কোনও কাজ থাকে না, যাকে যখন খুশি ডাকলেই পাওয়া যায়, যার কাছে মনের কথা যা খুশি বলা যায়। সংসারে আর সবাই ভারী ব্যস্ত, সকলেরই ভারী তাড়া, নিজের গম্ভীর বাবার কাছে কখনওই প্রায় ঘেঁষতে পারে না সে। সবচেয়ে ভালবাসে যে মা, সেও চৌপর দিন সংসারের হাজারও কাজে ব্যস্ত থাকে বলে

তেমন পাত্তা দিতে চায় না। সে শুনেছে যখন তারা খুব গরিব ছিল তখন বড়দি চিত্রলেখাকে পুষ্যি নিয়েছিল মেজমাসি। বড়দি সেই মাসির কাছে এলাহাবাদে থাকে। তাকে ভাল করে দেখেইনি সজল। আর দুই দিদির সঙ্গে ভাল বনিবনা নেই সজলের। মেজদি আর ছোড়দি দু'জনেই হিংসুটির হদ্দ। মা সজলকে কিছু বেশি ভালবাসে বলে ওরা তাকে সহ্য করতে পারে না। তবে ভয় পায়।

খ্যাপা নিতাইয়ের খিদে পেয়েছে। রান্নাঘরের দিকে হন্যে হয়ে যেতে যেতে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সজলকে দেখে বলল, আজ মদন ঠিকাদারকে খুব বকে দিয়ে এসেছি। পালপাড়ার জমি গায়েব করে রাস্তা বানাচ্ছিল।

সজল সঙ্গ ধরে বলল, আজ কোথাও নিয়ে যাবে নিতাইদা?

নিতাই আড়চোখে চেয়ে বলে, যাবে কোথায়? চারদিকে ট্যাম-গোপাল বসে আছে। ধরবে।

হি হি করে হাসে সজল। ট্যাম-গোপালের গলায় মস্ত ঘ্যাঘ। তাই দেখে সজল ভয় পেত বরাবর। ওই ঘ্যাঘের জন্যই গোপালের নাম হয়েছিল ট্যাম-গোপাল। তার নাম করে সজলকে এতকাল ভয় দেখিয়ে যা করার নয় তাই করিয়ে নিয়েছে বাড়ির লোক। কিন্তু সজল যে আর অত ছোট নেই তা সবাই এখনও তেমন বুঝতে পারে না। সে বলল, ট্যাম-গোপালের সঙ্গে আমার কবে ভাব হয়ে গেছে। চালাকি কোরো না নিতাইদা, আজ নদীর ধারে কাঁকড়া খুঁজতে যাব।

হবে হবে।

বলে নিতাই রান্নাঘরমুখো হাঁটা দেয়। সঙ্গে ইস্পাত, হাতে মুলো।

বাগানে একটা ছোট্ট পুকুর আছে। গাছে জল দেওয়ার জন্য বাবা কাটিয়েছিল। এখন তাতে কিলবিল করে আমেরিকান কই মাছ। এ বাড়ির কেউ এই মাছ খায় না। সজলের কাজ না থাকলে এসে চুপচাপ ছিপ ফেলে মাছ ধরে। পরে লুকিয়ে সেগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। কাজ নেই বলে সজল ছিপ হাতে পুকুরপাড়ে গিয়ে বসল। আটার টোপ ফেলে মাছের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বদ্রী চলে গেলে শ্রীনাথ উঠল। অফিসে যাওয়ার সময় হয়েছে। বেশ একটু দেরিতেই যায়, রাত করে ফেরে।

বাইরের দিকে নিজের এই আলাদা ছোট্ট ঘরখানা শ্রীনাথের একার। এ ঘরে কদাচিৎ কেউ আসে। দাদা মল্লিনাথ এ বাড়ি বানিয়েছিল নিজের পছন্দমতো। এই ঘরটা ছিল ভাবন-ঘর। চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যে বাড়িতে একটা আলাদা ঘর থাকা দরকার এটা একমাত্র তার মাথাতেই আসতে পারে যার মাথার স্ক্রু কিছু ঢিলে। বলতে নেই মল্লিনাথের মাথার কলকবজা কিছু ঢিলেই ছিল। বেশি বয়স পর্যন্ত ব্যাচেলর থাকলে যা হয়। অবরুদ্ধ কাম গিয়ে মাথায় চাড়া দেয়, নারীসঙ্গহীনতায় মনটা হয় ভারসাম্যহীন। পৃথিবীতে মেয়ে এবং ছেলে এই দুই জাতের সৃষ্টি যখন হয়েছে তখন তার পিছনে একটা কারণও থাকার কথা। এককে ছেড়ে আর একের কি পুরোপুরি চলে? শেষ দিকটায় মল্লিনাথের খুব সেবা করেছিল শ্রীনাথের বউ তৃষা। সেই কৃতজ্ঞতাতেই মল্লিনাথ তার গোটা বাড়ি সম্পত্তি সব তাকে উইল করে দিয়ে গেল। আর সেই থেকেই এ বাড়িতে পর হয়েছে শ্রীনাথ।

মল্লিনাথের এই ছোট্ট ভাবন-ঘরে সে থাকে। তার জাগতিক যা কিছু আছে সব এই ঘরটুকুর মধ্যে। তাও সব কিছু তার নিজের নয়। ওই ইজিচেয়ারটা মল্লিনাথের। লেখার ডেসকটাও তারই। দিশি মিস্ত্রি দিয়ে বানানো মজবুত চৌকিটার মালিক অবশ্য শ্রীনাথ। কিন্তু বইয়ের আলমারিটা মল্লিনাথের। এই ঘরে এই বাড়িতে বাস করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই শ্রীনাথের মনে হয়, সে পরের ঘরে বাস করছে। প্রতি মুহূর্তেই সে বোধ করে, এ বাড়ির দখল নিয়ে তারা ঠকাচ্ছে কাউকে।

মল্লিনাথের বিষয়-সম্পত্তির দাবিদার আরও দু'জন আছে। শ্রীনাথের ছোট দুই ভাই দীপনাথ

আর সোমনাথ। দীপ অন্য ধরনের মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটন ও অঘটনের দিকেই তার ঝোঁক, কে কোথায় ক'বিঘে জমি নিয়ে বসে আছে তা তার মাথাব্যথার বিষয় নয়। দীপ অতিশয় জটিল চরিত্রের মানুষ, তাকে একদম বুঝতে পারে না শ্রীনাথ। কিন্তু ছোট সোমনাথ জটিলতার ধার ধারে না। মানুষের সহজ সরল লোভ হিংসা প্রবৃত্তির বশে সে চলে। অর্থাৎ সোমনাথ খুবই স্বাভাবিক। উপরন্তু তার ভাবের বিয়ের বউ আর শাশুড়ি তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়। সুতরাং, সে প্রথম-প্রথম এসে বড়দার সম্পত্তির ভাগ নিয়ে শ্রীনাথ আর তৃষার সঙ্গে একটা রফা করার কথা বলত। শ্রীনাথ এ সম্পত্তি চায় না, তার আগ্রহ বা কৌতূহল নেই। সে থাকত চুপচাপ। সোমনাথের সঙ্গে লড়ত তৃষা একা। কিন্তু একাই সে একশো। প্রথম-প্রথম সোমনাথ নরম গরম কথাবার্তায় তুতিয়ে পাতিয়ে সম্পত্তি ভাগ করাতে চাইত, পরে সে নরম ছেড়ে গরম হল। রবিবার বা ছুটির দিনে এসে সে তুমুল ঝগড়া বাঁধাত তৃষার সঙ্গে। প্রায় সময়েই সঙ্গে করে আনত তার অল্পবয়সি প্রায়-বালিকা বউকে। সে বউটিও গলার জোরে কিছু কম যায় না। কোনও পক্ষকেই কোনওদিন হার মানতে বা ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখেনি শ্রীনাথ। ছুটির দিন এলে পারতপক্ষে সে নিজে আর এ বাড়িতে থাকত না। দূরে কোনও গ্রামগঞ্জে চাষ-আবাদ দেখার নাম করে চলে যেত।

খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই একদিন সোমনাথের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। গত বছর শীতকালে এক রবিবারে এসে সারা দিন সোমনাথ আর শমিতা থেকেছিল এ বাড়িতে। দফায় দফায় প্রবল ঝগড়াঝাঁটি হল দু'পক্ষে। সন্ধেবেলা যখন স্বামী-স্ত্রী কলকাতার ট্রেন ধরতে স্টেশনে যাচ্ছে তখন বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে দু' শো গজ যেতে না যেতেই নির্জন রাস্তায় দুটো লোক এসে ধরল তাদের। একজন শমিতাকে রাস্তার ধারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে গয়নাগাটি কেড়ে বদ মতলবে মাটিতে পেড়ে ফেলেছিল। অন্যজন লোহার রড দিয়ে চ্যাঙা-ব্যাঙা করে পিটিয়েছিল সোমনাথকে। হাতব্যাগ, ঘড়ি, মানিব্যাগ হাপিস করেছিল। শমিতা অবশ্য চরম লজ্জাকর ঘটনাটা ঘটতে দেয়নি। তার প্রবল প্রতিরোধ আর আঁচড় কামড়ে ধর্ষণকারী লুঠেরাটি নিবৃত্ত হয়। কিন্তু সোমনাথকে দিনতিনেক হেল্‌থ সেন্টারে পড়ে থাকতে হয়েছিল। পুলিশ সেই ঘটনায় কাউকে আজও ধরতে পারেনি। সোমনাথকে যে লোকটা পিটিয়েছিল সে লোকটা নাকি ছিল বেশ লম্বা আর দশাসই চেহারার। আর শমিতাকে যে ধরেছিল সে নাকি ছিল নরম-সরম শরীরের ছোটখাটো মানুষ। দু'জনেরই মুখে ভুষো কালি মাখা ছিল বলে ওদের ভাল বর্ণনা দিতে পারেনি শমিতা আর সোমনাথ। তবে শমিতা বলেছে, তাকে যে ধরেছিল তার মুখে পচা মাছের মতো প্রবল এক দুর্গন্ধ পেয়েছে সে। কিন্তু এই অস্পষ্ট বিবরণ থেকে কাউকে চেনা মুশকিল। শ্রীনাথ অনেক ভেবেছে, কিন্তু এ অঞ্চলের কোনও মানুষকেই ওই দুই বদমাশ বলে মনে হয়নি। তবে সোমনাথ স্পষ্টই তাকে বলেছে, এ কাজ করিয়েছে তৃষা।

শ্রীনাথের কোনও পক্ষপাত নেই। তৃষা এ কাজ করালেও করাতে পারে। তৃষার হাতে লোকের অভাব নেই। ঘরামি, মাটিকাটা মজুর, রাজমিস্ত্রি, দালাল, পলিটিকসওয়ালা, পুলিশ দারোগা সকলের সঙ্গেই তৃষা সদ্ভাব রেখে চলে। শুধু ছিনতাই করার জন্যই যদি সোমনাথ আর শমিতাকে ধরেছিল ওরা তবে খামোখা সোমনাথকে অত মারল কেন? সোমনাথ মার খাওয়ার পর অবশ্য শ্রীনাথ তৃষাকে ভাল করে লক্ষ করে দেখেছে। কোনও ভাবান্তর চোখে পড়েনি। কিন্তু শ্রীনাথ এও জানে, মুখের ভাবে ধরা পড়ার মতো কাঁচা মেয়ে তৃষা নয়। এই পুরো জমিজমা, সম্পত্তি একা হাতে সামলাচ্ছে তৃষা। সোমনাথ মার খেয়ে ফিরে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দাদার সম্পত্তির ভাগ দাবি করে মামলা ঠুকেছে। সেই মামলাও একা চালাচ্ছে তৃষা। আদালতে গিয়ে উইলের প্রোবেট বের করেছে। উকিলের বাড়ি যাতায়াত করছে। দরকারমতো উকিলকে পরামর্শ দিচ্ছে। এরকম বউ থাকলে মেনিমুখো মানুষের গৌরব হওয়ার কথা।

ঘরে এসে গা থেকে ঘামে-ভেজা গেঞ্জিটা খুলে সেটা দিয়েই গা মুছে নিল শ্রীনাথ। প্রায় সাড়ে

ন'টা বাজে। ইজিচেয়ারে বসে চোখ বুজে রইল একটু। মাথায় অজস্র চিন্তার ভিড়। কোনওটাই কাজের চিন্তা নয়। মল্লিনাথের এই ভাবন-ঘরের চারদিকেই অজস্র জানালা। আলোয় হাওয়ায় ঘরে ভাসাভাসি কাণ্ড। ভারী সুন্দর ঘর। কিন্তু সারাক্ষণ একটা অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে থাকে শ্রীনাথের মনে। এ বাড়ি দাদা বানিয়েছিল, এখন এর মালিক তার বউ তৃষা। এসব তার নয়, সে এ বাড়ির কেউ নয়।

গোলপানা একটা মুখ উঁকি দিল দরজায়। আবছা একটা ফোঁপানির শব্দ। আধবোজা চোখেই মুখখানা নজরে এল শ্রীনাথের। তার মেজো মেয়ে মঞ্জু।

শ্রীনাথ সোজা হয়ে বসে বলল, কী রে? কাঁদছিস নাকি?

কোনও জবাব নেই। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে অবশেষে মঞ্জু আড়াল থেকে বেরিয়ে কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। মুখ নিচু। খোলা চুল নেমে এসে খানিকটা আড়াল করেছে মুখখানা।

আগে ছেলেমেয়ের ওপর বড় মায়া ছিল শ্রীনাথের। বাড়ি ছেড়ে দূরে যেতে পারত না। এখন কেন যেন আর বুকের মধ্যে তেমন ব্যাকুলতা নেই, টান নেই। ছেলেমেয়েদের দেখলে, হঠাৎ যেন মনে হয়, অন্য কারও ছেলেমেয়ে। আগে খুব মিশত ওদের সঙ্গে শ্রীনাথ, আজকাল গা বাঁচিয়ে থাকে। পারতপক্ষে ওরাও আজকাল তার কাছে ঘেঁষে না। মেয়ে দুটো তবু মাঝে মাঝে একটু-আধটু ডাক-খোঁজ করে, কিন্তু ছেলের সঙ্গে প্রায় পরিচয়ই নেই শ্রীনাথের। ছেলে সজল পুরোপুরি তার মায়ের সম্পত্তি। এইভাবে বন্ধনমুক্তি শ্রীনাথের খুব খারাপও লাগছে না।

শ্রীনাথ আর কিছু বলছে না দেখে মঞ্জু এলোচুল খোঁপায় বাঁধল, চোখ মুছল, তারপর খুব সংকোচে সাবধানি পায়ে ঘরে এসে চৌকির বিছানায় বসে বলল, তোমার এ ঘরের চাবিটা আজ আমাকে দিয়ে যাবে বাবা?

বিরক্ত হয়ে শ্রীনাথ বলে, কেন?

আমি এখানে দুপুরটা থাকব।

তাই বা থাকবি কেন? ঝগড়া করেছিস নাকি কারও সঙ্গে?

ভাই ভীষণ পাজি। সারাদিন মাকে নালিশ করে মার খাওয়ায়। আজও মা কীরকম মেরেছে দেখো। গাল এখনও ফুলে আছে দেখেছ?

দেখল শ্রীনাথ। তৃষা এরকমই মারে। শ্রীনাথ উঠে দড়ি থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বলল, এ ঘরে তোকে খুঁজে পাবে না নাকি?

মঞ্জু সংকোচের গলায় বলে, ভাই তো তোমাকে ভয় পায়। এ ঘরে আসতে সাহস পাবে না।

এ কথায় একটু থমকাল শ্রীনাথ। এ বাড়ির কেউ তাকে ভয় পায় এটা নতুন কথা। সজল কেন তাকে ভয় পায় তা বুঝতে চেষ্টা করেও পারল না। মাথাও ঘামাল না বিশেষ। বালতি মগ আর সর্ষের তেলের শিশি নিয়ে ঘরের পিছন দিকে টিউবওয়েলে যেতে যেতে বলল, চাবি রেখে দিস, কিন্তু জিনিসপত্র ঘাঁটিস না।

বিশাল উঠোন পার হয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় নিকোনো শানের মেঝেয় পরিপাটি গালচের আসনের সামনে বাড়া ভাত আর ঢাকা-দেওয়া জলের গেলাসটি সাজিয়ে রাখার দৃশ্যটি দেখলে তখনও তার সেই একটি কথাই মনে আসে। এ বাড়িতে সে বড় বেশি অতিথির মতো। তৃষার কাজ নয়, এ হচ্ছে রাঁধুনি বামনির যত্ন-আত্তি। পিছনে অবশ্য তৃষার হুকুম আছে। কিন্তু এক কালে গরিব অবস্থার সময়ে কলকাতার শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের ভাড়াটে বাসায় তৃষা নিজের হাতে রেঁধে তাকে খেতে দিত, তখনও কোনওদিন এত যত্নে ভাত বেড়ে দেয়নি।

তবে তৃষা ভাত বেড়ে না দিলেও আজ কাছেপিঠেই ছিল। শ্রীনাথ খেতে বসার পরই সামনে এসে বসে বলল, কতদিন হয়ে গেল বিলুর চিঠি এসেছে। প্রীতমবাবুর অত অসুখ, তোমার একবার দেখতে যাওয়া উচিত ছিল না? রোজই তো কলকাতা যাচ্ছ। একদিন অফিসের পর গিয়ে ঘুরে আসতে কী হয়?

ভগ্নিপতির অসুখের খবর একটা কানে এসেছিল বটে শ্রীনাথের। অতটা গুরুত্ব দেয়নি। এখন বলল, কী অসুখ? খুব খারাপ কিছু নাকি?

তৃষা বলল, অত ভেঙে তো লেখেনি। শুধু লিখেছে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না পর্যন্ত।

শ্রীনাথ ভ্রু কোঁচকাল। কতকাল হল সে বিলুর খবর রাখে না? বছরখানেক হবে? তা হবে বোধহয়। গতবার বিলু ভাইফোঁটায় ডেকেছিল। সেবারই শেষ দেখা। এবার ভাইফোঁটায় বিলুও ডাকেনি, শ্রীনাথেরও ব্যাপারটা খেয়াল হয়নি। কিন্তু প্রশ্নটা হল, এতকাল মায়ের পেটের বোনকে একেবারে ভুলে সে ছিল কী করে? শ্রীনাথ পাতের দিকে চোখ রেখেই বলল, চিকিৎসার ব্যবস্থা কী করেছে?

কী আবার করবে? স্বামীর অসুখ হলে স্ত্রীরা যেমন করে তেমনই ব্যবস্থা করেছে। নিজে গিয়ে দেখে এলেই তো হয়।

উদাস উদার গলায় শ্রীনাথ বলল, যাব।

আজই যেয়ো পারলে। দেরি করা ঠিক নয়।

আজই?— বলে ভাবল একটু শ্রীনাথ। কী হয়েছে তার আজকাল, কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। অভ্যস্ত জীবনের বাইরে এক পা হাঁটতে হলেও কেন যে জড়তা আসে!

কেন, আজ কি কোনও কাজ আছে?

শ্রীনাথ বলে, অফিস ছুটির পর বাসে ট্রামে বড্ড ভিড়। তার চেয়ে কোনও ছুটির দিনে—-

তৃষা মাথা নেড়ে বলে, তা তুমি কি যাবে? ছুটির দিনে মানুষকে আলিস্যির ভূতে পায়। ব্যাপারটা ফেলে রাখলে আবার বছর গড়িয়ে যাবে। যেতে হলে আজই যাও। বিলুকে বোলো আমি মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে বড্ড ব্যস্ত। নইলে আমিও যেতাম।

॥ দুই ॥

দাওয়াতে দাঁড়িয়েই ঘটিভরা জলে আঁচাতে আঁচাতে খুব সাবধানে চোখের মণি বাঁয়ে সরিয়ে শ্রীনাথ তার বউ তৃষাকে দেখল। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। বেশ লম্বা, প্রায় শ্রীনাথের সমান। গায়ে মেদ নেই, কিন্তু তেজালো একটা শক্তি-সামর্থ্যের ভাব আছে। গায়ের রং শ্যামলা। মুখখানাকে সুন্দর বলা যায়, কিন্তু একটু বন্যভাব আর লোভ আর হিংস্রতা মেশানো আছে। এ বাড়ির ঝি চাকর মুনিশ খামোখা ওকে ভয় খায় না। ভয় পাওয়ার মতো একটা থমথমে ব্যক্তিত্ব আছে তৃষার। এ মেয়ের বর হওয়া খুব স্বস্তির ব্যাপার নয়। শ্রীনাথ কোনওদিন স্বস্তি পায়নি। কী করে তবে এর কাছে স্বস্তি পেয়েছিল মল্লিনাথ? তৃষার মুখে যে মধুর আত্মবিশ্বাস আর নিজের ধ্যানধারণার ওপর অগাধ আস্থার ভাব রয়েছে সেটা লক্ষ করলেই বোঝা যায়, সোমনাথ মামলায় হেরে যাবে। তৃষার সঙ্গে কেউ কখনও জেতেনি।

ভাবতে ভাবতে রোদে-ভরা উঠোন পেরোতে থাকে শ্রীনাথ। সোমনাথের দুরবস্থার কথা চিন্তা করতে করতে আপনমনে হাসে। চাকরির জমানো টাকা খরচ করে দেওয়ানি মামলা লড়তে গিয়ে ফতুর হয়ে যাচ্ছে বেচারা। তৃষার ধান-বেচা অগাধ টাকা তো ওর নেই। যখন মামলায় হারবে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসবে। বেচারা! সোমনাথ মরিয়া হয়ে এমন কথাও বলে বেড়াচ্ছে মল্লিনাথকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সম্পত্তি বাগাবার জন্য তৃষা তার ভাসুরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতিয়েছিল।

এ কথাও কি উড়িয়ে দিতে পারে শ্রীনাথ? রোদ থেকে বাগানের ছায়ায় পা দিয়েই সে থমকে দাঁড়ায়। অবৈধ সম্পর্কের কথাটা মনে হতেই তার শরীর গরম হচ্ছে। রক্তে উথাল পাথাল। সুস্পষ্ট

নির্লজ্জ কামভাব। আশ্চর্য এই, তৃষাকে সে সন্দেহ তো করেই, তার ওপর সেই সন্দেহ থেকে একটা তীব্র আনন্দও পায়।

পুকুরপাড়ে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে না? সজল কি? কয়েক পা এগিয়ে গেল শ্রীনাথ। চোখের দৃষ্টি এখন আগের মতো তীক্ষ্ণ নেই। তবু মনে হল সজল। মাছ ধরছে।

নিঃসাড়ে এগিয়ে যায় শ্রীনাথ।

জলের খুব ধারে দাঁড়িয়ে আছে সজল। সাঁতার জানে না। পাশে ঘাসের ওপর কম করেও পাঁচ-ছ'টা মাছ পড়ে আছে। কেউ খায় না। ধরছে কেন তবে?

খুবই রেগে গেল শ্রীনাথ। এমনিতেও তৃষার আশকারা আর আদরে বেহেড এই ছেলেটাকে তেমন পছন্দ করে না শ্রীনাথ। একটু আগেই মঞ্জু বলছিল, মাকে বলে দিদিদের মার খাওয়ায় ছেলেটা।

শ্রীনাথ আচমকা পিছন থেকে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, কী করছ?

একটা মস্ত দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। চমকে কেঁপে উবু হয়ে পড়ে যেতে যেতে কষ্টে সামলে নিল সজল। ভয়ে সাদা মুখ ফিরিয়ে তাকাল! তার সামনে খাড়াই পাড় ছিল। অন্তত সাত-আট ফুট নীচে জল। পড়লে খুব সহজে ওঠানো যেত না। পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে শ্রীনাথ একটু লজ্জিত হয়। ঠান্ডা গলায় বলে, মাছ ধরতে কে বলেছে?

সজল আস্তে করে বলে, কেউ বলেনি।

ছেলের সঙ্গে কথা বলার অনভ্যাসের দরুন কী বলবে তার ভাষা ঠিক করতে পারে না শ্রীনাথ। গম্ভীর মুখে বলে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি কি সাঁতার জানো?

না।

তা হলে পুকুরের ধারে আর কখনও এসো না।

ঘাড় কাত করে ভাল মানুষের মতো সজল বলল, আচ্ছা।

তারপর ছিপ গোটাতে লাগল।

শ্রীনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি মায়ের কাছে দিদিদের নামে নালিশ করো?

সজল সেই রকমই ভয়ার্ত মুখে বাবার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, না তো!

আজই করেছ।

সজল মৃদু স্বরে বলে, দুধে সর ছিল। তাই বলেছিলাম।

তুমি দুধের সর খাও না?

সজল মাথা নাড়ে। না।

শ্রীনাথ একটু হেসে বলে, সর তো ভাল। পুষ্টি হয়।

ঘেন্না লাগে।

শ্রীনাথ একটু চেয়ে থেকে কী বলবে ভাবে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বলে, যারা রোজ দুধ খায় তারা বুঝবে না একটুখানি ঘেন্নার সর কত ছেলের কাছে অমৃতের মতো।

সজল কথাটা হয়তো বুঝল না, কিন্তু টের পেল যে, বাবা তার ওপর খুশি নয়। তার মুখে-চোখে ডাইনি বুড়ি দেখার মতো অগাধ অসহায় ভয়। শ্রীনাথের মনে পড়ল, এক সময়ে ট্যাম-গোপালের নাম করলে সজল ভয় পেত খুব! আজ তার বাবাই তার কাছে সেই ট্যাম-গোপাল।

শ্রীনাথ জিজ্ঞেস করে, আমার সম্পর্কে তোমাকে কি কেউ ভয় দেখিয়েছে?

না তো!— তেমনি ভয়ে ভয়েই বলে সজল।

তবে ভয় পাচ্ছ কেন?

সজল হাতের ছিপটার দিকে চেয়ে থাকে মাথা নিচু করে।

শ্রীনাথ একটু মজা করার জন্য বলে, আমার তো শিং নেই, বড় বড় দাঁত নেই, থাবা নেই। তবে?

সজল এ কথায় একটুও মজা পেল না। তার মুখ রক্তশূন্য, চোখে কোনও ভাষা নেই। এই অসহায় অবস্থা থেকে ওকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই শ্রীনাথ বলে, যাও। তোমাকে কিন্তু আমি বকিনি। সাবধান করে দিয়েছি মাত্র। ওই মাছগুলো এখন কী করবে?

কিছু করব না।

বিরক্ত হয়ে শ্রীনাথ বলে, কিছু করবে না তো কি ফেলে দেবে? বরং খ্যাপা নিতাইকে দিয়ো। সে রেঁধে খাবেখন। নইলে গরিব-দুঃখী কাউকে দিয়ে দিয়ো। যাও।

সজল চলে গেলে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ইস্পাতের আনা সেই গো-হাড়টা নজরে পড়ে শ্রীনাথের। কাঁচা হাড়। এখনও মাংস লেগে আছে। ঘেন্নায় গা বিরিয়ে ওঠে। আর সেই সঙ্গেই আবার গুপ্ত কাম-ভাবটা মাথা চাড়া দেয়।

ঘরটা হাট করে খোলা। মঞ্জু নেই। শ্রীনাথ তার ইজিচেয়ারে বসে খানিক বিশ্রাম করে। তারপর উঠে জামাকাপড় পরতে থাকে।

শ্রীনাথের চাকরিটা খুবই সামান্য। এত ছোট চাকরি যে, নিজেকে নিয়ে একটু অহংকার থাকে না। একটা মস্ত বড় নামী প্রেসে সে প্রুফ দেখে। বেতন যে খুব খারাপ পায় তা নয়। কিন্তু এ চাকরিতে কোনও কর্তৃত্ব নেই, উন্নতির সম্ভাবনা নেই, উপরন্তু সারা বছরই প্রচণ্ড খাটুনি।

তারা সব ক'জন ভাই-ই ছিল ভাল ছাত্র। শ্রীনাথ একান্ন সালে ফার্স্ট ডিভিশনে অঙ্ক আর সংস্কৃতে লেটার পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে। আই এস-সিতে লেটার না পেলেও ডিভিশনটা ছিল। বি এস-সিতে পাসকোর্সে ডিস্টিংশন পায়। কিছু লোক আছে যাদের পাথরচাপা কপাল। বি এস-সি পাশ করে কিছুদিন মাস্টারি করেছিল শ্রীনাথ। তখন মনে হত, একদিন নিশ্চয়ই সে এসব ছোটখাটো পরিমণ্ডল ছেড়ে মস্ত কোনও কাজ করবে। মফস্সল ছেড়ে কলকাতাবাসী হওয়ার জন্য একদা মাস্টারি ছেড়ে প্রেসের চাকরিটা নিয়েছিল সে। তখনও ভাবত, এ চাকরিটা নিতান্তই সাময়িক। বড় চাকরি পেলে এটা ছেড়ে দেবে। সেই ছাড়াটা আর হয়ে উঠল না। একটা জীবন বড় কষ্টে কেটেছে। দাদা মল্লিনাথ ছিল মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু একটু খ্যাপাটে স্বভাবের দরুন এক চাকরি বেশিদিন করত না। তারপর একদিন খেয়ালের বশে মারকিনি কায়দায় র‍্যানচ বা খামারবাড়ি বানিয়ে চাষবাস করে একটা বিপ্লব ঘটানোর জন্য এইখানে চলে এল। উন্মার্গগামী ও অসম্ভব সুপুরুষ মল্লিনাথকে ভালবাসত সবাই। সে বিবাহে বিশ্বাসী ছিল না, কিন্তু একটু হয়তো মেয়েমানুষের দোষ ছিল। প্রচণ্ড মদও খেত। খুব খাটত, অনিয়ম করত, শরীরের যত্ন নিত না। ছুটির দিনে শ্রীনাথ সপরিবারে বেড়াতে এলে মল্লিনাথ তাদের ছাড়তে চাইত না। তৃষাকে এটা ওটা রান্নার ফরমাশ করত। তৃষা সেই পাগল লোকটার মনস্তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিল জলের মতো। স্বামীর চেয়েও বেশি যত্ন করত তাকে। এমনও হয়েছে ছেলেমেয়ে সহ তৃষাকে এখানে চার-পাঁচ দিনের জন্য রেখে কলকাতায় ফিরে গেছে শ্রীনাথ। সেই সব দিনের কথা ভাবতে চায় না সে এখন আর। ওই সব দিনগুলি তার বুকে বিশাল বিশাল গর্ত খুঁড়ে রেখেছে। কালো রহস্যে ঢাকা গহ্বর সব। আজও সে একা বসে বসে সেই সব কথা ভাবে আর শিউরে ওঠে গা। তখন ব্যাপারটা অসংগত মনে হত না কেন যে! এখন মনে হয়, কী সাংঘাতিক ভুলটাই সে করেছিল। তখন গরিব ছিল সে। বড়ই গরিব। মল্লিনাথ দেদার সাহায্য করত। ছেলেমেয়েরা এখানে এলে ভাল খাওয়া পেত, পরিষ্কার জলবায়ু পেত। অন্য দিকটা তখন কিছুতেই চোখে পড়ত না শ্রীনাথের।

কাজে আজ মন লাগছিল না শ্রীনাথের। মাঝে মাঝে এক রকম হাঁফ ধরা একঘেয়েমির মতো লাগে। মাইনের টাকাটা এখন আর দিতে হয় না তৃষাকে, তার নিজের খাই-খরচও নেই। সুতরাং টাকাটা জমে বেশ মোটা অঙ্কে দাঁড়িয়েছে। বদ্রী যদি খোঁজ দিতে পারে তবে সে নিজস্ব আলাদা জমি কিনে ভেষজের চাষ করবে। চাকরি করবে না, সারাক্ষণ দাদা মল্লিনাথের বাসায় বাস করার অপরাধবোধ থেকেও মুক্ত হবে।

প্রুফ রিডার হলেও প্রেসে তার কিছু খাতির আছে। খাতিরটা ঠিক তার নয়, পয়সার। সবাই জানে শ্রীনাথবাবুর পয়সা হয়েছে। সেই খাতিরটুকু মাঝে মাঝে ভাঙায় শ্রীনাথ। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত টেনে-মেনে কাজ করে সুপারভাইজারকে গিয়ে বলল, আমার ভগ্নিপতির বড্ড অসুখ। একটু যেতে হবে।

সুপারভাইজার বোসবাবুর সঙ্গে খুবই খাতির তার। বোসবাবু হেসে-টেসে বলেন, গেলেই হয়। ভগ্নিপতির অসুখের কথাটা বোধহয় বিশ্বাস হল না বোসবাবুর। শ্রীনাথের মনে খিঁচ থেকে গেল একটু। বিশ্বাস না করলেও বোসবাবুকে দোষ দেওয়া যায় না। মাঝেমধ্যেই আলতু-ফালতু অজুহাত দেখিয়ে সে অফিস থেকে কেটে পড়ে।

বাইরে শীতের ক্ষণস্থায়ী বেলা ফুরিয়ে সন্ধে নেমে এসেছে। বেশ শীত। শরীরের মধ্যে সকাল থেকে জিয়োল মাছের মতো ছটফট করে দাপাচ্ছে অদম্য সেই কামের তাড়না। তৃষার সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতার দরুন শরীরের ব্যাপারটা বড় একটা হয়ে ওঠে না। তৃষার প্রতি তার যেমন নিস্পৃহতা, তার প্রতি তৃষারও তাই। কিন্তু তা হলে চল্লিশ-বিয়াল্লিশে তার পুরুষত্ব তো আর মরে যায়নি?

প্রীতমকে একবার দেখতে যাওয়া উচিত, এটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনকে বোঝাল সে। এই মধ্য-কলকাতা থেকে ভবানীপুর যে খুব একটা দূর তাও নয়। কিন্তু গণ-বিস্ফোরণে কলকাতার রাস্তাঘাট এত গিজগিজে, ট্রাম-বাসের এমনই আসন্নপ্রসবার চেহারা এবং এত ধীর তাদের গতি যে কোথাও যেতে ইচ্ছেটাই জাগে না।

ইচ্ছে-অনিচ্ছের মধ্যে খানিক হেঁটে সে গিরিশ পার্কের পিছনের এলাকায় চলে এল। এখানে সে যে নিয়মিত আসে তা নয়, তবে মাঝে মধ্যে কাম তাড়া করলে চলে আসে। মেয়েমানুষের দরদাম ঠিক করতে পারে না সে। যা চায় প্রায় দিয়ে দেয় এবং বোধহয় খুব ঠকে যায়। এ পর্যন্ত যে তিন-চারজন বেশ্যার কাছে সে গেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বিপজ্জনক মনে হয়েছে দীনা নামে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একটি মেয়েকে। একটু বেশি কথা বলে, একটু বোকাও, কিন্তু কেমন একটু ধর্মভাব আছে তার।

সাড়ে পাঁচটাও বাজেনি ভাল করে। এটা ঠিক সময় নয়। তবু এ সময়টাই ভাল। অব্যবহৃত মেয়েদের পেতে হলে একটু আগে আসা ভাল।

এ পাড়াতেও গিজগিজ করছে লোকজন। বেশির ভাগই মতলববাজ লোক। মেয়ের দালাল, গুন্ডা, মাতাল, কামুক। সে এদেরই একজন, এ কথা ভাবতে তার অহংবোধে লাগে। কিন্তু বাস্তববোধ তার কিছু কম নয়। মুখটা রুমালে সামান্য আড়াল করে সে গলি থেকে আরও গহিন গলির অন্ধকারে ঢুকে যেতে লাগল।

দোতলা বাড়িটার ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে হাঁফ ছাড়ে সে। কিছু ক্লান্তি আর উদ্বেগে শরীরটা অস্থির। বুকে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দীনা তার ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। মুখচোখের অবস্থা ভাল নয়। বোধহয় মন খারাপ। ওর একটা বছর দশ-বারোর মেয়ে আছে। তার কিছু হয়নি তো? হলে আজ জমবে না।

দীনা তাকে চিনতে পারল। ডাকতেই মুখ ফিরিয়ে ভ্রু কুঁচকে দেখল তাকে। তারপর ভ্রু সহজ হয়ে গেল। বলল, অনেক দিন পর না?

তুমি ভাল আছ?— জিজ্ঞেস করে শ্রীনাথ।

ভাল আর কী? আসুন।

ভিতরে ঢুকে দীনা কপাট ভেজিয়ে দিয়ে বলে, কী কাণ্ড শুনবেন?

কী?

সে এক কাণ্ডই।

বলে দীনা হেসে ফেলে। দেখতে ভাল কিছু নয় মেয়েটা। সাদামাটা গেঁয়ো চেহারা। রং কালো। মাঝারি লম্বা, মাঝারি গড়ন। কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। তাই খদ্দেরেরও বাঁধাবাঁধি নেই। হেসে ফের গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, খুব রাগ হচ্ছে আমার, হাসিও পাচ্ছে। দুটো স্কুলে-পড়া ছেলে এসেছিল আজ জানেন?

বটে?— শ্রীনাথ তেমন আগ্রহ দেখায় না। স্কুল কলেজের ছেলেরা আজকাল হরবখত বেশ্যাপাড়ায় যায়। কিছু অস্বাভাবিক নয়।

দীনা চৌকির বিছানায় বসে খুব চিন্তিত মুখে বলে, চৌদ্দ-পনেরোর বেশি বয়স নয়, গায়ে স্কুলের পোশাক পর্যন্ত রয়েছে। ঠিক দুপুরে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দেখি দুই মূর্তি। প্রথমে ভেবেছিলাম পথ ভুল করে এসেছে বা জলতেষ্টা পেয়েছে বলে ঢুকে পড়েছে। তারপর দেখি তোতলাচ্ছে, আগডুম বাগডুম বলছে। বলতে গেলে ছেলের বয়সি। যখন বুঝতে পারলুম মতলব অন্যরকম, তখন এমন রাগ হল! বেঁটে ছাতাটা হাতের কাছে পেয়ে সেইটে দিয়ে পয়লা ছেলেটাকে দিলুম কষে ঘা কতক। দুটোয় মিলে এমন পড়িমরি করে পালাল না!

দীনা হেসে খুন হতে লাগল বলতে বলতে। তারপর ফের গম্ভীর হয়ে বলল, কিন্তু অন্য একটা কথা ভেবে ভারী ভয় হয়, জানেন! ভাবি, আজ না হয় তাড়ালুম। কিন্তু রোজ যদি ওরকম সব ছেলেরা আসে? একদিন হয়তো আর তাড়াব না।

শ্রীনাথ কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, আজই বা তাড়ালে কেন? ওরা তো কারও না কারও কাছে যাবেই। মাঝখানে তোমার রোজগারটা গেল।

দীনা ঠোঁট উলটে বলে, ঝ্যাঁটা মারি রোজগারের মুখে! বেশ্যা বলে কি ঘেন্নাপিত্তি নেই?

শ্রীনাথ দার্শনিকের মতো একটু হাসে। বেশ্যা বলে নয়, আজকাল এই দুনিয়ায় কোনও মানুষেরই ঘেন্নাপিত্তি খুব বেশিদিন থাকে না।

প্রীতমকে দেখতে যাওয়া হল না। বাড়ি ফিরতে বেশ একটু রাত হয়ে গেল শ্রীনাথের। স্টেশনে নেমে শীতে অন্ধকারে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, এই রাতে গিয়ে কোন অজুহাতে স্নানের জন্য গরম জল চাইবে। স্নান না করলেই নয়। যতবার বেশ্যাপাড়ায় গেছে ততবার ফিরে এসে স্নান করতেই হয়েছে তাকে। নইলে ভারী খিতখিত করে।

বাড়িটা ভারী নিঃঝুম। অন্ধকারে নিবিড় গাছপালার ছায়ায় আর কুয়াশায় যেন মিশে গেছে চারপাশের সঙ্গে। শুধু বাগানের মধ্যে এক জায়গায় শুকনো কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে বসে আছে খ্যাপা নিতাই। প্রতিদিন এই নিশুত রাতে মাটিতে একটা শলা দিয়ে পুতুলরাণীকে আঁকে সে। তারপর মন্ত্র পড়ে বাণ মারে। এতদিনে বাণের চোটে পুতুলরাণীর মুখে রক্ত উঠে মরার কথা। কিন্তু শ্রীনাথ যতদূর জানে পুতুলরাণী গুসকরায় রসবড়া ভাজছে। মাঝখান থেকে এ ব্যাটাই তান্ত্রিক-মান্ত্রিক সেজে খ্যাপাটে হয়ে গেল।

নিতাই নাকি রে?— ডাকল শ্রীনাথ।

ডাক শুনে নিতাই উঠে আসে, কিছু বলছেন?

তোর আগুনটায় আমায় এক ডেকচি জল গরম করে দে তো!

গু মাড়িয়েছেন বুঝি? স্নান করবেন?

ঠিক ধরেছিস। আমার ঘর থেকে ডেকচি নিয়ে যায়। আর শোন, তোর কুকুরটা একটা গো-হাড় এনে ফেলেছিল এইখানে। ওটা তুলে ফেলে দিস।

বলে টর্চ জ্বেলে বারান্দার তলায় দেখাল শ্রীনাথ। হাড়টা পড়ে আছে এখনও।

নিতাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বাঁ হাতে হাড়টা তুলে নিয়ে বলল, দিচ্ছি ফেলে।

ব্যাটা চামার।— গাল দেয় শ্রীনাথ, এত রাতে হাড়টা ছুঁতে গেল?

নিতাই অন্ধকারে জটাজূট নিয়ে মিলিয়ে যায়। একটু বাদে ডেকচি নিয়ে ফিরে আসে।

এই শীতে খোলা জায়গায় টিউবওয়েলের ধারে গরম জলে স্নান করতে গিয়েও শীতে থরথরিয়ে কাঁপছিল শ্রীনাথ। স্নানের পর যখন গা মুছছে তখন হ্যারিকেনের সামনে একটা মস্ত ছায়া এসে পড়ল।

চোখ তুলে দেখল, তৃষা। আর একবার আপনা থেকেই কেঁপে উঠল শ্রীনাথ।

তৃষা গম্ভীর মুখে বলে, তুমি কি আজ সজলকে বকেছ?

আমি?— বলে ভাববার চেষ্টা করে শ্রীনাথ। ভেবে-টেবে বলে, বকিনি। তবে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিল। সাঁতার জানে না। বিপদ হতে পারে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

তৃষা কোনও তর্ক করতে আসেনি। বিমর্ষ মুখে বলল, ছেলেটার বিকেল থেকে খুব জ্বর। ভুল বকছে। জ্বরের ঘোরে বার বার বলছে, বাবা বকেছে। বলেছে মারবে। ভীষণ মারবে।

বেকুবের মতো চেয়ে থেকে শ্রীনাথ বলে, মারব বলিনি তো! মারব কেন?

তৃষা একটু অবাক গলায় বলল, তুমি কি রোজ রাতে স্নান করো? সাধুটাধু হলে নাকি?

না। ওই নিতাইয়ের কুকুরটা একটা গোরুর হাড় এনে ফেলেছিল। সেটা পায়ে লেগেছে।

ও।— বলে তৃষা চলে গেল।

সজলকে একবার দেখতে যাওয়া উচিত কি না তা বুঝল না শ্রীনাথ। বাবা হিসেবে হয়তো উচিত। কিন্তু সে তো ঠিক স্বাভাবিক বাবা নয়।

স্নান করে ঘরে ফিরে এসে বালতি রেখে দড়িতে গামছা টাঙাচ্ছে, এমন সময় মঞ্জু এল চুপিসারে।

বাবা!

আবার কী চাই?

ভাইয়ের জ্বর হয়েছে কেন জানো?

না তো। কেন?

ভাই বলেছে, তুমি নাকি ওকে আজ খুব মেরেছ। মারতে মারতে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলে। তাই!

শ্রীনাথ রাগে স্তম্ভিত হয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, সজল এ কথা বলেছে?

নিজের কানে শুনেছি বাবা। আমার সামনেই মাকে বলল।

আমি মেরেছি?

বলে দিশেহারা শ্রীনাথ নিজের দুটো হাতের দিকে যেন সন্দেহবশে চেয়ে দেখল একটু। তারপর রাগে গরগর করে বলল, আচ্ছা মিথ্যেবাদী ছেলে তো! ওকে চাবকানো দরকার।

শুনে খুশি হল মঞ্জু। বলল, আমাদের নামেও বলে।

থমথমে মুখে শ্রীনাথ জিজ্ঞেস করে, ওর জ্বব এখন কত?

একশো চার। ওকে কিছু বলব বাবা?

না, এখন থাক। যা বলার আমিই বলব।

সেই রাগ নিয়েই গিয়ে রান্নাঘরে খেতে বসল শ্রীনাথ। সেই রাগ নিয়েই শুল রাত্রে। ঘুম আসতে চাইল না। পৃথিবীটা বড্ড পচে যাচ্ছে যে! সেই পচনের দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট। নিজের ছেলে জলজ্যান্ত এমন মিথ্যে কথাটা বলল কেমন করে?

শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল শ্রীনাথ। স্বপ্ন দেখল, সজল একটা মস্ত সুন্দর দিঘির ধারে মাছ ধরছে। আসলে মাছ নয়, পুকুর থেকে ছিপের টানে উঠে আসছে নানা রঙের ঘুড়ি। পিছন থেকে চুপিচুপি গিয়ে শ্রীনাথ ওর পিছনে দাঁড়াল। দেখল দিঘির জল খুব গভীর। সজল তার পিছনে বাবার উপস্থিতি টের পায়নি। শ্রীনাথ হাত বাড়িয়ে আচমকা সজলকে ঠেলে ফেলে দিল জলে।

॥ তিন ॥

শিলিগুড়ির হোটেল সিনক্লেয়ার থেকে দুপুরের রোদে ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল। দূর প্রসারিত নীলবর্ণ পাহাড়ের আড়াল থেকে সাদা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে হঠাৎ তাকালে মনে হবে যেন শূন্যে ভেসে আছে। যেন-বা রুপোলি মেঘ। বহুবার দেখেছে দীপনাথ। আবারও দেখছে।

রওনা হতে আর বেশি দেরি নেই। হোটেলের লাগোয়া ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের অফিসের লাউঞ্জে একটু আগেই সে দেখে এসেছে এ কে বোসের নামের লেবেল মারা একটা বেডিং আর দুটো ঢাউস বিদেশি ফাইবার গ্লাসের সুটকেস নামানো হয়েছে। সে বুঝতে পারছে না মালপত্রগুলো নিয়ে তাকেই এয়ারলাইনসের গাড়িতে যেতে হবে কি না। এয়ারলাইনসের লাউঞ্জে মালপত্র রাখার অর্থটা তাই দাঁড়ায়। বোস আর তার স্ত্রীর জন্য রাঙ্গাপানি টি এস্টেটের অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে গেছে। দীপনাথ বুঝতে পারছে না বাগডোগরায় সে নিজে যাবে কীসে। অ্যামবাসাডারে, না এয়ারলাইনসের গাড়িতে? বস্তুত আজকাল এসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার নেই। সিদ্ধান্ত নেয় বোস। বোসের ইচ্ছাই তার সিদ্ধান্ত। তবে এ ব্যাপারগুলো নিয়ে আর ভাবে না দীপনাথ। মেনে নিতে নিতে মন ভোঁতা হয়ে গেছে।

পরশু গ্যাংটকে কার্পেট কেনা নিয়ে বোস ও তার স্ত্রীর মধ্যে একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলার খরচের হাত সাংঘাতিক। সেই ঝগড়ার জের এখনও চলছে কি না কে জানে! যদি চলে তবে বোস স্বভাবতই চাইবে দীপনাথ তাদের সঙ্গে অ্যামবাসাডারেই এয়ারপোর্টে যাক। সেক্ষেত্রে বোস বসবে সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে, দীপনাথকে বসতে হবে শ্রীমতী বোসের পাশে একটু জড়সড় হয়ে পিছনের সিটে এবং পুরো রাস্তাটাই কোনও কথাবার্তা হবে না। বড় জোর শ্রীমতী বোস বলবে, যা-ই বলুন গ্যাংটক ভীষণ নোংরা, তার চেয়ে কালিম্পং অনেক ভাল। কিংবা, আপনি কিন্তু এবারও শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট দেখালেন না।

হোটেলেব লাউঞ্জে বসে না থেকে দীপনাথ দুপুরের রোদে বাইরে দাঁড়িয়ে ক্ষণেক কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে নিচ্ছে। ছেলেবেলায় বহুবার দেখেছে সে। তার বড়ভাই শ্রীনাথ আর ছোট সোমনাথ যখন মা-বাবার কাছে মানুষ হচ্ছে তখন বড়পিসি তাকে এনে রেখেছিল শিলিগুড়িতে। তখন সারাদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা জেগে থাকত ঠিক এইভাবে। তার যৌবন নেই, জরা নেই। কিংবা হয়তো আছে। কিন্তু পাহাড়ের যৌবন বা জরা এতটাই দীর্ঘস্থায়ী যে মানুষের আয়ুতে বেড় পায় না। কিন্তু আজও সে বাল্যকালের সেই যৌবনোদ্ধত পাহাড়টিকে দেখে খুব আনন্দিত হয়। সবকিছুর চেয়ে আজও তার বেশি প্রিয় পাহাড়। উঁচু, একা, মহৎ।

দীপনাথ নিজে পাহাড়ের ঠিক বিপরীত মানুষ। কোনও উচ্চতা নেই, মহত্ত্ব নেই। কলকাতার এক কৌটো তৈরির ছোট্ট কারখানায় সে প্রায় বছর আষ্টেক ম্যানেজারি করেছে। বাঙালির সেই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম থেকেই ধুঁকছিল। মালিক তেমন গা করত না। শ্রমিকরা ছিল ভয়ংকর তেড়িয়া। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিল দীপনাথের চিরশত্রু এবং মালিকের স্পাই। দীপনাথের খবরদারির মধ্যেই কারখানায় নিয়মিত চুরি হত। এ সবই সহ্য করে মুখ বুজে পড়ে ছিল সে। এমনকী অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের উসকানিতে সে একবার ষোলো ঘণ্টা ঘেরাও হয়ে থাকে, আর একবার তিন-চারজন ওয়ার্কারের হাতে তাকে মারধর খেতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেকা গেল না। কারখানার বুড়ো মালিক ডেকে বললেন, তোমার হাতে দিয়ে এতদিন তো দেখলাম, এবার ছেড়ে দাও, নতুন কারও হাতে দিয়ে দেখি যদি চালাতে পারে। দীপ জানে কারখানায় নতুন করে টাকা না ঢাললে, আপাদমস্তক ঢেলে না সাজালে কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়।

বছরখানেক আগে চাকরি খুইয়ে সে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াল খানিক। তারপর জুটল বোসের সঙ্গে। মস্ত এক গুজরাটি ফার্মের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বোস অতি ধূর্ত ও অভিজ্ঞ। দীপনাথ যে কাজের

লোক নয় সেটা বোধহয় সে এক নজরেই বুঝে নিয়েছে। কিন্তু সেটা স্পষ্ট করে বলেনি আজও। তবে দীপনাথকে যে সে সঙ্গী এবং সাহায্যকারী হিসেবে খুবই পছন্দ করে তাতে সন্দেহ নেই। কোম্পানি থেকে দীপনাথ ভাউচারে মাসিক ছয় থেকে সাতশো টাকা পায়। তাকে খাতায় সই করতে হয় না, অফিসে বসতে হয় না, ডিউটি আওয়ার্স বা ছুটির দিন বলেও কিছু নেই। অর্থাৎ তাকে কোম্পানির চাকরিতে বহাল করা হয়নি। কেবল ফুরনের লোক হিসেবে পোষা হচ্ছে। বোসকে বিস্তর টুর করতে হয়, সঙ্গে থাকে দীপনাথ। এসব খরচ অবশ্য কোম্পানিই দেয়। বোস কারও সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় দীপনাথের যে পদের উল্লেখ করে সেটাও গোলমেলে। বোস তাকে নিজের সেক্রেটারি বলে চালায়। ধৈর্যশীল এবং উপায়ান্তরহীন দীপনাথ তবু বোসের সঙ্গে লেগে আছে। সবদিন তো সমান যায় না। কৌটোর কারখানার ম্যানেজার হিসেবেও সে ছয়-সাতশো টাকার বেশি পেত না। কোনওদিন চুরি করেনি এক পয়সাও। করলে মাসিক আয় বেড়ে হাজার দুয়েকে দাঁড়াতে পারত। চুরি দীপনাথ এখনও করে না। আর সেটা জানে বলেই বোধহয় বোস তাকে এখনও খাতির করে। আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলে।

কাল গ্যাংটক থেকে ফিরে দীপনাথ বোস এবং তার বউকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে নিজে ফিরে গিয়েছিল হাকিমপাড়ায়, পিসির বাসায়। বছরখানেক আগে পিসি মারা গেছে। অতিবৃদ্ধ পিসেমশাই আর পিসতুতো ভাইরা আছে। দীপনাথ গেলে বাড়ির সবাই আন্তরিক খুশি হয় এখনও। কাল অনেক রাত পর্যন্ত ভাইদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে। সব ব্যর্থতার গ্লানি ফুৎকারে উড়ে গিয়েছিল গানে, গল্পে, ঠাট্টায় আর পুরনো দিনের কথায়। ছেলেবেলার কয়েকজন বন্ধুও এসে জুটেছিল। এসেছিল প্রীতমের মেজো ভাই শতম। কয়েকটা ঘণ্টা বড় আনন্দে কেটেছে। আজ দুপুর থেকে আবার সে বোসের রহস্যময় সেক্রেটারি। অর্থাৎ ফাইফরমাশ খাটার লোক, ফুরনের ভবিষ্যৎহীন খাটনদার।

শতম তার জিপগাড়িতে সিনক্লেয়ার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল দীপনাথকে। চলে যাওয়ার আগে হঠাৎ বলল, মেজদা, আমার দাদার জন্য কিন্তু বউদিই দায়ী। দাদা বোধহয় বাঁচবে না, এই শেষ সময়টায় যদি আমাদের কাছে তাকে আসতে দিত বউদি, তবে দাদা বোধহয় একটু আনন্দে মরতে পারত। তুমি বউদিকে একটু বুঝিয়ে বোলো।

পিসতুতো ভাইরা দীপনাথকে মেজদা বলে ডাকত। সেই থেকে সে প্রায় সকলেরই মেজদা। এই ডাকের ভিতরে পুরনো দিনের গন্ধ আছে, জড়িয়ে আছে আত্মীয়তা। মেজদা ডাকের মধ্যে আজও গভীর ভালবাসা খুঁজে পায় দীপনাথ।

মনটা খারাপ হয়ে আছে সেই থেকে। বিলুর সঙ্গে প্রীতমের বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিল পিসিমাই। কিন্তু প্রীতমের মতো সাদা সরল ভাল মানুষের সঙ্গে বিলুর মতো বারমুখো মেয়ের যে মিল হয় না সেটা প্রথম থেকেই বুঝেছিল দীপ। কিছু বলেনি তবু। গরমিল কতটা হয়েছিল তা হিসেব করার অবশ্য অবসর হল না। তার আগেই, জীবনের শুরুতেই আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে প্রীতম। এখনও একবার শিলিগুড়িতে আসার জন্য সে ছটফট করে। কিন্তু বিলু আসতে দেয় না। শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রীতমের এখন আকুপাংচার চলছে। একটু উন্নতি হয়তো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটুকুর ওপর ভরসা রাখতে ভয় পায় সবাই।

দীপ আর-একবার লাউঞ্জে ঢুকে খোঁজ নিল বোস সাহেবদের কতদূর। যদি এয়ারলাইনসের গাড়ি ছেড়ে যায় তবে তাকে বোসের সঙ্গে অ্যামবাসাডারেই যেতে হবে। কিন্তু এখন কিছুটা সময় সে বোসের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে চায়। সঙ্গে গেলেই হাজারও কথার জবাব দিতে হবে। একা থাকলে মুখ বুজে কিছুক্ষণ চিন্তা করার অবকাশ পাবে সে।

রিসেপশনিস্ট বোসের ঘরে ফোন করল। তারপর দীপনাথকে বলল, আপনি মালপত্র নিয়ে এয়ারলাইনসের গাড়িতেই চলে যান।

দীপনাথ একটা শ্বাস ছাড়ল। তা হলে বোধহয় দাম্পত্য ঝগড়া মিটেছে। সে কিছুক্ষণ একা হতে পারবে।

বস্তুত হোটেলের রিসেপশনিস্ট থেকে এয়ারলাইনসের কর্মচারী পর্যন্ত সবাই দীপনাথের চেনা। কারণ বোসের টিকিট কাটা, হোটেল বুক করা, গাড়ি ভাড়া করা থেকে যাবতীয় অনভিপ্রেত কাজ তাকেই করতে হয়।

দীপনাথ এয়ারলাইনসের অফিসের দিকে আসতে আসতেই দেখল এয়ারলাইনসের গাড়ি ছেড়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দীপনাথ 'দত্ত!' বলে দু' হাত তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়োতে লাগল। যেন তাঁর সর্বস্ব চলে যাচ্ছে।

দত্ত বোধহয় গাড়ির আয়নায় দেখতে পেয়েছিল তাকে। চেনা লোক। জানালা দিয়ে মুখ বার করে পিছু ফিরে হাসল। তারপর গাড়িটা ধীরে ধীরে ব্যাক করিয়ে আনল।

দত্তর চোখে গগলস, মুখখানা দারুণ সুন্দর। দুর্দান্ত স্মার্ট ছেলে। বলল, আমি তো আপনাকে এতক্ষণ খুঁজছিলাম। উঠে পড়ুন।

দীপনাথ লাউঞ্জে ঢুকে প্রকাণ্ড ভারী সুটকেসগুলো প্রায় ছেঁচড়ে নিয়ে এল নিজেই। এটুকু পরিশ্রমেই হাঁফাচ্ছিল। দত্ত বিরক্ত গলায় পোর্টারদের হাঁক দিয়ে বলল , ক্যা দেখ রহে হো? সাবকা মাল উঠা দো।

দীপনাথের কাছে একস্ট্রা খরচের পয়সা নেই। অন্য দিন থাকে। আজ নেই। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হওয়ার পর থেকেই বোস গোমড়ামুখো হয়ে আছে, অনেক কিছু করণীয় কাজও করছে না। কাজেই পোর্টারদের মাল তোলার ব্যাপারে একটু ভয় খেল দীপ। টিপস দিতে হবে নিজের গাঁট থেকে।

গতকাল পিসির বাড়ি যাওয়ার সময় দশ টাকার মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিল। দীপের কাছে আজকাল দশ টাকা মানে অনেক টাকা। সে যে ফুরনের কাজ করে তা তো কেউ জানে না। পিসতুতো ভাইরা বা পিসেমশাই জানে, সে একটা বড় ফার্মের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সেক্রেটারি। গালভরা কথা।

পোর্টারদের অবশ্য ঠেকাতে পারল না দীপ। তারা হাতাহাতি করে মালগুলো বাসের পিছনে তুলে দিল ফটাফট। চোখ বুজে তিনটে টাকা দিয়ে দিতে হল। এয়ারলাইনসের কুলিভাড়া সাংঘাতিক। এক পিস মালে এক টাকা।

বাসে কুল্লে দশ-পনেরোজন যাত্রী। তার মধ্যেও তিন-চারজন এয়ারলাইনসের লোক। বাস ছাড়বার আগে কেতাদুরস্ত দত্ত হাসিমুখে এগিয়ে এসে বাসের টিকিট দেয়। চারটে টাকা। দীপনাথ চোখ বুজে টাকাটা দিল। এসব খরচের হিসেব দিয়ে বিল করলে টাকাটা সে পেয়ে যাবে ঠিকই। কিন্তু এসব ছোটখাটো হিসেব বিল করতে তার লজ্জা করে।

জানালার ধারে বসে বাইরে চেয়ে থাকে দীপ। সামান্য একটা কুয়াশার ভাপ উঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা আবছা হয়েছে। প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে এসে এফোঁড় ওফোঁড় করছিল তাকে। তবু জানালাটা বন্ধ করল না দীপ। এই জায়গার বাতাসটা তার প্রিয়। এই জায়গা প্রিয় প্রীতমেরও। প্রীতম কি শেষ হয়ে যাওয়ার আগে কোনওদিন ফিরে আসতে পারবে এখানে?

বহুকাল আগে হাকিমপাড়ার কাঁচা নর্দমার ধারে তার হাতে ঘুসি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল প্রীতম। বয়সে কয়েক বছরের ছোট ছিল প্রীতম। রোগা এবং দুর্বল। কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল তাদের তা আজ মনে নেই। শুধু মনে আছে মাটিতে পড়ে প্রীতমের প্রাণান্তকর চেঁচানি। অসহায় আক্রোশে প্রীতম কাঁদতে কাঁদতে তাকে বলছিল, তুই আমার বাঁ হাতটা খা, আমার বাঁ পাটা খা। প্রীতম খারাপ গালাগাল জানত না। কোনওদিন সে 'শালা' কথাটাও বলেনি। তাদের পারিবারিক শিক্ষাই তার জিভকে শুদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু সেদিন প্রীতমের সেই গালাগাল শুনে হেসে বাঁচেনি দীপ। ও কি একটা গালাগাল হল? বাঁ হাত খা! বাঁ পা খা!

আজ বহুকাল পরে সেই কথা মনে পড়ায় চোখে জল আসছিল দীপের। না কি ঠান্ডা বাতাস

লেগে চোখ জলে ভরে আসছে! একজন দয়ালু যাত্রী পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে জানালার কাচটা টেনে বন্ধ করে দিল। দীপ আর কাচটা খুলল না। দত্ত প্রায় এরোপ্লেনের মতোই জোর গতিতে গাড়িটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এত বাতাস সইবে না।

এয়ারপোর্টে নামতেই আবার ব্যস্ততা। দার্জিলিঙে বরফ পড়ছে এবার। প্রচণ্ড শীতে মুহ্যমান উত্তরবঙ্গ। এয়ারপোর্টে ভিড় তাই তেমন নয়। সে মালপত্র ওজন করাল, কেবিন টিকিট নিল। প্লেনে মাত্র একটি সারিতেই রয়েছে দুটো সিট। সাধারণত বোস সস্ত্রীক সেই দুটো সিটেই জায়গা নেয়। কিন্তু মালপত্র ওজন করানোর সময় দীপের হঠাৎ মনে পড়েছে গ্যাংটকে দেড় হাজার টাকায় কেনা কার্পেটটা মালপত্রের সঙ্গে নেই। এয়ারলাইনসের অফিসে ফোন করে জানল যে, সেটা লাউঞ্জেও পড়ে নেই। মহার্ঘ কার্পেটটার গতি কী হল তা বুঝতে পারছিল না দীপ। ঝগড়ার মূলেও সেটাই। কার্পেটটা ভাঁজ করে সুটকেস বা বেডিং-এও ঢুকবে না। ঢুকলেও তা টের পেত দীপ। কারণ এই বেডিং বা সুটকেস তাকে বহুবার গোছাতে হয়েছে। তাই সে আন্দাজ করল কার্পেটটা ওরা সঙ্গে নিচ্ছে না। রাগ করে হয়তো ফেলে রেখেই যাচ্ছে। তার মানে, ওদের ঝগড়া মেটেনি। তাই যদি হয় তবে দুই আসনের সারিতে ওরা কিছুতেই পাশাপাশি বসবে না। দীপকে হয় বোস বা শ্রীমতী বোসের সঙ্গে বসতে হবে।

বোসরা এখনও আসেনি। লাউডস্পিকারে জানান দিচ্ছে, প্লেন আসতে দেরি হবে। কলকাতা থেকেই ছাড়বে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরিতে। একটু বিরক্ত হয় দীপ। এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেড়ে বেড়ে শেষ পর্যন্ত দু'ঘণ্টায় দাঁড়াতে পারে। এই অভিজ্ঞতা তার আছে। তার খুব ইচ্ছে আজ কলকাতায় ফিরেই প্রীতমকে দেখতে যায়। অবশ্য বোস যদি সময়মতো তাকে অব্যাহতি দেয়।

দীপ এক কাপ কফি খাবে বলে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। বেশ কয়েকজন সাহেব-মেম বসে বিয়ার খাচ্ছে। সামনের দিকে কয়েকজন সাহেব-মেমের খুব জটলা আর উঁচু গলার কথা শোনা যাচ্ছিল। তাদের মাঝখানে একজন প্রৌঢ় নেপালি দাঁড়িয়ে। তার গায়ে বিদেশি জার্কিন, পরনে কর্ডের প্যান্ট, চোখে গগলস। প্রথমটায় চিনতে পারেনি দীপ। একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কফি এলে গভীর তৃপ্তিতে চুমুক দিল সে। কিন্তু মনটা খচখচ করছে। আবার তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্মৃতি মথিত করে উঠে এল পরিচয়। তেনজিং নোরকে!

তেনজিং যখন এভারেস্টে উঠেছিল তখন দীপ বোধহয় স্কুলের বেশ নিচু ক্লাসে পড়ে। শিলিগুড়িতে সে বহুবার তেনজিংকে দেখেছে। দু'টি কিশোরী মেয়েকে নিয়ে তেনজিংকে তখন চারদিকে সংবর্ধনা নিতে ছুটতে হচ্ছে। জন্মগত বিনয় ও অহংকারহীনতা তেনজিংকে ভারী জনপ্রিয় করেছিল । আজও তাকিয়ে সে তেনজিং-এর মুখে সেই সবল হাসি দেখতে পায়। এই লোকটা এক মস্ত পাহাড়ে উঠেছিল। দীপ কোনওদিন সেইসব দুরারোহ পাহাড়ে উঠবে না। তার গতি নীচের দিকে। নীচের দিকে।

সমস্ত কৈশোরকাল তার সমস্ত রং আর গন্ধ নিয়ে ঘিরে ধরে দীপকে। সে উঠে কোটের পকেট থেকে ছোট নোটবই আর ডটপেন বের করে এগিয়ে যায়। সাহেব-মেমরা রাস্তা দিল। সোজা গিয়ে তেনজিং-এর সামনে, খুব কাছাকাছি দাঁড়ায় দীপ। হাত বাড়াতেই তেনজিং শক্ত পাঞ্জায় চেপে ধরে তার হাত। এ লোকটা পাহাড়ে উঠেছিল। খুব উঁচু, একা মহৎ এক শুভ্র পাহাড়ে। বাঁ হাতের নোটবইটা বাড়িয়ে যখন দীপ বলল, 'অটোগ্রাফ প্লিজ' তখনই বুঝতে পারল রুদ্ধ আবেগে তার গলা বসে গেছে।

তেনজিং খুব বিনয়ের সঙ্গে সই দিয়ে দেয়। কিছু বলার ছিল না দীপের। সে ফের এসে টেবিলে বসে। কফি ঠান্ডা হয়ে এসেছে। সে এক চুমুকে সেটা খায়। নোটবইটা খুলে একবার সইটা দেখে। এইভাবে সই নেওয়ার অভ্যাস তার কোনওকালে নেই। তেনজিং বিখ্যাত মানুষ বলেও নয়। কেবল সেই শৈশবের দারুণ সুন্দর স্মৃতি আর পাহাড়ে ওঠার এক অসম্ভব স্বপ্নই তাকে এই কাজে প্ররোচিত

করেছে। পাহাড়ের মতো সুন্দর আর কী আছে পৃথিবীতে? কে আছে তার মতো সুখী যে পাহাড়ে ওঠে?

একদিন দীপ তার সব কাজকর্ম ফেলে রেখে একা বেরিয়ে পড়বে। হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে কোনও মস্ত দুরারোহ পাহাড়ের পাদদেশে। তারপর শুরু করবে তার ধীর ও কষ্টকর আরোহণ। কোনওদিনই শীর্ষে পৌঁছাবে না সে। অনাহারে, শীতে, পথশ্রমে একদিন ঢলে পড়বে পাহাড়েরই কোলে। বড় একা, নিঃসঙ্গ মৃত্যু ঘটবে তার। কিন্তু বড় সুখী হবে সে।

আচমকাই বোস কাচের দরজা ঠেলে হনহন করে তার টেবিলে চলে এল। একা। বসেই বলল, বিয়ার চলবে?

না।— দীপ স্বপ্নভঙ্গের পর কিছুটা নরম স্বরে বলে। তারপর ভদ্রতাবশে জিজ্ঞেস করে, মিসেস বোস কোথায়?

বোস তার বিয়ারের অর্ডার দিয়ে বলে, স্টলে বোধহয় কিছু কিনছে। শি ইজ অলওয়েজ বায়িং অ্যান্ড বায়িং। হেল।

বোস ছ' ফুটের ওপর লম্বা। কিন্তু চেহারাটা শক্তিমানের নয়। বরং খানিকটা ভুঁড়ি এবং যথেষ্ট চর্বিওলা দশাসই চেহারাটা দেখলে একটু মায়াই হয়। মনে হয় এত বড়সড় চেহারাটা টানছে কী করে লোকটা? বোসের বয়স দীপের মতোই ত্রিশ পেরোনো। অর্থাৎ যথেষ্ট যুবক। তবু আরাম আমোদ এবং উচ্ছৃঙ্খলতার দরুন তার চুলে পাক ধরেছে, চোখের দৃষ্টিতে একটা ঘোলাটে ভাব এসেছে। লোকটা প্রচণ্ড অহংকারী। হালকা পেপারব্যাক ছাড়া আর কিছু পড়ে না বলে ওর মানসিকতাও এক জায়গায় থেমে আছে।

চোঁ করে বিয়ারের গ্লাস শেষ করে বোস। তারপর বলে, প্লেন লেট শুনছি!

হ্যাঁ। পঁয়তাল্লিশ মিনিট বলছে। তবে বেশিও হতে পারে।

বোস অন্য দিকে চেয়ে থাকে ভ্রু কুঁচকে বলে, আপনি দমদমে নেমে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবেন। আমি অফিস হয়ে যাব।

দীপ স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। মিসেস বোসকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েও সে প্রীতমের কাছে যাওয়ার যথেষ্ট সময় পাবে।

রেস্টুরেন্ট থেকে লাউঞ্জে ঢুকবার আগে পকেট থেকে এম্বার্কেশন কার্ডগুলো বের করে ভ্রু কুঁচকে খানিকক্ষণ দেখে দীপ। সমস্যা একটা থেকেই যাচ্ছে। দুটো সিট পাশাপাশি, একটা আলাদা। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে বোস এবং তার বউ কিছুতেই পাশাপাশি বসবে না। সেক্ষেত্রে তাকে হয় বোস বা তার বউয়ের সঙ্গে বসতে হবে। একা চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ আপনমনে থাকার কোনও আশাই নেই।

লাউঞ্জে খুব একটা ভিড় নেই। সব মিলিয়ে ষাট-সত্তরজন লোক হবে। বড়সড় বোয়িং ৭৩৭ বিমানটি আজ ফাঁকাই যাবে। তবু একা আলাদা বসার কোনও সুযোগই পাবে না দীপ। ভেবে তার মনটা ভার লাগছিল। কিছুই নয়, মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়, তবু ওই সময়টুকু নিজের জন্য চুরি করার যেন বড় প্রয়োজন ছিল। প্লেনটা যখন উঠবে তখন কয়েক পলক এক অসম্ভব অবিশ্বাস্য অ্যাঙ্গেল থেকে সে আর-একবার প্রাণমন ভরে দেখে নেবে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। দেখবে বিপুল কালো শরীরে মহিষাসুর পাহাড়গুলিকে। তারপর চোখ বুজে পাহাড়ের কথা ভাববে বাকিটা সময়।

ওপাশের স্টলে কয়েকজন দাঁড়িয়ে। পিছন থেকেও নির্ভুলভাবে মিসেস বোসকে চিনতে পারে দীপ। ইদানীং ভদ্রমহিলা কিছু উগ্র হয়েছেন। পরনে ঢোলা প্যান্ট এবং গায়ে খুব আঁটসাঁট একটা লাল পুলওভার। গলায় জড়ানো কালো নকশাদার একটা স্কার্ফ। বব চুলের ওপর একটা মস্ত বেতের টুপি। কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই একটা অসম্ভব সুন্দর সুগন্ধ পায় দীপ। গন্ধটা মোহাচ্ছন্ন করে ফেলার ক্ষমতা রাখে।

মিসেস বোস চকোলেট থেকে পেপারব্যাক পর্যন্ত বিস্তর জিনিস ইতিমধ্যেই কিনে ফেলেছেন। হাতের মস্ত হাতব্যাগটা খুলে অত্যন্ত অসাবধানে এবং অগোছালো হাতে অন্তত গোটা কুড়ি-পঁচিশ একশো টাকার নোট এক খামচায় বের করে এনে দাম দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু টাকাগুলো গোছানো অবস্থায় ছিল না বলে দু'-একটা নোট পড়ে গেল মেঝেয়। মিসেস বোস নিচু হয়ে কুড়োতে যাচ্ছিলেন, দীপ তা করতে দিল না। অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে নিজেই কুড়িয়ে দিল। নিচু অবস্থায় খুবই কাছাকাছি হল দু'জনের মুখ। মিসেস বোস বললেন, থ্যাংক ইউ।

দীপ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খুব দয়ালু হাতে মিসেস বোসের নোটগুলো সাজিয়ে ভাঁজ করে দেয় এবং বলে, প্লেন লেট। কফি খাওয়ার সময় আছে।

আমি এখন খাব না। ওই গরিলাটা আগে বেরোক, তারপর দেখা যাবে।

মিসেস বোস লম্বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। অর্থাৎ দীপের চেয়ে মাত্র ইঞ্চি তিনেক খাটো, রংটা তেমন পরিষ্কার নয়, কিন্তু ভারী ঢলঢলে আহ্লাদী এবং সুশ্রী চেহারা। বয়স নিতান্তই কম বলে একটা সতেজ আভা শরীর থেকে বিকীর্ণ হয়। দীপ জানে মিসেস বোসের অনেকগুলো মারাত্মক দোষ আছে, কিন্তু গুণের মধ্যে এই সতেজ ভাবটুকু অবশ্যই ধরতে হবে। যতবারই সে এই মেয়েটির কাছাকাছি হয় ততবারই তার অনুভূতি হতে থাকে, হাতের নাগালে একটা সাংঘাতিক হাই-ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক তার দুলছে। ছুঁলেই ছ্যাঁত করে মেরে দেবে। দীপ তার নিজের শ্বাসের পরিবর্তন টের পায়। শ্বাস কিছু গাঢ় ও ঘন এখন। সে বলল, উনি এখনই বেরোবেন বলে মনে হয় না, বিয়ার নিয়ে বসেছেন। কিন্তু রেস্টুরেন্টে একজন খুব ইন্টারেস্টিং লোক রয়েছেন। তেনজিং নোরকে। দেখবেন তাঁকে?

দ্যাট এভারেস্ট হিরো? ওঃ, ওকে আমি দেখেছি।

বলে মিসেস বোস তাঁর মস্ত হাতব্যাগটা খুলে কেনা জিনিসগুলো ভরবার চেষ্টা করতে থাকেন। স্বভাবতই দীপকে হাত লাগাতে হয়। মিসেস বোসের হাতব্যাগে জিনিস ভরে দিতে দিতে সে আনমনে তেনজিং-এর কথা ভাবছিল। বহু বছর আগে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতে উঠেছিল লোকটা। আজ পরের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না। তেনজিং-এর পর এভারেস্টে আরও অনেকে উঠেছে। কে তেনজিং-এর কথা অত করে মনে রাখবে? এভারেস্টের সেই মহিমাও তো আর নেই।

মিসেস বোস লাউঞ্জের একটা চেয়ারে বসে বলেন, এর আগের বার যখন এসেছিলাম, মনে আছে? আমাদের সঙ্গে প্লেনে বম্বের তিন-চার জন ফিলমস্টার ছিল? শিলিগুড়ির কোন ফাংশনে আসছিল যেন!

দীপ পাশের চেয়ারটা ফাঁক রেখে পরের চেয়ারটায় বসেছে। বলল, শিলিগুড়িতে ওরা প্রায়ই আসে। এখানে বছরে দশ-বারোটা ফাংশন হয়। কলকাতার চেয়েও বম্বের ফিলমস্টাররা শিলিগুড়িতে বেশি আসে।

ও। তা হলে এবার তারা নেই কেন?

এবারও আছে। তিলক ময়দানে বিরাট ফাংশন হচ্ছে।

ইস, তা হলে আর-একদিন থেকে গেলে হত।

মিস্টার বোসকে বলুন না!

ঠোঁটটা খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উলটে মিসেস বোস বলে, ওকে বলতে বয়ে গেছে। অদ্ভুত আনসোশ্যাল লোক একটা। আপনিই দেখলাম ওর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন, আমার তো অ্যাডজাস্ট করতে ভীষণ অসুবিধে হয়।

দীপ খুব উদার গলায় বলে, কেন? মিস্টার বোস তো বেশ লোক।

মিসেস বোস চকোলেট বারের রাংতা খুলতে খুলতে বলেন, পুরুষদের কাছে পুরুষরা তো ভাল হবেই। খারাপ যত মেয়েরা।

ঠিক তা বলিনি।— দীপ একটু দ্বিধার ভাব দেখায়।

মিসেস বোস টুকুস করে এক টুকরো চকোলেট দাঁতে কেটে বলেন, পুরুষদের আসল চেহারা বোঝা যায় বেডরুমে। বাইরে সে যত বড় একজিকিউটিভই হোক না কেন, বেডরুমে তার মুখোশ খুলে যায়। বাইরের লোক তো সেটা দেখতে পায় না।

কথাটা হয়তো ঠিকই। দীপ তাই এই বিপজ্জনক প্রসঙ্গ আর ঘাঁটে না। চুপ করে থাকে। বোসের অল্পবয়সি সুন্দরী স্ত্রীটি চকাস-টকাস শব্দ করে চকোলেট খান বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বোঝা যায় চকোলেটের স্বাদ উনি একটুও উপভোগ করছেন না। ভদ্রমহিলার আসল ভ্রু বলতে কিছু নেই। লোমগুলো খুবই নিপুণভাবে উপড়ে ফেলা হয়েছে। কপালের দিকে উঁচু করে কৃত্রিম ভ্রু আঁকা। ফলে চোখের ওপরে অনেকটা মাংসের ডেলা বেরিয়ে আছে। কাছ থেকে দেখলে দৃশ্যটা তেমন সুন্দর নয়। যা হোক, মিসেস বোস এখন তাঁর আঁকা ভ্রু কুঁচকে খুব বিরক্তির সঙ্গে সামনের দিকে চেয়ে কিছু ভাবছেন। বোধহয় মিস্টার বোস সম্পর্কে খুবই খারাপ ধরনের কিছু কথা। দীপ একবার কার্পেটটার খোঁজ নেবে কি না ভাবল। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ঠিক সাহস পেল না।

লাউডস্পিকারে ফ্লাইট টু টুয়েন্টি টু-র যাত্রীদের সিকিউরিটি এনক্লোজারে যেতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অর্থাৎ প্লেন আর খুব বেশি দেরি করবে না। ঘোষণাটি খুব নিরুত্তাপ মুখে শুনলেন মিসেস বোস, কিন্তু নড়লেন না। অবশ্য তাড়াহুড়ো নেই, হাতে এখনও অঢেল সময় আছে।

দীপ নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বাইরে দাঁড়ায়। ওপাশের রানওয়ে দিয়ে পর পর এয়ারফোর্সের চারটে ন্যাট গোঁ গোঁ করে বিদ্যুতের গতিতে ছুটে উড়ে গেল। তারপর ফাঁকা রোদে মাখা মস্ত মাঠটা পড়ে রইল উদোম হয়ে। উত্তরে নীলবর্ণ বিশাল পাহাড়ের সারি। কাঞ্চনজঙ্ঘার রং ধূসর সাদাটে হয়ে আকাশের পিঙ্গলতায় প্রায় মিশে গেছে। তবু তার ভাঙাচোরা শীর্ষদেশের একপাশে একটা সমতল ধারে সোনালি রোদ ঝলকাচ্ছে আয়নার মতো। মুহূর্তে সব ভুলে গেল দীপ। তার ভিতর থেকে আর-একজন দীপ বেরিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ের দিকে দীর্ঘ চলা শুরু করল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দীপ। পিঙ্গল আকাশে হঠাৎ রুপোলি প্লেনটা দেখা যায়। লাউডস্পিকারে শেষবারের মতো সিকিউরিটি চেক-এর জন্য যাত্রীদের ডাকা হচ্ছে। দীপ লাউঞ্জে এসে দেখে তার কিটব্যাগটা অনাদরে পড়ে আছে চেয়ারের পাশে। মিসেস বা মিস্টার বোসকে দেখা যায় না। সে একবার রেস্টুরেন্টে উঁকি দিল। নেই। সিকিউরিটির বেড়া ডিঙিয়ে ওরা সামনের লাউঞ্জে চলে গেছে নিশ্চয়ই। নিশ্চিত হয়ে সে সিকিউরিটির কাঠের খাঁচায় গিয়ে ঢোকে।

প্লেনে উঠে বোস আর তার বউ একটু ইতস্তত করছিল। তারপর যা হওয়ার তাই হল। বোস গিয়ে আলাদা সিটে বসল। দীপকে বসতে হল মিসেসের পাশে। স্বভাবতই মিসেস বোস জানালা দখল করেছেন।

যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। প্লেনের অর্ধেক সিটও ভরতি হয়নি। প্লেনের ভিতরে মৃদু সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে। লাউডস্পিকারে একঘেয়ে ঘোষণার শেষে নিয়মমাফিক মিউজিক বাজতে থাকে এবং খাবারের ট্রে হাতে আসে হোস্টেস। ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় প্লেন নিয়মমাফিক নামবে দমদমে। এই একঘেয়েমির হাত থেকে ক্বচিৎ মুক্তি পায় মানুষ। এই যে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে আকাশের হৃদয়ে ঢুকে পড়া তা মানুষ টেরই পায় না এইসব আধুনিক বিমানে। মিউজিক, এয়ার হোসটেস, খাবার, চা বা কফি, নরম কুশন ইত্যাদি দিয়ে কেবলই অন্যমনস্ক করে রাখা হয় যাত্রীদের। এক-আধবার নিয়ম ভেঙে প্লেনে আগুন লাগে, ইঞ্জিন বিগড়োয়, আর তখন মৃত্যুভয়ে হিম হয়ে যায় মানুষ। কিংবা কখনও-সখনও বেপরোয়া কোনও হাইজ্যাকার বন্দুক বার করে প্লেনকে নিয়ে যায় কোনও অচেনা দূর-দুরান্তে। সেসব বিরল ঘটনা। নইলে দুনিয়াভর অধিকাংশ বিমানই নিয়ম মাফিক ওড়ে এবং নামে। নিয়ম ভেঙে আজ অন্তত একজন হাইজ্যাকার উঠে দাঁড়াক বন্দুক হাতে। বলুক, এ প্লেনকে সোজা নিয়ে চলো কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে।

এক কাপ কফি ছাড়া দীপ আর কিছুই খেল না। কফি ভাল করে শেষ হওয়ার আগেই পায়ের নীচে চলে এল কলকাতা। দিগন্তে আর কোনও পাহাড়ের চিহ্নও রইল না।

এয়ারপোর্টে বোসের বশংবদ ড্রাইভার সহ গাড়ি অপেক্ষা করছিল। কিন্তু গাড়িতেও ওরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের ঝগড়াকে জানান দিতে আলাদা বসে। সামনে বোস, পিছনে তার বউ আর দীপ। দীপের মাথা থেকে পাহাড় খসে গেছে, এমনকী বোসের বউয়ের গা থেকে আসা সুবাসটিও সে টের পাচ্ছে না। ট্রলি থেকে লাগেজ বুটে মাল তোলার সময় সে লক্ষ করেছে মস্ত ফাইবার গ্লাসের বিদেশি সুটকেসটার একটা কবজা ভাঙা। আজকাল প্লেনে মাল নেওয়াটাই আহাম্মকি। এয়ারপোর্টের পোর্টাররা দুমদাম করে সেগুলো আছড়ে ফেলে বা তোলে। কোনও মায়াদয়া দায়িত্ববোধ নেই। কবজা ভাঙার জন্য সে দায়ী নয় বটে কিন্তু সুটকেসটা সারানোর দায়িত্ব তার ওপর পড়তে পারে ভেবে একটু তটস্থ বোধ করছিল দীপ। এসব ছোটখাটো জিনিস লক্ষ করাই আসলে তার কাজ। দীপ আজকাল ধরেই নিয়েছে, সে হল বোসের মোসাহেব, হেড চাকর, বাজার সরকার এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী দালাল। তবু নিজের ওপর তেমন কোনও গভীর ঘেন্না হয় না দীপের। কারণ সে জানে, একদিন এইসব তুচ্ছতা থেকে সে মুক্তি পাবে। যেদিন পাহাড় ডাকবে।

বোস গণেশ অ্যাভেনিউ অফিসের সামনে নেমে গেল।

দীপ একবার ভাবল, সামনের সিটে গিয়ে বসবে। কিন্তু সেটা কেমন দেখাবে তা বুঝতে না পেরে তার নড়তে চড়তে সাহস হচ্ছিল না। বোস নেমে যেতেই মিসেস বোস চাপা স্বরে বলেন, হামবাগ। কাজ না আরও কিছু! জাস্ট অ্যাভয়েড করার জন্য অফিসের নাম করে কেটে পড়ল।

দীপ কথা বলে না। বলার নেই। মাঝে মাঝে তাকে কেবল শুনে যেতে হয়। কলকাতায় পা দিয়েই বোসের বউ একটা মস্ত রোদ-চশমা চোখে দিয়েছেন। বাইরের দিকে চেয়ে থেকেই দীপকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনার কি অন্য কোনও কাজ জোটে না, দীপনাথবাবু? ওই গরিলাটার সঙ্গে লেগে থেকে নিজের ফিউচারটা নষ্ট করছেন কেন? হি উইল ডু নাথিং ফর ইউ।

দীপ চালাক হয়েছে। সে জানে এসব দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে মিস্টার বোস সম্পর্কে একটিও নিন্দের কথা তার বলা ঠিক হবে না। একদিন বোস আর তার বউ আমে-দুধে মিশে যাবে, আর সেদিন এই নিন্দের কথা বাঁশ হয়ে ফিরে আসবে। তাই সে খুব উদাসভাবে বলে, বোস সাহেবের ওপর আপনি খুব চটেছেন। রেগে গিয়ে কাউকে ঠিক বিচার করা চলে না।

একটু অধৈর্যের গলায় মিসেস বলেন, প্লিজ! আমার লাইফটা নষ্ট হয়েছে, আপনারটাও নষ্ট করবেন না।

দীপ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, আসলে দেশে চাকরির খুব একটা স্কোপও তো নেই দেখছেন।

ওসব বাজে কথা। ভাববেন না যে, আমি একজন হামবাগ মানিসেন্ট্রিক একজিকিউটিভের স্ত্রী বলে কোনও খবর রাখি না! ইন ফ্যাক্ট আমি নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। সোসাইটিতে কী হচ্ছে না হচ্ছে সব খবর রাখি। মাত্র কয়েক বছর আগেও আমি লেফটিস্ট ছিলাম, অ্যাকটিভ পলিটিকস করতাম।

দীপ একটু অবাক হয়ে নতুন করে মিসেস বোসের দিকে তাকায় এবং কথাটা মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

মিসেস বোসের রোদচশমাটার জন্য তেমন কিছু বুঝতে পারছিল না দীপ। খুব কৌতুকের সঙ্গে সে প্রশ্ন করে, এসব কথা কি মিস্টার বোস জানেন?

ঠোঁট উলটে মেয়েটা বলে, আমি ওকে কিছু বলিনি। জানলে জানে। আমি পরোয়া করি না। কিন্তু আমার প্রশ্ন, আপনি এভাবে ওর সঙ্গে লেগে আছেন কেন? আফটার অল আপনার তো কাজের কিছু এক্সপেরিয়েন্স আছে বলে শুনেছি।

দীপ মৃদু স্বরে বলে, আমি একটা কৌটো তৈরির কারখানায় কাজ করতাম। টেকনিক্যাল কাজ

নয়, অ্যাডমিনস্ট্রেশনের। খুবই ছোট লুজিং কনসার্ন। সেই অভিজ্ঞতার তেমন কোনও দাম নেই।

মিসেস বোস খুব দৃঢ় স্বরে বলেন, টেকনিক্যাল নো হাউ ই আসল জিনিস। যদি আপনি সেটা শিখে নিতেন তা হলে আজ এই গরিলাটাকে তোয়াজ করে চলতে হত না। আজকাল একটা সামান্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বা থার্ডগ্রেড ছুতোরও বসে থাকে না। যে সামান্য তালাচাবি সারাতে পারে, ঝালা দেওয়ার কাজ জানে, ছুরি কাঁচি শান দেয় বা লেদ চালায় তারও কাজের অন্ত নেই। একটুখানি টেকনিক্যাল কাজের জ্ঞান আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে থাকলেই হল। আপনার কি কোনওটাই নেই?

দীপ একটু হাসে। মাথা নেড়ে বলে, বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা তো জৈব জিনিস। সেটা ছাড়তে পারিনি বলেই এখনও মিস্টার বোসের সঙ্গে লেগে আছি।

কিন্তু তাতে বাঁচবেন না। ও নিজেই আমাকে অনেকবার বলেছে, দীপনাথ ইজ গুড ফর নাথিং। ওর উন্নতি করার ইচ্ছেটাই নেই। তার মানে ও আপনাকে অলরেডি ক্যানসেল করে রেখেছে। আর আপনি যতটা মনে করেন ওর ততটা ক্ষমতাও নেই। গুজরাটিরা অত্যন্ত কানিং বিজনেসম্যান। তাই ওর হাতে রিক্রুটিং পাওয়ার তেমন কিছু দিয়ে রাখেনি। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কথাটা খুব গালভরা, কিন্তু পাওয়ার বলতে কিছু নেই, ডিসিশন বা পলিসি মেকিং নেই, অ্যাডভাইস দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আপনি অনর্থক এখানে চাকরির আশা করছেন।

দীপ বোসের বউকে আর-একটু ভাল করে দেখল। কম বয়স, বামপন্থী চিন্তাধারার অবশিষ্ট কিছু রেশ, কিছু আবেগ, স্বামীর ওপর রাগ এবং তার ওপর করুণা এইসব মিলিয়ে এ মেয়েটা এখন যা বলছে তা নিজেও বিশ্বাস করে না। দীপ এই সমাজকে খুব ভাল না চিনলেও খানিকটা বুঝে নিয়েছে। সে জানে মিস্টার বোস চাকরি দেওয়ার মালিক না হলেও তাঁর কথার দাম আছে। গুজরাটিরা ভাল ব্যবসায়ী বলেই বোসকে কখনও চটাবে না। বোস ইস্টার্ন জোন-এ কোম্পানির কোমরের জোর অনেকখানি এনে দিয়েছে। বোসের বউ সেটা স্বীকার করুক বা না করুক। সে তাই মৃদু স্বরে বলে, বোস সাহেবের ক্ষমতা নেই এমন কথা আপনাকে কে বলল? কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। তা ছাড়া নতুন করে টেকনিক্যাল নো হাউ শেখার বয়সও আমার নেই।

আপনার বয়স কত?

ত্রিশের কিছু ওপরে। সঠিক হিসেব নেই, উইদিন থার্টিথ্রি।

ওটা কোনও বয়স নয়। আপনি তো খুব ফিট দেখতে।

তবু বয়সটা ফ্যাক্টর। শেখার পক্ষে ফ্যাক্টর।

বাড়িতে কে কে আছে?

অলমোস্ট কেউ না।

স্ত্রী?

বিয়ে করিনি।

তাই বলুন। একটা বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করে থাকলে পুরুষরা একটু খ্যাপাটে হয়ে যায়।

আমি কি খ্যাপাটে?

নয়তো কী? প্লেন থেকে নামবার সময় আমি লক্ষ করেছি আপনি মিস্টার বোসের অ্যাটাচি কেসটা হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিলেন। আপনার আত্মমর্যাদাবোধ নেই কেন? ওর অ্যাটাচি আপনি কেন বইবেন?

দীপ খুব হাসে। হাসতে হাসতে বলে, আপনি মিস্টার বোসের ওপর খুব চটেছেন আজ?

মিসেস বোস একটু চুপ করে থাকেন। কমনীয় মুখশ্রী এখন আর ততটা কমনীয় দেখাচ্ছে না। চোয়ালে যথেষ্ট দৃঢ়তা। খুব আস্তে করে বলেন, আই অ্যাম স্টিল ডেডিকেটেড টু মাই আইডিয়ালস। আমি কোনও বড়লোককেই সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে ওর মতো হামবাগ স্লেভ একজিকিউটিভদের। আমি ওকে জাংকারপট করে ছাড়ব। আর কিছু না পারি ওর সমস্ত

সেভিংসকে উড়িয়ে দেওয়ার পথ আমার খোলা আছে। আমি ওকে ভিখিরি করে ছেড়ে দেব।

দীপ টের পায় মিসেস বোসের কোমল অঙ্গ থেকে একটা অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহ আসছে। ভারী অস্বস্তি বোধ করে সে। এবং খুবই ঠান্ডাভাবে বসে থাকে।

॥ চার ॥

এই শীতে অন্ধকার বারান্দায় মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিলু। গলি থেকে চোখ তুলে দৃশ্যটা দেখে দীপ। নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিলু, যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ঘর থেকে আবছা আলোর আভাস এসে পড়েছে ওর গায়ে। আবছা দেখাচ্ছে মূর্তিটা। দোতলার ওই বারান্দায় উত্তরের বাতাস হু হু করে বয়ে আসে। বিলুর শীতবোধও কমে গেছে বুঝি।

বিলু গলির আবছা আলোতেও দীপকে দেখতে পেয়েছিল ঠিকই। দীপ দোতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতেই দরজা খুলে পরদা সরিয়ে দেয় বিলু।

আজকাল বিলুর কথা কমে এসেছে খুব। দরজা খুলে একবার ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। চলে যাচ্ছিল ভিতরের দিকে। দীপ বাইরের ঘরের সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে খুব সাবধানে মৃদু স্বরে বলল, এখন খুব হিম পড়ে। বাচ্চাটাকে নিয়ে বারান্দায় যাস কেন?

বিলুর সঙ্গে সবাই আজকাল সতর্কভাবে কথা বলে। কখন বোমা ফাটবে তার কিছু ঠিক নেই। সামান্য কথাতেই কখনও খুব রেগে যায়, কখনও ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বিলুর চুল রুক্ষ, ম্যাড়ম্যাড়ে হলুদ রঙের শাড়িটা রং-চটা ময়লা। গায়ের চামড়ায় খড়ি উড়ছে, ঠোঁট দুটো ভীষণ শুকিয়ে মামড়ি দেখা যাচ্ছে। দীপের কথার জবাব না দিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল।

দীপ একটা ঠোঙায় মহার্ঘ কাঠ-বাদাম, কিছু মুসুম্বি আর আপেল এনেছে। কাঠ-বাদাম খুব ভালবাসে প্রীতম।

জুতো খুলে মেঝেয় দাঁড়াতেই মোজার ভিতর দিয়ে ডিসেম্বরের ঠান্ডা উঠে এল শরীরে। এই কয়েকটা দিনই যা একটু শীত কলকাতায়। শীতের শিহরনটুকু শরীরে স্রোতের মতো বয়ে যেতেই মনের মধ্যে একটি দৃশ্যান্তর ঘটে গেল। মনে পড়ল, হাকিমপাড়ার মস্ত কাঁচা ড্রেনের পাশে দীপের হাতে অকারণে মার খেয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে কাঁদছে। দীপের সমান গায়ের জোর ছিল না প্রীতমের, বয়সেও অনেকটা ছোট। রাগে দুঃখে অপমানে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ ভরা জল আর শরীর-ফেটে-পড়া রাগ নিয়ে প্রীতম চিৎকার করে দীপকে বলেছিল, আমার বাঁ হাতটা খা। আমার বাঁ পাটা খা। তখন খুব হেসেছিল দীপ। আজকাল যতবার মনে পড়ে ততবার হাসির বদলে চোখে জল আসতে চায়।

দীপ ভিতরের ঘরের পরদা সরাতেই দেখল, প্রীতম প্রাণপণ চেষ্টায় একা একাই উঠে লেপটা সরিয়ে পাজামা পরা পা দুটো খাট থেকে নামানোর চেষ্টা করছে। কাঠির মতো শুকিয়ে এসেছে পা, হাত দুটোও কমজোরি হয়ে আসছে ক্রমে। শরীরটা এখন ভারী বে-ঢপ দেখায়। আচমকা দেখলে লোকে ভাববে, মানুষটা বেঁচে আছে কী করে?

শুধু মুখটাতে এখনও অসুস্থতা স্পর্শ করেনি প্রীতমকে। চোখের দৃষ্টি এখনও সজীব। পা ঝুলিয়ে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতো বসবার চেষ্টা করতে করতে প্রীতম তার ব্যথা-ভরা সুন্দর মুখ-টেপা হাসিটা হাসে।

টিনের চেয়ার বিছানার ধারটিতে টেনে নিয়ে বসে দীপ জিজ্ঞেস করে, আকুপাংচারের তারিখ কবে ছিল?

আজই। এই তো ঘণ্টা দুয়েক আগেই ফিরেছি আমরা।

ডাক্তার কী বলল?

ভাল। অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। আজ ছ'টা কি সাতটা ছুঁচ দিয়েছিল। তাই না বিলু?— বলে বিলুর দিকে একবার ফিরে তাকানোর চেষ্টা করল প্রীতম। বিলু পিছন দিকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে খুব দ্রুত তার রুক্ষ চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল। কিন্তু জটধরা চুলে চিরুনি চলতে চাইছে না। বিলুর রাগের হাত জটসুদ্ধ চুল ছিঁড়ে আনছে মাথা থেকে। প্রীতমের কথার জবাব দিল না বিলু।

প্রীতমের বালিশের পাশে ফলের ঠোঙাটা রেখে দিয়েছিল দীপ। প্রীতম তার সরু একখানা হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা ছুঁল, তৃপ্তির চোখে চেয়ে দেখল একটু। তারপর লাজুক গলায় বলে, এসব এনেছ কেন? আমি কি এখন আর আগের মতো খেতে পারি, বলো? আজ অরুণবাবুও ডাক্তারের কাছ থেকে আসার সময় একগাদা ফল কিনে আনলেন। কত বারণ করলাম।

বিলু ঘর থেকে চলে গেল রান্নাঘর আর ডাইনিং স্পেসের দিকে। খুব সতর্ক নিচু গলায় দীপ জিজ্ঞেস করল, আজ কি তুই অরুণের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি? বিলু সঙ্গে যায়নি?

প্রীতম মাথা নাড়ে। যায়নি। মুখে সেই অসম্ভব ভালমানুষের হাসি। দুটো হাতের পাতা কোলের ওপর জড়ো করা। হাড়ের ওপর চামড়া বসে যাচ্ছে খাঁজে খাঁজে। আঙুলের গিঁট জেগে উঠেছে, কংকালসার হয়ে যাচ্ছে হাতের পাতা। সেদিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে প্রীতম। নিজের কররেখা দেখে। তারপর মুখ তুলে বলে, অরুণ বড় ভাল ছেলে। ও এলে বাড়িটা জমজম করে। বিলুরও মনটা ভাল থাকে।

এ কথায় দীপ খুব কূট চোখে প্রীতমের মুখখানা দেখে। না, প্রীতমের মুখে কোনও ছায়া নেই। দরজার ওপরে সাঁইবাবার একটা ছবি টাঙানো, সেই দিকে চেয়ে আছে।

অরুণ হয়তো ভালই। তবে একটু আবেগহীন, বাস্তববাদী। প্রীতমের এই অসুখটা আজ পর্যন্ত কোনও ডাক্তার ধরতে পারেনি ঠিকমতো। প্রথমদিকে একজন বড় ডাক্তার ভুল চিকিৎসা করে রোগটাকে আরও গাড়িয়ে তোলে। পরে অন্যান্য ডাক্তার বিস্তর কসরত করার পর হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছে, এক ধরনের ইন্টারন্যাল ইনফেকশন। এ রোগের পরিণতি কী হতে পারে তা তারা কেউ স্পষ্ট করে বলেনি। তবে বুঝে নেওয়া যায় সবার আগে সেটা বুঝেছিল অরুণ। সে উপযাচকের মতোই প্রীতমকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোম্পানি থেকে ভলান্টারি রিটায়ার করাল। তাতে এক কাঁড়ি টাকা পেয়ে গেল প্রীতম। এল আই সি-র একজন চেনা এজেন্টকে ধরে-করে অরুণ প্রীতমের একটা সত্তর হাজার টাকার পলিসি করিয়ে দিয়েছে। ব্যাংকে প্রীতমের অ্যাকাউন্টকে বিলুর সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করিয়েছে। আত্মীয়-স্বজন যখন রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তখন ঠান্ডা মাথায় এই জরুরি কাজগুলি সেরে রেখেছে অরুণ। সে লোক ভাল হতে পারে, তবে তার মনে কোনও ভাবাবেগ নেই। পরোক্ষে সে কি প্রীতমকে তার পরিণতিটা জানিয়ে দিতে সাহায্য করেনি?

দীপ অন্য একটা কথাও মাঝে মাঝে ভাবে, অরুণ কি এসব প্রীতমের জন্যই করেছে? না কি বিলুর জন্য? এখনও বিলু অরুণকে ডাকনামে বুধু বলে ডাকে। বিলুর পোশাকি নাম অনন্যা। অরুণ ওকে ডাকে অন্যা বলে। এই বুধু ও অন্যার রহস্য বিলুর দাদা হয়ে ভেদ করতে চায় না দীপ।

দীপ ভাবে, প্রীতমের মনে যখন পাপ নেই তখন তার মনেই বা থাকবে কেন?

পাশের ডাইনিং স্পেসে অনেকক্ষণ ধরে সরু গলায় লাবু ঝিয়ের কাছে কী একটা বায়না করছিল। মেয়েটা এমনিতে মিষ্টি, ভিতু, ঠান্ডা, কিন্তু কখনও-সখনও খুব ঘ্যানায়। আর যখনই ঘ্যানায় তখনই ধৈর্যহীন বিলু নির্মম হাতে মেরে মেয়েটাকে পাট পাট করে দেয়। বিলুর ভয়ে মেয়েটা সবসময়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে থাকে। লাবুর সবচেয়ে বড় আশ্রয়টা সরে গেছে। শরীরের কারণেই বাবার কাছে আসা তার বারণ।

প্রীতম খুব উৎকর্ণ হয়ে মেয়ের গলার স্বর শোনে আর কীসের জন্য যেন অপেক্ষা করে। আচমকাই পরদার ওপাশে বিলুর চাপা গর্জন শোনা যায়, চুপ করলি অলক্ষ্মী মেয়ে? গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই চটাস পটাস চড়-চাপড়ের শব্দ হতে থাকে। বিলুর শ্রান্ত গলা শোনা যায়, আমাকে শেষ না করে ছাড়বি না তোরা! প্রীতম কেমন কুঁজো হয়ে চোখ বুজে সিঁটিয়ে থাকে। যেন মারটা তার পিঠেই পড়ছে।

আরও মারের ভয়ে লাবু কাঁদতে পারে না। কাঁদা বারণ, বারণ না মানলে বিলু আরও মারবে। তাই প্রাণপণে কান্না চেপে রাখার চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে হেঁচকি উঠছে লাবুর। পরদার ওপাশ থেকে সেই হেঁচকির শব্দ এসে এ ঘরে হাতুড়ির ঘা মারে। প্রীতম বিবর্ণ মুখে চেয়ে থাকে দীপের দিকে। খুব চেষ্টা করে একটু হাসে। মাথা নেড়ে বলে, বিলুর দোষ নেই। ও পেরে উঠছে না। সারাদিন ঘরে আটকে থাকে, ওর মেজাজ খারাপ তো হতেই পারে।

অজুহাতের দরকার ছিল না। দীপ সবই জানে। এও জানে লাবু হচ্ছে প্রীতমের প্রাণের প্রাণ। সেই লাবু পাশের ঘরে মার খেয়ে কাঁদছে এটা শরীর বা মন দিয়ে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না প্রীতম। কিন্তু এই একটা জায়গা ছাড়া প্রীতমের আশ্চর্য সহনশীলতার কোনও তুলনা নেই। নিজের বোন হলেও বিলুকে কোনওদিন তেমন পছন্দ করে না দীপ। ওর ধৈর্য বলতে কিছু নেই, অল্প কারণেই ভয়ংকর রেগে যায়, তাছাড়া অলস, অগোছালো এবং বেশ কিছুটা স্বার্থপর। অরুণের সঙ্গেও বহুকাল ধরে একটা ব্যাখ্যাহীন রহস্যময় সম্পর্ক রেখে চলেছে। এসব মিলিয়ে প্রীতমের বিবাহিত জীবনটা খুব সুখের নয় নিশ্চয়ই। তবু প্রীতমকে কদাচিৎ দুঃখিত বা বিষণ্ণ দেখেছে দীপ।

বিলু ঘরে নেই, তাই ফাঁক বুঝে দীপ চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, শিলিগুড়িতে যাবি প্রীতম?

প্রীতম উদাস চোখে তাকিয়ে বলে, গিয়ে কী হবে?

তোর ইচ্ছে করে না যেতে?

আগে করত। এখন ইচ্ছে-টিচ্ছে কিছু নেই। বিলু বলে, কলকাতা ছাড়া চিকিৎসা ভাল হবে না।

আমি আসার আগে শতমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ও।

বলে চুপ করে থাকে প্রীতম। দীপের কথায় ওর মন নেই। পরদার ওপাশ থেকে এখনও লাবুর হেঁচকি তোলার শব্দ আসছে। কান খাড়া করে সেই শব্দ শুনছে প্রীতম। যেন কিছুক্ষণ চুপ করে শুনে প্রীতম আস্তে করে বলল, আমি যে ভাল হয়ে উঠব এটা ওরা বিশ্বাস করে না।

কারা?—দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

আমার বাড়ির সবাই। ওদের ধারণা আমি শিগগিরই মরে যাব। তাই আমাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যেতে চায়। বিলুকে এরকম ধরনের চিঠিও লিখেছিল বাবা। আবার তুমিও শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা বলছ!

দীপ একটু মুশকিলে পড়ে গিয়ে বলে, দূর বোকা! তোর অসুখ সারবে না বলে শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা বলেছি নাকি? আসলে ওখানকার জলহাওয়া তো ভাল, আত্মীয়স্বজনদের কাছে মনটা ভাল থাকে।

খুব যেন অভিমানভরে মাথা নাড়ে প্রীতম। বলে, ওসব কথার কথা। আসলে তোমরা বিশ্বাসই করো না যে, আমি আর বেশিদিন বাঁচব।

প্রীতমকে এ ধরনের কথা কোনওদিন বলতে শোনেনি দীপ। তাই অবাক হয়ে কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকে। বিলু নিঃশব্দে ঘরে এসে দীপের হাতে এক কাপ চা দিয়ে চলে যায়।

ধীরে ধীরে প্রীতম শুয়ে চোখ বুজল।

দীপ চায়ে চুমুক দিয়েই হরিণঘাটার স্ট্যান্ডার্ড দুধের বোঁটকা গন্ধ পায় এবং মুখ বিকৃত করে। সে প্রাণপণে প্রীতমের অসহায়তা, তার রোগভোগের যন্ত্রণা, মৃত্যুচিন্তা এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছের

অহর্নিশ লড়াই, লাবুর প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসা ইত্যাদি বুঝবার চেষ্টা করতে থাকে। ভাবতে গেলে প্রীতমের সমস্যার শেষ নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, মরবার আগে প্রীতম কিছুতেই নিশ্চিন্তে জেনে যেতে পারবে না যে, বিলু শেষ পর্যন্ত বিধবা থাকবে, না কি অরুণকে বিয়ে করে বসবে। যদি তাই হয় তবে লাবুর দশা কী হবে! ভেবেচিন্তে প্রীতমের জন্য এক বুক দুঃখ উথলে উঠছিল দীপের। তাই সে চায়ে দুধের বোঁটকা গন্ধটা আর তেমন টের পেল না।

পরদা সরিয়ে মেয়ে কোলে বেরিয়ে এসে বিলু বলল, তুমি একটু বোসো মেজদা। আমি পাশের ফ্ল্যাট থেকে ঘুরে আসছি।

বিলু চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ বাদে প্রীতম চোখ খুলে বলে, মেজদা, আমি খুব বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি।

দীপ আত্মবিশ্বাসহীন গলায় বলে, তুই বাঁচবি নাই বা কেন?

খুব কষ্টে প্রীতম উঠে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে। বলে, এগুলো খুব বাজে ব্যাপার। এই অসুখ-টসুখ মোটেই ভাল জিনিস নয়। মন দুর্বল হয়ে যায়, মাথার ঠিক থাকে না। এই সময়ে তোমরা আমার কাছে এসে এমন কোনও কথা বোলো না যাতে মরবার কথা মনে হয়। আমি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকার চিন্তা করি। কাজটা সোজা নয়, তবু করি।

দীপ একটা ঢোক গিলে বলে, আমি তোর অনেক ইমপ্রুভমেন্ট দেখছি প্রীতম।

প্রীতম বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, ইচ্ছাশক্তিকে খুব কম জিনিস বলে মনে কোরো না। উইল পাওয়ার অনেক অঘটন ঘটাতে পারে।

নিশ্চয়ই।—দীপ তেমনি আস্থাহীন গলায় বলে।

আমি কখনও কাউকে বলিনি যে, আমি মরে গেলে লাবু আর বিলুকে দেখো। কেন বলব? ওসব তো হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা! আমার তো মনে হয় না কখনও যে, আমি মরে যাব!

সে কথা কেউই ভাবছে না। তুই অকারণে সবাইকে সন্দেহ করিস।

তবে বাড়ির লোক আমাকে শিলিগুড়ি নিয়ে যেতে চায় কেন? ওরা কি জানে না, সেখানে কলকাতার মতো চিকিৎসা হবে না?

এ কথাটা প্রীতম খুব আস্তে করে গাঢ় স্বরে বলল। কোনও রাগ বা অভিমান নিয়ে নয়। নিষ্পলক কয়েক সেকেন্ড দীপের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কয়েক পরদা নিচু স্বরে বলে, শোনো মেজদা, আমি শিলিগুড়ি গেলেও বিলু কিছুতেই যাবে না। শ্বশুরবাড়ির কাউকেই ও দু'চোখে দেখতে পারে না। জানো তো?

জানি।

কিন্তু আমি বিলুকে কলকাতায় একা রেখে যেতে ভয় পাই।

দীপু জুয়াড়ির মতো মুখের ভাব ঢেকে রাখার চেষ্টা করে বলে, কেন?

কেন তা আর বলল না প্রীতম। সামান্য একটু বিচিত্র সুন্দর হাসি হাসল মাত্র। দীপ জানে, মরে গেলেও কথাটা আর প্রীতমের মুখ দিয়ে বেরোবে না। ও কেবল সুন্দর করে হাসবে।

দীপ তাই চাপাচাপি না করে বলল, ইচ্ছে না হলে যাবি না। কেউ তো জোর করছে না!

তা ঠিক। তবে জোর করছে আমার ভিতরের একটা ইচ্ছে। মাঝে মাঝে আমি ডানপাশের ওই জানালাটা দিয়ে শিলিগুড়ির পাহাড় দেখতে পাই। প্রায় ডাকঘরের অমলের অবস্থা। কিন্তু জানি শিলিগুড়িতে গেলে আমি আর বাঁচব না। চিকিৎসার অভাবে নয়, শিলিগুড়িতে গেলেই আমার মন নরম হয়ে গলে যাবে, ইচ্ছার শক্তি যাবে কমে।

দূর পাগল!

প্রীতম হাসছেই। এতটুকু সিরিয়াস ভাব নেই মুখে, বিষণ্ণতাও নেই। যেন ঠাট্টা-ইয়ারকি করছে এমনিভাবে বলে, ওখানে গেলেই সেই ছেলেবেলায় সব কথা এসে ঘিরে ধরবে। সে ভারী সুখের

ব্যাপার, কিন্তু ওগুলো মনকে দুর্বল করে দেয়। তার ওপর সকলে বুক বুক করে যত্ন-আত্তি শুরু করবে, সিমপ্যাথি দেখাবে। ব্যস অমনি আমার লড়াইয়ের মনটাই যাবে নষ্ট হয়ে। এখানে তো তা নয়। এখানে প্রতি মুহূর্তেই রুক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে লড়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু এটাই আমার পক্ষে ভাল কেন জানো? আমাকে প্রতি মুহূর্তে জাগিয়ে রাখছে, সাবধান রাখছে, হাল ছাড়তে দিচ্ছে না, জেদ ধরিয়ে দিচ্ছে। যদি আমাকে বাঁচাতে চাও, মেজদা, কখনও শিলিগুড়ির কথা বোলো না।

দীপের স্বভাব হল যখনই কেউ কোনও কথা আন্তরিকভাবে বলে তখনই সে তা গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলে। শিলিগুড়িতে গেলে প্রীতম কেন মরে যাবে তার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাক বা না-থাক দীপ তা বিশ্বাস করল এবং শিউরে উঠে বলল, না না, ওসব আর বলব না প্রীতম। তোর যাওয়ার দরকার নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে দু'জন। প্রীতম তার দুর্বল হাত চোখের সামনে ধরে চেয়ে থাকে, যেন আয়নায় নিজের মুখ দেখছে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, তুমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছ না মেজদা?

দীপ একটু অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ। অনেকদিন।

বেশিদিন নয়। মাত্র দু'-তিন মাস বোধহয়।

তাই হবে। দীপ বলে, কেন বল তো!

আগে তুমি অনেক সিগারেট খেতে। দিনে অন্তত চল্লিশটা।

হুঁ।—দীপ বুঝতে পারে না প্রীতম কী বলতে চায়।

অত সাংঘাতিক নেশা ছাড়লে কী করে?

দীপ উদাস হয়ে বলে, ছেড়ে দিলাম।

কষ্ট হয়নি?

খুব। ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। পাগলের মতো লাগত।

প্রীতম তার সুন্দর হাসিটা মুখে মেখে বলে, তোমার ভীষণ রোখ আছে মেজদা। সাংঘাতিক রোখ।

দীপ ম্লান একটু হাসে। ছিল, কোনওদিন তার মধ্যে একটু ইস্পাতের মিশেল ছিল। একটু ছিল হয়তো বিলুর মধ্যেও। ছিল বড়দা মল্লিনাথেরও। কিন্তু দীপের ভিতরকার সেই ইস্পাত জীর্ণ হয়ে গেছে আজকাল। বিকেলেই মিসেস বোস তাকে বলেছিলেন, আপনার আত্মমর্যাদাবোধ নেই কেন?

প্রশ্নটা এখনও পাথরের মতো বুকের ভিতরে ঝুলে আছে।

দীপ ছটফট করে উঠে বলে, বিলু কোথায় গেল বল তো!

পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটার আজ জন্মদিন। এক্ষুনি এসে পড়বে। বোসো।

দীপ ঘড়ি দেখে। সাতটা। তার কোথাও যাওয়ার নেই। এখান থেকে সে সোজা মেসবাড়িতে ফিরে যাবে। কারও সঙ্গেই কোনও কথা বলবে না। চুপচাপ খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়বে সিঙ্গল বেডের বিছানায়। জীবনে অনেককাল কিছু ঘটেনি।

সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, না রে, অনেক রাত হয়ে গেল।

প্রীতম করুণ মুখ করে চেয়ে বলে, চলে যাবে? রাতে খেয়ে যাও না! মেসে তো বিচ্ছিরি খাবার খাও রোজ।

দীপ মাথা নেড়ে বলে, আজ নয়।

তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে একটু জোর দিয়ে যেয়ো। তোমার মনের জোরটা আমাকে দিতে পারো না?

দীপ খুব গম্ভীর মুখে বলে, তোর মনের জোর আমার চেয়ে কিছু কম নয় রে প্রীতম!

প্রীতম মুখ তুলে বলে, শোনো, শতম কলকাতায় এলে যেন আমার সঙ্গে দেখা না করে। ওকে দেখলেই সেইসব পুরনো কথা, মায়াটায়া এসে পড়ে। আমার পক্ষে ওগুলো ভাল নয়। ও যেন ভুল না বোঝে। ওকে বারণ করে দিয়ো।

দীপ মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

প্রীতম এমন কাঙালের মতো চেয়ে আছে যে, দীপ চট করে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে পারছিল না। তার বড় মায়া, তার বড় ভালবাসা এই ছেলেটির প্রতি।

দীপ তাই নিঃশব্দে আবার বসে, মেজদা বা সোমনাথ তোকে দেখতে আসে?

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, না। সোমনাথ একবার এসেছিল বহুদিন আগে। শ্রীনাথদা আসেনি।

দীপ গম্ভীর হয়ে বলে, আসা উচিত ছিল।

প্রীতম ক্লান্ত স্বরে বলে, তুমি মাঝে মাঝে এসো, তা হলেই হবে। আর কেউ না এলেও ক্ষতি নেই। বরং আত্মীয়দের আহা-উঁহু শুনলে আমার খারাপ রি-অ্যাকশন হয়। সিমপ্যাথি দেখানোর লোক আমি চাই না।

দীপ একটু হেসে বলে, তবে কী চাস? সেই পুরু রাজার মতো বীরের প্রতি বীরের ব্যবহার?

প্রীতম ক্ষীণ হাসে। বলে, ঠিক তাই।

দীপ শ্বাস ছেড়ে বলে, আমার রোখের কথা বলছিলি প্রীতম, কিন্তু তুই রোখা কিছু কম নোস। তুই পারবি মনের জোরে এসব কাটিয়ে উঠতে।

প্রীতম চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, শিলিগুড়িতে নয়, কিন্তু অন্য কোথাও গাছপালার মধ্যে, নদীর ধারে আমাকে কিছুদিন নিয়ে যেতে পারো না? বিলুকে বলেছি, কিন্তু ও তেমন গা করে না। বলে, বাইরে চিকিৎসা হবে না।

দীপ গম্ভীর হয়ে বলে, মেজদার ওখানে গিয়েই তো অনায়াসে থাকতে পারিস।

শ্রীনাথদা? ও বাবা, শ্রীনাথদার বউ ভারী কড়া লোক শুনি। সোমনাথ বিলুকে বলেছিল, বউদিই নাকি গুন্ডা ভাড়া করে ওকে মার দিয়েছে।

বাজে কথা। বউদি তেমন লোক নয়। বরং মেজদাই কিছু কাছাছাড়া লোক, তাই বউদি সম্পত্তি আগলে রাখে। তুই গেলে কত যত্ন করবে দেখিস।

তুমি কখনও গেছ ওখানে?

অনেকবার। বড়দা তখন বেঁচে। আমি গেলেই মুরগি কাটা হত। শ্রীনাথদার আমলেও গেছি। আরও সম্পত্তি বেড়েছে। ওরা বেশ ভাল আছে। তুই যাবি?

প্রীতম ম্লান মুখে বলে, কিন্তু ওরা না ডাকলে যাই কী করে? বিলু চিঠি লিখেছিল, শ্রীনাথদা জবাব দেয়নি। এখানেই তো রোজ চাকরি করতে আসে, একবার দেখাও তো করতে আসতে পারত। সেধে যেচে যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে?

দীপ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ভাই কত পর হয়ে যায়! রক্তের সম্পর্ক কথাটাই কি তা হলে এক বিকট ভুল?

মনটা খারাপ ছিলই তার। আরও একটু খারাপ হল মাত্র।

॥ পাঁচ ॥

তৃষা বিছানা ছাড়ে শেষ রাতে। শীতকাল বলে এখন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার থাকে। আকাশভরা জমকালো তারার ঝিকিমিকি। কখনও-সখনও ক্ষয়া চাঁদের ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নাও। পাখি ডাকে কি ডাকে না। এত নিঃঝুম যে, নিজের শ্বাস বা হৃৎপিণ্ডের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।

বৃন্দা ঘরের দরজা জানালা খুলে ঘর আর বারান্দা ঝাঁটাতে থাকে আর গুন গুন করে প্রভাতী গায়—ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে...। এমন পাষণ্ড কে আছে যার ভোরবেলার ছাঁকা নির্জনতায় ওই আপনভোলা নদীর মতো বয়ে যাওয়া সুরের প্রভাতী ভাল না

লাগবে। যার ভক্তি নেই সেও ওই গান শুনে মাঝে মাঝে প্রশ্নের সামনে দাঁড়ায়। তৃষার কোনওকালে ভক্তি ছিল না, আজকাল হয়েছে কি একটু!

তামাক দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে তৃষা কলঘরে চলে যায়। প্রাতঃকৃত্য সেরে এই মারুনে শীতে লোহার মতো ঠান্ডা জলে আকণ্ঠ স্নান করে সে। তামাকের ধ্বক ওই স্নান পর্যন্ত গলায় আটকে থাকে তার। স্নান করতে করতেই শুনতে পায় বাগানে ফুলচোরদের আনাগোনার শব্দ। নিচু দেয়াল টপকে লাফিয়ে নামছে ছোট ছোট পা, ফুল ছিঁড়ছে পুট পুট করে, চাপা গলার কথা। কুয়োর ধারে স্থলপদ্ম গাছটার ওপরেই ওদের নজর বেশি।

এই ভোরবেলায় মনে কোনও রাগ সহজে ওঠে না। তৃষা কান পেতে শোনে একটু। বাড়াবাড়ি টের পেলে গম্ভীর গলাটা একটু উঁচুতে তুলে বলে, কে রে? বৃন্দা, দ্যাখ তো!

ওইতেই কাজ হয়ে যায়। ঝুপ ঝাপ করে ফুলচোরেরা পালাতে থাকে। খ্যাপা নিতাইয়ের কুকুরটা মাঝে মাঝে তাড়া করে উপরন্তু। ঋডু পাহারাদার অবশ্য ফুলচোরদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। সারারাত পাহারা দিয়ে তৃষা উঠবার পর সে ঘুমোতে চলে যায়। এ সময়টায় তাই বাড়ির তেমন প্রতিরক্ষা নেই। কিন্তু তৃষা একাই একশো।

কলঘর থেকে বেরোতে একটু সময় লাগে তৃষার। নিজের যত্ন বলতে তার এই ভোরে স্নানটুকু। তাই সে সময় নেয়। এই সময়েই সে নিজের কথাও একটু ভাবে। দিনের মধ্যে বলতে গেলে এই একবারই।

কলঘর থেকে বেরোলেই দেখে পুব আকাশে ফিকে ফিরোজা রং ধরেছে। মিলিয়ে যাচ্ছে তারার আলো। ভোরের হয়তো-বা একটা সৌন্দর্য আছে। তৃষা তা কোনওদিনই তেমন টের পায় না। মস্ত দুই টিন-ভর্তি খেজুর রস বারান্দায় নামিয়ে রেখে যায় লক্ষ্মণ। হাঁস মুরগির ঘর থেকে ডিমের ঝাঁকা এনেও বারান্দা-সই করে দিয়ে যায় সে। নিতাই কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে উঠোনের পশ্চিম ধারে ডাঁই করে। রেলবাবুদের বাড়ি থেকে দুধ নিতে ছোট ছোট ঘটিবাটি হাতে নিয়ে কচি কাঁচা বুড়ো মদ্দারা এসে জুটে যায়। চতুর্দিকে চোখ রাখতে হয় তৃষার।

গোটা সাতেক দুধেল গোরুর পনেরো-ষোলো সের দুধ দুইয়ে মংলু গয়লা একটা মস্ত অ্যালুমিনিয়ামের ড্রামে ঢেলে দিয়ে যায়। ড্রামের মধ্যে তৃষার কিছু কারচুপি থাকে। দু'-তিন সের পরিষ্কার জল আগে থেকেই ড্রামে ভরে রাখে সে। অন্য গয়লারা যেমন গোরুকে জাঁক দেয় বা দুধে মিল্ক পাউডার, চক খড়ির গুঁড়ো বা হাবিজাবি মেশায় তৃষা তা কখনও করে না। তার বাড়ির দুধ খায় বহু বাড়ির আদর যত্নের বাচ্চারা। হিসেব করলে তিন টাকা সের দরে সে যথেষ্ট খাঁটি দুধই দেয়। অতটা দুধে এই সামান্য জল মেশানোটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তৃষার অন্তত কিছু মনে হয় না। শ্রীনাথ টের পেয়ে একদিন খুব রাগ দেখিয়েছিল, ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে কেমন করে যে তুমি এত নীচে নামতে পারলে! যদি এই কাজই করবে তবে সারাজীবন গয়লাদের সঙ্গে দুধে জল দেওয়ার জন্য খিটিমিটি করে এলে কেন?

শ্রীনাথের রাগ অবশ্য বাওয়া ডিমের মতো। সারবস্তু নেই। সংসারে সে হচ্ছে বোঁটা আলগা ফল। যে-কোনওদিন খসে পড়বে। তৃষা কথাটায় কানই দেয়নি। সামান্য মাইনের প্রুফ-রিডারের সংসার চালিয়ে সে জীবনের অনেক সত্য ও সারবস্তু চিনে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে তৃষার নিজের তেমন কোনও লোভ নেই। সে সোনার গয়নার জন্য হেঁদিয়ে মরে না, শাড়ি বা রূপটানের জন্য আকণ্ঠ কোনও অতৃপ্তি নেই। সে শুধু চায় একটা ছোটখাটো রাজত্বের ওপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করতে।

বাড়ির জন্য আলাদাভাবে দু'-তিন সের দুধ দোয়ানো হয়। ফেনিল, ঘন, ননী ওঠা সুস্বাদু বালতি ভরা সেই দুধ দেখে কোনওদিন এক চুমুকও খাওয়ার কথা মনে হয় না তৃষার। দুধের গ্লাস মুখের কাছে আনার কথা ভাবলেও পেট গুলিয়ে ওঠে। কয়েকবার চেষ্টা করে পারেনি। সকালে সে তাই বড় পাথরের গ্লাস ভর্তি চা খায়। রোদ ভাল করে ফোটার আগেই বৃন্দা তার জন্য মাটির হাঁড়ি করে

ফেনাভাত নামিয়ে দেয়। খাঁটি ঝাঁঝালো সর্ষের তেল, ঝাল লঙ্কা আর ডিমসেদ্ধ দিয়ে তৃষা জলখাবার খায়। ভাত ছাড়া আর কিছু খাওয়ার আছে সংসারে, এ তার মনেই হয় না।

কুটনো কোটা বা রান্না করার মতো মেয়েলি কাজ তৃষা আজকাল করে না। তার জন্য লোক আছে। সকালের দিকে রোদ উঠলে সে উঠোনে জলচৌকি পেতে বসে। কোলে থাকে তার নিজস্ব হিসাব-নিকাশের খাতা। কে কত পাবে, কার কাছে কত পাওনা, কাকে কোন কাজ দেওয়া হবে, কাকে রাখবে, কাকেই বা ছাড়াবে তা সব ওই খাতায় লেখা। বন্ধকি ঋণের একটা মস্ত হিসেবও রয়েছে তার। সোনা-রুপোর গয়না থেকে ঘটি-বাটি এমনকী গোরু পর্যন্ত বাঁধা রাখে সে। কখনও এক পয়সা ছাড়ে না।

ছেলেমেয়েরা কোনওদিনই খুব একটা ঘেঁষে না তার কাছে। তবে ওর মধ্যে সজলই তবু একটু সাহস রাখে। একটু মা-ন্যাওটাও সে-ই। কিন্তু সজল যখন সুন্দর নধরকান্তি শিশু ছিল তখনও তাকে তৃষা কোনওদিন হামলে আদর করেনি। আজও এক কঠোর শীতল শাসনের দূরত্ব বজায় আছে।

কয়েকদিন জ্বরে ভুগে উঠে সজল এখন ভারী রোগা আর দুর্বল। বেলায় ঘুম থেকে উঠে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে উঠোনের রোদে এসে গুটি গুটি বসেছে। তৃষার জলচৌকি থেকে অল্প দূরে।

তৃষা এক পলক তাকিয়ে বলল, পায়ে চটি নেই কেন?

ভুলে গেছি।

যাও পরে এসো।

সজল উঠল না। দুর্বল ঘাড়ের নলিতে মাথাটা খাড়া রাখতে না পেরে কাত করে মায়ের দিকে চেয়ে বলে, একটু খেজুর রস খাব মা?

না। সারারাত হিম পড়ে রস এখন বরফ হয়ে আছে। জাল দিলে গুড় খেয়ো। বেশি নয়, কৃমি হবে।

সজল চুপ করে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে।

তৃষা একবার ছেলের দিকে চেয়ে বৃন্দাকে ডেকে ওর চটিজোড়া দিয়ে যেতে বলে।

সজল উদাস চোখে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, বাবা কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি মা?

তৃষা সব জানে। তার অজান্তে কিছুই ঘটে না। গভীর রাতে খ্যাপা নিতাই তার জানালায় টোকা দিয়ে খবরটা দিয়ে গেছে, শেষ গাড়ি চলে গেল মা। বাবু কিন্তু ফেরেনি আজ।

খবরটা শুনে তৃষা কিছুক্ষণ জেগে ছিল। বলতে নেই, শ্রীনাথের জন্য তার খুব একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না। তার সন্দেহ শ্রীনাথ আজকাল বাইরে ফুর্তি করার স্বাদ পেয়েছে। তৃষার খুব ভুল হয়েছিল শ্রীনাথের সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে। প্রথম থেকে শ্রীনাথ দু' হাতে টাকা তুলত। তৃষা সাবধান হয়েছে এখন। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকা যতদূর সম্ভব টেনে নিয়ে ডাকঘরে রেখেছে। কিছু টাকা তার বন্ধকির ব্যাবসাতে চলে এসেছে। তবু যা টেনে নিয়েছে শ্রীনাথ তাও ফ্যালনা নয়। বদ্রীর মারফত জমিজমা কেনার চেষ্টা করছে, এ খবর মদন ঠিকাদারের কাছে শুনেছে তৃষা। শ্রীনাথের কথা খুবই ঘেন্নার সঙ্গে ভাবতে ভাবতে রাতে ঘুমিয়েছে তৃষা, সকালে আর ব্যাপারটা মনে ছিল না। ছেলের দিকে চেয়ে বলল, তোমার বাবা কাজে আটকে পড়েছে তাই আসেনি।

সজল এ কথায় জবাব দিল না, আর জানতেও চাইল না কিছু। কিন্তু তৃষা জানে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা মুখে যতই না বোঝার ভাব দেখাক, ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু বোঝে।

পাশদোলানি চালে তৃষার হাঁসের পাল লাইন ধরে ধপধপে ফর্সা উঠোন পেরিয়ে পুকুরের দিকে যাচ্ছে। তার মধ্যেই একটা হাঁস টপ করে দুলদুলে একটা ডিম প্রসব করে ফেলল মাটিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা হাঁস কপ কপ করে সেটা খেয়ে নিল। দৃশ্যটা গম্ভীর চোখে দেখল তৃষা। নন্দর কাছে ডিম বাবদ আড়াইশো টাকার মতো পাওনা। তাগাদার ভয়ে তিন-চারদিন হল সে আর এ

তল্লাট মাড়ায় না। তিন-চার দিনের ডিম ডাঁই হয়ে জমে আছে। বেশিদিন জমা থাকলে দু'-চারটে করে পচতে শুরু করবে। আজকালের মধ্যেই নতুন লোক না দেখলে নয়, নন্দ অবশ্য পালাতে পারবে না। টাকা তাকে দিতেই হবে, নইলে যে ঘোর বিপদ তা সে জানে। তৃষারা যখন প্রথমে এখানে আসে তখন কাঙাল ভিখিরি প্রার্থীদের খুব আনাগোনা ছিল। কাছাখোলা বাস্তববুদ্ধিহীন এবং লোকচরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ মল্লিনাথ তাদের দু' হাতে বিলোত। তৃষা হাল ধরার পর সব বন্ধ হয়। বিনা কাজে ফালতু একটি পয়সাও সে কাউকে দিত না। ভিখিরি-টিখিরি এলে সে বলত, কাজ দিচ্ছি, করলে পয়সা পাবে, ভাত পাবে। নইলে রাস্তা দেখো। তৃষার পাল্লায় পড়ে কিছু কিছু নিষ্কর্মা মাগুনে লোক এখন শুধরেছে। তৃষা তাদের খাটিয়ে পয়সা দেয়। নন্দ তাদেরই একজন। তৃষার টাকা মেরে দেওয়ার মতো অকৃতজ্ঞ হলেও সে হতে পারে কিন্তু প্রাণের ভয়েই সে তা করবে না। সুতরাং তৃষার দুশ্চিন্তা নেই।

তার পায়ের কাছে সজলের মাথার ছায়াটা পড়ে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ তৃষা চেয়ে দেখে, সজল নেই। কোথাও উঠে গেছে। হয়তো বাপের খোঁজ করতেই গেল। অবশ্য বাপের জন্য এক পয়সার টান নেই ওর। থাকবে কেন? তৃষা তো জানে, শ্রীনাথ ওকে কী চোখে দেখে। সজলও সেই বিষ মনোভাব টের পায়। শুধু শ্রীনাথ নয়, মল্লিনাথ ও তৃষার সম্পর্ক নিয়ে আরও অনেকেরই অন্যরকম ধারণা আছে। তৃষা সেসব ধারণা ভেঙে দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি। নিন্দের হাওয়াকে রুখতে নেই। চুপ করে থাকলে তা একদিন আপনিই কেটে যায়। গেছেও অনেকটা।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলে এই সাদা রোদে যে নিরুদ্বেগ সম্পন্ন গৃহস্থালির দৃশ্যটা দেখা যায় তার সবটা অত সরল গল্প নয়। তৃষা তার মেধা, বোধ, কূটবুদ্ধি, দেহ ও মনকে যতদূর সম্ভব নিংড়ে এ শাখা-প্রশাখাময় ছায়াঘন সংসারবৃক্ষটিতে সার ও সেচ জুগিয়েছে। উদ্যমহীন, আড্ডা ও অবসরপ্রিয়, হতদরিদ্র শ্রীনাথের ঘর করতে গিয়েই সে টের পেত, সতীত্ব বা এককেন্দ্রিক জীবন কত না অর্থহীন। কতই না হাস্যকর শব্দ ভালবাসা। রাজার আমলের টাকার মতোই তা অচল। তাই মল্লিনাথের সংস্পর্শে এসে সে যখন দারিদ্র্য মোচনের পথ দেখল তখন কোনও মানসিক বাধাই তাকে আটকে রাখেনি। লোকে বলে, অবৈধ সম্পর্ক। কিন্তু তাই কি? তৃষা কোনও পুরুষকেই ভালবাসে না বটে, কিন্তু তবু তার যেটুকু স্নেহ এখনও বুকের তলানিতে পড়ে আছে তার যোগ্য পুরুষ সারাজীবনে ওই একজনকেই পেয়েছিল তৃষা। সে মল্লিনাথ। ওই একজনকেই তার তেমন পরপুরুষ বলে মনে হয়নি কোনওদিন। বরং ওই একজনের প্রতি মানসিক বিশ্বস্ততাই তাকে খানিকটা সতীত্ব বা ওই ধরনের কিছু দিয়েছে। শরীরের কোনও বোধই কোনওদিন ছিল না তৃষার। কিন্তু আজও সে দেখতে শুনতে অতীব লোভনীয় এক যুবতী। হয়তো তরুণী নয়, কিন্তু জোয়ারি যুবতী। লম্বা মজবুত চেহারা তার। শরীরের হাড় বেশ চওড়া এবং শক্ত। যথেষ্ট পুরুষালি ভাব রয়েছে তার চেহারায় এবং চালচলনে। চোখের দৃষ্টিতে মেয়েমানুষি লজ্জা বা কমনীয়তা নেই। এতগুলো ছেলেমেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার বুকের আকার প্রকারে কোনও শ্লথ ভাব নেই, মাতৃত্বের আর্ত স্নেহশীলা নম্রভাবও নেই তার মধ্যে। এখনও সে হেঁটে গেলে মনে হয়, এই মেয়েটি কোনও পার্থিব সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। এ একা।

তৃষা বাস্তবিকই তাই। এত সুন্দর লোভনীয় চেহারা থাকা সত্ত্বেও তৃষার দেহের কোনও চাহিদা নেই। কোনওদিনই তার যৌন মিলনের কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। বিয়ের পর সে অত্যন্ত নিরুত্তাপভাবে এবং খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে দৈহিক মিলনটা মেনে নিয়েছিল মাত্র। তবে কোনওদিনই নিজে সাগ্রহে অংশ নেয়নি। কোনওদিন ওতে কোনও তৃপ্তিও বোধ করেনি সে। এ যেন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিদিন ব্যায়াম করার মতোই একটি কর্তব্য-কাজ। কিন্তু মেয়েমানুষের শরীরের যে বিপুল চাহিদা জগতে বিদ্যমান সে সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল টনটনে। তাই কাম সম্পর্কে অতি শীতল মনোভাব সত্ত্বেও এই দেহ সে কাজে লাগিয়েছে কখনও-সখনও। তেমনি মনোভাব নিয়েই সে মল্লিনাথকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। দেহের শীতলতার জন্যই সে দেহের সতীত্ব সম্পর্কে উদাসীন।

মল্লিনাথকে সে তাই বাধা দেয়নি। এমনকী দেহ দিয়ে মল্লিনাথকে খুব বেশি কিছু দেওয়া হয়েছে বলে কখনও ভাবেওনি সে। উপরন্তু তাই সে অবিবাহিত মল্লিনাথকে দিয়েছিল স্নেহ, সেবা ও সঙ্গ। শেষ জীবনটা মল্লিনাথ তার দয়ায় উদ্ভাসিত আনন্দে কাটিয়ে গেছে। মল্লিনাথের বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করতে তাই কোনও সংকোচ নেই তৃষার। সে জানে মল্লিনাথের আপনার জন বলতে ছিল একমাত্র সে-ই। লোভী শকুনরা ছোঁ মারতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু তৃষার অধিকার অনেক বেশি গভীর।

তাই চারদিকে চেয়ে সংসারের সম্পন্ন দৃশ্যগুলি দেখে তৃষা নিশ্চিন্ত থাকে না, তৃপ্তি বোধ করে না। গল্পটা তো অত সরল নয়। কিন্তু লড়াইটা সে খুব উপভোগ করে।

মুরগির ঘর থেকে লক্ষ্মণ ঝিমুনি রোগে ধরা তিনটে লেগহর্ন মুরগি বের করে এনে বলল, এ তিনটের হয়ে গেছে মা, আরও গোটা পাঁচেক কাল-পরশুই যাবে।

তৃষা নিরাসক্ত গলায় বলে, পাঠশালার মাঠে গর্ত খোঁড় গে। আমি যাচ্ছি।

লক্ষ্মণ মুরগি তিনটের পা বেঁধে তৃষার অদূরে উঠোনে ফেলে রেখে শাবল নিয়ে চলে যায়। তৃষা আবার তার হিসেবের খাতায় ঝুঁকে পড়ে। মুরগিগুলো নড়ে না, শুধু বসে বসে ঝিমোয়।

হিসেব শেষ করে উঠে পড়ে তৃষা। কাজের অন্ত নেই। কাজ ছাড়া থাকতে ভালওবাসে না সে। খাতাটা ঘরে রেখে আসতে না আসতেই লক্ষ্মণ এসে পড়ে।

গর্ত হয়ে গেছে, মা। চলুন।

পাঠশালা বলতে আসলে এখন কিছুই নেই। মল্লিনাথ ভাল ভেবে তার জমির মধ্যেই পাঠশালা খুলতে জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছিল। বাঁশের বেড়া আর টিনের চালওলা খানকয়েক ঘরও উঠেছিল এবং জনা বিশ-চল্লিশ পড়ুয়া আর তিন-চারজন মাস্টারমশাইকে নিয়ে একটা পাঠশালা চালুও হয়েছিল। তবে পাঠশালার জমি কতটা হবে তা চিহ্নিত করে রাখেনি মল্লিনাথ, লিখিত কোনও দলিলও ছিল না। তৃষা সাকসেসন পাওয়ার পর পাঠশালার জমি নিয়ে দাঙ্গা লাগার উপক্রম। মাস্টারমশাই বা ছাত্ররা নয়, কোমর বেঁধে বাগড়া দিতে এল স্থানীয় লোকজন। তাদের পান্ডা ছিল অল্পবয়সী এক ছোকরা রাজনৈতিক নেতা। তার তেজ দেখবার মতো। ছোকরা আলটিমেটাম দিয়ে বলল, তিন বিঘে জমি ছেড়ে দিতে হবে। নইলে ও জমি আপনি কোনও কাজে লাগাতে পারবেন না। আদালতের রায় পেলেও না। গণ্ডগোল আরও গাঢ় হয়ে উঠল ক'দিনের মধ্যেই। সমস্ত এলাকার লোক তৃষার বিরুদ্ধে। এমনকী পাঠশালার পাশ দিয়ে বাড়ির লোকের যাতায়াতের পথ একদিন কাঁটাতারের ব্যারিকেড তুলে বন্ধ করে দিল বিরুদ্ধপক্ষ। পুলিশের কাছে গিয়ে কোনও লাভ হয়নি।

এখন এই সকালের রোদে জারুল আর শিমুলের দীর্ঘ ছায়া, লম্বা ঘাসের জমির স্নিগ্ধ শ্যামল গালিচা, ইস্কুল ঘরের নিস্তব্ধতা যে শান্তির ইঙ্গিত দেয় গল্পটা অত সরল নয় মোটেই। দুঃসহ মানসিক জ্বালা, রাগ, বিদ্বেষ, অসহায় অপমান কতদিন ধরে নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল তাকে। সে তবু গোঁ ছাড়েনি, হাল ছাড়েনি, প্রতিপক্ষের কোনও দাবিই মেনে নেয়নি। শুধু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে, বিশ্লেষণ করে মনে মনে স্থির করল, ছোকরা রাজনৈতিক নেতাটিকে হাত করতে পারলেই বোধহয় হবে। সেটাও একটা দুরন্ত ঝুঁকি বটে। জল এত দূর গড়িয়েছিল যে, একজনকে হাত করলেই সেটা মিটবে এমনটা মনে হচ্ছিল না। তবু ঝুঁকি নিয়েছিল তৃষা।

মদন ঠিকাদারই ছিল একমাত্র নিরপেক্ষ লোক। ঝুট-ঝামেলায় নেই, আপনমনে কাজ করে, টাকা কামায়, গম্ভীর, শান্ত, নিরুদ্বেগ মানুষ। হয়তো তৃষাদের প্রতি তার খানিকটা অপ্রকাশ্য সহানুভূতি ছিল। তাকে দিয়েই একদিন ছোকরা নেতা শুভঙ্করকে নেমন্তন্ন করাল তৃষা। পোলাও, মুরগি, পাকা মাছ দিয়ে এলাহি খাওয়া। ছোকরা নির্লজ্জের মতো এল এবং খেল। যাওয়ার সময় যে পাঁচশো টাকা একটা ন্যাকড়ার থলিতে ভরে হাতে দিল তৃষা, তাও নিল নির্বিবাদে, যেন পাওনা টাকা। হাসিমুখে

চলেও গেল। তৃষার মন বলল, চালে ভুল হল না তো? ভুলই হয়েছিল। কারণ গণ্ডগোল মিটল না। কোনও ফয়সালা হল না। সেই ছোকরা সামনা-সামনি আর তড়পাত না বটে, কিন্তু আড়াল থেকে উস্কানি দিত। আবার সে নেমন্তন্ন খেতে এল এবং যাওয়ার সময় বেশ স্পষ্ট গলাতেই বলল, হাজারখানেক দিন। পার্টিফান্ডের জন্য চাইছি। এবার কথা দিচ্ছি, মিটে যাবে।

দাঁতে দাঁত চেপে তাও দিয়েছিল তৃষা। ফলে সামনাসামনি লড়াই বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু জমির গণ্ডগোল মিটল না। শুভঙ্কর অত্যন্ত উগ্র এবং ঘোড়েল। এখানকার সব লোক, মায় পুলিশ পর্যন্ত তাকে ভয় খায়। মাঝে মাঝেই সে আসত এবং নির্লজ্জের মতো টাকা নিত। দিতেও হত তৃষাকে। তবে তৃষা প্রতিটি দেওয়া পয়সার হিসেব রাখত। সুযোগ পেলে সুদে-আসলে উসুল করবে বলে। যারা খুব দাপের সঙ্গে চলে তারা অন্যায় করলেও লোকে কিছু বলতে সাহস পায় না। শুভঙ্কর যা করত অত্যন্ত তেজ ও জোরের সঙ্গে করত। কারও পরোয়া করত না। বেশ বড়সড় অনুকারীদের একটা দল ছিল তার। এ জায়গা শাসন করত তারাই। আশ্চর্যের বিষয়, তৃষার কাছ থেকে শুভঙ্কর যে টাকা নিত তা ঠিকঠাক তার পার্টি ফান্ডেই জমা দিত। এক পয়সাও এদিক ওদিক করত না। চুল থেকে পা পর্যন্ত সে ছিল রাজনীতির মানুষ। তার ব্যক্তিগত কোনও দুর্বলতা আছে কি না তা অনেক খুঁজেছে তৃষা। আর কিছু না হোক কাঁচা বয়সের ছেলেদের মেয়েমানুষ সম্পর্কে কৌতূহল তো থাকেই।

সেবার মাসির বাড়ি এলাহাবাদ থেকে বহুকাল বাদে দু' মাসের জন্য মা-বাবার কাছে এসে ছিল চিত্রলেখা। এমনিতেই চিত্রা দেখতে সুন্দর, তার ওপর মাসির কাছে সে একদম মেমসাহেবি কেতায় থাকে। দিঘল, ফর্সা যৌবনাক্রান্ত ঢলঢলে কিশোরী। বব চুল, দারুণ সব পোশাক, চলাফেরার কায়দাই অন্যরকম। কাউকেই মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না তেমন। সে এই জায়গায় পা দিতেই চারদিকে যেন চাপা শোরগোল পড়ে গেল। শুভঙ্করকে সেই সময় পরপর কয়েকদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াল তৃষা। গেল নদীর ধারে সপরিবারে পিকনিক করতে, সঙ্গে শুভঙ্কর। চিত্রলেখাকে শুভঙ্করের সঙ্গেই একদিন পাঠাল কলকাতা দেখতে। গেঁয়ো জায়গার কাঁচা ছেলের মাথা কাঁহাতক ঠিক থাকে? ততদিনে শুভঙ্কর হয়ে গেছে তৃষার একান্ত বাধ্য, ভীষণ রকমের পোষমানা। সুতরাং নদীর ধারে কাঠা পাঁচেক সস্তা জমি কিনে পাঠশালাকে একটা দানপত্র লিখে দিয়ে তৃষার পক্ষে ঘরের কোণে ঘোগের বাসা তুলে দিতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। পাঠশালা নিয়ে স্বয়ং শুভঙ্কর তখন তৃষার পক্ষে জান দিতে প্রস্তুত। পাঠশালা নদীর ধারে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৃষা জায়গাটা ঘিরে ফেলল দেয়াল দিয়ে। চিত্রলেখা এলাহাবাদে ফিরে যাওয়ার আগে একদিন তৃষাকে বলল, ওই বুদ্ধু ছেলেটার সঙ্গে তোমাদের এত মাখামাখি কেন? তৃষা কিছু বলেনি। চিত্রলেখা এলাহাবাদে ফিরে যাওয়ার পর থেকেই শুভঙ্কর তৃষাকে মা বলে ডাকতে থাকে। রোজ আসত। দেখা করত। এলাহাবাদে চিঠিপত্রও লিখত বলে শুনেছে তৃষা। শুভঙ্করকে আর তেমন খাতির করত না সে, তবে চটাতও না। চিত্রলেখার প্রেমে পড়েই কি না কে জানে, ক্রমে ক্রমে শুভঙ্করের সেই দীপ্ত তেজ আস্তে আস্তে নিভে আসছিল। মাস ছয়েক বাদে আসানসোলে একটা চাকরি পেয়ে সে চলে যায়। এলে তৃষার সঙ্গে দেখা করে যায়, মা বলে এখনও ডাকে। কিন্তু পুরোটাই নখদন্তহীন হয়ে গেছে শুভঙ্কর।

পাঠশালার মাঠের নরম শিশিরে সিক্ত ঘাসের জমিতে পা দিয়ে চারদিকের মনোরম নির্জনতা দেখতে দেখতে তৃষা ভাবে, এতটা সরল নয় এই জমিটুকুর ইতিহাস।

একটা শিমুল গাছের নীচে হাত দেড়েক গভীর গর্তের ধারে তিনটে ঝিম-ধরা মুরগিকে শাবলের ঘায়ে এক এক করে মারল লক্ষ্মণ। এই মুরগি মারার ব্যাপারটা সবসময়ে আজকাল তৃষা নিজেই তদারক করে। এর আগে লক্ষ্মণ বহুবার ঝিমুনি মুরগি নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে এসেছে। লোকে খেয়ে অসুখে পড়লে তৃষার বদনাম হবে।

মুরগি তিনটের মৃতদেহ দূর থেকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখে তৃষা। রক্ত, ছেঁড়া পালক, ঘাড় গোঁজা ওই অসহায় মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তার ভিতরটা একটুও নাড়া খায় না। এইসব দুর্বলতা নেই বলে সে খুশি।

লক্ষ্মণ পা দিয়ে ঠেলে মুরগি তিনটেকে গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দেয়। কবর হয়ে গেল। তৃষা গিয়ে চটি পরা পায়ে আলগা মাটি চেপে দেয় আরও একটু।

এমন সময় লক্ষ্মণ চাপা স্বরে হঠাৎ বলে ওঠে, বাবু ওই আসছে, মা।

তৃষা শুনল কিন্তু পথের দিকে তাকাল না। অন্য বউরা হলে তাকাত। কিন্তু তার আর শ্রীনাথের সম্পর্ক ততটা সরল নেই আর। শ্রীনাথ আসছে আসুক। তাব কী?

সজল দাঁড়িয়ে ছিল পুকুরের ধারে। দু' পকেটে চার-পাঁচটা ডিম। লম্বালম্বি একটা ডিমকে দু' হাতের চাপে কিছুতেই ভাঙা যায় না, বলেছিল ছোটন নন্দী। এখন সে ডিম নিয়ে পরীক্ষাটা করছিল। তার শরীর ভাল নেই। জ্বর থেকে উঠে খুব একটা জোর পাচ্ছে না হাতে-পায়ে। তবু প্রাণপণে ডিমে চাপ দিয়ে দেখছিল, বাস্তবিকই ভাঙে না। ইলিপস্ বা উপবৃত্তে যে-কোনও চাপই কাটাকুটি হয়ে যায়, বিজ্ঞানের বইতে সে এমন কথা পড়েছে। তবু বইতে যা লেখা থাকে তার সবই তো সত্যি না হতে পারে! তাই সে পরীক্ষা করে দেখছিল। আসলে সকালে এক ঝুড়ি ডিম চোখের সামনে দেখলে আজকাল তার ভারী রাগ হয়। এত ডিমের কোনও মানেই হয় না। রোজ সকালে বিকেলে ডিম দেখলে কার না ইচ্ছে করে দু'-চারটে নষ্ট করতে?

ডিমগুলো হাতের চাপে ভাঙল না ঠিকই, তবে সজল একটার পর একটা ডিম বুড়ো একটা মহানিমের গায়ে ছুড়ে মারল। ফনাক করে ফেটে কুসুম আর ক্বাথ গড়িয়ে পড়ছে কাণ্ড বেয়ে। দু'-তিনটে কাক তাই দেখে লাফিয়ে কাছে এসে 'খা খা' করতে থাকে। পুকুরে হাঁসগুলো ভ্যাক ভ্যাক করছিল, তাদের দিকেও একটা ডিম ছুড়ে দিল সে। ডিমটা ভাসল, ডুবল, ভাসল এবং ডুবে গেল।

তারপর হঠাৎই বাবাকে দেখতে পেল। উসকো খুসকো চুল, বাসি দাড়ি, তুসের চাদর গায়ে বাবা বাড়ির ভিতরে ঢুকছে। সজল চট করে সরে আসে একটা গাছের আড়ালে। সাবধানে দেখে। কিছুই দেখার নেই অবশ্য। বাবা বাড়ি ফিরছে, এইমাত্র ঘটনা। এত বেলায় যখন ফিরল, তখন আজ আর অফিসে যাবে না। তার মানে সারাদিনের মতো একটা দুশ্চিন্তা, ভয় আর অস্বস্তি থাকবে সজলের। তাকে বাবা দু' চোখে দেখতে পারে না।

ঘুরতে ঘুরতে সজল খ্যাপা নিতাইয়ের ঘরে এসে হানা দেয়। নিতাই নেই। ইস্পাতকে নিয়ে কোথায় গেছে। ঘরের দরজা হাঁ হাঁ করছে খোলা। চুরি যাওয়ার মতো কিছুই নিতাইয়ের নেই। তবু অনেক কিছু আছে। বাঁশের মাচানে একটা কম্বলের বিছানায় সে শোয়। মাথার কাছে একটা কুলুঙ্গিতে কালীমূর্তি তেল-সিঁদুরে বীভৎস নোংরা হয়ে আছে। মেঝের এক ধারে পঞ্চমুন্ডির আসন। সামনে মাটিতে একটা চক্র আঁকা। নিতাই কামারের তৈরি কাঠের বাঁটওলা পাকা লোহার কয়েকটা ছুরি পড়ে আছে পাশে। নিতাই রোজ রাতে বিভিন্ন লোককে বাণ মারে। সবচেয়ে বেশি মারে তার বউ পুতুলরাণীকে উদ্দেশ্য করে।

এ সবই সজল জানে। নিতাই একদিন তাকে খুব গুমোর করে বলেছিল, তোমার যদি কাউকে বাণ মারার থাকে তো আমায় বোলো। মেরে দেব।

সজল সঙ্গে সঙ্গে আলটপকা বলে ফেলেছিল, আছে। মারবে?

বলো। ঠিক মেরে দেব। লোকটা কে?

লোভী মুখে সজল বলেছিল, বাবা।

শুনে নিতাই খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, ছিঃ ছিঃ। দাঁড়াও. বাবাকে বলে দেব।

তখন খুব নিতাইয়ের হাতে-পায়ে ধরেছিল সজল।

এখন নিতাইয়ের ঝোপড়ায় সে একা পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে ছুরি ক'টা হাতে তুলে নেয় এবং মন দিয়ে ছকটা দেখতে থাকে। মংলু, লক্ষ্মণ, বামুনদি, বৃন্দা সকলেরই বিশ্বাস খ্যাপা নিতাই মারণ উচাটন বশীকরণ জানে। আবার মদনকাকা বলে, ওটা একটা ফ্রড। পাঠশালা নিয়ে গণ্ডগোলের সময় খ্যাপা নিতাইয়ের কুকুর ইস্পাত একটা ছেলেকে কামড়ে দিয়েছিল। কোথায় তার জন্য ক্ষমা চাইবে, বরং উলটে সেই ছেলেটার ওপর গিয়ে তম্বি করে এল। ফলে শুভঙ্করদা খুব মেরেছিল নিতাইকে। তারপর সেই রাতেই খ্যাপা নিতাই শুভঙ্করদাকে বশীকরণ বাণ মারে। বাণের গুণ কিছু আছেই। নইলে তারপর থেকেই শুভঙ্করদা ওরকম অন্য মানুষ হয়ে গেল কেন?

বাণ মারা না জানলেও সজল আপনমনে ছুরিগুলো ছকটার মধ্যে সজোরে ছুড়ে ছুড়ে গাঁথতে লাগল। আপনমনে বলতে লাগল, মর, মর, এ বাড়ির সবাই মরে যা।

দূর থেকে খুব চেঁচিয়ে ভীষণ রাগের গলায় বাবা ডাকছে, সজল! এই সজল!

সজল নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। এ ডাককে অগ্রাহ্য করতে খুব একটা সাহস পায় না সে। ইচ্ছে করছিল দৌড়ে পালিয়ে যেতে। কিন্তু এখন এই দুর্বল বুকে অতটা দম নেই।

সে একটা ছুরি প্যান্টের পকেটে নিয়ে উঠে পড়ে।

বেরিয়ে দূর থেকেই দেখতে পায়, বাবা ভাবন-ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। গালে দাড়ি কামানোর সাবানের ফেনা, হাতে খোলা জার্মান ক্ষুর। দৃশ্যটা দেখেই সে বুঝতে পারে, কেন তাকে এই তলব।

জড়ানো পায়ে ধীরে ধীরে কাছে যেতেই শ্রীনাথ গলা ফাটিয়ে বলে ওঠে, কে আমার ঘরে ঢুকেছিল?

সজল জবাব দিতে পারে না। বুক ধুকপুক করছে।

কে আমার ক্ষুরে হাত দিয়েছিল?

সজল চুপ করে থাকে। মিথ্যে কথা বলতে পারে বটে, কিন্তু ওই বিকট রাগের মুখে সেটুকুও সাহস হয় না।

বলো, কে হাত দিয়েছিল?

আমি জানি না।—কোনওরকমে বলল সজল।

জানো না! জানো না!—বলতে বলতে শ্রীনাথ বারান্দা থেকে দু' ধাপ সিঁড়ি নেমে এসে প্রকাণ্ড একটা চড় আকাশ সমান তুলল।

উঠোনের দিক থেকে মা আসছে, টের পাচ্ছিল সজল। চড়টা পড়ার আগেই তৃষা একটু তফাত থেকে চেঁচিয়ে বলল, খবরদার! রোগা ছেলেটাকে মারবে না।

চড়টা পড়ল না। কেমন একটু নিভে গেল শ্রীনাথ। কোনও জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে গেল ঘরে। তৃষা কলাঝোপ পর্যন্ত এসেছিল। তারপর আর এগিয়ে এল না।

সজল মার খেল না। বুঝতে পারল, মা-বাবার মধ্যে আবার একটা ঘোরালো ঝড় পাকিয়ে উঠছে বোধহয়। যদি কিছু হয় তবে সজল বাবাকে ছাড়বে না। যতই ভয় পাক সে, একদিন কিন্তু ঠিক প্রতিশোধ নিয়ে নেবে।

বাবা ঘরে গেল। মাও ফিরে গেল উঠোনে। একা সজল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীরে ভয়ের কাঁপুনি টের পেতে লাগল।

ভাবন-ঘর সম্পর্কে তার অগাধ কৌতূহল। ঘরে বই আছে, পুরনো দেরাজে আছে অনেক টুকিটাকি জিনিস, আছে ভাঙা দূরবিন, একটা বহু পুরনো ইঞ্জিনিয়ারিং টুল বক্স, আছে জমি-জরিপের যন্ত্রপাতি, মাপজোখ করার জন্য গোল চামড়ার খাপে ইস্পাতের লম্বা ফিতে, লোহা কাটার করাত, বৈদ্যুতিক তুরপুন, আরও কত কী। বেশিরভাগই জেঠুর জিনিস, এখন আর কেউ ব্যবহার করে না।

শ্রীনাথের শাসনের ভয় সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সে চুরি করে ঢোকে সেই ঘরে। জিনিসপত্র

নাড়াচাড়া করে। করাত দিয়ে লোহা কাটে, ডেসকের পায়া কাটে। জরিপের যন্ত্রপাতি বের করে বাগানটা মাপবার চেষ্টা করে। কাল সন্ধের কিছু আগে সে ঘরে ঢুকে বাবার ক্ষুর দিয়ে হাতের নরম লোম চেঁচেছিল। তারপর ধার পরীক্ষা করতে কয়েকটা ফুল গাছের ডাল কেটে দেখেছিল। গাছের কষে ক্ষুরটায় ছোপ ধরতেই সে ধার দেওয়ার চামড়ার টুকরোয় অনেকক্ষণ ঘষেছিল বটে, কিন্তু দাগ ওঠেনি।

এ বাড়ির মধ্যে ভাবন-ঘরটাই তার সবচেয়ে প্রিয়। পুরনো জিনিস তো আছেই। তা ছাড়া চারদিকে নিবিড় সবুজ গাছপালার ঘেরাটোপের মধ্যে নিঃঝুম ঠান্ডা ঘরখানি। ভারী খোলামেলা। সারাদিন পাখির ডাক ঝরে পড়ে, সারাদিন নিবিড় হাওয়া খেলা করে, খুব স্পষ্ট শোনা যায় ট্রেনের আওয়াজ।

একদিন সে এই ঘরখানা দখল করে থাকবে।

মনে মনে সে জানে, বাবা এই সংসারে বেশিদিন থাকতে পারবে না। এসব জিনিসপত্র, বাড়িঘর সব মায়ের। বাবা বসে বসে খায়। বাবাকে দু' চোখে দেখতে পারে না মা। আর মা যা চায় তাই হয়। মা বাবাকে ইচ্ছে করলেই বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে। দেবেও একদিন। মাকে সে বাবার অনেক খবর দেয়, যাতে মা চটে যায় লোকটার ওপর। অনেক কথা সে বানিয়েও বলে। মা সব কথা বিশ্বাস করে না, কখনও চুকলির জন্য বকে, কিন্তু তবু বাবার ওপর মা চটেও যায় ঠিকই।

সজল এসে পুকুরের ধারে দাঁড়ায়। কালো গভীর জলের দিকে চেয়ে থাকে। হাঁসগুলো উঠে গেছে। জল এখন নিথর। ভারী ভাল লাগে এই পুকুরের ধারটা। চারদিকে ঝোপঝাড়ে একটা বুনো গন্ধ উঠছে রোদের তাপে। এই পুকুরটার ধারে এসে দাঁড়ালে তার মনে হয়, কেউ তাকে ডাকছে, টানছে। নইলে আর কারও টান সে কখনও টের পায় না।

বাবা মা দিদিরা কাউকেই তেমন গভীরভাবে ভালবাসে না সে। মাকে একটু। আর কাউকে একবিন্দুও নয়। সবচেয়ে দূর আর পর হল বাবা।

বাবা? সজল মুখ টিপে আপনমনে হাসে। সে শুনেছে শ্রীনাথ তার বাবাও নয়। তার আসল বাবা হল জেঠু।

জেঠুই বাবা? ভাবতে একরকম রোমহর্ষ আর আনন্দ হয় তার। লম্বা চওড়া হুল্লোড়বাজ ওই লোকটার কথা মনে হলেই তার ভাল লাগে।

হে ভগবান, জেঠুই যেন তার আসল বাবা হয়।

॥ ছয় ॥

মালদা থেকে গভীর রাতে দার্জিলিং মেল ধরল সরিৎ। ট্রেনে অসম্ভব ভিড়। এই শীতে সাধারণত ভিড় এত হয় না কলকাতা-যাত্রীদের। তার কপালে হল। টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠবার অভ্যাস বহুকাল হল তার নেই। দরকারও হয় না। সব লাইনেই আজকাল রেলের রানিং স্টাফ একটা প্যারালেল ব্যবস্থা চালু রেখেছে। সেকেন্ড ক্লাস টিকিটের প্রায় অর্ধেক খরচে দিব্যি যাতায়াত করা যায়। মালদার রেলের লোকেরা প্রায় সবাই সরিতের চেনা বা মুখচেনা। স্টেশনের চ্যাটার্জিদাকে ধরতেই রেটটা আরও কিছু কমে গেল। চ্যাটার্জিদা বললেন, থ্রি টায়ারে উঠে কন্ডাক্টর গার্ডকে দুটো টাকা দিয়ো, আরামে শুয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু সরিতের কাছে দুটো টাকাও অনেক টাকা। দু' প্যাকেট চারমিনার আর দেশলাই হয়েও বেশি থাকবে। ফালতু ঘুমোনোর জন্য উঠতে হল। পাঁচ-সাতজন বন্ধু তুলে দিতে এসেছিল স্টেশনে। তারাও বলল, ওঠ।

কন্ডাক্টর লোকটা মহা ফ্যাচালে পার্টির। কেবল খ্যাচ খ্যাচ করে যাচ্ছিল, নেমে যান, নেমে যান। আজ কোনও অ্যাকোমোডেশন নেই।

বলে লোকটা মালদা স্টেশনেই জি আর পি ডেকে আনল। মহা ঝামেলা!

সরিৎ বেগতিক দেখে নেমে পড়েছিল। পিছন দিকে একটা মিলিটারি কামরা মোটামুটি ফাঁকা এবং দরজা খোলা দেখে আরও দশ-বারোজন যাত্রীর সঙ্গে সেটাতে উঠে পড়ে সরিৎ। ঘুমন্ত আধ-ঘুমন্ত মিলিটারিরা প্রথমে কিছু বলেনি। তারপরই হঠাৎ দশ-বারোটা কালো কালো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা জওয়ান তেড়ে এসে হুমহাম করে ভারতের অচেনা কোনও ভাষায় প্রচণ্ড ধমক চমক দিতে লাগল। ধমক শুনে ভয় খেলেও ট্রেন ছাড়ার সেই শেষ মুহূর্তে কারও নামবার ইচ্ছে ছিল না। তখনই হঠাৎ বিনা নোটিশে মিলিটারিগুলো কিল চড় আর লাথি চালাতে শুরু করে। কে মার খেল আর কে খেল না তা দেখার জন্য দাঁড়ায়নি সরিৎ। মালদা শহরে সে মস্তানি করে বেড়ায় বটে, কিন্তু মিলিটারি কামরায় হুজ্জতি করলে যে জল কত দূর গড়াবে তার ঠিক নেই বলে ঝট করে নেমে পড়ল। কিন্তু অপমানটা পুরো এড়াতে পারল না। নামবাব মুহূর্তে পাছায় একটা কেডস পরা পায়ের প্রবল লাথি হজম করতে হল।

বন্ধুরা দৃশ্যটা হয়তো দেখেনি, এই যা ভরসা। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে, সরিৎ দৌড়ে গিয়ে ফের থ্রি টায়ারে উঠে পড়ল। আবার কন্ডাক্টরের খ্যাচ খ্যাচ, ভীতি প্রদর্শন এবং যাত্রীদের দিক থেকেও প্রবল প্রতিবাদ।

সরিৎ জানে, বোবার শত্রু নেই। তাই চুপ করে কিটব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজা ঘেঁষে। কন্ডাক্টরকে দুটো টাকাই দিতে হবে, না কি কিছু কম-সম দিলেও হবে তা বুঝতে পারছিল না। দু'জন আর্মড পুলিশও কামবা পাহারা দেওয়ার জন্য উঠেছে। ডাকাত উঠলে আটকাবে। তবে তারা সরিৎকে কিছু বলল না। আরও জনা তিন-চার সরিতের মতোই ফালতু যাত্রী বাথরুমের গলিতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কন্ডাক্টর অবশ্য আর বেশি খ্যাচ খ্যাচ করল না। খানিক বাদে যাত্রীরা যে যার ঘুমিয়ে পডলে দরজার প্যাসেজে দাঁড়িয়ে একটা কাগজের দিকে খুব আনমনে চেয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, কোথায় যাবেন?

সরিৎ পকেট থেকে একটা আধুলি বের করল। কন্ডাক্টর আড়চোখে আধুলিটা দেখে বলল, ওতে হবে না। এক টাকা।

সরিৎ পয়সা বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে বলল, জায়গা করে দিতে পারলে দু' টাকা দিতাম। জায়গা তো নেই, মেঝেয় বসে যাব না হয়।

আবার খ্যাচ খ্যাচ। তবে কন্ডাক্টর তার নিজের বরাদ্দ লম্বা বেঞ্চটায় সিপাইদের পাশাপাশি সব ক'জন ফালতু যাত্রীর বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে এক টাকা করেই নিল। কিছুক্ষণ বাদে সিগারেট-টিগারেট দেওয়া-নেওয়া এবং গল্পসল্পও হতে লাগল।

সরিৎ অবশ্য বুড়ো কন্ডাক্টর বা বয়স্ক যাত্রীদের সঙ্গে জমাল না। একা বসে চোখ বুজে রইল, ঘুম আসবে না জানা কথা। মিলিটারির লাথিটা মাজায় জমে টনটন করছে। ফালতু ঝামেলা যত সব। ভাবতে গেলে অপমানে গায়ের ভিতরে জ্বালা ধরে যায়। তবু এত অপমান-অনাদরের পরেও যে বসার জায়গা পেয়েছে সেটাই একমাত্র তৃপ্তি।

সেজদি এতকাল তাদের বিশেষ পাত্তা দেয়নি। পয়সা হলে কে কাকে পাত্তা দেয়? সেজদি অবশ্য উলটো কথা বলে। তার যখন পয়সা ছিল না তখন নাকি বাপের বাড়ির লোকেরাই তাকে তেমন পাত্তা দিত না। সংসারের এইসব কূটকচালে ব্যাপার অবশ্য সরিৎ অত তলিয়ে বোঝে না। এতকাল পরে সেজদি যে তার বেকার ছোট ভাইকে ডেকে পাঠিয়েছে সেইটেই ঢের। সেজদির গোরু চরাতেও সে রাজি আছে, পয়সা পেলে। তারপর কলকাতায় একটা কিছু জুটে যাবে ঠিকই। কলকাতা তো আর মালদা নয়।

বড়দা মালদার সিভিল হাসপাতালের ডাক্তার। কান, নাক আর গলার স্পেশালিস্ট। কিন্তু ই এন টি-র ডাক্তারের তেমন প্রাইভেট প্র্যাকটিস থাকে না। বড়দারও নেই। তার ওপর লোকটা ঘরকুনো এবং ব্রিজ খেলার পাগল। যেখানেই বদলি হয়ে যায় সেখানেই ঠিক তার ব্রিজের বন্ধু জুটে যাবেই। ওই খেলাই বড়দার কাল হয়েছে। ডাক্তারির ব্যাপারটাকে আদৌ গুরুত্ব না দিতে দিতে রুগিদের কাছে এখন আর তার আদর নেই। পসার না থাকায় বাঁধা মাইনেয় সংসার চালাতে হয়। মধ্যপ্রদেশে মেজদার কাছে মা বাবা থাকে, সরিৎ আর তার ছোড়দি পড়ে আছে বড়দার ঘাড়ে। বউদি প্রথম-প্রথম খারাপ ব্যবহার করত না। ছোড়দি এই সংসারে রান্নাবান্না থেকে যাবতীয় কাজ বুক দিয়ে করে। তবু ইদানীং বউদি বস্তিবাড়ির মেয়েদের মতো জঘন্য সব গালাগাল দিয়ে ছোড়দির ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছে। মুশকিল হল, ছোড়দিটার বিয়ে হওয়ার চান্স খুব কম। ওর কী একটা মেয়েলি রোগ থাকায় ডাক্তার বিয়ে দিতে বারণ করেছে। তবু হয়ে যেত হয়তো, কিন্তু ছোড়দি দেখতে খুব খারাপ। রোগা, কালো, তার ওপর মুখটা এমন ভাঙাচোরা যে, বুড়ির মতো দেখায়। সুতরাং ছোড়দির আর গতি নেই বড়দার আশ্রয় ছাড়া। সেইটে সার বুঝে বড় বউদি ছোড়দির ওপর সাত জন্মের শোধ তুলে নিচ্ছে। নিক, তাতে সরিতের তেমন আপত্তি নেই। ছোড়দিও বড় কম যায় না, যখন মুখ ছোটায় তখন দিনকে রাত করে দিতে পারে। কিন্তু সরিতের বিপদ নিজেকে নিয়ে। বি এস-সি পাশ করে বহুদিন বসে আছে। বয়স ছাব্বিশের কাছাকাছি। বড়দা-বউদি খাওয়াচ্ছে বটে, কিন্তু খুশিমনে নয়। সরিৎ সংসারে বাজার হাট করা থেকে জল তোলা পর্যন্ত সবই করে দেয়, তবু হাতখরচ চালাতে তিন-চারটে টিউশানি করতে হয় তাকে। বড়দা খাওয়া ছাড়া আর কিছু দেয় না। ইচ্ছে থাকলেও বউদির জন্য দেওয়া সম্ভব নয়।

বেকার জীবনের একটা শূন্যতা আছে। সর্বদাই একটা খাঁ-খাঁ করা ভাব বুকের মধ্যে। মনে হয়, ভিতরের অনেক আগুন কাজে না লেগে আস্তে আস্তে নিভে আসছে। চাকরির জন্য সরিৎ পলিটিক্স করেছে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো থেকে শুরু করে নানাবিধ পোস্টাল ট্রেনিং নিয়েছে, শর্টহ্যান্ড আর টাইপ শিখে রেখেছে। কিছুতেই কিছু হয়নি। সরকারি চাকরির বয়স পার হতে চলল। এখন কেমন যেন একটা নেতিয়ে পড়া ভাব, 'কিছু হবে না' গোছের একটা ধারণার কাছে আত্মসমর্পণের ঝোঁক এসেছে। শুনেছিল তার গরিব সেজদির অনেক টাকা হয়েছে, ভাসুরের সম্পত্তি পেয়েছে বিস্তর, তাছাড়া নগদ টাকাও। কিন্তু তখন তার কাছে যাওয়া বা তার সাহায্য চাওয়াটা ভারী লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ সম্পত্তি পাওয়ার কিছুকাল আগেই সেজো জামাইবাবুর প্লুরিসির চিকিৎসার জন্য ভাইদের কাছে কিছু টাকা হাওলাত চেয়েছিল সেজদি। কেউই টাকাটা দেয়নি। ঘরের ঘটিবাটি গয়না বিক্রি করে সেজদিকে সে যাত্রা সামাল দিতে হয়। অভাবের সংসার থেকে বড় মেয়ে চিত্রাকে পাচার করতে হয়েছিল সেজদিকে মেজদির কাছে, এলাহাবাদে। তখন সেজদিকে সবাই সাহায্য করার ভয়ে এড়িয়ে চলত। সেই সেজদি হঠাৎ বড়লোক হওয়ার পর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে যাওয়াটা কি লজ্জার নয়?

বহুকাল বাদে সেজদি হঠাৎ একটা চিঠিতে সরিৎকে তার কাছে যেতে লিখেছে। সরিৎ বড়দার সংসার থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। সেজদির কাছেও হয়তো তেমন আদর হবে না। না হোক। আদর ভালবাসা কেমন তা ভুলেই গেছে সরিৎ। মধ্যপ্রদেশে মেজদার কাছেও আর আশ্রয় নেই। মেজদা একটা খনিতে কাজ করে। সামান্যই পায়। মা বাবা তার ঘাড়ে থাকায় সে আর কোনও দায়িত্ব নিতে নারাজ। বড়দি কেরানির ঘর করে নিউ কুচবিহারে। কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। মেজদি অবশ্য বড়লোক। কিন্তু বাপের বাড়ির সঙ্গে তারও বিশেষ সম্পর্ক নেই। মেজদিকে ভাল করে চোখেই দেখেনি সরিৎ। বড়লোক বলে ভয়ও পায়। সরিতের কাছে সব দরজাই বন্ধ ছিল। এখন হঠাৎ সেজদির দরজাটা খুলেছে। আদরের কথা সে আর ভাবে না, শুধু একটা আশ্রয়ের কথা ভাবে।

গাড়ি ফরাক্কা ব্যারেজ পার হচ্ছে গুমগুম শব্দ করে। প্রচণ্ড শীত। মাফলারের অভাবে সরিৎ রুমালটা দু' ভাঁজ করে কান ঢেকে কপালে গেরো দিয়ে বসল। পুরনো পুলওভারে শীত মানতে চায় না। হাত-পা অবশ-করা শীত থেকে পরিত্রাণ পেতে সে অনেক হিসেব করে একটা সিগারেট ধরাল। টাকার অভাব তো অনেক বড় জিনিস, তার চেয়েও ছোট জিনিস আধুলিটা সিকিটা নিয়ে সরিৎকে অনবরত মাথা ঘামাতে হয়। ছোট জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে ভিতরের মানুষটাও কি ছোট হয়ে যায় না?

বাঁপাশে দুটো পুলিশ, ডানধারে ফালতু যাত্রীরা। যাত্রীদের মধ্যে ঠিক পাশে বসা লোকটাকে সরিৎ মালদার বাজার-হাটে দেখেছে। সঠিক পরিচয় না জানলেও মুখচেনা। লোকটা হঠাৎ বলল, আপনি ডাক্তারবাবুর ভাই না?

হুঁ।—গম্ভীর গলায় আওয়াজ দেয় সরিৎ।

কলকাতায় যাচ্ছেন কি ইন্টারভিউ দিতে নাকি?

না। দিদির বাড়ি বেড়াতে।

অ। মলিনকে চেনেন? মলিন সাহা?

মলিনকে চেনে সরিৎ। তারই বয়সি ছেলে। খুব ফাঁটে একটা স্কুটার হাঁকিয়ে বেড়ায়, পরনে সবসময়ে দারুণ সব জামা প্যান্ট। শুনেছে বড়লোকের ছেলে। মলিনের বোন মলিনা বিখ্যাত সুন্দরী। তার জন্য কলেজের পথে বিস্তর ছেলে লাইন দেয়। সরিৎ দিয়েছে। সরিৎ বলল, চিনি। কেন বলুন তো!

আমি মলিনের বাবা।

শুনে সিগারেটটা ফেলে দেওয়া উচিত হবে কি না ভাবছিল সরিৎ। ভারী অবাকও হচ্ছিল সে। মলিনের বাপ বলে লোকটাকে বিশ্বাসই হয় না। কালো একটা তুসের চাদর আর মাফলার জড়িয়ে দীনহীনের মতো বসে আছে। কিন্তু দীনেন সাহা যে ডাকের বড়লোক, এ সবাই জানে। লোকটা মালদায় স্থায়ীভাবে থাকে না। থাকলে চিনতে পারত সরিৎ। শুনেছে, লোকটার চারটে মিনিবাস চালসা, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলে চালু আছে। আর আছে হরিশ্চন্দ্রপুরে আমবাগান, শিলিগুড়িতে ঠিকাদারি। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক দীনেন সাহা বিনা টিকিটে এইভাবে যাচ্ছে দেখে ভারী অবাক হল সে।

সরিৎ ভেবেচিন্তে সিগারেটটা হাতের আড়াল করেই ফেলল। উঠে বাথরুমে গিয়ে খেয়ে আসবে।

দীনেন সাহা কিন্তু নিজেই পকেট থেকে বিড়ি বের করে বলল, আপনার ম্যাচিসটা একটু দিন তো।

দেশলাইটা দিতে পেরে আর সংকোচ রইল না সরিতের। মুখটা একটু নিচু করে সিগারেটে আর-একটা টান দিল।

দীনেন সাহা ম্যাচটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ট্রেন লেট আছে।

হুঁ।—আওয়াজ দেয় সরিৎ। মনে মনে বলে, হাঁ রে শালা শ্বশুর, লেট আছে।

খুব বিষয়ী চোখে সরিৎকে আর-একবার দেখে নিয়ে দীনেন সাহা বলল, রেলগাড়ির যা অবস্থা হয়েছে আজকাল, বলার নয়। গত দশ বছর আমি টিকিট কেটে কোথাও যাইনি। ব্যবস্থা যখন আছে, টিকিট কেটে যাবই বা কেন? যাদের ফালতু পয়সা আছে তারা যাক।

সরিৎ সিগারেটটা শেষ করে বাঁচল। লোকটা যদি সত্যিই কোনওদিন তার শ্বশুর হয়?

দীনেন সাহা জিজ্ঞেস করে, আপনি চাকরি-বাকরি করেন নাকি?

না। চেষ্টা করছি।

মলিনটার তো কাজকারবারে মন নেই। খুব বাবুগিরির দিকে নজর।

সরিৎ একটু হাসে মাত্র। মনে মনে বলে, আমাকে জামাই করলে তোমার কাজকারবারে বিনে মাইনেয় খাটব, বুঝলে হে শ্বশুরমশাই?

দিদির বাড়ি কলকাতার কোথায়?—দীনেন জিজ্ঞেস করে।

কলকাতায় ঠিক নয়। কাছেই রতনপুর নামে একটা জায়গা। হাওড়া থেকে যেতে হয়।

অ। তা হলে আপনি বর্ধমান নেমে হাওড়ার লোকাল ধরবেন তো? আমিও তাই। আমি যাব দাশপুরে। জামাইবাবু কী করে?

চাকরি।

সংক্ষেপে জবাব দেয় সরিৎ। খামোখা ভ্যাজর ভ্যাজর করতে ভাল লাগে না। বয়স্ক লোকরা বড় বেশি হাঁড়ির খবর নেয়। তবু এ লোকটা মলিনার বাবা বলেই জবাব দিয়ে যাচ্ছে সরিৎ।

দীনেন সাহা বলে, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো হয়েছে ত্যাঁদড়। কথাবার্তা শুনতে চায় না। দাশপুরে গিয়ে মালটা নিয়ে আসতে বাবুর কোনও অসুবিধেই ছিল না। তা বলে কী জানেন? ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া চাই, আর কলকাতায় সাতদিন থাকার জন্য পাঁচশো টাকা হাতখরচা। শুনেছেন কখনও এমন তাজ্জব কথা! এই তো আমি ছ' টাকায় ম্যানেজ করছি। শীল লেনে বোনের বাড়িতে থাকব। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশি খরচ নয়। মলিনের সঙ্গে দেখা হলে ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন তো, এভাবে চললে দুর্দিনের বাজারে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

সরিৎ ঢুলছিল। তবু মনে মনে বলল, তোমার টাকায় মলিন একদিন পেচ্ছাপ করবে, শ্বশুরমশাই। তার চেয়ে আমাকে জামাই করো, সব দেখেশুনে রাখব। আজ মেলা বোকো না আর। গুড নাইট ফাদার-ইন-ল।

স্টেশন থেকে রতনপুর আধ মাইলের ওপর রাস্তা। রিকশা যায়। কিন্তু সরিৎ রিকশার কথা ভাবতেও পারে না।

স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করে রাস্তাটা বুঝে নিয়ে হাঁটা দিল। মনের মধ্যে নানারকম হচ্ছে। সেজদি কেন ডেকে পাঠিয়েছে, কেমন ব্যবহার পাবে, আশেপাশে ফুটফুটে মেয়েরা আছে কি না, চাকরির সুবিধে হবে কি না, দিদিরা কতটা বড়লোক এইসব ভাবছিল।

রাস্তা ফুরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে। বিশাল বাগান আর গাছে ঘেরা বাড়ির ফটকে ঢুকতেই খাউ খাউ করে তেড়ে এল একটা কুকুর। কুকুরের পিছনেই এক কাপালিক।

ভয় পেয়ে সরিৎ ফটকের বাইরে ফিরে এল আবার। গেটটা চেপে ধরল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে।

কাপালিকটা বলল, কাকে চাই?

শ্রীনাথ ব্যানার্জি।

এই বাড়ি। সোজা ভিতরে ঢুকে যান। কুকুর কিছু বলবে না।

খুব ভয়ে ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, অনিশ্চয় এক মন নিয়ে সেজদির বাড়ির সীমানায় ঢুকল সরিৎ।

মুড়ি চিবোতে একদম উদাস লাগছে নিতাইয়ের। রোজ মুড়ি কি ভাল লাগে?

যতদিন জ্ঞান হয়েছে ততদিন থেকে এই এক মুড়িই দেখে আসছে সে। শুকনো খাও, ভিজিয়ে খাও। তরকারি বা তেল মেখে খাও। তাও যে বরাবর জুটেছে ঠিকঠাক তাও নয়। প্রায়ই তার মুড়িটায় ভাতটায় টান পড়েছে। টান পড়লেই আদর বাড়ে। দু'দিন ফাঁক গেল তো তিনদিনের দিন এক কোঁচড় মুড়ি পেলে মনে হয়, এর কাছে অমৃত কোথায় লাগে!

আজ তবু মুড়ি বড় উদাস লাগে।

নিতাইয়ের মন ভাল নেই। অমল নন্দী গুসকরায় তার শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরে এসে কালই খবর

দিয়েছে পুতুলরাণী ইয়া মোটাসোটা হয়েছে। দুটো ছেলেপুলের মা। অমল নন্দী নিতাইয়ের কথা তুলেছিল। তাতে নাকি পুতুলরাণী বলেছে, ওটা তো বদ্ধ উন্মাদ।

সে কারণে নয়। আসলে মন খারাপ তার বাণ বশীকরণে, মারণ উচাটনে কাজ হচ্ছে না বলে। প্রতিদিন যাকে মোক্ষম মোক্ষম বাণ মারা হচ্ছে সে মোটা হয় কী করে?

যে তান্ত্রিকটা শিখিয়েছিল সেটা আসলে চারশো বিশ। সব কিছুতেই যখন ভেজাল তখন তান্ত্রিকই বা ভেজাল হবে না কেন?

আজ সকাল থেকে নিতাই ভাবছে, হিমালয়ে চলে যাবে। সেখানে পাহাড়ে কন্দরে খুঁজে আসল সিদ্ধাই কাউকে খুঁজে বের করবে। যদি আসল লোককে পেয়ে যায় তবে আর ফিরবে না নিতাই। যেমন তেমন করে হোক পুতুলরাণীর গলা দিয়ে রক্ত তুলতেই হবে।

পালপাড়ার সদর রাস্তার ধারে বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে রঘু কর্মকার। শালারা দুনিয়াটাই শান বাঁধিয়ে ফেলছে আস্তে আস্তে। একদিন কি লোকে ঘরের মধ্যেই হালচাষ করবে বাবা? না হলে জমিই বা পাবে কোথায়?

রঘু হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখছে। নতুন বাড়ির লাগোয়া তার পুরনো টিনের ঘর। রঘুর মেয়ে এসে বাপকে এক কাপ চা দিয়ে গেল। রঘু রোদে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে।

নিতাইয়ের এখন একটু চা-তেষ্টা পেয়েছে ঠিকই। সে দাঁড়িয়ে গেল। ইস্পাত একটু এগিয়ে রঘুর দিকে মুখ তুলে ধমকচমক করছে। কুকুরটা লোক চেনে। সোনা চুরি করে রঘুর পয়সা হয়েছে, এ কে না জানে!

নিতাই বলল, চা খাচ্ছ নাকি রঘুবাবু? বাড়িটা তো খুব সুন্দর হচ্ছে গো। তা তোমার বুদ্ধির বলিহারি যাই, পশ্চিমমুখো সদর করে কেউ? এ বাড়ি যে গরম হবে খুব।

রঘু ফিরে দেখে বলল, তাই নাকি? তবে তো বড় ভুল হয়েছে রে সম্বন্ধীর পুত!

তা একটু হয়েছে। অত গরম চা খেয়ো না। ফুঁইয়ে ঠান্ডা করে খাও। বেশি গরম খেলে পেটে ক্যানসার হয়।

বলে নিতাই ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখে। বলে, তিনতলার ভিত গেঁথেছ মনে হয়।

তাতেও কোনও ভুল হল নাকি?

না, ভাবছি রঘু স্যাকরার কত পয়সা হয়েছে।

রঘু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার আবার পয়সা! আর পয়সাটাই সব রে, নিতাই? তোর মতো মারণ উচাটন শিখতে পারলে কত কাজের কাজ হত! তা শুনলাম তোর বউটা এখনও নাকি মরেনি?

নিতাই মৃদু হেসে বলে, আস্তে আস্তে মরবে। ভুগে ভুগে। পট করে মরে গেলে কর্মফল ভোগ হবে কী করে বলো!

তা বটে। তবে আমি বলি কী, তুই একদিন গুসকরায় গিয়ে সামনাসামনি বাণ মেরে আয় না। তাতে অনেক কাজ হবে।

ও বাবা! পুলিশে ধরবে না? ফাঁসি হয়ে যাবে।

তখন পুলিশ বশীকরণ করবি।

ইয়ারকি হচ্ছে?

রঘুর বউ বেরিয়ে এসে উঁকি দিয়ে দেখে বলল, এই সাত-সকালে খ্যাপাকে রাগাচ্ছ কেন? কু-বাক্যি বলবে যে নামতা পড়ার মতো!

রঘু বউকে বলে, কু-বাক্যি না বলছে কে? তোমারটা তো পুরনো হয়ে গেছে, এর কাছে একটা নতুন রকম শুনি না হয়।

আহা, আমার কথা আলাদা। আমি ঘরের লোক বলি সে একরকম। তা বলে নিতাই বলবে কেন?

রঘু খুব ভাবুকের মতো বলে, কু-বাক্যি শোনা কিছু খারাপ নয়। তাতে মন মেজাজ পরিষ্কার হয়ে যায়, মনের ময়লা কেটে যায়, শরীরটাও চনমনে হয়ে ওঠে। বলরে, নিতাই!

জিভ কেটে রঘুর বউ ঘরে ঢুকে যায়।

নিতাই এখন সেয়ানা হয়েছে। কোমরে হাত দিয়ে রঘুকে বলে, আমাকে দিয়ে মেহনত করাবে তো বাপ! তোমার চালাকি জানি। তুমি হচ্ছ সেই স্যাকরা যে নিজের মায়ের সোনা চুরি করে। আগে বলো চা খাওয়াবে, তবে বলব।

খাওয়াব।—রঘু বলল। তারপর সামনের একটা মস্ত জামরুল গাছের তলায় গিয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বলল, শুরু করে দে।

নিতাই অমনি শুরু করল, তুমি শালা শুয়োরের বাচ্চা...

এমন মুখ চোটাল নিতাই যে রাজমিস্ত্রিরা পর্যন্ত কাজ থামিয়ে হাঁ করে শুনছিল। বাপ-মা চৌদ্দপুরুষ ধরে সে কী গালাগাল! রঘু চোখ বুজে বসে মাথা নাড়ে আর মিটিমিটি হাসে। মাঝে মাঝে বলে ওঠে, বহোত আচ্ছা। চালাও।

নিতাই একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। আবার চনমনে হয়ে রঘুর বউ মেয়ে থেকে শুরু করে মা মাসির কেচ্ছা গাইতে শুরু করে দিল।

আধ ঘণ্টাখানেক ঝিম ধরে বসে শুনল রঘু।

ঠোঁটের কোণে ফেনা তুলে নিতাই থেমে দম নিতে নিতে বলল, এবার চা খাওয়াও মাইরি। রোজ রোজ বিনিমাগনা তোমার ভূত ঝেড়ে দিই, কিছু চেয়েছি কখনও?

রঘু তার মেয়েকে ডেকে নিতাইকে চা দিতে বলে দেয়। ফুডুক ফুডুক হাসছে রঘু। একটু আগের ম্যাড়ম্যাড়ে চেহারাটায় এখন যেন একটু জলুস খুলেছে। বলল, আহা, কী শোনালি রে নিতাই! এমন বহুকাল শুনিনি।

এক গ্লাস চা রোজগার করে ভারী খুশি হয় নিতাই। গাছের তলায় বসে রক্তাম্বরে পেঁচিয়ে গরম পেতলের গ্লাসটা ধরেছে সাপটে। ইস্পাত মাঝে মাঝে কোলে লাফিয়ে উঠে গ্লাসের গন্ধ শুঁকছে।

রঘু মিস্ত্রিদের কাজ দেখতে দেখতে বলে, ও বাড়ির খবরটবর আছে নাকি রে কিছু?

নিতাই উদাস গলায় বলে, খবর আর কী? বাবু আর গিন্নির মুখ দেখাদেখি নেই।

সে তো পুরনো কেচ্ছা।

আজ এইমাত্র একটা নতুন ছোকরা এসে ঢুকল। কাঁধে ব্যাগ। দেখে মনে হয়, বাড়িতে সেঁধিয়ে গেল পাকাপাকি। ছোট মামাবাবুর আসার কথা ছিল। বোধহয় সে-ই।

মামাবাবু কাকাবাবু অনেক আসবে এখন। নরক গুলজার হবে। চোখ কান খোলা রাখিস। কাল রাতে বাবু বাড়ি ফিরেছিল?

ফিরেছিল।

ক'দিন ফিরছে না খেয়াল রাখিস।

চায়ে চিনি কম হয়েছে রঘুবাবু। তোমার মেয়েকে একটু চিনি দিয়ে যেতে বলো।

চিনি সস্তা দেখলি? এক ডেলা গুড় নে বরং।

তাই দাও। হাত আসুক।

এক জায়গায় বসে থাকলে নিতাইয়ের কাজ চলে না। গুড়ের ডেলাটা মুড়ির কোঁচড়ে ভরে চা-টা তলানি পর্যন্ত খেয়ে উঠে পড়ল নিতাই।

পথে নামতেই মুখোমুখি কালো এবং গম্ভীর প্রকৃতির মদন ঠিকাদারের সামনে পড়ে গেল। এ লোকটাকে কেন যেন একটু ভয় খায় নিতাই। মাঝে মাঝে মদনকেও বাণ মারে সে।

মদন ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর গলায় বলে, এতক্ষণ ওসব অসভ্য কথা বলে কাকে গালাগালি করছিলি?

তা আমি কী করব? স্যাকরা শুনতে চায় যে।

শখ করে কেউ গালাগাল শোনে?

শোনে কি না রঘুকেই জিজ্ঞেস করো না! দেখা হলেই আমাকে খোঁচায় বলার জন্য।

মিছে কথা বলবি তো মুখ ভেঙে দেব।

বলতে বলতে মদন ঘুসি পাকিয়ে এক পা এগোতেই ভারী আত্মসম্মানে ঘা লাগে নিতাইয়ের। এটা কেমন কথা যে, যার তার হাতে সে বরাবর মারধর খাবে, আর অপমান সহ্য করবে?

নিতাই দু' পা পিছিয়ে গেল বটে, কিন্তু আঙুল তুলে শাসিয়ে বলল, খবরদার মদন! বদন বিগড়ে দেব কিন্তু!

কিন্তু মদনটা চিরকেলে ডাকাবুকো। লাফিয়ে এসে এক খামচায় জটা ধরে ফেলল। নিতাই দেখল, গায়ের জোরে পারবে না। টানতে গেলে জটাও ছিঁড়বে। সুতরাং সে দু' হাত ওপরে তুলে নাচতে নাচতে বিকট সুরে চেঁচাতে থাকে, ব্যোম কালী! ব্যোম কালী! মহাকালী প্রলয়ংকরী! ভাসিয়ে দে মা! ডুবিয়ে দে মা! জ্বালিয়ে দে মা! কানা করে দে। ঠ্যাং ভেঙে দে। শেষ করে দে মা!

মদন ঠিকাদার কালী দুর্গা মারণ উচাটনে বিশ্বাসী নয়। নিতাইয়ের জটা আর দাড়ির কিছু ক্ষয়ক্ষতি হল। মদনের কিলগুলো সাংঘাতিক, চড়ও ভয়ংকর। ফলে নিতাইয়ের কষের দাঁতের গোড়া টনটন করতে লাগল, মাজায় বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা। আরও ব্যথা পেত, কেবল নাচানাচির ফলে মদন তেমন জমিয়ে মারতে পারেনি বলে।

মার দেখতে কিছু লোক জুটে গিয়েছিল। শেষমেশ তাদের মধ্যেই দু'-একজন এসে ছাড়িয়ে দিল। মদন শাসিয়ে গেল, শ্রীনাথের ছেলেকে তুইই তা হলে অসভ্য গালাগাল শেখাচ্ছিস। কোনওদিন আর মুখ খারাপ করতে শুনলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।

মদন চলে গেলে হি হি করে হাসে নিতাই খ্যাপা। সকলের দিকে চেয়ে বলে, লাগেনি মোটেই। বাহুবন্ধ বাণ চালিয়ে দিয়েছিলাম তো. মদনের হাতে আর শক্তি ছিল না। মারগুলো যেন বাতাসে ভেসে গেল।

মুখে যাই বলুক, নিতাইয়ের চুলের গোড়া থেকে মাজা পর্যন্ত জ্বালা আর ব্যথা করছে খুব। ভাল করে হাঁটতে পারছে না। দিনটা ভাল করে গড়ায়নি, এর মধ্যেই যে যার বরাদ্দ তুলে নিচ্ছে। বিড়বিড় করে নিতাই বলতে থাকে, একটাই তো নিতাই বাপ, রয়েসয়ে মারলেই হয়। এই নিতাই হিমালয়ে চলে গেলে কেরদানিটা কার ওপর দেখাবে?

মদন শালা লোকও অদ্ভুত। মল্লিবাবুর সে ছিল জিগির দোস্ত। দু'জনের একই সঙ্গে খানাপিনা, একই মেয়েমানুষের কাছে যাতায়াত। মদন ঠিকাদার ছাড়া মল্লিনাথ কারুকে চোখেও দেখতে পেত না। আর মদন ছিল মল্লিনাথের পোষা জীব, এই যেমন ইস্পাত হল খ্যাপা নিতাইয়ের। মল্লিনাথেরও এরকম হঠাৎ হঠাৎ রাগের পারদ লাফিয়ে একশো দশ ডিগ্রিতে উঠে যেত। মল্লিবাবু কত লোককে যে ঠেঙিয়েছে! কিন্তু মদন ঠিকাদার নিজে কখনও মারপিট করত না। তার হয়ে মারপিট করার লোক আছে। কিন্তু আজ হঠাৎ মদনার কী যে হল! নিতাই সহসা বাড়ি ফিরতে সাহস পেল না। মদন যদি গিন্নিমার কাছে গিয়ে লাগিয়ে থাকে যে, সে সজলখোকাকে খারাপ কথা শেখায়?

আসলে দোষ তো নিতাইয়ের নয়। সজলখোকাবাবু নিজেই এসে শিখতে চায় যে। খারাপ কথা শুনলে খুব খুশি হয়, হেসে গড়িয়ে পড়ে। এই যেমন রঘু স্যাকরা। নিতাইয়ের তা হলে দোষটা হল কোথায়?

নদী পেরিয়ে গোরুবাথানের জঙ্গলে গিয়ে ইস্পাতকে নিয়ে অনেক ঘোরাফেরার পর বেলা গড়িয়ে নিতাই ফিরে আসে। কোঁচড়ের মুড়ি যেমন কে তেমন থেকে নিউড়ে গেছে। গুড়ের ডেলাটা বের করে খেয়ে জল খেল নিতাই। তারপর কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

টের পেল, জ্বর আসছে। ব্যথার তারসে আসে ওরকম। শুয়ে শুয়ে সে পুতুলরাণীর কথা ভাবে।

ভারী নাকি মোটাসোটা হয়েছে। তা হলে দেখতে এখন ভালই লাগে নিশ্চয়ই। মহাকালী ভয়ংকরী! শক্তি দে মা। শক্তি দে। মন্ত্রের জোর দে।

যন্ত্রণায় পাশ ফিরে শোয় নিতাই। হিমালয়ে যেতেই হবে। আসল বিদ্যে শিখে আসতে হবে।

॥ সাত ॥

প্রীতমের ঘুম ভাঙে খুব ভোরবেলায়, যখন সূর্য ওঠে না, যখন চারদিক এক ভুতুড়ে আবছায়ায় নিঃঝুম হয়ে পড়ে থাকে। তখনই কি প্রথম ঘুম ভাঙে প্রীতমের? তা তো নয়। সারারাত আরও বহুবার ঘুম ভেঙে যায় তার। খুব তুচ্ছ সব কারণে। কখনও রান্নাঘরের এঁটো বাসনে ধেড়ে ইঁদুরের শব্দ, আরশোলার পাখার আওয়াজ, কখনও-বা নিছকই স্বপ্ন দেখে, কখনও এমনিই।

ঘুম ভাঙলেই বড় একা। ভীষণ একা। পাশের ঘরে এক খাটে বিলু আর লাবু, খাওয়ার ঘরের মেঝেয় বিন্দু নামে নতুন কিশোরী ঝি। তাদের ঘুম খুব গাঢ়। প্রীতমের কোনওদিনই গাঢ় ঘুম ছিল না। আর বরাবরই সে ঘুম ভেঙে একাকিত্বকে হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায় টের পেয়েছে।

এখন প্রীতম আরও একা। সামান্য সর্দিজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হলেও বরাবর বিলু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছে প্রীতমের। এখন দীর্ঘ রোগভোগের কালবেলা চলছে। এখন তার নিরেট নিশ্ছিদ্র একা থাকা, একা হয়ে যাওয়া।

কিন্তু মনকে দুর্বল হতে দেয় না প্রীতম। জানে, একবার ভয়কে প্রশ্রয় দিলে আর পরিত্রাণ নেই। মৃত্যুর চেয়েও বহুগুণ ভয়ংকর মৃত্যুভয় ধারেকাছে তরুণ উৎসাহী চিতাবাঘের মতো অপেক্ষা করে আছে। প্রীতম তার অন্ধকার নড়াচড়া চোখের নীল আগুন সব টের পায়, দেখতে পায় তার শরীরের কটাশে ছাপচক্কর। এক মুহূর্তে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভাব দেখলেই লাফিয়ে পড়বে।

ঘুম ভাঙলে তাই প্রীতম একা বোধ করা থেকে নিজের পরিত্রাণ খুঁজছিল প্রাণপণে। সে জানে তার বহু বহু দূর পরিধির মধ্যেও কোনও মানুষ নেই। বউ না, আত্মীয় না, ডাক্তার বা বন্ধুও না। সে একা, আর তার শরীরের অজস্র জীবাণু।

এইসব রহস্যময় জীবাণু কীরকম, কোথা থেকে এল তা জাঁহাবাজ ডাক্তারেরাও জানে না। তারা শুধু জানে হাড়ে-মজ্জায় কোনও গোপন অদ্ভুত রন্ধ্রপথে জীবাণুরা দিনরাত অবিরাম কাজ করে চলেছে।

একদিন তারা মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড়গুলি পেরিয়ে মগজে পৌঁছে যাবে। আজও অবশ্য ততদূরে পৌঁছয়নি তারা। প্রীতমের চিন্তাশক্তি আজও পরিষ্কার। থট প্রসেসে কোনও গোলমাল নেই। মাঝে মাঝে সে এখনও জটিল কুটিল সব এন্ট্রি দু'বার না ভেবেই করতে পারে। হায়ার অ্যাকাউন্টেন্সির কয়েকটা বই তার শিয়রের কাছে থাকে, সব সময়ে পাশে খাতা, ডটপেন।

তবু প্রীতম জাগে এবং কিছুক্ষণ একা বোধ করে। এই বোধের সঙ্গে তার লড়াই চলছে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে। প্রায় হারতে হারতেও লড়াইটা টিকিয়ে রেখেছে সে। বাঘের চোখ রোজ অন্ধকারে দপ দপ করে জ্বলে উঠে তাকে দেখে নেয়।

কিন্তু এক বিপুল গভীর অন্ধকারের বাঁধভাঙা স্রোত জানালা দরজার সব রন্ধ্রপথ দিয়ে হুড়হুড় করে ঘরে ঢুকে আসে। বর্ণ গন্ধ আকারহীন সে এক নিষ্ঠুর অন্ধকারের বিপুল সমুদ্র। এই আবছা ভোরে ভয় ভয় করে। কাছে এগিয়ে আসে কি বৈতরণী? প্রীতম তখন খুব খেলোয়াড়ের মতো চোখ বুজে নিজের শরীরের ভিতরে চিরজাগ্রত অবিরাম ক্রিয়াশীল নিদ্রা ও বিশ্রামহীন জীবাণুদেরই ডাকতে থাকে। বলে, তোমরা তো আছ। তোমরা তো আছ! আমি তো একা নই! মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা তো থাকবেই সঙ্গে! তারপর একসঙ্গেই মরণ আমাদের।

কথাটা কতদূর ঠিক কে জানে। তবে প্রীতম টের পায় যখনই সে ডাকে তখনই শরীরের ভিতরে ঝাঁকে ঝাঁকে কী যেন জেগে ওঠে, সাড়া দেয়। সে কেমন? যেন শরীরের ভিতরে ভিতরে এক রোমাঞ্চ, এক সচেতনতা, এক চনমনে ভাব।

তখন নিশ্চিন্ত হয় প্রীতম। একা কথা বলছে দেখলে বিলু হয়তো তাকে পাগল ভাববে। কিন্তু মাঝরাতে বা খুব ভোরের বেলায় কেউ তাকে দেখার জন্য জেগে থাকে না। তাই প্রীতম একা একা কথা বলে, তোমাদের দোষ নেই। তোমাদের কাজ তোমরা করছ মাত্র। জীবাণুরাই কি শুধু মারে মানুষকে? মানুষ নিজেও কি মারে না? কষ্ট দেয় না? তোমাদের তা হলে দোষ কী বলো? আমার তাতে কোনও দুঃখ নেই। শরীরটাই তো শুধু আমি নয়। এই হাত, এই পা, এই চোখ, কান, এগুলো আলাদাভাবে কোনওটাই তো আমি নয়। তবে আমি কেন তোমাদের শত্রু ভাবব? তোমরা একটা বাসা দখল করেছ মাত্র, তোমরা জোগাড় করছ বেঁচে থাকার রসদ। অন্যায় ভাবেও তো নয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষও তো কত কী করে। তবু বলি, আমাকে তোমরা ছুঁতে পারোনি আজ পর্যন্ত। কী করে পারবে? দেহটাই তো আর আমি নয়। এর ভিতরেই কোথাও আছে আর-এক আমি, তাকে স্পর্শ করা যায় না।

খুবই আন্তরিকভাবে কথাগুলি বলে প্রীতম। আর তখন তার পুবের জানালার অন্ধকার ক্রমে ফ্যাকাসে হতে থাকে। ভবানীপুরের এই গলির মধ্যে সরাসরি জানালার ওপর সূর্যের আলো এসে পড়ে না প্রথমেই। একটু সময় নেয়। ততক্ষণ এবং যতক্ষণ বিলু না ওঠে এবং চতুর্দিকের কাজকর্ম যতক্ষণ না শুরু হয় ততক্ষণ ঠোঁট অবিরাম নড়ে যায় প্রীতমের। ততক্ষণে সে এক ভয়াবহ লড়াই চালিয়ে যায়। এবং টিকে থাকে একের পর এক দিন।

একটা দিনের বাড়তি আয়ু পাওয়া, আর-একটা দিনের সূর্যের আলো দেখাই কি এখন যথেষ্ট বেশি আহ্লাদের বিষয় নয়?

তাই সকালের দিকে প্রীতম ক্লান্ত থাকলেও মনটা একরকম শক্ত সমর্থ রয়ে যায়। চোখ বুজে সে মৃদু মৃদু একটু হাসতেও থাকে। যতক্ষণ না বিলু এসে মশারি তুলে উঁকি দেয়।

মাঝে মাঝে মশারির মধ্যে এক-আধটা মশার গুনগুন শুনে মাঝরাতে চোখ মেলে চায় প্রীতম। খুব কান পেতে শোনে। বেড সুইচ টিপে আলোও জ্বালায়। অবশ্যই মশা মারবার জন্য নয়। সে সাধ্য তার নেই। হাঁটু গেড়ে বসো, সাবধানে মশাটাকে খুঁজে বের করো, সেটাকে কোথাও নিশ্চিন্তে বসতে দাও, তারপর এগিয়ে গিয়ে দু' হাতে চটাস করে মারো। না, এতসব প্রীতমের কাছে বিরাট বিরাট কাজ। মারবার কথা তার মনেও হয় না।

ঘুম ভেঙে সে মশারির মধ্যে কোনও মশার অস্তিত্ব টের পেলে চুপ করে শব্দ শোনে, তারপর ফিসফিস করে বলতে থাকে, তোমরা অন্য জগতের। তোমরা এক চিন্তাশূন্য কর্তব্যের জগৎ থেকে আসা জীব। সুখীও নও, দুঃখীও নও। জেগে থাকো, আমার সঙ্গে জেগে থাকো।

বিলু মশারি তুলে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি জেগেছ?

হুঁ।

বাথরুমে যাবে এখন?

একটু পরে।

পরে আবার কেন? এখনই সেরে নাও। গরম জল বসিয়ে এসেছি। ওঠো।

বলে হাত বাড়িয়ে পাঁজাকোলা করে প্রীতমকে বসায় বিলু। প্রীতম তখন বিলুর শরীরে বাসি জামাকাপড়ের গন্ধ পায়। বিলুর শরীরে কোনও উৎকট গন্ধ নেই। গ্রীষ্মকালেও বিলুর ঘাম হয় না। তবু সব শরীরেই যেমন একটা না একটা গন্ধ থাকে তেমনি বিলুরও আছে। প্রীতম গন্ধটা ভালই বাসে।

দাঁড় করানোর সময় বিলুর মুখ প্রীতমের মুখের কাছাকাছি এসেছিল। বিলু বলল, আজ ভাল করে তোমার দাঁত মেজে দিতে হবে। মুখে দুর্গন্ধ হচ্ছে।

দাঁড়ানোটা ভারী কষ্টকর প্রীতমের কাছে। তবু এখনও বিলুর ওপর শরীরের পুরো ভর ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে পারছে। বিলু বলল, কতবার বলি বাথরুমে যাওয়ার দরকার নেই। বিছানাতেই তো প্লাস্টিকের গামলায় মুখ ধোওয়া যায়।

আমার ঘেন্না করে।

ঘেন্না করলে চলবে কেন? যেমন অবস্থা তেমনি তো ব্যবস্থা হবে।

এখনও পারছি।

কষ্টও হয় তো!— বিলু বলল।

আমার চেয়ে তোমার কষ্টই বেশি।

আমার কষ্ট! আমার আবার কষ্ট কী!

সকালের দিকে বিলুর মন ভাল থাকে। এই সময়টায় বিলুর শরীরটা যেন মায়ের শরীরের মতো নম্রতা ও সুঘ্রাণে ভরা থাকে।

বিলুর শরীরে ভর দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে বাথরুমে যায় প্রীতম। বিলু খুবই সাবধানে তার বগলের নীচে কাঁধ দিয়ে, কোমরে হাত জড়িয়ে ধরে থাকে তাকে।

বাথরুমে বাচ্চা ছেলের মতো তাকে ধরে থেকে হিসি করায়, তারপর একটা বেতের চেয়ারে বসিয়ে মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে গুঁড়ো মাজনে আঙুল দিয়ে খুব যত্নে তার দাঁত মেজে দেয়। কোষে জল নিয়ে কুলকুচো করায়।

এসব করতে করতেই বলে, আজ স্নান করাব তোমাকে।

ভাল লাগে না। বড্ড ঝামেলা।

স্নান না করলে শরীর কষে যাবে।

আজকের দিনটা থাক।

রোজই তো থাকছে। ডাক্তার বলেছে সপ্তাহে তিন দিন স্নান করাতে।

আবার ধরে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে চিরুনিতে চুল পাট করে দেয়। বাসি জামাকাপড় বদলে দেয়। বিছানার চাদর, বালিশের তোয়ালে পালটে দেয়। রোজই চাদর আর তোয়ালে পালটানো হয়, ডেটল-জলে কাচা হয়। বেডসোর যাতে হতে না পারে তার জন্য পিঠে সযত্নে একটা ওষুধ দেওয়া পাউডার ছড়িয়ে দেয়।

এইসব প্রাতঃকৃত্যের পর শরীরের ভার অনেক কমে যায় প্রীতমের। বিলু তাকে সকালের ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে জামার ওপর গরম সোয়েটার পরিয়ে দেয়, হালকা শাল টেনে দেয় গলা অবধি।

তারপর বিছানায় হাত রেখে মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, আজ কী খাবে?

এই সময়ে রোজ প্রীতমের মনে হয় বিলু এখন খুব আলতো আমাকে চুমু খেলে কত ভাল হত! এরকম অবস্থায় খাওয়াই তো নিয়ম। খাবে কি?

কিন্তু বিলু কখনওই তা করে না। প্রীতমও কোনওদিন এরকম কোনও প্রস্তাব মুখ ফুটে করতে পারেনি।

প্রীতম বলে, যা খেতে দেবে তাই খাব।

কোনও বায়না নেই তো?

প্রীতম স্নিগ্ধ হেসে বলে, না। কোনওদিন বায়না করেছি? বলো!

বিলু হাসে না। ভ্রু কুঁচকে কেমন একটু আনমনা হয়ে যায়। আর ঠিক এই সময় প্রীতমের মনে হতে থাকে, এবার বিলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। নিশ্চয়ই ফেলবে।

কিন্তু বিলুর দীর্ঘশ্বাস নেই। কোনওদিনই দীর্ঘশ্বাস ফেলে না বিলু।

প্রীতম বলে, আজকাল ডিমে বড় আঁশটে গন্ধ লাগে। আজ আমি ডিম খাব না।

এই তো বায়না করছ! করো না বলে?

এটা তো না খাওয়ার বায়না। একে বায়না বলে না।

এটাও বায়না।—বিলু বলল, কিন্তু হাসল না। অথচ এরকম কথায় একটু হাসাটাই কি নিয়ম নয়?

বিলু বলল, ঠিক আছে, মাখন দিয়ে ডিমের পোচ করে দিচ্ছি, তা হলে অতটা আঁশটে গন্ধ লাগবে না।

দাও। আর জানালার কাছে ইজিচেয়ারটা পেতে দাও। একটু বাইরেটা দেখি।

বিলু লোহার ইজিচেয়ারটা পেতে দেয়, ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বসায়, সযত্নে গলা পর্যন্ত চাপা দিয়ে দেয়।

প্রীতম বিলুর দিকে চেয়ে বলে, সকালে উঠে রোজ একটু ফিটফাট হয়ে নাও না কেন? চুল উড়ছে, সিঁদুর লেপটে আছে, ওরকম চেহারা দেখতে কি ভাল?

আমার এখন সাজবারই সময় কিনা!

প্রীতম ভ্রু কুঁচকে বলে, কেন? তোমার কি দুঃসময় চলছে?

তবে কি সুসময়?

তাও নয়। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি সব হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছ।

বিলু মৃদু স্বরে আত্মবিশ্বাসহীন গলায় বলে, হাল ছাড়ার কী আছে! ঘরে রুগি থাকলে কার সাজতে ইচ্ছে করে বলো তো!

প্রীতম ঘুনঘুনে নেই-আঁকড়া স্বরে বলে, না, ওরকম দেখতে ভাল লাগে না। ওভাবে কখনও আমার সামনে এসো না। আমার খারাপ লাগে।

আচ্ছা।—বলে বিলু চলে যায়।

জানালা দিয়ে কিছুই দেখার নেই প্রীতমের। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে রাস্তা দেখা যায় না। শুধু কয়েকটা বাড়ির তিন বা চারতলা আর আকাশ দেখা যায়। কিন্তু প্রীতমের কোনও অন্যমনস্কতা নেই। যেটুকু দেখে সেটুকুই যথাসাধ্য চেতনা আর প্রখর অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করে অভ্যন্তরে।

বিলু খাবার নিয়ে আসে। প্রীতমের গলায় বাচ্চাদের মতো একটা ন্যাপকিনের বিপ বেঁধে দেয়। তারপর পাশে একটা টুলে বসে আস্তে আস্তে খাইয়ে দেয় তাকে। খাওয়া জিনিসটা বরাবরই প্রীতমের কাছে খুব বিরক্তিকর ছিল। খেতে হবে বলেই তার খাওয়া। বরাবর সে খায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি। বিলু এখন তা হতে দেয় না। প্রীতমও বুঝেছে খাওয়াটা খুবই জরুরি ব্যাপার। যদি বেঁচে থাকতে হয়, যদি লড়াই চালাতে হয়, তবে যথেষ্ট রসদের দরকার।

প্রীতম মুখ ফিরিয়ে বলে, আজকাল আমার খাওয়া কি খুব বেড়ে গেছে বিলু?

অন্য বউ হলে বলত, ছিঃ ছিঃ, ওসব কথা কি বলতে আছে? বিলু গম্ভীর মুখে বলল, আরও একটু বাড়লে ভাল হয়।

প্রীতম লক্ষ করল. বিলুর চুল এখনও রুক্ষ, এলোমেলো, কপালে সিঁদুর লেপটানো। এ নিয়ে আর বলতে গেলে সকালের নরম-সরম বিলু আর নরম-সরম থাকবে না। রেগে যাবে, ঠান্ডা কঠিন এক ব্যবহার দিয়ে সারাদিন প্রতিবাদ জানিয়ে যাবে।

খাওয়া শেষ হলে প্রীতম মুখ তুলে ফের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে। ও-ঘরে লাবু ঘুম ভেঙে মাকে ডাকতে থাকে, মা! ও মা! মা! ও মা! মা! ও মা! ঠিক নামতা পড়ার মতো। বিলু বোধহয় বাথরুমে। সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু যতক্ষণ না সাড়া দেবে ততক্ষণ এক সুরে, এক গলায় একঘেয়ে ডেকেই যাবে লাবু।

মেয়েকে পারতপক্ষে ডাকে না প্রীতম। বড় মায়া। এই বাসায় এই এক পুকুর ভালবাসার ডুবজল অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। বড় গভীর জল। একবার পা বাড়ালে তলিয়ে যেতে হবে। এখন ভালবাসায় ভেসে যেতে নেই। মন নরম হবে, মৃত্যুভয় এসে যাবে তবে। প্রীতম তাই কান কাড়া করে মেয়ের ডাক শোনে, কিন্তু নিজে তাকে ডাকে না বা সাড়াও দেয় না। লাবুর সঙ্গে তার এখন আড়ি।

ঝি-টা বাড়িতে নেই, দোকানে গেছে। প্রীতম লাবুর ওই অবিকল পাখির স্বরের ডাক সইতে পারছে না। ছটফট করে ভিতরটা। আপনা থেকেই শরীরটা দাঁড়িয়ে পড়তে চায়। সরু হাত তুলে সে কপাল টিপে ধরার এক অক্ষম চেষ্টা করে।

বাথরুম থেকে বন্ধ দরজা ভেদ করে বিলুর ক্ষীণ স্বর এল এই সময়ে, আসছি-ই।

লাবু শোনে এবং চুপ করে। মেয়েটা কেমন একরকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। মাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে চায় না। সারাদিন খাওয়া নিয়ে বিলু ওকে মারে, বকে। বিলুকে ভয়ও পায় ভীষণ, আবার অবাধ্যতাও করে যায় অনবরত। মার খেলে মায়ের কাছ থেকে সরে যায় না, পালায় না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অসহায় ভয়ে আর ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে।

যত ভাববে তত মায়ার পলি জমবে মনের মধ্যে। তাই প্রাণপণে নিজের অনুভূতির অন্য জগৎ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে প্রীতম। আগে উদাস ছিল প্রীতম, এখন সে অনেক অনুভূতিপ্রবণ হয়েছে। কীটপতঙ্গ জীবাণুদের জগৎকে সে আজকাল স্পষ্ট টের পায়। বাড়িময় যেসব আরশোলা ওড়ে, যে একটা-দুটো ইঁদুর বা ছুঁচো আনাগোনা করে তাদের গতিবিধি, সময়জ্ঞান ও চরিত্র সম্পর্কে সে অনেক অভিজ্ঞ হয়েছে ইদানীং। একটা দুধের শিশু বেড়াল অনেক তাড়া খেয়েও এই ফ্ল্যাটের আনাচে কানাচে নাছোড়বান্দা হয়ে ঘুরে বেড়াত। তাকে দু' চোখে দেখতে পারত না প্রীতম। এখন সেই বেড়ালটা বড় হয়েছে। সারাদিন পাড়া বেড়ায়, কিন্তু মাঝে মাঝে এসে প্রীতমকে দেখা দিয়ে যায় ঠিকই। আর রোজ রাতে নিয়মিত এসে প্রীতমের খাটের তলায় শুয়ে থাকে। কখন শুতে আসবে বেড়ালটা, তার জন্য ঘুমের আগে উন্মুখ হয়ে থাকে প্রীতম, এলে নিশ্চিন্ত হয়।

মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকবে তার তো কোনও বাঁধাধরা ছক নেই। প্রীতম এইভাবে বেঁচে আছে, সুতরাং যতদূর সম্ভব এই বাঁচাটাকে সে সইয়ে নেয়। খুব কঠিন কাজ কিন্তু প্রীতমকে পারতেই হবে।

লাবু ছিল তার প্রাণ। যতক্ষণ বাসায় থাকত প্রীতম ততক্ষণ লাবু এঁটুলির মতো লেগে থাকত তার সঙ্গে। মেয়ের প্রতি তার ভালবাসা ছিল একবুক তেষ্টার মতো, সহজে মিটতে চাইত না। মেয়েকে ছুঁয়ে না থাকলে রাতে ঘুমোতে পারত না প্রীতম। অসুখ হওয়ার পর বিলু লাবুকে সরিয়ে নিয়েছে। সরিয়ে নেওয়া নয়, যেন ছিঁড়ে নেওয়া। প্রথমদিকে লাবুকে ছাড়া খাঁ খাঁ শূন্য লাগত বুক। তারপর সয়েও গেছে। আগে আগে লাবু বাবার কাছে আসতে না পারায় ভীষণ কাঁদত, নিষেধ মানতে চাইত না, ফাঁক পেলেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত কোলে! কিন্তু ক্রমে সেও দূরত্ব রক্ষা করে চলতে শিখল তো! পারতপক্ষে প্রীতমও আর মেয়েকে ডাকে না, কথা বলে না। তাও সইল তার।

বিলুর সঙ্গে বরাবরই একটু দূরত্ব ছিল প্রীতমের। ঝগড়াঝাঁটি নয়, মন কষাকষিও নয়, ঠান্ডা লড়াইও বলা যায় না। তবে বিলু একটু অন্যরকম, কোনওদিনই প্রীতমের কাছে নিজের মনটা সবটুকু খুলে দেয়নি সে। বিয়ের পর প্রথম ভাব হলে মানুষ কত আগড়ম বাগড়ম বলে, কত তুচ্ছ কথার পাহাড় বানায়। বিলু কোনওদিন সেরকম ছিল না। কথা বরাবর কম বলত। কিন্তু একথাও বলা যাবে না যে, বিলুর প্রীতমের প্রতি ভালবাসা নেই। বললে খুব মিথ্যে বলা হবে, ভুল বলা হবে। গড়পড়তা বাঙালি বউরা যা করে বিলু তার চেয়ে একরত্তি কম করে না তার জন্য। কিন্তু তার ওই সেবার মধ্যে কোথায় যেন দক্ষ নার্সের পটুত্ব আছে, কোনও আবেগ নেই। অন্য কারও স্বামীর এরকম শক্ত অসুখ হলে চোদ্দোবার কেঁদে ভাসাত, বিলু একদিনও চোখের জল ফেলেনি। কিন্তু যারা কেঁদে ভাসায় তারাও হয়তো ওষুধ দিতে এক-আধবার ভুল করে, রুগির সেবা করতে করতে হয়তো-বা কখনও বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে। বিলুর সেরকম ভুল হয় না, বিরক্তির প্রকাশও তার নেই। তবে বিলুর মুখ সর্বদাই গম্ভীর, বিষণ্ণ। যে স্থায়ী বিরক্তির ছাপ বিলুর মুখে আছে তার সঙ্গে প্রীতমের অসুখের কোনও সম্পর্ক নেই।

বিয়ের আগে বিলুর সঙ্গে ভাব ছিল না প্রীতমের। তবে শিলিগুড়িতে বিলু মাঝে মাঝে তার

পিসির বাড়ি বেড়াতে যেত। তখন দেখেছে। বিলুর হাতে কখনও এক গ্লাস জল বা এক কাপ চা খেয়েছে প্রীতম। দুটো-চারটে কথাবার্তাও হত তখন। পরে সেই পিসিই বিয়ের সম্বন্ধ আনে এবং বিয়ে হয়েও যায়। মনে আছে, প্রথম রাত্রে বিলু তাকে বলেছিল, তুমি খুব শান্ত স্বভাবের। আমার শান্ত মানুষ খুব ভাল লাগে।

এটা কি ভালবাসার কথা নয়?

আজকাল ঘরবন্দি প্রীতম প্রায়ই ভালবাসার কথা ভাবে। কিন্তু ভালবাসার কথা ভাবলে কখনওই তার বিলুর মুখ মনে পড়ে না, কী আশ্চর্য! মনে পড়ে বনগন্ধ ভরা শিলিগুড়ির মাঠঘাট, আকাশ উপুড় করা শীতের ঢালাও রোদ, নীলবর্ণ মেঘের মতো দিগন্তে ঘনীভূত পাহাড়, মহানন্দার সাদা চর, মনে পড়ে তাদের ভরা সংসারের কলরোল। ভালবাসা ছিল ঝুমকো ভোরে ফুল চুরি করতে যাওয়ায়, ভালবাসা মাখা থাকত জোহা চালের ফেনা ভাতে গলে-যাওয়া ঘিয়ের গন্ধে, হাইস্কুলের নরেশ মাস্টার মশাইয়ের বিজবিজে কাঁচাপাকা দাড়িওলা মুখে ভালবাসার নিবিড় একটা ছায়া দেখেনি কী? প্রীতম, শতম, রূপম আর মরম এই চার ভাইয়ের মধ্যে ছিল অবিরাম খুনোখুনি ঝগড়া, বিছানায় বালিশকে গদা বানিয়ে প্রবল মারপিট, খাওয়া নিয়ে, খেলা নিয়ে, জামাকাপড় নিয়ে বরাবর রেষারেষি। এখন মনে হয় তার মধ্যেই ভালবাসার কীট গোপনে গোপনে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এর হৃদয়ের সঙ্গে ওর হৃদয়ের পথ করে দিয়েছিল। আর মা? বাবা? কোনওদিন তারা কেউ তো মুখ ফুটে বলেনি, প্রীতম তোকে বড় ভালবাসি। কিংবা, তুই বড় ভাল ছেলে। জ্ঞান বয়সে তাদের মুখে কখনও আদরের কথা শোনেনি প্রীতম, তবু সেই বাড়ি বুকসমান ভালবাসার জলে ছিল আধডোবা। চিরদিনই কলকাতা ছিল প্রীতমের কাছে নিষ্ঠুর প্রবাস। আজও তাই আছে। ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাটটা তার কাছে নিতান্তই এক বাসাবাড়ি, মেসবাড়ির মতো, হাসপাতালের মতো একটা নিরাপদ আশ্রয় মাত্র। এখানে ডুবজলে স্নান নেই।

যখনই শিলিগুড়ির কথা, ভালবাসার কথা মনে পড়ে তখনই বুকের মধ্যে নাটবল্টু ঢিলে হয়ে একটা কপাট যেন ভেঙে পড়তে চায়। ভারী ঘুনঘুনে এক নেই-আঁকড়া ভাব আসে মনে, শিশু হয়ে যেতে ইচ্ছে জাগে। সেই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় না প্রীতম। কাগজ খাতা ডটপেন নিয়ে অঙ্কে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করে।

আচমকাই কলিং বেল বেজে ওঠে রি-রি করে।

প্রীতম তখনও আনমনে ভালবাসার কথাই ভাবছে। ভাবছে, তুমি কি অকৃতজ্ঞ নও প্রীতম? বিলু কি তোমার জন্য নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছে না? দিচ্ছে তো? শুধু সকালে মুখের কাছে মুখ এনেও চুমু খায়নি বলেই কি এ বাড়িতে ভালবাসা নেই? এ কেমন ইল্লুতে কথা?

কে গিয়ে দরজা খুলে দিল সদরের। হঠাৎ একটা আফটার-শেভ লোশনের সুগন্ধে ভরে গেল। শুধু আফটার-শেভ নয়, সঙ্গে হয়তো আরও কোনও সুগন্ধ আছে।

এ গন্ধ চেনা প্রীতমের। মুখে হাসি নিয়ে চোখ তুলে সে বলল, আসুন।

আজ ভালই আছেন মনে হচ্ছে! নইলে এই সাতসকালে কেউ কি অ্যাকাউন্টস নিয়ে বসে?— বলতে বলতে অরুণ ইজিচেয়ার টেনে এনে বসে।

প্রীতম লক্ষ করল, অরুণ জুতোসুদ্ধু ঘরে ঢুকেছে। প্রীতম এ নিয়ে কাউকে কিছু বলতে পারে না কখনও। কিন্তু বিলু পারে। অরুণের এ ধরনের ভুল প্রায়ই হয় এবং বিলু বকলে ফের গিয়ে জুতো ছেড়ে আসে। আজও বিলু ওকে বকবে ঠিক।

প্রীতম কিছুতেই অরুণের জুতোজোড়া থেকে চোখ তুলতে পারে না। কী সাংঘাতিক দামি এবং ঝকঝকে উঁচু হিলের জুতো! জুতো থেকে চোখ তুললে গাঢ় খয়েরি রঙের ঢোলা প্যান্ট এবং তার ওপর ডাবল ব্রেস্টেড কোট, কোটের ফাঁকে গাম্ভীর্যপূর্ণ টাই চোখে পড়বে। তার ওপর অরুণের সুন্দর গোলপানা ফর্সা মুখখানা। বেড়ালের মতো একটু কটা চোখ, সামান্য লালচে এক ঝাঁক চুল,

চোখ দু'খানা বিশাল। আভিজাত্যের স্থায়ী ছাপ তার সর্বাঙ্গে। হাতের আঙুলগুলো দেখ, কী মোলায়েম, লাল টুকটুকে পেলব।

প্রীতম হাসছিল। বলল, আজ একটু ভালই।

অরুণ খুব চোখা হেসে বলল, খুব ভাল কি থাকবেন আজ! ডাক্তার যে আজ বিকেলে আবার গোটা দশ-বারো ছুঁচ ফোটাবে। আমি ঠিক ছ'টায় গাড়ি নিয়ে চলে আসব।

প্রীতম অস্বস্তি বোধ করে বলে, আপনার আসার কী দরকার? বিলুই ঠিক নিয়ে যেতে পারবে। এতদিন তো নিয়ে গেছে।

বিলু পারবে না, বলিনি তো! তবে কষ্ট হবে। দিন দিন কলকাতার কনভেয়ানস কেমন ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে জানেন তো! ঠিক সময়ে ট্যাক্সি না পেলে? ডেটটা মিস হওয়া কি ভাল?

প্রীতম কৃতজ্ঞতাবোধে অস্বস্তি বোধ করে সবচেয়ে বেশি। একটা লোক নিজের পেট্রল পুড়িয়ে গাড়ি নিয়ে আসবে, নিয়ে যাবে, ফের দিয়েও যাবে—এতটা কি পাওনা প্রীতমের ওর কাছে? অথচ অরুণের জন্য কিছু করারও নই,তার।

হতাশ হয়ে প্রীতম বলে, ঠিক আছে তা হলে।

ঠিকই আছে। খামোখা আমার অসুবিধের কথা ভেবে নিজেকে ব্যস্ত করেন কেন? আমার অসুবিধে হচ্ছে না।

অরুণ এরকম। কোনও জড়তা নেই, অকারণ বেশী ভদ্রতার ধার ধারে না। সবদিক দিয়েই ঝকঝকে প্রকৃতির মানুষ। ভীষণ ধারালো। উচিত কথা বলতে বা রুখে দাঁড়াতে ভয় খায় না প্রীতমের মতো।

রান্নাঘর থেকে এলোচুল দু' হাতে পাট করতে করতে তড়িৎ পায়ে বিলু ঘরে ঢুকতেই প্রীতমের বুক কেঁপে ওঠে। এইবার ঠিক অরুণের পায়ের জুতোজোড়া নজরে পড়বে বিলুর। সে চোখ কুঁচকে উদ্যত মারের অপেক্ষা করতে থাকে।

বিলু খুব ঝাঁঝালো গলায় অরুণকে বলে, আমার কমলা রঙের উলের কী হল? কবে থেকে বলছি, মেয়েটা জানুয়ারি থেকে স্কুলে যাবে! ওর ইউনিফর্ম লাগবে না?

অরুণ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে অন্যদিকে চেয়ে বলে, কমলা রং কাকে বলে তাই তো আমি বুঝি না। আমি একটু রংকানা আছি।

তা জানি। কানা শুধু নয়, ঠসাও। কতবার জুতো নিয়ে রুগির ঘরে ঢুকতে বারণ করেছি?

॥ আট ॥

বিয়ের পর যখন অরুণ এ বাড়িতে আসত তখন প্রীতম ওর সঙ্গে বিলুর সঠিক সম্পর্কটা জানত না। আজও জানে কী? আসলে মানুষে মানুষে সঠিক সম্পর্ক বলে তো কিছু নেই। সম্পর্ক পালটে যায়।

সাহস করে একদিন তবু প্রীতম জিজ্ঞেস করেছিল বিলুকে, অরুণের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বটা কেমন ছিল? খুব গাঢ়?

বিলু খুব একটা সংকোচ বা লজ্জা বোধ করেনি প্রশ্ন শুনে। তবে চোখের পাতাটা একটু নত করেছিল। কয়েক সেকেন্ডের দুর্বলতা মাত্র। তারপর বলল, আমরা একসঙ্গে স্কটিশ চার্চে পড়তুম বলিনি তোমাকে?

বলেছ।

অরুণ ছিল আমার দু' বছরের সিনিয়র। এমন পাজি না, একদিন ওর পোষা বেজিটাকে এনে

ছেড়ে দিয়েছিল করিডোরে। মেয়েদের মধ্যে সে কী চেঁচামেচি আর আতঙ্ক! আমি তো একটা জানালায় উঠে বসে রইলুম।

সেই থেকে তোমাদের ভাব?

সেই থেকেই। তবে আরও অনেক কাণ্ড আছে। শুধু যে ইয়ারকি করে বেড়াত তা নয়। ইয়ারকিটা ওর মুখোশ। ভিতরে ভিতরে ভীষণ সিরিয়াস।

অরুণ তোমার চেয়ে বয়সে বড়, ছাত্র হিসেবেও সিনিয়র। তবু ওকে তুমি-তুমি করে ডাকো কেন?

ঠোঁট উলটে বিলু বলল, ওকে আপনি বলতে যাবে কে? মেয়েরা সবাই ওকে নাম ধরে তুমি-তুমি করে বলত। তুমি কি অরুণ সম্পর্কে জেলাস ফিল করো প্রীতম?

না, না, তা নয়।—লজ্জা পেয়ে প্রীতম বলেছিল, আসলে আমি মানুষের সম্পর্কে জানতে ভালবাসি।

বিলু মৃদু হেসে বলল, তুমি কী জানতে চাও জানি। তুমি খুব শান্ত, ভালমানুষ। কিছু মনে করবে না তো?

না, কী মনে করব? মনে করার কিছু থাকলে কবেই তা বলে ফেলতাম।

বিলু একটু যেন আধোগলায় বলল, ওর সঙ্গে আমার ভাব ছিল। খুব ভাব। হয়তো বিয়েও করতুম।

করলে না কেন?

একটা কথা ভেবে।

কী কথা?

ও ভীষণ মেয়েদের সঙ্গে মিশত। বাছবিচার ছিল না। ওরকম পুরুষ একটু আনফেইথফুল হয়। জানো তো, পুরুষরা প্রকৃতির নিয়মেই পলিগেমাস। তারা কখনও একজন মহিলাকে নিয়ে খুশি নয়। তার ওপর অরুণ আবার ভীষণ ফ্রি-ওয়ার্লড তত্ত্বে বিশ্বাসী। ও বিয়ে, বন্ধন, সংসার, সন্তান ইত্যাদি রেসপনসিবিলিটি একদম জানে না। আমি বাপু অতটা আধুনিক নই। তাই ভেবেচিন্তেই ওকে বিয়ে করিনি, তোমাকে করেছি।

সেজন্য আজ তোমার দুঃখ হয় না বিলু?

ধুস, দুঃখ কিসের? আমার অত সেন্টিমেন্ট নেই। যা করেছি তা হিসেব করেই করেছি।

আমার সঙ্গে অরুণকে কখনও তুলনা করতে ইচ্ছে হয় না তোমার?

যাঃ! নেভার। তুলনা করব কেন? ও একরকম তুমি অন্যরকম।

প্রীতম হাসিঠাট্টার হালকা চালটা বজায় রেখেই বলল, ধরো আমি তো বেশ রোগা, আর অরুণ কত স্বাস্থ্যবান। অরুণ আমার চেয়ে অনেক ফর্সা। ও প্রচণ্ড বড়লোক আর দুর্দান্ত স্মার্ট—যে গুণগুলো আমার নেই।

তেমনি তুমি আবার শান্ত, দায়িত্বশীল, গভীর মনের মানুষ। সকলের তো সব গুণ থাকে না। শোনো তুমি কি অরুণ সম্পর্কে সত্যিই জেলাস নও?

প্রীতম হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলল, না, নই বিলু। বরং অরুণকে আমার বেশ পছন্দ।

বিলু খুব গভীর মনের মেয়ে নয়, প্রীতম জানে। তবু সেদিন বিলু খুব গভীর অতল এক চোখে প্রীতমের মুখখানা মন দিয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর শুকনো গলায় বলল, অরুণের এ বাড়িতে আসা যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে বলে দিয়ো, আমি ওকে বারণ করে দেব। তাতে ও কিছু মনেও করবে না।

ছিঃ বিলু!

বিলু নতমুখ হয়ে বলল, তুমি অত করে জানতে চাইছিলে বলে আমার মনে হচ্ছিল, তুমি বোধহয় ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছ না।

প্রীতম খুব স্পোর্টসম্যানের মতো কলার উঁচু করা গলায় বলে, আমার কাছে ব্যাপারটা নিতান্তই মজার। মফস্‌সলের ছেলে তো, আমরা জানি, প্রাক্তন প্রেমিকরা তাদের হাতছাড়া প্রেমিকাদের মুখোমুখি বড় একটা হয় না। তা হলে আর জীবনে ট্র্যাজেডি বলতে কিছু থাকে, বলো?

এ কথায় বিলু হেসে ফেলল। বলল, দেব-দানবের যুগ তো এখন আর নেই।

ফলে এ বাড়িতে অরুণের যাতায়াত বহাল থাকল। ঢাকা চাপার কিছু রইল না।

এখন বিলুর ধমক খেয়ে এই যে অরুণ উঠে গেল বাইরের ঘরে, জুতো ছেড়ে আসতে, তার মধ্যেও যেন অরুণের ওপর বিলুর গভীর অধিকারবোধ ফুটে উঠল। বুকের মধ্যে সামান্য চিনচিন করে ওঠে প্রীতমের। এত অধিকারবোধ নিয়ে আর এত জোরের সঙ্গে বিলু কোনওদিন তাকে কোনও হুকুম করেনি।

কিন্তু মানুষে মানুষে স্থায়ী সম্পর্ক বলেও তো কিছু নেই। প্রেমিকা চিরকাল প্রেমিকা থাকে না, স্ত্রীও থাকে না স্ত্রী। এইসব সম্পর্ক ভাঙচুর করতে করতে পৃথিবী খুব দ্রুত এগোচ্ছে।

মোজা পায়ে অরুণ ফিরে এসে বসে এবং বলে, তোমার বড় নিচু নজর বিলু, আজ আমি এত সুন্দর পোশাক পরে এসেছি, তবু তুমি আমার জুতোজোড়াই দেখলে?

বিলু একটু কঠিন গলায় বলে, এটা রুগির ঘর মনে রেখো।

সেকথা ঠিক। ভুলে যাই।—বলে একটু লজ্জার হাসি হাসে অরুণ।

প্রীতম লক্ষ করে, সবকিছু অরুণকে মানাল। ওর ওঠা, হাঁটা, হাসি, লজ্জা এ সবকিছুই যেন বহুকাল ধরে রিহার্সাল দিয়ে যত্নে রপ্ত করা।

আবার একটু চিনচিন করে প্রীতমের।

বিলু কথার ফাঁকেই গিয়ে মেয়েকে বাথরুমে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে অরুণকে বলে, সবকিছুই তো আজকাল তুমি ভুলে যাও। একটা হুইল চেয়ারের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?

ভুলিনি, কিন্তু প্রীতমবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, উনি হুইল চেয়ার পছন্দ করেন না।

বিলুর মুখ থমথমে হয়ে যায়। প্রীতমের দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বলে, হুইল চেয়ার হলে তোমার একা থাকতে তেমন কষ্ট হবে না।

বলতে নেই, আগের তুলনায় তার ধৈর্য ও স্থৈর্য বেশ কমে আসছে। যেমন বিলুর এই হুইল চেয়ারের ব্যাপারটায় এখন হল। অত্যন্ত তেতো স্বরে সে বলল, না না, ওসব আমি পছন্দ করি না। ঘরে একটা জবরজং জিনিস ঢুকিয়ে জঙ্গল বানাতে হবে না।

যদি এরকম স্বরে অরুণ কিছু বলত তা হলে বিলু ওকে তেড়ে মারতে যেত। কিন্তু প্রীতমের সঙ্গে বিলুর ব্যবহার অন্যরকম। কথাটা শুনে বিলু নিজের নখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, তুমি না চাইলে অন্য কথা। হলে তোমার সুবিধেই হত।

আমার কোনও সুবিধে হবে না বিলু। কেন কথা বাড়াচ্ছ?

বালিশে এলিয়ে চোখ বোজে প্রীতম। চোখের পাতাটা পুরো বন্ধ হওয়ার আগেই এক পলকের দৃশ্যটা চোখে পড়ল। অরুণ হাতের ইশারায় বিলুকে সরে যেতে বলছে।

বাথরুম থেকে লাবুও ডাকছিল। বিলু নিঃশব্দে চলে যায়।

অরুণ চেয়ারটা বিছানার আরও একটু কাছে টেনে এনে বসে। নরম গলায় বলে, ঘরে বসে থেকে থেকে তো পচে গেলেন মশাই! একটা কথা বলব? একদিন চলুন দিল্লি বা বম্বে রোড ধরে খানিকটা বেড়িয়ে আসি। এ বছর ওয়েদারটাও ভাল।

ইচ্ছে করে না যে! শরীরে অত শক্তিও নেই।

দূর মশাই! এই মনোবল নিয়ে আপনি লড়ছেন! শক্তি কারও শরীরে, কারও মনে। মনটা শক্ত করুন, ঠিক পারবেন।

ভাল লাগে না।

তবে কী ভাল লাগে? ঘরে বসে থাকতে?

প্রীতম ক্ষীণ হেসে বলে, ঘর আমার খারাপ লাগে না। বাইরেই তো যত গোলমাল।

বিলু ঠিকই বলে, আপনি ভীষণ ঘরকুনো এবং ঘোর সংসারী। সেইজন্যই কি বউকে চাকরি করতে দিতেও চান না?

মেয়েদের চাকরি করা আমাদের পরিবারে কেউ পছন্দ করে না।

সে তো বুঝলাম।— বলে হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অরুণ আবার বলল, কিন্তু এখন বিলুর চাকরি করা একটু দরকারও যে।

কেন?— বুলেটের মতো প্রশ্নটা বেরোয় প্রীতমের মুখ থেকে।

অরুণ মৃদু স্বরে বলে, আপনি নিজে অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আপনাকে আমি আর কী বোঝাব?

প্রীতমের চিন্তার স্রোত খুব ধীরে ধীরে খাত বদল করে। সে আবার চোখ বুজে নিঃঝুম হয়ে শুয়ে মনে মনে খুব দ্রুত হিসেব করে দেখে নেয়। ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের দরুন সে এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকার মতো পেয়েছিল। সেই টাকার ওপরেই এতদিন সংসার চলছে। বসে খেলে রাজার ভাঁড়ারও শেষ হয়।

অরুণ মৃদু স্বরে বলে, খরচও তো কম নয়। মেয়েদের চাকরি করা হয়তো স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভাল না হতে পারে আপনার কাছে। কিন্তু জরুরি প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই তাতে আপনার আপত্তি হবে না?

বিলু তো আমাকে কিছু বলেনি।

বিলু আপনাকে বলতে তেমন জোর পাচ্ছে না।

প্রীতম দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। বিলু তাকে বলতে জোর পাচ্ছে না, তবে অরুণকে বলছে কিসের জোরে? প্রীতম বিরক্তির গলায় বলে, বলতে জোরের দরকার কী?

অরুণ আরও একটু কাছে এগিয়ে আসে এবং খুবই নিচু গলায় বলে, আপনি যতটা শান্তশিষ্ট দেখতে, ঠিক ততটাই কি ডেনজারাস নন? বিলু বলে, প্রীতমের মুখোমুখি হলে ওর ঠান্ডা গভীর চোখের দিকে চেয়ে আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে।

কথাটার মধ্যে খুশি হওয়ার মতো কিছু একটা ছিল বোধহয়, নইলে প্রীতমের ভিতরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল কেন? চোখ খুলে সে বলল, আমি ডেনজারাস হতে যাব কেন? বিলু ওসব বলে বুঝি!

অরুণ হাসিমুখে চেয়ে থাকে। তার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি। চাপা গলাতেই বলে, ডেনজারাস বলতেই তো আর মারদাঙ্গাবাজ লোক নয়। আপনার বিপজ্জনকতার উৎস হচ্ছে স্ট্রং লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস। আপনি মুখে কিছু তেমন বলেন না, কিন্তু একটু নাকের কুঞ্চন বা ঠোঁট ওল্টানো কিংবা চোখের এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেন। যারা কম কথা বলে এবং যারা চাপা স্বভাবের, তাদের সবাই ভয় পায়।

প্রীতম নিজের এত গুণের কথা জানত না। কথাগুলো যে সত্যি নয় তাও সে একটা মন দিয়ে বুঝতে পারে। সে জানে তুখোড় বুদ্ধিমান অরুণ তাকে তেল দিচ্ছে। একটা উদ্দেশ্য নিয়েই দিচ্ছে। তবু অন্য একটা অবুঝ মন এই এত সব মিথ্যে গুণের কথা হাঁ করে গিলল। নিজের খুশির ভাবটা চাপা দেওয়ার জন্য সে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমাকে কারও ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

প্রীতমকে এক মোহময় সম্মোহনে আচ্ছন্ন করে দিতে দিতে বড় আন্তরিকভাবে অরুণ বলে, আছে। আপনি তা হয়তো টের পান না। বিলু পায়।

প্রীতম একটু অন্যমনস্ক থেকে বলে, ব্যাংকের টাকা কি ফুরিয়ে এসেছে?

তা নয়। এখনও অনেক আছে। হয়তো দু'-চার বছর চলেও যাবে। কিন্তু তারপর একদিন ফুরোবে।

কত আছে?

বিলু বলছিল কত যেন!

আমাকে বললে পারত।

প্রীতম আবার চোখ বোজে। গোঁ আঁকড়ে ধরে থেকে লাভ নেই সে জানে। চোখ খুলে আবার তাকায় এবং বলে, লাবুর কী হবে? বিলু চাকরি করতে গেলে ওকে দেখবে কে?

আয়া থাকবে। আপনিও তো রয়েছেন। লাবুর জন্য চিন্তা নেই। যেসব বাড়ির স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে তাদের ছেলেমেয়েও তো মানুষ হচ্ছে।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, ঠিক মানুষ হচ্ছে বলা যায় না। মায়ের সঙ্গ না পেলে বাচ্চারা ভীষণ রাগী, অভিমানী, জেদি আর হিংসুটে হয়ে ওঠে।

কথাটা স্বীকার করে অরুণ মাথা নাড়ে। সাদা একটা হাসিতে প্রীতমের মাথা গুলিয়ে দিয়ে বলে, লাবু তার বাবাকে তো পাবে। লাবু তো বাবা ছাড়া কিছু বোঝে না।

প্রীতম স্নিগ্ধ হয়ে গেল। দুর্বল হয়ে গেল। মোহাচ্ছন্ন হল। আনমনা গলায় বলল, বিলু কি কোথাও চাকরি পেয়েছে?

একটা ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করেছিল। পেয়ে গেছে।

আমাকে বলেনি।— দুঃখের সঙ্গে বলে প্রীতম।

অরুণ কথাটার জবাব দেয় না। শুধু হাসে।

অরুণ চলে যাওয়ার পর প্রীতম বিলুকে ডেকে বলে, তুমি চাকরি পেয়েছ, আমাকে বলোনি কেন?

বিলু প্রীতমের দিকে খুব সহজ চোখে তাকাল, আর সেই দৃষ্টি দেখেই প্রীতম বুঝল, বিলু কস্মিনকালেও তাকে ভয় খায় না। অরুণ এমন সুন্দর সাজিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলে!

বিলু জবাব দেয়, বললে তো তুমি খুশি হবে না। কিন্তু চাকরির এখন দরকার।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রীতম টাকার হিসেব জানে। তাই রোগা দুর্বল হাতে মাথার লম্বা চুল একটু পাট করতে করতে বলে, সেটা বুঝি। কিন্তু লাবু আর-একটু বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না বিলু?

ততদিন কি আমারই চাকরির বয়স থাকবে? না কি ইচ্ছে করলেই এই বাজারে চাকরি পাওয়া যাবে?

চাকরি নেওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করলে না একবার?

বিলু ভ্রু কুঁচকে বলে, এখনও নিইনি। তোমার অসুবিধে হলে না হয় নেব না।

কথাটায় ঝাঁঝ ছিল। প্রীতম কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ভাবাবেগ আসছিল। সেটা সামলে নিতে পারল। বলল, রাগ কোরো না। টাকার হিসেব আমি কারও চেয়ে কম বুঝি না। আমার জন্যও অনেক খরচ হচ্ছে। জমানো টাকা আর কত আছে?

খুব বেশি নেই।— বিলু অন্যদিকে চেয়ে বলল, যা আছে তা দিয়ে একটা ছোটখাটো বাড়ি একটু শহরের বাইরের দিকে হয়ে যেতে পারে।

তুমি বাড়ি করার কথা ভাবছ?

তুমি বারণ করলে ভাবব না। কিন্তু এইবেলা কিছু না করলে টাকাটা খরচ হয়ে যাবে।

বাড়ি করার কথা আমি কখনও ভাবিনি।

কেন ভাবোনি? সবাই তো এসব ভাবে।

শিলিগুড়িতে আমাদের একটা বাড়ি তো আছে।

বিলু কথাটার জবাব দিল না। কিন্তু মুখে একটা কঠিন ভাব ফুটে উঠল।

প্রীতম সবই জানে। বিলু কোনওদিন শিলিগুড়ি যাবে না। ও বাড়িটাকে সে নিজের বাড়ি বলে ভাবতেও পারে না। প্রীতম একটা সত্যিকারের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, জমিটমি দেখেছ?

দেখিনি। তবে দু'-একটা খবর পেয়েছি। অরুণের ছুটির দিন দেখে তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে সবক'টা দেখে আসব ভেবে রেখেছি।

আমি জমির কিছু বুঝি না। তোমরা থাকবে, তোমাদের পছন্দ হলেই হল।

কেন, সেই বাড়িতে তুমিও তো থাকবে!

প্রীতম এই কথায় বিলুর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ মনে হয়, তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য বিলু আর অরুণ আড়ালে কোনও ষড়যন্ত্র করছে না তো! প্রীতমের ঠোঁটে জবাবটা ঝুলছিল, যদি ততদিন পৃথিবীতে থাকি। কিন্তু অত সহজ ভাবপ্রবণতার কথা বলল না প্রীতম। ভাবের ঘোরে ভেসে গিয়ে লাভ নেই। তার বড় শক্ত লড়াই।

তাই প্রীতম স্বাভাবিকভাবে বলে, ঠিক আছে। যাব।

বিলু একটু যেন সংকোচের সঙ্গে বলে, এসব টাকা-পয়সা বা বাড়ির কথা বলতে আমার খারাপ লাগে। তুমিও হয়তো খুশি হও না। কিন্তু ভাল না লাগলেও তো ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়।

এত তাড়াতাড়ি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তা কখনও চিন্তা করিনি।

বিলু কঠিন মুখে চুপ করে থাকে।

প্রীতম হাসে একটু। আশপাশ থেকে রেডিয়োতে দূরাগত একটা ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণীর শব্দ আসছে। প্রীতম নিজের পাজামায় ঢাকা পা দু'খানা দেখতে থাকে। ইডেনে টেস্ট খেলা দেখে দু'বছর আগেও সে হেঁটে ভবানীপুর ফিরেছে।

বিলু মৃদু স্বরে বলল, আমি লাবুকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরোচ্ছি। বিন্দু রইল।

প্রীতম চোখ বন্ধ করে হুঁ দিল।

ভালবাসা থাক বা না থাক, বিলু বাড়িতে না থাকলে প্রীতমের বড় ফাঁকা আর নিরর্থক লাগে।

বিলু চলে গেলে প্রীতম বিন্দুকে ডেকে খবরের কাগজটা চাইল। কাগজ মুখের সামনে মেলে ধরে শূন্য চোখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। কিছুতেই মন দিতে পারল না।

পা দুটো ঝিন ঝিন করছিল। আজকাল প্রায়ই এটা হয়। অনেকক্ষণ ধরে কুঁচকি থেকে পাতা পর্যন্ত পা দুটোয় ঝিঝি ছাড়তে থাকে। প্রীতম তার অস্ত্রশস্ত্রের জন্য হাত বাড়ায়। নিরন্তর শরীরের সঙ্গে তার লড়াই। তাকে তো বাঁচতেই হবে। অসহনীয় ঝিনঝিন অনুভূতিটাকে সহনীয় করতে সে প্রাণপণে চোখ বুজে সেতারের বাজনার শব্দ মনে আনতে থাকে। বহুক্ষণের চেষ্টায় শরীরের ঝিনঝিনকে সে সেতারের ঝালার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে। তাতে অস্বস্তি কমে যায় না, কিন্তু খানিকটা সহনীয় হয়। সেতার হয়ে যাওয়ার একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতাও হতে থাকে তার।

এ বাড়িতে কেউ গানের তেমন ভক্ত নয় বলে রেকর্ড প্লেয়ার কেনা হয়নি। প্রীতম ভাবল বিলুকে একটা সস্তার রেকর্ড প্লেয়ার কিনতে বলবে। আর অনেক সেতার-সরোদের রেকর্ড। তার অস্ত্র চাই।

বিলু তার জন্য হুইল চেয়ার কেনার কথা ভাবছে, চাকরি করার কথা ভাবছে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করছে। আসলে এসবের পিছনে প্রীতমের অনস্তিত্বের কথাই কি ভাবা হচ্ছে না? বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ভয় হঠাৎ চিনচিন করে ব্যথিয়ে ওঠে, ককিয়ে ওঠে। মরে যাব নাকি?

বে-খেয়ালে হাত মুঠো পাকায় প্রীতম, চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, ভাল আছি। ভাল আছি। ভাল আছি। ভাল আছি। এবার থেকে যখনই কেউ জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছেন? তক্ষুনি খুব হোঃ হোঃ করে হেসে আনন্দে ভেসে যেতে যেতে প্রীতম বলবে, ভাল আছি।

রাস্তা পার হওয়ার জন্য ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোট্ট লাবু মুখ তুলে মায়ের দিকে চাইল। সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু ভরসা পায় না। মা মারবে।

বিলু আনমনে দাঁড়িয়ে আছে। ভ্রূ কোঁচকানো। ভাবছে' লাবু আবার মুখ তুলে মায়ের মুখটা দেখে। তারপর ডাকে, মা!

উঁ!

লাল আলো জ্বলে গেছে। পেরোবে না?

হুঁ। চলো।— বিলু শক্ত মুঠিতে মেয়ের হাত ধরে রাস্তা পার হয়।

আনমনে হাঁটছিল বিলু। লাবু হঠাৎ হাত টেনে ধরে বলে, মা! জল!

বিলু বিরক্ত হয়। দেখে মাংসের দোকান থেকে অঢেল রক্তমাখা জল ফুটপাথ বেয়ে বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় পিছন থেকে একটা লোক বিলুব ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনওরকমে সামলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। বিলু মেয়ের চুল টেনে দিয়ে বলে, কতবার বলেছি না, রাস্তায় সভ্য হয়ে চলবে। জল তো কী হয়েছে?

লাবু মায়ের দিকে চেয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। আস্তে করে বলে, জুতোয় লাগবে তো!

জুতোয় নোংরা লাগেই, তাতে কী?

লাবু আর জবাব দেয় না। টুকটুক করে মায়ের পাশে পাশে হাঁটে। আবার হঠাৎ ডাকে, মা।

আবার কী?

ফিতে।

তোমার অনেক ফিতে আছে। আর নয়।

চশমা?

তাও নয়। বায়না করবে না একদম।

লাবু ঘাড় হেলিয়ে রাজি হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি হাঁটো লাবু। বাবা একা রয়েছে।

পায়ে লাগছে।

কী হয়েছে পায়ে?

লাবু থামে এবং হেঁট হয়ে নিজেব পায়ের জুতো খুলতে চেষ্টা করে। পারে না। অসহায় মুখে মা'র দিকে চেয়ে থাকে।

উবু হয়ে স্ট্র্যাপটা খুলে বিলু জুতোর ভিতর থেকে একটা কমলালেবুর বিচি বের করে ফেলে দেয়। বলে, কতবার শিখিয়েছি জুতো পরার আগে ঝেড়ে নিয়ে পরবে! মনে থাকে না কেন?

বিলু দোকান থেকে গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট, মাখন, বিস্কুট ইত্যাদি কেনে। তারপর লাবুকে বলে, তুমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তো লাবু। বেশি দূরে যেয়ো না। সিঁড়িতে রোদ আছে, ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখো।

লাবু বাধ্য মেয়ের মতো সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে। মা যতক্ষণ টেলিফোনে কথা বলবে ততক্ষণ তাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সে জানে।

বিলু ফোনে অরুণকে পেয়ে বলে, ওর অ্যাটিচুড কেমন দেখলে?

খারাপ কিছু নয়। মেনে নেবে।

তুমি চলে আসার পর ও চাকরি নিয়ে আবার কথা তুলেছিল। ভারী অবুঝপানা করে। বলে, লাবু বড় হলে চাকরি কোরো। তাই কি হয়?

তুমি রাগ-টাগ দেখাওনি তো!

আমি বুঝি শুধু রাগই দেখাই? তোমরা আমাকে কী ভাবো বলো তো?

এই তো আমার ওপর রাগ দেখাচ্ছ।

তোমার কথা আলাদা।

আলাদা কেন? আমি রিঅ্যাক্ট করি না বলে?

ঠিক তাই। তোমার মতো কম রিঅ্যাকশনারি আমি বেশি দেখিনি।

অরুণ হাসল। বলল, তা হলে আমি তোমার রাগের জিম্মাদার রইলাম। প্রীতমবাবুকে অনুরাগটুকুই দিয়ো।

ছি ছি।

হঠাৎ ছিছিক্কার কেন?

এত বাজে অনুপ্রাস বহুকাল শুনিনি। তুমি না স্মার্ট ছিলে? রাগের সঙ্গে অনুরাগ মেলানো কি তোমাকে মানায়? শোনো, ও জমি দেখতে রাজি হয়েছে। তুমি কবে ফ্রি হবে বলো তো! গাড়ি নিয়ে সব ক'টা জমি একদিনে ঘুরে দেখতে হবে।

বিলু, জমি কেনার ডিসিশনটা পাল্টাও আবার বলছি। কে তোমার বাড়ি তৈরির খবরদারি করবে? তার চেয়ে ফ্ল্যাট কেনো।

ফ্ল্যাটেই যদি থাকব তবে তা কিনতে যাব কেন? ভাড়া দিয়েই তো থাকতে পারি।

ফ্ল্যাট কিনলে ভাল পাড়ায় যে মেটিরিয়ালের তৈরি বাড়িতে থাকতে পারবে, জমি কিনে বাড়ি করলে সেটা তো পাবে না। খরচ বেশি, ঝামেলা বেশি।

তবু আলাদা বাড়িই আমার পছন্দ।

তোমার যে এস্টিমেট তাতে জমি কেনার পর দু'খানা ঘর তৈরির টাকাও থাকবে না।

চাকরি করলে টাকা হবে। ধীরে ধীরে করব।

অরুণ একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি হয়তো পারবে। তুমি চিরকালই অন্যরকম ছিলে।

ছাড়ছি।

ফোন রেখে বিলু দেখে, লাবু হাঁটুর কাছে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চেয়ে আছে। তাকাতেই বলল, একটা পাগল আমাকে ডাকছিল। বিলু সামান্য একটু লজ্জা পেল কি?

লাবু ঘরে ঢুকেই থমকে গেল। বাবা কাত হয়ে শুয়ে আছে। বালিশ থেকে মাথাটা নীচে পড়ে গেছে। বাবার শরীরের ওপর মস্ত পাতা খোলা খবরের কাগজটা পড়ে আছে।

মা বাথরুমে ঢুকে যেতেই খুব আস্তে আস্তে হেঁটে বাবার বিছানার কাছে আসে লাবু। সে জানে, মানুষ মরে গেলে শ্বাস ফেলে না।

লাবু বাবার নাকের কাছে ছোট্ট হাতটা বাড়িয়ে দিল। খুব জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে বাবার। সন্তর্পণে খবরের কাগজটা টেনে আনে লাবু। ছোট হাতে অত বড় বড় পাতা ভাঁজ করতে পারে না। কোনও রকমে ঘুচুমুচু করে দলা পাকিয়ে টেবিলে সরিয়ে রেখে দেয়।

একটু ছোঁবে বাবাকে? ভয় করে। কত রোগা না লোকটা! এত রোগা কেন? এত অসুখ কেন?

প্রীতমের একটা রোগা হাত খাট থেকে বেরিয়ে ঝুলে আছে। লাবু খুব ভয়ে ভয়ে একবার হাতটা ছোঁয়। ভয় করে। হাতটা ঠান্ডা। কত বড় বড় নখ বাবার হাতে! ভয় করে।

বাবা চুল কাটে না কেন মা?— ভাত খেতে বসে লাবু মাকে জিজ্ঞেস করে।

বিলুর খেয়াল হয়, তাই তো। অনেকদিন প্রীতমের চুল ছাঁটানো হয়নি। সে লাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, ও মেয়ে! বাবার দিকে তো খুব নজর তোমার!

॥ নয় ॥

দীপের ঘুম ভাঙল কানের কাছে 'শুয়োরের বাচ্চা' কথাটা শুনে। তার বিছানা ঘেঁষেই জানালা এবং জানালার পাশেই রাস্তা। এখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। একেই শীতকাল, তার ওপর বাইরে কিছু কুয়াশা থাকতে পারে। শীতকালে ঘরের জানালা বন্ধ থাকে, মাথার জানালাটা কিছু তফাতে বলে খোলা। কিন্তু কোনওটা দিয়েই আলো বা হাওয়া আসে না তেমন। অতিশয় ঘিঞ্জি গলির মধ্যে এই ঘর। এখান থেকে সব সময়ে মনে হয়, বাইরে মেঘ করে আছে কিংবা সন্ধে হয়ে এল।

ঘুম ভাঙলেই রোজ আঁশটে, কটু একটা গন্ধ এসে নাকে লাগে। জানালার ধারেই পাড়ার রাজ্যের তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, এঁটোকাটা জমা হয়ে থাকে। করপোরেশনের টিনের ঠেলাগাড়ি একটু বেলায় এসে নিয়ে যায়। ততক্ষণ গন্ধটা বেশ তীব্র। তারপরও গন্ধ একটা থাকেই। একতলার ঘর বলে এইসব অস্বস্তি। তবে এখন আর অতটা টের পায় না দীপ। সয়ে গেছে। শুধু এই সকাল বেলায় ঘুম ভাঙলে এখন কয়েকটা শ্বাসে গন্ধ পায়।

দীপনাথ বেশ ভোরেই বিছানা ছাড়ে। আজও গা থেকে কম্বলটা একটু আলসেমিভরে সরিয়ে উঠে পড়ল। কাজ আছে। সাতসকালে রাস্তায় কে কাকে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলল সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু কথাটা শুনে ঘুম ভাঙল বলে দীপনাথের মন থেকে সহজে গেল না সেটা।

কম্বলটা ভাঁজ করে রাখতে গিয়ে দীপনাথের একটু কষ্ট হল মনে। দাদা মল্লিনাথ তাকে এই বিলিতি কম্বলটা দিয়েছিল। ওয়াড় কবে ছিঁড়ে গেছে, উদ্যোগহীন মল্লিনাথ আর ওয়াড় করায়নি। অযত্নের ব্যবহারে গায়ের ঘষটানিতে রোঁয়া উঠে ভিতরের বুনোট বেরিয়ে পড়েছে কয়েক জায়গায়, তেলচিটে ময়লা ধরায় সবুজ আর হলুদ চৌখুপিগুলোও আবছা হয়ে এসেছে। আর একটা বা দুটো শীতের পরই ভিখিরি-কম্বল হয়ে যাবে।

কেন কোনও জিনিসেই তার যত্ন নেই? এ কথা ভাবতে ভাবতে দীপনাথ নিজের ওপর বিরক্ত হয়। শিয়ালদার মোড় থেকে কিনে আনা তেতো ও রসাল নিমকাঠি দিয়ে দাঁতন করতে করতে কলঘরে যাওয়ার আগে সে দু'জন চিত ও কাত হয়ে পড়ে থাকা রুমমেটকে দেখে নেয়। একটি নিতান্তই বাচ্চা ছেলে, কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। অন্যজন ফুড ডিপার্টমেন্টের মধ্যবয়সি ইন্সপেক্টর। দীপনাথের সঙ্গে কারওরই খুব একটা ভাব নেই। লেপের তলায় দু'জনেই এখন নিথর। ছাত্রটি উঠবে সাতটা নাগাদ, ইন্সপেক্টর আরও পরে। এখন বাজে পৌনে ছ'টা মাত্র।

ভিতরে একটু দরদালান মতো। দরদালানের শেষে একটু চৌখুপি কাটা একধাপ নিচু করে বাঁধানো চৌবাচ্চার চাতাল। জলের চাপ কম বলে সকলেই আজকাল গ্রাউন্ড-লেভেলের নীচে চৌবাচ্চা বানায়।

চৌবাচ্চার ধারে অবশ্য যেতে পারল না দীপ। সেখানে ম্যানেজারের বউ তার ছোট ছেলেকে বড়-বাইরে করাতে বসেছে। দীপ সুতরাং দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁতন চিবোতে থাকে। ম্যানেজারের বউয়ের মুখখানা কোনওদিনই দেখেনি দীপ। বউটি লম্বা ঘোমটা দিয়ে থাকে। কিন্তু আন্দাজ করা যায় বউটি তরুণী এবং দেখতে ভালই। গায়ের রং বেশ ফর্সা। তবে এর মতো নিষ্ঠুর প্রকৃতির মহিলাও হয় না। দু'ঘরের মাত্র ছ'জনকে নিয়ে এই ছোট্ট বোর্ডিং-এর লোকদের ম্যানেজার এমনিতেই যাচ্ছেতাই খাবার দেয়, তার ওপর এই বউটি ইচ্ছে করেই এত খারাপ রাঁধে যে মুখে দেওয়া যায় না। ফলে কেউই পুরোপেট খেতে পারে না। প্রতিদিনই থাকে রসুন দেওয়া শাক, কলাইয়ের ডাল আর তেলাপিয়া মাছের একটি গাদার টুকরো। দীপনাথ খাওয়ার সময় প্রতিদিনই বমি-বমি ভাব টের পায়। এ দিয়েও হয়তো খাওয়া যেত কিন্তু এই বউটি তা হতে দেয় না। কলাইয়ের ডাল ফোড়ন ছাড়া রেঁধে দেয়, যা খাওয়া সম্ভবই নয়। সর্ষেবাটা আর গুঁড়োমশলা দিয়ে

রাঁধা মাছটিও গলা দিয়ে নামানো শক্ত। দীপনাথ প্রায়দিনই বাইরে খেয়ে নেয়। বউটির ঘোমটার আবরু আছে বটে কিন্তু মানবিক লজ্জাবোধটুকু নেই।

দীপনাথ দাঁতন করতে করতে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কঠোর দৃষ্টিতে বউটিকে দেখছিল। সে যে অপেক্ষা করছে তা টের পেয়েছে। একবার মুখ ঘুরিয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে চকিতে দেখে নিল তাকে, তারপর ন্যাংটো এবং ভেজা ছেলেটাকে দু'হাতে আলগা করে শূন্যে তুলে হরিণের পায়ে পালাল।

প্রাতঃকৃত্যের পর, রুমমেটেরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই দীপনাথ তার ব্যায়াম সেরে নেয়। নিজেকে ফিট রাখতে হলে এটুকু অবশ্যই দরকার। গোটা ষাটেক বৈঠক আর ত্রিশটা বুকডন, কয়েকটা যোগাসন এবং বুলওয়ার্কার নিয়ে একটু পেশি খেলানো। চল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা যায়। তা যাক। দীপনাথ জানে, শরীরকে সক্ষম রাখতে গেলে ব্যায়াম ছাড়া পথ নেই। বসিয়ে রাখলেই শরীরে ঘুণ ধরে, আজ গ্যাস অম্বল. কাল রক্তচাপ, হার্টের ব্যামো দেখা দেবেই। শরীরের যত্ন নিতে দীপনাথ ঠেকে শিখেছে। এর আগে মেস বোর্ডিং-এ বার দুয়েক সে শক্ত টাইফয়েড আর হাইপার-অ্যাসিডিটিতে ভুগে বিছানা নিয়েছিল। ফলে শৌখিন শরীর হলে তার চলবে না। দুর্ভাগ্যবশত তার আপনজন বলতে কেউই নেই। দাদা, ভাই বা বোন আছে বটে কিন্তু তাদের সঙ্গে একসাথে বেড়ে ওঠেনি বলে সম্পর্ক তেমন গাঢ় হয়নি। ফলে অসুখ বা বিপদ ঘটলে ভাই-বোনদের কাছে ধরনা দিতে তার লজ্জা করে। নিজের দায়িত্ব তার একেবারেই নিজের। অসুখ হয়ে পড়ে থাকা তার পোষায় না।

ব্যায়ামের পর কাচের গেলাসে ভেজানো কাবলি ছোলা খেয়ে স্টেটসম্যানটা খুলে বসে দীপ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে এবং আড়চোখে ঘড়ি দেখে। অফিস টাইমের আগেই বোসের ফাইবার গ্লাসের সুটকেসটা সারাতে চাঁদনি চওক যেতে হবে। সুটকেস সারিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অফিসে যাবে। অফিসে তার বাঁধাধরা কাজ নেই। গেলেই হয়। আসলে সে বোস সাহেবের চব্বিশ ঘণ্টার চাকর।

পৃথিবীর খবর খুব ভাল নয়। খবরের কাগজওলারা সেই নিরানন্দ ছবিই তুলে ধরে বারবার। এনার্জি ক্রাইসিস, ইনফ্লেশন, পৃথিবী জুড়ে উগ্রপন্থীদের উৎপাত, দুর্ঘটনা। খবরের কাগজ ভাঁজ করে রেখে দীপ উঠে পোশাক পরে নেয়। চৌকির তলা থেকে সুটকেসটা বের করে টেনে। ওজনে হালকা হলেও বেশ বড়সড় জিনিস। বাসে-ট্রামে নেওয়া কষ্টকর। বোস এটার জন্য ট্যাক্সির ভাড়া দেয়নি।

কৌতূহলবশে সুটকেসটা খুলল দীপ। ভিতরটা ভেলভেটের মতো নরম কাপড় দিয়ে ঢাকা, গভীর বেগুনি তার রং, অনেকগুলো পকেট রয়েছে নানা মাপের। দীপনাথ লোভী নয়, চোর নয়। তবু তার আঙুল প্রতিটি পকেটের ভিতর খুঁজতে লাগল। কী খুঁজছে তা সে জানে না। একেবারে সামনের দিকে লম্বা পকেটটাতে তার আঙুল একটুকরো কাগজ চিমটি দিয়ে তুলে আনল।

একটু অবাক হয়ে দীপনাথ দেখে মিসেস বোসের সই করা একটা বেয়ারার চেক। টাকার অঙ্ক লেখা আছে আড়াই হাজার। কে একজন স্নিগ্ধদেব চ্যাটার্জির নামে লেখা হয়েছে। চেকটা অবশ্য ব্যাংক থেকে ফেরত দিয়েছে। লাল কালি দিয়ে আগাগোড়া চেকটাকে আক্রোশভরে কেটে দিয়েছে কেউ। দীপনাথ চেকটা পকেটে রেখে দিল।

সকালের দিকে বোস সাহেবকে তাঁর বাড়িতে রোজ একটা ফোন করার নিয়ম আছে। কোনও কাজ থাকলে বোস সাহেব তা ফোনেই বলে দেন।

আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্ট অফিস থেকে দীপ ফোন করতেই মিসেস বোসের গলা পাওয়া গেল। গলাটি মিষ্টি বটে, কিন্তু বেশ ঝাঁঝালো।

দীপনাথ সবিনয়ে বলে, আমি দীপ।

বুঝেছি। মিস্টার বোস এইমাত্র বাথরুমে গেলেন।

দীপনাথ আড়চোখে ঘড়ি দেখে। এ সময়ে বোস সাহেবের বাথরুমে যাওয়ার কথা নয়। ঘড়ির

কাঁটায় চলা মানুষ। বাথরুমে থাকেন আটটা থেকে সওয়া আটটা। এখন সাড়ে আটটা বাজছে প্রায়।

দীপ মৃদু স্বরে বলে, আজ যেন একটু ইররেগুলার হলেন মিস্টার বোস!

ওপাশে মিসেস বোস থমথমে গলায় বললেন, হ্যাঁ। কয়েকজন ভিজিটর এসে পড়েছিল বলে দেরি। আপনি কি একটু ধরবেন?

দীপনাথ সংকোচের সঙ্গে বলে, আমি ডাকঘর থেকে ফোন করছি। এখানে তো বেশিক্ষণ লাইন আটকে রাখতে দেবে না।

উঃ, আপনার যে কত প্রবলেম দীপনাথবাবু! ঠিক আছে, আপনি না হয় পরে ফোন করবেন।

শুনুন মিসেস বোস, আপনাদের সুটকেসটার মধ্যে একটা জিনিস ছিল।

কী জিনিস? দামি কিছু?

না। স্ক্র্যাপ একটা চেক। স্নিগ্ধদেব চ্যাটার্জির নামে দেওয়া আপনার সই করা চেক।

হঠাৎ খুব কঠিন হয়ে গেল মিসেস বোসের কণ্ঠস্বর। বললেন, আপনি সুটকেসটা খুলেছিলেন কেন?

দীপনাথ একটু হাসল আপনমনে। বলল, সারাতে হলে মিস্ত্রিরাও তো খুলবে। তাই আমি আগেভাগে দেখে নিচ্ছিলাম, ভিতরে কিছু রয়ে গেছে কি না।

ও। ঠিক আছে।

চেকটা কী করব?

স্ক্র্যাপ চেক যখন, ফেলে দিন।

বলেই পরমুহূর্তেই মিসেস বোস হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, না, না। শুনুন, চেকটা আপনি নিজে নিয়ে এসে আমাকে দেবেন। প্লিজ, হারিয়ে ফেলবেন না।

আচ্ছা।

ফোন রেখে রাস্তার মোড়ের কাছে স্টার সেলুনে দাড়ি কামিয়ে নিতে বসে নিমীলিত চোখে আয়নায় নিজের সাবানের ফেনায় অর্ধেক ঢাকা মুখের দিকে চেয়ে দীপ ভাবে, মিসেস বোস খুব সাবধানি মেয়ে। চেকটা দীপ নষ্ট করে নাও ফেলতে পারে এবং সেটা দিয়ে কোনওদিন মিসেস বোসকে ব্ল্যাকমেল করতেও পারে, এই ভয়েই না ফেরত চাইল! আজকাল মানুষ মানুষকে একদম বিশ্বাস করে না।

দীপ স্নিগ্ধদেব চ্যাটার্জির একটা কাল্পনিক চেহারা ভাবতে চেষ্টা করল। নামটাই এমন মোলায়েম এবং দেবত্বে ভরা যে, যতবার চোখ বুজল ততবার শিবনেত্র এক জটাধারী পুরুষকে দেখতে পেল। নিশ্চয়ই ওরকম নয় আসল স্নিগ্ধদেব। সম্ভবত পায়জামা পাঞ্জাবি পরা দাড়িওলা, রোগা ও রগচটা এবং ভীষণ পড়াশুনো জানা কোনও উগ্রপন্থী যুবাই হবে। মিসেস বোসের একটা পলিটিক্যাল লাইন আছে, সে জানে; কিন্তু কিছুতেই স্নিগ্ধদেবকে মিসেস বোসের গোপন প্রেমিক বা জার বলে মনে হয় না। কারণ, মিসেস বোস ওরকম নয়। গোপনতার ধারও ধারে না। যা চায় তা মুখ ফুটে চাইতে জানে। দরকার মতো স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো যথেষ্ট হিম্মত আছে। না, মিসেস বোসের চরিত্রের সঙ্গে গুপ্তপ্রেম ব্যাপারটা একদম খাটে না। তবু কোথাও একটা গোপনীয়তা আছেও। নইলে শেষ মুহূর্তে চেকটা অত আকুলভাবে ফেরত চাইত না।

দীপ যখন চাঁদনি চওকে পৌঁছোল তখন বেলা সাড়ে ন'টা। নানু মিয়ার দোকানে সুটকেসটা জমা করে বেরোল আবার ফোন করতে। মিস্টার বোস এতক্ষণে অফিসে এসে গেছেন।

ফোন ধরেই মিস্টার বোস বলেন, আজ শনিবার খেয়াল আছে তো?

হ্যাঁ।

আপনি বেলা একটার মধ্যে রেসের মাঠে পৌঁছে যাবেন। আজ অফিসে আসার দরকার নেই। আর শুনুন মিসেস বোস নিউ মার্কেটে গেছেন। যদি অসুবিধে না হয় তা হলে গো দেয়ার অ্যান্ড ট্রাই টু বি সাম হেলপ টু হার।

আচ্ছা।— বলতে গিয়ে দীপ অনুভব করে একটা অদ্ভুত আনন্দে তার গলাটা হঠাৎ কাঁপছে।

বোস ফোনেই একটু শ্লেষের হাসি হেসে বলেন, বেটার ট্রাই টু রেসট্রেন হার ফ্রম বায়িং থিংস। ও কে?

ও কে।

বোস ফোন রেখে দেন।

চাঁদনি চওক থেকে নিউ মার্কেটে লম্বা পায়ে এক লহমায় পৌঁছে যায় দীপ। কিন্তু ভারী হতাশ হয়ে দেখে, নিউ মার্কেটে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। লোডশেডিং-এর মধ্যে টিমটিমে মোম জ্বলছে মাত্র। এই আলোয় কাউকে চিনে বের করা খুবই মুশকিল।

দীপ পরিস্থিতিটা একটু ধীর স্থিরভাবে বুঝে নিল। নিউ মার্কেটের গোলকধাঁধায় কীভাবে, কোন প্ল্যানমাফিক এগোলে মিসেস বোসকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হবে না সেই স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক করে শিকারি বেড়ালের মতো লঘু সতর্ক পায়ে এগোতে লাগল।

দীপের ভিতরে যে আর-একটা দুর্মুখ, দুর্বাসা টাইপের দীপ বাস করে সে ঠিক এই সময়ে প্রশ্ন করল, মিসেস বোসকে খুঁজে বের করার পিছনে তোমার আসল স্বার্থটা কী বলো তো বাপ! নিছক ডিউটি না অন্য কিছু?

দীপ ধমক দিয়ে বলে, চোপ শালা! ওসব বললে মুখ ভেঙে দেব। জানো না, আমি চব্বিশ ঘণ্টার চাকর! ডিউটি করছি।

ডিউটি? না কি রথ দেখা আর কলা বেচা। ভাঁড়িয়ো না বাপ, সব বুঝি। এই ঘুটঘুটে লোডশেডিং-এ খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার যে জোস দেখছি তোমার, তার পিছনে কেবল ডিউটি আছে বললে ঘোড়ায় পর্যন্ত হাসবে।

দূর গাড়ল। মিসেস বোসকে নিয়ে ভেবে ফালতু লাভ কী? একে বড়লোকের বউ, তার ওপর চাবুকের মতো তেজি মেয়ে। আমার মতো ম্যান্তামারাকে পাত্তা দেবে নাকি? স্বপ্নের পোলাও আমি খাই না হে।

রাখো রাখো! মেয়েছেলে ইজ মেয়েছেলে। সে যেমনই হোক, আর যারই বউ হোক। পুরুষের আবার অত কাণ্ডজ্ঞান থাকে নাকি? যার থাকে তার থাকে, কিন্তু তোমার অন্তত নেই।

আমার মন অত নরম নয়। এই তো দেখলে সেদিন দশ-বারো বছরের পুরনো সিগারেটের নেশা, কেমন ছেড়ে দিলাম। ভিতরের ইস্পাতে একটুও মরচে পড়েনি।

যত যা-ই বলো, আমার খুব ভাল ঠেকছে না। মেয়েছেলেটাও ইদানীং তোমাকে একটু একটু নজর করছে। চাকরির কথা ভেবে সাবধান থেকো। গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেলে বোস তোমাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়বে।

আরে না না। বলতে বলতে দীপ আবছায়ায় একটা মুঠো গয়নার দোকানের সামনে মিসেস বোসের মতো একজনকে দেখতে পেয়ে খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রায় ঘাড়ে শ্বাস ফেলে বলল, মিসেস বোস?

মহিলা মুখ ফেরালেন।

দীপ বলল, সরি।

গলির পর গলি খুঁজে যাচ্ছে দীপ। পাচ্ছে না।

তার ভিতরকার দুর্বাসাটা অক্রুর-সংবাদ দিল, লোডশেডিং বলে কেটে পড়েনি তো? খামোখা নাকাল হোচ্ছ খুঁজে খুঁজে।

উহুঁ! দীপ মাথা নেড়ে ভাবে, অন্ধকারে ভয় খাওয়ার মেয়ে নয়।

মার্কেটের মাঝমধ্যিখানে গোল চত্বরটায় দাঁড়িয়ে দীপ চারদিকে গলির মুখের দিকে চিন্তিত চোখে চায়। স্ট্র্যাটেজি ভাবে।

ভিতরকার দীপ খুব হাসে, মিসেস বোসকে খোঁজার জন্য যে পরিমাণে হামলে পড়েছ তাতে মনে হচ্ছে না পেলে হার্টফেল করবে। তবে আমি তোমাকে বরং একটা টিপস দিই বুদ্ধুরাম। বাইরে গিয়ে কার-পার্কটা খোঁজো। যদি বোসের অফিসের গাড়িটা দেখতে পাও তবে সেখানে একদম স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের নাড়িটা বরং দেখো।

দীপ লম্বা পায়ে দক্ষিণের ফটকের দিকে এগোল। তড়িঘড়িতে কোনওদিকে নজর করছিল না। কিন্তু ভাগ্য সহায়। আচমকাই একটা হ্যাজাকের আলোয় সামনের দোকান থেকে হাতে মস্ত বেতের বাস্কেট ঝুলিয়ে বেরিয়ে এলেন মিসেস বোস। পরনে জিনস আর কামিজ।

দীপের বুকের মধ্যে একটা ব্যাং হঠাৎ তার স্থবিরতা ঝেড়ে ফেলে মস্ত এক লাফ মারল।

মিসেস বোস!— দীপের গলা কাঁপছে।

আরে! আপনি এখানে?

আপনার খোঁজেই।

মিসেস বোসের হাত থেকে বাস্কেটটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায় দীপ। উনি বাস্কেটটা সরিয়ে নিয়ে বলেন, আই নিড নো হেলপ। আমার খোঁজে আপনাকে কে পাঠাল? মিস্টার বোস নাকি?

আর কে!— দীপ যতদূর সম্ভব অধস্তনের মতো বিনয়ী হেসে বলে।

অন্ধকারটা দীপের চোখে সয়ে গেছে। হ্যাজাকের আলোটাও বেশি চোখ ধাঁধাচ্ছে না। কাজেই আলো-অন্ধকারের সমস্যায় দীপ আর পীড়িত নয়। মিসেস বোসের ভ্রু-র ভাঁজ স্পষ্টই দেখতে পেল সে। এবং ভয় পেল।

তবে ভ্রু কুঁচকেও মিসেস বোস হেসে ফেললেন। বললেন, এটা স্পাইং নয় তো! ফিনানসিয়াল অফেনস ধরার জন্য মিস্টার বোস হয়তো আপনাকে লাগিয়েছেন।

না, না। আমি জাস্ট হেলপ করতে এসেছি।

মিসেস বোস মাথা নেড়ে বলেন, আমার হেলপ দরকার নেই। আমি ওয়ার্কিং উয়োম্যান। নিজেকে আমি শ্রমিক বলে মনে করি।

দীপ বলল, তা হলে মিস্টার বোসকে সেই কথাই বলব তো? আপনি আমার সাহায্য নেননি।

যা খুশি বলবেন। সেটা আপনার ভাববার কথা।

মিসেস বোস চোখে পরকলাটা পরেননি। পরলে ভাল হত। বাগডোগরার পর থেকে মিসেস বোস সম্পর্কে খুব সচেতন হয়ে পড়েছে দীপ। এতকাল তেমন লক্ষ করেনি, কারণ মিসেস বোসও লক্ষ করেননি তাকে। এখন দীপ টের পায়, মিসেস বোসের চোখে একটা অত্যন্ত শানিত এবং সৌজন্যহীন কঠিন দৃষ্টি রয়েছে। ইচ্ছে করলে উনি খুবই অভদ্র হতে পারেন।

দীপ একটু নিভে যায় মনে মনে। ম্লান মুখে বলে, শ্রমিক তো আমিও।

মিসেস বোস হাতের বাস্কেটটা দোলাতে দোলাতে দক্ষিণের ফটকের দিকে হাঁটছিলেন। পিছনে পিছনে বশংবদের মতো দীপ। মিসেস বোস মাথা ঝাঁকিয়ে বব চুলের ঝাপটা মেরে বললেন, কক্ষনও আপনি শ্রমিক নন। খাঁটি শ্রমিক হলে আপনাকে শ্রদ্ধা করতাম। আপনি হলেন মিস্টার বোসের কোর্ট জেস্টার, যাকে পারিষদ বলে।

রাগ অভিমান ইত্যাদি বহুকাল হল দীপের নেই। তার আদ্যন্ত চিন্তা হল টিকে থাকার। নানা ঘষটানিতে তার অনেক ফালতু জিনিস ভোঁতা হয়ে গেছে। কাজেই এ কথায় সে অপমান বোধ করল না। বলল, কথাটা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার পজিশনে না থাকলে আমার প্রবলেমটাও বোঝা যাবে না মিসেস বোস।

মিসেস বোস ঘাড় ফিরিয়ে দীপের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে এক ঝলক তাকালেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, যদি আমাকে নিতান্তই সম্বোধন করতে হয় তবে দয়া করে আমার নাম ধরে

ডাকবেন। আমার নাম মণিদীপা। নিজেকে আমি মিসেস বোস বলে ভাবতে ভালবাসি না। আমাকে যারা চেনে তারা সবাই মণিদীপা বলে ডাকে। মিসেস বোস বলে নয়।

দীপ একটু থমকায়। তারপর আস্তে করে বলে, আমার পক্ষে সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না কি? মিস্টার বোসই বা কী ভাববেন?

মণিদীপা কঠিন স্বরেই বলেন, আপনি শ্রমিক নন, স্লেভ। বন্ডেড লেবারার। শ্রমিকদের আত্মমর্যাদা আপনার চেয়ে হাজার গুণ বেশি। তবু আপনাকে বলে দিচ্ছি, যদি মণিদীপা বলে ডাকতে পারেন তবেই ডাকবেন। নইলে সম্বোধন করার দরকার নেই।

অন্ধকার থেকে বাইরের উজ্জ্বল রোদে এলে মণিদীপার চেহারাটা যেন আরও ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। পরনে রং-চটা নীল জিনস, গায়ে একটা হলদেটে খাটো টি-শার্ট, বাঁ হাতে গালা দিয়ে তৈরি মোটা একটা বালা, ডান হাতে ঘড়ি। কিন্তু এই নির্মোকের ভিতরে মণিদীপাকে সুন্দর না কুৎসিত দেখাচ্ছে সে বিচার এখন দীপের কাছে বাহুল্য মাত্র। পোশাকের চেয়ে এখন বহুগুণ বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির ব্যক্তিত্ব।

দীপ তার অসফল জীবনের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির চোখে চোখ রাখারই সাহস পাচ্ছিল না। আড়চোখে দেখে, শ্যামল দিঘল চেহারা ও কমনীয় সুশ্রী মুখের মেয়েটি যেন তার যাবতীয় বাঙালিয়ানা আর মেয়েলিপনা ঝেড়ে ফেলে বেপরোয়া দাঁড়িয়ে আছে। এত নির্ভয় হাবভাব দীপ কোনও মেয়ের মধ্যে দেখেনি।

মার্কেটের চাতালে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভ্রু কুঁচকে চারদিকে চাইলেন মণিদীপা। কার পার্কে বোস সাহেবের পুরনো মরিস গাড়িটা ধূলিধূসর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপেক রাষ্ট্ররা তেলের দাম বাড়ানোর পর থেকে বোস নিজের গাড়ি আর গ্যারাজ থেকে পারতপক্ষে বের করেন না। অফিসের গাড়িই ব্যবহার করেন। মণিদীপা রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে গাড়ির লক করা দরজা খুললেন।

ভদ্রতাবশে দীপ কাছে গেল। দাঁড়িয়েও রইল। কিন্তু কিছু বলার ছিল না বলে কথা বলল না।

মণিদীপা একরকম কঠিন মুখ করে সামনের দিকে চেয়ে থেকে গাড়ি ছাড়লেন।

আস্তে আস্তে হেঁটে দীপনাথ চাঁদনির দিকে ফিরে আসে। হঠাৎ খেয়াল হয়, মিসেস বোসকে চেকটা দেওয়া হল না। উনিও চাইলেন না।

ভারী অন্যমনস্ক বোধ করে দীপ। রাস্তাঘাট কিছুই খেয়াল করে না। এক রিমোট কন্ট্রোলে চালিত হয়ে সে বিপজ্জনক রাস্তাঘাট পেরোয় এবং নানু মিয়ার দোকানে এসে কাঠের টুলে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। সুটকেসটা সারাই করতে আরও একটু সময় লাগবে।

দীপ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুঝতে পারে, মিস্টার বোস তাকে হয়তো খামোখা শুধুমাত্র তাঁর বউকে হেলপ করার জন্য নিউ মার্কেটে পাঠাননি। তাকে দেখে মণিদীপাও খামোখা রেগে যায়নি। এই দুইয়ের মধ্যে তার বোধের অগম্য কোনও যোগসূত্র থাকতে পারে।

ঢাউস সুটকেসটা নিয়ে প্রায় দমসম হয়ে রেসের মাঠে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দীপ লম্বা দৈত্যের মতো বোস সাহেবের মুখের বিরক্তিটা লক্ষ করে। গেটের কাছেই ধৈর্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। দীপের দিকে একবার অবহেলায় চেয়ে দেখে বললেন, ফার্স্ট রেস এখুনি শুরু হবে।

দীপ দুঃখিত মুখে বলে, সারাই করতে অনেক সময় লাগল। বাসেও ভিড় ছিল।

ট্যাক্সি নিলেই তো পারতেন।

খুঁজেছি। পেলাম না।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। ট্যাক্সি খুঁজলে হয়তো সত্যিই পাওয়া যেত না। কিন্তু দীপ ট্যাক্সির চেষ্টাই করেনি। কারণ, ট্যাক্সি ভাড়া কে দেবে সেটা স্পষ্ট নয়। এমনকী গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে ঢোকার টিকিটের দামটা নিয়েও সে দুশ্চিন্তা করছে।

বোস হিপ পকেট থেকে আনকোরা নতুন এক বান্ডিল দশ টাকার নোট আর একটা প্যাডের

কাগজ বের করে দীপের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, খুব তাড়াতাড়ি করুন। বেটিং কাগজে লেখা আছে, একটু দেখে কাটবেন।

দীপ এ কাজে নতুন নয়। মাথা নাড়ল এবং সুটকেসটা নিয়েই কাউন্টারের দিকে দৌড়োল। লাইনে দাঁড়িয়ে কাগজটা আড়চোখে দেখে নেয় সে। সব ক'টা রেসেই আলাদা করে উইন আর প্লেস খেলছেন বোস সাহেব। ট্রেবল-টোট আর জ্যাকপটের বাছাই রয়েছে পাঁচটা করে। টাকা থাকলে কী দেদার ওড়ানো যায়!

সরু চ্যানেলে সুটকেসটা নিয়ে ভারী অসুবিধে হচ্ছিল। সামনের ও পিছনের লোকেরা তাকাচ্ছে। বিরক্তও হচ্ছে। কিন্তু দীপের কিছু করার নেই। সে পরিষ্কার বুঝে গেছে, লোকলজ্জা জিনিসটার কোনও মানেই হয় না। তার যা কাজ তা তাকে কারও পরোয়া না রেখেই করে যেতে হবে।

দীপ বোস সাহেবের কাগজ দেখে টিকিট কাটল। তারপর পকেট থেকে টাকা বের করে নিজের জন্যও একটা উইন কাটল। দু'নম্বর ঘোড়ার নাম মালকা। নামটা পছন্দ হল দীপের। নইলে ঘোড়ার সে কিছুই বোঝে না।

বোস সাহেবের সঙ্গে এখন আর দেখা করার দরকার নেই। একদম রেসের পর দেখা হলেই হবে। তাকে শুধু কাগজ দেখে টিকিট কেটে যেতে হবে।

রেস দেখার জন্য স্ট্যান্ডে গেল না দীপ। মজবুত সুটকেসটা এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে তার ওপর বসে একটু দম নিল। এই শীতের দুপুর আর তেমন শীতল নয়। তার বেশ ঘাম হচ্ছে। নিজামে ঢুকে রোল খেয়েছিল সস্তায়, এখন সেই রোলের উদগার উঠল একটা। কিন্তু বস্তুত তার পেটে এখনও যথেষ্ট খিদে আছে। দুপুরে ভাত না খেলে সে কোনওদিনই স্বস্তি বোধ করে না।

প্রথম রেসের ঘোড়াগুলিকে দেখতে পেল না দীপ। ভিড়ের মাথা টপকে জকিদের টুপিগুলিকে ছুটে যেতে দেখল শুধু। প্রচণ্ড চেঁচানিতে কান ঝালাপালা। নিস্তেজ হয়ে বসেই রইল দীপ। শুনতে পেল, কিং আরথার বাজি মেরেছে। সে জেতেনি, বোস সাহেবও নন।

দ্বিতীয় রেসের টিকিট কাটতে গিয়ে নিজের জন্য আবার দু'নম্বরই কাটে দীপ। ঘোড়ার নাম স্পার। স্পার কথাটার মানেই জানে না সে। তবু সেই অচেনা নামের ঘোড়ায় সে তার মহার্ঘ টাকা বাজি রেখে মনে মনে বলল, কোনও ঘোড়াই তো চিরকাল হেরে যায় না। একদিন না একদিন একবার হলেও জেতে।

কিন্তু স্পার জিতল না। তবে বোস সাহেবের উইন লেগে গেল এবার।

তৃতীয় রেসেও দু'নম্বর ঘোড়ায় নিজের বাজি ফেলল দীপ। যা থাকে কপালে, আজ লাগাতার দু'নম্বরেই খেলে যাবে। এবার দু'নম্বরের নামটাও সুন্দর। ফ্লোরা। লাইনে তার সামনের লোকটাও বোধহয় ফ্লোরাই কাটবে। কারণ সেই লোকটার সামনে আর-একজন মুখ ফিরিয়ে বলল, ফ্লোরার ওপর ধরছিস! ওর কি আগের দিন আর আছে! ফ্লোরার টাকা অনেক খেয়েছি, কিন্তু আর ও টাকা দেবে না।

কিন্তু তাতে দীপের কিছু যায় আসে না। সেই ফ্লোরাতেই বাজি ধরল। এবং জিতল না। বোস সাহেবের ঘোড়াও আর সে মেলায় না। রেসের পর টাকা নেওয়ার সময়েই দেখবে।

চতুর্থ বাজিতে টিকিট কাটতে গিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ল দীপ। দু'নম্বরের নাম লাকি ডিপ। কিন্তু পাঁচ নম্বরের নাম মণিদীপ। আশ্চর্য! কিন্তু পাঁচ নম্বর না কেটে দীপ করেই বা কী! মণিদীপারা যে ভারী তেজি হয়।

দীপ সুটকেস সামলে চ্যানেল থেকে বেরিয়ে এল। এবং খানিকটা অবাক হয়ে দেখল, একটা চেনা মুখের লোক হাঁ করে তাকে দেখছে। কে লোকটা?

পরমুহূর্তেই ভারী লজ্জা পায় দীপ। এ যে মেজদা শ্রীনাথ। কতকাল দেখা নেই।

॥ দশ ॥

রেসের মাঠে অবশ্য চেনা লোককেও চেনা দেওয়ার নিয়ম নেই। এই সত্যটা মিস্টার বোসের সঙ্গে রেসের মাঠে এসে এসে বুঝেছে দীপনাথ। তাই সে শ্রীনাথকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং আড়চোখে দেখে, শ্রীনাথও অন্য দিকে চলে যাচ্ছে।

এইভাবেই তারা দুই ভাই দুই দিকে আলাদা হয়ে চলে যেতে পারত এবং দীর্ঘকাল আর তাদের হয়তো দেখা হত না। কিন্তু পরের রেসে টিকিট কাটতে গিয়ে দীপনাথ আর শ্রীনাথ একেবারে আগুপিছু পড়ে গেল। বস্তুত দীপনাথের শ্বাস শ্রীনাথের ঘাড়ে পড়ছে।

তবু কথা বলছিল না দীপ। অন্য দিকে চেয়ে ছিল। টিকিট কেটে বেরিয়ে আসার পর হঠাৎ শ্রীনাথই মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করল, কত নম্বরে ধরলি?

দুই।— খুব লজ্জার সঙ্গে দীপনাথ বলে।

গাধা।— শ্রীনাথের উত্তর।

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দীপনাথ বলে, বাজে ঘোড়া নাকি?

ঘোড়াই নয়। বললাম তো, গাধা। এসব না বুঝেসুঝে পয়সা নষ্ট করতে আসিস বুঝি?

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আমি আসি না। বসের সঙ্গে আসতে হয়।

পরেরগুলো অমন আনতাবড়ি খেলিস না। টিপস দিচ্ছি, টুকে নে।

দীপনাথ দ্বিধা করতে থাকে। তার এমন অনেক টাকা নেই যে নষ্ট করবে। টিপস নেওয়াই হয়তো ভাল। শ্রীনাথ এসব হয়তো তার চেয়ে বেশিই বোঝে। সে বলল, টুকতে হবে না। বলো, আমার মনে থাকবে।

শ্রীনাথ সে কথায় কান না দিয়ে একটা বাতিল টিকিটের পিছনে ডটপেন দিয়ে কয়েকটা নম্বর লিখে তার হাতে দেয়। বলে, বিলুদের খবর কী? প্রীতমের নাকি অসুখ! তোর বউদি বলছিল।

খুব অসুখ। হয়তো বাঁচবে না।

কথাটা শুনে শ্রীনাথ একটু কেমন হয়ে যায় যেন। বলে, কী অসুখ? ক্যানসার নাকি?

না। হাড়ের ভিতরে আর নার্ভে ইনফেকশন। ডাক্তার কিছু ধরতে পারছে না।

চিকিৎসার কী হচ্ছে?

যা হওয়ার সবরকম হচ্ছে। আকুপাংচারও।

পরের রেসটা শুরু এবং শেষ হল। তুমুল হট্টগোলেও দুই ভাই তেমন উত্তেজিত হল না। কিন্তু বোর্ডে নম্বর উঠলে দু'জনেই পুতুলের মতো টিকিটের নম্বর মিলিয়ে নিল। দীপ জেতেনি। কিন্তু শ্রীনাথের মুখে সামান্য হাসির ফুসকুড়ি গলে যাওয়ায় দীপ বুঝল, মেজদা জিতেছে। সে বলল, প্রীতমকে কোথাও একটু চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া দরকার। কাছেপিঠে হলেই ভাল হয়।

এতক্ষণ আড়চোখে দীপনাথের হাতের সুটকেসটা বারবার দেখছিল শ্রীনাথ। হঠাৎ বলল, কোথাও যাচ্ছিস নাকি? হাতে সুটকেস কেন?

না, এটা সারানো হল।

শ্রীনাথকে একটু অন্যমনস্ক লাগছিল দীপনাথের। কোনও দিকেই যেন ঠিক মন নেই অথবা বহু দিকেই মন দিতে হচ্ছে। কথা বলতে বলতে ভিড়ের মধ্যে কার দিকে চেয়ে যেন একটু চোখের ইশারাও দিল।

দীপনাথের মনে হয়, শ্রীনাথের কোথাও একটা গূঢ় পরিবর্তন ঘটেছে। চালচলতির মধ্যেই একটা উড়ু-উড়ু ভাব।

শ্রীনাথ আনমনে কী একটু ভেবে হঠাৎ বলল, ওদের টাকা-পয়সা কীরকম?

সেটা এখনও কোনও দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। অফিস থেকে প্রীতম বেশ কিছু টাকা পেয়েছে।

শ্রীনাথ ভ্রু কুঁচকে বলল, গত বছরই তো ভাইফোঁটা নিয়ে এলাম। বিলু সেবার মস্ত মস্ত গলদা চিংড়ি আনিয়েছিল, চল্লিশ না পঞ্চাশ টাকা কেজি। তখনও খারাপ কিছু দেখিনি প্রীতমের।

গত বছর! ভুল বলছ। গত বছর নয়, তার আগের বার।

তাই নাকি? হতে পারে। বিলুর সদ্য একটা মেয়ে হয়েছিল তখন। সেটা তখনও খুব ছোট। আর কিছু হয়েছে তার পরে?

না। তুমি বহুকাল যাও না বিলুর বাসায়।

এবার একদিন যাব।

দীপ একটু রাগ করে বলল, রেসের মাঠ পর্যন্ত আসতে পারলে। বিলুর বাসা আর কত দূর! এখান থেকে ভবানীপুর তো হেঁটেই যাওয়া যায়।

শ্রীনাথ একটু হাসল। একসময়ে সে সুপুরুষ ছিল। বয়েসকালে আবার চেহারাটা জেল্লা দিচ্ছে। তবে বড়ই নরম পৌরুষহীন চেহারা। কিন্তু হাসলে চেহারার জেল্লা ভেদ করে একটা বিষণ্ণতা যেন ফুটে বেরোতে চায়। বলল, এই পথটুকু পার হওয়া যে কত শক্ত!

পুতুলের মতোই নিজেদের অজান্তে পরের রেসটার জন্য টিকিট কাটতে কাউন্টারে এসে দুই ভাই দাঁড়ায়। দীপনাথ বলে, ওটা কোনও কাজের কথা নয়। একটা লোক মরতে চলেছে, তাকে এই বেলা একবার শেষ দেখাও তো দেখে আসতে হয় মেজদা। নইলে কথা থাকবে।

যেতেই হবে!— দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রীনাথ বলে।

দীপনাথ শ্রীনাথকে নিশ্চিন্ত করার জন্য খুব সাবধানে বলল, ওদের টাকা-পয়সার বা অন্য কোনওরকম হেলপ দরকার নেই। জাস্ট মাঝে মাঝে গিয়ে একটু মনোবল বাড়িয়ে আসা আর কী! প্রীতমটা বেঁচে থাকার জন্য কত যে আকুলি-বিকুলি করে।

শ্রীনাথ আবার একটু হাসে। বলে, টাকাপয়সার দরকার হলে দিতে ভয় পাব নাকি?

আমি সেভাবে বলিনি।

দূর বোকা! আমিও সেভাবে বলছি না। আসলে আমার যেটুকু আছে তা নিতান্তই আমার। সে অবশ্য সামান্যই। দাদার টাকা তো আর আমার নয়। তোর বউদির। আমারটুকু আমি দিতে পারি।

এই একটা রহস্য থেকে গেল চিরকাল। কেন যে বড়দা মল্লিনাথ তার যাবতীয় বিষয়-আশয় ভাইয়ের বউকে লিখে দিয়ে গেল তা কে বলবে! দীপনাথের কোনও লোভ নেই বটে, কিন্তু ব্যাপারটা মনে পড়লে তার খুব ধাঁধা লাগে। কিছু কুকথাও শুনেছে সে মল্লিনাথ আর বউদিকে নিয়ে। কথাগুলো সুখশ্রাব্য নয়। গায়ে জ্বালা ধরে যায়।

দীপনাথ বলল, বলছি তো, ওদের টাকার দরকারটা আদপেই প্রধান নয়। ওদের যেটা নেই সেটা হল আপনজন।

কথাটা শ্রীনাথের বোধহয় মনোমত হল। ওপর নীচে বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, ওইটেই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা। আপনজন পাওয়াই সবচেয়ে কঠিন। জন থাকলেও তারা আপন হতে চায় না। তুই নম্বর দেখে টিকিট কাট।

তাই কাটে দীপনাথ।

বাইরে এসে শ্রীনাথ জিজ্ঞেস করে, এখন কী করছিস?

একটা গুজরাটি কোম্পানির ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সেক্রেটারি।

কত দিচ্ছে-থুচ্ছে?

দেয় একরকম। চলে যায়।

ওটা কোনও কাজের কথা নয়। পে স্কেল আছে তো?

না। চাকরিতে সদ্য ঢুকেছি, ওসব এখনও ঠিক হয়নি।

বিয়ে করে বসিসনি তো?

না।

করিস না। ও ঝামেলায় না যাওয়াই ভাল।

শ্রীনাথের মুখে এ কথা শুনবে বলে আশা করেনি দীপনাথ। বউদির সঙ্গে কি তা হলে ওর বনিবনা হচ্ছে না!

শ্রীনাথ নিজেই রহস্য পরিষ্কার করে দিয়ে বলল, চারদিকে এত থিকথিকে মানুষজন দেখে আমার বিয়ের ওপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আর লোক বাড়িয়ে লাভ কী? তা ছাড়া আজকালকার মেয়েরা যত্নআত্তিও জানে না। ঘাড়ে চেপে বসে বসে খায় আর রক্ত শোষে।

কথাগুলো নীরবে শুনল দীপ। মনে মনে হাসল। দীপনাথের ভালমন্দ ভেবে এত কথা বলেনি মেজদা। ও নিজের কথা ভেবে বলছে। দুনিয়ার সব মানুষই আজকাল নিজের নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে আর পাঁচটা লোকের ভালমন্দ বিচার করে।

শ্রীনাথ আর দীপনাথ দু'জনেই এই রেসটায় মার খেল। শ্রীনাথের টিপস মেলেনি। তবে দীপ অন্যমনস্কতার মধ্যেও চমকে উঠে দেখল, এই রেসে বাজি মেরেছে দু'নম্বর ঘোড়া। তারও আজ আগাগোড়া দু'নম্বরে বাজি ধরারই সংকল্প ছিল। ধরলে ঠকতে হত না।

শ্রীনাথ নিজের টিকিটটা দুমড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, তোর মেসের ঠিকানাটা দিয়ে রাখিস তো। একবার দিয়েছিলি, সেটা বোধ হয় হারিয়ে গেছে।

দীপ বলে, হারিয়ে ভালই হয়েছে। সেই বোর্ডিং-এ আমি আর থাকি না। এখনকার ঠিকানা আলাদা। অনেকদিন আমার কোনও খোঁজ রাখো না মেজদা!

তুই নিজেই কি রাখিস!

রতনপুরে সবাই ভাল আছে?

আছে ভালই। সবজি, ডিম, মাছ সব বাড়িতে বা জমিতে হচ্ছে। খাঁটি সব জিনিস পাচ্ছে, ভাল না থাকার কী?

সজল কত বড় হল?

এঁচড়ে পাকা।

অনেকদিন আগে ওকে চিড়িয়াখানা দেখাব বলে কথা দিয়েছিলাম। সেটা আর হয়নি।

চিড়িয়াখানা বহুবার দেখেছে। চিন্তা নেই। তা ছাড়া নিজেদের বাড়িতেই তো চিড়িয়াখানা। কত পাগল, ছাগল, সাধু, বদমাশের আনাগোনা।

শ্রীনাথের কথার ভিতর একটা ভয়ংকর বিদ্বেষ আর ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে। ঠিক অনুধাবন করতে পারছে না দীপনাথ। তবে আঁচটা গায়ে লাগছে। শ্রীনাথ কখনও বোধহয় কাউকে সুখী করেনি, সুখী সে নিজেও হয়নি।

পরের রেসগুলিতে একের পর এক দু'নম্বর ঘোড়া বাজিমাত করে গেল। শ্রীনাথের একটা টিপসও মিলল না। সেজন্য শ্রীনাথকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। স্বধর্মে মরাও যে ভাল এই আপ্তবাক্যটা যে মনে রাখেনি দীপ! নিজের সংকল্পে অচল থাকলে সে আজ বহু টাকা জিততে পারত।

শ্রীনাথ দাঁড়াল না। রেস শেষ হতেই বলল, চলি রে।

ভিড়ের ভিতর দূর থেকে মেজদাকে লক্ষ করছিল দীপনাথ। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, রেসের মাঠে মেজদা একা আসেনি। দীপনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্যে কাকে যেন চোখের ইশারা দিচ্ছিল।

দীপনাথের অনুমান মিথ্যে নয়। শ্রীনাথ পেমেন্ট কাউন্টারের কাছ বরাবর পৌঁছলে একটা কালো মতো বদমাশ চেহারার লোক আর ফর্সা মতো একটা মেয়ে তার সঙ্গ নিল।

গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড থেকে বোস নেমে আসে। সঙ্গে তার সমপর্যায়ের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এবং তাদের

দু'জনের দু'রকম সুন্দরী দু'টি স্ত্রী। সবাই খুব হাসছে। প্রায় সবাইকেই চেনে দীপ।

ক্লাইন ওয়ালকটের পি আর ও দত্ত দীপকে দেখে বলে উঠল, হ্যাল্লো! হাউ ইজ লাইফ?

দত্তর মুখটা রক্তাভ। আলগা একটা চকচকে ভাব তার চোখে। অঢেল বিয়ারের প্রভাব। দীপ মৃদু হেসে বলল, টেরিফিক।

তার হাতের সুটকেসটা সবাই দেখছে, তবে ভদ্রতাবশে কেউ জিজ্ঞেস করছে না কিছু। সবাই ফটকের দিকে হাঁটছে। দীপ বুঝতে পারছে না উইনিং টিকিটের পেমেন্টগুলো কে নেবে! সে জানে, বোস নিজে পেমেন্ট নিতে ভালবাসে। আজও নিজেই নেবে কি? সুটকেস নিয়ে দলের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে এই ছোট সমস্যাটা আবার ভাবিয়ে তুলল তাকে। কোনও ব্যাপারেই সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে দ্বিধাগ্রস্ত ও সমস্যাপীড়িত মন নিয়ে সে মহিলা দু'জনের সৌন্দর্যও ভাল করে উপভোগ করতে পারছে না।

ফটকের কাছাকাছি এসে অবশ্য বোস তাকে সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়ে বলল, দীপবাবু, আপনি বরং পেমেন্টটা নিয়ে আসুন। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।

সুটকেস দুলিয়ে দীপ দৌড়ল। বোস প্রায় হাজার দুয়েক টাকা জিতেছে। টাকায় টাকা আনে। বেশি টাকা না খেললে এ টাকাটা উসুল করতে পারত না বোস। দীপ নিজে একটির বেশি দু'টি টিকিট কাটার সাহস পায়নি। সামনের লাইনে দু'-চারজনের মুখে খুব ফ্যাকফেকে হাসি। একজন চেঁচিয়ে বলছে, আজ ছিল দুইয়ের দিন।

দীপ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মেজদার সঙ্গে দেখা না হলে সে আজ দুই নম্বর ঘোড়াগুলোর ওপর খেলত। কিছু অন্তত জিতেও যেত। কিন্তু এই অনিশ্চয়তার নামই তো ঘোড়দৌড়।

পেমেন্ট নিয়ে দীপ বাইরে এসে দেখে, বোসের গাড়িতে বসার জায়গা নেই। বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রীরা জায়গা জুড়ে বসে আছে। বোস দীপকে বলল, সুটকেসটা লাগেজবুকে দিয়ে দিন।

টাকাটা?— দীপ জানালায় ঝুঁকে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে।

আপনার কাছে থাক। একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে চলে আসুন।

গাড়ি ছেড়ে দেয়।

দীপ তার প্যান্টের গুপ্ত পকেটে টাকার বান্ডিলটা অনুভব করতে করতে অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে বোসের কোনও সন্দেহ নেই, তা সে জানে। কিন্তু ভয় কলকাতার চালু পকেটমারদের। টাকাটা মার গেলে শোধ করার সাধ্য তার নেই।

রেসের মাঠ থেকে শেয়ারের ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই।

রেসে হারা চারজন গোমড়ামুখো লোকের সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে জায়গা পেল দীপ। সামনের সিটে ড্রাইভার আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং আর-একজন যাত্রীর মাঝখানে খুবই ঠাসাঠাসি করে বসতে হয়েছে তাকে। শীতকাল বলে অতটা কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু ভারী আড়ষ্ট লাগছে। পিছনে হেরো রেসুড়েরা বলছে, কে জানত লাইটনিং জিতবে? পুরো গট আপ কেস।... আমি নিজে দেখেছি টপ স্কোরারকে বাঁকের মুখে ইচ্ছে করে জকি টেনে রাখছিল।... মন্দাকিনী বোধ হয় জীবনে এই প্রথম জিতল।... স্টেটসম্যান ওটাকে ফ্লুকে রেখেছিল...

দীপ অত্যন্ত সজাগ হয়ে বসে আছে। তার সমস্ত মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে গুপ্ত পকেটের দু'হাজার টাকার ওপর। হাত দিয়ে ছুঁয়ে টাকাটা আছে কি না দেখতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু সেটা ভারী বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। লোকে জেনে যাবে, টাকা আছে।

তারাতলায় নেমে আর বাস-টাস ধরল না দীপ। সোজা হাঁটা দিল। নিউ আলিপুরের ও ব্লক অনেকটা দূর। তবু হাঁটাই ভাল।

শীতের অন্ধকার দেখতে না দেখতে নেমে আসে। দীপের ঘেমো শরীরে উত্তরের হাওয়া লেগে শিরশির করতে থাকে। তবু একটু রোমাঞ্চও আছে কোথাও। মনের গভীরে কি সত্যিকারের পাপ

আছে তার? তবে কেন বোস সাহেবের ফ্ল্যাটে যেতে তার একরকম তীব্র সুখের অনুভূতি হচ্ছে? এখনও সেই কাটা চেকটা তার বুক পকেটে। স্নিগ্ধদেব চ্যাটার্জির নামটা সে একটুও ভুলে যায়নি।

বোসের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দীপ দেখল, বোস এখনও আসেনি। সাদা উর্দিপরা একজন বেয়ারা দরজা খুলে দিয়ে ড্রয়িং কাম ডাইনিংয়ের মাঝখানে প্ল্যাস্টিকের ফুলছাপ পরদাটা টেনে দিল। ড্রয়িংরুমের ফাঁকা নির্জনতায় বসে দীপ টের পাচ্ছিল ডাইনিং হলে আজ কোনও ভোজের আয়োজন হচ্ছে। অন্তত দু'-তিনজন বেয়ারা নিচু স্বরে কথা বলতে বলতে টেবিল সাজাচ্ছে। প্লেট আর চামচের শব্দ হচ্ছে টুং টাং।

বড়লোকদের ড্রয়িংরুম যেরকম হয় বোসেরটাও তাই। ভাল সোফাসেট, পেতলের ছাইদানি, মেঝেয় কার্পেট, কাচের স্ল্যাব বসানো সেন্টার টেবিল, ঘোমটা দেওয়া স্ট্যান্ডের আলো, টি ভি সেট এবং অপরিহার্য বুক-কেস।

মিসেস বোস বা মণিদীপার কোনও সাড়াশব্দই পেল না দীপ। ভদ্রমহিলা আদৌ বাড়িতে আছেন কি না তাও বুঝতে পারছে না। এ বাড়িতে তার যাতায়াত বেশ কিছু দিনের। কিন্তু এখনও সে ড্রয়িংরুমের সীমানা পার হতে পারেনি।

খবর না দিলে মণিদীপা হয়তো খবর পাবেন না ভেবে দীপ উঠে গিয়ে পরদা সরিয়ে একজন বেয়ারাকে বলল, মেমসাহেব বাড়িতে নেই?

আছেন। ড্রেস করছেন।

তাঁকে একটু সেলাম দেবে? বলো, দীপনাথবাবু এসেছেন।

বেয়ারা তেমন গা করল না যেন। তবে মাথা নাড়ল।

দীপ আবার এসে সোফায় বসে এবং একটি ইংরেজি ফ্যাশনের পত্রিকা তুলে নিয়ে ছবি দেখতে থাকে।

মণিদীপা নিঃশব্দে এলেন না। এলেন চাকর-বাকর বা বেয়ারাদের কাউকে অনুচ্চস্বরে বকতে বকতে। কারও কোনও দোষ হয়ে থাকবে।

ড্রয়িংরুমের পরদা সরিয়ে ভিতরে এসে চুপ করে দাঁড়ালেন মণিদীপা। 'কী খবর' বা 'এই যে, কখন এলেন' গোছের কোনও প্রশ্ন করলেন না। দাঁড়িয়ে খুব খরচোখে দীপকে দেখছিলেন। পরনে একটা কাপতান। জাপানি কিমোনো ধরনের ভারী ঝলমলে পোশাক। মুখে রূপটান মাখা শেষ হয়েছে। মস্ত মৌচাকের মতো করে বাঁধা খোঁপা। দীপের যতদূর মনে পড়ে, ওঁর মাথার চুল বব করা। তবু খোঁপাটা কী করে সম্ভব হল তা ভেবে পায় না সে। মণিদীপার গা থেকে ভারী মোহময় একটা সুবাসও আসছিল। সম্ভবত ফরাসি সেন্ট।

দীপ মুখ তুলে বলল, সকালে সেই চেকটা দেওয়ার কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

মণিদীপা একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, ওটা নিয়ে আপনি অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? খুব ইমপর্ট্যান্ট কিছু নয়।

দীপ বুকপকেটে চেকটা খুঁজতে খুঁজতে বলে, আপনার কাছে না হলেও আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। আপনিও চেয়েছিলেন।

বুকপকেট থেকে রেসের বাতিল টিকিট, ঠিকানা লেখা কাগজ এবং ভাউচার ইত্যাদি একগাদা কাগজ বেরোল বটে, কিন্তু চেকটা নেই। নেই তো নেই-ই। পোশাকে যে ক'টা পকেট ছিল সবই হাঁটকে ফেলল দীপ। মুখ লাল হয়ে উঠছে তার, কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। চেকটা তার সঙ্গে হঠকারিতাই করে বসেছে শেষ পর্যন্ত।

মিসেস বোস নিঃশব্দে ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। মুখে মৃদু জ্বালাভরা হাসি। দীপের খোঁজা এবং না পাওয়ার পালা শেষ হলে বললেন, খামোখা ব্যস্ত হচ্ছেন। আমিই তো বলছি চেকটার কোনও দাম নেই।

দীপ নিভে গিয়ে বলে, আমি কিন্তু পকেটেই রেখেছিলাম। রেসের মাঠে হয়তো—

আপনি নিশ্চিন্তে বসুন। ওটা কেউ পেয়ে থাকলেও ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আমাকে ব্ল্যাকমেল করা অত সহজ নয়।

দীপ শিউরে ওঠে। আজ সকালে সেও ব্ল্যাকমেলের কথাই ভেবেছিল না কি? সে তাড়াতাড়ি বলল, না, ব্ল্যাকমেলের কথা নয়।

তবে আর কিসের ভয়? চেকটা এমনভাবে কাটা হয়েছে যে ওটা আর ক্যাশ করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ব্যাংকে আমার অত টাকাও নেই। স্নিগ্ধ বেচারা খামোখা ব্যাংকে গিয়ে হয়রান হয়েছিল।

দীপ চুপ করে বসে থাকে। ভারী লজ্জা করছে চেকটা হারিয়ে ফেলায়। উনি হয়তো ভাবছেন, চেকটা সে-ই রেখে দিয়েছে। প্রয়োজনমতো কাজে লাগাবে।

মণিদীপা অতিরিক্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন, মিস্টার বোস বোধ হয় রেসের পর কোথাও বসে বিয়ার-টিয়ার খাচ্ছেন। আপনাকে বসতে হবে। একটু চা বলে দিই?

চা!— বলে দীপ একটু ভাবে, তারপর মাথা নেড়ে বলে, দরকার নেই। আমি বরং উঠে পড়ি। উইনিং টিকিটের টাকাটা যদি আপনি রেখে দেন—

বলতে বলতে দীপ উঠে প্যান্টের গুপ্ত পকেটের দিকে হাত বাড়ায় এবং ভাবে, হায় ভগবান! চেকটার মতো টাকাগুলোও যদি এতক্ষণে ম্যাজিকের মতো গায়েব হয়ে গিয়ে থাকে!

মণিদীপা মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে বোস সাহেব অত বিশ্বাস করেন না দীপনাথবাবু। আমি বিশ্বস্তও নই। টাকাটা আমার হাতে এলে আমি নিশ্চয়ই খরচ করে ফেলব। তখন আপনি খুব মুশকিলে পড়বেন। বরং একটু বসুন, মিস্টার বোস এসে যাবেন।

দীপ সুতরাং বসে পড়ে। বলে, টাকাটা যে আপনার হাতে দেওয়া যাবে না এমন কথা কিন্তু মিস্টার বোস আমাকে বলেননি।

মণিদীপা হেসে বলেন, ও কখনও বলবে না। কিন্তু এইসব ছোটখাটো ঘটনার ভিতর দিয়ে আপনার বুদ্ধিকে ও পরীক্ষা করবে। নাড়ুগোপালের মতো চেহারা দেখে ওকে বোকা ভাববেন না। ও শেয়ালের মতো চালাক। পরীক্ষায় আপনি পাশ করলেই যে ও আপনাকে কোনও চান্স দেবে তাও ভাববেন না। মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করাটা ওর হবি। আমাকেও অনবরত পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

বলে মণিদীপা ইংগিতপূর্ণভাবে চুপ করে থাকেন।

দীপ বোঝে, এটাও একটা পরীক্ষা। মণিদীপা দেখছেন, সে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে কি না। সে ইদানীং চালাক হয়েছে, তাই ওসব কথার ধার দিয়েই গেল না। বলল, টাকাগুলো যতক্ষণ সঙ্গে থাকবে ততক্ষণই অস্বস্তি।

টাকার কিছু হ্যাজার্ডস তো আছেই।— বলে মণিদীপা একটু হাসলেন। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবাব পাশের কৌচে বসে বললেন, কত টাকা জিতেছে ও?

প্রায় দু'হাজার।

মণিদীপা ভ্রু কুঁচকে একটু ভেবে বললেন, টাকা আয় করা কারও কারও কাছে কত সোজা!

তা ঠিক।

মণিদীপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আপনিও রেস খেললেন নাকি?

আমার ভাগ্যটা একদম কানা। চল্লিশ টাকার মতো হেরে গেছি।

কোনও দিন জিতেছেন?

না।

তা হলে আপনাকে ভাগ্যবানই বলতে হয়।

কেন?

জিতলে রেসের মাঠের নেশা আপনাকে ভূতের মতো পেয়ে বসত। আমিও প্রথম প্রথম ওর সঙ্গে খুব যেতাম। কিন্তু প্রত্যেকবার হেরে হেরে বিরক্তি ধরে যাওয়ায় আর যাই না। কিন্তু টের পেতাম যারা এক-আধবার জেতে তারা আর নেশাটা কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

দীপ একটু হেসে বলল, আমার প্রবলেমটা তা নয়। আমি যে-কোনও নেশাই ছাড়তে পারি।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলেন, ইউ আর নট একসেপশন।

দীপ হঠাৎ টের পায় তার নামের সঙ্গে মণিদীপার নামের একটা আশ্চর্য মিল আছে। সে দীপনাথ, আর মিসেস বোস মণিদীপা। এতক্ষণে এ মিলটা তার মনে পড়েনি তো! আশ্চর্য!

দীপ বলল, আসলে আমি কোনও কিছুতেই তেমন ইন্টারেস্ট পাই না। আমার আগ্রহ শুধু কোনওক্রমে বেঁচে থাকার।

মণিদীপা উদাসভাবে বললেন, আমারও কি তাই নয়? সকলেরই তাই। তবু মানুষের ইন্টারেস্টেরও তো শেষ নেই। রেসের মাঠে আমি আমার স্কুলের একজন পুরোনো মাস্টারমশাইকে দেখতে পেয়েছিলাম, যাকে সবাই সাধুসন্ত বলে মনে করত।

মণিদীপা চায়ের কথা বলেননি, কিন্তু তবু চা এল। ট্রে ভরতি চায়ের পট, দুধের পাত্র, চিনির বোল, একটা মস্ত প্লেটে নিউ মার্কেটের ভাল কেকের একটা বড় টুকরো, দুটো বড় সন্দেশ আর একটা কাটলেট গোছের জিনিস। এ বাড়িতে দীপ কদাচিৎ আপ্যায়িত হয়েছে। এতটা তো কোনওদিনই নয়। সে বলল, এত?

আমার বাপের বাড়িতে লোক এলে চা আর খাবার দেওয়ার নিয়ম। গরিবদের বাড়িতেই ওসব নিয়ম থাকে। বড়লোকরা খুব কাঠ-কাঠ ডিসিপ্লিনে চলে, তাই অতিথি আপ্যায়ন না করলেও বলার কিছু নেই। তবে মাঝে মাঝে পার্টি দিতে হয়। আজ যেমন।

দীপ চুপ করে রইল। চুপ করে থাকার চেয়ে বড় কূটনীতি তার জানা নেই। অল্পস্বল্প খাচ্ছিলও সে। তবে খুব সংকোচের সঙ্গে।

মণিদীপা হঠাৎ খুব হেসে উঠে বললেন, সত্যিই আপনার কোনও ব্যাপারে ইন্টারেস্ট নেই দেখছি!

দীপ কৌতূহলে মুখ তুলে বলে, কেন?

একবারও তো জিজ্ঞেস করলেন না স্নিগ্ধদেব লোকটা কে!

দীপ গম্ভীর হয়ে বলে, আমার জানার দরকার তো নেই।

দরকার নেই, সে তো ঠিকই। কিন্তু কৌতূহলও কি হয় না?

দীপ কেকটার তেমন স্বাদ পাচ্ছিল না, ভালই হওয়ার কথা। বলল, কেউ একজন হবেন। হয়তো আপনার ভাই-টাই।

কী বুদ্ধি! আমি বোসের বউ হলে আমার ভাই চ্যাটার্জি হয় কী করে?

অসবর্ণ তো হতে পারে!

মোটেই না। আমার বাপের বাড়ি মিত্র।

ও। তা হলে বন্ধু?

মণিদীপা মস্ত এক শ্বাস ছেড়ে বললেন, শুনলে হাসবেন। স্নিগ্ধদেবের বয়স চল্লিশের ওপর। রং কালো, চেহারা রোগা এবং দেখতে মোটেই ভাল নয়। মাথার চুল পাতলা হয়ে টাক পড়ে এল প্রায়। তার স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়ে আছে। স্কুলমাস্টার এবং বেশ গরিব।

গরিবকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন?

না। টাকাটা ওকে দিচ্ছিলাম, ও পার্টি-ফান্ডে জমা দেবে বলে।

রাজনীতির লোক নাকি?

ভীষণ। এবং এত গাটসওয়ালা লোক এ দেশে দুটো নেই। আপনি যদি ওর সঙ্গে দশ মিনিট কথা

বলেন তা হলেই আপনার লাইফ-ফিলজফি পালটে যাবে।

দীপ খুব চালাকের মতো বলে, তা হলে দেখা না করাই ভাল।

আসলে দীপ ব্যক্তিপূজা ভালবাসে না। এলেমদার যে-কোনও লোককে বিগ্রহের আসনে বসাতে সে রাজি নয়।

মণিদীপা বললেন, আপনি ওকে চেনেন না।

দীপ লক্ষ করে মণিদীপার চোখে হঠাৎ স্বপ্নের সুদূর ফুটে উঠল।

॥ এগারো ॥

এখানে দু'কাঠা চার ছটাক জমি আছে। দাম পঁচিশ হাজার।

বড্ড বেশি। নাকতলায় এত বেশি জমির দাম নয়।

নাকতলা কি আগের নাকতলা আছে বউদি? জমির সামনে ষোলো ফুট চওড়া রাস্তা হবে।

সে যখন হবে তখন দাম বেশি দেব।

আসলে জমিটা পছন্দও নয় বিলুর। বড্ড ঘিঞ্জি পাড়ার মধ্যে, চারধারে বড় বড় বাড়ি। রাস্তাও ভাল নয়। কাঁচা ড্রেন থেকে ঝাঁঝালো কটু গন্ধ আসছে। সে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে একটু পিছিয়ে এল। পাশেই একটা দোতলা বাড়ি থেকে একটা বউ তাকে লক্ষ করছে।

দালাল লোকটা মরিয়া হয়ে বলল, দুটো প্লট ছেড়ে পরের প্লটে একজন ফিল্ম স্টার থাকে।

কৌতূহলে বিলু জিজ্ঞেস করে, কে?

দালাল যার নাম বলল সে আসলে পড়তি অভিনেত্রী। বিলু তাই আগ্রহী হল না। বলল, গলফ্ ক্লাবের একটা প্লটের কথা বলেছিলেন যে।

দালাল খদ্দেরের ধাত বুঝে একটু অবহেলার স্বরে বলে, সে বিক্রি হয়ে গেছে। আরও বেশি দাম ছিল।

এই শীতেও পরিশ্রান্ত বোধ করে বিলু। সকাল থেকে এ পর্যন্ত গোটা চারেক প্লট দেখল। বেহালা, কসবা, গড়িয়া আর নাকতলা। সবই কলকাতার বাইরের অঞ্চল। কিন্তু কোথাও তেমন খোলামেলা নেই আর। অবারিত মাঠঘাট নেই। আবার লোকবসতি বেশি বলে তেমন ফ্যাশনদুরস্ত বাজারহাট বা দোকান-পসারও তেমন হয়নি। ভবানীপুরে থেকে থেকে অভ্যাসটাই খারাপ হয়ে গেছে।

গাড়িটা অনেক দূরে রাখতে হয়েছে। এত দূরে গাড়ি আসেনি। হয়তো আসত, কিন্তু দালালই সাহস পায়নি রাস্তা ভাল নয় বলে।

বিলু একটু উষ্মার সঙ্গে বলে, পছন্দসই একটা জমিও কিন্তু আপনি দেখাতে পারলেন না।

দালাল লোকটি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, কোনওটা তো অপছন্দের নয় বউদি। এই জায়গাগুলো সবই ডেভেলপ করবে, তখন দেখবেন প্লটটা নিয়ে রাখলেন না বলে দুঃখ হবে।

ডেভেলপ করেনি বলছেন, তা হলে দামই বা অত বেশি কেন? এসব জায়গার দাম আরও কম হওয়া উচিত।

দালাল মাথা নেড়ে বলে, পঁচিশ হাজার আজ বলছে। এক মাস পরেই দেখবেন, ত্রিশ উঠে গেছে। আর জমির দাম একবার উঠলে আর কখনও নামে না। ওই একটা জিনিস কেবল উঠেই যাবে।

শীতের রোদ বলে রোদের তেজ কম নয়। মাথা বাঁচাতে ঘোমটা দিয়েছে বিলু, চোখ বাঁচাতে গগলস্। এখন বেলা বাড়ায় একটু গরমও লাগছে। হেঁটেছে অনেকটা।

দালাল শেষ কথা বলল, জমির তো আর সাপ্লাই বাড়বে না। ও ভগবান যা মেপে দিয়ে রেখেছেন তাই চিরকাল থাকবে। কিন্তু চাহিদা বেড়েই যাবে, দামও চড়বে। যত সব বড় ফ্যামিলি ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জমির জন্য হন্যে হয়ে উঠছে লোক। বাপ নিজে বাড়ি করল তো তার তিন উপযুক্ত ছেলে তিনটে বাড়ি হাঁকাল, কেউ কারও সঙ্গে থাকতে চায় না আজকাল। প্রত্যেকেই চায় আলাদা সংসার, আলাদা বাড়ি। তা ছাড়া বাড়িওয়ালারা হুড়ো দেয় বলেও লোকে নিজে বাড়ি করতে চায়।

অরুণের সাদা অ্যামবাসাডার গাড়ি রোদে ঝিকোচ্ছে বড় রাস্তায়, অরুণ পিছন ফিরে প্রীতমকে কী যেন বলছে। পিছনের সিটে প্রীতম বসে আছে নির্জীব হয়ে। সে কিছুই শুনছে বলে মনে হল না। চোখ বোজা, ঠোঁটে ক্লান্ত একটু হাসি।

অরুণ বলল, পছন্দ হয়েছে?

না, বড্ড ঘিঞ্জি।

তোমার জন্মেও পছন্দ হবে না।

বিলু ভ্রুকুটি করে বলে, পছন্দের মতো হলেই পছন্দ হবে।

দালাল লোকটা সামনের সিটে অরুণের পাশে উঠে বসে। বিলু পিছনের সিটে প্রীতমের পাশে বসে বলে, তোমাকে খামোখা কষ্ট দিলাম।

প্রীতম চোখ মেলে চেয়ে বলে, খুব নয়, তবে এখন শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

শোবে? শোও না!— বলে বিলু নিজের কোল দেখিয়ে দিয়ে ঠিক হয়ে বসে।

প্রীতম শোয় না। অরুণের সামনে কেমন দেখাবে! সে বলল, না, পারব।

একটা বা দুটো বালিশ আনলে পারতে।— অরুণ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলে।

ভুল হয়ে গেছে।— বিলু জবাব দেয়।

প্রীতম লজ্জার সঙ্গে বলে, না না, সেটা খারাপ দেখাত। আমার অত বেশি কষ্ট হচ্ছে না।

হলেই কি আপনি বলবেন!— অরুণ মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, আপনি তাজ্জব লোক।

কেন?— মৃদু উদাস গলায় প্রশ্ন করে প্রীতম। ঠিক প্রশ্নও নয়। সে যে একটু তাজ্জব লোক তা সে জানে।

আপনি ভাবেন, নিজের কষ্টের কথা স্বীকার করার মানেই হল, ডিফিট।

এ কথার নিশ্চয়ই জবাব হয়। কিন্তু প্রীতম জবাব দেওয়ার মতো দমে কুলিয়ে উঠতে পারে না। বহুক্ষণ সে বসে আছে। হেলান দিয়ে যথেষ্ট নরম গদিতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তার শরীর এখন খাড়া থাকতে চাইছে না। শরীরের জীবাণুরা খেপে উঠছে। ঝিঝি ডাকছে সারা পা জুড়ে।

একটু মাথা হেলিয়ে দিতেই বিলুর কাঁধে আশ্রয় পায় সেটা। বিলু বলে, তোমার লজ্জার কী? ভাল করে মাথা রাখো।

প্রীতম আবার ঘাড় সোজা করে বসে।

উঠলে কেন?

রাস্তাঘাট দেখি। বহুকাল এসব দিকে আসিনি।

বিলু মৃদু স্বরে বলে, দেখতে হবে না। মাথাটা আমার কাঁধে রেখে চোখ বুজে থাকো। কোনও কাজ হল না আজ, শুধু শুধু তোমাকে টেনে আনলাম।

প্রীতম উদাসভাবে বসে থাকে। বলে, পছন্দ হল না কেন?

পাড়াগুলো কেমন যেন!

কেমন?

ভাল নয়।

সব জায়গাতেই মানুষ থাকছে। তুমিও থাকতে পারবে।

এটা বুঝি কোনও কথা হল? মানুষ তো উত্তর মেরুতেও থাকে, মরুভূমিতেও থাকে।

নাকতলা তো মেরুও নয়, মরুও নয়।— অরুণ সামনে থেকে বলে।

তুমি থার্ড পারসন। তোমার কথা বলা সাজে না।— বিলু ধমক দেয়।

প্রীতম উদাসভাবে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। এই পৃথিবীতে তার কোনও জমির আর প্রয়োজন নেই। ভেবে দেখলে কারওরই প্রয়োজন নেই। তবে সেটা সকলে সব সময়ে টের পায় না। প্রীতম আজকাল পায়। তবে তার কাছে গোটা পৃথিবীটাই একটা সুন্দর সম্পূর্ণ বাস্তুজমি। সবটুকুই তার দরকার। আসমুদ্র পর্বত, অরণ্য, বৃষ্টি, আকাশের নীল রোদ, জ্যোৎস্না মিলিয়ে তার বিশাল বাড়ি। গোটা পৃথিবীকেই তার বড় দরকার ছিল। আরও কিছুদিন।

বিলু শালটা ভাল করে জড়িয়ে দিচ্ছিল তার গলায়। একটু বিরক্তির মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে আপত্তি জানাল সে। বাইরে ঝকঝকে রোদে রাসবিহারীর মোড় পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। বাঁ ধারে একটা ঘেয়ো চায়ের দোকানের সামনের ফুটপাথে এই রকম সরল রোদে শীত-গ্রীষ্মে দাঁড়িয়ে থাকত বীতশোক। কোনও কাজ ছিল না, সারা জীবন কোনও পয়সা রোজগার করেনি। ভাল আড়বাঁশি বাজাতে পারত বলে সিনেমা-থিয়েটারে কাজ করেছে বহু। কিন্তু পয়সা আদায় করার এলেম ছিল না। চাইতে জানত না। বেশ বয়স হয়ে যাওয়ার পর যখন বুঝেছিল আর কিছু করার নেই তখন থেকে এইখানে চুপ করে সকাল-সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস করে নিয়েছিল। ভাইদের সংসারে অনাদরের ভাত জুটে যেত। দু'আনা-চার আনা হাতখরচও। সেই ছিল তার অঢেল। ট্রামে-বাসে চড়ত না। বিড়ি খেত। দাঁড়িয়ে থাকত। কখনও এক নাগাড়ে চেয়ে থাকত পশ্চিম ধারে। কখনও পুব ধারে। কিছু দেখত না। কেবল চেয়ে থাকত। অমন নির্বিকার মানুষ, অমন অহং ও আমি-শূন্য লোক জীবনে দুটো দেখেনি প্রীতম। বীতশোককে সে বহুবার টাকা বা পয়সা দিয়েছে যেচে। হাত পেতে নিত। বলত, খুব ভাল হল। কয়েকদিন আর বাড়িতে পয়সা চাইতে হবে না। বড্ড বকে।

বীতশোকের দীন ভাব বহুবার নকল করার চেষ্টা করেছে প্রীতম। কিছুতেই হয় না। অভিনয় হয়ে যায়, কৃত্রিম হয়ে যায়। কতগুলো জিনিস কিছুতেই নকল করা যায় না। ভিতরে ওই দীনতার কোনও প্রস্রবণ না থাকলে হওয়ার নয়।

গাড়ি বাড়ির সামনে এসে গেল হু হু করে।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে লাবু। একটু ঝুঁকে, চোখে প্রবল উৎকণ্ঠা। পাখির মতো স্বরে ডাকল, মামণি।

প্রীতমকে ডাকল না। আজকাল প্রীতমকে ডাকে না লাবু।

অরুণ দরজা খুলে কাঁধ এগিয়ে দিয়ে হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে।

প্রীতম নামে। পায়ের ওপর খাড়া হওয়ার চেষ্টা করে এবং বুঝতে পারে বৃথা চেষ্টা।

অন্য দিক দিয়ে সযত্নে জড়িয়ে ধরে বিলু। পাড়ার লোকজন দেখছে। রোজই দেখে। কী লজ্জা!

দোতলায় নিজের ঘরে বিছানায় পৌঁছে গড়িয়ে পড়ে প্রীতম। বাইরের পৃথিবী থেকে এসে এই খণ্ড ছোট্ট ঘরের মধ্যে তার যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায় সে!

বিলু রান্নাঘরে গেল। অরুণ বাইরের ঘরে দালাল লোকটার সঙ্গে বসে কথা বলছে। রাস্তায় পাড়ার ছেলেদের খেলার হর্‌রা শোনা যাচ্ছে।

প্রীতম ঝিম মেরে পড়ে থাকে কিছুক্ষণ।

চা খাবে?— বিলু নিঃশব্দে এসে চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কেটে জিজ্ঞেস করে।

খাব।

খুব হাঁফিয়ে পড়োনি তো?

না না।— বলে উঠে বসতে চেষ্টা করে প্রীতম।

উঠো না। আমি জানি, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

তবু উঠে বসে প্রীতম। এইমাত্র মৃত্যু সম্পর্কে তার নতুন একটা কথা মনে হল। সে বলল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। ওরা চলে গেলে একবার আমার কাছে এসো।

ওরা এক্ষুনি চলে যাবে চা খেয়েই। তুমি শুয়ে থাকো, আমি আসছি।

কিন্তু প্রীতম শোয় না। বসে থাকে। বাইরের ঘর থেকেই অরুণ বিদায় নিয়ে চলে যায়। সদর বন্ধ করে বিলু ঘরে এসে প্রীতমের বিছানায় বসে।

কী বলছিলে?

প্রীতমের মুখে একটা নরম উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। মৃদু হাসি তার মুখে। সে বলে, মনে আছে বিয়ের পর অভিমান হলেই আমি তোমাকে বলতাম, আমি যখন মরে যাব তখন দেখো?

মনে থাকবে না কেন?

কিন্তু আমার মনে হয় কী জানো?

কী?

মানুষ মরে কিছু প্রমাণ করতে পারে না, কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

সে তো ঠিকই।

অমন আলগা জবাব দিয়ো না। ভেবে দেখো। খুব গভীরভাবে ভাবো।

আমার কি অত সময় আছে? মেয়েকে চান করাব, তোমাকে চান করাব, রান্নাও অনেক বাকি।

আঃ বিলু! শোনো। যেয়ো না।

বলো।

অংশুকে তোমার মনে আছে?

কোন অংশু?

আমার কলিগ ছিল।

ওঃ। নামটা চেনা। ঠিক মনে পড়ছে না।

অংশু কেন সুইসাইড করেছিল জানো?

কেন?

মা আর বউয়ের ওপর রাগ করে। বনিবনা হত না। ভীষণ গণ্ডগোল হত বাড়িতে। তার মায়ের সঙ্গে বউয়ের ছিল সাংঘাতিক ঝগড়া। অংশু সেই ঝগড়ার মাঝখানে থেকে শুকিয়ে যেতে লাগল দিনকে দিন। তারপর একদিন জ্বালা জুড়োতে ঘুমের ওষুধ খেল।

তাতে কী?

অংশু মরার পর তার মা আর বউ দু'জনেই প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিল। হুলুস্থুল কান্নাকাটি বিলাপ। তারপর এ ওকে দুষত। পরে যতদিন একসঙ্গে ছিল ততদিন আবার ঝগডা করত দু'জনেই। অংশু হয়তো ভেবেছিল, সে মরলে দু'জনেরই শিক্ষা হবে। হয়নি। অংশু হয়তো ভেবেছিল মরলে নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু তা পেয়েছে কি না তা পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রমাণিত নয়। সুতরাং মৃত্যু দিয়ে অংশু প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ঠিক সেই রকম যারা আত্মহত্যা করে তারা কিছুই প্রমাণ করতে পারে না।

সে তো ঠিক।

আমি কয়েকদিন খুব আত্মহত্যা নিয়ে ভাবছি বিলু। আমার জীবনে যে ক'টা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে সব ক'টার চুলচেরা বিচার করছি। দেখলাম, মৃত্যু একটা মাইনাস পয়েন্ট। জীবনের কোনও কিছুর সঙ্গেই তার মেলে না।

বুঝেছি। এবার কাজে যাই?

তুমি কখনও মরা নিয়ে কিছু ভাবোনি?

সময় কোথায় যে দু'দণ্ড কিছু ভাবব?

প্রীতম খুব সন্দেহের চোখে বিলুর দিকে তাকায়, তারপর বলে, তুমি কি সত্যিই খুব ব্যস্ত? না কি আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্য বলছ?

বিলু এ কথার জবাব না দিয়ে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল, তারপর একটু ঘন হয়ে বসল প্রীতমের কাছে। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো?

কী হয়েছে তা প্রীতম নিজেও বুঝতে পারছে না। ভিতরে একটা বাঁধ ভেঙেছে। খুব আবেগ আসছে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মন। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে মৃত্যুভয়। বিলুর কাছে যে এর কোনও নিদান নেই তাও সে জানে। কিন্তু বিভ্রমবশে আজ তার মন ভীষণ কেন যে বিলু-বিলু করছে!

প্রীতম কী বলছে তা হিসেব না করেই বলল, তুমি আজ সারা দিন আমার কাছে-কাছে থাকো।

থাকব। কাছেই তো থাকি।

প্রীতম মাথা নেড়ে হতাশভাবে বলে, কিছুই আমার কাছে নয়। ওই বাথরুমটাকে মনে হয় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। খাট থেকে মেঝেটাকে মনে হয়, দোতলা থেকে একতলার ফুটপাথের মতো নিচুতে। এ ঘর থেকে ও ঘর যেন এ পাড়া থেকে ও পাড়া। কেন সব কিছুই এত দূর লাগে বলো তো?

বিলু চুলে হাত বোলাচ্ছে. মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত অবাক চাউনি দিয়ে দেখছে তাকে। আস্তে করে বলল, কিছুই তো দূর নয়।

সবচেয়ে দূরে তুমি আর লাবু।— এ কথা বলার সময় প্রীতমের চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তার চোখে কি জল আসছে? ছিঃ ছিঃ! চোখে হাত দিয়ে দেখতে তার লজ্জা করল। কিন্তু বুকের মধ্যে যে একটা কান্না গোঙাচ্ছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। হঠাৎ হল কী তার? যদি দুর্বলতা আসে, যদি হাল ছেড়ে দেয়, তবে এ লড়াইয়ে তার হার নিশ্চিত।

বিলু একটু রাগ করে বলে, অত ভাবের কথা জানি না বাবা। আমরা তোমার থেকে দূরে হতে যাব কেন? ওইসব ভাবো বুঝি সারা দিন?

প্রীতম গাঢ় স্বরে বলে, মানুষ কতটা মানুষের কাছে হতে পারে বিলু? একজন অন্যজনের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে না?

বিলু হাসল। বলল, এও তো ভাবের কথা। যাই তোমার দুধ নিয়ে আসি গে। দুধ খেয়েই ওষুধ খাবে—

প্রীতম মাথা নেড়ে বলল, যেয়ো না। এ সময়টা খুব ডেনজারাস। এক মুহূর্তও আমাকে ছেড়ে থেকো না এখন। আমাকে ছুঁয়ে বসে থাকো।

বিলু সহজে ভয় পায় না, সহজ আবেগে ভেসেও যায় না। কিন্তু এখন হঠাৎ তার চোখে ঘনিয়ে উঠল ভয়। ঠোঁট সাদাটে দেখাল। শরীরটাও হঠাৎ শিউরে উঠল কি? প্রীতমকে এত চঞ্চল কখনও দেখেনি সে। দু'হাতে প্রীতমের রোগা শরীরটা আঁকড়ে ধরে। সে বলল, আছি, আছি। কোনও ভয় নেই তোমার। কেন এরকম করছ? আমি যে ভেবে মরছি।

প্রীতম লক্ষ করে সকালের উজ্জ্বল রোদে ধোয়া এই ঘরে সিলিং থেকে বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে কালো কালো অন্ধকার। ঝুলছে, দোল খাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে থেকে অতিকায় ডানায় উড়ে আসছে তাদের আরও দোসর। বুক-কেসের তলায়, খাটের নীচে, আলনার পিছনে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের স্তূপ। শরীরের জীবাণুরা ঝিনঝিন শব্দে গাইছে মুক্তিসংগীত।

সে বিলুর হাত আঁকড়ে ধরেছিল। তার বড় বড় নখের আঁচড় লেগে বিলুর হাত ছড়ে গিয়েছিল বলে বিলু অস্ফুট ব্যথার শব্দ করল, উঃ!

প্রীতম বড় বড় শ্বাস ফেলছিল। উদ্‌ভ্রান্ত চোখে বিলুর দিকে চেয়ে বলল, যেয়ো না।

যাচ্ছি না তো।

থাকো। আর একটু থাকো।

সারা দিন থাকব, ভেবো না। ওভাবে তাকিয়ে কী দেখছ?

প্রীতমের মন বলল, আর খুব বেশি সময় নেই। দিনের আলোর ওপর একটা অন্ধকারের ঘোমটা নেমে এসেছে। হালকা ফিকে অন্ধকার। কিন্তু ক্রমে তা গাঢ়তর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে। শরীরের জীবাণুরা তাদের প্রবল সংগীত গেয়ে চলেছে।

হাল ছেড়ে প্রীতম বালিশে মাথা রাখে। চোখ বোজে। বিলুর সঙ্গে জমির প্লট দেখতে যাওয়া তার ঠিক হয়নি। যেই প্লট দেখতে গেল অমনি এল বিষয়-চিন্তা। সে গাড়িতে বসে থেকে অন্তত গোটা তিনেক প্লট দেখেছে। আর বাস্তুজমি কেনার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে গিয়ে কেবলই মনে হয়েছে, আমি মরে গেলে বিলু আর লাবুর তো একটা স্থায়ী আস্তানা দরকার। এইসব ভাবতে ভাবতে জীবাণুদের প্রবল প্রশ্রয় দিয়েছে সে। মন মৃত্যুর পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এসেছে। এখন তার সমস্ত সত্তা এক ঢালু বেয়ে একমুখী টানে নেমে যাচ্ছে মৃত্যুর উপত্যকায়। একে ফেরানো খুব মুশকিল।

বালিশের কোনা আঁকড়ে দাঁতে দাঁত চেপে সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ভাল আছি, আমি ভাল আছি; আমার কোনও অসুখ নেই, আমি রোগমুক্ত, সুস্থির, আমি অজর, অমর। ভাল আছি, আমি ভাল আছি...

ওইভাবেই ঘুমিয়ে পড়ল প্রীতম।

বিলু তার গায়ে লেপটা সাবধানে টেনে দিয়ে উঠে পড়ল।

মনটা হঠাৎ বড় ভার লাগছে বিলুর। অঘটনের জন্য মনকে সে প্রস্তুত রেখেছে। তবু হঠাৎ সর্বনাশ এসে দরজায় দাঁড়ালে বুক কেঁপে উঠবে না কি?

লাবুকে স্নান করিয়ে খাইয়ে দিল বিলু। রান্না দেখিয়ে দিল ঝিকে। তারপর একটু একা হয়ে বারান্দায় এসে উদাসভাবে চেয়ে রইল দূরের আকাশের দিকে।

কলেজে পড়ার সময় এবং তার পরবর্তী কালেও বিলুর প্রিয় বন্ধু ছিল পুরুষরা। মেয়েদের সঙ্গে সে কখনওই মিশতে ভালবাসত না তেমন। পুরুষদের সঙ্গে বেশি মিশে তার স্বভাবও অনেকটা পুরুষের মতো হয়ে গেছে। সে সহজে অসহায় বোধ করে না, ভেঙে পড়ে না। সে অনেকটাই স্বাবলম্বী, আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীনচেতা। তবু আজ প্রীতমের হাবভাব দেখে তার বুকের মধ্যে ধকধক করছে। শুকিয়ে আছে গলা, জিভ। একটু কান্না কান্না ভাব থম ধরে আছে কণ্ঠার কাছে। এখন কোনও আপনজনকে বড় দরকার। কিন্তু কে আছে বিলুর! দাদারা যে যার সংসারে জড়িয়ে থেকে দূরের মানুষ হয়ে গেছে। সেজদা দীপনাথ নানা কাজে ব্যস্ত। ছোড়দা সোমনাথের কাছে আছে বুড়ো অথর্ব বাবা। বিলুর এই অসহায় অবস্থায় কেউই এগিয়ে আসবে না, কাজে লাগবে না।

আপনজনের অভাব এমন কোনওদিন টের পায়নি বিলু। এই রোগা মানুষটাকে এতদিন তো ভারী মনে হয়নি তার। প্রীতম কোনওদিনই বিলুর ওপর নিজেকে ছেড়ে দেয়নি। মনে হচ্ছে, আজ থেকে দিল। ফলে বিলুর ভারী বিপদ হল এখন থেকে। কেউ পাশে থাকলে সে অনেকটা জোর পেত। প্রীতমের ভার সে একা বইবে কী করে?

মা! আমি একটু খেলনা ধরব?

বিলু ফিরে তাকিয়ে লাবুকে দেখে। ছোট্ট অসহায়, একান্ত নির্ভরশীল। লাবুকেও তো বইতে হবে তার, যতদিন না লাবু নিজের ভালমন্দ বুঝতে শেখে! বাপ-ন্যাওটা লাবুকে বাপের কাছ থেকে কেড়ে নিতে খুব বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরেছে বিলু। ফলে লাবুর ভারও তাকে একা বইতে হয়।

মেয়ের দিকে চেয়ে একটা বড় শ্বাস ফেলে বিলু। লাবু তাকে ভীষণ ভয় পায়। সব সময়ে চোর হয়ে থাকে। সামান্য নড়াচড়া করতেও মায়ের অনুমতি নেয়। তবু এরকম কড়া শাসন ছাড়া উপায়ই বা কী বিলুর! দুষ্টু, দামাল, অবাধ্য মেয়ে হলে বিলুর বড় বিপদ হত।

বিলু গলায় সামান্য মাপমতো আদর মিশিয়ে বলল, খেলো। তবে শব্দ কোরো না। বাবার ঘুম যেন না ভাঙে।

লাবু মাথা নেড়ে চলে গেল।

অনিয়ম বিলু পছন্দ করে না। তবুও প্রীতমকে অঘোরে ঘুমোতে দেখে বিলু স্নান-খাওয়া বাকি রেখে বাইরের ঘরের সোফায় শুয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল।

উঠল বেলায়, প্রীতমের ডাকে।

বিলু! বিলু! আমার খিদে পেয়েছে।

ঘুম ভেঙে বিলুর কেমন একরকম লাগতে থাকে। মাথাটা ফাঁকা এবং টলমলে। বুকটা খাঁ খাঁ করছে তেষ্টায়। কেবল মনে হচ্ছে, কেউ নেই, আমাদের কেউ নেই।

প্রীতমের মাথা ধুইয়ে খাওয়াতে বসে বিলু হঠাৎ আজ বলে ফেলল, শিলিগুড়ি থেকে কাউকে আনাবে?

প্রীতম অবাক হয়ে বলে, কেন?

আমাদের এখন একজন সহায়-সম্বল দরকার। আপনজন বলতে তো কেউ নেই।

প্রীতম মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, কে আসবে?

তুমি চাইলে নিশ্চয়ই আসবে কেউ না কেউ।

আসার মধ্যে এক আসতে পারে মা। কিন্তু তারই বা এসে লাভ কী?

লাভ হয়তো একটু আছে। আমার না হলেও তোমার।

অসময়ের ঘুম থেকে উঠে প্রীতম দেখেছে, ঘরের বাদুড়ঝোলা অন্ধকারগুলো আর নেই। সে ঘবকে বলেছে, আমি বেশ ভাল আছি। আর এখন সত্যিই সে অনেক ভাল আছে।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলল, মা! মায়েদের ভীষণ মায়া। আমার এ চেহারা মায়ের না দেখাই ভাল। তা হলে আর যে ক'দিন বাঁচত তাও বাঁচবে না।

বিলুর কোনওদিন সহজে অভিমান-টান হয় না। আজ এ কথায় হল। বলল, শুধু মায়ের দিকটাই দেখলে! আমি কীভাবে বেঁচে আছি তা দেখলে না!

মা আমাকে পেলে বড় করে দিয়েছে। এখন মায়ের পালা শেষ। ছেলেরা বড় হলে মায়েদের খুব বেশি কিছু করার থাকে না।

বিলু দীর্ঘশ্বাস কখনও ছাড়ে না। এখন ছাড়ল। বলল, তুমি আর বড় হলে কোথায়? এখনও মায়ের আঁচলই তোমাকে ঘিরে আছে।

কথাটার মধ্যে একটু খোঁচা ছিল। প্রীতম মাথা নেড়ে বলল, তুমি যদি না পারো তবে আমাকে কোনও নার্সিং হোম বা হাসপাতালে দাও। আমার মাকে বা আর কাউকে এর মধ্যে টেনে এনো না।

বিলুর মুখ থমথম করে উঠল। ভাতের চামচ তুলেছিল প্রীতমের মুখের কাছে, প্রীতম মুখ ফিরিয়ে নিল বিরক্তিতে। আর খাবে না জানে বিলু। সে নিজে যেমন পুরুষালি স্বভাবের, প্রীতম তেমনি ঠিক মেয়েলি স্বভাবের।

বিলুর ঠোঁটের আগায় অনেক জবাব এসেছিল, কিন্তু সংযত রাখল নিজেকে। ভাতের প্লেট নিয়ে উঠে চলে গেল।

ছাদের দিকে অপলক চেয়ে শুয়ে রইল প্রীতম। চেয়ে থাকলেও তার মন অন্য কাজ করছে। ভিতরে একটা বাঁধ ভেঙে প্লাবন হয়ে গেছে। সেই বাঁধ মেরামত চলছে। এত সহজে সে কি ধরা পড়বে মৃত্যুর ফাঁদে? আগে বেঁচে থাকাটাকে মাঝে মাঝেই খুব অর্থহীন মনে হত। মনে হত,

মৃত্যুটা কেমন? এখন আর তা মনে হয় না। এখন মনে হয়, বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকা। এর প্রতিটি মুহূর্তের দাম কোটি কোটি টাকা। মৃত্যু একটা মাইনাস পয়েন্ট। তা দিয়ে কিছুই প্রমাণ করা যায় না।

॥ বারো ॥

কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নায় নদীর ধারে পাঠশালার বারান্দায় দুটো লোক জবুথুবু হয়ে বসে আছে। আজ একেবারে রক্তজমানো ঠান্ডা। থেকে থেকে উত্তুরে হাওয়া মারছে, তাতে ভিতরের প্রাণবায়ুটা পর্যন্ত যেন নিবু নিবু হয়ে আসে। জ্যোৎস্নায় দেখা যায়, নদীর বুকটা খাঁ খাঁ করছে, শুকনো আর সাদা। একধার দিয়ে শুধু নালার মতো একটা জলধারা কষ্টেসৃষ্টে বয়ে যাচ্ছে। নদীর খাত আগে গভীর ছিল। এখন মাটি আর বালি জমে জমে তা প্রায় মাঠঘাটের সমান উঁচু হয়ে এল। বর্ষার প্রথম চোটেই জলের ঢল উপচে মাঠঘাট ভাসায়, পাঠশালায় ক্লাসঘরে গোড়ালিডুব জল দাঁড়িয়ে যায়। তাই এখন গ্রীষ্মের বদলে পাঠশালায় বর্ষার লম্বা ছুটি দেয়।

এই পাঠশালা, এই নদী, চারদিকের মাঠঘাট এসব কিছুর সব গল্পই জানে নিতাইখ্যাপা। খুব যত্নে ছোট কলকেয় গাঁজা সাজতে সাজতে বলল, এ জায়গার একটা নেশা আছে। থাকো কিছুদিন, টের পাবে। মেরে তাড়ালেও যেতে চাইবে না।

ধুর! এ তো ব্যাকওয়ার্ড জায়গা।

নিতাই ইংরিজি কথাটা বুঝল না। তবে আন্দাজে ধরল, নিন্দের কথাই হবে। একটু চড়া স্বরে বলল, এ জায়গার মাটির তলায় কী আছে জানো? বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ। তাকে জড়িয়ে আছে সাতটা জ্যান্ত সাপ। মাকালতলার মোড়ে যে বটগাছ আছে, ঠিক তার দেড়শো হাত নীচে। একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে, তা দিয়ে যাওয়া যায়। তবে সুড়ঙ্গের হদিশ কেউ জানে না।

যত সব গুলগপ্পো।

নিতাইখ্যাপা এবার খেপে গিয়ে বলে, আর চাঁদে যে মানুষ গেছে সে গপ্পোটা কী? সেটা গুল নয়? হিমালয় পাহাড়ে মানুষ ওঠার গল্প গুল নয়? নিতাই সব জানে। বেশি বকিয়ো না।

সরিৎ হাসে। বলে, এখানে আর কী কী আছে?

সে অনেক আছে। শুনলে মহাভারত। থাকো, জানতে পারবে।

বলে নিতাই কলকেটা এগিয়ে দিয়ে বলে, ধরাও। অগ্রে ব্রাহ্মণং দদ্যাৎ। প্রসাদ দিয়ো।

আমার পৈতে নেই, ব্রাহ্মণ-টাহ্মণ আবার কী?

ও বাবা, গোখরো সাপের বিষদাঁত উপড়ে ফেললেই সেটা ঢোঁড়া হয়ে যাবে নাকি? পৈতে থাক না থাক ব্রাহ্মণ বলে কথা।

কলকেটা নিয়ে সরিৎ সন্দেহের গলায় বলে, খুব কড়া নয় তো! মাথাটাথা ঘুরে গেলে মজা দেখাব।

আরে না। মিহিন ধোঁয়া, ভারী মিষ্টি, শরীরটা গরম হবে, মাথাটা হালকা লাগবে। একটার বেশি টান দিয়ো না, ধোঁয়াটা বেশিক্ষণ ধরে রেখো না।

রাখলে কী হবে?

নেশা করেছ টের পেলে তোমার দিদি আমাকে ঠেঙিয়ে তাড়াবে।

তা তুমি তো হিমালয়ে চলেই যাচ্ছ। তাড়ালে ভয় কী?

সে তো যাবই। খাঁটি জিনিস এখনও সেখানেই পাওয়া যায়। আমাকে এক পোটকা সাধু এসে ভেজাল মাল দিয়ে গেছে। মন্ত্রে তেমন কাজ হচ্ছে না।

সরিৎ খুব আস্তে ন্যাকড়া জড়ানো কলকেয় টান দিল। মিষ্টি, মাতলা ধোঁয়া। ধক করে গলায় লাগল না, কিছু তেমন টেরই পাওয়া গেল না। ফলে আর-একটা জোর টান মেরে ধোঁয়াটা ধরে রাখল বুকে।

হাত বাড়িয়ে নিতাই কলকেটা নিয়ে বলে, সাবধান কিন্তু। ধরা পড়লে আমার নাম কোরো না।

আরে না!— বলে ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয় সরিৎ।

নিতাই কলকেটা জুতমতো ধরে বলে, নিতাইয়ের কপালটা খুব ভাল কিনা! যেখানে যত খারাপ ব্যাপার হবে সবাই ধরে নেয় এ নিশ্চয়ই নিতাইয়ের কাজ। তোমার ডেঁপো ভাগনেটা কোথা থেকে খারাপ খারাপ কথা শিখে এসেছে, সে দোষটা পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চালান করল মদনা।

বাণ মারতে পারো না! বাণ মেরে সব ফিনিশ করে দাও।

নিতাই অভিমানভরে বলে, বাণমারা নিয়ে সবাই আমাকে খ্যাপায়। তুমিও নতুন এসেই পেছুতে লাগলে?

সরিৎ বাঁশের ঠেকনোয় মাথা রেখে কুয়াশামাখা আধখানা চাঁদের দিকে চেয়ে বলল, খ্যাপাব কেন? বাণ মারা জানলে আমিও বিস্তর লোককে বাণ মারতাম।

নিতাই শ্বাসটা সম্পূর্ণ ছেড়ে কলকেয় একটা চুমু খেয়ে মুখ লাগাল, তারপর হাপরের শব্দ করে টেনে নিতে লাগল ধোঁয়া। ধিইয়ে উঠল কলকের আগুন। অনেকক্ষণ ঝিম মেরে থেকে বলল, আমিও মারি। কিন্তু মদনা শালা মরে না।

মদনটা কে বলো তো?

ঠিকাদারবাবুকে চেনো না? ভুশুণ্ডির কাক। দেখলেই চিনবে। মল্লিবাবুর সঙ্গে খুব মাখামাখি ছিল।

সরিৎ খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করল, মল্লিবাবু লোক কেমন ছিল?

নিতাই আবার টান মেরেছে। ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকক্ষণ কথা বলল না। তারপর নাক দিয়ে দুটো সাদা সাপ ছেড়ে দিয়ে বলল, যারা বিয়ে করে না তারা লোক খারাপ হয় না। পুরুষদের খারাপ করে তো মেয়েছেলেরা। যাদের এগারো হাতেও কাছা হয় না।

মেয়েছেলের ওপর তোমার অত রাগ কেন বলো তো?

মা বোন পর্যন্ত মেয়েছেলেরা ভাল। যেই বউ হল অমনি সর্বনাশ।

সরিতের নেশা হয়েছে কি না তা বুঝতে পারছে না! তবে মাথাটা হালকা লাগছে, টলমল করছে। শরীরে তেমন ঠান্ডা টের পাচ্ছে না। বরং একটা যেন হাঁসফাঁস লাগে। তবু সেজদির বাড়ির রহস্যটা জানবার একটা আগ্রহ সে এসে থেকেই বোধ করছে। গত সাত দিনে সে শুধু রহস্যটা টের পেয়েছে। বোঝেনি। এ ব্যাপারে কাউকে প্রশ্নও করা যায় না। কেবল নিতাইখ্যাপার কথা আলাদা।

সরিৎ খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করল, মল্লিবাবু বিয়ে করল না কেন?

বিয়ে করেনি তাতে কী? ভালই ছিল। অনেক মেয়েমানুষ ছিল তার। লাইনের ওধারে মঙ্গলহাটের চামেলীর কাছে খুব যাতায়াত ছিল, কলকাতাতেও তো ছিলই শুনি। ফুর্তিতে থাকত। ফেলো কড়ি মাখো তেল। কোনও বাঁধাবাঁধি নেই।

বিয়ে করবে না তো এত সব সম্পত্তি করতে গিয়েছিল কেন? কার ভোগে লাগবে?

ও হচ্ছে পুরুষ মানুষের একটা নেশা। রোজগার করবে, সম্পত্তির মালিক হবে, এ না হলে পুরুষ কিসের? ভোগের কথা যদি বলো তো ভোগ মল্লিবাবু একাই কিছু কম করেনি।

এত লোক থাকতে সেজো জামাইবাবুকেই বা সম্পত্তি দিয়ে গেল কেন, জানো?

সে অনেক গুহ্য কথা আছে। থাকলে টের পাবে। তবে সম্পত্তি তোমার ভগ্নিপোতের নয়, দিদির।

তাও জানে সরিৎ। সেই শোকেই কি জামাইবাবু বাড়ি থেকে অনেকটা বাইরের দিকে আলাদা

ঘরে পর-মানুষের মতো বসবাস করছে? সেজদির সঙ্গে জামাইবাবুর কথাবার্তা প্রায় নেই বললেই হয়। এ বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো একটু নির্জীব যেন। গাছপালা, পুকুর, আলো-হাওয়া, প্রচুর খাবার-দাবার সত্ত্বেও বাড়িটায় যেন আনন্দ নেই।

খ্যাপা নিতাই আর কী বলে শোনার জন্য উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে সরিৎ।

নিতাই বোম ভোলানাথের মতো চোখ বুজে থাকে খানিক। তারপর গদগদ স্বরে বলে, জয় কালী।

সরিৎকেও গাঁজাটা বেশ ধরেছে। চোখে অনেক ঝিকিমিকি দেখছে সে। শরীরের মধ্যে দে দোল দোল ভাব। চিন্তাশক্তি ঠিক থাকছে না, একটু একটু গুলিয়ে যাচ্ছে বোধভাষ্যি।

কী খাওয়ালে গো নিতাই! বাড়ি যেতে পারব তো! পা টলবে না?

আরে দূর দূর। খুব পারবে বাড়ি যেতে। অত ভয় খেলে কি নেশা করে সুখ আছে? চেপে বসে থাকো, চারদিককার কাণ্ডকারখানা দেখো আর হাসতে থাকো। জয় কালী!

নিতাইয়ের দেখাদেখি চোখ বুজে ধ্যানস্থ হতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তন্দ্রা এসে যায় সরিতের। হালকা মাথাটা বাঁশের ঠেকনোয় কিছুতেই আটকে থাকতে চায় না। ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে।

ঝিমুনি কাটিয়ে চোখ চাইতেই বুঝতে পারে, নিতাই তাকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে।

কী বলছ?

বলি, দিদি তোমাকে মালদা থেকে এখানে আনাল কেন?

কী জানি। লিখেছিল এখানে কাজ করতে হবে।

কী কাজ?

তা কে জানে! জমিজিরেত সম্পত্তির ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না।

নিতাই একটা শ্বাস ফেলে বলে, শ্রীনাথবাবুও বোঝেন না। বোঝেন বটে তোমার দিদি। জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। মল্লিবাবু ঠিক লোক চিনত, তাই শ্রীনাথবাবুর নামে সম্পত্তি লিখে দিয়ে যায়নি। গেলে এতদিন পুরোটা ফুঁকো হয়ে যেত।

কেন বলো তো?

সে আর বলে কাজ নেই। শ্রীনাথ কর্তা মল্লিবাবুর দোষগুলো পুরোমাত্রায় পেয়েছেন, গুণগুলো পাননি। এবার বুঝে নাও। আমি এই ছোট মুখে বড় কথা বলতে চাই না বাবা। তবে ঠাকরোনের সঙ্গে ওঁকে মানায় না।

সরিৎ হেসে বলে, তা আমার দিদিও তো মেয়েমানুষ, তারও এগারো হাতে কাছা হয় না।

আ ছি ছি, তোমার দিদির কথা এখানে হবে কেন? ওসব কথা এলেবেলে মেয়েছেলে সম্পর্কে খাটে। ঠাকরোন কি তেমনধারা মেয়েমানুষ?

তবে কেমনধারা?

নিতাই একটু ফাঁপরে পড়ে গিয়ে বলে, তোমার দিদিকে আসলে কেউ আমরা মেয়েছেলে বলে ভাবিই না। সবাই যমের মতো ভয় খাই।

সরিৎ মৃদু-মৃদু হাসে। সেজদিকে কুমারী অবস্থাতেও লোকে একটু সমঝে চলত। লম্বা সুগঠিত চেহারার সেজদির দিকে নজর দিত অনেকেই, কিন্তু ভিড়তে ভয় পেত। একবার সেজদির সঙ্গে রাস্তায় যেতে পিছনে একদঙ্গল ছেলের মন্তব্য কানে এসেছিল সরিতেব, এ যা ফিগার মাইরি, সাতটা মিলিটারিও ঠান্ডা করতে পারবে না।

কথাটা শ্লীল নয়, শুনে সরিৎ লজ্জাও পেয়েছিল বটে। কিন্তু কথাটা মিথ্যেও নয়। বলতে কি সেজ জামাইবাবুর আদুরে মোলায়েম চেহারার পাশে সেজদিকে মানায় না। ভাই হিসেবে তার কথাটা ভাবা উচিত নয়, তবু তার মাঝে মাঝে ইদানীং সন্দেহ হচ্ছে, নরম-সরম জামাইবাবু তার পাঞ্জাবি মেয়ের মতো ফিগারওলা সেজদিকে ঠান্ডা করতে পারে কি না। কথাটা এই নেশার

ঘোরে মনে হওয়ায় হাসিটা চাপতে পারল না সরিৎ। ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। বিয়ের আসরে সেজদি আর জামাইবাবুকে দেখে মুখ-পাতলা বড় জামাইবাবু বলেই ফেলেছিল, এ যে প্রশান্ত মহাসাগরে একটা কাঁচকলা। কথাটা মনে হওয়ায় সরিৎ আবার হাসে। হাসতেই থাকে।

খ্যাপা নিতাই চোখ খুলে গম্ভীর গলায় বলল, হাসছ যে!

একটা কথা ভেবে।

কী কথা?

সে আছে!

নেশাটা খুব ধরেছে তোমায়। বাড়িতে গিয়ে খানিকটা দুধ খেয়ে নিয়ো। নইলে এ নেশায় শরীর শুকিয়ে যায়।

আর কী হয়?

ব্রেন খুব কাজ করে। লোকে গাঁজাখোরকে গাঁজাখোর বলে বটে, কিন্তু মগজকে এমন তরতরে করার মতো জিনিস আর নেই। গাঁজা হচ্ছে কুলোর মতো, ঝেড়ে ঝেড়ে আজেবাজে চিন্তা মগজ থেকে ফেলে দেয়। কাজের জিনিসগুলো রাখে।

কুলোর উপমায় সরিৎ আবার ফিক করে হাসে। বুঝতে পারে, হাসিটা কিছুতেই সে সামলাতে পারছে না। খুব ডগমগ লাগে ভিতরটা। সেজদিকে এখানকার এরা সবাই ভয় খায় জেনেও তার হাসি আসতে থাকে। সে বলে, সেজদিকে তোমরা যে মেয়েমানুষ বলে মনে করো না সেই কথাটা আমি আজই সেজদিকে বলে দেব।

নিতাই আবার ফাঁপরে পড়ে গিয়ে বলে, তাই কি বললাম নাকি?

তাই তো বললে!

দূর বাপু, তুমি সব কথারই সোজা মানেটা ধরো। এ কথার মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে, সেটা তো বুঝবে।

প্যাঁচটা আবার কী?

নিতাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তখন মল্লিবাবু বেঁচে। গুঁতে নামে একটা বিখ্যাত চোর ছিল এ তল্লাটে। গুণী লোক। তার হাত খুব সাফ ছিল। তো সে একবার এ রকম মাঘের রাত্তিরে তোমাদের দক্ষিণের ঘরে হানা দিয়েছিল। সে ঘরে ঠাকরোন আর তাঁর মেয়েরা শোয়। শ্রীনাথবাবু তখন কলকাতায়। সজলখোকা তখনও হয়নি।

গল্পটা বলতে বলতে নিতাই একবার আঁধারভেদী বেড়ালচক্ষুতে সরিতের মুখখানা দেখে নেয়। শালা শুনছে তো ঠিক? প্যাঁচটা ধরতে পারছে তো?

সরিৎ শুনছে। মন দিয়েই শুনছে। এসব কথাই তো সে শুনতে চায়।

সরিৎ বলল, হুঁ।

নিতাই থুঃ করে কৃত্রিম থুথু ফেলে বলে, তা ঘরে ঢুকতে অবশ্য গুঁতেকে কষ্ট করতে হয়নি। ঠাকরোন বুঝি বাইরে গিয়েছিলেন দরজাটায় শেকল দিয়ে। গুঁতে তক্কে-তক্কে ছিল, সেই ফাঁকে গিয়ে ঢুকে মেয়েদের গলার হার, হাতের বালা হাতাচ্ছে।

তুমি তখন কোথায় ছিলে?

আমি তখনও সাধু হইনি। গোলাঘরের পাশে মল্লিবাবু একটা কাঁচা ঘর করে দিয়েছিলেন, সেইখানে মড়ার মতো পড়ে ঘুমোতাম।

তো কী হল?

গুঁতে যখন বেরোতে যাচ্ছে সেই সময় ঠাকরোন উঠোন পেরিয়ে ফিরে আসছিলেন।

উঠোন পেরিয়ে কেন? কলঘর কি তখন উঠোনের অন্যধারে ছিল?

নিতাই একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল। যাক বাবা, ছেলেটা একেবারে গাড়ল নয়। ঠিক ঠিক শুনছে, জায়গামতো প্যাঁচটা ধরতেও পারছে।

নিতাই একটু আমতা আমতা করে বলল, ঠিক তা নয়। ঠাকরোন হয়তো বাড়িটা চক্কর মারতে বেরিয়েছিলেন। খুব ডাকাবুকো মানুষ তো। ভূত-প্রেত চোর-ডাকাত কাউকে ভয় নেই।

উঠোনের এধারে কে থাকত?

নিতাই অবাক হওয়ার ভান করে বলল, কে আবার থাকবে? তখন তো এত ঘর ওঠেনি। উত্তরধারে মল্লিবাবুর সেই ঘর এখনও আছে, উনিই থাকতেন।

সরিৎ মৃদু হাসে। গোলমালটা সে আগেই আন্দাজ করেছিল, এখন ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। গাড়ল নেতাইটা বুঝতে পারছে না যে, গুহ্যকথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।

সরিৎ বলল, তারপর?

ঠাকরোনের হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ছিল। চোখধাঁধানো আলো হত সেটাতে। গুঁতে যেইমাত্র চৌকাঠ ডিঙিয়েছে অমনি ঠাকরোন টর্চটা মারলেন। গুঁতে এক লাফে উঠোনে নেমেই ঠাকরোনের হাতের টর্চটা কেড়ে নিয়ে উঠোনে ফেলে দিয়ে দু'হাতে মুখ আর হাত চেপে ধরে বলল, টুঁ শব্দ করলে মেরে ফেলব। গুঁতে ভেবেছিল, মেয়েমানুষকে আর ভয় কী? মতলব ছিল, ঠাকরোনকে ঘরে ভরে দিয়ে বাইরে থেকে শেকল টেনে পালাবে। অন্য সব মেয়েমানুষ হলে তা পারতও। ওই অবস্থায় বেশির ভাগ মেয়েছেলেরই দাঁত কপাটি লাগার কথা। কিন্তু ঠাকরোনের ধাত অন্য। এক ঝটকায় গুঁতের হাত ছাড়িয়ে এমন এক চড় কষালেন গুঁতে সেইখানে বসে পড়ল। আশ্চর্য যে ঠাকরোন কাউকে ডাকাডাকি করেননি, হাল্লাচিল্লা ফেলেননি। সেইখানে গুঁতেকে ধরে লম্বা টর্চখানা দিয়ে এমন উস্তম-কুস্তম পেটালেন যে, তার ধাত ছাড়ার জোগাড়।

সাংঘাতিক তো।— সেজদির এই সাহসে সরিৎ ভারী বিস্মিত হয়।

সেই তো কথা। কাণ্ডটা মল্লিবাবু তাঁর ঘর থেকে আগাগোড়া দেখেছিলেন।

সে কী? দেখেও বেরোননি?

বেরোননি কেন তার কারণ আছে। পরে বলেছিলেন, আমি তৃষার সাহস আর বীরত্বটা দেখছিলাম। স্বীকার করতে হয়, হ্যাঁ, মেয়েমানুষ বটে। এরকম একজন ঘরে থাকলে পুরুষমানুষের আর চিন্তা-ভাবনা থাকে না।

সেজদিকে খুব শ্রদ্ধা করতেন বুঝি মল্লিবাবু?

খুব। শুনিয়ে শুনিয়েই বলতেন, শ্রীনাথের বউ যেন গোবরে পদ্মফুল। দেখেছ তো মল্লিবাবুকে?

অনেকবার। দারুণ চেহারা ছিল। মিলিটারির মতো।

তবে বলো ঠাকরোনের পাশে মানাত কাকে? ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। তবু বলি শ্রীনাথ কর্তাকে একেবারে গোবরগণেশ লাগে ঠাকরোনের পাশে। মল্লিবাবুর উঁচেগোটে জম্পেশ চেহারাখানা ছিল। কার্তিকঠাকুরটি নন, রীতিমত খাটিয়ে-পিটিয়ে শরীর।

সে কথা ঠিক।

তবেই বোঝো মল্লিবাবু কেন ঠাকরোনের নামে সম্পত্তি দিয়ে গেলেন। জানতেন, এঁর কাছ থেকে লোকে ভয় দেখিয়ে নিতে পারবে না।

লোকে কি চেষ্টা করেছে?

করে আবার নি! বিস্তর করেছে। তবে ঠাকরোনের সঙ্গে এটে ওঠেনি কেউ। গুঁতেকে যেমন হাজতবাস করিয়ে দেশছাড়া করেছিলেন তেমনি আরও অনেক কীর্তি আছে। থাকো, শুনবে।

দু'-চারটে বলো না শুনি।

সে অনেক আছে। লোকে সাধে কি ঠাকরোনকে মেয়েছেলে বলে ভাবে না!

কেউ ভাবে না?

নিতাই আবার মুখটা দেখার চেষ্টা করল। ছেলেটা ল্যাজে খেলাচ্ছে না তো! ভাল মানুষের মতো বলল, ঠাকরোনের সমান সমান পাল্লা টানার মতো মরদ কে আছে বলো! একমাত্র ছিলেন মল্লিবাবু। তাঁর সামনে ঠাকরোন মাথা উঁচু করে কথা বলতেন না।

বটে! বটে!— সরিৎ নড়েচড়ে বসে।

মরদ এ তল্লাটে ওই একজনই ছিল। আর দিনে কালে আর একজনও হয়তো হয়ে উঠবে।

কে? কার কথা বলছ?

সজল খোকাবাবু।

সরিৎ একটু ধাঁধায় পড়ে যায়। সজলকে নিয়ে সে কখনও কিছু ভাবেনি। এখন হঠাৎ ভাবনাটা শুরু হল। ঝিম হয়ে খানিক এলেবেলে চিন্তা ও টলোমলো মাথায় সে সজলের মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। তারপরই তার মনে হল, সজলের চেহারাটা বয়সের তুলনায় বেশ লম্বা। হাড়গুলো মজবুত এবং কাঠামোটাও শক্ত, ভারী জেদি ছেলে। মায়ের শাসনে মিনমিনে হয়ে থাকে বটে, কিন্তু ওর ধাত তা নয়। পরশু কি তার আগের দিনই হবে, সজল মুরগির ঘর থেকে একটা মস্ত মোরগ চুরি করে নিয়ে যায় এবং তার বাবার দাড়ি কামানোর জার্মান ক্ষুর দিয়ে সেটাকে জবাই করে। সেই অবস্থাতেই ফেলে রেখেছিল পুকুরের ধারে। হুলো বেড়ালটা মুখে করে সেটাকে নিয়ে গোলাঘরের পিছনে ছেঁড়াছেঁড়ি করছিল। স্বপ্না দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি করায় ঘটনাটা ধরা পড়ে। প্রথমে সজলকে কেউ সন্দেহ করেনি। কিন্তু সেজদি সহজে ছেড়ে দেয়নি, সবাইকে প্রশ্ন করে অবশেষে ঠিক আসামিকে ধরতে পারে। সজল কবুল করেছে সে মাংস খাওয়ার জন্য মোরগটা চুরি করেনি। তবে? তার কোনও জবাব নেই।

খ্যাপা নিতাই বলল, ঠিক মল্লিবাবুর মতো।

কে?

সজল খোকাবাবু।

কথাটার মানে কী নিতাই?

সরিতের গলার স্বরটা হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠায় নিতাই সাবধান হয়ে বলে, কোনও মানে-টানে নেই বাপু। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

নেশাটা যত জোর ধরেছে বলে ভেবেছিল সরিৎ ততটা নয়। হঠাৎ এই সং-সাজা ভাঁড়টার ওপর তার রাগ হল প্রচণ্ড। টাপে টোপে বলছিল সে এক রকম কিন্তু এ তো পষ্টাপষ্টি সেজদির কলঙ্ক রটানো।

সরিৎ মালদায় বিস্তর মারপিট করেছে। অনেকগুলো কাজিয়া ছিল না-হক খামোখা। অনেক সময় নির্দোষ লোককেও মেরেছে। আজ একটা মতলববাজ হারামজাদাকে মারলে কেমন হয়?

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ উঠে একটা লাথি চালায় সরিৎ, এই শালা! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

নিতাই পোঁটলার মতো গড়িয়ে পড়েছে বারান্দা থেকে। পড়েই চেঁচাল, মেরে ফেললে! মেরে ফেললে!

সরিৎ লাফিয়ে নামে। মাথায় আগুন ধরে গেছে। পর পর কয়েকখানা লাথি ঝাড়ল কাঁকালে। বলল, শব্দ করলে মেরে চরে পুঁতে ফেলব।

কে শোনে কার কথা। মাটিতে পড়ে খ্যাপা নিতাই গড়ায় আর জটাজুটে ধুলো মাখে আর প্রাণপণে চেঁচাতে থাকে, নির্বংশ হবি। অন্ধ হয়ে যাবি। কুষ্ঠ হবে।

॥ তেরো ॥

বদ্রীর ইনফ্লুয়েনজা হয়েছিল, খবর পেয়েছিল শ্রীনাথ। তারপর থেকে সে আর আসছে না। নদীর ওধারে মাইল দশেক ভিতরে শ্যামগঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে। যেখানে এক লপ্তে প্রায় বিঘে দশেক জমি আছে। তাতে বর্গা নেই। খবরটা ভালই ছিল। কিন্তু বদ্রী একদম নাপাত্তা। সে থাকেও বহু দূরে। লাইনের ওধারে অনেকটা যেতে হয় কাঁচা রাস্তায়। জায়গাটা খুব ভাল চেনেও না শ্রীনাথ।

দাদার এই বাড়ি থেকে তার যে বাস উঠে গেছে সেটা সে টের পেয়েছে বহুকাল। ভাবন-ঘরের চাবি তার সঙ্গে থাকে। মজবুত তালা ঝোলে দরজায়। ডুপলিকেট চাবিটা সে বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখেছে। সেটা যেমন কে তেমনই আছে। খোয়া যায়নি। তবু সজল কী করে ঘরে ঢোকে এবং তার জিনিসপত্র ঘাঁটে তা প্রথম-প্রথম ততটা খেয়াল করে ভাবেনি সে। ক'দিন আগে আবার তার ক্ষুরে হাত পড়ায় হঠাৎ খেয়াল হল।

স্বপ্না এসেছিল সকালে, চা দিতে। তাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, আমার ঘরের তালাটা সজল খোলে কী করে জানিস?

স্বপ্না বা স্বপ্নলেখা রোগা মেয়ে। খুব শান্ত, খুব নীরব এবং দুঃখী চেহারা। মুখখানা ভীষণ ধারালো বটে, কিন্তু স্বভাবের সঙ্গে তার মুখশ্রীর কোনও মিল নেই। নিজের এই মেয়েটিকে শ্রীনাথ কখনও ঠিক বুঝতে পারে না।

শ্রীনাথের প্রশ্ন শুনে স্বপ্না ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থেকে বলল, বোধ হয় চাবি আছে।

চাবি তো আমার কাছে।

তা হলে ঠিক জানি না।

সজলকে দেখতে পেলে পাঠিয়ে দিস তো।

ও আসবে না।

কেন?

সেদিন সেই মোরগ চুরির পর থেকে মা ওকে দক্ষিণের ঘরে সারাদিন শেকল দিয়ে আটকে রাখে।

ও।— বলে একটু গম্ভীর হয়ে যায় শ্রীনাথ। ভিতরবাড়িতে কী হয় না হয় তার সব খবর তার কানে এসে পৌঁছয় না। শ্রীনাথ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আচ্ছা যা।

স্বপ্না চলে যাচ্ছিল। শ্রীনাথ ডাকল, শোন।

বলো।

চাবির কথাটা তোর মায়ের কানে তুলিস না।

স্বপ্না একটু হেসে বলল, কে ওসব কথা তুলবে বাবা! মা যে রেগে আছে দু'দিন ধরে! ভাইকে শুধু গলা টিপে মেরে ফেলতে বাকি রেখেছে। ছোটমামা না আটকালে কী যে হত!

বিরক্ত হয়ে শ্রীনাথ বলল, দোষ যখন স্বীকারই করেছে তখন অত মারধরের কী দরকার ছিল!

মা জানতে চাইছিল মোরগটাকে ও মারল কেন! সেই কথাটার জবাব দেয়নি যে। শুধু বলেছে, আমি চুরি করেছি, আমিই কেটেছি। কিন্তু কেন তা বলতে পারছে না।

কেন আবার! রক্তের দোষ! মায়াদয়াহীন বলেই তরতাজা মোরগটাকে মেরে মজা দেখেছে। আমি তো দেখেছি ও প্রায়ই ডিম চুরি করে এনে ঢিল ছোড়ে তাই দিয়ে।

স্বপ্না চলে গেল। চাবির রহস্যটা বসে বসে ভাবতে লাগল শ্রীনাথ। ভেবে কোনও হদিশ করতে না পেরে বাগানে নেমে গেল।

গাছপালার মধ্যে শ্রীনাথের আনন্দ অগাধ। আচার্য জগদীশ বোস গাছপালার মধ্যে প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন। সারা দুনিয়ার বোকা লোকেরা এক বাঙালির কাছে শিখেছিল এই মহান সত্য, তবু

নোবেল প্রাইজ দেয়নি। শ্রীনাথের হাতে ক্ষমতা থাকলে জগদীশবাবুকে চারবার নোবেল প্রাইজ দিত। গাছপালার প্রাণ যে কত বড় আবিষ্কার তা কেন যে তেমন স্বীকার করল না সাহেবরা! জগদীশ বোস নেটিভ বলেই কি? হবে। সাহেবরা বড় নাকউঁচু জাত।

প্রতিদিন শ্রীনাথ নিজেও গাছপালার প্রাণ আবিষ্কার করে। এখানে এক অদ্ভুত নীরব অনুভূতির সাম্রাজ্য। বাক্য নেই, শ্রবণ নেই, যৌনতা নেই, তবু জন্ম আছে, বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার আপ্রাণ প্রয়াস আছে। ক্রিসেনথিমাম, কসমস, পপি বা গোলাপ বলে কথা নেই, নগণ্য আগাছাও শ্রীনাথের প্রিয়। ফুলের বাগান থেকে বহুবার ওপড়ানো আগাছা সে ঘের-দেয়ালের ধারে ধারে পুঁতে দিয়ে এসেছে। আজও বীজ থেকে গাছের জন্ম দেখে অবাক হয় শ্রীনাথ। বসে বসে ভাবে। চোখে সবুজের ঘোর লেগে যায় তার। মাটির ভিতব পোঁতা শুকনো বীজ থেকে গুপ্ত সৈনিকের মতো সারি সারি ওরা কী করে যে বেরিয়ে আসে! কী অদ্ভুত! কী আশ্চর্য! একই মাটি থেকে বীজের রকমফেরে কী করে জন্মায় এত রকমের গাছ!

শ্রীনাথের হাতের গুণে সামনের বাগানটা হয়েছে দেখবার মতো। অবশ্য কারও চোখে পড়ে না তেমন। লোক লাগিয়ে শুকনো ডালপালা দিয়ে দেড় মানুষ সমান উঁচু দুর্ভেদ্য একটা বেড়া দিয়ে রেখেছে শ্রীনাথ, যাতে তেমন চোখে না পড়ে। খ্যাপা নিতাইয়ের কুকুরটা আর কোনও কাজের না হোক, গাছের পাতা খসলেও চেঁচায়। শুধু চেঁচাতে জানে। তবু সেই ভয়েই ফুলচোররা বড় একটা হানা দেয় না। এ হল শ্রীনাথের নিজস্ব বাগান। নার্সারি থেকে বিচিত্র ফুলের বা ফলের বীজ আর চারা নিয়ে আসে সে। সার দেয়, জল দেয়, আর দেয় অগাধ মায়া মেশানো ভালবাসা। গাছ তেজে বেড়ে ওঠে। বার বার অবাক করে, আনন্দে ভরে দেয় শ্রীনাথকে। যতক্ষণ সে বাগানে থাকে ততক্ষণ সে অন্য মানুষ। কাম নেই, ক্রোধ নেই, লোভ নেই, অভিমান নেই, এমনকী অহংবোধটুকু পর্যন্ত থাকে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা বিভূতিভূষণের মতো সেও তখন অর্ধেক নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে বিসর্জন দেয়। সম্মোহিত হয়ে থাকে নীরব প্রাণের খেলা দেখে।

একটা নাইট কুইনের গোড়া উসকে দিচ্ছিল শ্রীনাথ। হঠাৎ নজরে পড়ল বাগানের পিছন দিয়ে আগাছায় ঢাকা পড়ো এক ফালি জমির দিকে। কেউ চলাচল করে না, দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢেকে আছে। কিন্তু ওই পড়ো জমি দিয়ে যেতে পারলে সকলের অলক্ষে দক্ষিণের ঘরের পিছন দিকটায় হাজির হওয়া যায়।

একটু ভাবল শ্রীনাথ। যাওয়াটা ঠিক হবে কি?

তারপর ভেবে দেখল, তার সংকোচের কোনও কারণ তো নেই। সে তো এখনও এ বাড়ির কর্তা।

খুরপি রেখে শ্রীনাথ উঠল। জঙ্গলে কাঁটাগাছ থাকতে পারে বলে ঘরে গিয়ে বাগানের কাজের হাওয়াই চটি ছেড়ে একজোড়া পুরনো রবারের বর্ষার জুতো পরে নিল। সাপ বা অন্য কিছুর ভয় তার নেই। জন্মসূত্রেই বোধ হয় সে কোনও জায়গায় সাপ আছে বা নেই তা টের পায়। গত গ্রীষ্মেও একদিন ভোররাতে অন্ধকারে বারান্দার সিঁড়িতে পা বাড়িয়েও সে পা ফেলেনি। মন থেকে কে যেন সাবধান করে দিয়েছে। পা আটকে গেছে। পরে টর্চ জ্বেলে দেখেছে, কেউটে। এখন শীতকাল বলে আরও ভয় নেই।

পড়ো জমিটা মোটামুটি নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে গেল শ্রীনাথ। দক্ষিণের ঘরের পিছনে নিষ্পত্র ঝোপঝাড়। একটু খড়মড় শব্দ হয়ে থাকবে।

ঘরের ভিতর থেকে ভয়ে ভয়ে সজল বলল, কে রে?

শ্রীনাথ জানালায় পৌঁছে দেখল, পড়ার টেবিলে বসে সজল সোজা জানালার দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে। চোখে অবাক চাউনি।

বাবা!

শ্রীনাথ মৃদু ম্লান একটু হাসল। বলল, ভয় পাওনি তো!

না। তুমি ওখানে কী করছ?

তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

সজল আরও অবাক। বাবার কথা থাকলে এমন চোরের মতো পিছনের জানালা দিয়ে কেন? কিন্তু সেটা বলল না সজল। চেয়ে রইল।

শ্রীনাথ বলল, তোমাকে তোমার মা আটকে রেখেছে বুঝি?

সজল মৃদু একটু হাসল। চমৎকার দেখাল ওকে। সুপুরুষ ছেলেটি। গালে টোল পড়ল। ঘন ভ্রু-র নীচে চোখ দুটো ঝিকিয়ে উঠল বুদ্ধির দীপ্তিতে। চাপা স্বরে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু আমার খারাপ লাগছে না।

আটক থাকলে তো খারাপ লাগারই কথা। তোমার তবে লাগছে না কেন?

খারাপ লাগলে তো আমি মা'র কাছে হেরে যাব। মা তো চায় আমার খারাপ লাগুক।

এ কথায় একটু অবাক হয় শ্রীনাথ। সজল যে অনেক গভীর করে ভাবতে পারে তা টের পায়নি কখনও। এ প্রসঙ্গে আর না গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, সারাদিন তুমি কী করো?

বই পড়ি। আর পাটাতনের ওপর অনেক পুরনো জিনিস আছে। এত জিনিস যে অবাক হতে হয়।

পাটাতনে ওঠা না তোমার বারণ? ওঠবার মইটা তেমন ভাল নয়। নড়বড় করে। পড়ে গেলে?

সজল ভয় খেয়ে বলে, সব সময় নয়। যখন একঘেয়ে লাগে, ঘুমটুম পায়, তখন উঠি। সাবধানে।

উঠে কী করো?

জিনিস দেখি। ওপরে অনেক জিনিস বাবা! আমি রোজ ওখানে গুপ্তধন খুঁজি।

এত সহজভাবে সজল কখনও শ্রীনাথের সঙ্গে কথা বলে না। এখন কেন বলছে তাও বোঝে শ্রীনাথ। সজল জানে তার বাবা আর মা দুই প্রতিপক্ষ। সব সময়েই সজল তার মায়ের পক্ষে। কিন্তু সেই মোরগ চুরির ঘটনার পর মায়ের ওপর গভীর ও তীব্র বিরাগ থেকে সজল সাময়িকভাবে তার বাবার পক্ষ নিয়েছে। এবং এও হয়তো কারণ যে, শ্রীনাথকে এভাবে চুপি চুপি পিছনের জানালায় হাজির হতে দেখে সে বাবার গুরুত্বটা খানিক হারিয়ে ফেলেছে।

শ্রীনাথ বলল, আমি কখনও ওই পাটাতনে উঠিনি। কী আছে বলো তো!

অনেক ট্রাংক বাক্স। পুরনো সব মেটে হাঁড়ির মুখে মালসা দিয়ে ঢেকে ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখা। পুরনো বই আর খবরের কাগজের ডাঁই।

আর কী?

একটা টর্চ থাকলে বুঝতে পারতাম। পাটাতনটা দিনের বেলাতেও এত ঘুটঘুট্টি অন্ধকার যে কিছুই ভাল করে বোঝা যায় না।

আর উঠো না। মা টের পেলে আবার শাস্তি দেবে।

দিলেই কী? আমাকে যে গুপ্তধন খুঁজতে হবে।

ভ্রুকুটি করে শ্রীনাথ বলে, শাস্তিকে তুমি ভয় করো না?

সজল বাবার দিকে চেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বসা স্বরে বলে, করি।

করবে। শাস্তিকে ভয় যে না করে তার সর্বনাশ।

সজল চুপ করে চেয়ে থাকে।

বাবা-ছেলের মধ্যে একটু আগের সহজ সম্পর্কটা হঠাৎ কেটে যায়।

শ্রীনাথ গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, ইয়ে, তোমাকে একটা প্রশ্ন করার ছিল। জবাব দিতে ভয় খেয়ো না। সত্যি কথা বললেও আমি রাগ করব না।

কী?

আমার ঘরের তালাটা তুমি কীভাবে খোলো? চাবি দিয়ে, না অন্য কোনও যন্ত্রপাতি আছে?

সজল একটু অবাক হয়ে বলে, কেন? চাবি দিয়েই খুলি। অবশ্য খোলাটা অন্যায় হয়েছে। আর কখনও—

বাধা দিয়ে শ্রীনাথ বলে, অন্যায় তুমি স্বীকারও করেছ। সেটা নিয়ে আমার কোনও প্রশ্ন নেই। কথা হল, চাবি দিয়েই বা খোলো কী করে? চাবি তো আমার কাছে থাকে।

সজল একটু আমতা-আমতা করে বলে, মায়ের কাছে যে চাবিটা আছে, সেইটে চুরি করি।

মায়ের কাছে! শ্রীনাথ ভীষণ অবাক হয়। ঘরের তালাটা সে মাস দুই আগে চাঁদনি বাজার থেকে বাইশ টাকায় কিনেছে। নামকরা তালা। দুটো চাবিই তার কাছে। তৃষার কাছে আর একটা চাবি যায় কী করে? এলেবেলে তালা নয় যে, যে-কোনও চাবিতে খুলে যাবে। শ্রীনাথ কঠিন স্বরে বলে, তোমার মায়ের কাছে তো চাবি থাকার কথা নয়।

সজল বাপের দিকে চেয়ে আবার ফ্যাকাসে হয়। শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলে, গুরুপদ চাবিওলা মাকে চাবিটা বানিয়ে দিয়েছে।

শ্রীনাথ অবাক ভাব চেপে রেখে বলে, ও তালার চাবি কি বানানো যায়? চাবি বানাবে কীভাবে?

সজল মাথা নেড়ে বলে, জানি না তো! গুরুপদদা একদিন চাবিটা দুপুর বেলায় মাকে দিয়ে যায়। সেই চাবি দিয়ে মা একদিন তোমার ঘর খুলে বৃন্দাদিকে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করিয়েছিল।

ও।— বলে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে শ্রীনাথ।

সজলের ভয় কাটেনি, বরং বাড়ল। সে তাড়াতাড়ি বলল, দোষটা আমারই।

তুমি মোরগটাকে মেরেছিলে?

হ্যাঁ।

মরার সময় মোরগটা কেমন করেছিল?

খুব ডানা ঝাপটাচ্ছিল। ভীষণ ডাকছিল। আমাকে ঠোকরানোর চেষ্টা করছিল। অথচ যখন চুরি করে ঠ্যাং ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন কিছু করেনি। ঠিক যখন কাটব তখন ওই রকম করতে লাগল। কী করে যেন টের পেল, আমি ওকে কাটব।

মোরগের তো অত বুদ্ধি নেই, তবে টের পেল কী করে?

সজল কিছুক্ষণ ভেবে বলে, ক্ষুরটা দেখে বোধ হয়।

ওরা তো ক্ষুর চেনে না।

অসহায় ভাব করে সজল বলে, তা হলে কী?

শ্রীনাথ একটু হেসে বলল, ওরা অস্ত্র চেনে না ঠিকই। তবে বোধ হয় ওরা কখনও-সখনও মানুষের চোখ মুখ আর হাবভাব দেখে কিছু টের পায়। আর কিছু না হোক, নিষ্ঠুরতাটা বুঝতে পারে, মৃত্যুর গন্ধও পায় নিশ্চয়ই।

সজল একটু অন্যমনস্ক হয়ে বোধ হয় দৃশ্যটা কল্পনা করে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, আমি অতটা বুঝতে পারিনি।

শ্রীনাথ সান্ত্বনার গলায় বলে, তোমার এখনও বোঝার বয়সও হয়নি। বয়স হলেও অনেকে ব্যাপারটা বোঝে না।

কাজটা খুব অন্যায় হয়েছিল, না?

শ্রীনাথ একটা শ্বাস ফেলে বলে, আমরা সবাই যখন মাছ মাংস খাচ্ছি তখন কাজটাকে একা তোমার অন্যায় বলি কী করে? মোরগ তো সবাই মারছে।

সজল একটু হেসে বলে, তা হলে অন্যায় নয় তো?

তা ঠিক বলতে পারি না। হয়তো অন্যায়ই হবে। কিন্তু তুমি ওটা করতে গেলেই বা কেন? মাংস খেতে ইচ্ছে হয়ে থাকলে মংলুকে বললেই তো পারতে। ও কেটে দিত।

মাংস খেতে ইচ্ছে হয়নি তো! মা রোজ টেংরির জুস খাওয়ায়। রোজ খেতে ভাল লাগে, বলো?

খেতে খেতে এখন মাংসের গন্ধে আমার বমি আসে।

শ্রীনাথ বলে, তা হলে কাটলে কেন?

এমনিই।

শ্রীনাথ হাসে, দূর পাগল! এমনি এমনি কিছু করে নাকি মানুষ? কারণ একটা থাকেই। একটু ভেবে দেখ তো!

আমার খুব রাগ হয়েছিল।

কার ওপর?

সকলের ওপর।

আমার ওপরেও?

সজল লজ্জা পায়। মাথা নেড়ে বলে, না, তোমার ওপর নয়।

তবে কি মায়ের ওপর?

হুঁ।

কেন?

সজল এবার আবার একটু ভাবে। ভেবে বলে, ঠিক মায়ের ওপরেও নয়।

তবে কার ওপর?

এই বাড়িটার ওপর। গাছপালার ওপর। হাঁস-মুরগির ওপর।

তোমার অত রাগ কেন?

এক-একদিন খুব রাগ হয়।

শ্রীনাথ আবার ক্ষীণ হাসে। বলে, রেগে যদি মোরগ মারতে পারো, তা হলে একদিন মানুষকেও খুন করে বসবে যে!

না, তা নয়।— সজল মাথা নিচু করে।

শ্রীনাথ এই বাক্যালাপে আগাগোড়া কৌতুক বোধ করছে। সে হেসেই বলল, স্কুলে যাচ্ছ না?

না। দু'দিন মা স্কুলে যাওয়া বন্ধ রেখেছে।

কবে তোমার ছুটি হবে?

বোধ হয় আজ। বৃন্দাদি সকালে এসে বলে গেছে পড়া করে রাখতে। আজ স্কুলে যেতে হবে।

রাত্রে তুমি এই ঘরে একা থাকো?

না, ছোটমামা শোয়।

ও।— শ্রীনাথ মৃদু স্বরে বলে, শোনো। তোমার সঙ্গে আমার আরও কয়েকটা কথা আছে। সন্ধের পর একবার আমার ঘরে এসো।

আচ্ছা।

তারপর শ্রীনাথ একটু ইতস্তত করে বলে, আমার সঙ্গে এই যে কথা হল এটা কাউকে বোলো না। আমি লুকিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম।

সজল এক গাল হেসে বলল, জানি।

শ্রীনাথও হাসল।

বলতে কী, মল্লিদাদার ওপর শ্রীনাথের কোনও রাগ নেই।

আগাছায় ভরা পড়ো জমি পেরিয়ে সামনের দিকে ফিরে আসতে আসতে শ্রীনাথ ভাবে, স্ত্রী বা মেয়েমানুষের ওপর অধিকারবোধটা ভুলে যেতে পারলে পৃথিবীটা কি আরও একটু সুন্দর হয়? কুকুব, বেড়াল, পাখি, পতঙ্গের তো বউ থাকে না। ওরকম হলেই কি ভাল? তা হলে সজল কার ছেলে, তার বউ কার সঙ্গে শুয়েছে, না শুয়েছে এসব বাজে চিন্তায় আর কষ্ট পেতে হয় না। ভেবে

দেখলে, সজলের ওপরেও তার বিরাগ থাকা উচিত নয়। নিজের জন্মের জন্য সে তো দায়ী ছিল না!

গাছপালা, কীটপতঙ্গের কাছ থেকে শ্রীনাথ আজকাল অনেক শিখছে।

পালং ক্ষেতে সরিৎ দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে বলল, জামাইবাবু, কোথায় ছিলেন? কখন থেকে খুঁজছি।

শ্বশুরবাড়ির কারও ওপর খুব খুশি নয় শ্রীনাথ। অবশ্য ওদের কোনও দোষও নেই। ভালমন্দে মিশিয়ে যেমন মানুষ হয়, ওরাও তেমনি সাধারণ। তবু তৃষার ওপর থেকে যেদিন তার মন সরে গেছে সেদিন ওদের ওপর থেকেও গেছে।

শ্রীনাথ জোর করে মুখে হাসি এনে বলল, খুঁজছিলে?

হ্যাঁ। ভাবলাম, কোনও কাজ নেই যখন, জামাইবাবুর বাগানটা দেখে আসি। আমি খানিকটা বাগানের কাজ জানি।

খুব ভাল। এর পর থেকে এই বাগান তোমরাই দেখবে।

কেন, ওকথা বলছেন কেন? বাগান তো আপনারই।

কিছুই আমার নয়। জানো না?— মুখ ফসকে কথাটা বেরোল।

সরিৎ বোধ হয় মুখোমুখি কথাটা শুনে লজ্জা পেল। বলল, আমার বেশি জানার দরকার কী?

শ্রীনাথ অবশ্য সামলে গেল। বলল, আসলে কী জানো? এসব এখন ভাল লাগে না। এখন ভাল লাগে চুপচাপ সময় কাটিয়ে দিতে। কেউ একজন যদি বাগানটা দেখে তো ভালই।

সরিৎ মাথা নেড়ে বলে, আমি দেখব। আপনি কী করে কী করতে হয় বলে দেবেন।

বেশ তো।

সরিৎ বেশ লম্বা-চওড়া ছেলে। ওদের ধাতটাই ওরকম। সা জোয়ান সব। তবে খুব একটা বুদ্ধি বা রুচি নেই। একটু ভোঁতা, ব্যক্তিত্বহীন। এক সময়ে এই সরিৎ খুব প্রিয় ছিল শ্রীনাথের।

সরিৎ বলল, আগে আপনি আমাকে সব সময়ে ব্রাদার বলে ডাকতেন। এবার এসে একবারও ডাকটা শুনিনি।

শ্রীনাথ হাসল। বলল, কতকাল দেখা হয়নি। কী ডাকতাম তা মনেই ছিল না। এবার থেকে ডাকব।

আমাদের ভুলে গিয়েছিলেন তবে?— সরিৎ সকৌতুকে প্রশ্ন করে।

শ্রীনাথ বিপাকে পড়ে বলে, আরে না। ডাক ভুলতে পারি, মানুষকে কি ভোলা যায় সহজে!

শুধু মানুষ কেন, আমরা তো আত্মীয়। নয় কি?

সে তো বটেই।

তবে?

শ্রীনাথ কথার পিঠে কথা বলতে জানে না। তাই লজ্জা পেয়ে বলল, এসো, ঘরে এসো।

ঘরে ঢুকেই সরিৎ বলে, দারুণ তো! ঘর না বার তা বোঝা যায় না এত আলো বাতাস!

শ্রীনাথ তার ইজিচেয়ারে বসে বলল, তোমাদের বাড়ির সকলের খবর-টবর কী?

সরিৎ জবাবের জন্য তৈরিই ছিল। বলল, দিন পনেরো হল এসেছি, এই প্রথম এ কথাটা জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীনাথের বাস্তবিকই কারও কোনও খবর জানার কৌতূহল হয়নি। এইসব নীতি-নিয়ম ভদ্রতাবোধ তার মাথা থেকে উবে যাচ্ছে কেন?

সরিৎ ফের বলল, এ কয়দিন ভাল করে কথাই বলছিলেন না। আমি ভাবলাম, আমাদের ওপর বুঝি রাগ করে আছেন।

কথাটার জবাব হয় না। শুধু হাসি দিয়ে সেরে দিতে হয়। শ্রীনাথ যতদূর সম্ভব অপরাধী হাসি

হেসে বলল, সংসারের নানা রকম ব্যাপার। আমি ঠিক এত বড় একটা এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অভ্যস্ত নই কিনা। তাই বড্ড ভুলও হয় সব কাজে।

সরিৎ বিছানায় বসে বলল, কার খবর জানতে চান?

শ্রীনাথের মনে পড়ল প্রথমেই শাশুড়ির কথা। বিয়ের সময় শ্রীনাথ খুব খেতে পারত। শাশুড়িও তাকে তখন প্রাণভরে খাইয়েছেন। থালার চারদিকে বাটি সাজিয়ে গোটা দুই বৃত্ত রচনা করে ফেলতেন প্রায়। প্রথমেই সেই ভদ্রমহিলার কথা মনে পড়ে। শুনেছে, খুব সুখে নেই। শ্বশুর রিটায়ার করার পর ছেলের হাততোলা হয়ে আছেন।

শ্রীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জিজ্ঞেস না করাই বোধ হয় ভাল। বরং মনে মনে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করাটাই এখন দরকার।

সরিৎ কথাটা বুঝল। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, এটা খুব ঠিক কথা। জানতে গেলেই মন খারাপ হবে। কেউই তো ভাল নেই।

তুমি কেমন সরিৎ?

সরিৎ না, ব্রাদার।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রাদার।

আমিও ভাল না জামাইবাবু। বড়দার কাছে ছিলাম। ভাল ছিলাম না। সেজদি ডেকে আনল, এলাম। দেখি এখানে কেমন থাকি।

খারাপ লাগছে না তো এখানে?

ভাল কি লাগার কথা! বেকারকে কাজ না দিয়ে যত ভালই রাখুন সে ভাল থাকে না।

শ্রীনাথ চিন্তিত মুখে বলে, সেটা তো সকলেরই প্রবলেম ব্রাদার।

আমারও। তাই বলি, কেমন আছি না জানতে চেয়ে বরং আমারও মঙ্গল প্রার্থনা করুন।

দূর পাগলা! তোমার তো বয়স কম, জীবনটাই পড়ে আছে।

একটা চাকরি দিন, তবেই জীবন থাকবে। নইলে কবে শুনবেন, ট্রেনের তলায় গলা দিয়েছি।

যাঃ!— বলে হাসে শ্রীনাথ।

মাইরি জামাইবাবু! বিশ্বাস করুন।

॥ চৌদ্দ ॥

চাবিটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না শ্রীনাথ। তৃষা তাকে গোপন করে ভাবন-ঘরের একটা চাবি করিয়ে রেখেছিল কেন তা বুঝতে অবশ্য তার কষ্ট হয় না। সোজা কথা শ্রীনাথের এই একটেরে ঘরখানার ভিতরেও তৃষার দখলদারি রয়ে গেল। অবারিত হল ঘরখানা। শ্রীনাথের কিছু লুকোনোর রইল না, তার অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তাও রইল না ঘরখানার।

মানুষ 'ঘর ঘর' করে গলা শুকোয়। শ্রীনাথেরও শুকোত এতদিন। আজকাল সে ঘরের অসাড়তা বুঝতে পারে। এই সব অবসেসন অভিভূতির কোনও মানে হয় না। একখানা ঘর আর কতখানিই বা আশ্রয় দেয় মানুষ্য, যদি না ঘরের লোক আপন হয়। মিস্ত্রি এসে যে ঘর তৈরি করে দিয়ে যায় তার কোনও ব্যক্তিত্ব নেই, বিকার নেই। সেই ঘরে যে সব মানুষজন বসবাস করতে আসে তারাই ইট-কাঠ-টিনের ওপর নানা মায়া ভালবাসার পলেস্তারা দেয়, স্মৃতির রং মাখায়, কত ঠাট্টা ইয়ারকি খুনসুটি, আদর ভালবাসা দিয়ে পূরণ করে তোলে ঘরের শূন্যতাকে। শ্রীনাথ তবে কেন ঘর ঘর করে মরবে? ঘর তো তৃষার।

সরিৎ চলে যাওয়ার পর খানিক বসে এই তত্ত্বকথা চিন্তা করল সে। তারপর উঠে খুব তীক্ষ্ণ

নজরে নিজের দেরাজ খুলে সব পরীক্ষা করল। বাক্স তোরঙ্গ উলটে পালটে দেখল। সবই ঠিক আছে। দেরাজের বা বাক্সের চাবিও হয়তো করিয়েছে তৃষা। কে জানে? তার চেক বই, পাশ বই, ইনসুয়েরেনসের পলিসি, শেয়ার সার্টিফিকেট, নগদ টাকা এসবই বোধ হয় খুঁটিয়ে দেখেছে।

মালদা থেকে সরিৎকে কেন আনিয়েছে তৃষা তাও খানিকটা আন্দাজ করতে পারে শ্রীনাথ। এ কথা তৃষা ভালই জানে যে জমিজিরেতের ওপর নির্ভর করে থাকার বিপদ আছে। মল্লিনাথের সব জমি আইনত তার নয়ও। ভুতুড়ে জমি মেলাই আছে। যে-কোনওদিন শত্রুরা খবর দিয়ে ধরিয়ে দেবে আর সরকার জমি কেড়ে নেবে। কানাঘুযোয় শ্রীনাথ শুনেছে, তৃষা বড় পাইকারি দোকান দেবে। চালকল খুলবারও ইচ্ছে আছে। হয়তো-বা সেই সব কাজের জন্য বিশ্বস্ত লোকের দরকার বলেই আনিয়েছে সরিৎকে।

সরিতের ইতিহাসটা খুব পরিষ্কার জানে না শ্রীনাথ। শেষবার যখন দেখেছিল তখন বোধ হয় সদ্য কলেজে ঢুকেছে। তখনও ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়নি। এক বছরে ছেলেটা মানুষ হয়েছে না অমানুষ তা এই অল্প সময়ে বোঝা গেল না। কিন্তু সে যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত সরিৎ তৃষারই লোক, শ্রীনাথের কেউ নয়।

শ্রীনাথের লোক পৃথিবীতে খুবই কম। নেই বললেই চলে।

গভর্নমেন্ট প্রেসে স্ট্রাইক চলছে বলে শ্রীনাথের প্রেসে এখন বিস্তর জব ওয়ার্ক এসে জমা হয়েছে। ডাঁই ডাঁই হরেক রকমের ফর্ম, বিল, বিজ্ঞপ্তি ছাপার কাজ চলছে। মালিক বলে দিয়েছে, কামাই করা চলবে না। কাজ তুলে দিতে পারলে সবাইকে একটা থোক টাকা দেওয়া হবে। মিনি বোনাস।

বোনাসের ওপর শ্রীনাথের কোনও টান নেই। তবে সে হল জব ওয়ার্কের বিশেষজ্ঞ। বহুকাল প্রেসে কাজ করায় সে হেন কাজ নেই যে জানে না। মল্লিনাথের সম্পত্তি হাতে আসায় কিছুকাল আগে সে নতুন ফেসের কিছু টাইপ তৈরি করার জন্য ভূতের মতো খাটছিল। বাংলা টাইপরাইটার সংস্কারের কাজেও বিস্তর মাথা ঘামাচ্ছিল। কাজ এগিয়েছিল অনেকটাই। লেগে থাকলে কিছু একটা হয়ে যেত হয়তো। কিন্তু, দেদার সম্পত্তি আর নগদ টাকা হাতে আসায় কেমন যেন গা ঢিলে দিয়ে দিল। তবু এখনও বোধ হয় প্রেসের কাজকে সে এক রকম ভালই বাসে। প্রেসটার ওপরেও তার গভীর মায়া। তাই এই কাজের চাপের ব্যস্ততা তার খারাপ লাগে না।

স্নান করে খেয়ে বেরোতে একটু দেরি হল তার। তা হোক। মালিকপক্ষ জানে, দেরি করে গেলেও শ্রীনাথ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। দরকার হলে সারা রাত খেটে কাজ তুলে দেবে। কাজের চাপে থাকলে শ্রীনাথ অন্য মানুষ। সেই কাজের জন্য সে বোনাস ইনক্রিমেন্ট বা প্রোমোশনও চাইবে না। ওসব কথা তার মনেই আসে না। শুধু মনটার মধ্যে একটা কথাই খচখচ করছে, সজলকে বিকেলে আসতে বলেছিল ঘরে। যদি দেরি হয় তবে সজল এসে ফিরে যাবে। কথার খেলাপ হবে তার। বাচ্চাদের কাছে কথার খেলাপ করা ঠিক নয়। ওতে ওরা শ্রদ্ধা হারায়, হতাশায় ভোগে।

অফিসে পৌঁছে এক গ্লাস জল খেয়ে, একটা পান মুখে দিয়ে কাজে ডুবে গেল শ্রীনাথ। চাবির কথা মনে রইল না, ঘরের কথা মনে রইল না, তৃষা বা সজলের কথাও বেমালুম গায়েব হয়ে গেল মন থেকে।

কিন্তু মনে পড়ল বিকেলের দিকে। মনে করিয়ে দিল সোমনাথ।

বোসবাবু এসে খবর দিলেন, আপনার ভাই এসেছে।

সন্ধে হয়-হয়। শ্রীনাথের ঘাড় টনটন করছিল। কপি ধরে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোধরানো কম কথা নয়। ভুল থাকলে প্রেসের রাক্ষুসে মেসিন এক লহমায় সেই ভুল কপি কয়েক হাজার ছেপে ফেলবে। ভুল ধরা পড়লে ছাপা কাগজ সব ফেলে দিতে হবে। এখন কাগজ কালি লেবারের খরচার যে বহর তাতে ক্ষতির পরিমাণটা বড় কম দাঁড়াবে না। তাই মালিক নিজে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাজ

দেখে গেছে। প্রিন্ট-অর্ডার দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেছে শ্রীনাথকে। তাতে শ্রীনাথের ঝামেলা বেড়েছে। মাথা তোলার সময় পায়নি।

ভাই কথাটা কানে শুনেই বুঝেছিল সোমনাথ। দীপনাথ কিছুতেই নয়। কারণ দীপ ভাই হলেও একটু দূরের ভাই।

প্রেসটা বিরাট বড় দরের হলেও রিসেপশন বা ওয়েটিং রুম বলে কিছু নেই। বাইরের দিকে সুপারিনটেনডেন্টের ফাঁকা অফিসে বসে আছে সোমনাথ। মুখটায় চোর-চোর ভাব, চোখের দৃষ্টিতে শেয়ালের মতো একটা এড়ানো-এড়ানো ভাব।

প্রকৃতির নিয়মে বাপের মেজো ছেলেরাই নাকি সবচেয়ে পাজি হয়। তাদের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। শ্রীনাথ নিজেই মেজো। সে কতটা পাজি তা হিসেব করে দেখেনি এখনও। কিন্তু পাজি বলতে সত্যিকারের যা বোঝায় তা হল সোমনাথ। মল্লিনাথের সম্পত্তির ভাগ চাইছে বলেই নয়, সোমনাথ বুড়ো বাবাকে নিজের কাছে রেখে অন্য দুই ভাইয়ের কাছ থেকে সেই বাবদ টাকা নেয়। ভয়ংকর কৃপণও বটে। সরকারের একটা বিল সেকশনে কাজ করে। ঠিকাদারদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা ঘুষ নেয়।

শ্রীনাথ বলল, কী রে?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

সোমনাথের কপালে এখনও সেই মারের দাগ রয়েছে। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল।

শ্রীনাথ দারোয়ানকে দু' ভাঁড় চা আনতে পাঠিয়ে বসে বলল, সব ভাল তো?

সোমনাথের চেহারাটা মন্দ নয়। মোটাসোটা, গোলগাল, গোপাল-গোপাল চেহারা। মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন ছোট ছেলেকে চূড়ান্ত আদর দিয়ে গেছে। সেই সুবাদেই এই চেহারা।

সোমনাথ বলল, বাবার অবস্থা তো জানোই! যে-কোনওদিন হয়ে যাবে।

জানা কথা। বাবার খবরের জন্য ব্যস্ত নয়ও শ্রীনাথ। এই সব নিষ্ঠুরতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আসে। বাবা যে কবে ফালতু হয়ে গেল তা টেরও পায়নি। কিন্তু হয়েছে।

শ্রীনাথ একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, সে তো জানি।

সোমনাথ মার খাওয়ার পর দু'-তিন বার ওকে দেখতে এসেছিল শ্রীনাথ। তখন বাবার সঙ্গেও দেখা হয়। কিন্তু দেখা হওয়া আর না হওয়া সমান। বাবা এখনও লোক চিনতে পারছেন বটে কিন্তু কারও জন্যই কোনও অনুভূতি নেই। সোমনাথ যে হাসপাতালে তা শুনেও নির্বিকার। বিকেলের জলখাবার নিয়ে শমিতার কাছে বায়না করছিল বলে শমিতা কটকট করে উঠল। বলল, আপনার ছেলে হাসপাতালে সিরিয়াস অবস্থায় পড়ে আছে, আর আপনি চিঁড়েসেদ্ধ চিঁড়েসেদ্ধ করে পাগল হচ্ছেন! এ রকমই ধারা নাকি আপনাদের?

কথাটা তা নয়। বাবা এখন সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ এই সব অনুভূতির বাইরে চলে গেছে। বোধ-বুদ্ধি ছোট হয়ে হয়ে এখন কেবল নিজের জৈবিক চাহিদাটুকু নিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এও হয়তো এক ধরনের পাগলামি। তবে যাই হোক, বাবাকে নিয়ে তাদের আর খুব বেশি ভাবনা-চিন্তা নেই। তৃষা কিছুকাল আগেই শ্রীনাথকে একবার বলেছিল, শ্বশুরমশাইকে এখানে এনে রাখলেই তো হয়। এখানে অনেক ফাঁকা ঘর, খোলামেলা জায়গা, দেখাশুনো করার লোকও আছে, তবে কেন উনি সোমনাথদের খুপরি বাসায় পড়ে থাকবেন?

যখনকার কথা তখনও সোমনাথ মার খায়নি। ফি-রবিবারে সস্ত্রীক ঝগড়া করতে আসত। প্রস্তাব শুনে কিন্তু সোমনাথ বা শমিতা কেউ রাজি হল না। বলল, না, উনি আমাদের কাছেই থাকতে চান। অন্য কোথাও যাওয়ার নাম করলেই রেগে ওঠেন।

কথাটা মিথ্যেও নয়। বুড়ো বয়সে অনেক সময়েই অভ্যস্ত জায়গা ছেড়ে লোকে অন্য কোথাও যেতে চায় না। যুক্তি হিসেবে ছেলেমানুষের মতো বলে, এ বাড়িতে পায়খানাটা কাছে হয়, এখানে

জলের সুবিধে, সোমনাথ রোজ মাছ আনে ইত্যাদি। তবু বাবাকে জোর করে আনাও যেত এবং তাতে ফল খারাপ হত না। কিন্তু সোমনাথ রাজি হল না অন্য কারণে। বাবার খরচা বাবদ তৃষা মাসে মাসে ওকে তিনশো টাকা করে পাঠাত এবং শ্রীনাথ যত দূর জানে, এখনও পাঠায়। কর্তব্যের ব্যাপারে তৃষার কোনও ত্রুটি নেই। আর কিছু সোমনাথ আদায় করে বিলু আর দীপনাথের কাছ থেকে। দীপ মাসে মাসে দেয় না, কিন্তু কখনও-সখনও থোক পাঁচ-সাতশো টাকাও দিয়ে ফেলে। সুতরাং বাবাকে নিজের কাছে রাখলে সোমনাথের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

সোমনাথ একটু চুপ করে থেকে বাবা সম্পর্কে ট্র্যাজেডি শ্রীনাথের মাথায় বসতে সময় দিল। তারপর বলল, আমি ছেলে হিসেবে কোনও ত্রুটি রাখি না, সব কর্তব্যই করি।

হুঁ।— শ্রীনাথ ওর মতলব বুঝতে না পেরে সাবধান হয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিল।

সোমনাথ দুঃখী-দুঃখী মুখ করে গম্ভীর গলায় বলল, শমিতার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

কী হয়েছে?

সোমনাথ অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে বলে, ছেলেপুলে হবে।

ও।

তাই বলছিলাম এ অবস্থায় বাবার যত্ন-আত্তি ঠিক মতো হবে না। বাবার অবশ্য অত বোধটোধ নেই, কিন্তু আমার তো বিবেক আছে। ডাক্তার শমিতাকে কাজকর্ম করতে একদম বারণ করেছে, বেশি নড়াচড়া করলে মিসক্যারেজ হয়ে যেতে পারে।

কোনও ডিফেক্ট আছে নাকি?

আছে।

তা হলে এখন কী করতে চাস?

যদি কিছু মনে না করো তো বলি, এখন বাবাকে কিছুদিন তোমাদের কাছে নিয়ে রাখো।

শ্রীনাথ টক করে প্রস্তাবটায় রাজি হতে পারে না। তৃষা এক সময় শ্বশুরকে তার কাছে রাখতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু এতদিনে যদি মত পালটে থাকে? বাড়ি তো শ্রীনাথের নয় যে নিজে সিদ্ধান্ত নেবে।

শ্রীনাথ বলল, তোর বউদিকে একটু বলে দেখ।

সোমনাথ একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, বউদিকে বলব কেন? বউদি কে? তুমি কর্তা, তুমিই ডিসিশন নেবে।

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, আমি কিসের কর্তা? কোনও ব্যাপারেই আজকাল আমি থাকি না।

সোমনাথ ওপরওয়ালার মতো চড়া গলায় বলল, থাকো না কেন? থাকো না বলেই তো মেয়েমানুষের বাড় বাড়ে।

বিরক্ত হয়ে শ্রীনাথ বলে, ওসব কথা থাক। আমি না হয় তোর বউদিকে আজ জিজ্ঞেস করব'খন, কাল এসে জেনে যাস।

কী জেনে যাব? জানাজানির মধ্যে আমি নেই। বাবা তো তোমারও। তোমরা এক সময়ে বাবাকে রাখতেও চেয়েছিলে। তা হলে এখন আবার পিছোচ্ছ কেন?

শ্রীনাথ একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইল। এটা যে পিছানো নয় তা সোমনাথও কি জানে না? ও এখন একটা চাল খেলছে, সেটা যে কী তা অবশ্য শ্রীনাথ বুঝতে পারছে না।

সোমনাথ বলল, তা ছাড়া অত মতামতেরই বা দরকার কী বুঝি না, বাবা! বড়দা তো বাবারই ছেলে। তার বাড়িতে বাবা তো নিজের রাইট নিয়েই থাকতে পারে।

ছেলের সম্পত্তির ওপর বাবার অধিকার আছে, এমন কথা কোন আইনের বইতে আছে তা একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল শ্রীনাথের। কিন্তু তাতে কথা বাড়বে বলে বলল না।

শ্রীনাথ মৃদু স্বরে বলল, আমি তো অমত করছি না। তবে আমার মতামতের দামও নেই।

একশো বার দাম আছে।— সোমনাথ গলার জোরে কথাটাকে যত দূর সম্ভব গেঁথে দিতে চেষ্টা করল শ্রীনাথের মাথায়। তারপর মোলায়েম আদুরে গলায় বলল, তুমি মেজদা, দিনকে দিন কেমন হয়ে যাচ্ছ বলো তো! তোমার টাকাপয়সা বা বিষয়-সম্পত্তির লোভ নেই সেটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তা বলে সংসারের সব কর্তৃত্ব বউদির হাতে ছেড়ে দেবে?

শ্রীনাথ যে নির্লোভ সেটা যে সোমনাথ জানে তা শুনে খুশিই হয় শ্রীনাথ। বলে, আমি যেমন আছি তেমনিই থাকতে দে। গণ্ডগোলে জড়াস না।

সন্নিসি তো নও। সংসারে থাকলে গা বাঁচিয়ে চলবে কী করে? তা ছাড়া চোখের সামনে এত বড় সব অন্যায় ঘটে যাচ্ছে দেখেও যদি চুপ করে থাকো তবে তোমার ভালমানুষির কোনও দাম থাকে না।

ভালমানুষির দামই বা চাইছে কে! কথাটা বলতে পারত শ্রীনাথ, বলল না। শুধু আনমনে একবার হুঁ দিল।

সোমনাথ বলল, বউদি যে তোমাকে বাড়ির চাকর-বাকর মনে করে সেটা আমাদেরও খারাপ লাগে। তুমি যদি একটু রোখাচোখা হতে তবে এমনটা হতে পারত না।

শ্রীনাথের একটু রাগ হচ্ছিল। কিন্তু সোমনাথকে রাগ দেখিয়ে লাভ নেই। কোনওকালেই ও কারও পরোয়া করে না। শ্রীনাথ তাই চুপ করে থাকে।

সোমনাথ নিজেই বলে, তুমি চুপ করে থাকলেও আমি ছেড়ে দেব বলে ভেবো না। তোমাদের ওখানকার লোকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তারা কেউ বউদির পক্ষে নয়। তারা নিজেরাই বলছে বড়দার সম্পত্তিতে বউদিব কোনও রাইট নেই। দরকার হলে তারা ওখানকার মাতব্বরদের সালিশি মানবে। বউদির রাজত্ব অত নিষ্কণ্টক হবে ভেবো না।

এটা যে অপমান তা শ্রীনাথ বুঝতে পারছে। তৃষার সঙ্গে তার বনিবনা থাক বা না থাক এই কথাগুলো তৃষাকে জড়িয়ে তাকেও বলা। তবু জবাব দেওয়ার মতো জোর পায় না শ্রীনাথ। সে নিজেও বোঝে, দাদার সম্পত্তি নিয়ে একটা অন্যায় দখলদারি চলছে।

শ্রীনাথ বলল, এসব আমাকে বলছিস কেন? আমি তোদের কী করেছি? যা করবি করিস, আমার কিছু বলার নেই।

সোমনাথ একটু নরম হয়ে বলে, তোমাকে কষ্ট দিতে চাইও না। দুঃখ হয় বলে বলি।

ওখানকার কে কে তোর কাছে এসেছিল?

অনেকেই আসে। বহু গুপ্ত খবর দিয়ে যায়। বউদি নাকি তার গুন্ডা ক্লাসের সেই ভাইটিকে মালদা থেকে আনিয়েছে।

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, সরিৎ! সরিৎ গুন্ডা নাকি?

সোমনাথ একটু হেসে বলে, তুমি তো মানুষ চেনো না। নিতাই খ্যাপাকে মেরে তোমার শালা পাট পাট করে দিয়েছিল। বউদি ঘটনাটা চেপে দিয়েছে। এতকাল ভাড়াটে গুন্ডা ছিল, এখন নিজের ভাইকে দিয়েই গুন্ডামি চালাবে।

নিতাইকে সরিৎ মেরেছে, এ কথা কেউ তো আমাকে বলেনি!

তুমি কোন খবরটাই বা রাখো! বউদি যে বন্দুকের লাইসেন্স চেয়ে অ্যাপলিকেশন করেছে তা জানো?

না তো।

বড়দার একটা জার্মান বন্দুক ছিল তা মনে আছে?

আছে। আমি নিজেও কয়েকবার শিকার করতে গিয়ে চালিয়েছি। তারপর সেটা থানায় জমা করে দিই।

বউদি সেইটেই ফেরত চেয়েছে। তবে লাইসেন্স হবে সরিতের নামে।

শ্রীনাথের কাছে এগুলো খুব একটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার নয়। সে বলল, ও, তা হবে।

ছেলেপুলের ঘর বলে মারাত্মক অস্ত্রটা শ্রীনাথ ঘরে রাখতে চায়নি। নইলে সে দরখাস্ত করলে বন্দুকটার দখল পেয়ে যেত। কিন্তু দখল করার ইচ্ছেই তার ছিল না। তাই থানায় জমা করে দিয়েছিল। তৃষা বন্দুকটা ফেরত চেয়েছে, ভাল কথা, কিন্তু সেটা একবার তাকে জানালেও পারত।

সোমনাথ বলল, সরিৎ হল বউদির রঙ্গরাজ।

শ্রীনাথ বুঝল না। বলল, কে রঙ্গরাজ?

দেবী চৌধুরানির বড় সাকরেদ, মনে নেই? আর বউদি নিজে হতে চাইছে দেবী চৌধুরানি।

শ্রীনাথের গম্ভীর থাকা উচিত ছিল। কিন্তু উপমাটা এমন অদ্ভুত যে, অনিচ্ছেসত্ত্বেও ক্ষীণ একটু হেসে ফেলল।

সোমনাথ আঁশটে মুখে বলে, হেসো না মেজদা। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস।

শ্রীনাথ এবার গম্ভীর হয়ে বলল, তা আমি কী করব বল?

কিছুই যদি না করো তবে অন্তত দেখে যাও। চতুর্দিকে লক্ষ রেখে চলো।

চাবির কথাটা আবার মনে পড়ে গেল শ্রীনাথের। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। বলল, লক্ষ রেখেই বা লাভ কী? আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।

সোমনাথ অধৈর্যের গলায় বলল, বাবার ব্যাপারটা কী হবে?

বললাম তো।

শোনো, মেজদা!— সোমনাথ খুব জোরালো গলায় বলে, বউদির মত থাক বা না থাক আমি সামনের রবিবার বাবাকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসছি। তারপর আর আমার দায়িত্ব থাকবে না।

দারোয়ান চা দিয়ে গেল। শ্রীনাথ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, তাতে হয়তো আপত্তি উঠবে না। কিন্তু আমি বাবার কথাটাই ভাবছি।

কী ভাবছ?

বাবার খুব কষ্ট হবে হয়তো।

বাবার কষ্টের কথা যদি সত্যিই ভাবো তবে কষ্ট দিয়ো না।

মুখের মতো জবাব পেয়ে শ্রীনাথ চুপ করে গেল। চা খেয়ে উঠল সোমনাথ। বলল, তা হলে ওই কথাটাই ফাইনাল।

শ্রীনাথ ঊর্ধ্বমুখে ভাইয়ের মুখখানা দেখল। বাবাকে ও কেন রতনপুরে চালান করছে তার সত্যি কারণটা বুঝতে চেষ্টা করল। সম্ভবত সোমনাথ বাবাকে ওখানে পাঠিয়ে ক্ষীণ একটা অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। নইলে মাসে তিনশো টাকার ফালতু আয় জলাঞ্জলি দিত না।

সোমনাথ চলে যাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ কাজ করল শ্রীনাথ। যখন উঠল তখন সন্ধে সাতটা।

খারাপ পাড়ায় যেতে হলে প্রথম-প্রথম একটু বুকের জোর চাই। একা যেতে সাহসও হয় না। কিন্তু আশ্চর্য আশেপাশে বন্ধুবেশী আড়কাঠিরা ইচ্ছেটাকে ঠিক টের পেয়ে যায় এবং তারাই পৌঁছে দেয় মেয়েমানুষের ঘরে। শ্রীনাথেরও তাই হয়েছিল। যখন ফেবারিট কেবিনে আড্ডা মারত তখন কানাই বোস নামে একজন ঠিকাদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। সে খারাপ পাড়ায় যেত এবং সেইসব গল্পও করত খুলে মেলে। শ্রীনাথকে খারাপ পাড়ায় নিয়ে গিয়েছিল সে-ই। তারপর থেকে অবশ্য আর বাধা হয়নি। যেতে যেতেই শ্রীনাথের অভিজ্ঞতা হয়েছে, কলকাতা শহরে নাম লেখানো এবং না-লেখানো খারাপ মেয়ে অঢেল। আজকাল তার চোখ পাকা হয়েছে। রাস্তায় ঘাটে যে-কোনও মেয়েকে একনজর দেখলেই বুঝতে পারে, খারাপ না ভাল। তা ছাড়া যাতায়াতে বহু দালালের সঙ্গে চেনা হয়েছে। তারাও খোঁজ দেয়। বাবুল দস্তিদার নামে একজন বন্ধু গোছের দালাল ক'দিন আগে

বলেছিল, শ্রীনাথবাবু, আপনি লো ক্লাসের মেয়েদের কাছে যান কেন? ওরা তো পান্তা ভাত। কোনও মজা নেই। যাদের রেস্ত আছে তারা নানারকম এনজয়মেন্ট করবে। শরীরের ব্যাপারটারও তো অনেক রকম স্টাইল আছে।

বাবুল তাকে হাওড়া ময়দানের কাছে নমিতার খোঁজ দেয়। দেখে খারাপ মেয়ে মনে করা বেশ কঠিন। একদম আধুনিকা। ফটাফট ইংরেজি বলে, দারুণ সাজে, গিটার বাজায়, বি এ পাশ। রবি ঠাকুর থেকে বিষ্ণু দে পর্যন্ত কোটেশন দেয়।

খরচ অনেক বেশি বটে, কিন্তু নমিতা কেবলমাত্র শরীরী তো নয়। সে শ্রীনাথের সঙ্গে বেড়ায়, রেস্টুরেন্টে খায়, সিনেমা-থিয়েটারও দেখে। সারাক্ষণ বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলে। বেশির ভাগ কথাই প্রেম-ভালবাসা ঘেঁষা। এমন সব কথা যা শ্রীনাথের বয়ঃসন্ধির যৌবনকে ফিরিয়ে আনে। নমিতার চোখের চাউনি, ঠোঁটের হাসি সব কিছুই অত্যন্ত উষ্ণ, নিবিড় এবং অনেকটাই যেন আন্তরিক। বিভ্রমই বটে, তবে বিভ্রমই তো মানুষ চায়।

শ্রীনাথ তাই সম্প্রতি নমিতার খাতায় নাম লিখিয়েছে। জমানো টাকা হু-হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তা যাক। জীবনে টাকা দিয়ে তো কিছু পাওয়া চাই। শ্রীনাথ মনে করে নমিতার কাছে সে কিছু পাচ্ছে। কৃত্রিম হলেও পাচ্ছে।

নমিতার খদ্দেরের সংখ্যা বেশি নয়। দিন ও সময় বাঁধা থাকে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া যাওয়া যায় না। এইটেই একমাত্র যা অসুবিধে।

আজ শ্রীনাথের দিন নয়। তবু মনটা ভাল ছিল না বলে হাওড়ায় এসে গাড়ি ধরতে গিয়ে ধরল না। বেরিয়ে বাসে উঠে ময়দানের কাছে নমিতার দোতলার ফ্ল্যাটে এসে উঠল।

আশ্চর্য। নমিতা একা ফাঁকা ঘরে সেজেগুজে বসে আছে। তাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে বলল, আজ একটা ছোটলোকের আসার কথা ছিল। দেখো তো, সারা বিকেলটা বসে বসে নষ্ট করলাম। তুমি এলে, কী ভাগ্যি!

খুশি হয়েছ?

সকলের বেলায় হই না। তুমি তো সকলের মতো নও!

নই?

নমিতা হেসে ফেলে বলে, বললে ভাববে তেল দিচ্ছি। তা কিন্তু নয়।

সোফায় বসে শ্রীনাথ হাসিমুখে বলল, আমি কীরকম তা আজ তোমার মুখে শুনব। বলো তো।

যাঃ।— লজ্জায় যেন লাল হল নমিতা। মুখ দু'হাতে ঢেকে বলল, এভাবে বলা যায় নাকি? বোঝো না কেন?

নমিতার দোভাঁজ করা বিনুনির সঙ্গে অনেকগুলো আলগা ফিতে বাঁধা। তাতে ভারী ছুকরি দেখাচ্ছে ওকে। কানে মস্ত রুপোর কানপাশা। হাতে রুপোর চুড়ি। একটু অবাঙালি সাজে আজ ওর আকর্ষণ তিনগুণ বেড়েছে।

মায়া ও মতিভ্রমের দিকে অভ্যাসবশে হাত বাড়াল শ্রীনাথ।

কিন্তু তারপর শরীরে সেই খিতখিত ভাব। যেন অপবিত্রতা, অশৌচ। বাড়িতে ফিরে কেরোসিন স্টোভ জ্বেলে গরম জল বসিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। স্নান করবে।

এমন সময় দরজার বাইরে সজল এসে দাঁড়ায়।

বাবা!

এসো।

শ্রীনাথ নরম স্বরে ডাকে। মনে মনে ভাবে সজলের সঙ্গে এই দেখা হওয়ার আগে স্নানটা সেরে নেওয়া উচিত ছিল। স্নান না করে যেন এই অবস্থায় ছেলের সঙ্গে কথা বলতে নেই। কোথায় যেন আটকায়।

সজল একটু যেন সংকোচের সঙ্গে ঘরে আসে। মুখে একটু লজ্জার হাসি।

সজল দেখতে ভারী মিষ্টি। মুখখানা যেন নরুন দিয়ে চেঁচে তৈরি। শরীরের হাড়গুলো চওড়া। লম্বাটে গড়ন। বড় হলে ও খুব লম্বা চওড়া আর শক্তিমান পুরুষ হয়ে দাঁড়াবে।

সজল ঘরে ঢুকে কৌতূহলভরে ঘুরে ঘুরে এটা ওটা দেখতে থাকে। হঠাৎ বলে, জল গরম করছ কেন বাবা? চা খাবে? ছোড়দিকে বলো না, করে দেবে।

না, চা খাব না।

তবে?

চান করব।

এত রাতে!— সজল অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকায়।

কী বড় বড় অন্তর্ভেদী চোখ। কিছুতেই শ্রীনাথ ওর চোখে চোখ রাখতে পারল না। মাথা নিচু করে বলল, পায়ে নোংরা লেগেছিল।

বুকটা ঢিব ঢিব করে ওঠে শ্রীনাথের। হে ভগবান! আর যাই হোক ছেলের কাছে যেন কোনওদিন মুখ কালো না হয়।

সজল বলে, তোমার শীত করবে না?

শীত করবে বলেই তো গরম জল করছি।

বাড়িতে বলে পাঠালেই তো মা গরম জল করে দিত।

লোককে কষ্ট দিয়ে কী লাভ! এটুকু নিজেই পারা যায়।

তোমার ক্ষুরটা ধরেছিলাম বলে রাগ করেছ, বাবা?

একটু করেছিলাম। এখন আর রাগ নেই। টেবিলের ডান ধারের দেরাজে আছে। বের করে নাও। ওটা তোমাকে দিলাম।

দিলে?— উজ্জ্বল হয়ে সজল জিজ্ঞেস করে।

হুঁ। কিন্তু খুব সাবধান। অসম্ভব ধার। হাত-টাত কেটে ফেলো না।

না, আমি দাড়িই কাটব।

দাড়ি!— অবাক হয়ে শ্রীনাথ তাকায়।

হি হি। নিতাইদা যখন ঘুমোবে তখন চুপি চুপি গিয়ে ওর দাড়ি কামিয়ে দিয়ে আসব।

সর্বনাশ।— শ্রীনাথ প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ে, খবরদার ওসব করতে যেয়ো না। কখন গলায় বসিয়ে দেবে অসাবধানে। তা হলে কিন্তু ফাঁসি।

আচ্ছা। তাহলে রেখে দেব। বড় হলে নিজের দাড়ি কামাব।

ক্ষুরটা ওকে দেওয়া ভুল হল কি? হয়তো। কিন্তু এখন দেওয়া জিনিস ফেরত নেওয়া ঠিক হবে না।

শ্রীনাথ বলে, তুমি মাকে জিজ্ঞেস করে এখানে এসেছ তো!

হ্যাঁ।— ঘাড় নাড়ে সজল। বলে, মা বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

তোমার মা!— বলে আবার সচকিত হয়ে খাড়া হয় শ্রীনাথ।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার আড়াল থেকে কালো শাড়ি পরা তৃষা দরজার আলোয় দেখা দেয়।

অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তার স্ত্রী এই ঘরে আসতেই পারে। তবু ভীষণ যেন চমকে যায় শ্রীনাথ। যেন তার লুকোনো কোনও ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে। প্রকাশ পেয়েছে তার ভীষণ কোনও গোপনীয়তা।

শ্রীনাথ বলল, তুমি!

তৃষা গম্ভীর মুখে বলে, অবাক হওয়ার কী হল? আমি তো ভূত নই। মানুষ।

॥ পনেরো ॥

শ্রীনাথ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এসো। কিছু বলবে?

তৃষা খুব তীক্ষ্ণ চোখে সজলের দিকে চেয়ে ছিল। চৌকাঠের ওপাশ থেকেই বলল, ক্ষুরটা কি তুমি সজলকে দিয়ে দিলে?

হুঁ।

কেন দিলে?

ওর ওটার ওপর খুব লোভ। প্রায়ই চুরি করে আমার ঘরে ঢুকে ক্ষুরটা নিয়ে দুষ্টুমি করে বেড়ায়।

তাই দেবে? বাচ্চা ছেলের হাতে ধারালো জিনিস থাকলে কত কী বিপদ হতে পারে।

শ্রীনাথের যে কথাটা মনে হয়নি তা নয়। কোথায় যেন একটু অপরাধবোধ জেগে ওঠে তার। বলে, ওকে বলেছি রেখে দিতে।

তৃষা কঠিন গলায় বলল, সজল কি খুব বাধ্য ছেলে? ওকে তুমি চেনো না?

শ্রীনাথ বিরক্ত হয়ে বলে, অত ভেবে দেখিনি। না দিলেও তো নিজে থেকেই নেবে।

তাই ওই সর্বনেশে জিনিস হাতে তুলে দিতে হবে? ওইটে দিয়েই মুরগি কেটেছিল!

সজল টেবিলের ধারটায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা বাবা দু'জনকেই সে সাংঘাতিক ভয় পায়। ক্ষুরটা নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে মুঠোয় ধরে রেখেছে। চোখ দরজার দিকে।

শ্রীনাথ কঠিন স্বরে বলে, তার আগে আমার জানা দরকার মুরগি কাটার জন্য ক্ষুরটা ও পেয়েছিল কী করে! আমার ঘরে ঢুকল কী করে?

তৃষা শ্রীনাথের দিকে স্থির তীব্র চোখে চেয়ে বলে, সেটা ওকেই জিজ্ঞেস কোরো। আমার সেটা জানার কথা নয়।

শ্রীনাথ এ নিয়ে কথা বাড়াতে চায় না। চাবির কথা উঠলে সজলের নাম ফাঁস হয়ে যাবে। তাই সে তৃষার চোখের দিকে না তাকিয়ে বলল, আমার দেওয়ার ভাগ দিয়েছি। তোমার ভয় করলে ওর কাছ থেকে নিয়ে নাও।

তৃষার গলায় বেশির ভাগ সময়ে উষ্মা থাকে না, কাঠিন্য থাকে। ঠান্ডা নিরুত্তাপ একরকম রক্ত জল করা গলায় বলল, ও খুব স্বাভাবিক নয়। ক্ষুর, ছুরি বা ওরকম কিছু পেলে ও যা-খুশি করতে পারে। নিজের গলাতেও বসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। এটা তোমার না জানার কথা নয়। নিজেও দেখছ।

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, আমি জানব কী করে? আমাকে কেউ এ রকম কিছু বলেনি তো!

নিজের ছেলে সম্পর্কে আর-একটু খোঁজ-খবর রাখাটা বোধ হয় ছেলের ভালর জন্যই দরকার।

বলে তৃষা সজলের দিকে তাকাল। খুবই শান্ত গলায় বলল, ক্ষুরটা তোমার বাবাকে ফেরত দাও।

সজল টেবিলের ওপর ক্ষুরটা রেখে দেয়। আস্তে করে বলে, বাবা বলছিল আমি যেন বড় হয়ে ওটা দিয়ে দাড়ি কামাই।

তৃষা তেমনি শান্ত স্বরে বলে, দাড়ি যখন হবে তখন ক্ষুরেরও অভাব হবে না।

এর মধ্যে শ্রীনাথের কিছু বলা সাজে না। সে তাই অপমানিত বোধ করেও চুপ করে থাকে।

তৃষা চৌকাঠ ডিঙোল না। দরজার কোণে বাঁকা হয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু বলতে আসিনি। সজলকে বিকেলে আসতে বলেছিলে, ও অনেকবার তোমার খোঁজ করে ফিরে গেছে। রাতে আবার এল। অন্ধকার উঠোন পেরোতে ভয় পায় বলে সঙ্গে এসেছি। দেরি দেখে সজল ভাবছিল।

শ্রীনাথ বলল, অফিসে কাজ ছিল। বিকেলে ফিরতে পারিনি।

সে তো থাকতেই পারে।— তৃষা স্টোভে বসানো জলটার দিকে চেয়ে বলল, তোমার জল ফুটে গেছে।

ডেকচির ঢাকনা ঠেলে ফুটন্ত জল পড়ে স্টোভের আগুন লাফাচ্ছে। শ্রীনাথ উঠবার আগেই অবশ্য তৃষা গিয়ে আঁচল দিয়ে ডেকচিটা নামিয়ে স্টোভটা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে বলল, আজকাল রোজ রাতে স্নান করছ! কী ব্যাপার?

শ্রীনাথ বাধো-বাধো গলায় বলে, কলকাতায় যা ধুলো ময়লা...তার ওপর প্রেসের কালিঝুলি...শরীরটা কেমন খিত খিত করে।

আগে তো এই অভ্যাস ছিল না!

এখন হচ্ছে।

তৃষা আর এ নিয়ে ঘাঁটাল না। বলল, প্রীতমবাবুর অসুখের খবর পেয়েছিলাম। তাকে একবার দেখতে গিয়েছিলে?

শ্রীনাথ একটু লজ্জা পায়। বলে, না। সময় হয়নি।

কী হয়েছে তাও তো জানা দরকার ছিল। তুমি যাবে বলে আমি বিলুর চিঠির জবাব পর্যন্ত দিইনি। এটা ভীষণ অভদ্রতা হল। ওরা কী মনে করছে!

শ্রীনাথ শ্বাস ফেলে বলল, জেনে আর হবেটা কী? ওসব না জানাই ভাল।

তৃষার গলা একটু তীক্ষ্ণ হল, কেন?

আমরা ওদের জন্য আর কী করতে পারি?

করতে না পারলেই বা, বিপদের দিনে গিয়ে একটু সামনে দাঁড়ালেও মানুষ জোর পায়। তোমারই বোন-ভগ্নিপতি, তাই বলেছিলাম।

শ্রীনাথ উদাস গলায় বলল, কেউ কারও না। আমার আর ওসব সেন্টিমেন্ট নেই।

না থাকলে তো মুক্ত পুরুষ। তবে তুমি যাবে না জানলে আমি বিলুর চিঠির জবাব দিতাম। চাই কি একবার নিজেই যাওয়ার চেষ্টা করতাম।

শ্রীনাথ আজকাল সংসারের কোনও দায়দায়িত্বের কথা শুনলেই রেগে যায়। যখন চাকরির টাকায় সংসার টানত তখন অভ্যাস ছিল। এখন দায়দায়িত্ব না নিয়ে নিয়ে তার ভেতরটা অলস হয়ে গেছে। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবতে তার গায়ে জ্বর আসে।

শ্রীনাথ বলল, তুমি গেলেই তো ভাল হয়।

তাই যেতে হবে দেখছি।

সজল মা-বাবার কথা শুনছিল না। খুব সাবধানে হাত বাড়িয়ে ক্ষুরটা ছুঁয়ে দেখছিল। কী দারুণ ধার!

শ্রীনাথ কথাটা কী ভাবে তুলবে বুঝতে পারছিল না। একটু দোনোমোনো করে বলল, আজ বুলু অফিসে এসেছিল।

তৃষা অবাক হল না। শান্ত স্বরে বলল, তাই নাকি?

শমিতার বুঝি বাচ্চা হবে।

ও। ছোটবাবু কি সেই খবর দিতেই এসেছিল? না কি অন্য মতলব আছে?

মতলবের কথা বলতে পারব না। তবে বলছিল সামনের রবিবার বাবাকে এখানে দিয়ে যাবে। বাবার ওখানে খুব অসুবিধে হচ্ছে।

তৃষা মৃদু একটু হেসে বলে, তা তুমিও কী বললে?

আমি মতামত দিইনি।

ওমা! কেন?

আমি তো মতামত দেওয়ার মালিক নই। তোমার সঙ্গে কথা বলে জানাব বলেছি।

এতে আমার সঙ্গে পরামর্শ করার কী আছে? ছোটবাবু যদি শ্বশুরমশাইকে না রাখতে চায় রাখবে না। আমাদের এখানে অনেক ঘর আছে। উনি স্বচ্ছন্দে এসে থাকতে পারেন। এর আগেও তো আমি

বলেছি, শ্বশুরমশাইকে দিয়ে যেতে। ছোটবাবু রাজি হয়নি।

শ্রীনাথ এ কথা শুনে খুশি হল না, অখুশিও হল না। তবে একটু অবাক হল। তৃষা এখনও সম্পর্ক অস্বীকার করছে না, এখনও উদারভাবে দায়দায়িত্ব নিতে চাইছে। অথচ এক সময়ে শ্বশুর-শাশুড়ির দায়দায়িত্ব নিয়ে গরিব অবস্থায় অনেক মন কষাকষি হয়েছে তাদের। তৃষা কেন এত উদার হয়ে যাচ্ছে সেটা বোঝা মুশকিল।

শ্রীনাথ বলল, ঠিক আছে। বুলুকে তাই বলে দেব।

বোলো। না বললেও ছোটবাবু দিয়ে যাবে ঠিকই। বাবা এখানে থাকলে ওরও যাতায়াতের একটু উপলক্ষ হয়।

তৃষার বুদ্ধি দেখে একটু তাক লাগে শ্রীনাথের। তৃষার বুদ্ধি বরাবরই প্রখর ছিল। এখন মানুষ চরিয়ে সেটা আরও সাংঘাতিক ধারালো হয়েছে।

শ্রীনাথ মাথা নিচু করে বসে নিজের হাতের দিকে চেয়ে রইল। কিছু বলার নেই।

তৃষা বলে, তোমার জল ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। স্নান করলে করে নাও।

হুঁ।— বলে শ্রীনাথ ওঠে।

সজলকে আর কিছু বলবে?

না। ক্ষুরটা দেওয়ার জন্যই ডেকেছিলাম।

ক্ষুরটা ও নেবে না। ওটা সাবধানে রেখে দাও যাতে কেউ নাগাল না পায়। আর কখনও আমাকে জিজ্ঞেস না করে ওকে কিছু দিয়ো না।

শ্রীনাথ একটু বিষ-হাসি হেসে বলেই ফেলল, ক্ষুরের চেয়ে বন্দুক অনেক বিপজ্জনক। তুমি বন্দুকটাও সাবধানে রেখো।

বন্দুকের কথা যে তৃষা শ্রীনাথকে বলেনি সেইটে মনে করেই শ্রীনাথ চিমটিটুকু কাটল।

তৃষা অবশ্য চোখের পাতাও ফেলল না। মুখের ভাবেরও কোনও বদল হল না তার।

শান্ত স্বরে তৃষা বলল, তুমি কোনও ব্যাপারেই মাথা ঘামাও না বলে বন্দুকের কথাটা তোমাকে বলিনি। আজকাল অনেক সময়ে নগদ টাকা বা সোনাদানা ঘরেই রাখতে হয়। চারদিকে যে ভীষণ ডাকাতি হচ্ছে সেই কথাটা ভেবেই বন্দুকটা ফেরত চেয়েছি। বন্দুক থাকবে আমার স্টিলের আলমারিতে। কোনও ভয় নেই।

আমাকে বলোনি বলে কিছু মনে করিনি। তবে কথাটা বুলুর মুখ থেকে শুনে জানতে হল বলে খারাপ লাগে। বাইরের লোকেও যা জানে তা ঘরের লোক হয়েও আমি জানি না।

তৃষা সজলের দিকে চেয়ে বলল, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। রাত হয়েছে।

মা-বাবার কথা চালাচালি হাঁ করে শুনছিল সজল। তৃষা বলার পর বাধ্য ছেলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বারান্দায় মেঝের ওপর তৃষা তার মস্ত ফ্ল্যাশলাইট উপুড় করে রেখে এসেছিল। বাতি জ্বালিয়ে সজলকে পথটা দেখিয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসে তৃষা। আগের ভঙ্গিমাতেই দরজায় ঠেস দিয়ে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, ছেলের সামনে ওসব কথা না তুললেই ভাল।

আমি তুলতে চাই না। কথা আপনি ওঠে।

বন্দুকের কথা তোমাকে ছোটবাবু বলেছে?

হ্যাঁ।

অনেক খবর রাখে তা হলে?

নিজের স্বার্থেই রাখে। বোধ হয় এখানকার লোকজনকে নিয়ে একটা ঘোঁটও পাকাচ্ছে।

সেটা জানি। এখানকার অনেক লোকও মুখিয়ে আছে আমাকে জব্দ করার জন্য।

শ্রীনাথ অধৈর্যের গলায় বলে, সেটা নতুন কথা নয়। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করে, এখনও লোকে আমাদের শত্রু ভাববে কেন?

সবাই ভাবে না।

কিছু লোকেই বা ভাববে কেন?

শ্রীনাথ সামান্য উঁচুতে তোলে গলা। বরাবর সে অসম্ভব শান্তিপ্রিয় ফুর্তিবাজ মানুষ। কোনও ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করে না। কোনও বিরুদ্ধতা দেখলেই সে গুটিয়ে যায়।

তৃষা বলল, তাতে তোমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তারা আমাকেই শত্রু ভাবে। তোমাকে নয়।

শ্রীনাথ শ্লেষের হাসি হেসে বলল, যাক এতদিনে তবু স্বীকার করলে যে তুমি আর আমি দুটো সম্পর্কহীন আলাদা লোক।

তৃষা ভ্রু কুঁচকে বলে, কথাটার মানে কি তাই দাঁড়াল?

তাই দাঁড়ায়।

আমি তো ওরকম ভেবে বলিনি।

শ্রীনাথ ইজিচেয়ারে বসে পড়ে আবার। মাথার পাতলা চুলে উত্তেজিত আঙুল চালাতে চালাতে বলে, কী ভেবে বলেছ তা তুমি জানো আমিও জানি।

তৃষা শান্ত গলায় এতটুকুও উত্তেজিত না হয়ে বলে, তুমি বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে থাকো না। সে হয়তো তোমার অভিমান। সম্পত্তি যেহেতু আমার নামে। তুমি দেখো না বলেই আমাকে দেখতে হয়। লোকেও লক্ষ করছে বিষয়-সম্পত্তি আমিই দেখি। আমিই সংসার চালাই। লোকে সেটা সহ্য করতে পাবে না। একজন মেয়েমানুষকে ক্ষমতায় দেখতে পুরুষরা পছন্দ করে না। তার ওপর এখানকার বেশির ভাগ পুরুষই অপদার্থ, কুচুটে, পরশ্রীকাতর। তাদের তেমন কোনও কাজ না থাকায় ওইসব করে বেড়ায়। তবে তোমার সম্পর্কে তাদের কোনও রাগ নেই।

শ্রীনাথ অধৈর্যের গলাতেই বলে, সেটাই বা তুমি কী করে জানলে?

তৃষা একটু ফিচেল হাসি হেসে বলে, লোকে বলে আমি নাকি তোমার মতো ভাল লোককে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছি। তুমি নাকি খুবই ন্যায়বান, যুক্তিবাদী, সৎলোক। এমনকী তুমি আমাকে ছেড়ে নাকি অন্য জায়গাতে চলে যাওয়ারও চেষ্টা করছ। এ রকম খারাপ একজন মহিলার সঙ্গে বাস করতে তোমার নাকি ভীষণ ঘেন্না হয়। এ সব শুনেই বুঝি, লোকের রাগ তোমার ওপর নয়।

তৃষা ইদানীং একসঙ্গে এত কথা বলেনি শ্রীনাথের সঙ্গে। তৃষা আজকাল তর্ক করে না, আলোচনা করে না, কথার পিঠে পিঠে খানিকক্ষণ জবাব দিয়ে এক সময়ে চুপ করে যায়। আজ তৃষার এত কথা এবং কথার মধ্যে চাপা একটা হতাশার ভাব লক্ষ করে অবাক মানে শ্রীনাথ।

সে বলল, এখানকার লোক কী বলে তা আমার কানে বেশি আসে না। তবে এটা বুঝি যে, এতদিনেও আমরা এ জায়গার লোক হয়ে উঠতে পারিনি।

তৃষা একটা শ্বাস ফেলে বলে, এক জায়গায় বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বসলেই সেই জায়গা আপন হয় না। পুরুষানুক্রমে থাকলে আত্মীয়তা জ্ঞাতিগুষ্টি বাড়লে তবে হয়।

তবু চেষ্টা করা উচিত ছিল।

কথাটা কি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছ?

তবে আর কাকে?

আমাকে দায়ী করছ কেন? এ জায়গার আপন হতে তুমিও তো চেষ্টা করছ না। কেবল একটা পালাই-পালাই ভাব।

শ্রীনাথ সাবধান হয়। বদ্রীকে দিয়ে সে যে জমি কেনার চেষ্টা করছে অন্য জায়গায় সেটাও কি তৃষা জানে? জানার কথা নয়। বদ্রীও বেশ কিছুদিন হল আসে না।

একটু চিন্তিত দেখাল শ্রীনাথকে। আস্তে করে বলল, এ জায়গাকে আমার আপন করে কী লাভ? তুমি থাকবে, সুতরাং দায়িত্ব তোমারই।

কেন? তুমি থাকবে না?

আছিই তো। যতদিন থাকা যায় থাকবও।

তৃষা বড় বড় চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, বিষয়-সম্পত্তি আমার হলেও সংসারটা কিন্তু আমার নয়। ছেলেমেয়েও আমি বাপের বাড়ি থেকে আনিনি। সুতরাং এখন থাকা না থাকার কথা তোলা খুব বীরপুরুষের কাজ হবে না।

আমি বীরপুরুষ নই বলেই কথাটা উঠল।

তুমি স্নান করে এসো। আমি যাই।— বলে তৃষা নিচু হয়ে বারান্দা থেকে তার ফ্ল্যাশ লাইট কুড়িয়ে নিল। তারপর অন্ধকারে তাকে আর দেখা গেল না।

শ্রীনাথ ডেকচির জল নিয়ে কলপাড়ে গিয়ে খুব ঘষে ঘষে স্নান করল আজ।

কলপাড় থেকেই দেখা যাচ্ছিল, পুকুরের ধারে আজও শুকনো কাঠকুটো দিয়ে মস্ত আগুন জ্বেলেছে নিতাই।

স্নান করে ফিরে এসে বারান্দায় উঠে শ্রীনাথ হাঁক পাড়ল, নিতাই নাকি রে!

হ্যাঁ।

শুনে যা।

ভেজা গায়ে উত্তুরে হাওয়ায় খোলা বারান্দায় শীতে কাঁপছিল শ্রীনাথ। নিতাই কাছে আসতেই বলল, শুনলাম এর মধ্যে কবে যেন সরিৎবাবু তোকে মেরেছে।

নিতাই হাসে, দূর। দূর। মারবে কী? গাঁজার নেশায় তখন বাবুর গায়ে জোর ছিল নাকি?

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, সরিৎ গাঁজা খেয়েছিল?

রোজ নয়। সেদিন খেয়েছিল।

মারল কেন?

আজ্ঞে নেশা-ভাঙের মুখে কোন কথা থেকে কোন কথা বেরিয়ে যায়। তার কোনটা শুনে বাবুর রাগ হল কে বলবে?

মেরেছিল যে, সেটা আমাকে বলিসনি কেন?

নিতাই খুব হেসে-টেসে বলল, পরদিনই আবার খাতির হয়ে গিয়েছিল কিনা।

সরিৎ ছেলেটা কেমন? গুন্ডামি-টুন্ডামি করে না তো!

আজ্ঞে না। লোক খুব ভাল।

বদ্রী তপাদারের বাড়িটা চিনিস?

খুব চিনি। লাইনের ওধারে উত্তরদিকে আমবাগান পেরিয়ে মাইলটাক।

কাল ওকে গিয়ে খবর দিবি তো। বলবি জরুরি দরকার। আসে যেন একবার কাল পরশু।

দেবোখন। এই সেদিনও মা ঠাকরোন ডাকিয়ে এনেছিলেন। আমিই গিয়ে খবর দিয়েছিলাম কিনা।

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, সজলের মা বদ্রীকে ডাকিয়েছিল?

আজ্ঞে।

কেন?

তা জানি না।

আশ্চর্য তো! আচ্ছা, তুই যা।

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে গেল শ্রীনাথ। এত অন্যমনস্ক যে ঘরে ঢুকেও সে ঘরটাকে লক্ষই করল না। ডেকচি, বালতি, মগ, গামছা সব যন্ত্রের মতো যেখানকার জিনিস সেখানে রাখল। ধোয়া লুঙ্গি পরল, উলিকটের গেঞ্জি গায়ে দিয়ে চাদর জড়াল। চুল আঁচড়াল।

তারপর ইজিচেয়ারে বসতে গিয়েই সাপ দেখার মতো চমকে উঠল ভীষণ। বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করে হৃৎপিণ্ড আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে।

তার বিছানায় খুব অলস ভঙ্গিতে টর্চ হাতে তৃষা বসে আছে।

বোধ হয় চমকানোতে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল শ্রীনাথের। বোধ হয় চমকটা বাইরে থেকেও বুঝতে পেরেছিল তৃষা। উঠে এসে বুকে হাত রেখে বলল, আমারই অন্যায়। একটা জানান দেওয়া উচিত ছিল। ভয় পেয়েছ?

শ্রীনাথ কথা বলতে পারল না বুকের অসহ্য ধড়ধড়ানিতে। শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না।

আমাকে তোমার ভয় কিসের?

অনেকক্ষণ দম নিয়ে স্বাভাবিক হল শ্রীনাথ। বুকটা তার বোধ হয় ভাল নয়। ক্ষীণ একটু যন্ত্রণা হচ্ছে যেন। এক মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভ বন্ধু তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, দেখো ভায়া, যদি বাঁ দিকের বুকের নিপলের দু'ইঞ্চি নীচে কখনও ব্যথা-ট্যথা হয় তবে ঠিক হার্ট ট্রাবলের লক্ষণ বলে জেনো।

ব্যথাটা হচ্ছে। শ্রীনাথ চোখ বুজে অনুভব করে।

তৃষা ইজিচেয়ারের ধারে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বলল, তোমার তো কখনও এমন শরীর খারাপ হয় না।

শ্রীনাথ চোখ মেলে বলল, ওটা কিছু নয়। বলো, কী বলবে?

এখন তোমার ভাল লাগছে তো!

হ্যাঁ। ভাল।

তৃষা আবার বিছানায় গিয়ে বসল। তোমার খাবারটা আমি এ ঘরেই পাঠিয়ে দিতে বলেছি। এই শীতে আবার অত দূরে যাবে?

শ্রীনাথ মৃদু স্বরে বলে, ভালই করেছ।

আবার ভেবে বসবে না তো যে, তোমাকে এইভাবে আলাদা আর পর করে দিচ্ছি! লোকে কত ভুল ভাবতে ভালবাসে।

আজ এত আদুরেপনা কেন তা বুঝল না শ্রীনাথ। কিন্তু একটু হাসল। বলল, না, তা কেন?

তৃষা বসে রইল। গেল না। ভারী অস্বস্তি হতে লাগল শ্রীনাথের। আজ কেন সব অন্য রকম হচ্ছে?

একটু বাদেই খাবার নিয়ে এল বৃন্দা। সামান্য খেল শ্রীনাথ। বৃন্দা দাঁড়িয়ে থেকে এঁটো পরিষ্কার করে নিয়ে গেল। তবু তৃষা বসে আছে।

শ্রীনাথ ইজিচেয়ারে বসে বলল, কিছু বলবে?

তৃষা মৃদু হেসে বলে, বলার জন্যই বসে আছি।

বলো।

তোমার শরীর এখন কেমন লাগছে?

খুব ভাল। কিছু হয়নি।

তৃষা উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। আবার বিছানায় বসে অদ্ভুত এক হাসি হেসে বলল, আমি তোমার বউ না?

তাই তো জানি!— অবাক, ভীষণ অবাক হয়ে বলে শ্রীনাথ।

তৃষা বলে, বউ হলেও আমি ভাল বউ নই। তোমাকে একটা জিনিস থেকে বহুকাল বঞ্চিত করে রেখেছি। তাই না?

শ্রীনাথ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বুকের মধ্যে আবার সেই ধড়াস ধড়াস। সারা গায়ে শীতকাঁটা।

বলো, ঠিক নয়?— তৃষা আদুরে গলায় বলে।

শ্রীনাথ তৃষার মুখের দিকে তাকায়। না, তৃষার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। যেমন দৈনন্দিন মানুষটি ছিল, তেমনি আছে। শুধু চোখ-দুটো একটু দিপ-দিপ করে জ্বলছে। মুখে অদ্ভুত এক মোহিনী হাসি।

তৃষা বসা স্বরে ফিস ফিস করে বলল, আজ নাও। দিতে এসেছি। অভিমান কোরো না, মুখ ফিরিয়ে থেকো না। লক্ষ্মীটি!

শ্রীনাথের গলা শুকিয়ে আসছিল। তার শরীরের কামনা মরে যায়নি বটে, বরং সে রোজই তীব্র কাম বোধ করে। তবু এখনও এক রাত্রে দু'জন মেয়েমানুষের পাল্লা টানবার ক্ষমতা তার নেই। হাওড়া ময়দানের নমিতা তাকে আজ নিঃশেষ করেছে।

মৃদু স্বরে শ্রীনাথ বলে, আজ নয়।

আজই!— বলে উঠে আসে তৃষা। পাশে দাঁড়ায়। কানের কাছে মুখ এনে বলে। আজই। আজ আমি ভীষণ পাগল হয়েছি।

শ্রীনাথ সিঁটিয়ে যায়। কাঠ হয়ে বসে থাকে। তারপর বলে, তোমার এত ইচ্ছে ছিল না তো কখনও!

তুমি তার কী জানবে!

আমি জানব না তো জানবেটা কে?

আজ জেনে দেখো।

আজ নয়, তৃষা।

আজই। আজই চাই। এসো।

তৃষা শ্রীনাথের কোমর ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। তৃষার গায়ে অনেক জোর। এত জোর যে শ্রীনাথ ওকে ঠেকাতে পারল না।

বুকের বাঁ দিকে নিপলের ঠিক দু' ইঞ্চি নীচে ক্ষীণ ব্যথাটা আবার টের পেল শ্রীনাথ।

তৃষা কানে কানে বলে, আমার যদি ইচ্ছেই না থাকবে তাহলে তোমার এতগুলো ছেলেপুলে হল কী করে?

শ্রীনাথ হঠাৎ বলে ফেলল, ইচ্ছে হয়তো আছে, তবে তা আমাকে নিয়ে নয়। আমার প্রতি তুমি বরাবর ক্যালাস ছিলে।

অবাক গলায় তৃষা বলে, তোমাকে নিয়ে নয়? তবে কাকে নিয়ে?

অনেক কথাই বলতে পারত শ্রীনাথ। কিন্তু ভদ্রতাবোধ এসে গলা টিপে ধরল। বাধা হয়ে দাঁড়াল লজ্জা। মৃত দাদা মল্লিনাথের প্রতি একরকম মায়া হল এ সময়ে। এত অকপটে তৃষার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙচুর করতে বুঝি-বা হল ভয়। তাই বলতে পারল না।

তৃষা বাতি নিভিয়ে দিয়ে চলে এল বিছানায়। এক ঝটকায় নিজেকে খুলে ফেলল। শ্রীনাথকেও শরীরে কোনও আবরণ রাখতে দিল না। নগ্ন শরীরে লেপটা টেনে নিল। বলল, লেপটা ভীষণ সাণ্ডা। কাল বের করে রেখে যেয়ো, রোদে দেব। চাবিটা রেখে যেয়ো, তাহলেই হবে।

শ্রীনাথ জবাব দেওয়ার আগেই তৃষা তার মুখ বন্ধ করে দিল জোরালো এক চুমুতে। বড় ঘিনঘিন করছিল শ্রীনাথের। মুখে লালা, ঠোঁট, শ্বাস কিছুই তার শরীরে সাড়া তুলছে না। নেতিয়ে অবশ হয়ে আছে শরীর।

এসো।— বলে হাত বাড়ায় তৃষা।

না তৃষা, আজ আমার ইচ্ছে নেই।

কানের কাছে হঠাৎ তীক্ষ্ণ শোনায় তৃষার গলা, ইচ্ছে নেই কেন? বহুদিন তো এসব হয়নি। ইচ্ছে না হওয়ার কথা নয়।

তৃষার হাত দারোগার মতো খানাতল্লাস করতে থাকে তার শরীরে।

শ্রীনাথ লড়াই করে, না তৃষা, আজ আমার মন ভাল নেই।

তবু তৃষার সমস্ত শরীর হামলে পড়ে তার ওপরে। তার হাত তৎপর হয়। এমনকী টর্চ জ্বেলেও কী যেন দেখার চেষ্টা করে সে।

হঠাৎ শ্রীনাথ বুঝতে পারে, তৃষার এক ফোঁটাও কাম নেই। এতটুকুও ভালবাসা জাগেনি আজ ওর এই রাতে। তৃষার চোখ আর হাত একটা কিছু বুঝতে চাইছে। দেখতে চাইছে।

শ্রীনাথ ভয়ে প্রাণপণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। নিজেকে ঢাকতে চায়। তৃষাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করে সে।

কিন্তু জোরালো হাতে পায়ে বিছানার সঙ্গে তৃষা তাকে বেঁধে রাখে। পুরুষকে জাগিয়ে তোলার যতরকম মুদ্রা আছে তা প্রয়োগ করে যায় সে। টর্চ জ্বেলে পরীক্ষা করে তাকে।

তারপর গভীর এক শ্বাস ফেলে তাকে ছেড়ে দেয়।

শ্রীনাথ উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে থাকে ঘেন্নায়। তৃষা জানল, সে আজ অন্য মেয়েমানুষের কাছে গিয়েছিল।

॥ ষোলো ॥

রবিবার দিনটা দীপনাথের নিরঙ্কুশ ছুটি থাকে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো, আড্ডা, বিকেলের দিকে প্রীতম বা সোমনাথের বাড়িতে যাওয়া কিংবা আর্ট একজিবিশন, ভাল নাটক, বিচিত্র কোনও অনুষ্ঠান দেখে বেড়ানোর প্রোগ্রাম থাকে তার।

কিন্তু এই রবিবার ছুটি পেল না সে। বোস সাহেব বিরাট দল নিয়ে শিকারে যাচ্ছেন। মিঠাপুকুরের বাগানবাড়ি ছেড়ে দিয়েছে একজন বড় মহাজন। সেখানে কেটারারের এলাহি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

দীপনাথের এইসব আমোদ-ফুর্তিতে কোনও সম্মানজনক ভূমিকা নেই। তাই সে আনন্দ পায় না, বরং যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত থাকে। তবু এবার তার কোথায় একটু উত্তেজনাময় আনন্দের অনুভূতি হচ্ছিল। তার কারণ, অন্যান্য মহিলাকুলের সঙ্গে মণিদীপাও যাচ্ছেন।

নিজের মনের এই সাম্প্রতিক পাপবোধ দীপনাথকে যথেষ্ট খোঁচা দেয়। কিন্তু সে যেন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, জ্বলে গাল না যায় ত্যাজন।

মিঠাপুকুরের মস্ত ঝিলে যে বালিহাঁস থাকবেই এমন কোনও কথা নেই। তবে ঝোপ-জঙ্গল বাঁশঝাড়ে বিস্তর নিরীহ পাখি-টাখি এসে বসবে। তাদের দু'-চারটে মারা পড়লেও পড়তে পারে। কারণ সঙ্গে যাচ্ছে তিন-তিনটে বন্দুক।

অ্যামবাসাডরে ড্রাইভারের কনুইয়ের গুঁতো আর অ্যালবার্ট টমসনের চিফ অ্যাকাউনট্যান্ট মিস্টার গুহর ভারী উরুর পার্শ্বচাপ সহ্য করতে করতে সেই তিনটে খাপে ভরা ভারী বন্দুক খাড়া করে ধরে থাকতে হচ্ছে তাকে আগাগোড়া। লাগেজ বুটে জায়গা হয়নি, সেখানে বিস্তর জিনিস। আর দীপনাথ থাকতে অন্য কোথাও জায়গা হওয়ার দরকারই বা কী?

তবে দৃশ্যটা মণিদীপা দেখছে না। মেয়েরা দুটো গাড়ি বোঝাই হয়ে আগে আগে যাচ্ছে। পিছনে আর দুটো গাড়িতে পুরুষমানুষের দল। মণিদীপা দেখলে একটু অস্বস্তি বোধ করত দীপ। ভদ্রমহিলা মনে করেন, দীপনাথ বোস সাহেবের চামচা। কথাটা হয়তো তেমন মিথ্যেও নয়।

সকালের নরম রোদে শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তা আর দু'ধারে প্রাকৃতিক সবুজের মধ্যে পড়ে দীপনাথের ভাল লাগার কথা। বন্দুকগুলোর জন্য তেমন লাগছে না। মুখের সামনে তিনটে খাপে ঢাকা নল উঁচু হয়ে তার চোখ আড়াল করে আছে। এই বন্দুকে পাখি মারা পড়বে ভাবতেই তার বুকে কষ্ট হয়। খুনখারাপি—তা সে পাখিই হোক আর বাঘই হোক—দীপনাথ সহ্য করতে পারে না। বড়দা মল্লিনাথ তাতে বন্দুক চালাতে শিখিয়েছিল। মল্লিনাথের হাত ছিল সাফ। মাথা ঠান্ডা, আর বুকে ছিল যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা। একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার হিসেবে কিছুদিন উত্তর বাংলায় ছিল

মল্লিনাথ। তখন বনে-জঙ্গলে তার সঙ্গে ঘুরে দীপনাথ তালিম নিয়েছিল। কিন্তু আজও সে বন্দুক জিনিসটাকে পছন্দ করে উঠতে পারেনি।

গুহ সাহেব পিছনে একটু ঘুরে ব্যাক সিটে বসা বোস সাহেব এবং আর তিন কোম্পানির তিন বড় মেজো কর্তার সঙ্গে অফিস নিয়ে কথা বলছিলেন। ফলে উরুর চাপে দীপনাথ আরও চ্যাপটা হয়ে গেল। শীতকালেও তার অল্প ঘাম হচ্ছে। দমফোট লাগছে।

হাওড়া ছেড়ে উনিশ-কুড়ি মাইল দূরে মিঠাপুকুর। ইতিমধ্যেই গাছ-গাছালি ঘন হয়ে উঠেছে। বসতির ঘনত্ব কমে এসেছে। চাষের মাঠ দেখা যাচ্ছে। বন্দুকের নল সরিয়ে দেখতে থাকে দীপনাথ। সামনের একটা গাড়িও খুব তৃষিত চোখে দেখে নেয় সে। সবুজ একটা ফিয়েট গাড়ি। ওতে মণিদীপা রয়েছে। মণিদীপা আজও শাড়ি পরেনি। জিনস আর টি শার্ট। তার ওপর একটা কাশ্মীরি কোট। বড্ড বেশি চমকি দেখাচ্ছিল।

গাড়িটা ডাইনে বাঁক নিল। আর দেখা গেল না।

বিশুদ্ধ মার্কিন ইংরেজিতে এ গাড়ির সাহেবরা অফিস বিজনেস আর বিভিন্ন একজিকিউটিভের দোষ-ত্রুটি নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। দীপনাথ বিন্দুমাত্র কৌতূহল বোধ করে না। চোখ বুজে সে মনের চোখটি খোলে। অমনি নীল আকাশের গায়ে স্বর্গের সমান উঁচু মহান পর্বতের দৃশ্য ভেসে ওঠে।

সব তুচ্ছতা ছেড়ে একদিন কি সে পাহাড়ে যাবে না?

গাড়ি ডাইনে বাঁক নিয়ে একটা গাছপালায় নিবিড় শুঁড়িপথে ঢোকে। কাঁচা রাস্তা। গাড়ি হোঁচট খাচ্ছে। খুব আস্তে চলছে। প্রচণ্ড ধুলো উড়ছে চাকার ঘষড়ানিতে। চারদিকের গাছপালার ডাল আর পাতা ছটাছট আছড়ে পড়ছে গাড়ির গায়ে। বাঁশের একটা ডগা গুহ সাহেবের গালে চুমু খেয়ে গেল। উনি একটু সরে এলেন। উরুর চাপে দীপনাথ আরও সরু হল এবং ড্রাইভারের কনুই তার পেটে ঘোত করে বসে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা এই যন্ত্রণা সহ্য করে বাগানবাড়িতে পৌঁছল দীপনাথ।

ধূলিধূসর দুটো গাড়ি থেকে মহিলারা নেমেছেন। বাগানময় অজস্র সুন্দর নিবিড় গাছপালা, কুঞ্জবন, পুকুর, বাড়িটাও বিশাল। চারদিকে উঁচু দেয়ালের প্রতিরোধ। চারদিক ম ম করছে কফির গন্ধে। বাগানে পুকুরের ধারে মস্ত গার্ডেন আমব্রেলার নীচে টেবিল সাজানো। এখুনি হালকা জলখাবার দেওয়া হবে। ড্রিংকস চাইলে ড্রিংকসও। কেটারারের বেয়ারারা ট্রে নিয়ে তৈরি হচ্ছে।

বন্দুকগুলো ঘাসে শুইয়ে রেখে দীপনাথ হাত-পা টান টান করল। পুলওভার গায়ে রাখা যাচ্ছে না এই রোদে। সেটা খুলে পিঠে ঝুলিয়ে হাতা দুটো গলায় ফাঁস দিয়ে রাখল। একটা ফাঁকা টেবিলে বসে কফিতে চুমুক দিয়ে হাঁফ ছাড়ল সে।

কিছুক্ষণ সে হাঁফ ছাড়তে পারবেও। শিকারের প্রোগ্রামে সে সাহেবদের সঙ্গে যাবে না, এ কথা বোসকে সে আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

বোস শুনে একটু হেসে বলেছেন, রক্ত দেখলে ভয় পান নাকি?

ওসব আমার ঠিক সহ্য হয় না।

ঠিক আছে। মিসেসরাও কেউই নাকি যাবেন না। আপনি না হয় ওঁদের সঙ্গে সময়টা কাটাবেন।

কথাটায় খোঁচা আছে। কিন্তু সারা দিন কত খোঁচাই তাকে হজম করতে হয়।

শিকারের পর লাঞ্চ। এবং লাঞ্চের পর কলকাতা থেকে আসা এক ম্যাজিসিয়ান ম্যাজিক দেখাবেন। এক গায়িকা গান শোনাবেন। তারপর মিস্টার এবং মিসেসরাও হয় গাইবেন, না হলে মজার গল্প বলবেন, কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন, যার যা খুশি।

সুতরাং দীপনাথের খুব একটা কাজ নেই। অনেকটা সময় সে একা কাটাতে পারবে।

কফির কাপের কানার ওপর দিয়ে তার চোখ খুব আলতোভাবে লক্ষ করছিল, কিন্তু মণিদীপাকে

কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। রাই মাখিয়ে গোটা দুই ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ খেয়ে ফেলল সে। তারপর আবার বসে বসেই খুঁজতে লাগল চোখ দিয়ে। অবাধ্য চোখ বশ মানছে না। বড় জ্বালা।

অনেকটা দূরে একটা লিচু গাছের আড়ালে ক্যাম্বিসের চেয়ারে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে মণিদীপা বসে আছে, এটা আবিষ্কার করতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। মণিদীপার সঙ্গে জনা দুই মহিলা ও জনা তিনেক পুরুষ রয়েছে। হাত পা নেড়ে প্রচণ্ড কথা বলছে তারা।

দীপনাথ উঠল এবং একটু লক্ষ্যহীন পায়ে এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে লিচুতলার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। মণিদীপার চোখে পড়ার জন্য সে ইচ্ছে করেই ওর মুখোমুখি উলটো দিক থেকে খানিকটা হেঁটে কাছাকাছি চলে গেল প্রায়।

কিন্তু মণিদীপা একদমই পাত্তা দিল না তাকে। ডাকল না, তাকালও না।

দীপনাথের কাছে এটুকুই যথেষ্ট অপমান। মণিদীপা সম্পর্কে যত বেশি সচেতন হয়ে উঠছে সে, তত বেশি অভিমান আর অপমানবোধ বেড়ে যাচ্ছে তার।

দীপনাথও স্পষ্ট করে তাকাল না। উদাস মুখে হাঁটা অব্যাহত রেখে সে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পশ্চিম দিকে একটা পরিচ্ছন্ন ঘাসজমিতে চলে এল। খুঁজে-পেতে একটা পছন্দসই গাছের ছায়ায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে, হাতে মাথা রেখে। চোখ জ্বালা করছে রোদের তেজে। তাই চোখ বুজল। তারপর পাহাড়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল হঠাৎ।

কিন্তু ঘুমোলেও দীপনাথের ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ু সব সময়ে সজাগ থাকে। সামান্য শব্দ বা সামান্য চলাফেরাও সে টের পায়। ঘুমের চটকার মধ্যেই সে একটা ভারী সুন্দর গন্ধ পেল। ঘুম ভাঙলে চোখ চাইল না সে, কে এসেছে তা সে জানে।

বড় অভিমান হল তার। পাশ ফিরে শুল।

মণিদীপা আস্তে করে ডাকল, দীপনাথবাবু!

প্রথমে উত্তর দিল না দীপনাথ।

আরও দু'বার ডাক শুনে হঠাৎ উঠে বসল।

মণিদীপা হাসছিল। বলল, কুম্ভকর্ণ।

দীপনাথ হাইটা চেপে দিয়ে বলল, কিছু কাজ নেই, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিছু বলছেন?

তেমন কিছু নয়। আমার ভাল লাগছে না।

কেন?

এরা কেউ তো আমাদের ক্লাসের লোক নয়। আপনি যেরকম মধ্যবিত্ত পরিবারের, আমিও তাই। আই হেট দেম।— বলতে বলতে মণিদীপা একটু জ্বলে ওঠে।

দীপনাথ গম্ভীর হয়ে বলে, তা বললে হবে কেন? একজন একজিকিউটিভের বউকে এই সমাজে মিশতেই হবে। অন্য উপায় তো নেই।

খুব জেদের গলায় মণিদীপা বলে, আমার যা ভাল লাগে না তা মানিয়ে নিতে আমি রাজি নই।

তা হলে কী করবেন?

আমি এখানে সারা দিন থাকতে পারব না।

একটু আগে তো লিচুতলায় হাই সোসাইটির লোকদের সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিচ্ছিলেন।

ওঃ! আই ওয়াজ প্রিচিং কমিউনিজম।

কী সর্বনাশ!

মণিদীপা মৃদু হেসে বলে, খুবই সর্বনাশ। মিস্টার বোস শুনলে মূর্ছা যাবেন। উনি কমিউনিজমকে সাংঘাতিক ভয় পান। আমাদের বাড়িতে লাল মলাটের কোনও বই ঢুকতে পারে না। তা বলে ভাববেন না হাই-সোসাইটিতে কমিউনিস্ট নেই। বরং অনেক আছে। আমি যাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম তাদের একজনই তো কট্টর মার্কসিস্ট।

হতেই পারে।

হচ্ছেও। কমিউনিজম ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে সব ক্লাসের মধ্যে।

খুব ভাল।— দীননাথ আবার হাই তোলে। মণিদীপার এই একটা ব্যাপারই তার যা একটু না-পছন্দ। সে জিজ্ঞেস করল, বসরা সব কোথায়?

মণিদীপা ঘাসে বসে বলল, শিকার-শিকার খেলা করতে গেল সব। প্রত্যেকটাই মাতাল। কারও হাতে টিপ নেই।

না থাকলেই ভাল। পাখি মারা আমার একদম ভাল লাগে না।

মণিদীপা হাসে। বলে, আপনাকে দেখেই মনে হয়, আপনি ভীষণ সফট-হার্টেড।

মণিদীপার হাসিটা এতই ঝকমকে এবং হাসলে বয়সটা এতই কম দেখায় যে, দীপনাথের চোখ আঠাজালে পড়া পাখির মতো মণিদীপার মুখে আটকে থেকে ছটফট করছিল।

মণিদীপা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে, দি হামবার্গস আর অ্যাওয়ে। চলুন আমরা একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবেন?

যে-কোনও জায়গায়। জাস্ট টু কিপ ডিসট্যানস ফ্রম দি হবুচন্দ্র কিংস অ্যান্ড গবুচন্দ্র মিনিস্টারস। কোনও চাষার বাড়িতে গেলে কেমন হয়?

দীপ শঙ্কিত হয়ে বলে, ও বাবা!

ভয় পাচ্ছেন কেন? চলুন। রিয়্যাল হিউম্যান বিয়িং-এর কাছে গেলে অনেক ভাল লাগবে।

চাষা বলতেই যে রিয়্যাল হিউম্যান বিয়িং নয় এ কথাটা বোঝানোর বৃথা চেষ্টা করল না দীপ। তবে উঠল।

মণিদীপা হাঁটতে হাঁটতে বলে, ধারে-কাছে দেখার মতো কোনও জায়গা নেই?

দীপ মাথা নেড়ে বলে, জানি না, তবে কয়েক মাইলের মধ্যে রতনপুর নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমার মেজদা থাকে।

মণিদীপা ভ্রু তুলে বলে, উনি কি বড়লোক?

না। তবে একটা খামার মতো আছে ওদের। গেরস্থ।

আমি যদি যেতে চাই আপনার কোনও অসুবিধে নেই তো?

থাকলে তো কথাটা বলতামই না। চেপে যেতাম।

মণিদীপা ঘড়ি দেখে বলে, এখন মোটে সাড়ে ন'টা বাজে। গিয়ে লাঞ্চের আগে ফেরা যাবে তো?

তা যাবে।

তবে গাড়ি জোগাড় করি?— বলে প্রায় দৌড়ে চলে যায় মণিদীপা।

বেশ খুশি ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল মণিদীপাকে। দীপনাথ স্পষ্ট টের পায়, একা সে নয়। মণিদীপাও তার প্রতি টানে টানে একটু একটু এগিয়ে আসছে। বেশ আগ্রহী। হয়তো সেটা প্রেম নয়। কারণ মণিদীপার সত্যিকারের ভালবাসার লোক একজন বয়স্ক স্কুলমাস্টার, যার নাম স্নিগ্ধদেব এবং যে সাংঘাতিক বিপ্লবী। কিন্তু মণিদীপার মন উপচে যে বাড়তি লাবণ্যটুকু ঝরে পড়ছে তার কিছু ভাগ অবশ্যই দীপেরও। আপাতত এই রবিবারটার যাবতীয় কষ্ট, কাজ ও অপমানকে ভুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে সেটুকুই ঢের।

মণিদীপা ফিয়েট গাড়িটা জোগাড় করেছে। দীপ সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল, মণিদীপা বলল, ও কী? পাশাপাশি না বসলে কথা বলব কার সঙ্গে?

দীপ লজ্জা পেয়ে মণিদীপার পাশে উঠে বসে।

মণিদীপা বলে, আপনি ড্রাইভিং জানেন?

না, একটু শিখেছিলাম, ভুলে গেছি।

জানলে ড্রাইভারটাকে কষ্ট দিতাম না।

আপনি তো জানেন।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলে, জানলে কী হবে? এসব অচেনা জায়গায় কি পারব? ঠিক সাহস পাচ্ছি না।

পারবেন।— দৃঢ় স্বরে বলে দীপনাথ।

পারব?— মণিদীপা উজ্জ্বল চোখে তাকায়।

নিশ্চয়ই। বেচারাকে খামোখা কেন কষ্ট দেবেন? ছেড়ে দিন।

দীপনাথ এ কথা বলার সময়েও টের পাচ্ছিল, তার বুক কাঁপছে। নির্জন গাঁ-গঞ্জের রাস্তায় এই অ্যাডভেঞ্চারে ড্রাইভার না থাকলে মণিদীপা অনেক খোলামেলা হবে না কি? মুখ-ফাঁকা দু'-একটা কথা ঠিক বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর-একটু ভেবে মণিদীপা বলে, না, থাক। আমি যে আপনার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি না ড্রাইভারটা তার সাক্ষী থাকবে।

ভীষণ লাল হয়ে গেল দীপ। বলল, কী যে বলেন!

রতনপুর কোন দিকে এবং কত দূর তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না দীপের। খুব দূর যে নয় তার একটা ধারণা হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাত্র পনেরো মিনিটে পৌঁছে গিয়ে সে নিজেও অবাক। মণিদীপা মেজদার বাড়িতে কে কে আছে এবং তারা কেমন লোক তা জানতে চেয়েছিল। সেই সব প্রশ্নের জবাবও ভাল করে দেওয়া হল না।

ফটকের কাছে গাড়ি থেকে মণিদীপাকে সঙ্গে নিয়ে নামবার সময় দীপনাথ একটু লজ্জা বোধ করছিল। এই পোশাকে একজন সধবাকে দেখে মেজো বউদি আবার কী ভাববে!

ঢুকতেই ডান ধারে শ্রীনাথের বাগান।

মণিদীপা দাঁড়ায় এবং বাগান থেকে মাটিমাখা হাত-পায়ে উঠে আসে শ্রীনাথ।

কাকে চাইছেন?

দীপনাথ হাতের ইশারা করে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে মেজদাকে। তার পর এগিয়ে গিয়ে বলে, মেজদা, ইনি মিসেস বোস। আমার বসের স্ত্রী।

শ্রীনাথ একটু অবাক। বলে, ও, তুই! আসুন! আসুন!

শ্রীনাথ আর তাদের মধ্যে বেড়ার বাধা। শ্রীনাথ বেড়া বরাবর এগিয়ে যেতে যেতে বলে, ওই সামনের ঘর। আসুন।

বোঝাই যাচ্ছিল, মেজদা একটু ঘাবড়ে গেছে। তটস্থ হয়ে পড়েছে। হবেই। কী একখানা মেয়ে। সঙ্গে নিয়ে বেরোলে বাজারে প্রেস্টিজ বেড়ে যায়।

মণিদীপা মুখ ফিরিয়ে দীপনাথকে বলে, ঘর নয়। আমি বাগানটা দেখব। দারুণ সুন্দর বাগান।

শ্রীনাথ কথাটা শুনে মুখ ফিরিয়ে বলে, বাগান দেখবেন? খুব খুশি হলাম। তা হলে ওই সামনের ফটক ঠেলে চলে আসুন।

বাস্তবিকই দেখার মতো বাগান করেছে শ্রীনাথ। সাজানো গোছানো নয়। বরং জংলা, এলোপাথাড়ি সব গাছপালা গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু তার বিচিত্র রকমফের মানুষকে হতভম্ব করে দেয়। প্রাইজ জেতার মতো বড় বড় আকারের মরশুমি ফুল থেকে পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের ভাষায় রাক্ষুসে ফুলকপি পর্যন্ত সবই ফলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, বাগানের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালে নিবিড় গাছপালার আবডালে বাইরের পৃথিবী একদম আড়াল পড়ে যায়।

আপনি বাগান করতে খুব ভালবাসেন, না?— মণিদীপা শ্রীনাথকে জিজ্ঞেস করে।

শ্রীনাথ একটা চার-রঙা তারাফুল তুলে মণিদীপার হাতে দিয়ে বলে, আচার্য জগদীশ বোস

গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন, জানেন তো! আমি নতুন করে সেই প্রাণটার সন্ধান করছি।

রোদচশমার ওপর দিয়ে মণিদীপার ভ্রু-তে একটু কুঞ্চন দেখা দেয়। সে বলে, অনেক বাঙালি এ কথাটা বলে বেড়ায়। কিন্তু আচার্য জগদীশ গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন, এ কথাটা মোটেই ঠিক নয়।

শ্রীনাথ একটু যেন ভয় খেয়ে তাকায়। বলে, তা হলে?

মণিদীপা এবার সুন্দর করে হাসে। বলে, গাছের প্রাণের কথা লোকে তো বহু দিন ধরে জানে। জগদীশ বোস বোধ হয় গাছের সেনসিটিভিটি প্রমাণ করেছিলেন। ডিটেলস জানি না। তবে ওইরকমই কিছু।

শ্রীনাথ একটু নিভে গিয়ে বলে, তাই হবে।

মণিদীপা খুব সমবেদনার সঙ্গে বলে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। গাছের প্রাণ আপনিই আবিষ্কার করেছেন। এত বড় আর লাইভলি ফুল আমি আগে দেখিনি। প্রত্যেকটা গাছই এত হেলদি!

আপনি গাছ ভালবাসেন?

কে না বাসে?

শ্রীনাথের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে যায়। সে বলে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিচি দেখে গাছ চিনতে পারে না। লেখাপড়া শিখে তা হলে কী লাভ?

ঠিকই তো!

বলতে বলতেই গাছপালা এবং বাগানের ওপর মণিদীপার কৌতূহল শেষ হয়ে যায় এবং দীপনাথ সেটা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে।

দীপ বলে, চলুন, আমার বউদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

মণিদীপার চোখ চারদিকটা গিলে খাচ্ছে। বলল, বাঃ, বেশ তো জায়গা। এ রকম একটা জায়গায় থাকতে পারলে কলকাতার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে আমি এক্ষুনি রাজি।

ভাবন-ঘর থেকে ভিতরবাড়ি যাওয়ার পথেই খবর রটে গিয়েছিল। ছেলে-মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের ধারে। তৃষা এগিয়ে এসে মণিদীপার হাত ধরে বলল, আসুন। আপনার জন্যই বোধ হয় আমার একজন হারানো দেওরেরও খোঁজ পাওয়া গেল।

বাকি সময়টুকু দীপনাথ আর মণিদীপার নাগালও পেল না। মেয়েমহলে গিয়ে ঘুরঘুর করা তার স্বভাব নয়। মণিদীপাকে এগিয়ে দিয়ে সে ফিরে এল ভাবন-ঘরে।

শ্রীনাথ হাত-মুখ ধুয়ে এসে বলল, কোথায় এসেছিলি?

মিঠাপুকুর। তোমার আস্তানাটা যে এত কাছে কে জানত?

শ্রীনাথকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বলল, আমি ভাবলাম বুঝি সোমনাথ তোকে খবর দিয়ে আনিয়েছে।

না তো! সোমনাথ আনাবে কেন?

আজ বাবাকে নিয়ে ওরও এখানে আসার কথা।

দীপনাথ ভারী লজ্জিত হয়। বাবা যে সোমনাথের কাছে সেটা সে মাঝে মাঝে ভুলেই যায়। বাবাকে দেখেওনি বহুদিন।

সে বলল, বাবা আসছে কখন?

কে জানে?

দীপনাথ ঘড়ি দেখে বলে, বেলা বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারি। তারপর লাঞ্চে যেতে হবে। এর মধ্যে যদি বাবা এসে যায় তবে দেখাটা হতে পারে।

এখানে দুপুরে খাবি না?

উপায় নেই। একা হলে কথা ছিল। বসের বউ সঙ্গে রয়েছে।

মেয়েটা একটু খ্যাপা নাকি?

কেন?

কেমন যেন অন্যরকম।

দীপনাথ হাসে। বলে, খ্যাপা নয়। আজকালকার মেয়েরা এরকমই। সজলকে ডাকো তো। বহুকাল ওকে দেখি না।

শ্রীনাথ বারান্দায় বেরিয়ে খ্যাপা নিতাইকে ডেকে সজলকে পাঠিয়ে দিতে বলে।

॥ সতেরো ॥

সজল এসে প্রণাম করে হাসিমুখে দাঁড়াতেই মনটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল দীপনাথের। সজলের মুখখানা ভারী মিষ্টি হয়েছে। দু'খানা বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় চোখ, জড়তাহীন ভাবভঙ্গি। চেহারাখানাও বেশ লম্বা এবং কাঠামোটাও মজবুত।

আমাকে চিনতে পারিস, সজল!

হুঁ-উ। বড়কাকা।

এখানে আসব বলে ঠিক ছিল না। তাই তোর জন্য কিছু আনতে পারিনি।

বলে মানিব্যাগটা হিপ পকেট থেকে বের করে কুড়িটা টাকা সজলের হাতে দেয় দীপনাথ। বলে, জামাটামা কিছু একটা কিনে নিস।

শ্রীনাথ ধমক দিয়ে বলে, কেন? কোনও পালপার্বণ পড়েছে এখন! কিচ্ছু দিতে হবে না।

সজলও হাত গুটিয়ে নিয়ে বলে, না না, আমার এখন জামার দরকার নেই, কাকু। তুমি টাকা রাখো।

দীপনাথ শ্রীনাথকে ধমক দিয়ে বলে, তুমি থামো তো। সজল কি আমার কুটুম নাকি?— বলে সজলের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, কাকার সঙ্গে ভদ্রতা হচ্ছে? এক চড় খাবি। নে!

সজল টাকাটা নেয়। খুব লজ্জার সঙ্গে হাসে।

দীপনাথ মানিব্যাগ পকেটে পুরতে পুরতে বলে, আজেবাজে ব্যাপারে খরচ করিস না। জামা কিনে নিস। লেখাপড়ায় কেমন হয়েছিস? ক্লাসে ফার্স্ট হোস নাকি?

শ্রীনাথ বলে ওঠে, আরে না না। কোনওরকমে পাসটাস করে যায় আর কী। লেখাপড়ায় মনই নেই। অতি বাঁদর।

দীপনাথের নিকট-আত্মীয় বলতে এরাই। বড়দা মল্লিনাথ বিয়েই করেনি। তবে দীপনাথ একবার এক গোপনসূত্রে খবর পেয়েছিল বৈধ সন্তান না থাকলেও নাকি এই রতনপুরেই মল্লিনাথের একজন বাঁধা মেয়েমানুষ ছিল এবং তার গর্ভে মল্লিনাথের এক অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। মল্লিনাথকে বাদ দিলে আর থাকে সে নিজে আর সোমনাথ। সোমনাথের এখনও ছেলেপুলে হয়নি। এখনও পর্যন্ত শ্রীনাথই যা বংশরক্ষা করছে।

বংশরক্ষা কথাটা এ যুগে প্রায় তামাদি হয়ে গেছে। তবু দীপনাথ এই কথাটার মধ্যে এক গভীর মায়া ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে।

সে উঠে পড়ে বলল, চল, তোদের বাড়িটা ঘুরে দেখি।

সজল খুব রাজি। বলল, চলো।

কাকাকে সজলের খুব পছন্দ হয়ে গেছে। সে শুনেছে এই কাকা নাকি খুব উদাস ধরনের। সংসারে মন নেই। আত্মীয়দের সঙ্গে তেমন সম্পর্কও নেই। ছোটকাকার মতো এই কাকা কোনওদিন জেঠুর সম্পত্তি দাবি করতে আসেনি।

সজল মুখ তুলে সকালের রোদে দীপনাথের মুখখানা ভাল করে দেখল। উদাস একরকম চোখ। একটু যেন ছটফটে ভঙ্গি। মুখখানা লম্বা ধরনের এবং খুবই সুশ্রী। সব মিলিয়ে কাকাটিকে তার ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়।

খ্যাপা নিতাইয়ের ঝোপড়াটা দেখিয়ে দীপনাথ বলে, ওটা কী রে?

নিতাই খ্যাপার ঘর।

কোন নিতাই? সেই যে তান্ত্রিক?

সজল অবাক হয়ে বলে, তুমি চেনো?

চিনব না কেন? বহুকাল আগে বড়দার ফাইফরমাশ খাটত। তখন দেখেছি। তখন অবশ্য তান্ত্রিক হয়নি। এখন কী করে?

ওঃ, সে অনেক কিছু করে। বাণ মারে।

সর্বনাশ! কাকে বাণ মারে?

হি হি করে হাসে সজল। বলে, সবাইকেই মারে। যার ওপর যখন খেপে যায়। একদিন সরিৎমামাকেও বাণ মেরেছিল।

সরিৎ! কোন সরিৎ? বউদির এক ভাই ছিল সরিৎ, সেই নাকি?

হুঁ, সরিৎমামা এখন আমাদের এখানে থাকে।

ওকে বাণ মারল কেন?

সরিৎমামা ওকে মেরেছিল যে! মা'র নামে কী যেন সব বলেছিল, তাই মেরেছিল।

বউদির নামে?— ভ্রু কুঁচকে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে দীপনাথ বলে, তবে বউদি ওকে এখানে রেখেছে কেন? তাড়িয়ে দিলেই তো হয়।

সজল মাথা নেড়ে বলে, মা ওকে তাড়াবে না।

কেন?

নিতাইদাকে মা খুব ভয় পায়।

পুকুরধারে বিস্ময়ে প্রায় থেমে যায় দীপনাথ। বলল, বউদি ওকে ভয় পায়, বলিস কী রে? ওকে ভয় পাবে কেন?

বাণ মারে যে!

কথাটা দীপনাথ হেসেই উড়িয়ে দেয়। তৃষা বউদি খ্যাপা নিতাইয়ের বাণকে ভয় খাওয়ার মেয়ে নয়।

পুকুরের গভীর ছায়াচ্ছন্ন জলের দিকে চেয়ে ছিল দীপনাথ। চারদিকে গাছপালার নিবিড়তা। এত সুন্দর ছায়া আর গভীর জল যেন বহুকাল দেখেনি দীপনাথ। কী নির্জনতা এখানে। বলল, এ পুকুরে বড়দা অনেক মাছ ছেড়েছিল।

এখনও অনেক মাছ।— সজল আগ্রহের সঙ্গে জবাব দেয়।

মাছগুলো তোরা কী করিস?

মাঝে মাঝে ধরা হয়। ধরবে কাকা? আমার হুইল আছে।

না রে, আজ সময় নেই।

তবে কবে আসবে বলো, সেদিন দু'জনে মিলে ধরব।

আসব'খন একদিন।

তুমি রবিবারে-রবিবারে আসতে পারো না?

ভারী স্নেহের হাতে সজলের মাথার এক টোকা চুল একটু নেড়ে দেয় দীপনাথ। বলে, তোর বুঝি খুব মাছ ধরার শখ?

খুব। তবে মাছ খাই না।

তা হলে ধরিস কেন?

ভাল লাগে। তুমি কখনও মুরগির গলা কেটেছ কাকু?

দীপনাথ ভ্রূ কুঁচকোয় আবার। বলে, না তো! কেন রে?

মুরগি কাটতে খুব ভাল লাগে, না?

দীপনাথ একটু দুশ্চিন্তার দৃষ্টিতে ভাইপোর দিকে তাকায়। মুরগি কাটার মধ্যে ভাল লাগার কী আছে বুঝতে না পেরে মাথা নেড়ে বলে, আমার ভাল লাগে না। অবোলা জীবকে কাটতে ভাল লাগবে কেন? তুই কাটিস নাকি?

লুকিয়ে কেটেছিলাম। মা টের পেয়ে তিন দিন ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।

কাটতেই বা গেলি কেন?

নিতাই কাটে, সরিৎমামা কাটে, লক্ষ্মণ কাটে, তবে আমি কাটলে কী দোষ?

ইতস্তত করে দীপনাথ বলে, দোষ নেই। তবে তোর বয়সে সবাই তো রক্ত দেখলে ভয় পায়।

আমিও পেতাম। এখন পাই না। জানো কাকু, বাবার কাছে একটা দারুণ জার্মান ক্ষুর আছে। সেইটে দিয়ে কাটতে যা ভাল না!

সর্বনাশ! ক্ষুরে হাত দিস নাকি? ভীষণ ধার যে, কখন হাত-ফাত কেটেকুটে ফেলবি।

কাটবে কেন? বাবা তো নিজেই ক্ষুরটা আমাকে দিতে চেয়েছিল। মা দিতে দিল না। তাই নিয়ে দু'জনের কী ঝগড়া! জানো, মা আর বাবার মধ্যে খুব ঝগড়া। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না।

দীপনাথ একটু মুশকিলে পড়ে যায়। কারও হাঁড়ির খবরে তার তেমন আগ্রহ নেই। তার ওপর এই বাচ্চা ভাইপোটার মুখ থেকে পাকা পাকা কথা শুনতে তার ভাল লাগে না। কিন্তু এ বাড়ির আবহাওয়া যে খুব পরিশ্রুত নয় তা সে জানে। যদি এদের জন্য কিছু করা যেত!

দীপ বলল, ঝগড়া নয়। মা-বাবার মধ্যে ওরকম একটু-আধটু হয়েই থাকে।

সজল মাথা নেড়ে বলে, আমার বন্ধুদের মা-বাবার মধ্যে ওরকম হয় না তো।

কী নিয়ে তোর মা-বাবার এত ঝগড়া?

মুখে মুখে ঝগড়া হয় না। কিন্তু দু'জনের সম্পর্ক ভাল না। সবাই জানে। বাবা তো এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

তোকে কে বলল?

আমরা জানি। বদ্রীকাকু আছে না, ওই যে লাইনের ওধারে থাকে, সে-ই বলেছে।

বদ্রীটা আবার কে? যা হোক, হবে কেউ। ভাবে দীপ।

সজল বলে, মা একদিন বদ্রীকাকুকে ডাকিয়ে এনে খুব ধমকাল। বদ্রীকাকু নাকি বাবার জন্য চারদিকে জমি খুঁজছিল। জমি পেলেই বাবা চলে যাবে।

ও।

মা অবশ্য বদ্রীকাকুকে এমন ভয় দেখিয়েছে যে আর এদিকে আসে না। ছোটকাকুর মতোই অবস্থা।

কেন, ছোটকাকুর আবার কী হয়েছিল?

বাঃ, ছোটকাকুকে দুটো লোক মিলে মারল না? এখনও কেস চলছে তাই নিয়ে।

সে জানি। তার সঙ্গে তোর মায়ের সম্পর্ক কী?

সেই লোক দুটোকে যে আমি চিনি!

তারা কারা? কী নাম?

বললে মা আমাকে মেরে ফেলবে।

বিরক্তি চেপে দীপ বলে, তা হলে বলিস না।

সজল একটু দ্বিধায় পড়ে। আসলে এই বড়কাকুকে তার ভীষণ ভাল লেগে গেছে। একে সে সব

কথা বলতে চায়। সে তাই চুপি চুপি বলল, এর পরের বার যখন তুমি আসবে তখন চিনিয়ে দেব। ওই ইটখোলার দিকে থাকে।

দীপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, চিনেই বা কী করব? তুই বরং ওসব কাউকে বলিস না। সেই লোক দুটো কি তোর মায়ের লোক?

না তো কী? মদনজেঠুর লোক। মদনজেঠুকে বলে মা ওদের কাজে লাগিয়েছিল।

পুকুরপাড় ছেড়ে সবজিবাগানের ধার ঘেঁষে একটা কুলগাছের ছায়ায় এসে পড়েছিল দু'জন। সবজিবাগানে মুনিশ খাটছে। ভারী সুন্দর ফুলকপি বাঁধাকপি হয়ে আছে। এক ফালি জমি ঘন সবুজ ধনেপাতায় ছাওয়া। কাঁঠালের ডালে মস্ত মৌচাকে গুন গুন শব্দ।

কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্যের ওপর যেন এক বিষণ্ণতার পরদা ঠেলে দিয়েছে কে। দীপ আধখানা চোখে দেখছে। মন অন্যত্র।

সে জিজ্ঞেস করল, তুই খেলাধুলো করিস না?

খুব করি।

কী খেলিস?

ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, সিজনের সময় ফুটবল।

আবার যখন আসব তখন তোর জন্য কী নিয়ে আসব বল তো?

একটা এয়ারগান আনবে? যা দিয়ে পাখি মারা যায়?

পাখি মারবি কেন? টারগেট প্র্যাকটিস করবি!

সরিৎমামা বলেছে আর কিছুদিন পরেই আমাকে আসল বন্দুক চালাতে শিখিয়ে দেবে।

আসল বন্দুক পাবি কোথায়?

জেঠুর বন্দুক থানায় জমা আছে না? মা সেইটে আনাচ্ছে।

বন্দুক দিয়ে তোর মা কী করবে?

আমাদের নাকি অনেক শত্রু।

দীপনাথ হেসে ফেলে। বলে, তাই নাকি?

সজল হাসে না। গম্ভীর মুখ করে বলে, এ জায়গায় কেউ আমাদের দু' চোখে দেখতে পারে না! বিশেষ করে মাকে।

কেন?

সবাই বলে, মা নাকি ভাল নয়।

দীপ গম্ভীর হয়ে বলে, ছিঃ সজল, ওসব কখনও মনে ভাববে না। বলবেও না কাউকে। তোমার মাকে আমি বহুকাল চিনি। উনি খুব ভাল।

আমি তো খারাপ বলিনি। লোকে বলে।

লোকে যা খুশি বলুক, কান দিয়ো না।

তুমি এখানে এসে থাকবে, কাকু? থাকো না, খুব মজা হবে তা হলে। এখানে একটাও ভাল লোক নেই।

আমি যে ভাল তা তোকে কে বলল?

আমি জানি। মাও বলে।

মা কী বলে?

বলে ভাইয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল বড় ঠাকুরপো। সাতে-পাঁচে থাকে না, নিজের মনে আছে।

বলে বুঝি?

তুমি থাকলে এখানকার লোকেরা আমাদের পিছনে লাগবে না।

এখন লাগে বুঝি?

ভীষণ। স্কুলেও আলোচনা হয়। সবাই বলে, আমরা নাকি জেঠুকে ঠকিয়ে সব সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছি। এমনও বলে, মা নাকি জেঠুকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

যাঃ।— বলতে বলতে তারা একটা ডাঙা জমিতে উঠল।

সামনেই মেহেদির বেড়া। তারপর উঠোন। অন্তঃপুর।

আগড় ঠেলে উঠোনে পা দেওয়ার আগে সজল মুখ ফিরিয়ে বলল, আজ দাদুর আসার কথা, জানো?

জানি।

দাদু এলে খুব মজা হবে। আমি দাদুকে যা খ্যাপাই না!

খ্যাপাবি কেন? দাদু বুঝি বন্ধু?

তা নয়। ভাল লাগে। দাদু যে একটুতেই রেগে যায়।

রাগলেই বুঝি রাগাতে হবে?

কথা কইতে কইতে তারা উঠোনে ঢোকে।

মঞ্জু ছুটে এসে দীপনাথের হাত ধরে বলে, উঃ কাকু, ভদ্রমহিলা যা স্মার্ট না!

দীপ একটু হাসে। বলে, তা তো বুঝতেই পারছি। ভদ্রমহিলাকে পেয়ে কাকাকে একদম ভুলে গেছিস। একবার কাছেও গেলি না।

বড় বড় চোখে চেয়ে মঞ্জু বলে, আহা, তুমি তো আসবেই। উনি তো আর আসবেন না। এত সুন্দর কথা বলেন না, কী বলব!

খুব ভাব হয়ে গেছে তোদের?

ভীষণ। আর একটু থাকবে, কাকু?

উপায় নেই রে। লাঞ্চে ফিরে যেতে হবে।

আর কতক্ষণ?

দীপ ঘড়ি দেখে বলে, বড় জোর ঘণ্টাখানেক।

উনি কিন্তু যেতে চাইছেন না।

সে কী?

হ্যাঁ গো। বার বার বলছেন, তোমাদের বাড়িটা আমার খুব ভাল লেগে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছে সারা দিনটা এখানেই কাটিয়ে যাই। থাকবে কাকু সারাদিন?

তাই হয় না কি? চারদিকে খোঁজ পড়ে যাবে। শোন, গাড়ির ড্রাইভারটা বসে আছে, ওকে একটু চা-টা পাঠিয়ে দিস তো।

ওঃ, সে কখন দিয়ে এসেছে মংলু! চা, পরোটা, ডিমভাজা। তোমাদের জন্য মা তাড়াতাড়ি কিমাকারি তৈরি করছে।

ওরে বাবা, এখন ওসব খেলে লাঞ্চ খাব কোন পেটে?

পারবে। এসো না আমাদের ঘরে। মণিদি কীরকম গল্প করছে দেখে যাও।

দীপনাথ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, দূর পাগলি। মেয়েমহলে পুরুষদের যেতে নেই। তুই বরং ওঁকে গিয়ে বল, হাতের ঘড়িটার দিকে যেন একটু নজর রাখে।

দাদুর সঙ্গে দেখা করে যাবে না? আজ ছোটকাকু দাদুকে নিয়ে আসবে যে!

আজ যদি দেখা না হয় তবে অন্য দিন আসব।

সজল গেল না। মঞ্জু দৌড়ে চলে গেল মণিদীপার গল্প শুনতে। দীপ আনমনে চিন্তা করে, মণিদীপা ওদেরও কমিউনিজম বোঝাচ্ছে না তো!

রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দীপনাথ ডাকল, বউদি!

তৃষা দারুণ সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে কিমা রান্না করছিল। দুটো বিশাল চোখে ফিরে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, অন্যের বউ নিয়ে টানাটানি না করে নিজে একটা বউ জুটিয়ে নিলেই তো হয়।

ভীষণ বিব্রত বোধ করে লাল হয়ে গেল দীপনাথ। বলল, যাঃ, কী যে বলো!

অন্যের বউটি অবশ্য সাংঘাতিক স্মার্ট। সুন্দরীও।

তাতেই বা আমার কী?

তৃষা রান্নার ভার বৃন্দার হাতে ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বলে, এসো, আমার ঘরে বসবে।

দীপনাথ তৃষার পিছু পিছু এসে যে ঘরটায় ঢোকে সেটাতেই এক সময় বড়দা মল্লিনাথ থাকত। চমৎকার পাকা ঘর। আবলুস কাঠের দেয়াল-আলমারি, বন্দুকের স্ট্যান্ড থেকে এইচ এম ভি-র বাক্স গ্রামোফোনটি পর্যন্ত এখনও সযত্নে সাজানো। বিশাল একখানা চিত্র-বিচিত্র খাট। একপাশে টেবিল। হল্যান্ডের ফিলিপস রেডিয়ো।

দীপনাথ বহুকাল বাদে এই ঘরে এল। তৃষা বলল, অবশ্য রংটা আমার মতোই।

কার রং?— দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

মণিদীপার। তোমার বন্ধুর বউ নাকি?

বন্ধু নয়। বস। ওপরওয়ালা।

বস মানে জানি মশাই, বাংলা করে বলতে হবে না।

দীপ হাসে। বলে, আমি আনিনি। উনিই আসতে চাইলেন।

আজকালকার মেয়েদের কোনও জড়তা নেই। লজ্জা-টজ্জাও কম। আমরা হলে পাঁচটা কথা উঠে পড়ত।

কথা ওঠার ব্যাপার নয় বউদি। দিনের বেলায় সামান্য আউটিং। দোষের কিছু দেখলে নাকি?

তৃষা মাথা নেড়ে বলে, দোষের কী দেখব আবার, তবে একটা জিনিস দেখে একটু মজা পেয়েছি।

কী সেটা?

মেয়েটা দু'-পাঁচ মিনিট পর পরই তোমার খোঁজ করছে। উনি কোথায় গেলেন? দূরে যাননি তো? উনি যদি চা খান তা হলে আমিও খাব।

দীপনাথ আবার লাল হয়। বুকের মধ্যে এমন একটা শিরশিরানি ওঠে যে গাঁয়ে কাঁটা দিতে থাকে।

॥ আঠারো ॥

তৃষা দীপনাথকে বসিয়ে রেখে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই করতে গেল বোধহয়।

মল্লিনাথের এই ঘরখানায় বসে হারানো বহু স্মৃতিই মনে পড়ার কথা। আশ্চর্য, দীপনাথ একবারও মল্লিনাথের কথা ভাবল না! তার শরীর বার বার কাঁটা দিল এক শিহরনে। মণিদীপা তার খোঁজ করছে।

সত্য বটে দীপনাথের ভিতরে এক সময় ইস্পাত ছিল। তাদের সব ভাইবোনের মধ্যেই কিছুটা করে আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে মেজদা শ্রীনাথ। কিন্তু দীপনাথের সেই ইস্পাতই বা কোথায় গেল?

ভিতর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্য এক দীপনাথ বলল, জং ধরে গেছে হে!

দীপনাথ বলল, অত সস্তা নয়। আমি সহজে হার মানি না।

হার মেনেছ কে বলল? বরং তথ্য বিশ্লেষণ করে একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, তুমি জয় করেছ! হার মেনেছে অন্য পক্ষ।

ইয়ারকি নয়। আমি কারও প্রেমে পড়িনি।

তাও বলা হচ্ছে না। ঘুরিয়ে বলতে গেলে অন্য পক্ষই পড়েছে। তাতে তো তোমার দোষ ধরা যায় না।

অন্য পক্ষের দায়-দায়িত্ব তো আমি নিতে পারি না। কে কবে কার প্রেমে পড়বে আর দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবে—

ধীরে বন্ধু, ধীরে। একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবো। মণিদীপার বয়স কত বলো তো?

কে জানে? কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে বোধহয়।

তা এ বয়সে আজকালকার মেয়েদের খুকিই বলা যায়।

যত খুকি ভাবছ তত নয়।

তবু বলছি ততটা পাকেনি এখনও। মনটা কাঁচা আছে। জাম্বুবান স্বামীটার জন্য একটা আনহ্যাপি লাইফ লিড করতে হচ্ছে বলে রাগে আক্রোশে প্রতিহিংসায় মাথাটাও ঠিক নেই কিনা।

মিস্টার বোসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই মহিলাও যে সাংঘাতিক বিপ্লবী।

স্বামী সিমপ্যাথিটিক হলে বিপ্লবটা এমন চাগিয়ে উঠত না মাথার মধ্যে। যাকগে যা বলছিলাম, মিসেস বোসের কাঁচা মাথাটা খাওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। তুমি ছাড়া অন্য কেউ হলেও খেতে পারত।

এই কথায় দীপের একটু অভিমান হল। বলল, তা হতে পারে। তবে মাথাটা আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই।

একেবারেই নেই কি?

মোটেই নেই।

তা হলে বাপু তুমি মুক্ত পুরুষ। অত লজ্জা শরম পাচ্ছ কেন?

আমি মুক্ত পুরুষই।

তবু বলছি, ভিতরকার মরচে-পড়া ইস্পাতে একটু শান দাও। শক্ত হও। নইলে আমও যাবে, ছালাও যাবে। চাকরিও নট, মণিদীপাও নট।

যায় যাক। পরোয়া করি না।

চাকরির পরোয়া করো না করো, মণিদীপার পরোয়া একটু-আধটু করছ, উনিও করছেন। বউদির চোখে ধরাও পড়ে গেছে। এখন বেশ সাবধানে পা ফেলো।

আমার কোনও দুর্বলতা নেই। এই মুহূর্তে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

বলে দীপনাথ খুব বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তেই মল্লিনাথের বার্মা সেগুনের বিশাল আলমারির গায়ে লাগানো খাঁটি বেলজিয়াম আয়নায় তার আপাদমস্তক প্রতিবিম্ব সামনে দাঁড়াল।

ব্যায়াম-ট্যায়াম করে এবং দৌড়ঝাঁপের মধ্যে থেকে তার চেহারাটা হয়েছে গুন্ডা শ্রেণির। খুবই শক্তপোক্ত। লম্বাটে আখাম্বা। মুখশ্রীতে কিছু রুক্ষতা সত্ত্বেও বংশগত লাবণ্য কিছু রয়ে গেছে। চেহারাটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সে। বেশ খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে মন থেকে এক বিচারপতি রায় দিল, এই চেহারার পুরুষ মানুষের প্রেমে পড়তে কোনও মেয়েরই বাধা নেই।

ভালই গো ভালই। অত দেখতে হয় না নিজেকে।— বলে তৃষা পিছন দিকে একটা টুলের ওপর খাবারের রেকাবি রাখল।

খুবই চমকে গিয়েছিল দীপনাথ। হেসে ফেলে বলল, চেহারা নয়। আয়নাটা দেখছিলাম। খাঁটি বেলজিয়াম গ্লাস।

তৃষা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ, আজকাল আর এসব জিনিস পাওয়া যায় না।

দীপনাথ আবার একটু অস্বস্তিতে পড়ে। জিনিসটা বড়দার। বউদি আবার ভাবল না তো, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসব জিনিসের ওপর দাবিদাওয়া রাখছি?

সে তাড়াতাড়ি বলল, অত সব কী এনেছ? লাঞ্চ আছে যে!

তৃষা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, এসে থেকেই তো বাপু কেবল শুনছি লাঞ্চ আর লাঞ্চ। ওসব সাহেবি কেতার লাঞ্চ কী রকম হয় তা একটু-আধটু জানি বাপু। ওখানে তুমি কম খেলে না বেশি খেলে, ফেললে না রাখলে তা কেউ খেয়ালও করবে না। এসব আমাকে শিখিয়ো না।

কথাটা ঠিক। দীপনাথ যদি বুফে লাঞ্চে একটা পদ নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে তা হলেও কেউ লক্ষ করবে না। তা ছাড়া লাঞ্চের আগেই সকলে নিরাপদ রকমের মাতাল হয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। তাই সে প্লেটের সামনে বসে বলল, তা বটে। খেয়াল ছিল না।

তৃষা মুখ টিপে হেসে বলে, ভেবো না, উনিও পেট ভরে খেয়েছেন। লাঞ্চ নিয়ে মণিদীপার একটুও মাথাব্যথা নেই। এমনকী যেতে চাইছেন না।

সর্বনাশ! না গেলে পরস্ত্রী হরণের দায়ে পড়ে যাব, বউদি।

পড়ে যাবে কেন ভাই? পড়ে অলরেডি গেছ।

তার মানে?

ভাল চাও তো এদের কনসার্নে চাকরি আর কোরো না।

দীপনাথ আবার লাল হয়ে একটা লুচি ছিঁড়ে দুই টুকরো করে বলে, তুমি না একদম বাজে।

তৃষা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, তুমিই বা কেন এরকম কিম্ভূত? দেশে কুমারী মেয়ের তো অভাব নেই, তবে এই কচি বউটার মাথা খেয়ে বসে আছো কেন?

দীপনাথ এবার স্পষ্টতই একটু বিরক্ত হয়। তেতো গলায় বলে, এ যুগটা তোমাদের যুগের মতো নয় বউদি। এখনকার মেয়েরা অত সহজে প্রেমে পড়ে না। মণিদীপার তুমি কী বেহেড অবস্থা দেখলে?

তৃষা হেসে ফেলে বলে, ঠাট্টা বোঝো না, তুমি কেমন হয়ে গেছ বলো তো!

ঠাট্টা! হতেও তো পারে। দীপনাথ আবার লাল হয়। বলে, বসের বউ নিয়ে ইয়ারকি নয়। কানে গেলে সর্বনাশ।

তৃষা নীরবে একটু হাসে। বলে, প্রেমে পড়েছে এমন কথা কিন্তু একবারও বলিনি। বরং বলছিলাম, বসের বউকে ভাল জপিয়ে নিয়েছ। টক করে প্রোমোশন পেয়ে যাবে।

জপিয়েছি তাই বা বলছ কী করে?

ওসব বোঝা যায়।

তবে তুমিই বোঝো যাও।

রাগ করলে নাকি গো!— বলে তৃষা আবার গা জ্বালানো হাসি হাসে। বস্তুত একমাত্র এই দেওরটির কাছেই সে বরাবর একটু তরল। শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়ির আর কারও সঙ্গে তার কোনও ঠাট্টা বা ইয়ারকির সম্পর্ক নেই। দীপনাথকে বরাবরই তার ভাল লাগে। এই এক সংসার-উদাসী মানুষ। বড় ভাল মানুষ। কখনও কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলে না, কারও কাছে কোনও প্রত্যাশাও নেই তার। বিয়ের পর হয়তো বদলে যাবে। বেশির ভাগ ভাল পুরুষই বিয়ের পর সেয়ানা হয়। দীপনাথ যতদিন বিয়ে না করছে ততদিন তৃষার তাকে বোধহয় এইরকমই ভাল লাগবে।

দীপনাথ বলল, না, রাগ করব কেন? অনুরাগের কথাই তো বলছ। তবে তুমি বরাবরই ফাজিল।

তৃষা স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বলে, আমি যে ফাজিল সে শুধু দুনিয়ায় একমাত্র তুমিই বললে! আর কেউ কিন্তু বলে না।

আর সবাই কী বলে তোমাকে?— খেতে খেতে চোখ তুলে দীপনাথ ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

সে অনেক কথা। সোমবাবু তো নাকি বলে, আমি দেবী চৌধুরানি হওয়ার চেষ্টা করছি। এখানকার লোকেও বলে, আমি মেয়ে গুন্ডা, নারী ডাকাত।

বলে নাকি?

শুনি তো।

ঠিকই বলে।— দীপনাথ গম্ভীর মুখে বলল।

তৃষা মৃদু হাসল। বলল, কেন, তোমারও কি তাই মনে হয়?

ডাকাত না হলে ভিলেজ-পলিটিকসের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে পারতে না, বউদি। ডাকাত তো তুমি বটেই।

তোমার মেজদাও আমাকে খুব ভাল চোখে দেখেন না। ওঁর ধারণা আমি ইচ্ছে করে এখানকার লোকেদের সঙ্গে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করছি।

করছ নাকি? সর্বনাশ! লোকাল লোকদের খুব সমীহ করে চলবে। এরা গ্রাম্য হোক, অশিক্ষিত হোক, খেপলে কিন্তু নাজেহাল করে ছাড়বে।

কঠিন হয়ে গেল তৃষার মুখ। ঠাট্টা-ইয়ারকির ভাবটা একদম রইল না আর। বলল, সহজে আপস করি না। করবও না।

দীপনাথ চোখ তুলে বউদির মুখটা একবার দেখে নিয়ে বলল, মামলা-মোকদ্দমা চলছে নাকি?

চলছে।

আচমকাই দীপনাথের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল, সোমনাথকে কারা মেরেছিল জানো?

তৃষা এক ঝলক তাকিয়ে বলল, না। জানলে চুপ করে থাকতাম নাকি?

তা বলিনি। এইটুকু ছোট একটা জায়গায় ক্রিমিন্যাল ধরতে পুলিশের এত দেরি হচ্ছে কেন সেইটেই বুঝতে পারছি না।

সে পুলিশ জানে।

সে তো ঠিকই।— দীপনাথ আবার মাথা নিচু করে। তারপর একটু ধীর গলায় বলে, সজলকে কি এখানেই বরাবর রাখবে?

তৃষা অবাক হয়ে বলে, কেন বলো তো! এখানে রাখব নাই বা কেন?

দীপনাথ বিজ্ঞের মতো বলে, এই পরিবেশটা হয়তো তেমন ভাল নয়, বউদি।

তা তো নয়ই।

তা হলে সজলকে কোনও ভাল স্কুলে দিয়ে দাও। হোস্টেল বা বোর্ডিং-এ রাখো।

তৃষা বোকা নয়। সে স্থির দৃষ্টিতে দীপনাথের দিকে চেয়ে ছিল। বলল, সজলের সঙ্গে তোমার কথা হল বুঝি?

হুঁ।

কী বুঝলে?

বুঝলাম সজল এখানে খুব হ্যাপি নয়। ওকে বাইরে পাঠানোই ভাল।

হ্যাপি নয় কেন? কিছু বলল?

অনেক কিছু বলল। সেগুলো কিছু খারাপ কথাও নয়। তবে বুঝতে পারলাম ওর একটা অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি গ্রো করছে।

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সেটা আমিও মাঝে মাঝে টের পাই, আগে আমাকে যমের মতো ভয় পেত। আজকাল কেমন যেন ভয়ডর কমে যাচ্ছে।

বাইরে পাঠিয়ে দাও। ঠিক হয়ে যাবে।

দেখব।

যদি বলো তো আমিও ভাল বোর্ডিং স্কুল দেখতে পারি।

তৃষা খুবই অন্যমনস্ক ছিল। জবাব দিল না।

রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত সোমনাথ বাবাকে নিয়ে এল না। একটা বেজে গেল। রওনা না হলে নয়।

বিদায়ের সময় বড় ফটকের কাছে বাড়ির সবাই জড়ো হল। সমস্বরে বলল, আবার আসবেন।

খুব অকপটে মণিদীপা ঘাড় হেলিয়ে বলল, আসবই। আমার এরকম একটা স্পট দেখার খুব ইচ্ছে ছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করার বেশ খানিকক্ষণ পর দীপনাথ সাবধানে বলল, একটু দেরি করে ফেললাম আমরা! মিস্টার বোস ভাবছেন।

একটু ভাবুক না! রোজ তো ভাবে না, আজ ভাবুক।

আপনার যা মানায়, আমাকে তো তা মানায় না। দোষটা বোধহয় আমার ঘাড়ে এসে পড়বে।

কেন? আপনার দোষ কিসের? আমিই তো আসতে চেয়েছিলাম।

দীপনাথ একটু শ্বাস ফেলল। সব কথা মণিদীপা বুঝবে না। বোঝানো যাবেও না।

মণিদীপা আবার তার স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষের হাসি হেসে বলে, ইউ আর এ স্লেভ। বণ্ডেড লেবারার। বোসের মতো একজন কাকতাড়ুয়াকেও ভয় পান।

আমিই যে সেই কাক।

মণিদীপা সামান্য ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, কথাটা মিথ্যে নয়। একটা কথা মনে রাখবেন, দীপনাথবাবু, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারও কাছে দাসখত লিখে দিইনি, দেবও না। আমি কোথায় যাব না যাব সেটা আমিই ঠিক করতে ভালবাসি এবং তার জন্য কোনও জবাবদিহি করতে ভালবাসি না।

মণিদীপা যে মোটেই তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েনি সেটা হঠাৎ চোখের দৃষ্টির খর বিদ্যুৎ এবং স্বরের কঠিন শীতলতায় হাড়ে হাড়ে টের পেল দীপনাথ। তার ভিতরে যে প্রত্যাশা, লোভ ও তরল এক রকমের আবেগ তৈরি হয়েছিল তা চোখের পলকে কেটে গেল। সে সচেতন হয়ে নড়েচড়ে বসল। তার পাশে যে মেয়েটা বসে আছে সে মোটেই মেয়েছেলে নয়। একজন দৃপ্ত কমরেড, একজন নির্বিকার বিপ্লবী। যদি কারও প্রেমে কখনও পড়ে থাকে মণিদীপা তবে সে দীপনাথ নয়। সেই ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা একজন স্কুলমাস্টার, স্নিগ্ধদেব।

দীপনাথ কথার তোড়ে একটু কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল। কী বলবে ভেবে না পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাদে বলতে পারল, আমার দাদা-বউদি একটু সেকেলে। আপনার বোধহয়—

মণিদীপা কথাটার জবাব দিল না। বাইরের দিকে চেয়ে শিথিল শরীরে বসে ছিল। মুখ গম্ভীর।

দীপনাথ আর কিছু বলার সাহস পেল না।

বাগানবাড়িতে তাদের অনুপ্রবেশ বিন্দুমাত্র আলোড়ন তুলল না। কেউ জিজ্ঞেস করল না কিছু। শিকারের পার্টি এখনও ফিরেই আসেনি।

দীপনাথ এতক্ষণ মনে মনে এই একটা ভয়ই পাচ্ছিল। বোস সাহেব ফিরে এসে যদি শোনেন—

দীপনাথ নিশ্চিন্ত হল। মণিদীপা গাড়ি থেকে নেমে তাকে কোনও কথা না বলে সেই যে গটগট করে হেঁটে কোথায় চলে গেল তাকে আর দেখতে পেল না সে। খুঁজতেও সাহস হল না। মুহুর্মুহু মেয়েটার মেজাজ পালটে যায়।

দীপনাথ চারদিকে চেয়ে দেখল, দুপুরের রোদে উঁচু সমাজের গৃহিণীরা গাছতলার টেবিল-চেয়ারে শ্লথ ভঙ্গিতে বসে আছেন। দুটো তাসের আড্ডা বসেছে। কয়েকজন পুরুষ আনাড়ির মতো ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করছেন। বেয়ারারা বিয়ারের ট্রে নিয়ে ঘুরছে।

দীপনাথ একটা নিরিবিলি গাছতলা বেছে নিয়ে মাথার ওপর হাত রেখে শুয়ে পড়ল। বউদি অঢেল খাইয়েছে। লাঞ্চে সে আজ আর কিছু খাবে না। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছিল সে।

স্বপ্নের মধ্যে মণিদীপা এসে সামনে দাঁড়াল। পিছনে চাবুক হাতে বোস সাহেব। বোস সাহেবের ব্যাকগ্রাউন্ডে মণিদীপাকে আরও কঠিন ও সাংঘাতিক দেখাচ্ছে।

মণিদীপা বলল, দীপনাথবাবু।

দীপনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলল, জানি।

কী জানেন?

আপনি আমাকে অপমান করবেন এইবার। অপমানটা আমি সবার আগে টের পাই।

কী করে বুঝলেন?

কারণ আমি সবসময়েই অপমানই প্রত্যাশা করি বলে। জীবনে আমি এতবার এত মানুষের অপমান সহ্য করেছি যে, আমাকে আর অপমান করার দরকারই নেই কারও। প্লিজ, আপনিও করবেন না।

যারা কাপুরুষ তারাই অপমানিত হয়। কই, করুক তো স্কুলমাস্টার স্নিগ্ধদেবকে কেউ অপমান! এমন রুখে উঠবে যে যত বড় লোকই হোক না কেন, ওর চোখের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না।

জানি।

স্নিগ্ধর আপনি কতটুকু জানেন?

স্নিগ্ধদেবকে জানি না। কিন্তু চরিত্রবান মানুষদের জানি। তাদের কেউ অপমান করতে সাহস পায় না। ব্যক্তিত্বওলা লোকদের চেনা শক্ত নয়। আপনার চোখের দৃষ্টি দেখেই আমি স্নিগ্ধদেবকে অনুমান করতে পারি। আমি তার চেয়ে বোধহয় অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান, কিন্তু তার জোর অন্য জায়গায়। আমি জানি।

মণিদীপা হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, স্নিগ্ধদেবের জোরটা কোথায় জানেন?

না, বলুন শুনি?

স্নিগ্ধদেব কখনও আমাকে কামনা করেনি। আর করেনি বলেই সে আমাকে কিনে রেখেছে। আর আপনি?

আমি করেছি।— চোখ নামিয়ে দীপ বলল।

আর কী জানেন?

কী?

স্নিগ্ধদেব কখনও তার বসকে খুশি করে জীবনে উন্নতি করতে চায়নি। স্নিগ্ধদেব কখনও টাকা-পয়সায় বড়লোক হতে চায় না। স্নিগ্ধদেব একা বড় হতে চায় না। তাই স্নিগ্ধ অত বড়।

মানছি। আমি বড় নই।

কেন বড় নন?

সারা জীবন আমার কেটেছে বড় ভয়ে-ভয়ে। আতঙ্কে। নৈরাশ্যে। অনিশ্চয়তায়।

স্নিগ্ধরও কি তার চেয়ে বেশি ভয়, আতঙ্ক, নৈরাশ্য বা অনিশ্চয়তার কারণ নেই?

আছে। মানুষ যত বড় হয় তার সমস্যার বহরও তত বাড়ে।

তা হলে? স্নিগ্ধদেব পারলে আপনি পারবেন না কেন?

আমি যে বড় নই।

ওটাও কাপুরুষের মতো কথা।

আমার যে স্নিগ্ধদেবের ট্রেনিংটা নেই। আমার জীবনের তেমন কোনও লক্ষ্যও নেই।

হতাশ হয়ে মণিদীপা বলে, কোনও লক্ষ্যই নেই?

দীপ একটু ভেবে বলে, একটা লক্ষ্য আছে হয়তো। কিন্তু বললে আপনি হাসবেন। আমার জীবনের একটাই লক্ষ্য। একদিন স্বর্গের সমান উঁচু মহান এক পাহাড়ে উঠব। উঠব, কিন্তু চূড়ায় পৌঁছোব না কোনওদিন। পাহাড়ের ওপর উঠলে তাকে ছোট করে দেওয়া হয়। আমি পাহাড়ের চেয়ে উঁচু নই। আমি চাই উঠতে উঠতে একদিন সেই পাহাড়ের কোলেই ঢলে পড়ব।

রোমান্টিক ইডিয়ট। সেন্টিমেন্টাল ফুল।

শুনুন মিসেস বোস, আমার কথাটা একটু শুনুন। যখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি তখন একটা

হারমাদ ছেলের সঙ্গে আমার লড়াই বাধে। খুবই সাংঘাতিক ছেলে। তার নাম ছিল সুকু। সে অসম্ভব ভাল সাইকেল চালাত, ছিল খুবই ভাল স্পোর্টসম্যান। তার গায়ে ছিল আমার দ্বিগুণ জোর। কী নিয়ে তার সঙ্গে আমার প্রথম লেগেছিল মনে নেই। বোধহয় বেঞ্চে জায়গা দখল করা নিয়ে। প্রথমে ছোটখাটো তর্কাতর্কি। একদিন মনে আছে, সে সামনের বেঞ্চে বসে পিছনের ডেস্কে আমার বইয়ের ওপর ইচ্ছে করে কনুই তুলে দিয়ে ভর রেখেছিল। আমি তার কনুই ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। সে নির্বিকারভাবে পিছনে ফিরে আমার বইগুলো টান মেরে নীচে ফেলে দিল। ক্লাসে তখন মাস্টারমশাইও ছিলেন। কিন্তু আমি তার বেপরোয়া নির্ভীক হাবভাব দেখে নালিশ করারও সাহস পেলাম না। কিন্তু ঝগড়াটার শেষ সেখানেও হল না। আমার মধ্যে অপমানবোধ বড় তীব্র কাজ করছিল। পরদিন আমি সকলের আগেই স্কুলে পৌঁছে সুকুর সামনের বেঞ্চে বসলাম এবং মাস্টারমশাই ক্লাসে আসার পর ইচ্ছে করেই সুকুর বইয়ের ওপর কনুই তুলে দিলাম; কী হল জানেন? সুকু তার বইগুলো এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল। আমি পিছনে হেলে ধড়াস করে ডেস্কে ধাক্কা খেলাম। ডেস্কের তলা দিয়ে সুকু একটা লাথিও মেরেছিল কোমরে। সেদিনও কিছু বলিনি ভয়ে। কিন্তু ক্লাসে সবাই সুকুর আর আমার ঝগড়ার কথা জেনে গেল। সবাই তাকাত, হাসত, মজা পেত। বলা বাহুল্য, নামকরা স্পোর্টসম্যান বলে সবাই ছিল সুকুরই পক্ষে। এরপর থেকে ক্লাসে প্রায়ই সুকু আর তার কয়েকজন চেলাচামুণ্ডা, আমাকে হাবা বলে ডাকতে শুরু করেছিল। অঙ্ক কষছি, ট্রান্সলেশন করছি, ফাঁকে ফাঁকে শ্বাসবায়ুর শব্দের সঙ্গে কানে আসত, এই হাবা! এমন কিছু খারাপ কথা নয়, এখন বুঝি। কিন্তু তখন পিত্তি জ্বলে যেত শুনে। উলটে কিছু বলতে হয় বলে আমি গালাগাল দেওয়া শুরু করি। প্রথম বলতাম শালা, গাধা, গোরু, এইসব। পরে একদিন বেশি রাগ হওয়ায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, শুয়োরের বাচ্চা। হেডসারের ক্লাস ছিল। উনি চলে যেতেই রাগে টকটকে রাঙা মুখে উঠে এল সুকু। কোনও কথা না বলে আমার জামা ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে কী জোর এক চড় মারল যে তা বলে বোঝানো যাবে না। মাথা ঘুরে গেল চড় খেয়ে। আর চড় খেয়ে যখন আমার বুদ্ধিনাশ হয়ে গেছে তখনই সুকুর সাঙাতরা এসে আমার পরনের হাফপ্যান্ট খুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে এল। সম্পূর্ণ গাড়লের মতো হতবুদ্ধি হয়ে আমি বসে ছিলাম। গায়ে শুধু শার্ট, পরনে আর কিছু নেই। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছে। পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি যেন আর অপমান নেই। দু'হাতে লজ্জা ঢেকে আমি হতভম্বের মতো তখন জানালা দিয়ে বাইরে চাইলাম। সেই প্রথম যেন আবিষ্কার করলাম উত্তরের হিমালয়কে। দেখলাম পৃথিবীর সব তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে কত উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই মহান পর্বত। জানালা দিয়ে সে যেন হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। বিড়বিড় করে বড় অভিমানে আমি বললাম, এরা তো কেউ আমার নয়। এরা বড় যন্ত্রণা দেয় আমাকে। আমি একদিন তোমার কাছে চলে যাব। সেই থেকে, মিসেস বোস, সেই থেকে ওই পাহাড় আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কেউ অপমান করলেই আমি পাহাড়ের কথা ভাবি। কেবলই মনে হয়, আমি একদিন সব ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করে পাহাড়ে চলে যাব। যখন যাব তখন আর কোনও অপমানই আমার গায়ে লেগে থাকবে না।

ঘুমের মধ্যেও দীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিকই কাজ করছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে কলের পুতুলের মতো সোজা হয়ে বসল সে। সূর্যের শেষ একটু আলো গাছের গাঢ় ছায়া ভেদ করে ঘোলা জলের মতো ছড়িয়ে আছে এখনও। লাঞ্চ কখন শেষ হয়ে গেছে!

যে জায়গায় দীপ শুয়ে ছিল সেটা বাগানের শেষ প্রান্তে, একটা পুকুর পেরিয়ে। এখান থেকে কিছুই দেখা যায় না।

প্রচণ্ড শীত করছিল তার। মাটির ওপর শুয়ে থাকায় জামা-কাপড়ে একটা ভেজা-ভেজা ভাব। শুকনো মরা ঘাস লেগে আছে গায়ে।

উঠে সে দ্রুত পায়ে বাড়ির সামনের চাতালে চলে আসে।
দেখে কোনও লোক নেই। একটা গাড়িও নেই। সবাই চলে গেছে।
দীপনাথ একটু হতবুদ্ধি হয়ে যায়। পার্টি সন্ধে পর্যন্ত চলার কথা ছিল। তবে কি সাহেবরা মদ খেয়ে বেশি মাত্রায় বেচাল হয়ে পড়েছিল?
তাই হবে।
রাস্তায় এসে সে দেখতে পায়, একটা ভ্যানগাড়িতে কেটারারের লোকেরা মালপত্র তুলছে।
সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, পার্টি ভেঙে গেল ভাই?
একটা ছেলে খুব সুন্দর করে হেসে বলে, হ্যাঁ! সাহেবরা মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন।
দীপনাথ মনে মনে হিসেব কষছিল। তাকে ফিরতে হবে। কেউ তাকে ফেলে গেছে বলেই তো সে আর পড়ে থাকতে পারে না।
সে বলল, আমি বোস সাহেবের সেক্রেটারি। একটা জরুরি কাজে আটকে পড়েছিলাম। তোমাদের গাড়িতে আমাকে একটু পৌঁছে দাও।
কেটারারের লোকেরা রাজি হচ্ছিল না। সন্দেহ করছে।
পাঁচটা টাকা কবুল করে এবং প্রায় হাতে-পায়ে ধরে অবশেষে জায়গা পেয়ে গেল দীপ। ড্রাইভারের পাশেই। খুব ঠাসাঠাসি চাপাচাপির মধ্যে বসে সে বন্দুকগুলোর কথা ভাবছিল। বন্দুকগুলো ঠিকঠাকমতো ওরা নিয়ে গেছে তো? ফেরার সময়ে বন্দুকগুলো ধরে বসে ছিলই বা কে?

৷৷ উনিশ ৷৷

তুমি বেলুন ফোলাবে? না, না, কখনও নয়! কখনও নয়!— বলে বিলু তেড়ে এল।
বেলুন-ধরা রোগা হাতখানা বিলুর নাগালের বাইরে সরিয়ে নিয়ে প্রীতম একটু ছেলেমানুষের হাসি হেসে বলল, পারব। দেখো, ঠিক পারব।
পারলেই কী? রোগা শরীরে যদি শেষে না সয়?
কিছু হবে না। লাবুর জন্মদিনে আমার তো কিছু করার সাধ্য নেই। এটুকু করতে দাও।
অনেকগুলো চোপসানো বেলুন দু' হাতের আঁজলায় নিয়ে লাবু একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। বিকেল হয়ে এসেছে, তবু কেউ বেলুনগুলো ফোলাচ্ছে না দেখে তার একটু দুশ্চিন্তা হয়েছিল বলে সে শেষ পর্যন্ত বাবাকে এসে ধরেছিল, বেলুনগুলো একটু ফুলিয়ে দেবে, বাবা? সবাইকে বলেছি, কেউ শুনছে না। কিন্তু বাবার যে বেলুন ফোলানোও বারণ তা সে বুঝতে পারেনি।
বিলু মেয়ের দিকে ফিরে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল, বেলুন ফোলানোর জন্য আর লোক ছিল না? কে তোকে বাবার কাছে আসতে বলেছে?
লাবু ভয়ে কাঁটা হয়ে বলে, বিন্দুদিকে বলেছিলাম। দিল না তো! তুমিও দিচ্ছ না।
তাই বাবার কাছে আসতে হবে?
প্রীতম গম্ভীর স্বরে বলে, ওকে বকছ কেন? ও কী বোঝে?
বিলুও বোঝে না। ওর যখন রাগ হয় তখন ও কিছুই বুঝতে চায় না। না যুক্তি, না ভাল কথা। একনাগাড়ে তখন কেবল নিজের ঝাল ঝেড়ে যায়। লঘু অপরাধে লাবু প্রায়ই অত্যন্ত গুরু দণ্ড ভোগ করে। প্রীতমের সে বড় জ্বালা। তার চেয়ে লাবুর জন্ম না হলেও বুঝি ভাল ছিল!
বিলু প্রীতমের দিকে চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, খুব বোঝে। তুমি ওর হয়ে একদম কথা বলবে

না। সারাদিন আমি ভোগ করছি, শাসন করার অধিকারও আমার হাতেই ছেড়ে দাও।

প্রীতম মৃদু স্বরে বলে, আজকের দিনটা যাক। আজ ওর জন্মদিন।

বিলু মেয়েকে নড়া ধরে সরিয়ে নিতে নিতে বলল, ছেড়ে দিয়ে দিয়েই তো এরকম বেয়াড়া হয়ে উঠেছে।

প্রীতম বালিশে শরীরের ভর ছেড়ে দিল। চোখ বুজল। শরীরে তেমন কোনও ক্লান্তি নেই, কিন্তু এই ছোট্ট ব্যাপারটায় মনটা চুমকে গেল।

বাঁ হাতে ধরা বেলুনটাকে বার বার আঙুলে নিষ্পেষিত করল সে। স্থিতিস্থাপক রবার তার শক্তিহীন আঙুলের ফাঁকে লুকোচুরি খেলল কিছুক্ষণ।

লাবুর আজ তিন বছর পূর্ণ হল। তখন ডিসেম্বরের শেষ। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই লাবু একটা কিন্ডারগার্টেনে পড়তে যাবে। বিন্দু ওকে পৌঁছে দেবে, আবার নিয়ে আসবে ছুটির পর। তারপর একদিন একা একাই স্কুলে যাবে লাবু। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরবে। তখন প্রীতম কোথায়?

আমি তখন কোথায়? এ কথা ভাবতে গিয়েই বোধহয় প্রীতমের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর ওত পেতে থাকা জীবাণুরা কোলাহল করে ওঠে শরীর জুড়ে। তারা এই সব দুর্বল মুহূর্তগুলির জন্যই তো অপেক্ষা করে থাকে!

প্রীতম বিপদের গন্ধ পেয়ে টপ করে চোখ খোলে। বালিশ থেকে মাথা তুলে চারদিকে চায়। বলে, ভাল আছি। ভাল আছি। খুব ভাল আছি। কিছু হয়নি আমার।

বলতে বলতে হাতের বেলুনটা মুখে নিয়ে এক ফুঁয়ে টনটন করে ফুলিয়ে তোলে সে। তারপর ডাকে, লাবু! লাবু!

লাবু প্রথমে সাড়া দেয় না। আরও কয়েকবার ডাকে প্রীতম।

লাবু খুব মৃদু, ভিতু পায়ে পরদাটা সরিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরে ঢুকে চৌকাঠের কাছেই দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে।

বিছানায় ডিমসুতো রেখে গিয়েছিল লাবু। বেলুনের মুখটা বেঁধে ফেলতে পারল প্রীতম। একগাল হেসে বেলুনটা লাবুকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, হয়নি?

লাবুও ছোট ছোট ইঁদুরের মতো দাঁত দেখিয়ে হাসল।

প্রীতম বলল, সব বেলুন নিয়ে এসো, ফুলিয়ে দিই।

মা জানলে?

জানুক। তুমি আনো তো!

অধৈর্যের গলায় বলে প্রীতম। এক্ষুনি কোনও কাজ নিয়ে তার ব্যস্ত হয়ে পড়াটা দরকার। শরীরের ক্ষিপ্ত জীবাণুরা আফ্রিকার নরখাদকের মতো মৃত্যু-নাচ নাচছে।

লাবু চোখের পলকে পাশের ঘর থেকে আঁজলা করা বেলুন নিয়ে এসে প্রীতমের বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে বলে, মা বাইরে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি করো, বাবা।

মেয়ের সঙ্গে একটু বোঝাপড়ার চোখাচোখি হয় প্রীতমের। দু'জনেই একটু হাসে।

একটা বুটিদার হলুদ বেলুন ফুলিয়ে দিয়ে প্রীতম বলে, তোমার মা কোথায় গেছে?

মিষ্টির দোকানে। অর্ডার দেওয়া ছিল, নিয়ে আসতে গেছে। তুমি দেরি কোরো না।

প্রীতম দেরি করে না। যথেষ্ট দম পাচ্ছে সে। বুকভরা অফুরন্ত বাতাস। মুহুর্মুহু ফুঁয়ে সে বেলুনগুলি ফুলিয়ে তুলছে। আপনমনে হাসছেও সে। এ যেন এক অদ্ভুত জীবনমরণের খেলা।

মা আসছে কি না বারান্দায় গিয়ে দেখি, বাবা?

দেখো। আসতে দেখলেই একটা টু দিয়ো।

আচ্ছা। — বলে লাবু ছুটে ঝুলবারান্দায় চলে যায়।

আজ তিন বছর পূর্ণ হয়ে গেল লাবুর। কেমন যেন বিশ্বাস হয় না। তিন-তিনটে বছর যেন মাত্র কয়েক মাস বলে মনে হয়।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে এক বিকেলে জগুবাজারে বিলুকে নিয়ে দু'-চারটে জিনিস কিনতে বেরিয়েছিল প্রীতম। বিলুর তখন দশমাস চলছে। যে-কোনওদিনই বাচ্চা হতে পারে। নার্সিং হোম ঠিক করা ছিল। ঘন ঘন চেক-আপ চলছিল।

জগুবাজারে এক মনোহারি দোকানে কেনাকাটা করার সময় বিলু হঠাৎ তার কানে কানে বলল, বাড়ি চলো। আমার শরীর ভাল লাগছে না।

কীরকম লাগছে?

ভাল নয়। চিনচিনে ব্যথা।

প্রীতম এক সেকেন্ডও দেরি করেনি। ট্যাক্সি না পেয়ে টানা-রিকশায় বিলুকে তুলে সোজা চলে গেল ডাক্তার বোসের চেম্বারে। বোস তৈরিই ছিলেন। হেসে বললেন, দেরি আছে। তবু এখনই ভরতি করে দেওয়া ভাল। নইলে বেশি রাত হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে।

বাড়ি ফিরে এসে তারা নার্সিং হোমে যাওয়ার জন্য গোছগাছ করতে বসল। কিন্তু নিরেট অনভিজ্ঞতার দরুন কী লাগবে না লাগবে তা না জেনে সুটকেস বোঝাই করছিল শাড়ি আর ব্লাউজ আর কসমেটিকসে। বিলু একটু পরেই হাঁফিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রীতম তখন বেডিং বাঁধছে। পাশের ফ্ল্যাটের মাদ্রাজি পরিবারের এক বুড়ি এসে তখন সহজ বাংলায় বিলুকে বললেন, তুমি এখন কেবল হাঁটাচলা করতে থাকো, একটুও বসবে না। তারপর প্রীতমকে ধমকে বললেন, নার্সিং হোমে বিছানা আছে। তোমাকে বেডিং নিতে কে বলেছে? সুটকেসে পাউডার-ক্রিম-ফাউন্ডেশন দেখে বুড়ি হেসেই খুন। বললেন, নার্সিং হোমে যা লাগে তা হল প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার ন্যাকড়া। যত পারো ছেঁড়া কাপড় নাও। আর পরবার জন্য দামি শাড়ি কক্ষনও নেবে না, নার্সিং হোমের জমাদারনি, আয়া, ঝি-রা সব নিয়ে নেবে।

সন্ধে সাতটা নাগাদ বিলু নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে গেল। তখনও ব্যথা-ট্যথা ওঠেনি ভাল করে। একজন সিস্টার প্রীতমকে বললেন, আপনি বাড়ি চলে যান। এখনও অনেক দেরি আছে।

মানুষের আত্মীয়স্বজন কাছে না থাকা যে কত মারাত্মক তা সেদিন হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিল প্রীতম। কেউ কাছে নেই, একটা সান্ত্বনার কথা বলার মতো লোক নেই, আগ বাড়িয়ে সাহায্য করার মতোও কেউ নেই, আছে শুধু পকেটভর্তি টাকা। কিন্তু টাকা দিয়ে কি সব কেনা যায়?

ডাক্তার বোস চিকিৎসক খারাপ নন। স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে নামও আছে। কিন্তু লোকটা অসম্ভব টাকা চেনে। অফিসের এক কলিগই প্রীতমকে ডাক্তার বোসের কথা প্রথম বলেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সে এও বলেছিল, দেখবেন, এ কিন্তু কথায় কথায় সিজারিয়ান করে। সিজারিয়ানে টাকা বেশি তো! আপনি সহজে সিজারিয়ানে রাজি হবেন না।

কিন্তু রাজি হতে হয়ওনি প্রীতমকে। নার্সিং হোমে মাদ্রাজিদের ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। সারা রাত জেগে দুশ্চিন্তা ভোগ করে যখন সকালের দিকে একটু ঘুমিয়েছে প্রীতম, তখনই তাকে জাগিয়ে সেই বুড়ি খবর দিয়ে গেলেন, অপারেশন করে বিলুর বাচ্চা বের করতে হবে। অবস্থা ভাল নয়। বিছানা ছেড়ে কোনও রকমে পোশাক পরে প্রায় মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটেছিল প্রীতম।

নার্সিং হোমে গিয়ে গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না প্রীতমের। বিলুকে ও টি-তে নিয়ে গেছে। তার অবস্থা কীরকম তা কেউই বলতে পারছে না।

কতগুলো সময় আসে যখন মানুষের কিছুই করার থাকে না। তখন তাকে অসহায়ভাবে দর্শকের আসনে বসে থাকতে হয়। তার সামনে তখন যা করার তা করে যায় ভাগ্য বা নিয়তি। প্রীতম নার্সিং হোমের লাউঞ্জে বসে রইল স্থির হয়ে। শরীর স্থির, কিন্তু মনের মধ্যে এক ঘূর্ণিঝড়। বিশাল, ব্যাপ্ত প্রচণ্ড এক সর্বনাশের ভয়। তার ওপর সে একা, একদম একা। বোজানো চোখের পাতা ভিজিয়ে

জল নেমে এল ফোঁটায় ফোঁটায়, বিলুর মৃত্যু সে সহ্য করতে পারবে না। বিড় বিড় করে সে বলল, ওকে বাঁচিয়ে দাও, বাঁচিয়ে দাও। কাকে বলল কে জানে! এমন সময় ডাক্তার বোস এসে কাঁধে হাত রাখলেন।

বিলু তখন হতচেতন। হাতে ছুঁচ, কবজি বাঁধা। আয়া ন্যাকড়ায় জড়ানো রক্তের দলা বাচ্চাটাকে এনে দেখাল। হতবুদ্ধি প্রীতম তখন কী দেখল, কীই-বা বুঝল, তা আজ আর মনে করতে পারে না। শুধু মনে আছে বিলুর হাতে বেঁধানো সেই স্যালাইনের ছুঁচ, ফ্যাকাসে মুখ, মৃত্যুনীল চোখের দুটো পাতা। আর রক্তাভ একটা মাংসের পুঁটলির মতো সদ্যোজাত লাবু। কোনও ভালবাসা, টান, স্নেহ কিছুই বোধ করেনি সেদিন।

কিন্তু তারপর যত দিন গেছে, যত লাবুর চোখ-মুখ স্পষ্ট হয়েছে, যত পাকা হয়ে উঠেছে সে ক্রমে ক্রমে, তত তার দিকে ভেসে গেছে প্রীতম। কিন্তু সে কি তিন বছর? এই তো মোটে সেদিনের কথা!

নিজের কৃতিত্বে খুবই তৃপ্ত হল প্রীতম। মোট পনেরোটা বেলুন ফুলিয়েছে সে। তার মধ্যে অন্তত চারটে বিশাল লম্বা, আর চারটে বিশাল গোল। বিছানা উপচে ফোলানো বেলুনগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছিল। গোটা দুই দুমদাম ফেটেও গেল।

ছুটে এসে লাবু অবাক।

ওমা, কত ক'টা ফুলিয়েছ, বাবা!

প্রীতম গর্বের হাসি হেসে বলে, আরও ফোলাব। তুমি বেলুনগুলো কুড়িয়ে আনো, তোড়া বেঁধে দিই। সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিলে সুন্দর দেখাবে।

কে ঝোলাবে? তুমি?

কে ঝোলাবে সেইটেই প্রশ্ন। প্রীতম একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তাদের যে কেউ নেই। সে, বিলু আর লাবু। ব্যস, এইটুকুতেই তারা শেষ।

প্রীতম বলল, কেউ না ঝোলালে আমিই ঝুলিয়ে দেব।

পারবে?

পারব। চেষ্টা করলে পারা যায়।

মা বকবে না?

বকলে বকবে।

লাবু বেলুন কুড়িয়ে নেয়। খুব যত্নের সঙ্গে অতিকায় বেলুনের তোড়া বাঁধতে বসে যায় প্রীতম। হাত-পায়ের প্রবল আড়ষ্টতা, শরীরের দুর্বলতা, কোনওটাকেই গ্রাহ্য করে না। দাঁতে দাঁত চেপে সে মনে মনে বলে, ভাল আছি। ভাল আছি। কিছুই হয়নি আমার।

এবং পারেও প্রীতম। গোড়ায় গোড়ায় বেঁধে বেলুনের একটা সুন্দর তোড়া তৈরি করে ফেলে সে।

ভীষণ অবাক হয়ে যায় লাবু! স্তম্ভিত হয়ে বাবার হাতের এই শিল্পকর্ম দেখে সে। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে সে বাবার খুব কাছে চলে আসে। এমনকী বাবার ঊরুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে মাথাটা পাঁজরে ঠেকিয়ে বসে লাবু। তারপর বলে, আরও বেলুন আনব, বাবা?

আগে চলো এটা ঝুলিয়ে দিই।

বিন্দুদিকে ডাকি?

ডাকো। ওকে বাইরের ঘরে ফ্যানের নীচে একটা চেয়ার দিতে বলো।

ফ্যানের সঙ্গে বাঁধবে?

হ্যাঁ।

দৌড়ে গিয়ে লাবু বিন্দুকে ধরে আনে।

বিন্দু এমনিতে বেশি কথা বলে না। সারাদিনই সে চুপচাপ। কিন্তু এখন থাকতে না পেরে বলল, আপনি টাঙাবেন? একা বাথরুমে যেতে পারেন না আপনি, টাঙাতে গেলে পড়ে যাবেন যে।

পারব। তুমি চেয়ারটা একটু ধরে থেকো।

আমিও ধরব, বাবা।—লাবু বলল।

সবটাই প্রীতমের কাছে লড়াই। সাংঘাতিক এক লড়াই। কোটি কোটি জীবাণুর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ।

শোওয়ার ঘর থেকে বসার ঘরের দূরত্ব তার কাছে এখন কয়েক মাইল। বিন্দু বাইরের ঘরে ফ্যানের নীচে একটা কাঠের মজবুত চেয়ার দাঁড় করিয়েছে। প্রীতম বিছানা থেকে নেমে তার শুকিয়ে আসা দুই থরোথরো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই মনে হয়, পারব না।

বিন্দু পরদা সরিয়ে দেখছিল। সেও বলল, পারবেন না।

প্রীতমের পা দুটো এই কথা শুনেই যেন লোহার শিকের মতো শক্ত হয়ে গেল। বাতাসে হাত বাড়িয়ে অভ্যাসবশে একটা অবলম্বন খুঁজল প্রীতম। পেল না।

একটু টলে গেল সে। তারপর আবার সোজা হল। লাবু আর বিন্দুকে অন্যমনস্ক রাখার জন্য সে খুব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, আজ কাদের নেমন্তন্ন করেছ, লাবু?

পাশের ফ্ল্যাটের ঊষারা সবাই। আর সেজোমামা, অরুণমামা, ছোটমামা আরও অনেক আছে বাবা।

প্রীতম চার-পাঁচ পা এগিয়ে গেল। দরজার চৌকাঠ হাতের নাগালে পেয়ে ধরে ফেলল। বলল, কী কী খাওয়াবে?

মিষ্টি, মাংস, লুচি।

আচ্ছা।—বলে চৌকাঠ পেরিয়ে প্রীতম নিরালম্ব হয়ে আবার কয়েক কদম এগোয়।

পারবে, বাবা?

পারব। ভেবো না।

বিন্দু চেয়ারটা শক্ত করে ধরে। নিচু সিলিঙের আধুনিক ফ্ল্যাট বলে পাখাটাও খুব উঁচুতে নয়। প্রীতম একটু দম নিয়ে ওপরের দিকে চেয়ে স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক করে নিল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চেয়ারে উঠে পড়ল ধীরে ধীরে।

মাথাটা একটু ঘুরছে।

সে বলল, মাংসটা কি বাড়িতেই রান্না হবে?

লাবু বলে, না তো। অরুণমামা বাইরে থেকে মাংস আনবে।

ও। খুব ভাল। আর লুচি?

লুচিও বাইরে থেকে আনা হবে।—এ কথাটা বিন্দু বলল।

ঘরে কিছু হচ্ছে না?

বলতে বলতে প্রীতম চেয়ারের পিঠে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে ফ্যানের বাটিটা ধরেও ফেলে সে।

পারবেন তো?—বিন্দু প্রবল উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করে।

খুব পারব। কাজটা মোটেই শক্ত নয়।

বাবা ঠিক পারবে, দেখো। না, বাবা?

হ্যাঁ মা। এবার তোড়াটা আমার হাতে দাও।

লাবু তোড়াটা বিন্দুর হাতে দেয়। বিন্দু সেটা তুলে ধরে প্রীতমের নাগালে। বুদ্ধি করে প্রীতম তোড়ার গোড়ায় আলগা সুতো রেখেছে। যাতে বাঁধতে অসুবিধে না হয়।

পা দুটো আবার থরথরিয়ে ওঠে যে। হাঁটু ভেঙে ভেঙে আসছে না? মাথাটা বেভুল চক্কর মারছে।

তুমি কবে থেকে স্কুল যাবে, লাবু?

জানুয়ারি ফার্স্ট উইক।

স্কুলটা কেমন?

খুব ভাল, বাবা। ইংলিশ মিডিয়াম।

ও।

বলতে বলতে ফ্যানের একটা ব্লেডের সঙ্গে তোড়ার সুতো জড়িয়ে দিতে পারে প্রীতম।

স্কুলে যেতে তোমার ইচ্ছে করে?

হ্যাঁ-অ্যাঁ!

ভয় করে না? আমার তো ছেলেবেলায় স্কুলে যেতে খুব ভয় করত।

আমার করে না। স্কুলে কত খেলা, গল্প, হইচই।

তোমাদের স্কুল খুব ভাল। আমার স্কুলটা তো ভাল ছিল না।

কেন, বাবা?

আমরা পড়া না পারলে স্কুলে খুব মারত।

আমার স্কুলে মারধর নেই।

সেইজন্যই তো ভাল।

বলতে বলতে দ্বিতীয় সুতোটা জড়িয়ে দেয় প্রীতম। অবাধ্য পা দুটোর থরথরানি সমানে চলছে। মাথাটা অদ্ভুতভাবে ঘুরছে তার। চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে বারবার।

তোমাকে স্কুলে খুব মারত, বাবা?

হ্যাঁ মারত। তবে আমার চেয়েও বেশি মার খেত তোমার সেজোমামা। ভীষণ দুষ্টু ছিল।

ছি ছি! সেজোমামা কাঁদত না?

বেলুনের তোড়া খুবই সুন্দরভাবে সিলিং ফ্যানটাকে ঢেকে ফেলেছে। প্রীতম পারল। ধোঁয়াটে চোখে নিজের এই অসম্ভব দুর্দান্ত কীর্তিটি দেখে একটা বিরাট শ্বাস ছাড়ল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা হঠাৎ কাচের পুতুলের মতো ভেঙে পড়ল তার।

কী হল তা বুঝতেও পারল না প্রীতম। টের পেল চেয়ারটা টাল খেয়ে তাকে নিয়ে পড়ে যাচ্ছে। ঘরের চারটে দেয়াল চোখের ওপর পর পর ঘুরে গেল। তারপর দেখল ঘরের মেঝেটা একশো মাইল বেগে ছুটে আসছে তার দিকে।

আতঙ্কে চিৎকার করছে বিন্দু আর লাবু। নিরালম্ব দুই হাতে বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে পড়ে গেল প্রীতম। হাড্ডিসার শরীর কঠিন শানের ওপর পড়ে ঝনৎকার তুলল।

নীলাভ এক অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ ডুবে রইল সে। চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয়। সে টের পাচ্ছিল, বহু দূরে কারা যেন কথা বলছে। কেউ কি কাঁদল? কিন্তু সেসব তাকে স্পর্শ করছে না। এক অপরূপ নীলাভ অন্ধকারের মধ্যে অগাধ সাঁতার দেয় প্রীতম। ভারী ঠান্ডা, বড় মোলায়েম ভীষণ সুন্দর এই অন্ধকার। কোনও শব্দ নেই। শুধু বিস্তার আছে। সীমাহীন অগাধ অফুরান আকাশের মতো।

আস্তে আস্তে অন্ধকার থেকে আলোয় চোখ মেলল সে। এত আলো যে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। চারদিকটা প্রবলভাবে অর্থহীন। একটা ঘর, আসবাব, কয়েকটা মুখ। কোনও মানে নেই এর। এরা কারা, এসব কী, এ জায়গাটা কোথায়?

কিছুক্ষণ এরকম ধন্দের মধ্যে কাটাবার পর পরিপূর্ণ চেতনায় ফিরে এল প্রীতম।

লাবু বিছানার কাছেই ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে। বিন্দু চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। বিলু হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বুকে। কিন্তু প্রীতম টের পায়, তার শরীরে জীবাণুদের কোলাহল থেমে গেছে। কাছেপিঠে ওত পেতে থাকা মৃত্যুভয়ের বাঘটার গায়ের গন্ধও পাচ্ছে না সে। ভাল হতেই তার সমস্ত মনপ্রাণ ছুটে গেল লাবুর দিকে।

বিলুর দিকে চেয়ে প্রীতম বলল, লাবুকে মারোনি তো? ওর কিন্তু কোনও দোষ নেই।

বিলু প্রীতমের চোখ থেকে অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, একটা থাপ্পড় দিয়েছি। একটু বাইরে যেতে না যেতেই এসব কী কাণ্ড বাঁধালে তোমরা বলো তো? পাগল হয়ে গেছ নাকি সবাই?

প্রীতম মৃদু স্বরে বলে, লাবুর দোষ নেই। ওকে কেন মারলে?

তবে দোষটা কার? বেলুন বেলুন করে এতক্ষণ ও-ই সকলের মাথা গরম করে তুলেছিল।

ও আমাকে বেলুন ঝোলাতে বলেনি। আমি নিজে থেকেই যা কিছু করেছি।

কিন্তু কেন করতে গেলে? এসব বাহাদুরি কাকে দেখাচ্ছিলে?

লাবুর জন্মদিনে আমারও তো কিছু করতে ইচ্ছে হয়।

আমিই তো বেলুন সাজাতে পারতাম।

আমিও তো পেরেছি।

পেরেছ ঠিকই। কিন্তু পড়ে গিয়ে হাডগোড় ভেঙেছে কি না কিংবা আর কিছু হয়েছে কি না তা বুঝতে এখন ডাক্তার ডাকতে হবে।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, দরকার নেই।

তুমি চুপ করে থাকো। দরকার আছে কি না আমি বুঝব।

না, প্লিজ ডেকো না। আজকে আনন্দের দিনে ডাক্তার এলে সব মাটি হয়ে যাবে।

এখন তো আর কিছু করার নেই। ডাক্তারকে ফোন করে দিয়েছি। এক্ষুনি চলে আসবে।

আবার ফোন করো। আসতে বারণ করে দাও। আমার কিছুই হয়নি।

হয়নি কী করে বুঝব?

হঠাৎ প্রবল চেষ্টায় উঠে বসে প্রীতম, এই দেখো, উঠেছি। এই দেখো হাত, এই দেখো পা। বুকে হাত দাও। দেখো, হার্ট ঠিক ঠিক চলছে। দাও না হাত।

বিলু তবু সন্দিহান চোখে চায়। কিন্তু প্রীতমের মুখ-চোখে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। তবু সে বলে, তা হলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে কেন?

ওটা পড়ার ইমপ্যাক্টে। সকলেরই হয়। এখন যাও ডাক্তারকে আসতে বারণ করে দিয়ে এসো।

বলতে বলতে প্রীতম বিলুকে বিছানা থেকে প্রায় ঠেলে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

বিলু বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি।

বিলু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে প্রীতম মেয়ের দিকে চেয়ে একটু বুঝদারের হাসি হাসে। লাবুর কান্না থেমেছে। কিন্তু চোখভরা জল নিয়ে সে ফোঁপাচ্ছিল। বাবার দিকে চেয়ে সেই ফোঁপানি আর চোখের জল নিয়েই গাল ভরে হাসল।

প্রীতম জরুরি গলায় বলে, রঙিন কাগজ নেই? না থাকলে বিন্দু দোকান থেকে নিয়ে আসুক। দরজায় কাগজের শিকলি না টাঙালে কি ভাল লাগে?

লাবু হি-হি করে হাসতে থাকে আনন্দে। হাততালি দেয়।

অগত্যা দোকান থেকে রঙিন কাগজ নিয়ে আসে বিন্দু। কাঁচি আর আঠার শিশি নিয়ে বিছানায় শিকলি বানাতে বসে যায় প্রীতম। লাবু মাছির মতো লেগে আছে গায়ের সঙ্গে। বিলু দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। শুধু খুব থমথমে দেখাচ্ছিল তাকে।

বিলু বুঝবে না, এ শুধু লাবুর নয়, প্রীতমেরও জন্মদিন। বিলু কেন, পৃথিবীর কেউই কোনওদিন বাইরে থেকে টের পাবে না, প্রীতমের ভিতরে এক ধুন্ধুমার কুরুক্ষেত্রে চলছে কৌরব আর পাণ্ডবের লড়াই। আজ সেই লড়াইতে অনেকখানি হারানো জমি দখল করে নিয়েছে প্রীতম। লাবুর সঙ্গে তাই আজ তারও জন্মদিন।

প্রীতমের শিকলি তৈরির অভ্যাস ছিল ছেলেবেলায়। সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেল সে বড় কম সাজায়নি। আবার সেই উত্তাপ ফিরে এল আজ। অল্প সময়ের মধ্যেই সে মস্ত মস্ত শিকলি বানিয়ে

ফেলে। ঘরদোর সাজাতে সাজাতে এসে বিলুও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দেখছে। কিছু বলছে না, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে অবাক হওয়ার ভাবটা স্পষ্টই ফুটে উঠেছে। একবার মুখ ফুটে বলেই ফেলল, আমি তো ভেবেছিলাম তোমার অসুখ বলে এবার লাবুর জন্মদিনটা নমো-নমো করে সারব।

প্রীতম একটু বিবর্ণ হয়ে বলে, আমার অসুখ! না, আমার তো অসুখ নেই। আমি ভাল আছি। শোনো বিলু, লাবুর জন্মদিনে কেবল দোকানের খাবার দিয়ে অতিথিদের বিদেয় করাটা কি ভাল?

তবে কী করব? আমার তো খাবার তৈরি করার সময় নেই।

বেশি নয়, অন্তত একটা কোনও আইটেমে এই ঘরের কর্ত্রীর হাতের ছোঁয়া থাকা ভাল।

বিলু একটা ক্লিষ্ট শ্বাস ফেলে বলে, এখন তো সময়ও নেই। তবু হুকুম করো, করব।

প্রীতম হেসে ফেলে। বলে, দুঃখের সঙ্গে নয়, আনন্দের সঙ্গে যদি করতে পারো তা হলে বলি।

বিলু ক্ষীণ একটু হাসল, ঠিক আছে। আনন্দের সঙ্গেই করব না হয়।

বলছিলাম কী, লুচির সঙ্গে একটু বেগুন ভেজে দাও। অতিথির সংখ্যা তো খুব বেশি নয়। পারবে না?

পারব।

ভারী তৃপ্ত হল প্রীতম। গভীর শ্বাস ছাড়ল একটা। মনে মনে বলল, আজ আমারও জন্মদিন! আমারও জন্মদিন! ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত শরীরে ঝিমুনি এল। বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল প্রীতম।

যখন আবার চোখ মেলল তখন বাইরের ঘরের দরজায় রঙিন শিকলি ঝুলছে, ঘরের এ-কোণ ও-কোণ জোড়া রঙিন কাগজের ফেস্টুন, বেলুনের তোড়া থেকে বহুরঙা আনন্দ ঝরে পড়ছে। বাইরের ঘর গম গম করছে অতিথিদের কলরোলে।

এসো সেজদা।—বলে বিছানায় উঠে বসল প্রীতম। দীপ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বিছানার কাছে বসল।

কেমন আছিস, প্রীতম?

ফাইটিং। জোর লড়াই দিচ্ছি সেজদা।

তোকে একটু ব্রাইট দেখাচ্ছেও।

ভিতরেও খুব ব্রাইটনেস ফিল করছি।

খুব ভাল। খুব ভাল। তোর কোনওদিন খারাপ কিছু ঘটতেই পারে না। তুই বড় ভাল যে।

প্রীতম লজ্জায় লাল হয়ে বলে, বহুকাল আসোনি, সেজদা। ব্যস্ত ছিলে?

ব্যস্ত? তা বলা যায়। আসলে একটা হুইমজিক্যাল লোকের খিদমত করতে হয় তো। মাঝখানে দুম করে আমেদাবাদ, বোম্বে আর হায়দ্রাবাদ ঘুরে আসতে হল বসের সঙ্গে।

বেশ চাকরি তোমার, সেজদা। খুব টুর পাও!

দীপনাথ বিষণ্ণ হেসে মাথা নেড়ে বলল, টুর পাওয়াটা তখনই ভাল লাগে যখন দুশ্চিন্তা থাকে না।

তোমার আবার দুশ্চিন্তা কী? বিয়ে করোনি, দায়দায়িত্ব নেই। ঝাড়া হাত-পা।

অনেক উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় রে, প্রীতম। তুই বুঝবি না।

প্লেট হাতে বিলু খুব ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ঘুম ভাঙল কখন?

এইমাত্র।—প্রীতম হাসিমুখে বলে, বেগুনভাজা কি করেছ, বিলু?

করিনি আবার! কর্তার হুকুম, না করে উপায় আছে? তোমাকে এবার কিছু খেতে দিই। অনেকক্ষণ খাওনি।

দাও।—খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে প্রীতম, সব আইটেম দিয়ো।

বিলু চোখ কপালে তোলে, সব আইটেম মানে? তোমার জন্য স্টু করা আছে, পাউরুটি টোস্ট করে দিচ্ছি।

প্রীতম প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলে, না, না। আমি লাবুর জন্মদিনের নেমন্তন্ন খাব।

বিলু হাসে, তাই কি হয়? ওসব দোকানের জিনিস। তুমি রুগি মানুষ, সইবে কেন?

ফের বিবর্ণ হয়ে যায় প্রীতম, কে বলল আমি রুগি? তাহলে বেলুন টাঙাল কে? শিকলি বানাল কে?

ওঃ! তাই তো! আমার ভীষণ ভুল হয়ে গিয়েছিল।

যেভাবে লাবুকে মাঝে মাঝে ভোলায় ঠিক সেইভাবে প্রীতমকে ভুলিয়ে বিলু বলল, আচ্ছা, তাহলে অল্প করে দেব।

বলে বিলু চলে যায়।

বিলুর যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে দীপ মাথা নেড়ে বলে, বিলুকেও আজ একটু ব্রাইট দেখাচ্ছে।

শুধু তোমাকেই দেখাচ্ছে না, সেজদা।

গোটা দুনিয়াটারই ব্রাইটনেস কমে যাচ্ছে রে প্রীতম, আমি কোন ছাড়!

আমার কাছে পৃথিবীর ব্রাইটনেস একটুও কমছে না, বরং বাড়ছে। দিনে দিনে বাড়ছে। বেঁচে থাকাটাই যে কী ভীষণ আনন্দের তা লোকে বোঝে না কেন বলো তো!

দীপনাথ একটু চুপ করে বসে মিটিমিটি হাসে। তারপর আচমকা বলে, আজকাল যেন বিলুর সঙ্গে তোর একটু বেশি ভাবসাব হয়েছে রে, প্রীতম!

যাঃ, কী যে বলো! আমাদের ভাব আবার কবে ছিল না?

সে ছিল ঠান্ডা ভাব। এখন যেন সম্পর্কটা ফ্রিজ থেকে বের করে উনুনে চড়ানো হয়েছে। বেশ হাতে-গরম!

খুব হাসে প্রীতম। রান্নাঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে উঁচু গলায় বলে, বিলু! বিলু! শুনে যাও সেজদা কী বলছে!

৷৷ কুড়ি ৷৷

হাসিমুখে, স্নিগ্ধ মনে কিছুক্ষণ দীপনাথের দিকে চেয়ে থাকে প্রীতম। বাইরের ঘরে কোনও বাচ্চা বুঝি কচি গলায় ইংরিজি গান গাইছে। বেশ সাহেবি উচ্চারণ। সঙ্গে বোঙ্গো আর মাউথ-অর্গান। মন দিয়ে শোনে প্রীতম। তারপর বলে, ও ঘরে কী হচ্ছে তা আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

দীপনাথ জিজ্ঞেস করল, যাবি?

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, না। থাকগে।

দীপনাথ বলে, নতুন কিছু হচ্ছে না। সেই কেক কাটা, মোমবাতি নেভানো, সাহেবরা যা সব করত আর কী।

বলে একটু হাসে দীপ।

প্রীতমও হাসে। বলে, সাহেবরা দেশ ছেড়ে গেলেও সাহেবদের ভূত তো আর আমাদের ছেড়ে যায়নি সেজদা। আমার জন্মদিনে মা পুজো দিত, পায়েস রাঁধত। আজও তাই করে শুনেছি, আমি কাছে না থাকলেও করে।

থাকগে। তুই এ নিয়ে বিলুকে কিছু বলতে যাস না। তোদের সম্পর্কটা একটু ভাল যাচ্ছে দেখছি। সেটা যেন বজায় থাকে।

ও নিয়ে ভেবো না। আমি কখনও ঝগড়া করি না। তাছাড়া, বিলু যা করে আনন্দ পায় তাই করুক।

বলে প্রীতম ছাদের দিকে চেয়ে একরকম উদাস অভিমান মুখ করে শুয়ে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, তোমার কথা বলো সেজদা, শুনি।

আমার আর কী কথা! নাথিং নিউ।

আমি তোমার কথা মাঝে মাঝেই ভাবি। মনে হয়, তোমার সত্যিই আরও ওপরে ওঠার কথা ছিল। এতদিনে একটা বেশ হোমরাচোমড়া হতে পারতে তুমি। একজন সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করতে পারতে। কিছুই করলে না। কেমন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছো।

দীপ হাসছিল মৃদু-মৃদু। বলল, দুনিয়াটা যে সস্তা নয় তা কি নিজে এতদিনেও বুঝিসনি প্রীতম?

দুনিয়া সস্তা নয় জানি। কিন্তু তোমার যে ভীষণ রোখ ছিল। স্কুলে তুমি কত ভাল ছাত্র ছিলে।

বিলু খুব দ্রুত পায়ে এসে প্রীতমের বিছানায় একটা প্লাস্টিক ফেলে তার ওপর চিনেমাটির বড় প্লেট রেখে বলল, লাগলে বোলো, বিন্দু দেবে।

বলেই বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল বিলু। ওই ঘর থেকে হট্টগোল আর গানবাজনার শব্দ আসছিল কিছুক্ষণ ধরে। বিলু সাবধানে মাঝখানের দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

প্রীতম প্লেটের দিকে তাকাল, কিন্তু নড়ল না।

খা।—দীপনাথ সস্নেহে বলে।

ইচ্ছে করছে না।

এই তো বলছিলি খিদে পেয়েছে।

এইমাত্র খিদেটা চলে গেল।

দীপনাথ মৃদু হেসে বলে, আসলে বোধ হয় কিছু একটা ভেবে তোর মনটা খারাপ হয়েছে।

প্রীতম ক্লিষ্ট একটু হাসে। বলে, তোমার মতো এত ভাল করে আমাকে কেউ চেনে না মেজদা। তুমি খুব সহজেই আমাকে বুঝতে পারো। কী করে পারো বলো তো!

দূর পাগলা!—দীপনাথ উদাস মুখ করে বলে, আসলে তোকে ছেলেবেলা থেকেই দেখছি তো!

তাই হবে।—বলে প্রীতম আবার ছাদের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, তোমার কথা ভেবেই আমার মনটা খারাপ লাগছে সেজদা। তোমাকে এত আনসাকসেসফুল দেখব বলে কোনওদিন ভাবিনি।

তবে তুই কী ভেবেছিলি? এয়ার-কন্ডিশনড চেম্বার? চার হাজার টাকা মাইনে? ফ্লুয়েন্ট ইংরিজি বলিয়ে বাঙালি-মেম বউ নিয়ে পার্টিতে যাওয়া?

প্রীতম উদাস গলায় বলে, হলেই বা দোষ কী ছিল?

দোষ কিছু নয়। তবে সেরকম হলে এই যেমন তোর কাছটিতে এসে বসে আছি এরকম বসতে পারতাম না। বাইরের ঘর থেকেই হয়তো বিদায় নিতাম। নয়তো লাবুর জন্মদিনে আসতামই না। হয়তো লাবুর জন্মদিনের চেয়েও ইমপর্ট্যান্ট কোনও পার্টি থাকত।

তাও মেনে নিতে রাজি আছি সেজদা। আমার কাছে এসে তোমাকে বসতে হবে না, লাবুর জন্মদিনের কথাও না হয় ভুলে গেলে, তবু সাকসেসফুল হও।

এসব কথায় ঠিক হাসি আসে না দীপনাথের। একটু বিষণ্ণ স্বরে সে বলে, তুই আমাকে খামোখা হিরো বানাচ্ছিস। এর চেয়ে বড় কিছু হওয়ার যোগ্যতাই আমার ছিল না। আমি এই বেশ আছি। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, তাই কমপিটিশনও নেই কারও সঙ্গে, আর তাই অযথা উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই। এই একরকম কেটে যাচ্ছে তো।

প্রীতম দীপনাথের মুখের দিকে চেয়ে বুঝল, প্রসঙ্গটা আর বানানো ঠিক হবে না। দীপনাথ সত্যিকারের অস্বস্তি বোধ করছে। সে আবার ছাদের দিকে চেয়ে রইল। তারপর যেন দীপনাথের নয়, খুব দূরের কাউকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার মনে আছে সেজদা, একবার আমার দশ-বারো বছর বয়সের সময় তুমি আমাকে হাকিমপাড়ার রাস্তায় খুব মেরেছিলে?

দীপনাথ প্রথমে জবাব দিল না। স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, হুঁ, তখন তো ছেলেমানুষ ছিলাম।

আমি জানি সেজদা, সে কথা ভাবলে তুমি আজও দুঃখ পাবে। কিন্তু মজা কী জানো?

কী?

মজা হল, তুমি আমাকে মেরে মস্ত এক উপকার করেছিলে। বোধ হয় মার্বেলের জেত্তাল নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া লাগে। তারপর তুমি আমাকে হঠাৎ দুমদাম প্রচণ্ড মারতে শুরু করে দিলে। আশ্চর্য এই যে, তার আগে বা পরে জীবনে আমি কারও হাতে মার খাইনি। স্কুলে নিরীহ ভাল ছেলে, বাড়িতে চূড়ান্ত আদুরে, বড় হয়ে ল-অ্যাবাইডিং সিটিজেন, তাই আমাকে কেউ কখনও মারধর করার স্কোপ পায়নি। একমাত্র তুমি মেরেছিলে। জীবনে ওই একবারই আমি মার খাই।

দীপনাথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সে কথা ভাবলে আজও আমার খারাপ লাগে। তুই-ই বা কেন ওসব ভাবিস? কোন ছেলেবেলার কথা!

প্রীতম হাত তুলে দীপনাথকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ভাবলে আমার দুঃখ হয় না। বরং খুব আনন্দ পাই। ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝবে না। সেই বয়সে তুমি পাড়ায় পাড়ায় মারপিট করে বেড়াতে, ওসব ছিল তোমার জলভাত। আমার কাছে তো তা ছিল না। কেউ আমাকে ঘুসি চড় লাথি মারবে, ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেবে এমন ঘটনা কল্পনাও করতে পারতাম না কোনওদিন। আমার গায়ে ফুলের টোকাটাও লাগেনি তখনও। তুমি যখন মারলে তখন ভয় বা ব্যথার চেয়েও বেশি হয়েছিল বিস্ময়। একজন আমাকে মারছে! ভীষণ মারছে! বীভৎস রকমের মারছে! আমি মার খাচ্ছি! আমার নাক আর দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে। আমি নোংরা ড্রেনের মধ্যে পড়ে আছি! এইসব ভেবে আমি ভীষণ ভীষণ অবাক হয়ে গেছি তখন। আর চোখের সামনে চেনা পৃথিবীটাই তখন হঠাৎ বদলে যাচ্ছে। ঠিক যেন পুনর্জন্মের মতো একটা ব্যাপার। মার খেয়ে প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলেছিলাম। সবাই তাই দেখে হেসেছিল। অপমানে তখন মাথা পাগল-পাগল। পারলে তোমাকে তখন খুন করি। কিন্তু কী হল জানো? অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসে গেল আমার মধ্যে। তুমি জানো না, বড়সড় বয়সেও মাঝে মধ্যে আমি রাতে ঘুমের মধ্যে বিছানায় পেচ্ছাপ করে ফেলতাম। তোমার হাতে মার খাওয়ার পরই সেই বদ অভ্যাসটা একদম চলে গেল। সেই সঙ্গে আমার যে সাংঘাতিক ভূতের ভয় ছিল সেটা অর্ধেকের বেশি কমে এল। খেতে শুতে, জামা-জুতো পরতে আমি সবসময়ে মা বা দিদিদের ওপর নির্ভর করতাম। সেই থেকে সেই নির্ভরশীলতা আর একদম রইল না। মনে মনে ভাবতাম, যে রাস্তার ছেলের হাতে মার খায় তার বাড়ির আদর খাওয়া মানায় না। তার ভূতের ভয় হলেও চলে না। এইভাবে নিজের ওপর আধিপত্য এল। তোমার ওপর শোধ নেব বলে আমি একটা ব্যায়ামাগারে ভরতি হয়ে বহুদিন ব্যায়াম-ট্যায়াম করে মাসলও ফুলিয়েছিলাম। কিন্তু ততদিনে তোমার সঙ্গে আমার খুব গভীর ভাব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মার খাওয়াটা কোনওদিন ভুলিনি। আজ যে আমি একটা অসুখের সঙ্গে লড়াই করতে পারছি তা কী করে পারছি জানো? তোমার সেই মারের জন্য। তোমার হাতের মার আজও আমাকে চাবকে চালায়। বাইরের ঘরে যে বেলুনের থোপা ঝুলছে, দরজায় যে রঙিন কাগজের শিকলি তা আজ আমি নিজে তৈরি করলাম। সেই যে তুমি আমাকে দুনিয়ার সব বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে লড়াই করার দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলে, সেই দমে আমি আজও বহাল আছি সেজদা। নইলে কবে রোগের কথা ভেবে ভেবে শুকিয়ে মরে থাকতাম।

দীপনাথ ম্লান হেসে বলল, কোনওদিন তো বলিসনি এসব!

আজ মনে হল তাই বললাম।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বুঝলাম। কিন্তু এখন তোর বেলুন-টেলুন ফোলাতে যাওয়া উচিত নয়। বিলু আমাকে বলছিল, তুই নাকি কিচ্ছু মানতে চাস না। চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিলি নাকি আজ!

খুব অকপটে বাচ্চা ছেলের মতো হাসে প্রীতম। বলে, ও কিছু নয়। ব্যালান্সটা রাখতে পারিনি।

একটু সাবধান হওয়া ভাল। বেশি বাড়াবাড়ি না-ই করলি।

প্রীতম করুণ মুখ করে বলে, কিন্তু আমি যে ভাল আছি সেজদা। খুব ভাল আছি।

তাই থাকিস।

কিন্তু তুমি কেন ভাল নেই?

আমি!—অবাক হয়ে দীপনাথ বলে, আমি কি খারাপ আছি? বেশ আছি তো! ভালই আছি।

তোমার মুখ দেখে তা মনে হয় না।

দীপনাথ বেখেয়ালে নিজের গালে হাত বোলাল, তারপর খুব বোকার মতো একটু হাসল। বলল, কেন? আজ তো দাড়িটাড়ি কামিয়ে এসেছি। মুখ দেখে খারাপ লাগার কথা তো নয়।

ইয়ারকি মেরো না সেজদা। মনে রেখো, রোগে ভুগলে মানুষের অনুভূতি ভীষণ বেড়ে যায়। তুমি স্নো পাউডার মেখে এসে হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ করতে থাকলেও আমি ঠিক বুঝতে পারতাম যে, তুমি আসলে ভাল নেই।

তখন থেকে কেন যে তুই কেবল টিকটিক করছিস! এমন পিছনে লাগলে আর ঘন ঘন আসব না দেখিস, বহুদিন বাদে বাদে আসব।

প্রীতম একটু অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল, তারপর একেবারে আপাদমস্তক দীপনাথকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করল, তুমি কারও প্রেমে-টেমে পড়োনি তো?

এত চমকে গিয়েছিল দীপনাথ যে, বুকটা ধুকধুক করে উঠল ভীষণভাবে। আর ঠিক সেই সময়ে বাইরের ঘরের ভেজানো দরজাটা কে যেন খুলে ধরল। উন্মুক্ত বোঙ্গো, ব্যানজো আর মাউথ-অর্গানের সঙ্গে মার্কিনি গানের দুর্দান্ত শব্দ এসে তছনছ করতে লাগল ঘর। দীপনাথ কোনওকালেই ভাল অভিনেতা নয়। তার ধারণা, সে যা ভাবছে তা আশেপাশের সবাই টের পেয়ে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোনও গোপন কথাই ঠিকমতো গোপন করতে পারেনি দীপনাথ।

বাইরের ঘরের দরজা ভেজিয়ে বিলু রান্নাঘরের দিকে চলে যাওয়ার পর দীপনাথ মৃদু স্বরে বলল, দূর দূর!

প্রীতম কথাটা বিশ্বাস করল না। কিন্তু তেমনি অদ্ভুত গোয়েন্দার মতো দৃষ্টিতে চেয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল দীপনাথকে। বাস্তবিক তার অনুভূতি আজকাল প্রখর থেকে প্রখরতর হয়েছে। এমনকী সে আজকাল বাতাসে অশরীরীদেরও বুঝি টের পায়। দীপনাথের চোখে মুখে সে আজ একটা হালকা ছায়া দেখতে পাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি বড্ড চঞ্চল, চোখে চোখ রাখতে চাইছে না। প্রীতম আজকাল উকিলের মতো সওয়াল কবতে পারে। তাই সে সহজ সরল পথে গেল না। বলল, তোমার কি আজকাল বকুলের কথা খুব মনে পড়ে?

বকুলের কথা!—একটু যেন অবাক হয় দীপনাথ। বকুলের কথা একসময়ে ভুলে যাওয়া শক্ত ছিল বটে। কিন্তু এখন তো একদম মনে পড়ে না। সে মাথা নেড়ে বলল, কী যে বলিস পাগলের মতো। কোন ছেলেবেলার কথা সব! কবে ভুলে গেছি!

একটুও মনে নেই?

তা মনে থাকবে না কেন? মনে করতে চাইলে মনে পড়ে। এমনিতে পড়ে না।

বকুল কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দর ছিল। একদম রবি ঠাকুরের কোনও উপন্যাসের নায়িকার মতো।

দীপনাথ ম্লান হাসল। বলল, তা হবে। তোর মতো চোখ তো সকলের নেই। আমার অত সুন্দর লাগত না।

তবে ওর সঙ্গে ঝুলেছিলে কেন?

তা সে বয়সে কি আর বাছাবাছি থাকে!

তোমার আর সব ভাল, কিন্তু বরাবরই তুমি একটু চরিত্রহীন ছিলে কিন্তু সেজদা।

বহুক্ষণ বাদে হঠাৎ খুব হোঃ হোঃ করে হাসে দীপনাথ। বলে, চরিত্রহীন! বলিস কী?

একটু ছিলে। হাসলে কী হবে, আমি তো জানি।

কী জানিস?

সাইকেল নিয়ে বাবুপাড়ায় একসময়ে শীলাদের বাড়ির কাছে টহল মারতে। তারপর নজর দিলে রেল-কোয়ার্টারের লাবণ্যর ওপর। তোমাকে সবচেয়ে জব্দ করেছিল কলেজপাড়ার বকুল।

স্মিত হাসছিল দীপনাথ। একটা শ্বাস ফেলল।

প্রীতম বলল, অবশ্য জব্দ করতে গিয়ে বকুল নিজেই জব্দ হয়ে গেল শেষ অবধি।

পাশের ঘরে উৎসব চলছে। এই ঘরে দু'জন মানুষ নিস্তব্ধ হয়ে আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছিল উজানে।

বকুলকে কে যেন শিখিয়েছিল, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে নেই। তার বিষণ্ণ, গম্ভীর, সুন্দর মুখে সবসময়ে একটা অদৃশ্য নোটিশ ঝুলত : আমার দিকে কেউ তাকাবে না, একদম তাকাবে না, খবরদার তাকাবে না।

বকুল নিজেও বোধহয় কোনও ছেলের দিকে তাকায়নি কোনওদিন।

বকুল এমনিতে বাড়ি থেকে বেরোত না কখনও। তবু স্কুলের পথে বা এ বাড়ি ও বাড়ি কখনও যেতে হলে ছেলেরা তো টিটকিরি দিতে ছাড়ত না। কিন্তু বকুল উদাস অহংকারে রানির মতো হেঁটে চলে যেত। যখন কলেজে ভরতি হল তখন কো-এডুকেশনেও তাকে কাবু করতে পারেনি। দীপনাথ তখন কলেজের শেষ ক্লাসে। সে বকুলের হাবভাব দেখে বলত, হাতি চলে বাজারে, কুত্তা ভুখে হাজারে।

দীপনাথ বকুলের প্রেমে পড়েছিল কি না তাতে সন্দেহ আছে। তখন সে ছিল শিলিগুড়ির চালু মস্তান টাইপের ছেলে। দল পাকাত, ইউনিয়ন করত, মেয়েছেলে নিয়ে দেয়ালা করার সময় পেত না।

তবু বকুলকে নজরে পড়েছিল দীপনাথের। ভারী সুন্দরী, ভীষণ শান্ত, অদ্ভুত অহংকারী। কাউকে পাত্তা দিত না। কারও দিকে তাকাত না। এমনকী পাছে তার দিকে কেউ তাকায় সেই ভয়েই বোধ হয় ভাল করে সাজগোজও করত না সে। অত্যন্ত সাদামাটা শাড়ি পরে আসত, মুখে কোনও রূপটান মাখত না, আঁচল জড়িয়ে শরীরটাকে খুব ভাল করে মমির মতো ঢেকে রাখত। নজর থাকত সবসময়েই মাটির দিকে। সাহস করে দু'-চারজন ফাজিল ছেলে তার সঙ্গে নানা ছুতোয় কথা বলার চেষ্টা করেছে, বকুল জবাব দেয়নি।

এই বকুলের সঙ্গে দীপনাথের সেবার লেগে গেল হঠাৎ। ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে কোনও মেয়ের সঙ্গে প্লাস চিহ্ন দিয়ে কোনও ছেলের নাম লেখাটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সর্বত্রই হয়ে থাকে। বকুলের নামও বহুবার ব্ল্যাকবোর্ডে কেউ কোনও ছেলের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে লিখেছে। একদিন সংস্কৃত ক্লাসে প্রফেসর এসে দেখলেন গোটা গোটা অক্ষরে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা : বকুল, তোমাকে আমি ভালবাসি—দীপনাথ চট্টোপাধ্যায়। লেখাটা ডাস্টার দিয়ে মুছবার আগে রসিক অধ্যাপক একটা ছোট রসিকতা করেছিলেন। লেখাটার জন্য বকুল হয়তো কিছু মনে করত না, কিন্তু রসিকতাটার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ ফুঁসে উঠেছিল মনে মনে।

পরদিন ঘটনাটা আর-একটু গড়ায়। বকুল দীপনাথের লেখা একটা কুৎসিত প্রেমপত্র পায়। সেই চিঠিতে আদিরসের ছড়াছড়ি। বকুল এমনিতেও বোধ হয় কিছু প্রেমপত্র পেত। সেগুলোকে পাত্তা দিত না। এই চিঠিটাকে একটু বেশি পাত্তা দিল।

সেদিন সোজা প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে চিঠিটা তাঁর হাতে দিয়ে ভীষণভাবে কেঁদে ফেলল বকুল, দেখুন স্যার, কীসব লিখেছে!

প্রিন্সিপ্যাল অপ্রস্তুতের একশেষ। চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রাখলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন দীপনাথকে।

ইউনিয়নের পান্ডা হিসেবে দীপনাথকে ভাল করেই চিনতেন তিনি এবং অপছন্দও করতেন।

দীপনাথ এলে জিজ্ঞেস করলেন, এই চিঠি তোমার লেখা?

দীপনাথ চিঠিটা পড়ল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল পলকে। এ চিঠি সে লেখেনি। তার রুচিবোধ কখনও অত নীচে নামতে পারে না। তবু হাতের লেখাটা তার চেনা-চেনা ঠেকেছিল বলে চিঠিটা পকেটে রেখে সে অকপটে বলল, না। কিন্তু কে লিখেছে তা খুঁজে বের করতে পারব।

বলে সে বকুলের দিকে ইঙ্গিত করে প্রিন্সিপ্যালকে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই মহিলার প্রতি আমার কোনও দুর্বলতা নেই।

এই কথাটা দীপনাথ তেমন কিছু ভেবে বলেনি, শুধু আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া। প্রকৃতপক্ষেও বকুলের প্রতি তার কোনও দুর্বলতা তো ছিলও না। মেয়েটিকে সে আর পাঁচজনের মতোই সুন্দরী বলে লক্ষ করেছিল মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু শান্ত, শামুক স্বভাবের লাজুক ও অহংকারী বকুল কথাটার মধ্যে কেন সাংঘাতিক অপমান খুঁজে পেল সেই জানে। হঠাৎ সে দিশাহারার মতো দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, মিথ্যে কথা। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

দীপনাথ অবাক হয়ে বলল, কোনটা মিথ্যে কথা?

এ চিঠি আপনার লেখা। কাল ব্ল্যাকবোর্ডেও আপনি যা-তা লিখে রেখেছিলেন। আপনি অনেকদিন আমার পিছু নিয়েছেন। আপনি মিথ্যেবাদী, স্কাউন্ড্রেল!

বলতে বলতে রাগে বুদ্ধিবিভ্রমে, আক্রোশে বকুল হঠাৎ নিজের পায়ের চটি খুলে ছুড়ে মারল দীপনাথের দিকে।

দীপনাথের কপাল খারাপ। চটিটা এদিক-ওদিক না গিয়ে সোজা এসে লাগল তার কপালে।

প্রিন্সিপ্যালের চোখের সামনে এই ঘটনা।

দীপনাথ তেমন কিছু বলেনি। পকেট থেকে চিঠিটা বের করে প্রিন্সিপ্যালকে ফেরত দিয়ে বলেছিল, আমি এ কাজ করিনি। আপনি এনকোয়ারি করে দেখতে পারেন। যদি আমার কথা সত্যি হয় তবে এ মেয়েটির পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করবেন কি? আমি বিচার চাই।

ব্যাপারটা নিয়ে সারা কলেজ এবং শহরেও বেশ একটা হইচই পড়ে গিয়েছিল। ফয়সালা হতেও অবশ্য দেরি হয়নি। চিঠির হাতের লেখা দীপনাথের ছিল না, সুব্রত নামে একটি মিটমিটে ডান ছেলে ওই কাজটি করে দীপনাথকে ফাঁসায়। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাটা কার তা অবশ্য ধরা পড়েনি।

প্রিন্সিপ্যাল একদিন ইউনিয়নের পান্ডা সমেত দীপনাথকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও। আফটার অল একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ বলে একটা কথা আছে। তাকে তোমরা পাবলিক্লি অপমান করলে তোমাদের পৌরুষ বলে কিছু থাকে না।

কিন্তু ইউনিয়নের নেতারা বলল, না জেনে যখন অন্যায় কাজ করেছে তখন পানিশমেন্টও তাকে নিতেই হবে। একজন নির্দোষ ছেলেকে আপনার সামনেই ও চটি ছুড়ে মেরেছে। এ কাজ কোনও ছেলে করলে তো আপনি ছেড়ে দিতেন না!

এই নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা, তর্কাতর্কি হল।

অবশেষে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, বকুলের কী শাস্তি হবে তা লেট হারসেলফ ডিসাইড। মেয়েটির স্বভাব চমৎকার। আমার মনে হয় ওকে সেলফ-ইমপোজড পানিশমেন্ট নেওয়ার স্বাধীনতা তোমাদের দেওয়া উচিত।

এতে দীপনাথ ও তার বন্ধুরা আপত্তি করেনি।

বিকেলের দিকে জানা গেল বকুল নিজের শাস্তি নিজেই ঠিক করে নিয়েছে। সে ছ'মাস খালি পায়ে কলেজে আসবে।

এ পর্যন্ত ঘটনাটা ছিল অপমান, আক্রোশ, বিবাদে ভরা।

কিন্তু বকুল যখন পরদিন থেকে খালি পায়ে কলেজে আসতে লাগল তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল ভারী করুণ।

বকুলের মাথা আরও হেঁট, চোখে-মুখে অহংকারের বদলে নিরুদ্ধ কান্না। মেয়েটাকে প্রায় ভিখিরি করে ছেড়ে দিয়েছিল দীপনাথ। আর তখনই তাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিল।

কিন্তু মফস্‌সল শহরে তখনকার দিনে মেলামেশা বা ভাব করা অত সহজ ছিল না।

মাসখানেক বাদে ভরা বর্ষার একটি দিনে যখন কলেজে ভিড় খুব কম, তখন বারান্দায় হঠাৎ বকুলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল দীপনাথের।

দীপনাথ বলল, বকুল, একটা কথা বলব?

মাথা নত করে বকুল মৃদু স্বরে বলল, বলুন।

আমি ব্যাপারটা মনে রাখিনি। আপনি কাল থেকে আর খালি পায়ে কলেজে আসবেন না। তার দরকার নেই।

বকুল বিনীত এবং দৃঢ় স্বরে বলেছিল, আপনার কথায় তো হবে না।

কেন হবে না! ভিকটিম তো আমিই। আমিই সব অভিযোগ তুলে নিচ্ছি।

তা নিলেও হয় না। পানিশমেন্টটা তো আমি নিজেই নিয়েছি। ডিসিশনটা আমার। সেখানে অন্যের কথায় কিছু যায় আসে না।

দীপনাথ উদ্বেগের সঙ্গে বলল, খালি পায়ে হেঁটে অভ্যাস নেই, শেষে যদি পেরেক-টেরেক ফুটে ভাল-মন্দ কিছু হয় তো লোকে আমাকেই দায়ী করবে যে!

করবে না। এতে আপনার কোনও হাত ছিল না।

শান্ত স্বভাবের আড়ালে বকুলের যে একটি জেদি, একগুঁয়ে, নিজস্ব মন আছে তা হাড়ে হাড়ে টের পেল দীপনাথ। এও বুঝল, এ মেয়েটির সঙ্গে জমানো ততটা সহজ হবে না। বরফ এখনও গলেনি।

বরফ অবশ্য কোনওদিনই তেমন করে গলল না। তবে বকুলের সঙ্গে একটু মাখামাখি করার রাস্তা দীপনাথ অনেক চেষ্টায় করে নিয়েছিল। প্রায়ই দেখা হত তাদের। কথাবার্তা হত।

শেষ পর্যন্ত বুঝি দীপনাথের ওপর একটু টান এসেছিল বকুলের। একদিন বলল, আপনি কি চাকরি-বাকরি করবেন না? বি-এ পাশ করে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছেন যে বড়!

চাকরি করলে কী হবে?

হবে একটা কিছু। আপনি একটা চাকরি জোগাড় করুন তো আগে।

মনে মনে তখন বকুলকে প্রশ্ন করেছিল দীপনাথ, আমাকে বিয়ে করবে বকুল?

মনে মনে বকুলের জবাব এল, হ্যাঁ।

পিসেমশাইয়ের এক চেনা লোকের সূত্র ধরে কৌটোর কারখানায় চাকরি পেয়ে গেল দীপনাথ। কলকাতায় চলে এল।

তারপর যা হয়। চাকরি বাঁচাতে আর কাজ শিখতে হিমশিম খেতে খেতে একদিন বকুল তার মন থেকে বেরিয়ে গেল। বকুলের কী হয়েছিল কে বলবে! সে দীপনাথকে কোনওদিন মনের কথা তেমন করে জানায়নি তো! তবে একজন মিলিটারি অফিসারকে বিয়ে করে সে ইউ পি-বাসিনী হয় বলে খবর পেয়েছিল দীপনাথ। খুব একটা দুঃখ পায়নি তার জন্য।

এখন প্রীতমদের এই ঘরে অনেকখানি উজিয়ে দৃশ্যটা দেখে আবার বর্তমানে ফিরে আসে দীপনাথ। একটা বড় করে শ্বাস ছাড়ে।

প্রীতম বলে, তাহলে বকুল নয়।

দীপনাথ মৃদু ম্লান হেসে বলে, না, বকুল নয়।

তবে কে সেজদা?

কেউ নয়।
আজ নয়, তবে কোনওদিন ইচ্ছে হলে বোলো।
বলার কিছু নেই রে। আজ চলি।
বলে উঠল দীপনাথ।
আবার এসো। তুমি এলে ভাল লাগে।
আসব। তুই ভাল থাকিস।
আমি ভাল আছি। খুব ভাল আছি।
দীপনাথ চলে গেলে প্রীতম খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকে। সে কিছু ভোলে না, সে অনেক কিছু দেখতে পায়, অনেক বেশি অনুভব করে। বিড়বিড় করে সে বলল, তোমার কিছু হয়েছে সেজদা। তুমি ভাল নেই। তুমি কি এমন কারও প্রেমে পড়েছ যে তোমাকে ভালবাসে না?

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই স্কুলে যেতে শুরু করল লাবু। ফেব্রুয়ারিতে বিলু যোগ দিল চাকরিতে। আড়াইশো টাকা মাইনে আর খাওয়া-দাওয়া কবুল করে একজন বেবি সিটার রাখা হয়েছে লাবুর জন্য।
এইসব ঘটনাগুলো বাইরে থেকে দেখতে কিছুই নয়। কিন্তু প্রীতমকে এইসব ছোটখাটো পরিবর্তন বড় গভীরভাবে স্পর্শ করে। বিলু বাড়িতে না থাকলে তার কাছে ভীষণ একঘেয়ে আর ফাঁকা লাগে বাড়িটা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। লাবু যতক্ষণ স্কুলে থাকে ততক্ষণ সে ভিতরে-ভিতরে অস্থির হয়ে থাকে। সবচেয়ে খারাপ লাগে বেবিসিটার মেয়েটিকে। বয়স বেশি নয়, লেখাপড়া জানে, চেহারারও খানিকটা চটক আছে। কিন্তু মেয়েটা খুব অবাক চোখে প্রীতমকে বারবার তাকিয়ে দেখে। কী দেখে মেয়েটি? প্রীতমের অস্বাভাবিক রোগা, শুকিয়ে যাওয়া হাত-পা? প্রীতমের নিরন্তর শুয়ে থাকা? ও কি ভাবে, এ লোকটা আর বেশিদিন বাঁচবে না?
যদি সবসময়ে একজন লোক প্রীতমকে লক্ষ করে তাহলে প্রীতম কীভাবে তার লড়াই করবে? বারবার যে সে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে! চমকে যায় মাঝে মাঝে! অস্বস্তি বোধ করে!
সে একদিন বলেই ফেলল, বিলু, ওকে তাড়াও।
কাকে?
অচলাকে।
কেন? ও কী করেছে?
কিছু করেনি। কিন্তু বাইরের অচেনা একজন সবসময়ে ঘরে থাকলে আমার ভারী অস্বস্তি হয়।
ও মা! তাহলে লাবুকে দেখবে কে?
কেন, বিন্দু!
বিন্দুর যে ট্রেনিং নেই! অচলা ট্রেইনড নার্স। ভাল বেবিসিটার। অরুণের চেনা বলে কম নিচ্ছে। নইলে ট্রেইনড বেবিসিটারের মাইনে কম করেও তিনশো।
প্রীতম জানে, বলে লাভ নেই। সে যত ঘ্যানঘ্যান করবে তত বিলু তাকে খুব ভদ্রভাবে বোঝাবে, রাজি করানোর চেষ্টা করবে। কিছুতেই তবু ছাড়বে না অচলাকে। বিলু ওইরকম। খুব ঠান্ডা আর কঠিন ওর প্রতিরোধ।
প্রীতম তাই হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু তবু তো তাকে বাঁচতেই হবে! সব বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধেই তো তার লড়াই। তাই সে অচলার বিস্ময়কে সহ্য করার নতুন শিক্ষণ নিতে চেষ্টা করে।
শোনো অচলা।
বলুন।
পাখাটা একটু আস্তে করে খুলে দাও। গরম লাগছে।

দিচ্ছি।
তোমার বাড়িতে কে কে আছে?
স্বামী, একটা ছেলে।
তোমার ছেলেকে কে দেখাশোনা করে?
সে এখন বড় হয়েছে। দশে পড়ল। কাউকে দেখতে হয় না।
তোমার যে দশ বছরের ছেলে আছে তা তো মনে হয় না। কত বয়স তোমার?
কত আর হবে! আমার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল।
স্বামী কী করে?
বিজনেস।
এবার একটু শীত-শীত করছে। পাখাটা আর-একটু কমিয়ে দাও বরং।
পাখা তো এক-এ আছে, আর তো কমবে না। তাহলে বন্ধ করে দিই?
দাও। এখন কি গরম পড়েছে?
তা একটু পড়েছে।
তাই বলো, আমারও আজকাল গরমই লাগে।
শীত তো চলে গেল।
বিন্দুকে একটু চা করতে বলবে?
বিন্দু বাড়ি নেই, এ বেলা ছুটি নিয়েছে।
ও। তাহলে থাক।
ও মা! থাকবে কেন? আমি করে দিচ্ছি।
এইভাবে লড়াইটা লড়তে থাকে প্রীতম। বেশ ভালই লড়ে। একদিন অচলার চোখ থেকে কৌতূহল খসে যায়। সে প্রীতমের দিকে আর আড়ে-আড়ে তাকায় না।

॥ একুশ ॥

আপনি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন কেন? এখন তো আর শীতকাল নেই!
শীতকাল নেই? তবে এটা কী কাল?
ফাল্গুনের শেষ। এখন আর শীত কোথায়?
তাই বলো। আমারও কেমন হাঁসফাঁস লাগে আজকাল! চোখে ভাল দেখি না, বাইরে কি রোদের খুব তেজ?
খুব তেজ। কিন্তু চোখে ভাল দেখেন না কেন? ছোট ছেলে তো ছানিটা কাটিয়ে দিতে পারত।
চেয়েছিল কাটাতে। আমিই ভাবলাম, সে ছা-পোষা মানুষ। চোখ কাটাতে খরচ তো কম নয়। আর এ বয়সে চোখ নিয়ে আমি করবটাই বা কী?
চোখ কাটানোর নাম করে টাকা নিয়েছিল সেই গেলবার। শুনি দীপু ঠাকুরপোও টাকা দিয়েছিল। তা হলে কাটাল না কেন?
সে টাকা কি আর রেখেছে? গরিবের সংসার, কবে বোধহয় ভেঙে খেয়ে ফেলেছে।
খুব গরিব নয়। মাইনে তো খারাপ পায় না যতদুর জানি। থাকে অবিশ্যি গরিবের মতো। কিন্তু তা বলে নিজের বাবার চোখের ছানিটা পর্যন্ত কাটাতে নেই? অমন ছেলের কাছে ছিলেন কী করে এতদিন?
না, এমনিতে অযত্ন করত না। ডাক-খোঁজও করত খুব। বউমাটিও ভাল।

ভাল হলেই ভাল। কিন্তু চোখ যখন কাটায়নি, তখন টাকাটা আমাদের ফেরত দিয়ে দিক।

সে কি আর দিতে পারবে? পাবে কোথায়? ওদের সংসারে সারাদিন হা-টাকা যো-টাকা।

আপনার নিজেরও তো কিছু টাকাপয়সা ছিল শুনেছি; সেটাও খুব কম হবে না। সেটাও কি গিয়েছে নাকি?

আমার টাকা!

তা নয় তো কী? কিছু টাকা তো আপনার ছিল। অন্তত পনেরো-বিশ হাজার তো হবেই।

কে জানে! কোথাও আছে বোধ হয়। ডাকঘরে বা ব্যাংকে।

আছে ঠিক জানেন?

মনে নেই। আজকাল ভুলে যাই বড্ড।

শাশুড়ি-মায়ের কিছু গয়নাও ছোট কর্তার কাছে ছিল।

বুলুর কাছে? না, না, বুলুর কাছে থাকবে কেন? গয়না ছিল আমার কাছে।

ছিল মানে? এখন কি নেই?

কথাটা তা নয়। আসলে গয়নাগুলো আমি বউমাকে দিয়েছিলাম তার লকারে রাখতে।

তবেই হয়েছে। বউমা তার লকার বোধহয় আর জীবনেও খুলবে না।

মটরমালা একটা হার কিন্তু দিইনি।

সেটা তবে কোথায়?

সেটা বউমা স্যাকরাকে দেখাতে চেয়ে নিয়েছিল। বেশি দিনের কথা নয়। বলল, ওরকম একটা হার গড়বে। স্যাকরা প্যাটার্নটা দেখতে চেয়েছে।

ফেরত দিয়েছিল?

দিয়েছে বোধহয়। আমার বাক্সটা খুলে দেখো তো! বাঁ দিকে একটা বহু পুরনো সিগারেটের কৌটো আছে। ওপরে কয়েকটা পইতে, তার তলায়।

দেখতে হবে না। ধরেই নিচ্ছি ওটাও নেই।

না, না, দেখোই না ভাল করে। আমি লুকিয়েই রেখেছিলাম।

লুকিয়ে রাখতে গেলেন কেন? চোর-ডাকাত না ছেলের ভয়ে?

ভয়ে ঠিক নয়। তোমার শাশুড়ি যখন মারা যান তখন গলায় ওইটে ছিল। আমি খুলতে চাইনি। ভাবলাম যার জিনিস তার সঙ্গে যাক। সুরবালাকে মনে আছে তোমার?

ও মা। নিজের পিসশাশুড়িকে মনে থাকবে না কেন!

তা সেই সুরবালাই ওটা গলা থেকে খুলে আমার হাতে দিল। বলল, ওটা কাউকে দিয়ো না। এখনও রাঙা-বউঠানের গায়ের তাপ এতে লেগে আছে। সেই থেকে হারটা ছিল। তোমার শাশুড়ির কথা খুব মনে পড়ত বলে হারটা দেখতাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কী যেন বলছিলাম!

বলছিলেন, হারটা লুকিয়ে রেখেছিলেন।

ঠিক তাই। পাছে কেউ চুরি করে সেই ভয়ে। ভেবেছিলাম একেবারে শেষ সময়ে যে সেবা করবে তাকে দিয়ে যাব। সময় করে একবার খুঁজে দেখো তো!

আমি দেখব কেন? আপনার জিনিস আপনিই খুঁজুন। আমার ওতে লোভ নেই। তবে এও জানি, খুঁজলেও পাবেন না।

তবে কি ফেরত দিতে ছোট বউমা ভুলে গেল?

ভুলে যাবে কেন? অত ভুলো মন তো ওর নয়।

তা হলে?

তা হলে আর কী? মনে মনে ওটা ছোট বউমাকেই দান করে দিন।

দান করাই যায়। ছোট বউমা আমার সেবা কিছু কম করেনি।

সেটা করেছে নিজের গরজেই। আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই মাসে মাসে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল যে! আমরা পাঠাতাম। দীপু ঠাকুরপো পাঠাত।

দীপু! বহুকাল দীপনাথকে দেখি না। সে কি তোমাদের এখানে মাঝে মাঝেই আসে?

না, বহুকাল বাদে ওই সেদিন এসেছিল, যেদিন আপনাকে সোমনাথ পৌঁছে দিয়ে গেল এখানে। তাড়া ছিল বলে চলে গেল একটু। সঙ্গে ওর বসের বউ ছিল।

কী করছে এখন?

চাকরিই করছে।

ভাল আছে তো! বহুদিন দেখিনি।

দেখবেন। আসতে লিখে দেব।

তোমাদের এই বাড়িটা খুব ভাল। বেশ খোলামেলা, হাওয়া-বাতাস আছে। আগেরবার দেখে গেছি, তখন এত দালান-কোঠা ওঠেনি।

এসব ঘর পরে হয়েছে।

মল্লিনাথের কি অনেক সম্পত্তি, বউমা?

খুব কম নয়।

আমার ছেলেদের মধ্যে মল্লিনাথই ছিল সবচেয়ে সাকসেসফুল। অথচ দেখো, তারই ভোগ করার কেউ নেই।

কেউ নেই কেন? এই তো আমরা ভোগ করছি।

সে ঠিক কথা। তবে তার নিজের তো কেউ নেই। পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্ছে।

আমরা কি ভূত, বাবা?

তোমাদের কথা নয়। কী মুশকিল! আমার কি বুড়ো বয়সে সব কথা ঠিকঠাক আসে?

বললেন বলেই জিজ্ঞেস করলাম। সোমনাথ কী বলে? আমরাই সেই পঞ্চভূত?

বুলুকে তোমরা দেখতে পারো না কেন বলো তো? সে কিন্তু তার মায়ের খুব আদরের সন্তান ছিল।

বেশি আদর দিয়েছেন বলেই তো এরকম।

ছেলেপুলেরা তো বাপ-মায়ের আদরেরই হয়। তুমি কি আদর দাও না?

দেব না কেন? তবে অন্যায় আদর দিই না।

দীননাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিবিড় চুলে ভরা মাথাটা নাড়ালেন। বললেন, সবাই সেকথা বলে।

কী বলে?

বলে মেজো বউ খুব কড়া ধাতের। তা ভাল, আমরা সে আমলে সত্যিকারের ছেলেপুলে মানুষ করতে জানতাম না। ছেলেরা নিজেরাই যে যার মানুষ হত। এখনকার দিনের মা-বাবারা অনেক বেশি ছেলেপুলের যত্ন করে। তবে শাসনটা তেমন করে না। তুমি অবশ্য করো।

আপনারাও যদি ছেলেপুলেকে শাসন করতেন তবে এরকম হত না।

দীননাথ শঙ্কিত চোখ তুলে বলেন, কীরকম বলো তো? আমার ছেলেপুলেরা কি খুব খারাপ?

ভালও কিছু নয়।

কেউ নয়?

ভাশুর ঠাকুরকে ধরছি না।

দীননাথ খুশি হয়ে আবার মাথা নেড়ে বললেন, মল্লিনাথ ছিল ব্রিলিয়ান্ট। ওরকম ছেলে হয় না।

দীপুও বড় ভাল। আপনার ছেলেপুলেদের মধ্যে এই দু'জন অন্যরকম।

শ্রীনাথ কি খুব সৃষ্টিছাড়া? তাকে এখানে এসে অবধি ভাল করে দেখলামই না।

কখন দেখবেন? সেই সকালে বেরোন, রাত করে ফেরেন। কখনও ফেরেনই না।

ফেরে না? তবে রাতে কোথায় থাকে?

তা কে বলবে?

দীননাথ একটু ভাবেন। বলেন, ওর কি চরিত্র খারাপ?

খোঁজ নিয়ে দেখিনি।

খারাপ হতে দিয়ো না। এখনও আটকাও। স্বামী ছাড়া মেয়েদের কিছু নেই।

আমি ওসব মানি না।

আজকালকার মেয়েরা অবশ্য মানে না। পুরুষগুলোও তো যাচ্ছেতাই। একটা কথা বলব, বউমা?

বলুন।

আমি মরে গেলে বুলুকে একটু দেখো। যত খারাপ ভাবো ও তত খারাপ নয়।

দেখব কী, দেখার আছেই বা কী? সোমনাথ তো আর কচি খোকা নয়। বয়স হয়েছে, বিয়ে করেছে, নিজের এবং অন্যের ভালমন্দ ভালই বুঝতে শিখেছে।

ও ওর মায়ের খুব আদরের ছিল।

তাতে আমার কী? আমি তো মায়ের আদর দিতে পারব না।

তা বলিনি। বলছি, ওর বড় অভাব। ওকে একটু দেখো।

আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝেছি। বোধহয় সোমনাথই আপনাকে এসব বলতে শিখিয়ে দিয়েছে।

দীননাথ একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, যত যা-ই হোক, ওর দাদারই তো সম্পত্তি।

সেটা দাদা বেঁচে থাকতে বুঝে নিল না কেন?

তুমি কি ওকে খুব অপছন্দ করো?

করলেই বা। ওর তাতে কী যায় আসে?

ও তোমারই দেওর।

তা হলেই বা কী? আমাকে তো বউদি বলে ভাবে না। ভাবলে এখানকার লোকদের আমার ওপর খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করত না।

ও কি তাই করছে?

হ্যাঁ।

দীননাথ তাঁর এই বয়সেও প্রচুর কালো চুলে ভরতি মাথাটা চুলকোন দু' হাতে। তারপর বলেন, ওকে কি তুমি লোক দিয়ে মার খাইয়েছিলে?

ও তাই বলে নাকি?

ঠিক তা বলে না। তবে আন্দাজ করে। মরতে মরতে বেঁচে গেছে।

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

দীননাথ তৃষার দিকে গভীরভাবে চেয়ে দেখছিলেন। ভাল দেখতে পান না বলে ভ্রু কোঁচকানো। বললেন, তবে এই কম্বলটা আর গায়ে দেব না বলছ?

না। শীত করলে পাতলা সুতির চাদর গায়ে দেবেন।

চাদর তো নেই।

আপনার যে কিছুই নেই তা আমি জানি। ওসব নিয়ে ভাববেন না। চাদর বিছানায় ঠিক থাকবে।

আচ্ছা। খুব ভাল। তোমার বেশ চারদিকে চোখ।

চোখ ছিল বলে বেঁচে আছি। নইলে চিল-শকুনে খেয়ে যেত। কম্বল দিন, রোদে দিয়ে তুলে রাখব।

থাক না, বিছানাতে আছে থাক। এ কম্বল বিলেতে তৈরি। মল্লিনাথ দিয়েছিল। একটা স্মৃতির মতো।

ভয় নেই বাবা। আমি শমিতা নই যে, নিয়ে ফেরত দেব না।

ওই দেখো, কী কথা থেকে কী কথা!

কম্বলটা দিন। শীত এলে ফেরত পাবেন।

আর শীত কি আসবে আমার জীবনে? এটাই শেষ শীত বোধহয়।

তৃষা কম্বলটা নিয়ে চলে যায়। বিছানাটা একটু ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে দীননাথের। কম্বলটার জন্য বড় উদ্বেগ। নিয়ে গেল, আবার দেবে তো! ঠেকে ঠেকে শিখেছেন, একবার নিলে লোকে আজকাল আর কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

দীননাথ আর শুয়ে রইলেন না। বসে বসে নিজের ছেলেপুলেদের কথা ভাবতে লাগলেন। দীপনাথ মানুষ হয়েছিল বেদবালার কাছে। বেদবালার প্রথম সন্তান বাঁচেনি। তাই দীপুকে নিয়ে গেল। পরে আরও ছেলেপুলে হয়েছিল বটে, কিন্তু দীপুকে খুব বুক দিয়ে মানুষ করেছিল। বলত, দীপ হল আমার মেজো ছেলে।... বিলুর বড় বিপদ চলছে। জামাইয়ের নাকি বাড়াবাড়ি অসুখ!... শ্রীনাথ রাতে ফেরে না মাঝে মাঝে, এ ভাল কথা নয়।... ওদিকে ছোট বউমা কী করছে কে জানে। সোমনাথ বলেছিল, রবিবারে-রবিবারে আসবে। তা কত রবিবার চলে গেল। এল না তো! বউমার কি কিছু হল-টল?

খবর দেওয়া সত্ত্বেও বদ্রী এল না দেখে এক ছুটির দিনে বিকেলে নিজেই তার খোঁজে বেরিয়েছে শ্রীনাথ।

তাড়া নেই। বাজারের কাছটায় মাদারির খেল হচ্ছে, তাই দাঁড়িয়ে দেখল খানিক।

আবার রওনা হওয়ার মুখে পিছন থেকে রঘু স্যাকরা ডাকল, কে, শ্রীনাথদা নাকি?

আরে রঘুবাবু, খবর কী?

কোন দিকে চললেন?

যাই একটু ঘুরে-টুরে আসি।

খবরটা শুনেছেন নাকি?

কী খবর?

আপনার শালাবাবুর নামে যে শচীন সরকারের ভিটেটা কেনা হয়ে গেল।

সরিতের নামে? কে কিনল?

কোনও খবরই রাখছেন না আজকাল।

শ্রীনাথ বিরক্ত হয়ে বলে, ওসব খবরে আমার ইন্টারেস্ট নেই, রঘুবাবু।

রঘু শ্রীনাথের বিরক্তিটা গায়ে মাখল না। খুব জরুরি গলায় বলল, পুকুর আর বাঁশবন সমেত বিঘে সাতেক জায়গা। টাকাও নেহাত কম লাগেনি। বিঘেতে তিন হাজার, তার ওপর পাকা একতলা বাড়িটার জন্য আরও হাজার আষ্টেক। আপনার শালা কি ব্ল্যাক-ট্যাক করে নাকি?

কে জানে কী করে?

সবাই এ নিয়ে খুব গরম। শচীন সরকারের বউয়ের সঙ্গে বিনোদ কুণ্ডুর ব্যবস্থা হয়েছিল বিঘেতে দুই হাজার আর বাড়ির বাবদ পাঁচ। আপনার শালা চড়া দাম হেঁকে কিনে নিল।

তার আমি কী করব?

বিনোদ সহজে ছাড়বে না। টাকাটা কোত্থেকে এল তার খোঁজ নিচ্ছে। বাগে পেলে জেলে ভরে দেবে। বিনোদের এক ভায়রাভাই সার্কেল অফিসার।

দিক। আমি ওসবের মধ্যে নেই।

তা আমরা জানি।

আপনারা মানে?

এ অঞ্চলের সবাই। আমরা বলি, শ্রীনাথ চাটুজ্জে কখনও কারও পাকা ধানে মই দিতে আসে না।

বলে থেমে গিয়ে রঘু গেলাসের ইঙ্গিত করে বলল, চলবে নাকি? এই কাছেই খালধারে আমার একটা ঠেক আছে।

না। কাজে যাচ্ছি।

আপনার বাবা এলেন শুনেছি! ক'দিন থাকবেন?

তা জানি না। আছেন তো এখন।

বাপ-মায়ের মতো জিনিস হয় না। গৃহদেবতা। যত্ন-আত্তি করবেন। ওঁদের আশীর্বাদেই সব।

তা বটে।

সোমনাথবাবু বাবাকে মাথায় করে রেখেছিলেন। ওই হল ছেলের কাজ।

ঠিকই তো।

যাই তা হলে। ডানদিকে এই কাছেই রামলাখন সিং-এর ঘর। চেনেন তো?

না। আসিনি কখনও।

ভাল জায়গা। সব ব্যবস্থা আছে।

কী ব্যবস্থা?

যা চান। সবই চলে ওখানে। দরকার হলে বলবেন।

রঘু খালধারের ধুলোভরতি রাস্তায় নেমে গেলে অনেকক্ষণ ভাবমাভরতি মাথা নিয়ে আনমনে হাঁটে শ্রীনাথ। বাজার পেরিয়ে রেললাইনেব ধারে উঠে হাঁটাপথ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে একটু হাসে শ্রীনাথ। এরা তৃষাকে চেনে না।

তার মায়া হয়। ভাবে রঘু স্যাকরাকে ডেকে বলে দিয়ে আসে, শুনুন মশাই, তৃষা আপনাদের একদিন এখান থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়বে। কোন দিক থেকে ওর মার আসবে তা টেরও পাবেন না।

বদ্রী ঘরে ছিল। ডাকতেই বেরিয়ে এসে খাতির করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

ঘরটা পাকা হলেও ছোট আর গরম। পশ্চিম দিকে খোলা বলে রোদে তেতে আছে।

বদ্রী একটা হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বলল, ক'দিন খুব ঝামেলায় ছিলাম বলে যেতে পারিনি। যাব-যাব করছিলাম।

তুই তো গিয়েছিলি শুনলাম।

কোথায়?— বদ্রী আকাশ থেকে পড়ে।

তৃষা তোকে ডেকে পাঠিয়েছিল না?

বদ্রী হেসে বলে, ওঃ, সে বহুদিন হল।

কেন ডেকেছিল?

রায়পাড়ার একটা জমি বেচতে চাইছেন।

তৃষা জমি বেচতে চাইছে?— শ্রীনাথ খুব অবাক হয়।

তাই তো বললেন।

মিথ্যে বলিস না, বদ্রী। তৃষাকে আমি জানি সে কোনওকালে এক ইঞ্চি জমিও বেচবে না। পারলে সে গোটা অঞ্চল, গোটা দেশ, মায় গোটা দুনিয়া কিনে নেবে।

বদ্রী ফাঁপরে পড়ে বলে, আজ্ঞে, আমি যা জানি তাই বললাম।

তুই চেপে যাচ্ছিস। তৃষা তোকে অন্য কাজে ডেকেছিল।

আজ্ঞে না।

আর তারপর থেকেই তুই আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করেছিস।

বললাম তো, ঝামেলায় ছিলাম খুব। আমার সম্বন্ধীর অসুখ গেল। ছোটাছুটি, ডাক্তারবদ্যি, হাসপাতাল অবধি হয়ে গেল।

তৃষা তোকে কী বলেছে?

আপনার ব্যাপারে কিছু নয়। জমি নিয়েই কথা ছিল।

আমার জন্য যে জমির খোঁজ এনেছিলি তার কী হল?

যেরকম চাইছেন সেরকম পাচ্ছি না।

বলেছিলি দূরের দিকে পাওয়া যাবে।

শেষতক হয়নি। সব জায়গায় হুড়োহুড়ি করে বর্গা রেজিস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে।

ভাল দাম পেলে বর্গা ছাড়া জমিও লোকে বেচবে। আমি তো টাকায় পিছোচ্ছি না।

দেখব। কয়েকদিনের মধ্যেই খবর পেয়ে যাবেন।

না বদ্রী, খবর পাব না। খবর তুই দিবিও না।

আমার তাতে কী লাভ বলুন। খবর দিয়েই তো দু' পয়সা ঘরে তুলি।

তৃষা কি তোকে ঘুষ দিয়েছে?

কী যে বলেন!— বদ্রী জিব কাটে।

লুকোস না। তৃষা কি চায় না যে আমি কোথাও জমি কিনি, চাষবাস করি?

কোন স্ত্রীই বা চায় বলুন? কিন্তু কথাটা তা নয়।

তবে কী?

কথাটা হল, আপনি অন্য জায়গায় যেতে চাইছেন কেন? এদিকে তো আপনার জমিজায়গার অভাব নেই।

জমি কি আমার?

বদ্রী চোখ লুকিয়ে বলে, আপনার ছাড়া আর কার? বউঠান তো আর আপনার পর-মানুষ নন।

এসব কথা তোকে শেখাল কে? তৃষা?

না, না। কী যে বলেন!

বদ্রী, আমি জানি তৃষা তোকে হয় ভয় দেখিয়েছে, নয় তো ঘুষ দিয়েছে।

বদ্রীর মুখটা আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছিল। কেমন অসহায়, ফ্যাকাসে, ভয়ে ভরা।

হাতপাখা রেখে বদ্রী নিচু স্বরে বলে, দোষ ধরবেন না তো? তা হলে বলি।

বল, বদ্রী। আমি কাউকে কিছু বলব না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার জেনে রাখা দরকার।

বউদিকে আমরা ভয় খাই। উনি চোখ রাঙালে সে কাজ করতে ভরসা হয় না।

তা হলে তৃষা তোকে চোখই রাঙিয়েছে?

ঠিক চোখ রাঙানো নয়। বরং ডেকে পাঠিয়ে অনেক মিষ্টি-মিষ্টি কথাই বললেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আপনাকে জমির খোঁজ দিতে পেরেছি কি না।

তুই কি গাড়লের মতো সব বলে দিলি?

না বললেও উনি ঠিকই খোঁজ রাখেন। চতুর্দিকে ওনার চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রমথবাবুর জমি কিনতে চেয়েছিলাম সেকথা প্রমথবাবুই বলে এসেছেন বউদিকে।

তোকে কী বলল তৃষা?

আমার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিয়ে বললেন, উনি এখন অন্য জায়গায় জমি-টমি কিনলে এখানকার সব দেখাশোনার অসুবিধে হবে।

বাজে কথা। আমি এখানকার কিছুই দেখাশোনা করি না।

সে আমি জানি। বউদি যা বললেন তাই বললাম আপনাকে।

তারপর কী হল?

উনি বললেন, আর জমি-টমি তোমাকে দেখতে হবে না। নিজের কাজ নিয়ে থাকো। জমির যদি তেমন কোনও খবর পাও তা হলে আমাকে জানিয়ো। কাছেপিঠে হলে আমরা কিনব।

শ্রীনাথ একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর বদ্রীর দিকে চেয়ে বলল, তুই আমার নিজের লোক ছিলি রে, বদ্রী। তৃষা তোকেও হাত করল।

বদ্রী কাঁচুমাচু হয়ে বলে, আমার দোষ নেই দাদা, ছা-পোষা মানুষ।

শচীন সরকারের ভিটে কেনা হচ্ছে, সে খবর রাখিস?

রাখি। আপনার শালার নামে।

কেন?

ল্যান্ড সিলিং আছে না? জমি কিনে গেলেই তো আর চলবে না। আপনার নামেও বিস্তর জমি কেনা হয়েছে, আপনি কি জানেন?

না তো!— খুব অবাক হয়ে শ্রীনাথ বলে।

হয়েছে।

কিনলেই হল? আমার সইসাবুদ লাগবে না?

আপনার ওকালতনামায় অন্য লোক কিনছে।

ওকালতনামা আমি কাউকে দিইনি তো?

তার আমি কী বলব বলুন? যা জানি তাই বলছি।

জানিস যদি তবে খোলসা করে বল। আমার ওকালতনামা অন্যে পায় কী করে?

পেয়েছে। আমি ভাল করে জানি।

তবে কি বলছিস আমার সইও জাল হচ্ছে আজকাল?

আমি তাই বললাম নাকি? হয়তো কোনও সময়ে দিয়েছেন, এখন মনে নেই।

বাজে কথা বলিস না। আমার এখনও ভীমরতি ধরেনি।

বদ্রী জবাব দিল না। আস্তে আস্তে হাতপাখা নাড়তে লাগল। খুব আস্তে করে বলল, শুধু আপনি নয়। বৃন্দা, মংলু, এমনকী খ্যাপা নিতাইয়ের নামেও বিস্তর জমি কেনা হয়েছে।

সেই যে সেজোকাকা এসে গেছে তারপর থেকে সজলের প্রায়ই খুব সেজোকাকার কথা মনে পড়ে। সজলের হাত ধরেছিল সেজোকাকা। হাতটা দারুণ শক্ত। ধরলেই বোঝা যায় সেজোকাকার গায়ে খুব জোর। অত চওড়া কবজি আর কারও দেখেনি সে।

স্কুলে সে একদিন বন্ধুদের বলল, আমার সেজোকাকা একবার খালি হাতে বাঘ মেরেছিল।

খালি হাতে? যাঃ।

সেজোকাকার গায়ের জোর তো জানিস না। ঘুসি মেরে পাথর ফাটিয়ে দেবে।

তোর সেজোকাকা কুংফু জানে? ক্যারাটে?

ফুঃ। সেজোকাকা যখন শিলিগুড়িতে ছিল তখন একবার সিনেমাহলে মারপিট লাগে। একা পঞ্চাশজনকে মেরে ঠান্ডা করে দিয়েছিল।

গুল ঝাড়িস না।

আচ্ছা, আবার এলে তোদের দেখাব সেজোকাকাকে।

কীরকম দেখতে?

ইয়া লম্বা, অ্যায়সা গুল্লু গুল্লু মাসল্।

বুকের ছাতি কত?

ছেচল্লিশ।

আমার দাদারই তো বাহান্ন।

তোর দাদাকে আমি দেখেছি রে, কমল। মোটেই বাহান্ন হবে না।

তবে কত?

বিয়াল্লিশ হবে বড়জোর।

দাদা কার কাছে ব্যায়াম শেখে জানিস? বিষ্টু ঘোষের আখড়ায়।

জানি। সেজোকাকা আমাকে কুংফু শিখিয়ে দেবে বলেছে। ক্যারাটেও।

আমার দাদাও ক্যারাটে জানেন।

আমার সেজোকাকার মতো নয়।

তোর সেজোকাকা যে বাঘটা মেরেছিল সেটা কত বড়?

দশ ফুট। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। দেখিসনি?

আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজ রাখাই হয় না।

বেরিয়েছিল। আসল রয়েল বেঙ্গল।

তোর বাবার গায়ে কিন্তু একদম জোর নেই।

সজল ফুঁসে উঠে বলে, কী করে বুঝলি?

একদিন দেখি স্টেশনের দিক থেকে আসছে তোর বাবা। চায়ের দোকানে কতকগুলো লোক বসে থাকে না সব সময়? সেই লোকদের একজন চেঁচিয়ে তোর বাবাকে আওয়াজ দিল, ওই যে শ্রীচরণনাথ যাচ্ছে, দেখ দেখ।

বাবা কী করল?

তোর বাবা মাইরি সব শুনতে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালও। তখন সেই লোকটা না— হিঃ হিঃ—

সেই লোকটা কী?

সে যা অসভ্য কাণ্ড না!

বল না!

সেই লোকটা দু'হাতের আঙুল দিয়ে তোর বাবাকে খুব অসভ্য একটা জিনিস দেখিয়ে বলল, যাও যাও, এইটে করো গে।

লোকটা কে?

নাম জানি না। খুব মস্তানের মতো দেখতে।

বাবা কিছু বলল না?

কিছু না। মাথা নিচু করে চলে এল ভেড়ুয়ার মতো।

সজলের গা রি রি করে রাগে। সে বলে, ঠিক আছে, মামাকে বলে দেব।

তোর মামা কী করবে?

মামাকে তো চেনো না। কী করবে দেখো।

যাঃ, যাঃ, তোর মামাকে জানি। ওই তো মহাদেবের দোকানে বসে থাকে বিকেলের দিকে। লোকে বলে বেকার।

মালদায় মস্তান ছিল, জানো না তো!

বাড়িতে ফিরে সজলের নানা সময়ে বারবার কথাটা মনে পড়ে। স্টেশনের কাছে একটা লোক তার বাবাকে আওয়াজ দিয়েছিল।

বাবা যে কেন এরকম তা বোঝে না সজল। সে অবশ্য বাবাকে ভয় পায়। ভীষণ ভয় পায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানে, বাবাকে সে ছাড়া আর কেউ ভয় পায় না। পাত্তাও দেয় না কেউ।

বাবার জায়গায় সেজোকাকু হলে নিশ্চয়ই অন্যরকম হত। যেই মস্তানটা আওয়াজ দিত অমনি সেজোকাকু গিয়ে দুই চটকানে লোকটাকে মাটিতে ফেলে মুখ দিয়ে রক্ত বার করে ছেড়ে দিত। বাবা কেন সেজোকাকুর মতো নয়!

দাদু এসে সজলের কথা বলার আর-একটা লোক হয়েছে। নইলে মা, দিদিদের বা বাবাকে সে নাগালে পায় না কখনও। দাদুকে পায়।

দাদু!
বলো, ভাই।
তুমি সেজোকাকুর ঠিকানাটা জানো?
না। তবে তোমার বাবা বোধহয় জানে। ঠিকানা দিয়ে কী করবে?
চিঠি লিখব। কাকু আমাকে একটা এয়ারগান দেবে বলেছিল।
এয়ারগান দিয়ে কী করবে?
লোককে ভয় দেখাব। আচ্ছা দাদু, সেজোকাকু কি কুংফু জানে?
কী ফু বলছিস?— বলে দীননাথ কানের পিছনে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়েন।
হি হি করে হেসে ফেলে সজল। দাদু এসব জানে না।

॥ বাইশ ॥

রতনপুরে পাঁচখানা নতুন সাইকেল রিকশা চালু হল। পাঁচখানাই তৃষার। মাইল তিনেক দূরে তৃষা খুলেছে হাসকিং মিল। এই পাঁচখানা রিকশা আর মিল অবশ্য তৃষা নিজের নামে করেনি, করেছে সরিতের নামে।

একটা হালকা পলকা সস্তা মোপেড কিনে দিয়েছে সরিৎকে। সে এখন হাসকিং মিল আর রিকশা নিয়ে দিনরাত গলদঘর্ম। প্রথমটাতেই বুঝতে যা একটু সময় লাগে। তারপর আস্তে আস্তে সব কাজেরই একটা বাঁধা ছক দাঁড়িয়ে যায়। তখন আর কষ্ট হয় না। বহুকাল বাদে খাটুনিতে নেমে প্রথমটায় হাঁফ ধরে যাচ্ছিল সরিতের। এখন ক্রমে সয়ে যাচ্ছে।

মোপেড জিনিসটা সরিতের তেমন পছন্দ নয়। মোপেড মানেও সে জানে না। তবে আন্দাজ করে, মোটর কাম পেডাল, অর্থাৎ যখন মোটরে চলবে তখন একরকম, মোটর খারাপ হলে পেডাল মেরে সাইকেলের মতোও চালানো যাবে। সুতরাং গাড়িটা না রাম না গঙ্গা। সাইকেলও নয়, মোটর সাইকেলও নয়। তবে কলকবজা বিশেষ জটিল নয় বলে সহজেই সারানো যায়। বেশি খরচাও নেই। এক লিটার তেলে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন কিলোমিটার চলে যেতে পারে। তবু এই কলের গাড়িতেও দুইদিক সামলাতে সরিতের দমসম হয়ে যায়।

আজকাল রোদের তেজ বেড়েছে। গরম পড়ে গেছে বেশ। ভোর হতে না হতেই হাসকিং মিলে গিয়ে হাজির হতে হয়। মিল চালু করে দিয়েই কাজ শেষ হয় না। খাতায় এনট্রি রাখতে হয়। মাঝে মাঝে ধান কিনতেও বেরোতে হয় তাকে। দুপুরে বাড়িতে খেতে আসার নিয়ম নেই। এক গেরস্তর ঘরে মাসকাবারি বন্দোবস্তে দুপুরের ভাতেব ব্যবস্থা করে দিয়েছে তৃষা। কাজেই সারাদিন সরিৎ এখানে বন্দি। বিকেলে বাড়ি ফিরে স্নান সেরে একটু জিরোতে না জিরোতেই বেরোতে হয় দোকানঘরে।

তৃষা তিন মেয়ের নামে ঝকঝকে এক স্টেশনারি আর মুদির দোকান দিয়েছে বাজারের কাছে। দোকানের নাম ত্রয়ী। রতনপুরে যা পাওয়া যেত না সেইসব জিনিস মনে করে রেখেছিল তৃষা। ত্রয়ীতে এখন সেইসব জিনিস পাওয়া যায়। নুডল, লিপস্টিক, স্টেনলেস স্টিলের বাসন; ভাল শ্যাম্পু কিংবা সাবান, দামি সিগারেট পর্যন্ত। প্রথম-প্রথম খুব একটা বিক্রি ছিল না। কিন্তু লোকের আজকাল নতুন নতুন জিনিস কেনার আগ্রহ দেখা দিয়েছে। দোকানও তাই রমরম করে চলছে। লোকে তৃষাকে দেখতে পারুক চাই না-পারুক তার দোকান থেকে চোখ বুজে জিনিস কেনে।

দোকানে দু'জন কর্মচারী রেখেছে তৃষা। সন্ধেবেলায় সরিৎ গিয়ে বসে স্টক আর বিক্রির টাকা মেলায়। মুদির দোকানের স্টক মেলানো রোজ অসম্ভব। তবু যথাসাধ্য হিসেব নিতে হয়। রাত দশটা

পর্যন্ত এই করতে চলে যায়। তারপর বাড়িতে ফিরতে না ফিরতেই শেষ ট্রেনের ট্রিপ মেরে রিকশা ফেরত দিতে আসে রিকশাওয়ালারা। তাদের কাছে রোজের পয়সা গুনে নিতে হয়। সব কিছুতেই লাভের অর্ধেক বখরা সরিৎ পায়। শুধু ত্রয়ীর আয় থেকে তার ভাগ নেই। দোকানের টাকা জমা হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের জন্য। তবু প্রথম মাসের হিসেবেই সরিৎ পেল প্রায় চারশো টাকা। পেয়ে তার মাথা ঘুরে গেল।

এত টাকা একসঙ্গে নিজের করে কোনওকালে পায়নি সরিৎ। কী করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। টাকাটা অবশ্য এক রাত্রির বেশি রইল না তার কাছে। পরদিনই তৃষা ডেকে একশো টাকা মায়ের নামে আর পঞ্চাশ টাকা মালদায় বড়দার নামে পাঠাতে বলে দিল। আর বলল, বাকি টাকা থেকে খাইখরচ বাবদ মাকে একশো টাকা দিবি। যা থাকবে তা থেকে পঞ্চাশ টাকার বেশি হাতখরচ রাখবি না। বাকিটা ডাকঘরে অ্যাকাউন্ট খুলে জমা দিয়ে আয়। পাশবই আমার কাছে দিয়ে যাবি।

সরিৎ কিছুটা ম্লান হয়ে গেল বটে, কিন্তু মেজদির ওপরে যে কথা চলে না তাও সে জানে।

পরের মাসেই তার আয় আরও পঁচিশ টাকার মতো বেড়ে গেল। সরিৎ বুঝতে পারছিল, এই হারে চললে তার টাকা খায় কে। তবে মুশকিল হল, তার একটু গান-বাজনা আসত, সিনেমা দেখার নেশা ছিল। সেগুলো এবার যায় বুঝি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মেজদি একেবারে নিশ্ছিদ্র করে দিয়েছে তার।

এর মধ্যেই আবার তাকে অন্যরকম কাজেও লাগায় তৃষা। একদিন ডেকে বলল, স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে কয়েকটা বাজে লোক নাকি বসে থাকে, একটু নজর রাখিস তো। তোর জামাইবাবুকে টিটকিরি দেয়, সজল স্কুলে শুনে এসেছে।

সরিৎ একটু চনমনে হয় কথাটা শুনে। মারপিট, হাঙ্গামা তার পছন্দসই জিনিস।

তৃষা বোধহয় তার মনের ভাব বুঝেই বলল, তা বলে খুনোখুনি করতে হবে না। সঙ্গে গঙ্গা থাকবে, যা করার সেই করবে। তুই তোর জামাইবাবুকে আগলে রাখিস।

জামাইবাবু যে ভেড়ুয়া তা সরিৎ জানে। তবে আবার অন্যরকম তেজও আছে। পাঁচখানা রিকশার মধ্যে একখানা রোজ রাতে স্টেশন থেকে শ্রীনাথকে নিয়ে আসবে, এরকম একটা কথা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীনাথ রাজি হয়নি। বলেছে, না, আমি এমনিই আসতে পারব।

সরিৎ ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝল না। গঙ্গাকে সে চেনেও না। তবে মেজদির কাছে বেশি কিছু জানতে চেয়ে লাভ নেই। দরকারও নেই।

পরদিন সন্ধেবেলা হাসকিং মিল থেকে ফিরে আসার পর গঙ্গার দেখা পেল সরিৎ। বড় ঘরের দাওয়ায় এক কোণে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। সামনে একটা কাঠের চেয়ারে তৃষা।

তৃষা ডেকে বলল, এই গঙ্গাকে দেখে রাখ। কাল তোর সঙ্গে যাবে।

সরিৎ দেখল, আবছা অন্ধকারে গোঁয়ার গম্ভীর ধরনের একটা লোক। চোখে চোখ রেখে তাকাতে জানে না। চেহারাটা খুব মজবুত। পরনে ধুতি আর হাফহাতা শার্ট। সরিতের সঙ্গে কথাই বলল না। শুধু যাওয়ার আগে ভাঙা চাষাড়ে গলায় বলল, আমি স্টেশনের ধারেই থাকব। আপনি রাতের দিকে আসবেন।

গঙ্গা কে, কী তার পেশা তা কিছুই জানা গেল না। এমনকী মুখটাও ভাল করে দেখতে পায়নি সরিৎ। মেজদিও কোনও পরিচয় দেওয়ার দরকার মনে করল না। তবে সরিৎ বুঝল, এ হল মেজদির পোষা গুন্ডা। শহুরে গুন্ডাদের মতো চতুর না হলেও বোধহয় কাজের লোক। গাঁইয়া গুন্ডারা বোধহয় অন্যরকম হয়।

স্টেশন থেকে একটা পাকা রাস্তা আঁকাবাঁকা হয়ে ঢুকে এসেছে জনবসতির মধ্যে। সামনেই একটা চৌরাস্তা। তার মোড়ে কয়েকটা কাঁচা ঘরে চা মিষ্টির দোকান। বাইরে পেতে রাখা বেঞ্চে সর্বদাই

কিছু লোককে সন্ধের পর বসে থাকতে দেখা যায়। হ্যাজাক জ্বলে, চায়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

পরদিন রাত আটটা নাগাদ সরিৎকে তাদের রিকশাওয়ালা ফাগুলাল স্টেশনের চত্বরে এনে নামিয়ে দিল। লোকজন কেউ নেই এত রাতে। জামাইবাবু কোন গাড়িতে আসবে তাও কিছু ঠিক নেই। সরিৎ মালদা থেকেই একটা চেন সঙ্গে করে এনেছে। খুব কাজের জিনিস। প্যান্টের পকেট থেকে সেটা বের করে একবার দেখে নিল। ধারেকাছে গঙ্গা নেই, তবে নিশ্চয়ই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। কী করতে হবে মেজদি তা বলে দেয়নি। রতনপুরে তার দু'-চারজন বন্ধু হয়েছে। তাদের কাউকে সঙ্গে আনলেও হত। কতজনের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে তা তো জানে না।

আজকাল সরিতের পকেটে সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাই থাকে। এতকাল থাকত না। বরাবর দুটো বা চারটে সিগারেট কিনে খালি প্যাকেটে ভরে রাখত। সিগারেট থাকলেও বেশির ভাগ সময়েই দেশলাই থাকত না। পথচলতি লোককে থামিয়ে তাদের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ধরিয়ে নিত। এমন সব উঞ্ছবৃত্তি আজকাল করতে হচ্ছে না। স্টেশনের কাঠের বেঞ্চে বসে নিজের ভরা প্যাকেট থেকে সিগারেট ঠোঁটে তুলে নিজেরই দেশলাই দিয়ে সেটা ধরিয়ে খুব একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করল সরিৎ। মাস গেলে এখন তার রোজগার সোয়া চারশো। মেজদির জন্য এখন জান দিয়ে দিতে পারে সে।

একটা ডাউন গাড়ি চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপ গাড়িরও আলো দেখা যাচ্ছিল। গাড়ি থেকে অনেকজনাই নামল, কিন্তু শ্রীনাথকে দেখা গেল না।

হাই তুলে বসে বসে নিজের অবস্থার এই পরিবর্তনের কথা সুখের সঙ্গে ভাবছিল সরিৎ। আর কিছুদিন পর ইচ্ছে করলে সে বিয়েও করতে পারে। মালদায় দু'-চারটে মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল বটে। কিন্তু আজ, বেশ কিছু দূরে বসে এবং অনেকটা সময়ের পার্থক্যে সে আবেগহীন ভাবে বিচার করে দেখল সেই মেয়েদের কাউকেই তার খুব একটা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে না। বরং রতনপুর হাইস্কুলের একজন ছাত্রীকে তার চোখে ধরে গেছে। আলাপ-টালাপ অবশ্য হয়নি এখনও। কিন্তু সেটা কোনও ব্যাপার নয়।

আবার একটা আপগাড়ি হল। চলেও গেল। দুটো সিগারেট শেষ হয়ে গেল সরিতের। ফাগুলাল এসে বলল, গাড়ি কি গ্যারাজ করে দেব বাবু? আমার মেয়েটার জ্বর।

সরিৎ একটু কড়া চোখে চেয়ে বলল, আরও দুটো গাড়ি দেখব। তারপর যা হয় করা যাবে। এখন যা।

পরের গাড়িটাতেই শ্রীনাথ এল।

জামাইবাবু যে কলকাতায় ফুর্তি লোটে এ কথা সবাই জানে। জামাইবাবুর চোখে-মুখে ফুর্তি করার একরকমের ছাপও পড়ে গেছে। প্রায় রোজই সামান্য নেশা করে আসে। আজও এসেছে। ঠিক মাতাল নয়, তবে খুব আয়েসে পা ফেলছে, শরীরে গা ছাড়া ভাব, চোখ লালচে এবং উজ্জ্বল।

গেটের কাছে শ্রীনাথের কনুইটা ছুঁয়ে সরিৎ ডাকল, জামাইবাবু!

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, আরে তুমি?

ভচাক করে মদের গন্ধটা সরিতের নাক দিয়ে পেটে ঢুকে যায়। সেও এক সময়ে খেয়েছে এসব। তবু এখন গা গুলিয়ে উঠল।

শ্রীনাথের অহংকারী স্বভাবের কথা সবাই জানে। সরিৎ তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে জানলে মারাত্মক চটে যাবে। সরিৎ তাই সাবধানে বলল, এদিকে একটু কাজ ছিল।

শ্রীনাথ বোকাটে একরকম মাতলা হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ, তোমরা সব কাজের মানুষ।

ফাগুলালের রিকশাটা দাঁড় করানো আছে। যেতে চান তো--

ও তোমাদের রিকশা তোমরা চড়বে। আমি দিব্যি হেঁটে যেতে পারব।

তা হলে আপনি এগোন, আমি পিছু পিছু আসছি।

সরিৎ শ্রীনাথের সঙ্গে যেতে চায় না। শ্রীনাথের সঙ্গে তাকে দেখলে মোড়ের মাস্তানরা টিটকিরি নাও দিতে পারে। শ্রীনাথকে তারা ভেড়ুয়া বলে জানে, কিন্তু সরিৎকে তো জানে না।

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, এসো। তবে আমার সঙ্গে থাকার এমনিতে দরকার নেই।

আপনার দরকার নেই সে জানি। পথটা একসঙ্গে হেঁটে যাব আর কী।

এসো।— বলে শ্রীনাথ এগোয়।

সরিৎ রেল-কোয়ার্টারের পিছনে মেঠো পথটা আগেই ঠিক করে রেখেছিল। পাকা রাস্তা এড়িয়ে ওটা ধরে দোকানঘরগুলোর পিছন দিকে গিয়ে ওঠা যায়।

মেঠো পথে নেমেই পকেট থেকে চেনটা বের করে সরিৎ একবার নিপুণ হাতে বাতাসে সেটা ঘোরাল। বোঁ করে ভোমরার ডাক ডেকে বাতাস কেটে এসে বশীভূত সাপের মতো সেটা আবার কুণ্ডলী পাকাল তার হাতে।

শ্রীনাথের অনেক আগেই সে দোকানঘরের পিছনে পৌঁছে যায়। এখানে গাছপালার অভাব নেই। শান্তভাবে সে একটা বড়সড় গাছের আবডালে দাঁড়িয়ে দোকানঘরগুলোর দিকে লক্ষ রাখে। প্রথম দোকানটাই বড় এবং সেখানেই ছোকরা আড্ডাবাজদের সংখ্যা বেশি। অন্তত ছ'জনকে সে দেখতে পায় বাইরের বেঞ্চে বসে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ করছে। বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে। কাউকেই তেমন পোক্ত মাস্তান মনে হল না। একজন খুব চেঁচিয়ে গান গাইছে, চাঁদনি চাঁদসেই হোতা হ্যায়, সিতারো সে নহি। কোনও হিন্দি ছবির গান। ছেলেটা গায়ও ভাল। একটু উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল সরিৎ। এ ছবিটা তার দেখা নয় নিশ্চয়ই। কাছেপিঠে কোথাও চলছে কি? কিংবা কলকাতায়? একদিন সময় করে গিয়ে দেখে আসবে।

শ্রীনাথ মন্থর পায়ে মোড়ে এসে পড়ল। চলার ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস নেই, তাড়া নেই, এমনকী কোনদিকে যাবে তারও যেন ঠিক নেই। মোড়ে এসে চারদিকে চেয়ে তবে বাঁ দিকে ফিরল।

মুঠো থেকে চেনটার একটা কোনা ছেড়ে দিল সরিৎ।

ঠিক এমন সময়ে পিছন থেকে তার কবজিটা আলতো হাতে ধরে ফেলল কে যেন। সরিৎ বাঘের মতো পিছু ফিরতেই গঙ্গা বলল, এখানে আপনি জড়াবেন না। বাবুকে নিয়ে বাড়ি চলে যান। হাঙ্গামা হলে মা ঠাকরোন যেন এতে না বেঁধে যান।

তবে আমি এলাম কেন?

দরকার হলে আমি হাঁক মারব।

দু'জনে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কটমটে চোখে তাকিয়ে দেখে, শ্রীনাথ বড় দোকানঘরটার সমুখে আলোর চৌহদ্দিতে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোকরা লাফিয়ে উঠে বলল, আরে শ্রীচরণ চাটুজ্জে যাচ্ছে ওই দ্যাখ।

আর একজন, আজ খুব টেনেছে রে।

কাছাটা টেনে খুলে দিয়ে আয় না।

আমার কাকা কী বলে জানিস? শ্রীনাথ বউদি আর তৃষা দাদা।

হোঃ হোঃ! হিঃ হিঃ!

শ্রীনাথ একবার খুব উদাস চোখে দোকানটার দিকে তাকাল। চোখে রাগ নেই, ঘৃণা নেই, কেবল বুঝি বৈরাগ্য বা অবহেলা আছে।

সরিতের চোখ বাঘের মতো জ্বলে ওঠে।

গঙ্গা নিচু স্বরে বলে, আপনি কর্তাবাবুর পিছু পিছু যান। একটু আস্তে হাঁটবেন।

সরিতের এই প্রস্তাব পছন্দ নয়। তার রক্তে রীতিমতো জ্বালা ধরেছে, হাত-পা নিশপিশ করছে। সে বলল, অত কায়দা কানুনের দরকার কী?

দরকার আছে।— ঠান্ডা গলায় গঙ্গা বলে।

সরিৎ কথা বাড়ায় না। মেজদির ব্যাপার মেজদিই ভাল বুঝবে। ভিতরের জ্বালা চেপে রেখে রাগে গনগন করতে করতে পাকানো চেনটা হাতের মুঠোয় চেপে রেখে সে বড় রাস্তা ধরে জামাইবাবুর পিছু নেয়। দোকানঘরটার সামনে একবার থমকে দাঁড়িয়ে আগুনে চোখে তাকায় ছোকরাদের দিকে।

ছোকরারা চোখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের স্বাভাবিক জৈব বুদ্ধি তাদের বলে দেয়, এবার গোলমাল করাটা ঠিক হবে না।

ছোকরারা একটা টুঁ শব্দ করলেও সরিৎ লাফিয়ে পড়ত। তা হল না। সরিৎ কয়েক কদম এগিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে চাইল। গঙ্গাকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। লোকটা করছে কী?

জামাইবাবু খানিকটা এগিয়ে গেছে। যাক। লোকটা আস্তে আস্তে হাঁটছে। সরিৎ পা চালিয়ে ধরতে পারবে। সে রাস্তা থেকে সরে ধারে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

একটু বাদে হঠাৎ ওপাশের আঁধার থেকে গঙ্গা বেরিয়ে এসে দোকানটার সামনে দাঁড়াল, তার হাতে একটা খাটো লোহার রড। ভাবগতিক আকাট খুনির মতো। ছোকরাগুলো বোধহয় গঙ্গাকে চেনে। গঙ্গা দু'-চারটে কথা বলে দোকানটার দিকে দু' কদম এগোতে না এগোতেই তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছোকরাগুলো এধার-ওধার দৌড়ে পালাতে থাকে। সরিৎ হাসে। একপাল ভেড়ুয়া। এগুলোকে ধাওয়া করতে খামোখা এত কায়দা কসরত। গঙ্গা একটা ছোকরাকে ধরে পেটাচ্ছে, দূর থেকে দেখতে পেল সরিৎ। দুই ছোকরা এদিকে পালিয়ে আসছিল। সরিৎ চেনটা খুলে দু'কদম এগিয়ে রাস্তার মাঝবরাবর গিয়ে দাঁড়ায়। ছোকরা দুটো পালাতে পালাতে পিছু ফিরে দোকানঘরের কাণ্ডটা দেখছে। সরিৎকে লক্ষ করেনি।

সরিতের চেন একবার ঘুরে এল। 'বাপ রে' বলে চেঁচিয়ে পয়লা ছোকরা বসে পড়তে না পড়তেই দু' নম্বরকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে সরিৎ তার থুতনিতে বুটশুদ্ধ একটা লাথি জমিয়ে দিল। এতসব করতে গা একটু ঘামলও না তার। পয়লা ছোকরার গলায় চেনটা ফাঁসের মতো পরিয়ে টেনে দাঁড় করাল সরিৎ। কদর্য একটা খিস্তি দিয়ে বলল, আর কখনও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবে?

এ ধরনের কঠিন মার ছোকরা বোধহয় জীবনেও খায়নি। কেমন ভ্যাবলা হয়ে গেছে। কানের ওপরে অনেকটা জায়গা চেন-এ কেটে গিয়ে কাঁধের জামা পর্যন্ত রক্তে ভিজে যাচ্ছে। ওই অবস্থাতে ছেলেটা মাথা নেড়ে বসা গলায় বলল, না।

ঠিক এই সময়ে পিছন থেকে জামাইবাবুর স্পষ্ট তীক্ষ্ণ গলা শুনতে পায় সে, কী হচ্ছে এখানে? সরিৎ, ওদের মারছ কেন?

সরিৎ চেনটায় একটু টাইট মেরে জামাইবাবুর দিকে ফিরে চেয়ে হাসল। বলল, আপনাকে রোজ আওয়াজ দেয় এই সুমুন্দির পুতেরা। মুখগুলো বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীনাথ একটু বুঝি থমকে যায়। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, কে বলেছে তোমাকে এ কাজ করতে? আওয়াজ দেয়, বেশ করে। একশোবার আওয়াজ দেবে। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও শিগগির।

সরিৎ যতটা অবাক হয়, ততটাই রেগে যায়। তেজি গলায় বলে, কী বলছেন আপনি?

শ্রীনাথ তেড়ে এসে বলে, ঠিক বলছি। ওরা আওয়াজ দেয় ঠিকই করে। যা সত্যি তাই বলে। তাতে তোমাদের অত গায়ের জ্বালা কেন?

চেন-এর ফাঁস থেকে ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে সরিৎ ধমক দিয়ে বলে, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! যান তো, বাড়ি যান। যা করার আমরা করছি।

কেন বাড়ি যাব? ইয়ারকি পেয়েছ? গুন্ডামি করে চলে যাবে? আপনারা বসে দেখছেন কী সব? এক্ষুনি পুলিশে খবর দিন। বেঁধে নিয়ে যাক দুটোকে...

দু'-চারজন ডেইলি প্যাসেঞ্জার, চায়ের দোকানের খদ্দের, মালিক আর বয় বেয়ারা মিলে মোড়ে নেহাত কম লোক নেই। চেঁচানিতে তারা বেরিয়ে এসেছে।

মার-খাওয়া দুটো ছেলেই রাস্তার ওপর গাড়লের মতো বসে আছে। সরিতের হাতে রক্তমাখা চেন। জামাইবাবু লোক জড়ো করছে।

এই সংকট-সময়ে ছায়ার মতো গঙ্গা এসে পাশে দাঁড়াল। হিংস্র গলায় বলল, আপনাকে হুজ্জত করতে মানা করেছিলাম, শুনলেন না।

সরিৎ অন্যমনস্ক গলায় বলে, লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

পাগল নয়। শয়তান। আপনি দেরি করবেন না। ফাগুলালের রিকশা সামনে এগিয়ে দাঁড় করানো আছে, সোজা বাড়ি চলে যান। পুলিশ এলে বিপদে পড়ে যাবেন।

জামাইবাবুকে কী করবে?

সে আমি দেখছি। আপনি যান তো। কাজ একেবারে গুবলেট করে দিয়েছেন আপনি।

সরিৎ ব্যাপারটা বুঝল না। তবে গঙ্গার পরামর্শটা মেনে নিল। একটু এগিয়ে গিয়ে রিকশাটা দেখে চড়ে বসল। ফাগুলাল ঊর্ধ্বশ্বাসে নিয়ে এল বাড়িতে।

তৃষা রান্নাঘরে বসে ঠাকুরের কাজকর্ম দেখছিল।

সরিৎ গিয়ে জরুরি গলায় ডাক দিল, মেজদি, একটু বাইরে এসো।

তৃষা তাড়াহুড়ো করল না। কিছু একটা বুঝে নিয়েই যেন একটু বিরক্ত গলায় বলল, ঘরে যা, যাচ্ছি।

সরিৎ কোথায় কী গণ্ডগোল করে ফেলেছে তা সে নিজেও বুঝতে পারছিল না। ঘরে এসে নিঃশব্দে জামা কাপড় বদল করল।

তৃষা শান্ত ভঙ্গিতে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

সরিৎ একটু উত্তেজিত গলায় ঘটনাটা সংক্ষেপে জানিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলল, জামাইবাবু সব কাঁচিয়ে দিয়েছে।

তৃষা কঠিন চোখে ভাইয়ের দিকে চেয়ে ছিল। ঠান্ডা এবং বিরক্ত গলায় বলল, তুই গঙ্গার কথা শুনলি না কেন?

ছেলে দুটো আমার ওপর এসে পড়ল যে।— একটু রং চড়াল সরিৎ।

তৃষা অনুত্তেজিত গলায় বলে, আমি খোঁজ নিয়েছি, ছেলেগুলো পাজি হলেও ষন্ডাগুন্ডা নয়। তোকে মারতে আসেনি।

আমি ভাবলাম বুঝি...

সরিৎ আমতা আমতা করে।

এর পর থেকে যেটা বলব সেটা ভাল করে শুনবি, বুঝবি। যা করলি তাতে সবাই জেনে যাবে এ ঘটনায় আমাদের হাত আছে। গঙ্গা অনেক সাবধানে কাজ করত।

সরিৎ বলল. লোকে জানতে পারত না। শুধু জামাইবাবু ওই পাগলামিটা না করলে—

তোর জামাইবাবু যে ওরকম কিছু করবে তা জানি বলেই তোকে বলেছিলাম ওঁকে আগলে রাখতে। তুই ওঁকে নিয়ে চলে এলে এরকম করতে পারত না।

এখন তা হলে কী করব?

কিছু করতে হবে না। চুপচাপ থাক।

পুলিশ এলে?

তৃষা বোধহয় একটু হাসল। কিন্তু আবছা অন্ধকারে ভাল দেখতে পেল না সরিৎ। তবে শান্ত আত্মবিশ্বাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, পুলিশ আসবে না।

মেজদি চলে গেলে সরিৎ উত্তেজিত মাথায় বসে জামাইবাবুর সাইকোলজিটা বুঝবার চেষ্টা

করছিল। এরকম কাণ্ড করার কোনও যুক্তিসংগত কারণই সে খুঁজে পাচ্ছে না।

একটু বাদে উঠে সে একবার বাইরের দিকে বেরোল। জামাইবাবুর ঘর এখনও অন্ধকার তালাবন্ধ। বুকটা গুরুগুর করে উঠল তার। লোকটা যদি সত্যিই পুলিশে যায়। বহু লোক সাক্ষী আছে।

খ্যাপা নিতাই আজ ঘরেই আছে। ডাকতেই বেরিয়ে এসে এক গাল হেসে বলল, আজকাল খুব কাজের লোক হয়েছ সরিৎবাবু।

তা হয়েছি। চল খালধারে গিয়ে একটু গাঁজা টেনে আসি। বহুকাল টানি না।

গাঁজা পাব কোথায়? পয়সা-টয়সা ছাড়ো কিছু।

ছাড়ছি। বদমায়েশি করিস না। আজ একটু গাঁজা না টানলেই নয়।

চোখ ছোট করে নিতাই জিজ্ঞেস করে, কেন, কী হয়েছে?

সে অনেক কথা।

নিতাই টপ করে ঘরে ঢুকে গাঁজার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে এসে ঘরের ঝাঁপ টেনে দিয়ে বলল, চলো।

শ্রীনাথের চেঁচামেচিতে মোড়ের মাথায় বিস্তর লোক জমে গেছে এতক্ষণে। পরের ট্রেনের ডেলি-প্যাসেঞ্জাররাও জুটেছে। আচমকা দু'-দুটো গুন্ডার হাতে দোকানঘরের আড্ডাবাজ ছেলেরা ঘায়েল হওয়ায় কিছু লোক হয়তো খুশিই কিন্তু শ্রীনাথ তাদের খুশি থাকতে দিতে চায় না।

সে সমবেত জনসাধারণকে বলছিল, আপনারা কি ভেড়া হয়ে গেছেন নাকি? যে ছেলেটা চেন চালিয়েছিল তাকে আমি চিনি। পুলিশের কাছে আমি তার নামধাম বলব। আপনারা সাক্ষী দেবেন।

ভিড়ের মধ্যে গঙ্গাকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তার জায়গা নিয়েছে আর-একজন রোগা পাতলা ছোটখাটো লোক। তাকে এ অঞ্চলের সবাই চেনে। এত ধূর্ত এবং ফেরেববাজ লোক দুটো নেই। তার নাম গণি। যখন যে রাজনৈতিক দল টাকা দেয় তখনই সে সেই দলের হয়ে গ্রামেগঞ্জে কাজ করে বেড়ায়। মামলা-মোকদ্দমায় তার মাথা খুব সাফ। জমি-ঘটিত আইন-কানুন তার নখদর্পণে।

পিছন থেকে গলা তুলে গণি জিজ্ঞেস করে, ছেলেটার নাম যদি জানেন তবে সবার কাছে বলছেন না কেন? সাক্ষী দেবার কথাই বা উঠছে কীসে? লোকে যদি তাকে না চিনে থাকে তবে কি বানিয়ে বলবে নাকি?

গণিকে শ্রীনাথও ভালই চেনে। এও জানে গণি অন্তত তৃষার বিপক্ষের লোক নয়। তবু সে তেজি গলায় বলল, যে ছোকরা দু'জন মার খেয়েছে তারা দেখেছে।

তারা কোথায়? কে মার খেয়েছে?

ওই যে রাস্তায়।— বলে শ্রীনাথ আঙুল তুলে দেখায় পিছনবাগে। কিন্তু রাস্তায় ছেলে দুটোকে দেখা গেল না।

গণি বলল, কেন ঝুটমুট ঝামেলা করছেন? মাল খেয়ে আছেন বুঝতে পারছি। বাড়ি গিয়ে আরাম করুন গে।

শ্রীনাথ রাগে লাল হয়ে চেঁচিয়ে বলল, এইমাত্র এত বড় ঘটনাটা ঘটে গেল সকলের চোখের সামনে সেটা কি ইয়ারকি নাকি?

সবাই গুনগুন করছিল। একমাত্র গণিই গলা তুলে বলল, ঘটনা আবার কী? একটা গাঁইয়া লোক হঠাৎ কী কারণে খেপে গিয়ে একটা ছেলেকে দুটো কিল ঘুসি চালিয়ে পালিয়ে গেল। তাই নিয়ে এত হইচইয়ের কিছু নেই।

গাঁইযা লোক!— শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, কিসের গাঁইয়া লোক! ও তো গঙ্গা।

গণি খুব হাসল। বলল, গঙ্গা না কে তা কে দেখেছে? আপনি মাল-খাওয়া চোখে কী দেখতে কী দেখেছেন।

শ্রীনাথ বলল, আলবত গঙ্গা। সবাই দেখেছে।

দেখেছে তো বলুক না। বলছে না কেন?

শ্রীনাথ চেঁচিয়ে বলল, আপনারা বলুন তো, লোকটা গঙ্গা নয়?

শ্রীনাথ ভুল করেছিল। এ কথা ঠিক গঙ্গাকে প্রায় এক ডাকে লোকে চেনে। তাকে মারতে লোকে দেখেছেও। কিন্তু সে কথা কেউ কখনও স্বীকার করবে না।

করলও না। দু'-চারজন বরং বলল, শ্রীনাথবাবু, বাড়ি চলে যান। যা হওয়ার হয়ে গেছে।

শ্রীনাথ অসহায়ভাবে বলল, একটা ছেলের মাথা ফেটে রক্ত পড়ছিল, আমার নিজের চোখে দেখা।

চারদিকের গুঞ্জনটা বেশ চেঁচামেচিতে দাঁড়িয়ে গেল। শ্রীনাথের কথা কেউ শুনছে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, যাদের ওপর হামলা হয়েছিল সেই আড্ডাবাজ ছেলেগুলোর একটারও টিকি দেখা গেল না।

ভিড় ঠেলে একটা খালি রিকশা এগিয়ে এল। চালাচ্ছে তৃষার আর-এক বশংবদ বীরু। তৃষারই রিকশা। ঝকঝকে নতুন। সামনে এসে শ্রীনাথকে বলল, বাবু, উঠে পড়ুন, মা আপনার জন্য ভাবছেন।

গণি এক ফাঁকে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁধে হাত রেখে একটু চাপ দিয়ে বলল, উঠে পড়ুন। মালটা কিন্তু আজ একটু বেশি টেনে ফেলেছেন।

শ্রীনাথ কঠিন স্বরে বলল, আমি কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দেব না গণিমিয়া। বলে রাখলাম।

কী করবেন? পুলিশে যাবেন? যান না, কে ঠেকাচ্ছে?

যাব। তাই যাব।

পুলিশ হাসবে। আপনার তো সাক্ষীই নেই।

দরকার হলে টাকা দিয়ে সাক্ষী জোটাব। তা বলে এত বড় অন্যায় সহ্য করব না।

তার চেয়ে বাড়ি গিয়ে মাথাটা ঠান্ডা করুন। তারপর যা বিবেচনা হয় করবেন।

বলে একরকম ঠেলেই তাকে রিকশায় তুলে দেয় গণি। রোগা হলেও গণির কবজিতে জোর বড় কম নয়। আঙুলগুলো লোহার মতো শক্ত। ছাড়াতে গিয়েও পারল না শ্রীনাথ। কবজিতে ব্যথা পেয়ে 'উঃ' করে ককিয়ে উঠল। রিকশায় উঠতে না উঠতেই বীরু হাওয়ার বেগে রিকশা ছেড়ে দিল। একটু বাদে ছায়ার মতো রিকশার পাশাপাশি একটা সাইকেল চলে এল। তাতে গণি।

পাশাপাশি চলতে চলতে গণি বলল, ওই ছোঁড়াগুলো যে রোজ আপনাকে টিটকিরি দেয় সেটা কি আপনার ভাল লাগে শ্রীনাথবাবু?

শ্রীনাথ উগ্রস্বরে বলল, বেশ করে টিটকিরি দেয়। কেন দেবে না?

আপনাকে বা আপনার বউকে অপমান করলে আপনার লাগে না?

না। ওরা সত্যি কথাই বলে।

আপনি কি মরদ নন? আমাকে বললে তো আমি অনেক আগেই চামড়া তুলে নিতাম।

ওরা ঠিক কাজই করে।

সে আপনাব যা খুশি ভাবুন। কিন্তু থানা-পুলিশ করলে একটু ভেবেচিন্তে করবেন।

আমি কাউকে পরোয়া করি না।

লোকে তো হাসবে। আজও তো লোক হাসালেন।

এটা তোমাদের ষড়যন্ত্র, গণি। তোমরা তৃষার টাকা খাও।

হি হি। কী যে বলেন!— গণি বোধহয় জিভ কাটল। তারপর হালকা গলায় বলল, ঠাকরোনের

সঙ্গে আপনার বনিবনা নেই তো সেটা হল ঘরের ব্যাপার। পাঁচজনকে সেটা জানাতে যাওয়া কি ভাল? ঘরের কথা পরকে জানালে যে ঘরটা বাজার হয়ে যায়।

॥ তেইশ ॥

আমি যদি এই কোম্পানি ছেড়ে দিই তা হলে আপনি কী করবেন?

দীপনাথ একটু ভেবে বলল, কী করে বলি? আপনি কি সত্যিই ছাড়ছেন?

ছাড়তে পারি। একটা ইংলিশ ফার্ম ভাল অফার দিয়েছে। পুরোপুরি ইংলিশ নয়, ইন্ডিয়ান কোলোবোরেটর আছে।

ভাল অফার কি?

খুবই ভাল অফার। ডিরেক্টর করবে বলে প্রমিস করেছে। কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। আমার প্রশ্ন হল, আপনি কী করবেন?

দীপনাথ মিস্টার বোসের দিকে চেয়ে ছিল। বোস ঠ্যাং ছড়িয়ে বেতের আরামদায়ক চেয়ারে বসে আছে। সামনে বেতের টেবিলে দুটো বিয়ারের বোতল আর গেলাস। বোতলের গায়ে এখনও ফ্রিজের কুয়াশা। দীপনাথ নিজের গেলাস নামিয়ে রেখে বলল, আমার তো এ কোম্পানিতে কোনও পাকা চাকরি নেই। আপনি চলে গেলে এরাই বা রাখবে কেন?

একজ্যাক্টলি। আমিও তাই জানতে চাইছিলাম, আপনি আমার সঙ্গেই থাকতে চান কি না।

বোসের গলার স্বর খুব সহানুভূতি এবং সমবেদনায় মাখনের মতো নরম হয়ে কানে বাজল।

দীপনাথ বলল, খবরটা খুব আনএক্সপেকটেড। আমি একটু ভেবে দেখি।

বোস অসহিষ্ণুভাবে বলে, আপনি কেন ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নিতে পারেন না বলুন তো? সব সময়ই সব কাজে আপনার জড়তা দেখতে পাই। জীবনে বড় কিছু করতে গেলে ডিসিশনটা মাস্ট বি প্রোন্টো।

তাড়াহুড়োর কিছু আছে কি?

আছে।— বোস প্লেট থেকে কাই মাখানো সসেজ কাঁটায় তুলে মুখে দেয়। বিয়ারে দীর্ঘ চুমুকের পর বলে, ইংলিশ ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্র্যান্ডে বসে চারদিকে জাল ফেলছেন। পরশু ফিরে যাচ্ছে বাংগালোরে। যাওয়ার আগেই পাকা কথা হয়ে যাবে।

শুয়োরের মাংসের প্রতি আজন্ম একটু খুঁতখুঁতোনি থাকা সত্ত্বেও স্রেফ বোসকে সঙ্গ দিতে দ্বিতীয়বার সসেজ খেয়ে খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, এই কোম্পানিতে আমার কোনও স্ট্যাটাস ছিল না। নতুন কোম্পানিতে কোনও স্ট্যাটাস পাব কি?

স্ট্যাটাস!

বলে বোস হাঁ করে একটু চেয়ে থাকে। বারান্দায় কোনও আলো নেই। ঘর থেকে আর রাস্তা থেকে যেটুকু আলো আসছে তাতে অন্ধকার কাটেনি। তাই বোসের চাউনিটা ভাল করে বুঝতে পারল না দীপ। বোস একটা হুঁঃ বলে সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, কোম্পানি যে এখনই নতুন লোক নেবে এমন কোনও অ্যাসুরেনস নেই। আমিও কথা দিতে পারছি না। তবে ওখানেও আপনি এর চেয়ে খারাপ থাকবেন না।

আপনি কি আমার জন্য চেষ্টা করবেন?

করব। তবে প্রথম দিকে নয়। পরে। এ কোম্পানি সদ্য স্টার্ট করছে। দে নিড এ লট অফ এক্সপিরিয়েন্সড পিপল। কাজেই আপনারও চান্স আছে। কিন্তু প্রথম লটে নয়। আপনি তো ততটা এক্সপিরিয়েন্সড নন।

দ্বিতীয়বার ঘেন্না-পিত্তি সত্ত্বেও সসেজটি খারাপ লাগেনি দীপের। কিন্তু বোস যেহেতু আর

সসেজ খেল না সেইজন্য তারও আর-একটা খেতে সংকোচ হচ্ছিল। পেটে যথেষ্ট খিদে। সে বিয়ারে নিরাসক্ত একটা চুমুক দিয়ে বলে, বাংগালোরেই যেতে হবে?

অফ কোর্স।

দীপ আনমনা হয়ে গেল কয়েক পলকের জন্য। বাংগালোরে। তার মানে হিমালয়ের সেই সব মহান পাহাড় থেকে আরও বহু দূরে। বাংগালোরে গেলে যখন-তখন প্রীতমটার কাছে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে না। বাংগালোর দীপনাথের অচেনা নয়। বার তিনেক গেছে বোসের সঙ্গেই। বড় ভাল পরিচ্ছন্ন শহর। তবু তো দূর।

কী ভাবছেন?

ভাবছি, অনেকটা দূর।

বোস হঠাৎ হেসে ফেলে। খিলখিল মেয়েলি হাসি। বলে, দূর? কোথা থেকে দূর?

কলকাতা থেকে।

আমি যদি উলটো করে বলি বাংগালোর থেকেই কলকাতা দূর।

তার মানে?

বোস কথাটার সোজা জবাব না দিয়ে বলে, দূরের কনসেপশনটা বাঙালিদের খুব অদ্ভুত। আমার তো কোনও জায়গাকেই পরের জায়গা মনে হয় না, তাই দূরের জায়গা বলেও ভাবি না।

দীপনাথ একটু গোঁজ হয়ে থেকে অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, সে অবশ্য ঠিক।

আপনাকে কলকাতার ভূতে পেল নাকি? কিন্তু শুনেছি আপনি নর্থ-বেঙ্গলের ছেলে।

দীপ একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, কলকাতায় আমার এক ভগ্নিপতি থাকে। সে ভীষণ অসুস্থ। আমি ছাড়া ওদের মর‍্যাল গার্জিয়ান কেউ নেই।

বোস বোতল থেকে বিয়ার ঢালছিল গেলাসে। কথাটা শুনল কি না বোঝা গেল না, তবে পাত্তাও দিল না তেমন। বলল, ওটা কোনও কথা নয়। ইয়োর ডিসিশন মাস্ট বি ভেরি প্রম্পট।

বোস যখন বিয়ার ঢালছিল তখন প্রায় চুরি করার মতো করে আর-একটা সসেজ তুলে নিল দীপ। ভিতরটা হতাশায় ভরা। বোস চলে গেলে তার খুঁটি সরে যাবে। হতাশায় ফাঁকা ফোঁপরা অভ্যন্তরে সসেজটাকে পাঠিয়ে দীপনাথ কিছুক্ষণ বিয়ারের ঝিল্লিধ্বনি শুনল নিজের মাথায়। আজ মণিদীপা বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে, আসবে। সেই পিকনিকের পর থেকেই মণিদীপার সঙ্গে কথা প্রায় বলেইনি সে। বড় অভিমান হয়েছিল। আর সবাই তাকে ফেলে চলে এলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু মণিদীপা এল কী করে! সে তো মাতালও হয়নি সেদিন? সেই দিন দুপুরেই না মেজদার বাড়িতে গিয়ে খুব আঠা দেখিয়ে এসেছিল?

কী ভাবলেন?

কিছু না।

ভাবনাটা স্টার্ট করুন। কাল বা পরশুই একটা ফাইনাল কথা আমাকে জানিয়ে দেবেন।

আচমকা দীপ ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে, ডু ইউ লাভ মি মিস্টার বোস?

বোস প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবে সময় নিয়ে এক রাউন্ড সসেজ বিয়ারের সঙ্গে ভিতরে পাঠিয়ে বলল, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড ইউ আর টপ গ্রেড। অ্যান্ড আই রিয়েলি নিড এ ফ্রেন্ড।

এ কথার জবাব হয় না। কথাটা হয়তো আবেগ থেকেই বলা, যদিও বোসের আবেগ সহজে প্রকাশ পায় না।

একটু বাদে আর কিছু বিয়ার খাওয়ার পর বোস খুব গা ছেড়ে বসে ধীরে ধীরে বলে, আমার যে সত্যিকারের কেউ নেই তা বোধহয় আপনি এতদিনে টের পেয়েছেন।

দীপনাথ একটু মুশকিলে পড়ে গিয়ে আমতা-আমতা করে বলে, বৃহৎ মানুষরা সব সময়ই একা। কথাটা দীপনাথ কোথায় যেন শুনেছিল। আজ আলটপকা কাজে লেগে গেল। বোস খুশিই হল

বোধহয়। আহাম্মকটা হয়তো সত্যিই নিজেকে বৃহৎ মানুষ ভাবে। বিয়ার সহযোগে তাই হয়তো কিছুক্ষণ মনে মনে কথাটাকে উপভোগ করল। তারপর বলল, মিসেস বোস অবশ্য বাংগালোরে যেতে রাজি নন।

কেন?

কে জানে? শি হ্যাজ হার ওন ওয়ে। উনি ভয়ংকর স্টাবোর্ন।

তা হলে?

তা হলে কিছুই না। আমি যাচ্ছিই।

মিসেস বোসের কী হবে?

শি মে সিক এ ডিভোর্স।

কথাটা এমন অনায়াসে বলে ফেলল বোস যে, খুব অবাক লাগল দীপনাথের। ডিভোর্সের ব্যাপারটা এখনও কোনও বাঙালির কাছে এতটা জলভাত হয়ে যায়নি। সে তাই বলল, না না, তাই কি হয়?৽

বোস কথাটায় কান না দিয়ে বলল, ওঁর একজন অ্যাডভাইজার আছে। স্নিগ্ধদেব চ্যাটার্জি। এ লেফটিস্ট হুলিগান। উনি তাঁর পরামর্শ ছাড়া কিছু করবেন না। দ্যাট বাগার কন্ট্রোলস হার।

জুয়াড়ির মতো আবেগহীন মুখভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতে করতে দীপনাথ বলল, তাই নাকি?

বোস মাছি তাড়ানোর মতো করে হাত নেড়ে বলল, ও প্রসঙ্গ থাক। মিসেস বোসকে নিয়ে বেশি ভাববার কিছু নেই। আই অ্যাম র‍্যাদার ইন নিড অফ এ ফ্রেন্ড। অ্যান্ড আই হ্যাভ নান। আপনি কি আমার বন্ধু হতে পারেন?

বহুকাল চাকরবাকরের মতো থেকে এখন একটা মরিয়াভাব এসে গেছে দীপনাথের। সে আর ততটা মুখচোরা থাকতে চাইল না। হঠাৎ বলে বসল, বৃহতের সঙ্গে কি ক্ষুদ্রের বন্ধুত্ব হয় বোস সাহেব?

বলেই বুঝল এ প্রায় শরৎচন্দ্রীয় ডায়ালগ হয়ে গেল। আসলে সে মোটে আধ গেলাস বিয়ার খেয়েছে। কিন্তু অভ্যাস না থাকায় সেইটুকুই পেটে গিয়ে জিভটাকে একেবারে লাগামছাড়া করে দিয়েছে বোধ হয়।

বোস সাহেবের অবস্থাও খুব ভাল কিছু নয়। বেতের সোফার পিছনে আরও তিনটি খালি বোতল জমা পড়েছে, টেবিলের ওপর বাকি দুটোর মধ্যে একটার মুখ এখনও খোলাই হয়নি। বাড়ির বেয়ারা এইমাত্র একপ্লেট গরম পকোড়া রেখে গেল টেবিলে। বোস সাহেব একটা পকোড়া তুলে কামড় দিয়ে বলল, হয়। মে বি আই অ্যাম সামটাইমস ভেরি রুড। আপনিও হয়তো অফিস-ওয়ার্কে তেমন এফিসিয়েন্ট নন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে আমি আপনার ক্যারেকটারের প্লাস পয়েন্টগুলো লক্ষ করিনি। আই র‍্যাদার লাইক ইউ। অন দি আদার হ্যান্ড আমারও কিছু প্লাস পয়েন্ট আছে মিস্টার চ্যাটার্জি। সেগুলো কি আপনি লক্ষ করেছেন?

দীপনাথ আর একটু হলেই বোসের সামনেই লজ্জায় জিভ কেটে ফেলত বা বলে উঠত, আই অ্যাপোলাজাইস। কিন্তু বিয়ারের ধোঁয়ার ভিতর দিয়েও মগজের যুক্তি বুদ্ধি পথ হারিয়ে ফেলেনি। এ কথা সত্যি যে, সে বোসের প্লাস পয়েন্টগুলো লক্ষ করেনি। কিন্তু সে কথা স্বীকার করে কোন আহাম্মক?

সে বলল, আপনার প্লাস পয়েন্ট তো অনেক।

বোস বোকা লোক নয়। বোকা হলে এত অল্প বয়সে এত ওপরে উঠতে পারত না। কথাটা শুনে একটু হাসল। আবার পকোড়া আর বিয়ার খেয়ে বলল, আই হ্যাভ মাই ভাইসেস অলসো। কিন্তু একটা জিনিস কি জানেন? আপনি যদি কেবল আমার দোষগুলো লক্ষ করেন তা হলে কোনওদিনই

আমাকে ভালবাসতে পারবেন না। মিসেস বোসের প্রবলেমটা এখানেই।

বলেই হঠাৎ বোস পিছনে হেলে ছাদের দিকে চেয়ে বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল, দূর ছাই। এসব কথা আপনাকে বলছিই বা কেন?

আপনাদের ভিতরকার প্রবলেমটা কী তা আমি আজও জানি না। তবে মিসেস বোস ইজ এ উয়োম্যান অফ পার্সোনালিটি।

বলছেন! ঠিক আছে, মানছি। কিন্তু শি ইজ ক্রিয়েটিং এ ডেঞ্জারাস মানিটারি প্রবলেম ফর মি।

কী রকম?

কোম্পানি এক্সিকিউটিভদের অবস্থা যতটা ভাল বলে লোকে মনে করে আসলে তো ততটা ভাল নয়। আপনিও জানেন, আই হ্যাভ বিগ এক্সপেন্ডিচারস। মিসেস বোস হ্যাজ ইভন গ্রেটার এক্সপেন্ডিচারস। উনি খুব বড়লোকের মেয়ে নন, তবু খরচের হ্যাবিটচা এত সাংঘাতিক— ইউ নো।

আপনার কি টাকার প্রবলেম চলছে বোস সাহেব?

ভেরি অ্যাকিউটলি। কোম্পানিতে আমার দেদার লোনও হয়ে গেছে। হাজার ত্রিশেকের কাছাকাছি।

বলেন কী?

বোস আর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, সেটাও একটা মস্ত প্রবলেম। নতুন কোম্পানিতে যাওয়ার আগে এই কোম্পানির টাকা শোধ করতে হবে। নইলে দেয়ার মে বি আগলি কনসিকোয়েন্সেস।

বুঝতে পারছি।

বোস হাসল, বুঝতে তো পারছেন, কিন্তু এই টাকাটা আমি কোথায় পাব তা বলতে পারেন কি?

দীপনাথের মনে পড়ল, মণিদীপা তাকে কয়েকবারই বলেছে 'আমি ওকে শেষ করে ছাড়ব।' বোস সাহেবকে সেসব কথা কোনওদিনই বলা যাবে না। বলতে গেলে এই প্রথম তার বোস সাহেবের ওপর খানিকটা মায়া হচ্ছিল। এতকাল এই লোকটার তাঁবেদারি সে করেছে বটে, কিন্তু কোনওদিনই বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বোধ করেনি। বরং মণিদীপা বোসকে শেষ করছে ভেবে সে মনে মনে এক রকমের আনন্দও পেত। আজ কষ্ট হল। বোস কোনওদিন এত খোলামেলা কথাবার্তা বলেনি তার সঙ্গে।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বিষণ্ণ মুখে বলল, না। ত্রিশ হাজার আমার কাছে অনেক টাকা।

আমার কাছেও।— বলে বোস আবার একটা শ্বাস ছাড়ে। আস্তে করে স্বগতোক্তির মতো বলে, ক্লাবে আনপেইড বিল কত জমে গেছে কে জানে। হায়ার পারচেজ-এর দোকানেও অনেক পেমেন্ট রয়ে গেছে। বাংগালোরে যাওয়ার আগে সবই মেটাতে হবে। যাকগে, যা বলছিলাম। আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন মিস্টার চ্যাটার্জি? আই নিড ইউ।

একটু ভেবে দেখি।

খুব বেশি ভাববেন না। তা হলে আর যাওয়া হবে না।

দ্বিধার সঙ্গে দীপনাথ বলে, বাংগালোরে বোধ হয় খরচ বেশি।

একটু বেশি হতে পারে। তবে সেখানে আমি তো বিশাল বাংলো পাব। মিসেস বোস যদি না যান তা হলে ইউ মে শেয়ার দি হাউস। আপনার মাসে কত হলে চলে যায়?

দীপনাথ মিথ্যে করে বাড়িয়ে বলতে পারত। কিন্তু মিথ্যে কথাটা চট করে তার মুখে আসে না। তাই বলল, ছ'-সাত শো।

বোস মৃদু স্বরে বলল, আপনাকে আমার হিংসে হয়। এত কমে চালান কী করে?

দীপনাথ করুণ করে হাসল। কী করে সে চালায় তা তো বোসকে তারই জিজ্ঞেস করার কথা।

অন্ধকার বারান্দায় দু'জনের কথাবার্তা হঠাৎ থেমে গেল। নীচে গেটের সামনে একটা গাড়ি এসে

থেমেছে। বোস সাহেবের নিজস্ব ছোট গাড়িটা। দারোয়ান গেট খুলে দিল। গাড়িটা বাঁক নিয়ে ঢুকে এল ভিতরে। মিসেস বোস।

দীপনাথের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কিছু বাড়ল। একটু দমের কষ্ট হতে থাকল। বেশ কিছুদিন হল সে মণিদীপার সঙ্গে অভিমানে কথা বলেনি। আর বোধহয় সেই কারণেই বুকের মধ্যে অনেক বেশি আবেগ জমে উঠেছে।

দু'জনেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

প্রথম স্তব্ধতা ভেঙে বোস সাহেব বলল, প্রস্তাবটা নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি ভাববেন। বেশি সময় নেই।

বোস সাহেবকে এত দুর্বল কোনওদিন দেখেনি দীপনাথ। আজ বিয়ারের ধাঁধার সঙ্গে এই হৃদয়দৌর্বল্য মিশে কেমন ভোম্বল-ভোম্বল লাগছিল নিজেকে। সে কিছুক্ষণ কান খাড়া করে বসে রইল। মণিদীপা যে ঘরে এলেন তা বোঝা গেল ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে। ডাইনিং হলেই বোধহয় বেয়ারার সঙ্গে কিছু কথা বললেন।

দীপনাথ উঠে বলল, আমি তা হলে আসি।

বোস আনমনে সামনের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে বসে ছিল। ঠ্যাংদুটো ছড়ানো। কিছু দেখছে না। শুনছে না।

দীপনাথ আর-একবার বিদায় জানাতে বোস মুখটা ফিরিয়ে যেন অন্য কোনও মানুষকে বলল, গুড নাইট।

দীপনাথ প্যাসেজে ঢুকে একটু অপেক্ষা করে। ডান ধারে দু'টি শোয়ার ঘর, বাঁ দিকে একটা মস্ত লিভিং রুম, সামনে ডাইনিং কাম ড্রয়িং। এতটা অতিক্রম করে তবে সিঁড়ি। কিন্তু এই পথটুকুতে মণিদীপার সঙ্গে দেখা হবে কি? যদি বেডরুমে ঢুকে গিয়ে থাকে?

দীপনাথের ভিতরটা আজ বড় কাঙাল। খুব প্রত্যাশা নিয়ে সে একটু গলাখাঁকারি দিল। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগোতে লাগল। চোখের নজর ডাইনে বাঁয়ে খবর নিচ্ছে। প্রায় বয়ঃসন্ধির অবস্থা। বুক কাঁপছে, গলা শুকোচ্ছে, কান গরম হচ্ছে। অথচ পিকনিক থেকে ফেরার সময়ে এই ভদ্রমহিলা তার খোঁজও নেয়নি।

ডাইনিং হল পর্যন্ত কোনও ঘটনাই ঘটল না। একটু হতাশ হল দীপনাথ। আজকের দিনটা বোধহয় তার ভাল গেল না।

ড্রয়িংরুমে মণিদীপাকে বসে থাকতে দেখবে বলে মোটেই আশা করেনি দীপ। বাইরে থেকে ফিরে কোনও মহিলাই নিজের ড্রয়িংরুমে বসে ম্যাগাজিন দেখে না।

কিন্তু মণিদীপা ঠিক তাই করছে। যেন এ বাসা তার নয়, সে বেড়াতে এসেছে মাত্র। বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছে।

মণিদীপাকে এক পোশাকে দু'দিন কখনও দেখেনি দীপ। আজও তার পরনে দীপনাথের না-দেখা একখানা নীল শাড়ি। যাদের রং চাপা তাদের নীল রং পরতে নেই। এমন একটা কথা কারও মুখে কখনও শুনে থাকবে দীপ। তাতে নাকি কালোকে আরও কালো দেখায়। কিন্তু মণিদীপা সেই নীল রংকে হজম করে আরও সুন্দর হয়ে বসে আছে। মস্ত চওড়া সোফায় গা ছেড়ে বসার ভঙ্গিটির মধ্যে একটু অহংকার মেশানো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। তবে হ্যাঁ, ভঙ্গি, মুখের ভাব সব কিছুর মধ্যে একটা অপেক্ষার ভাব আছে ঠিকই।

কিন্তু কার জন্য অপেক্ষা? বুকের মধ্যে একটা আশার পাখি হঠাৎ গুড়গুড় করে ওঠে যে!

আত্মবিস্মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল দীপনাথ। বোকার মতোই। প্রথম কয়েক সেকেন্ড মণিদীপা লক্ষই করল না। তারপর হঠাৎ বড় বড় চোখ তুলে নীরবে তাকাল। চোখে সেই পুরনো অহংকার।

চোখে চোখ। কয়েকটি দ্বিধাগ্রস্ত মুহূর্ত।

আচমকাই মণিদীপা জিজ্ঞেস করে, কী চলছিল? বিয়ার?

ওই একটু।

হাতের ম্যাগাজিনটা আবার দেখতে দেখতে মণিদীপা বলল, আগে তো এসব খেতেন না!

এখন মাঝে মাঝে খাই। বারণ করবার তো কেউ নেই।

মণিদীপার চোখ আবার উঠল। এবার চোখ দুটো বেশ কঠিন।

বারণ করারও লোক চাই নাকি?

লোক কেউ থাকলে ভাল লাগত।

আজকাল বেশ সাহসের সঙ্গে কথা বলতে পারেন তো!

মরিয়ার সাহসের অভাব হয় না।

মণিদীপা চমৎকার একটু হাসল, স্লেভারির চেয়ে এরকম সাহস অনেক ভাল।

তা হলে আমার উন্নতি হচ্ছে বলছেন?

বোধহয়। আর-একটু না দেখলে বোঝা যাবে না।

তা হলে দেখুন।— বলে একটু বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় দীপ। হেসে বলে, অনেককাল দেখেন না।

তাই নাকি?— খুব শ্লেষের সঙ্গে বলে মণিদীপা।

কিন্তু দীপনাথ আর সেই পুরোনো সংকোচটা বোধ করে না। বোস বাংগালোরে চলে যাচ্ছে এবং তাকে মিনতি করছে সঙ্গে যাওয়ার জন্য। তাতে বোস সাহেবের ওপরওয়ালাসুলভ চরিত্রটা ভেঙে গেছে। মণিদীপা ছিল বসের বউ, কিন্তু সেও এখন সম্ভাব্য ডিভোর্সের গাড্ডায়। তবে দীপনাথের আর কাকে সংকোচ?

দীপনাথ তাই খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি একটা গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেদিন। আমার বিশ্বস্ত বন্ধুরা আমাকে না নিয়েই চলে এসেছিল। অথচ সেইসব বন্ধুদের পায়ে কাঁটা ফুটলেও আমাকেই দায়ী হতে হত।

মণিদীপা হঠাৎ নিভে গিয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়।

ম্যাগাজিনটা ফেলে রেখে নিজের খাটো চুল খোঁপায় বাঁধার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলে, আমার দোষ ছিল কি না ঠিক জানেন?

আপনার কথা বলছি না।

তবে কার কথা?

আমার ছদ্ম-বন্ধুদের কথা। আর দোষের কথাই বা উঠছে কেন? আমি সামান্য মানুষ, নজরে পড়ার মতোই তো নয়।

আমি খুঁজছিলাম। কিন্তু সেদিন ওঁকে নিয়ে এত বেসামাল হয়ে যাই যে কিছু করার উপায় ছিল না। দে ওয়্যার মেকিং এ সিন। আমি মিসেস সিনহাকে বলেছিলাম আপনাকে যেন ওঁদের গাড়িতে তুলে নিয়ে আসেন। পরে মিসেস সিনহা আমাকে বললেন তাড়াতাড়িতে আপনাকে নাকি খুঁজে পায়নি।

তা হবে।— উদাসভাবে বলে দীপ। তারপর দরজার দিকে এগোয়।

শুনুন।

বলুন।— তেমনি উদাস স্বর দীপনাথের।

নিশ্চয়ই আপনি ও ব্যাপারটার জন্য আমার ওপর চটে যাননি!

আপনার ওপর চটার প্রশ্নই ওঠে না।

ছদ্ম-বন্ধু বলতে আপনি আমাকেই মিন করছেন।

না। আপনাকে কেন মিন করব?

না হলে আপনার কোন বন্ধুই বা ওখানে ছিল?

বোধহয় সবাই আমার পরম বন্ধুই ছিল ওখানে।

একটু ঝাঁঝালো স্বরে এবার মণিদীপা বলে, এত ন্যাগ করতেও পারেন আপনি। আচ্ছা বাবা, ক্ষমা চাইছি। কান ধরছি।

হাসিমুখে দীপ ফিরে দাঁড়ায়। তার রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। একটু মিষ্টি কথাতেই উবে যায়। সে বলল, অতটার দরকার নেই।

এবার আর রাগ নেই তো?

মোটেই নেই।

আবার আমি ভাল বন্ধু তো?

নিশ্চয়ই।

বসুন না একটু।

দীপ বসল। কোনও সংকোচ হল না। বোস সাহেব দেখে ফেললেও বোধহয় ক্ষতি নেই, এই মহিলাকে তো সে ডিভোর্সই করবে।

বলুন।

মণিদীপার মুখ-চোখ কাছ থেকে দেখে একটু শীর্ণ মনে হল। কাঁধের হাড় দুটোও একটু বেশি জেগে রয়েছে। বলল, বোস সাহেবের সঙ্গে কী কথা হল?

বাংগালোরে যাওয়া নিয়ে।

আমি কিন্তু যাচ্ছি না, শুনেছেন?

বলছিলেন।

আর কিছু বলেনি?

আর কী?

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মণিদীপা খুব সুন্দর করে একটু হাসল। ন্যাকামি নেই, অঙ্গভঙ্গি নেই, তেমন কোনও কটাক্ষ নেই, তবু নিছক নিজের চরিত্রের একটা সহজ সরল জোরে মণিদীপা কী করে তাকে সম্মোহিত রেখেছে তা দীপনাথ ঠিক বুঝতে পারে না।

মণিদীপা হাসিটা মুছে ফেলে মৃদু স্বরে বলল, যখন ভাঙল মিলনমেলা ভাঙল...।

দীপনাথ একটু গম্ভীর ও দুঃখিত মুখ করে বলে, কিছুই ভাঙবে না। আপনিও বাংগালোরে চলুন।

কেন? আপনার হুকুম?

না, তা নয়। শুনেছি আপনাকে হুকুম করার আলাদা লোক আছে।

আছেই তো। যার চরিত্র আছে সেই হুকুম করতে পারে।

ঠিক কথা। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে কী হুকুম দিয়েছেন?

ভ্রুকুটি করে মণিদীপা বলে, আগে বলুন আমাকে হুকুম দেওযাব লোকটা কে?

হয়তো স্নিগ্ধদেববাবু।

স্নিগ্ধদেব সম্পর্কে আপনার এত স্বচ্ছ ধারণা হল কী করে?

আমার ধারণা নেই। বোস সাহেব বলছিলেন।

বোস সাহেব!— বলে হঠাৎ যেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে মণিদীপা। তারপর চাপা হিংস্র স্বরে বলে, স্নিগ্ধদেবের নাম ওঁর জানার কথা নয়। আপনি বলেছেন ওঁকে?

একটু অবাক হয়ে দীপনাথ বলে, আমি বলব কেন? আমি তো তেমন কিছু জানিও না।

তবে ও জানল কী করে?

দীপ মাথা নেড়ে বলে, তা আমি জানি না।

ও আপনাকে কী বলছিল?

দীপ একটু বিপদে পড়ে যায়। ভরসা এই, এই মেয়েটিকে বোস ডিভোর্স করবে এবং সম্ভবত

দীপের বস হিসেবেও বোস আর থাকছে না। দীপনাথ তাই সাহস করে একটু হাসি মুখে এনে বলে, বলছিলেন আপনি নাকি স্নিগ্ধবাবুর কথায় চলেন।

মণিদীপার চোখে-মুখে ক্রুদ্ধ অহংকার ফুটে ওঠে। ঠোঁট উলটে বলে, আমাকে কেউ কখনও হুকুম করে না। আমি কখনও কারও কথায় চলি না।

তবু আমি ওয়েল-উইশার হিসেবে বলছি, আপনি বাংগালোরে যান। ভাল হবে। মিলনমেলা ভাঙবে না।

ভাঙলে বয়ে গেল। আপনি যাচ্ছেন বুঝি?

ঠিক করিনি। তবে যেতেও পারি।

তাই বুঝি আমাকে অত সাধাসাধি?

কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগল দীপের। কয়েক সেকেন্ড। তারপরই তার ফর্সা রঙে আগুন ধরে গেল যেন। অপলক স্থির চোখে চেয়ে বলল, তার মানে?

মিস্টার বোস আপনাকে বলেননি যে আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন আর আমি আপনাকে নাচাচ্ছি?

দীপনাথ হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে।

মণিদীপা হাসছিল। খুবই বিষাক্ত শ্লেষ ভরা হাসি। আস্তে করে বলল, আমাকে বলেছে।

কী বলেছে?

ওই যা বললাম।

আমি! আপনাকে?

হ্যাঁ, আপনি আমাকে এবং আমি আপনাকে। বলা উচিত ছিল। স্নিগ্ধদেবের কথা যখন উঠল তখন এটা উঠলেও দোষ ছিল না।

ছি ছি, আমি তো ভাবতেও পারি না।

বলেই দীপ অনুভব করল তার ভিতরকার ঠোঁটকাটা ইয়ারবাজ আর-একটা দীপনাথ খুব হোঃ হোঃ করে হেসে বলল, পারোও বটে হে তুমি। ভাবতে ভাবতে ছাল তুলে ফেললে, আর মুখে বলছ ভাবতে পারো না!

আপনি ভাবতে না পারলে কী হবে? বোস সাহেব তো ভাবছেন।

খুব ভুল ভেবেছেন উনি।

ভুল ভাবায় উনি একজন বিশেষজ্ঞ। কিন্তু এ ব্যাপারটা হয়তো ততটা ভুল ভাবেননি।

এই বলে মণিদীপা হঠাৎ মুখে রঙিন ম্যাগাজিনটা চাপা দিয়ে আড়ালে হাসতে থাকে।

দীপ অবাক হয়ে বলে, কোন ব্যাপারটা?

এই আপনার আর আমার ব্যাপারটা।

তার মানে?

আপনি হয়তো সত্যিই আমার প্রেমে পড়েছেন।

কী যে বলেন!— দীননাথ বোধহয় রামধনুর মতো বহুরঙা হয়ে গেল লজ্জায়, ঘেন্নায়, আত্মধিক্কারে।

খুব অসম্ভব ব্যাপার কি?

খুবই অসম্ভব।

তা হলে আমার পক্ষে বেশ দুঃখের কথা। সারা জীবনে বহু লোক আমার প্রেমে পড়েছে। প্রায় সব পরিচিত যুবক এবং প্রৌঢ়। আপনারই বা না পড়ার কী?

কী যে বলেন!

দোষের তো কিছু নয়।

মিসেস বোসের মুখ ম্যাগাজিনে ঢাকা। তবু চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি হাসছে।

দীপ দরজার নবের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, আমি কারও প্রেমে পড়িনি।

সত্যিই?— বলে চোখ বড় করে মণিদীপা।

বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে।

তা হলে আর বাংগালোরে গিয়ে আমার কী হবে? আপনি যদি আমার প্রেমে পড়তেন তা হলে বাংগালোরে গিয়েও সুখ ছিল!

ইয়ারকি করছেন?

মণিদীপা খুব ধীরে ধীরে ম্যাগাজিনটা মুখ থেকে নামায়। মুখে এতটুকু হাসি নেই. মজা নেই। বড় বড় দু'খানা চোখ নেমে যায় কার্পেটের দিকে।

জবাবের জন্য অপেক্ষা করে না দীপ। দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

যদি কেউ ড্রয়িংরুমে থাকত তা হলে দেখত, জ্ঞানবয়সে মণিদীপা এই প্রথম সচেতনভাবে কাঁদছে।

॥ চব্বিশ ॥

পরদিন অফিসে এসেই দীপনাথ শুনল, আমেদাবাদ থেকে স্বয়ং বড় মালিক এসেছেন। বোস সাহেবের সঙ্গে রুদ্ধদুয়ার আলোচনা চলছে। অফিসে জোর কানাঘুষো, বড় মালিক বোস সাহেবকে ছাড়তে রাজি নন। তার জন্য বোস সাহেবকে আরও অনেক বেশি মাইনে দিতেও তিনি প্রস্তুত।

অফিস বলতে চল্লিশ বাই কুড়ি একটা হলঘর। গাদাগাদি স্টিলের টেবিল-চেয়ার, ফাইল-ক্যাবিনেট লোহার আলমারি। শুধু বোস সাহেবের জন্য আলাদা একটা কাঠের ঘেরা দেওয়া চেম্বার।

দীপনাথ সম্পর্কে অফিসের সকলেরই প্রথম-প্রথম একটু সন্দেহের ভাব ছিল। সম্ভবত তাকে বোস সাহেবের স্পাই বলে মনে করত। এখন আর সে ভাবটা নেই। বরং দীপনাথ যে এখনও পাকা চাকরি পায়নি তার জন্য কারও কারও কিছু সহানুভূতি আছে।

আগে এ অফিসে বাঙালি প্রায় ছিলই না। ইদানীং বোস সাহেব কিছু বাঙালি ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন। কম বেতনের কেরানি বা টাইপিস্ট নেওয়ার ক্ষমতা বোস সাহেবের হয়তো আছে।

দীপনাথ গিয়ে টাইপিস্ট রঞ্জন রায়ের মুখোমুখি চেয়ারে বসল। রঞ্জন একদম হালে ঢুকেছে। মাস দুই হবে বোধ হয়। চেহারাটা খুব রোগা, মুখে শুকনো খড়ি-ওঠা ভাব, চোখ গর্তে, গাল ভাঙা। তবে লম্বা চুল আর জাঁদরেল জুলপি আছে। কিন্তু রঞ্জনের পোশাক-আশাক খুবই সাদামাটা। সাধারণ একটা লাল-সাদা চেককাটা হাওয়াই শার্ট আর পরনে বোধ হয় এসপ্লানেডের ফুটপাথ থেকে কেনা স্ট্রেচলনের সস্তা বেলবটম, পায়ে চটি। ছেলেটা সর্বদাই খুব গম্ভীর থাকে। কিন্তু কথা শুরু করলে আবার অনেক কথা কয়।

দীপনাথ জিজ্ঞেস করল, বোস সাহেবের ঘরে কনফারেন্স কতক্ষণ চলছে?

রঞ্জনের এখন কোনও তেমন কাজ নেই বোধ হয়। ডান হাতের মুঠোটা মুদ্রাদোষবশত সব সময়ে মুখের সামনে মাউথপিসের মতো ধরে রাখে। ওই ভঙ্গিতেই বলল, তা ঘণ্টা খানেক হয়ে গেল।

মালিকের চেহারা কেমন দেখলে? খুব বুড়ো?

না, তেমন বুড়ো নয়। বছর ষাটের হবে। একেবারে আমার মতো দেখতে। রোগা চিমসে চেহারা। তবে ভীষণ লম্বা। ছ'ফুটের ওপর। সঙ্গে আরও সাঙ্গোপাঙ্গ আছে।

ক'জন হবে?

জনা চারেক। সবাই নাকি মালিক। বড় মেজো সেজো।

তা হলে খুব লড়ালড়ি হচ্ছে, কী বলো?

রঞ্জন হাসল। বলল, তাই তো মনে হচ্ছে।

কোনদিকে ফয়সালা হবে মনে হয়?

কী করে বলি? বোস সাহেব চলে গেলে আমাদের চাকরিরও বারোটা বাজবে। ক'দিন হল এসব ভেবে আরও শুকিয়ে যাচ্ছি। মালিক যখন নিজে এসেছেন তখন...

মালিক কি খুব বড় অফার দিয়েছে?

সবই গুজব। তবে অতদূর থেকে তো কেবল মিঠ্যা বাত বলতে আসেনি। মালকড়ির কথাই হচ্ছে বোধ হয়।

দীপনাথ একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে। বোস থাকলে তার সব দিক দিয়েই সুবিধে। বলল, কনফারেন্স আর কতক্ষণ চলবে?

বলতে পারি না। শুনেছি আজই হেস্তনেস্ত যা হয় হয়ে যাবে। ফেলাদা অবশ্য কালই আমাকে বলেছে অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা করতে।

সবিস্ময়ে দীপনাথ বলে, ফেলাদা কে?

রঞ্জন একটু হেসে বলে, ফেলাদা বোস সাহেবের ডাকনাম।

তুমি ওঁকে চেনো নাকি?

চিনি না আবার! আমার পিসতুতো দাদা।

বলো কী? এতদিন জানতাম না তো?

অফিসে আত্মীয়তার ব্যাপারটা গোপন রাখাই ভাল।

সে অবশ্য ঠিক। তোমার আপন পিসির ছেলে?

হ্যাঁ। তবে তেমন ঘনিষ্ঠতা তো নেই। ফেলাদাও এখন টপ বস। ফান্ডাই আলাদা।

দীপনাথ বুঝল, সম্পর্কে ভাই হলেও রঞ্জন বোধ হয় বোস সাহেবের ওপর তেমন সন্তুষ্ট নয়। সাবধানে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা বেঁচে আছেন?

রঞ্জন একটু অবহেলার মুখভঙ্গি করে বলল, আছে না-থাকার মতোই! মাথার গোলমাল।

বোস সাহেব মামাকে দেখতে-টেখতে যান না?

নাঃ। ওসব ফেলাদা পছন্দ করে না। আত্মীয়তা তো সব বোগাস ব্যাপার ওদের কাছে।

তবু তো তোমাকে চাকরি দিয়েছেন।

দিয়েছেন।— রঞ্জনের গলার স্বরে কোনও কৃতজ্ঞতা ফুটল না, আমাকে না দিলেও আর কাউকে তো দিতেই হত।

বোস সাহেবের নিজের মা-বাবা নেই?

কেন থাকবে না? টালিগঞ্জে ওদের বিরাট জয়েন্ট ফ্যামিলি।

সেই ফ্যামিলির সঙ্গে বোস সাহেবের যোগাযোগ নেই?

একটু-আধটু কি নেই! তবে না থাকার মতোই। ফেলাদার মা-বাবা অর্থাৎ আমার পিসি আর পিসেমশাই খুব ভাল মানুষ। বলতে কী তাদের জন্যই আমার এই চাকরি। কিন্তু ফেলাদা দারুণ সেলফিশ।

মা-বাবাকে দেখেন না বুঝি?

এমনিতে দেখার দরকার নেই। ফেলাদার আর দুই ভাইও ভাল চাকরি করে, পিসেমশাই পেনশন পান। ওদের ভালই চলে যায়। কিন্তু টাকাটাই তো বড় কথা নয়। সোজা কথা ফেলাদার কোনও দরদ নেই। বউটাও হয়েছে তেমনি। আপনি তো ওদের ভালই চেনেন!— বলে একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসল রঞ্জন।

আমি কর্মচারী। যেটুকু চিনি তা কর্মচারী হিসেবে। মানুষ কেমন তা তো বিচার করিনি।

কিন্তু আপনি তো ওদের সঙ্গে টুরেও যান শুনেছি।

তা অবশ্য যাই। কিন্তু দূরত্ব থাকে।

বউটাকে আপনার কেমন মনে হয়?

কেন, এমনিতে তো ভালই।

রঞ্জন একটু করুণার হাসি হাসল। চাপা গলায় বলল, কিছুই জানেন না। একটা আস্ত ভ্যাম্প। ফেলাদার বারোটা না বাজিয়ে ও মেয়ে ছাড়বে না।

মণিদীপা সম্পর্কে এসব কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল না দীপনাথের। সে উদাসভাবে বলল, তাই নাকি?

জিনস পরা মেয়ে পথেঘাটেই দেখতে ভাল, কিন্তু আমাদের মতো মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে ওসব মেয়ে চলে না। আমার ও রকম বউ হলে থাপ্পড় মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিতাম।

দীপনাথ একটু চিন্তা করে বলে, তোমার কথাটা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তবে সব কিছুর জন্য তো কেবল মেয়েদেরই দোষ দেওয়া যায় না।

মেয়েদের দোষ দিচ্ছে কে? ফেলাদা যে তার বউকে কন্ট্রোল করতে পারে না তার জন্য ফেলাদাই দায়ী। অথচ ওদের লাভ-ম্যারেজও নয়।

জানি। শুনেছি মিসেস বোস গরিব ঘরের মেয়ে।

গরিব মানে একদম ভুখ্‌খা পার্টি। বাপ পলিটিকস করত। চাকরি-বাকরি করেনি কোনওদিন। পার্টি থেকে কিছু কিছু পেয়ে টেনেমেনে সংসার চালাত। ওদের বাড়ির সবাই পলিটিকসের পোকা।

মিসেস বোসের বাবা কি কোনও নেতা-টেতা?

না না। স্রেফ ক্যাডার।

ও।— বলে দীপনাথ চুপ করে থাকে।

রঞ্জন তার মুঠোর মাউথপিস সরিয়ে নিয়ে চুল ঠিক করছিল। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। দীপনাথ চকিতে দেখতে পেল, রঞ্জনের সামনের সামান্য উঁচু দুটো দাঁতের রং কালচে। বোধ হয় পোকা লেগেছে। একটা দাঁত বোধ হয় আধখানা ভাঙাও।

রঞ্জনকে কেন মাউথপিস সামনে রাখতে হয় তা বুঝতে পারল দীপনাথ। মানুষের যে কত কমপ্লেক্স থাকে!

রঞ্জন আবার মাউথপিস সামনে ধরে বলল, শুনেছি ফেলাদায় আর বউদিতে নাকি খুব খাড়াখাড়ি। ডিভোর্সও হয়ে যেতে পারে।

তাই নাকি?— বলে বিস্ময়ের ভান করে দীপনাথ।

শুনেছি। যদি ডিভোর্স হয় তো ফেলাদা জোর বেঁচে যাবে।

তোমার সঙ্গে মিসেস বোসের ভাল আলাপ আছে?

না। তবে দেখেছি। আমাদের পাত্তাই দিতে চায় না। তাকালে যেন মনে হয় পোকামাকড় দেখছে।

একটু ডাঁটিয়াল, না?

সেন্ট পারসেন্ট। অথচ ডাঁটের কী আছে বলুন? গায়ের রং তো টেলিফোনের মতো। বাপেরও কিছু মালকড়ি নেই। তবু এমন রং নেবে যে আপনার গায়ে বিচুটি লেগে যাবে। লোয়ার ক্লাস থেকে আপার ক্লাসে উঠে এখন চোখে ভেলভেট দেখছে।

দীপনাথ আড়চোখে দেখল, উর্দিপরা একজন বেয়ারা ট্রে-ভর্তি কোল্ড ড্রিংকস নিয়ে বোস সাহেবের চেম্বারে ঢুকছে। সাদা স্ট্রগুলো বোতলের মুখ থেকে উঁচু হয়ে আছে। দৃশ্যটা সুন্দর দেখায়।

দীপনাথ চেম্বারের দরজার দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে কত পাচ্ছো?

রঞ্জন বলল, মোটে আড়াইশো। ফেলাদা ইচ্ছে করলেই তিনশো সাড়ে তিনশো করতে পারত। কিন্তু করবে না। হি ইজ সেলফিশ।

আত্মীয়রা কেউই বোধহয় মিস্টার বোসের ওপর খুব খুশি নয়, না?

কেউ না। ফেলাদার মা-বাবা পর্যন্ত ওকে পছন্দ করে না।

দীপনাথ চুপ করে বসে রইল। বোস সাহেব যে কেন এত একা তা বুঝতে আর কষ্ট হয় না তার। গতকাল সন্ধ্যায় বোস সাহেব যে কেন তার বন্ধুত্ব চেয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে গেল এখন।

রঞ্জন বলল, আমি শুনেছি আপনি নাকি খুব এফিসিয়েন্ট লোক। অথচ ফেলাদা আপনাকে লেজে খেলাচ্ছে, চাকরি দিচ্ছে না। অফিসে এ নিয়ে কথা হয়।

দীপনাথ কথাটা কানে নিল না। বরং অন্য দিকে চেয়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল, ওঁর ডাকনাম ফেলা কেন বলো তো?

ফেলা? ও। ফেলাদার আগে বোধহয় পিসির আরও ছেলেমেয়ে হয়ে বাঁচেনি। তাই এই ছেলের নাম ফেলা। খুব আদরের ছিল।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, বেশি আদরের ছেলেরা একটু বখা হয়।

রঞ্জন হাসল। বলল, আদরের ছেলেরা বখা হলে আপত্তি নেই। বখা ছেলেরাও অনেক সময়ে মা-বাপকে হ্যাটা করে না। কিন্তু ফেলাদা তো বখা ছেলে নয়। বরং ভাল রেজাল্ট করে পাশ করেছে বরাবর, ভাল চাকরি করছে। একে তো বখা বলে না। এ তো সেলফিশনেস। আদরের ছেলেরা সেলফিশ হবে কেন?

দীপনাথ ভ্রু কুঁচকে ভেবেও এই রহস্যের সমাধান খুঁজে পেল না। কিন্তু বোস সাহেবের একাকিত্বের ব্যাপারটা বুঝতে পারল। লোকটা খুবই আনপপুলার সন্দেহ নেই। সে মাথা নেড়ে হঠাৎ একটু হেসে ঘোষণা করল, মিসেস বোস কিন্তু সেলফিশ নন।

রঞ্জন স্থির চোখে দীপনাথকে একটু মাপজোখ করে নিয়ে বলে, বউদি ফেলাদার চেয়েও বেশি সেলফিশ। আপনি ওকে চেনেন না।

চেম্বারের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। জনা চারেক লোক বেরিয়ে এল কথা বলতে বলতে। তিনজনের পরনে ঝকঝকে স্যুট। শুধু খুব লম্বা এবং রোগা মানুষটির পরনে ধুতি এবং গলাবন্ধ সুতির কোট, মাথায় সাদা পাগড়ি। সকলের পিছনে বোস সাহেব। তাদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না, ডিসিশন কোন দিকে গেছে। তবে তাদের কারও মুখেই গাম্ভীর্য বা হাসিখুশি ভাব নেই।

বোস সাহেব ওদের সঙ্গেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে চারদিকে চেয়ে দেখে নিল একবার। দীপনাথ নিজের উপস্থিতি জানান দিতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বোস সাহেব একবার তাকালও তার দিকে, কিন্তু কোনও ইশারা করল না।

দীপনাথ আবার বসে পড়ল। এই দাঁড়ানোর অবস্থায় তাকে দেখলে মণিদীপা অবশ্যই চাপা হিংস্র গলায় বলত, স্লেভ! স্লেভ! বন্ডেড লেবারার।

ওরা বেরিয়ে যেতেই অফিসে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, নানা রকম অনুমান, আন্দাজ।

হাতে একটা কাজ আছে। সেরে ফেলি।— বলে রঞ্জন তার টাইপ মেশিনে খটাখট শব্দ তুলতে লাগল।

দীপনাথ উঠে সামনের দিকে জানালায় এসে উঁকি দিয়ে দেখল, মস্ত একটা গাড়িতে বোঝাই হয়ে বোস সাহেব সমেত মালিকরা কোথাও যাচ্ছে। অর্থাৎ এখন তার কোনও কাজ থাকছে না।

দীপনাথ বোকা নয়। সে জানে এই কোম্পানির যা ক্যাপিট্যাল ইনভেস্টমেন্ট আছে তাতে অনায়াসে এটাকে উঁচু গ্রেডে তোলা যায়। কিন্তু ব্যবসায়িক কারণে মালিকরা তা চাইছে না। বোস চাইছে। শুধু ব্যক্তিগত বেতন বা ভাতা বাড়ালেই বোস খুশি হওয়ার লোক নয়। সে যে এ কোম্পানিকে হায়ার গ্রেডে তুলেছে তার স্বীকৃতি না দিলে সে খুশি হবেও না। টাকার সঙ্গে

প্রেস্টিজও তার দরকার। মালিকরা সেই মৌলিক ব্যবসাগত নীতিতে নরম হল কি না সেটাই বড় কথা।

সুতরাং দীপনাথের অনিশ্চয়তা কাটে না।

বোস সাহেবের বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, সাহেব লাঞ্চের পর অফিসে আসবে।

লাঞ্চের এখনও দেরি আছে দেখে দীপনাথ সন্তর্পণে গিয়ে বোস সাহেবের চেম্বারে ঢুকে দরজাটা টেনে দিল। এই চেম্বারে ঢুকতে তার কোনও বাধা নেই। প্রায়ই ঢোকে।

চেম্বারে এয়ার-কন্ডিশনার চলছে। বিশাল ঝকঝকে সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ঘোরানো চেয়ার। মেঝেয় সত্যিকারের উলের কার্পেট। মালিকরা বোস সাহেবকে যথেষ্ট আদরে রেখেছে। এত আদরে থাকলে দীপনাথ বর্তে যেত, আর কিছু চাইত না। মালিকদের কথায় উঠত, বসত। কিন্তু নাম্লে সুখমস্তি। বোস আরও চায়। কেন চায় কে জানে! এ পৃথিবীতে কিছু মানুষের আছে রাক্ষুসে চাওয়া। আলাদিনের দৈত্য কিংবা জিন পরিরাই বোধহয় সেই চাহিদা কেবলই মিটিয়ে যাচ্ছে। দীপনাথ খবর রাখে, এক আধা-সাহেবি কোম্পানির এক ডিরেক্টর বিশ হাজার টাকা মাইনে এবং আর-সব খরচপত্র পায়। এত পাওয়া পছন্দ করে না দীপ। এত পেলে কি জীবনটা বিস্বাদ হয়ে যায় না!

ডাইরেক্ট লাইনে সে বোস সাহেবের বাড়ির নম্বর ডায়াল করল।

মণিদীপা বোধ হয় আর-কারও অপেক্ষায় টেলিফোন কোলে করেই বসে ছিল। প্রথম রিং-এর শব্দটা হতে না হতেই রিসিভার তুলে বলল, হ্যালো।

আমি দীপ।

হুঁ। কী খবর?

একটা খবর বোধহয় দিতে পারি।

কী সেটা?

খবরটা ভাল হলে খাওয়াবেন তো!

আপনার প্রিমিটিভিনেসটা কবে যাবে বলুন তো?

ব্যথাহত দীপনাথ বলে, কেন? প্রিমিটিভিনেসটা কী দেখলেন?

ওই যে খাওয়ার কথা। খাওয়াটা এমন বড় প্রবলেম কি?

দীপনাথ বিষণ্ণ হেসে বলে, আপনার মতো একজন মার্কসবাদীর মুখে কথাটা কি মানাল? দেশের লক্ষ মানুষের মূল প্রবলেমটাই তো এই প্রিমিটিভ প্রবলেম। যা নিয়ে আপনি ভাবছেন, স্নিগ্ধদেব ভাবছেন।

স্নিগ্ধর কথা ওঠে কেন? কথা হচ্ছে আপনার আর আমার মধ্যে। লিভ স্নিগ্ধ।

আমি ওঁর নাম উচ্চারণ করলেও বুঝি ওঁকে অপমান করা হয়?

মণিদীপা অধৈর্যের গলায় বলে, ইউ আর স্টিল প্রিমিটিভ। ইউ আর জেলাস।

দীপনাথ একটু চোখ বুজে দম ধরে রইল। তারপর বলল, আমার জেলাসির কোনও কারণ নেই।

নিশ্চয়ই জেলাস। আপনি জেলাস, মিস্টার বোস জেলাস। আপনারা স্নিগ্ধকে হিংসে করেন, কারণ আপনারা জন্মেও ওর মতো হতে পারবেন না।

সবাই কি নেতা হতে পারে? কাউকে কাউকে তো জনগণও হতে হবে।

স্নিগ্ধ নেতা নয়। আমরা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাস করি না, নেতৃত্বেও নয়।

তা হলে কি কালেকটিভ লিডারশিপ?

ও বাবা। তাও জানেন দেখছি।

একটু একটু শিখছি।

এবার খবরটা কি দয়া করে বলবেন?

তাই তো বলতে চাইছিলাম। কিন্তু আপনি বলতে দিচ্ছেন কই?

সরি। এবার বলুন।

বোস সাহেব বাংগালোরের চাকরি নাও নিতে পারেন। আজ মালিকদের সঙ্গে কনফারেন্স হল।

শুনে মণিদীপা একটু চুপ করে থাকে। তারপর নিস্পৃহ গলায় বলে, তাতে আমার কী?

কিছুই কি নয়?

বোস সাহেবের বাংগালোরে যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে তো কোনও প্রবলেম হয়নি। আমাদের প্রবলেম অন্য। সে আপনি বুঝবেন না।

দীপনাথ বিষণ্ণ হয়ে বলে, ও। আমি অবশ্য আপনাদের প্রাইভেট ব্যাপারে কিছু জানতে চাইছিলাম না। জাস্ট খবরটা দিলাম, যদি তাতে আপনার মত বদলায়।

না, খবরটার তেমন কোনও দাম নেই আমার কাছে। বোস কি ফাইন্যালি ডিসিশন চেঞ্জ করেছে?

তা এখনও জানি না। তবে ভাবসাব দেখে মনে হয়, মালিকরা এ রকম একজন এফিসিয়েন্ট লোককে ছাড়বে না।

এফিসিয়েন্ট!— বলে একটু শ্লেষের হাসিই যেন হাসল মণিদীপা। তারপর বলল, আপনি কষ্ট করে খবরটা দিলেন বলে ধন্যবাদ। যদিও খবরটার কোনও ইমপর্ট্যান্সই আমার কাছে নেই।

শুনুন, মিসেস বোস।

শুনছি। কিন্তু মিসেস বোস নয়, মণিদীপা। আমার নিজস্ব পরিচয়টাই আমার একমাত্র পরিচয়, কথাটা কতবার বলেছি?

মনে রাখতে পারি না। আমরা একটু সেকেলে।

হ্যাঁ, আপনারা কিছু অভ্যাসের দাস।

তাই হবে।

কী বলছিলেন?

কাল রাতে আমি আপনাকে যা বলেছি তার জন্য খুব লজ্জিত।

লজ্জার কী আছে? ফ্র্যাংকনেস আমি পছন্দই করি। আমিও তো আপনাকে কিছু কথা বলেছি।

ওসব তো সত্যি নয়।

কোনটা সত্যি নয়?

ওই যা সব বললেন।

বোস সাহেব আপনাকে আর আমাকে সন্দেহ করে কি না?

দীপনাথের কান লাল হল এত দূরে থেকেও। বলল, ওসব উনি যদি ভেবে থাকেন তো ভুল ভেবেছেন।

ভুল ভাবতে পারেন। তবে সত্যি হলেও লজ্জার কিছু নেই।

কী যে বলেন!

আপনি মেয়েদের বোকা ভাবেন, না?

না তো। কেন?

সব পুরুষই তাই ভাবে।

আমি ভাবি না।

আর মেয়েরাও আবার পুরুষদের বোকা ভাবে।

এসব কথা হচ্ছে কেন?

ভাবছিলাম, আপনি আমাকেও বোকা ভাবেন কি না?

মোটেই না।

না ভাবলেই ভাল। কারণ, আমি বোকা নই।

আপনি তো খুবই বুদ্ধিমতী।
খুব না হলেও মোটামুটি।
কিন্তু কী বলতে চাইছেন?
বলছি যে, আমি পুরুষদের ভাবসাব এবং মতলব টের পাই।
ঠিক বুঝলাম না।
আমি জানি আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন।
না না। ছিঃ ছিঃ কী যে বলছেন সব...
আর তাতে আমি মোটেই রাগ করিনি। বরং খুশি হয়েছি।
কিন্তু ব্যাপারটাই যে সত্যি নয়।— দীপনাথ মিথ্যেটাকে সত্যি বলে চালাবার চেষ্টা করে।
ওপাশ থেকে মণিদীপা খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, আমি মানুষে মানুষে ভালবাসায় বিশ্বাসী। বরং ভাল না বাসাটাই সন্দেহজনক।
কিন্তু সে তো অন্য ভালবাসা।
আমার কাছে সব ভালবাসারই অর্থ এক। ভালবাসা মানেই তো আর বিয়ে বা সেক্স নয়।
তা হলে মিস্টার বোস কী দোষ করলেন? উনি কেন আপনার ভালবাসা পাচ্ছেন না?— খুব বুদ্ধিমানের মতো পট করে কথাটা পেড়ে ফেলল দীপনাথ।
মানুষ হিসেবে ওঁর প্রতিও আমার ভালবাসা এবং সহানুভূতি আছে। তবে আমরা শ্রেণিশত্রুর প্রতি কিছুটা নির্দয়।
মিস্টার বোস আপনার শ্রেণিশত্রু হতে যাবেন কেন? আপনাদের শ্রেণি তো এক।
মোটেই নয়। দেয়ার ইজ এ গ্রেট ডিফারেন্স।
কিসের ডিফারেন্স?
আমি তো আপনাকে আগেও বলেছি আমি হচ্ছি শ্রমিকশ্রেণির মানুষ।
বলেছেন, কিন্তু আমি কথাটা আজও বুঝতে পারিনি।
কারণ আপনার সেই মানসিকতা বা ট্রেনিং নেই।
তা অবশ্য ঠিক।
অথচ শুনেছি আপনি এক সময়ে ছাত্র আন্দোলন করতেন। এবং সেটা করতেন শিলিগুড়িতেই, যেখানে অনেক বিপ্লবীর জন্ম।
দীপনাথ সত্যিকারের অবাক হয়ে বলে, এ কথা আপনাকে কে বলল?
বলেছে শিলিগুড়িরই একটা ছেলে। জেসপের ইঞ্জিনিয়ার। একটা পার্টিতে কিছুদিন আগে আলাপ হল। সে শিলিগুড়ির ছেলে শুনে আপনার রেফারেন্স দিয়েছিলাম।
আমাকে চিনল?
খুব চিনল। নইলে জানলাম কী করে?
তখনকার ছাত্র আন্দোলন তো এখনকার মতো ছিল না।
তা হতে পারে। তবু আপনি যে কোনওদিন কোনও আন্দোলন করেছেন তাতেই প্রমাণ হয় যে, আপনার ব্যাকবোন ছিল।
এখন কি নেই?
না। মিস্টার বোসের তাঁবেদারি করে করে আপনার ব্যাকবোন ভেঙে গেছে। সোজা কথা, মিস্টার বোসরা অন্যের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্যই অত মাইনে পান।
তাই নাকি?
ঠিক তাই। আর সেইজন্যই মিস্টার বোস আমার শ্রেণিশত্রু। আপনারও।
দীপনাথ ঠিক করেছিল, কথাটা বলবে না। কিন্তু এখন একটু গুমগুমে রাগ আর উত্তেজনার মাথায়

কথাটা এসে গেল। সে বলেই ফেলল, কিন্তু আপনাকেও যে কেউ কেউ চরম শ্রেণিশত্রু মনে করে।

করতে পারে। তারা কারা?

আপনারই আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ।

আমার আত্মীয়দের আপনি চেনেন?

আপনার এক দেওরের সঙ্গে আলাপ হল। দূর-সম্পর্কের দেওর। সে আপনাকে পছন্দ করে না।

সে কি খুব গরিব?

বেশ গরিব। কেন?

যদি গরিব হয় তবে তাকে আমার ভালবাসা জানিয়ে দেবেন। যে-কোনও গরিবেরই অধিকার আছে আমাকে ঘৃণা করার। কারণ দুর্ভাগ্যবশত আমি একজন ওপরওয়ালার স্ত্রী। কিন্তু যে-কোনও গরিবই আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

এ কথাও কি তাকে জানাব?

নিশ্চয়ই। কিন্তু জানানোর সাহস আপনার হবে না।

কেন?

কারণ চুকলি যারা করে তাদের সৎসাহস থাকে না।

তার মানে?

আপনি কার কথা বলছেন তা আমি জানি। রঞ্জন। সে যদি কোনও কথা আপনাকে বলেই থাকে তবে সেটা আমার কাছে ফাঁস করা আপনার উচিত হয়নি, দীপবাবু। একে সাদা বাংলায় চুকলি করা বলে।

দীপনাথের মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল অপমানে। এই মেয়েটার কাছে সে কেন বারবার এ রকম হেরে যায়? এত নির্মমই বা কেন মণিদীপা?

মণিদীপার শান্ত স্বর ওপাশ থেকে শোনা গেল, শুনুন দীপবাবু, আমি আপনার ভাল চাই বলেই আপনাকে ছোট হতে দেখলে খারাপ লাগে। মনে রাখবেন আপনিও একজন গরিব, আর গরিবের জন্য সামনে বিশাল লড়াই পড়ে আছে। কূটকচালির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে লড়াইটা করবে কে?

দীপনাথ অস্ফুটস্বরে বলল, মাপ করবেন। ঠিক চুকলির জন্য কথাটা বলা নয়।

তাও জানি। আপনি আমাকে একটু চিমটি কাটতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অত সহজে জব্দ হওয়ার মানুষ তো আমি নই। আমার ট্রেনিং আছে।

টেলিফোনটা কান থেকে নামিয়ে সভয়ে দীপনাথ সেটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ওপাশে মণিদীপা এখনও কিছু বলছে। কিন্তু সেটা শুনল না দীপনাথ।

আস্তে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল।

অল্পের জন্য বেঁচে গেল দীপনাথ। বেরোতেই মুখোমুখি বোস সাহেব।

খুবই গম্ভীর মুখ বোস সাহেবের। দীপনাথের দিকে চেয়ে বলল, চেম্বারে আসুন। কথা আছে।

॥ পঁচিশ ॥

দীপ একটু থতমত খেয়েছিল ঠিকই। আবার বোসের সঙ্গে চলার দীর্ঘকালের অভ্যাসবশে সামলেও গেল।

চেম্বারে ঢুকে বোস সাহেবের মুখোমুখি বসল শান্তভাবে। মনে কিছু প্রত্যাশা। চাকরি বা পারমানেন্ট স্ট্যাটাস নিয়ে। দীপনাথ অবশ্য নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। বোস নিজেই যদি বলে।

বোস সাহেবকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ইদানীং দীপ লক্ষ করছে, এই অল্প বয়সেই বোসের গায়ের চামড়া অনেকটাই যেন ঝুলে ঝুলে পড়েছে। শরীরের কোনও বাঁধন নেই। মুখশ্রীতে কিছু শ্রীহীনতা। ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্সের জন্য হতে পারে। কিংবা কোনও অসুখ হওয়াও বিচিত্র নয়।

বোস নিজের চুলে অতি দ্রুত উত্তেজিত আঙুল চালাল কয়েকবার। একটু হাঁফাচ্ছেও। আজকাল অসম্ভব গরম পড়ে গেছে কলকাতায়। জুন চলে গেল। জুলাইয়ের আজ চার তারিখ। বৃষ্টি নেই। কলকাতায় আজকাল বৃষ্টি হয় কম। গরম ক্রমেই বাড়ছে। বৃক্ষহীন শহরের বাতাস বিষিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এই গরমে বোসের মতো আরামপ্রিয় নধরকান্তিদের হাঁফ ধরা স্বাভাবিক। তবু কেমন সন্দেহ হয় দীপনাথের। লোকটার শরীর হয়তো ভাল নেই।

বোস কিছু বলার আগেই তাই দীপনাথ হঠাৎ বলে ফেলল, ইদানীং কোনও মেডিক্যাল চেক-আপ করিয়েছেন মিস্টার বোস?

বোস সাহেব বেশ কষ্টকর একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, না তো! কেন?

আপনার বয়স বেশি নয় জানি। তবু একটা মেডিক্যাল চেক-আপ করিয়ে রাখা ভাল।

বোস একটু অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে, কেন বলুন তো! আমি তো বেশ ভালই আছি।

আমি বলছি না যে, আপনি অসুস্থ। তবে চেক-আপের হ্যাবিট রাখা ভাল। বিশেষ করে যারা রেসপনসিবল পোস্টে কাজ করে তাদের জন্য এটা দরকার। অন্তত হার্ট, প্রেশার আর সুগার।

হেল উইথ দোজ থিংস। শুনুন, কোম্পানি আপগ্রেডেড হচ্ছে।

দীপনাথ অপমান হজম করে অভ্যস্ত। প্রথম কথাটা তাই গায়ে মাখল না। দ্বিতীয় কথাটা শুনে একটু নড়েচড়ে বসল। বলল, মালিকরা রাজি হয়ে গেল তা হলে?

ভারবালি। ফাইনাল ডিসিশন আমেদাবাদে গিয়ে জানাবে। তবে কথার নড়চড় বড় একটা ওদের হয় না।

তা হলে আপনি কি এই কোম্পানিতেই থাকছেন?

সম্ভবত। ওরা আমাকে আমেদাবাদে হেড অফিসে যাওয়ারও অফার দিয়েছে। সেকেন্ড অফার দিল্লির নতুন ব্রাঞ্চের চার্জ। আমি কোনওটাতেই রাজি হইনি। ইস্টার্ন জোনে আমার পাওয়ার অনেক বেশি।

সে কথাও ঠিক।

আগামী কয়েক মাসে এখানে অনেক রদবদল হবে। আমি যদি শেষ পর্যন্ত থাকি তবে আপনি একটা ভাল পজিশন পাবেন।

সাবধানে দীপনাথ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কীরকম পজিশন?

চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেওয়া হবে। আপনি ওই চারটে পোস্টের একটা পেতে পারেন। আবার বলছি, যদি আমি থাকি। আমার ডিসিশন এখনও ফাইনাল নয়।

আর যদি বাংগালোর যান, তা হলে?

তা হলেও ওপেন অফার আছে। কাল রাতেও বলছিলাম। আপনিও যেতে পারেন।

কিন্তু আপনারই যে কোনও নিশ্চয়তা নেই মিস্টার বোস।

বোস মাথা নাড়ল, না, আমার কোনও নিশ্চয়তা এখনও নেই। তবে হয়তো দিন সাতেকের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি তো অনেকদিন অপেক্ষা করলেন। আর তো মোটে সাত-আটটা দিন। মালিকরা ফিরে গিয়েই বোর্ডের মিটিং ডাকবে। তবে সে মিটিং নাম কো বাস্তে। ডিসিশন যা হওয়ার তা এখানে আজই বলতে গেলে হয়ে গেল।

তবু আপনি বাংগালোরে যাওয়ার ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখলেন কেন?

দেয়ার ইজ অ্যানাদার প্রবলেম। কাল রাতে সেটা নিয়েও আপনার সঙ্গে ডিসকাশন হয়েছিল।

মিসেস বোস?

একজ্যাকটলি।

প্রবলেমটা কী?

দীপা নিজেই প্রবলেম। শি ইজ পলিটিক্যালি অবসেস্‌ড। মেয়েদের পলিটিকস করা আমার পছন্দ নয়। দু'নম্বর, শি ইজ গাইডেড বাই অ্যানাদার ম্যান।

আপনি তো কাল ডিভোর্সের কথা বলছিলেন।

ডিভোর্স একটা সোশ্যাল স্ক্যান্ডাল। জবাবদিহি করতে করতে জিব বেরিয়ে যাবে পাঁচজনের কাছে। আমি চাইছিলাম স্নিগ্ধর ক্লাচ থেকে ওকে বের করে বাংগালোরে নিয়ে যেতে।

দীপ একটু ভাবল। বলল, উনি বোধ হয় রাজি নন।

না।

তা হলে কী হবে?

ও যদি শেষ পর্যন্ত রাজি হয় তবে আমি নিশ্চয়ই এ চাকরি ছেড়ে বাংগালোরের অফারটাই নেব। ইট অল ডিপেন্ডস অন হার।

বুঝলাম।— বলে দীপ বিরস মুখে উঠে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত মিসেস বোসের অনিশ্চিত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরেই তার ভাগ্য নির্ভরশীল। ব্যাপারটা খুবই অপমানজনক নয় কি?

বোস একটু ঠান্ডা হয়েছে। হাঁফ-ধরা ভাবটাও আর নেই। বলল, আমি কাল আপনাকে আর-একটা কথাও বলেছিলাম। সেটা কিন্তু ইমোশনের কথা নয়।

কী কথা?

আই রিয়েলি নিড ইউ। প্লিজ ট্রাই টু বি মাই ফ্রেন্ড।

দীপনাথের ভদ্রতায় বাধে। নইলে বলত, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম আছে সন্দেহ করেও বন্ধুত্ব চান? না বলে দীপনাথ একটু কাষ্ঠহাসি হাসল। মাথা নাড়ল শুধু। তার অর্থ, ঠিক আছে।

বোস খুব তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ছিল। হঠাৎ চোখ নামিয়ে টেবিলের একটা কাগজ খামোখা দেখতে দেখতে বলল, আমি জানি কাজটা আপনার পক্ষে বেশ শক্ত। ইন রিয়েলিটি, আপনার ওপর কিছু ইনজাস্টিস হয়েছেও। কিন্তু সেগুলো মেরামত করা অসম্ভব নয়।

মিসেস বোসের মতামতটা কবে জানা যাবে?

জানি না। তবে আজ আমি আর-একবার ট্রাই করব।

একবার স্নিগ্ধদেবকে অ্যাপ্রোচ করুন না!

বোস এবার চোখ তুলে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর ধীর স্বরে বলে, লোকটাকে আমি চিনি। প্রথম দিকে ওপেনলি কয়েকবার আমাদের বাসায় এসেছেও। কথাবার্তায় ভীষণ ভদ্র, হাসিটাও খুব সুইট। কিন্তু অসম্ভব স্টাবোর্ন। ও যদি কোনও কিছু স্থির করে থাকে তবে তা মরলেও বদলাবে না। তা ছাড়া আপনি কি মনে করেন নিজের স্ত্রীকে কোনও ব্যাপারে রাজি করাতে অন্য কারও সাহায্য নেওয়াটা ওয়াইজ ডিসিশন?

সেটা অবশ্য ভেবে দেখিনি।

ম্লান হেসে বোস বলে, আমাকে ভাবতে হয়।

দীপনাথ বিনীতভাবে বলল, যদি অনুমতি দেন তবে আমি একবার এই রিমোট কন্ট্রোলটির কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারি।

রিমোট কন্ট্রোল!— বলে বোস অবাক হয়ে তাকায়।

ওই যে স্নিগ্ধদেব। যিনি আড়াল থেকে মিসেস বোসকে চালাচ্ছেন।

রিমোট কন্ট্রোল!— বলে হঠাৎ হেসে ওঠে বোস। খুব জোরে নয়। তবু সেটা হাসিই। মাথা নেড়ে বলে, রিমোট কন্ট্রোল! একজ্যাকটলি। কিন্তু আপনারও তার কাছে যাওয়ার দরকার নেই। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে ঠিক ওভাবে ফয়সালা হয় না। তবু আপনার অফারের জন্য ধন্যবাদ। আপনি

আজ চলে যেতে পারেন। আমার আজ আর আপনাকে দরকার হবে না। কল ইট এ ডে।

দীপনাথ বেরিয়ে এল।

বাইরে হা হা করছে রোদ। ফুটকড়াই ভাজা গরম। টেরিলিনের নিশ্ছিদ্র শার্টের তলায় গা ভিজে গেল ঘামে।

আনমনে রাস্তা পার হল দীপনাথ। হাতে অনেকটা সময় আছে। এই খর গ্রীষ্মের দুপুরে তার কোথাও যাওয়ার নেই। বোস যদি বাংগালোরে না যায় তবে সে এই কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হবে কোনওদিন। কিন্তু অতটা ভাবতে একটু কষ্ট হয় তার। বোস সাহেব যতই বলুক, লোকটা ধুরন্ধর। কোনও না কোনও দিক থেকে লোকটার ওপর প্রেশার রাখতে হবে। কিন্তু বোসকে প্রভাবিত করার কোনও পথ পায় না দীপ।

স্নিগ্ধদেব। একবার স্নিগ্ধদেবের কাছে খুব যেতে ইচ্ছে করে দীপনাথের। সে হয়তো এক ছদ্মবেশী ট্রটস্কি। সে-ই হয়তো ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। স্নিগ্ধদেবই হয়তো সেই মানুষ যার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করছে। আবার হয়তো-বা সে একটা ফ্রড! একটা সাইকিক কেস। স্রেফ ধোঁকাবাজ।

যাই হোক, একবার স্নিগ্ধদেবের কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করে।

বিলু যে ব্যাংকে কাজ করে সেটা খুব দূরে নয়। প্রীতমটা কেমন আছে জানতে গুটি গুটি সেদিকেই রওনা দিল দীপ। বেলা দুটো বাজবার মুখে মুখে পৌঁছেও গেল।

বিলু কাউন্টারে বসে। চোখাচোখি হতেই চোখ তুলে বলল, সেজদা!

প্রীতম কেমন?

ওই রকমই।

লাবু?

আর কী, দিন দিন দুষ্টু হচ্ছে।

তুই কখন বাড়ি ফিরিস?

দেরি হয়। সন্ধের মুখে মুখে। কেন বলো তো?

না এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। অনেকটা সময় প্রীতম একা থাকে।

কী করব বলো! সবই তো বোঝো।

বুঝি, আবার বুঝিও না। চাকরিটা না নিলেই পারতিস।

পারতাম না। জোরে বোলো না, সবাই শুনবে। কোত্থেকে এলে হঠাৎ?

আমার অফিস তো দূরে নয়।

তাই তো। মনেই ছিল না।

অরুণ আসে-টাসে?

বিলু যেন চোখটা ফিরিয়ে নিল একটু। বলল, আসে। ওর বাবা এই ব্যাংকের ডিরেক্টর।

বিলু কি সত্যিই অরুণের সঙ্গে প্রেম করে? দীপনাথ সাহস করে বলল, কীসে ফিরিস বিকেলে?

লেডিজ ট্রামে। কখনও মিনিবাসে।

অরুণ লিফট দেয় না?

বিলু কি একটু ভয় পেল? কেমন যেন দেখাল মুখখানা। ধরা পড়া ভাল। নিচু স্বরে বলল, কালেভদ্রে। যখন আসে তখন পৌঁছে দেয়।

বিলু অরুণের সঙ্গে প্রেম করলেই বা তার কী? ভেবে পায় না দীপনাথ। সে নিজেও কি মণিদীপার প্রেমে পড়েনি? ওটাও পরস্ত্রী, এটাও পরস্ত্রী। তবু মানুষ এমনই অন্ধ, এমনই নিকৃষ্ট যে, নিজের বেলা আর পরের বেলা দু'রকম চোখ নিয়ে দেখে। দীপনাথও অবিকল তাই। নিজেকে একদিন দীপনাথ হয়তো এ জন্যই ঘৃণা করতে শুরু করবে। নিজেকে ঘৃণা করার অনেকগুলো কারণ ঘটতে শুরু করেছে।

দীপনাথ উদাস মনে জিজ্ঞেস করল, আজ কখন ফিরবি?

দেরি আছে। পাঁচটার আগে তো নয়।

দীপনাথ ঘড়ি দেখে বলল, একটু আগে বেরোতে যদি পারিস তবে আমিও সঙ্গে যেতে পারতাম।

তুমি যাও না বাসায়! ও তো একা আছে, তোমাকে পেলে ভীষণ খুশি হবে। আমি ছুটি হলেই তাড়াতাড়ি চলে যাব।

দীপনাথ ভাবতে লাগল। ব্যাংকের লোহার শাটার নেমে এল সদর দরজায়। লেনদেন বন্ধ। কোথায় যাবে বা কোথাও যাবে কি না তা আজ ঠিক করতে পারছিল না দীপনাথ। সে কি সত্যিই মণিদীপার কাছে রঞ্জনের কথা নিয়ে চুকলি করছিল? ভাবলে এখনও কান লাল হয়ে ওঠে যে!

না রে যাই। আজ অন্য কাজ আছে।

বলে দীপনাথ কাউন্টার ছেড়ে চলে আসতে আসতেও একবার কী ভেবে বিলুর দিকে ফিরে দেখল। বিলুকে একটু অন্যরকম লাগছে না? কেন লাগছে? কয়েকদিন ধরেই যেন একটু অন্যরকম! না? বিলুর চুল আর রুক্ষ নয়। একবেণীতে বাঁধা। ভ্রু কি প্লাক করে বিলু আজকাল? হতে পারে। তবে ঠোঁটে ন্যাচারাল কালারের লিপস্টিক যে দিয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। মুখের উজ্জ্বল রং প্রমাণ করে মুখেও আজকাল কোনও দামি মেক-আপ ব্যবহার করে সে। চোখে কি একটু আবছা কাজলও দিয়েছে?

দীপনাথের ফিরে তাকানো দেখে বিলুও চেয়ে ছিল। দীপনাথ তাই চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে আসে। মনটা খারাপ লাগে। খুব খারাপ লাগে। হয়তো চাকরি করতে গেলে মেয়েদের একটু সাজতেই হয়। এর পিছনে হয়তো অন্য কারণ নেই। তবু কেন মনটা খারাপ হল আজ দীপনাথের?

বিলুর ভাবনাটা শেষ করেনি দীপনাথ। ভাবতে ভাবতেই প্রচণ্ড রোদের রাস্তায় ছায়া দেখে দেখে হাঁটছিল। বিলু আজকাল আগেকার মতো গোমড়ামুখী নয়। বেশ কথা-টথা বলে। হাসে-টাসেও। বয়সটাও যেন যথেষ্ট কমে গেছে।

এসব থেকে অবশ্য কোনও পাকা সিদ্ধান্তে আসতে পারে না দীপনাথ। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা মনখারাপের বাতাস বইতে থাকে।

এই জনকোলাহল, মানুষে-মানুষে বিচিত্র সব সম্পর্ক, সংসারে জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে হরেক জটিলতা, অপমান, দুঃখ ও অভাববোধ, এসব ছাড়িয়ে ওই বহু দূরে এক মহান শ্বেতবর্ণের পর্বত দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য। শুধু তারই জন্য। দীপনাথ বরফকাটা কুড়ুল নেবে না, নাল লাগানো জুতো পরবে না, সঙ্গে নেবে না অক্সিজেন সিলিন্ডার, দড়ি বা তাঁবু। সে একদিন এমনি সাদামাটা ভাবে রওনা দেবে সেই উত্তুঙ্গ প্রেমিক ও প্রভুর কাছে। নিজের তুচ্ছতাকে বিসর্জন দেবে সেই মহিমময়ের অতুলনীয় মহত্ত্বের মধ্যে। একদিন কি পাহাড় ডাকবে না তাকে?

আজ হঠাৎ সেজদা ব্যাংকে এসেছিল।— বিলু একটু দুশ্চিন্তার সঙ্গে বলে।

অরুণ গাড়ি চালাচ্ছিল। মুখ না ফিরিয়েই বলল, সো হোয়াট?

সেজদা কখনও আসে না তো।

তাই বলেই কি আসতে নেই? তোমার সব অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রবলেম। সেজদা ব্যাংকে এসেছিল কেন তা নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে নাকি?

অরুণ ঠিক এসব ব্যাপার বুঝবে না। ওদের পরিবার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ওরা অন্য রকম মানুষ। অঢেল টাকা, অপার স্বাধীনতা। পরিবার থেকে কোনও বাধা নিষেধ নেই। বাপে-ছেলেতে একসঙ্গে বসে মদ খায়, একই ক্লাবে ফুর্তি করতে যায়, মেয়েমানুষ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে।

বিলু তাই দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে বলল, জিজ্ঞেস করছিল যে তুমি আমাকে লিফট দাও কি না!

দিই তো!

দাও সে তো ঠিকই। এখনও তো দিচ্ছ। বললাম যে, সেজদা কথাটা জানতে চাইছিল।

অরুণ গাড়িটা একটু আস্তে করে বলল, প্রবলেমটা কি একটু বলবে খোলাখুলি? সেজদা জানতে চাইল তো তাতে কী হল?

ভাবছি সেজদা আমাদের নিয়ে কিছু ভাবছে কি না।

কী ভাববে?

সন্দেহ করতে তো পারে কিছু!

লাভ অ্যাফেয়ার?

যদি ধরো তাই।

অরুণ হাসল, কথাটা তো মিথ্যেও নয়। আই লাভ ইউ।

ইয়ারকি কোরো না। সেজদা একটু সেকেলে। হয়তো ফ্রেন্ডশিপ বোঝে না। উল্টোপাল্টা কিছু ভেবে বসে আছে।

সেটা কি কোনও অ্যাংজাইটির ব্যাপার আমাদের? তুমি যেমন আছো তেমনি থাকবে। লোকে যা খুশি ভাবতে পারে। আমরা তো বাচ্চা ছেলেমেয়ে নই। ভালমন্দ বুঝি।

বোঝো?— বিলু একটু হাসে।

আলবাত বুঝি।

তা হলে বলো তো, এই যে আমাকে লিফট দিচ্ছ, এটা ভাল না মন্দ?

র‍্যাবিশ, বিলু। এসব নিয়েও তুমি ভাবো নাকি আজকাল? তুমি একদম পাল্টে গেছ।

কী রকম?

আগে তোমার এত সংকোচ ছিল না। কত ফ্রি ছিলে!

আজকাল ফ্রি নই?

একদম নও। সেজদার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও একই লাইন অফ থটস ধরে ফেলেছ।

সংসারে, বিশেষ করে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত সংসারে বেশি ফ্রিডম ভাল নয়, অরুণ।

কে তোমাকে এসব শেখাচ্ছে বলো তো!

কে শেখাবে! নিজেই বুঝতে শিখছি।

বিলু, পৃথিবী তো পিছিয়ে যাচ্ছে না। চারদিকে চেয়ে দেখো কত মুক্ত হয়ে যাচ্ছে সমাজ, কত অবাধ হচ্ছে। নিজের মনের মধ্যে মাথা কুটে মরার সংস্কার থাকলে স্বাধীনতার অর্থই থাকে না। তোমাকে স্বাধীন করবে কে?

বোকো না তো! বকবকানি একদম ভালবাসি না।

অরুণ খুব হাসল। বলল, কেমন দিলাম আস্ত একখানা ভাষণ ছেড়ে!

কলেজের ডিবেটিং-এ বলতে, সে একরকম ছিল। এখন তো দামড়াটি হয়েছ।

আচ্ছা, নাউ আই শ্যাল হোল্ড মাই টাং অ্যান্ড লেট ইউ লাভ।

বিলু খানিকক্ষণ থম ধরে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, তুমি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ, অরুণ?

কী বলো তো!

আমার ভুল হতে পারে। আগে বলো, প্রীতমকে আজকাল তুমি কেমন দেখছ?

কেমন মানে?

মানে প্রীতমকে আগের মতোই রুগ্ন লাগে কি তোমার?

অরুণের মুখে হাসি নেই। গম্ভীর মনোযোগে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, হয়তো খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করিনি। ইজ দেয়ার এনি ইমপ্রুভমেন্ট?

বললাম তো, আমার চোখের বা মনের ভুল হতে পারে। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

আমি লক্ষ করিনি। তুমি কিছু দেখেছ?

মনে হয়। খুব সামান্য একটু যেন, ভুলই হবে হয়তো, তবু—

বিলু আর বলল না। বোধহয় ভাল কথা বলতে নেই বলেই।

অরুণ গম্ভীর মুখেই বলল, ঠিক আছে, আজ লক্ষ করে দেখব।

দেখার কিছু নেই। তেমন কিছু হলে তোমার নজরে এমনিতেই পড়ত।

তার কোনও মানে নেই। প্রীতমের সঙ্গে দেখা হয় বটে। কিন্তু খুব ইনটেনসিভভাবে তো ওকে লক্ষ করি না। মনটা হয়তো নানা রকম চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। মানুষ তো কত সময়ে একটা জিনিস দেখেও দেখে না।

বিলু ভ্রু কুঁচকে সামনের কাচের ওপাশে গতিশীল রাস্তাঘাট দেখছিল। বলল, ক'দিন আগে লাবুর জন্মদিনে কী কাণ্ড করেছিল সে তো জানো।

হুঁ।— অরুণ মাথা নাড়ল। তারপব বলল, দেয়ার মে বি সাম ইমপ্রুভমেন্ট।

ডাক্তার কি তোমাকে কিছু বলেছে?

ডাক্তাররা তো সব সময়ে প্রফেশনাল কথাবার্তাই বলে।

ইদানীং কিছু বলেনি?

না। তেমন কিছু নয়।

ডাক্তারকে একবার জিজ্ঞেস করবে?

আজই তো যাচ্ছি প্রীতমকে নিয়ে। জিজ্ঞেস করব।

আজই আকুপাংচারের ডেট নাকি?

অরুণ বিস্ময়ে ভ্রু তুলে বললে, না তো আজ আচার্যি কবিরাজের ডেট। ভুলে গেছ?

আমি আজকাল ভুলে যাই। এত চিন্তা মাথায়, অথচ অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না।

ন্যাচারাল। তোমার অবস্থায় যে কারও হত।

বিলু একটু স্মিত মুখে বলল, তুমি তো মনে রেখেছ! আমার ভরসা যে তুমিই।

এ কথায় অরুণের ফর্সা রং রাঙা হল, বাজে কথা বোলো না।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বলে ভেবেছ নাকি?

কখনও ওসব জানিয়ো না। তাতে রিলেশনটা হালকা হয়ে যায়।

কী মুশকিল! কৃতজ্ঞতা জানাইনি তো! তবু বকছ কেন?

অরুণ চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালাল।

বিলু বলল, মুডটা হঠাৎ খারাপ করে ফেললে নিজের দোষেই।

অরুণ হঠাৎ হেসে ফেলল এবং চমৎকার দেখাল তাকে। বলল, লিভ ইট। প্রীতমবাবুর যদি কোনও ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে থাকে তবে সেটাই আপাতত বড় কথা।

ময়দানের ভিতর দিয়ে খুব আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে অরুণ। অন্যমনস্ক। গম্ভীর।

বিলু নিজের মনে মনে আর-একবার সম্মোহিত হয়। এই একটি লোককে সে চেনে যে নিজের প্রশংসা একটুখানি শুনলে লজ্জায় রাঙা হয় এবং কখনও-কখনও রেগে যায়। অরুণের অনেক গুণের মধ্যে এই একটা গুণ সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে বিলুকে। অথচ অরুণ কত ব্যাপারে কতই না প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু সেসব বলার কথা বিলুর মনেও থাকে না। অরুণ অরুণের মতোই, সেটা আবার তাকে বলার কী? আজ হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল।

বিলু খানিকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলল, প্রীতমকে বাইরে থেকে যেমন মনে হয়, ও মোটেই সে রকম

নয়। ওর মনের জোর সম্পর্কে আমার এতদিন কোনও ধারণাই ছিল না।

আজকাল খুব স্বামীর প্রশংসা করে বেড়াচ্ছ যে!

যেটুকু বলার সেটুকু বলব না কেন?

অরুণ আবার সিরিয়াস হয়ে বলে, কথাটা মিথ্যে নয়। হি ইজ এ ফাইটার। এ টাফ ফাইটার। হয়তো সেই জোরটার জন্যই লড়তে পারছে। তোমার কি মনে হয় না মনের জোর থাকলে অসুখ সেরে যেতে পারে?

আই বিলিভ ইন সায়ান্স। মনের জোর জিনিসটা ফ্যালনা নয়! কিন্তু তার ক্ষমতার সীমা আছে।

প্রীতম পারবে না বলছ?

পারতে পারে। নট ইমপসিবল।

কিন্তু তুমি চাইছ না যে আমি ওর মনের জোরের ওপর নির্ভর করে কোনও আশার কথা ভাবি।

অরুণ প্রথমে জবাব না দিয়ে মলিন মুখ করে হাসল একটু। তারপর বলল, কথাটা অবশ্য তাই দাঁড়ায়!

কেন চাইছ না, অরুণ?

প্রীতম যদি ভাল হয়ে ওঠে তো লক্ষ বার ওয়েলকাম। কিন্তু তুমি যে-কোনও ইভেনচুয়ালিটির জন্য তৈরি থাকলেই ভাল। তাতে কোনও শকই তোমাকে ভেঙে ফেলতে পারবে না।

ডাক্তাররা যে রুগিদের মনের জোর রাখতে বলে, সেটা তা হলে কী?

সেটাও দরকার। কিন্তু মনের জোরটাই সব নয়। একবার আমার ইস্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার আগে টাইফয়েড হয়েছিল। দিন চারেক টেম্পারেচার ঠায় একশো চারে দাঁড়িয়ে। তখনও টাইফয়েডের মডার্ন ট্রিটমেন্ট বেরোয়নি। চারদিনের দিন রক্ত পরীক্ষা করে টাইফয়েড ধরা গেল। আমি যেই বুঝলাম যে এ অসুখ সহজে সারবে না আর অ্যানুয়াল পরীক্ষাও দেওয়া হবে না, তখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে মনের খুব জোর করতে লাগলাম। বছর নষ্ট হওয়ার আতঙ্কে জোরটা বেশ ভালই দিয়েছিলাম। সন্ধেবেলা টেম্পারেচার সাতানব্বইতে নেমে গেল। ডাক্তাররা পর্যন্ত হাঁ। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। তারপরই তেড়ে জ্বর উঠল। আবার একশো-চার। ত্রিশ দিনের দিন ভাত খাই।

খুবই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে বিলু। ঠোঁটদুটো লিপস্টিক সত্ত্বেও ভারী শুকনো দেখায়।

অরুণ কয়েকবার ফিরে ফিরে দেখল বিলুকে। তারপর বলল, হতাশ হলে বোধহয়!

বিলু কিছু বলল না। কিন্তু একটা বড় শ্বাস ফেলল।

অরুণ গাঢ় আন্তরিক গলায় বলে, তোমাকে মিথ্যে কোনও স্তোক দেওয়াটা উচিত হত না বিলু। তার চেয়ে বাস্তববাদী হওয়া ভাল।

আমি স্তোক চাইনি তো।— বিলু একটু অবাক হয়ে বলে।

তবু বলছি প্রীতমের মনের জোরের ওপর নির্ভর করে খুব একটা বেশি আশা করে বোসো না।

বিলু আবার একটু বড় শ্বাস ফেলে বলল, দিনরাত তো কেবল নেগেটিভ চিন্তাই করে যাই অরুণ! আমাকে সেটা আর শিখিয়ো না তুমি।

নেগেটিভ চিন্তা করতেও বলিনি। যে-কোনও অবস্থার জন্য মনটাকে নিরপেক্ষ রাখা।

হঠাৎ বিলু ঝাঁঝালো গলায় বলে, কেন বাজে বকছ অরুণ, মনকে নিরপেক্ষ রাখা কথাটাই ভণ্ডামি। কেউ কোনওদিন তা পারে না।

চেষ্টা করলেই ডিটাচড হওয়া যায়। তুমি চেষ্টা করছ না। দিনে দিনে তুমি আরও বেশি জেবড়ে জড়িয়ে পড়ছ।

বেশ করছি।

অরুণ হাসল, ক'দিন পর দেখব তুমি হয়তো তারকেশ্বরে মানত করতেও যাচ্ছ।

বিরক্ত হচ্ছিল বিলু। নীরস গলায় বলল, যদি বুঝি তাতে কাজ হবে তো হলে তাও করব। একজন মানুষের জন্যই করব তো!

একটা শ্বাস ফেলে হতাশ গলায় অরুণ বলে, করো। মেয়েরা কোনওদিনই সংস্কারমুক্ত হতে পারে না, এ তো জানা কথা।

আবার ভাষণ!

ভাষণ কেন হবে! তোমাকে তো অন্যরকম জানতাম বিলু। তুমি ছিলে ঠান্ডা, লজিক্যাল, আনইমোশনাল। প্রীতমের এই অসুখ যখন হল তখনও তোমাকে ইমোশনাল হতে দেখিনি। হঠাৎ আজকাল তোমার ভিতরে একটু আবেগ-টাবেগ দেখছি।

বিলু চুপ করে থাকে। এ কথার জবাব হয় না। অরুণ দীর্ঘকালের বন্ধু। বিলুর স্বভাব, বিলুর চরিত্র সবই অরুণের নখদর্পণে। সে যদি আজ কোনও কথা বলে তবে সেটা বাজে কথা হবে না। কথাটা মিথ্যেও নয়। বিলুর ভিতরে কোনওদিনই কোনও আবেগ ছিল না। কোনও কিছুতেই সে উত্তেজিত হয়নি কখনও। এমনকী জ্ঞানত কোনওদিন বিলু কোনও কারণেই কাঁদেনি। অথচ কান্না নাকি মেয়েদের বড় সহজেই আসে। প্রীতম সম্পর্কে বিলু কোনওদিন তেমন কোনও টানও বোধ করেনি, আবার বিরূপতাও নয়।

কিন্তু এই সেদিন যখন লাবুর জন্মদিনে রোগা লোকটা বিছানায় বসে প্রাণপণে বেলুন ফোলানোর চেষ্টা করছিল তখন হঠাৎ সেই সামান্য দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ বিলুর ভিতরে খান খান শব্দে কী যেন ভেঙে গেল। হঠাৎ এল আবেগ, হঠাৎ এল ভয়। প্রীতম মরে যাবে, এই সত্যটাকে সে শান্ত বিষাদে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু রোগা কাঠির মতো হাতে বেলুনটা ধরে কাঁপতে কাঁপতে যখন নিজেব মহার্ঘ শ্বাসবায়ু তার মধ্যে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করছিল প্রীতম তখনই যেন বিলু টের পেল একটা মানুষের কাছে তার নিজের বেঁচে থাকাটা কত জরুরি।

আজকাল আমার মধ্যে একটু-আধটু আবেগ আসছে ঠিকই।— বিলু অনেকক্ষণ বাদে বলল, কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে, সেটা ইললজিক্যাল।

অরুণ নিস্পৃহ গলায় বলে, আমি ইমোশন জিনিসটা বুঝি না। আমার নিজের তো কোনও সেন্টিমেন্ট নেই, বুঝব কী করে? আমার মা যেদিন মারা গেল সেদিন এক ফোঁটাও কাঁদিনি। কোনও দুঃখ বা অভাব বোধ করিনি। আমি বিকেলে একটা পার্টিতেও গিয়েছিলাম। আমি হচ্ছি আলবিয়ার কামুর নায়কদের মতো। ভেরি মাচ কোল্ড-ব্লাডেড।

বিলু চিমটি কেটে বলে, তোমার পরিবারকে জানি। বেশি বোকো না। মায়ের জন্য কাঁদবেই বা কেন, তুমি মাকে তো ভাল করে চেনোইনি। মানুষ হয়েছ গভর্নেসের কাছে। একটু বড় হতেই চলে গেলে বিদেশে। ওরকম পরিবারে কোনও ইমোশনাল সম্পর্কই গড়ে ওঠে না।

তা অবশ্য ঠিক।

কিন্তু তোমার ভিতরে যে ইমোশন টসটস করছে তা একদিন টের পাবে, দেখো। নিজেকে যত আধুনিক ভাবছ, ততটা নও।

বাড়ির গলিতে গাড়ি ঢোকাবার আগেই বিলু নেমে গেল। অরুণ গাড়ি ব্যাক করিয়ে ঢোকাবে। অন্য দিন এই অবস্থায় বিলু গলির মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে ওর জন্য। আজ করল না। এক্ষুনি প্রীতমকে একবার দেখবার জন্য সে কিছুটা অস্থির বোধ করছিল।

দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠে ঘরে ঢুকে দেখল, প্রীতম শান্তভাবে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

বিলু হাতের ব্যাগটা ড্রেসিং টেবিলে রেখে লঘু নিঃশব্দ পায়ে বিছানার কাছে আসে। তারপর খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে প্রীতমের হাত পা মুখ। একটু কি রং বদল হয়েছে চামড়ায়? সামান্য স্বাস্থ্যের ঝিকিমিকি কি দেখা যাচ্ছে না?

ঠিক বুঝতে পারল না।

॥ ছাব্বিশ ॥

এই এখন নিজের মনের ভিতরে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে দীপনাথ। কিছুতেই উঠতে পারছে না। অনেক হাঁচোড়-পাঁচোড় করে যাচ্ছে। কিন্তু মনটা একবার ছেঁচড়ে গেলে খুব সহজে তাকে আবার দু'পায়ে দাঁড় করানো যায় না। এই পৃথিবীতে সে কি সবচেয়ে বোকাদের দলে? যদি বা সে বোকাই, তবে কেন মণিদীপার মতো অমন চনমনে চালাক তুখোড় এক মহিলার সঙ্গে তার একটা হোক-না-হোক সম্পর্ক হল?

এক সময়ে বকুলের প্রেমে পড়েছিল দীপনাথ। কলকাতার জল বছরখানেক পেটে যেতে না যেতেই কৌটোর কারখানায় সব রস নিংড়ে নিল। তখন নারীদেহ মনে পড়লেও নারীপ্রেম কথাটা ভসকা লাগত। এই কিছুদিন আগেও তার নারীপ্রেম নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আসত না। এখনও কি আসে? বলা যায় না ঠিক। তবে মণিদীপা যখন এসেছে, তখন ওগুলো আসতেই বা বাধা কী? ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে তাও জানা নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই মনে একটা তেতো স্বাদ আসছে। একটা কিছু বদলাবে। একটা কিছুর বদল দরকার। কখনও প্রেমিকা, কখনও চাকরি।

মনটা আজ আরও বিগড়ে গেছে বিলুকে দেখে। বিলুর সঙ্গে অরুণের একটা খুব আধুনিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। দীপনাথ সম্পর্কটার ওপরসা চেহারাটা মানে না। তলে তলে কী হচ্ছে সেটাই তার জিজ্ঞাসা। প্রীতম কিছু টের পায় হয়তো। কিন্তু কেটে ফেললেও বলবে না।

গোঁয়ার দীপনাথ তাই বিলুর অফিস থেকে বেরিয়ে খানিক দূর গিয়েও আবার ফিরে এল। অফিসে ঢুকল না। তবে উল্টোদিকের ফুটপাথে একটা দোকানের শেডের তলায় দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়াতে হল বহুক্ষণ। খামোখা এতক্ষণ দাঁড়ানোরও মানে হয় না বলে সে খানিক চিনেবাদাম, কাটা পেঁপে আর আখের রস খেল, এক বিষহরি ওষুধওলার বক্তৃতা শুনল। দোকানে দোকানে শো-কেস দেখে বেড়াল। চারটের কিছু বাদে একখানা টয়োটা লাল রঙের মোটরে চড়ে এল অরুণ। দোষের কিছু নয়, আসতেই পারে।

তারপর বিলু আর অরুণ মিলে ভোকাট্টা হয়ে গেল।

বিলু তার আপন বোন হলেও ওর স্বভাবচরিত্র রুচি সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না দীপনাথ। তারা একসঙ্গে মানুষ হয়নি। ফলে বিলুকে তাব ধাঁধার মতো লাগে।

গরমে রোদে প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছিল দীপনাথের। ক্লান্তি লাগছিল। ট্রাম ধরে সে বোর্ডিং-এ ফিরে আসে। ঘরে কেউ নেই। দুটো তালায় ইন্টারলক করা। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। জানালা দরজা বন্ধ ছিল বলে ঘরটা সহনীয় রকমের ঠান্ডা। দীপনাথ পাজামা পরে খালি গায়ে ফ্যানের নীচে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে। বহুকাল পরে এই অসময়ের ঘুম।

সন্ধেবেলা ঘুম ভাঙতে দেখল, ফুড ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক তাঁর বিছানায় বসে খুব চোর-চোর চোখে তাকে দেখছে। রুমমেটদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় প্রায় নেই বললেই হয় দীপনাথের। তিনজন অচেনা লোক একটা ঘরে রাত কাটায় মাত্র। সারা দিন যে যার ধান্দায় ব্যস্ত থাকে। দীপনাথের মনে পড়ল, ফুড ইন্সপেক্টরের নাম সুখেনবাবু। একটু খাপছাড়া গোছের লোক। চল্লিশ-টল্লিশ বয়স হবে, এখনও বিয়ে করেননি। মোটাসোটা লম্বা ফর্সা আলিসান চেহারা। কিন্তু খুবই নম্র ও লাজুক। গুন গুন করে মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রসংগীত ও অতুলপ্রসাদী বা রজনীকান্তের গান করেন। গলা যে সুরে বাঁধা তা গুন গুন থেকেই বোঝা যায়। বিছানার ওপর লম্বালম্বি একটা নাইলনের দড়িতে ঝোলানো সুখেনবাবুর রাজ্যের জামা-কাপড় পাহাড় হয়ে থাকে। জামা-কাপড় ময়লা হলে সেগুলো কাচাকাচির হাঙ্গামায় না গিয়ে উনি নতুন জামা প্যান্ট কিনে আনেন। পুরোনোগুলো ওইভাবে জমে যাচ্ছে। এরকমভাবে কত জামা হবে তা একবার জানতে ইচ্ছে হয় দীপনাথের। সুখেনবাবু রাতের দিকে সামান্য মদ খেয়ে আসেন, সেটা গন্ধেই টের পায় দীপনাথ।

এ ছাড়া ভদ্রলোকের আর কোনও দোষের কথা তার জানা নেই।

আজ ঘুম ভেঙে দীপনাথ সুখেনবাবুর সুরেলা গুন গুন শুনতে পেল। ও চাঁদ চোখের জলে...

দীপনাথ টপ করে উঠে বসে বলল, বেশ গলা আপনার। শিখতেন নাকি?

সুখেনবাবু ভারী লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে একটু হাসেন। চোখে ভারী চশমা, যেটা স্নানের সময়েও খোলেন না। খালি গায়ে রং ফেটে পড়ছে, কিন্তু বুক পিঠ, কাঁধ, এমনকী কানে পর্যন্ত প্রচুর লোম। মুখে প্রায় সর্বদাই পান। হেসে বললেন, এখনও শিখি।

একটু জোরে করুন। শুনি।

ভদ্রলোক আপত্তি করলেন না। আর একটু গুন গুন করে সুর এবং কথা ঝালিয়ে নিয়ে অনুচ্চস্বরে হঠাৎ গাইতে শুরু করলেন, ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার...

বড় প্রিয় গান দীপনাথের। চোখে জল এসে যাচ্ছিল। লোকটা গায় ভাল।

গোটা চার-পাঁচ গানের পর পাড়ার দোকানে চা আর টোস্টের কথা চাকরটাকে দিয়ে বলে পাঠাল দীপনাথ। জুত করে বসে বলল, বাড়িতে কে কে আছে?

বাবা আছেন। মা, মানে সৎমা আছেন।

বাড়ি কোথায়?

এই তো জয়নগর। যেখানকার মোয়া বিখ্যাত।

জানি। যাইনি কখনও।

কাছেই।

আপনি নিজে বাড়ি যান না?

কখনও-সখনও। খুব কম।

ভাই-টাইরা কী করে?

নিজের ভাই নেই। তবে সৎ ভাই-বোন আছে। তারা এন্ডিগেন্ডি অনেক। ছোট ছোট সব। এখনও কিছু কাজ-টাজ করার মতো বয়স হয়নি।

তা হলে তো আপনার লায়াবিলিটিজও আছে।

তা আছে। মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়।

বাবা কী করেন?

কিছুই নয়। আগে কিছু জমিজমা ছিল। তা সে সব প্রায় সবই বেচে দিতে হয়েছে। এখন মেরেকেটে দু'-চার বিঘে আছে হয়তো।

আপনার টাকাতেই চলে?

চলে কি না কে খোঁজ নিচ্ছে? তবে চলে যায় নিশ্চয়ই কোনওরকমে। দেশের অবস্থা খুব খারাপ। লোকের যে কী করে চলছে সেটা একটা রহস্য।

দীপনাথ একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলে, তা ঠিক।

সুখেন গম্ভীর হয়ে বললেন, মাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকা আয় করে এমন লোকও যে কী করে বেঁচে আছে সেটা ভেবে পাই না। কিন্তু আছে।

আপনি বিয়ে করেননি?

সময়ই পেলাম না। আঠেরো বছর বয়স থেকে রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে পড়তে হল। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের সংসার নইলে কে টানত বলুন?

সুখেনবাবু এমনিতে লাজুক হলেও বোধ হয় নিজের কিছু কথা কাউকে বলতে চান। আজকাল লোকে প্রাণ খোলসা করে প্রাণের কথা বলার মতো লোক পায় না। কাউকে হঠাৎ পেয়ে গেলে পাকা ফোড়া ফেটে গেলে যেমন গলগল করে পুঁজ রক্ত বেরিয়ে আসে। দীপনাথ ঠিক করল লোকটার সঙ্গে ভাব করবে। বলল, আপনার বোধহয় বাবার সঙ্গে বনিবনা নেই!

সুখেন একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, আমার কয়েকটা অ্যামবিশন ছিল। বাবা যদি বুড়ো বয়সে বিয়েটা না করত তা হলে আমার পক্ষে লেখাপড়া বা গানবাজনার শখ মেটানো অসম্ভব হত না।

আপনার তো এমন কিছু বয়স হয়নি। এখনও পারেন।

মনটাই বুড়ো হয়ে গেছে।

সৎ-মা'র সঙ্গে বনিবনা কেমন?

সুখেন একটু চুপ করে থেকে বলেন, বনিবনার প্রশ্ন নেই। বাবা যখন বিয়ে করেন তখন আমি বড় হয়ে গেছি। কাজেই সৎ-মা'র পক্ষে অত্যাচার করা সম্ভব ছিল না। বরং সৎ-মাই উলটে আমাকে ভয় পায়। তার বয়স বোধ হয় আমার মতোই। লোক খারাপ নয়। কিন্তু এই মহিলাকে মায়ের জায়গাটা দিতে পারিনি আর কী।

ভাইবোন ক'জন?

তিন বোন, দুই ভাই।

তারা আপনাকে মানে?

মানে। না মেনে উপায় কী? বয়সের তফাতটা তো বিরাট। কিন্তু কেবল আমাকেই মানে, আর কাউকে নয়। আমি বাড়িতে না থাকায় সেগুলি তেমন ভালভাবে মানুষ হচ্ছে না। অভাবও খুব।

আপনি তো আরও দিতে পারেন ইচ্ছে করলে।

দিয়ে লাভ নেই। বাবার দারুণ খরচের হাত। তার ওপর অভাবে থেকে থেকে এমন হয়েছে, টাকা পেলেই কাছা খুলে খরচাপাতি শুরু করে দেন। মাছ মাংস পোলাও লাগিয়ে দেন। দু'দিনে হাত ফাঁকা।

মা'র নামে পাঠালে পারেন।

তাতে বাবার প্রেস্টিজে লাগে।

দীপনাথ হাসছিল। দেখাদেখি সুখেনও হাসলেন। আসনপিঁড়ি হয়ে নিজের চৌকিতে জুত করে বসে ছিলেন, এবার একটা বালিশ কোলে টেনে নিয়ে আরও আরামে বসলেন। বালিশ বিছানা সবই অবশ্য তেলচিটে নোংরা। বললেন, আপনি খুব বড় চাকরি করেন শুনেছি।

দীপনাথ ম্লান হেসে বলল, বড় চাকরি কিছু নয়। কোনও রকম একটা।

কেন, বড় সায়েবের নাকি ডান হাত? ম্যানেজার বলছিল, দীপনাথবাবু মাসে আড়াই হাজার টাকা বেতন পান। ইচ্ছে করলে যাকে খুশি চাকরি দিতে পারেন।

দীপনাথ সত্যি কথাটা বলতে একটু ইতস্তত করে। অনেক সময়ে মানুষকে তার ভুল ভাবনা নিয়ে থাকতে দেওয়াটা স্ট্র্যাটেজির দিক দিয়েও দরকার। তবে আবার একেবারে নির্জলা মিথ্যেটাও স্বীকার করতে বাধে। সে বলল, ম্যানেজার বাড়িয়ে বলেছে।

তবু আমার মতো উঞ্ছবৃত্তি তো নয়।

উঞ্ছবৃত্তি কেন? আপনারও তো ভাল চাকরি।

কোন দিক দিয়ে? গালভরা নামের সরকারি চাকরি, এইমাত্র। যা পাই তাতে দশ দিনও চলে না।

তা হলে চালান কী করে?

এদিক সেদিক করতে হয়। ডান হাত বাঁ হাত।

দীপনাথের একটা ব্যাপার আছে। সে কখনও ঘুস-টুষের কথা ভাবতেই পারে না। সে বোসের কাছে উঞ্ছবৃত্তি করে বটে, তবু কখনও হিসেবের বাইরের টাকা ছোঁয়নি। সে যে সচেতনভাবে সৎ তা নয়, ডান হাত বাঁ হাতের কথা তার মনেই আসে না আসলে। তার চারপাশের বেশির ভাগ লোকই যে এই অপকর্মটি করে তা জেনেও তার নিজের কখনও ইচ্ছে হয়নি।

দীপনাথ একটু হেসে বলল, সবাই আজকাল করছে।

সুখেনও বিনা জবাবে একটু হাসলেন। প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, আপনাকে তো এ সময়ে বড় একটা দেখতে পাই না। শুনি নাকি অফিসে আপনার অনেক রাত পর্যন্ত কাজ থাকে!

প্রায়ই থাকে। কাজ না হোক, পার্টি-ফার্টি থাকেই।

আজ কি সেসব নেই?

না, আজ একটু ছুটি পেয়েছি।

সন্ধেবেলাটা কী করবেন?

কিছু করার নেই। ভাবছি বই-টই পড়ব।

দূর। বই পড়ে কী হয়? আমি লাস্ট বইটই পড়েছি সেই কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে। এখন শুধু খবরের কাগজখানা সকালে একবার দেখি।

দীপনাথ বইয়ের পোকা। আজকাল অবশ্য বোস সাহেবের হ্যাপা সামলে বোর্ডিং-এ রাত করে ফিরে পড়তে ইচ্ছে করে না। রাতে বাতি জ্বেলে রাখলে রুমমেটদেরও অসুবিধে।

কথাটা শুনে একটু বিরক্ত হল দীপনাথ। তবে কিছু বলল না।

সুখেন বললেন, আজ আমার সঙ্গে চলুন। একটু খাওয়াদাওয়া করে আসি। আমি খাওয়াব।

দীপনাথ একটু ইতস্তত করে। সুখেনকে সে প্রায় চেনেই না। এত অল্প পরিচয়ে এ লোকটার পয়সায় খাওয়া কি উচিত?

তার দ্বিধা দেখে সুখেন একটু করুণ মুখ করে বললেন, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল তো, তাই বলছিলাম। কলকাতায় ফ্র্যাংকলি স্পিকিং আমার কোনও বন্ধু নেই। বলতে কী আপনিই আমার প্রথম বন্ধু।

এত চট করে বন্ধুত্ব পাতাতে দীপনাথের আপত্তি আছে। তবে সুখেন লোকটা বোধহয় বাস্তবিকই একা এবং বন্ধুহীন। নইলে দু'-চারটে কথাবার্তার পরই কেউ অত হ্যাংলার মতো বন্ধুত্ব পাতাতে চায় না। তাই দীপনাথ বলল, ঠিক আছে। তবে আমি কিন্তু মদ-টদ বেশি খাই না।

বেশি নয়। একটুখানি। জাস্ট ফুর্তি করা আর কী!

চলুন।

তা হলে আর দেরি নয়। উঠে পড়ুন।

দীপনাথ ওঠে।

এ কথা ঠিক যে কলকাতা শহরটা দীপনাথের নখদর্পণে নয়। এখনও এর অনেক কানাগলি, গোলকধাঁধা তার চেনা নেই। সুখেন একটা টানা রিকশা ডেকে ঘরের দরজায় দাঁড় করিয়ে বলল, ট্যাক্সি পাওয়ার বহুত ঝামেলা। যেখানে যাব সেখানে ট্যাক্সি ঢোকেও না।

সুখেনের সঙ্গে টানা রিকশায় খুবই চাপাচাপি বোধ করছিল দীপনাথ। সুখেন বেশ স্বাস্থ্যবান। দীপনাথও নেহাত কম যায় না। ফলে চাপে মাজা ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। সুখেন তার মধ্যে বসেই মহানন্দে গুন গুন করে 'দুঃখ আমার প্রাণের সখা...' গাইতে লাগলেন।

রিকশা হ্যারিসন রোড ধরে গিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে পড়ল। খানিক এগিয়ে ডান হাতে যে গলিতে ঢুকল সেটায় কস্মিনকালে আসেনি দীপনাথ। তারপর আরও গলি। আরও সরু ও অন্ধকার গলির পর গলি। সুখেন হাপসে-পড়া রিকশাওয়ালাকে এমনভাবে পথ চেনাচ্ছিলেন যে, মনে হয় উনি চোখ বুজে সব দেখতে পান। পশ্চিমা রিকশাওয়ালাটির ন্যাড়া মাথায় পর্যন্ত ঘাম জমে গেছে। কষ্ট হচ্ছিল দীপনাথের। বলল, চলুন না বাকি পথটা হেঁটে যাই?

দরকার কী! প্রায় এসে গেছি।

রিকশাওয়ালাটার জন্য মায়া হচ্ছে।

মায়া করবেন না। ওরা খুব হার্ডি। আমাদের মতো নয়।

এই নিষ্ঠুরতা ভাল লাগল না দীপনাথের। চুপ করে রইল।

রিকশাকে অবশেষে থামালেন সুখেন। সামনে একটা এঁদো বাড়ি। সেটা কত উঁচু তা এই সরু গলিতে সন্ধের আবছা আলোয় ঠাহর করা মুশকিল।

সুখেন নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে রিকশাওয়ালার সঙ্গে একটু বচসা বাধালেন। তারপর দীপনাথকে বললেন, আসুন।

এখানে কি কোনও রেস্টুরেন্ট আছে?— দীপনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল। বলতে কী বাড়িটার চেহারা দেখে সে একটু হতাশও হয়েছে। একেবারে অবাঙালি পাড়া। নর্দমা আর রোদহীন বাতাসের ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। কম আলোর ভুতুড়ে গলি।

আমি ফুড ইন্সপেক্টর। সব ঘাঁটি চিনি। নিশ্চিন্তে আসুন।

সরু সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির দোতলায় সুখেনের পিছু পিছু উঠে এল দীপনাথ। সুখেন একটা ফ্ল্যাটের দরজার পর্দা সরিয়ে গট গট করে ঢুকলেন।

কোনও রেস্টুরেন্ট বলে মনেই হয় না। সামনের ঘরটা ঠিক যেন কারও বাড়ির খাওয়ার ঘর। একটা মাত্র ডাইনিং টেবিল ঘিরে গোটাছয়েক চেয়ার। স্টিক লাইট জ্বলছে। চারিদিকে ফানুসের মতো আকৃতির আরও কয়েকটা ঘর-সাজানোর বাতি ঝুলছে সিলিং থেকে। দেয়ালে মুখোশ, তির-ধনুক, বিদ্ধ এবং মরা প্রজাপতি সাজানো। বাড়িটা চুপচাপ। শুধু ভিতরের কোনও ঘর থেকে ক্ষীণ রেডিয়োয় বিবিধ ভারতীর শব্দ আসছে। কেউ তাদের রিসিভ করল না। সুখেন গিয়ে ডাইনিং টেবিলের চেয়ার টেনে বললেন, বসুন। ওই কোণে বেসিন আছে, হাত ধুয়ে আসতে পারেন।

এটা তো কারও বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

বাড়িই তো। কিন্তু কাম রেস্টুরেন্ট। পাবলিকের জন্য নয়। বাঁধা খদ্দের। যারা চেনে তারাই আসে।

লোক কই?

আসবে। খেতে হলে এসব জায়গাই ভাল। এরা ঠিক প্রফেশনাল নয়, তাই যত্ন করে খাওয়ায়।

পুরনো বাড়ি বলেই বোধহয় ঘরটায় তেমন গরম নেই। একটা আদ্যিকালের ডি সি পাখা ঘুরছে ওপরে। একটু ধূপকাঠির গন্ধও রয়েছে।

দীপনাথ জিজ্ঞেস করল, এরা কি চিনে?

দো-আঁশলা। খাঁটি চিনেম্যান এখানে পাবেন কোথায়?

কথা বলতে বলতেই এক বয়স্কা চিনে মহিলা এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। মোটাসোটা, হাসিখুশি, স্তনহীন, স্বর্ণদন্তী। পরনে কামিজ আর ঢোলা পাজামা। পায়ে রবারসোলের খড়ম। সুখেন অল্প কথায় অর্ডার দিলেন।

মহিলা চলে গেলে দীপনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, শুয়োরের মাংস খান তো?

দীপনাথ খায়। একটু ঘেন্না হলেও খায়। হেসে মাথা নাড়ল।

সুখেন বলেন, এরা ওইটে ভাল করে।

খাবার এল একটু বাদেই। প্রন-চাউমিন আর পর্ক চপ। পরিমাণে প্রচুর এবং অত্যন্ত সুন্দর গন্ধ ও স্বাদ। সঙ্গে দু' বোতল বিয়ার। কাঁচা পেঁয়াজ এবং স্যালাড। দীপনাথ খেয়ে বুঝল, বহুকাল সে এত ভাল খাবার খায়নি।

সুখেন ভ্রু তুলে জিজ্ঞেস করেন, ভাল নয়?

দারুণ।

ভাল খেতে চাইলে আমাকে বলবেন। এরকম আরও বহু খাওয়ার জায়গা আছে কলকাতায়।

আমার জানা ছিল না।

অনেকেই জানে না।

দীপনাথ হাসল।

সুখেন খেতে খেতেই বলেন, আমার বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না? তখন আপনাকে সত্যি কথাটা বলিনি।

কী কথা?

আমার একজন মহিলা আছেন।

দীপনাথ ভ্রু তুলে বলে, মহিলা?

বিবাহিতা। ছেলেমেয়েও আছে।

সে কী?

সুখেন একটু হাসলেন। ঠোঁট চাউমিনের তেলে মাখা। চকচক করছে। চোখে বিয়ারের উজ্জ্বলতা। এতক্ষণে লোকটাকে হঠাৎ বদমাশের মতো দেখাল। শান্ত লাজুক নিরেট মুখ-চোখে একটা পাপবোধের আবিলতাও ফুটে উঠল। বললেন, বিয়েতে একটু আটকাচ্ছে। সামাজিকতাই বাধা।

দীপনাথ অল্প ভড়কে গিয়ে বলে, বিবাহিতা মহিলা মানে তো স্বামী আছে।

সে ব্যাটা এক নম্বরের পাজি। বদমাশ দি গ্রেট। এখন জেল খাটছে। বউটাকে দেখার কেউ নেই। ছেলেমেয়েগুলো একেবারে অনাথ।

ছেলেমেয়ে ক'জন?

তিনটে।

ভদ্রমহিলার বয়স?

বয়স আছে।

এ ব্যাপারটা সুখেন ভাঙতে চান না বুঝে দীপনাথ আর প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, ও।

আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে একটু পরামর্শ করতে চাই।

দীপনাথ সতর্ক হয়ে বলে, ওটা আপনার পার্সোনাল ব্যাপার। থাক না।

আরে গোপনীয়তা কিছু নেই। আপনি তো আমার বন্ধু, আপনাকে বলতে বাধা কী?

বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে?

ঠিক কিছুই নয়। আমি তেমন ইন্টারেস্টেডও নই। তবে একটু ফেঁসে গেছি। ওই মহিলার কাছে আমি ইনডেটেড। অসময়ে আমার অনেক উপকার করেছে। এখন ওর একটা পার্মানেন্ট আশ্রয় দরকার।

তা হলে আর আমি কী বলব বলুন!

চলুন না একবার মহিলাটির কাছে নিয়ে যাই আপনাকে এখন।

এখন!—বলে দীপনাথ ভড়কায়। একদিনে এত ঘনিষ্ঠতায় হাঁফ ধরে যাচ্ছে তার। বলল, আজ থাক।

বেশি দূর নয়। রিকশায় মিনিট দশেক।

আবার রিকশা!—আঁতকে ওঠে দীপনাথ।

সুখেন হেসে বলেন, আপনার টানা রিকশা ভাল লাগে না, না? আমার কিন্তু বেশ লাগে। মনে হয়, কলকাতার ভিড়ের ওপর দিয়ে যেন নৌকোয় ভেসে ভেসে চলেছি।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমি গিয়ে করবটা কী?

কিছুই নয়। একটু বসবেন, চা-টা খাবেন। বীথি খুশি হবে।

ভারী অস্বস্তি বোধ করে দীপনাথ। রবি ঠাকুর জীবনে জীবন যোগ করার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু বেমক্কা এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়তে তার একদম ইচ্ছে করছিল না। ভয়-ভয় করছিল। সে বলল, কোথায় বাড়ি?

গড়পাড়। আমাদের বোর্ডিং থেকে বেশি দূরও নয়।

খাওয়া হতেই টক করে উঠে পড়লেন সুখেন। চিনে মহিলার সঙ্গে পাশের রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গুনগুন করে কী একটু কথা বলে এলেন।

চলুন।

দীপনাথ জড়তা কাটিয়ে উঠল। লোকটা খাইয়েছে, বন্ধু হতে চেয়েছে, একটু রিটার্ন সার্ভিস দেওয়া উচিত। তবে সে মনে মনে স্থির করে ফেলল এরপর থেকে সুখেনকে আর বেশি পাত্তা দেবে না।

রিকশায় উঠে আবার দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে নিজেদের বোর্ডিং-এর সামনে দিয়েই গড়পাড়ের দিকে চলল তারা। সুখেন গুনগুন করে একটা নজরুলগীতি গাইছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুখেন দু' বোতল বিয়ার টেনেছেন, দীপনাথ কষ্টেসৃষ্টে এক বোতল। বেশ ঝিম ঝিম করছে শরীর।

গড়পাড় দীপনাথের অচেনা নয়। তবু আজ কেন যেন গা ছমছম করছিল।

সুখেন একটা নতুন দোতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে রিকশা থামালেন। আবার রিকশাওয়ালার সঙ্গে একটু বচসা। এবং আবার দোতলায় ওঠা। তবে এ বাড়িটা ঝকঝকে নতুন। চওড়া সিঁড়ি. উজ্জ্বল আলো। দোতলার বাঁদিকে ফ্ল্যাটের দরজায় বোতাম টিপতে ভিতরে পিয়ানোর মতো আওয়াজ হল। দরজা খুলল একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মারকাট যুবা। তার চোখ-মুখে ছমছমে স্মার্টনেস। শরীরখানা বেতের মতো মেদহীন এবং শক্তসমর্থ, কিন্তু মোটাসোটা নয়। গায়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি, পরনে গাঢ় খয়েরি রঙের বেলবটস্, মাথায় লম্বা চুল, গালে কোমল দাড়ি-গোঁফ, চোখে চশমা। খুব ভদ্র ও নরম গলায় বলল, আসুন, আসুন। মা এইমাত্র ফিরল।

সুখেন বললেন, তুমি বেরোচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ।

এই ইনি হচ্ছেন দীপনাথ চ্যাটার্জি। আমার বন্ধু।—বলে দীপনাথের দিকে ফিরে বললেন, বীথির বড় ছেলে স্বস্তি। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে।

দীপনাথ খুবই হতভম্ব হয়ে গেছে। বীথির ছেলে এত বড়? তবে বীথির বয়স কত?

ঘরদোর বেশ বড়লোকদের মতো সাজানো গোছানো। ভাল সোফাসেট, বুক-কেস, রেডিয়োগ্রাম সবই আছে। মেঝেয় একটা উলের ছোট কার্পেট পর্যন্ত। দীপনাথ আরও হাঁ হয়ে গেল। এরা তবে মোটেই গরিব নয়।

সুখেন তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে চট করে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ কেউ এল না। শুধু একটু বাদে স্বস্তি একটা হাওয়াই শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল, বসুন, চা আসছে।

একটু বাদেই সুখেনের পিছু পিছু চায়ের ট্রে হাতে এলেন বীথি। এবং দীপনাথের যা কখনও হয় না, সে প্রথম দর্শনেই এই তিন ছেলেপুলের বয়স্কা মায়ের প্রেমে পড়ে গেল।

বীথির যে বয়স হয়েছে তা তাঁর অদ্ভুত সৌন্দর্য ভেদ করেও বোঝা যায়। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হবে, লাগে সাতাশ-আঠাশ। বেশ লম্বা, দারুণ ফর্সা, সবচেয়ে চোখে পড়ে দু'খানা মায়াবি একটু পুরু ঠোঁট। টসটস করছে আহ্লাদে। এত সুন্দর ঠোঁট খুব কমই দেখেছে দীপনাথ। তাছাড়া মুখখানায় সৌন্দর্য যতটা তার চেয়ে ঢের বেশি কমনীয় নরম একরকম সহৃদয় ভাব। শরীরটা একটু মেদভারে আক্রান্ত। তবু মানিয়ে গেছে। জংলা ছাপা শাড়ি পরে আছেন, খাটো ব্লাউজ. দু' হাতে সোনার দু'টি বালা। সামনের দিকে চুল এমনভাবে ছাঁটা যে কপালের দু'পাশে দুটো চুলের ঝুমকো দোল খায়। কপালে টিপ, ভ্রু প্লাক করা।

দীপনাথ কোনও মেয়ের দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে পারে না। লজ্জা করে। আজ বীথির সুন্দর চেহারা এবং হয়তো বিয়ারের প্রভাবে সে প্রায় চোখের পাতা ফেলতে পারছিল না। সুখেনের মাথা কি সাধে খারাপ হয়েছে?

বীথি বেশি আদব-কায়দার ধার না ধেরে প্রথমেই বলে ফেললেন, দেখুন তো ভাই, আপনাকে নিয়ে আসবে যদি ফোনেও একবার জানিয়ে দিত, তা হলে একটু যত্ন-আত্তির ব্যবস্থা করতাম। এই তো আধঘণ্টা আগে রান্নার লোকটাকে ছুটি দিয়ে দিলাম।

আমরা খেয়ে এসেছি।—দীপনাথ বলল, এবং তার নিজের কানেই নিজের গলা অন্যরকম শোনাল।

সুখেনের মুখে একটা আহ্লাদের হাসি লেগে আছে তো আছেই। এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হচ্ছে না। উনি বললেন, সেকথা কি বলতে বাকি রেখেছি! কিন্তু বীথি না খাইয়ে ছাড়বে না।

বীথি চা এগিয়ে দিয়ে উলটোদিকে বসে বললেন, ফ্রিজে মাংসের ঘুগনি আছে। একটু বসুন, গরম করে দেব।

পেটে জায়গা নেই। পারব না।—দীপনাথ কাতর স্বরে বলে।

জায়গা হয়ে যাবে। বসুন না, খিদে পেয়ে যাবে'খন। হোটেলে মেসে থাকেন, ওরা কী খাওয়ায় তা তো জানি।

হাতের আঙুলগুলো লক্ষ করছিল দীপনাথ। বীথির মতো এত সুন্দর লম্বাটে ললিত আঙুল সে জীবনে দেখেনি।

চায়ে নিঃশব্দে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বীথি বললেন, আজ অফিস থেকে ফিরতেও দেরি হয়ে গেল। রান্নার গ্যাসও ফুরিয়েছে দু'দিন হল। স্টোভ জ্বেলেই সব করতে হবে।

কষ্ট করবেন কেন? কোনও দরকার নেই।

সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা আত্মসচেতনতাও মিশে আছে কি না, ভাবছিল দীপনাথ। কয়েকটা কথাতেই বীথি জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর বাসায় টেলিফোন, ফ্রিজ এবং গ্যাস উনুন আছে। আজকাল মধ্যবিত্তদের ঘরে এসব থাকে এবং তারা এই নিয়ে খুব আত্মপ্রসাদও বোধ করে। বীথির আত্মসচেতনতার কথা ভেবে একটু খারাপ লাগল দীপনাথের।

বীথি ভারী সুন্দর হাসেন। দাঁত ঝকঝকে এবং হাসলে মাত্র অর্ধেক দেখা যায়, বাকি অর্ধেক ঠোঁটে ঢাকা থাকে। সব মিলিয়ে বীথি অতীব কাম-উত্তেজক। তাকিয়ে থেকে দীপনাথ নিজের অসহনীয় উত্তেজনা টের পায়। ভিতরে গর্জন করছে এক ঘুম-ভাঙা বাঘ। আশ্চর্য। কোনওদিন মণিদীপাকে দেখে ঠিক এরকমটা হয়নি। অথচ বীথির বয়স মণিদীপার চেয়ে অনেক বেশি।

বাড়িতে আর কারও সাড়াশব্দ নেই। বীথি বললেন, এ সময়ে কেউ বাড়িতে থাকে না। ছোট ছেলে টিউটোরিয়ালে যায়। মেয়ে এখন লখনউতে—ওদের স্কুলের এক্সকারশনে গেছে।

আপনি হয়তো বিশ্রাম করতেন, অসময়ে আমরা এলাম।—ভদ্রতা করে দীপনাথ বলে।

ওমা! বিশ্রামই তো করছি। কারও কারও সঙ্গে বসে কথা বলাটাও বিশ্রাম।

কথাগুলোর তেমন মানে নেই, শুধু শুনতে ভাল। দীপনাথকে এখানে সুখেন আনলেন কেন তা সে বুঝতে পারছিল না এখন পর্যন্ত। তবে অপেক্ষা করছিল।

ঘণ্টাখানেক গেলে বীথি বললেন, যা গরম পড়েছে, একটু ঠান্ডা বিয়ার খান। ফ্রিজে আছে। ঘুগনিটাও গরম করে আনি।

না-না, করল দীপনাথ। বীথি শুনলেন না। ফলে আবার বিয়ার এবং মাংসের ঘুগনি পেটে চালান হল।

মাঝপথে হঠাৎ সুখেন উঠে বললেন, কাছেই একজন লোকের সঙ্গে দেখা করে আসছি। একটু বসুন দীপনাথবাবু, মিনিট চল্লিশ।

আমিও বরং উঠি।

না না। বসুন না, গল্প করি।—বীথি বললেন।

খুবই ভয়-ভয় করল দীপনাথের। সেই সঙ্গে জেগে উঠল ঘুমন্ত লোভ, কাম, সবকিছু। সদর দরজা বন্ধ করে এসে বীথি বললেন, চলুন আমার বাসাটা আপনাকে ঘুরে দেখাই।

কী হবে বা হতে পারে তা যেন জানত দীপনাথ। একটা চমৎকার মধুর ফাঁদের মতো ব্যবস্থা।

সে যে ফাঁদে পা দিচ্ছে তাও জলের মতো পরিষ্কার। সুখেনটা রাসকেল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটারও যেন দরকার ছিল দীপনাথের।

বীথি তাকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে এলেন। চমৎকার ঘর। মস্ত খাটে নরম বিছানা। মৃদু সবুজ আলো জ্বলছে।

আলোটা কি থাকবে?—বীথি ব্যবসায়িক গলায় জিজ্ঞেস করেন।

থাক।

বীথি সাবধানে জানালার পরদাগুলো টেনে দিলেন।

ঘরের মাঝখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দীপনাথ ভাবল, এত সহজ! এত সহজ! অথচ এত সুন্দরী!

॥ সাতাশ ॥

বেজি জাতটা কিছুতেই পোষ মানে না। যতই পোষো, যতই আদরে রাখো, সুযোগ পেলেই শালারা জঙ্গলে পালিয়ে যাবে। যাবে তো যাবেই, আর আসবে না।

নিতাই তা জানে। তবে বহুকাল ধরে একটা বেজির বড় শখ। মল্লিবাবুর একজোড়া বেজি ছিল। তখনকার এই রতনপুর ছিল কেউটে গোখরোর আড্ডা। উরু পর্যন্ত একটা চামড়ার স্নেক-বুট পরে বেজি নিয়ে মল্লিবাবু এই ভিটের জঙ্গলেই কত সাপ মেরে বেড়িয়েছেন। সেই কর্মফলেই অকালে মরণ। সাপ মারতে নেই, এই সরল সাদা কথাটা শহুরে বাবুরা কিছুতেই শুনবে না। নিতাই ধরে নিয়েছিল, একদিন সাপেই কাটবে বাবুকে। সেটা অবশ্য হয়নি। মল্লিবাবু সাপ মেরে মেরে এ জায়গাকে সাপের শ্মশান বানিয়ে ছেড়েছিলেন। তিনি মারতেন, তাঁর বেজি দুটোও মারত। মদন ঠিকাদার বলত, সাপের চেয়ে মানুষ অনেক বেশি বিপজ্জনক। মেয়েমানুষ আরও। সাপ না মেরে বরং বন্দুক দেগে এখানকার কয়েকটা বদমাশ শয়তানকে মারো হে মল্লিবাবু। বন্দুক দেগে দাও, জায়গাটা ঠান্ডা হবে। মল্লিবাবু জবাবে বলতেন, আমি সবকিছু মারতেই ভালবাসি।

তখন গনিয়ার জঙ্গল নামে একটা জঙ্গল ছিল, এখন রিফিউজিরা সেখানে থানা গেড়েছে। সেই জঙ্গলে ঢুকে পাখি মারতেন মল্লিবাবু। কম করেও চার-পাঁচটা খ্যাপা কুকুর মেরেছেন। বধে খুব আনন্দ ছিল। মানুষও মেরেছেন কি না সে কথা বলা বারণ। নিতাইয়ের মুখ দিয়ে কখনও তা বেরোবে না। তা সেই গনিয়ার জঙ্গলেই একদিন বেজি দুটো পালিয়ে গেল। মল্লিবাবুর সে কী রাগ বাবা! পোষা জীব মায়া কাটিয়ে পালিয়ে গেলে রাগ হওয়ারই কথা।

আর পোষা মানুষ, ভালবাসার মানুষ পালিয়ে গেলে? যে লক্ষ্মীছাড়ি গুসকরায় গিয়ে রসবড়া ভাজছে তাকে কিছু কম পুষত নিতাই? বেজির নেমকহারামি তবু গায়ে সয়, মেয়েমানুষেরটা সয় না।

খালধারে রামলাখনের ঘরে একটা বেজির বাচ্চা রেখে গেছে কোনও এক খদ্দের। কাণ্ডটা ভারী মজার। ব্যাটা নাকি বেজির বাচ্চাটা নিয়েই ফুর্তি করতে এসেছিল। পকেট গড়ের মাঠ। খাসির নাড়িভুঁড়ি দিয়ে প্যাঁজ লঙ্কার ঝাল-কটকটে করে রান্না ঘুগনি আর দিশি মাল মিলিয়ে পনেরো-বিশ টাকার খেয়ে উঠে বলল, পয়সা নেই। তখন রামলাখন বেজিটা রেখে দিল। বেজির প্রতি কোনও মায়া-দয়া নেই তার। লোকটাও আর ছাড়াতে আসেনি।

সন্ধান পেয়ে বেজিটা বাগাতে রামলাখনকে গিয়ে অনেক তোতাই-পাতাই করেছে নিতাই। রামলাখন রাজি নয়। কেবল বলে, তোর পয়সা কোথায়? বেজি কি মাগনা?

দেব। যত চাস দেব।

বাকির কারবার হবে না। হঠ।

জানিস আমার দশ বিঘে জমি আছে?

সবাই জানে। যা না জমির এক গোছা ধানে হাত দিয়ে দেখ গেছো মাগি তোর কী হাল করে!

চাটুজ্জে-গিন্নিকে গেছো মাগি বললি! দাঁড়া বলে দেব।

বল গে। লাইনের এপারে কিছু করতে এলে—

বলে জঘন্য একটা খিস্তি দেয় রামলাখন।

শুনে কান ঢেকে ফেলে নিতাই। বলে, ছিঃ ছিঃ, মুখটা গঙ্গাজলে ধুয়ে ফেলিস রে। ওসব পাপকথা বলতে নেই।

তবে জমির কথা তুলিস কেন? জমি কি তোর বাপের?

আমার নামে তো।

তাতে কী? নাম ধুয়ে জল খা গে যা।

বেজির জন্য চাস কত বলবি তো!

পঞ্চাশ। এক পয়সা কম হবে না।

তাই দেব।

নগদ ছাড়, দিয়ে দিচ্ছি।

নগদ পাব কোথায়? কাউকে বাণ মারতে হয় তো বল, মেরে দেব।

দেহাতিরা বাণ-টানকে একটু ভয়-টয় পায়। রামলাখনের বাপটা পুরোদস্তুর দেহাতি ছিল। কাঁচা চামড়ার মজবুত নাগরা পড়ত। মাথায় ফগ্‌গে জড়াত, মোটা মার্কিনের কুর্তা পরত, আটহাতি ধুতি ব্যবহার করত। কিন্তু পাষণ্ড রামলাখনটা এ দেশের জল-হাওয়ায় শেয়ালের মতো চালাক হয়ে উঠেছে। বলল, তোর বাণের মুখে পেচ্ছাপ করি। বাণ মারবি তো গেছো মাগিকে মার গে। মুখে রক্ত উঠে যদি মরে তো বেজিটা দিয়ে দেব।

রামলাখনের রাগের কারণ আছে। স্টেশনের গায়ে একটা গাছের গোড়া বাঁধিয়ে দিব্যি একটা জুয়ার আড্ডা করেছিল সে। সন্ধের দিকে কারবাইড জ্বালিয়ে আসর বসত। জমি কারও বাপের নয়, সরকারের। কারও বলার হক ছিল না। পুলিশ-টুলিশ বড় একটা আসেও না এদিকে। কেউ এসে পড়লে দু'-চার টাকা দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন পালে বাঘ পড়ল হড়াম করে। স্বয়ং সার্কেল অফিসার আর থানার ও সি এসে হাজির।

রামলাখনকে মাস তিনেক জেলের ভাত খেতে হয়েছিল। পুলিশের একটা পোস্টও বসে গিয়েছিল স্টেশনের ধারে। সবাই বলে, কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল তৃষা। পুলিশ তার হাতের লোক। তার পিছনে পলিটিকসওয়ালারাও আছে।

নিতাই বলে, তা কিসে দিবি বলবি তো! বেজি জিনিসটা আমার বড় পছন্দ।

রামলাখন উদাস গলায় বলে, আমার ভুট্টাখেতটা যদি সাতদিন কুপিয়ে চৌরস করিস তো দিয়ে দেব।

বলে কী ব্যাটা! দিনে আট টাকার মজুর রাখলেও সাতদিনে ছাপ্পান্ন টাকা যে! ব্যাটার মাথাটাই খারাপ। নিতাইকে কাজ করতে বলছে। কাজ করা কাকে বলে তা নিতাই নিজেই ভুলে গেছে। ফাইফরমাশ করা ছাড়া তার আর ভারী কাজ আসেই না। কাজের নামে গায়ে জ্বর আসে। আর করাই বা কার জন্য? যার জন্য কাজ সেই তো কবে লম্বা দিয়েছে।

নিতাই বলল, তোর দিন ঘনিয়েছে রে ব্যাটা। সাধুসন্নিসিকে কাজের কথা বলিস!

তুই সাধু?

আলবত সাধু।

তবে চোর কে? বদমাশ কে?

তোর কবে কী চুরি করেছি রে নির্বংশের ব্যাটা?

অ্যাই বাপ তুলে কথা বলবি না বলে দিচ্ছি।

ওই দেখ। বাপ তুললাম কখন? তুইই তো আমাকে চোর আর বদমাশ বললি।

বললাম তো কী? মারবি নাকি?

মেজাজ দেখাচ্ছিস কেন রে হারামজাদা? বেজিটা নিয়ে কথা হচ্ছে তো তাই নিয়ে কথা ক'।

হারামজাদা বললি যে! মানে জানিস?

মদ বেচে দু' পয়সা করেছিস বলে খুব তেল হয়েছে রে তোর। এই বলে রাখলাম, নিতাইকে খেপিয়ে কেউ সাতদিনও পার করতে পারেনি। মরবি।

ফের বুজরুকি করছিস? এটা লাইনের ওপার নয়, মনে রাখিস।

হেঃ হেঃ করে হেসে নিতাই বলে, এই তো সেদিন জন্মালি রে লাখন। মায়ের পেটে যখন ছিলি তখন এই নিতাই এসব জায়গায় লাঠি ঘোরাত। দেহাত থেকে এসেছিস দেহাতির মতো চুপচাপ থাক।

এই পর্যন্ত হয়েছিল। তিনদিনের দিন নিতাই মাঝরাতে গিয়ে রামলাখনের মাটির ঘরে সিঁধ দিল।

পরদিন সকালের রোদে বেজিটা খ্যাপা নিতাইয়ের ঘরের সামনে তুরতুর করে চলে ফিরে বেড়াতে থাকে আর প্রাণ ভরে দেখতে থাকে নিতাই। ইস্পাতের একটা বন্ধু হল। বেজিটাকে এমন ট্রেনিং দেবে সে যে, ব্যাটা বাঘের গলার নলিও কেটে দিয়ে আসতে পারবে।

নিতাই জানে বেজি খুঁজতে এ বাড়িতে আসার মুরোদ রামলাখনের নেই। মুখে যতই গেছো মাগি বলুক, সজল-খোকার মাকে যমের মতো ডরায়। তাই নিতাই খানিকটা নিশ্চিন্ত।

বেজির ঘোরাফেরা দেখতে দেখতে নিতাই অনেক তত্ত্বকথা ভাবছিল। মল্লিবাবুর ছিল দুটো বেজি, তার একটা। বড়লোকদের সব জিনিসই কিছু বেশি থাকে। কিন্তু ভগবান তা বলে বড়লোকদের তিনটে করে হাত-পা দেয়নি। তবে বড়লোক শালারা অত তড়পায় কেন?

কথাটা ভেবে খুশিই হল সে। এখন কথাটা কাউকে বলা দরকার। ঘরে একটা পাখির খাঁচা খালি পড়ে আছে। তার বউ ময়না পুষত। বউ পালানোর পর কিছুদিন মন খারাপ থাকায় ময়নাটাকে আর দানাপানি দেওয়া হয়নি। পাখিটা মরেই যেত। যখন ধুঁকছে তখন তৃষা এসে নিয়ে গেল। খাঁচাটা পরে ফেরত দেয়। ময়নার জন্য নতুন মস্ত খাঁচা বানিয়ে নিয়েছে।

বেজিটাকে ধরে খাঁচাবন্দি করে তত্ত্বকথাটা কাউকে বলতে বেরোল নিতাই।

গ্রীষ্মকালে মাথার জটাটা খুব পাকিয়ে উঠেছে। উকুনের চিড়বিড়েনির চোটে মাথা খাবলে ঘা করে ফেলল। সেই ঘা এখন দগদগিয়ে উঠে পুঁজ রক্ত পড়ছে। চিমসে গন্ধ এমন ছাড়ে যে, নিতাই নিজেও টের পায়। বোষ্টমরা বেশ আছে। মাথা কামিয়ে ফেলে। তান্ত্রিকদেরই যত বিপদ।

হরিশ ডাক্তার আগে জল দিলেও লোকের রোগ সারত। এখন আর পসার নেই, এই গঞ্জ জায়গায় এখন আরও দু'জন ডাক্তার হয়েছে। তবু হরিশ ডাক্তার এখনও বাজারের গায়ে ডিসপেনসারিতে হাতের থাবায় নাক ঢেকে চুপ করে বসে থাকে। কম্পাউন্ডার পর্যন্ত নেই।

নিতাই গিয়ে সুমুখের চেয়ারটা টেনে বসে বলল, মাথার ঘায়ের একটা ওষুধ দাও দিকিনি।

হরিশ বেশি কথা বলে না। চেয়ে থেকে শুধু বলল, পয়সা কে দেবে?

চিকিচ্ছের আগেই পয়সা! ডাক্তাররা কি চামারই হল দিনে দিনে!

যা না, ওই যে সব ভাগাড়ের ডাক্তাররা এসেছে তাদের কাছে যা। কী বলে শুনে আয়।

ওসব শুনে কী হবে? তুমি হলে এ গাঁয়ের পুরনো ডাক্তার। আমিও পুরনো লোক। তোমার আমার কি কেবল পয়সার সম্পর্ক?

তবে কিসের সম্পর্ক? তুই আমার কোন ভাতিজা লাগিস?

মাথার ঘায়ে আমার বলে পাগল-পাগল অবস্থা! পিছুতে লাগছ কেন বলো তো! একটা মলম-টলম দাও না। ডাক্তাররা তো বিনিমাগনা কত ওষুধ পায়।
সে তোর মতো গর্ভস্রাবের জন্য নয়।
খুব যে বড় বড় কথা বলছ, তোমার অবস্থাও জানি।
কী জানিস?
তোমার রুগি জোটে না।
হুঁ! দু'দিন সবুর কর, তারপর দেখিস জোটে কি না।
দু'দিনে কী হবে?
ভাগাড়ের ডাক্তাররা যখন রতনপুরে শকুন ফেলবে তখন ত্রাহি-ত্রাহি বলে এসে জুটবে সব। রুগি জোটে না! রুগি জোটে না তো তুই-ই বা কেন এসে জুটলি? বেরো!
আচ্ছা না হয় মানছি। পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, সবাই জানে। তোমার দাম এরা বুঝবে কি? আমরা পুরনোরা বুঝি।
হরিশ ডাক্তার একটা শ্বাস ফেলে বলে, সুবিধে হবে না রে, অন্য জায়গায় দেখ।
চটলে নাকি?
চটাই তো স্বাভাবিক। সকালবেলায় তোর মুখটাই দেখতে হল!
শাস্ত্রে কী আছে জানো?
কী আছে?
শাস্ত্রে আছে, বড়লোকদের তিনটে করে হাতও নেই, তিনটে করে পাও নেই। আছে?
তবে বড়লোকদের ক'টা করে হাত-পা?
দুটো করে। গরিবদের মতোই।
এটা তো ভেবে দেখিনি।
ভাবো। ভাবলেই টের পাবে।
ভাবব'খন। এখন তুই বাপ্ গতর তোল।
তুলছি, তুলছি। আমার হাতে মেলা সময় বলে ভাবো নাকি? কাজ আমারও আছে। বলছিলাম, বড়লোকদের যদি ভগবান গরিবদের মতোই সব দিয়েছেন, তবে শালাদের অত তেল কেন?
এটাও ভাববার কথা। জামা-কাপড় ক'দিন কাচিস না বল দেখি! গন্ধে ভূত পালায়।
ভূত কখনও গন্ধে পালায় না গো ডাক্তার।
তবে কীসে পালায়?
মন্ত্রে।
ওঃ, তুই তো আবার তান্ত্রিক!
আলবত তান্ত্রিক। একটা মলম দাও, মাস পয়লা দাম দিয়ে দেব।
তোর কি মাস পয়লায় বেতন হয় নাকি?
আমার যজমান আছে, তাদের বেতন হয়।
তোরও যজমান?
আমাকে ভাবো কী বলো তো তোমরা, তন্ত্রটা তো ইয়ারকি নয়!
সে জানি। কিন্তু তোর ওষুধের পয়সা না থাকলেও গাঁজার পয়সা জোটে কোত্থেকে বল দিকি?
লোকে দেয়।
চুরি-টুরি এখনও করিস নাকি?
চোর কি আমার গায়ে লেখা আছে?
চোরের গায়ে চোর লেখা থাকে নাকি?

মলম তা হলে দেবে না?

পয়সা দিলে দেব।

ফুঃ! বিনা পয়সায় কত মলম চাও? ওই বেণু ডাক্তারের কাছে গেলে এখনই বাপের সুপুত্র হয়ে মলম দেবে।

তাই যা না।

যাচ্ছি। তুমি পুরনো লোক বলেই এসেছিলাম।

যা যা ভাগ।

গনগন করতে করতে নিতাইখ্যাপা বেরিয়ে এল। ওযুধ করাটা একটু শিখতে হবে। জড়িবুটি কিছু না জানলে আজকাল সাধুসন্নিসির তেমন কদর হয় না।

বেণু ডাক্তার গঞ্জে নতুন লোক। তার ডাক্তারখানায় কিছু রুগি জোটে। আজও জুটেছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে নিতাই হুংকার দিল, জয় কালী! জয় কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

বেণু একটা ছেলের পিলে টিপে দেখছিল। বিরক্ত মুখ তুলে বলল, কী চাই?

চাটুজ্জেবাড়ি থেকে আসছি।

কোন চাটুজ্জে?

চাটুজ্জে আবার এখানে ক'টা? শ্রীনাথ চাটুজ্জে, তৃষা চাটুজ্জের নাম শোনোনি?

ও।

বলে বেণু ডাক্তার আবার পিলে দেখতে লাগল। তারপর ওষুধের নাম লিখল, কম্পাউন্ডারকে ডেকে কাগজখানা দিল।

ততক্ষণে নিতাই কাঠের বেঞ্চটায় জায়গা করে নিয়ে বসে ঠ্যাং নাচাচ্ছে। বসে বসে সে বেণু ডাক্তারকে দেখছিল আর ভাবছিল। কোত্থেকে এসে বেশ জুড়ে বসে গেছে। কথায় আছে বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। এও হল সেই কাণ্ড।

আপনমনে খুব একচোট হাসল নিতাই। বেণু ডাক্তার ভ্রু কুঁচকে চেয়ে তার হাসি দেখল, কিছু বলল না। নিতাই হেসে-টেসে নিয়ে বলল, হরিশ ডাক্তার কী বলে জানো? বলে, তোমরা নাকি সব ভাগাড়ের ডাক্তার।

বেণু আবার ভ্রু কোঁচকায়। বলে, এটা গালগল্পের জায়গা নয়।

তোমরা বাপু হুট করে বড় চটে যাও। আজকাল কারও সঙ্গে বসে দুটো কথা বলতে পারি না। সবাই ব্যস্ত, সবাই বদরাগী।

হাতের রুগিকে ছেড়ে দিয়ে বেণু নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, কী চাই?

মাথার ঘায়ের জন্য একটু মলম দাও তো।

মাথাটা দেখি।

গোরু-মোষ যেমন গুঁতোনোর সময় করে তেমনি মাথাটা এগিয়ে দিল নিতাই।

বেণু ডাক্তার টাকার কথাটা আগে তুলল না। তার মানে লোকটা খারাপ নয়। জপানো যাবে।

অনেকক্ষণ দেখল বেণু। তারপর বলল, ওযুধ দিচ্ছি। দিন সাতেক লাগিয়ে দেখো। যদি তাতে না কমে তবে একবার মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে দেখিয়ো।

নিতাই একগাল হেসে বলে, তোমার ওযুধেই কমবে। লোকে বলে তুমি ধন্বন্তরী।

কই, হরিশবাবু তো বলেন না!—বলে বেণু একটু হাসে।

হরিশ আবার ডাক্তার! কলিকালে কতই হল, পুলিপিঠের ন্যাজ বেরুল।

বেণু ডাক্তারের সত্যিই গালগল্পের সময় নেই। তবু বলল, পুলিপিঠের আবার লেজ হয় নাকি?

ও সে এক মাতালের গল্প। মদ খেয়ে আলায়-বালায় পড়ে ছিল, তো এক ইঁদুর এসে তার মুখ

শুঁকছে। খপ করে ইঁদুরটাকে চেপে ধরে ভাবল, বাঃ এ যে দিব্যি পুলিপিঠে। কিন্তু পুলিপিঠের একটা ন্যাজও রয়েছে। তাই ভাবছে এসব কলিকালের কাণ্ডমাণ্ড আর কী!

গল্পটা বেণু ডাক্তার জানত না। একটু হাসল। হাসি দেখে ভরসা পেল নিতাই। মানুষের মুখে হাসি সে বড় একটা দেখতে পায় না। ভারী দুর্লভ জিনিস। বলল, এরকম কত গপ্পো আছে আমার ঝোলায়। শুনতে চাও তো রোজ এসে শুনিয়ে যাব।

কম্পাউন্ডার একটা অয়েল পেপারে মোড়া খানিকটা মলম এনে দিয়ে বলল, এক টাকা বারো আনা। দিনে তিনবার লাগাবে। সকাল, দুপুর, রাত্রি।

কম্পাউন্ডার ছোকরা চেনা মানুষ। আর চেনা মানুষকেই নিতাইয়ের যত ভয়। তাই শুনি-না শুনি-না ভাব করে বলল, বুঝলে ডাক্তার, আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় এমন টাইফয়েড হল, পরীক্ষাটাই বরবাদ।

ও বাবা!—বেণু ডাক্তার চোখ বড় করে বলে, এইট থেকেই এক লাফে ম্যাট্রিক!

কোথাও একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে বুঝতে পেরে নিতাই মোলায়েম গলায় বলে, সে আমলে হত। আজকের কথা তো নয়।

তুমি কোন আমলের লোক, বয়স কত?

তা তিন কুড়ি চার কুড়ি হবে।—নিতাই বোকা সাজল একটু।

ডাক্তার হাসে। বলে, তা হলে তো মেলাই বয়স তোমার।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এ জায়গায় বাঘ ডাকত।

কম্পাউন্ডার ছোকরা তাড়া দিয়ে বলে, পয়সাটা?

নিতাই বিরক্ত হয়ে বলে, চুপ দে তো সতু। কাজের কথা হচ্ছে তার মধ্যে ঘ্যান ঘ্যান লাগালি। পয়সা হবে'খন। চাটুজ্জেবাড়ির পয়সা মার যায় দেখেছিস? আমার দশ বিঘে জমি আছে।

কথার তোড়ে সতু ভড়কে পিছিয়ে গেল।

বেণু ডাক্তার লোক খারাপ নয়। তাছাড়া পসার জমাতে হলে লোককে প্রথম-প্রথম একটু খাতির করতেই হয়। তাই হাসিমুখেই বলল, ঠিক আছে, পরে দিয়ে যেয়ো। তৃষা বউদির কাছে বিলও পাঠিয়ে দিতে পারি।

আঁতকে উঠে নিতাই বলে, না না, বউদিদিমণিকে আবার এর মধ্যে কেন? মোটে তো সাতসিকে পয়সা। গনিয়ার জঙ্গলের পুবধারে ভাঙা মন্দির খুঁড়লে সাত ঘড়া সোনার মোহর, জানো? বহুকাল আগে এক সাধু আমাকে সন্ধান দিয়ে গেছে। ভারী আলিস্যি তো আমার, তাই আজও তুলিনি। আমারটা খাবেই বা কে বলো! সন্নিসি ফকির মানুষ। তুলব-তুলব করেও তাই তুলিনি। এবার একদিন যেতেই হবে দেখছি।

মলমটা নিয়ে বেরোতেই দেখতে পেল, সামনে বউদিমণির দোকান ত্রয়ীর পাশের টিউবওয়েলটায় মাছির মতো ভিড় লেগেছে। আগে বাজারে পাতকো ছিল, পুকুর ছিল, একটা টিউবওয়েলও ছিল। পুকুর মজে ভরাট হয়েছে, পাতকো ভাঙা, টিউবওয়েলটার দশাও বুড়োর দাঁতের মতো নড়বড়ে। বউদিমণি এই টিউবওয়েল বসাল এই সেদিন, এখনও গায়ের সবুজ রংটা চটেনি পর্যন্ত। প্রথম-প্রথম লোকে এ টিপকলের জল নিত না। মাতব্বররা নাকি নিষেধ করেছিল। আজ ভিড় দেখে খুশি হল নিতাই। একটা হুংকার ছেড়ে বলল, জয় কালী। এই ব্যাটারা, লাইন লাগা! লাইন লাগা!

বলে নিজেই এগিয়ে গিয়ে লোকজনকে ঠেলা ধাক্কা দিতে থাকে নিতাই, বাপের কল পেয়েছিস শালারা? ভেঙে ফেলবি যে। এই খোকা, ভর দিবি না, টিপকল বেঁকে যাবে।

লোকে হিহি করে হাসে, নিতাইয়ের কথার অবাধ্যও হয় না। যত যাই হোক, বউদিমণিরই তো কল। আর নিতাই হল বউদির ডান হাত। লোকে তাই লাইন লাগাতে থাকে। নিতাই একটু তফাত

হয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মাতব্বরি করতে থাকে, এই পদা, অমন ঝকাং ঝকাং হ্যান্ডেল মারছিস যে! বাপের জন্মে এসব সাহেবি জিনিস দেখেছিস? খাস বিলেত থেকে জাহাজে করে আনা। বলি ও রতনের মা, লাইন ভেঙে এগোলে যে বড! কাদু, তুই হরিপদর পেছনে। এই শালা কেতল, তোর কি চান করার মতলব নাকি? কোমরে গামছা, মাথায় সপসপে তেল, হাত বালতি মগ? অ্যাঁ? চান করলে ঠ্যাং ভেঙে দেব। ইঃ, লাটসাহেব বউদির বিলিতি কলে চান মারাতে এসেছে! ভাগ, ভাগ! হুঁ হুঁ বাবা, এ কল এমন মন্তর দিয়ে বেঁধেছি কেউ বদ মতলব নিয়ে এলে কল সাপ হয়ে ছুবলে দেবে। এ হল পাতালগঙ্গার জল, যত পারিস খা, রোগ-ভোগ দূর হয়ে যাবে, গায়ে হাতির বল হবে। ডায়াবেটিস জানিস, ডায়াবেটিস? এই জল খেলে ডায়াবেটিসও সারে।

দুপুরের দিকে বাজারটা ফাঁকা-ফাঁকা। তারই ভিতর থেকে হঠাৎ একটা কালোপানা লোক ধাঁ করে বেরিয়ে এল। নিতাই মাতব্বরিতে ব্যস্ত ছিল বলে দেখতে পায়নি। লোকটা এসে রক্তাম্বরখানা গলার কাছটায় চেপে ধরতেই নিতাই চেতন হয়ে দেখল, রামলাখন।

এই শালা, কাল আমার ঘরে সিঁধ দিয়েছিল কে?

তোর বাবা।—বলে চোখ বুজে রইল নিতাই। নিশ্চিন্তে। কারণ, সেই মুহূর্তে সে বাজারের ও প্রান্ত থেকে একটা ভটভটিয়া আসার শব্দ পেল। সময় মতোই আসছে।

শালা, এইখানে আজই তোর লাশ নামিয়ে দিয়ে যাব।

নিতাই চোখ বন্ধ করে গম্ভীর গলাতেই বলল, পিঁপড়ের পাখা ওঠে কখন জানিস? মরার সময়। ঘোর কলি, ঘোর কলি। নইলে মাতাল বদমাশরা সাধুসন্নিসির গায়ে হাত তোলে?

একটা খিস্তি দিয়ে রামলাখন বলে, পুলিশে সকালবেলায় খবর করেছি। কিন্তু তোকে পুলিশে দেব না। নিজের হাতে বানাব।

ভটভটিয়াটা ত্রয়ীর সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। কলের লাইন ভেঙে লোকে মারপিট দেখতে জুটে গেছে চারধারে।

নিতাই চোখ খুলে চারদিকটা দেখে নিয়ে খুশি হল। লোকজন না জুটলে খেল কিসের? ঠান্ডা গলায় বলল, তিনদিনের মধ্যে গলায় রক্ত উঠে মরবি। যা, বাণ মেরে দিলাম।

ঠিক আছে। বাণের মোকাবিলা করে নেব। এখন বল, বেজিটা কোথায়?

তার আমি কী জানি?

তুই জানিস না তো কে জানে? তোর বাপ জানে। বল।—বলে রামলাখন একটা ঠুসো দিল পেটে।

ককিয়ে উঠে নিতাই বলে, বাপ জানে তো আমার বাপের কাছেই যা না। আমার বাপ কোথায় আছে জানিস? ভূত হয়ে মাদারপাড়ার বাঁশবনে দোল খায়। তোকেও সেখানে পাঠাব। আর তো মোটে তিনদিন।

চড়াক করে একটা চড় পড়ল গালে। মাথাটা ঘুরে গেল একটু। গাঁজার নেশা থাকলে একটু দুধ দরকার হয়। নইলে শরীরে কিছু থাকে না। বুধিয়ার মায়ের কাছ থেকে একপো করে নিলে কেমন হয়? বদলে মন্তর দেবে ওদের। রাজি হবে না?

নিতাই বিড়বিড় করে বলে, তুই মরবি। তোর বংশ ঝেড়েপুঁছে সাফ হবে। ছেরাদ্দ হবে না, পিণ্ডি পড়বে না।

মলমটা ঠেলা ধাক্কায় হাতের মধ্যেই ভচকে গেছে। হাতময় আঠা। এই অবস্থাতেও সাবধানে হাতটা তুলে মাথার ঘায়ে মলম ঘষতে ঘষতে সে হঠাৎ চেঁচায়, বোম কালী, গোলে বকাবলী। জয় মা! শেষ করে দে, ফিনিশ করে দে, রক্ত দিয়ে চান কর মা! মা গো!

সরিৎবাবু বড় দেরি করছে। আবার চোখ বুজে ফেলে নিতাই। চোখের নজর লুকোনোটা ভাল অভ্যাস। তারাপীঠের এক সাধু তাকে কায়দাটা শিখিয়েছিল। বলেছিল, পাপ-তাপ করলে লোককে

চোখের দিকে তাকাতে দিয়ো না। চোখে সব ভেসে ওঠে। ধরা পড়ে যাবে। চোখ বুজে থেকো. মেজাজটা ঠান্ডা রেখো। বিপদ কেটে যাবে। সেই উপদেশটা আজ কাজে লাগিয়ে দিল।

ভিড়ের ওপাশে রাস্তার ধারে সরিৎ তার মোপেড থামিয়েছে, দোকানের কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। গোলমাল দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ কোঁচকাল।

কী হচ্ছে রে ওখানে?

দোকানের ছোকরা কর্মচারী শম্ভু বলে, খ্যাপা নিতাইকে রামলাখন ধরেছে। বেজি না কী চুরি করেছে বুঝি।

রামলাখনটা কে?

সে ওই লাইনের ওধারে ঝোপড়ায় থাকে। মহা বদমাশ।

সরিৎ একবার ভাবল, ঝামেলায় জড়াবে না। সেজদি আবার কী না কী বলে।

কিন্তু রামলাখন নামে লোকটা খুব গলা তুলছে। দু'-চার ঘা ঝাড়লও। সরিতের রক্তটা একটু চনমনে হয়ে ওঠে। নিতাই চোর-ছ্যাঁচড় যা-ই হোক. সে চাটুজ্জেবাড়ির আশ্রিত। তার ওপর বাজারি মার পড়লে দিদিরও অপমান।

সরিৎ মোপেড থেকে নেমে রাস্তাটা চকিত পায়ে পার হল।

বাবা আজকাল তাকে ঘরের চাবি দিয়ে যায়। আগের মতো বাবা আর রাগী নেই। না, কথাটা ভুল হল। বাবা এখন বরং আগের চেয়ে আরও বেশি রাগী হয়ে গেছে। কিন্তু সজলের ওপর বাবা আজকাল একদম রাগে না।

বাবার ঘরে ঢুকে সজল আজকাল ইচ্ছেমতো জিনিসপত্র হাঁটকায়। বাবা কিছু বলে না। মাঝে মাঝে বলে, আমি যখন থাকব না তখন তুমি এ ঘরটায় থেকো।

তুমি কোথায় যাবে?

কোথাও চলে যাব।

কেন?

এখানে ভাল লাগে না।

আমারও লাগে না। আমাকে রামকৃষ্ণ মিশনের হোস্টেলে পাঠাবে?

সে তোমার মা জানে।

মাকে তুমি বলো না!

কেন হোস্টেলে যেতে চাও?

হোস্টেলে অনেক বন্ধু পাব।

কেন, এখানেও তো তোমার অনেক বন্ধু। পাঠশালার মাঠে বিকেলে ওই যাদের সঙ্গে ফুটবল খেল!

হ্যাঁ, ওরা আবার বন্ধু নাকি? মা তো আমাকে বাইরের কারও সঙ্গে মিশতে দেয় না, যদি আমি খারাপ হয়ে যাই। তাই সব ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে মা বন্দোবস্ত করেছে, তারা যদি বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে খেলে তা হলে রোজ ভাল টিফিন খাওয়াবে।

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, সে কী!

সজল হি হি করে হাসে। বলে, একটা ছেলেও ভাল করে শট করতে জানে না। একটা ছেলের সঙ্গেও আমার তেমন ভাব নেই। শুধু খাওয়ার লোভে পেটুকগুলো রোজ খেলতে আসে।

রাগে ক্ষোভে শ্রীনাথের মুখটা কেমনধারা হয়ে গেল। প্রায় কাঁপা গলায় বলল, শাসন তা হলে এত দূর গেছে!

তুমি ভেবো না বাবা, আমি স্কুলে অন্যসব বন্ধু পাই।

কিন্তু এ রকম ভাড়া করা বাছাই ছেলেদের সঙ্গে মিশলে যে মনের দিক থেকে তুমি পঙ্গু হয়ে যাবে।

কথাটার মানে বুঝল না সজল, কিন্তু আন্দাজে বুঝল। বলল, সেইজন্যই তো হোস্টেলে যেতে চাই। যেতে দেবে, বাবা?

শ্রীনাথ একটু ভেবে মাথা নেড়ে বলে, আমি তোমাকে যেতে দেওয়ার মালিক নই।

তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাব।

শ্রীনাথ হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। গাঢ় স্বরে বলে, সেও তোমার মা জানে। তোমার মায়ের হাত থেকে কেউ পালাতে পারে না। তুমিও পারবে না।

আর তুমি?

আমি পারব। একভাবে না পারি অন্যভাবে পারব।

অন্যভাবে কীরকম বাবা?

সে তুমি বুঝবে না। তবে আমি যখন থাকব না তখন এই খোলামেলা ঘরখানায় তুমি এসে থেকো। আমার বাগানটা দেখো। বাগান করা খুব ভাল। প্রকৃতির মতো এমন শিক্ষক আর নেই।

বাবার কথাগুলো একটু অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু বাবা বরাবরই একটু এ রকমই তো। সজল তাই বাবাকে নিয়ে বেশি ভাবে না। তবে ঘরখানা তার খুব ভাল লাগে। সুযোগ পেলেই এসে হানা দেয়। হাঁটকায়।

সেদিন সকালের পড়া থেকে ছুটি পেয়েই চলে এল বাবার ঘরে। গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। অগাধ অফুরন্ত দুপুর সামনে। বাবার ঘর থেকে ক্ষুরটা গোপনে নিয়ে বেরিয়ে এল সজল। বিশাল বাগানের এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে চলে এল নিতাইয়ের ঘরে।

সামনে ঝিম মেরে ঘুমোচ্ছে ইস্পাত। ঝোপড়ার দরজাটা বন্ধ। ঠেলতেই ঝাঁপের দরজা খুলে যায়।

নিতাইদা আছো?

নেই। তবে একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েছে। পাখির খাঁচায় ছোট্ট একটা বেজি।

সজল খাঁচার গায়ে হাতের চাপড় দিতেই বেজিটা এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। বেজি সাপ মারে শুনেছে সজল। কখনও দেখেনি। সে খাঁচাটা দোলাতে থাকে। এখন একটা সাপ এনে খাঁচাটার মধ্যে ছেড়ে দিলে দারুণ হত।

ভাবতে ভাবতেই ফটকের দিকে একটা গোলমাল শুনতে পেল সজল।

ছোটমামা কাকে যেন মারতে মারতে আর গালাগাল দিতে দিতে টেনে আনছে। বলছে, চল শালা, তোর বেজি যদি খুঁজে না পাস তবে পুঁতে ফেলব।

দরজায় দাঁড়িয়ে সজল দেখল। লোকটা রামলাখন। মামা খুব মারছে রামলাখনকে। চেন দিয়ে গলাটা পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে এক হাতে। মামার গায়ে দারুণ জোর। দেখে একটু খুশির হাসি হাসে সে। গায়ের রক্ত ছলাত-ছলাত করে।

বেজির ব্যাপারটা বুঝতে তার এক পলকও লাগেনি। চকিতে ঘরে ঢুকে খাঁচাটা নিয়ে সে বেরিয়ে আসে। তারপর অজস্র ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে যায়।

॥ আঠাশ ॥

আড়াল থেকে দেখতে পাচ্ছিল সজল. রামলাখনকে ছোটমামা ঘাড় ধরে এনে ধাক্কা দিয়ে নিতাই খ্যাপার ঝোপড়ায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, বার কর তোর বেজি। বার কর!

রামলাখনের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। মুখটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আছে। কাঁদো-কাঁদো ভাব। আবার রাগও থমথম করছে। কিন্তু শক্ত পাল্লায় পড়ায় কিছু করতে পারছে না।

ছোটমামার সঙ্গে যদি কোনওদিন সেজোকাকার ফাইট হয় তবে কে জিতবে তা এখন ভেবে ঠিক করতে পারছে না সজল। তার মন চায় সেজোকাকাই জিতুক। কিন্তু তা কি হবে? ছোটমামার গায়ের জোর ভীষণ, সাহসও সাংঘাতিক। এই তো মাত্র কয়েক মাস হল এ জায়গায় এসেছে, এর মধ্যেই তাকে সবাই ভয় খায়। তবু যদি কোনওদিন ফাইট লাগে, আর সজলকে যদি রেফারি করা হয় তবে সজল সেজোকাকুকেই জিতিয়ে দেবে।

রামলাখন ঝোপড়া থেকে ম্লান মুখে বেরিয়ে এল। সজল জানে, ঘরে বেজিটা পেয়ে গেলেও রামলাখনের লাভ হত না। ছোটমামা অত কাঁচা ছেলে নয়। সঙ্গে সঙ্গে বলত, ওটা তো আমাদের বেজি। পরশুদিনই গণি মিয়ার কাছ থেকে কিনেছি। তোর বেজি কই?

এসব সজলের জানা। বেশ কিছুদিন আগে শীতলাবাবুদের ময়না পাখিটা খাঁচা খোলা পেয়ে উড়ে পালায়। কিন্তু খাঁচায় থেকে থেকে ডানার জোর ছিল না বলে খানিক উড়ে এসে তাদের বড় ঘরের বারান্দায় চুপ করে বসে ছিল। বৃন্দা সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে ধরে। পরে খবর পেয়ে শীতলাবাবুর মেয়ে টুটু যখন খোঁজ করতে এল তখন পাখিটা নতুন বড় একটা খাঁচায় নিতাইখ্যাপার পাখিটার পাশে দোল খাচ্ছে।

টুটু বলল, ও মা! এই তো আমাদের ময়না।

বৃন্দা অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি? তা সে তোমরা গণি মিয়ার সঙ্গে বোঝো গে যাও। নগদ পচিশ টাকায় কালই তো বড়দিমণি কিনলেন।

ডাহা মিথ্যে। পরে শীতলাবাবুরা বাড়িসুদ্ধ মেয়ে-মদ্দায় এলে সে কী কাঁউ কাঁউ করে ঝগড়া! জবাবে মা কিছুই বলল না। বৃন্দাকে এগিয়ে দিল। বৃন্দা একাই গলার জোরে সবাইকে হঠিয়ে দিয়েছিল।

গণি মিঞা মাঝে মাঝে পাখি বেচতে আসে। মা'র সঙ্গে তার একটা বন্দোবস্ত আছে। মা যা বলাবে সে তাই বলবে। কাজেই বৃন্দার ভয় ছিল না। তবু শীতলাবাবুদের পাখিটাকে ধরে রাখার একটা অন্য কারণও ছিল। কোন কালে যেন জেঠুর সঙ্গে জমি নিয়ে তাদের মামলা হয়। সেই রাগে জেঠুর তিনটে গোরুর একটাকে শীতলাবাবু তার চাকরকে দিয়ে বিষ খাইয়ে মারে। গাভিন গাইটা সন্ধের মুখে বাড়ির উঠোনে দাপিয়ে মরল। গোরুর ডাক্তার এসে বলল, এ তো ক্লিয়ার পয়জনিং কেস। মা তবু ময়নাটাকে মারেনি। কেউ কেউ অবশ্য বলে যে, শীতলাবাবুদের ময়নাটা আসলে নিজে উড়ে আসেনি, নিতাই পাগলই সেটাকে চুরি করে আনে।

সত্যি মিথ্যে কে জানে!

তবে রামলাখন ব্যাটা এখন হাতজোড় করে ছোটমামার কাছে বোধহয় ক্ষমাই চাইছে। পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে সজল সব দেখতে পাচ্ছিল। তার হাতের খাঁচায় বেজি।

হেলেদুলে নিতাই খ্যাপা এসে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলল, জয় কালী কলকাত্তাওয়ালি। নখদর্পণ জানিস ব্যাটা?

রামলাখন কী একটা তেজি জবাব দিল তার কথার।

নিতাই নেচে উঠে বলল, শাস্তর মন্তর জানলে তো মর্ম বুঝবি! পাঁচটা টাকা নিয়ে অমাবস্যায় আসিস, গুনে বলে দেব তোর বেজি কোথায় আছে।—বলে খুব হাসতে থাকে বাহাদুরির হাসি।

ছোটমামা অবশ্য আর বাড়াবাড়ি করল না। বাগানের কাজ করার জন্য যেসব ফুরনের লোক হামেশা কাজ করে তাদের একজনকে ডেকে বলল, এটাকে লাইন পার করে দিয়ে আয় গে। এসে আমাকে খবর দিস।

রামলাখন বিদেয় হতেই সাবধানে চারপাশটা দেখে নিয়ে সজল এক দৌড়ে বেজির খাঁচা নিয়ে ভাবন-ঘরে পৌঁছে গেল। তালা খুলে ভিতরে ঢুকে সে দরজায় খিল তুলে দেয়।

ভাবন-ঘরের পিছন দিকে একটা দরদালানের মতো ঢাকা বারান্দা আছে। খুব বড় নয়, বরং খুবই ছোট। চারদিকে ঘষা কাচ বসানো জানালা। এ ঘরে কেউ কখনও আসে না। একটা অদ্ভুত ঢালু টেবিল আছে। এটাতে নাকি ড্রইং-বোর্ড রেখে জেঠু নানা আঁকজোঁক করত। ইঞ্জিনিয়ারদের ওরকম করতে হয়। এ ঘরে পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়েছে, মাকড়সা জাল বুনেছে, ঘুলঘুলিতে চড়াই পাখি বাসা করেছে।

টেবিলের তলায় খাঁচাটা রেখে সজল ভাবতে লাগল, বেজিরা কী খায়?

ভেবে পেল না। তবে বাড়ি থেকে একটু বাদে গিয়ে কয়েকটা ছোলা, এক বাটি জল, কিছু চাল এনে খাঁচার মধ্যে ছড়িয়ে রেখে গেল। যেটা মন চায় খাবে। বিকেলে চিনেবাদাম কিনে এনে দেবে। মংলুকে বললে কাঁচা মাংসেরও ব্যবস্থা হবে। বাবা এলে জেনে নেবে বেজিরা কী খায়।

ভাবন-ঘরে ফের তালা দিয়ে বেরোচ্ছে, শুনতে পেল ঝোপড়ার দিক থেকে নিতাইখ্যাপা চেঁচাচ্ছে, জয় কালী, কালীশ্বরী, মহাবিদ্যা, প্রলয়ংকরী। মা। মা গো।

তাকে দেখেই নিতাই হাতছানি দিয়ে ডাকল।

মুখখানা নিপাট ভালমানুষের মতো করে এগোয় সজল।

কোথায় ছিলে সজলখোকা? কত কাণ্ড হয়ে গেল, দেখলে না?

কী কাণ্ড?

হি হি করে খুব হাসে নিতাই। তারপর গলা নামিয়ে চোখ ছোট করে খুব ষড়যন্ত্রের গলায় বলে, বাজারে পেয়ে ব্যাটা খুব ধরেছিল আমাকে। মা প্রলয়ংকরী এসে বাঁচায়।

কে ধরেছিল?

রামলাখন। ব্যাটা সাতদিনের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মরবে। বাণ মেরে দিয়েছি, কাজও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু মায়ের কী লীলা বলো তো? আমাকে বাঁচাতে মা বেজিটা হাপিস করে দিল বটে, কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শালাটাকে আর দেখতে পাচ্ছি না।

বেজি? কত বড় বেজি?

নিতাই চোখ কুঁচকে সজলের দিকে অনেকক্ষণ দেখে নিয়ে বলে, তোমার কাণ্ড নয় তো?

মাইরি না। চোখের দিব্যি।

আহা, বেজিটা তো তোমার জন্যই আনা। ব্যাটা দেহাতি কী মর্ম বুঝবে অবোলা জীবের?

পেলে আমাকে দিয়ো। আমার খুব বেজি পোষার শখ।

মুখটা একটু ম্লান হয় নিতাইখ্যাপার। আনমনে দূরের দিকে চেয়ে বলে, মা কত মায়াই না জানে। বেজিটা যে হাওয়া হয়ে গেল আর রূপ ধরল না। মেহনতটাই বৃথা।

তুমি বেজিটা চুরি করেছিলে নিতাইদা?

চুরি আবার কী? অবোলা জীবটাকে উদ্ধার করেছিলাম। তা মায়ের জীব মা নিজেই নিয়েছে। ভারী আশ্চর্য কাণ্ড। জলজ্যান্ত ঘরে রেখে গেলাম।

দুপুর পেরিয়ে গেল নিতাইদা, খাবে না?

আনমনে একটু হুঁ দিয়ে নিতাই মাটিতে একটা কাঠি দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে থাকে।

সজল সরে আসে। বেজিটা কিছুদিন এখন লুকোনো থাক।

উঠোনের পুবধারে মস্ত নিমগাছের ঝিরঝিরে ছায়ায় ইজিচেয়ার পেতে বসে দীননাথ

হোমিয়োপ্যাথ হরিপদ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় বলেই ফেললেন, তোমার ওষুধ সত্যিই কথা কয় হে।

পড়ন্ত বিকেলের আলোয় হরিপদর মুখ একটু উজ্জ্বল হয়। মুখখানা এমনিতে শুকনো আর ভাঙা, রসকষ নেই, সর্বদাই চিন্তায় ভারাক্রান্ত। বলল, আগে তো বিশ্বাস করতেন না!

তোমার ওষুধের গুণও আছে, এ বাড়ির ভাল খাওয়াদাওয়া, সেবা যত্ন আছে। বউমার ব্যবস্থা সব খুব ভাল।

সে তো আছেই। কিন্তু খেলেই তো হবে না, হজম করবে কে?

সেও ঠিক। ছোট ছেলের কাছে যখন ছিলাম তখন মনে হত, বয়স বুঝি আশি-নব্বুই কি শতেক পার হয়েছে। একটু ভীমরতিও যেন ধরেছিল। হাঁটতে চলতে পারতাম না নিজের জোরে।

আর এখন?

দেখছই তো, ওই ঘর থেকে একা এতদূর চলে এসেছি।

আস্তে আস্তে আরও পারবেন। আমি আপনাকে একদম ছোকরা বানিয়ে দেব।

দীননাথ হাসলেন। বেঁচে থাকতে একটা আলাদা স্বাদ পাচ্ছেন। বললেন, ওষুধ তো ভালই দাও, তবে আমার দাদুভাইয়ের কৃমি সারে না কেন?

সজলের কৃমি জন্মেও সারবে না। শুধু ওষুধ দিলে কী হবে? পথ্য কন্ট্রোল করবে কে? সারাদিন কুপথ্য করছে।

দীননাথ গম্ভীর মুখে খানিক ভেবে বললেন, আমার চার ছেলের মধ্যে বড় জন নেই, সেজো বিয়ে করবে কি না জানি না। ছোটরও ছেলেপুলে হবে শুনছি, কিন্তু মেয়ে হলেই বা ঠেকায় কে? এখন পর্যন্ত বংশে বাতি দিতে ওই একমাত্র নাতি। তুমি খুব মন দিয়ে ওর চিকিৎসা করো তো?

ওষুধ তো দিই। প্রায়ই খায় না, ভুলে যায়।

এখন থেকে আমি খেয়াল রাখব। আজকাল আর ততটা ভুলে যাই না।— বলে দীননাথ লাজুক মুখে হাসেন।

সজলের জন্য ভাববেন না। আমার চিকিৎসাতেই বড় হল। তবে মাঝে মাঝে অ্যালোপ্যাথিরও বিষ ঢুকেছে কিনা।

হরিপদ চলে যেতে দীননাথ গ্রীষ্মের বিকেলে এই নরম ছায়ায় বসে বসে সোমনাথের কথা ভাবতে লাগলেন। মেজো বউমা যত্ন করে বটে, এ বাড়ির পরিবেশও ভাল। তবু কেন যেন ছোট বউমার জন্য, ছোট ছেলের জন্য আর কলকাতার অন্ধকার সেই একতলা বাসাবাড়ির জন্য বড্ড মন কেমন করে। এখানে এসে অবধি শ্রীনাথের সঙ্গে ভাল করে দেখাই হয়নি। খুব পর মানুষের মতো থাকে। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন। কিন্তু চিন্তাশক্তি এখন আর তেমন জোরালো নয় বলে ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারছেন না।

আজকাল ঘরে, বারান্দায়, উঠোনে টুকুস টুকুস করে হাঁটতে পারেন। আগে পারতেন না। মেজো বউমা অবশ্য বলে, হাঁটতে ঠিকই পারতেন, কেবল মনে জোর ছিল না। ভাবতেন, হাঁটতে গেলেই পড়ে যাব বুঝি। মেজো বউমার বুদ্ধি খুব সাফ। ঠিকই বুঝেছিল। একা বসে মাথায় দুশ্চিন্তা আসছিল বলে দীননাথ উঠে পড়লেন। বাচ্চা ছেলের যেমন নতুন হাঁটতে শিখে হাঁটার নেশায় পায়, তাঁরও হয়েছে তেমনি।

বিকেলের দিকে বাড়িটা হাঁ-হাঁ করছে ফাঁকা। উঠোনটা জনমনিষ্যিহীন পড়ে আছে। ঘুরে ঘুরে হিসেবি চোখে দেখেন দীননাথ। ছোট শয়তান বুলুটা মিছে কথা বলে না। মল্লি বেশ বড় সম্পত্তিই করেছিল। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি। কোনও কিছুরই অভাব নেই। উপচে পড়ছে। দেখে বুকের মধ্যে একটু ধাক্কা লাগে। তাঁর আর-ছেলেরা কেউই তেমন কৃতী নয়। সকলেরই টানাটানি। ওরা যদি সবাই মিলে এই জায়গাটায় থাকতে পারত। ভেবে দীর্ঘশ্বাস

পড়ে। হবে না। ওদের কারও সঙ্গে কারও মিল নেই।

উঠোনের পশ্চিমধারে এসে একটা ছাগলের 'ম্যা' শুনে দাঁড়ালেন দীননাথ। বাগানে ছাগল ঢোকেনি তো! পশ্চিমধারে একটা বাঁশের আগড়। সেটা ঠেলে উঁকি মারতেই দেখেন, একটা পুরুষ্টু ছাগল ঠ্যাং ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর মংলু পেতলের মালসায় চড়াং চড়াং করে তার দুধ দুইছে।

ছাগলের দুধ কে খায় রে?

শুনে মংলু হাসে, আপনিই তো খান, আর কে খাবে?

ও বাবা, আমাকে বউমা রোজ ছাগলের দুধ দেয় বুঝি?

হ্যাঁ তো। ডাক্তার আপনাকে ছাগলের দুধ খেতে বলে গেছে না! মা ঠাকরোন তাই ছাগলটা কিনে আনালেন।

দীননাথ হাঁ করে থাকেন। তাঁকে দুধ খাওয়ানোর জন্য বউমা ছাগল কিনেছে? এ যে ভাবা যায় না। বলতে কী, এই বুড়ো বয়সে বেঁচে আছেন বলেই মাঝে মাঝে তাঁর লজ্জা করে। যত্ন-আত্তি খাতিরের কথা মনেও আসে না। এ যে আজকাল নিজের মেয়েও করে না।

ছাগল দোয়ানো দেখতে দেখতে চোখে প্রায় জল এসে গেল। দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দৃশ্যটা দেখলেন। মালসা ভরে উঠল দুধে, দীননাথের মনটাও ভরে গেল। দুনিয়াতে একটু আদর ছাড়া আর তাঁর কিছু চাওয়ার নেই।

ফিরে এসে বউমার ঘরের দাওয়ার সিঁড়িতে উঠে ডাকলেন, বউমা! ও মেজো বউমা!

ঘরে কেউ নেই। শ্রীনাথের তিন মেয়ের নাম ওদের ঠাকুমাই রেখে গেছেন— রমলা, বিমলা আর কমলা। সে নাম অবশ্য আজ আর টিকে নেই। শুধু দীননাথই আজও ওদের এই নামে ডাকেন। রমলা এখানে থাকে না। তার এক মাসি তাকে দত্তক নিয়েছে। বিমলা আর কমলাকে বড় একটা দেখতে পান না দীননাথ। এখন দেখলেন, মেজো বিমলা লাল একটা শাড়ি পরে খুব পাকা মেয়ের মতো সেজে এলোচুল খোঁপায় বাঁধতে বাঁধতে উঠোন পেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে।

দীননাথ ডাকলেন, বিমলি।

কী দাদু?

কোথায় যাস?

কোথায় যাব? বাড়ির মধ্যেই।

তোর মা কোথায়?

মা বেরিয়েছে। কিছু লাগবে?

না, কী আর লাগবে।

তবে? কথা বলার লোক পাচ্ছ না বুঝি?

দীননাথ হেসে বলেন, তো তুই-ই আয় না, দুটো প্রাণের কথা বলি বসে বসে।

পাঠশালার মাঠে আমার বন্ধুরা বসে আছে যে।

তবে যা।

তুমি গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলো না! বাবা ফিরেছে।

ফিরেছে? যাক।

বলে উঠলেন দীননাথ। লাঠিতে ভর দিয়ে বেশ ভালই হাঁটতে পারছেন। কাউকে না ধরে, কারও সাহায্য না নিয়ে পৌঁছে গেলেন ভাবন-ঘরে।

শ্রীনাথ একটু দূরের ছেলে। দীননাথ এমনিতেই ছেলেদের সমীহ করেন, শ্রীনাথকে আরও একটু। ছোট ছেলে ছাড়া আর কাউকে তুই-তোকারি করেন না। বাইরে দাঁড়িয়ে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে সাবধানে ডাকলেন, শ্রীনাথ, আছো নাকি?

ভিতর থেকে গম্ভীর গলা এল, কে?

আমি দীননাথ।

শ্রীনাথ দরজায় এসে দাঁড়াল। খালি গা, পরনে একটা সবুজ লুঙ্গি। টকটক করছে ফর্সা রং। চুলগুলো এলোমেলো। চোখের নীচে একটু বসা ভাব, একটু কালচেও। ঠোঁট দুটো কেমন যেন ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে আছে। শরীরের বাঁধুনি নেই। এক সময়ে খুবই সুপুরুষ ছিল শ্রীনাথ। এখনও আছে। বোধহয় এখন একটু বয়সের ছাপই পড়েছে চেহারায়।

শ্রীনাথ একটু অবাক এবং বিরক্ত হয়েছে। বলল, আপনি একা একা এতদূর এলেন কেন?

দীননাথ অপ্রতিভ হয়ে হাসলেন। বললেন, আজকাল একটু হাঁটতে-টাটতে পারি। বউমার কাছে এসে বেশ ভাল আছি। কত সেবা-যত্ন।

বলে বড় বড় চোখ করে ছেলের দিকে চাইলেন দীননাথ। কিন্তু শ্রীনাথ খুশি হয়েছে বলে মনে হল না, বরং বিরক্তিটা স্পষ্ট প্রকাশ পেল। বলল, তবু একা একা এতদূরে এসে ভাল করেননি।

দীননাথ ম্লান হয়ে বললেন, ভাবলাম অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় না। তুমি তো রাত করে ফেরো, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়ি।

বিরক্ত শ্রীনাথ বলল, দেখা করার কী আছে?

তোমার শরীরটা কি ভাল নেই? আজ তাড়াতাড়ি ফিরলে যে।

না, শরীর ভালই আছে।

দীননাথ ঘরে ঢুকতে সাহস পেলেন না। অনেকটা হেঁটে এসে একটু কাহিলও হয়ে পড়েছেন। লাঠিটা পাশে রেখে বড় একটা শ্বাস ছেড়ে ছেলের মন রাখার জন্য বললেন, অফিসে নাকি তোমার খুব নামডাক। খাটুনিও তাই বোধ হয় বেশি। নামডাক হলেই খাটুনি বাড়ে।

শ্রীনাথ ঠোঁট ফাঁক করে অসহায় বিরক্তি নিয়ে বাবার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, চলুন আপনাকে রেখে আসি।

তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই পারব। একটু দমটা নিয়ে নিই।

অনিচ্ছের গলায় তখন শ্রীনাথ বলে, শানে বসছেন কেন? দাঁড়ান চেয়ার এনে দিই।

হাত তুলে দীননাথ বলেন, তার দরকার নেই। এই ভাল। বলছিলাম কি বউমার ব্যবস্থা তো খুবই সুন্দর, চারদিকে লক্ষ্মী শ্রী। একটু আগে বসে বসে ভাবছিলাম, এই জায়গায় তোমরা তিন ভাই যদি একসঙ্গে থাকতে পারতে!

শ্রীনাথ কথাটার জবাব দিল না। তবে অনেকটা দূরত্ব রেখে সেও বারান্দার শানে বসল উবু হয়ে।

দীননাথ আপন মনেই বললেন, এখানে হাঁস, মুরগি, গোরু, ছাগল, সবজি কত কী! অপর্যাপ্ত। বুলুটার কথা ভাবি। বড় কষ্টে আছে। সবাই মিলেমিশে থাকলে কারও তেমন কষ্ট থাকবে না।

শ্রীনাথ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, বুলুর কষ্ট কিসের?

সংসারে বড় অভাব। আমি তো ওদের সংসারে কম দিন থেকে আসিনি।

অভাব হওয়ার তো কথা নয়। বুলু যা মাইনে পায় ওদের দু'জনের ভালভাবে চলবার কথা।

তবে চলে না কেন?

কঞ্জুসদের ওরকমই হয়। ওটা অভাব নয়, স্বভাব।

বুলু যে একটু কৃপণ তা দীননাথ জানেন। তবু কথাটা স্বীকার না করে মাথা নেড়ে বললেন, মিতব্যয়ী আর কী। তবে প্রয়োজন বুঝে খরচ করতে পিছোয় না।

শ্রীনাথ অন্যমনস্ক হয়ে দূরের দিকে চেয়ে ছিল। বলল, কষ্ট তো আমারও কিছু কম যায়নি একসময়ে। তখন বুলু ক'দিন খোঁজ করেছে?

দীননাথ আবার অপ্রতিভ হয়ে বললেন, ও খোঁজ করে কী করবে? ওর নিজেরই চলে না।

এ কথায় শ্রীনাথের মুখ বিকৃত হয়ে যায়। তীব্র বিরক্তির গলায় বলে, বুলুকে আপনি খুবই স্নেহ করেন, সেটা ভাল কথা। কিন্তু আপনার যে আরও দু'টি ছেলে আছে সে কথাটা ভুলে যান কেন?

এত একচোখোমি মোটেই ভাল নয়।

দীননাথ এ কথায় একেবারে বেহাল হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে নিজের ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, কথাটা ঠিক তা নয়। বুলুর কাছেই ছিলাম তো, তোমরা কেউ খোঁজ নিতে না।

বাজে কথা।— শ্রীনাথ ধমক দিয়ে বলে, আমরা সবসময়েই আপনার খোঁজ নিতাম, টাকাও পাঠানো হত।

সে সবই শুনেছি।

তবে বলছেন কেন?

বলে কিছুক্ষণ আক্রোশভরে দীননাথের দিকে চেয়ে রইল শ্রীনাথ। তারপর হঠাৎ তার চোখ উদাস হয়ে গেল। মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল, আস্তে আস্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। খুবই উদাস গলায় বলল, বুলু বা দীপু যদি এখানে এসে থাকতে চায় অনায়াসেই থাকতে পারে। আমি বলার কে? এ সম্পত্তি কার তা কি আপনি জানেন না?

কেন, মল্লিনাথের।

শ্রীনাথ মৃদু ম্লান হাসি হাসল। বলল, আপনার ভীমরতি ধরেছে। এ সম্পত্তি আপনার বউমার।

দীননাথ তাতে হটে গেলেন না। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, বউমার মানেই তো তোমার। স্ত্রী-ধনে স্বামীর পুরো অধিকার। তাছাড়া স্ত্রীলোকের আবার আলাদা সম্পত্তি হয় নাকি? আমি যদি একটা বাড়ি করতাম তবে তোমার মায়ের নামেই করতাম। সবাই আজকাল তাই করে।

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, অন্যে কী করে তা দিয়ে আমার কী? আপনার বউমার সম্পত্তি আমি নিজের সম্পত্তি বলে মনে করি না।

দীননাথ একটু অবাক হয়ে বলেন, বউমা তো চমৎকার মেয়ে। আমার জন্য ছাগল পর্যন্ত কিনেছে। তোমার সঙ্গে তার বনিবনা হয় না কেন?

শ্রীনাথ বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। বলল, ছাগল কিনেছে?

শুধু তাই? দু'বেলা ডাক্তার আসছে। চমৎকার সব খাওয়াদাওয়া। আমার তো দশ বছর বয়স কমে গেছে।

শ্রীনাথ চুপ করে রইল।

দীননাথ বললেন, তুমি বরং বউমাকে একটু বলে দেখো। তুমি বললে বউমা দীপু আর বুলুকে এখানে আনতে অরাজি হবে না।

আপনার বউমা আমার কথায় চলেন না। আপনিই বলুন, তবে এটা জেনে রাখবেন, এ সম্পত্তিতে আমার অধিকার নেই। আমি অধিকার ফলাতেও চাই না।

বড় ভাইয়ের সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে। মেয়েমানুষ যত ভালই হোক তাকে মাথায় উঠতে দিতে নেই।

বিরক্ত হয়ে শ্রীনাথ বলে, যা বোঝেন না তা নিয়ে কথা বলেন কেন? বউমা আপনার সেবা-যত্ন করছে, সে খুব ভাল কথা। আরামে থাকুন। খামোখা সংসারের পলিটিকসে মাথা দিতে যাবেন না। তা হলে আর বেশি দিন আরামে থাকতে হবে না। আপনার ভালর জন্যই বলছি। এখন আপনি যান, আমার কাজ আছে।

দীননাথ ম্লানমুখে উঠে পড়েন। তিন ছেলে এক জায়গায় থাকবে, তার এই স্বপ্নটা হয়তো কোনওদিন সত্য হবে না। ছেলেদের মধ্যে মিল নেই। তবু বউমাকে একবার বলে দেখবেন। বউমা বিবেচক।

গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে ধীরে ধীরে দীননাথ চলে যাচ্ছেন, এই দৃশ্যটা খানিকক্ষণ দাওয়ায়

বসে দেখল শ্রীনাথ। তারপর ঘরে এসে হেলানো চেয়ারটায় বসল। জীবনে কোথাও কোনও শান্তি নেই। মদ মেয়েমানুষ রেস খেলা কিছুতেই সে কোনও আনন্দ পায় না আজকাল। মনটা বিষাক্ত, বিরক্ত, ক্ষিপ্ত। মাথার মধ্যে পাগল-পাগল ভাব।

বহুক্ষণ চোখ বুজে ভিতরকার যন্ত্রণাটা অনুভব করে শ্রীনাথ। ভিতরে যেন একটা অর্থহীন পাগল কারখানা চলছে। বিপুল রোলার, পিনিয়ন শ্যাফট চলছে ঘুরছে শব্দ করছে, কিন্তু কিছুই তৈরি হচ্ছে না। একা হলেই নিজের ভিতরে এই পাগলা কারখানার কান্ড টের পায় সে। বহুকাল হল সে কোনও সৎ চিন্তা করে না, সৌন্দর্য উপভোগ করে না।

খুব তলিয়ে ভাবলে অবশ্য একটা কথা স্বীকার করতে হয়। এই যন্ত্রণাটাকে সে উপভোগ করে। এই বিষ থেকেই একটা নেশার আমেজ উঠে এসে তার মন আর মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। একরকমের মৌতাত। তখন সে বাইরের পৃথিবীর কিছুই লক্ষ করে না, আপনমনে বিড় বিড় করে নানা কথা বলতে থাকে। কান পেতে শুনলে শোনে, বিড় বিড় করে সে যা বলে সেগুলো কুৎসিত অশ্লীল সব গালাগাল এবং আক্রোশের কথা। আর তার সমস্ত আক্রোশ ক্রমে ক্রমে জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। সেই জায়গাটার নাম তৃষা। তাই চোখ বুজলেই সে তৃষাকেই দেখতে পায়।

বাবা!— আচমকা ডাকে খুব চমকে উঠল সে।

কে রে?

আমি। আমি স্বপ্না।— বলে স্বপ্নলেখা ঘরে আসে।

কত লম্বা হয়েছে স্বপ্না। বহুকাল বাদে দেখল নাকি নিজের ছোট মেয়েটাকে! মুখের আদলটাও একটু বদলে গেছে। নিজের মুখের সুস্পষ্ট ছাপ মেয়ের মুখে দেখতে পায় শ্রীনাথ। এ মেয়ে দিনেকালে চিত্রার মতোই সুন্দর হবে।

মেয়েকে দেখে মনটা সামান্য নরম হল। গলার তেতো ভাব যতদূর সম্ভব কমিয়ে রেখে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, কী চাস?

স্বপ্না একটু ত্রস্ত। খুব ব্যস্ত জরুরি গলায় বলে, ভাইয়ের মাথা ফেটে গেছে। তোমার ওষুধের বাক্সটা নিয়ে একবার আসবে?

মাথা ফেটে গেছে? কীভাবে?— বলে হিম হয়ে থাকে শ্রীনাথ। রক্ত সে একদম সইতে পারে না।

বেজি নিয়ে খেলা দেখাচ্ছিল পাঠশালার মাঠে। বেজিটা পালিয়ে যাচ্ছিল, ভাই তাড়া করতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে। ইটে মাথা লেগে কেটে গেছে।

তোর মা কোথায়?

মা বাড়ি নেই। ছোটমামাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় গেছে সেই দুপুরবেলায়। ফিরতে রাত হবে। পিসেমশাইকে দেখতে যাবে বলে গেছে।

তৃষাকে ঘৃণা করলেও শ্রীনাথ জানে এসব অবস্থায় তৃষাই সবচেয়ে উপযুক্ত লোক। তার রক্ত সাপের মতো ঠান্ডা, কোনও বিপদে কখনও ঘাবড়ায় না।

আঁকুপাকু করে শ্রীনাথ উঠল বলল, খুব রক্ত পড়ছে নাকি?

খুব। ভেসে যাচ্ছে।

জ্ঞান ফিরেছে?

জ্ঞান ফিরবে কী? অজ্ঞান তো হয়নি। বরং হাসছে হি হি করে।

হাসছে?

ভাইকে তো চেনো না। গেছো বাঁদর একটা।

হাসছে শুনে খানিকটা ধাতস্থ হল শ্রীনাথ। একটা ফার্স্ট এইড বক্স বহুকাল ধরে এই ঘরে রাখা আছে। দাদা মল্লিনাথই কিনে রেখেছিল। ডেসকের লকার থেকে সেটা বের করে খুলে দেখল,

ব্যান্ডেজ, কাঁচি থেকে ওষুধপত্র সব সাজিয়ে রাখা। দেখলেই কেমন লাগে। কেবল রক্ত, ক্ষত, যন্ত্রণার কাতর শব্দ মনে পড়ে। এইজন্যই না সে প্রীতমকে এতকাল দেখতে যায়নি!

বাক্সটা নিয়ে উঠল শ্রীনাথ, চল দেখি।

মায়াবশে স্বপ্না বলে, তোমাকে যেতে হবে না। বাক্সটা দাও।

পারবি?

ওমা, আমি তো ফার্স্ট এইড জানি। মা'র ঘর তালাবন্ধ, নইলে ওঘরেও ফার্স্ট এইড বক্স ছিল।— বলে স্বপ্না বাক্স নিয়ে চলে গেল।

শ্রীনাথ বসে পড়ে। কিন্তু নিজের ভিতর এক অস্থিরতা বোধ করতে থাকে। একবার যাওয়া দরকার। তবে একটু পরে। আগে ওরা রক্ত-টক্ত মুছে ব্যান্ডেজটা বেঁধে ফেলুক।

ভিতরের কারখানাটা আবার ভীমবেগে চলতে শুরু করে। শ্রীনাথ বিড় বিড় করতে থাকে, মাগি! হারামজাদি! শুয়োরের বাচ্চা!

সন্ধে হয়ে আসতে শ্রীনাথ উঠে পড়ল। জামা-কাপড় পরে ভিতরবাড়িতে এসে সজলকে দেখল। ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা নিয়ে শুয়ে শুয়েই মেকানো নিয়ে খেলছে। দেখেই বলল, বাবা দেখো, ঠিক হাওড়ার ব্রিজ হয়নি?

শ্রীনাথ আড়চোখে লোহার ছোট ছোট পাতে নাটবল্টু দিয়ে এঁটে তৈরি করা ব্রিজটা দেখে বলল, অনেকটা।

এই সেটটা দিয়ে ক্যান্টিলিভার ব্রিজ হয় না। তুমি আমাকে একটা বড় মেকানো কিনে দেবে?

দেওয়া যাবে।

আজই।

আজ কী করে হবে? ওসব তো কলকাতা ছাড়া পাওয়া যায় না।

তুমি কলকাতায় যাচ্ছো তো?

না। এখানেই একটু ঘুরে আসতে যাচ্ছি।

আমি যাব?

আজ নয়। সদ্য একটা ব্যথা পেয়েছ।

ব্যথা লাগেনি।

তোমার এ টি এস নেওয়া আছে?

হ্যাঁ।

তবু আজ আর না বেরোলেই ভাল।

তা হলে কী আনবে?

কী চাও?

কিছুমিছু এনো।— বলে সজল হি হি করে হাসে।

হাসছ কেন?

কিছুমিছু গল্পটা জানো না বাবা?

না।

নিতাইদা জানে। সওদাগর বাণিজ্যে যাচ্ছিল, সবাই সবকিছু আনতে বলল, শুধু ছোটবউ বলল, কিছুমিছু এনো।

সজল গল্প শুরু করছে দেখে শ্রীনাথ তাড়াতাড়ি বলে, গল্প পরে শুনব বাবা। তুমি এখন ঘুমোও।

সন্ধেবেলা কি ঘুম আসে? এখুনি মাস্টারমশাই আসবে যে।

আজ পড়বে?

পড়ব। আমার কিছু হয়নি।

চিন্তান্বিত মুখে শ্রীনাথ ছেলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর বলে, তা হলে প'ড়ো।

উঠে পড়ি বাবা?

উঠবে?— বলে আবার ভাবে শ্রীনাথ।

তুমি দিদিদের ডেকে বলে দাও যে, আমাকে ওঠার পারমিশন দিয়েছ। নইলে ওরা আমাকে জোর করে শুইয়ে রাখবে।

শ্রীনাথ ষড়যন্ত্রটা বুঝতে পারল। তবু ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

তা হলে উঠি?

শরীর ভাল লাগলে ওঠো।

সজল উঠেই পড়েছিল। এখন এক লাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। 'হো হো হো' বলে দু'হাত ওপরে তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এক ছুটে।

শ্রীনাথ বেরিয়ে এসে দেখে স্বপ্না কোথা থেকে এসে সজলকে পাকড়াও করে ধমকাচ্ছে, শিগগির গিয়ে শুয়ে থাক। নইলে মা এলে বলে দেব।

শ্রীনাথ গম্ভীর গলায় বলল, ওর তেমন কিছু হয়নি। ছেড়ে দে। বসে বইটই পড়ুক, মন ভাল থাকবে।

শ্রীনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। হাতে টর্চ। রামলাখনের ঘরে ফুর্তির আসরটা কী রকম তা একবার দেখে আসবে আজ। খুবই নোংরা অস্বাস্থ্যকর নিশ্চয়ই। তবে শ্রীনাথের আজকাল বাছাবাছির মন নেই। তা ছাড়া এখানকার বদমাশ শয়তানগুলোর সঙ্গে একটু মেলেমেশা করা বড় দরকার।

॥ উনত্রিশ ॥

শ্রীনাথ বাড়ির ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়ে চারপাশে লক্ষ করল। দু'-চারজন যাতায়াত করছে, কিন্তু চেনা মুখ নজরে পড়ল না। ধীরেসুস্থে স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকে সে।

সামনেই একটা তেমাথা মোড়। আর মোড় মানেই কিছু পানবিড়ি বা মুদির দোকান। কিছু লোক সমাগম। এখানে দু'-চারটে চেনা মুখ নজরে পড়ল বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে কথাবার্তার সম্পর্ক বড় একটা নেই শ্রীনাথের। রাস্তায় ঘাটে প্রায়ই দেখে, এই যা। তবে হরিশ কম্পাউন্ডার ধীরে ধীরে সাবধানে সাইকেল চালিয়ে মোড় পেরিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। হরিশের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা নেই, তবে কথাবার্তা হয়। শ্রীনাথ হাঁক মারল, হরিশবাবু যে!

হরিশ সাইকেলের ব্রেক চেপে ধরেও ঘষটাতে ঘষটাতে খানিক দূর চলে গিয়ে নামল। এ অঞ্চলে শ্রীনাথবাবু মানী লোক। তিনি ডাকলে থামতেই হয়, পথ-চলতি জবাব দিয়ে চলে যাওয়া যায় না।

হরিশ একগাল হেসে বলে, ভাল আছেন তো শ্রীনাথদা?

খারাপ কী? আপনাকে বহুকাল দেখি না।

দেখবেন কী করে, আপনারা কাজের লোক, ব্যস্ত থাকেন।

আমার আর কাজ কী? বসে বসে খাচ্ছি।— বলে শ্রীনাথ একটু শ্লেষের হাসি হাসে।

হরিশের সাইকেলের হ্যান্ডেলে একটা ন্যাকড়ার ব্যাগ ঝুলছে। বোধ হয় বাজার করে ফিরবে সেই রাত্রিবেলা। কম্পাউন্ডার হলেও বোধ হয় হরিশের সংসার বেশ সুখেরই। মুখে-চোখে সংসারী মানুষের স্বাভাবিক দুশ্চিন্তার ছাপ আছে, চেহারাটাও গরিবদের মতো নীরস। বোধ হয় দিন দুয়েক দাড়ি কামায়নি। অল্পে বুড়িয়ে যাওয়ার ভাব। নিতান্তই সস্তা হ্যান্ডলুমের ময়লা গেরুয়া পাঞ্জাবি আর মোটা ধুতির পোশাক। পায়ে হাওয়াইজোড়ার সোল কাগজের মতো পাতলা। তবু লোকটাকে

অসুখী মনে হয় না শ্রীনাথের। একহাতে সাইকেলটা ধরে রেখে অন্য হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার হাসি হেসে বলে, বসে বসে খেলেও কি আর বড়লোকদের কাজের অভাব হয়?

আমি বড়লোক কিসের? সবাই জানে, সম্পত্তি সজলের মায়ের।

ওই হল। আপনার যে কেমন সব কথা!

কথাটা শুনতে খারাপ বলেই কি আর মিথ্যে? আমি বড়লোক-টড়লোক নই বাপু।

হরিশ বোধ হয় এসব কথায় থাকতে চায় না। অন্য কথায় যাওয়ার জন্যই বলল, আজ যে বড় বেলাবেলি দেখছি। এত সকালে তো ফেরেন না।

আজ ফিরেছি। ভাবলাম, রোজ তো কলকাতায় ফুর্তি করিই, আজ এখানকার রসের হাটটা একটু দেখে আসি।

হরিশ একটু ঘাবড়ে গেল এ কথায়। বলল, তা বেশ তো। ভাল কথা।

শ্রীনাথ কূটচোখে হরিশকে নজর করছিল। একে দিয়ে কাজটা হলেও হতে পারে। তাই সে গলাটা একটু নামিয়ে বলল, রামলাখনের ঝোপড়ায় কেমন ব্যবস্থা জানেন?

হরিশ থতমত খেয়ে বলে, রামলাখন? মানে লাইনের ওপাশে?

হ্যাঁ। শুনেছি নাকি খুব জমে সেখানে।

হরিশ বিষণ্ণ মুখে বলল, জানি না।

বেশ গলা তুলে মোড়ের প্রায় সবাইকে শুনিয়ে বলল, আজ রামলাখনের ঘরেই ফুর্তি করতে যাচ্ছি।

হরিশ এ কথার জবাব না দিয়ে এবং কথাটা যেন শোনেনি এমন ভাবখানা করে তাড়াতাড়ি বলল, যাই তা হলে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বলেই সাইকেলটা একটু ঠেলে গুপ্ করে লাফিয়ে উঠে বসল।

শ্রীনাথ একটু চেয়ে রইল চলন্ত সাইকেলটার দিকে। আশা করা যায়, আজ বা কালকের মধ্যেই সারা বাজারে কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। ভেবে আপনমনে এক বিষাক্ত আনন্দের হাসি হাসল শ্রীনাথ। ছড়াক, অনেকদূর পর্যন্ত ছড়াক।

মোড় ছাড়াতেই যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা। বছরখানেক আগে হাইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার হিসেবে রিটায়ার করেছেন। এখন দু'বেলা টিউশনি করেন আর অবসর সময় কাটে বছর তিনেকের নাতনিটিকে নিয়ে। আজও নাতনি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। যতীনবাবুরও ভারী গাছপালার শখ। তবে পয়সার অভাবে বিরল জাতের দামি গাছ লাগাতে পারেন না। আজ দেখা হতেই বললেন, দেওঘর থেকে গোলাপ আনিয়েছেন শুনলাম। আমাকে একটা কলম দেবেন?

আর ক'দিন যাক। গাছ এখনও মাটির সঙ্গে কথা কইছে।

সে তো জানি। গাছ বড় হোক, আমার কথাটা যেন মনে থাকে।

থাকবে। আপনি নতুন কী লাগালেন?

এ সিজনে আর কী হবে! মল্লিকা লাগিয়েছিলাম, খুব ফুল হচ্ছে। আপনার কথামতো কেমিক্যাল সার একদম বাদ দিয়ে দিয়েছি।

ভাল করেছেন। বেশিদিন কেমিক্যাল সার দিলে মাটি জমে পাথর হয়ে যাবে। দুনিয়াটার যে কী সর্বনাশই করছে মানুষ কেমিক্যাল সার দিয়ে। বুঝবে একদিন।— দরদি লোক পেয়ে কথাটা আবেগ দিয়ে বলল শ্রীনাথ।

যতীনবাবুর বাচ্চা নাতনিটা খুঁত খুঁত করছে। দাদুর এই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা তার বিশেষ পছন্দ নয়। যতীনবাবু নাতনিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, ক'দিন ধরেই যাব-যাব ভাবছিলাম। কিন্তু আপনাকে তো বাড়ি গিয়ে পাওয়া যায় না। আজ ভাগ্যে দেখা হয়ে গেল।

সকালের দিকটায় থাকি।

আজ ছুটি নাকি?

না। তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি।

বলে একটু ইতস্তত করল শ্রীনাথ। যারা গাছ ভালবাসে তাদের দুঃখ দিতে তার প্রাণ চায় না। কিন্তু মনে এত বিষজ্বালা যে, সব সৎ ও অসতের বোধ একাকার হয়ে গেছে। তাই শ্রীনাথ দ্বিধা ঝেড়ে বেশ স্পষ্ট করে বলল, যাচ্ছি একটু রামলাখনের ঘরে ফুর্তি করতে।

যতীনবাবু কথাটা ঠিক বুঝতে পারেননি। বললেন, রামলাখন? সেটা আবার কী?

ওই লাইনের ওপাশে তার ঝোপড়ায় দেশি মদ বিক্রি হয়। আরও সব ব্যাপার আছে।

যতীনবাবু হাঁ হয়ে গেলেন। এমনভাবে তাকালেন যেন শ্রীনাথের মাথা খারাপ হয়েছে কি না তা বুঝতে পারছেন না। দৃশ্যটা করুণ এবং শ্রীনাথের একটু কষ্টও হল। কিন্তু এরকমভাবে কথাটা না ছড়ালেও তার উপায় নেই। এ তার লড়াই।

যতীনবাবু ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। নাতনিকে আর-একটু বুকে চেপে ধরে ভ্রু-টা কুঁচকে বললেন, যান। বড়লোকদের সবই মানায়।

আমি বড়লোক নই, তবে ফুর্তিবাজ বটে। বড়লোক হচ্ছে সজলের মা। আমি কে?

যতীনবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, ওসব ভদ্রলোকের জায়গা নয়।

বেশ রেলার সঙ্গেই শ্রীনাথ বলল, ভদ্রতার মুখে পেচ্ছাপ।

এই কথাটাই যতীনবাবুকে ধাক্কা দিয়ে সচল করে দিল। নাতনি নিয়ে বেশ পা চালিয়ে চলে গেলেন।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একা একা হাসল শ্রীনাথ। কাজ হচ্ছে। কাজ হচ্ছে।

চোটে হেঁটে শ্রীনাথ স্টেশনের বিপরীত গঞ্জে পৌঁছে গেল সন্ধের ঘোর-ঘোর আঁধারে। রামলাখনের ঝোপড়াটা সে কয়েকদিন হল চিনে রেখেছে দূর থেকে। কাজেই খুঁজতে হল না।

তবে রামলাখনের আড্ডাটা নিতান্তই ছোটলোকদের জন্য। উঠোনে গোটা চারেক ছাগল বাঁধা অবস্থায় মিহিন স্বরে ডাকছে মাঝে মাঝে। দড়ির জালে ঘেরা বারান্দার একধারে মুরগির পাল ডানা ঝাপটাচ্ছে। ছাগলের বোঁটকা গন্ধের সঙ্গে মুরগির চামসে গন্ধ মিশে বাতাস দূষিত।

উঠোনের দু'পাশে দুটো খোড়ো ঘর। মাটির ভিত। সর্বত্রই নোংরা ময়লা আর দীনদরিদ্র হাড়হাভাতে ভাব। কোনওকালেই এরকম কুৎসিত জায়গায় পা দেয়নি শ্রীনাথ। এখানে ফুর্তির প্রশ্ন ওঠে না। বরং বমি আসছে।

তবু এ তো তার লড়াই।

রামলাখনকে চাক্ষুষ চেনে কি না তা সে নিজেও জানে না। দেখলে হয়তো মুখটা চেনা বলেই জানতে পারবে। তবে সে না চিনলেও এ তল্লাটে তাকে সবাই চেনে। তাই বারান্দায় উঠে গম্ভীর গলায় হাঁক মারল, রামলাখন!

ঘরের ভিতর থেকে সোঁদা টকচা বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে। সম্ভবত পচাই বা তাড়ি, বা দুটোই। এসব কখনও খায়নি শ্রীনাথ। খেতে পারবে বলেও মনে হয় না। গন্ধে গা গুলোচ্ছে।

খুব নিচু আধমানুষ সমান একটা দরজা সামনে। কুঁজো হয়ে সাজোয়ান একটা লোক উঁকি মেরে খুব ভ্রুকুটি করে তার দিকে চাইল।

শ্রীনাথ উঁচু গলায় বলে, তুমি রামলাখন?

রামলাখন সন্ধের ঘোর-ঘোর অন্ধকারে বোধ হয় ভাল দেখতে পায় না। ফের ঘরে ঢুকে একটা হ্যারিকেন হাতে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলল, কী চাই বাবু?

শ্রীনাথ হেসে বলল, দূর ব্যাটা। তোর এখানে লোকে আবার কী চাইবে? ফুর্তি করতে চাই।

লোকটা হাঁ করে আছে। হ্যারিকেনের আলোতেও তার চোখে আতঙ্ক দেখতে পায় শ্রীনাথ। বোধ হয় তার মতো বিশিষ্ট লোক এখানে আসায় ভড়কে গেছে।

শ্রীনাথ গলা মোলায়েম করে বলে, ভাল মালটাল রাখিস? না কি শুধু পচাই আর তাড়ি?

লোকটা জবাব দিচ্ছিল না। ঘরের ভিতরে বোধ হয় দু'-চারজন গুন গুন করে কথা বলছিল, সেসব কথাবার্তা থেমে গেছে। লোকটার মুখের ভাব আর চারদিককার আবহাওয়ায় কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল শ্রীনাথের। সে রামলাখনকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলল, আরে ভয় নেই, পুলিসের লোক নই। আমাকে চিনিস না? আমি চাটুজ্জেবাড়ির বাবু।

এবার লোকটা চেরা গলায় এক কথায় বলল, চিনি।

তবে হাঁ করে আছিস কেন?

লোকটা একটু যেন বিরক্ত গলায় বলল, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আবার কী অন্যায়টা হল?

কথাটার কোনও মানেই বুঝল না শ্রীনাথ। বলল, দূর ব্যাটা, নিজেই এক পেট গিলে বসে আছিস নাকি? কী হয়েছে? কিসের কথা বলছিস?

লোকটা কথা কানে না তুলে বলল, সাচ বাত বলে দিই বাবু, নিতাই শালা বহুত হারামি। অনেকদিন আমার বেজিটা চুরি করাব মতলবে ছিল। লাইনের এধারে শালাকে পেলে ছাড়ব না।

শ্রীনাথ বুঝল, নিতাই একটা কিছু করেছে। তা সে নিত্যই সবসময়েই করে। চুরি তার হাতের পাঁচ। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে শ্রীনাথ ভাবে, নিতাইকে তাড়িয়ে দেবে। আবার মনে হয়, সেই দাদার আমল থেকে আছে, পাগলছাগল লোক। আছে থাক। কত সময়ে কাজেও লেগে যায়।

শ্রীনাথ জিজ্ঞেস করল, কেন? নিতাই কী করেছে?

আপনি জানেন না বাবু?

বললে তো জানব! আমি কি নিতাইয়ের খবর নিয়ে বেড়াই নাকি?

আপনার শালা সরিৎবাবু আমাকে বাজার থেকে মারতে মারতে সকলের সামনে দিয়ে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। বলল, বের কর তোর বেজি, নইলে জান নিয়ে নিব। বলুন, কাজটা জুলুম নয়? নিতাই বেজি চুরি করেছে সবাই জানে। আর চোরাই মাল ঘরে রাখার মতো বুরবক তো নিতাই নয়। ঝুটমুট আমার হয়রানি।

সরিৎ তোমাকে মেরেছে? কবে বলো তো?

আজ দুপুরবেলা।

শ্রীনাথ কী বলবে ভেবে পেল না। তবে রাগে তার গা জ্বলতে লাগল। সরিৎ যে ভদ্রলোকের মতো মানুষ হয়নি সেটা শ্রীনাথ জানে। কিন্তু এটা বড্ড বেশি বুক চিতিয়ে চলা। এটাকে বাড়তে দিলে অনেক দূর গড়াবে। একা তৃষাতেই রক্ষা নেই, তার ওপর আবার সরিৎ।

শ্রীনাথ একটা ধমক দিয়ে বলল, তা তোকে মারল আর তুইও মার খেলি! এত বড় গতরটা কি ভেড়ার গতর নাকি? উলটে দু' ঘা দিলি না কেন?

আই বাবা, বাবুলোকদের গায়ে হাত তুললে পুলিস জান কয়লা করে দেবে। আমরা তৃষা বউদির সঙ্গেও কাজিয়া করতে চাই না। কিন্তু নিতাই শালা কে বলুন! ওকে খাতির করব কেন?

কথা বারান্দায় দাঁড়িয়েই হচ্ছে। ভারী মশার উৎপাত। দাঁড়ানো অবস্থাতেই শ্রীনাথের ধুতি পরা পায়ের পিছনে গোটা পাঁচ-সাত কামড়াল। সে নিচু হয়ে পা চুলকোতে চুলকোতে বলল, ঠিক আছে, ব্যবস্থা হবে। এখন ঢুকতে দে বাবা। মালটাল বের কর কী আছে।

লোকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, এই ঘরে সব বস্তির লোক বসে। ওইদিকের ঘরে চলুন, আলাদা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

দূর ব্যাটা!— শ্রীনাথ হাসে, আলাদা মাল খাওয়ায় সুখ কী রে! সকলের সঙ্গে বসে খেলে তবে না মৌজ। দরজা ছাড় তো বাবা বিভীষণ।

রামলাখন দরজা ছেড়ে ভিতরে ঢুকে যায়। পিছু পিছু শ্রীনাথ।

ঘরটা বেশ বড় মাপের। মেটে ভিটির ওপর দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা কাঠের বেঞ্চ, আর মাঝখানে চাটাই পাতা। খদ্দের বেশি এখনও জোটেনি। দু'-চারজন রিকশাওয়ালা বা কুলিকাবারি গোছের লোক বসে আছে এদিক ওদিক। জানালা বেশি না থাকায় ঘরের মধ্যে যেমন গুমোট তেমনি গা-গোলানো গন্ধ। অতি জঘন্য পরিবেশ। একটা কালো মোটাসোটা গেছো মেয়েছেলে সার্ভ করছে। তার হাতে মোটা রুপোর রুলি, পায়ে মল। মুখখানার কোনও শ্রী নেই। বরং ব্রণ বা ঘামাচি থাকায় মুখের চামড়া অমসৃণ। তবে মেয়েটার একটা প্লাস পয়েন্ট যে, তার বয়স ত্রিশের নীচেই।

এই মেয়েটাই যদি এখানকার মক্ষীরাণী হয়ে থাকে তবে শ্রীনাথ এখানে মেয়েছেলের ব্যাপারটা পেরে উঠবে না।

রামলাখন তাকে একটা কাঠের চেয়ারে বসতে দিয়েছিল। শ্রীনাথ সোজা চাটাইয়ে বসল। রামলাখন বোধ হয় গরম জলে ধুয়ে ভাল একটা গেলাসে তার স্টকের সবচেয়ে সেরা দিশি মদই এনে দিল। তবু খুবই ঘিন ঘিন করছিল শ্রীনাথের। কিন্তু সে জানে মুখে দেওয়ার আগটুকু পর্যন্তই যত ঘেন্না। তারপর আর ঘেন্নাপিত্তি থাকে না, সব অমৃত হয়ে যায়।

মাল খেতে খেতে শ্রীনাথ রামলাখনের সঙ্গে জমিয়ে নিল।

বহু বহুকাল বাদে তৃষা এই ঘরের কাছের কলকাতায় এল।

দুপুরবেলা হাওড়া স্টেশনে নেমেই বুঝেছিল সে অনেকটাই গেঁয়ো হয়ে গেছে। শহর দেখলে বুকে চমক লাগে। ভয় ভয় করে। দিশাহারা বোধ হয়।

সরিৎ বলল, ট্যাক্সি নেব তো?

ট্যাক্সি! ট্যাক্সি কেন?

তবে কিসে যাব? যা ভিড়।

আমার পয়সা সস্তা হয়নি। বাসে বা ট্রামে যাব।

এ কথার ওপর কথা নেই। তবে সরিৎ আশা করেছিল। বড়লোক দিদির সঙ্গে একটু আরামে ট্যাক্সিতে ঘুরবে। সেটা হল না।

তৃষার তেমন কেনাকাটার বাই নেই। তবে বড়বাজার থেকে কিছু জামাকাপড় না কিনলেই নয়। ত্রয়ীর জন্য পাইকারদের কাছেও যেতে হল। বড়বাজারের পাইকাররা মফস্‌সলের খুদে দোকানদারদের পাত্তাই দিতে চায় না। তৃষা এসেছে তাদের কারও কারও সঙ্গে পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে। না হোক তৃষার হাতব্যাগে হাজার দশেক টাকা আছে আজ। বাসে যাওয়া কতটা নিরাপদ তা বুঝতে পারছিল না সরিৎ। শত সতর্ক থাকলেও কলকাতার হস্তশিল্পীদের কাজ খুবই সূক্ষ্ম। মেজদিও তো এখন আর কলকাতার হালচালে রপ্ত নয়। তাই সরিৎ প্রায় চোখের পাতা ফেলছিল না।

বড়বাজারের কাজ সারতে সারতেই বিকেল হয়ে গেল। অফিস টাইম।

সরিৎ বলল, ভবানীপুরে কি আজই যাবে?

যেতেই হবে। কেন?

বলছিলাম, অফিস ভাঙল তো, বাসে ওঠা যাবে না।

আমি যাবই।

সঙ্গে মালপত্র আছে যে!

পাইকারদের সঙ্গে বন্দোবস্তে যাওয়া গেছে বলে তৃষা একটু খুশি। মেয়েছেলে খদ্দের দেখেই হোক বা অন্য কারণেই হোক পাইকাররা তৃষার সঙ্গে অন্তত দুর্ব্যবহারটা করেনি। পাইকার বাছতে ঘোরাঘুরিও কিছু কম হয়নি। তাই সবদিক বিবেচনা করে তৃষা বলল, ট্যাক্সি ধরতে পারবি?

দেখি।

দেখ তা হলে।

সরিৎ অবশ্য সহজেই ট্যাক্সি পায়। তার কারণ সে সহজাতভাবেই উদ্যোগী লোক। ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে যদি অন্য কারও সঙ্গে বখেরা লাগে বা ট্যাক্সিওয়ালা বেগড়বাই করে, তবে সরিৎ টপ করে হাত চালাচালিতে নেমে যেতে পারে। তা ছাড়া নিপাট ভালমানুষের মতো ট্যাক্সিওয়ালা যেদিকে যেতে চায় সেদিককার নাম করেই উঠে বসে, তারপর নিজস্ব পথে ঘাড় ধরে নিয়ে যেতে পারে।

সুতরাং আধঘন্টার চেষ্টাতেই সরিৎ ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ভবানীপুরে যখন পৌঁছোল তখনও বেলা আছে বেশ।

একটু বাধো-বাধো লাগছিল তৃষার। বহুকাল প্রীতমবাবু বা বিলুর সঙ্গে দেখা হয়নি। এ বাড়িতে আসেওনি তিন-চার বছর। বিলুর মেয়ে হয়েছে খবর পেয়েছিল, সেই মেয়েটাকে দেখেনি পর্যন্ত।

দোতলায় উঠে কলিং বেল টিপতেই অল্পবয়সী একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ নজরে চারদিকটা দেখে নেয় তৃষা। প্রথমেই নজরে পড়ে, ঘরে অনেক দামি জিনিস, কোনও যত্ন নেই। বিলু কোনওকালেই সংসারী ছিল না। একটু উড়ু উড়ু উদাসীন মেয়ে। কুমারী অবস্থায় অনেক জল ঘোলা করেছে। তৃষা কানাঘুষো শোনে, এখনও নাকি একজন পুরুষবন্ধুর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখে।

তা সে রাখুক গে, কিন্তু সংসারটা গুছিয়ে তুলবে তো। বাইরের ঘরে সিলিং-এ ঘন কালো ঝুল জমেছে, চেয়ারে ধুলো, সোফার ঢাকনা নোংরা, টেবিলের ওপর ম্যাগাজিন অগোছালোভাবে ডাঁই করা, মেঝের জুট কার্পেটের ফেঁসো বেরিয়ে আছে, দরজার পরদায় হাজার রকমের হাতমোছার দাগ।

তৃষা প্রথমে মেয়েটিকেই জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

এ বাড়িতে বাচ্চা রাখি।

শুধু বাচ্চা রাখো?

হ্যাঁ।

তৃষার চেহারায় ব্যক্তিত্ব এবং কণ্ঠস্বরের বিরক্তিতে মেয়েটা একটু মিইয়ে গেছে। ঠিক বুঝতে পারছে না, ইনি কে বা কতখানি কর্তৃত্বের অধিকারী।

তৃষা নীরস গলায় বলল, ঘরদোরের দিকে একটু নজর দিতে পারো না? বিলু বাড়ি আছে?

না। অফিসে।

প্রীতমবাবু?

ভিতরের ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন।

তা হলে আমরা এ ঘরেই একটু বসি। তুমি ততক্ষণে একটু চা করে আনো। আর প্রীতমবাবুর ঘুম ভাঙলে বোলো, রতনপুরের বউদি এসেছে।

আচ্ছা।

বাচ্চাটা কোথায়?

বাচ্চাও ঘুমোচ্ছে।

তোমার নাম কী?

অচলা।

কতদিন কাজ করছ?

এই তো মাস তিনেক।

চা করতে পারবে তো?

এবার অচলা হেসে বলে, কেন পারব না?

না ভাবছিলাম তোমার চা করার কথা হয়তো নয়।

তাতে কী? একটু বসুন, করে আনছি।

বাড়িতে আর কাজের লোক নেই?

আছে।

বলে অচলা সরিৎকে অপাঙ্গে দেখে নিল। ঘরে ঢুকে অবধি ছেলেটা খুব মন দিয়ে তাকে দেখছে। ক্ষুধার্ত চোখ। যেন পেলেই ছিঁড়ে খায়। নজরটা অবশ্য অচলার খারাপ লাগে না। পুরুষের চোখে নিজের একটা যাচাই হয়। রতনপুরের বউদিকেও তার একনজরেই ভাল লেগে গেছে। আজকালকার ফালতু বউ নয়, ওজন আছে। ঘরের পাখা চালিয়ে দিয়ে অচলা স্মিতমুখে ভিতরে চলে গেল।

প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমে তৃষার ব্লাউজ ভিজে গেছে। কিন্তু শরীরের কষ্টকে সে কোনওকালে কষ্ট বলে মানে না। মনের কষ্টও তার নেই, কারণ মন জিনিসটাকে সে মেরে ফেলতে শিখে গেছে।

তৃষা পাখার তলায় সোফায় বসল। সরিৎ একটু সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব রেখে বসল চেয়ারে। সরিৎ জেনে গেছে সে মেজদির যতটা ভাই তার চেয়ে অনেক বেশি কর্মচারী।

একটু বাদেই ট্রেতে চা সাজিয়ে নিয়ে এল অচলা। প্লেটে বিস্কুট আর চানাচুর। বলল, দাদাবাবু জেগেছেন।

আমার কথা বলেছ?

বলেছি। উনি আসছেন।

আসছেন!— বলে ভ্রু তোলে তৃষা, আসছেন মানে? শুনেছি, উনি নাকি বিছানা থেকে উঠতে পারেন না!

এখন তো ওঠেন দেখি।

তবু কী দরকার? চলো, আমরাই ভিতরে যাই।— বলে তৃষা উঠে পড়ে।

অচলা মৃদু হেসে বলে, চা খেয়ে নিন। আমি ততক্ষণে ভিতরের ঘরটা গুছিয়ে নিচ্ছি। নইলে তো আপনি আবার রাগ করবেন।

এ কথায় মেয়েটিকে ভাল লেগে গেল তৃষার। সে মুখ টিপে একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। অগোছালো দেখলে আমার খুব রাগ হয়। ঘরদোরের সিজিল মিছিল থেকে সে ঘরের লোকেরা কেমন তা বোঝা যায়।

তা তো ঠিকই। তবে আমার কাজ শুধু বাচ্চা রাখা। ঘরের কাজের জন্য অন্য লোক আছে।

তা তো থাকবেই। তবে কাজের লোক রাখলেই তো হয় না। লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেও জানা চাই। সেটা সবাই পারে না। তোমার দোষ দিচ্ছি না। তবে বাপু তোমাকেই বলি, এ বাড়িতে যখন কাজে ঢুকেছ তখন তুমিও এ বাড়ির লোক। আপন মনে করে একটু চারদিকে নজর রেখো। শুধু মাইনের কেনা লোক হয়ে থাকলে কোনওদিন কোথাও ভালবাসা পাবে না।

এসব কথা অন্যে বললে অচলা হয়তো চটে যেত। সে বহু বাড়িতে বাচ্চা রাখার কাজ করেছে, বহু গিন্নিকে চরিয়ে খেয়েছে। কিন্তু এই বউদির কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা জোর আর ভালবাসা আছে যে অচলার রাগ তো হয়ই না, বরং ভক্তি এসে পড়ে। সে শুনেছে রতনপুরের বউদির অনেক সম্পত্তি, অনেক টাকা। কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। সাদা খোলের সাধারণ শাড়ি পরা, মুখে রূপটান নেই। কালো হলেও চেহারাখানা কী! এত সুন্দর যেন অচলা জীবনে দেখেনি। কথা বলার ঢঙটাও এত ভাল যে, বকলেও শুনতে ইচ্ছে করে।

চা খেতে খেতে তৃষা অচলার মুগ্ধ ভাব লক্ষ করছিল। সারা জীবনে তৃষা এইসব মানুষের ভালবাসা অঢেল পেয়েছে। এখনও যেসব কাজের লোক তার বাড়িতে আছে তারা এক কথায় তার জন্য প্রাণ দিতে পারে। বৃন্দাকে ডবল মাইনে দিয়ে নিতে চেয়েছিল বাজারের পুরনো মহাজন

পোদ্দাররা। বৃন্দা তো যায়ইনি, তার ওপর ক্যাট ক্যাট করে দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে। কিন্তু এসব লোকের ভালবাসা পেলেও তার জীবনে কোথাও একটা ভালবাসার অভাবও কি নেই? তৃষা জানে, তার তিন মেয়ে আর ছেলে তাকে ততটা ভালবাসে না যতটা স্বাভাবিক নিয়মে ছেলেমেয়েদের মাকে ভালবাসা উচিত। এই অভাববোধটা এতকাল তাকে কষ্ট দেয়নি। আজকাল মাঝে মাঝে কথাটা মনে হয়। নিজের পরিবারের কারও ভালবাসাই বোধহয় তৃষা কোনওদিন পাবে না। তাকে একমাত্র সত্যিকারের ভালবেসেছিল একজন। সেই তার একমাত্র প্রেমিক, একমাত্র উপাস্য, যার কথা ভাবলে আজও মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। সে মল্লিনাথ।

বাইরের চেহারায় তৃষার কোনও ভাবপ্রবণতা নেই, আবেগ নেই, আদিখ্যেতা নেই। তার জীবনে ভালবাসার চর্চাও তেমন কিছু নেই। কিন্তু ভিতরে ওই একটা জায়গায় সে আজও দুর্বল। রতনপুরের বাড়িতে প্রকাশ্য জায়গায় মল্লিনাথের কোনও ছবি নেই। বেশি ফটোগ্রাফ মল্লিনাথের ছিলও না। অনেক কুড়িয়ে বাড়িয়ে গোটা দশেক ছবি জোগাড় করতে পেরেছে তৃষা। আলাদা একটা অ্যালবামে সেঁটে সেগুলো নিজস্ব স্টিলের আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছে। এখনও মাঝে মাঝে গোপনে বের করে দেখে। যত দিন যাচ্ছে তত ধীরে ধীরে মল্লিনাথের ওপর শ্রদ্ধা বাড়ছে তার। মৃত ভাসুর মল্লিনাথকে ভালবাসা পাপ কি না কে জানে। তবে এই পাপটুকু তৃষা করে যাবে।

ভিতরের দরজার পরদা হঠাৎ সরে যেতেই তৃষা চায়ের কাপ রেখে উঠে গিয়ে প্রীতমের হাত ধরল, অনেকক্ষণ বাইরের মানুষের মতো বৈঠকখানায় বসে আছি। আর নয়, এবার অন্দরমহলটায় ঢুকতে দিন।

প্রীতম স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ আলো করে বলল, আপনার কথা এত ভাবি কী বলব! আজকাল সকলের কথা ভাবি।

যাক, আর বানিয়ে বানিয়ে খোশামোদ করতে হবে না নন্দাইমশাই। চলুন কথা বলি।

প্রীতমকে তার বিছানায় বসিয়ে পাশে বসে তৃষা। বলে, কবে রতনপুর যাবেন বলুন তো? দিন ঠিক করুন, আমি নেওয়াবার ব্যবস্থা করব।

নিয়ে কী হবে! আমার যে চিকিৎসা চলছে। গিয়েও তো থাকতে পারব না, বিলু আবার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসবে।

আনবেই তো। অসুখ হয় কেন?

সে কি আমার দোষ?

সেসব জানি না। অসুখ শিগগির সারিয়ে ফেলুন।

সারাবার মালিকও কি আমি?

সব আপনি। মানুষ ইচ্ছে করলে সব পারে।

বউদির যে কেমন সব কথা!—বলে উজ্জ্বল মুখে একটু হাসে প্রীতম। এই একজন লোক, যে এ কথা বলল।

মেয়ে কোথায়?

পাশের ঘরে।

দাঁড়ান দেখে আসি।

বলে তৃষা উঠে গেল। ফিরে এসে বলল, অচলা ওকে ঘুম পাড়িয়েছে বুঝি। কপাল আমার, মটকা মেরে পড়ে চোখ পিট পিট করছে। আমাকে দেখেই চোখের পাতা টাইট করে বন্ধ করল।

প্রীতম হাসল। বলল, আপনি এলে কী যে ভাল লাগে! দাদাকে সঙ্গে আনলেন না?

বেশ বলেছেন ভাই। দাদাকে সঙ্গে আনব কী, বরং আপনার দাদার সঙ্গেই তো আমার আসার কথা।

ওই হল।

আমি তাঁর নাগালই পাই না। কলকাতায় চাকরি করতে আসেন কোন সকালে, ফেরেন রাত্রে। একদিন আমাকে দেখতেও এলেন না।

মানুষটা একটু ওইরকম।

আপনি এতদিন বাদে দোষ কাটাতে এলেন?

তৃষা হেসে বলে, রতনপুরে চলুন, দেখবেন আমাকে সকাল থেকে সংসার কেমন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোড়াচ্ছে। তখন উলটে বোধহয় আমার জন্য মায়া হবে।

প্রীতম খুশি হচ্ছিল। তৃষা বউদি একবারও তার শুকিয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে একটুও মন্তব্য করেননি। সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনি ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করেন বউদি?

ওমা! কেন করব না? আমি নিজেই তো ভাই ইচ্ছের শক্তিতে চলি। আমার তো আর কোনও ক্ষমতা নেই।

বিমর্ষ মুখে প্রীতম বলে, কিন্তু বিলু করে না। বিলুকে অরুণ বুঝিয়েছে, অসুখ-বিসুখের ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তির কোনও দাম নেই।

অরুণ কে তা জিজ্ঞেস করল না তৃষা। অরুণের কথা সে জানে। শুধু বলল, শহুরে লোকরা যা-ই ভাবুক, আমরা গেঁয়ো লোক ওসব মানি। বিলু অফিস থেকে কখন ফিরবে বলুন তো!

আজ রাত হবে বলে গেছে। অফিসের এক কলিগের বিয়ে।

তা হলে আমি তো আজ আর বেশিক্ষণ বসতে পারব না। শ্বশুরমশাই আমাকে কিছুক্ষণ না দেখলেই অস্থির হয়ে পড়েন।

আর-একটু বসুন বউদি। আপনার সঙ্গে কথা বললেই ভাল লাগে।

বসল তৃষা। কয়েকবার চা খেল। খাবারও খেতে হল। লাবুর জন্য একটা সোনার হার এনেছিল। লাবু ওঠার পর সেটা তার গলায় পরিয়ে আদর করল একটু। সন্ধের বেশ কিছু পরে যখন উঠল, তখন প্রীতমকে খুবই উজ্জ্বল এবং আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। তৃষা বলল, তাড়াতাড়ি রোগটাকে মেরে তাড়িয়ে দিন।

আবার কবে আসছেন?

আসব। শিগগিরই আসব। গিন্নিটাকে তৈরি থাকতে বলবেন। এবার এসে একবেলা থেকে খেয়েদেয়ে যাব।

বিশ্বাস হয় না। তবে শুনতে ভাল লাগল।—বলে প্রীতম স্নিগ্ধ হাসে।

দেখবেন।—বলে তৃষা উঠে পড়ে।

রতনপুরে গাড়ি থেকে তৃষা আর সরিৎ যখন নামল তখন রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। রিকশা তৈরি ছিল। উঠে পড়ল দু'জনে।

তেমাথা পেরিয়ে রিকশা যখন সাঁই সাঁই করে ছুটছে তখন বটতলায় একটা ভিড় দেখে তৃষা বলল, ওরে, রিকশা থামা! থামা!

বটতলার বাঁধানো চত্বর ঘিরে অন্তত জনা কুড়ি লোক ঝুঁঝকো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। একটা লোক চত্বরের ওপর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, ওই মাগিকে যতক্ষণ না দেশছাড়া করতে পারছ ভাইসব, ওর ভাইটাকে যতক্ষণ না চিতায় তুলছ ততক্ষণ তোমরা সব শুয়োরের বাচ্চা...

সরিৎ মৃদু স্বরে বলল, জামাইবাবু।

জানি। তুই নেমে যা।

কিছু করতে হবে?

না, শুধু কী বলছে শুনে আসবি। আমি চললাম।

রিকশা চলে গেল। সরিৎ চিতাবাঘের পায়ে গিয়ে বটতলার ভিড়ে মিশে গেল।

॥ ত্রিশ ॥

আজ বোসসাহেবের মুখে খুব ছেলেমানুষি হাসি দেখল দীপ। একটা খোলা টাইপ করা চিঠি টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বোস বলে, ম্যানেজমেন্ট আমার প্রোপোজাল মেনে নিয়েছে।

দীপ চিঠিটা ভদ্রতাবশে তুলল, তাকিয়ে দেখল, কিন্তু পড়ল না। তার দরকারও নেই। চিঠিটা আবার টেবিলে রেখে দিয়ে বলল, তা হলে বাঙ্গালোরে?

ইটস ড্রপড ন্যাচারেলি।

ভাল।—খুব উদাস গলায় বলে দীপনাথ।

খুশি হলেন না?

দীপ একটু অবাক হয়ে বলে, আমার খুশি-অখুশির ব্যাপার তো নয় বোসসাহেব।

কিন্তু আপনি বোধহয় চেয়েছিলেন আমি বাঙ্গালোরে না যাই।

দীপ মাথা নেড়ে বলে, ঠিক তা নয়। তবে আমি নিজে যেতে চাইনি।

বোস একটু যেন ম্লান হয়ে বলে, তাই হবে। আমিই হয়তো ভুল ভেবেছিলাম।

দীপ স্থির চোখে চেয়ে বলে, আর-একজনও বোধহয় চাননি। মিসেস বোস।

ওর কথা বাদ দিন। ওদিকটা নিয়ে আমি ভাবছি না। মিসেস বোসও আপনার মতোই। আমি যাই ক্ষতি নেই, তবে উনি যাবেন না।

দীপনাথ এসব কথায় খুশি হচ্ছে না। বোস সাহেব বলেছিল, কোম্পানি আপগ্রেডেড হলে তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করা হবে। সে বিষয়ে বোস এখনও কিছু বলেনি। দীপ চক্ষুলজ্জায় নিজেও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারছে না। সে শুধু বলল, আপনি বাঙ্গালোরে না গেলে মিসেস বোসের সঙ্গে আপনার ব্রিচটা আবার মিলে যাবে।

থ্যাংকস ফর ইয়োর ইনফরমেশন, মিসেস বোসের সঙ্গে আমার কোনও ব্রিচ নেই।

যাক, দাম্পত্য কলহ তা হলে মিটেছে। দীপ নিশ্চিন্ত হয়ে একটু শ্বাস ছাড়ে।

কলহও মেটেনি। যারা কখনও কোনওদিন জোড়া লেগেছিল তাদের মধ্যেই ব্রিচ হয়। আমরা কোনওদিনই ততটা ঘনিষ্ঠ নই।

দীপনাথ এর কী জবাব দেবে? তবু ভেবেটেবে বলে, মনের মিলটা তো স্বর্গ থেকে হয়ে আসে না। ওটাও আমার মনে হয় প্র্যাকটিসের ব্যাপার।

বোসসাহেব মিসেস বোসের প্রসঙ্গ আজকাল একদম পছন্দ করে না। তবু এ কথায় খুব কৌতুকের মুখ করে বলে, সেটা কীরকম?

এক সময়ে ভালবাসা হত প্লাবনের মতো, ঝড়ের মতো চোখাচোখি হতে না হতেই প্রেম। কিন্তু সে যুগ তো আর নেই। এখন কেউ চোখ বুজে ভালবাসে না। তবে ভালবাসার চেষ্টা করতে করতে একদিন হয়তো বেসে ফেলে।

কথাটার মধ্যে একটা হয়তো থেকে যাচ্ছে দীপনাথবাবু!

তা থাকছে। আজকাল খবরের কাগজে এত বউ খুনের কথা পড়ি যে ভালবাসার মধ্যে একটা হয়তো আপনা থেকেই এসে যায়।

বউ খুনের ঘটনা পড়েন। কিন্তু বর খুনের কথাও যে আছে। সেটা খবরের কাগজে বেরোয় না। আর সত্যিকারের ফিজিক্যাল খুনও ঘটে না। কিন্তু এক ধরনের মানসিক স্লো-পয়জনিং ঘটে। তাতে পুরুষদের ভিতরটা আস্তে আস্তে মরে যায়।

বলে বোস একটু হাসে। খুবই ম্লান, মড়ার মুখের হাসির মতো হাসি। এয়ার-কন্ডিশনারের মৃদু শব্দটা না থাকলে এখন ঘরখানা খুবই নিস্তব্ধ লাগত দীপনাথের। কারণ তার নিজের ভিতরটাও এ সময়ে বড় নিস্তব্ধ। মুখে কোনও কথা আসছে না।

অনেকক্ষণ বাদে বোস সাহেব বলল, আপনি তা জানেন? জানেন না। আপনি তো আবার বিয়ে করেননি, এসব অভিজ্ঞতাও নেই।

দীপনাথ মৃদু স্বরে বলে, আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অবশ্য আমার নাক গলানো উচিত নয়।

বোস মাথা নেড়ে বলে, ইউ আর এ ফ্যামিলি-ফ্রেন্ড, দেয়ারফোর ইউ আর উইদিন আওয়ার ফ্যামিলি। নাক গলালে দোষ দেব না। কিন্তু মুশকিল হল, আমাদের প্রবলেমটার মধ্যে কোনও মিস্ট্রিও নেই। একদম খোলাখুলি গরমিল। কোনও প্যাচওয়ার্কও নেই। বয়-বেয়ারা-বাবুর্চি থেকে শুরু করে বাইরের লোকও সবাই জানে।

আমি কিন্তু এতকাল টের পাইনি।

তা হলে আপনি আমাদের দিকে মনোযোগ দেননি কখনও।

তা হবে।

আমাদের সমস্যাটা খুবই আন-ইমোশনাল। হার্ড ফ্যাক্ট। এর কোনও সমাধানও হয় না।

তা হলে কী হবে?

ডিভোর্স হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। আমরা হয়তো চিরকাল এমনি থেকে যাব। কিছুই বলা যায় না।

ডিভোর্স করলে মিসেস বোস কী করবেন? ওঁর পক্ষে তো আবার বিয়ে করা সম্ভব নয়।

অসম্ভবও কিছু নয়। তবে আমার বিশ্বাস ডিভোর্স করলে উনি পুরোপুরি ওঁর রোমান্টিক পলিটিকস নিয়ে মাতবেন।

তারপর?

তারপর কী হবে তা নিয়ে একদিন চলুন লটারি করব।

বোসসাহেব কথাটা বলেই হেসে ফেলে। সঙ্গে দীপও।

বোসসাহেব মাথা নেড়ে বলে, বাইরে থেকে কিছুতেই ঠিক বোঝা যায় না মিস্টার চ্যাটার্জি। আপনি ওয়েলউইশার, কাজেই আপনি তো ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা করবেনই। আই নো ইউ টু বি এ ভেরি নাইস ম্যান। দুনিয়াতে ভাল লোকের খুব অভাব। আপনি সেই দুর্লভদের একজন।

দীপ একটু লাল হয়। মনে মনে ভারী ছোট হয়ে যায় নিজের কাছে। ভিতরটা ছটফট করে তার। কিছুদিন আগেও সে নিষ্কলঙ্ক ভাল লোকই ছিল। মনে পাপ থাকলেও কাজে কখনও বেচাল কিছু করেনি সে। হঠাৎ সেদিন—

মানুষ কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার সময় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে ঠিকই, কিন্তু আমার এ কথাটা মোটেই বাড়াবাড়ি নয় দীপনাথবাবু।

বলে বোস একটু স্মিত চোখে দীপনাথকে দেখে। তারপর বলে, আমি খুব ব্রড-মাইন্ডেড। মিসেস বোস যদি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন তা হলে আমি সব মেনে নেব। কাজেই আমাকে কিছু বোঝাতে হবে না। আপনি বরং মিসেস বোসকে একটু ট্রাই করুন। ওই খুঁটিটাকেই নড়ানো শক্ত। তবে আপনি পারলেও পারতে পারেন। আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আপনাকে পছন্দ করি। মিসেস বোসও সেদিন বলছিলেন—

অসময়ে রসভঙ্গ হল। বোসের চেম্বারের দরজা খুলে বেয়ারা ঢুকে স্লিপ দিল। ভিজিটার।

মিসেস বোস তার সম্পর্কে কী বলেছে তা শোনা হল না দীপনাথের। উঠল।

চলে যেতে যেতেই দীপনাথ একটু থমকে সংকোচ ঝেড়ে চোখ বুজে জিজ্ঞেস করল, তা হলে আমিও এই অফিসেই থাকছি তো?

বোস বিস্মিত মুখ তুলে বলে, অফ কোর্স। কোথায় আর যাবেন?

না, জিজ্ঞেস করলাম আর কী।

এ ফানি কোশ্চেন। এই অফিস তো এখন আপগ্রেডেড। আমার ক্ষমতাও বেড়েছে। আপনি অন্য

কোথাও চেষ্টা করবেন না। আমি আপনার কেসটা উইথ টপ প্রায়োরিটি দেখছি।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল। পাশ কাটিয়ে কোট-প্যান্ট পরা একজন ভিজিটার ঢুকে গেল চেম্বারে।

দীপনাথের আজকাল কাজ নেই। বোস ইচ্ছে করেই কাজ দিচ্ছে না। বসিয়ে বসিয়ে ভাউচারে প্রায় আটশো টাকা পাইয়ে দিয়েছে গত মাসে। হয়তো এটা তাকে খুশি রাখার চেষ্টা। তবে একজন বস-মার্কা লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে একটু বাধো-বাধো লাগে দীপের।

সে গিয়ে আবার রঞ্জনের মুখোমুখি বসে। রঞ্জনেরও কাজ নেই। খুটখাট করে ঢিমাতালে কী যেন একটু টাইপ করছিল। দীপ বসতেই অভ্যাসবশে হাত মুঠো করে মুখের সামনে মাউথপিসের মতো ধরে বলল, কোম্পানি তা হলে জাতে উঠল?

উঠল বলেই তো মনে হচ্ছে।

আমাদের গ্রেড কী হবে শুনেছেন কিছু?

না। মোটে তো চিঠি এল। আরও ফর্মালিটি আছে।

কিছু একটা হলে বাঁচা যায়।

বিয়ে করবে নাকি?

না, না, ওসব নয়। বিয়ে একটা ফালতু জিনিস। উটকো ঝামেলা।

তবে?

তবে আবার কী? মাইনে বাড়লে সংসারের কিছু সুবিধে হবে।

সে তো বটেই।

রঞ্জন শুকনো মুখ করে বলল, চাকরি পাওয়ার পরই মা একটা ইনসিয়োর করিয়েছে দশ হাজার টাকার। সঙ্গে ব্যাংকে একটা রেকারিং ডিপোজিটও। মা তো জানে না, প্রিমিয়াম বা মান্থলি ডিপোজিট দেওয়া কত কষ্টের। ভাবছিলাম, দুটোই ছেড়ে দেব।

মাইনে তো বাড়বেই। ছেড়ো না। একটু ধৈর্য ধরো।

রঞ্জন মুঠোর আড়ালে হাসল, ওই একটা জিনিস আর শেখাতে হবে না দাদা। ধৈর্য জিনিসটা শিখেই মায়ের পেট থেকে পড়েছি। নইলে এতদিন বেঁচে আছি কী করে?

আচমকাই দীপ জিজ্ঞেস করে, তুমি কখনও পলিটিকস করোনি রঞ্জন?

আমি? না তো? তবে ছাত্র ছিলাম যখন, তখন একটু-আধটু করতাম। সেটা কিছু না। কেন বলুন তো?

এমনি আজকালকার ছেলেরা তো করে।

রঞ্জন আবার একটু হাসল। বলল, করে বটে, তবে কেরিয়ারের জন্য। আমার বয়সি ছেলেদের বেশিরভাগেরই কোনও সত্যিকারের পলিটিকস নেই। নকশালদের শুধু ছিল। আর তো সব—

কথাটা রঞ্জন শেষ করে না। বোধহয় দীপনাথের রাজনীতির বোধ সম্পর্কে কিছু জানে না বলেই সতর্ক হয়ে গেল।

দীপনাথ বলে, পলিটিকস করলে সিরিয়াসলিই করা ভাল। নইলে একদম ওটাকে এড়িয়ে চলতে হয়।

হঠাৎ পলিটিকসের কথা তুললেন যে!

আজকাল যারা পলিটিকস করে তাদের মধ্যে খুব মহৎ মানুষ কাউকে দেখতে পাই না কেন বলো তো? ভারতবর্ষে এতগুলো নেতা আছে অথচ তাদের কারও ওপর ভক্তি হয় না। এটা ভেবে খুব অবাক লাগছিল বলে তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম।

ভক্তি হবে কী করে? আমি তো আপনাকে বললামই যে পলিটিকস আজকাল কেরিয়ার ছাড়া কিছুই নয়। আই এ এস বা ডব্লু বি সি এস-এর মতো, কিংবা তার চেয়েও খারাপ।

একটু অন্যমনস্কভাবে দীপনাথ বলে, কিন্তু ছদ্মবেশে কেউ নেই তো? হয়তো তেমন কোনও নেতা আছেন যিনি এখনও আমাদের কাছে তেমন পরিচিত নন, হঠাৎ দুম করে একদিন বেরিয়ে গোটা দেশের খোল-নলচে পালটে দেবেন।

দাদা কি নেতাজির কথা বলছেন নাকি?

আরে না। ভাবছি, তেমন কেউ সত্যিই আছে কি না।

নেই। ওরকম কেউ থাকলে এদ্দিন চুপ করে বসে থাকত না।

হয়তো আছে। তুমিও জানো না, আমিও জানি না।

থাকলে আছে। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আপনার কী হয়েছে বলুন তো?

আপনার চাকরির কী হল? বস কথা দেয়নি?

দিয়েছে। বলেছে হবে।

ওঁকে বিশ্বাস করবেন না। আমার দাদা হলেও বলে দিচ্ছি, ও মাল অত সহজ নয়। যা করতে চান কাগজে-কলমে লিখিয়ে নেবেন।

সেইরকমই কিছু করতে হবে দেখছি।—আনমনে দীপনাথ বলে।

হ্যাঁ, ডেফিনিটলি করাবেন। আপনি একটু ভোলেভালে টাইপের আছেন। কিন্তু মনে রাখবেন আপনার বস এমন একখানা চিজ, যে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রং পালটে ফেলবে।

দীপনাথ নিজের সম্পর্কে রঞ্জনের মন্তব্যটা শুনে সামান্য করুণার হাসি হাসে। ভোলেভালে কাকে বলে তা অবশ্য সে জানে না। তবে যদি হাঁদা বোঝায়, তবে বলতে হবে, দীপনাথ হাঁদা নয়, আবার খুব চালাকও নয়। তার মগজের চেয়ে হৃদয় বেশি ক্রিয়াশীল, এটাই যা ঝামেলার। যথেষ্ট লোভ বা আকাঙ্ক্ষা তার নেই। আর থাকলেও সে খুব বেশি স্বার্থপর হতে কখনও পারে না। নির্লজ্জ হতেও নয়।

রঞ্জন বলল, সেদিন হঠাৎ এক কাণ্ড হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখি সন্ধেবেলা মণিদীপা বউদি একখানা ঝরঝরে গাড়ি চালিয়ে আমাদের বাসায় হাজির।

দীপনাথ মণিদীপা নামটির আকস্মিক উচ্চারণে হঠাৎ কেমন স্থবির হয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, তাই নাকি?

আমরা তো সব হাঁ! জীবনে কখনও আসেনি, একমাত্র বিয়ের পর একদিন জবরদস্তি নিমন্ত্রণ খেতে আসা ছাড়া। আমাদের ঠিকানাও ওর জানার কথা নয়।

কী বলল?

সে অনেক কথা। বাবার জন্য ফল-মিষ্টি সব এনেছিল। তারপর আমাকে ডেকে খুব সেধে সেধে কথা বলল। কত মাইনে পাই, কতদিন চাকরি, পার্মানেন্ট কি না, অফিসে ইউনিয়ন আছে কি না। ফালতু বাত সব। শেষমেশ হঠাৎ আপনার কথা তুলল।

দীপনাথের গলার কাছে অস্বস্তি হতে থাকে। সে অস্পষ্ট স্বরে বলে, আমার আবার কী কথা?

প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, আমি আপনাকে চিনি কি না। চিনি বলায় জানতে চাইল, আপনি কত মাইনে পান, চাকরি পার্মানেন্ট হয়েছে কি না। এতসব ফালতু কথা। তবে শেষে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি লোকটা কেমন।

বলো কী? তুমি কী বললে?

যা সত্যি তাই বললাম। বললাম, দীপনাথ চাটুজ্জের কোনওকালে উন্নতি হবে না। লোকটার অ্যামবিশন নেই। উনিও দেখলাম কথাটা মেনে নিলেন।

দীপনাথ হাসল। মানুষ নার্ভাস হলে যেমন হাসে। তারপর বলল, আমি যে অপদার্থ এটা দেখছি সবাই জেনে গেছে। তোমার বউদি আর কী বলল?

অনেক পলিটিক্যাল পয়েন্ট তুলল। মনে হল আমাকে ওর দলে ভেড়াতে চাইছে। যাহোক

ভ্যাজর ভ্যাজর অনেকক্ষণ শুনতে হল। বস কাম দাদার বউ, চটাতে তো পারি না। মনে মনে হাসছিলাম। বড়লোকদের পক্ষে গরিবদের জন্য দুঃখ বোধ করা কত সোজা। আমি নিজে গরিব হয়েও কিন্তু গরিবদের পছন্দ করি না।

দীপনাথ খামোখা লজ্জা পেল। বলল, তোমার বউদি আমার সম্বন্ধে আর কিছু বলেনি তো!

না, আর কী বলবে? আপনার কথা বলতে বলতে বিপ্লব-টিপ্লবের কথায় চলে গেল।

দীপনাথ মনে মনে একটু নিশ্চিন্ত হয়। মণিদীপা তাকে মুখের ওপর চুকলিখোর বলেছিল সেদিন টেলিফোনে। রঞ্জনকেও বলে দিতে পারত যে, তার সব কথা দীপনাথ মণিদীপাকে বলেছে। যা হোক এইটুকু করুণা মণিদীপা তাকে করেছে।

দীপনাথ উঠে পড়ল। বলল, বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

বাইরে আজ সাংঘাতিক রোদ। যা গরম পড়েছে!

কোনও কাজ নেই, ঘুরেই আসি। বস যদি খোঁজ করে তবে বোলো লাঞ্চের আগেই এসে যাব।

দীপনাথ বেরিয়ে এল এবং প্রচণ্ড রোদ আর গরম গলা টিপে ধরল তার।

কিন্তু শরীরের অস্বস্তি বা অসুবিধের কথা ভাবছিল না দীপনাথ। সে ভাবে তার পতনের কথা। এত সহজে তার পদস্খলন ঘটবে এটা সে কোনওদিন ভাবেনি। তার ভিতরে একটু ইস্পাত ছিল। অত প্রিয় সিগারেট সে ছেড়ে দিয়েছিল কেবল ইচ্ছাশক্তির জোরে। শরীরের জোর আসল নয়, আসল হল মনের জোর। সেদিন রাত্রে বীথির শোওয়ার ঘরে সেই জোরটা কোথায় গেল তা আজও আর খুঁজে পায়নি দীপনাথ।

ব্যাপারটার মধ্যে কোনও পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। সুখেনকেও খামোখা দোষ দিয়ে লাভ নেই। সুখেন তো আর বীথির দালাল নয়। সেই রাতের ঘটনার পর সুখেন আর ফিরে আসেনি বীথির বাসায়। একা রিকশা করে বোর্ডিং-এর ঘরে ফিরল দীপনাথ। সুখেন সে রাত্রে বোর্ডিং-এও ফিরল না। ফিরল পরদিন রাত্রে। প্রথম চোখে চোখে তাকাচ্ছিল না। দীপনাথও লজ্জায় ঘেন্নায় কেন্নো হয়ে যাচ্ছিল।

ভাগ্যি ভাল কলেজের পড়ুয়া ছেলেটা সেদিনই তার মেদিনীপুরের বাড়িতে গেছে। একা ঘরে সুখেনকে পেয়ে অনেক রাত্রে দীপনাথ বলল, ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করবেন?

সুখেন করুণ মুখ করে বলল, ব্যাখ্যার কিছু নেই। আপনার জন্য আমার খুব কষ্ট হত। তাই—

আমার জন্য কষ্ট হবে কেন? আমি কি দুঃখে আছি?

ঠিক তা বলা যায় না। তবে আপনি সেদিন বন্ধু হলেন তো! আমার আর কোনও বন্ধু নেই। আপনাকে বন্ধু পেয়ে সেদিন কী যে আনন্দ হচ্ছিল!

আমি তো তেমন কেওকেটা কেউ নই। বন্ধু হলেও অতি সাধারণ বন্ধু। রাস্তাঘাটেও এরকম আকছার বন্ধু মেলে।

যাঃ, কী যে বলেন! আপনি কত সুপুরুষ, স্মার্ট, কত সৎ মানুষ। এরকম লোক কই?

এই প্রশংসায় মোটেই খুশি হয়নি দীপনাথ। রূঢ় গলায় বলেছে, আমি যদি অত ভালই তা হলে আমাকে এরকম গাড্ডায় নিয়ে ফেললেন কেন?

বললাম যে আপনার জন্য কষ্ট হয়।

মানেটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

সুখেন যে খুব ভাল বোঝাতে পারে তা নয়। একটু এলোমেলোভাবে বলল, দেখলেই বোঝা যায় এই বয়স পর্যন্ত আপনার মেয়েমানুষের অভিজ্ঞতা হয়নি।

তাতে কী?

ওটা না হলে মানুষের মনের আড় ভাঙে না।

শুধু সেই জন্য?

না, আমি ভাবছিলাম, আপনি তো আমার বন্ধু হলেন, বন্ধু-র একটু সেবা দিই।
বীথি কি ভাড়াটে মেয়ে?
ঠিক তা নয়। কথাটা ঠিক বুঝবেন না। ও একটু ওইরকম, কিছু মানে-টানে না।
টাকাপয়সা নেয়?
কেন, আপনার কাছ থেকে নিয়েছে নাকি?—বলে জিভ কেটে সুখেন বলল, ছিঃ ছিঃ।
না, আমার কাছ থেকে নেয়নি।
নেওয়ার কথা নয়।
আপনি বোধহয় ওর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রেখেছিলেন।
সুখেন লাজুক হেসে বলে, তাই।
কিন্তু ওর সঙ্গেই আপনার বিয়ের কথা আছে না?
আছে।
এরকম মেয়েকে জেনেশুনে বিয়ে করবেন?
সেইজন্যই তো আপনার পরামর্শ চেয়েছিলাম।
আমি পরামর্শ দেওয়ার মালিক নই।
আলবত মালিক। আমি আপনাকে বুজম ফ্রেন্ড হিসেবে মানি। যা বলবেন তা-ই হবে।
এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা সাজে না। আমি কিছু বুঝতেই পারছি না। প্রস নয়, চাকরি করে, দেখতে সুন্দর, বড়সড় ছেলে আছে, স্বামী জেল খাটছে, সব মিলিয়ে মহিলা খুবই অদ্ভুত। আমি হলে বিয়ে করার সাহস পেতাম না।
হ্যাঁ, একটু অন্যরকম।
খুবই অন্যরকম। ওর সঙ্গে আপনি জুটলেন কী করে?
জুটে যায়।—উদাস গলায় বলে সুখেন।
বীথি এত সহজে অচেনা লোককে শরীর দেয় কী করে? ওর ঘেন্না করে না? ভয় করে না?
আপনাকে ঘেন্না?—অবাক হয়ে সুখেন বলে, আপনার মতো এরকম ভদ্রলোক ও আর পেয়েছে নাকি? আজ সন্ধেবেলাই তো আপনার কত প্রশংসা করছিল।
রাগে তেতে উঠলেও প্রশংসার কথায় একটু থমকে গেল দীপনাথ। বলল, কীরকম?
আপনার সম্পর্কে আমি যা ভেবেছি ওরও ধারণা তাই। আজ অনেকক্ষণ আপনার কথা হল।
আমি তো কিছুই নই। একটা লম্পট চরিত্রহীন।
ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলবেন না। পুরুষমানুষের কোনও কলঙ্ক নেই।
ওটা আপনার ধারণা, আমার নয়।
তা হলে বরং আমার কান মলে দিন।—বলে বাস্তবিকই মাথাটা এগিয়ে দিল সুখেন।
সুখেনের সঙ্গে পারা যায় না। কাজেই হাল ছেড়ে দিল দীপনাথ। বীথির সঙ্গে সেই সম্পর্কের কথা ভেবে আজও সে কোনও সুখ পায় না। বরং নিজের ভিতরটা কোনও মহামূল্যবান হারানোর দুঃখে হাহাকারে ভরে ওঠে।
আর কোনওদিন সে বীথির কাছে যাবে না।
রোদের রাস্তায় আনমনে হাঁটতে হাঁটতে সে ঘটনাটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবছিল। এই রহস্যময় নোংরা শহর তার ভাল লাগছে না। একদম ভাল লাগছে না।

॥ একত্রিশ ॥

তুই হুইলচেয়ারে কেন রে?

আমাকে সবাই যে রুগি বানিয়ে রাখতে চায়, কী করব বলো তো সেজদা!

তুই তো একটু-আধটু হাঁটতে পারছিলি।

এখনও কি পারি না? পারি। দেখবে?

থাক গে। বসে আছিস বসেই থাক।

সারাদিন বসে থাকি। তুমি কতকাল পরে এলে।

সময় পাই না রে। মনটাও ভাল নেই।

তোমার মনের আবার কী হল? চাকরি যায়নি তো!

না, চাকরিটা আছে।

পার্মানেন্ট হয়েছ?

এবার হয়তো হয়ে যাব।

প্রীতম খুব সুন্দর একরকম হেসে বলে, অবশ্য সেটা জেনেই বা আমার কী হবে? জাগতিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আজকাল ভাবি না।

না ভাবাই ভাল। জগৎটা তো ভাল কিছু নয়। তোর মাথায় কোনওকালেই বিষয়বুদ্ধি ছিল না। তুই ছিলি আনমনা, ফিলজফার টাইপের।

প্রীতম একমুখ হাসি নিয়ে বলল, তার মানে তো হাঁদা।

একটু লজ্জা পায় দীপনাথ। ছেলেবেলায় অন্যমনস্ক প্রীতমকে সে নিজেই হাঁদা বলে ডাকত। তাই থেকে পাড়ায় তার নামই হয়ে গিয়েছিল হাঁদা। বলল, হাঁদা থাকাই ভাল।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, এ সমাজে হাঁদার জায়গা নেই সেজদা। চার চৌকো না হলে টেকা যায় না।

দীপ স্মিতমুখে বলে, তা যদি বলিস তবে আমিও তোর চেয়ে কম হাঁদা নই। তুই তবু একটা ভাল চাকরি করছিলি। আমার মতো ওপরওয়ালার ফাইফরমাশ খাটতে হয়নি তোকে।

প্রীতম একটু থমকে গিয়ে বলে, ওপরওয়ালা কি তোমাকে ফাইফরমাশ করে?

বেফাঁস কথাটা বলে ফেলেছে দীপনাথ। প্রীতম তাকে এতটাই ভালবাসে যে, তার আর বোস সাহেবের আসল সম্পর্কটা জানলে দুঃখ পাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি বলল, চাকরি করতে গেলে ওরকম একটু আধটু করতে হয় রে।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, ঠিক বুঝলাম না। বুঝিয়ে বলো।

বোঝানোর কিছু নেই। ফাইফরমাশ মানে তো আর সেরকম কিছু নয়।

আগেও তুমি এরকম কিছু কথা বলেছ। তখন গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু আজ তোমার মুখ দেখে অন্যরকম লাগছে।

অন্যরকম লাগবার কী? আমি ঠিক আছি। চাকরি পাকা হলে সবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

প্রীতম অনেকক্ষণ গুম হয়ে রইল। আস্তে হুইলচেয়ারটা ঘুরিয়ে মেঝের ওপর খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে ফিরে এল। বলল, শুধু চাকরিই নয়, আরও কিছু ব্যাপার ঘটেছে সেজদা। তোমার চোখ অন্যরকম।

মনে মনে প্রীতমের নজর থেকে রেহাই চাইছিল দীপনাথ। আগে ওর নজর এত তীক্ষ্ণ ছিল না। রোগে ভুগলে কি মানুষের অনুভূতি বাড়ে? বাড়ে হয়তো। দীপনাথ জানে, টি বি রোগীদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি বা শিল্পী হয়েছে। হয়তো শরীরের ক্ষয় অন্যদিকে স্নায়ুকে স্পর্শকাতর করে তোলে। সে একটু অস্বস্তিতে ভরা গলায় বলল, কিছুই পালটায়নি। তুই ভুল দেখছিস।

তুমি নিজে কিছু টের পাও না?

না তো! কী টের পাব?

আশ্চর্য! যদি সত্যি টের না পেয়ে থাকো তবে এখন থেকে খুব সাবধান হোয়ো সেজদা।

কিসের জন্য সাবধান করছিস?

প্রীতম মৃদু স্বরে বলল, যে মানুষ নিজের বশে থাকে না সে নানা অবস্থার চাপে পড়ে নানারকম মানুষের একটা সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

দূর! কথাটার মানেই বুঝলাম না।

তোমাকে কি আমি বোঝাতে পারি? তুমি চিরকালই আমার চেয়ে সবকিছু বেশি বোঝো।

চিরকালই তোর মাথায় অদ্ভুত সব কথা আসে। একবার যেন কোন মহাপুরুষের একটা কথা তুলে শুনিয়েছিলি, শয়তান আর কেউ নয়, শয়তান হল মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা। কথাটার মানে অনেক ভেবে ভেবে শেষকালে বের করেছি। অদ্ভুত কথা।

প্রীতম ভ্রু কুঁচকে বলে, অন্য সব কথা ছেড়ে এ কথাটাই বা মনে রাখলে কেন তুমি?

প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা কাকে বলে তা বুঝতে পেরেছি বলে।

তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা কিছু হয়?

সকলেরই হয়।

প্রীতম মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর আবার ভ্রু কুঁচকে কী যেন ভাবে। খানিক বাদে বলে, আমার মাথা পর্যন্ত এখনও রোগটা পৌঁছয়নি। যতদিন না পৌঁছয় ততদিন আমি সব বুঝতে পারব সেজদা। কিন্তু আমার আজকাল কিছু বুঝতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় রোগটা তাড়াতাড়ি মাথায় পৌঁছে গেলে বুঝি ভাল হয়।

দীপনাথ একটু অবাক হয়ে বলে, সে কী? তুই যে নেগেটিভ চিন্তা করতে ভালবাসতি না! তুই যে আমাকে রোগের কথাটাও উচ্চারণ করতে বারণ করেছিলি?

এখন আর বারণ করছি না।

হাল ছেড়ে দিচ্ছিস?

তোমরা সংসারটাকে বেঁচে থাকার যোগ্য করে রাখোনি। এখানে কি কারও বাঁচতে ইচ্ছে করে?

ক'দিন আগেও তো এই পৃথিবীটাই ছিল। হঠাৎ রাতারাতি তো পালটে যায়নি।

বড় পৃথিবী না পালটাক, মানুষের নিজস্ব জগতের নিজস্ব সংসারের পৃথিবী তো পালটে যেতে পারে।

তোর পৃথিবীর আবার কী অদলবদল হল?

প্রীতম ভ্রু কুঁচকে রোগা হাতে নিজের নীচের ঠোঁটটা টেনে ধরে চুপ করে থাকে। জবাব দেয় না।

খুব গাঢ় স্বরে এবং বুকে ভয় নিয়ে দীপনাথ জিজ্ঞেস করে, কিছু হয়েছে রে?

প্রীতম হঠাৎ খুব স্পোর্টসম্যানের মতো হেসে ওঠে। সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করতে করতে বলে, হলেই বা কী? আমার তো কিছুই যায় আসে না।

দীপনাথের মনে পড়ে বিলুর সাজগোজ, অরুণ ওকে মাঝে মাঝে গাড়িতে লিফট দেয়। অক্ষম প্রীতম পড়ে থাকে ঘরে। বিলু টাটকা যুবতী।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কী জানি কী হল!

দুনিয়া পালটে যাচ্ছে সেজদা।

হুঁ। কিন্তু পালটানোর কারণটা তো বলবি!

সব কি বলা যায়? তোমার কথাই কি তুমি আমাকে বলতে পারো? পারো না।

আমার বলার মতো কিছু নেই।

কে জানে! হয়তো আছে। হয়তো নেই।

প্রীতম, তুই কেন খামোখা আমাকে নিয়ে ভাবিস?

খামোখা নয় সেজদা। আমি একা একা সারাদিন সকলের কথা যদি না ভাবি তবে আমার সময় কাটবে কী করে?

শুধু সময় কাটানোর জন্য হলে বই পড়িস না কেন?

আমি তো নাটক নভেল ভালবাসি না। ঘরে তেমন বই নেইও কিছু। বিলু কখনওই বইটই পড়ে না। আমারও ভাল লাগে না। তার চেয়ে বরং জ্যান্ত মানুষদের নিয়ে ভাবলে অনেক বেশি ভাল লাগে।

ভাল আর লাগছে কই? আমরা তো কেউ তোর মনের মতো ভাল নই!

প্রীতম হাসে না। গম্ভীর মুখেই বলে, কথাটা মিথ্যে নয় সেজদা, তোমরা কেউ আমার মনের মতো ভাল নও। কিংবা হয়তো আজকাল আমার ভালর সঙ্গে তোমাদের ভাল মিলছে না।

তা নয় রে, ঘরে বসে থেকে তুই তো বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক বেশি রাখিস না। তাই হয়তো ঠিকঠাক সব জিনিস বুঝিস না।

প্রীতম একটু হাসে। বলে, তুমি এখনও আমাকে সেই শিলিগুড়ির বাচ্চা প্রীতম বলে ভাবো বোধহয়।

কেন, তাই বললাম বুঝি?

শোনো সেজদা, আমি বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক মিটিয়েছি। শিগগিরই আমার ঘর-সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্কটুকু আছে তাও মিটে যাবে। তখন তোমাদের ভাল নিয়ে তোমরাই একটা বিচার করে দেখো।

বহুবচনে বলছিস কেন রে? আমার সঙ্গে কাকে জড়াচ্ছিস?

এই কথায় হঠাৎ প্রীতমের ঠোঁট দুটো কি কেঁপে উঠল? টপ করে মাথা নোয়াল কেন? চোখে জল এল নাকি? একটু দূরে চেয়ারে বসেছিল দীপনাথ। কাছে উঠে এসে প্রীতমের কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বলল, আমাকে বিশ্বাস হয় না তোর?

হয়।—খুব ক্ষীণ গলায় বলে প্রীতম, একমাত্র তোমাকেই হয়।

তা হলে সব বল। শুনি। কী হয়েছে?

প্রীতম আবার মুখ তোলে। একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, বাদ দাও। ওসব কিছু নয়। দুনিয়ায় সম্পর্কটার কোনও মানে নেই। এ দুনিয়ায় কে কার ভাই, কে কার বউ, তা দিয়ে কী হয় বলো তো? মারা গেলে কোন অসীম অন্ধকারে হারিয়ে যাব সবাই, কে কার থাকবে?

এ কথাটার মানেও বুঝলাম না। সহজ করে বুঝিয়ে দে।

কিছু বোঝানোর নেই।

বিলু কি তোর দিকে নজর দিচ্ছে না?

প্রীতম এ কথাটার জবাব চট করে দিল না। একটু অস্থির হল যেন। দুটো হাত বারবার কোল থেকে হাতলে, হাতল থেকে চাকায় স্থানান্তরিত করল। চোখের পলক ফেলল ঘন ঘন। তারপর বলল, বিলু বিলুর মতোই।

বুঝিয়ে বল।

প্রীতম খুব আস্তে করে বলল, মাঝখানে ক'দিন বিলু খুব আপনজন হয়ে উঠেছিল। ঠান্ডা বিলুর ভিতর খানিকটা উত্তাপ টের পেতাম। তুমিও হয়তো লক্ষ করেছ। আমি ইচ্ছাশক্তির কথা বলতাম। ও সেটা বিশ্বাসও করত।

চমৎকার। তারপর কী হল?

ও আমাকে অন্য চোখে দেখতে লাগল হঠাৎ। খুব বেশি নজর রাখত, খুব বেশি ভাবত আমাকে

নিয়ে। তারপরই চাকরিতে ঢুকে গেল। গোটা একটা ছবিই যেন ভেঙে পড়ে গেল আচমকা।

চাকরিতে ঢুকলে মেয়েদের একটু বদল হয়। সারাদিন খাটে, ঘরে এসে আবার সংসারের ঝামেলা পোয়ায়।

আমার সেই কনসিডারেশন নেই ভাবছ?

থাকলে ভালই তো।

মেয়েদের চাকরি করা আমি পছন্দ করি না ঠিকই। কিন্তু যখন বিলু চাকরিতে ঢুকল তখন থেকেই আমি মনকে প্রস্তুত করেছি। মন নিয়েই তো আমার সারাদিন কাটে। সারাদিন তো শরীরের লড়াইতে হেরে যাচ্ছি, তাই মনকে খুব শাসনে রাখি। যে-কোনও অবস্থার জন্য আমার মন তৈরি থাকে।

তা হলে অসুবিধেটা কোথায়?

বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যাবে না, সেজদা। ছোটখাটো অনেক ব্যাপার ঘটে যায়।

কীরকম? একটু খুলে বল।

বিলু চাকরি করতে যাওয়ার পর প্রথম-প্রথম সবই ঠিক ছিল। কোনও কিছুই পালটায়নি। শুধু ও না থাকলে বাড়িটা ফাঁকা লাগে মাত্র। সারাদিন বিলুর জন্য অপেক্ষা করতাম। বিলুও ফিরত আমার জন্য আকুলি ব্যাকুলি হয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে বিলুর বোধহয় ক্লান্তি এল। অনেকদিন ধরে এক রুগি-স্বামীর ঘর করছে। ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। সঙ্গে অফিসের খাটুনিও যোগ হয়েছে। কিন্তু সে ক্লান্তি একরকম। অন্যদিকে আর-একটা ক্লান্তিও আছে। সেটা হল আশা বা ভরসার ক্লান্তি। ও আমাকে একদিন বলল, ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষ সবকিছুকে জয় করতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানে ইচ্ছাশক্তির কোনও দাম নেই। তুমি ঠিকমতো ওষুধ খাও, চিকিৎসা করা হচ্ছে, ঠিক সেরে যাবে।

কেন বলল ওকথা?

ওর ধারণা সারাদিন ইচ্ছাশক্তির ব্যায়াম করলে আমার মন ক্লান্ত হয়ে পড়বে। মাথাও বিগড়ে যাবে।

দীপনাথ একটু হেসে বলে, তাতেই বা কী? ও যদি বলেই থাকে তো বলুক না। তুই কান দিস কেন?

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, কান দিই কারণ কথাটা ওর নিজের নয়। আর কেউ ওর মুখে কথাটা বসিয়েছে। বিলু আধুনিক বিজ্ঞানের খবর রাখে না, ইচ্ছাশক্তির কার্য-কারণও ওর জানা নেই।

হয়তো হঠাৎ ভেবে ফেলেছে, জেনে ফেলেছে!

তা নয়। আমার অনুভূতি তোমাদের চেয়ে এখন অনেক বেশি প্রখর। আমি তো বাইরে যাই না। তাই চারদিকের সঙ্গে ঘষা খেয়ে খেয়ে আমার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়নি। আমি নিজেকে নিয়ে থাকি, মনে শান দিই, যুক্তি দিয়ে সবকিছুকে বিশ্লেষণ করার অবসর পাই।

বুঝলাম। বল।

আমি যে মরতে চাই না এটা বিলুর চেয়ে আর বেশি কে জানে বলো! আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে আমার লড়াই চালাচ্ছি। আমার আশা ছিল, বিলু অন্তত সে লড়াইতে আমাকে সাপোর্ট দেবে। কিন্তু সেই প্রথম দিককার বিলুকে যেমন ঠান্ডা আর পর মনে হত, আজকাল বিলু যেন তাই হয়ে গেছে। কোনওদিন আমার ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে বিলু তো একমত ছিল না। মাঝখানে একটু হয়েছিল। আবার এখন সেই আগেকার বিলু।

তোর কী ধারণা?

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, অন্য কেউ বিলুর ভাবনা-চিন্তাকে প্রভাবিত করে এটা আমার পছন্দ নয় সেজদা।

অন্য কেউটা কে? অরুণ?

তার আমি কী জানি! আমি তো ওদের দু'জনের মধ্যে কী কথা হয় তা জানি না।

দীপনাথের বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগছিল। এরকম কিছু হবে তা তো সে জানতই। মুখে অবশ্য বলল, বিলুর কথা নিয়ে তুই মাথা ঘামাস না।

একেবারে উদাসীনও থাকতে পাবি না। বললাম যে মৃত্যুর সঙ্গে আমার লড়াই একেবারেই আমার নিজস্ব। ওষুধ বলো, ডাক্তার বলো, কেউ তো আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। হয়তো আমার ইচ্ছাশক্তিরও তেমন ক্ষমতা নেই। কিন্তু তা বলে লড়াইটায় এত সহজে হেরে যাব? কেউ আমার লড়াইটাকে বুঝবে না?

বিলু ভুল করেছে। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।

প্রীতম মাথা নাড়ে. তার চেয়ে তুমি আমার বাড়িতে একটা চিঠি লিখে দাও। শতম এসে আমাকে নিয়ে যাক।

শিলিগুড়িতে যাবি?—হঠাৎ উৎসাহে একটু চেঁচিয়ে ওঠে দীপনাথ।

প্রীতম ম্লান মুখে ক্লিষ্ট একটু হাসি ফুটিয়ে দীপনাথের দিকে চেয়ে বলে, তুমি ভুলে গেছ সেজদা?

কী ভুলেছি?

তোমাকে বলিনি কখনও আমাকে আমার মায়ের কথা, ভাইদের কথা, শিলিগুড়ির কথা বোলো না! ওসব মনে পড়লে আমি হাল ছেড়ে দিই, আমার লড়াই করার জোর থাকে না। বলিনি?

দীপনাথ একটু অবাক হয়ে বলে, কিন্তু এখন যে তুই নিজেই বললি!

কেন বললাম তা তো ভেবে দেখলে না সেজদা!

কেন?

প্রীতম ঠোঁটকে রবারের মতো টেনে হাসিটা বজায় রাখল। বলল, তার মানে তো দাঁড়ায়, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, লড়াইয়ে হেরে গেছি। এখন আমার মন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

দীপনাথের কপালে ভাঁজ পড়ে। বহুকাল বাদে সে আজ খুব সিরিয়াস হয়। গম্ভীর গলায় বলে, শোন প্রীতম, বিলুর সামান্য কথায় তোর এত কিছু হয়নি। তুই আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছিস। বল তো কী হয়েছে!

না, না...

বলতে বলতে কোনওদিন যা হয় না তা আজ হল। আচমকা প্রীতমের গলা ভেঙে বসে গেল। চোখ দুটো পলকে রাঙা হয়ে উঠল। সে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

প্রীতম! প্রীতম! এই পাগলা! ওরকম করছিস কেন?

প্রীতম সাড়া দিল না। মুখ ঢেকে কয়েকটা হেঁচকি তুলল। তারপর গোঁজ হয়ে স্থির হয়ে রইল অনেকক্ষণ। যখন মুখ তুলল তখন সে মুখ পাথরের মতো হয়ে গেছে।

দীপনাথ ওকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বলবি না তো বলিস না। আমি কিছু শুনতেও চাই না। কিন্তু দোহাই আমার মুখ চেয়ে অন্তত ভেঙে পড়িস না। আর কেউ চাক বা না চাক, আমি চাই তুই বেঁচে থাক। আমি তোর ইচ্ছাশক্তির জয় দেখতে চাই। আমি নিজে ইচ্ছের লড়াইতে মার খেয়ে গেছি। আই হ্যাভ নো মর‍্যালিটি। কিন্তু আমার চোখের সামনে তুই তো আছিস!

প্রীতমের মুখের পাথর নরম হল। একটু হাসলও সে। বলল, সেজদা, তুমি কোনওদিন সাবালক হবে না। ওসব কী বলছ? আমি তোমার আইডিয়াল?

দীপনাথ একটু ধাতস্থ হয়। একটু লজ্জাও পায়। তারপর ক্ষোভের সঙ্গে বলে, একটু ইমোশন এসে গিয়েছিল। তুই এরকমভাবে কথা বলিস কেন?

ঠিক আছে, বলব না। কিন্তু আমি তো বলতে চাইওনি। তুমিই তখন থেকে বলতে বলছ।

দীপনাথ গম্ভীর হয়ে বলে, কিছু কথা আছে না শোনাই ভাল। ওগুলো চাপা থাকলে শান্তিতে থাকব।

আমিও তাই বলি।

দীপনাথ ঘড়ি দেখে বলে, সাতটা বাজতে চলল, বিলু এখনও এল না? লাবুই বা কোথায়?

লাবু পাশের ফ্ল্যাটে ওর সমবয়সি একটি মেয়ের সঙ্গে মাদ্রাজি টিচারের কাছে প্রাইভেটে পড়ে।

অচলা? বিন্দু?

বিন্দু রান্নাঘরে আছে। অচলার ছেলের অসুখ বলে ক'দিন আসছে না।

তুই তা হলে একা?

ঠিক একা নই। আমার সঙ্গে হাজারও ভূতের ভাবসাব। তারা আছে।

দীপনাথ হেসে বলে, তোর সঙ্গী ভূত ছাড়া আর কে হবে? অত পাগলামি সইবে কে?

তুমি কি এখনই যাবে?

দীপনাথের একটু কাজ আছে। ঘড়ি দেখে বলল, রাত হল।

যাবে তো যাও।

একটু বসি। বিলুর সঙ্গেও দেখাটা হয়ে যাবে।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, না, যাও সেজদা। আমি এখন একটু একাই ভাল থাকব। আমার মনে মনে কিছু হিসেব কষতে হবে।

কর তা হলে। কিন্তু হিসেবের অঙ্কে মাইনাস বসাস না। সব প্লাস।

ঠিক আছে। চেষ্টা করব। অন্তত একজন তো আমাকে বেঁচে থাকতে দেখতে চায়।

অনেকেই চায়। তুই জানিস না।

দীপনাথ বেরিয়ে আসে। আজকাল মন ভাল থাকে কমই। তবু আজ বিকেলে যেন আরও ভরাডুবি হল। খুব আনমনে সে নিউ আলিপুরে যাওয়ার একটা ভিড়ঠাসা বাসে উঠে পড়ল। বহুদিন বোস সাহেবের বাড়িতে যায়নি।

বাসে আচমকাই বেলফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ এল নাকে। এই এক গন্ধই মনের বিষাদকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আজ বোধহয় বিয়ের তারিখ।

॥ বত্রিশ ॥

টালিগঞ্জ ফাঁড়িতে নামবার মুখে দুটো জিনিস টের পেল দীপনাথ। এক হল, বাইরে হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। দু' নম্বর হল, তার প্যান্টের হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগটা খোয়া গেছে। দুটোই দুঃসংবাদ। দুটোর ওপরেই দীপনাথের কোনও হাত নেই। এই প্রচণ্ড ভিড়ের বাসে মানিব্যাগটা উদ্ধারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। বাইরের এই ঝড়বৃষ্টিতেই তাকে নামতেও হবে।

একেবারে কর্পদকহীন দীপনাথ বেকুবের মতো ভিড়ের বাস থেকে বৃষ্টির মধ্যে খসে পড়ল। দৌড় দৌড়। মোড়ের সিনেমা হলের লবি পর্যন্ত পৌঁছাতেই জামাপ্যান্ট ভিজে চুপসে গেল। ছাদের নীচে নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে সে রুমাল দিয়ে মাথা, ঘাড় মুখ মুছছিল যতখানি সম্ভব। মানিব্যাগটার জন্য রাগে গা চিড়বিড় করছে। খুব বেশি ছিল না, মেরেকেটে গোটা ত্রিশেক টাকা হবে। কিন্তু এখন মেসে ফেরার পয়সাটাও তার নেই। বোসের কাছ থেকে ধার করতে হবে।

কলকাতা শহরকে সে কতখানি ঘেন্না করে তা এই হঠকারী বৃষ্টির সন্ধ্যায় ভেজা গায়ে দাঁড়িয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছিল। নিজের ওপর রাগে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠছিল। হিপ পকেটে

মানিব্যাগ রাখাটাই এক নম্বরের বোকামি। তার ওপর সে ভিড়ের বাসেও গাড়লের মতো অন্যমনস্ক ছিল। সেটা দু' নম্বর বোকামি।

বৃষ্টির তোড় কমে আসছিল, দীপনাথের রাগও ঠান্ডা হচ্ছিল ক্রমে। মনটা তেতো, বিরক্ত। কলকাতায় তার কম দিল হল না, তবু এখনও সে এ শহরে বাস করার যোগ্যতা পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি।

ঘণ্টাখানেক বাদে যখন বৃষ্টি থামল তখন বাসে এত ভিড় যে কাছে যাওয়াই মুশকিল। তার ওপর খালের ওপর ব্রিজের মুখে এক নিশ্চল জ্যাম জমে গেছে। বাসে উঠবার পয়সা দীপনাথের নেই, উঠলেও সহজে পৌঁছানো যাবে না। সুতরাং দীপনাথ হাঁটা ধরল।

বোস সাহেবের বাড়ি পৌঁছবার পর তার দুঃখের ভরা পূর্ণ হল। রাঁধুনি লোকটা দরজা খুলে জানাল, মিস্টার বা মিসেস কেউই বাড়ি নেই। কখন ফিরবে বলা যাচ্ছে না।

এই অঞ্চলে দীপনাথের চেনাজানা কেউ নেই। একমাত্র উপায় হল বোস সাহেব বা মণিদীপার জন্য অপেক্ষা করা কিংবা রাঁধুনির কাছেই কিছু ধার চাওয়া। লোকটা দীপনাথকে চেনে।

দীপনাথ বলল, তা হলে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। জরুরি কাজ আছে।

রাঁধুনি বলল, বসুন, চা করে দিচ্ছি।

ভেজা জামাকাপড়ে দামি সোফাসেটে বসতে একটু দ্বিধা বোধ করে দীপনাথ। ভেবেচিন্তে সে একটা রেক্সিনে মোড়া চেয়ারে বসল। তারপর ম্যাগাজিন তুলে ছবি দেখতে লাগল।

নিজের মুখের ভাব কোনওদিনই গোপন করতে পারে না দীপনাথ। তার মন খারাপ থাকলে মুখের ভাবে অবশ্যই বিমর্ষতা ফুটে উঠবে। আরও ঘণ্টাখানেক বাদে যখন মণিদীপা ফিরল তখন দরজায় দাঁড়িয়েই তাকে দেখে উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

দীপনাথ খুব বেপরোয়া মতো একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, কোথায় কী হয়েছে! কিছু হয়নি তো।

মণিদীপা গম্ভীর হয়ে বলে, না হলেই ভাল।

দীপনাথ একঝলক চেয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। বহুকাল বাদে মণিদীপার সঙ্গে দেখা। এত সুন্দর দেখাচ্ছে। বোস সাহেব একে ডিভোর্স করবে কোন প্রাণে!

মণিদীপা ভিতরে গেল না। দীপনাথের মুখোমুখি বাইরের ঘরেই বসল। আজ তার সাজগোজ তেমন চোখে পড়ার মতো নয়। হলুদ লাল কালো ডুরের একটা তাঁতের শাড়ি পরনে। চুল এলোখোঁপায় বাঁধা। বসে আর-একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগল।

দু'জনের মধ্যে একটা অস্বস্তি আর সংকোচের বলয়। কেউ সেটা ভাঙতে চায় না। দীপনাথ সমস্ত অপমান মনে রেখেছে, কিছুই ভোলেনি। এই মেয়েটাকে চোখের সামনে দেখলে বা টেলিফোনে এর গলার স্বর শুনলেও তার স্নায়ু দুর্বল হয়ে যায়। প্রতিশোধের কথা মনে থাকে না।

রান্নার লোকটা দীপনাথকে সযত্নে ট্রে-তে করে চা আর ঘরে তৈরি কেক দিয়ে মণিদীপার দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে বলল, টি মেমসাব?

মণিদীপা চোখ না তুলেই মাথা নাড়ল। খাবে না।

দীপনাথ সসংকোচে চায়ের কাপটার দিকে চেয়ে ছিল। কিছু বলার নেই, একটা জড়তা বোধ করছে।

মণিদীপা ম্যাগাজিনটা মুখে ধরে রেখেই বলল, বোস সাহেবের সঙ্গে কোনও দরকার ছিল বুঝি?

ছিল একটু।

দরকারগুলো অফিসে মিটিয়ে নিলেই তো হয়। অফিস-আওয়ার্সের পরও কেন একজন লোককে এত দূর দৌড়ে আসতে হবে বুঝি না।

দীপনাথ বুঝতে পারল না, এটা মণিদীপার বিরক্তি না অনুকম্পা। হয়তো কোনওটাই নয়। সে বলল, অফিসের বাইরেও কাজ থাকে।

মণিদীপা ভ্রূ কুঁচকে বলে, আপনি চা খান, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

খাচ্ছি।—বলে দীপনাথ কাপে চুমুক দেয়।

কোম্পানি জাতে ওঠার পর বোধহয় আপনার কাজ আরও বেড়েছে।

বোস সাহেবের হয়তো বেড়েছে।—দীপনাথ বলল।

আপনার বাড়েনি?

না। আমি তো জাতে উঠিনি।—এই প্রথম বুদ্ধিমানের মতো একটা মন্তব্য করতে পেরে খুশি হল দীপনাথ।

কোনওদিন উঠবেনও না।

উঠব। যেদিন সর্বহারাদের একনায়কত্ব হবে।

ম্যাগাজিনটা টেবিলের ওপর ফটাস করে আছড়ে ফেলে সোজা হয়ে মণিদীপা ফুঁসে ওঠে, ওসব কি ইয়ারকির কথা?

দীপনাথ চমকে উঠলেও ঘাবড়ে যায়নি। এ মেয়েটাকে খোঁচা দেওয়া যে বিপজ্জনক তা সে জানে। কিন্তু খোঁচা যখন দিয়েই ফেলেছে তখন পিছু হটাও বোকামি। তাই সে মৃদু স্বরে বলল, সর্বহারার সবরকম কোয়ালিফিকেশন আমার আছে। অন্তত আজ এই মুহূর্তে আমি সর্বহারা।

মণিদীপা দুই বিশাল চোখে তাকে ভস্ম করে দিতে দিতে বলে, তার মানে?

একটু আগে বাসে আমার পকেটমার হয়েছে। মেসে ফেরার বাসভাড়া পর্যন্ত নেই।

দীপনাথ ভেবেছিল মণিদীপা হাসবে। কিন্তু হাসল না। চোখের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা মিশিয়ে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, কত গেছে?

বড়লোকের চোখে বেশি নয়। তবে গরিবের অনেক। প্রায় ত্রিশ টাকা।

কবে যে আপনাকেও চুরি করে নেয়! টাকাটা কোথায় ছিল?

হিপ পকেটে।

পুলিশে জানিয়েছেন?

দীপনাথ একটু অবাক হয়ে বলে, পকেটমার হলে কেউ পুলিশে যায় নাকি? এ রকম তো শুনিনি। গিয়েও লাভ হয় না।

তবু পুলিশকে জানানোটা নিয়ম।

খামোখা সময় নষ্ট। আমি ব্যাপারটা মেনে নিয়েছি। হয়তো এক গরিবের পকেট কেটে আর এক গরিবের কিছু উপকার হচ্ছে।

পকেটমাররা গরিব হবে কেন? ওদের বিরাট অর্গানাইজেশন থাকে। আপনি খুব সহজেই সব কিছু মেনে নেন। ওটা একদম ভাল নয়। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ যত সামান্যই হোক তার একটা মূল্য আছে, এটা মানেন তো?

আমাদের দেশে নেই।

কে বলল নেই?

আমিই বলছি!

আপনি কখনও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেছেন জীবনে? না করলে বুঝবেন কী করে? প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের ক্ষমতা থাকলে এই ঝড়-বাদলের সন্ধেবেলা এত দূরে বসের বাড়ি বয়ে আসতেন না।

দীপনাথ একটু অধৈর্যের গলায় বলে, বোস সাহেবের কাছে তো আমি আসিনি! গরজটা আমারই।

কিসের গরজ?

আপনি সত্যিই বিয়েটা ভেঙে দিচ্ছেন?

মণিদীপা এ কথায় বোধহয় একটু হকচকিয়ে যায়। তারপর ভীষণ তেতো আর বিরক্ত গলায় বলে, এটা কি অন্যের ভীষণ পার্সোনাল ব্যাপারে হাত দেওয়া নয়?

দীপনাথ এ কথাটার জবাব তৈরি রেখেছিল। সে বলল, বিয়ে করা বা বিয়ে ভাঙা কোনওটাই খুব পার্সোনাল বিষয় হতে পারে না, মিসেস বোস। যদি হত তা হলে বিয়েতে সোশ্যাল গ্যাদারিং, পুরুত, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বা সাক্ষীর দরকার হত না।

আমি ওসব জানি না। প্রসঙ্গটা আমার কাছে ভাল লাগে না।

আমারও লাগে না। তবে আমি আপনাদের ভাল চাই বলেই জিজ্ঞেস করছি, বিয়েটা বাঁচানো কোনওভাবে সম্ভব কি না?

বোধহয় না।

কেন, মিসেস বোস?

বিয়েটা আমরা কেউই ভাঙছি না বোধহয়। আপনিই ভেঙে যাচ্ছে।

দীপনাথ আচমকা জিজ্ঞেস করল, সেদিন আপনি টেলিফোনে আমাকে বলেছিলেন, স্নিগ্ধদেবের কথা মিস্টার বোস জানেন না। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়, মিসেস বোস। স্নিগ্ধদেব আপনাদের এ বাড়িতে একসময়ে আসতেন। বোস সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল।

মণিদীপা হঠাৎ একটু অস্বস্তি বোধ করে। বিরক্তির ভাব দেখিয়ে ঠোঁট উলটে বলে, হতে পারে। আমার অত মনে নেই। তবে এর মধ্যে আবার স্নিগ্ধকে কেন?

দীপনাথ সামান্য ম্লান একটু হেসে বলল, আজকাল বারবারই কেন যেন স্নিগ্ধদেবের কথা আমার মনে হয়। ভাবি, স্নিগ্ধই হয়তো আমাদের আগামী দিনের নেতা, মুক্তিদাতা, দেশের হৃদয়।

মণিদীপা এ কথায় রাগ করবে না হাসবে তা ঠিক করতে সময় নিল। তারপর হেসেই ফেলল। বলল, হতেও পারে! ঠাট্টার ব্যাপার নয়।

আমি ঠাট্টা করিনি। যিনি আড়াল থেকে এত চোখা চালাক হাজির-জবাব একটি মহিলাকে চালাতে পারেন, তাঁর ক্ষমতা অনেক।

দাঁতে দাঁত পিষে মণিদীপা বলে, আপনাকে এ খবর কে দিয়েছে যে, স্নিগ্ধ আমাকে চালায়?

আমাকে স্নিগ্ধদেবের ঠিকানাটা দেবেন?

কেন?— বড় চোখে চেয়ে সন্দিগ্ধ গলায় মণিদীপা জানতে চায়।

আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

কেন দেখা করবেন?

আমি জানতে চাই কেন আপনাদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

স্নিগ্ধ তা কী করে বলবে? আপনার কি সন্দেহ যে, আমি স্নিগ্ধর সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করি?

না। প্রেম করার হলে আপনি প্রকাশ্যেই করতেন।

এটা কি কমপ্লিমেন্ট?

ধরে নিতে পারেন।

বেশ ধরলাম। তা হলে আপনি বা আপনার স্পাইনলেস বস ভাবেন না যে, আমি স্নিগ্ধর সঙ্গে প্রেম করি?

না, ভাবি না।

তা হলে ডিভোর্সের ব্যাপারেই বা স্নিগ্ধর কী করার থাকতে পারে?

উনি আপনার প্রেমিক না হলেও আপনার নেতা।

তা হতেই পারে।

তিনি প্রভাব বিস্তার করলে আপনি হয়তো বোস সাহেবকে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা পালটাবেন।

নেতারা আজকাল এসবও করেন নাকি?

আমবা তাঁকে অনুরোধ জানাব।

আমরা মানে? আপনার সঙ্গে আরও কেউ আছে নাকি?

দীপনাথ একটু বাধা পেল। ভাবল। ভেবে বলল. না. আমি একাই যাব।

তাই বলুন। আমরা শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম।

আপনি কী ভেবেছিলেন?

ভাবছিলাম. আপনার সঙ্গে বোধহয় বোস সাহেবও আছেন।

না, বোস সাহেবের আত্মসম্মান বোধ একটু বেশি।

মণিদীপা তীব্র শ্লেষের হাসি হেসে বলে, বোস সাহেবের ঘটে আপনার চেয়ে বুদ্ধিও কিছু বেশি আছে। উনি বোকা নন বলেই স্নিগ্ধর কাছে যাওয়ার কথা ভাবেন না।

আমি কি স্নিগ্ধদেবের কাছে গেলে খুবই বোকামি করব?

খুবই বোকামি করবেন।

আমি কি খুবই বোকা?

এখন পর্যন্ত তেমন বুদ্ধির কোনও পরিচয় দেননি।

দীপনাথ প্রাণপণে ভাবার চেষ্টা করছিল। তার বুদ্ধিবৃত্তি এখন ঠিকমতো কাজ করছে না। মাথাটা এলোমেলো, বিভ্রান্ত। একটু ঘাবড়েও যেন যাচ্ছে সে। ভেবেচিন্তে বলল, হয়তো আমি বোকাই। তবু আমি আপনাদের ভাল চাই।

কী ভেবে বুঝলেন যে, বোস সাহেবের সঙ্গে বিয়েটা না ভাঙলেই ভাল হবে?

দীপনাথ গুছিয়ে বলতে পারবে না জানে। তবু কিছু কথা তার বুকে ঠেলাঠেলি করছে। সে মৃদু স্বরে বলল, বিয়ে ভাঙলে বিশ্বাসের ভিত নড়ে যায়।

তাব মানে?

ডিভোর্সের চলন বেশি হলে ভবিষ্যতে স্বামী বা স্ত্রী কেউ কারও ওপর নির্ভর করতে পারবে না। অবিশ্বাস এসে পড়বে। কেউ সখী হবে না।

ডিভোর্স না করেও তো অনেকেই সুখী নয়।— মণিদীপার মুখে মৃদু শ্লেষের হাসি।

তা বটে। কিন্তু আপনি যদি বোস সাহেবকে সইতে না পারেন তবে ভবিষ্যতে যে অন্য কাউকে সইতে পারবেন তার তো গ্যারান্টি নেই। হয়তো সামান্য সওয়া বওয়ার অভাবে একটার পর একটা বিয়ে ভেঙে যাবে। মানুষের ঘবদোর খাঁ খাঁ করবে। অফিস থেকে ফেরার সময় একজন মানুষ ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে না. ঘরে তার বউ আছে কি নেই।

হাউ ট্র্যাজিক!— বলে মণিদীপা একটু শব্দ করে হেসে ফেলে।

দীপনাথ গোঁয়ারের মতো তবু বলল, কাজটা ভাল হচ্ছে না মিসেস বোস।

মণিদীপার ঝলমলে মুখের ভ্রু-টা হঠাৎ কুঁচকে যাওয়ায় ভীষণ থমথমে হয়ে গেল। তেমনি গম্ভীর গলায় বলল, বোস পদবিটা কি আমার গায়ে লেগে আছে? আপনি আজ পর্যন্ত আমার নাম ধরে ডাকার সাহস পাননি। ভারী আশ্চর্য!

দীপনাথ অধৈর্যের গলায় বলে, ওসব ইররেলেভেন্ট ব্যাপার। আপনার নাম ধরে ডাকতে আমার এখনও একটু সংকোচ আছে। আমি চট করে ফ্রি হতে পারি না।

তাই দেখছি।— মণিদীপার ভ্রু আবার সটান হল এবং মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বেশ আবার ঝলমলে দেখাল তাকে। মৃদু স্বরে বলল, আপনি সত্যিই খুব ভাল লোক। কিন্তু আমার বিশেষ কিছু অলটারনেটিভ নেই। আপনি যখন অনেকখানিই জেনে ফেলেছেন তখন আপনাকে আর-একটু জানাতে বাধা নেই। শুনুন, ডিভোর্সের পর আমি আর কাউকে বিয়ে করতে যাব না, স্নিগ্ধর সঙ্গে অবৈধ প্রেম করব না। এমনকী আপনার সঙ্গেও নয়।

যাঃ, কী যে বলেন!

মণিদীপা মন্তব্যটা যেন শুনতে পায়নি এমন উদাসীনভাবে বলল, আপনাকে আগেও বলেছি, আমার ধ্যানধারণার সঙ্গে মিস্টার বোসের কোনও মিল নেই। আমরা জাস্ট চুক্তিবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী। আমাদের সম্পর্কটা এখন একদম স্টেলমেট হয়ে গেছে।

আপনি কি খুব অহংকারী?

মণিদীপা একটু চেয়ে থেকে গম্ভীর মুখেই মাথাটা ওপরে নীচে নেড়ে বলল, ভীষণ। আমি সহজে কারও কাছে মাথা নিচু করতে পারি না।

হতাশার গলায় দীপনাথ বলে, মিস্টার বোসও তাই। সমস্যা হল দু'জন অহংকারীকে কী করে বশে আনা যায়। একজন একটু মাথা না নোয়ালে তো হয় না।

মণিদীপা গাঢ় এক দৃষ্টিতে দীপনাথকে দেখছিল। এ মেয়েটা বেশ অকপটে চোখে চোখে তাকাতে পারে। সম্ভবত ওর মনে পাপ নেই। মণিদীপা না হেসেই বলল, আপনি তো বিয়ে করেননি, স্বামী-স্ত্রীর এই প্রবলেমটার কথা জানলেন কী করে?

জানি।

মণিদীপা অন্য মনে দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডারের দিকে চেয়ে বলল, বোধহয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হল অহংকারের লড়াই।

আপনি কি তা মানেন?

মণিদীপা অবাক হয়ে বলল, মানি বলেই তো বলছি।

তা হলে তো প্রবলেমটা থাকে না। সল্‌ভ হয়ে গেল।

হল না। একটা মানুষ কি সহজে নিজেকে বদলাতে পারে?

কিন্তু বদলালে যদি ভাল হয়?

ভাল হয় কি না তা দেখার জন্য তা হলে মানুষকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। হয়তো বারে বারে বদলাতে হবে। মানুষ তো পুতুল নয়।

তা হলে কী হবে?

কিছু হবে না। এসব প্রবলেম অত সহজে মেটে না। তার চেয়ে ডিভোর্স ভাল।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মণিদীপা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়ান, আপনার বাসভাড়াটা এনে দিই।

দীপনাথ ম্লান মুখে বলল, চলে যেতে বলছেন তো?

মণিদীপা যেমন টপ করে দাঁড়িয়েছিল তেমনই টপ করে বসে পড়ল। অত্যন্ত ব্যথিত চোখে চেয়ে বলল, মানেটা বুঝি তাই দাঁড়াল?

তা জানি না। তবে হঠাৎ বাসভাড়া দেওয়ার কথা শুনে মনে হল আপনি আমার মধ্যস্থতার ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করছেন না।

সে তো ঠিকই। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে অন্য কারও মতামত আমি পছন্দ করি না। কিন্তু তা বলে আপনাকে আমার অপছন্দ নয়।

দীপনাথের ফর্সা মুখ লাল হয় একটু।

মণিদীপা তাকে শিউরে দিয়ে বলল, বহুকাল আপনি আসেননি। হয়তো আমার ওপর রাগ করেছিলেন। কিন্তু আপনাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করেছিল ক'দিন। খুব ইচ্ছে করেছিল। বিশ্বাস করুন। আপনার ভালমানুসির একটা দারুণ অ্যাট্রাকশন আছে।

দীপনাথের একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তবু সে নিজের আবেগের ওপর উঠতে পারল প্রাণপণ চেষ্টায়। বলল, মিস্টার বোসের কি কোনও অ্যাট্রাকশনই নেই?

হঠাৎ বোস সাহেবের কথা উঠল কেন?— বলে মণিদীপা হেসে ওঠে। তারপর বলে, আপনার

বোধহয় এখনও ধারণা, আমি আপনার প্রেমে পড়েছি।

না, না, তাই বললাম নাকি?— দীপনাথ আঁকুপাঁকু করে ওঠে।

মণিদীপা স্নিগ্ধ স্বরে বলে, বোস সাহেবের কিছু অ্যাট্রাকশন নিশ্চয়ই আছে দীপনাথবাবু। তবে সেগুলোর কোনও অ্যাপিল আমার কাছে নেই।

একটা মানুষের তো সবরকম সদ্‌গুণ থাকতে পারে না। তার যেটুকু আছে সেটুকুকে মূল্য দিলেও হয়।

আপনি আজকাল পুরোপুরি বোস সাহেবের দালাল হয়ে গেছেন। কিন্তু বোস সাহেব আপনাকে এ কাজের ভার দিয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ, ওর কাছে আমারও কোনও অ্যাট্রাকশন নেই।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, না, আমি বোস সাহেবের দূত হয়ে আসিনি। তবে আপনাদের দু'জনকে আমার বেশ লাগত। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে খারাপ লাগবে।

আপনার ভাল লাগার মতো কিছু যে করতে পারছি না তার জন্য দুঃখিত।

দীপনাথ মাথা নিচু করে বলল, আমার ভাল লাগার প্রশ্নটা তো বড় নয়। আমার নিজের এক পিসির কথা খুব মনে পড়ছে। আমি সেই পিসির কাছে শিলিগুড়িতে মানুষ। পিসির দাঁত উঁচু ছিল, সাজগোজ করতে জানতই না, লেখাপড়ারও তেমন বালাই ছিল না। যাকে বলে ভয়েড অফ অল উওম্যানলি অ্যাট্রাকশন, কিন্তু পিসেমশাই তো তার সঙ্গেই একটা জীবন কাটালেন।

মণিদীপা গম্ভীর হয়ে বলে, ওসব বলে লাভ নেই। আমার মা-বাবাও একসঙ্গে এতকাল কাটিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রিলেশনও খুব ভাল। সেই আমলের বিয়েটা ছিল পারিবারিক। এখন ম্যান-উওম্যান রিলেশন। পৃথিবী তো থেমে নেই, দীপনাথবাবু।

থেমে নেই, কিন্তু তার গতিটা খুব মহৎ লক্ষ্যে হয়তো যাচ্ছে না।

সেটা আপনার ধারণা। আমি মনে করি কিছু কিছু জিনিসকে ভেঙে ফেলে ভিতরকার সত্যটিকে খুঁজে দেখা উচিত। রিভ্যালুয়েশনটাই বেঁচে থাকার বড় লক্ষণ।

দীপনাথ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলল, আমাকে বাসভাড়াটা দিন। অনেক রাত হল।

মণিদীপা ঠোঁট দাঁতে চেপে একটু চেয়ে থেকে বলে, নাউ হু ইজ বিয়িং রুড? কথার মাঝখানে বাসভাড়া চাওয়ার মানে কি আমাকে অপমান করা নয়?

দীপনাথ উঠে দাঁড়ায় এবং তেতো গলায় বলে, আপনাকে অপমান করার ইচ্ছে ছিল না। আমি তো অপমান করতে আসি না, অপমানিত হতেই আসি।

এটা থিয়েটারি সংলাপ হয়ে গেল। তবু মণিদীপা ঠাট্টা করল না। গম্ভীর মুখে নিজের করতলের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আচমকা উঠে গিয়ে মিনিট পাঁচেক বাদে ফিরে এসে নিঃশব্দে তিনটে দশ টাকার নোট সেন্টার টেবিলের ওপর ছাইদানিতে চাপা দিয়ে রাখল।

দীপনাথ তাকিয়ে বলল, অত টাকা দিয়ে কী হবে?

মণিদীপা জবাব দিল না।

দীপনাথ টাকাটা ছুঁল না, গোঁয়ারগোবিন্দর মতো দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আমার পকেটমারের পুরো টাকাটাই তো আপনার দেওয়ার কথা নয়। পঞ্চাশটা পয়সা পেলেই আমার হয়ে যাবে। আর সেটাও ধার হিসেবে। কালই ফেরত দেব।

মণিদীপা যেন চটকা ভেঙে বলল, ওঃ, তাই তো। মনে ছিল না যে অহংকারী আমি একাই নই।

আমি অহংকারী নই। অহংকার করার কিছুই যে আমার নেই তা তো আপনি ভালই জানেন।

আপনার সবকিছু আমি জানি এ ধারণা কী করে হল? আমি কারও কিছু জানতে চাইও না।— বলে মণিদীপা আবার গিয়ে একটা আধুলি এনে টঙাস করে টেবিলে ফেলে দিল।

আধুলিটা অচল কি না দেখে নিয়ে দীপনাথ পকেটে ফেলে।

চলি তা হলে।

মণিদীপা জবাব দিল না। মেঝের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাইরের ঘরে।

দীপনাথ আবার বলে, আসছি। বোস সাহেব এলে বলবেন, আমি এসেছিলাম।

মণিদীপা হঠাৎ ফুঁসে উঠে বলল, পারব না।

বলেই ঝাপটা দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

॥ তেত্রিশ ॥

ট্রেনের কথা একদম খেয়াল থাকে না দীপনাথের। অথচ কৌটো কোম্পানির মালিক নীলাম্বর ভদ্র তাকে শিখিয়েছিল, কলকাতায় এখানে সেখানে যাতায়াতের সময় যদি কাছাকাছি রেল স্টেশন থাকে তবে তাতেই যাতায়াত করবেন। কলকাতার বাসে-ট্রামে ওঠা মানে কিছুক্ষণ নরকবাস। তার চেয়ে ট্রেন ঢের ভাল।

কিন্তু দীপনাথের একমাত্র দূরে যাওয়ার কথা ভাবলেই ট্রেনের কথা মনে পড়ে। অথচ কলকাতায় লোকাল ট্রেন যে কত উপকারী তা খেয়াল থাকে না।

আজ অবশ্য খেয়াল হল। মণিদীপার দেওয়া আধুলি পকেটে নিয়ে বেরিয়ে সে আজ প্রথম কালীঘাট স্টেশনের কথা ভাবল। মিনিট দশেক হাঁটলেই ট্রেনের নাগাল।

বাড়ির বাইরে এসে সে একবার দোতলার অন্ধকার বারান্দাটার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ততটা অন্ধকার নয় যাতে মণিদীপাকে দেখা যাবে না। চুপচাপ রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার আলো অতদূরে মৃদু হয়ে পৌঁছেছে, সঙ্গে একটা বড় গাছের চিকড়ি-মিকড়ি ছায়াও।

দীপনাথ স্টেশন পর্যন্ত দৃশ্যটাকে বয়ে আনল।

ফাঁকা স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে কুড়িয়ে বাড়িয়ে জনা পাঁচেক যাত্রী হবে। স্টেশনঘরে জিজ্ঞেস করে জানল ট্রেনের এখনও দেরি আছে।

সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার পর আজকাল কোনও কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে গেলে সময়টা বড় দেরিতে কাটে, অপেক্ষা দীর্ঘ মনে হয়। তবু সিগারেট ছেড়েছিল বলে দীপনাথ আজকাল নিজের পকেটে হাত দিয়ে পয়সার অস্তিত্ব টের পায়। দিনে কম করেও আড়াই থেকে তিন টাকা ছিল তার সিগারেট আর দেশলাইয়ের খরচ। একদিন খুব শান্তভাবে সে এই খামোখা খরচটার কথা ভাবল। পরদিনই সিগারেটের বদলে মেনথল দেওয়া লজেন্স কিনল এক ডজন। লজেন্স মুখে ফেলে মুখের সরস ভাবটা বজায় রাখল, সিগারেট আর ছুঁল না। কোনও কিছু ছাড়তে হলে এক ঝাঁকিতেই ছাড়তে হয়, ধীরে ধীরে ছাড়া যায় না।

ঠিক সেই সিগারেটের মতোই সহজে যে সব ছাড়া যাবে তা তো নয়। স্টেশনের একটা বেঞ্চের কোনায় বসে দীপনাথ কেবলই যখন অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়ানো মণিদীপার কথা ভাবছিল তখন তার মনে হল, এটা ছাড়া যায় না। এটা ছাড়লে বাচার কোনও অর্থ থাকে না। জীবনের প্রতিটি মিনিটই তবে অসহনীয় এক-একটি ঘণ্টায় দাঁড়াবে।

আবার ভাবল, একটু আগেই না সে বিশ্বাসের কথা বলছিল!

মুশকিল হল দীপনাথের প্রিয় কোনও চিন্তা নেই, একমাত্র আজকাল মণিদীপাকে ভাবা ছাড়া। সে কী করে একা তার অবসরকে ভরে তুলবে।

বৃষ্টির জল এখানে সেখানে জমে আছে। প্ল্যাটফর্মের মোরম ভেজা। ভ্যাপসা একটা গরম থম-ধরা ভাব। স্টেশনের আলোর সংখ্যা এতই কম যে চারদিক ভাল করে দেখা যায় না। এই স্টেশন থেকে কোনওদিন গাড়ি ধরেনি দীপনাথ, কোনওদিন ট্রেন থেকে নামেওনি এই স্টেশনে। আজই প্রথম। আধুলি ভাঙিয়ে শিয়ালদার টিকিট কাটবার পর খুব অল্প কিছু খুচরোই অবশিষ্ট আছে

পকেটে। পকেট থেকে পয়সাগুলো বের করে হাতের মুঠোয় ধরে থাকে দীপনাথ। আধুলিটায় মণিদীপার স্পর্শ ছিল। এই পয়সাগুলোয় বুকিং ক্লার্কের হাতের ছোঁয়া আছে মাত্র তবু এও তো মণিদীপারই স্পর্শের ভাঙানো খুচরো।

আজই, এই মুহূর্তে মণিদীপাকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য দীপনাথ আচমকা পয়সাগুলো ছুড়ে দিল লাইনের দিকে। ঠুং ঠাং শব্দ হল অদূরে। দু'-একজন অন্ধকারে মুখ তুলল শব্দের দিকে। লাইনের ওপর গাড়ির আলো এসে পড়ল তখন।

গাড়িতে কোনও ভিড় নেই, বরং অস্বস্তিকর রকমের ফাঁকা। দীপনাথ উঠল এবং ফাঁকা বেঞ্চে খুব হাত পা ছড়িয়ে বসল।

দীপনাথ!

উঁ!

এবার একটা বিয়ে করো।

আমি অপদার্থ, অপদার্থের বিয়ে করতে নেই।

বিয়ে করো দীপনাথ, তা হলে অন্তত সন্ধেবেলা ফিরে যেতে ভাল লাগবে। মেসবাড়িতে ফেরা তো ঠিক ফেরা নয়।

কথাটা ঠিক। প্রতিদিনই মনে হয়, কোথাও ঠিক ফিরে যাচ্ছি না। কিন্তু শুধু ওটুকুর জন্য অতটা রিস্ক নেওয়া কি ভাল?

তবে কী ভাল দীপনাথ? পরকীয়া?

পরকীয়া? ছিঃ ছিঃ, তা কেন?

তবে বিয়ে করো দীপনাথ। জীবনে একজনের কাছে অন্তত পুরোপুরি উন্মোচন করতে পারবে নিজেকে। এখন এটা তোমার দরকার।

ভাবছি। বরং আর-একটু ভাবি।

তুমি ভাবতে বড় ভালবাসো। অত ভেবে ভেবে ঘুঘু পাখি হয়ে যেয়ো না। সঙ্গে কিছু করো।

বিয়ে করলে খাওয়াব কী?

বোস তো চাকরি দিচ্ছে।

যদি দেয়। বোসকে তো ঠিক বোঝা যায় না।

বলো কী! বোস যে তোমার বন্ধু!

তবু বোস সাহেবের মতো লোককে বিশ্বাস নেই হে, হয়তো এ জীবনে বিয়েটা ঘটেই উঠবে না।

কীরকম মেয়ে হলে হবে তোমার দীপনাথ?

খুব সুন্দর কিছু নয়। মিষ্টি চেহারাটা হবে। খুব ভালবাসতে জানবে আর... আর কী!

আর কিছু নয়?

আর খুব বিশ্বস্ত হবে। খুব বিশ্বস্ত।

বাঃ।

তবে একটু ভয় করে। ভয় করে।

কেন বলো তো!

আমার মেজদা শ্রীনাথ আর মেজোবউদির মধ্যে তো দেখছি। বিলু আর প্রীতমের মধ্যেও দেখছি। বোস সাহেব আর মণিদীপার ব্যাপারও জানি। তাই ভয় করে।

যদি মণিদীপাকে বোস সাহেব ডিভোর্স করে তা হলে কখনও তাকে বিয়ে করতে পারবে দীপনাথ?

পারব। নিশ্চয়ই পারব।

ভেবে বলো। ভাল করে ভেবে দেখো।

পারব। বলছি তো। তবে সেটা ঘটবে না।

যদি ঘটে?

ঘটবে না। মণিদীপা কি আমাকে ভালবাসে?

ভালবাসার কথা থাক, দীপনাথ। আমি বলি বিশ্বস্ততার কথা। একটু আগেই বলছিলে না যে, মানুষের ঘর-সংসার খাঁ খাঁ হয়ে যাবে!

বলছিলাম।

বিশ্বস্ততার কথা বলছিলে?

হুঁ। তা-ও।

মণিদীপাকে বিশ্বাস করতে পারবে?

পারব না কেন?

কী করে পারবে? সে যে বিশ্বাসের ঘরে আগুন দিয়েই আসবে, যদি আসে।

আসবে না। ওরকম কিছু ঘটবে না।

যদি ঘটে?

বলেছি তো, যদি আসে তবে বিনা প্রশ্নে তাকে নেব।

তবে একটু আগে তাকে যে বড় বিসর্জন দিলে!

আমার মনে হয় ওরা বিয়ে ভাঙবে না। যদি না ভাঙে তবে মণিদীপার ভালর জন্যই ওকে মন থেকে বিসর্জন দেওয়া আমার উচিত।

তা হলে প্রতিমা ভাসান হয়ে গেল বলছ! আর ওকে নিয়ে ভাববে না?

না। যেভাবে সিগারেটের নেশা ছেড়েছিলাম ঠিক সেইভাবে ছাড়ব।

জানি সিগারেট ছেড়ে মেনথল দেওয়া লজেন্স খেতে। এখন কে তোমার লজেঞ্চুস হবে দীপনাথ? বীথি?

না, না! ওকথা বোলো না। ওই আমার একটা মাত্র পাপ, মাত্র একবারের পদস্খলন!

তাই তো বলি দীপনাথ, বিয়ে করো। তা হলে আর দুনিয়াটা এত গোলমেলে লাগবে না।

শিয়ালদা সাউথ স্টেশনে ঘরমুখো যাত্রীদের হাউড় ভিড়, গাড়ি থামতে-না-থামতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল কামরায়। ঠেলা গুঁতো খেয়ে, ঘষটে, চেপটে অতি কষ্টে নামে দীপনাথ। প্ল্যাটফর্মের থিকথিকে ভিড় কেটে ফটকের দিকে এগোয়।

সুখেন ঘরেই ছিল। পাজামা পাঞ্জাবি পরে যেন বেরোবার মুখে বসে আছে। দীপনাথকে দেখেই বলল, আমি আপনার জন্যই ওয়েট করছিলাম। বাইরের জামা-কাপড় আর ছাড়বেন না। চলুন বেরোই।

কলেজের পড়ুয়া রুমমেটটি আজ ঘরেই আছে। খুব কম কথা বলে, একটু অভদ্র রকমের চুপচাপ থাকে। সে আজ খুব নিবিষ্ট মনে বইখাতা খুলে পড়াশুনো করছে।

দীপনাথ আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে বলল, কোথায়?

বাইরে চলুন বলছি।

দীপনাথ বিরক্ত হয়। সুখেনের বন্ধুত্ব আজকাল তার শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে। কিন্তু পাছে পড়ুয়া ছেলেটির সামনেই কাণ্ডজ্ঞানহীন সুখেন বেফাঁস কোনও কথা বলে ফেলে সেই জন্য সে ঘরের বাইরে এল।

রাস্তায় এসে সুখেন বলে, আজ বীথি আপনাকে নেমন্তন্ন করেছে।

একটু চমকে উঠে দীপনাথ বলে, কেন?

সেদিন আপনাকে ঠিকমতো কিছু খাওয়াতে-টাওয়াতে পারেনি বলে দুঃখ করছিল। আজ আমার অফিসে ফোন করে বলল, তোমার বন্ধুকে নিয়ে অবশ্যই আসবে। যত রাত হোক আমি অপেক্ষা করব।

দীপনাথ খুবই রেগে যাওয়ার চেষ্টা করে। তার মনে হয়, এই প্রস্তাবে তার বোমার মতো ফেটে পড়া উচিত। কঠিন প্রতিরোধ তৈরি করা উচিত। সুখেনকে প্রচণ্ড অপমান করা উচিত।

কিন্তু কোনওটাই পারে না দীপনাথ। ভিতরে একটা বোমার পলতেয় আগুন সে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু মিয়ানো বোমাটা ফাটল না। তবু যতদূর সম্ভব গলায় ঝাঁঝ এনে সে বলল, না, আমি যেতে পারব না। আমি অসম্ভব টায়ার্ড।

আজ যে বড় জমাটি বাদলার ওয়েদার ছিল দীপবাবু!

বাদলার ওয়েদার তো কী হয়েছে?

ভারী অপ্রতিভ মুখে বোকাটে হাসি হেসে সুখেন বলে, আপনি ভারী তেজি মানুষ। মর‍্যালিস্ট। কিন্তু বীথি আজ কোনও দুষ্টুমি করবে না, কথা দিয়েছে। আপনি যে রেগে আছেন তা ওকে আমি বলেছি। আপনি জানেন না, বীথি ভারী ভাল মেয়ে। জীবনে অনেক ঘা খেয়ে—

উদাসভাবে দীপনাথ বলে, খারাপ মেয়েদের সব গল্পই এরকম। বীথি ভাল মেয়ে হলেই বা আমার কী?

ব্যথিত মুখে সুখেন বলে, আপনি ভুল বুঝেছেন।

ওসব কথা থাক। আমি ইন্টারেস্টেড নই।

ও যে অপেক্ষা করবে।

অপেক্ষা করতে তো কেউ বলেনি। তবু যদি করে তো করবে।

বাদলা ওয়েদারটা ছিল। জমত।

আমার মেজাজ ভাল নেই সুখেন।

সেইজন্যই তো আরও দরকার। বীথি মেজাজ ভাল করার ওষুধ জানে।

ভিতরে ভিতরে দীপনাথের প্রতিরোধ ভেঙে যাচ্ছিল। দুর্গের ফটক ভেঙে ঢুকে আসছে অশ্বারোহী। বাদলা দিন, অবসাদ, একঘেয়ে মেসের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়া— এসবের মধ্যে তো কিছু রহস্য নেই। তা ছাড়া একবার যখন পদস্খলন ঘটেছে তখন দু'বারে আর বেশি কী হতে পারে? খুব শিগগিরই সে বিয়ে করে ফেলবে, তখন ভাল করে দুর্গের চারদিকে পরিখা কাটবে, মজবুত ফটক লাগাবে। শুধু আজকের দিনটা... একটা দিন...

দীপনাথ বলল, এটা আপনাদের খুব অন্যায়।

দীপনাথের কণ্ঠস্বরে দুর্বলতা ধরে ফেলে সুখেন উজ্জ্বল মুখ করে বলল, আপনার বন্ধুত্ব ছাড়া আমি সত্যিই অন্য কিছুকে তেমন মূল্য দিই না। লোকে শুনলে ভাববে আমি আপনার খারাপ বন্ধু, কু-পথে নিয়ে যাচ্ছি। মাইরি, তা নয়। আমি শুধু চাই, আপনার জীবনে আরএকটু আনন্দ আসুক।

দীপনাথ একটু ধমক দিয়ে বলে, কিন্তু এই-ই শেষ বার। বীথিকে কথাটা বলে দেবেন।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! শুধু আজকের দিনটা।

আবার টানা রিকশা ভাড়া করে সুখেন। বলে, টানা রিকশার মতো এমন বাবুয়ানির জিনিস হয় না। ভারী আয়েসের গাড়ি। নিজেকে রাজা-রাজা লাগে।

দীপনাথ টানা রিকশা দু'চোখে দেখতে পারে না, তবু আনমনে বলল, হুঁ।

কী ভাবছেন?

কিছু না।

আজকাল আপনাকে আরও বেশি অন্যমনস্ক লাগে। অফিসে ঝামেলা চলছে নাকি?

না। এমনি নানা কথা ভাবি।

আমি একটু অন্যরকম। আমার মাথায় তেমন ভাবনা-চিন্তা আসে না। মন-টন খারাপ হলে আমি ফুর্তি করতে বেরিয়ে পড়ি।

ফুর্তি করাটাই তো জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয় মানুষের।

করুণ মুখ করে সুখেন বলে, আমি খুব ভোঁতা ধরনের, বুঝলেন! পলিটিকস ভাল লাগে না, খেলাধুলো বুঝি না, দেশ কাল নিয়ে খামোখা মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না। দুনিয়াটাকে নিয়ে আমার কোনও চিন্তা নেই। এমনকী নিজের পরিবার নিয়েও ভাবি না। ইন্দো-চায়না ওয়ারের সময় এক ভদ্রলোক আমাকে যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করায় আমি ভারী ফাঁপরে পড়েছিলাম। আবছা আবছা কানে এসেছিল বটে চিনের সঙ্গে ইন্ডিয়ার কী একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, কিন্তু তার ডিটেলস কিছু জানতাম না। লোকটা আমাকে দেশদ্রোহী-ট্রোহী বলে খুব গালাগাল করেছিল। মাইরি, দেশদ্রোহী কি না আমি তাও ঠিক বলতে পারব না। আমার গণ্ডিটা বড়ই ছোট।

দীপনাথ হাসছিল।

সুখেন হাসি দেখে উদ্বেগের গলায় বলল, আমি লোকটা কি খুব খারাপ? আমাকে আপনার কেমন লাগে বন্ধু?

আপনি দারুণ লোক।

ঠাট্টা করছেন!

করলেই বা, অন্যের কথায় আপনার কী আসে যায়?

অন্যের কথায় আসে যায় না ঠিকই, কিন্তু আপনার কথায় আসে যায়। আমার জীবনে বলতে গেলে আপনিই সঠিক বন্ধু হলেন। আর কারও সঙ্গ আমার কখনও এত ভাল লাগেনি। আপনার জন্য আমার অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করে।

আর কিছু করতে হবে না, মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদী বা রজনীকান্তের গান শোনাবেন তা হলেই হবে।

ঠিক আছে। যখনই ইচ্ছে হবে একবার মুখ ফুটে বলবেন, শুনিয়ে দেব।

রিকশা গড়পারে ঢুকতেই বুকটায় খামচা-খামচি শুরু হল দীপনাথের। বীথির মুখোমুখি হওয়াটাই ভারী লজ্জার হবে। জীবনে যে মহিলার সঙ্গে তার অতখানি ঘনিষ্ঠতা হল সেদিন তাকে সে ভাল করে চেনেও না।

দোতলার ঘরের দরজায় আজ দারুণ একটা ছাপ-ছক্করওয়ালা পরদা টাঙানো। পাল্লা দুটো খোলা। ভিতর থেকে ধূপকাঠির চন্দনগন্ধ আসছে। ঘরের ভিতরে রজনীগন্ধা ছিল আজ। নীলরঙা জিনস-এর ফুলপ্যান্ট আর খালি গায়ে তোয়ালে জড়ানো স্বস্তি সোফায় বসে কী একটা চিঠি পড়ছিল। তারা ঘরে ঢুকতেই মুখ তুলে হাসল। কী সুন্দর হাসি! কোমল দাড়িতে মুখটা ভারী নরম যিশুখ্রিস্টের মতো দেখায়। মাথা ভরতি লম্বা চুল। অকপট চাউনি। চেহারাটা রোগাটে হলেও মাংসপেশিগুলো কঠিন। শরীরে লকলক করে জোরালো একটা ভাব।

কী খবর দীপনাথবাবু? অনেকদিন বাদে এলেন।

দীপনাথ খুব অস্বস্তির সঙ্গে হাসল। স্বস্তি কি জানে না যে, দীপনাথ বীথির প্রেমিক? নিজের মায়ের কথা না জানাটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক। স্বস্তির মুখে চোখে খরশান বুদ্ধির দীপ্তি। এ ছেলে সব জানে। তবে কী করে সহ্য করে?

দীপনাথবাবুকে বসিয়ে রেখে সুখেন ভিতরে গেল। স্বস্তি উঠে গেল না। বসে চিঠিটা পড়ে আবার ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে পকেটে পুরল। তারপর বলল, একটু বসুন। মা বাথরুমে। এসে যাবে এক্ষুনি।

স্বস্তিকে আপনি বলবে না তুমি তা ঠিক করতে পারছিল না দীপনাথ। স্বস্তির বয়স খুবই কম, কিন্তু ওর নরম হাসির পিছনে একটা ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্ব আছে বলে সন্দেহ হয়।

কেন জানে না, এর আগের দিন অস্পষ্টভাবে স্বস্তিকে দেখে যেন আর-কারও কথা মনে হয়েছিল। আজও হল। কে? একটু ভাবল দীপনাথ। তারপরেই অবাক হয়ে দেখল, স্বস্তিকে দেখে তার কেন যেন অপরিচিত অদেখা স্নিগ্ধদেবের কথা মনে পড়ে। স্নিগ্ধদেব কি এরকম? হয়তো

কালো, রোগা, লম্বা এবং আরও পরিণত এবং ধীর স্থির। তবু স্বস্তির ভিতর যেন ওইরকম এক বিপ্লবীর গন্ধ আছে।

দীপনাথ বলল, আপনি কি পলিটিকস করেন?

স্বস্তি আবার সুন্দর হাসিটি হাসল। কিন্তু প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল না। নরম গলায় বলল, স্টুডেন্টস মুভমেন্ট করি কিছু কিছু। আপনি ইন্টারেস্টেড?

একসময়ে নর্থ বেঙ্গলে আমিও করতাম। তারপর যা হয়।

ও।— স্বস্তি আর কিছু বলল না।

দীপনাথ অস্বস্তি বোধ করতেই থাকে। স্বস্তি বোধহয় রাজনীতির ব্যাপারে খুব সচেতন। এলেবেলে লোকের সঙ্গে ও নিয়ে কথা বলতে চায় না। দীপনাথ তাই নিরুত্তাপ প্রশ্ন করল, বাইরে থেকে এলেন?

ওয়াই এম সি এ-তে টেবিল টেনিস খেলতে গিয়েছিলাম। খেয়েই আবার বেরিয়ে যাব।

কোথায়?

আমি একটা নাইট স্কুল করেছি। বেলেঘাটায়।

খুব ভাল।

দীপনাথ আলগা গলায় বলে। কিছুতেই এই ছেলেটিকে তার বীথির মতো নষ্ট মহিলার গর্ভজাত বলে মনে হয় না। সে জিজ্ঞেস করে, আর কী করেন?

স্বস্তি মাথা নেড়ে বলে, সংগঠন ছাড়া খুব বেশি কিছু করা একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই একটা অর্গানাইজেশন করে তুলছি।

কী করতে চান?

অনেক কিছু। টু মেক পিপল কনশাস। সোশ্যালি অ্যান্ড পলিটিক্যালি।

জনসাধারণকে নিয়ে ভাবা বা দেশের জন্য কিছু করার কথা দীপনাথ বহুকাল হল ভুলে গেছে। এই গ্রীষ্মের রাতে এখন সে এক কামার্ত শুকনো পুরুষ, প্রায় বিগত-যৌবনা এক সুন্দরীর বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করছে। তার দেশ নেই, দেশবাসী নেই, দায়দায়িত্ব নেই। নিজের জন্য কি একটু লজ্জা হচ্ছিল দীপনাথের?

লজ্জা থেকে মুক্তি দিতেই বুঝি স্বস্তি উঠে পড়ে বলল, আমি একটু আগেই খেয়ে নিচ্ছি। স্কুলে ওরা অপেক্ষা করবে। কিছু মনে করবেন না।

না, না। আপনি কাজে যান।

স্বস্তি চলে গেল। পাশের খাবার ঘরে চেয়ার টানার শব্দ হল।

চুপচাপ বসে দীপনাথ নিজের ভিতরকার অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে। এই যে এরা, এই স্বস্তি এবং তার মা, এরা কারা, সমাজের কোন শ্রেণির মানুষ, ভাল না মন্দ তা কিছুই বুঝতে পারে না সে। ভারী রহস্যময় এরা। হয়তো অকপট, হয়তো সংস্কারমুক্ত, তবু মন থেকে এদের স্বীকার করে নিতে পারছে না দীপনাথ।

নিজের মায়ের ঘৃণ্য জীবনে কি অভ্যস্ত হয়ে গেছে স্বস্তি? তার প্রতিবাদ নেই? বিপ্লব নেই?

খুব অল্প সময়ে খাওয়া শেষ করে খালি গায়ের ওপর একটা ভাঁজহীন হাওয়াই শার্ট চড়াতে চড়াতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় স্বস্তি যখন তার দিকে চেয়ে হেসে গেল তখনও দীপনাথ তার মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মতো উঠে সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় স্বস্তিকে ধরল, শুনুন, আমি আপনার নাইট স্কুলটা একটু দেখব।

স্বস্তি অবাক হলেও কোনও আবেগ প্রকাশ করল না। শান্ত গলায় বলল, মা আজ আপনাদের নেমন্তন্ন করেছে শুনেছি। ততক্ষণ ওয়েট করা তো সম্ভব নয়।

আমার নেমন্তন্নের চেয়ে নাইট স্কুলটা দেখাই বেশি দরকার।

পরে দেখবেন। কিছু তেমন দেখার মতো ব্যাপার নয়। মা অপেক্ষা করছে। আপনি যান, আমিও চলি।

দীপনাথ নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ বলল, আপনার মা নন, আপনাকেই আমার বেশি দরকার। আমি আপনার কাছে কিছু শিখতে চাই।

স্বস্তি হয়তো সন্দেহ করল, দীপনাথ মদ-টদ খেয়েছে। তাই সামান্য হেসে বলল, শেখার কথা বলছেন কেন? ওসব ইমোশনের কথা।

হতে পারে। কিন্তু এখন আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।

স্বস্তি একটু স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে খুবই আবেগহীন ভদ্র গলায় বলল, মায়ের বন্ধুদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালই, কিন্তু আমি তাদের কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হই না, অন প্রিনসিপ্‌ল। মাফ করবেন।

স্বস্তি চলে যাওয়ার পরও তার গম্ভীর, গভীর, বেতারঘোষকের মতো সুন্দর কণ্ঠস্বরটি অনেকক্ষণ কানে লেগে রইল দীপনাথের।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে একবার ভাবল, এখান থেকেই মেসে ফিরে যাবে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুর্গের ফটক ভেঙে যে ঘোড়সওয়ার ঢুকেছে সে লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে নীতিবোধ, আব্রু এবং প্রতিরোধ।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিল দীপনাথ। মাঝপথ পর্যন্ত উঠেই থামল। বাইরের ঘরে নয়, কিন্তু ভিতরের ঘরে কোথাও তীব্র স্বরে বীথি কিছু বলছে। বলছে বোধহয় সুখেনকেই। সুখেনের গলাও শোনা গেল। দু'জনের বোধহয় ঝগড়া হচ্ছে।

ঝগড়ার শব্দটা দীপনাথকে সাহায্য করল অনেক। তার নিজের ভিতরের উত্তেজনা হঠাৎ স্তিমিত হয়ে এল। অনিচ্ছে জাগল।

কাউকে কিছু না বলে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল দীপনাথ। ধীরে সুস্থে হেঁটে গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

॥ চৌত্রিশ ॥

দৈহিক দিক থেকে পঙ্গু দক্ষ একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বাড়িতে বসে যে-কোনও রকম ট্যাক্স রিটার্ন, হিসাব তৈরি এবং অ্যাকাউন্টস সংক্রান্ত সবরকম পরামর্শ দিতে প্রস্তুত। প্রথম শ্রেণির ফার্মে চাকরির অভিজ্ঞতা আছে।

এই বিজ্ঞাপনটা একটি চেক সহ কিছুদিন আগে পাঠিয়েছিল প্রীতম। রোববারের কাগজে বিজ্ঞাপনটা বেরোল। পার্সোনাল কলমে বিজ্ঞাপনটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে সে। কাজটা ঠিক হল কি না বুঝতে পারছে না। অরুণ বা বিলু টের পাবে না। বিজ্ঞাপনে ঠিকানা নেই, বক্স নম্বরে আছে। তবে যদি খুঁটিয়ে দেখে এবং দুইয়ে দুইয়ে চার করে তবে প্রীতমের ধরা পড়ার সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা নয়। অরুণের ক্ষুরধার বুদ্ধিকেই তার ভয়। অবশ্য যদি সত্যিই প্রীতম কোনও কেস হাতে নেয় তবে ওদের কাছে শেষ পর্যন্ত কিছুই গোপন থাকবে না।

কাগজটা রাখতে গিয়েও আবার দুইয়ের পাতায় বিজ্ঞাপনটা দেখে নেয় প্রীতম। ওটা চোখে পড়ার পর থেকেই তার রক্তস্রোত কিছু দ্রুত হয়েছে, শ্বাসের উষ্ণতা বেড়েছে। বহুকাল পরে উত্তেজক কিছু ঘটল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি ক্লায়েন্ট সত্যিই আসে তবে সে পারবে কি না। এই পারা না-পারার প্রশ্নটিই তার কাছে সবচেয়ে বড়।

ছুটির দিনে বিলু সারাদিনই ঘরে থাকে। চাকরি করে বলে আজকাল সপ্তাহের অনেক কাজ জমে থাকে ছুটির দিনটির জন্য। কাচাকুচি, তোলা ঝাড়া, একটু-আধটু রান্না। রবীন্দ্রসদনে বাচ্চাদের একটা

ফাংশনে যাওয়ার জন্য অনেক দিনের বায়না ছিল লাবুর। আজ মায়ে-মেয়েতে সকালবেলা রবীন্দ্রসদনে গেল। দুপুরে ফিরবে। বিলুর খুব ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু লাবুর মুখ চেয়ে যেতে হল। একা ভাল লাগছিল না প্রীতমের। একা কাজ ছাড়া কখনওই ভাল লাগে না। আজ তাই বালিশে হেলান দিয়ে সে পারা না-পারার কথা ভাবতে থাকে।

সুস্থ শরীরের একজন মানুষ কতটা পারে তার কোনও হিসেব হয় না। মানুষের পারার কোনও শেষই নেই। কেবলমাত্র ইচ্ছের জোরেই না মানুষ দক্ষিণ মেরুতে গেছে, সিঁড়িহীন দেয়ালের মতো খাড়া আকাশের মতো উঁচু পাহাড়ে উঠেছে, খড়ের নৌকোয় পাড়ি দিয়েছে সমুদ্র। ক'মাস আগেই তো খবরের কাগজে পড়েছে, আমেরিকার এক ছোকরা ব্যথাহরা ট্যাবলেট খেয়ে তারপর নিজের শরীরে ছুরি চালিয়ে এক মস্ত অপারেশন প্রায় সাঙ্গ করে এনেছিল। মানুষ কি আসলে মানুষ? অনেক মানুষ আছে যারা আসলে দৈত্য, দানব, রাক্ষস বা দেবতা।

ইচ্ছাশক্তির ওপর বিলু বা অরুণের আস্থা নেই। ওদের কখনও ঠিক এরকম প্রয়োজন না পড়লে, এরকম বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়ার সমস্যা দেখা না দিলে, নিরন্তর রোগজীবাণুর সংক্রমণ টের না পেলে ইচ্ছাশক্তির ওপর ওদের আস্থা আসবেও না।

কেবল ইচ্ছের জোরে প্রীতম পারবে তো? তার শরীর শুকিয়েছে বটে, কিন্তু রোগ এখনও তার মগজকে স্পর্শ করেনি। হয়তো দীর্ঘ দিন করবেও না এখনও। অডিটের সব আইনকানুন তার মনে আছে।

অচলা!— হঠাৎই ডাকল প্রীতম।

রান্নাঘরে বিন্দুর সঙ্গে বসে কিছু খাচ্ছিল বোধহয়। ভরাট মুখে সাড়া দিল, যাই।

মেয়েটাকে খুব ভাল লাগে প্রীতমের। আগে সহ্য করতে পারত না। মনে হত, বাইরের একজন মানুষ এসে অন্দরমহলে অনধিকার প্রবেশ করেছে। অন্যায় কৌতূহলে চেয়ে চেয়ে দেখছে তার শুকনো শরীর। অস্বস্তি হত। আজকাল হয় না। অচলাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা আর ভাবেও না প্রীতম।

কিছু বলছেন?

চাকাওলা চেয়ারটা কই? দেখছি না তো!

ও ঘরে বোধহয় লাবু নিয়ে গাড়ি-গাড়ি খেলছিল কাল। এনে দিচ্ছি।

অচলা হুইল-চেয়ারটা সামনের ঘর থেকে টেনে আনলে প্রীতম বিরসমুখে বলল, থাক। শোওয়ার ঘরের র‍্যাক-এ অ্যাকাউন্টেন্সির কয়েকটা বই আছে, সঙ্গে খাতা। এনে দাও তো। একটা ডটপেন বা কলম দিয়ো, আর পেনসিল।

অচলা এনে দিল। বলল, একটু চা করে দিই?

দাও।

বই খুলে প্রীতম একটার পর একটা এন্ট্রি দেখে যায়। হরেক রকমের প্রবলেম জল করে দিতে থাকে। এখনও মগজ শতকরা একশো ভাগ ক্রিয়াশীল।

অচলা!— আবার ডাকে প্রীতম।

চা নিয়ে যাচ্ছি। অচলা জবাব দেয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসে।

বলুন।

শোনো। আজ থেকে এক সপ্তাহ কেটে গেলে তুমি একটু সজাগ থাকবে। আমার কাছে কেউ কেউ আসতে পারে। তারা বিভিন্ন কোম্পানির লোক। তোমার বউদি যেন ব্যাপারটা টের না পায়।

কোম্পানির লোক কেন আসবে?

তারা কাজ নিয়ে আসবে। কাজ করাতে আসবে।

আপনি রোগা শরীরে কাজ করবেন?

রোগা শরীর বলেই কাজ বন্ধ করে দেওয়াটা কি উচিত হবে? শোনোনি, অনেক সময় কাজ করলে রোগের প্রকোপ কমে যায়?

আপনাদের তো অভাব নেই, তবে কেন কাজ করবেন?

টাকার জন্যে নয়! বেঁচে থাকার জন্য।

অসুখ হলে শুয়ে থাকতে হয়। ডাক্তাররা বলেন, অ্যাবসোলিউট রেস্ট।

এতকাল তো আমি ডাক্তারদের অবাধ্য হইনি। কিন্তু ডাক্তারদের ওষুধে আমার কাজও হয়নি। তাঁদের কথা শুনে আর কী হবে?

কাজ হয়নি কে বলল? আপনাকে আমি প্রথম এসে যেরকম দেখেছিলাম এখন তার চেয়ে ভাল দেখি।

প্রীতম হাসল। বলল, সত্যিই ভাল দেখো? না কি রুগিকে ওরকম বলতে হয় বলে বলছ?

ভাল দেখছি। চা খান, ঠান্ডা হয়ে যাবে।

প্রীতম তার দু'হাতে প্লেটসুদ্ধ চায়ের কাপ তোলে। কম করেও দু'-তিন কেজি ভারী মনে হয় কাপটাকে। একটু একটু কাঁপে, চা ছলকায়। তবু পারে প্রীতম আজকাল। চা খেতে ডাক্তার তেমন কিছু বারণ করেনি, কিন্তু সম্প্রতি বিলু তার চা বন্ধ করেছে। বিলু না থাকলে লুকিযে অচলা করে দেয়। চা আজকাল বড় প্রিয় হয়েছে প্রীতমের।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রীতম বলে, আমি ভাল আছি। লোকে বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমি কিন্তু ভাল আছি।

ভাল হয়েও যাবেন। কিন্তু তা বলে এখনই কাজ-টাজ করতে যাবেন না। কমপ্লিট রেস্ট নিন।

কমপ্লিট রেস্ট বলে কিছু নেই, জানো না? মন যদি অস্থির থাকে, তবে কী করে বিশ্রাম হবে? কারও যদি রাতের বেলা বিছানায শুয়েও ঘুম না আসে তবে কেবল শুয়ে থাকাটাই তো ঘুমের অলটারনেটিভ হতে পারে না। বরং শুয়ে থাকলে আরও অশান্তি! তার চেয়ে বই-টই পড়ে সময় কাটিয়ে দেওযা ভাল।

বউদি যে আপনাকে ভাবনা-চিন্তা করতে বারণ করেছেন। কাজ করতে গেলেই তো মাথায় চাপ পড়বে!

কাজ না করলেও পড়ে। সারাদিন কত চিন্তা করি।

অচলা সামান্য হেসে বলে, আপনি নাকি ভীষণ মনের জোর খাটিয়ে অসুখ সারানোব চেষ্টা করেন?

সেটা কি দোষের?

জানি না। তবে বউদি বলেছিলেন ওতেও মাথার ওপর চাপ পড়ে।

উদাস গলায় প্রীতম বলে, তোমার বউদি আমাব সবটুকু তো জানে না। সে কী করে বুঝবে আমি কীসে ভাল থাকি?

প্রীতমের এই হঠাৎ উদাসীনতা লক্ষ করে অচলা তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। কাজ করলে যদি ভাল থাকেন তবে না হয় আমি বউদিকে কিছু বলব না। কিন্তু পরে যেন দোষ না হয়।

সারা দিনটা এই অচলাই আজকাল তাকে সঙ্গ দেয়। স্নেহ-মমতার একটা দুর্লভ ভাণ্ডার আছে ওর। সহজেই চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, অল্প কারণেই উদ্বিগ্ন হয়। লাবু এখন একটু বড় হয়েছে। ঠিক বেবি-সিটারের দরকার আর ওর নেই। অচলা তাই প্রীতমকে দেখাশোনা করে নিজের গরজেই। কেউ ওকে বলেনি। একজাতের মেয়ে আছে, যারা প্রেমিকা বা স্ত্রী হিসেবে তেমন কাজের নয়। কিন্তু ভারী ভাল মা হতে পারে। অচলা ঠিক সেই জাতের।

ছেলেবেলায় মা ছাড়া প্রীতম আর-কোনও মেয়েকে চিনতই না। বড় হয়ে চিনল বিলুকে। সারা

জীবনে নিজের মা, বোন, বউ আর মেয়ে— এই ছিল প্রীতমের ঘনিষ্ঠ মহিলা-জগৎ। এর বাইরে যারা তাদের কাছে প্রীতমের ভারী লজ্জা, সংকোচ, বুক দুরু-দুরু ভয়। এখন সেই ছোট্ট চৌহদ্দিতে কবে অনায়াসে ঢুকে গেছে অচলাও।

প্রীতম বলল, তোমার দোষ হবে না। ভয় নেই।

অচলা মৃদু হেসে বলে, আচ্ছা দেখব দোষ হয় কি না। আজকাল তো রোজ আপনার জন্য আমি বউদির বকুনি খাই।

কেন? আমার জন্য তুমি বকুনি খাবে কেন? বিলুর তো ভারী অন্যায়।

ঠিকই করেন। সেদিন আপনি বাথরুমের ঠান্ডা জলে চান করলেন, পরশুর আগের দিন বিন্দুকে দিয়ে রাস্তার আলুর চপ আনিয়ে খেলেন, গত সপ্তাহে পাপোশে পা আটকে পড়ে গিয়েছিলেন। আপনার ওই সব দুষ্টুমির জন্য বকুনি তো আমারই খাওয়ার কথা।

প্রীতম প্রশ্ন করল না, কিন্তু চোখে প্রশ্ন নিয়ে চেয়ে রইল।

অচলা এবার স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বলল, বউদি কী বলেছেন জানেন? বলেছেন, এ বাড়িতে বাচ্চা কিন্তু একটি নয়, দু'টি। এ বাড়ির কর্তার চার্জও তোমার। এমনকী দুটো বাচ্চাব দেখাশোনার জন্য আমার মাইনেও বউদি পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তাই বলো!— প্রীতম মাথা নাড়ল।

এবার বুঝেছেন, কেন আপনার কিছু হলে আমার জ্বালা!

বুঝেছি। কত বেশি পাও বললে?

পঞ্চাশ টাকা।

মাত্র? আমি তোমাকে কিছু ঘুষ দিতে রাজি অচলা।

অচলা হেসে ফেলে বলে, আমার আর বেশি চাই না। বলুন, কী করতে হবে?

কিছু নয়। শুধু সব কথা তোমার বউদিকে বোলো না।

বলব না। কিন্তু সব কি লুকোতে পারবেন? বিন্দু আছে, লাবু আছে। ওরা ঠিক বলে দেবে। আর আমিও তো আপনাকে যা-খুশি-তাই করতে দিতে পারি না।

আমি কি খুব যা-খুশি-তাই করি?

ওই যে বইপত্র নিয়ে বসেছেন। এখন কি মাথা খাটানো ভাল? আমি ভয়ে কিছু বলি না, পাছে আপনি রেগে যান। আজ বলছি, রুগিদের বইপত্র নিয়ে পড়ে থাকা উচিত নয়।

প্রীতম খানিকক্ষণ শূন্যে চেয়ে থেকে বলল, তোমার বউদি তা হলে আমার ভার তোমার হাতেই ছেড়ে দিল?

তা কেন? বউদিও দেখাশোনা করবেন, আমিও করব। আমি নার্সিং জানি তো, তাই রুগির দেখাশোনা অনেকের চেয়ে ভাল পারি।

প্রীতম একটু গম্ভীর হয়ে বলল, খুব ভাল। কিন্তু বিলু ব্যাপারটা আমাকে জানাল না কেন?

ওমা! আপনি রাগ করলেন নাকি?

প্রীতমের আজকাল বুকভরা অভিমান হয়েছে। বেশিদিন রোগে ভুগলে বুঝি এ রকমই হয়। পাছে অভিমানের ব্যাপার অচলা ধরে ফেলে সেই ভয়ে একটু ক্লিষ্ট হাসি হাসল সে। বলল, না। রাগের কিছু নেই।

সত্যিই নেই। বউদি আপনাকে কত ভালবাসেন। আমি অনেক পরিবারে কাজ করেছি। আপনাদের মতো ভাল সম্পর্ক খুব বেশি পরিবারে দেখিনি।

প্রীতম একটা ছোট শ্বাস ফেলে। বলে, আমি কারও কাছে ভার হতে চাইনি কখনও।

ওই দেখুন! আপনি ঠিক রাগ করছেন।

প্রীতম নিজেকে সামলে নেয়। ঠাট্টার গলায় বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি একটু ভেবে দেখি,

আমার জন্য তোমাদের কী কী করতে হয়। তারপর চেষ্টা করে দেখব, সেগুলো নিজেই পারি কি না।

অচলা উদ্বেগের গলায় বলে, নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু পুরুষমানুষ বলে কথা, মেয়েমানুষ থাকতে তারা কেন সব কাজ করতে যাবে? আমি বাড়ি ফিরলে এখনও আমার কর্তা এক গেলাস জল নিজে গড়িয়ে খান না। কেন খাবেন?

প্রীতম হেসে ফেলে। বলে, সবাই কি তোমার কর্তার মতো? পৃথিবীতে আমার মতো হতভাগাও কিছু আছে।

আপনি কেন এরকম বলুন তো! কী কথা থেকে কোন কথায় চলে গেলেন।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, বিলুর জন্য নয়, তোমার কথা ভেবেই আমার মনটা খারাপ লেগেছিল, অচলা। আমি ভেবেছিলাম, আমার ওপর বুঝি তোমার মন একটু নরম হয়েছে, তাই যেচে সেধে আমার সেবা করো আজকাল। কিন্তু তা তো নয়, তুমি তো আসলে চাকরি করছ। তাই না?

এ কথায় অচলা থেমে গেল। কী বলবে? তার মানসিকতা একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার ওপরে যাওয়া তো সম্ভব নয়। পৃথিবীর খানাখন্দ, অন্ধকার সে কিছু কম চেনে না। মানুষের ভিতরকার ইতর জন্তুর মুখোমুখিও সে কয়েকবার হয়েছে। মাত্র বছরখানেক আগে এক অসুস্থ, দারুণ সুন্দরী মহিলার নার্সিং করছিল সে। স্বামী মস্ত চাকরি করে। দ্বিতীয় রাত্রিতেই সেই সুপুরুষ সবল লোকটি তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল শোওয়ার ঘরে। এসব নিয়ে হইচই করা বোকামি জেনেই সে কিছু করেনি। আগের অভিজ্ঞতাও কিছু আছে। দিন-রাতের নার্সিং বা বেবি-সিটিং করতে গেলে চোখের সামনে তরতাজা যুবতী মেয়েকে পেয়ে লঘু-প্রেমের ইচ্ছে কত পুরুষের জেগে ওঠে। কিন্তু প্রীতমকে সে চোখে দেখার কিছু নেই। এই এক পুরুষ যে অন্যরকম। সম্পূর্ণ অন্যরকম। এ মানুষ প্রেমে পড়ে না, কিন্তু মা চায়। এর দৃষ্টিতে কখনও পাপের ছোঁয়া দেখেনি অচলা। এ যেন তার ছেলেরই এক ভাই। টাকা পায় বটে, কিন্তু টাকার জন্য তো এ মানুষটার জন্য তার এত দরদ নয়। কিন্তু সে কথা বোঝানোর মতো ভাষা জানা নেই অচলার।

ভাষার অভাবে অচলার তাই চোখে জল এল। মুখটা ফিরিয়ে ধরা গলায় বলল, গরম জল হয়ে গেছে। এখন স্পঞ্জ করে দেব। তৈরি থাকুন।

আমি তোমার কাছে স্পঞ্জ করব না। বিলু আসুক।

নার্স-ডাক্তারদের কাছে লজ্জা করতে নেই।

না, না।— বলে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে প্রীতম। সে পারবে না। ভারী লজ্জা।

আচ্ছা, তা হলে বউদিই আসুক।

অচলা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে প্রীতম। মেয়েটা কি দুঃখ পেল? পৃথিবীর কাউকেই তার এতটুকু দুঃখ দিতে ইচ্ছে হয় না।

কাল রাতে খুব বৃষ্টি গেছে। আজ এত বেলাতেও মেঘলার আঁধার ছেয়ে আছে চারদিকে। এরকম দিনে কিছু ভাল লাগে না। মনটা বড় স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে। বিলু কেন আসছে না এখনও?

স্পঞ্জ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল প্রীতম। কিছু যায় আসে না, অচলাই স্পঞ্জ করুক। অচলাকে ডাকতে যাচ্ছিল প্রীতম, হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল।

তার শোওয়ার ঘরের দরজায় পাঠানের মতো বিশাল চেহারার দাড়িওয়ালা একটা লোক দাঁড়িয়ে, তার কাঁধে মস্ত এয়ারব্যাগ। চোখে হালকা রঙিন কাচের রোদ-চশমা।

অবাক হয়ে চেয়ে ছিল প্রীতম। অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করল, কে?

ব্যাগটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে শতম এগিয়ে এসে বিছানার ধারে বসে।

চিঠি পাওনি? আসব বলে চিঠি পোস্ট করেছি পরশু।

প্রীতম ওঠে। বুক কাঁপছে, অস্তিত্ব কাঁপছে।

কোন গাড়িতে এলি?

দার্জিলিং মেল, আর কোন গাড়ি!

এত দেরি যে!

চোরাই চাল নিয়ে হুজ্জতি হল ডানকুনিতে। সেখানে ঠায় আড়াই ঘণ্টা লেট। বউদি, লাবু সব কোথায়?

বেরিয়েছে একটু। আসবে এক্ষুনি। বোস।

বিন্দু আছে?

আছে।

দাঁড়াও, ওকে একটু চা করতে বলে আসি।

উঠতে হবে না। এখান থেকেই শুনতে পাবে। অচলা! অচলা!

অচলা কুণ্ঠিত পায়ে আসে। মুখে হাসি নেই।

একগাল হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে প্রীতম বলে, এই আমার মেজো ভাই। এইমাত্র শিলিগুড়ি থেকে এল। একটু চা করতে পারবে?

মাথা নেড়ে অচলা আবার ধীরে চলে গেল। সেদিকে একটু চেয়ে থাকে প্রীতম। মেয়েটাকে সুযোগ মতো একটু মন-ভোলানো কথা বলতে হবে। বেচারা দুঃখ পেয়েছে।

শতম তার গায়ের টি-শার্টটা খুলে ফেলল। গলায় কালো সুতলিতে বাঁধা ধুকধুকি। হাতে পাঞ্জাবি বালা। গালে ঘেঁষ দাড়ি, মস্ত গোঁফ। একদম চেনা যায় না। তার ওপর সম্প্রতি চেহারাটাও ভাল হয়েছে। এই বড়সড় স্বাস্থ্যবান যুবকটি তার ভাই এ কথা ভাবতেই ভাল লাগে।

পরশু চিঠি ড্রপ করেছিস বললি?

শতম বলে, হ্যাঁ। পাওনি তো?

পাওয়ার কথা নয়। দু'দিন তো মিনিমাম লাগে। বারো-তেরো বছর আগে মা সকালে চিঠি পোস্ট করলে আমি বিকেলে এখানে পেয়ে গেছি কতবার।

আসাটা হঠাৎ ঠিক হল। তাই আগে খবর দেওয়া যায়নি।

তাতে কী? খবর না দিলেও তো কোনও অসুবিধে নেই।

না, তবু ভাবলাম তোমরা যদি কোথাও চেঞ্জে-টেঞ্জে যাও।

কোথায় আর যাচ্ছি!

যা গরম তোমাদের কলকাতায়!

সকাল থেকে কিছু খেয়েছিস?

খেয়েছি।

বাড়ির সবাই ভাল? মা?

ওই এক রকম। মা তোমার জন্য কী সব যেন পাঠিয়েছে।— বলে শতম উঠতে যাচ্ছিল।

প্রীতম বলল, থাক না। বোস। পরে বের করিস।

তুমি কেমন আছ?

ওই এক রকম। তুই অনেকদিন বাদে এলি।

ঠেকায় না পড়লে কে কলকাতায় আসতে চায় বলো? এ তো নরক। দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে শহরটা। বউদি কোথায় গেছে বললে?

একটা ফাংশনে।

ওই মেয়েটা কে?

ও অচলা। লাবুর দেখাশোনা করে।

বউদি চাকরি করছে, না?

হুঁ। না করে উপায় ছিল না।

আমি মেয়েদের চাকরি করা সাপোর্ট করি। তবে বাড়িতে সবাই হয়তো পছন্দ করে না।

স্নান করবি না?— প্রসঙ্গটা পাশ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করে প্রীতম।

বাথরুমে জল আছে তো? তোমাদের কলকাতায় খুব জলের ক্রাইসিস বলে শুনি।

প্রীতম বলে, জল আছে।

অচলা ধীর পায়ে ট্রেতে চা নিয়ে এল। সঙ্গে কিছু নোনতা বিস্কুট। এক গেলাস জলও। বুদ্ধি আছে। কারণ শতম প্রথমেই জলের গেলাস নিয়ে এক চুমুকে শুষে নিল।

অচলা বলল, আর-এক গেলাস দেব?

না। কলকাতার জল ভীষণ নোনতা। খাওয়াই যায় না। খুব তেষ্টা ছিল বলে এক গেলাস খেলাম।

অচলা মৃদু হাসল।

বিস্কুট লাগবে না। চায়ের সঙ্গে আমি কিছু খাই না।— বলে কাপটা ট্রে থেকে তুলে নেয় শতম।

আপনি ডিম খাবেন তো? আজ ডিম হয়েছে।

ডিম? না, আমি ওসব খাই না। মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছি। শুধু ডাল হলেই চলবে।

ওমা! সে কী?

শতম একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, ডিম ছাড়া কিছু হয়নি?

তা হয়েছে। কিন্তু মাছ মাংস খান না কেন?

ওঃ, সে একটা ব্যাপার আছে।— বলে লাজুক হাসি হাসে শতম।

অচলা বলে, তা হলে ছানাব ডালনা করে দিতে বলি। ছানা আছে।

শতম জবাব দিল না। খাওয়া নিয়ে তার বেশি ভাবনা আসে না।

প্রীতম মাছ মাংস নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না। শতম হয়তো জবাব দিতে চাইছে না। ভাই বড় হয়েছে, এখন তাকে আর জেরা করা যায় না তো। যদি নিজে থেকে কারণটা কখনও বলে তো বলবে।

প্রীতম বলে, তুই আজকাল খুব মোটরসাইকেল দাবড়াস শুনি।

এখানে সেখানে যেতে হয়।

সাবধানে চালাস তো!

হ্যাঁ হ্যাঁ, ও নিয়ে ভেবো না।

মা বারণ করেনি মোটরসাইকেল কিনতে?

ও বাবা! সে অনেক ঝামেলা গেছে। এখন তেমন কিছু বলে না।

আমার নিজের একটা মোটরসাইকেল বা স্কুটারের খুব শখ ছিল।

না কিনে ভাল করেছ। কলকাতার রাস্তায় ওসব চালানো ভয়ংকর রিস্‌কি।

তা অবশ্য ঠিক।

শোনো দাদা, বউদি আসার আগেই তোমাকে একটা ইমপর্ট্যান্ট কথা বলে নিই। আমি এবার কেন এসেছি জানো?

কেন?

তোমাকে নিয়ে যেতে।

আমাকে নিয়ে যাবি?— প্রীতম কেমন দিশেহারা বোধ করে। কী বলছে শতম তা যেন ঠিক বুঝতে পারে না। আবার বলে, নিয়ে যাবি?

বউদি চাকরি করে, সুতরাং তুমি রুগি মানুষ সারাদিন একা পড়ে থাকো। শোনার পর থেকেই মা খুব অস্থির। নার্স বা আয়ার হাতে তো ঠিক যত্ন হয় না। মা বলে পাঠিয়েছে, শিলিগুড়ির বাড়িতে তোমার সবরকম ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হবে। আমরা সবাই আছি। এখানে এরকম অসহায় থাকবে কেন?

প্রীতম কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সেটা কি ভাল হবে? বিলু কী ভাববে?

বউদি তো তেমন কিছু ভাবছে না। নইলে এরকম অবস্থায় তোমাকে রেখে চাকরি করছে কেন? তোমার টাকার দরকার হলে একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিলেই আমরা টাকা পাঠাতে পারতাম। বউদির চাকরি করার দরকার ছিল না।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, তা জানি। টাকাটা কোনও কথা নয়, আমি গেলে বিলু আর লাবুর গার্জিয়ান কে থাকবে?

সেটা তুমি বউদির সঙ্গে কথা বলে ঠিক করো। মত হলেই আমি প্লেনের টিকিট কাটব।

তুই স্নানে যা। বিলু আসুক। আমি একটু ভেবে দেখি।

প্রীতম চোখ বুজে থাকে। সংসারে একটা বিরোধ এতকাল চাপা পড়ে ছিল। এখন কি সেটা বেরিয়ে আসবে প্রকাশ্যে? একটা লড়াই শুরু হল নাকি তাকে নিয়ে? শতমের মুখচোখে ওরকম একটা কাঠ-কাঠ শক্ত ভাব কেন? ভিতরে যেন গনগনে রাগের আগুন!

শতম বাথরুমে গেল। দরজার শব্দ শুনল প্রীতম। সংসারে ঝগড়াঝাঁটিকে বড় ভয় পায় প্রীতম। অশান্তির ভয়ে সে চিরকাল চুপ করে থেকেছে। বহু অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনি, অনেক ন্যায্য কথা বলতে চেয়েও বলেনি।

ভিতরে ভিতরে বড় অস্বস্তি হচ্ছিল প্রীতমের। তাকে নিয়েই এখন এই টানা-হ্যাঁচড়ার সূত্রপাত ঘটবে।

ঠিক এই সময়ে কপালে একটা ঠান্ডা নরম করতল কে যেন রাখল। ছোট হাতখানা।

প্রীতম চোখ খুলে দেখে, পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয় মুখখানা ঝুঁকে আছে মুখের ওপর।

ঘুমোচ্ছিলে বাবা?

না। ফাংশন কেমন হল?

খুব ভাল। আমি কিন্তু রাস্তার মোড় থেকে গলিটা হেঁটে একা একা বাড়িতে এলাম।

কেন, তোমার মা?

মা তো অরুণমামার সঙ্গে কথা বলছে। সেই মোড়ে।

অরুণমামা গিয়েছিল নাকি তোমাদের সঙ্গে?

হ্যাঁ তো। আমরা যে অরুণমামার গাড়িতেই গেলাম মোড় থেকে।

ও। ভাল, খুব ভাল।— বলে লাবুর হাতখানা মুঠোয় চেপে চোখ বোজে প্রীতম। তারপর গাঢ়স্বরে বলে, তোমার কাকা এসেছে। শতকাকা। শোনো মা, আমি যদি শিলিগুড়ি চলে যাই তা হলে কি তোমার খুব কষ্ট হবে?

আমিও যাব।

তোমার যে স্কুল! তোমার মাও এখানে থাকবে।

ইস! তুমি গেলে আমার যে কান্না পাবে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

পরদিন চেম্বারে ঢুকতেই বোস সাহেব হাসিমুখে বলে, উড ইউ লাইক এ ট্রিপ টু নর্থ বেঙ্গল?

দীপনাথ একটু হকচকিয়ে যায়। শিলিগুড়ি! এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?

সে কোনও জবাব দেওয়ার আগেই বোস সাহেব বলে, এবার অবশ্য একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্যুর। সঙ্গে আমি থাকছি না।

তবে?

তবে আবার কী? আপনার দায়িত্ব বাড়ছে। আমি আর আগের মতো ট্যুরে যেতে পারছি না। অফিসটাকে ঢেলে সাজাতে হবে অ্যান্ড আই অ্যাম ডগ টায়ার্ড! ট্যুর এখন থেকে আপনার।

সব ট্যুর?

সব না হলেও কিছু।

নর্থ বেঙ্গল আমার ফেবারিট—

বোস হাত তুলে কথাটা শেষ হওয়ার আগেই তাকে থামায়। বলে, আমি জানি। নর্থ বেঙ্গলে যেতে পারলে যে আপনি কত খুশি হন তা আপনার চোখমুখ দেখেই বুঝেছি।

থ্যাংক ইউ।

ইটস অল ইন দি জব। আমার কোনও কেরামতি নেই। আরও তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আসছেন। আমি তাঁদের রিক্রুট করিনি, করেছে কোম্পানি। তাবা গুজরাট, পাঞ্জাব এবং কেরালার লোক। বাঙালি কেবল আপনি।

আমি? আমি তো এখনও—

বোস সাহেব আবার হাত তোলে, কথাটা এখনও শেষ হয়নি চ্যাটার্জি। যা বলছিলাম। আপনিই চারজনের মধ্যে একমাত্র বাঙালি এবং মোস্ট প্রোবাবলি একমাত্র ইনএফিসিয়েন্ট লোক।

দীপনাথ এটা ঠাট্টা কি না না-বুঝে একটা গাড়লের হাসি হাসল।

তবে এও জানি অন্যে যখন ট্যুরের নামে দু'হাতে টাকা লুটবে তখন আপনিই একমাত্র পাই-পয়সারও ডিটেলস হিসেব দেবেন। তাই বলছি আপনার ইনএফিসিয়েন্সির তুলনা হয় না।

এটা কি কমপ্লিমেন্ট বোস সাহেব?

না।— বলে বোস তার বাঁ ধারে আলাদা করে রাখা একটা সাদা খাম তুলে তার হাতে দিয়ে বলে, এটা কমপ্লিমেন্ট নয়। জাস্ট দি রিকগনিশন।

দীপনাথ খামটা খুলল। আমেদাবাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস তাকে কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করেছে। খবরটা বহুবার বোস সাহেবের কাছে শুনেও তেমন বিশ্বাস হয়নি। বাংগালোরের ফ্যাঁকড়া থাকায় বরং কথাটা শুনলে মন খারাপ হত। কিন্তু এখন চিঠিটা হাতে পেয়ে তার সমস্ত শরীর মন মাথা ভেসে যাচ্ছে আনন্দে শিহরনে। মোটামুটি বড় একটা কোম্পানির সে জোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। মাইনে দেড় হাজার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে।

এতটা আশা করেনি দীপনাথ। বিভ্রান্তভাবে সে বোস সাহেবের দিকে চেয়ে থাকে।

বোস সাহেব বলে, বসুন।

দীপনাথ পুতুলের মতো বসে।

বোস সাহেব তার কাচের গেলাস থেকে খানিকটা জল খেয়ে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, আমি জানি, গতকাল পর্যন্তও আপনি আমাব কথায় বিশ্বাস করতেন না। ভাবতেন আই অ্যাম জাস্ট টেকিং ইউ টু এ ট্র্যাপ।

দীপনাথ কিছু বলতে যায়, বোস সাহেব আবার হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, অ্যান্ড আই ডিজার্ভড দ্যাট। আমি আপনার সঙ্গে কথার খেলাও কিছু কম খেলিনি।

দীপনাথ চুপ করে থাকে। হাতের চিঠিটার দিকে আর-একবার তাকায়, ভাঁজ করে পকেটে রাখার কথা মনে হয় না। কেবল চেয়ে থাকে। তারপর বলে, বাংগালোর কি তা হলে ক্যানসেলড?

হুঁ। তবে বাংগালোর নিয়ে তো আমার কোনও প্রবলেম ছিল না। আমার প্রবলেম যেটা সেটা রয়েই গেল।

কী?— দীপু ঝুঁকে বসে।

মণি। আমার স্ত্রী।

আমরা কিছুই করতে পারি না মিস্টার বোস?

বোস মাথা নাড়ে, না। নেক্সট মানথ উই আর গোয়িং টু কোর্ট।

কোর্ট, বোস সাহেব? কোর্ট?

কোর্ট। মিউচুয়াল করে নিচ্ছি। তারপর কোম্পানির কাজে একটু বাইরে যাব। শীতের আগেই।

কোথায়?

মিডল ইস্ট। তারপর আমেরিকা। লম্বা ট্যুর। ভালই হবে। দি উন্ডস উইল বি হিলড।

দীপনাথ এবার চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রাখে।

বোস হাসে হঠাৎ। বলে, ইজ দি পেমেন্ট অলরাইট?

খুব ভাল। আনএক্সপেক্টেড।

বোস সাহেব মাথা নেড়ে বলে, দ্যাটস ফুলিশনেস। আমার কাছে বললেন ভালই, খবরদার আব কাউকে বলবেন না। নাথিং ইজ টু গুড অ্যাজ ফার আাজ ইউ ক্যান স্ট্রেচ দেম।

আপনাকেই বলছি।

আমাকেও নয়। আমি ম্যানেজমেন্টের লোক।

দীপনাথ হাসে।

বোস সাহেব মুখটা একটু গম্ভীর করে বলে, একটা কথা বলে রাখি। আপনার কোয়ালিফিকেশন খুব জেনারেল ধরনের বলে আপনার পে অন্য তিনজনের চেয়ে খানিকটা কম। বাকি তিনজন বেসিক স্যালারি পাবে রাউন্ড অ্যাবাউট টু থাউজ্যান্ড।

পাক, আমার অভিযোগ করার কিছু নেই।

থাকলেও আপাতত কিছু করা যেত না। আমি বেশি চাপাচাপি করিনি। তা হলে ম্যানেজমেন্ট অন্যরকম সন্দেহ করত।

ঠিক আছে।

বোস মাথা নেড়ে বলে, ঠিক নেই। আমি জানি। তবে আমি তো থাকছিই। বছর খানেকের মধ্যেই সকলের স্ট্যাটাস সমান করব। কথা দিচ্ছি।

দীপনাথের কাছে চাকরির আনন্দ অনেকটাই বিস্বাদ হয়ে গেছে। বোস আর মণিদীপার বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, সেটা তার চাকরি পাওয়ার চেয়েও গুরুতর ঘটনা।

দীপনাথ বলে, আমি মিসেস বোসের কাছে শেষবারের মতো একটু যাব?

বোস অবাক হয়ে বলে, নিশ্চয়ই যাবেন। ইউ নিড নো পারমিশন। কিন্তু কেন?

আর একবার চেষ্টা করব।

বোস হাসে। নিজের মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ম্লান ও সুন্দর হাসিটি ঝুলিয়ে রেখেই বলে, ডুয়িং গুড টু আদারস? ইউ আর রিয়েলি ইম্পসিবল। আপনাকে তো বলেইছি, প্রবলেমটা ইমোশনাল নয়। হার্ড ফ্যাক্ট।

জানি। খানিকটা বুঝতেও পারি। কিন্তু আমার মনে হয় প্রবলেমটা তেমন জটিল কিছু নয়। হয়তো আপনাদের সম্পর্কের একটা ছোট্ট কোনও আনঅ্যাডজাস্টমেন্ট আছে। আর সেইটেই এখন ফেঁপে ফুলে উঠেছে।

বোস আনমনে মধ্য-দূরত্বের শূন্যে চেয়ে কী যেন ভাবছিল। দীপনাথের কথাটা শুনে বলল, হতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, আমি কাজকর্ম নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে, নিজের স্ত্রীকে নিয়ে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা করার সময় পাইনি। চিন্তা করার দরকারও হয়নি এতকাল।

এখন কি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন মিস্টার বোস?

বোস সাহেব চমৎকার করে হাসল। ইদানীং বোসের হাসিতে একটা বিষাদ যুক্ত হওয়াতেই বোধহয় হাসিটা ফোটে ভাল।

বোস সাহেব বলে, ইন ফ্যাক্ট, আমার কাছে ডোমেস্টিক অ্যান্ড কনজুগাল প্রবলেমগুলো ভীষণ ফরেন। দীপা এমন সব প্রবলেম তৈরি করে যেগুলো আমি বুঝতেই পারি না। ম্যাজিসিয়ানরা যেমন শূন্যে টুপি থেকে খরগোশ বের করে, দীপাও তেমনি আউট অফ নাথিং ক্রাইসিস তৈরি করতে পারে।

কীরকম ক্রাইসিস?

বলতে গেলে মহাভারত। আমার অত মনেও থাকে না। আই হ্যাভ মোর ইমপর্ট্যান্ট থিংস টু থিংক অ্যাবাউট। বিয়ে করুন, আপনিও জানতে পারবেন।

বিয়ে সবাই করে, কিন্তু সকলের তো আপনাদের মতো প্রবলেম দেখা দেয় না।

সেটাও সত্যি। আমরা বোধহয় একটু বেশি আপ-স্টার্ট।

না, না, তা নয়। আপনারা চমৎকার একটি দম্পতি। আমি তো জানি।

বাইরে থেকে বোধহয় ভালই দেখায় আমাদের। যাকগে, ওসব কথা থাক। ডিভোর্স হলে আমি বা দীপা কেউই বোধহয় খুব কিছু লুজ করব না।

বিয়ে ভেঙে-যাওয়াটা একটা সোশ্যাল স্ক্যান্ডাল, আপনিই সেদিন বলেছিলেন।

নিশ্চয়ই। স্ক্যান্ডাল এড়ানোর জন্য আমি দীপার সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ যেতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, লেট আস লিভ টুগেদার লাইক কো-টেনান্টস।

উনি কী বললেন?

দীপা গায়ে জ্বালা ধরানো হাসি হেসেছিল। কিন্তু চ্যাটার্জি, আমার অনেক কাজ আছে। এসব এখন থাক।

দীপনাথ উঠল। বলল, আমি নতুন পোস্টে কবে জয়েন করব?

আজই।

নর্থ বেঙ্গল কবে যেতে হবে।

তিন-চার দিনের মধ্যেই।

আসছি বোস সাহেব।

শুনুন, আপনি আজ জয়েন করলেও আজই আপনাকে কোনও কাজ দেওয়া হবে না। আপনি এখন চলে যেতে পারেন। সামনের মাস থেকে কাজের প্রেশার বাড়বে। ততদিন একটু বিশ্রাম করে নিতে পারেন।

আচ্ছা। একটা কথা, আমি কি আমার আত্মীয় এবং বন্ধুদের জানাতে পারি যে, আমি এ চাকরিটা পেয়েছি?

নিশ্চয়ই। আপনার চাকরি একদম পাকা।

থ্যাংক ইউ।— বলে দীপনাথ বেরিয়ে আসে।

একটু অন্যমনস্ক ছিল বলে অফিসের চারদিকে লক্ষ করেনি। বেরোবার মুখে রঞ্জন এসে ধরল, কী দাদা! কতবার যে ইশারা করলাম, দেখতেই পেলেন না?

দীপনাথ থতমত খেয়ে বলে, একটু অন্য কথা ভাবছিলাম।

সে তো বুঝতেই পারছি। খবর কী বলুন তো? আমরা তো শুনছি আপনি কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হচ্ছেন।

হ্যাঁ। আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম।

অভিনন্দন না কী যেন জানাতে হয়! তাই জানাচ্ছি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ একটা কাজ আছে রঞ্জন, চলি।

আমার কেসটা একটু দেখবেন। এখন তো আপনি টপ-বসদের একজন।

নিশ্চয়ই। পরে কথা হবে।

বেরিয়ে এসে নীচের ফটকে দাঁড়িয়ে দীপনাথ দেখে, বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। দরজায় ভিড় জমে আছে। বেরোনো যাবে না। কিন্তু অফিসেও ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না তার। চুপচাপ ভিড়ের একটু পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। মনে অজস্র কথার ঝড়।

আধ ঘণ্টায় কলকাতাকে ডুবিয়ে, গাড়িঘোড়া বন্ধ করে দিয়ে বৃষ্টি থামল।

রাস্তায় বেরিয়ে দীপনাথ ঠিক করতে পারছিল না কোথায় যাবে। মণিদীপা, প্রীতম কিংবা বাবা। ভেবে দেখল অনেকক্ষণ। মণিদীপা হয়তো বাড়িতে নেই এখন। প্রীতম সম্ভবত ঘুমোচ্ছে। তা ছাড়া খবরটা সকলের আগে বাবাকেই দেওয়া উচিত। বহুদিন হল বাবার সঙ্গে দেখা হয় না।

সজলকে একটা এয়ারগান দেওয়ার কথা ছিল। নিউ মার্কেটে গিয়ে একটা এয়ারগান কিনল দীপনাথ। তারপর ভাবল, সকলের জন্যই কিছু নেওয়া উচিত। সুতরাং বউদির জন্য একটা রঙিন শাড়ি, বাবা আর মেজদার জন্য ধুতি, মঞ্জু আর স্বপ্নার জন্য দুটো ম্যাক্সি কিনে নিল। পকেটে গত মাসে পাওয়া আটশো টাকার অনেকটাই অবশিষ্ট ছিল।

রতনপুর পৌঁছোতে বিকেল। কলকাতার কংক্রিট থেকে এই সবুজ গাছপালার মধ্যে হঠাৎ এসে পড়লে মনটা জুড়িয়ে যায়।

পথটা হেঁটেই পার হয় দীপনাথ, সমস্ত শরীর আর মন দিয়ে চারদিককাব প্রকৃতি থেকে স্নিগ্ধতা শুষে নিতে নিতে। অল্প দূরে মাঠের ধারে সূর্য নামছে। পাখির ডানার শব্দ। গাছপালায় বাতাস লাগছে এসে।

বাড়িটা ভারী নিঃঝুম। ঢুকতেই প্রথমে শ্রীনাথের ভাবন-ঘর। দরজায় তালা ঝুলছে। ভিতরবাড়ি পর্যন্ত অনেকটা পথ। হাঁটতে হাঁটতে দীপনাথ চারদিকে চেয়ে দেখছিল পুকুরপারের ঝোপড়াটায় খ্যাপা নিতাই না কে একটা লোক থাকে। সেদিক থেকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল মাত্র, কিন্তু কোনও মানুষের সাড়া নেই।

খানিক ঘেউ ঘেউ করে কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে সঙ্গ ধরে।

উঠোনে পা দিয়ে দীপনাথের একটা কেমন যেন লাগে। বাড়িটা নিস্তব্ধ, নিরানন্দ। লোকের মানসিকতা কি বাড়ির চেহারাতে ফুটে ওঠে? কে জানে! কিন্তু পশ্চিমের রাঙা রোদে ভেসে-যাওয়া মস্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে দীপনাথের মনে হয়, এ বাড়িতে যেন বিষাদ ঘনিয়ে আছে। বাবা কি তা হলে নেই!

বউদি! ও বউদি!

বড় ঘর থেকে তৃষা বেরিয়ে আসে, ওমা! বড় ঠাকুরপো! এসো, এসো।

শঙ্কিত চোখে তৃষার দিকে চেয়ে দীপনাথ বলে, বাবা! বাবা কোথায়?

বাবা বেড়াতে গেছেন। সারাদিন বসে থাকেন তো। আজকাল তাই বিকেলের দিকে রিকশায় করে বেড়াতে পাঠিয়ে দিই। বোসো, এক্ষুনি এসে যাবেন।

খুব বিশেষ মানুষ ছাড়া তৃষা নিজের ঘরে কাউকে বসায় না। দীপনাথকে বসাল। বলল, এতদিন পরে মনে পড়ল?

মনে রোজই পড়ে। সময় হয় না।

কলকাতার লোকদেরই যত সময়ের অভাব। না?

কথাটা মিথ্যে নয়। আচ্ছা বউদি, বাড়িটা আজ এরকম লাগছে কেন বলো তো?

কীরকম?

ঠিক বোঝাতে পারব না। খুব আনহ্যাপি যেন।

যাঃ। আনহ্যাপির কী আছে!

বাচ্চাগুলো কোথায়?

এ সময় ওরা বাড়িতে থাকে নাকি? খেলতে-টেলতে গেছে। ওসব কী এনেছ অত?

দেখো তো এই শাড়িটা কেমন?— বলে তৃষার শাড়িটা পলিথিনের প্যাকেট থেকে বের করে দীপনাথ।

বাঃ, বেশ শাড়ি। কার জন্য কিনলে?

তুমি পরবে।

আমি! আমি কি আজকাল রঙিন শাড়ি পরি নাকি! পাগল কোথাকার।

কেন, রঙিন শাড়ি পরলে কী হয়?

যাঃ, ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে না! তা ছাড়া তোমাকে এসব পাকামি করতে কে বলেছে? আমার জন্য শাড়ি আনার কী দরকার পড়ল হঠাৎ বলো তো? বিয়ে-টিয়ে ঠিক হয়েছে নাকি?

না, তবে বিয়ের পথ পরিষ্কার হয়েছে। আমি একটা দেড় হাজারি চাকরি পেয়েছি।

ওমা! তাই নাকি! তা হলে পাত্রী দেখি?

দীপনাথ স্মিতমুখে চেয়ে বলল, তোমার হাতে অনেক পাত্রী আছে জানি। ধীরে সুস্থে দেখো। আগে রঙিন শাড়ির প্রবলেমটা মিটুক। তুমি রঙিন শাড়ি পরবে না কেন?

বয়স হচ্ছে না!

লাজুক ভাব করে তৃষা বলে। মল্লিনাথ ছাড়া বোধহয় দীপনাথই একমাত্র পুরুষ যাকে খুব কাছের লোক বলে ভাবতে পারে তৃষা। এই দেওরটির মুখোমুখি হলে তার সব কঠোরতা কোমল হয়ে আসে, বুকের জ্বালাগুলো মিইয়ে যায়।

তোমার কত বয়স?

কে জানে বাবা! শুধু জানি, ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, আমিও বুড়ি হচ্ছি।

তোমার দ্বিগুণ বয়সের মহিলারা কত ঝলমলে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে, দেখো না?

কলকাতায় ওসব কেউ মাইন্ড করে না। কিন্তু এ তো কলকাতা নয়! গাঁ গ্রামকে তো জানো না! এখানে নিন্দে রটে।

সেটা তোমার ইমাজিনেশন। গাঁ গ্রামও আর আগের মতো শরৎচন্দ্রের যুগে পড়ে নেই। বুড়োমিটা একটু কমাও। যাও গিয়ে শাড়িটা পরে এসো।

আচ্ছা আচ্ছা হবে 'খন। আগে জিরিয়ে নাও, চা করতে বলে আসি।

ভ্রুকুটি করে দীপনাথ বলে, আগে শাড়ি পরবে, তারপর আমি এ বাড়িতে জলগ্রহণ করব। যাও।

তৃষা হাসে না। মলিন এক মুখ করে খানিকক্ষণ দেওরের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর মৃদু স্বরে বলে, আচ্ছা, পরছি।

তৃষার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কষ্ট হল দীপনাথের। বউদিকে সে কোনওদিন ঠিক এরকম বিষাদ-প্রতিমা দেখেনি। তৃষা কোথাও কখনও হার মানে না, ভেঙে পড়ে না।

সে বলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো!

কিছু না গো।— বলে তৃষা জোর করা হাসি হেসে চলে যেতে যেতে দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, রঙিন শাড়ি পরে আসছি, তখন দেখো কেমন ঝলমলে আর হাসিখুশি দেখায়।

বলেই চলে গেল।

মল্লিনাথের ঘরটায় একা বসে চারদিক দেখে দীপ। খাটের পাশেই বন্দুক রাখার র‍্যাকে মল্লিনাথের পুরনো বন্দুকটা ফিরে এসেছে। কৌতূহলী দীপনাথ উঠে গিয়ে বন্দুকটা তুলে নেয়। ছ্যাচা ইস্পাতের সিকিম জিনিস। প্রচণ্ড ভারী। ঘোড়ার কাছে লোহার ওপর নানা কারুকার্য করা। কুঁদোর গায়ে একটা খোদাই করা পেতলের পাতে ইংরিজিতে লেখা এম এন চ্যাটার্জি। বন্দুকটা ভেঙে ব্যারেলের ফুটোয় চোখ রাখে দীপনাথ। সদ্য পরিষ্কার করা বর্তুল আয়নার মতো ইস্পাতে ঝকমকিয়ে উঠল আলো আর প্রতিবিম্ব।

আপনার চা।

একটু চমকে ওঠে দীপনাথ। বউদির ঝি বৃন্দা।

রেখে যাও।

বলে বন্দুকটা আবার সোজা করে কাঁধে তুলে দেয়ালের দিকে তাক করে দীপনাথ। বড়দার হাত ছিল পরিষ্কার। শুধু বন্দুকের টিপ কেন, কোন দিকটাতেই বা খামতি ছিল বড়দার! বিশাল চেহারার অতি সুন্দর পুরুষ, দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, সাহসী, ডানপিটে। যেখানেই গেছে সেখানেই সহজাত কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। কারও কাছে মাথা নোয়ায়নি। শুধু একটু চরিত্রের দোষ ছিল। মদ আর মেয়েমানুষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়েটা কেন করল না তা সঠিক বোঝা যায় না। যখন উত্তরবাংলায় ছিল তখন মাঝে মাঝেই পিসির বাড়িতে হানা দিয়েছে। হইচই ফুর্তি করতে খুব ভালবাসত। দীপনাথ তখন রামকৃষ্ণ ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করে। স্বাস্থ্যখানা বরাবর পেটানো ছিল। মল্লিনাথ তার কাঁধে থাবড়া মেরে বলত, তুই হবি আমার মতো। স্বাস্থ্য না হলে কি পুরুষকে মানায়?

ঘোর-ঘোর হয়ে এসেছে ঘরখানা। বন্দুকটা কোলে নিয়ে প্রায় জুড়নো চায়ে চুমুক দিতে দিতে জলজ্যান্ত চোখের সামনে যেন দেখতে পেল মল্লিনাথকে। দীপনাথ গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলল, অত স্বাস্থ্য ছিল তোমার, তাও বাঁচলে কই? তুমি বেঁচে থাকলে আমাদের একটা আশ্রয় থাকত। বাড়িঘরের আশ্রয় নয়, মনের আশ্রয়।

টুক করে ঘরের আলো জ্বলে উঠল। খুব জোরালো নয়, নিস্তেজ হলুদ আলো। সেই আলোয় তৃষা সামনে দাঁড়িয়ে লাজুক মুখে হেসে বলল, নাও, হল তো!

দীপনাথ দেখে, হলুদে খয়েরিতে ছাপা সুন্দর শাড়িতে বউদির বয়স কম করেও দশ বছর কমে গেছে। কিন্তু হাসিটি সত্ত্বেও মুখ এত মলিন যে শাড়িটাকে ছদ্মবেশ বলে মনে হয়।

তৃষা চোখ নামিয়ে শাড়িটা একবার দেখে বলল, বুড়ো বয়সের এত সাজগোজ কে দেখবে বলো তো!

মেয়েরা নিজেদের জন্যই সাজে।

তোমাকে বলেছে!

ঠিক আছে, তুমি না হয় আমার জন্যই সেজো। তোমাকে বুড়ি দেখতে আমার ভাল লাগে না।

এ কথায় তৃষা যেন কিছুক্ষণ নিজেকে খুঁজে পেল না। শক্ত মেয়ে হরিণীর মতো চকিত চোখে চারদিক দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ চোখ পড়ায় ভ্রু কুঁচকে বলল, কী সর্বনাশ! তুমি যে বন্দুক নিয়ে বসে আছ। কিন্তু ভাই, আমি তো রোহিণী নই।

দীপনাথ হেসে বলে, আমারই-বা কোন গোবিন্দলাল হওয়ার দায় ঠেকেছে!

দীপনাথ বন্দুকটা আবার র‍্যাকে তুলে রেখে বলল, শিলিগুড়িতে থাকতে এই বন্দুকটা কয়েকবার চালিয়েছি। হঠাৎ হাতের কাছে পেয়ে একটু দেখছিলাম। এটা যত্ন করে রেখো।

যত্নেই আছে। এতদিন থানায় জমা ছিল। নিয়ে এসেছি।

ভাল করেছ। বাবা ফিরেছে?

না। উনি বোধহয় শিমুলতলায় বুড়োদের আড্ডায় বসেছেন।

বাবাকে চাকরির খবরটা দিতেই আসা।

আজই চলে যাবে নাকি?

যাব না?

খুব যদি জরুরি কাজ না থাকে তবে থেকে যাও না রাতটা!

কেন বলো তো?

কেন আবার! তুমি এলে আমরা কত খুশি হই জানো না? ছেলেটা তো বড় কাকা বড় কাকা করে অস্থির। আমাকেও জ্বালিয়ে খায়। সবাইকে বলে তুমি নাকি দারুণ ভাল বক্সিং জানো, আরও কী কী

সব যেন। বলে, বড় কাকা একাই পঞ্চাশজন গুন্ডাকে মেরে পাট করে দিতে পারে।

বহুকাল বাদে এমন হোঃ হোঃ করে হাসল দীপনাথ। বলল, ব্যাটা বোধহয় খুব অ্যাডভেঞ্চারের বই-টই পড়ে।

ভীষণ। আর দিনরাত্তির কেবল মারপিটের গল্প।

ওর জন্য এয়ারগান এনেছি।

কত কী এনেছ পাগল! কত টাকা নষ্ট হল।

আমার মাইনে দেড় হাজার, মনে রেখো।

দেড় হাজার!— বলে একটা শ্বাস ছাড়ে তৃষা। বলে, সংসারী হলে বুঝতে এই বাজারে দেড় হাজার কিছুই নয়। এখন থেকে কিছু কিছু করে জমাও।

তুমি সত্যিই বুড়ি হয়েছ।

সেই মেয়েটার কী খবর বলো তো! যাকে একদিন সঙ্গে করে এনেছিলে!

মেয়ে নয়, বউ। বসের বউ।

ওই হল। সে কেমন আছে?

ভাল না।

কেন?

স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে।

তৃষা একটু চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে, সত্যি বলো তো ঠাকুরপো, ডিভোর্সের কারণ তুমি নও তো?

দীপনাথ চমকে তাকায়, কী যা-তা বলছ?

আর-একদিন ঠাট্টা করেছিলাম, তুমি রেগে গিয়েছিলে। আজ কিন্তু ঠাট্টা করছি না। আমার সত্যিই ধারণা, ও মেয়েটা তোমাকে অসম্ভব ভালবাসে।

দূর! আমাকে দেখলেই যা-তা বলে। কথায় কথায় অপমান করে, তুমি একটি বুদ্ধু!

তৃষা হাসল, তা হলে বলি, এবার ঠিক জানলাম মেয়েটা তোমার প্রেমে পড়েছে। নইলে অপমান করত না।

॥ ছত্রিশ ॥

ওপরে আজকের তারিখ। নীচে সাদা পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে শ্রীনাথ তার ডায়েরি লিখছিল। আগেও লিখত মাঝে মাঝে। তবে সেসব ছিল গাছপালার কথা, নানা অভিজ্ঞতা এবং ভাবনা-চিন্তার কথা। আজকাল সে লিখছে নিজের জীবনের সব নোংরামির কথা। জ্বালা-যন্ত্রণার কথা। কিছুই গোপন করছে না, বরং এত খোলাখুলি লিখছে যে লেখার পর সেটা পড়তে গেলে তার নিজেরই মাথা গরম হয়ে যায়। তবু তার মধ্যে আছে বিষাক্ত, জ্বালাধারা, তীব্র এক সুখও।

সবচেয়ে উত্তেজনা হয় যখন তৃষার কথা লেখে, মল্লিনাথের কথা লেখে। ওদের অবৈধ প্রেম এবং সজলের জন্মকথা সবটাই সে লিখেছে কিছু তথ্য ও কিছু অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু গল্পটা জমেও গেছে বেশ।

শ্রীনাথ জানে, তার ঘরে কোথাও কিছু গোপন করার উপায় নেই। তৃষা ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে রেখেছে। তার অনুপস্থিতিতে এই ঘরে প্রায়ই নিখুঁত তল্লাশি চালানো হয়। তৃষা কী খোঁজে সেই জানে। তবে শ্রীনাথ তার ডায়েরিটা খুব সহজ জায়গায়, হাতের কাছে, টেবিলের ওপরেই রেখে যায়। তৃষা পড়ুক। শুধু তৃষাকে পড়ানোর জন্যই না তার এই নিরন্তর ডায়েরি লিখে যাওয়া! এর

জন্যই সে বেশ মোটা একটা খাতা তার প্রেস থেকে বাঁধিয়ে এনেছে।

আজ সে মদ খায়নি। মেয়েমানুষের ঘরে যায়নি। আজ দুপুরে প্রচণ্ড বৃষ্টির পর মনটা কেমন অন্য গান গাইল। প্রেসের বুড়ো মালিক মারা গেল সেদিন। গতকাল তার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েই জীবনের নশ্বরতার দিকটা হঠাৎ আবার চোখে পড়ল তার। রাস্তা দিয়ে মড়া নিতে দেখলে বা শ্মশানঘাটে গেলে যেমনটা হয় আর কী! ফুর্তি করলে মনের ভারী ভাবটা হয়তো কেটে যেত। কিন্তু কাটাতে চায়নি শ্রীনাথ। বহুকাল অনিত্য জীবনের কথা তো ভাবেনি। নতুন একটা ভাবনা। সেটা ভেবে দেখলে ক্ষতি কী?

আজ সন্ধের মুখে ফিরে এসে পরিপাটি করে স্নান সেরে ডায়েরি নিয়ে বসেছে। আজ কোনও জ্বালা-যন্ত্রণার কথাও লিখছে না সে। আজ সে খুব শান্ত বিষণ্ণতায় লিখছে একটা যন্ত্র ও একজন মানুষের যৌথ সংগ্রামের কথা।

একদিন সেই উনিশশো পনেরো সালে খলসেপুর গ্রাম থেকে একটি ছেলে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসে ডুবজলে পড়ে গেল। এই তরঙ্গসঙ্কুল উথাল-পাথাল দরিয়ায় সাঁতারের কায়দা জানে না। কখনও এ রক-এ শুয়ে থাকে, কখনও ওই গাড়িবারান্দার তলায়। তখন করপোরেশনের জলের কল শুকনো থাকত না, লোকের সদাশয়তা ছিল কিছু, দানধ্যান ছিল, ইংরেজ ছিল, রাজা ছিল, জমিদার ছিল। সে এক অন্য জগৎ। কখনও কলের জল, কখনও লোকের দয়া সম্বল করে ছেলেটা টিকে রইল। দু'-একজন তার অবস্থা দেখে দেশে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিল। ছেলেটা গেল না... কালক্রমে সেই ছেলে কীভাবে এক মস্ত প্রেসের মালিক হল সেই কাহিনি খুব মনপ্রাণ দিয়ে লিখছিল শ্রীনাথ। বুড়ো মালিক শচীন্দ্রনাথকে সে সত্যিই শ্রদ্ধা করত। এই একজন লোক যিনি জীবনে কাউকে বড় একটা আপনি থেকে তুমি বলেননি।

শচীনবাবু মারা গেলেন, বহুকাল বাদে খুব দুঃখ পাওয়ার মতো একটা ঘটনা ঘটল শ্রীনাথের জীবনে। আজকাল তার মন এতই ভোঁতা হয়ে গেছে যে, সহজে সে দুঃখ পায় না। মনে হয় কোনও নিকট আত্মীয়-বিয়োগ ঘটলেও তার চোখে জল আসবে না কিছুতেই।

কিন্তু এল। শচীনবাবুর বয়স হয়েছিল আশির কাছাকাছি। এই বয়সেও বেশ ভালই ছিলেন। শরীরে মেদ ছিল না, কোনও ঘ্যানঘ্যানে অসুখ ছিল না, খাওয়ার লোভ ছিল না। প্রচুর দানধ্যান করে গেছেন। শ্রীনাথ একমাত্র এই লোকটার জন্যই একটানা এতকাল এক জায়গায় নিরুপদ্রবে কাজ করে গেছে। একেবারে হালে কিছু শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, বিক্ষোভ এবং লক আউটের সম্ভাবনা ইত্যাদি দেখা দিলেও কোনওদিনই খুব বিরক্তিকর কিছু ঘটেনি। সবই মিটে গেছে। সেই প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ডটি ভেঙে গেল। তবে প্রেসের ভবিষ্যৎ ভেবে নয়, নিছক একজন মানুষের জন্যই সেইদিন খুব কেঁদেছিল শ্রীনাথ। খুব কেঁদেছিল।

তার নিজের জীবনে আর-কোনও সদর্থক লড়াই নেই, গরিব থেকে বড়লোক হওয়া নেই, সাফল্য লাভ নেই। এখন একটানা এক জীবন, ঘাত-প্রতিঘাতহীন বয়ে যাবে মৃত্যুর দেউড়ি অবধি। তাই বুঝি ওই কান্না। যে জীবন তার নয়, যে জীবন তার কখনও হবে না, তাকে সিংহাসনে বসিয়ে মানুষ মাঝে মাঝে এরকম ধুলায় পড়ে কাঁদে।

দরজার শেকল নড়ে উঠতেই সামান্য চমকে গিয়েছিল শ্রীনাথ।

মেজদা!— বাইরে থেকে কে ডাকল।

কে?

আমি দীপু। দরজা খোলো।

শ্রীনাথ উঠে দরজা খুলে দীপনাথকে দেখে একটু অবাক হয়। কারণ, দীপনাথের পরনে একটা লুঙ্গি করে পরা ধুতি, গায়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। এই বেশে কোত্থেকে এল?

দীপু! কখন এসেছিস?

অনেকক্ষণ। সেই বেলা থাকতে।

টের পাইনি তো?

পাবে কী করে? তুমি তো বারবাড়িতে থাকো।

দরজা ছেড়ে ঘরে গিয়ে দীপনাথকে ঘরে আসার পথ দেয় শ্রীনাথ। টেবিলের পাশের চেয়ারটায় গিয়ে ফের বসে বলে, এই ঘরটাই বাড়ির মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

ঘরখানা তো ভালই।— বলে দীপনাথ বিছানায় বসতে যাচ্ছিল।

শ্রীনাথ বলল, ওই আরামকেদারায় বোস। মুখোমুখি হবে। আজ কি এখানেই থাকবি নাকি?

বউদি যেতে দিল না। একটু কাজ ছিল কলকাতায়।

কাজ তো রোজই আছে। তোর চাকরির কী একটা গোলমাল চলছে না?

মিটে গেছে। আমি কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়েছি।

বাঃ খুব ভাল।

বলে শ্রীনাথ একটা বিড়ি ধরাল। আজকাল বিড়ি খেতে দারুণ লাগে। বড়বাজার থেকে স্পেশাল বিড়ি কিনে আনে পাইকারি দরে। দীপনাথের সাফল্য তাকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে না। দুনিয়ার কোনও কিছুই করে না বড় একটা। কত মাইনে হল জিজ্ঞেস করবে করবে করেও করতে পারে না। কী হবে জেনে?

খানিক বিড়ির ধোঁয়া বুকে আটকে রেখে ছেড়ে দিয়ে বলল, ভাল। খুব ভাল।

দীপনাথ চারদিকে তাকিয়ে ঘরখানা দেখে। স্থাপত্যের দিক দিয়ে ঘরটাকে গোলই বলতে হয়। সব দিকটা না হলেও পিছনের দিকটা পুরোপুরি অর্ধ বৃত্তাকার। চারদিকেই মস্ত মস্ত জানালা। এই ঘরের নাম মল্লিনাথ দিয়েছিল ভাবন-ঘর।

হঠাৎ দীপনাথ প্রশ্ন করে, বড়দা এই ঘরে বসে কী ভাবত বলো তো!

কে জানে!

বড়দাকে কখনও কিছু খুব ভাবতে তো দেখিনি। হইচই করত, ফুর্তি করত, ভাবত কখন?

ভাবত, ভাবত। না ভাবলে, ব্রেন না খাটালে এত সম্পত্তি করল কী করে অত অল্প বয়সে?

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, ভাবলেও অলস চিন্তা করত না। এই ঘরটা আসলে ছিল কাজের ঘর। ড্রইং করত, প্ল্যান আঁকত।

তা হবে। আমি তো কিছু করি না, বসে বসে ভাবি। ঘরটার নাম আমিই সার্থক করছি।

কী ভাবো তুমি?— সকৌতুকে প্রশ্ন করে দীপনাথ। তার সন্দেহ মেজদারও ভাবনা-চিন্তা করার মস্তিষ্ক নেই।

আমার সবই অলস চিন্তা। অলস মাথা শয়তানের বাসা।

প্রীতমকে দেখতে গিয়েছিলে?

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, না। তোর বউদি গিয়েছিল।

সে খবর শুনেছি। তোমারও একবার যাওয়া উচিত।

এবার যাব একদিন। তুই কি প্রায়ই যাস নাকি?

যাই। প্রীতমকে তো ছেলেবেলা থেকে চিনতাম।

সে তো ঠিকই। প্রীতম ছেলেটাও ভাল। ওর যে কেন এমন হল!

সে কথা আমিও ভাবি। প্রীতমের তো কোনও পাপটাপ নেই। তবে কেন ওরই এই রোগ!

বাঁচবে না, না?

ডাক্তাররা স্পষ্ট করে সে কথাটাও তো বলছে না। তবে প্রীতম খুব বেঁচে থাকতে চায়।

এ কথায় যেন একটু অবাক হয় শ্রীনাথ। বেঁচে থাকাটা এমন কী ভাল ব্যাপার যে, লোকে বেঁচে থাকতে চাইবে! তবে মাথা নেড়ে গতানুগতিক কথাটাই বলল, তা তো চাইবেই! কে না চায়!

সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রীতমকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হয়তো শেষ অবধি ওই জোরেই বেঁচেও যাবে।
তাই যেন হয়। এই বয়সে বিলুটা না ভেসে যায়।
তোমার এক-আধদিন গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করা উচিত। কেন সময় পাও না বলো তো! প্রেসের চাকরিটুকু ছাড়া আর তো তোমার দায়দায়িত্ব নেই। সংসার-টংসার সব তো বউদি দেখছে।
শ্রীনাথ আর-একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, সময়ের অভাবটা বড় কথা নয়। আমার কেমন যেন অসুখ-বিসুখের কাছে যেতে ইচ্ছে হয় না।
তা বলে কর্তব্য করবে না? আমরা ছাড়া প্রীতম আর বিলুর কে আছে বলো?
কেন, প্রীতমের তো মা বাপ ভাই বোন, সবাই আছে শুনেছি।
আছে, তবে তারা এখানে থাকে না। সেটা কোনও কথা নয়। এখানে যখন অসহায়ভাবে আছে তখন আমাদের সকলেরই উচিত খোঁজ-খবর নেওয়া।
শ্রীনাথ একটু বিপদে পড়ে যায়। সঠিক কিছু জবাব দিতে পারে না। অন্য দিকে চেয়ে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্য বলে, সেই যে তোর সঙ্গে একটা মেয়ে এসেছিল তার খবর কী?
মেয়ে নয়, বসের বউ।
ওঃ, আমি ভেবেছিলাম বুঝি—
কথাটা হাওয়ায় ছেড়ে দেয় শ্রীনাথ। দীপনাথ একটু লজ্জা পায়। শ্রীনাথ কী ভেবেছিল তা খুব দুর্বোধ্য নয়।
দীপনাথ বলল, অন্যরকম ভাববার তো কিছু নেই। আমি তো পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়েই বলেছিলাম যে, উনি আমার বসের বউ।
তা হবে। মনে ছিল না। মেয়েটা অনেক খবর রাখে।
একালের ছেলেমেয়েরা তোমাদের আমলের চেয়ে একটু বেশি ইনফরমেশন রাখে।
তা বুঝি। সজলই তো এমন সব কথা বলে যে আমি অবাক হয়ে যাই।
দীপনাথ মৃদু হেসে বলে, ইনফরমেশনের ব্যাপারে তোমার আগ্রহ খুবই কম কিন্তু মেজদা। আজকাল তোমাকে সব ব্যাপারেই খুব কোল্ড বলে মনে হয়। কেন বলো তো!
আমার কথা বাদ দে।
বউদির সঙ্গে কি বনিবনা হচ্ছে না?
কোনওদিনই হত না।
আজকাল বেশির ভাগ সংসারেই স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হচ্ছে না দেখছি।
তাই হবে।
কিন্তু তোমরা তো আজকালকার ছেলেমেয়ে নও। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এতদিনে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।
শ্রীনাথ একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, অনেক ব্যাপার আছে। সবটা তোকে বলা যায় না।
দীপনাথ গম্ভীর হয়ে বলে, আমি শুনতে চাইনি। ওসব শুনে কী হবে? সবসময়েই দু'পক্ষেরই সমান বলার কথা থাকে। কিন্তু কথা এক জিনিস, আর কাজ অন্য।
শ্রীনাথ খুব ঘন ঘন বিড়িতে টান দেয় খানিকক্ষণ। তারপর বলে, আমার দিক থেকে আর কিছু করার নেই।
এটা ভাল নয়, মেজদা। এ বয়সেও যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রী অচেনা লোকের মতো থাকো তবে ছেলেমেয়েরা কী ভাববে? ওরা বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে। মা-বাবার মধ্যে সম্পর্ক ভাল না থাকলে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় না।
তার আমি কী করব? আমার কিছু করার নেই।
বউদির ব্যাপারে তুমি বরফের মতো ঠান্ডা থাকলে কী করে কী হবে! বরং একদিন তোমরা

মুখোমুখি বসে ঠান্ডা মাথায় কথাবার্তা বলো না কেন! বউদি তো অবিবেচক নয়। বরং আমাদের অনেকের চেয়ে বউদির বুদ্ধি বেশি, বড়দার সম্পত্তি উনি খুব ভাল দেখাশোনা করছেন।

হ্যাঁ, ওঁর অনেক গুণ।— বিষ-গলায় বলে শ্রীনাথ।

ওই তো রাগের কথা হল। মানুষের গুণের পাশাপাশি দোষও তো কিছু থাকবেই। তোমারও কি দোষ নেই?

আমারই তো সব দোষ বলে শুনি।— শ্রীনাথ খুবই নিরুত্তাপ গলায় বলে।

এটাও রাগের কথা। শোনো মেজদা, এভাবে বারবাড়ির ঘরে তোমার বনবাস মোটেই ভাল দেখায় না। তার চেয়ে তোমরা একটা আপসরফা করে নাও।

আমাকে আর কিছু করতে বলিস না। আমি পারব না।

কেন পারবে না?

আমার ও ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই।

দীপনাথ একটু চুপ করে ভাবে। ঠিক এই অবস্থায় শ্রীনাথকে আর চাপাচাপি করা উচিত হবে কি না বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, শ্রীনাথ এখন এমন একটা হতাশা ও মানসিক অবসাদে ভুগছে যে তাকে বেশি চাপ দিলে সে খেপে উঠবে।

দীপনাথ মৃদু স্বরে বলে, ঠিক আছে। তুমি না চাইলে কোনও কথা নেই।

শ্রীনাথ আর-একটা বিড়ি ধবাচ্ছে। ধরিয়ে বলল, তুই যেভাবে বলছিস ওভাবে এর সমাধান হয় না। অনেকদিনের অনেক ব্যাপার জমে জমে পাহাড় হয়েছে। এ শুধু কি কথা কয়ে ঠিক করা যায়?

তুমি অত বিড়ি খাচ্ছ কেন? আগে তো খেতে না।

খাই। এমনিই।

অত বিড়ি খেয়ো না।

কী আর হবে।

রেসের মাঠে তোমাকে সেদিন খারাপ লেগেছিল। প্রায়ই যাও নাকি?

যাই। তবে নিয়মিত কিছু নয়। আমার নেশা নেই। তুই যাস কেন?

সাধ করে যাই না। বোস সাহেবের সঙ্গে যেতে হয়েছিল। নইলে রেস-টেস আমি বুঝিই না।

শ্রীনাথ একটা শ্বাস ফেলে, আমার কাছে সব সমান। ভাল বা মন্দ বলে কিছু নেই।

তুমি আজকাল খুব অন্যরকম হয়ে গেছ।

সেটা আমিও টের পাই। কিন্তু কিছু করার নেই।

করার থাকলেও তো তুমি করবে না।

এ কথায় শ্রীনাথ একটু হাসল।

আমি সজলকে নিয়ে একটা কথা ভাবছি, মেজদা।

কী?

আমার চাকরি তো পাকা হল। ভাবছি কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট নেব। সজলকে কলকাতার কোনও ভাল ইংলিশ স্কুলে ভরতি করে দেব। আমার কাছেই থাকবে।

সজল কি যেতে চায়?

খুব চায়। আজই তো আমাকে চুপিচুপি বহুবার বলেছে, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো, বড়কাকা। আমি তোমার কাছে থাকব।

সজল ওরকম একটা কথা আমার কাছেও বলে। ও বোধহয় এ বাড়িতে থাকতে চায় না।

না, চায় না। তোমরা ওর মনের দিকে মোটেই তাকাও না। হি ইজ বিয়িং নেগলেকটেড। আগের বার যখন এসেছিলাম তখন ও আমাকে কিছু অদ্ভুত কথা বলেছিল। তখনই বুঝেছিলাম ও ভেতরে ভেতরে রিভোল্ট করছে।

হতে পারে। আমি অত সব লক্ষ করিনি।

করো না কেন? আমাদের বংশের এখনও পর্যন্ত ওই একটিই সলতে। সজলের দায়িত্ব তোমরা যদি ঠিকমতো নিতে না পারো তবে আমিই নেব। ও আমাকে খুব ভালও বাসে!

নে না। কে বারণ করেছে? ছেলেমেয়েরা আমার কাছে মানুষ হয় না, হয় ওদের মায়ের কাছে। কাজেই ওদের ভালমন্দ তোর বউদির হাতে।

তবু তোমার দায়িত্ব আছে। তুমি বাবা।

শ্রীনাথের বিড়ি নিভে গেছে। সেটার পোড়া মুখটা টিপে ছাই ফেলতে ফেলতে খুব অবাক হয়ে প্রতিধ্বনি করল, আমি বাবা!

দীপনাথ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ছিল শ্রীনাথের দিকে। এই লোকটার জন্য তার দুঃখ হয়, এর ওপর রাগও হয়। কোথায় যেন একটা স্বাভাবিকতার সুর কেটে গেছে শ্রীনাথের জীবনে। বড়দা মল্লিনাথের সঙ্গে মেজো বউদি তৃষার যে অবৈধ সম্পর্কের কথা কানাঘুষায় দীপনাথের কানে গেছে তা যদি সত্যিও হয় তবু তার জন্য শ্রীনাথেরও কি দায়িত্ব নেই! বড়দার খামারবাড়িতে বউদিকে একা ফেলে রাখত কেন দিনের পর দিন? ঘি আর আগুন কাছাকাছি রাখতে নেই, সে কথা কে না জানে! তখন তো অনেকে এমন কথাও বলেছে যে, দাদার সম্পত্তি হাত করার জন্যই শ্রীনাথ বউকে কাজে লাগিয়েছে। এসব নোংরামি এতকাল গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি দীপনাথ। এখন অবস্থা দেখে ভাবতে হচ্ছে।

সে বলল, সজলের ওপর আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে।

বলছি তো, তোর বউদির সঙ্গে বুঝে দেখ। আমি এ সংসারের কেউ নই।

বউদির অমত নেই। তবু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলল।

তবে তো হয়েই গেছে। নিয়ে যাস সজলকে, আমার অমত নেই। তুই কি শিগগিরই বিয়ে-টিয়ে করবি?

হঠাৎ ওকথা কেন?

বিয়ে না করলে সজল থাকবে কার কাছে? তোর তো অফিস আছে, ট্যুর আছে।

লোক রাখব।

দূর পাগলা!— শ্রীনাথ হাসে, বাচ্চাবা কি মাইনে-করা লোকের কাছে ভাল মানুষ হয়?

যাকগে, সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে। এ বছরই তো কিছু হচ্ছে না। নতুন সেসনে ওকে কলকাতার ভাল স্কুলে ভর্তি করব। তার দেরি আছে।

বাবার সঙ্গে দেখা করেছিস?

করেছি। বাবা বলছিল, তুমি নাকি এক বাড়িতে থেকেও তাঁর খোঁজখবর নাও না।

নিই না ঠিক নয়। মাঝে মাঝে নিই। তবে এক বাড়িতেই তো থাকা, ব্যস্ততার কিছু নেই।

আর-একটা কথা, মেজদা।

তুই আজ অনেক কথা বলছিস।

প্রয়োজন হয়েছে বলেই বলছি।

বল। শুনছি।

ঘরের কথা বাইরে লোককে জানানো কি ভাল?

শ্রীনাথ ঠান্ডা বিড়িটার দিকে চেয়ে থাকে। জবাব দেয় না।

দীপনাথ অত্যন্ত ঠান্ডা দৃঢ় স্বরে বলে, এ কাজটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। মনে রেখো, এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের সকলেরই সম্মান জড়িয়ে আছে। বউদির নামে তুমি যদি বাইরে কিছু রটাও সেটা আমাদেরও ছোট করে দেয়, তোমাকেও করে। তুমি সেটা বুঝতে চাও না কেন?

ওসব কথা থাক।— শ্রীনাথ অস্বস্তি বোধ করে বলে।

আজ থাক। কিন্তু পরে যদি শুনি তবে আবার কথাটা তুলব, আর তুমি যদি মনে করো যে, মানসিক দিক দিয়ে তুমি নিজের ওপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছ তা হলে তা জানিয়ো, ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করব।

সুস্পষ্ট এটা ওয়ার্নিং। দীপনাথকে শ্রীনাথ খুব ভাল করে চেনে না। তবে এটা জানে যে, দীপনাথের নৈতিক বোধ খুব প্রবল, সবাই তাকে দাদা মল্লিনাথের মতোই শক্ত-সমর্থ লোক বলে জানে। তবে মল্লিনাথের নীতিবোধে ঘাটতি ছিল, দীপনাথের তা নেই।

শ্রীনাথ বুঝতে পারল না দীপুকে তার ভয় পাওয়া উচিত কি না। বোধহয় উচিত। কেননা গত পাঁচ মিনিট সে দীপনাথের চোখে চোখ রাখা দূরের কথা, তার দিকে চাইতেই পারল না।

দীপনাথ উঠল, আমি একটু নিতাই খ্যাপার খোঁজ করতে যাচ্ছি। যাওয়ার সময় দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

আয়।

দীপু চলে যেতে নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল শ্রীনাথ। ভারী ভয়ের গুড়গুড়ানি উঠেছিল বুকের মধ্যে। ঠিক এই রকম ভয় পেত সে দাদা মল্লিনাথকে।

ডায়েরি বন্ধ করে রাখল শ্রীনাথ। আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। উঠে বহুকাল বাদে সে বিনা প্রয়োজনে ভিতরবাড়ির রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটতে থাকে।

তৃষা নিজের ঘরের বারান্দায় একটা প্লাস পাওয়ারের চশমা চোখে দিয়ে মাদুরে বসে জাবদা খাতায় কী লিখছিল নিচু হয়ে। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদনি নেই, কিন্তু থোকা থোকা জোনাকি জ্বলছে চারদিকে। ঝিঁঝি ডাকছে।

তার সাড়া পেয়ে মুখ তোলে তৃষা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শ্রীনাথ টের পায়, তৃষা আর যুবতী নেই। তৃষা প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছে; বসার ভঙ্গি, চশমা, মুখ তুলে চাওয়া—এসব কিছুর মধ্যে সুস্পষ্টই বয়সের প্রগাঢ়ত্ব এসে গেছে।

তুমি!

একটু এলাম।

বোসো।

শ্রীনাথ মাদুরে বসল। দূরত্ব রেখে।

তৃষা নিজে থেকেই বলে, দীপুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

হুঁ।

ও বড় ভাল ছেলে।

হ্যাঁ।

আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না শ্রীনাথ।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

অন্ধকার উঠোন ভবতি জোনাকি পোকার নীলচে আলো নেচে বেড়াচ্ছে। আলোর তালে ডাকছে ঝিঁঝি পোকা। দুটো-একটা গার্হস্থ্যের শব্দ ছাড়া চারদিকে বড়ই নিঝুম।

বারান্দায় মুখোমুখি বসা পুরুষ ও রমণীটিকে হঠাৎ কারও চোখে পড়লে ভাববে, স্বামী-স্ত্রী ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ততায় পরস্পরের উত্তাপ নিচ্ছে। কত ভুল দৃশ্যই না রচিত হয় এইভাবে।

শ্রীনাথ তৃষার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে অন্ধকার দেখছে। তৃষা নিচু হয়ে তার খাতার পাতা ওলটাচ্ছে। অনেকক্ষণ আর কেউ কোনও কথা বলল না। পরস্পরের গুপ্ত ক্ষত

দুর্বলতা আর পাপের কথা তারা জানে। তাই আহত হওয়ার ভয়ে মুখোমুখি তারা পরস্পর আজকাল কদাচিৎ আক্রমণ করে।

শ্রীনাথ সামান্য তিক্ত গলায় বলে, দীপু আমার ছোট। অনেক ছোট। ওকে আমাদের ঘরসংসারের খবর জানানোটা কি ভাল?

তৃষা খুবই ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, খবরটা জানাল কে? তোমার কি সন্দেহ আমি?

দীপু আজ অনেক কথা কইল। সবটা কানে ভাল ঠেকল না। কেউ নিশ্চয়ই জানিয়েছে।

কী কথা?

তোমার আমার কথা। গরমিলের কথা।

সে তো এ বাড়ির কাকটাও জানে।

দীপু তো এ বাড়ির লোক নয়। সে জানল কেমন করে?

কেউ বলেছে হয়তো।— উদাস গলায় তৃষা বলে, বললেই বা দোষ কী? কে কার পরোয়া করে?

আফটার অল দীপু আমার ছোট ভাই। সে কিছু বললে আমার অপমান হওয়ার কথা।

হওয়ার কথা, কিন্তু হয়েছে কি?

নিশ্চয়ই হয়েছে। নইলে এলাম কেন?

এখনও যে অপমানের বোধ একটু হলেও আছে সেটা ভাল।

আমি ঝগড়া করতে আসিনি।

ঝগড়া কেউ করছে না।

শ্রীনাথ উষ্মা চেপে আবার ঠান্ডা গলায় বলল, তোমার খেলা তুমি খেলবে, আমার খেলা আমি খেলব। এর মধ্যে কোনও সালিশি ডেকে আনা উচিত নয়।

সালিশি কেউ ডাকেনি। তবে খেলার কথা কী বলছ তাও আমি বুঝতে পারলাম না। কিসের খেলা?

তৃষা খেলা বোঝেনি দেখে যেন খুবই অবাক হল শ্রীনাথ। তৃষার দিকে তাকাতেই আবার তার নির্ভুল নজরে পড়ল, তৃষার বয়স। এই সেদিনও ভারী কচি ঢলঢলে চেহারা ছিল তৃষার। এখন হঠাৎ যেন বয়সের ভার নেমেছে চেহারায়। মুখে ভাঁজ পড়েনি, শরীরে খাঁজ পড়েনি, চামড়া ঢিলে হয়নি, তবু কোথাও না কোথাও পুরনো হওয়ার আভাস ধরা পড়ছে চেহারায়।

শ্রীনাথ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তার ছোট বিড়ি ধরাল। বলল, খেলাটা তুমি ঠিকই বোঝো, স্বীকার করো বা না-করো।

তবু তুমিও একটু বুঝিয়ে বলো না, শুনি।

দরকার নেই। বলেছি তো ঝগড়া করতে আসিনি।

ঝগড়া কি আমিই করছি? শুধু জানতে চাইছি মাত্র।

জানানোর মতো রহস্য কিছু যদি থাকত। যাকগে, বলছিলাম দীপুটা এসব না জেনে সুখেই আছে। এসব না জানলে সুখেই থাকবে।

কে কাকে কী জানায় তা আমি কী করে বলব? রেসের মাঠে তো আমি তোমাকে দেখিনি, দীপু দেখেছে। মদের দোকানে বসেছ, সে খবর দিয়ে গেল পাঁচু রিকশাওয়ালা। মিনার হলে একটি মেয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখছিলে তা চোখে পড়েছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর। আমি খবর দিই না, খবর পাই।

খুব শান্তভাবেই কথাটা শুনল শ্রীনাথ। তারপর বলে, খবর আমিও কিছু রাখি, কিন্তু সেগুলো বলতে গেলে চেঁচামেচি হবে, খবর আরও ছড়াবে। ওসব কথা থাক।

কথাগুলো কি বটতলার মিটিং-এর জন্য জমিয়ে রাখছ? লোক জড়ো করে না বললে সুখ নেই?

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, বলার এখনও অনেক বাকি। ঠিকই বলেছ, লোক জড়ো করে না বললে সুখ নেই।

তবে দীপু জানল বলে আর দুঃখ করার কী? তুমিই তো ঢোল সহরত করতে বেরিয়ে পড়েছ।

শ্রীনাথ অন্ধকারের দিকে চেয়ে বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে বলল, দীপুর কথা আলাদা। আমি পাবলিককে যা-ই বলে থাকি দীপুকে বলিনি। তুমি যদি বলতে থাকো তবে আমাকেও লাজ-লজ্জার বালাই ঝেড়ে ফেলে বলতে হবে।

বলো না। বাকি থাকে কেন?

সব বলব?

সব বলতে কী? আর কিছু বাকি আছে নাকি?

আছে। পাবলিককেও আমি সব বলিনি। বলতে বলছ?

তৃষা মুখ তুলে খুব সহজভাবে তাকাল। চোখে বেড়ালের মতো জুলজুলে চাউনি নেই। কিছু ক্লান্তি কি? অন্তত গলায় একটা পরিশ্রান্ত স্বর ফুটল, তুমি কী করতে না-করতে তুমিই জানো। ছেলেপুলেরা ঘরদোর নোংরা করেই, মেয়েরা তা ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দেয়। আমারও সারা জীবন তাই করতে হবে। দুঃখ কিসের?

সব আবর্জনা কি যাবে তাতে?

চেষ্টা তো করতেই হবে।

নোংরা কি তুমিই কিছু কম করেছ এই সংসারকে?

এবার ঝগড়ার কথা কে বলছে শুনি!

শ্রীনাথ সামলে নিল। বাস্তবিক তৃষার সঙ্গে আর ঝগড়া করার কোনও মানেই হয় না। সামলে নিয়ে সে বলল, তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব। দেবে?

চাইবে?— তৃষা অবাক হয়ে বলে, কী চাও বলো।

খুব দূরে কোথাও এক ফালি জমি কিনে চাষবাস করব ভেবেছিলাম। তুমি তাতে বাগড়া দিয়েছ। জমির কোনও খবরই পাচ্ছি না। যদি বাধা না দাও তবে আমি একটু জমি কিনে চাষবাস নিয়ে থাকতে পারি।

আমি বাগড়া দিইনি।

দিয়েছ। শোনো ওসব করে লাভ নেই। আমি ঠিক করেছি, জমি যদি কিনতে নাই পারি তবে অন্তত কলকাতায় একটা মেসে গিয়ে উঠব। সেটা কি আটকাতে পারবে?

আটকাব কেন?

কেন তা আমি কি জানি? হয়তো তোমার কোনও এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমার মতো একটা গিনিপিগ দরকার।

ওসব তোমার নিজের মনের কথা? আমি বাধা দেব না। দিইওনি। তোমাকে নিয়ে আমার কোনও এক্সপেরিমেন্টও করার ইচ্ছে নেই।

আমি দূরে গেলে তোমারই সুবিধে। পাবলিককে ঘরের কথা বলার কেউ থাকবে না।

পাবলিককে নিয়ে তো আমি ভাবছি না। তারা তোমাকেও চেনে, আমাকেও চেনে। আমি ভাবছি তোমার বাবার কথা, তোমার ছেলেমেয়ে এবং সংসারের কথা। তুমি গেলে এদের কে দেখবে?

একটু অবাক হয়ে শ্রীনাথ বলে, এদের এতকাল কি আমি দেখাশুনো করতাম নাকি?

না, এতকাল আমিই করেছি। কিন্তু আমারও তো ক্লান্তি আছে, বয়স আছে। আমি বরং বলি, এতকাল তো আমিই দেখলাম, এবার তুমি দেখো, আমি যাই।

কোথায় যাবে?

এ প্রশ্ন তো তোমাকে আমি করিনি। তবে তুমিই বা করছ কেন? কোথাও যাব।

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, এ সম্পত্তি আমার নয়, তোমার। এখানে এসব আগলে আমি থাকতে যাব কেন?

তৃষা একটা বড় শ্বাস ফেলে বলে, সম্পত্তির সুখ কীরকম তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তুমি যদি চাও তো তোমার নামে লিখে দিতে পারি।

আমার নামে লিখে দেবে কেন? আমি নেবই বা কোন লজ্জায়?

উদাস মুখে তৃষা বলে, সেসব জানি না। সম্পত্তি না নিলে বলার কিছু নেই, কিন্তু সংসারের দায়িত্ব আমি একা নিতে পারব না।

এসব তোমার সাজানো কথা। তুমিও জানো, আমিও জানি, দায়িত্ব আমার কোনওকালে ছিল না, আজও নেই। তুমি আমাকে দায়িত্ব দাওনি, আমিও নিইনি।

এতকালের কথা দিয়ে কী হবে? আমি বলছি এখনকার কথা। এতকাল অন্যরকম ছিল বলে চিরকালই তাই থাকবে নাকি?

শ্রীনাথ বিমর্ষ মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি জানি তৃষা, তুমি আমাকে আটকে রাখতে চাও। যদিও আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই।

এরকমভাবে যারা ভাবে তাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি ওভাবে ভাবি না।

তোমার মনের খবর রাখি না। কিন্তু এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আমি এ বাড়িতে ভারচুয়ালি কয়েদ রয়েছি।

কেউ তোমাকে কয়েদ রাখেনি।

না, দরজায় তালা দিয়ে কয়েদ তো তুমি করোনি। তুমি শুধু আমার বেরিয়ে যাওয়ার পথগুলো আটকে দিয়েছ।

তৃষা হাঁটু তুলে তার ওপর থুঁতনি রেখে কী যেন ভাবল একটু। তারপর বলল, তুমি কলকাতার মেসে থাকবে?

থাকব।

তাতে বাধা কোথায়?

বাধা যে নেই তাও নয়। মেসে আমি বহুকাল থাকতে পারব না। তুমি জেনে গেছ যে, গাছপালা ছাড়া আমি আজকাল থাকতে পারি না। হাতে পায়ে মাটি না লাগালে আমার স্বস্তি নেই। কলকাতায় গেলে আমি ছটফট করে মরব। সেই জন্যই যদি আমি কলকাতার মেসে যেতে চাই তবে তুমি বাধা দেবে না, আমি জানি।

আমি তোমাকে নিয়ে অত খুঁটিয়ে ভাবিনি। মিছিমিছি তুমি আমাকে এক মস্ত শত্রু মনে করে বসে আছো। যদি আমি শত্রু হতাম তবে অনেক কিছু করতে পারতাম।

তাও জানি। তোমার অপার করুণা।

ঠাট্টা কোরো না। এখন আর ওসব ভাল শোনায় না।

শ্রীনাথ বাঁকা হাসি হেসে বলে, শত্রুতার বদলে বরং আমার কিছু উপকারই করতে চেয়েছ। স্টেশনের স্টলে সরিৎকে লেলিয়ে দিয়ে কয়েকটা ছেলেকে মার খাইয়েছ। আমাকে নিয়ে ওরা মশকরা করত সেটা তোমার সহ্য হয়নি।

বড় বড় চোখে চেয়ে তৃষা বলে, তোমার মান-অপমানবোধ নেই জানি। তা বলে তোমার পরিচয়টা তো মুছে যায়নি। তোমার অপমানে এই পরিবারেরও অপমান, সেটা ভুলতে পারিনি। মনে রেখো, এই পরিবারটা কিন্তু আমার বাপের বাড়ির পরিবার নয়, তোমারই পরিবার। আমি সঙ্গে করে আনিনি।

শ্রীনাথ বিষ-হাসি হেসে বলে, সেটা কি আর জানি না? কিন্তু আমি জানলে কী হবে? পাবলিক জানে, এই পরিবার শ্রীনাথ চাটুজ্জের নয়, তৃষা চাটুজ্জের। তুমি সর্বেসর্বা। আমাকে কেন আর নাম-কো-বাস্তে জড়ানো!

তোমার কি কোনও অপমানই আর গায়ে লাগে না?

না। আমার আবার মান-অপমান কী? সংসারকে যদি একটা বড় গাছ বলে ভাবো তবে আমি হচ্ছি সেই গাছের একটা পোকায় খাওয়া বুড়ো পাতা। খসে পড়লে কেউ টেরও পাবে না।

সেটা তোমার মনের দোষ। আমি তোমাকে সংসারেব বাড়তি লোক বলে ভাবি না। তুমি নিজে থেকেই নিজেকে বাড়তি লোক করে তুলেছ। এখানে আসার পর থেকে কখনও তুমি সংসারের সঙ্গে জড়াতে চাইলে না, আলগা-আলগা গা বাঁচিয়ে থাকলে। আমার পাশে এমন একজন পুরুষমানুষ ছিল না যে সব দেখাশোনা করবে। বাধ্য হয়েই আমাকে পুরুষের কাজ করতে হয়েছে।

কাজটা তুমি যে-কোনও পুরুষের চেয়েও ভাল ভাবে করেছ। সবাই বলে, তুমি নাকি এ তল্লাটের সব জমিই প্রায় নামে-বেনামে কিনে নিয়েছ। এমনকী আমার নামেও জমি কেনা হয়েছে, অথচ আমি জানি না।

তুমি যদি সম্পত্তি দেখাশোনা করতে তাহলে বুঝতে পারতে, কত কী করে তবে সব বজায় রাখতে হয়। কতকাল সাজিনি, বেড়াইনি, সিনেমা দেখিনি! সব ছেড়ে শুধু এই ছাইমাটি আগলে যক্ষীবুড়ির মতো বসে আছি। তবু তো তোমাকে খুশি করতে পারিনি।

আমার সুখের অন্ত নেই। যার বউ এত গুণের, তার সুখের অভাব কী?

আবার ঠাট্টা করছ? করো। তোমার দিন পড়েছে।

তাই নাকি? তুমি তাই মনে করো?

করব না কেন? তোমার তো ফুর্তির কোনও ভাঁটা পড়েনি। দেখছি, মুখ বুজে আছি।

শ্রীনাথ একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, তোমাকে আর কেউ না জানলেও আমি জানি তৃষা। আমার কাছে ওসব ভাল সেজো না। তোমাকে মানায় না। তুমিও আমাকে শেষ করার চেষ্টা করছ, আমিও তোমাকে শেষ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমি দুর্বল, তোমার মতো ধূর্তও নই। বুঝতে পারছি আমি হেরে যাব। তোমার সঙ্গে কেউ কখনও পেরে ওঠেনি। তবু লড়াই তো লড়তেই হবে।

তুমি বোধ হয় আজকাল খুব বেশি নেশা-টেশা করছ।

করছি। সেটাও লড়াইয়েরই কৌশল।

এত কথা হচ্ছে খুব স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে। কেউ গলা তুলছে না, চেঁচাচ্ছে না। প্রায় মৃদু প্রেমের কথা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছে বুদবুদের মতো। দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে, দু'জনে আসলে নিজেদের অস্ত্র ও ঢাল নিয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার এক প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছে।

তৃষা মৃদু স্বরে বলে, তোমার লড়াই তুমি করো গে বাতাসের সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার কোনও লড়াই নেই।

নেই? তবে আমার পিছনে কেন তোমার গোয়েন্দারা ঘোরে? কেন গোপনে আমার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি তৈরি হয়? কেন বদ্রীকে ডেকে ভয় দেখানো হয় জমির খবর না দেওয়ার জন্য?

তৃষা একটু থতমত খেয়ে গেল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, সব প্রশ্নেরই সঠিক জবাব আছে। একদিন মাথা ঠান্ডা করে শুনো। সেদিন বুঝতে পারবে, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করতে চাইনি। রামলাখনের ঘরে ফুর্তি করতে যাও বা আর যেখানেই যা করে বেড়াও, আমি বাধা দেব না। দিতে আমার আত্মসম্মানে লাগে। কিন্তু আমার ক্ষতি করতে গিয়ে নিজের নাম ডোবাচ্ছ কেন?

শুধু আমার নাম নয়, সেই সঙ্গে তোমার নামও। কিন্তু মুশকিল কী জানো?

আমি ওসব জানতে চাই না।

তবু জেনে রাখো। এককালে, অর্থাৎ ত্রিশ-চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর আগে মদ খেলে বা মেয়েমানুষের কাছে গেলে নিন্দে হত। লোকে সন্দেহের চোখে দেখত, এড়িয়ে চলত। আজকাল দান উলটে গেছে। এখন বারো আনা ভদ্রলোকই মদ খায়, মেয়েমানুষেও আজকাল আর তেমন দোষ ধরে না কেউ। এই গাঁ-গঞ্জে কিছু লোক এখনও শুনলে একটু চমকে ওঠে বটে, কিন্তু তা নিয়ে

বেশি একটা হই-চই করতে যায় না। যদি করত তবে এতদিনে তোমার বা আমার নামে ঢি ঢি পড়ে যেত। তুমি সেটা জানো বলেই কোনও বাধা দাওনি আমাকে। তোমার বুদ্ধি অনেক বেশি।

তৃষা জবাব দিল না। হাঁটুতে থুতনি রেখে চেয়ে রইল। মুখে কোনও আফসোস নেই, উদ্বেগ নেই। কেবল এক ঠান্ডা হিসেব-নিকেশ রয়েছে।

শ্রীনাথ দাঁড়াল না। সিঁড়ি ভেঙে উঠোনে নেমে এল। একবার ফিরে তৃষার দিকে চাইল। একটু বয়সের ছাপ পড়ল নাকি? বয়স হল বুঝি এতদিনে।

বৃষ্টির পর ভারী ভ্যাপসা গরম পড়েছে। তবু এ জায়গাটা ফাঁকা বলে তেমন খারাপ লাগে না। দীপনাথ খানিকক্ষণ বাবার সঙ্গে কথা বলল বসে বসে। তারপর বেরোল সরিতের সঙ্গে বাজার দেখতে। একটু একটু করে বুঝতে পারছিল বড়দা মল্লিনাথ যা সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল বউদি তার ওপরেই নির্ভর করে নেই। নানা দিকে সম্পত্তি বেড়েছে, আয় বেড়েছে। সবটাই হয়তো আইন মেনে নয়। কিন্তু তবু বেড়েছে তো।

ত্রয়ীর কাউন্টারে রমরমা ভিড়। দোকানের স্টক দেখে তাজ্জব মানে দীপনাথ। কম করেও হাজার পঞ্চাশেক টাকার জিনিস রয়েছে। দিনে অন্তত দু'-তিন হাজার টাকার বিক্রি।

ফেরার সময় সে একটা শ্বাস ফেলে বলল, না হে, বউদি জানে। কীভাবে ব্যাবসা করতে হয় তা ওই বউদির মতো অনেক পুরুষেরও জানা নেই।

এককথায় সরিৎ খুব খুশি হয়। মেজদিকে তারও বড় ভক্তি। সে বলল, দিদি রুখে না দাঁড়ালে মল্লিদার সম্পত্তি ভূতে খেত।

তুমি কি হাসকিং মিল দেখছ?

না, সবই দেখতে হয়। তবে মেইনলি হাসকিং মিলটা।

বউদির জমি কত বলো তো?

তা কম নয়। সব তো নামে নেই।

জানি। পুলিস বা সরকার থেকে ঝামেলা হয় না?

বন্দোবস্ত আছে।

এখানকার লোকেরা কেমন?

ভাল নয় খুব একটা। আগে নানা রকম গোলমাল করেছে। তবে এখন মেজদিকে সবাই সমঝে চলে।

ভয় পায়?

পায়। সমীহ করে আর কী।

দীপনাথ মৃদু হেসে বলল, মেজদাকে আমি ভালই জানি। মেজদা এত সব করতে পারত না।

সরিৎ সতর্ক গলায় বলে, জামাইবাবু একটু অন্য রকম হয়ে গেছেন।

কী রকম বলো তো?

অন্য রকম। খুব স্বাভাবিক নয়।

সেটাও বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন?

কে বলবে?

দীপনাথ মৃদু স্বরে বলে, মেজদা কিন্তু মানুষ খারাপ ছিল না কোনওদিন।

সে আমি জানি। বিয়ে হওয়ার পর প্রথম-প্রথম দেখেছি তো। দারুণ লোক। কিন্তু এখন কেমন ম্যাস্তামারা হয়ে গেছেন।

তোমরা মেজদার ওপর নজর রাখো। মানুষটার কোথাও একটা গভীর ক্ষত আছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সেটা কেন। কিন্তু আছে।

উনি তো কাউকে বলবেন না। কী করে আমরাই বা জানব বলুন?

তোমাদের কথা নয়।— দীপনাথ গম্ভীর হয়ে বলে, এ কাজ করতে পারে একমাত্র বউদি।

দিদির সঙ্গে উনি কথাই বলেন না।

একটু বিরক্ত হয়ে দীপনাথ বলে, তাও জানি। কিন্তু বুঝি না। যাকগে, বউদির সঙ্গেই কথা বলে দেখব।

আমরা চাই জামাইবাবু আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠুন। উনি কিন্তু তা হচ্ছেন না। এ জায়গার লোকেদের কাছে উনি মেজদির নামে যা-তা বলে বেড়াচ্ছেন।

তাই নাকি?— বলে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দীপনাথ। কী রকম?

এই তো সেদিন কলকাতা থেকে আমি আর মেজদি ফিরছি। দেখি বটতলায় লোক জড়ো করে যা-তা বলছেন। মেজদি আমাকে বলল, যা গিয়ে চুপি চুপি শুনে আয় কী বলছে।

তুমি শুনলে?

শোনা যায় না, শোনা উচিতও নয়। মেজদির হুকুমে শুনতে হল, কিন্তু সে মুখে আনতে পারব না।

দীপনাথ খুবই বিষণ্ণ বোধ করে। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে সে অনেকক্ষণ ধরে ভাবে। শ্রীনাথ এরকম নয়। তাদের বংশে ইতরামো বড় একটা কারও মধ্যে নেই। তবে মেজদার এটা হল কী?

দীপনাথ অনেকক্ষণ বাদে বলল, তোমার জামাইবাবুকে তোমরা কী চোখে দেখো সরিৎ?

আমরা জামাইবাবুকে নিয়ে আর ভাবি না। ভেবে লাভ নেই।

কিন্তু একটা মানুষ কেন এরকম পাগলের মতো কাজ করছে তা ভেবে দেখবে না?

আমাকে জামাইবাবু পছন্দ করেন না। আমার নামেও লোককে যা-তা বলেন। আমি তাই বেশি কাছে ঘেঁষি না।

দীপনাথ আর কিছু বলল না। বাড়ি পৌঁছে চুপচাপ হাত-মুখ ধুল। তারপর খেতে বসে অন্যমনস্কভাবে টুকটাক কিছু কথাবার্তা বলল। খাওয়ার ঘরে শ্রীনাথ নেই। পাশাপাশি সরিৎ, সে আর সজল।

নিজের শোবার ঘর তাকে ছেড়ে দিয়ে তৃষা শোবে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। বালিশ বিছানা ঠিক করতে যখন এল তখনই দীপনাথ বলল, বউদি, মেজদা কেমন আছে বলো তো?

দেখছই তো ভাই।

তবু তোমার মুখে শুনি।

তোমার মেজদা ভাল নেই।

কেন ভাল নেই? শরীর খারাপ?

শরীরের খবর তো জানি না।

কেন জানো না?

তৃষা বড় বড় চোখে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, উনি জানতে দিচ্ছেন কই?

যদি হুট করে মেজদা আজ নিজের ঘরে গলায় দড়ি দেয় তাহলে?

কী যা-তা বলছ?

একটা শ্বাস ফেলে দীপনাথ বলে, মেজদার মনের ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে বউদি। তোমার সাবধান হওয়া উচিত।

॥ আটত্রিশ ॥

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ বসে থাকে। বাইরে রাতের নিস্তব্ধতায় নানা গ্রামীণ শব্দ। দূরে মেঘ ডাকল। বৃষ্টি হবে।

তৃষা দীপনাথের দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে সে-ই প্রথম বলল, কেউ যদি মরতে চায় তাহলে কী করে ঠেকাব বলো?

দীপনাথ বিরক্ত ছিল। গলার স্বরে একটু রূঢ়তা চলে এল। সে বলল, ওটা কথা নয় বউদি, ওটা কথার চালাকি। তোমার কাছ থেকে এ ধরনের কথা আনএক্সপেকটেড। যে বুক দিয়ে আগলে অসীম মমতায় বড়দার সম্পত্তি আগলাচ্ছে, কারবার বাড়াচ্ছে, এত দায়-দায়িত্ব পালছে, সে কেন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কথা বলবে?

কথার রূঢ়তা তৃষার দুই গালে চড় কষায়। ভীষণ অপমান বোধ করে সে। পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ এ ধরনের কথা বললে সে সহ্য করত না। কিন্তু এ যে দীপনাথ। এই একজন মানুষ যার সামনে তার হৃদয় দ্রব হয়, গাঢ় হয়। দীপনাথের প্রতি তার এক অন্ধ স্নেহ।

তৃষা বড় শ্বাস ফেলে বলল, তুমি বোধ হয় ভাবছ, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মেতে আছি বলেই তোমার দাদাকে দেখার সময় পাই না!

ঠিক তা বলছি না।

তাই বলছ গো।

বলে তৃষা ম্লান হাসল। আজকাল তার মনে কোনও আবেগ ওঠে না, বিরহ জাগে না, প্রেম নেই। আছে কঠিন সব সমস্যার সমাধান, হিসেব-নিকেশ, দেনা-পাওনা। কিন্তু আজ হঠাৎ একটু দুলছে মনটা। সে দীপনাথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে, কথাটা মিথ্যেও তো নয়। বহুকাল তোমার মেজদার শরীরের খবর আমি জানি না। ওর অবশ্য এমনিতে অসুখ-বিসুখ কিছু নেই। কিছু হলে বলবেও না।

মেজদার বয়স চল্লিশের কোঠায় পড়ল না!

হবে বোধ হয়।

এইবেলা চেকআপগুলো করিয়ে নাও না কেন?

তোমাকে একটা কথা বলব?

বলো।

এসেছই যখন দয়া করে এখন ওগুলোর ভার তুমিই নাও না!

আমি তো কাল সকালেই কেটে পড়ব।

আর-একটা দিন থাকো। ডাক্তার আনানোর ব্যবস্থা আমিই করাব। তুমি শুধু তোমার দাদাকে রাজি করাবে।

দীপনাথ একটু চিন্তা করে বলে, অফিসের বুড়ি একবার ছুঁয়ে আসতেই হবে। তারপর যদি হয়--

তাই হবে। এখান থেকে অনেকে কলকাতায় অফিস করে। তুমিও পারবে।

এখানে কি ভাল ডাক্তার আছে?

আছে, তবু আমি এখানকার ডাক্তার ডাকব না। সরিৎ কাল সকালে গিয়ে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসবে।

তাতে অনেক খরচ। তার চেয়ে মেজদাকে নিয়ে গেলেই তো হয়। মেজদা তো আর শয্যাশায়ী রুগি নয়!

ও কি যেতে চাইবে ডাক্তারের কাছে?

দীপনাথ হেসে ফেলল। বলল, আজ তোমার বুদ্ধি একদম খেলছে না, খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ।

কেন? কী বললাম?

মেজদা যদি কলকাতায় ডাক্তারের কাছে যেতে না চায়, তা হলে বাড়িতেও যে ডাক্তার দেখাবে তার গ্যারান্টি কী?

তবু বাড়িতে তো তুমি থাকবে!

আমিই না হয় কলকাতায় নিয়ে যাব। তাহলে তো হবে?

তৃষা লজ্জায় চোখ নামিয়ে বলল, হবে, কিন্তু তাহলে তো তুমি আর-একটা দিন এখানে থাকবে না!

শুধু আমাকে এখানে একদিন আটকে রাখার জন্য এত টাকা খরচ করবে! তুমি পাগল হলে নাকি বউদি?

রাগ করলে না তো!

না। তবে আমি গরিব ঘরের ছেলে, বাজে খরচা একদম পছন্দ করি না। বলছি তো থাকব।

তৃষা ভারী লজ্জা পেয়েছে। নিজের মনের কোনও দুর্বলতা ধরা পড়লে সে ভীষণ লজ্জা পায়। স্বভাবে এক দুর্মদ অহংকার আর তেজ আছে তার। কোথাও সে মাথা নোয়ায় না। এই একটা লোকের সামনে তার সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।

ধরা পড়ে তৃষা দুই চোখে মিটমিট করে চেয়ে দীপনাথের মুখে কৌতুকের হাসিটা দেখে নিয়ে বলল, শোনো দীপু, সংসারে বোধ হয় আমার আপন মানুষ একজনও নেই যাকে নিজের কথা বলি। আমার মতো এমন একা দু'টি নেই। এমনকী আমার পেটের ছেলেমেয়েরাও আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে।

তুমি এরকম ভয়ংকরী তো আগে ছিলে না।

আজকাল হয়েছি। ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে পাকিয়ে কোনওদিন যে মেয়েমানুষ ছিলাম তা ভুলতে বসেছি। অথচ পুরুষমানুষও তো নই। আজকাল তাই মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, আপনজন কেউ না থাকলে বেঁচে থাকাটা কি বড্ড আলুনি নয়?

তোমার মুখে একদম মানাচ্ছে না কথাটা বউদি। তুমি কি জানো, আড়ালে, তোমাকে কেউ কেউ দেবী চৌধুরানি বলে ডাকে?

জানব না আবার!— বলে একটু হাসে তৃষা।— শোনো দীপু, তোমার দাদা নয়, হয়তো একদিন শুনবে, আমিই সিলিং থেকে দড়িতে ঝুলে পড়েছি।

ইয়ারকি মেরো না।

ইয়ারকি বুঝি? বিশ্বাস হচ্ছে না?

তুমি মরবে কেন?

কেউ ভালবাসে না বলে।— তৃষা দুষ্টুমির হাসি হাসল।

দীপনাথ একটু গম্ভীর হয়ে বলে, মেজদার কথা কেন বললাম জানো? মেজদার চেহারাটার ওপর যেন একটা ছায়া পড়েছে। কিসের ছায়া কে জানে! তবে দেখলে খুব ভাল ঠেকে না। আজকাল কি মেজদা খুব ড্রিংক করে?

তা করে বোধ হয়। কিন্তু তার জন্য নয়। ড্রিংক অনেকেই করে।

তা হলে আর কী করে বলো তো?

কিছু করে না। কিংবা কী করে তা জানায় না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীষণ একটা রাগ আর অভিমানে ফেটে পড়ছে সবসময়।

তবু তুমি কিছু উপায় বের করতে পারছ না?

তাই তো তোমাকে ধরেছি। তুমি একটা কিছু উপায় করো, হয়তো তোমার কথা শুনবে।

ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু তোমাদের ভিতরকার জটিলতাকে সরল করব কী করে? কাজটা তো সহজ নয়।

আমাদের জটিলতা যেমন আছে থাক। এ জন্মে ওর সঙ্গে আমার বোধ হয় আর মিলমিশ হবে না। কিন্তু ও লোকটা তো বাঁচুক। নিজের মনে মাথা খুঁড়ে মরছে, এটা তো ভাল নয়।

দাদার সম্পত্তি নিয়ে কোনও গন্ডগোল নয় তো?

না, তা কেন? তোমার মেজদা সম্পত্তির পরোয়াই করে না। এর সমস্যা অন্য। হয়তো সবটার জন্যই আমি দায়ী নই।

তোমাকে দায়ী করছে কে?

একটা শ্বাস ফেলে তৃষা বলে, তুমিই করছ গো। আর একমাত্র তোমাকেই আমি ভয় পাই।

দীননাথের এ কথায় হাসা উচিত ছিল, কিন্তু হাসি এল না। সে বলল, ভয় পাও বউদি? আমাকে ভয় পাও? আমাকে ভয় পাওয়ার কী আছে?

কী আছে তা কী করে বলব? ঠিক এরকম আর-একজনকে ভয় পেতাম। সে কে জানো? ভাসুরঠাকুর।

দীপনাথের ভ্রু কুঞ্চিত হল। একটু সময় নিয়ে সে বলল, বড়দাকে তুমি খুব শ্রদ্ধা করতে? না বউদি?

গাঢ়স্বরে তৃষা বলল, করতাম। ওরকম মানুষকে কে না করে বলো?

তোমাকেও বড়দা খুব ভালবাসত নিশ্চয়ই। নইলে সব তোমাকেই লিখে দিয়ে যেত না।

তৃষা দৃষ্টি নত রেখে বলল, বোধ হয়। কিন্তু সে কথা থাক।

দীপনাথ অস্বস্তির সঙ্গে মৃদু স্বরে বলল, অনেকে অনেক কুকথা বলে। আমি সেগুলো বিশ্বাস করি না। তোমরা যখন বড়দাদার বাড়িতে এসেছ, তখন আমি ছিলাম সেই শিলিগুড়িতে। কী হয়েছিল তা সঠিক জানি না। কী হয়েছিল বউদি?

প্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলতে তৃষার আটকায় না। কিন্তু আজ রাতে এই প্রিয় দেওরটির সামনে যখন দ্রবীভূত মন নিয়ে সে বসে আছে তখন মিথ্যে কথা বলতে জিভে আটকাল তার। মল্লিনাথকে নিয়ে আজ অবশ্য তার লজ্জারও বোধ হয় কিছু নেই। দশজনের সামনে ইচ্ছে করলে সে চেঁচিয়েও বলতে পারে।

তৃষা মৃদু স্বরে বলল, সংসারটা তো জঙ্গল। বাইরে মানুষ পোশাক পরে থাকে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বেশির ভাগই তো জানোয়ার। কেউ কারও ভাল দেখতে চায় না, তাই কলঙ্ক রটায়। রটানোর রসদও ছিল। আমি তখন যুবতী, ভাসুরঠাকুরেরও এমন কিছু বয়স হয়নি... আর কি কিছু বলতে হবে?

তৃষা মিথ্যে কথা বলল না, সত্যও নয়। ঠেকা দিল মাত্র।

কুণ্ঠিত দীপনাথ বলল, থাক থাক। তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি ওসব জানি। তুমি কিছু মনে কোরো না বউদি।

আমার মনই নেই, তাই মনে করা-টরা আসে না। আগে আগে রাগ হত, দুঃখ হত। আজকাল কিছু হয় না।

আমাকে ভয় পাও কেন তা কিন্তু বলোনি।

সব কি বলতে হয়?

আহা, এ তো গোপন কিছু নয়।

যদি বলি তবে তুমি আমার ভয় ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি চাই, ভয়টা থাক। পৃথিবীতে অন্তত আমার একজনও ভয়ের লোক থাক।

দীপনাথ একটু যেন বিরক্ত হল। বলল, বলছ বটে, কিন্তু ভয়ের কোনও লক্ষণ তো কখনও দেখিনি।

তৃষা বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, দেখোনি?

কোথায় আর দেখলাম।

দেখার চোখ থাকলে তো দেখবে।

তা হলে তোমার চোখ দিয়েই না হয় দেখাও।

এই যে সন্ধেবেলা তোমার হুকুমে রঙিন শাড়ি পরে এলাম এ কাজ আর কেউ আমাকে দিয়ে করাতে পারত?

দীপনাথ নিঃশব্দে কিন্তু মুখ ভরে সরল হাসি হাসল। বলল, তা হলে শাড়িটা কাউকে আবার দিয়ে-টিয়ে দিয়ো না। মাঝে মাঝে প'রো। ভয়েই প'রো না হয়।

তৃষা গাঢ় স্বরে বলে, তুমি যখন আমাকে খুকি সাজাতে চাও তখন না হয় সাজবই।

পরবে তো?

পরব বাবা, বলছি তো।

বৃষ্টি নামল বাইরে। গাছের পাতায় জলের ফোঁটা পড়ার সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর শব্দ বহুকাল বাদে শুনল দীপনাথ। গাছগাছালির ভিতর দিয়ে বাতাস বইছে। ব্যাং ডাকছিল অনেকক্ষণ ধরে। এখন বৃষ্টির সঙ্গে সেই ডাক মিশে যেন মুহূর্তের মধ্যে ফিরিয়ে আনল শিলিগুড়ির শৈশবকে।

বউদি, কী অদ্ভুত!

কী অদ্ভুত?

তোমাদের এই জায়গাটা!

তোমার পছন্দ?

খুব পছন্দ। বড়দা একটা সুন্দর জায়গা বেছে বের করেছিল তো!

মুখ টিপে হেসে তৃষা বলে, খুব সুন্দর নয় গো। থাকলে টের পাবে। থাকবে এখানে?

বললাম তো থাকব। কালকের দিনটা।

না রে বোকা, সে কথা বলিনি। বলছি এখানেই থাকো না কেন? কোনও অসুবিধে হবে না। মেসে বোর্ডিং-এ থাকো, আমার ভাল লাগে না।

দূর। তাই হয় নাকি?

কেন হয় না দীপু? যে মানুষটা এ বাড়িতে থাকলে আমি সবচেয়ে খুশি হই সেই কেন আসতে চায় না বলো তো!

দীপনাথের মুখে কথা আসছিল না। তবে মেজো বউদি যে তাকে খুব ভালবাসে এটা সে বহুদিন ধরে জানে। তবু সে একটু নিষ্ঠুর হল। আস্তে করে বলল, কী জানো বউদি, সেটা ভাল দেখাবে না। বড়দা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তোমাকে এই সব বাড়িঘর সম্পত্তি দিয়ে গেছে। যদি আমি বা বুলু এসে থানা গাড়ি তা হলে লোকে বলবে, সম্পত্তির লোভে এসে জুটেছি।

তুমিও ওকথা বললে দীপু?

একটু ভেবে দেখো বউদি, খারাপ কথা কিছু বলিনি। আজ বাবাও আমাকে ওরকম একটা কিছু বলছিল, আমি কান দিইনি।

বাবা তাঁর কথা বলেছেন, আমি আমার কথা বলছি। আমার নিকটজন কেউ নেই দীপু, সমান সমান কেউ নেই, বন্ধু নেই।

নেই? বলো কী? তবে মঞ্জু স্বপ্না সজল সরিৎ এরা কারা?

ওরা ওরাই। তুমি তো ওদের মতো নও। ওরা আমাকে ভয় পায়, ওরা কেউ আমার সমান সমান নয়, বন্ধু নয়। সম্পর্কটা কেমন জানো? যেন ওরা সবাই আমার অধীন, আর আমি ওদের ওপরওয়ালা।

আমি কি তোমার সমান সমান?

না দীপু, তুমি তার চেয়ে কিছু বেশি। পৃথিবীতে কারও যদি আমার ওপরওয়ালা হওয়ার ক্ষমতা থেকে থাকে তবে সে একমাত্র তুমি।

যাঃ, কী যে সব বলছ আজ বউদি! তোমার মাথাটা আজ বড্ড গোলমাল করছে দেখছি। একটু বায়ু দমনের ওষুধ খাওগে যাও।

ইয়ারকি নয় দীপু। তুমি আমার সমস্যাটা ধরতেই পারছ না।

ধরার মতো লিড দিচ্ছ কই? এমন সব কথা বলছ যা নাটক-নভেলে থাকে।

বোকা কোথাকার! তুমি মেয়েমানুষদের একদম চেনো না।

খুব চিনি।

ছাই চেনো। একমাত্র বসের ওই কালো বউটিকে চিনলেই কি আর সবাইকে চেনা যায়?

বউদি! ফের ইয়ারকি?

কালো বললাম বলে রাগ নাকি?

আঃ, তোমার সঙ্গে পারা যায় না।

ভয় নেই গো, আমি মণিদীপার চ্যাপ্টার খুলে বসব না। ওর নাম শুনলেই তোমার যা মুখের অবস্থা হয়!

দীপনাথ নিজের করতলের দিকে চেয়ে থাকে। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। মনের মধ্যে কেবল আনন্দে-বিষাদে মেশা আলোছায়ার চক্কর।

তুমি আমাকে সন্দেহ করো বউদি?

তৃষা স্মিতমুখে বলে, করি। কিন্তু ভয় পাই বলে অতটা বলতে ভরসা হয়নি। আজ বললাম। তবে আবার বলছি, তোমার মনের কথা জানি না এখনও। কিন্তু আমার মেয়েমানুষের চোখ ভুল দেখেনি, তোমার বসের কচি বউটার মাথা কিন্তু তুমিই চিবিয়ে খেয়েছ। ও তোমাকে অন্ধের মতো ভালবাসে।

বাসলেই বা কী লাভ?— উদাস অবহেলায় বলে দীপনাথ।

তাই দেখছি। তোমাকে যারা ভালবাসে তাদের কোনও লাভ নেই। তুমি সকলের প্রতি সমান নিষ্ঠুর।

উঃ, আজ তুমি মাথা ধরিয়ে দিলে বউদি। যা ডায়ালগ দিচ্ছ।

তৃষা মৃদু হেসে বলে, তুমি তো জানো না, আমি পাঁচ জনের সঙ্গে কত কম কথা বলি। লোকে যদি শোনে যে, আমি কথা বলে বলে তোমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি, তা হলে বিশ্বাস করবে না। সবাই বলে, আমি নাকি ভীষণ গম্ভীর।

কী একটা বলছিলে যেন!

বলছিলাম, মেয়েমানুষকে তুমি ছাই জানো।

না জানলেই বা কী এমন ক্ষতি!

তোমার ক্ষতি নয়। ক্ষতি আমার।

তোমারই বা কেমন ক্ষতি!

বললে তো বলবে নাটকের ডায়ালগ দিচ্ছি।

আচ্ছা, বলব না।

মাথা ধরবে না?

না। ঘাট মানছি, বলো।

তুমি কি মানো যে, আমার বাইরেটা যতই রুক্ষ হোক, আমি আসলে একজন মেয়েমানুষ?

তাই তো জানতাম। অত ঘটা করে মানবার কী আছে! তুমি মেয়েমানুষ না হলে পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হল কী করে?

তৃষা হেসে বলে, লোকে অবশ্য তোমার দাদাকেই মেয়েমানুষ বলে, আমাকে পুরুষ।

কথা ঘোরাচ্ছ। পয়েন্ট থেকে সরে যাচ্ছ।

খুব ঘুম পায়নি তো?

না। তবে রাত অনেক হল, এক কাপ চা হলে—

করছি। এ ঘরে চায়ের ব্যবস্থা সব সময়েই থাকে।

তৃষা উঠে কেরোসিনের স্টোভে চা বসিয়ে এসে বলল, তুমি ঠিক বুঝবে না। তবু বলি, আমার মাঝে মাঝে মাথাটা কেমন হয়ে যায় আজকাল। বুদ্ধি বিবেচনা গুলিয়ে যায়। তখন মনে হয়, আমাকে চালানোর মতো কেউ থাকলে বড় ভাল হত।

তোমার চালক তো মেজদা।

আইনে তা-ই বলে, কিন্তু কাজে নয়। ওর কথা থাক। আমার কথা বলি। আমি কারও প্রভুত্ব মেনে নিতে পছন্দ করি না। আমি অন্যের ওপর ছড়ি ঘোরাতে ভালবাসি। আমি ক্ষমতা ব্যবহার করতে ভালবাসি। এগুলো সবাই জানে, আমিও অস্বীকার করি না। আমি অহংকারী, একটু রাগী, হয়তো একটু নিষ্ঠুরও। কিন্তু আমার ভিতরে যে মেয়েমানুষের মনটা আছে সে এখন কারও প্রভুত্ব মেনে নিতে চায়। চালানোর লোক চায়। একজন বিশেষ কারও হুকুম মেনে চলতে চায়। তুমি কি জানো দীপু, মেয়েরা যে যত বড়ই হোক প্রত্যেকের ভিতরে এই মজ্জাগত আকাঙ্ক্ষা থাকে? জানো না তো? তা হলে আমার কাছ থেকে শোনো। স্বামী বা প্রেমিক, ছেলে বা ভাই, কোনও একজন না একজন পুরুষের কর্তৃত্ব সব মেয়েই জীবনের কোনও না কোনও সময়ে স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। নইলে তার মন ছটফট করে, ভিতরটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে ভরে থাকে।

দীপনাথ খুব অবাক হয়ে চেয়ে ছিল তৃষার দিকে। মুখে একটু অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। বলল, মাইরি মেজো বউদি, তুমি তো দারুণ কথা বলতে পারো। কী সুন্দর সাজিয়ে বললে! আমি তো ভেবেছিলাম গাঁয়ে থেকে তুমি গাঁইয়া-মাজারি হয়ে গেছ!

তৃষা আবার লজ্জা পেল। উঠে গিয়ে চায়ের জল নামিয়ে পাতা ছেড়ে এসে ফের বসল। বলল, কথা কি মুখে এমনি আসে? আসে জ্বালায়!

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, তোমার কথা মানছি। মেয়েরা না হয় প্রভুই চায়, কিন্তু আমি মনে করি তাদের প্রভু হবে তাদের স্বামীরাই। মেজদাকে তুমি একটু কষ্ট করে প্রভুত্বটা দিয়ে দাও।

আবার তোমাকে হাঁদা গঙ্গারাম বলতে ইচ্ছে করে।

বলো না, শুনতে খারাপ লাগছে না।

ফাজিল হয়েছ। শোনো দীপু, মেয়েদের সকলেরই একজন প্রভু থাকেন, সবসময়ে সে তো স্বামীই হয় না। স্বামীদের সকলের কি সেই সিমপ্যাথি বা পার্সোনালিটি থাকে! ওসব ছেলেমানুষি কথা বলছ কেন? তোমার মেজদার এমন কিছু নেই যে, আমার ওপর প্রভুত্ব করতে পারেন।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, এটা যদি বিয়ের আগে ডিসাইড করতে বউদি, তা হলে কত ভাল হত! যার প্রভু হওয়ার যোগ্যতা নেই তাকে বিয়ে করতে গেলে কেন?

তখন কি জানতাম!

জানা উচিত ছিল।— ভ্রু কুঁচকে দীপনাথ বলে।

সবাই কি জানে! জিজ্ঞেস কোরো তো মণিদীপাকে, সেও জানে কি না। জিজ্ঞেস কোরো তো, তার প্রভু কে!

তৃষা চা করে নিয়ে আসে। এক কাপ দীপনাথকে দেয়, এক কাপ নিজে নিয়ে বসে। বলে, আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি কতটুকু। জীবনের এত বিষ তো তখনও পান করিনি।

রবিঠাকুর ছাড়ছ যে!— বলে দীপনাথ একটু হাসে। কিন্তু হাসিটা ফুটল না। বলল, আমাকে দিয়ে কি তোমার সেই সুপারম্যানের কাজ হবে বউদি?

জানি না। শুধু বলি, ভাসুরঠাকুরের পর একমাত্র তোমাকেই আমার বন্ধুর মতো মনে হয়। নিজের ভাই বা বাপের বাড়ির কাউকেই আমি এত স্নেহ বা শ্রদ্ধা করি না। সামনাসামনি বলছি,

খারাপ লাগছে। দীপু, তোমাকে আমার খুব দরকার। পরামর্শ করার, দুঃখের কথা বলার, সঙ্গ করাব মতো তো কেউ নেই আমার।

দীপনাথ চা খেতে খেতে বাইরে বৃষ্টির গভীর শব্দ শুনতে থাকে। ভ্রু কোঁচকানো। ভাবছে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, কেউ যদি আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনে বউদি, তা হলে ভাববে আমরা দেওরে-বউদিতে অবৈধ প্রেম করছি।

তৃষা ম্লান হাসল, আর প্রেমে কাজ নেই গো। অনেক হয়েছে। আর লোকের ভাবনা নিয়ে ভাবতে পারি না। থাকবে এখানে দীপু? যদি থাকো, আমি সব সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দেব।

চায়ের কাপটা শেষ করে মেঝেতে নামিয়ে রেখে দীপনাথ বলে, তুমি আমাকে কী ভাবো বলো তো! ওসব বোলো না, শুনতে ভাল লাগে না।

তোমার লোভ নেই কেন দীপু?

কে বলল নেই? তবে আমি সহজ পন্থায় বিশ্বাসী নই।

তোমাকে কিন্তু লোভ দেখাইনি। বিশ্বাস করো, এত কষ্টে আমি যা করেছি সব এখন ছাই বলে মনে হয়। অথচ কষ্ট তো করেছি। এগুলো তো যাকে-তাকে বিলিয়ে দিতে পারি না।

দীপনাথ হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, তোমার অফারটা খুব ভাল। সেজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমারও এসব ভাল লাগে না বউদি। আমার এই পরিবেশ, এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, এত নোংরা আর প্যাঁচের জগৎটাকেই পছন্দ হয় না। আমি কি ভাবি জানো? একদিন এক মস্ত বরফে ঢাকা পাহাড় আমাকে ডাকবে। সেদিন আমি সব ছেড়েছুড়ে রওনা হয়ে যাব, আর কোনওদিন ফিরব না।

ও কী অলক্ষুনে কথা! যাঃ।

সত্যি। বিশ্বাস করো। একটা পাহাড় আমাকে ডাকে। ভীষণ ডাকে। সেই মস্ত উঁচু, আকাশছোঁয়া মহাপর্বতের কথা ভাবলে আমি সব ভুলে যাই।

তৃষা আস্তে হেসে ওঠে, পাগলা কোথাকার! যদি পাহাড়েই যাবে তবে মণিদীপার হবে কী? সে যে কেঁদে মরে যাবে।

বউদি, ফের?— বলে কটমট করে তাকানোর একটা অক্ষম চেষ্টা করে দীপনাথ।

ঘাট হয়েছে। আর হবে না।

অনেকবার ওকথা বলেছ, কিন্তু তোমার সত্যিকারের রিপেনটেনস এসেছে বলে মনে হয় না। ফের বললে কিন্তু—

আচ্ছা, এবার দেখো।

টেবিলের ওপর অ্যালার্ম ক্লকটায় সময় দেখে তৃষা চমকে উঠে বলল, ওমা! রাত একটা বাজে। সত্যিই তো, লোকে সন্দেহ করলে বলার কিছু নেই। এবার আমি যাই দীপু, তুমি দরজা দিয়ে শোও।

বৃষ্টিতে যাবে? ছাতা?

আছে গো, আছে।—বলে তৃষা আলমারির পিছন থেকে ছাতা বের করে তড়িৎ পায়ে দরজা খুলে চলে গেল।

দরজার ছিটকিনি আর বাটাম দিয়ে দীপনাথ এসে বিছানায় বসে। এ জায়গায় একদম মশার উৎপাত নেই। কেন নেই তা কিছুক্ষণ ভাবল দীপনাথ। থাকারই তো কথা! বোধহয় বউদি ওষুধ ছড়িয়ে চারদিককার মশা নিকেশ করেছে! বউদি ওরকমই, যা করবে তাতে খুঁত রাখবে না।

অনেকক্ষণ ভারী আনমনে বসে রইল দীপ। অনেক কথা ভাবল। সে একটা জিনিস টের পায় আজকাল। সেটা হল, মানুষকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করার এক দুর্লভ ক্ষমতা আছে তার।

বউদি বিছানার চাদর, মাথার তোয়ালে পালটে দিয়ে গেছে। তবু এই বিছানায় প্রগাঢ় মেয়েমানুষি কিছু সুগন্ধ রয়ে গেছে এখনও। এত ভাল বিছানায় দীর্ঘকাল শোয়নি দীপনাথ। সহজে তাই ঘুম আসে না।

পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে সে জিজ্ঞেস করে, মণিদীপার প্রভু কে? বিলুর প্রভু কে? বীথির প্রভু কে? দুর দূর, বউদিটা যে কী সব বলে গেল!

গভীর এক বৃষ্টি ঝেঁপে এল চারদিক। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। উঠোনে অনেক জল দাঁড়িয়ে গেছে। এমন সুন্দর জলে জল পড়ার নিবিড় শব্দ বহুকাল শোনেনি যেন দীপনাথ। সে ঘুমিয়ে পড়ে।

অমনি দেখে একটা মস্ত আস্ত কাচের ওপাশে মণিদীপা। কাচে গাল ঠেকিয়ে কোনাচে চোখে দেখছে তাকে।

কিছু বলছেন?

মণিদীপা কিছু বলে। ঠোঁট নড়ে কিন্তু শব্দ আসে না।

মণিদীপা, আপনি কেন আমাকে ভালবাসেন? ঠিক নয়, মণিদীপা, ঠিক নয়। আপনি বোস সাহেবকে ভালবাসুন। ভালবেসে দেখুন, ঠকবেন না।

মণিদীপার চোখে অসহ্য অভিমান। ঠোঁট কাঁপে। কিন্তু শব্দ আসে না।

দীপনাথ কাচের গায়ে আঙুল ছোঁয়ায়। মণিদীপা, আমাদের এরকম করাটা উচিত নয়। আমি আপনার ভাল চাই।

মণিদীপা কী বলছে? শুনতে পায় না দীপ। কিন্তু দেখে, মণিদীপার পিছনে এক মস্ত অন্ধকার। একটা ফাঁকা মাঠ।

ভিতরে আসছেন না কেন মণিদীপা?

এবার কাচের ভিতর দিয়ে ক্ষীণ টেলিফোনের গলার মতো ফিনফিনে শব্দ আসে, দরজা কোথায়?

দরজা! দরজা নেই?—দীপনাথ জিজ্ঞেস করে।

না। দরজা রাখেননি কেন দীপনাথবাবু?

পিছনের মাঠে অনেক মশাল জ্বলে উঠল হঠাৎ। এক দঙ্গল কালো কালো লোক। হাতে লাঠি সড়কি বল্লম। ডাকাত।

দরজা রাখিনি! বড় ভুল হয়ে গেছে। দাঁড়ান, কাচ ভেঙে ফেলছি।

মণিদীপা হেসে ওঠে, ভাঙবেন? এ যে বুলেট-প্রুফ কাচ।

দীপনাথ দড়াম করে ঘুসি মারে কাচে। একটুও চিড় ধরে না। মাঠ ভেঙে লোকগুলো নিঃশব্দে, বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসছে।

দীপনাথ কাচের গায়ে দমাদম লাথি মারে। কিছুই হয় না। মাঠ ছেড়ে লোকগুলো মণিদীপার কাছ বরাবর এসে ঘিরে ধরে।

গোঁ গোঁ আওয়াজ করে পাশ ফেরে দীপনাথ। অস্ফুট স্বরে ঘুমের মধ্যেই বলে, আমি আসছি।

॥ উনচল্লিশ ॥

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, ডাক্তার দেখাব কেন রে? আমার কী হয়েছে?

কিছু হয়েছে বলে নয়। চেক-আপ-এর জন্য। এখন একটু সাবধান হওয়া ভাল।

সারা রাত বৃষ্টির পর সকালে রোদ উঠেছে। কিন্তু বাগানে জল দাঁড়িয়ে গেছে, কাদা থিকথিক করছে, মেলা গাছ শুয়ে পড়েছে বৃষ্টির দাপটে। শ্রীনাথ সযত্নে শুয়ে পড়া গাছগুলোকে ঠেকনো দিয়ে দাঁড় করাচ্ছিল। দীপনাথের প্রস্তাব শুনে বারান্দার সিঁড়িতে বসেছে খানিক। অবাক হয়ে বলল, চেক-আপ? সেসব তো বড়লোকেরা করে শুনেছি। আমরা নাভিশ্বাস না উঠলে ডাক্তারের কাছে যাই নাকি? গুচ্ছের বাজে খরচ।

টাকার কথা বাদ দাও তো। টাকা আমি দেব।

তুই কি পাগল হলি? আমার কিছু হয়নি। বেশ আছি।

বেশ থাকলে বলতাম না। তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে না। চোখের কোল ফুলেছে, শরীরের বাঁধন আলগা, তার ওপর ড্রিংক-ট্রিংক করো, ডাক্তার দেখিয়ে রাখা ভাল।

তোর মাথায় এ বুদ্ধি ঢোকাল কে বল দেখি?

কেউ ঢোকায়নি। কাল থেকে আমারই মনে হচ্ছিল।

দূর দূর। ওসব কোনও দরকার নেই। আমার শরীরের ভাল-মন্দ আমি টের পাই না ভেবেছিস?

চেহারা নরম হলেও শ্রীনাথ গোঁয়ার কম নয়। রাজি হল না।

হতাশ দীপনাথ ফিরে এসে তৃষাকে বলল, বউদি, হল না।

আমি তো জানতাম।

আমি আজ চলে যাব বউদি। তুমি মেজদাকে দেখো।

যাবে? কাল রাতে কী কথা হয়েছিল?

সে তো দাদার চেক-আপের জন্য। সেটা যখন হচ্ছে না তখন—।

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এসব দীর্ঘশ্বাস-টাস তার বড় একটা আসে না। আজ এল। বলল, ঠিক আছে।

তৃষার অভিমানের আঁচ টের পেল দীপনাথ। কিন্তু বেশি গা করল না। বাঁধা পড়তে তার ভাল লাগে না। একা, আলগা, দূরের লোক হয়ে থাকার মধ্যে ভার অনেক কম।

নিজেদের ঘরের লম্বা বারান্দায় পিচবোর্ডের টার্গেট বানিয়ে এয়ারগান ছোড়ার অভ্যাস করছিল সজল। মাদুর পেতে পাশবালিশ ফেলে তার ওপর কনুই রেখে শুয়ে খুব কায়দা দেখাচ্ছে। দীপনাথ হেসে বলে, ক'টা লাগালি?

সতেরোটার মধ্যে দুটো মাত্র।

দে আমাকে।

এয়ারগান নিয়ে দীপনাথ ছোট্ট লোহার গুলি ভবে ফটাফট খানিকক্ষণ টার্গেট প্র্যাকটিস করল। আসলে নিজেকে এইভাবে সরিয়ে নেওয়া, প্রত্যাহার করা। বউদির চোখে চোখে তাকাতে হচ্ছে না।

দেরিতে অফিসে গেলেও ক্ষতি ছিল না। তবু দীপনাথ পালানোর জন্য সময়ের আগেই খেয়ে নেয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির চৌহদ্দি ঠেঙিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই শ্বাস ফেলে ভাবল, বাঁচা গেল।

বৃষ্টির পর এই শরৎকালের ভোরবেলাটা খুব ভাল কাটছিল না প্রীতমের। পরশু শতম এসেছে। তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তেই তার ভয় হয়েছে, এই বুঝি তাকে শিখণ্ডী রেখে বউদি আর দেওরে লেগে যায়। লাগেনি এখনও, কিন্তু আবহাওয়ায় বারুদের গন্ধ ছিল।

কাল ঘটল অন্যরকম। একদম অন্যরকম।

বিলু ফিরল কাল বেশ রাতে। কম করেও ন'টা। পাশের ফ্ল্যাটের মাদ্রাজিদের টেলিফোনে অবশ্য একটা খবর দিয়েছিল, ফিরতে দেরি হবে। কারণ বলেনি।

কারণটা প্রীতম ঝাঁ করে টের পেল, বিলুকে দেখেই।

কী দেখেছিল প্রীতম? শুয়ে শুয়ে সারাক্ষণ সে চিন্তা করছে, খুঁজছে, প্রশ্ন করছে নিজেকে, কী দেখেছিলাম? কী দেখেছিলাম?

বিলু ভিতরের ঘরে ঢুকেই খুব সচকিত চোখে একবার দেখেছিল প্রীতমকে। দৃষ্টি অন্যরকম। চোরের মতো। ভয়ে ভরা। তারপর গেল বাথরুমে।

ফিরে এসে খাটের বিছানায় প্রীতমের পায়ের কাছে এসে বলল, অফিসে যা কাজ না!

অফিসের কাজের জন্য দেরি হল?—খুব নিবিড় তীক্ষ্ণ শার্লক হোমসের চোখে তাকিয়ে বিলুকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করে প্রীতম।

না। অফিসের পর একটা ডিনার ছিল।

কারা দিল?

নতুন ডিরেক্টরের রিসেপশন।

চোখ কপালে তুলে প্রীতম জিজ্ঞেস করে, নতুন ডিরেক্টরের রিসেপশনে তোমার নিমন্ত্রণ?

সে তো আমার গুণে নয়। এই ব্যাংকের ডিরেক্টর যে অরুণের বাবা।

তাতে কী? তবু ওই রিসেপশনে তোমাকে ডাকার কথা নয়।

বিলু একটু কাঠ হয়ে বলল, ডাকল তো। কী করব বলো?

কোথায় হল?

পার্ক হোটেলে। শতম কোথায়?

বেরিয়েছে। ফিরবে।

শতমের কথাটা তুলে বোধহয় পাশ কাটাতে চাইল বিলু। প্রীতম তাকে পাশ দিলও। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। করার দরকার নেই। বিলুর মুখশ্রী, চোখের দৃষ্টি, দেহের শান্ত ভাবই বলে দিচ্ছে অন্য কিছু। ডিনার ছিল ঠিকই, কিন্তু তারপর আরও গভীর কিছু ছিল। অন্তরঙ্গ কিছু ছিল।

বিদ্যুতের ছোবল খেয়ে প্রীতম আঁকড়ে ধরল বালিশ। সে তো জানত। পুরুষ আর রমণী যতই পরিধেয় পরুক, ঘনিষ্ঠতা একদিন তাদের দেহমিলনে প্ররোচিত করবেই।

টের হয়তো পেত না প্রীতম। পেল কেবল এই দীর্ঘ রোগে ভুগে অনুভূতির প্রখরতা বেড়ে গেছে বলে।

না কি অন্যায় সন্দেহ? আবার ভাবতে বসল প্রীতম। ভেবে ভেবে বৃষ্টির রাত পার করল।

শতম কাল অনেক রাতে ফিরেছে। তখন ঘুমের ভান করে শুয়ে ছিল প্রীতম। কথা হয়নি। কথা বলতে ইচ্ছে ছিল না তার কারও সঙ্গেই।

বৃষ্টির পর এই শরৎ ঋতুর মতো উজ্জ্বল ভোরবেলা বিছানায় বসে আছে প্রীতম। শরীরের গাঁটে হালছাড়া ভাব। শরীরে খিল ধরেছে। মাথা ভার। চোখে জ্বালা। ভাবছে, কী দেখেছিলাম?

আজকাল বিলুর বদলে অচলা আসে তার প্রাতঃকৃত্যে সাহায্য করতে। দুর্বল আঙুলে নিজেই দাঁত মেজে নেয় প্রীতম। অচলা কুলকুচের জন্য একটা অ্যালুমিনিয়মের গামলা ধরে রাখে বিছানায়। আজ দাঁত মাজতে গিয়ে বারবার অবশ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল হাত।

অচলা বলল, কী হল? আমি মেজে দেব?

না, না। আমি পারব।

কীরকম ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

তা হলে আমাকে ডাকেননি কেন?

তুমি কী করতে?

একটা ট্র্যাংকুইলাইজার খাইয়ে দিতাম।

প্রীতম হাসল, ট্র্যাংকুইলাইজার? ওতে কিছু হত না। কাল রাতে আমার কিছুতেই ঘুম আসত না। বিলু কোথায়?

বউদি ওঠেননি।

ক'টা বাজে বলো তো?

বেশি নয়। সাতটা।

প্রীতম দেখল সকাল সাতটার তুলনায় অনেক বেশি আলো এসেছে ঘরের মধ্যে। এত আলো ভাল

লাগছিল না প্রীতমের। সে বলল, জানালাগুলো ভেজিয়ে দাও তো। চোখে বড় আলো লাগছে।

অচলা জানালা ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এল। বলল, কী হয়েছে বলুন তো? ডাক্তারকে খবর দেব?

না।

তা হলে বউদিকে ডাকি?

না, ও ঘুমোক। তুমি যাও অচলা। আমি শুয়ে থাকি।

কিছু খেয়ে নিন।

অচলা আপত্তি শুনল না। তর্ক করতে ইচ্ছে করল না বলে এক গেলাস দুধ খুব অনিচ্ছার সঙ্গে খেয়ে প্রীতম পড়ে রইল বিছানায়। কিছুতেই আজ নিজের প্রতিরোধ রাখতে পারছে না সে। হেরে যাচ্ছে। জয়ের গন্ধে শরীরময় নেচে উঠছে বীজাণুরা। কোলাহল করছে।

ঘুম এল না। অসহ্য কষ্ট। উঠে বসল প্রীতম। ঘর বড় বেশি অন্ধকার। না?

অচলা, জানালাগুলো খুলে দিয়ে যাও।

তাই দিয়ে গেল অচলা। বলল, বউদি উঠে বাথরুমে গেলেন। আসছেন এক্ষুনি।

প্রীতম কিছু বলল না। শূন্যগর্ভ চোখে চেয়ে রইল সামনের দিকে। কোনও মানুষই কোনও মানুষের সম্পত্তি নয়, ক্রীতদাস ক্রীতদাসী নয়। কারও দেহের অধিকার, প্রেমে পড়ার অধিকার কেনই বা থাকবে না মানুষের? এসব ভাবল। অনেক ভাবল।

কী হয়েছে? অচলা বলছিল—

বলতে বলতে বিলু এসে কাছ ঘেঁষে বসে। মুখ থেকে ঝাঁঝালো পেস্টের গন্ধ আসছে।

কিছু নয়। রাতে ঘুম হল না।

কেন?

কী করে বলব? এল না।

আমাকে ডাকোনি কেন?

তুমি কাল খুব টায়ার্ড ছিলে।—বলে এক ঝলক বিলুকে দেখে নেয় প্রীতম।

তাতে কী? তোমার অসুবিধে হলে বলবে না তা বলে?

কিছু অসুবিধে হয়নি।। একটু ছটফট করেছি মাত্র।

ডাক্তারবাবুকে টেলিফোন করে দিচ্ছি এখনই।

না। তার দরকার নেই। আজ ভাল আছি।

বিলু আর তেমন উদ্বেগ দেখাল না। অনেকক্ষণ অবশ্য বসে রইল কাছে। হঠাৎ বলল, শতম কেন এসেছে বলো তো!

এমনি।

আমাকে অচলা বলছিল, ও নাকি তোমাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যেতে চায়।

প্রীতম মনে মনে অচলার ওপর বিরক্ত হল। মুখে বলল, তাই তো বলছে।

নিয়ে যাবে কেন? এখানে কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে তোমার?

প্রীতম গম্ভীর মুখে বলল, আমার বোঝা তো অনেক টেনেছ বিলু। এবারটা কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দিলে দোষ কী?

বিলু এ কথায় স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর অনেকটা সময় পার করে বলে, তুমি কি আমার বোঝা?

বোঝা। ভীষণ বোঝা বিলু। নিজেকে আমার তাই মনে হয়।

তোমার মনে এমন সব জিনিস হয় যা লজিক্যাল নয়।

প্রীতম বিলুর দিকে চেয়ে ছিল। কাল রাতের অপরাধবোধ টানা ঘুমের পর কেটে গেছে। এখন পরিচ্ছন্নই দেখাচ্ছে বিলুকে। তবু এ বিলু কীটদষ্ট। এতদিন ওর প্রতিরোধ ছিল। কাল ভেঙে গেছে। প্রীতম সব টের পাচ্ছে। পৃথিবীতে কে কার?

তোমার অফিসের সময় হয়ে এল বিলু।

বিলু নড়ল না, স্থির হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত তুমি এই ডিসিশনই নেবে। কোনওদিন তুমি আমাকে আপনজন ভাবোনি।

এ কথার জবাব দিলে বোধহয় ঝগড়া হবে। কিন্তু প্রীতম কোনওদিন ঝগড়া করেনি। তার সারাজীবনেই ঝগড়া বলে কিছু নেই। যদিও বা দু'-চারবার সে কারও সঙ্গে ঝগড়া করেছে, প্রতিবারই গো-হারা হেরেছে। উত্তেজিত হলে তার মুখে কথা ফোটে না, মাথা গুলিয়ে যায়, শরীর ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে থাকে। সে ভারী করুণ অবস্থা!

প্রীতম তাই চুপ করে থাকে।

বিলু বলে, ওরা তোমাকে কেন নিয়ে যেতে চায় তা বলেছে?

নিয়ে যেতে চায় এমনিই। আমি তো ওই পরিবারেরই ছেলে।

তা কি জানি না! কিন্তু ভাবছি আমার কোনও ত্রুটি হল কি না।

না, তুমি যথেষ্ট করেছ।

একটা কথা বলবে? তুমি বাড়িতে চিঠি লিখে কিছু জানাওনি তো?

কী জানাব?

তোমার কোনও অসুবিধের কথা?

না বিলু। আমার তো কোনও অসুবিধে নেই। আমি কখনও কারও কাছে তোমার নামে নালিশ করিনি। ওটা আমার আসে না।

আমিও তাই জানতাম এতদিন।

আজ কি বিশ্বাস করছ না আমায় বিলু?

বিশ্বাস করছি। আমি শুধু ভাবছি আমার দোষটা কোথায়।

এটা দোষগুণের ব্যাপার নয়। আমার মা, ভাই, বাড়ির লোক সবাই চায় আমাকে তাদের কাছে কিছুদিন নিয়ে রাখতে। তোমার দোষের কথা ওঠেই না।

কথা বলতে বলতে প্রীতম গভীরভাবে বিলুকে দেখছিল, অনুভব করছিল। কাল এই বিলু ছিল তার। আজ যেন তার নয় আর। এই সত্য প্রীতমের ভিতরে মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে দিচ্ছে। বেঁচে থাকা নিরর্থক। তার লড়াই শেষ হয়েছে। এবার শিলিগুড়ি চলে যাবে। জানালা দিয়ে দেখবে সারাদিন, উত্তরের পাহাড়। শৈশব ফিরে আসবে। নিবিড় হয়ে উঠবে মায়ের আঁচলের সেই অদ্ভুত গন্ধ। বড় নেই-আঁকড়া ছেলে ছিল সে। আবার তাই হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে লাবুর জন্য কষ্ট হবে খুব। বিলুর কথা বড় মনে পড়বে। কিন্তু বেশিদিন নয়, রোগ-জীবাণুরা ঘোড়সওয়ারের মতো উঠে আসবে মাথায়। সব ভুলিয়ে দেবে। সব ভুলে যাবে প্রীতম।

বিলু আবার নিচু গলায় বলে, তোমার শিলিগুড়িতে যাওয়ার অর্থ আমার সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, তা-ই বিলু। অস্বীকার করে লাভ নেই। তুমি তো শিলিগুড়িতে যাবে না।

ও কথা থাক। কেন যাব না, কেন যেতে চাই না, তা তো তুমি জানো।

জানি। তবে ছাড়াছাড়ির জন্য দুঃখ নেই বিলু। এখানে থাকলেও খুব শিগগিরই একদিন ছাড়াছাড়ি তো হতই।

বিলু খুব অবাক হয়ে প্রীতমের দিকে তাকিয়ে বলে, তার মানে? ওসব কী বলছ তুমি?

কেন, তুমি জানো না যে, আমার আয়ু বেশিদিন নয়? এটা কি নতুন কথা বিলু?

বিলুর চোখ-মুখ তবু বিস্ময়ে টানটান হয়ে থাকে। অস্ফুট গলায় সে বলে, তুমি তো কোনওদিন এসব বলোনি প্রীতম! আজ কেন বলছ?

ভারী অপ্রস্তুত বোধ করে প্রীতম। মুখে কথা আসে না।

বিলু তার দু'হাত দিয়ে প্রীতমের একখানা হাত ধরে বলে, কেন বললে? তুমি তো কখনও মরার কথা বলো না। আজ কেন বললে?

প্রীতম হাতটা আস্তে টানে। কিন্তু দুর্বল হাতখানা বিলুর হাত থেকে খসে এল না। সে বলল, একটু আস্তে বিলু। শতম শুনবে, অচলা শুনবে।

শুনুক। তোমাকে বলতে হবে প্রীতম।

কী বলব! আমি কিছু ভেবেচিন্তে বলিনি। মনে হল, তাই বললাম।

তোমার মনের সেই জোর কোথায় গেল?

একটু শ্লেষের হাসি অজ্ঞাতেই ফুটে ওঠে প্রীতমের মুখে। বলে, মনের জোরে তুমি তো বিশ্বাস করো না।

আমি না করলেও তুমি তো করতে?

আমার মনের জোর আর নেই। হাল ছেড়ে দিয়েছি। এবার ভেসে যাব।

বিলু তার হাতটা আর-একটু নিবিড়ভাবে চেপে ধরে, কী হয়েছে তোমার বলবে?

আমার কিছু হয়নি। তুমি কেমন আছ বিলু?

এ কথায় বিলু যেন চমকে ওঠে, আমি কেমন আছি? তার মানে?

প্রীতম ঠেস দিয়ে কথা বলতে প্রায় জানেই না। বলতে লজ্জাও করে তার। তবু আজ বলল, এখন তো তোমার একটা আলাদা বাইরের জীবন হয়েছে বিলু। সে জীবনটার কথা তো আমি জানি না! তাই জিজ্ঞেস করছি, কেমন আছ?

বিলুর মুখ থমথম করছে। একটু কঠিন গলায় সে বলে, আলাদা জীবন? চাকরি করলেই কি একটা আলাদা জীবন হয় মানুষের! আজ তুমি অদ্ভুত সব কথা বলছ প্রীতম।

চাকরি কেন করতে গেলে বিলু? সে কি টাকার জন্য?

না তো কী?

এমন তো নয় যে, সারাদিন একজন রুগির সঙ্গ করে করে হাঁফিয়ে উঠেছিলে বলে, সব সময়ে মৃত্যুর সঙ্গে ঘর করতে হচ্ছে বলে, একটু মুক্তির জন্য, ডানা মেলবার জন্যই চাকরি করতে গেছ?

বিলুর সেই পুরনো কাঠিন্য ফিরে এল মুখশ্রীতে। বহুকাল ওই বরফ-শীতল ভাবটা দেখেনি প্রীতম। মাঝখানে কিছুদিন একটু প্রগল্‌ভা হয়েছিল বিলু। শীতল মুখশ্রীর সঙ্গে ঠান্ডা গলার মিশেল দিয়ে বিলু বলে, তোমার যদি তা-ই মনে হয়েছিল তবে আগে বলোনি কেন?

আমি তো তোমার কোনও কাজে বাধা দিই না। সব মানুষেরই ইচ্ছে মতো চলার স্বাধীনতা আছে। তবু কেন বলছি জানো? মনে হয় বলে।

কেন মনে হবে?

এ প্রশ্নের জবাব হয় না। মনে হয়, তাই বললাম। চাকরি করে কিছু অন্যায়ও করোনি। আমি যদি না বাঁচি তবে এ চাকরিটা তোমার দরকার হবে।

বিলু মাথা নিচু করে বসে থাকে। সময় বয়ে যাচ্ছে। প্রীতমের বড় ইচ্ছে হল, নতমুখী এই শীতল মেয়েটিকে একটা চরম আঘাত দিতে। কোনওদিন শত অপরাধেও যা করেনি প্রীতম। কিন্তু এখন সে শেষবারের মতো চলে যাচ্ছে। হয়তো আর কখনও দেখা হবে না। ওকে একটু আঘাত দিয়ে যাওয়া ভাল। তাতে হয়তো ও মনে রাখবে।

প্রীতম গলা ঝাড়ল। অনেক ইতস্তত ভাব, দ্বিধা কাটিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আর একটা কথা।

বলো শুনছি।

তোমার বয়স বেশি নয়। যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয় বিলু, তা হলে তুমি একা থেকো না।

বিলু মুখটা নিচুই রাখল। মৃদু কঠিন স্বরে বলল, কী বলতে চাইছ?

বলছি, তুমি আবার বিয়ে কোরো।

বিয়ে?—বলে ভারী অবাক হয়ে তাকায় বিলু, কী বলছ?

বিয়ের কথায় অবাক হোয়ো না। তুমি তো এসব সংস্কার মানো না, আমিও মানছি না। ভেবে দেখেছি, তোমার একা থাকার চেয়ে আবার বিয়ে করাই ভাল।

বলতে মুখে আটকায় না তোমার?

না। কারণ বিয়ে অনেক স্পষ্ট, অনেক পরিষ্কার ও সহজ ব্যাপার। তাতে গোপনীয়তা নেই, লুকোছাপা নেই, ভয়-ভীতি নেই। বিয়েই ভাল বিলু।

এতটা স্পষ্ট কথা, এত সুস্পষ্ট আক্রমণ বোধহয় বিলু প্রত্যাশা করেনি। তার শীতল কঠিন মুখশ্রী কাঁপতে থাকে। তারপর হঠাৎ ঠোঁট ফুলে ফুলে ওঠে। চোখ জলে ভরে আসে। স্খলিত গলায় সে বলে, কী বলছ তুমি?

প্রীতম আনমনে দূরের জানালাব দিকে চেয়ে আকাশের উজ্জ্বল নীল চৌখুপিটা দেখছিল। উদাস গলায় বলল, সেই ভাল বিলু। না হয় অরুণকেই কোরো। ও তোমাকে খুব ভালবাসে।

বিলু একটু শিউরে উঠল কি?

একটা হাত তুলে সে প্রীতমের মুখ চাপা দিয়ে বলল, বোলো না, ও কথা আর বোলো না। কী বলছ তা তুমি জানো না।

প্রীতমের সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়েছে এই পরিশ্রমে। এই কথাটুকু, এই আঘাত করার প্রস্তুতি এবং আঘাত তাকে এক পালটা প্রতিক্রিয়ায় বড় ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বালিশে এলিয়ে পড়ে প্রীতম। বড্ড ঘুম আসছে। মনটা হালকা। পৃথিবীতে কেউ কারও নয়। সারাজীবন ধরে মানুষ কেবলই ভুল দাবিদাওয়া করে যায়।

শুনছ! এই, শুনছ! প্রীতম!

প্রীতম সাড়া দিল না। অগাধ ঘুম তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

বিলু তড়িৎ পায়ে উঠে পাশের ফ্ল্যাটে দৌড়ে গেল টেলিফোন করতে।

আধ ঘণ্টা পর ডাক্তার এল। দেখল। ওষুধ লিখল। কিন্তু বিলুর কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব দিল না। বলল, খুব স্ট্রেন গেছে। দেখা যাক কী হয়।

সিরিয়াস নয় তো!

মনে তো হচ্ছে না। দেখা যাক।

একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠে শতম গিয়েছিল প্রাতঃভ্রমণে। ফিরে এসে দাদার অবস্থা দেখে কেমনধারা হয়ে গেল। মুখ ফ্যাকাসে, চোখে আতঙ্ক। বারবার জিজ্ঞেস করে, বউদি, দাদা বাঁচবে তো? কিছু হয়নি তো?

না। তুমি ভেবো না শতম।

তুমি অফিসে যাবে বউদি?

না, আজ অফিসে যাওয়ার কথাই ওঠে না।

প্রেসক্রিপশনটা দাও। আমি ওষুধ এনে দিচ্ছি।

অচলাই পারবে।

না, না।—অধৈর্যের গলায় প্রায় হুংকার ছাড়ে শতম, আমি আনব। দাও।

প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে বিলু যখন টাকাও দিতে গেল তখন আবার হুংকার ছাড়ে শতম, টাকা? দাদার ওষুধের জন্য টাকা নেব? রাখো তো! খুব রোজগার করতে শিখেছ।

কথাটায় কামড় ছিল, কিন্তু শতমের মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে সাহস পেল না বিলু। ও চলে গেলে বিলু চুপি চুপি বাথরুমে ঢুকে দোর দিল। আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল অনেকক্ষণ ধরে। কাল রাতের ব্যাপারটা কি টের পেল প্রীতম? ছিঃ ছিঃ।

॥ চল্লিশ ॥

প্রীতম কখনও দূরে কোথাও যায়নি। তার একমাত্র দূরে যাওয়া ঘটেছিল যখন শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় এল সি-এ পড়তে। বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের এক মেসবাড়ির দোতলার ঘরে বসে সে তখন ভাবত, ইস! শিলিগুড়ি কত দূর!

কলকাতায় থাকতে থাকতে আর কলকাতাকে দূরের জায়গা মনে হত না তার। শিলিগুড়ির কথা ভেবে শুয়ে শুয়ে চোখে জল আসত না তার। বিয়ের পর বিলুর সঙ্গে হানিমুন করতে গিয়েছিল পুরী। সেই তার আর-একবার দূরে যাওয়া। দিন সাতেকের মধ্যেই কলকাতায় ফেরার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল সে। অফিসের কাজে বর্ধমান, টাটানগর, সিন্ধ্রি বা দু'-তিনবার দিল্লিতেও যেতে হয়েছিল তাকে। কোনওদিন সে বাইরে গিয়ে ভাল বোধ করেনি। কোথাও দু'-তিন দিনের বেশি থাকতে পারেনি। দূর প্রীতমকে টানে না কখনও।

তার প্রিয় শিলিগুড়ি, তার প্রিয় কলকাতা।

কিন্তু দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা পর চোখ চেয়ে প্রীতম টের পেল, জীবনে সে এত দূরে আর কখনও আসেনি। শব্দহীন, ঝিঁঝি-ডাকা আবছা অন্ধকার চেতনার মধ্যে চেয়ে সে অনুভব করল, দূরত্বটা বড় বেশি। মাঝখানে এক বিশাল নদী বয়ে যাচ্ছে কি? অস্পষ্ট সেরকম একটা শব্দ পায় সে। কোনও নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। কোনও মুখ মনে নেই। স্মৃতির কপাট বন্ধ। জীবাণুরা অনেকটা উঠে এল বুঝি! মগজে? হবেও বা। তার শরীরের মধ্যে আর কোনও লড়াই নেই। সে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

দাদা! দাদা, শুনতে পাচ্ছ?

হু।

কেমন আছ? কেমন লাগছে?

ভাল। খুব ভাল।—অতি কষ্টে আড়ষ্ট জিভ নেড়ে বলে প্রীতম। কিন্তু কে প্রশ্ন করল তা বুঝতে পারল না। সে যে জবাবটা দিল তার অর্থও তার ভাল জানা নেই। শুধু অভ্যস্ত একটা শব্দ বেরিয়ে গেল মাত্র।

কিছু খাবে?

না।

গরম দুধ খাও। ভাল লাগবে।

গরম দুধ! না, খাব না।

এই যে, লাবুকে দেখো। লাবু সেই সকাল থেকে তোমার পাশে বসে আছে। দেখো।

লাবু? কই?

এই তো! আয় লাবু, বাবার চোখের সামনে আয়।

লাবুর মুখ শুকনো করুণ। হামাগুড়ি দিয়ে সে বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে বসল।

কিন্তু চিনতে পারল না প্রীতম। লোকটা কে? মেয়েটা কে? কিন্তু অভ্যস্ত জিভ বলল, লাবু? বাঃ বেশ।

তুমি মরে যাওনি তো বাবা?—লাবু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে।

মরে যাইনি তো।—প্রতিধ্বনি করে বলে প্রীতম।

মাকে ডাকব বাবা?

মা কে?

মা! আমার মা?

তোমার মা! বাঃ খুব ভাল।—বলল প্রীতম।

মা সারারাত জেগে ছিল তো। এইমাত্র একটু ঘুমোচ্ছে।

আচ্ছা।

ডাকব বাবা?

শতম লাবুর পিঠে হাত রেখে বলে, যাও, ডেকে আনো।

লাবু গিয়ে ও ঘরে মাকে ডাকতে থাকে।

শতম বিছানায় বসে প্রীতমের কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। সারা শরীরে কোথাও মাংস নেই। কপালটা করোটির মতো শক্ত। দাঁতে দাঁত পিষে শতম বলে, এরা তোমাকে প্রায় শেষ করে এনেছে দাদা। আর নয়, শিলিগুড়ি চলো। তোমাকে ঠিক সারিয়ে তুলব।

প্রীতম শিলিগুড়ি কথাটা যেন বুঝতে পারে। ঠক করে কিছু মনে পড়ে না, তবে একটা মস্ত সাদা পাহাড়, ঘন জঙ্গলের দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে তার।

শিলিগুড়ি?

শিলিগুড়ি। যাবে না দাদা?

যাব।

তা হলে আমি আজই রিজার্ভেশন করতে যাব।

প্রীতম যদিও কিছুই মনে করতে পারে না, তবু তার ভিতর থেকে এক প্রম্পটারই যেন বলে ওঠে, ওদের কে দেখবে?

তুমি কি ওদের দেখো? ওদের ওরাই দেখবে।

এ কথাটা স্পষ্টই শুনতে পেল বিলু। সে নিঃশব্দে বিছানার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ এক রাতেই শুকিয়ে গেছে। চোখ কান্নায় ফোলা এবং অনিদ্রায় লাল। চুল এলোমেলো। কাল সারারাত সে প্রীতমকে ছেড়ে প্রায় নড়েইনি। অপেক্ষা করেছে, কখন প্রীতমের জ্ঞান ফিরে আসে। আমাকে শুধু খারাপ ভেবেই চলে যেয়ো না প্রীতম। আমি যে তোমাকে কত ভালবেসেছিলাম তা জেনে যাবে না?

শতমের কথাটা কানে আসতেই একটু শিউরে ওঠে বিলু। প্রীতমকে নিয়ে যাবে? নিয়ে যাবে?

প্রীতমের করোটির মতো শক্ত কপালে বিলুও হাত রাখে, কেমন আছ, প্রীতম?

প্রীতম খুব ভাল করে মহিলাটিকে দেখে নিচ্ছিল। এ যেন কে? খুব চেনা। ঠিক মনে পড়ছে না।

প্রীতম বলল, ভাল। খুব ভাল আছি।

আর কেউ না বুঝলেও বিলু ঠিকই টের পায়, একটা দিনের মধ্যেই প্রীতমের মধ্যে একটা বড় রকমের ওলট-পালট হয়ে গেছে। তার এমনও সন্দেহ হয়, প্রীতম তাকে চিনতে পারেনি।

একটু ঝুঁকে বসে বিলু। খুব আস্তে আস্তে বলে, আমি বিলু। চিনতে পারছ?

শতম পাশ থেকে বলে, চিনতে পারবে না কেন বউদি? কী বলছ?

বিলু করুণ মুখটা তুলে মাথা নেড়ে বলে, ও চিনতে পারছে না। আমি জানি।

এরকম কি মাঝে মাঝে হয়?

না। এই প্রথম।

শতমের মুখে উদ্বেগ ফুটে ওঠে, একটু আগেই তো শিলিগুড়ি যাওয়ার কথায় রাজি হয়ে গেল।

বিলু বলল, ওর চোখের দৃষ্টিটা দেখো। তা হলেই বুঝতে পারবে।—বলে বিলু আবার প্রীতমের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, আমি কে বলো তো? আমি কে?

তুমি!—বলে প্রীতম ভ্রু কোঁচকায়। অনেক দূর থেকে শব্দগুলো আসছে। ঝিঝি-ডাকা আবছায় ভাসছে কিছু মুখ।

লাবুকে চিনতে পারছ না? এই যে লাবু।

লাবু! হ্যাঁ লাবু।—প্রীতম ভ্রু কুঁচকে রেখেই বলে।

শতম চাপা গলায় বলে, ডাক্তারকে খবর দেবে না বউদি?

বিলু মাথা নেড়ে বলে, খবর দেওয়াই আছে। বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ আসবেন কালই বলে গেছেন। আমি ভাবছি, এটা হয়তো ঘুমের ওষুধের এফেক্ট। এটা কেটে গেলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।

দাদাকে এবার কিছু খেতে দাও।

খাওয়াব। অচলাকে দুধ গরম করতে বলে এসেছি।

শতম একটু চুপ করে থেকে বলে, এটা কোনও খারাপ সাইন নয় তো বউদি?

কী জানি। তবে ঘাবড়ে যেয়ো না।

আমার কীরকম লাগছে।

জবাবে বিলু একটু হাসল মাত্র।

অচলা দুধের ফিডার নিয়ে গম্ভীর মুখে ঘরে আসে। কাল সারা রাত সেও প্রায় জেগেই কাটিয়েছে। তবে তার অভ্যেস আছে বলে মুখে রাত জাগার কোনও ছাপ নেই। সে কাছে এসে বলল, সরুন, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

বিলু উঠে সরে বসল। মন দিয়ে দেখতে লাগল, অচলা কী সুন্দর পটু হাতে অল্প অল্প করে দুধ খাইয়ে দিচ্ছে প্রীতমকে। গলায় পরিষ্কার একটা তোয়ালে দিয়ে নিয়েছে।

বিলু আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, অচলা, আমার মনে হচ্ছে ও লোকজন চিনতে পারছে না। তুমি একটু দেখো তো!

অচলা মুখ না তুলেই বলল, ডাক্তার আসুন, উনিই বুঝবেন।

তুমি কিছু বুঝতে পারছ না?

আমি পেশেন্টের অবস্থা খুব ভাল দেখছি না।

কী হল বলো তো?

কী করে বলব! কালও তো নর্মাল ছিলেন। আজ কেমন অন্যরকম দেখছি।

দুধ খাইয়ে অচলা গরম জলে ভেজানো তোয়ালে এনে প্রীতমের মুখ মুছিয়ে চুলগুলো পাট করে দিল। একটু ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে দিল গায়ে। একটা ওষুধ খাওয়াল। তারপর বলল, পেশেন্ট এবার ঘুমোবে। আপনারা ও ঘরে যান।

প্রীতম বাস্তবিকই ঘুমিয়ে পড়ে।

ডাক্তারের জন্য শতম ঘর-বার করতে করতে বারবার ঘড়ি দেখতে থাকে। আঁচলে শরীর জড়িয়ে বাইরের ঘরের সোফায় কোণ ঘেঁষে বসে থাকে বিলু। একদম স্থবিরের মতো। বাড়ির আবহাওয়ায় বিষণ্ণতা টের পেয়ে লাবু দ্বিতীয় শোওয়ার ঘরে গিয়ে খাটের নীচে ঢুকে পুতুল খেলতে বসে।

এতদিন বলার সুযোগ হয়নি, কিন্তু আজ রাগ বিরক্তি শোক সব মিশে শতম নিজেকে সামলানোর চেষ্টা না করেই হঠাৎ বলে ফেলল, এখানে দাদার যত্ন হচ্ছে না বউদি। এবার আমি দাদাকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাব।

এ কথার কোনও জবাব মাথায় এল না বিলুর। অনেকক্ষণ ধরে তার মনের মধ্যে ওই কথাটাই প্যারেড করে বেড়াচ্ছে, প্রীতমকে নিয়ে যাবে! প্রীতমকে নিয়ে যাবে!

বিলু শতমের দিকে চেয়ে থেকে মনের সেই কথাটাই মুখ দিয়ে বলল, নিয়ে যাবে!

শতম সামান্য চড়া গলায় বলে, তুমি অফিসে চলে যাও। সারাদিন দাদা তো একা থাকে। আয়া-টায়ারা কি ঠিকমতো সেবাযত্ন করতে পারে?

বিলু আবার বলে, নিয়ে যাবে!

তুমি বাধা দিয়ো না বউদি। দাদার ভালর জন্যই বলছি।

বিলুর ভিতরে যে ঠান্ডা কঠিন এক মানুষ ছিল সে গলে জল হয়ে গেছে। এখন বিলুর মাথার ঠিক নেই। সে খুবই শুষ্ক সরু অসহায় এক গলায় বলল, প্রীতম যদি আর ফিরতে না পারে!

শতম গম্ভীর হয়ে বলল, কী হবে তা তো জানি না। তবে শিলিগুড়ি তো মোটে এক রাতের পথ। প্লেনে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। যখন তখন ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারবে। ভাবছ কেন?

এত অসহায় বিলু কখনও বোধ করেনি। সে নিজের চারদিকে একবার হরিণের মতো ত্রস্ত চাউনিতে দেখে নিল। কিন্তু আসলে কিছুই দেখল না। কোথাও কিছু নেই দেখবার মতো। নিজের করতলের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, তুমি কি ওকে নিয়ে যেতেই এসেছিলে শতম?

বলতে পারো তাই। দাদা অমত করলে নিতাম না। কিন্তু দাদা এবার অমত করেনি।

আমারও তো একটা মতামত আছে।

ক্রুদ্ধ শতম বিলুর দিকে ষণ্ডামর্কের মতো তাকিয়ে বলল, তোমার মতটা তা হলে কী? দাদা এইখানে এইভাবে শেষ হোক?

বিলুর আজ মনের জোর নেই। যদি গতকাল অরুণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাটা না হত, যদি ওভাবে ভেসে না যেত সে, তবে আজ রুখে উঠতে পারত বিলু। অরুণ কোনও সংস্কাব মানে না, বড় বেশি সাহসী। কোনওদিন বিলুর ওপর এই লোভ প্রবল ছিল না অরুণের। কাল সেই লোভ দেখা দিল। বলল, অবশেষে আমার বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে গেল বিলু। হয়তো জানুয়ারিতে। তার আগে পর্যন্ত এই সময়টুকু আমাদের। অরুণ বিয়ে করছে—এই খবরে একই সঙ্গে বিষাদ ও ক্রোধ চেপে ধরেছিল বিলুকে। আর সব মিলিয়ে হয়ে গেল ওই অদ্ভুত কাণ্ডটা। কেউ জানে না, তবু তারপর থেকেই বিলুর ভিতরে একটা মিয়োনো ভাব, পাপবোধ, চকিত শিহরন খেলে যাচ্ছে। অকারণেই মাঝে মাঝে চমকে উঠছে সে, ভয় ভয় করছে তার, লজ্জা পাচ্ছে।

বিলু মাথা নেড়ে বলল, যেখানে গেলে ওর ভাল হবে সেখানেই নিয়ে যাও। আমি ওর ভালই তো চাই।

তা হলে তোমার মত আছে বলছ?

না থাকার কিছু তো নয়। তবে আমাকে তোমরা কেউ একবারও তো জিজ্ঞেস করোনি। আমি কি কেউ নই?

কথাটা বলতে বলতে বিলুর চোখ ভিজে এল। এ ঘটনা তার জীবনে এতই বিরল যে, কখনও নিজের চোখে জল এলে সে নিজেই অবাক হয়। এখন অবশ্য হল না। তবে মুখ ফিরিয়ে শতমের চোখ থেকে মুখ আড়াল করল।

শতম বলল, এটা প্রোটোকলের সময় নয় বউদি। অনুমতি বা তা নিয়ে মন কষাকষি এসব খুব ছেলেমানুষি ব্যাপার। দাদার এখন লাইফ অ্যান্ড ডেথ-এর প্রশ্ন।

বিলুর মনটা তার স্বাভাবিক কাঠিন্য ও শীতলতা কিছুটা ফিরে পেল এ কথায়। সে ঠান্ডা গলায় বলল, নিয়ে যাও, কিন্তু সঙ্গে আমি যেতে পারব না।

সেটা জানি। কিন্তু গেলে তোমার কোনও ক্ষতি হত না। শিলিগুড়ির বাড়িটাও তোমারই বাড়ি।

ভ্রু কুঁচকে বিলু বলে, ওসব কথা থাক শতম।

শতম কথাটা কানে না তুলে বলে, তোমাদের সেখানে একটু কষ্ট হতে পারে, কিন্তু চলেও যাবে। তোমাদের সব খরচ আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

আমাদের খরচ সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণাই নেই. তাই বলছ। কিন্তু ও কথা নিয়েও এখন কিছু বলতে চাই না। প্রীতম ইচ্ছে করলে তার যা টাকাপয়সা আছে তা তুলে নিয়ে যেতে পারে।

শতম একটু হকচকিয়ে গেল। বলল, দাদার টাকা নিয়ে আমরা কী করব? টাকার কথা ওঠেই না। আমরা শুধু দাদাকেই নিয়ে যেতে চাই।

ওর ওপর তোমাদের অধিকার অনেক বেশি।

শতম মাথা নেড়ে বলে, ওটা তোমার রাগের কথা।

আমার মতো অবস্থায় যদি কাউকে বছরের পর বছর কাটাতে হত তবেই সে বুঝতে পারত আমার রাগ কেন হয়। এতকাল প্রীতমকে আগলে রেখেছি, হঠাৎ এখন তোমরা ভালমানুষ সেজে ওকে নিয়ে যেতে চাইলে রাগ কি হতে পারে না?

শতম যেন এরকম কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বলল, স্বামীকে আগলে রাখাই স্ত্রীর কাজ। বউদি, সে কাজটাও তুমি ভাল করে করছ? একে কি আগলে রাখা বলে?

অত কথায় কাজ নেই শতম। নিতে এসেছ নিয়েই যাও। তোমাদের কাছেই হয়তো ও ভাল থাকবে।

আমাদের সঙ্গে তুমি কোনও সম্পর্ক রাখো না বলে হয়তো জানোই না, আমরা কেমন লোক। যদি জানতে তা হলে দাদাকে নিয়ে যেতে চাইছি বলে রাগ করতে না। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, দাদাকে আমরা প্রাণপণে আগলে রাখব। মাইনে করা লোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে চাকরি করতে যাব না।

বিলু নিঃশব্দে উঠে ভিতরের ঘরে চলে এল। রাতে ঘুম হয়নি, শরীর জুড়ে ব্যথা আর ক্লান্তি। সঙ্গে উদ্বেগ, অশান্তি. লজ্জা, পাপবোধ। সে এসে প্রীতমের বিছানায় বসল। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না বিলু। প্রীতমের প্রতি তেমন উথালপাথাল ভালবাসা কোনওদিনই ছিল না তার। কিন্তু এখন মনে হয়, প্রীতম চলে গেলে তার পায়ের তলা থেকে একটা পাটাতন সরে যাবে বুঝি!

কিন্তু এই বোধ তো সত্য নয়। প্রীতমের ওপর কোনওদিক দিয়েই সে নির্ভরশীল নয়। কাজেই যুক্তি দিয়ে নিজের ভাবাবেগকে দমিয়ে দিতে পারল সে। অরুণের কাছে সে শিখেছে, দুনিয়ার কালো দিকগুলি, হতাশার কথাগুলি, দুঃখের বোধগুলিকে পাত্তা দিতে নেই। অরুণ উপদেশ দিয়ে এসব তো শেখায়নি, তাকে দেখেই শিখেছে বিলু। অরুণ ঠিক ওইরকম। কোনওদিন কোনও ঘটনাই তাকে বিমর্ষ করে না।

বিলু শতমের জ্বালা-ধরানো কথাগুলো নিয়ে ভাবল না আর। ভাববে কেন! ওর দাদাকে ও নিয়ে যাক। বিলুর পৃথিবী যেমন ছিল তেমনই থাকবে। হয়তো আর-একটু স্বাধীনতার স্বাদ পাবে সে। একটু মন কেমন করবে প্রীতমের জন্য। তা করুক। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গিয়ে কত লোক কত শোক তাপ সহ্য করে।

আস্তে আস্তে প্রীতমের পাশে ছোট পরিসরে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে কখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল বিলু।

ছোট, গোল রোদেভরা সবুজ পৃথিবীটা হেলিকপ্টারের তলায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল প্রীতম। পৃথিবীটা যে এত ছোট তা সে জানত না। কোনও শহর গাঁ চোখে পড়ে না। শুধু কিছু সবুজ ছোট ছোট পাহাড়, একটা ঘন বনাকীর্ণ উপত্যকা, ফুলের বন্যা বয়ে যাচ্ছে সেখানে। একটা ছলছলে পাহাড়ি নদী গেছে এঁকেবেঁকে। আর একটা ন্যারোগেজের রেল লাইন। অনেক প্রজাপতি উড়ছে, পাখি উড়ছে। দেখতে দেখতেই পৃথিবীটা একটা পাক খেল। ও পিঠেও জনবসতি নেই, একটা ছোট নীল সমুদ্র, একটা বরফে ঢাকা পাহাড়, আর একটা মাঠের ভিতরে সরু মেঠো পথ দেখতে পায় সে। এত সুন্দর জায়গাটা যে, প্রীতম হেলিকপ্টারে কাচের মতো স্বচ্ছ তলাটায় উপুড় হয়ে পড়ে একদৃষ্টে লোভীর মতো চেয়ে থাকে। কিন্তু হেলিকপ্টারটা বারবার চেষ্টা করেও ছোট্ট সুন্দর পৃথিবীটাকে স্পর্শ করতে পারছে না। কোথাও এক অদৃশ্য বলয় বাধা দিচ্ছে। দূরত্বটাকে অতিক্রম করা যাচ্ছে না। চোখে গগলস্ আর হাতে দস্তানা-পরা পাইলট খুব চেষ্টা করছে অবশ্য। কিন্তু হচ্ছে না।

মাঝে মাঝে হেলিকপ্টার ঝম করে নেমে যাচ্ছে, ছুঁইছুঁই দূরত্বে এসে যাচ্ছে। কিন্তু সুন্দর ছোট্ট

গোল রূপকথার রাজ্যের মতো পৃথিবীটা অমনি একটা পাক খেয়ে সরে যাচ্ছে দূরে। অনেকটা দূরে। তখন ভয়ে হতাশায় ককিয়ে উঠছে প্রীতম। হাত তুলে বলছে, পাইলট! পাইলট! নামাও।

বিরক্ত পাইলট বলে, কী করব? চেষ্টা তো করছি।

আরও চেষ্টা চাই। আরও চেষ্টা।

আমার হেলিকপ্টারে যতটা ক্ষমতা ততটা চেষ্টা করছি। পৃথিবীটা যদি অমন বদমাইশি করে তবে কী করব বলুন!

প্রীতম ভয়ে ঘেমে ওঠে। বলে, বিলু রয়েছে ওখানে, লাবু রয়েছে, আমাকে যে নামতেই হবে।

বিলু কি আপনার একার? আমারও কি নয়?

প্রীতম কেতড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পাইলটের দিকে তাকাল। হেলমেটের নীচে ফর্সা ঘাড়, মসৃণ করে ছাঁটা কালো চুল, সুদৃঢ় ঠোঁটের একটু আভাস। ঠিকই তো। বিলু তো তার একার নয়, অরুণেরও।

প্রীতম বলল, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে অরুণবাবু।

কেন বলুন তো! কষ্ট কিসের?

বেশি দূরে আমি কখনও যাইনি। আমার এক্ষুনি বিলুর কাছে ফিরে যাওয়া দরকার। আপনি হেলিকপ্টারটা নামিয়ে দিন।

অরুণ খুব বিষণ্ণ গলায় বলে, বিলু? এই পৃথিবীতে তো বিলু থাকে না। এখানে কেউ থাকে না। শুধু আপনি থাকবেন বলে এটা তৈরি করা হয়েছে।

একটু অবাক হয়ে প্রীতম বলে, সে কী? আমি একা এখানে থাকব কেমন করে?

তা তো জানি না। আমার ওপর হুকুম আছে, আপনাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে হবে। তবে এ জায়গাটা খুব সুন্দর। আপনার বোধহয় ভালই লাগবে।

কিন্তু বিলুর কী হবে? লাবুর?

ওরা অন্য পৃথিবীতে ভালই থাকবে। ওদের মতো করে ভাল থাকবে।

সে পৃথিবীটা কত দূর?

কয়েকটা লাইট-ইয়ার।

লাইট-ইয়ার! এত দূর!

হ্যাঁ। দূরত্বটা কিছু বেশি।

হেলিকপ্টারটা হঠাৎ কাত হয়ে সাঁ সাঁ করে নামতে থাকে। ঘরঘর করে চপারের শব্দ হয়। নীচে সবুজ সাদা নীল ঘূর্ণির মতো ছোট্ট পৃথিবীটা পাক খায়।

নামছি!—বলে অরুণ চেঁচিয়ে ওঠে।

না, না! আমি ফিরে যাব অরুণ!

ফেরার উপায় নেই প্রীতমবাবু!

ফিরতেই হবে। বিলু, লাবু একা। বড় অসহায়।

একা কেন? আমি তো রয়েছি।

তা বটে।—বলে আবার হতাশায় ভেঙে পড়ে প্রীতম।

খুব কাছাকাছি এসেও তাদের হেলিকপ্টারের নাগাল এড়িয়ে পৃথিবীটা সরে যায় এপাশে, ওপাশে।

দুষ্টুমিটা দেখছেন?—অরুণ বিরক্ত হয়ে বলে।

প্রীতম জবাব দেয় না। কাচের ওপর উপুড় হয়ে থাকে। চোখে জল আসে। তবু মনে কোনও ভার নেই। একা এই পৃথিবীতে তাকে কতকাল বেঁচে থাকতে হবে? অনন্তকাল! অসীম সময় কী করে একা কাটাবে প্রীতম?

অরুণ ডাকছে, প্রীতম! প্রীতমবাবু!

উঃ।

কেমন লাগছে?

ভাল নয়! একদম ভাল নয়। এখানে কী করে থাকব?

কপালে একটা ঠান্ডা হাত স্পর্শ করে। প্রীতম চোখ মেলে চায়।

অস্বচ্ছতা অনেকটাই কেটে গেছে প্রীতমের। দীর্ঘ ঘুমের পর শরীরের নিস্তব্ধতা আছে, কিন্তু ক্লান্তি নেই।

নিজের ঘরখানাকে চিনতে পারে প্রীতম। চিনতে পারে সামনে দাঁড়ানো অরুণকেও। ফটফটে সাদা একটা টি-শার্ট তার গায়ে। সুন্দর মুখে কিছু উদ্বেগ, একটা খুব সুন্দর গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

অরুণ তার কপাল থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেমন আছেন?

আধো জাগরণে যে জবাব দিয়েছিল প্রীতম এখন জাগ্রত অবস্থায় ঠিক তার উলটো বলল, ভাল আছি। খুব ভাল আছি।

আমাকে চিনতে পারছেন তো?

আপনি! আপনি তো অরুণ!

বাঃ! চমৎকার!

প্রীতম হাসবার চেষ্টা করল। এখনও কানে মৃদু হেলিকপ্টারের শব্দ লেগে আছে। বলল, কিন্তু অত দূরে আমি যেতে পারব না।

কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন?

ওই যেখানে আপনি নামিয়ে দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন আমাকে।

আমি!—বলে অবাক হতে গিয়েও অরুণ মৃদু হেসে ফেলে, আপনি বোধহয় হ্যালুসিনেশন দেখছিলেন।

অনেক দূর! কিন্তু সে জায়গাটাও সুন্দর।

অনেক দূরে আপনাকে যেতে হবে না প্রীতমবাবু। ইউ আর উইথ আস।

বিলু আর লাবুর কী হবে?

অরুণ চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসে। কপালে হাত রাখে। তারপর মৃদু স্বরে বলে, বিলু আপনার জন্য কান্নাকাটি করছে প্রীতমবাবু। এখন আপনার একটু স্টেডি হওয়া উচিত।

প্রীতমের ঘোর-ঘোর ভাবটা অল্প কেটে যাচ্ছে। সে বড় একটা শ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকে। শরীরে জীবাণুদের কোলাহল। সে একটু একটু করে পা নাড়ল, হাত নাড়ল। না, এখনও সাড় আছে। চোখ চেয়ে সে ভাল করে চারদিকটাকে দেখে নিল।

অরুণের দিকে চেয়ে বলল, আমি শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছি।

শুনেছি। কিন্তু কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

কেন? কাজটা কি খারাপ?

বিলু একা হয়ে যাবে।

কেন, আপনি তো আছেন।

ডোন্ট বি এ ফুল। আমি কে? বিলুর জন্য আমি কী করতে পারি?

আমিই বা বিলুর কে? আমরা কেউ কারও নই।

আপনাদের কি ঝগড়া হয়েছে প্রীতম?

না, ঝগড়া কেন হবে?

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দেখলে আজকাল আমি খুব ভয় পাই। আমিও শিগগির বিয়ে করতে যাচ্ছি কিনা।

প্রীতম বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে অরুণের দিকে।

অরুণ মৃদু হেসে বলে, ইটস ট্রু।

৷৷ একচল্লিশ ৷৷

কলকাতায় এবার খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ভীষণ বৃষ্টি। দুপুর বা বিকেলের দিকে প্রায়দিনই ঝমাঝম বৃষ্টি এসে পথঘাট ডোবাচ্ছে। ট্র্যাফিক জ্যাম। বৃষ্টির জ্বালাতেই ক'দিন প্রীতমের কাছে যাওয়া হয়নি দীপনাথের। অবশ্য অফিসের কাজও বেড়েছে। প্রায় দিনই কাজ শেষ করতে সন্ধে সাতটা-আটটা বেজে যায়। নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের মধ্যে একজন মাত্র কাজে যোগ দিয়েছে। বাকিরা আরও দিন পনেরো পরে আসছে। সুতরাং দীপনাথকে একাই তিনগুণ খাটতে হচ্ছে।

সপ্তাহখানেকের মাথায় দুপুরে বিলুর টেলিফোন এল।

সেজদা! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ট্যুরে বাইরে গেছ। বহুদিন খবর নিচ্ছ না।

না রে। নতুন পোস্টে কাজের প্রেশার ভীষণ। রোজ বিকেলের দিকে বৃষ্টিও নামছে এখন। প্রীতম কেমন?

খোঁজও তো নাওনি। আমার অফিস তোমার অফিস থেকে মোটে দু'কদম।

বিলু ঠিক এভাবে অভিমানের গলায় কখনও কথা বলে না। বরাবরই ও একটু কাঠ কাঠ। তাই সামান্য অবাক হচ্ছে দীপনাথ। সে বলল, রোজই যাব-যাব করছি বলে আর খোঁজ নেওয়া হয়নি। তোরা সবাই ভাল আছিস তো? প্রীতম কেমন আছে আগে বল।

মাঝখানে একটু ক্রাইসিস গেছে। একদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

বলিস কী?

সিরিয়াস কিছু নয়, তুমি তো খবর রাখো না, এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।

কী ঘটনা?—উদ্বেগের গলায় দীপনাথ বলে।

এসো বলব। আজ আসবে?

ঘড়ি দেখে দীপনাথ বলে, মোটে পাঁচটা বাজে। যেতে দেরি হবে।

হোক, তবু এসো। আজ আমাদের ওখানেই রাতে থেকো। অনেক কথা আছে।

থাকব?—বলে একটু দ্বিধা করে দীপনাথ। দ্বিধার কিছু নেই, বোনের বাড়িতে লোকে থাকতেই পারে। তবু ওই হল দীপনাথের স্বভাব।

তুমি বোধহয় জানো না, শতম এসেছে।

তাই বুঝি! কবে এল?

দিন আট-দশ। প্রীতমকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

শিলিগুড়ি!—খুব অবাক হয়ে দীপনাথ বলে, সে কী রে! প্রীতম যে শিলিগুড়ি যাবে না বলেছিল আমাকে।

মত পালটেছে।

যাচ্ছে তা হলে?

গলাটা হঠাৎ একটু ভেঙে গেল বিলুর। বলল, যাচ্ছে। তুমি আজ এসো কিন্তু। ভীষণ দরকার।

তুই প্রীতমকে যেতে দিতে রাজি হয়েছিস?

আমার মতামতে কিছু যায় আসে না।

কবে যাচ্ছে?

পরশু। রিজার্ভেশন হয়ে গেছে। বাঁধাছাঁদা চলছে।

তুই সঙ্গে যাবি না?

আমাকে তো যেতে বলেনি। বললে হয়তো কিছুদিনের জন্য যেতাম।

টেলিফোনে আর কিছু বলল না দীপনাথ। যদিও একটা রাগের হলকা তার মগজটাকে চেটে নিচ্ছিল। কিন্তু রাত্রে প্রীতমের বাড়ি গিয়ে বাইরের ঘরে বিলুকে ধরল দীপনাথ।

বিলু, প্রীতমের চেয়ে কি চাকরিটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট? তুই ওর সঙ্গে যাচ্ছিস না কেন?

বললাম তো, ওরা আমাকে যেতে বলেনি।

এটা কি প্রোটোকলের সময় যে, না বললে যাবি না?

ওরা যদি আমাকে না চায়, তবে কেন যাব?

তবু যাবি। হয়তো তুই যেতে চাস না ভেবে ওরা বলছে না। ওদেরও প্রেস্টিজ আছে।

বিলু মুখ নিচু করে শক্ত হয়ে রইল। ভীষণ গোঁ।

ছুটি পাবি না?—দীপনাথ কোমল গলায় জিজ্ঞেস করে।

হয়তো পাব, তবে বেশিদিন নয়।

তবে চাকরিটা ছেড়ে দে না কেন?

আজকাল একবার চাকরি ছাড়লে আর কি সহজে পাওয়া যায়?

চাকরিটাকে অত ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছিস কেন?

বিলু ধীরে ধীরে মুখ তুলল। বেশ কঠিন মুখ। ধীর শান্ত গলায় বলল, চাকরিটা এখন আমাদের কাছে খুব জরুরি।

প্রীতমের চেয়েও?

একটা শ্বাস ফেলে বিলু বলল, প্রীতম তো বাঁচবে না, সেজদা। তারপর আমার আর লাবুর কী হবে? কে দেখবে আমাদের? অনেক ভেবেচিন্তে তাই চাকরিটাকে ধরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে ঠিক করেছি।

কথাটা নির্ভেজাল ভাবাবেগহীন সত্য। তবে বড্ড বেশি নির্লজ্জ অকপট। দীপনাথ এ ধরনের নগ্ন সত্যকে পছন্দ করে না। বিরক্ত হল, অস্থির বোধ করল, কিন্তু সঠিক কোনও জবাবও এল না মুখে।

শতম বেরিয়েছে, প্রীতম অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাই দীপনাথ বাইরের ঘরেই বসে রইল অনেকক্ষণ। বিলু গিয়ে নিজে চা করে আনল, একটা ধোয়া পাজামা এনে রাখল পাশে। দীপনাথ আনমনে খানিকক্ষণ আকাশ-পাতাল ভাবল।

হঠাৎ বলল, তুই তা হলে এই ফ্ল্যাটে একাই থাকবি?

আমি আছি, লাবু আছে, অচলা আর বিন্দুও থাকছে। ঠিক একা তো নয়।

তবু একে একাই বলে। পুরুষ অভিভাবক তো থাকছে না।

খুব ভাল হত যদি তুমি এসে থাকতে। তিনটে ঘর আছে, তোমার কোনও অসুবিধা হত না।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলল, সেটা সম্ভব নয়। এ বাড়িতে প্রীতম নেই, এটা আমার সহ্য করা মুশকিল।

তুমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল সেজদা। প্রীতমকে আমি কারও চেয়ে কম ভালবাসি না, কিন্তু রিয়্যালিটিকে তো মেনে নিতেই হবে। প্রীতম চলে গেলে এ বাসায় আমিও তো থাকব।

দীপনাথ জবাব দিল না। বিলুও আর দ্বিতীয়বার তাকে এ বাসায় থাকার কথা বলল না।

দীপনাথ জিজ্ঞেস করে, প্রীতম কেন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বললি না?

ভ্রু কুঁচকে বিলু বলে, কী করে বলব? তবে সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে ওকে খুব ইমোশনাল দেখেছিলাম। এমন সব কথা বলছিল যার কোনও মানে হয় না।

কীরকম কথা?

বলছিল, ও শিগগিরই মরে যাবে। তারপর আমি যেন বিয়ে করি। এইসব কথা।

এরকম কথা তো সহজে বলে না প্রীতম। সেদিন কেন বলল?

তা তো জানি না।—বলে বিলু চোখ সরিয়ে নিল।

ও কখনও মরার কথা ভাবে না। অসম্ভব বেঁচে থাকার ইচ্ছে ওর। তবে কেন ওরকম কথা বলব? তোকে আবার বিয়ে করতে বলবে এমন ছেলেমানুষও তো প্রীতম নয়।

বলল তো।

প্রীতমের ওপর একটু রাগ হয় দীপনাথের। বলে, তা পাত্রটাও প্রীতমই ঠিক করে দিয়ে যেত না হয়!

বিলু খুবই অস্বস্তি বোধ করছে। আঁচলটা গায়ে টান টান করে জড়িয়ে শাড়ির খুঁটটা আঙুলে জড়াচ্ছে। মুখ তুলছে না, কিন্তু ওর ছটফটানি স্পষ্ট বোঝা যায়। দীপনাথ খর চোখে বোনকে দেখছিল। একটা আবছা সন্দেহ খেলে যায় মনে।

বিলু কিছু বলল না। খানিক অপেক্ষা করে দীপনাথ বলল, প্রীতমকে আজ একটু বকব। এসব কথা কেন বলবে ও?

মৃদু দৃঢ়স্বরে বিলু বলে, না। কিছু বলার দরকার নেই। হয়তো ভুল বুঝবে। ভাববে, আমি তোমার কাছে নালিশ করেছি।

নালিশ তো করাই উচিত।

ওর এখন ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। অন্যরকম হয়ে গেছে! কিছু বললে হয়তো খেপে উঠবে।

প্রীতম খেপে উঠবে! কথাটা বিশ্বাসই করা যায় না। প্রীতমের কোনওদিন রাগ দেখাই যায়নি। সেই ছেলেবেলায় শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার রাস্তায় দীপনাথের হাতে মার খেয়ে ছেলেমানুষের মতো অসহায় আক্রোশে চেঁচিয়েছিল প্রীতম। বড় হয়ে সে হয়ে উঠেছে শান্ত, নির্বিরোধী এবং প্রায় ব্যক্তিত্বহীন এক মানুষ। স্ত্রৈণ? না, ঠিক স্ত্রৈণও বলা যায় না প্রীতমকে। কোনওদিন ঝগড়া করেনি বিলুর সঙ্গে, মতে মত দিয়ে চলেছে, তবু আলাদা একটা সত্তাও বেঁচে ছিল তার মধ্যে। বিলু প্রীতমকে হয়তো কোনওদিনই ঠিকমতো বোঝেনি।

অচলা এসে খবর দিল, প্রীতম জেগেছে।

নিঃশব্দে দীপনাথ গিয়ে প্রীতমের পাশটিতে বসে। ওর রোগা দুর্বল হাতখানা নিজের হাতে তুলে নেয়।

প্রীতমের মুখে আজ হাসি ফুটল অনেক দেরিতে। মৃদু স্বরে বলল, ক'বছর পরে এলে?

বছর! দূর পাগলা। অফিসে দিন সাতেক খুব ভুতুড়ে খাটুনি চলছে।

জানি। তুমি কাজের লোক।

অপদার্থ বলেই তো খাটতে হয় বেশি। তোর মতো কোয়ালিফিকেশন থাকলে খাটতে হত না।

কোয়ালিফিকেশন কোন কাজে লাগল, সেজদা?

লাগবে। সেরে ওঠ, দেখবি।

তুমি কি ছেলেমানুষ হয়ে গেলে, সেজদা! সেরে ওঠ বললেই কি সেরে উঠব?

তোর কী হয়েছে বল তো? আগে তো সবসময়ে বলতিস ভাল আছি।

আজকাল আমি ভাল নেই।

কেন ভাল থাকিস না? কেন মেজাজ খারাপ করিস?

বেঁচে থেকে কী হবে? কিসের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁচে মানুষ? কোন আশায় রোজগার করে? কোন পিপাসায় সারাদিন ভূতের মতো খেটে বিকেলে বাড়ি ফিরে আসে?

কী সব যা-তা বলছিস?

পায়ের নীচে মাটি সরে গেলে মানুষ আর বেঁচে থাকবে কেন?

অনেক রোগা, দুর্বল, নির্জীব দেখাচ্ছে প্রীতমকে। কণ্ঠস্বর তত স্পষ্টও নয়। তবু তার ভিতর থেকে একটা ঝাঁঝ আসছে।

দীপনাথ মৃদু স্বরে বলল, চুপ কর। দুনিয়ার সবকিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই।

তার মানে?

তুই যা বলতে চাইছিস তা আমি জানি।

সামান্য অবাক হয়ে প্রীতম বলে, জানো? কী জানো বলো তো?

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, এ ঠিক জানা নয়। আন্দাজ। তবে আন্দাজটা হয়তো মিথ্যে নয়। বলব? শুনে তোর কী লাভ, প্রীতম? বরং জেনে রাখ, তুই যেমন জানিস, আমিও তেমন জানি।

দীপনাথের হাতটা কাকের পায়ের সরু দাঁড়ার মতো আঙুলে চেপে ধরার চেষ্টা করে প্রীতম এই প্রথম মন খুলে হাসল। গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলল, জানো! তুমি জানো! কী করে জানলে? নিজের চোখে কিছু দেখেছ?

দূর বোকা! আমি কি গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াই? তুই যেভাবে জেনেছিস আমিও ঠিক সেইভাবে... আন্দাজ, অনুমান।

প্রীতম গভীর দৃষ্টিতে দীপনাথের দিকে চেয়ে বলে, তোমার খুব সূক্ষ্ম অনুভব আছে, সেজদা।

মোটেই নয়। কিন্তু আমি বলি, তুই ওসব নিয়ে কেন ভাবিস? মানুষ একটা বিশ্বাসের জায়গা চায়, নির্ভরতা চায়, আশ্রয় চায়—এসব তো পুরনো কথা। কিন্তু তোর তো তা নয়। বিলু তোর বউ বটে, কিন্তু তুই বেঁচে আছিস নিজের জোরে। বউ যদি বিশ্বাস না রাখে, তাতেও তোর কিছু এসে যায় না, প্রীতম। বেঁচে থাকাটাই যে তোর আসল পায়েব তলার মাটি। তুই কেন ছিচকাঁদুনের মতো অন্যের ওপর নির্ভর করবি?

তুমি কেন এতদিন এলে না সেজদা? এসব কথা কেন আগে এসে বললে না আমায়? সমস্যাটা নিয়ে আমি রোজ শুয়ে শুয়ে ভাবছি আর জড়াচ্ছি।

প্রীতমের চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কেটে দীপনাথ বলে, বিলু বা অরুণ তো তোর কোনও প্রবলেম নয়, প্রীতম। তবু যে ওটা নিয়ে ভেবেছিস তার কারণ, পুরুষের স্বাভাবিক অধিকারবোধ। বিয়ের পর একজন মেয়েকে পুরোপুরি পাব, সে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হবে, তার ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যাবে, এসব হল পুরুষদের মজ্জাগত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখবি, বড় করে পাত পেতে লাভ নেই, যে দেয় সে তার আন্দাজ মতোই দেয়। বিলু বা সংসারের আর কারও কাছ থেকে কিছু চাসনি, প্রীতম। শুধু বেঁচে থাকাটাকই বড় করে দেখ।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না সেজদা। ঘটনা যাই হোক, আমার তো সত্যিই তাতে কিছু যায় আসে না।

এতক্ষণে বুঝেছিস বোকারাম।

কিন্তু বেঁচে থাকারও তো আর আমার কোনও দরকার নেই।

কেন? ওকথা কেন বলছিস? এতক্ষণ তা হলে কী বুঝলি?

আমি যা বুঝেছি তা তুমি কোনওদিন বুঝবে না। তোমাকে কী করে ভালবাসার তত্ত্ব বোঝাব বলো তো?

বোঝালে বুঝব। বল শুনি।

আমি যে বিলুকে ভালবাসি সেটা বোঝো?

দীপনাথ গম্ভীর হল। সে ভেবেছিল বিলুকে গুরুত্বহীন করে দিয়ে প্রীতমকে শান্ত করা যাবে। সেটা হয়নি। এর মধ্যে একটা ভালবাসার চোরকাঁটাও বিঁধে আছে তা হলে। সে বলল, ভালবাসবি না কেন?

অত আলগাভাবে কথাটা ভেবো না। আমি জানি তুমি আজও সত্যি করে কাউকে ভালবাসোনি। বেসেছ?

কে জানে বাবা!

বাসোনি। সংসারে তোমার কোনও ইনভলভমেন্ট নেই বলেই অত সহজে সব ঘটনাকে উড়িয়ে দিতে পারলে। আমি তোমার মতো অত বেপরোয়া হব কী করে? ভালবাসলে তা হওয়া যায় না।

তা হলে কী করবি?

বিলু কোথায়? তাকে ডাকো, আমি আজ তোমার সামনে বিলুকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

দীপনাথ চমকে ওঠে, বলিস কী? তুই কি পাগল? ওসব কথা এভাবে বলতে নেই।

প্রীতম শান্তভাবে অকপট চোখে চেয়ে বলল, কথাটা বিলুকে এতদিন জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। কী জানি যদি অপমান বোধ করে দোতলা থেকে ঝাঁপ দেয়। আজ তুমি আছ, তোমাকে মাঝখানে রেখে কথাগুলো বলব।

দীপনাথ শক্ত করে প্রীতমের হাত চেপে ধরে কঠিন গলায় বলে, না প্রীতম, এ কাজ করিস না।

সেজদা, আমি শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছি। শেষবারের মতো। আর কখনও বিলুর সঙ্গে দেখা হবে না। কথা ক'টা জেনে গেলে নিশ্চিন্তে যাওয়া হবে। নইলে বড্ড ছটফট করব যে।

না, প্রীতম।

কেন নয়?

আমি বিলুর দাদা। খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

আমি খারাপ কিছু বলব না, সেজদা। শুধু জিজ্ঞেস করব, ও অরুণকে সত্যিই ভালবাসে কি না। যদি বাসে তা হলে কী করে বাসে? কীভাবে সেটা সম্ভব হল? আর যদি সম্ভব হয়েই থাকে তবে আমি কোন বিশ্বাসে এতকাল বেঁচে ছিলাম? কার জন্য রোজগার করেছি, কাকে ভেবে দিনের শেষে বাড়ি ফিরে এসেছি?

পৃথিবীটা কীরকম তা কি জানিস না, প্রীতম?

না জানি না। আমি বিলুকে আজও ভালবাসি। তাই আমি ওকে জিজ্ঞেস করব, বাকি জীবন ও অরুণকে ঠকাবে কি না। যদি ঠকায় তবে ঘরে ঘরে সেই ঠকানোর হাওয়া গিয়ে লাগবে কি না। আমি স্পষ্ট কথা জানতে চাই।

তুই আজ বড্ড ছেলেমানুষি করছিস, প্রীতম। তোর বোঝা উচিত, দুনিয়ার সব সত্য জানতে নেই। এগুলো না জানলেও তোর চলবে।

তুমি ভাবছ আমি মরে যাব বলেই এসব কথা না জানা ভাল। তাই না সেজদা?

না প্রীতম, তা নয়।

আমি জানি।

তুই ভুল জানিস।

বিলুকে ডাকো।

না। তুই একটু শান্ত হ।

নিজের বোনকে আড়াল করতে চাইছ না তো?

ছিঃ প্রীতম। তুই কি জানিস না, বিলুর চেয়েও আমার কাছে তুই-ই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট?

প্রীতম ক্লান্তিতে চোখ বুজল। তারপর সামান্য দমফোট গলায় বলল, বিলুকে ডাকার দরকার নেই। ও সবই শুনেছে। ভিতরের ঘরের পরদার আড়ালে এতক্ষণ ছিল।

দীপনাথ একটু তটস্থ হয়, তাই তো। বিলুর না শোনার কথা নয়। ফ্ল্যাটবাড়ির ঘরের মধ্যে ঘর। কান পাতলেই শোনা যায়। সে নিচু হয়ে ফিস ফিস করে বলল, কেন শোনালি, প্রীতম?

প্রীতম চোখ বুজে রেখেই হাসল। বলল, শোনাতে চেয়েছিলাম। একটু শুনুক। তাতে ওর ভাল হবে।

দীপনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ইদানীং তাকে বড় বেশি স্বামী-স্ত্রীর সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। অভিজ্ঞতা বড় কম হল না। তবু প্রীতমের এই নিষ্ঠুরতার কোনও তুলনা হয় না। তার মেজদা প্রকাশ্যে বউয়ের নামে কুৎসা রটিয়েও এতটা তীক্ষ্ণ লড়াই তৈরি করেনি।

ভিতরের ঘরের পরদা সরিয়ে হঠাৎ বিলু চৌকাঠে দেখা দেয়। মৃদু স্বরে বলে, সেজদা, শোনো।

দীপনাথ জড়তা কাটিয়ে ওঠে।

পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিলু মৃদু স্বরে বলে, ও কী বলছিল, সেজদা?
কেন, তুই শুনিসনি?
একটু-আধটু কানে এসেছে।
না শুনলেই ভাল করতিস।
আমি শুনতে চাই। তুমি বলো।
কী বলব? বলার কিছু নেই।
ও কি শিলিগুড়ি যাবেই?
তাই তো মনে হচ্ছে। যাওয়াই ভাল।
একটু আগের কাঠিন্য হঠাৎ ঝরে গেছে বিলুর। কেমন সাদা পাঁশুটে মুখে চেয়ে থাকে দীপনাথের দিকে। হলুদ আলোয় ঠোঁট দুটো বিবর্ণ দেখায়। অনেক রোগাও হয়ে গেছে বিলু। গলার স্বর আবার হঠাৎ ভেঙে গেল ওর। বলল, যাক না! যাক। কে আটকাচ্ছে?
এসব কথা বলে সাধারণ মেয়েরা হঠাৎ কেঁদে ফেলে বা ভেঙে পড়ে। বিলু তা করল না। খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেমন ছিল। খাটে সবুজ নাইলনের মশারির মধ্যে লাবু নিশ্চিন্তে ডান কাতে ঘুমোচ্ছে। খুব আস্তে ঘুরছে সিলিং-এর পাখা।
কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। তারপর বিলুই হঠাৎ বলল, ও আমাকে সন্দেহ করে।
সন্দেহ কেন করবে? সন্দেহ নয়।
তোমাকে কিছু বলেনি?
বলেছে। তবে সেটা সন্দেহ নয়, বিলু। আমিও জানি সেটা সত্য।
বিলু মেঝেতে পা ঘষল। মুখ তুলল না। মৃদু স্বরে বলল, তুমিও আমাকে বিশ্বাস করো না সেজদা?
দীপনাথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, অরুণকে ছেড়ে দে না কেন বিলু! কেন অশান্তি বাড়াচ্ছিস?
একটু তেজের গলায় বিলু বলে, ছাড়ার কিছু তো নেই। অরুণের মতো শুভাকাঙ্ক্ষী আমার কে আছে?
এ সময়ে দীপনাথের আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে গেল। বিলুর দেওয়া পাজামাটা সে এখনও পরেনি। মৃদু স্বরে বলল, আজ যাই রে বিলু। পরে একদিন এসে থাকব।
বিলু অবাক হল না। পরিস্থিতি পালটে গেছে। বলল, খেয়ে যাও।
না, খিদে নেই।

মেসে ফিরতে রাত হয়ে গেল। ঢাকা খাবার ছুঁয়েও দেখল না দীপনাথ। বিছানায় শুয়ে জেগে রইল। ঘুম এল ভোরের দিকে, যখন দীর্ঘ বিরতির পর আবার বৃষ্টি নামল বাইরে।
পরদিন আধভেজা হয়ে অফিসে পৌঁছে পেডেস্টাল ফ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে প্যান্ট শার্ট শুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সে। এ সময়ে এক্সটেনশন লাইনে তার টেবিলের টেলিফোন বেজে ওঠে। হঠাৎ কেন যেন আওয়াজটা শুনেই মনে হল, মণিদীপা। বহুকাল তার ডাক আসেনি।
রিসিভার কানে তুলতেই নির্ভুল গলাটি বলল, আমি ভীষণ আটকে পড়েছি এক জায়গায়। একটু হেলপ করবেন?
দীপনাথ কাচের শার্সি দিয়ে বাইরে বৃষ্টির প্রচণ্ড তাণ্ডব দেখতে পাচ্ছিল। ভরদুপুরেও প্রায় ঘুটঘুট্টি অন্ধকার চারদিকে। রাস্তায় কোনও চলমানতা নেই। গাড়ি না, মানুষ না, গোরুটা পর্যন্ত না। সে মৃদু স্বরে বলল, এই ওয়েদারে ঈশ্বর আপনার সহায় হোন। কোথায় আটকে পড়েছেন?
বাগবাজারের এক মিষ্টির দোকান থেকে ফোন করছি। রাস্তায় হাঁটুজল।
দীপনাথ বলল, এখানে কোমর সমান। কিছু করার নেই। অপেক্ষা করুন। বোস সাহেবকে লাইনটা দেব?

বিরক্ত মণিদীপা বলে, তা হলে আর আপনাকে ফোন করছি কেন?

সত্যিই তো, কেন?

প্রমোশন পাওয়ার পর খুব চোপা হয়েছে তো আপনার!

প্রমোশন পেলেও আমি এখনও বোস সাহেবের আন্ডারে। আপনার মতোই।

আমি কারও আন্ডারে নই। আই অ্যাম নট এ স্লেভ লাইক ইউ।

সেকথা থাক। আপনার জন্য কী করা যায় বলুন তো!

সেটাই তো আপনাকে ভাবতে বলছি।

বোস সাহেবকে বলি, তিনিও না হয় একটু ভাবুন।

আপনাদের কাউকেই ভাবতে হবে না। আমিই ভাবব।

রাগ করলেন? আপনার ভয়ের কিছু নেই। এখন বেলা বারোটা মাত্র বাজে। বৃষ্টি থামবে, গাড়িঘোড়াও চলবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে এই যা। বাগবাজারে কোথায় গিয়েছিলেন?

যেখানে আমার খুশি। শুনুন, অফিসের একটা গাড়ি পাঠাতে পারেন না?

গাড়ি? আমার চোখের সামনে অন্তত দশ-বারোখানা গাড়ি রাস্তায় জলবন্দি হয়ে পড়ে আছে। গাড়ির কথা ভুলে যান। গরিবের বন্ধুরা বিপদে পড়লেই কেন গাড়ির কথা ভাববে?

আবার কটকটে কথা! আমার আধুলিটা তা হলে ফেরত চাইব কিন্তু।

ওই যাঃ। আধুলিটা ফেরত দিইনি আপনাকে?

কই আর দিলেন!

তা হলে শিগগিরই একদিন যাচ্ছি ফেরত দিতে।

মণিদীপার পরের কথাটা অস্পষ্ট এল। লাইন ডেড। সম্ভবত আন্ডার-গ্রাউন্ড কেবল-এ জল ঢুকেছে। তবু মনে হল মণিদীপা জিজ্ঞেস করছিল, উইথ লাভ?

॥ বিয়াল্লিশ ॥

কতকাল পরে রেলগাড়ি দেখছে প্রীতম!

অ্যাম্বুলেন্স থেকে স্ট্রেচারে নামিয়ে ট্রেনের একটা ফার্স্টক্লাশ কুপেতে চটপট তাকে তুলে দিয়ে গেছে বাহকেরা। কিন্তু ওই সময়টুকুতেই সে অবাক হয়ে ঠিক লাবুর মতো ছেলেমানুষি কৌতূহলে রেলগাড়িটাকে দেখেছে।

নীচের বার্থে নরম বিছানায় শুয়ে সে রেলগাড়ির অদ্ভুত নেশারু গন্ধটা পাচ্ছিল। কাঠের পালিশ, গদি আর মৃদু ফিনাইল মিলে বোধহয় এই গন্ধটা তৈরি হয়। বড় ভাল লাগে।

কাঁদবে বলে লাবুকে স্টেশনে আনা হয়নি। তবু কি কাঁদেনি? অসহায় তোম্বাপানা মুখ করে সারাদিন বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করেছে প্রীতমের বিছানার আশেপাশে। রওনা হওয়ার সময় সামলাতে পারেনি, হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। প্রীতম মড়ার মতো মুখ করে শক্ত হয়ে রইল। মনে মনে জপ করল, ওরা কেউ না, ওরা আমার কেউ না। তবু সে তো জানে, আমৃত্যু লাবুর মুখখানা চোখে ভাসবে তার।

স্ট্রেচারে অ্যাম্বুলেন্সে ভেসে ভেসে চলে আসার সময় সে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, এ শোক বেশিদিন তো নয়। শোনোনি তোমার শরীরের ভিতরে কোলাহল আর জয়ধ্বনি করছে জীবাণুরা। বেশিদিন নয় হে, বেশিদিন নয়।

এতদিনে গতকালই প্রথম সে তার বিজ্ঞাপনের একটা জবাব পেয়েছিল। ছোট একটা কোম্পানি তাকে দিয়ে অডিট করাতে চেয়েছে। সামান্য ফি দেবে। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল প্রীতম, হয়তো

কাজ-টাজ হাতে নিলে বেঁচে যাব। তারপর ভাবল, খেলাটা শেষ হওয়াই ভাল। খামোখা টানাহ্যাঁচড়া করে ক্ষতবিক্ষত হওয়া। আর লড়াই নেই। এবার নিশ্চিন্ত।

সারাক্ষণ বিলু পাশাপাশি রয়েছে। ট্রেনের কামরা অবধি। পায়ের কাছে বসে প্রীতমের রোগা হাঁটুর ওপর হাত রেখে পলকহীন চেয়ে আছে। বিকেল থেকে কেবলই ওই মূক চেয়ে থাকা। কথা নেই। প্রীতম অবশ্য চাইছে না। চেয়ে কী হবে? মায়া বাড়বে।

তবু এই শেষ সময়টুকু এভাবে কাটিয়ে দেওয়া অভদ্রতা বলে প্রীতম বিলুকে জিজ্ঞেস করল, মেজদা আসবে না?

বিলু সংবিৎ পেয়ে বলল, তুমি যে কেন সেজদাকে মেজদা ডাকো!

আমি তো মেজদাই ডাকব। পিসিমার ছেলেরা ডাকত। ও আমাদের ছেলেবেলা থেকে ডেকে অভ্যাস। তবে আজকাল সেজদাও ডাকি, কিছু ঠিক নেই।

বিলু বলল, আসবার তো কথা। হয়তো অফিসে কাজ পড়েছে।

মেজদা আসবেই। তুমি একটু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। হয়তো কামরাটা চিনতে পারছে না।

বিলু নিঃশব্দে উঠে গেল। একটু বাদে ফিরে এসেই বলল, শতম তো রয়েছে বাইরে।

ট্রেন ছাড়তে কত দেরি?

এখনও কুড়ি মিনিটের মতো।

শতমটা যে কেন একগাদা টাকা খরচ করে ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কাটতে গেল। সেকেন্ড ক্লাশেই দিব্যি যেতে পারতাম।

এই ভাল হয়েছে। সেকেন্ড ক্লাশে ভিড়, গোলমাল, ধাক্কাধাক্কি।

সেটাই তো ভাল। কতকাল মানুষজন দেখি না, গোলমাল কানে আসে না। জ্যান্ত তাজা, একগাদা মানুষ দেখতে কত ভাল লাগত।

অসুবিধে হত।

তুমি বুঝবে না মানুষের ভিড় আমার এখন কত প্রিয়।

ঘরবন্দি থাকলে ওরকম মনে হয়। কিন্তু ভিড় তো আর সত্যিই ভাল কিছু নয়।

আচমকাই অরুণের দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারাটা দরজা জুড়ে দেখা দিল। পরনে ধূসর রঙের সাফারি শার্ট আর প্যান্ট। হাতে গাড়ির চাবি।

একটুও চমকাল না প্রীতম। মনে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। শান্ত গলায় বলল, আসুন।

চললেন তা হলে?—অরুণ ভিতরে এসে দাঁড়ায়।

চললাম। বিলু আর লাবু রইল।

বিলু উঠে দাঁড়িয়ে অরুণকে বলল, এখানে বোসো।

অরুণ বসল না। হাত নেড়ে বিলুকে বসে থাকার ইঙ্গিত করে বলল, বিলুও তো ছুটির অ্যাপ্লিকেশন করেছে শুনলাম। করোনি বিলু?

হ্যাঁ।

শিলিগুড়ি কবে যাচ্ছ?

সামনের মাসে।

প্রীতম এই সংলাপ নীরবে শুনল। কথা বলল না। বিলু সামনের মাসে শিলিগুড়ি যাবে, এ কথা তাকে আগে বলেনি। এখন জেনেও প্রীতমের ভাল বা খারাপ কিছু লাগল না। মাথার মধ্যে কোনও কথাই তরঙ্গ তুলছে না। কেমন একটা জমাট নিরেট ভাব।

অরুণ ওপরের বাঙ্কে হাতের ভর রেখে ঝুঁকে বলল, আমার বিয়েটা পর্যন্ত আপনি থাকবেন আশা করেছিলাম।

প্রীতম সামান্য হাসল। বলল, বিয়েটা হোক। দূর থেকে শুভকামনা করব।

অরুণ মুখ গম্ভীর করে বলে, আপনার ওয়েল উইশিং-এর দাম আছে। আপনি সত্যিকারের ভাল লোক।

প্রীতম আবার হাসে। মাথাটা এত প্রতিক্রিয়াহীন কেন? এত জমাট কেন?

বিলু আবার হাঁটুতে হাত রেখেছে। আস্তে করে বলল, আমি আর দিন কুড়ি-পঁচিশ বাদেই যাচ্ছি। ততদিন ওষুধ-টষুধ ঠিকমতো খেয়ো।

ভেবো না। বাড়িতেই দেখার লোক আছে।

তবু বলছি।

গাড়ি ছাড়ার মিনিট সাতেক বাকি থাকতে দীপনাথ এল। মুখে ঘাম, উদ্বেগ। বড় বড় শ্বাস ছাড়ছে।

এলে মেজদা? ভাবছিলাম, বোধহয় পৌঁছতে পারবে না।

দেরি হয়ে গেল। বউবাজারে যা জ্যাম। ট্যাক্সি ছেড়ে প্রায় দৌড়ে এসেছি।

তোমার নর্থবেঙ্গলের ট্যুর আর নেই?

আছে। খুব শিগগিরই যাচ্ছি। অফিসে কিছু বকেয়া কাজ জমে গেছে বলে ডেটটা পিছিয়েছে।

তাড়াতাড়ি চলে এসো। আমি বেশিদিন—

চুপ কর প্রীতম।

প্রীতম আবার হাসে। মাথা একটু তোলার চেষ্টা করে বলে, পাঁচ মিনিটের বেশি বোধহয় সময় নেই। বিলু, তুমি নামো।

বিলু মৃদুস্বরে বলে, অনেক দেরি আছে।

প্রীতম দীপনাথের দিকে চেয়ে বলে, মাথাটা কেমন লাগছে মেজদা। বোধবুদ্ধি কমে যাচ্ছে। ক'টা বাজে বলো তো? সময় আছে?

দীপনাথ ঘড়ি দেখে বলে, মিনিট তিনেক।

শতম গাড়িতে উঠল না?

উঠবে। অত অস্থির হচ্ছিস কেন?

অস্থির নয়। গাড়িটা চললে আমার খুব ভাল লাগবে। কতকাল চলন্ত রেলগাড়িতে...কতকাল..

প্রীতম!

উঁ।

ওরকম করছিস কেন? শরীর কেমন লাগছে?

ভাল। খুব হালকা।—চোখ বুজে গভীর শ্বাস টেনে প্রীতম বলে, গাড়ি ছাড়লেই ভাল লাগবে।

দীপনাথ ওর কপালে হাত রাখে। করোটির মতো কপাল। চামড়ায় খসখসে ভাব। ঠিক এতটা দুর্বল কিছুদিন আগেও ছিল না প্রীতম। ডাক্তাররা পাকেপ্রকারে জবাব দিয়েছে অনেককাল আগেই, তবু অসম্ভব মনের জোরে লড়ে গেছে প্রীতম।

দীপনাথ ক্রুদ্ধ বিরক্ত চোখ তুলে অরুণের দিকে তাকায়। সুন্দর শয়তান। বলবে দীপনাথ? বলবে যে, আপনিই প্রীতমের এ অবস্থার জন্য দায়ী?

বলা যায় না। মানুষের সমাজে আজও ভদ্রতা, শিষ্টতার মতো কিছু ভাঁড়ামি এসে সত্যের মুখ চাপা দিয়ে ধরে।

অরুণ একদৃষ্টিতে দীপনাথকে দেখছিল। হঠাৎ বলল, আমেরিকায় এক জায়গায় মোটর নিউরো ডিজেনারেশন নিয়ে রিসার্চ চলছে। আমি চিঠি লিখেছিলাম। জবাব এসেছে, ওরা এখন এই রোগটা নিয়ে অ্যানিম্যাল রিসার্চ করছে। কোলোনে আর-এক জায়গায় যোগাযোগ করেছি।

কী লিখেছে?

এখনও জবাব আসেনি। যদি আসে তবে জানাব।—এইটুকু স্বাভাবিক গলায় বলে হঠাৎ মুখটা

কাছে এনে বলল, এস এন ডি ইজ ইনকিউরেবল ইউ নো।

দীপনাথ মাথা নাড়ে।

শতম দরজায় আসে। ছোট কুপটায় ভিড় হয়ে গেছে। শতম বলল, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। বউদি, নামো।

কথাটা শুনেও কয়েক সেকেন্ড বসে থাকে বিলু। তারপর উঠে প্রীতমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কোমল স্বরে বলে, আসছি। ভাল থেকো।

প্রীতম চোখ চাইল। বলল, গাড়ি চলছে বিলু?

না, এখনই ছাড়বে। আমি যাচ্ছি।

আচ্ছা।—বলে আবার চোখ বোজে প্রীতম। গাড়ি যখন সত্যিই ছাড়ল তখনও তার চোখ বোজা। গাড়ি নড়ে উঠলে হঠাৎ বলল, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

একটু বাদে কলকাতার চৌহদ্দি পেরিয়ে দার্জিলিং মেল মাঠঘাটের অন্ধকার ভেঙে যখন দৌড়োচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে তখনও প্রীতম কিছু টের পেল না। শতম শিয়রে বসে দাদার কপালে হাত রাখল। রোগা, পাণ্ডুর মুখখানার দিকে চেয়ে রইল গভীর দৃষ্টিতে। অনেকক্ষণ তার মুখে রাগ, অভিমান, দুঃখ খেলা করে গেল। তারপর শান্ত হল শতম।

দাদা!

উঁ।

ওদের কথা বিশ্বাস কোরো না।

কাদের কথা?

ডাক্তারদের কথা, বউদি বা অরুণদার কথা। ওরা কি দুনিয়ার সব কিছু জানে?

দুনিয়ায় সব কথা কেই-বা জানে!

শোনো দাদা, আমি বলছি, এ অসুখ ভাল হয়ে যাবে। তোমাকে এত সহজে মরতে দেব নাকি? ওরা তোমাকে মেরে ফেলছিল বলে আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

ভাল করবি? শুনিসনি, মোটর নিউরো ডিজেনারেশনের কোনও চিকিৎসা নেই?

রাখো তো! নাম চিকিৎসায় সব ভাল হয়।

প্রীতম মুখে কিছু বলল না। শুধু একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসল।

শতমের চোখে মুখে একটা গভীর বিশ্বাসের প্রত্যয় ফুটে উঠল, নামই সব। নাম থেকেই প্রাণ। নামে সব হয়। দেখবে দাদা?

ক্লান্ত চোখে একটু উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে প্রীতম বলে, এসব তো এতদিন বলিসনি।

বলব কী? ওরা তোমার এত চিকিৎসা করছে অথচ নিজেরাই বিশ্বাস করছে না যে, তুমি বাঁচবে। মূলে একটু বিশ্বাস না থাকলে কি হয়! ওদের কারও স্বভাবেই বিশ্বাস জিনিসটা নেই। বীজমন্ত্র জপে অসুখ সারে, এ কথা শুনলে হাসত। আজ তোমাকে ওই পরিবেশ থেকে তুলে আনতে পেরেছি বলে বলছি। তুমি শুধু একটু বিশ্বাস করো যে, তুমি বাঁচবে।

কিন্তু সব যে বড় দূরে সরে যাচ্ছে।

কিছুই দূরে সরছে না। তুমি চুপ করে চোখ বুজে থাকো। আমি তোমার শিয়রে বসে একটু জপ করি।

আচ্ছা।—প্রীতম চোখ বোজে।

শতম কামরার বাতি নিভিয়ে দেয়। প্রীতমের শিয়রে শিরদাঁড়া টানটান খাড়া রেখে বসে। ভ্রু-যুগল এবং নাসামূলের সঙ্গমে ত্রিকূটি। আজ্ঞাচক্র। তেসরা তিল। দার্জিলিং মেলের ঝোড়ো গতি, দুলুনি এবং প্রবল শব্দের জন্য মনটাকে সংহত করতে একটু দেরি হয়। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে

পারেও তা। আজ্ঞাচক্রে স্মিত হাস্যময় অপার্থিব সুন্দর মুখশ্রী ফুটে ওঠে। শুরু হয় বীজনামের স্পন্দন। একটু একটু কাঁপতে থাকে শতম। নামের ধ্বনির সঙ্গে তাল রেখে তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ পালটে যায়। শব্দ ধ্বনিত হতে থাকে। ত্রাতা ডাকে, অনাহত শব্দ ডাকে... শোন ওই অনাহত শব্দ— সব শব্দ শব্দ শব্দ। তিনি বলেছিলেন, দ্যাখ, আমাদের যেতে হলে সেই গঙ্গার ধারে যেতে হবে। শব্দগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, দ্যাখ্, আমার নাম করতে করতে আসলেই ওই ত্রিবেণীঘাটে পৌঁছিবে, তারপর ওই ত্রিবেণীতে পৌঁছিলে ওই শব্দগঙ্গা পেলেই গা ঢেলে দিয়ে বসে যা। রূপের রাজ্য আস্তে আস্তে পার হয়ে পড়। তারপর রূপও যাবে নামও যাবে। আমি কে জানিস? ওই শব্দটা। ওটা কী জানিস? ওই প্রণব।

স্টেশনের বাইরে এসে অরুণ বলল, দীপনাথদা, আপনাকে গাড়িতে পৌঁছে দিই?

দীপনাথ ভীষণ আনমনা ছিল। কথাটা শুনতেই পেল না। অরুণ দ্বিতীয়বার বলায় সে মাথা নাড়ল, না দরকার নেই। আমি তো কাছেই থাকি।

বিলু কিছু বলছিল না এতক্ষণ। এবার হঠাৎ বলল, আজ তোমাকে মেসে ফিরতেই হবে সেজদা?

কেন বল তো!

আজ প্রীতম চলে গেল। আমার খুব একা লাগবে।

তোর সঙ্গে যেতে বলছিস?

গেলে খুব ভাল হয়। যাবে?

অন্যমনস্ক দীপনাথ প্যান্টের পকেটে হাত ভরে কী যেন ভাবে অনেকক্ষণ। বলে, প্রীতমকে যেতে দিলি কেন?

গেলে আমি কী করব? জোর করল যে।

তোর জোর ছিল না?

তাতে ভাল হত?

দীপনাথ আবার একটু ভেবে বলে, না বোধহয়। এই ভাল হয়েছে।

ও ওর মা-বাবা ভাই-বোনকে বড় বেশি ভালবাসে। তাই আমি ভাবলাম, ও যদি নাই বাঁচে তা হলে অন্তত শেষ ক'টা দিন প্রিয়জনদের কাছে থাকুক। কোনও ভুল করেছি?

না তো।—দীপনাথ অবাক হয়ে বলে, ভুল করবি কেন?

অরুণ তার গাড়িটা দূরে পার্ক করে রেখেছে। তিনজন হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে যায়।

যাবে সেজদা?

চল।

অরুণ সামনে, গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনের সিটে বিলু আর দীপনাথ।

বিলু মৃদু স্বরে বলে, প্রীতম বড় কষ্ট পাচ্ছে সেজদা।

দেখলাম তো।

শুধু শরীরের কষ্টই তো নয়। দিনরাত ঘরবন্দি থাকতে কেমন লাগে বলো।

দীপনাথ একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

বিলু মাথা নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সবাই হয়তো আমার দোষ ধরবে।

আনমনা দীপনাথ বলল, কে দোষ ধরবে?

ওরা, ওই প্রীতমের বাড়ির সবাই।

কেন? তুই কী করেছিস?

আমি আবার কী করব? ওরা হয়তো বলবে, আমি প্রীতমের যথেষ্ট সেবা করিনি। শতমও সেইরকমই সব কথা বলে গেল। ওদের বিশ্বাস, আমি চাকরির নাম করে প্রীতমকে অ্যাভয়েড করেছি।

প্রীতমের বাড়ির লোককে আমি চিনি। ওরা খারাপ নয়।

এ কথাটাকে সমর্থন করল না বিলু। তবে জবাবও দিল না। গোঁজ হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, তুমি প্রীতমকে বড্ড ভালবাসো, না সেজদা?

উঁ।—স্বপ্নোত্থিত দীপনাথ বিলুর আবছা মুখের দিকে চায়। তারপর বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, প্রীতমটা যে ভীষণ ভাল। শিলিগুড়িতে আমরা একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। ওকে কি ভাল না বেসে পারা যায়?

প্রীতমও তোমাকে ভীষণ ভালবাসে।

জানি।

ও চলে যাওয়ায় তুমি আমার চেয়েও বেশি শক্‌ড।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, ঠিক তা নয়।

তুমি যে ভীষণ আনমনা হয়ে আছ।

দীপনাথ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, প্রীতম বাড়ি গেল। তাতে শক্‌ড হওয়ার কিছু নেই। আমি শুধু আমাদের ছেলেবেলার কথা ভাবছিলাম।

বলে চুপ করে রইল দীপনাথ। কলকাতায় প্রীতম ছিল। অশক্ত, শয্যাশায়ী, পঙ্গু হলেও ছিল। কিন্তু এখন, আজ থেকে আর নেই। কলকাতা এখন তো অনেক বিবর্ণ লাগবে দীপনাথের কাছে।

অরুণ বিলুদের বাসার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেল।

নিঃশব্দে ফ্ল্যাটে উঠে এল দীপনাথ আর বিলু। লাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া এসে ফাঁকা ঘরে হুটোপুটি খাচ্ছে। প্রীতমের বিছানার বেডকভারের কোণ বাতাসে উলটে আছে। ওষুধের ফাঁকা শিশিগুলো দাঁড় করানো বিছানার পাশের টেবিলে।

বিলু বাথরুমে গেছে। দীপনাথ দাঁড়িয়ে প্রীতমহীন ঘরখানা খুব মন দিয়ে দেখে। ঘরের কোণে প্রীতমের হুইল চেয়ার বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। প্রীতম চলে গেছে, এটা কি বুঝতে পারছে প্রীতমের বিছানা, টেবিল বা হুইল চেয়ার!

রাতে খেতে বসে কিছুই প্রায় খেতে পারল না দীপনাথ। বমি আসছে। মুখ ধুয়ে এসে বলল, প্রীতমের বিছানায় একটা ফর্সা চাদর পেতে দে। আমি আজ এই বিছানায় শোব।

বিলু আপত্তি করল না।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে বিলু এসে প্রীতমের বিছানায় দীপনাথের পাশে বসল।

পান খাবে সেজদা?

না।

এক্ষুনি শুয়ে পড়বে নাকি?

দীপনাথ অসহায়ভাবে হেসে বলে, শুয়ে লাভ নেই। আজ রাতে ঘুম আসা শক্ত।

তবে আমাকে প্রীতমের গল্প বলো। তোমাদের ছেলেবেলার গল্প।

শুনতে চাস?

চাই। আজ প্রীতমের কথা শুনতেই তো তোমাকে ডেকে আনা।

কথাটা হয়তো সত্যি নয় বিলুর। প্রীতমের কথা শুনতে তার হয়তো ততটা ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু সে জানে, সেজদা প্রীতমের কথা বলতে পারলে খুশি হবে।

প্রীতম। প্রীতমের কথা বলতে গেলেই বিশাল পাহাড়, বনশ্রেণি চোখে ভেসে ওঠে। ছেলেবেলার শিলিগুড়ির জনবিরল রাস্তাঘাট, উদোম মাঠ, অবারিত প্রসার মনে পড়ে যায়। প্রীতম তো কোনও বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়। সে যেন এই ছেলেবেলার এক অবধারিত শর্ত।

অনেক অনেক কথা জমা হয়েছিল বুকে। বলতে বলতে ফাঁকা হয়ে গেল বুক। হাঁটু মুড়ে ভিখিরির মতো করুণ ভঙ্গিতে বসে যতদূর সম্ভব মন দিয়ে শোনে বিলু।

॥ তেতাল্লিশ ॥

পরদিন ভাইবোনে অফিসে বেরোল একসঙ্গে। ভিড়ের বাসে রড ধরে দাঁড়িয়ে গুঁতোগুঁতির মধ্যেও দীপনাথ লেডিজ সিটে বসা বিলুকে লক্ষ করে। আজ সকালে বিলুর মুখে একটু বিষণ্ণতা এসেছে, একটু অন্যমনস্কতা। দুইয়ে মিলে ওর কাঠ কাঠ মুখটাকে কোমল লাবণ্যে মেখেছে বুঝি। চোখদুটো ভার ভার। রাতে হয়তো কেঁদেছে।

খুব ভাল, খুব ভাল।—মনে মনে বলে দীপনাথ।

বিলুকে ব্যাংকে পৌঁছে দিয়ে সে অফিসে যায়। মনটা আজ খুব গভীর এবং স্থির। দুঃখ নেই, আনন্দও নেই। তবু কী একটা গভীরতর ভাব থানা গেড়ে আছে।

অনেকক্ষণ সে কাজে মন দিতে পারল না। টেবিলে বসে রইল চুপচাপ। বোস সাহেব একটা ছোট কাজে দিল্লি গেছেন। কার্যত এখন অফিস চালাতে হচ্ছে দীপনাথকে। অফিসকে অবশ্য চালানোর কিছু নেই। আপনি চলে। কিন্তু বিস্তর কাজ জমে আছে।

মনটাকে জড়ো করতে সময় লাগল একটু। দুপুর পর্যন্ত একটানা কাজ করে গেল সে।

লাঞ্চে ফোন এল।

দীপনাথবাবু!—মণিদীপার গলা।

বলছি। কী খবর? সেদিন শেষ পর্যন্ত কীভাবে বাড়ি ফিরলেন?

থাক। জানতে যে চাইলেন সেটাই ভাগ্যি।

দীপনাথ হাসল। বলল, সেদিন কিছু করার ছিল না।

জানি। কিন্তু তা বলে একটু সিমপ্যাথিও দেখাতে নেই?

কেন? দেখাইনি?

আমি অবশ্য সিমপ্যাথির কাঙাল নই।

সেটা আর বলতে হবে না। হাড়ে হাড়ে জানি।

শুনুন, আমি একটু মুশকিলে পড়েছি।

কী মুশকিল?

হাতে টাকা নেই। মিস্টার বোসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যে এত ফাঁকা তা জানতাম না।

কত টাকা?

পাঁচশো হলেই চলবে। অ্যারেঞ্জ করা যাবে অফিস থেকে?

দীপনাথ বলল, আপনি কিছু ভাববেন না। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনার কবে দরকার?

আজই। এক্ষুনি।

এক্ষুনি কী করে হবে? আমি বরং বিকেলে—

না, অত দেরি করা অসম্ভব। আমি এসপ্ল্যানেড থেকে ফোন করছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি আপনাদের অফিসে যাচ্ছি।

ঠিক আছে। আসুন।

কেমন আছেন? ভাল?

আপনি কেমন?

চমৎকার। ফ্রি লাইক এ বাটারফ্লাই।

ফ্রিডম ফ্রম হোয়াট?

এভরিথিং। হাজব্যান্ড হাউজহোল্ড অ্যান্ড হেডেক।

অনেকটা আমার মতোই, তাই না?

তার মানে?

আমি যেমন ফ্রি ফ্রম ওয়াইফ ওয়েলথ্ অ্যান্ড ওরিজ।

এটাও কি রং নাম্বার?

কেন বলুন তো!

আমি দীপনাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলছি, না অন্য কারও সঙ্গে?

নম্বর ঠিকই আছে।

আপনি এত স্মার্ট হলেন কবে থেকে? খুব বোল ফুটছে দেখছি। দিব্যি তো সরল সোজা গেঁয়ো লোকটি ছিলেন। বোল ফোটাচ্ছে কে?

কেউ হবে।—দীপনাথ হাসছিল না। ভ্রু কোঁচকানো। চিন্তিত মুখ। একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বলল, বোস সাহেবের সঙ্গে আপনার একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল না?

হ্যাঁ। একমাত্র সেটাই আমার অ্যাকসেসিবল অ্যাকাউন্ট।

আপনার নিজের অ্যাকাউন্টও তো আছে!

আছে। কিন্তু তাতে বহুকাল টাকা নেই।

বোস সাহেবের বেতন, যতদূর জানি, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টেই জমা হয়।

মণিদীপা একটু চুপ করে থাকে। তারপর একটু ঝাঁঝালো গলায় বলে, জেরা করার মানে কী?

জেরা নয় মিসেস বোস। কেবল সেফ-সাইডে থাকা। বোস সাহেব ফিরে এলে হয়তো কৈফিয়তটা আমাকেই দিতে হবে।

আমার কথা বলবেন। কৈফিয়ত যেন আমার কাছেই চায়।

রাগ করলেন? আসলে টাকা-পয়সার ব্যাপারটাই এত বিচ্ছিরি যে, এই একটা ব্যাপারে কিছুতেই আব্রু রাখা চলে না।

আপনি আজকাল খুব প্র্যাকটিক্যাল হয়েছেন। এত প্র্যাকটিক্যাল যে আমার আবার মনে হচ্ছে এটা রং নাম্বার।

একদিক দিয়ে বিচার করলে এটা তো রং নাম্বারই, মিসেস বোস।

তার মানে?

সেদিন বৃষ্টিতে বাগবাজারে আটকে পড়ে আপনার ফোন করা উচিত ছিল মিস্টার বোসকে। আপনি তা না করে একটা রং নাম্বারে ডায়াল করেছিলেন। মনে আছে?

মণিদীপা একটু সময় নেয়। এত সময় নেয় যে, দীপনাথের একবার সন্দেহ হয় লাইনটা কেটে গেছে। মণিদীপা অবশ্য লাইন ছাড়েনি। খানিক বাদে একটু গম্ভীর গলায় বলে, আপনি মাইন্ড করবেন জানলে আপনাকে ফোন করতাম না।

মাইন্ড করিনি। বরং আনন্দে শিহরিত হয়েছিলাম। তবু সেটা কিন্তু রং নাম্বার।

আমি রং নাম্বার বলে ভাবি না। ভাবলে এত সহজে আপনার কাছে আজ টাকার কথা বলতে পারতাম না।

একটা কপট শ্বাস ছেড়ে দীপনাথ বলল, আমার মেজোবউদি ঠিকই বলে।

কী বলে?

সে আপনাকে বলা যাবে না।

মেজোবউদি মানে রতনপুরের সেই বউদি?

হ্যাঁ। এই সেদিনও মেজোবউদি বলছিল—

থামলেন কেন?

থামাই ভাল। সে বলা যায় না।

তবু শুনি!

কী শুনবেন? শোনার মতো নয়। টাকাটা রেডি রাখছি, এলেই পেয়ে যাবেন।

শুনুন। টাকাটা যখন পাওয়া যাচ্ছেই তখন মেক ইট এ থাউজ্যান্ড।

আপনার সঙ্গে ফোনে বেশিক্ষণ কথা বলা দেখছি বিপজ্জনক।

কেন?

আর পাঁচ মিনিট পরে তো আরও পাঁচশো টাকা বাড়িয়ে দেবেন।

খুব অসুবিধে হবে নাকি?—গলাটা একটু করুণ শোনায় মণিদীপার। বলে, বোস কবে ফিরবে কিছুই বলে যায়নি। অথচ আমাকে তো এস্টাব্লিশমেন্টটা চালাতে হবে!

এস্টাব্লিশমেন্ট যে মণিদীপা চালায় না তা দীপনাথ ভালই জানে। তবু বুঝদারের মতো ভালমানুষি গলায় বলল, অলরাইট। ইট উইল বি এ থাউজ্যান্ড।

ছাড়ছি তা হলে?

ঠিক আছে।

ফোন রেখে দীপনাথ ওঠে। বুড়ো অ্যাকাউন্ট্যান্ট অবনীবাবুর টেবিলে গিয়ে বোস সাহেবের পে-অর্ডারগুলো উলটে-পালটে দেখে। পৃথিবীতে উচ্চতম হারে ট্যাক্স কেটে নেওয়া হয় একমাত্র ভারতবর্ষেই। তা ছাড়া অফিস থেকে বোস সাহেবের প্রচুর টাকা অ্যাডভান্স নেওয়া আছে। সেইসব বকেয়া কর এবং অ্যাডভান্স কেটে নেওয়ার পরও বোস সাহেবের অ্যাকাউন্টে বড় কম জমা হয় না। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে টেবিলে ফিরে এসে বোস সাহেবের ব্যক্তিগত আয়করের রিটার্ন যে জমা দেয় সেই মিত্রকে ফোন করল। ভ্রু আর-একটু কুঁচকে গেল তার।

খুব কম করেও জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে হাজার দশেক টাকা থাকার কথা। মাস এখনও শেষ হয়নি। দীপনাথ ক্ষান্ত হল না। ফোন করল ব্যাংকে। দীপনাথের খুবই পরিচিত ব্যাংক। বোস সাহেবের হরেক চেক বহুবার জমা দিতে এসেছে। কাজেই সে অনায়াসে জেনে নিতে পারল, বোস সাহেব দিল্লি যাওয়ার পর মণিদীপা কম করেও তিন হাজার টাকা তুলেছে। মাত্র দু'-তিন দিনে। এবং আজই আবার টাকা চাইছে?

দীপনাথ সমস্যাটা সরিয়ে রেখে অফিসের কাজ টেনে বসল। বোস সাহেবের অনুপস্থিতিতে কার্যত সে-ই কর্তা।

কাজ করতে করতে হুঁশ ছিল না দীপনাথের। হঠাৎ হাতঘড়ি দেখে অবাক হল। বেলা পৌনে পাঁচটা। মণিদীপা এখনও আসেনি। অ্যাকাউন্ট্যান্টকে বলে টাকার ব্যবস্থা করে রেখেছে দীপনাথ। সাড়ে পাঁচটায় অফিস ছুটি।

ক্যাশিয়ারকে ডেকে ভাউচারে সই করে টাকাটা নিজের টেবিলের টানায় রেখে চাবি দিল দীপনাথ। আগে তার এত ক্ষমতা ছিল না, এত স্বাধীনতাও নয়। আজকাল সে নিজের নামে অনেক টাকা অফিস থেকে নিতে পারে। মাইনের সঙ্গে হিসেব করে কেটে নেবে।

মণিদীপার কথা কয়েক মিনিট ভাবল দীপনাথ। তারপর আবার কাজ টেনে বসল।

অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ারও প্রায় পনেরো মিনিট বাদে বেয়ারা এসে বলল, মেমসাহেব এসেছেন।

কোথায়?

করিডোরে।

ভিতরে নিয়ে এসো।

পৌনে ছ'টা ছাড়িয়ে ছ'টার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটা। দীপনাথ টেবিলের কাগুজে জঞ্জাল সরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছিল। বুক কাঁপছে, গলা শুকোচ্ছে।

খুব ছাপছক্করওলা রাজস্থানি ঘাঘরা আর কামিজে রঙের একটা ঘূর্ণি তুলে মণিদীপা শূন্য অফিসঘরটায় ঢোকে। চারদিকে মরা টেবিল, প্রাণহীন ক্যাবিনেট, বিশুষ্ক কাগজের স্তূপের ভিতর বসন্তের হাওয়া এল। সঙ্গে সুগন্ধ।

আমার জন্যই বসে আছেন? না কি কাজ ছিল?

কাজ ছিল।

যাক তা হলে বসিয়ে রাখিনি। রাখলে তো দোষ ধরতেন।

ধরতাম। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ হত, আমি চলে গেলে আপনি টাকাটা আজ আর পেতেন না।

পেতাম।

কী করে?

আপনি পৌঁছে দিতেন।

তাই নাকি? কী করে বুঝলেন?

আই নো ইউ। ইউ আর ফেথফুল লাইক এ—

ডগ?— বলে হাসে দীপনাথ।

ভ্রুকুটি করে মণিদীপা বলে, তাই বলছি?

বললেও দোষ হত না। কুকুরের কিছু গুণ পেলে মানুষও বর্তে যেত।

এখনও বসতে বলেননি।

বসুন।

মণিদীপা বসে। চোখেমুখে সামান্য টেনশন। চনমন করছে। রোজ যেমন দেখায় তেমনি ভাল দেখাচ্ছে তাকে। মুখে খুব একটা রং মাখেনি। স্নিগ্ধ কোমল মুখশ্রী। একটু গম্ভীর, একটু করুণ।

চা খাবেন? সামনেই একটা ভাল দোকান আছে। বেয়ারা এনে দেবে।

আমার চায়ের নেশা নেই।

তা হলে কী দিয়ে আপ্যায়ন করি আপনাকে?

আপ্যায়ন-টন এখন থাক। আপনি এখন এই অফিসের একজন বস, তাই না?

ছোট মাপের।

বস হতে কেমন লাগে?

মন্দ না।

মণিদীপা সুযোগ পেয়েও কোনও চিমটি কাটল না। এমনকী সেই বিষ-হাসিটাও হাসল না। বলতে পারত, একজন বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটেছে। জন্ম নিয়েছে একজন শোষণকারী বা ওই গোছের কিছু।

আপনাকে একটু ডিসটার্বড দেখাচ্ছে।

মণিদীপা চোখ না তুলে বলল, না তো। আপনার বউদি কী বলেছে, এবার বলুন।

বউদি!— বলে একটু অবাক হয় দীপনাথ, বউদি কী বলবে?

ওই যে তখন ফোনে বললেন, বউদি ঠিকই বলে!

বলেছি? ও হ্যাঁ। কিন্তু সে তো বলা যাবে না।

কেন বলা যাবে না?

কথাটা টপ সিক্রেট।

আমি শুনতে চাই।

কেন শুনতে চান?

নাই যদি বলবেন তবে বউদির রেফারেন্স দিলেন কেন?

সাধারণ মেয়েদের গোপন কথা শোনার অনভিপ্রেত কৌতূহল থাকে। কিন্তু আপনি তো সাধারণ নন।

মণিদীপা একটা কাচের পেপারওয়েট গ্লাসটপ টেবিলের ওপর কাত করে গড়িয়ে দেয়। ধরে। আবার গড়িয়ে দিয়ে একটু খেলা করে। গোমড়া মুখে বলে, কারও আড়ালে তাকে নিয়ে আলোচনা করাটাও তো উচিত নয়।

যারা আলোচনার যোগ্য তাদের নিয়েই আলোচনা হয়। সাধারণ মানুষকে নিয়ে কে আলোচনা করে বলুন!

উঃ। বলুন না বউদি কী বলেছেন!

দীপনাথ টেবিলের ড্রয়ার খুলে টাকাটা একটা লম্বা খামে ভরে এগিয়ে দেয়। বলে, নিন।

নেব না। আগে বলুন।

দীপনাথ মৃদু হেসে বলে, বউদি বলেছে, তোমার বসের বউয়ের মাথায় একটু ছিট আছে, ঠাকুরপো।

মোটেই না। আপনার বউদি আপনাকে ঠাকুরপো বলে ডাকেন না, নাম ধরে ডাকেন।

এতও মনে রেখেছেন!

মেয়েরা রাখে।

আপনি কি মেয়ে?

তবে কী?

না, না, ঠিক তা বলিনি।— দীপনাথ হেসে ফেলে বলে, আমি বলছিলাম, আপনি তো সাধারণ মেয়ে নন। ওসব খুঁটিনাটি লক্ষ করে অতি সাধারণ মেয়েরা, যাদের আই কিউ ভীষণ লো।

বারবার আমাকে অসাধারণ বলছেন কেন? আমি কিছু অসাধারণ নই।

আপনি মনে-প্রাণে প্রোলেতারিয়েত তা জানি। কিন্তু ঈশ্বর তো সবাইকে সমান গুণ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাননি। ওরকম অ্যান্টিকমিউনিস্ট দুনিয়ায় দুটো হয় না। আর বোধ হয় তাই কমিউনিস্টরাও অ্যান্টিগড।

কমিউনিস্টরা অ্যান্টিগড নয়। অ্যান্টিগড হচ্ছে ডেভিল। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসই করি না, তাই তার অ্যান্টিও হতে পারি না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধতা করতে গেলেও তার অস্তিত্ব মানতে হয়।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝেছি।— দীপনাথ হাত তুলে বলে, কিন্তু এটা তো মানবেন দুনিয়ার সবাই সমান নয়। সাধারণ আছে, অসাধারণ আছে।

মানি। কমিউনিস্টরা তো গাধা নয়।

আমি সেইটিই বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম আপনাকে।

ঠিক করে বলুন তো, বউদি কী বলেছেন!

আমার বউদি অতি সাধারণ। তিনি তাঁর মতো করে বলেছেন, ওসব আপনার শুনে কাজ নেই।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলে, আপনার বউদি খুব কমন মহিলা নন। শি নোজ হোয়াট ইজ হোয়াট।

দীপনাথ বিজ্ঞের মতো হেসে বলে, তা হলে বলছেন বউদি যা বলেছে তা সত্যি?

না জেনে বলি কী করে?

অ্যাসাম্পশন থেকে! বউদি নোজ হোয়াট ইজ হোয়াট!

মণিদীপা ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে বলে, মে বি। আগে তো শুনি।

টাকাটা নিন।

আগে বলুন।

বড্ড জ্বালাচ্ছেন তো! বউদি কিছু বলেনি। আমি আপনাকে টিজ করছিলাম।

মণিদীপা গাঢ় তীক্ষ্ণ চোখে দীপনাথের দিকে সরাসরি চেয়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে এক প্যাকেট দামি বিদেশি সিগারেট আর একটা লাইটার বের করে। সিগারেট ধরিয়ে রাজস্থানি পোশাকের কোমরে একটা ডোরে বাঁধা দুটো চাকতি আয়নার একটা তুলে নিজের মুখটা মন দিয়ে দেখে।

দীপনাথ সামান্য অবাক হয়। মণিদীপাকে সে সিগারেট খেতে আগে দেখেনি। কী বলবে তা ভেবে না পেয়ে একটু চুপ করে থাকে সে। তারপর বলে, এটা কবে থেকে ধরলেন?

অবান্তর প্রশ্ন।

মেয়েদের সিগারেট খেতে দেখলে আমার রিঅ্যাকশন হয়।

আমি মদও খাই।

ভাল করেন না।

বেশ করি।

বউদি ঠিক বলে।

মণিদীপা জ্বালাতন হয়ে চোখ ছোট করে তাকিয়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর বলে, ইয়ারকি হচ্ছে? আজ আমার কিন্তু ইয়ারকির মুড নেই।

বসের বউ ইয়ারকির পাত্রী নয়। ইয়ারকি করছি না।

আমি কারও বউ-টউ নই। বউদি কী বলেন?

বউদি বলেন—

বলে দীপনাথ একটু থামে। তারপর আচমকা বলে, বলব। ঠিকই বলব। তার আগে সিগারেটটা ফেলে দিন।

মণিদীপা প্রায় আস্ত সিগারেটটা মেঝেয় ফেলে স্যান্ডালে পিষে দিল। যেন সিগারেটটা ফেলে দেওয়ার একটা ছুতো সে নিজেও খুঁজছিল।

এবারে বলুন।

বলছি, বলছি। আর-একটা কথা।

কী?

প্রমিস করতে হবে, মদও খাবেন না।

মণিদীপা তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে, আমাকে কী পেয়েছেন বলুন তো! অ্যানাদার স্লেভ লাইক ইউ?

ভালবাসা জিনিসটা তো স্লেভারি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, আপনি আমার না হলেও নিশ্চয়ই আর-কারও স্লেভ।

অনেক জানেন তো! বলুন তবে কার?

ধরুন স্নিগ্ধদেব!

স্নিগ্ধদেবের কথায় হঠাৎ মণিদীপা নাক কোঁচকায়। তারপর কয়েকটা ঘন শ্বাস ছেড়ে বলে, স্নিগ্ধর কথা আমি ভুলে যেতে চাই। ও নামটা আর আমার সামনে প্লিজ উচ্চারণ করবেন না।

বিস্মিত দীপনাথ বলে, সে কী? স্নিগ্ধদেব কী করলেন হঠাৎ?

হি ইজ নাউ এ ফলেন গাই।

তার মানে?

বিশ্বাস করবেন? স্নিগ্ধদেব আমেরিকায় যাচ্ছে!

দীপনাথ ব্যাপারটা ধরতে পারল না। বলল, তাতে কী?

তাতে কিছু নয় বুঝি? আমেরিকান গভর্নমেন্টের টাকায় তাদের স্কলারশিপ নিয়ে ও চলে যাচ্ছে। মুখে বলছে, ওখানে গিয়ে মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট নিয়ে রিসার্চ করবে। কিন্তু আমি জানি, তা নয়।

আপনি কী জানেন?

আমি জানি, হি হ্যাজ অ্যাবানডনড দি রিভোলিউশন। ও যাচ্ছে সুখে থাকবে বলে।

কী করে বুঝলেন?

স্নিগ্ধদেবকে আমি যত গভীরভাবে বুঝি আর-কেউ তা বোঝে না। হি হ্যাজ এ চার্মিং পার্সোনালিটি। সবাইকে হিপনোটাইজ করে রাখতে পারে। এ বর্ন-লিডার। আমেরিকান এজেন্টরা ওকে সেই কারণেই পিকআপ করেছে।

সি আই এ?

মে বি। কিন্তু ও এখন সম্পূর্ণ ওদের ট্র্যাপে।

বুদ্ধিমান লোকেরা সহজে ট্র্যাপে পড়ে না মিসেস বোস।

আমি ইডিয়ট নই। জানি, স্নিগ্ধকে কেউ ট্র্যাপে ফেলেনি। বরং ও নিজেই একটা সোনার খাঁচা খুঁজছিল। পেয়ে গেছে।

তা হলে আমাদের কী হবে, মিসেস বোস?

তার মানে?

দীপনাথ হতাশার গলায় বলল, আপনার কাছে শুনে শুনে আমিও যে মনে মনে স্নিগ্ধদেবকে আমার লিডার বানিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই দুর্ভাগা দেশে একদিন লেনিন, মাও বা হো চি মিনের মতোই স্নিগ্ধদেব উঠে দাঁড়াবেন।

আবার ইয়ারকি?

বলে মণিদীপা দীপনাথের দিকে চেয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারল হয়তো। দীপনাথ ইয়ারকি করছে না। তার মুখে সত্যিকারের এক গভীর হতাশার কালিমা মাখানো। মণিদীপা ঝুঁকে বসে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করে, আপনার কী হল বলুন তো হঠাৎ? আর ইউ সিরিয়াস!

দীপনাথ খানিকক্ষণ শূন্যচোখে মণিদীপার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, অতটা না হলেও স্নিগ্ধদেব যে একজন মহৎ মানুষ ছিলেন তা আপনার ডিভোশন দেখেই মনে হয়েছিল। ওঁর যদি পতন হয়ে থাকে তবে সেটা আমাদের সকলের কাছেই দুঃখের ব্যাপার। বিশেষত আপনার কিছুই রইল না।

আমার কেন কিছুই থাকবে না! স্নিগ্ধ আমার কে?

হয়তো লিডার। হয়তো লিডারের চেয়েও বেশি কিছু। অন্তত ওই একটা জায়গায় আপনার ডিভোশনের কোনও খাঁকতি ছিল না।

ঠোঁট উলটে মণিদীপা বলল, আমরা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নই। এক স্নিগ্ধ মার্কিনদের দালাল হয়ে গেল তো কী! আরও হাজার স্নিগ্ধদেব আসবে।

মাথা নেড়ে দীপনাথ বলে, অত সোজা নয়। আপনিও সেটা জানেন।

বলেছি তো আমি ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নই। ব্যক্তিগত মেধা বা ব্যক্তিত্বেরও কোনও মূল্য নেই যদি তা বিপ্লবের কাজে না লাগে। স্নিগ্ধদেব এখন আমার কাছে নন-এনটিটি।

উনি কবে রওনা হচ্ছেন?

আসছে সপ্তাহে।

ওঁর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?

কী জানি! শুনেছি দিল্লি গেছে। সেখান থেকে ফিরে এসেই বউ-বাচ্চা নিয়ে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে রওনা হবে।

স্নিগ্ধদেব কি ইদানীং আপনার কাছে টাকা চাইতেন?

একটু অবাক হয়ে মণিদীপা বলে, চাইত। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?

এমনি কৌতূহল।

মণিদীপা গম্ভীর হয়ে টেবিলের কাচে আঙুল দিয়ে নকশা আঁকার চেষ্টা করতে করতে বলে, চাইত অবশ্য ধার হিসেবে। ওর কিছু গরম জামাকাপড় দরকার বিদেশে যাওয়ার জন্য।

পার্টি-ফান্ডেও আপনার কিছু কনট্রিবিউশন আছে বোধ হয়?

হঠাৎ এ সব কথা কেন?

এমনি, মিসেস বোস।

আপনার কৌতূহল ঠিক মেয়েদের মতোই।

তা হবে। ইচ্ছে না হলে জবাব দেবেন না।

এ সব প্রসঙ্গ ভাল লাগে না। আই হেট টু টক অ্যাবাউট মানি। টাকা শুধু আমার কিছু পারপাস সারভ করবে, তা বলে আমার ইনটেলেক্টকে দখল করবে না!

তা ঠিক।

এবার বলুন বউদি কী বলেছেন?

বউদি বলেছে, আপনি একজন চমৎকার মানুষ।

মিথ্যে কথা।

বউদি বলেছে, আপনি লোক তত ভাল নন।

এটাও বাজে কথা।

দীপনাথ মুখ বিকৃত করে বলে, তা হলে একদিন বউদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়!

কবে নিয়ে যাবেন বলুন? আমি এক্ষুনিই যেতে রাজি।— বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছিল মণিদীপা।

দীপনাথ অবাক হয়ে বলে, এক্ষুনি যাবেন? পাগল নাকি!

মণিদীপা আবার বসে পড়ে। হতাশার গলায় বলে, কলকাতায় এখন একা আমার অসহ্য লাগছে। ইট বার্নস। বিশেষত আফটার স্নিগ্ধ'জ বিট্রেয়াল।

আমেরিকায় গেলেই কি বিপ্লবী মরে যায়? বরং তার বেস অনেক ব্রড হয়।

কিন্তু স্নিগ্ধ সেভাবে যাচ্ছে না। হি হ্যাজ সোলড হিমসেলফ, আই নো। স্নিগ্ধর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ছিল অসম্ভব ব্রিলিয়ান্ট। ইচ্ছে করলে ও এমনিতেও সুখে জীবন কাটাতে পারত।

দীপনাথ একটা সত্যিকারের দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারও কি মনে মনে আশা ছিল না, স্নিগ্ধদেবই একদিন সাধারণের অরণ্য থেকে মহীরূহের মতো মাথা তুলবে! সে বলল, আমরা আর-একজন স্নিগ্ধদেবকে বানিয়ে নেব মিসেস বোস। ভাববেন না।

মণিদীপা মাথা নত রেখেই বলল, সেটা আমি জানি।

তা হলে জ্বলছেন কেন?

মানুষ বিট্রে করলে রাগ হবে না?— বলে হঠাৎ একটু হেসে মণিদীপা বলে, আপনি এরকম অদ্ভুত লোক কেন বলুন তো!

কেন? কী করলাম?

আমার মুখে শুনে আপনি স্নিগ্ধকে আপনার লিডার বানিয়েছিলেন? সত্যি?

ভীষণ সত্যি।

যাঃ। প্লিজ আপনি আর কখনও ওরকম করবেন না।

কেন?

আপনাকে মানায় না। একটু মাথা উঁচু করে থাকতে শিখুন তো! যাকে-তাকে নেতা বানাবেন কেন?

স্নিগ্ধদেব কি যে-সে?

একদম যে-সে। আপনি আপনার মতো থাকবেন।

কেন? স্নিগ্ধকে নেতা বলে মানলে কি আমি ছোট হয়ে যাব মিসেস বোস?

হ্যাঁ, যাবেন।

আমি তো এমনিতেই ছোট। স্লেভ।

মোটেই না।

আপনিই তো বলতেন।

ঠাট্টা করতাম। আই নো ইউ টু বি এ ভেরি গুড ম্যান। বোস সাহেবকে আপনি ছাড়েননি কেবল মায়া করে।

এটা কি কমপ্লিমেন্ট?

তাই মনে করুন। বউদির কাছে কবে নিয়ে যাবেন?

বোস সাহেব আসুন, তারপর।

কেন?

ভারচুয়ালি আমিই এখন অফিস চালাচ্ছি। তা ছাড়া বোস সাহেবের অনুমতি না নিয়ে তার বউকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে লোকে কী বলবে?

আর-একদিনও তো নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুমতি নিয়েছিলেন কি?

তখন ছিল অন্য রকম।— দীপনাথ হাসিমুখে বলে।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

বেয়ারাকে কিছু বলতে হয়নি। বোস সাহেবের বউকে সে চেনে। নিঃশব্দে এসে এক পট কফি আর দুটো কাপ সমেত ট্রে টেবিলে রেখে কফি ঢেলে দিল। দুটো করে চিনির কিউব, গরম দুধ।

কফিটা আনমনে চামচে নাড়তে নাড়তে মণিদীপা বলে, বাইরে বৃষ্টি নামল।

হবে। বৃষ্টির সিজনই তো এটা।

তা জানি। আপনি আমার সব কথাতেই জবাব দেন কেন বলুন তো!

দিতে নেই বুঝি? বসের ওয়াইফ বলে?

মণিদীপা ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়। তারপর সামান্য চড়া গলায় বলে, আপনি আমাকে কখনও সিরিয়াসলি নেন না! না?

আপনার ব্যাপারে আমি এবং আমরা সবাই খুব সিরিয়াস।

আমরাটা আবার কে?

আমি বা বোস সাহেব, অর্থাৎ জনগণ আর কী।

আজ আমার ইয়ারকি ভাল লাগছে না। আই হ্যাভ লস্ট এ ফ্রেন্ড, ইউ নো!

শুধু ফ্রেন্ড নয় মিসেস বোস। স্নিগ্ধদেব ছিলেন আপনার আইডিয়া, আপনার ড্রিম, আপনার নেতা। কিন্তু লসটা আপনার একার নয়। আমারও, অর্থাৎ জনগণেরও। আমি তো ভাবতাম, উনিশশো নব্বই সালে স্নিগ্ধদেবই হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

একটু আগেই আপনি স্নিগ্ধদেব সম্পর্কে খুব সিরিয়াস ছিলেন। আবার এক্ষুনি লাইট হয়ে গেলেন! আপনার পার্সোনালিটি এত ফ্লাকচুয়েট করে কেন বলুন তো?

করে?

নিশ্চয়ই করে।

দীপনাথ মুখখানা আঁশটে করে বসে, আমার পপুলারিটির পারদ নেমে যাচ্ছে দেখছি।

মণিদীপা আর-একবার সিগারেটের প্যাকেটের ঢাকনা খুলেও থামল। ভ্রু কুঁচকে বলল, আপনি হয়তো জানেন না, যাদের পার্সোনালিটি থাকে না তারাও পপুলার হতে পারে। পার্সোনালিটি নেই বলেই তারা অন্যের যে-কোনও কথায় অনায়াসে সায় দিয়ে যায়, অন্যের হয়ে খামোখা খাটে, চাটুকারিতা করে, খোশামোদ করে। ওভাবেও পপুলারিটি গেন করা সম্ভব। আপনি যেমন ভাবে করেছেন।

বহুকাল পর আবার কান-মাথা গরম হল দীপনাথের। মণিদীপার মার কোন দিক থেকে আসবে তা সে জানত না। খুব গভীরে আহত হয় দীপনাথ। আহত হয়, তার কারণ মণিদীপা খুব মিথ্যে বলেনি। কখনও কখনও তো সত্যিকারেরই চাটুকার, খোশামুদে। নিজের মতামত, ইচ্ছে-অনিচ্ছে প্রকাশে ভীরু।

ক্লিষ্ট মুখ তুলে দীপনাথ বলে, জনগণের কি কোনও পার্সোনালিটি থাকে?

মণিদীপা জয়ের গন্ধ পেয়ে একটু ঝুঁকে তীব্র স্বরে বলে, আপনি যে জনগণেরই একজন সেটা সৎভাবে একবারও বিশ্বাস করেন কি? জনগণের কেউই তা করে না। তারা ভাবে, আমি ছাড়া আর সবাই জনগণ, সাধারণ অ্যাভারেজ। যেদিন আপনি নিজেকে সত্যিই সাধারণ মানুষদের একজন ভাবতে পারবেন সেদিন লোকে আপনাকে অসাধারণ বলে স্বীকার করবে।

দীপনাথ মনে মনে তারিফ করল। এটাও নিখুঁত মার। সে পুনর্বার আহত।

তবে প্রত্যাঘাতের জন্য ব্যস্ত হল না দীপনাথ। নরম চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি কি আমার বিবেক, কাউন্টার-ইগো? যাত্রাদলের বিবেকের মতো এসে মাঝে মাঝে জীবনের সত্যগুলিকে চিনিয়ে দিয়ে যান!

মণিদীপার প্লেটে কাপ রাখার শব্দটা একটু জোরালো শোনাল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, টাকাটা দিন!

দীপনাথ কথা বাড়াতে সাহস করল না। টাকাটা টেবিলের ওপর নিঃশব্দে রাখল।

ভ্রু কুঁচকে মণিদীপা বলে, কোনও ভাউচারে সই করতে হবে না?

দীপনাথ মাথা নাড়ল, না।

অফিসের টাকা দিতে ভাউচাব লাগে না?

লাগে। কিন্তু অত কথায় কাজ কী?

মণিদীপা ঠোঁট ওলটাল, কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর চটপটে পায়ে বেরিয়ে গেল একটিও কথা না বলে।

সারা অফিসটাই ফাঁকা, নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

দীপনাথ কিছুক্ষণ সামনে চেয়ে রইল। এ কথা সত্য, তার ব্যক্তিত্বের তেমন জোর নেই, না আছে স্বাধীন মত প্রকাশের সাহস। প্রায় সকলেই তাকে পছন্দ করে বটে, কিন্তু কেউই তাকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট মনে করে না। শুধু এই সেদিন, মেজোবউদি বলেছিল, দীপনাথকে তার প্রয়োজন। ঠিক ওরকমভাবে দীপনাথকে আর-একজনও গুরুত্ব দিয়েছিল। সে হল বোস সাহেব। বাংগালোরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি।

কিন্তু এসব কথা ভেবে কী হবে? সে যা, সে ঠিক তাই। কেউ তো তাকে শেখায়নি কী করে ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে হয়। কেউ তো তাকে হাতে ধরে শেখায়নি জীবনযাপনের পদ্ধতি। আজ তার মনে হয়, যেভাবে ছেলেবেলায় তাঁকে এক দুই বা অ আ ক খ শেখানো হয়েছিল, ঠিক তেমনি করে আজ এই জীবনযাপনেব পাঠ কেউ শিখিয়ে দিলে বড় ভাল হত।

আস্তে আস্তে রাত বাড়ছে। বাইরে ঝুম হয়ে এল বৃষ্টি। দীপনাথ আবার কাগজপত্র টেনে বসে বকেয়া কাজ সেরে রাখতে লাগল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতা এল, ক্লান্তি লাগল, হাই উঠল। তবু ঠায় রাত পৌনে আটটা পর্যন্ত টেবিলে রইল সে।

তারপর বেয়ারাকে ডেকে অফিস বন্ধ করতে বলে ধীরে ধীরে নেমে এল নীচে। বৃষ্টির জোর কমে এসেছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। ইদানীং অফিসপাড়াটা রাতের দিকে খুব নিরাপদ নয়। নির্জন রাস্তায় একা মানুষকে পেলে একদল ছেলেছোকরা প্রায়ই চুরি ছিনতাই করে। তাই ঘড়িটা খুলে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল দীপনাথ।

চারদিকে দেখে রাস্তায় নেমে কয়েক পা হাঁটতেই পিঁ করে একটা হর্নের শব্দ। দীপনাথ বেখেয়ালে ফিরে তাকাল। তাকিয়েই একটু চমকে উঠল।

কালো ছোট গাড়িটার ড্রাইভিং সিটে মণিদীপা বসে আছে না! একটা সিগারেটের আগুন একটু ধিইয়ে উঠেই মিইয়ে গেল।

দীপনাথ এগিয়ে জানালায় ঝুঁকে বলে, কাজটা ভাল করেননি। এ পাড়াটা এত রাতে খুব বিপজ্জনক। সঙ্গে অতগুলো টাকা রয়েছে।

আই ক্যান লুক আফটার মিসেলফ্।

ওটা বৃথা অহংকারের কথা মিসেস বোস। এই দেশে কোনও সক্ষম পুরুষও নিজের সিকিউরিটির গ্যারান্টি দিতে পারে না, মেয়েরা তো কোন ছার!

আপনি গাড়িতে উঠুন। পৌঁছে দিচ্ছি।

ও বাবা! আমি থাকি শেয়ালদার কাছে। সেখানে রোজ খুব সাংঘাতিক রকমের জ্যাম হয়। অবলা মেয়েমানুষ আপনি, গিয়ে মুশকিলে পড়বেন।

নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির ভাষায় কথা বলবেন না তো! আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি দরকার আছে। উঠুন।

অপেক্ষাই যদি করলেন তা হলে তো ওপরেই বসে থাকতে পারতেন।

পারতাম। কিন্তু অত কথায় কাজ কী?

দীপনাথ ঢোক গিলে সামনের সিটে মণিদীপার পাশে উঠে বসল।

গাড়ি ছেড়ে মণিদীপা দাঁতে দাঁত পিষে বলে, আমি অবলা? না আপনি অবলা?

আমিই বোধ হয়। যাক সে কথা। কী বলছিলেন?

মণিদীপা মোটেই দীপনাথের আস্তানার দিকে গাড়ি ঘোরাল না। সোজা এসপ্ল্যানেডের দিকে যেতে যেতে বলল, আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দি মানি।

দীপনাথ ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিতে পড়ে যায়। মৃদু স্বরে বলে, কিছু গোলমাল নেই মিসেস বোস। পরিষ্কার হোয়াইট মানি।

সে কথা নয়। টাকাটা কার?

তার মানে?

টাকাটা নিয়ে চলে আসতে আসতে আমি ভাবছিলাম মিস্টার বোসের অ্যাবসেন্সে তার অফিসের অ্যাকাউন্ট থেকে আর-কেউ টাকা তুলতে পারে কি না। ভেবে মনে হল, তা সম্ভব নয়। আমি অবশ্য আইনকানুন জানি না, তবু মনে হল। তাই ভাবলুম, এ টাকাটা কার? আপনার নয় তো!

আরে না। বোস সাহেবেরই টাকা। অফিসের আইন যেমন আছে তেমনি ফাঁকও আছে।

এ ক্ষেত্রে আমার অন্য রকম সন্দেহ হচ্ছে। ইউ আর জাস্ট হ্যাভিং পিটি অন মি।

মোটেই নয় মিসেস বোস।

আবার মিসেস বোস?

জিবে এসে যায়, কী করব?

ইউ আর এ স্লেভ।— মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে মণিদীপা বলে।

তা-ই তো। একটু আগেই জানতে পারলাম যে আমি ব্যক্তিত্বহীনও।

আর আমিও জানতে পারলাম যে, আমি আপনার কাউন্টার-ইগো।

তাতে রাগ করেছেন?

না তো! বরং শুনে আমার পরম আহ্লাদ হয়েছে।

আর বলব না।

মণিদীপা একবার ঘুরে তাকাল। চোখ হাসছে, মুখ হাসছে। সত্যিকারের আনন্দ দেখলেই বোঝা যায়। বলল, টাকাটা আপনার। আই অ্যাম সিয়োর।

সন্দেহ থাকলে কাল আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ফোনে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

তাতে লাভ নেই। আমি ফোন করার আগে আপনি অ্যাকাউন্ট্যান্টকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখবেন।

আপনি সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত।

সন্দেহের পিছনে কারণ আছে।

বোস সাহেবেরই টাকা। আমি তো জানি, আপনি স্বামীর অর্জিত টাকা ছাড়া অন্য টাকা ছোঁবেন না। ইউ আর এ লয়াল ওয়াইফ।

এটা আবার কোন দেশি ইয়ারকি?

ইয়ারকি নয়।

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট ধরে মণিদীপা গাড়িখানা আস্তে চালিয়ে ময়দানে এসে পড়ে। তারপর হু হু করে চালাতে থাকে। কিছুক্ষণ কথা বলে না মণিদীপা। দীপনাথও চুপ করে থাকে। যদিও সে জানে, মণিদীপা তাকে কোথাও পৌঁছে দিচ্ছে না। শুধু নিয়ে যাচ্ছে। কোথায়, তা হয়তো মণিদীপাও জানে না।

খুব মৃদু স্বরে, প্রায় নিজেকে শুনিয়ে দীপনাথ বলে, আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে...।

মৃদু হলেও মণিদীপা বোধহয় শোনে। মুখ না ঘুরিয়েই বলে, আমি কিন্তু সুন্দরী নই।

আপনি দারুণ সুন্দরী। কে বলে সুন্দরী নন?

হলেও আই ডোন্ট কেয়ার। সুন্দর ব্যাপারটাই স্কিন ডীপ!

তা হবে। আমি শুধু সত্যি কথাটা জানিয়ে দিলাম।

মণিদীপা আবার বহুক্ষণ জবাব দিল না। ময়দানের অন্ধকার চিরে ভেজা রাস্তায় চোখে ধাঁধা লাগিয়ে ছুটে আসছে গাড়ি। বৃষ্টির চিকন কাচে আলোর রেণু ছড়িয়ে পড়ছে। হেডলাইট ঘিরে অপ্রাকৃত আলোর বলয়। একরকম মন্দ লাগে না দীপনাথের। বিদেশি এক সেন্ট ছোট গাড়ির মধ্যে ভারী ঘন হয়ে এক মায়ার সৃষ্টি করেছে। এত সুন্দর সব গন্ধ মাখে মণিদীপা!

এক-একবার গাড়ির অন্ধকার অভ্যন্তরে চলমান গাড়ির আলো এসে পড়ে, আর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মণিদীপার মুখ। এখন মণিদীপার মুখে একটু আগেকার সেই ঝলমলে হাসির কোনও রেশ নেই।

মণিদীপা একবারও আর ফিরে তাকায় না তার দিকে। শুধু একবার বলে, আপনার মাথার চুলে বৃষ্টির জল লেগে আছে। গ্লাভস কমপার্টমেন্টে একটা পরিষ্কার ঝাড়ন আছে। মুছে নিন।

দরকার নেই। আপনা থেকেই শুকিয়ে যাবে।

আর কোনও কথা হল না অনেকক্ষণ।

দীপনাথ ভেবেছিল, মণিদীপা নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটেই নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কিন্তু তা নয়। খিদিরপুরের ঘিঞ্জি ও নোংরা পাড়ায় একটা দু'নম্বরি চেহারার রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মণিদীপা নামল। বলল, আসুন।

এখানে কোথায়?— বলতে বলতে দীপনাথ সন্দিহান ভাবভঙ্গি করে নামে।

গাড়ি লক করে মণিদীপা খুবই অভ্যস্ত পায়ে রেস্টুরেন্টে ঢোকে। পিছনে দীপনাথ।

ম্যাড়ম্যাড়ে হলুদ রঙের এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালের লম্বা সরু একখানা ঘর। ঢোকার মুখেই মস্ত উনুনে শিক-কাবাব সেঁকা হচ্ছে। কাঁচা পেঁয়াজ এবং মশলাদার রান্নার খুব চড়া গন্ধ। তন্দুরে রুটি হচ্ছে। ভিড় বেশি নেই। যারা এনামেলের প্লেট থেকে রগরগে মাংসের কাই মেখে মাংসের টুকরোয় জড়িয়ে হালুম হালুম খাচ্ছে তারা নিঃসন্দেহেই খালাসি শ্রেণির লোক। এদের জাত-টাত নেই। সব একাকার, একরকম। দরিদ্র, লোভী, ক্ষুধার্ত, হিংস্র এবং ক্রুদ্ধ। সেই সঙ্গে ওপরতলার লোক সম্পর্কে সন্দিহান, দ্বিধাগ্রস্ত এবং ভিতু। চোর-চোখে একটা আধবুড়ো পাঠানি চেহারার কালো লোক দু'জনকে খুব দেখছিল।

মণিদীপা অবশ্য খুবই সহজভাবে গিয়ে একটা টেবিলের দখল নেয়। কাঠের ময়লা আবরণহীন টেবিল। ভেজা স্যাঁতসেঁতে ভাব। মণিদীপা একটা রুমালে মুখ থেকে সামান্য বৃষ্টির ফোঁটা মুছে বলে, আমি মাঝে মাঝেই এখানে ডিনার সেরে যাই।

কেন?

এমনি। ভাল লাগে।

পাবলিক রিলেশন?

আই লাইক দিজ মেন। আই লাইক দিস এনভিরনমেন্ট।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

রেস্টুরেন্টটা খালাসি মার্কা হলেও খাবার খুব খারাপ নয়। রুটি আর চাপ মুখে দিয়ে সেটা টের পায় দীপনাথ। একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, মাংসটা কিসের?

গোরু নয়। খাসি।

গোরু কি না তা জিজ্ঞেস করিনি।

মণিদীপা মৃদু শ্লেষের হাসি হেসে বলে, আমার প্রেজুডিস নেই, কিন্তু আপনার তো থাকতে পারে।

দীপনাথের তেমন খিদে ছিল না। শ্লথভাবে গ্রাসটা মুখে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, আমার আছে। এ দেশের গোরুর মাংস খুব হাইজিনিক না হওয়ারই কথা।

এ দেশের কিছুই হাইজিনিক নয়। কিন্তু তাতে কী? গরিবরা তো বেঁচে আছে।

আপনি দেশের সব গরিবকে নিয়ে ভাবেন, শুধু একজন গরিব ছাড়া।

সে কে? আপনি?

মাথা নেড়ে দীপনাথ বলে, না। বোস সাহেব।

বোস সাহেব গরিব নাকি?

দীপনাথ আবার মাথা নেড়ে বলে, অ্যাপারেন্টলি নয়। কিন্তু আজ ওঁর ব্যাংকে ফোন করে যা জানলাম তাতে মনে হয় বোস সাহেব মানিটারিলি খুব ভাল অবস্থায় নেই।

উদাসভাবে মণিদীপা বলে, তার আমি কী করব?

কিছুই নয়। শুধু একজন গরিবের কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

মণিদীপাও তার খাবার নাড়াচাড়া করছিল মাত্র। ওইভাবে আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ রুমালে হাত মুছে উঠে পড়ল।

চলুন।

আবার কোথায়?

আঃ, অত প্রশ্ন করেন কেন?

মণিদীপার ভিতরকার ছটফটানি খুব স্পষ্ট টের পাচ্ছিল দীপনাথ। কিসের কামড় তা বুঝতে পারছিল না অবশ্য।

মণিদীপা আবার গাড়ি ছাড়ল। এবার নাক বরাবর সোজা এসে থামল নিজের ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে। দীপনাথ নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল।

মণিদীপা ঘরে ঢুকে ব্যাগটা সোফায় ছুড়ে ফেলে ডাইনিং হলে গিয়ে ঢুকল। দীপনাথ বসে রইল বাইরের ঘরের সোফায়। শুনতে পেল মণিদীপা দিল্লিতে ট্রাংক কল বুক করছে পাশের ঘরে।

তারপর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা। তার মধ্যেই রাঁধুনি কফি দিয়ে গেছে, দীপনাথ একটা পুরনো ন্যাশনাল জিয়োগ্র্যাফিকের সিকি ভাগ ছবি মুগ্ধ চোখে দেখে ফেলেছে।

এ সময়ে ঘরোয়া ছাপা শাড়ি পরে মণিদীপা এসে সামনে বসল। বলল, আপনাকে একটু বসতে হবে। আমি দিল্লিতে বোস সাহেবকে কনট্যাক্ট করছি। অন্তত ততক্ষণ।

হঠাৎ গরিবকে মনে পড়ল যে!

আই ওয়ান্ট টু টিচ হিম এ লেসন।

ও বাবা! টেলিফোনেও ঝগড়া করবেন নাকি?

আমরা ঝগড়া-টগড়া করি না। নো শাউটিং বাট উই হ্যাভ আওয়ার ওয়ে অফ কমিউনিকেশন।

দীপনাথ মৃদু হাসে। মণিদীপা ভারী ছেলেমানুষ।

দিল্লির লাইন পেতে খুব একটা দেরি হয় না। টেলিফোন বেজে উঠতেই ছুটে যায় মণিদীপা। দীপনাথও নিঃশব্দে উঠে গিয়ে মণিদীপার পাশে দাঁড়াল।

মণিদীপা বোস সাহেবকে ফোনে ধরতে পেরেছে। একতরফা মণিদীপারই কথা শুনতে পাচ্ছিল দীপনাথ; শোনো, আমি মণি বলছি। আই অ্যাম সরি, ব্যাংকে টাকাগুলো সব তুলতে হয়েছে। আমার হাতে আর একদম টাকা নেই। ...না, হারায়নি। তুমি এলে সব বলব। ...আঃ, শোনো না! দেয়ার ইজ এ সিরিয়াস ম্যাটার। আমি তোমার অফিস থেকে টাকা অ্যাডভান্স চেয়েছিলাম।... কী বললে? ... হ্যাঁ, মিস্টার চ্যাটার্জির কাছেই। ...অ্যাঁ? টাকাটা চাইতেই উনি দিয়ে দিলেন। কিন্তু বুঝতে পারছি না হাউ ইজ ইট পসিবল। ... বলো। ...বলছি তো সিরিয়াস ট্রাবলে না পড়লে অফিসে জানাতাম না। তুমি এলে সব বলব। ফোনে কি বলা যায়!... ইজ ইট অলরাইট দেন?... ওঁকে আমি বাসায় ধরে এনেছি।

কিছু বলবে?... আচ্ছা, ছাড়ছি।

দীপনাথ নিঃশব্দে সরে এসে সোফায় বসে।

মণিদীপা যখন পরদা সরিয়ে বাইরের ঘরে এল তখন তার ভ্রু কোঁচকানো। মুখ গম্ভীর।

দীপনাথ মৃদু স্বরে বলে, কথা বললেন?

ইউ আর এ লায়ার।

কেন?

ও টাকা বোস সাহেবের নয়।

তাতে কী? টাকার গায়ে তো নাম লেখা থাকে না।

কিন্তু আপনিই না একটু আগে বলছিলেন, আমি অন্যের টাকা ছুঁতে ঘেন্না পাই!

দীপনাথ আন্তরিক দুঃখের গলায় বলে, আপনাকে শান্ত করার জন্য বলেছি। ওটা নিয়ে ভাববেন না। স্টিল নাউ আই ও ইউ ফিফটি পয়সা।

বলতে বলতে দীপনাথ তার মানিব্যাগ বের করে একটা আধুলি সেন্টার টেবিলে রাখল। বলল, কুইটস।

নো কুইটস। আপনি আমাদের কাছে হাজার টাকা পান।

বলতে বলতে মণিদীপা তার এলো চুলগুলো একটা গার্ডারে আটকে সামনে বসল।

দীপনাথ মৃদু স্বরে বলল, এ সব প্রসঙ্গ থাক।

মণিদীপা মৃদু হেসে বলে, উড ইউ বিলিভ? আমি কিন্তু সত্যিই অন্যের টাকা ছুঁতে ঘেন্না পাই। আমি বোস সাহেব ছাড়া ম্যারেড লাইফে অন্য কারও টাকা নেওয়ার কথা ভাবতেই পারিনি। আপনার টাকাটা তাই ফেরত দিতাম। কিন্তু বোস সাহেব অ্যাপ্রুভ করেছে বলে নিচ্ছি।

দীপনাথের বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ ঠেলাঠেলি করতে থাকে। এতদিনে! অবশেষে! "হুররে" বলে তার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। সেই সঙ্গে একটা বিরহের জ্বালাও খামচে ধরে বুক। হরষে বিষাদ কথাটা বহুবার পেয়েছে। আজই প্রথম হরষে বিষাদ কাকে বলে তা বুঝল।

পরিপূর্ণ চোখে মণিদীপার দিকে চেয়ে দীপনাথ বলে, আজ তা হলে চলি মণিদীপা।

মণিদীপা একটু অবাক হয়ে বলে, তা হলে বোল ফুটল?

ফুটল। আজ জেনে গেলাম আপনি সুখী হবেন। আপনি মানে আপনারা।

মণিদীপা উঠে পিছনে আসতে আসতে বলে, একজিটটা একটু ড্রামাটিক হয়ে যাচ্ছে না কি?

হোক, হোক। জীবনে একটু নাটক থাকা ভাল।

ইয়ারকি হচ্ছে? বসুন, এখানে ডিনার খেয়ে যাবেন।

ডিনার খাওয়ালেন যে দোকানে! মনে নেই?

সে কি খাওয়া বলে?

তা হোক। আজ আর-একটা ভোজে দিল খুশ হয়ে আছে। অন্য ভোজের দরকার নেই।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

পুরনো গোয়ালঘরটা ফাঁকা পড়ে থাকে। তৃষা ইদানীং কয়েকটা খুব ভাল জাতের গোরু কিনেছে। পাকা লম্বা ব্যারাক বাড়ির মতো নতুন গোয়ালঘর তুলেছে। সূক্ষ্ম জালের পাল্লা বসিয়ে জানলা-দরজা দিয়ে মশা ঢোকার পথ বন্ধ করা হয়েছে। গোরু দেখাশোনা করার জন্য আরও দুটো লোক এসেছে।

সজল কাউকে কিছু না বলে এক ছুটির দিনে সকালে পুরনো গোয়ালঘরটায় গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে বেজি, হাতে লাঠি।

মাটির ভিটিতে এর মধ্যেই হরেকরকম গর্ত তৈরি হয়েছে. জঞ্জাল জমেছে। বাইরে থেকে লতানে গাছ এসে উঁকিঝুঁকি মারছে জানলা-দরজা দিয়ে। বিশ্রী একটা ভ্যাপসা গন্ধ আর পোকামাকড়ের ঘিনঘিনে আওয়াজ। সজল সিলিং-এর কাঠের বিমগুলো দেখছিল। বেশ মজবুত।

বেজিটা তড়াক করে একটা লাফ দেওয়ায় সজল চকিতে চোখ নামায়। একটা গর্তের মুখে সরু একটা মুখ উঁকি দিয়েই ডুব দিল। সাপ। সজল জানে, এ ঘরে সাপ থাকবেই। বেজিটা এখনও বাচ্চা, বোধহয় সাপের সঙ্গে লড়তে শেখেনি। সজল তাই উদ্যত বেজিটাকে হাতে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে ছেড়ে দরজা বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে। তার লাঠির ডগায় একটা লোহার ফলা পরানো আছে। নিঃশব্দে সে গর্তটার কাছে গিয়ে উঁকি দিল ভিতরে। অন্ধকারে তেমন কিছু দেখা যায় না, সে ভুসভুসে মাটির মধ্যে ফলাটা চালিয়ে গর্তের মুখটা বড় করতে থাকে।

গর্তটা তেমন গভীর ছিল না। মুখটা বড় হতেই সে ভিতরে চিকরিমিকিরি দেখতে পেল। গোখরো। মাথা তুলছে না ভয়ে। ওরাও তো মরণ টের পায়।

সজল দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে খুব সাবধানে গর্তের মধ্যে ফলাটা চালিয়ে দিল বার কয়েক। ভিতরে তর্জন-গর্জন চলল কিছুক্ষণ। তারপর নিথরতা। সাপটাকে গর্ত থেকে তুলল না সজল। ওপর থেকে মাটি চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিল।

নিজেই একটা ঝাঁটা এনে ঘরটা যতদূর সম্ভব সাফ করল। একটা মস্ত বস্তায় বালি ভরে তৈরি রেখেছিল সে। খ্যাপা নিতাই আর সে ধরাধরি করে এনে সেটাকে সিলিং-এ দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিল।

কাজ শেষ হলে নিতাই কপালের ঘাম মুছে বলে, কাণ্ড বাপু তোমার। গায়ের জোর করে হবেটা কি শুনি? জোর হল মন্তরের। এই দেখো না, আমার যে রোগা জিবজিবে শরীর, তবু সাতখানা গাঁয়ের লোক আমায় দেখলে পথ ছেড়ে দেয়। মন্তরের জোর বাড়াও, সব বশ হয়ে যাবে।

সজল ঝুলন্ত বস্তাটায় ঘুরে ঘুরে ঘুসি মারছিল। কর্কশ বস্তা আর বালিতে আঙুলের চামড়ার নুনছাল উঠে গেল। জ্বালা করছে। সে ধমক দিল, কেটে পড়ো তো নিতাইদা! আর, খবরদার মাকে বলতে যেয়ো না।

সজলখোকা, এই তো সেদিনও এটুকু ছিলে!

বলে একটু অবাক হয়ে নিতাই সজলকে আজ ভাল করে দেখে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, হবে না! কার ছেলে দেখতে হবে তো!

কথাটার মানে সজল জানে। একসময়ে সে নিজেকে জেঠামণির ছেলে বলে ভাবতে ভালবাসত। আজকাল বাসে না। তার বাবা শ্রীনাথ যেমনই হোক, সে আজকাল বাবার পক্ষে। তাই বস্তা ছেড়ে কোমরে হাত দিয়ে সে রক্তচোখে তাকাল নিতাইয়ের দিকে।

নিতাই চোখ দেখেই ধরে ফেলে, মার আসছে। সজলখোকা ছোট বয়সে তাকে বড় কম মারেনি। কিন্তু সে ছিল ছোট হাতের মিঠে মার। কিন্তু ইদানীং সে বাচ্চাটা বেশ বুনো আর শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছে। এখন এর হাতের মার খেলে হাড়ে গিয়ে লাগবে।

নিতাই চট করে সুর পালটে বলল, শ্রীনাথবাবুর কথাই বলছিলাম খোকাবাবু। তোমার বাবা। ভারী তেজি লোক। তুমি তারই ছেলে তো।

বেরোও তো এখন।

এই যাচ্ছি।— বলে নিতাই চোখের পলকে সখে পড়ে। দুনিয়াটা কেমনধারা হয়ে যাচ্ছে। কাউকে বিশ্বাস নেই। সেদিনকার খোকাটা কেমন মাতব্বরের মতো চোখ রাঙায়। ছোট কলকে দিয়ে যে সরিৎবাবুকে একসময়ে বশে রেখেছিল সেও এখন মোড়লমশাই। শুধু নিতাই বদলাল না, যে নিতাই সেই নিতাই-ই রয়ে গেল।

অবশ্য নিতাই আর বেশিদিন পুরনো নিতাই থাকবে না। ক'দিন আগে হিজলির শিষ্যবাড়ি থেকে একটা শোল মাছের বাচ্চা আর কিছু ডালের বড়ি গামছায় বেঁধে ফিরছিল নিতাই। হিজলির জেলেরা বোকাসোকা লোক। দু'ঘর তার কাছে মন্ত্র নিয়েছে হালে। এই এখন শিষ্যবাড়ি থেকে কিছু আদায় উশুল করতে পেরে মনে ভারী ফুর্তি ছিল। গুনগুন করছিল আপনমনে। পশ্চিমের জলার ধারের নির্জন রাস্তায় সাঁঝটি হল যেই অমনি নিতাই তারস্বরে কালী নাম করতে লাগল। কিন্তু তবু মেছো পেতনিটা এলোচুল ফাঁপিয়ে জলা থেকে উঠে এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

নিতাইয়ের হয়ে গিয়েছিল সেদিনই। ধাত ছাড়ে আর কী! হঠাৎ মনে পড়ল, এ জলার ধারেই বাঁশবনের আড়ালে কুঠে সামন্ত থাকত না! ব্যাটা মরেছে। চারটি ছেলেপুলে নিয়ে তার বউ এখন বিধবা। তা সেই বিধবাটাই নয় তো!

আন্দাজটা লেগেছিল ঠিকই। চোখ খুলে দেখল, সামন্তর সেই বিধবাই বটে। কালো হাকুচ, রোগা, বড় দাঁত, চোখ কোটরে। একেবারে মরি-মরি ছিরি।

তবু সেই ঝুঁঝকো সাঁঝে জলা থেকে আঁশটে গন্ধের একটা কু-বাতাস এসে বাঁশবনে মড়মড় শব্দ যখন তুলল, আর যখন রাঙা-ভাঙা একটা চাঁদও উঁকি দিল দিগন্তে, তখন আর বুক বশ মানল না। ভারী একটা কষ্ট ঘুলিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। সামন্তর বেধবা বউটা! আহা!

কী খবর গো!

সামন্তর বিধবা স্ত্রী নিতাইকে বিলক্ষণ চেনে। রতনপুরের নামকরা চাটুজ্জেবাড়ির পোষা তান্ত্রিক। তাই সে জড়োসড়ো হয়ে বলল, কোনও গতিকে আছি বাবা!

তার আঁচলে বাঁধা কিছু গেঁড়িগুগলিই হবে। সামন্ত একসময়ে চমৎকার ঘরামির কাজ করত। কুষ্ঠ হয়ে বসে যায়। সেই থেকে অবস্থা পড়তির দিকে। সংসারটার কী অবস্থা তা আন্দাজ করতে অসুবিধে নেই। এদের মন্তর দেওয়া বৃথা। কিছুই আদায় উশুল হবে না। তবু নিতাইয়ের সেদিন ভারী কষ্টই হচ্ছিল। গরিবের জন্য গরিব না ভাবলে চলে?

সে বলেই ফেলল, চলো তোমার ঘরটা দেখে যাই। সামন্ত আমার বন্ধুলোক ছিল।

ঘর!— বলে বউটা হাঁ করে রইল, ঘর বলতে কি আর কিছু আছে বাবা! কোনওরকমে থাকা। যাবে তো এসো।

বাঁশবনের পিছনে সামন্তর ভিটেয় পা দিয়ে নিতাইয়ের চোখে জল এল। এমন গরিবও আছে! ঘর বলতে শুধু কয়েকটা মাটির দেয়াল খাড়া রয়েছে। চালে টিন বা খড় নেই, সে জায়গায় পুরনো চট, বাসি ক্যালেন্ডারের কাগজ, ক্যানেস্তারা এইসব দিয়ে জোড়াপট্টি লাগানো। বিছানা নেই, বাসন নেই, কাপড়চোপড় নেই। কীভাবে যে আছে! সামন্তর বউয়ের ট্যানাটা বোধহয় গায়ে গায়ে ভিজে গায়ে গায়েই শুকোয় রোজ। তাই চামসে আঁশটে পেট-গোলানো গন্ধ ছাড়ছে গা থেকে। বড় মেয়েটা যুবতীই হবে। বুকে ন্যাকড়ার ঢাকনা, কোমর থেকে আর

একটা আব্রু ঝুলছে। শরীরটা ঢ্যাঙা, কঙ্কালসার। বাকি কুঁচো কাচাগুলো উদোম ন্যাংটো।

সামন্তর বেধবা কান্নাকাটি করল না। বলল, এখনও ভিক্ষে শুরু করিনি বাবা। চাটুজ্জে-মাকে বলে ঘরের একটা কাজ দাও তো বাঁচি।

শোল মাছটা বেধবার হাতে দিয়ে নিতাই বলল, এটা সেদ্ধ করে আজ চালিয়ে দাও। আমি গিয়ে বউদিমণিকে বলবখন। হয়ে যাবে হিল্লে। বড় মেয়ে কতয় পড়ল?

বিয়ের যুগ্যি। নেবে?

ভেবে দেখি।

ভাবাভাবির অবশ্য কিছু নেই। এই বয়সে হাড়হাভাতে ছাড়া আর কে মেয়ে দেবে? তবু দর বাড়াতে একটু সময় নিয়ে রাখল। প্রথম দিন তো! বিয়ের কথা পাড়লেই হয়তো মেয়ের গায়ে এক কুড়ি কি দু'কুড়ি দামের লেবেল বসে যাবে। দিনকাল ভাল না।

তৃষা বউদিকে পরদিন সব বলল নিতাই। বউদি শুনেটুনে বলল, চোর নয় তো?

না, সামন্ত লোক ভাল ছিল। কুষ্ঠরোগী ছিল বলে পরিবারটা কোথাও ঘরের কাজ পায় না।

তৃষা বউদি খুব চোখা নজরে নিতাইকে দেখে নিয়ে বলল, বড় মেয়ে-টেয়ে আছে?

নিতাই লজ্জায় মুখ নামিয়ে বলল, আছে একটা।

বউদিমণি আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি বটে, কিন্তু ওইটুকুতেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া নিতাইয়ের বাপেরও সাধ্যি নয়।

সামন্তর বউ অবশ্য ধানকলে কাজ পেল। আগুরি শতখানেক টাকাও বউদি দিয়ে দিল ঘর মেরামতির জন্য। সামন্তর ঘরামি বন্ধুরা মজুরি না নিয়ে ছেয়ে দিল ঘর। এখন খেয়ে-পরে আছে। সামন্তর বড় মেয়ের শাড়ি জুটেছে, শরীরটাও ফিরছে আস্তে আস্তে। বিকেলের দিকটায় প্রায়ই গিয়ে ওদের উঠোনে থানা গাড়ে নিতাই।

মুশকিল হল, বিয়ে করে বউ তুলবে কোথায়! সে ভালমতোই জানে, এ বাড়িতে বউ নিয়ে নিতাইকে বাস করতে দেবে না বউদি। তার ওপর খোরাকির কথাও ফেলনা নয়। একা পেট চলে যায়, কিন্তু বউ হলে তার অনেক বায়নাক্কা। তাই খুব হিসেব নিকেশ করছে নিতাই। বিয়ের জন্য প্রাণটাও আঁকুপাঁকু করে। পুতুলরানি গিয়ে অবধি জীবনটা শুকিয়ে পাটকাঠি হয়ে গেছে।

নিতাই যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বালির বস্তায় ঘুসি চালাল সজল। মুঠির চামড়া লাল, কবজি ছিঁড়ে পড়ছে ব্যথায়, সারা গায়ে জবজবে ঘাম।

দিন চারেকের মধ্যে গোয়ালঘরে দুটো বাচ্চা সমেত আরও দুটো গোখরো মারল সজল। দেখেশুনে নিতাই বলল, বাস্তুসাপ। মারলে তো, এখন দেখো কী না কী হয়! দোষের কাজ হয়ে গেল, একটা পুজো লাগালে হয়।

সজল বলল, ধ্যাত!

কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগল না নিতাইয়ের। বাস্তুসাপ বলে কথা। সে গিয়ে বউদিমণিকে গোপনে জানাল, পুরনো গোয়ালঘরে তিনটে বাস্তুসাপ মেরে দিয়েছে সজলখোকা। কাজটা ভাল হয়নি। একটা পুজোটুজো লাগালে ভাল হয়।

তৃষা চোখ বড় করে বলে, সজল মেরেছে?

আজ্ঞে। বারণ শোনে না।

একটু ভাবল তৃষা। সজল সাপ মেরেছে! ঘটনাটার মধ্যে একটু সাবালকত্বের আভাস আছে না?

সজলকে নিয়ে বরাবরই একটা ভাবনা ছিল তৃষার। সেটা আর-একটু বাড়ল। তা বলে ছেলেকে কিছু বললও না সে। গোপনে গিয়ে একদিন গোয়ালঘরে ঝুলন্ত বালির বস্তাটা দেখে এল। ফাঁসির মড়ার মতো ঝুলে আছে। অনেকক্ষণ ব্যাপারটা গুনগুন করল তার মনের মধ্যে।

সকালে বিকেলে দুইজন প্রাইভেট টিউটর সজলকে পড়ান। তবু আজকাল সজল প্রায়ই রাতের দিকে শ্রীনাথের কাছে পড়া বুঝতে আসে।

ব্যাপারটা যে শ্রীনাথের খুব ভাল লাগে তা নয়। কিন্তু সে খুব একটা বারণও করে না। শুধু যেদিন নেশাটা বেশি হয় সেদিন ফিরিয়ে দেয় ছেলেকে। কিংবা ফেরাতেও হয় না, দরজার বাইরে থেকেই বাবার অবস্থাটা দেখে সজল নিজেই ফিরে যায়।

যেদিন শ্রীনাথ ভাল থাকে, তেমন নেশা করে না, সেদিনই বই খাতা নিয়ে এসে সজল বসে যায়।

শ্রীনাথ যে খুব ভাল পড়াতে পারে তা নয়। চর্চা না থাকায় কত কী ভুলে গেছে। ভগ্নাংশ বা দশমিকের অঙ্কই পারে না। ভূগোলে কোন দেশের কী রাজধানী তা মনেই পড়ে না। ইতিহাস যেন আবছা এক নদীর মতো লাগে, হুমায়ুন আকবরের বাবা? না আকবর হুমায়ুনের?

অবশ্য এসবেও কিছু যায় আসে না। কিছুক্ষণ পড়া-পড়া খেলা সেরে নিয়ে সজল গল্প বলার জন্য শ্রীনাথকে নানারকম উসকানি দিতে থাকে। তাতে কাজও হয়।

সারাদিন কারও সঙ্গেই তো কথা বলার নেই শ্রীনাথের। শ্রোতা পেয়ে সে মনের আগল খুলে দেয়। বানানো গল্প নয়, ভূত প্রেত দত্যি দানোব গল্প নয়, শ্রীনাথ স্মৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে থাকে সজলের কাছে। সজল হাঁ করে শোনে।

রাত বাড়ে। চারদিক নিঃঝুম হয়ে যায়। এক-একদিন ভিতরবাড়ি থেকে বৃন্দা বা অন্য কেউ এসে ডেকে নিয়ে যায় সজলকে। কোনওদিন সজলকে নিজেই ফেরত পাঠায় শ্রীনাথ।

একদিন শ্রীনাথ জিজ্ঞেস করল, রোজ আমার কাছে আসিস কেন রে?

সজল লাজুক মুখে বলে, তুমি খুব ভাল পড়াও যে!

শ্রীনাথ ছেলের দুষ্টুমি ধরতে পেরে বলে, আমি আর কী পড়াব? তুই তো আসিস গল্প শুনতে।

বড় মায়া হল শ্রীনাথের। ছেলেটা তো জানেও না যে, সে ওর বাবা নয়। কিন্তু তাতে তো ওর কোনও দোষ নেই। শ্রীনাথ ওর কাছে কোনওদিন ভুলটা ভাঙবে না। সজলকে তার ভালই লাগে। হয়তো ছেলের মতোই ভালও বাসছে আজকাল।

শ্রীনাথ বা সজল টের পায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবন-ঘরের জানালা বা দরজার পাশটিতে ছায়ামূর্তির মতো এসে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তৃষা। সজল যে তাকে তেমন পছন্দ করে না তা তৃষা বরাবর জানে। তার জন্য কোনও মাথাব্যথাও নেই তার। কিন্তু ইদানীং শ্রীনাথের ওপর সজলের টান দেখে তার মনে নানা সন্দেহ উঁকি দেয়। শ্রীনাথকে বিশ্বাস নেই। ছেলেকে হাত করে তৃষাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে হয়তো।

করছেই। এতদিন বাইরের লোকের কাছে কুৎসা গেয়ে বেড়িয়েছে। তাতে কাজ হয়নি দেখে এখন নতুন করে কোনও ফন্দি আঁটছে নিশ্চয়ই।

দিন সাতেক বাদে একদিন নিশুত রাতে কুকুরের চিৎকারে ঘুম ভাঙল তৃষার। উঠোনে খুব চেঁচাচ্ছে কুকুরটা। তৃষার ভয়ডর বলে কিছু নেই। মেঝেয় বৃন্দা পড়ে ঘুমোচ্ছে। তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে তৃষা টর্চ হাতে দরজা খুলল।

পাল্লা দুটো ভাল করে খোলবার আগেই অন্ধকার উঠোনে একটা নীলচে লাল আগুনের ঝলকানি, আর সেই সঙ্গে বুক কাঁপানো দুড়ুম শব্দ। বাতাসের ধাক্কা আগুনের হলকা আর সেই সঙ্গে বালির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো কী যেন এসে সপাটে ধাক্কা মারল তৃষাকে। আচমকা এসব ঘটে যাওয়ায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল তৃষা। কিন্তু সেই অবস্থাতেই দু'জোড়া পায়ের দৌড়োনোর শব্দ তার কান এড়াল না।

দরজা খুলে তৃষা টর্চ জ্বেলে দেখে বারান্দার সিঁড়ির কাছে শানের ওপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাদাটে দাগ। সিমেন্টে চিড় ধরেছে। একটা বোমার খোল পড়ে আছে উঠোনে। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী।

শব্দে মারমার করে বাড়ির লোকজন উঠে এল। সরিৎ, ছেলেমেয়ে, চাকর-বাকর। বোমার শব্দে

ইস্পাত কেঁউ কেঁউ করে পালিয়ে গিয়েছিল। লোকজন দেখে সেও এল আবার ঘেউ ঘেউ করতে করতে।

সরিৎ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে বন্দুকটা নিয়ে এল। বলল, কোনদিকে গেল বলো তো মেজদি!

তৃষা টর্চ জ্বেলে সদর ফটকের দিকটায় আলো ফেলে বলল, তাড়া করে লাভ নেই।

তাদের দেখেছ?

না। তবে দু'জন ছিল। পায়ের শব্দ পেয়েছি।

কারা হতে পারে?

কী করে বলব? মংলার হাতে চিঠি দিয়ে একবার থানায় পাঠা।

খোকনকে সজাগ থাকতে বলে হঠিয়ে দিল তৃষা। তারপর টর্চ হাতে নিঃশব্দে চলল ভাবন-ঘরের দিকে।

গ্রীষ্মকাল বলে কয়েকটা জানালা খুলে রেখে শোয় শ্রীনাথ। আজও শুয়েছে। আগে অন্ধকার ঘরে শ্রীনাথের ঘুমন্ত শরীরটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে। ঘুমোচ্ছে! বোমার আওয়াজটা এতদূর এসে পৌঁছোয়নি নাকি?

সন্দেহ। তৃষা টর্চ জ্বেলে নাইলনের মশারির ভিতরে শ্রীনাথের ঘুমন্ত মুখটাকে বুঝবার চেষ্টা করে। ঘুমোচ্ছে তো? না কি মটকা মেরে পড়ে আছে। টর্চের আলোটা খানিকক্ষণ মুখের ওপর নাড়াচাড়া করেও দেখল, শ্রীনাথ জাগে কি না। জাগল না।

তৃষা ডাকল, শুনছ! ওঠো তো! বাড়িতে কারা এইমাত্র বোমা মেরে গেল।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর শ্রীনাথ উঠল।

কী হয়েছে?

দরজা খোলো, বলছি।

বিরক্ত শ্রীনাথ উঠে দরজা খোলে, এত রাতে! ডাকাত পড়েছে নাকি?

এখনও পড়েনি। তবে যে-কোনওদিন পড়বে।

কী হয়েছে তা হলে?

দুটো লোক এসে আমার শোওয়ার ঘরে বোমা মেরে গেল একটু আগে। শব্দ পাওনি?

বোমা!—বলে হাঁ করে চেয়ে থাকে শ্রীনাথ। বোমা মারে বটে লোকে, কিন্তু তৃষার শোওয়ার ঘরে বোমা মারার কী আছে তা সে ঘুমন্ত মাথায় সঠিক বুঝতে পারে না।

কারা জানো?—তৃষা জিজ্ঞেস করে।

আমি কী করে জানব? বোমা কারও গায়ে লেগেছে?

না। মনে হচ্ছে আমাকেই মারতে এসেছিল। কিন্তু তাড়াহুড়োয় ঠিক মতো ছুড়তে পারেনি। বারান্দায় পড়ে ফেটে গেছে।

সর্বনাশ! —বলে সত্যিকারের সাদা হয়ে যায় শ্রীনাথ। তার মাথাটা ঘুম ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ জেগে ওঠে। কাল রাতে একটু বেশি টেনে ফেলেছিল সে। জেগে শরীরের একটা প্রবল কষ্ট টের পায়। বলে, তোমাকে মারতে এসেছিল!

খুব তীক্ষ্ণ চোখে শ্রীনাথকে লক্ষ করে তৃষা। হয়তো অভিনয়। সে ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারে না। বলে, আমাকে ছাড়া আর কাকে? আমার তো শত্রুর অভাব নেই। কিন্তু এতটা আগে কখনও হয়নি। তুমি কিছু জানো না?

আমি জানব! আমি কী জানব?

তুমি তো রামলাখনের আড্ডায় যাও, বটতলায় মিটিং করো, ওসব জায়গায় যারা যায় তারাই হয়তো এই কাণ্ডটার পিছনে আছে।

তৃষা কী বলতে চাইছে তা সঠিক ধরতে পারল না শ্রীনাথ। তাই রেগেও গেল না। তোম্বা ঘাবড়ে যাওয়া মুখে মাথা নেড়ে বলল, না, আমি কিছু শুনিনি। কেউ তোমাকে মারতে চায় বলে জানি না।

এখন তো জানলে!

জানলাম। কিন্তু কী করা উচিত বুঝতে পারছি না।

তৃষা সামান্য হেসে বলল, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কোনওদিন কিছু কি করেছ আমাদের জন্য? আজও তোমাকে ছাড়াই চলবে।

শ্রীনাথ এ কথাটাও গায়ে মাখল না। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর একটা বিড়ি ধরাল। চোখেমুখে ভীষণ উদ্বেগ আর ভয় ফুটে রয়েছে তার।

তৃষা উঠে বাইরে গিয়ে চারদিকে টর্চটা ঘুরিয়ে দেখল। নিতাই একটা মশাল জ্বেলে জঙ্গলে-জঙ্গলে খুঁজছে। আরও কয়েকটা টর্চ জ্বলে উঠছে এখানে-সেখানে।

তৃষা উঁচু গলায় ডাকল, সরিৎ!

কী বলছ?—ফটকের ধার থেকে জবাব এল।

ছেলেমেয়েগুলোকে শুয়ে পড়তে বল। বৃন্দাকে বলিস ওদের ঘরে শুতে। নইলে ভয় পাবে।

যাচ্ছি।

বন্দুকটা রেখে আয়।—বলে তৃষা আবার ভাবন-ঘরে ঢুকে শ্রীনাথের মুখোমুখি হয়।

শ্রীনাথ আর-একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, পুলিসে যাওয়া উচিত।

লোক গেছে। ছেলে দুটো কাল-পরশুই ধরা পড়বে।

পড়লেই ভাল। কিন্তু আজকাল পুলিস অত রেসপনসিবল নয়।

তৃষা খুব খর দৃষ্টিতে শ্রীনাথের মুখের দিকে চেয়ে বলল, পুলিস পারুক বা না-পারুক ছেলে দুটো ধরা পড়বেই। মরা বা জ্যান্ত।

॥ ছেচল্লিশ ॥

মরা বা জ্যান্ত!—বলে শ্রীনাথ খুব অবাক চোখে তৃষার দিকে চায়। একটু তোতলা জিভে জিজ্ঞেস করে, ধরতে পারলে তুমি ওদের মেরে ফেলবে নাকি?

না।—তৃষা ঠান্ডা গলায় বলে, জ্যান্ত ধরতে পারলে মারব কেন? যদি জ্যান্ত ধরা না যায় তা হলে দরকার হলে মেরে ফেলব।

তুমি!—বলে বিস্ফারিত চোখে অনেকক্ষণ পলক ফেলে না শ্রীনাথ। তারপর যেন চুপসে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, তুমি সব পারো।

ভুলে যেয়ো না ওরা আমাকেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

শ্রীনাথ আর-একটা বিড়ি ধরায়। খুব ঘন ঘন বিড়ি খাচ্ছে এখন সে। তৃষার কথাটা শুনে একটু ভেবে বলল, কথাটা শুনতে কিছু অদ্ভুত। তবু বলি, তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল বলেই যে ওরা বধের যোগ্য তা কিন্তু নয়।

আমিও তা বলিনি। যদি ধরা পড়ে তা হলে যা করার পুলিস বা আইন আদালত করবে। যদি তারা উপযুক্ত শাস্তি না দেয় বা খালাস দেয় তখন আইন আবার আমরা হাতে নেব। কিন্তু সে অন্য কথা। আমাকে মারতে চেয়েছিল বলেই যে আমি তাদের মারব তা আমি এখনও বলছি না।

শ্রীনাথের গলার স্বর থেকে আত্মবিশ্বাস বিদায় নিয়েছে। কেমন মিনমিনে শোনাচ্ছে তাকে। তেমনি এক ভেজা ভিতু গলায় সে বলে, তুমি আগে আর কাউকে খুন করিয়েছ তৃষা?

তৃষা আজ রাতে নানা কারণেই কিছু বিভ্রান্ত। তবু এখন শ্রীনাথের মুখের দিকে চেয়ে তার একটু

করুণা হল। সে মাথা নেড়ে বলল, না। কিন্তু আমার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান এত কম কেন?

শ্রীনাথ একটা ঢোক গিলে বলল, জ্ঞান? না, আমার আর জ্ঞানের দরকার নেই। আমি আর কিছু জানতে চাই না।

বলতে বলতে শ্রীনাথের দাঁতে একটু খটখটি হল। সে যে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেছে তা বুঝতে তৃষার কোনও কষ্ট হচ্ছে না। এ লোক যে তৃষাকে খুন করানোর জন্য লোক লাগাতে পারে না, তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছে তৃষা। কিন্তু সন্দেহের একটা আলপিন তবু ফুটে থাকে তার মনের মধ্যে। সে শান্ত কিন্তু কঠিন এক গলায় বলে, লোককে ঘরের কথা বলে বেড়ানো তোমার স্বভাব। কিন্তু তা বলে লোককে বলতে যেয়ো না যে, আমি বোমাওলাদের মেরে ফেলার তালে আছি। যদি বলো তা হলে তোমার ভাল হবে না।

শ্রীনাথ ভয় পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা বলে তৃষার এই প্রচ্ছন্ন চোখরাঙানোটাও তার সহ্য হয় না। সে আবার বিড়ির আগুন থেকে নতুন বিড়ি ধরিয়ে নেয়। বলে, আমি বললেই যে লোকে বিশ্বাস করবে এমন নয়। মাতাল বদমাশদের কথা লোকে রেখে-ঢেকে অর্ধেক ধরে, অর্ধেক ফেলে দেয়। আজকাল তাই বলাবলি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু লোকে যদি আমার কথা বিশ্বাস করত তবে বলতাম।

কথা বলতে বলতে শ্রীনাথের একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। সে উঠে গিয়ে কাঠের আলমারি থেকে একটা ব্র্যান্ডির বোতল বের করে ছিপিতে ঢেলে কয়েকবার খেয়ে নিল। একটা বিদঘুটে ঢেঁকুর তুলে মুখটা বিকৃত করে আবার ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। মুখটা বোকাটে, ঘাবড়ানো এবং সন্ত্রস্ত।

তৃষা বলল, লোকে তোমাকে বিশ্বাস না করলেও কেচ্ছাকে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে কে বলেছে সেটা বড় কথা নয়, কী বলছে সেটাই বড় কথা। তাই বলছি বোলো না। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

অসহায় মুখে শ্রীনাথ বলে, খুন-টুন আমি সইতে পারি না।

তুমি পুরুষমানুষ হয়ে যখন পারো না, আমি মেয়েমানুষ হয়ে কি পারি?—তৃষা যেন বাচ্চা ছেলেকে ভোলাচ্ছে এমনভাবে কথাটা বলল। একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু অনেক ঠেকে শিখেছি, আমি বিপদে পড়লে বাঁচানোর মতো কেউ নেই। আমার দুঃখ হলে পাশে এসে কেউ দাঁড়াবে না। তাই বিপদ-আপদ বা দুঃখ-টুঃখকে আমি কাছে আসতে দিই না। তার আগেই নিকেশ করি। মাঝরাতে দুটো ছেলে এসে বাড়িতে ঢুকে বোমা মেরে আমাকে উড়িয়ে দিয়ে যাবে, এতকাল তো এত কষ্টের জীবন শুধু সেজন্য বয়ে বেড়াইনি! কাজেই যারা মারতে এসেছিল তাদের একটু সমঝে দেওয়া ভাল। যদি আর কারও মনে ওরকম ইচ্ছে থেকে থাকে তবে তারাও হুঁশিয়ার হবে।

হয়তো তোমাকে মারতে চায়নি। হয়তো অন্য কাউকে—

কী করে বুঝলে?

সেদিন স্টেশনের কাছে দুটো ছেলেকে সরিৎ চেন দিয়ে মেরেছিল। তারাও হতে পারে। হয়তো সরিতের ওপর শোধ নিতে এসেছিল।

সরিৎ আমার ভাই। তাকে মারতে এলেই বা আমি ছাড়ব কেন? সে আমার আশ্রয়ে আছে, তার দায়দায়িত্ব আমার, সেটা ভুললেও তো চলবে না।

শ্রীনাথের আর কিছু বলার থাকে না। সে চুপ করে রইল।

তৃষা জিজ্ঞেস করে, সরিৎ যাদের মেরেছিল তাদের তুমি চেনো?

না। মুখচেনা।

সোমনাথ বহুকাল এদিকে আসছে না। তবু আমাকে সব খবরই নিতে হবে।

সোমনাথ! সোমনাথ এর মধ্যে নেই তৃষা। আমি বলছি।—খানিকটা আতঙ্কের সঙ্গে বলে ওঠে শ্রীনাথ।

নেই কী করে জানলে? সোমনাথ নিজে না থাকলেও তাব অনেক সিমপ্যাথাইজার আছে এখানে।

ওকে এখানে কেউ চেনেই না। তা ছাড়া বুলু এখন তার বউকে নিয়ে ব্যস্ত।

তুমি কোনও খবরই রাখো না। ওদের বাচ্চাটা পেটেই নষ্ট হয়ে গেছে সেই কবে! সোমনাথ বাবাকে একটা চিঠিতে লিখেছে, আমিই নাকি কোন তান্ত্রিককে ধরে বাণ মেরে ওই কাণ্ড করিয়েছি।

বুলু লিখেছে?

হ্যাঁ। বাবার তোষকের নীচে চিঠিটা ছিল। তোষক রোদে দিতে গিয়ে চিঠিটা বৃন্দার হাতে পড়ে। সে আমাকে দেয়।

বুলুটা পাগল।

তাই হবে।—বলে তৃষা ওঠে। চারদিকে চেয়ে বলে, তুমি ঘুমোও। রাত আর বেশি নেই।

আর ঘুম!—বলে শ্রীনাথ আবার উঠে গিয়ে ছিপিতে ঢেলে ব্র্যান্ডি খায়।

তৃষা অন্ধকার বারান্দায় বেরিয়ে আসে। মস্ত বাগানের আনাচে-কানাচে এখনও টর্চ জ্বলছে।

তৃষা বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে বলল, তোদের আর খুঁজতে হবে না। ঘরে যা সবাই।

আনমনে রাস্তাটুকু পার হয়ে উঠোনে পা দিয়ে তৃষা দেখে, তার ঘরের সিঁড়িতে সরিৎ বসে আছে। হাতে একটা বেতের মোটা লাঠি। তার পাশে খ্যাপা নিতাই। নিতাইয়ের পায়ের কাছে ইস্পাত। তৃষাকে দেখে ইস্পাত উঠে এসে কুঁই কুঁই করে গায়ে পা তুলে আদর কাড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরের আদরে বড় ঘেন্না তৃষার। বলল, যাঃ যাঃ।

সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাত ভয় খেয়ে নিতাইয়ের কাছে ফিরে যায়।

তৃষা বলে, তোরা শুতে গেলি না?

সরিৎ হাই তুলে বলল, সাড়ে তিনটে বাজে, আর শুয়ে কী হবে?

তৃষা আর কিছু বলল না। বারান্দায় উঠে দরজার শিকল খুলল।

সরিৎ বলল, দরজাটা দিয়ে দাও। আমরা পাহারা দিচ্ছি।

তৃষা খুব অন্যমনস্ক। কথাটা শুনেও শুনল না। মশারি সরিয়ে বিছানার ধারে বসে রইল সে। স্ট্যান্ডে বন্দুকটা রেখে গেছে সরিৎ। তৃষার চোখ সেইদিকে। ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠছে রাগ আর আক্রোশ। কিন্তু বাইরে খুব স্থির সে। মনে এখন আর কোনও ভয় বা বিভ্রান্তি নেই। তবে তীব্র জ্বালা আছে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে তারপর উঠে স্টোভ জ্বেলে সে চায়ের জল চড়ায়। উঠোনে, বাগানে লোকজন জেগে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু এই ভোরবেলা আর কোনও শত্রু এসে ঢুকবে না, এটা জানে তৃষা। শত্রুরা জানে, এর পর তৃষা আরও সতর্ক হবে, নিষ্ঠুর হবে। তাই আর সহজে এ বাড়ির ছায়া মাড়াবে না তারা। কিন্তু মাড়ালেই তৃষার সুবিধে হত। হাতের মুঠোয় পেত তাদের।

পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক দিনের। তারা এনকোয়ারিতে এসে কী কী জিজ্ঞেস করবে তা সে জানে। তার কোনও শত্রু আছে কি না। কাকে তার সন্দেহ হয়। লোকগুলো কেমন দেখতে। ইত্যাদি।

তৃষা দরজা খুলেই বিস্ফোরণ দেখেছিল। আর কিছু মনে নেই। কিন্তু তৃষা জানে, দরজা খোলা এবং বোমা ফাটবার মধ্যে যে কয়েক সেকেন্ড সময় তার মধ্যেই তার চোখ অনেক কিছু দেখেছে। কিন্তু বোমার ধাক্কায় মাথাটা এতই গুলিয়ে আছে যে কিছুই মনে পড়ছে না। তবে মনটাকে শান্ত ও নিরুদ্বেগ করে যদি একাগ্রভাবে চিন্তা করে সে, তবে নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

কিন্তু মনটাকে শান্ত করা কি সোজা! সংসারের এত জ্বালাপোড়া, এত ক্ষোভ রাগ হতাশা জমে আছে ভিতরে! মশারির মধ্যে বসে চোখ বুজে যতবার ভাববার চেষ্টা করল ততবারই অন্য সব বাজে চিন্তা হিজিবিজি কথা এসে লন্ডভন্ড করে দিল মাথা। ওই কয়েক সেকেন্ডের জরুরি স্মৃতি কিছুতেই মনে এল না।

উঠোনটা অন্ধকার ছিল। কুকুরটা দৌড়ে দৌড়ে ডাকছিল খুব। দরজা খুলে কী দেখেছিল সে?

শুধু অন্ধকার? আর কিছুই নয়? কোনও অস্বাভাবিকতা নয়? কোনও গন্ধ বা শব্দ নয়? কোনও নড়াচড়া নয়? যে দু'জোড়া পায়ের শব্দ শুনেছিল তার আওয়াজ কেমন? চটির আওয়াজ না জুতোর? ভারী পা, না হালকা?

চারদিকে ফটফটে ভোরের আলো দেখা গেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তৃষা। বহু কাজ।

বাকি রাতটুকু ভাল ঘুম হয়নি শ্রীনাথেরও। তৃষা চলে যাওয়ার পর একা ঘরে এক রক্ত-জল-করা ভয় তাকে পেয়ে বসল। এ কার ঘর সে করছে এতকাল? তৃষা অনেক কিছু করতে পারে, সে জানে। কিন্তু তা বলে খুন? মাথাটা গরম হয়ে উঠছিল, বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে উঠছে এক ধুকধুকনি। খুনখারাপি মারধর কোনওদিনই সহ্য করতে পারে না শ্রীনাথ। উঠে গিয়ে সে ব্র্যান্ডির বোতলটা বের করে আনল। জল মিশিয়ে অনেকক্ষণ খেল বসে বসে। তারপর শরীরে ঝিমঝিমনি উঠলে গিয়ে শুয়ে পড়ল। দুঃস্বপ্ন দেখল অনেক। উঃ আঃ শব্দ করল ঘুমের মধ্যেই।

একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠল শ্রীনাথ। শরীর কাহিল, মন অবসন্ন। এত বিদঘুটে হ্যাংওভার বহুকাল হয়নি তার। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সে গিয়ে মুখ-হাত ধুল। তারপর ইজিচেয়ারে পড়ে রইল মড়ার মতো। বাড়িতে বোমা পড়লেও যথাসময়ে চা এল ঠিকই। চেয়ে আরও এক পট দুধছাড়া চা আনিয়ে খেল শ্রীনাথ। সঙ্গে অল্প ব্র্যান্ডি। কিন্তু মাথাটা অল্প অল্প ঘুরছে, শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে বেশ।

সকালেই পুলিসের জিপ এসে ফটকের কাছে থেমে আছে। শ্রীনাথকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অবশ্য কেউই এল না। এলে খুবই অস্বস্তিতে পড়বে সে। সে নিজেও জানে সত্যিকারের কাপুরুষ বলতে যা বোঝায় সে হচ্ছে তা-ই। তবে এখন আর সেজন্য কোনও লজ্জা নেই শ্রীনাথের। জীবনটাকে তো আর পালটানো যাবে না।

চোখ বুজেও সে দুঃস্বপ্নই দেখছিল এখন। চারদিকে শরতের উজ্জ্বল এক সকাল। চোখ বুজেই টের পেল দরজার আলোয় কে যেন এসে দাঁড়িয়ে ছায়া ফেলল।

চোখ চেয়ে অতি কষ্টে মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে শ্রীনাথ বলল, আয়। পুলিস কি চলে গেছে?

সজল ষড়যন্ত্রকারীর মতো বেড়াল-পায়ে ঘরে আসে। মুখ টিপে হেসে বলে, না। ডবল ডিমের ওমলেট খাচ্ছে বসে বসে। তবে খেয়েই চলে যাবে।

এনকোয়ারি হয়ে গেল?

হ্যাঁ। সবাইকে ধরে ধরে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল।

তোকেও করেছে?

হ্যাঁ।—বলে মাথা হেলায় সজল, আমি বলেছি বোমবাজদের আমি চিনি।

সে কী?—বলে শ্রীনাথ চোখ বড় করে তাকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সকালের এই সাদা আলোটা সইতে পারে না একদম। চোখ কুঁচকে বলে, তুই আবার নাম-টাম বলিসনি তো?

বলেছি।

কার নাম বলেছিস?

রামলাখন আর কাটুমদা।

কাটুমদা কে?

শীতলাতলার ভটচায মশাইয়ের ছেলে, চেনো না?

সে বোমা মেরেছে?

মারতে পারে। মেজদিকে স্কুলের রাস্তায় রোজ ফলো করে। মেজদি একদিন চটি খুলে তাড়া করেছিল।

খুবই অবসাদ বোধ করে শ্রীনাথ। বলে, না জেনে পুলিসকে কোনও নাম বলা ঠিক নয়। বললি কেন?

এমনিই। পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে পেটালে ভাল হবে।

ধরবে নাকি ওদের? তোর কথায়?

না। —একটু হতাশার গলায় সজল বলে, মা যে সব নষ্ট করে দিল। মা পুলিসকে বলল, ওর কথা ধরবেন না। তোমার কথা মা কী বলেছে জানো?

কী বলেছে?

বলেছে আমার হাজব্যান্ড প্রকৃতিস্থ নন। ওঁকে জেরা করার দরকার নেই। তাই পুলিস তোমার কাছে আসেনি।

একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলল শ্রীনাথ। মনে মনে তৃষাকে ধন্যবাদ দিল।

সজল জিজ্ঞেস করল, বোমার শব্দটা তুমি শোনোনি বাবা?

না।

জায়গাটা দেখেছ? যেখানে বোমাটা মেরেছিল?

না দেখিনি।

গিয়ে একবার দেখে এসো। দারুণ। বারান্দার শানে অনেকখানি চিড় ধরে গেছে। মা'র গায়ে লাগলে একদম উড়িয়ে দিত।

বিরক্ত শ্রীনাথ বলে, তুই হাসছিস কেন? এটা কি মজার ব্যাপার?

সজল যেন ধরা পড়ে গিয়ে একটু কাঁচুমাচু হল। বলল, লাগেনি তো।

লাগেনি, কিন্তু ব্যাপারটা তা বলে হাসির নয়।

আমার স্কুলের একটা ছেলে পেটো বানাতে পারে। কিছু টাকা দিলে শিখিয়ে দেবে।

খবরদার!—বলে শ্রীনাথ ধমক দেয়।

সজল ফের একটু মিচকি হাসি হেসে বলে, তুমি কেবল শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছ। ছোটমামা নিজেই পেটো বানায় তা জানো?

স্তম্ভিত শ্রীনাথ বলে তোকে কে বলল?

কে বলবে? সবাই জানে।

তোর মা জানে?

মা-ই তো মশলা কেনার টাকা দেয়।

শ্রীনাথ হাঁ করে থাকে। মাথাটা একটু বেশি পাক খায় বলে তাকাতে কষ্ট হয় খুব। বড় করে শ্বাস ফেলছে বারবার। বলল, সরিৎ ওসব বানায় কেন?

কে জানে?—ঠোঁট উলটে সজল বলে।

আবার এক তীব্র আতঙ্কে বিহ্বল হতবুদ্ধি হয়ে যায় শ্রীনাথ। এ সে কাদের মধ্যে রয়েছে? এ কারা তার আত্মীয়স্বজন? উঠতে গিয়ে টাল খেয়ে বসে পড়ল শ্রীনাথ। আবার চেষ্টা করল। এ বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে এক্ষুনি তার বেরিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু উঠতে গিয়ে এবার আর বসে পড়ল না। চোখ অন্ধকার আর মাথা শূন্য হয়ে দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেয়।

সজল চমকে উঠেছিল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল মেঝেয় পড়ে থাকা তার বাবার দিকে। উপুড় হয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, বাবা! বাবা!

শ্রীনাথ রক্তবর্ণ দুটো চোখ খুলে বলে, একটু হাওয়া। আমাকে খোলা হাওয়ায় নিয়ে চলো।

কী হয়েছে তোমার?

আমি মরে যাচ্ছি! শিগগির।

সজল ভিতরবাড়িতে দৌড়ে গেল।

একটু বাদেই বাড়ির লোকজন আর ডাক্তার-বদ্যিতে ভরে গেল ঘর।

শ্রীনাথের বহুকাল কোনও অসুখ-বিসুখ করেনি। বিছানায় এক ঘোরের মধ্যে শুয়ে থেকেও সে

সবই টের পায়। বিছানায় তৃষা, মঞ্জু আর স্বপ্না খুব কাছাকাছি বসে আছে। ডাক্তার তার প্রেশার নিচ্ছে। মাথার কাছে একটা টেবিল-ফ্যান থেকে স্নিগ্ধ হাওয়া এসে লাগছে। পাতালে তলিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে শ্রীনাথ। তারপর একটা ছুঁচের মুখ ঢুকে গেল হাতে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে।

ডাক্তার বলে গেল, ভয়ের কিছু নেই। একজহশন, ড্রিংক, ল্যাক অফ এক্সারসাইজ। মাইল্ড স্ট্রোকও বলা যায়। প্রেশারটা ভীষণ লো। এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার।

তৃষা ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে ভাবন-ঘরের ইজিচেয়ারে এসে বসে।

শ্রীনাথের তেমন কিছু হয়নি জেনে ছেলেমেয়েরা নেয়েখেয়ে স্কুলে গেল। বাড়ির লোক সংসারের নানা কাজে লেগে পড়ল। সরিৎ গেল ওষুধ আনতে।

একা তৃষা শ্রীনাথের ঘুমন্ত মুখের দিকে জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে রইল। মনে মনে বলল, অকৃতজ্ঞ! তোমার না হয়ে যদি আমার এ রকম হত, তবে তুমি আমার জন্য করতে এতটা? পুরুষমানুষের মতো নিমকহারাম দুটো নেই দুনিয়ায়। তুমি বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে মদ খেয়ে যত না নিন্দে কুড়িয়েছ, আমার একটা কলঙ্কের নিন্দে তার চেয়ে ঢের বেশি। বেশ আছ তোমরা কাপুরুষ মেরুদণ্ডহীন! মেয়েমানুষকে মারতে চোরের মতো মাঝরাতে এসে বোমা ছোড়ো, তোমরা কেমন জন্তু?

পুরুষমানুষের ওপর আগ্রাসী রাগ খুব বেশিক্ষণ রইল না তৃষার। বোমার খবর রটে গেছে। বহু লোক দেখা করতে আসছে। পাড়ার মাতব্বর, প্রাক্তন এক এম এল এ, সমাজকর্মী, কৌতূহলী গিন্নিবান্নিরা। বৃন্দাকে শ্রীনাথের ঘরে রেখে তৃষাকে উঠে যেতে হল।

ফাঁক পেতে পেতে সেই দুপুর। ঘুমন্ত শ্রীনাথকে আধোজাগা করে গরম দুধ খাইয়ে এল তৃষা। নিজে নেয়ে-খেয়ে একটা প্যাডের কাগজে লম্বা চিঠি লিখতে বসল দীপনাথকে।

দীপু, তোমাকে আমার গার্জিয়ান করতে চেয়েছিলাম। তুমি সেই ভয়ে সেই যে পালিয়ে গেলে আর এলে না। না হয় গার্জিয়ান না-ই হলে, তা বলে কি খোঁজ নিতে নেই! আমার কী বিপদ যাচ্ছে জানো না তো।...

অনেক অনেক কথা লিখল তৃষা। সচেতনভাবে যা সে কখনওই লিখতে পারত না। লজ্জা পেত।

চিঠিটা খামে এঁটে মংলাকে ডাকছিল ডাকে দেওয়ার জন্য। বারান্দা থেকেই হঠাৎ চোখে পড়ল, ফটক থেকে আলোছায়াময় আঁকাবাঁকা পথটি ধরে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী আসছে। বোধ হয় পড়শিই কেউ হবে। তৃষা ঘরে গিয়ে চশমাটা চোখে দিয়ে বেরিয়ে এল।

বলল, ওমা!

উঠোনে দীপনাথ আর মণিদীপা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

দীপনাথ বলল, এলাম।

তৃষা নেমে গিয়ে মণিদীপার হাত ধরে বলল, তুমি বাপু আজ একদম সাজোনি!

মণিদীপা বড় বড় চোখে চেয়ে তৃষাকে দেখছিল। খুবই বুদ্ধিমতী। বলল, আমি না হয় সাজিনি। কিন্তু আপনার কী হয়েছে বলুন তো! ইউ লুক সো ক্রেস্টফলেন!

কিছু নয়। ঘরে এসো।

আপনাদের এ জায়গাটা আমার ভীষণ ভাল লাগে। অবশ্য তার জন্য আপনিই রেসপনসিবল আপনাকে ভাল লাগে বলেই জায়গাটাকেও ভাল লাগে। কিন্তু আপনিই তো আজ প্যাথস।

॥ সাতচল্লিশ ॥

নিজের ঘরে দু'জনকে বসাল তৃষা। দীপনাথ চেয়ারে, মণিদীপা তৃষার পাশে বিছানায়।

মণিদীপা আগের দিন যে পোশাক পরে এসেছিল তা তৃষার তেমন পছন্দ হয়নি। আজ মণিদীপার পরনে শাড়ি। চুলে নতুন করে ছাঁট দেয়নি বলে বব চুলও অনেক লম্বা হয়ে কাঁধ ছাড়িয়েছে। শুধু কপালের দু'পাশে কয়েকগাছি চুল ছাঁটা। সেগুলো সবসময়ে দু'দিকে ঝাপটার মতো দোলে। সিঁথিতে সিঁদুর না থাকায় দীপনাথের সঙ্গে ওকে যে-কেউ প্রেমিক-প্রেমিকা বলে গুলিয়ে ফেলবে। বয়সটাও কম। তার ওপর চেহারায় খুকির ছাপ প্রবল।

তৃষা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যা দেখার দেখে নেয়। বলল, আগের দিন কিন্তু বলে গিয়েছিলেন খুব তাড়াতাড়ি আবার আসবেন। আসতে কিন্তু বছর ঘুরে গেল।

পথটা ঠিক চিনি না তো! ট্রেনে আগেরবার আসিনি। নইলে ঠিক চলে আসতাম।

একা কেন? দীপুই তো আনতে পারত।

ওঁর কত কাজ!—ছদ্মগাম্ভীর্যে মণিদীপা বলে, কতদিন ধরে সাধাসিধি করে আজ তবু সময় হল। আপনার এই খামারবাড়িটা এত ফ্যান্টাসটিক যে, আমার বারবার এ জায়গাটার কথা মনে পড়ে।

তৃষা এই প্রশংসায় একটু আনমনা হয়ে গেল। বলল, জায়গাটা তো এমনিতে সুন্দর হয়নি। কত ভালবাসা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার। লোকে কেবল বাইরে থেকে দেখে, এ বাড়ির মালিকদের কত টাকা।

মণিদীপা তৃষার এই ভাবান্তর লক্ষ করল না। সে আলতো প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনি কি জোতদার?

জোতদার! কই কখনও কথাটা ভেবে দেখিনি তো! না বোধ হয়, আমি জোতদার-টোতদার নই।

তবে জোতদার কাদের বলে?

মণিদীপাকে তৃষার হাতে ছেড়ে দিয়ে দীপনাথ বাইরে এসে দাঁড়ায়। খাঁ খাঁ করছে দুপুর। গ্রীষ্ম ও বর্ষার রেশ এখনও কেটে যায়নি। তবু এই বারান্দায় দাঁড়ালে আকাশের পেঁজা মেঘ, উঠোনের ধারে কিছু কাশফুল আর রোদের রং দেখলে শরৎকাল টের পাওয়া যায়। খানিকক্ষণ প্রকৃতির দিকে চেয়ে দীপনাথ মাথা নিচু করে বারান্দার পাশে জুতোর রবার সোল ঘষতে থাকে। বউদিকে আজ একটু অন্যরকম লাগছে না? একটু যেন বিব্রত! একটু অন্যরকম।

দীপনাথ সিঁড়ি ভেঙে নেমে উঠোন পেরোল। বাবার ঘরের দরজা আবজানো। নিঃশব্দে ঢুকে দেখল, তিনি কাত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন.

তাঁকে না জাগিয়ে বেরিয়ে এল দীপ। এ ঘর সে ঘর ঘুরে কাউকে না পেয়ে সে এল ভাবন-ঘরে। দরজা আবজানো দেখে ঠেলে ঢুকেই থমকে গেল সে। মেজদা! কী হয়েছে মেজদার?

চোখের পাতা মেলে অনেকক্ষণ ঘোর-ঘোর আচ্ছন্ন ভাবটায় ডুবে থাকে শ্রীনাথ। তারপর চেতনায় ফেরে।

মেজদা!

দীপু!

তোমার কী হয়েছে?

আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবি, দীপু?

কোথায় যাবে?

পালিয়ে যাব। এরা কী ভীষণ ডেঞ্জারাস তা জানিস না। এরা মানুষ মারে, বোমা বানায়।

এরা কারা?

তৃষা, সরিৎ।

কী যা-তা বলছ?

কেউ বিশ্বাস করবে না, জানি। তবু বলছি, দে আর মার্ডারার্স। সজলকে জিজ্ঞেস করিস, বোমা বানায় কি না।

বোমা বানানো অত সোজা নয়। আর বোমা দিয়ে কী হবে?

কাল রাতে সরিৎ এ বাড়িতে বোমা ফাটিয়েছে।

সরিৎ?

তোর বউদি অবশ্য বলেছে, দুটো ছেলে রাতের বেলা তাকে খুন করতে এসেছিল। পুলিসকেও তাই বলেছে। পরে সজলের কাছ থেকে জেনেছি, আসলে বোমা বানায় সরিৎ নিজেই। তৃষা তার জন্য টাকা দেয়।

একটু বিরক্তির গলায় দীপনাথ বলে, আচ্ছা, সেসব কথা পরে হবে। তোমার কী হয়েছে আগে বলো তো!

ওসব শুনে আজ সকালে আমি কেমন নার্ভাস হয়ে কোলাপস্ করলাম।

শোনো মেজদা, এখনও তোমার শ্বাসে অ্যালকোহলের গন্ধ আসছে। নার্ভাস তুমি এমনিতে হওনি, মদ খেয়ে কোলাপস্ করেছ।

না, না। বিশ্বাস কর। সে শুধু খোঁয়াড়ি ভাঙতে একটু খেতে হয় বলে খাওয়া। আসল কারণ অন্য।

অনেক আগেই তোমাকে ডাক্তার দেখাতে বলেছিলাম। আমার সন্দেহ ভিতরে ভিতরে তোমার ডায়াবেটিস পাকিয়ে উঠছে।

দূর! মদ খেলে কোনও অসুখ হয় না।

এ কথাটা মাতাল বন্ধুদের কাছে শিখেছ। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়।

মরলে মরব। রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে।

রাবণটা কে?

আমাকে এখান থেকে নিয়ে যা, দীপু। আই বেগ টু দী।

শেষ কথাটা ছেলেবেলায় পড়া ইংলিশ সিলেকশনের কোনও পাঠ্যাংশ থেকে মুখস্থ বলল শ্রীনাথ। দীপনাথ অবশ্য হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, নিজের কী অবস্থা করেছ যদি নিজের চোখে একবার দেখতে!

এরা আমাকে স্লো পয়জন করেনি তো, দীপু?

তোমাকে কে স্লো পয়জন করেছে তা কি জানো না?—দীপনাথ সামান্য ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে। বলেই হেসে ফেলে। শ্রীনাথের দুর্বল ন্যাতানো একটা হাত মুঠোয় নিয়ে বলে, অন্যের ঘাড়ে কেন দোষ চাপাচ্ছ? আমি তো তোমাকে চিনি।

তোরা সবসময়ে কেন আমারই দোষ দেখিস? আব কোনও দিকে তাকাস না কেন? একটা কালো মেয়েমানুষ এতগুলো লোককে কী করে হিপনোটাইজ করে রাখে বল তো?

তোমাকে তো পারেনি!

আমাকে পারা খুব সোজা নয়। আই হ্যাভ ড্রাংক লাইফ টু দি লিজ।

এটাও কোটেশন। কিন্তু দীপনাথ এবারও হাসল না। বলল, তোমাকে পারেনি। বুলুকেও পারেনি।

বুলুকে গুন্ডা দিয়ে মার খাইয়েছিল কে জানিস?

আমি হলেও তাই করতাম।

নিজের মায়ের পেটের ভাইকে গুন্ডা দিয়ে মার খাওয়াতিস?

না। নিজের হাতেই মারতাম। বউদি মেয়েমানুষ নিজের হাতে মারতে পারেনি বলে অন্যকে দিয়ে মার দিয়েছে।

হতাশ শ্রীনাথ চোখ বুজে বলে, তোরা অন্ধ। তোরা কোনওদিন ট্রুথটাকে ধরতে পারবি না। ও তোদের জাদু করে রেখেছে।

বউদি যদি জাদু চালিয়ে থাকে তবে তুমিও কিছু পালটা জাদু চালাও না! কে বারণ করছে?

ও হচ্ছে লেডি ম্যাকবেথ। অ্যামবিশাস, ক্রুয়েল...

সব বুঝলাম। তবু বউদি তার কর্তব্য করে যাচ্ছে। এ বাড়ির দরজা এখনও আমাদের মুখের ওপর বন্ধ করে দেয়নি। বাবাকে আমরা কোনও ভাই-ই দেখিনি। বউদি দেখছে। তোমার লজ্জা করা উচিত, মেজদা।

শ্রীনাথ চুপ করে থাকে।

দীপনাথ খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে বলে, কাল রাতে বোমা কীভাবে ফাটল তা জানো?

না। তৃষা মাঝরাতে এসে ঘুম থেকে তুলে আমার কাছেই জানতে চেয়েছিল বোমাটা কে বা কারা মেরেছে।

তার মানে বউদি তোমাকে সন্দেহ করে!

কে জানে! হয়তো করে।

তুমি জানো কিছু?

কী জানব? সকালে সজলের কাছে শুনে বুঝলাম, সরিৎ বোমা বানায়। হয়তো রাতে গোপনে বানাচ্ছিল, অ্যাকসিডেন্টালি ফেটে গেছে।

তাই যদি হয় তবে বউদি পুলিসে খবর দেবে কেন? খবর দিলে তো নিজেদেরই ধরা পড়ার সম্ভাবনা। পুলিস বাড়িটা তন্ন তন্ন করে দেখবেই।

শ্রীনাথ যুক্তিটা বোঝে। তবু মিনমিন করে বলে, কাল রাতে কী হয়েছিল তা জানি না। তবে সরিৎ যে বোমা বানায়...

দীপনাথ একটু বিরক্ত হয়ে বলে, সজলের সব কথা বিশ্বাস কোরো না। ও বলে বেড়ায় আমি নাকি কুংফু জানি, পঞ্চাশটা লোককে একা ঘায়েল করতে পারি। আসলে সজল একটু রোমান্টিক, অনেক কিছু কল্পনা করতে ভালবাসে।

সরিৎ এক নম্বরের গুন্ডা, তুই জানিস না। স্টেশনের কাছে দুটো ছেলেকে চেন দিয়ে এমন মেরেছিল!

তুমি সব কিছুকে গুলিয়ে ফেলছ। সরিৎ গুন্ডা হলেই বা তোমার কী? আর বউদিকেই বা ওর সঙ্গে এক করছ কেন?

তোদের কিছুই বোঝানো যাবে না। তোরা বুঝতে চাস না।

তোমারই বা বেশি বোঝার দরকার কী? দিব্যি খাচ্ছ, দাচ্ছ, চাকরি করছ, বউদিকে বেশি না ঘাঁটালেই হল।

তোরা তো তা বলবিই।

বোমাটা কোথায় পড়ল জানো?

না। আমি ভিতরবাড়িতে যাইনি। শুনছি, তৃষার শোওয়ার ঘরের বারান্দায়।

কী সর্বনাশ!

বোমা পড়া নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ের কথা, তৃষা বলেছে বোমা যারা ফেলেছে তাদের জ্যান্ত ধরতে না পারলে মরা অবস্থায় ধরবে। তৃষা যা বলে তা করে।

জানি, মেজদা।

ও কেমনধারা মেয়েমানুষ?

দীপনাথের একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল তুমি যেমনধারা পুরুষ। কিন্তু তা বলল না দীপনাথ। সে লক্ষ করল, অসুস্থ শ্রীনাথের চোখে-মুখে আতঙ্কের গভীর একটা ছাপ পড়েছে। তাই একটু কষ্ট

হল দীপনাথের। সে বলল, তুমি মনে মনে বউদির একটা ভয়ংকর চেহারা বানিয়ে নিয়েছ বলে কষ্ট পাচ্ছ। আসলে হয়তো মানুষটা অত ভয়ংকর নয়।

তুই কিছু জানিস না।

তা হবে। কাল রাতে বউদিকে কেউ বোমা মেরেছিল এ খবর বউদি নিজে কিন্তু আমাকে বলেনি। লোকে খামোখা বউদিকে কেনই বা বোমা মারবে তাও আমি বুঝি না।

খামোখা নয়। ওকে এখানকার কেউই পছন্দ করে না।

পছন্দ যদি না করে, তবে সেটা বউদির দোষ নয়।

তোর মাথাটা তৃষা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে। তোরা তৃষার ভাল দেখ, আমার তাতে কী? শুধু আমার জন্য একটু আলাদা ব্যবস্থা করে দে। আমি ওর কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাই।

বিরক্ত দীপনাথ বলল, এখন একটু ঘুমোও, মেজদা।

শোন যাস না। রাতে আমার কাছে কে থাকবে?

তার মানে?

রাতে কারও আমার কাছে থাকা দরকার। আমি তৃষা আর সরিৎকে বিশ্বাস করি না।

তোমার মাথাটা গেছে, মেজদা। কী আবোল-তাবোল বকছ?

মোটেই আবোল-তাবোল নয়। যখন আমার ভালমন্দ একটা কিছু ঘটে যাবে তখন বুঝবি।

বলতে বলতে শ্রীনাথ কয়েকবার উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু ক্লান্তিতে পারল না। বালিশে আবার মাথা রেখে বলল, আমার কোনও অসুখ ছিল না। আজ সকালের চা-টা একটু তেতো তেতো লেগেছিল। চা খাওয়ার পর থেকেই—

দীপনাথ হাসল। বলল, তোমাকে মেরে বউদি বা সরিতের কী লাভ?

শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

তুমি কি বউদির শত্রু?

ও তো তাই মনে করে।

কী করে বুঝলে?

আমি বুঝব না তো কে বুঝবে? কাল রাতে যখন তৃষা আমার কাছে এসেছিল তখন মাথাটা গোলমেলে ছিল বলে ওর কথার অর্থ ধরতে পারিনি। এখন ভেবে দেখলাম, আসলে বোমা মারার ব্যাপারে ও আমাকেই সন্দেহ করছিল।

দীপনাথ একটা মস্ত শ্বাস ছাড়ল। তারপর ঘড়ি দেখে বলল, তুমি আরও কয়েক ঘণ্টা ঘুমোও তো! ঘুমোলে উত্তেজনা, ভয় সবই কমে যাবে।

কিন্তু আজ রাতে আমার কাছে কে থাকবে?

খ্যাপা নিতাইকে ডেকে এনে মেঝেতে শুইয়ে রেখো, যদি একা নিতান্তই ভয় পাও।

নিতাই? নিতাই তো তৃষার লোক! এ বাড়িতে আমার লোক কেউ নেই, সবাই তৃষার। আমাকে তুই নিয়ে যা। তোর মেসে জায়গা হবে না?

দীপনাথ মেজদার মুখের ওপর কোনও কঠিন কথা বলতে পারল না। লোকটা ভয়ে সন্দেহে এত কাতর যে বেশি কিছু বললে আবার ভেঙে পড়বে।

দীপনাথ তাই মন-ভোলানো গলায় বলল, এ অবস্থায় তো যেতে পারবে না। শরীরটা সুস্থ হোক, আমি এসে নিয়ে যাব।

ঠিক বলছিস?

ঠিকই বলছি।

কিন্তু যদি স্লো পয়জন করে থাকে তবে সুস্থ হব কী করে? আর হয়তো বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারব না।

পারবে। একটু রেস্ট নাও, তা হলেই পারবে।

ওই কাঠের আলমারিতে একটা ব্র্যান্ডির বোতল আছে, এনে দে তো।

এই শরীরে ব্র্যান্ডি খাবে?

না খেলে যে ঘুম আসবে না। ডাক্তার একটা বোধহয় ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল সকালে। তার এফেক্টটা কেটে গেছে। দুশ্চিন্তায় মাথাটাও গরম।

দীপনাথ উঠল। ইচ্ছে ছিল ব্র্যান্ডির বোতলটা বের করে ইচ্ছে করেই হাত থেকে ফেলে দিয়ে ভাঙবে। কিন্তু কাঠের আলমারিটা খুলে বোতলটা খুঁজে পেল না সে। বলল, কই? নেই তো!

ভাল করে খুঁজে দেখ। ওপরের তাকে, ডানদিকে জামাকাপড়ের ভাঁজে ঢোকানো আছে।

দীপনাথ খুঁজল। পেল না। বলল, না নেই।

তাহলে সরিয়ে নিয়েছে। ওরা সব খোঁজ রাখে।

কেউ সরিয়ে নিলে তোমার ভালই করেছে। এ শরীরে খেলে তুমি বাঁচবে না।

এমনিতেও মরব। কথাটা তা নয়। ওরা আমার কিছুই গোপন বা ব্যক্তিগত থাকতে দেবে না। কেন যে আমার পিছনে লেগেছে! তুই মেসে আমার জন্য আজই একটা সিট বুক করবি গিয়ে।

করব। কিন্তু তোমার বাগান?

বাগান! —শ্রীনাথ হতাশায় চোখ বুজে বলে, সেই গিরিশবাবুর মতো বলতে হয়—আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

আবার কোটেশন শুনে দীপনাথ হাসল। বলল, বাগান শুকোবে কেন? তুমিই শুকিয়ে যাচ্ছ, মেজদা। এখন ঘুমোও।

বৃন্দা কোথাও গিয়েছিল। এখন ঘরে এসে ঢুকেই ধলল, এ কী! বাবু জাগলেন কখন?

দীপনাথ একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, তুমি রুগির দেখাশুনো করছ নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথায় গিয়েছিলে? এরকম একা ঘরে ফেলে যাওয়া উচিত হয়নি।

বড় গোরুটা খোঁটা উপড়েছে শুনে ধরতে গিয়েছিলাম। বড় তেজি গাই। অন্য কাউকে মানে না।

আর যেয়ো না।

আচ্ছা। বাবু, একটু দুধ-টুধ কিছু আনি?

শ্রীনাথ আতঙ্কের সঙ্গে বলে, না, না। আমি কিছু খাব না। তুই কাজে যা, আমি ভাল আছি।

মা'ঠানকে একটা খবর দিই গে?

কোনও দরকার নেই। আমি এখন ঘুমোব।

বলে শ্রীনাথ পাশ ফিরে কোলবালিশ আঁকড়ে চোখ বোজে। আত্মরক্ষার এর চেয়ে ভাল পদ্ধতি সে আর খুঁজে পায় না।

দীপনাথ মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বৃন্দাকে ঘরের বাইরে যেতে বলে। বৃন্দা চলে গেলে শ্রীনাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলে, কোনও ভয় নেই। ঘুমোও।

ঘুম আসবে না। দেখ তো টেবিলে ঘুমের কোনও ওষুধ আছে কি না।

দীপনাথ টেবিলে একটা ট্র্যাংকুইলাইজারের ছোট শিশি পেয়ে গেল। একটা বড়ি শ্রীনাথকে গিলিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। শ্রীনাথ খুবই অবসন্ন ছিল। সকালের ঘুমের ওষুধের ক্রিয়াও রয়েছে ভিতরে। ফলে দশ মিনিটের মধ্যে শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়ে।

দীপ বেরিয়ে এসে দরজাটা টেনে দেয়। তার ভ্রু কোঁচকানো, মনটা ভার। মানুষের এরকম ভয়ংকর মানসিক যন্ত্রণার চেহারা সে খুব কমই দেখেছে, যতটা শ্রীনাথের মধ্যে দেখা গেল। শ্রীনাথের আর যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু কুরে কুরে খেয়ে নেবে ওই অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

ভেতরবাড়িতে যাওয়ার রাস্তার ধারে একটা গাছতলায় ঠেস মেরে বসে রইল দীপনাথ। সাড়ে চারটের সময় ফটক খুলে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে সজল ঢুকল।

সজল! —দীপনাথ কোমল স্বরে ডাকে।

বড়কাকা!—সজলের ক্লান্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কখন এলে?

বেশিক্ষণ নয়।

সজল এসে তার হাত ধরে বলে, ভিতরে চলো! মা রোজ তোমার কথা বলে।

তোমার মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে।

বাবার খুব অবস্থা খারাপ, জানো? আজ সকালে বাবার স্ট্রোক হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, অবস্থা এখন-তখন।

তোমার বাবার সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে এলাম।

সজল অবশ্য এ কথায় অপ্রতিভ হয় না। হাসে। বলে, বাবা ভীষণ ভিতু।

তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, সজল। তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম।

কী কথা?

তুমি কি তোমার বাবাকে বলেছ যে, সরিৎ বোমা বানায়?

বোমা! কই, না তো!

বলোনি?—দীপনাথ একটু অবাক হয়।

সজল ঠিক বুঝতে পারছিল না, সত্য কথাটা বলা উচিত হবে কি না। কিন্তু বড়কাকা তার ভীষণ প্রিয়। এই কাকার কাছে তার সব সত্যি কথা বলে দিতে ইচ্ছে করে। সে চোখ নামিয়ে বলে, আমি আসলে বাবাকে একটু ভয় খাওয়ানোর জন্য বানিয়ে বলেছিলাম।

কাজটা ভাল করোনি। তোমার বাবা খুবই ভয় পেয়েছেন। তা ছাড়া কথাটা পাঁচ কান হলে তোমার মা আর ছোটমামাও বিপদে পড়বেন। তুমি কি তা চাও?

আমি আর কাউকে বলিনি।

বোলো না। এখন যাও হাত-মুখ ধুয়ে বাবার কাছে গিয়ে একটু বোসো। বাবাকে বোলো, তুমি বোমা বানানোর কথাটা বানিয়ে বলেছ।

বাবা যদি রাগ করে?

করবে না। বরং খুব খুশি হবে। আমিও ও-ঘরেই থাকব'খন, ভয় নেই।

আচ্ছা।—বলে মাথা নেড়ে চলে গেল সজল।

দীপ উঠে বাগানের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে লাগল খানিক এলোমেলো উদ্দেশ্যহীনভাবে। অভিশাপ বলে কিছু মানে না সে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, বড়দা মল্লিনাথের এই গোটা বাড়ি এবং সম্পত্তির ওপর একটা অভিশাপ ছায়া বিস্তার করে আছে শকুনের মতো। এখানে আসার আগে অবধি শ্রীনাথ বা তৃষা সুখেই ছিল তো! যেই এ বাড়ির মৌরসি পাট্টা পেল তখন থেকে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল ওদের জীবন। দুর্বহ হল বেঁচে থাকা। এখন তার সন্দেহ হচ্ছে, শ্রীনাথ হয়তো খুব বেশিদিন বাঁচবেও না। বড়দা মল্লিনাথ গেছে, এখন শ্রীনাথও যদি যায় তবে সেটা বড় দুঃখের হবে।

॥ আটচল্লিশ ॥

এ বাড়িটা অভিশপ্ত কি না তা অনেক ভেবেও স্থির করতে পারল না দীপনাথ। প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ-টাপ গোছের কিছুকেই সে বিশ্বাস করে না। তার ঈশ্বরবিশ্বাস বলেও তেমন কিছু নেই। সে ভূত-প্রেতও মানে না বহুকাল। তবু বড়দা মল্লিনাথের এই শখের বাড়ির বাগানে বসে সে আজ এক দীর্ঘশ্বাস ও অভিশাপকে টের পায়।

যখন গরিব ছিল তখনই ভাল ছিল মেজদা। যেই বড়দার সম্পত্তি পেল অমনি সত্যিকারের গরিব হয়ে গেল। আজ শ্রীনাথ ও তৃষার সমস্যা বোধ হয় চিকিৎসার অতীত। দুটো মানুষের মধ্যে ফেনিয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত ও বিচিত্র শত্রুতার জটিলতা। তার মধ্যে তৃতীয় কোনও মানুষ ঢুকতেই পারবে না।

আজ মেজদার জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে দীপনাথ। মাথা নিচু করে ঘাস ছিঁড়ছিল সে। এমন সময় সজল খুব কাছ থেকে ডাকল. বড়কাকা!

দীপ মুখ তুলে হাসে, বলো।

সজলের মুখশ্রীতে তার মায়ের আদল। কিন্তু লম্বাটে গড়ন আর চোখমুখে নির্ভীক এক দৃঢ়তার ভাব থাকায় তাকে ঠিক শ্রীনাথের ছেলে বলে মনে হয় না বটে। এটুকু মল্লিনাথের। বউদি কথাটা সেদিন স্বীকার করেনি। স্বীকার করার দরকারও নেই। সজল বড় হলে কথাটা আপনি স্বীকৃতি পেয়ে যাবে।

আগে দীপ, পিছনে সজল ভাবন-ঘরের বারান্দায় উঠে এল। দরজা ভেজানো। ঠেলে ঢুকবার মুখে বৃন্দা পথ আটকাল, কোথায় ঢুকেছ এসে বাবুরা? রুগির ঘর যে! অমন হুটহাট ঢুকলে হবে কেন?

দীপ মৃদু স্বরে বলে, রুগির ভালর জন্যই আসা।

পিছন থেকে সজল হুমকি দিয়ে ওঠে, তোমার সব তাতেই অত সর্দারি কেন বলো তো বৃন্দাদি! মারব একদিন ঝাপড়।

সজলের একখানা হাত নিঃশব্দে চেপে ধরে দীপনাথ এবং সজল চুপ করে যায়।

বৃন্দা বলে, বাবু এখন ঘুমোচ্ছে। একটু আগে ওষুধ দিয়েছি, কিন্তু খেল না।

কেন খেল না?—দীপনাথ জিজ্ঞেস করে।

ঠোঁট উলটে বৃন্দা বলে, ভগবান জানে। ঘুমের ঘোরে ভুল বকছিল না কী, বলল তো ওষুধে বিষ আছে।

সত্যিই ঘুমিয়েছে তো?

মটকা মেরে পড়ে থাকলে ঠিক বুঝতাম। তা নয়। নাক ডাকছে। পা টিপে টিপে এসে দেখে যাও না।

দীপনাথ আর সজল নিঃসাড়ে ঘরে ঢোকে। শ্রীনাথ বাঁ-কাতে শুয়ে বাস্তবিকই ঘুমোচ্ছে। শিশুর মতো অসহায় গভীর ঘুম।

দু'জনে আবার নিঃসাড়ে বেরিয়ে আসে।

সজল বলে, বড়কাকা, তা হলে কী হবে?

তোমার বাবা যখন ঘুম থেকে উঠবেন তখন এসে সত্যি কথাটা এক ফাঁকে জানিয়ে যেয়ো ওঁকে।

আচ্ছা।

বাবাকে ভালবাসো তো সজল?

সজল হাসে। মাথা নিচু করে বলে, বাসি। তবে বাবা একটু কেমন যেন। আর সকলের মতো নয়।

তা হোক। সবাই তো সমান হয় না। বাবাকে একটু ভালবেসো। দুনিয়ায় খুব কম লোকই তোমার বাবাকে ভালবাসে। তুমি কিন্তু বেসো।

আচ্ছা।

আর-একটা কথা।

কী?

তোমার বাবা কাল রাতের ওই বোমার পর থেকে খুব ভয়ে ভয়ে আছে। ওঁর সন্দেহ কেউ ওঁকেও খুন করবে। তুমি এখন থেকে বাবার কাছে থেকো। পারবে?

মাকে রাজি করাও, পারব।

তোমার মাকে আমি বলে যাব।

কিন্তু মা রাজি হবে না।

কেন?

বাবা যে মদ খায়। মাতাল হলে যা-তা বিশ্রী গালাগাল দেয়।

সে অন্য সময়ে। এখন তোমার বাবা অসুস্থ। মদ খাওয়া বা গালাগাল দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

বলছি তো, মা বললে থাকব।

সজলকে ভিতরবাড়ি পর্যন্ত আর টেনে নিল না দীপ। মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে বলল, এবার খেলতে যাও।

সজল এক ছুটে ফটক পেরিয়ে পালাল।

দীপনাথকে খুঁজতে হল না। ভিতরবাড়িতে ঢুকবার মুখেই বউদির সঙ্গে দেখা। ট্রেতে তোয়ালের ঢাকনা দেওয়া খাবার চাকরের হাতে সাজিয়ে নিয়ে তৃষা ভাবন-ঘরে যাচ্ছে।

দীপ বলল, দাদা ঘুমোচ্ছে। অঘোর ঘুম।

তৃষা একটু শুকনো মুখ করে বলল, দুপুরেও প্রায় কিছু খায়নি।

এখন জাগিয়ে খাবার দিতে যেয়ো না। জাগলে বরং দিয়ো।— দীপনাথ সতর্কভাবে বলে। সে জানে বিষপ্রয়োগের ভয়ে শ্রীনাথ খাবার দেখলে ভয় পাবে, চেঁচামেচিও করতে পারে। দীপনাথ মণিদীপার উপস্থিতিতে ঘটনাটা ঘটতে দিতে চায় না।

তৃষা চাকরকে বলে তবু, ট্রে-টা বৃন্দাকে পৌঁছে দিয়ে আয়। বলিস বাবু জাগলে দুধটা যেন গরম করে দেয়।

শোনো বউদি।— দীপনাথ খুব সিরিয়াস মুখে বলে।

কী? বলো।

আজ থেকে দাদার কাছে রাত্রিবেলা সজলকে রেখো।

সজলকে! কেন বলো তো?

দাদা তো ভিতু মানুষ জানোই।

তা খুব জানি। কিন্তু তার জন্য সজল কেন? সরিৎ আছে, মংলা আছে, নিতাই আছে।

দাদার কাছে সজলের থাকাই ভাল।

সজল! না না। তা হয় না।

কেন হয় না?

সজল ছেলেমানুষ, সে কী করবে?

কিছু করতে হবে না, শুধু থাকবে।

রুগি পাহারা দেওয়া কি ছেলেমানুষের কাজ? বরং আমি নিজেই থাকবখন। আমার তো ভয়ভীতি বলতে কিছু নেই।

তবু সজলকে রাখবে না?

তুমি আচ্ছা এক ছেলেমানুষ। বলছি না যে, রুগি দেখাশোনা করতে হলে সজলকে দিয়ে হবে না।

তা অবশ্য ঠিক। তবু সজল যদি ঘরে থাকে তবে দোষ কী? দাদা যখন ভাল হয়ে উঠবে তখন প্রতি রাতেই যদি সজল ওঁর কাছে থাকে তবে বোধহয় ভালই হবে। মেজদাকে একটু বুঝতে দেওয়া দরকার যে ওর আপনজন কেউ আছে।

এ কথায় স্পষ্টতই তৃষার চোখেমুখে একটা দুর্ভাবনা ফুটে ওঠে। সে বলে, পাগল হয়েছ? রোজ রাতে গিয়ে ও-ঘরে থাকলে একদিন সজলের গলা টিপে ধরবে না!

অবাক দীপনাথ বলে, কে ধরবে? মেজদা?

তৃষা একটু লজ্জা পায়। বলে, সজল আমার একটামাত্র ছেলে, জানোই তো। ওকে কোনও রিস্কের মধ্যে ফেলতে চাই না।

রিস্ক কিসের?

আছে। সব তুমি বুঝবে না।

একটু বিরক্তির গলায় দীপনাথ বলে, রিস্কই যদি থাকবে তবে সজল সন্ধের পর মেজদার কাছে পড়া বুঝতে যায় কী করে?

যায়, কিন্তু কখনও একা যায় না। সজল নিজেও জানে না, ওর পিছনে লোক থাকে। ঘরের আশেপাশেও আমি পাহারা রাখি। চোখের আড়াল হতে দিই না।

এ কথাটার মধ্যে যেন মেজদাকে জড়িয়ে তাদের পুরো বংশের ওপরেই একটা কলঙ্ক আরোপ করা হল। অপমানে হঠাৎ দীপনাথ তেতে ওঠে, লাল হয়। কিন্তু মুখে জবাবও আসে না। শ্রীনাথ তাদের পুরো পরিবারকে এত দূর অধঃপাতে টেনে নামিয়েছে।

তৃষা মুখ তুলে ভিখিরির মতো গলায় বলে, দোষ নিয়ো না। ওকে বিশ্বাস করার উপায় আমার নেই। আমি অনেক ঠকে, অনেক *ঠেকে* অনেক শিখেছি।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, ঠিক আছে।

তোমার মেজদা কি তোমাকে কোনও ভয়ের কথা বলেছে?

বলেছে।

কী বলেছে?

দীপনাথ আনমনে বলে, ওই ভয়টয়ের কথা।

তৃষা আর প্রসঙ্গটা বাড়ায় না। বলে, এসো। উনি বসে আছেন।

থাকুন না। উনি তো তোমাদের কাছেই এসেছেন।

তৃষা বলল, তা বটে। তবু তোমার একেবারে বেপাত্তা থাকা ভাল নয়। কিছু ভাববে।

ওরা অত ভাবে না।

তুমি তবে কী করবে এখন?

একা একা একটু ঘুরে বেড়াই।

আজ এখানে এসে তোমার ভাল লাগছে না!

না বউদি। মনটা ভাল নেই।

তোমার বউদির কপালটাই খারাপ।

কাল রাতে কারা এসে নাকি তোমাকে বোমা মেরেছিল! কই, বলোনি তো!

তৃষা মুখ টিপে হেসে বলল, মরলে তো বাঁচতাম।

গেঁয়ো মেয়েদের মতো কথা বোলো না। কী হয়েছিল?

কী করে বলব? কুকুরটা চেঁচাচ্ছিল শুনে উঠে দরজা খুলতেই ভীষণ কাণ্ড।

তোমার কোথাও লাগে-টাগেনি তো?

না। আমার কইমাছের প্রাণ। লাগলেও মরতাম না।

তুমি কাউকে সন্দেহ করো?

তৃষা চিন্তিত মুখ করে বলে, কাকে সন্দেহ করব? আমার শত্রুর অভাব তো নেই, কিন্তু এতটা কেউ করবে বলে ভাবিনি কখনও।

মেজদার কোনও হাত আছে বলে সন্দেহ হয়?

তৃষা বড় বড় চোখে দীপনাথের মুখের দিকে অকপটে চেয়ে বলে, হঠাৎ এ কথা কেন?

মেজদাই বলছিল, তুমি নাকি ওকে সন্দেহ করছ!

তৃষা মাথা নেড়ে ধীরে কেটে কেটে বলে, না। সে প্রথম একটু সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, মেজবাবুও অতটা করবে না। তার সেই সাহস নেই। তবে ওর শুভাকাঙ্ক্ষী তো অনেক। তারা কেউ এ কাণ্ড করেছে কি না কে বলবে?

মেজদা লোক ভাল নয় বউদি, সবাই জানে। তবু বলি, আমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে মেজদা আর সোমনাথের কোনও কিলার-ইনস্টিংক্ট নেই। ওরা রক্ত দেখতে ভয় পায়।

বাকি দু'জন?— বলে তৃষা চিকচিকে চোখে তাকায়। মুখ টিপে হাসে।

বড়দার ছিল। ইনফ্যাক্ট বড়দা এক-আধটা খুনখারাপি করেছে বলে শুনলেও আমি অবাক হব না।

আর তুমি?

আমার কথা আমি নিজে বলি কী করে? তবে আমাকে যদি কেউ কোণঠাসা করে ফেলে, যদি মরিয়া করে তোলে তা হলে কাউকে খুন করা আমার পক্ষে হয়তো তেমন অসম্ভব নয়।

মাগো! বোলো না, শুনলে ভয় করে।

দীপনাথ খুব কষ্ট করে মুখে হাসি টেনে বলল, ঢং কোরো না বউদি, আমি তোমাকে জানি। ভয়ডর তোমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। বোমা মারার ব্যাপারে তোমার মেজদাকে সত্যিই সন্দেহ হয় না তো?

বললাম তো, না।

তা হলে সজলকে মেজদার কাছে রেখে স্বস্তি পাও না কেন?

তৃষা একটু থমকে গিয়ে বলে, তুমি আজকাল বড্ড জেরা করো, দীপু। সব কথা তোমাকেও বলা যায় না। তবু জেনে রাখো, আক্রোশ মানুষকে অনেক দূরে টেনে নামাতে পারে।

দীপনাথ চিন্তিত মুখে বলে, তাই দেখছি।

আমার মতো বয়স হোক, আরও অনেক কিছু দেখবে।

দীপনাথ ভ্রুকুটি করে বলে, তোমার বয়স কত?

তোমার চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড়।

ইয়ারকি কোরো না। বিয়ের সময় তুমি নিতান্ত ছুকরি ছিলে। খুব বেশি হলে তুমি আমার সমান বয়সি বা এক-আধ বছরের ছোটই হবে।

খুব টেক্কা মারার শখ, না?

তোমারই বা অত বুড়ো সাজার বাই কেন? এই সেদিনও রঙিন শাড়ি পরা নিয়ে ঝামেলা করছিলে।

বয়স হয়েছে গো। তুমি যতই আমাকে খুকি দেখতে চাও না কেন, বয়স বসে নেই। এখন ঘরে চলো তো!

তোমার ঘর খুব সুন্দর বউদি, কিন্তু আমার বাইরেটাই বেশি ভাল লাগছে।

তুমি কি মণিদীপাকে লজ্জা পাও, দীপু?

যাঃ, কী যে বলো! লজ্জার ব্যাপার নয়, তবে অনারেবল ডিসট্যান্স বজায় রাখি মাত্র।

আমার রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে একটু গিয়ে ওঁর কাছে বোসো। আমি গিয়ে তোমাদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা দেখি।

খাওয়ার দরকার নেই। যত দূর জানি মিসেস বোস ডায়েটিং করছেন, আর আমার আজকাল খিদে পায় না।

তবু। বহুদূর থেকে এসেছ। এসো, গুরুজনদের কথা শুনতে হয়।

কিন্তু ঘরে মণিদীপা ছিল না। আশেপাশে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

নিজের মস্ত ভ্যানিটি ব্যাগে লুকিয়ে দুটো জিনিস এনেছিল মণিদীপা। একটা ছোট ক্যামেরা আর একটা টেপ-রেকর্ডার।

তৃষা গৃহকর্মে গেলে সে ফাঁকা ঘরে একটুক্ষণ বসে ছিল। তারপর পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

আগেরবার এসে একটা ছোটখাটো আম্রকুঞ্জে বিস্তর মৌমাছির চাক দেখে গিয়েছিল। গাছের জড়াজড়ির মধ্যে নীচে ঘন ছায়া। সেই জায়গায় সারাক্ষণ সেতারের ঝালার মতো মৌমাছির গুঞ্জন। তা ছাড়া চারদিক থেকে আচমকা আচমকা অদ্ভুত পাখির ডাক চলে আসে। গাছের পাতার ভিতর দিয়ে দমকা বাতাস বয়ে যাওয়ার রহস্যময় শব্দ ওঠে।

জায়গাটা খুঁজে বের করতে কষ্ট হল না তার। বাড়ির পিছন দিকে একটু চোখের আড়াল জায়গা। কেউ তেমন নজর দেয়নি বলে এদিকটায় ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছে। এখনও মাঝে মাঝে শরতের খেয়ালখুশির বৃষ্টি আসে বলে মাটি স্যাঁতসেঁতে ভেজা।

কুঞ্জবনের মধ্যে বড় বড় ঘাস, ঘন ছায়া। জমজমাট শব্দের আসর বসেছে। নাক-মুখ ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে মৌমাছি। মণিদীপার গায়ে একটু কাঁটা দেয়। টেপ-রেকর্ডারটা বের করে ঘাসের ওপর রাখে সে। বোতাম টিপে যন্ত্রটা চালু করে সে সরে আসে বাইরে।

পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের ক্যামেরায় এলোপাথাড়ি ছবি তুলতে থাকে। চারদিকে শুধু গাছপালা। এই জঙ্গলের ছবি তুলে তেমন লাভ নেই ভেবে মণিদীপা একটা জুতসই পাখি খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির বিশাল সীমানার মধ্যে অনেকটা চলে গিয়েছিল। আচমকা কে ডাকল, সেলাম মেমসাহেব!

মণিদীপা তাকিয়ে দেখে একটা অত্যন্ত হতদরিদ্র কুটিরের দরজায় সাধুগোছের একটা লোক দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছে।

গরিব দেখলেই মণিদীপার আবেগ জেগে ওঠে। সে বলে, তুমি কি এই বাড়ির কাজের লোক?

ঠিক কাজের লোক নই মেমসাহেব, আমি হচ্ছি যোগী নিত্যানন্দ। অনেকে নিতাই অবধূতও বলে। মারণ উচাটন বশীকরণ যা দরকার বলবেন, কাজ হয়ে যাবে।

মণিদীপা সাধু-সন্তদের পাত্তা দেয় না। শুধু এ লোকটা গরিব বলেই তার যা কিছু কৌতূহল। সে দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলে, এই ঘরে তুমি থাকো?

আজ্ঞে।—নিতাই এক পা পিছিয়ে যায়।

দেখি তো তোমার ঘরটা।

এই চোস্ত মেয়েটা তার ঘরে ঢুকবে ভেবে নিতাই একটু বিপদে পড়ল। এ বাড়িতে যারা আসে তাদের তো এ ঘরে ঢোকার কথা নয়। বউদি শুনলে আবার না তার বাপান্ত করে ছাড়ে। তাই সে বলল, আজ্ঞে ভিতরে ভয়ের জিনিস আছে। করোটি, কঙ্কাল আরও কত কী! মেয়েদের ঢোকা বারণ।

তুমি ওই সব বুজরুকি করে বেড়াও?

এসব কথা নিতাই অনেক শুনেছে। মাথা চুলকে বলল, বুজরুকি হবে কেন মেমসাহেব, খাঁটি জিনিস লোকে সহজে চিনতে চায় না। একটা কথা বলব, রাগ করবেন না?

না, রাগের কী? বলো।

আমার একটা ফোটো খিঁচে দেবেন?

মণিদীপা হাসে, দেব না কেন? এসো, আর একটু আলোর দিকে সরে এসো।

দাঁড়ান তা হলে, জিনিসপত্র সব নিয়ে আসি।

বলে নিতাই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। কয়েক মিনিট বাদে যখন বেরিয়ে এল তখন তাকে আর চেনা যায় না। সর্বাঙ্গে ধুনির ছাই মাখা, গলায় হাড়ের আর রুদ্রাক্ষের দু'গাছি মালা, এক হাতে নরকরোটি পানপাত্র, অন্য হাতে সিঁদুর মাখা ত্রিশুল।

মণিদীপা হেসে ফেলে বলে, তোমাকে একদম ক্লাউনের মতো দেখাচ্ছে।

খুব জুত করে তুলবেন। সবটা যেন ওঠে।

বলে খুব গম্ভীরভাবে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় নিতাই।

মণিদীপা তার গোটা তিনেক ছবি তুলে নিয়ে বলে, তুমি তো সাধু মানুষ, ফোটো দিয়ে কী করবে?

যজমানদের দেব। তারা পুজো করবে।

বলো কী?

নিতাই খুব লজ্জার সঙ্গে হেসে বলে, আজ্ঞে তারা খুব মানে আমাকে।

ধর্মটর্ম সব নিষ্কর্মাদের ব্যাপার। তুমি আর কোনও কাজটাজ করো না?

এই করেই বলে সময় পাই না। আর কাজ করব কখন?

মণিদীপা বলল, চলো তোমার ঘরটা দেখাবে আমাকে।

এবার নিতাই খাতির করে বলল, আসুন আজ্ঞে। সাধু-সন্নিসির ঘর আপনার হয়তো অসুবিধে হবে।

না, না, আমার কোনও অসুবিধে নেই।

সারা বাড়ি আর বাগান তোলপাড় করে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে যখন দীপনাথ নিতাইয়ের ঘরে উঁকি দিল তখন চোখ কপালে উঠল তার। নিতাইয়ের পঞ্চমুণ্ডীর আসনের ওপর মণিদীপা বাবু হয়ে আঁট করে বসে আছে। নিতাই তার সামনে মাটিতে ছক কেটে বাণ মারার কায়দা দেখাচ্ছে।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

ঝোপড়ার দরজায় দীপনাথ উঁকি দিতেই মণিদীপা মুখ তুলে চাইল। একটু হেসে ইঙ্গিতে নিতাইকে দেখিয়ে বলল, হি ইজ এ কমপ্লিট ফ্রড।

সো অ্যাম আই অ্যান্ড সো ইউ অল আর। এখন চলুন তো, বউদি আপনাকে ভীষণ খুঁজছেন।

দীপনাথ কথা বলতেই ঝোপড়ার ভেতরকার চিমসে কটু বদখত একটা গন্ধ পেয়ে নাক কুঁচকে বলে, এই বিকট গন্ধের মধ্যে বসে আছেন কী করে?

মণিদীপা উঠে আসছিল। বাইরে এসে মিষ্টি হেসে বলল, আমি এক সময়ে কলকাতায় বস্তিতে বস্তিতে সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছি। নোংরা, বদগন্ধ, আব্রুর অভাব, পভার্টি যদি সহ্য করতে পারেন তবে দেখবেন লোকগুলো খারাপ নয়। দে আর অল লাইক ইউ অ্যান্ড মি।

অভিজ্ঞতাবলে দীপনাথ জানে, কথাটা সত্যি নয়। তবু সে তর্কে না গিয়ে বলল, আপনি অনেক কিছু পারেন দেখছি। আমি খ্যাপা নিতাইয়ের ঝোপড়ায় এর আগেও বার কয়েক হানা দিয়েছি। ভিতরে ঢুকতেই গা ঘিনঘিন করেছে।

মণিদীপা দীপনাথের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, বেচারার একটা বউ ছিল, আপনি জানেন?

কে না জানে? বউ পালানোতেই তো নিতাই পাগল হল।

হাসছেন? লোকটা যে বউকে অতটা ভালবাসত তার জন্য কষ্ট হয় না আপনার?

হয়। আই অ্যাম অলওয়েজ উইথ দা হাজব্যান্ডস।

জানি। ব্যাখ্যা করতে হবে না।

এতক্ষণ পালিয়ে পালিয়ে আর কী কী করলেন?

ওই যা!— বলে থমকে দাঁড়ায় মণিদীপা।— আমার টেপ-রেকর্ডারটা পড়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে।

কী সর্বনাশ! টেপ-রেকর্ডারও সঙ্গে এনেছেন নাকি?

আনব না তো কী? কলকাতায় বসে মৌমাছির শব্দ শুনব বলে... দাঁড়ান দেখে আসি।

বলে মণিদীপা কুঞ্জবনের দিকে প্রায় দৌড়তে থাকে। পিছনে দীপনাথ।

খাস জঙ্গলের ওপর ক্যাসেট শেষ হওয়া টেপ-রেকর্ডারটা পড়েই ছিল। স্পিকারের ওপর পাখি নোংরা ফেলে গেছে। মণিদীপা রি-উইনড করে একটু শুনল শব্দটা। মুখ গোমড়া করে বলল, একদম ভাল সাউন্ড আসেনি।

দীপনাথ হেসে বলে, টেপ-রেকর্ডারটা যে চুরি হয়ে যায়নি সেটাই ভাগ্য বলে জানবেন।

আপনার সঙ্গে আমার তফাত কোথায় জানেন?

কোথায়?

আপনি সবসময়ে জিনিসটার কথা ভাবেন, তার পারপাসটার কথা ভাবেন না। আমার কাছে অনেক বেশি জরুরি হল মৌমাছির শব্দ, পাখির ডাক। আপনার কাছে তার চেয়ে ঢের বেশি দামি জিনিস এই যন্ত্রটা। আপনি এত অ্যান্টি-রোমান্টিক কেন বলুন তো!

তার মানে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী।

আমি যে বাস্তববাদীদেরই সবসময়ে পছন্দ করি তা কিন্তু নয়।

তা জানি। সেই জন্যই বোধহয় আপনি আমাকে কোনওদিনই পছন্দ করেননি।

মণিদীপা মৃদু একটু হাসল। তারপর বলল, আপনি বাস্তববাদী এ কথা কিন্তু আমি স্বীকার করিনি। আপনি রোমান্টিকও নন তা বলে।

তা হলে আমি কী?

আপনি ভীষণ হাঁদারাম।

দীপনাথ হাসল বটে, কিন্তু এই খুকি চেহারার এঁচোড়ে পাকা মেয়েটাকে একটা গাঁট্টা মারবার জন্য তার হাত একটু নিশপিশও করছিল। ঘাসজঙ্গলে মিষ্টি ছায়ায় দু'জন মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে বসে। মুখ নিচু করে মণিদীপা ক্যাসেটটা যন্ত্র থেকে খুলে আনল। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আর-একটা নতুন দামি ক্যাসেট বের করে ভরল টেপ-রেকর্ডারে।

আবার টেপ করবেন নাকি?

আগেরটা যে ভাল হল না। এই ক্যাসেটটা দিয়ে দেখি। যন্ত্রটা গাছের ডালে বসালে বোধহয় ভাল হয়, তাই না? ওই নিচু মৌচাকটার কাছাকাছি টেপ-রেকর্ডারটাকে একটু সেট করে দেবেন?

আমাকে গাছে উঠতে বলছেন?

গাছে ওঠেননি কোনওদিন?

বিস্তর। তবে সে ছেলেবেলায়। এই বুড়োবয়সে পড়ে গিয়ে মাজা ভাঙলে আপনি দায়ী।

আপনি হাঁদারাম হলেও পড়ে যাওয়ার লোক নন। কেরিয়ারের গাছটিতে তো দিব্যি তরতরিয়ে উঠে যাচ্ছেন। আর এ তো সামান্য গাছ।

মুখ শুকনো করে দীপনাথ বলে, দুনিয়ার যত খারাপ কি কেবল আমি?

আপনি ভীষণ খারাপ। এখন জুতো খুলুন তো। নিচু গাছ, উঠতে কোনও অসুবিধে হবে না।

উঠছি বাবা। কেরিয়ারিস্ট হওয়াও যে কী কষ্টের তা যদি বুঝতেন!— জুতো খুলতে খুলতে দীপনাথ বলে, বসকে তেল দিতে হয়, বসের বউকে তেল দিতে হয়। আর তেল দেওয়ার ছিরিটাও

দেখুক লোকে। বসের ছিটিয়াল বউ মৌমাছির গান টেপ করবে বলে এই বারবেলায় মধ্যবয়সে গাছেও উঠতে হচ্ছে।

কেরিয়ারিস্ট দু'রকমের আছে। হাঁদারাম আর বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানদের খাটতে হয় না, কিন্তু হাঁদারামদের খাটা ছাড়া তো উপায় নেই।

দীপনাথ জুতো খুলে গাছে উঠল। খুবই সহজ গাছ। নিচুতেই অজস্র ডালপালা। দুটো ডাল ডিঙিয়ে একটু উপরে উঠতেই মণিদীপা বলল, বাঃ, বেশ পারেন তো। কিন্তু আরও ওপরে উঠে গেলে আমি টেপ-রেকর্ডারটা দেব কী করে? নাগাল পাব না যে! এইবেলা এটা ধরুন।— বলে দু'হাতে টেপ-রেকর্ডারটা উঁচু করে তুলে ধরল মণিদীপা।

ঝুঁকে যখন টেপ-রেকর্ডারটা নিতে হাত বাড়াল দীপনাথ তখন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত একটা মৌমাছি ধেয়ে এল কোত্থেকে। বাঁ চোখের কোলে তার বিষাক্ত হুল কুট করে বিঁধল, টের পায় দীপনাথ। কিন্তু এ সময়ে নড়লে বা অসাবধান হলে দামি যন্ত্রটা পড়ে যেতে পারে। তাই সে একটুও শব্দ করল না। নীরবে টেপ-রেকর্ডার তুলে নিল।

মৌচাকটা খুব ওপরে নয়। আর দুটো ডাল উঠতেই সে প্রায় হাতের নাগালে পেয়ে গেল মৌমাছিতে বিড় বিড় করা চাকটাকে। বাঁ চোখের কোল মুহূর্তে ফুলে উঠছে। তীব্র জ্বালা। কিন্তু দীপনাথ শব্দ করল না। একটা মৌমাছির কামড় বই তো নয়! মৌচাকের কাছাকাছি যেতে হলে মুখ মাথা ঢেকে নিতে হয়, সে জানে। কিন্তু ঢাকনা দেওয়ার মতো কিছু নেই হাতের কাছে।

একটা ঘন পাতার চাপ ভেদ করে মাথা তুলতে-না-তুলতেই তার চুলের মধ্যে জেট প্লেনের মতো দুটো মৌমাছি এসে ঢুকল আর একটা হুল দিল কলারের নীচে, ঘাড়ে। প্রতিটি হুলই ইলেকট্রিক শকের মতো। দীপনাথ স্থির হয়ে রইল। নড়লে আবার কামড়াবে। খুব ধীরে ধীরে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে টেপ-রেকর্ডারটা ঝোলানোর অবলম্বন খুঁজে দেখল। পেয়েও গেল হাতের কাছে। একটা ভারবহনক্ষম ডাল বেরিয়ে আছে কাণ্ড থেকে। সে হাতলটা গলিয়ে দিল গাছের ডালে। তারপর সাবধানে রেকর্ডিং চালু করে দিল। টেপ ঘুরছে কি না তাও দেখে নিল ভাল করে। এখানে মৌমাছির শব্দ খুব ঝাঁঝালো। আশা করা যায় রেকর্ডিং ভালই হবে।

সাবধানে আবার নেমে আসে দীপনাথ। ভাগ্যে তার প্যান্টের পকেটে একটা রোদচশমা ছিল। কালো চশমা পরতে তার ভাল লাগে না। সবকিছু মেঘলা দেখায় তাতে। তবু রোদের কথা ভেবে সঙ্গে এনেছিল। এতক্ষণ পরেনি। গাছ থেকে নেমেই সে মণিদীপার দিকে পিছন ফিরে চশমাটা পরে নিল।

মণিদীপা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ধন্যবাদ না, কোনও কথাও না।

দীপনাথ হাতটা ঝেড়ে নিয়ে হাসি মুখে বলল, চলুন। বউদি বসে আছে।

মণিদীপার ভ্রু কোঁচকানো, নতমুখ। শুধু বলল, হুঁ।

দীপনাথের বাঁ চোখ ক্রমে আরও ফুলে উঠেছে, চশমার ফ্রেমের তলা দিয়েও সেটা দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু মণিদীপা তাকাচ্ছে না তার দিকে। মৃদু পায়ে হাঁটছে আগে আগে, ভিতরবাড়ির দিকে। দীপনাথের ঘাড়ে মাথায় আরও গোটা তিনেক জায়গা ফুলে উঠেছে। পাগল-পাগল জ্বালা। তবু সে পিছন থেকে হাসিমুখে বলল, ম্যাডাম এই কুঞ্জবনটা খুঁজে বের করলেন কীভাবে?

মণিদীপা জবাব দিল না।

দীপনাথ অবাক হল না। মণিদীপা একটু মুডি। কখন ভাল থাকে বা কখন খারাপ থাকে তার তো কোনও ঠিক নেই। তাই সে আর কথা বলে উত্ত্যক্ত করল না। জ্বালাভরা চুলকোনি সামাল দিতে একবার চশমাটা তুলে হুলের জায়গাটা কচলায় সে। নরম জায়গাটা তো তেড়েফুঁড়ে আরও ফুলে উঠতে থাকে। চশমাটা আর রাখাই যাচ্ছে না। তবু সেই জ্বালাধরা জায়গার ওপর চশমাটা জোর করে বসিয়ে রাখল সে। মৌমাছির হুল, তার চেয়ে বেশি কিছু তো নয়! মানুষ এর চেয়ে ঢের বেশি

যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে। প্রীতম করেনি? মুমূর্ষু পঙ্গু ওই প্রীতম তাকে জীবনে অনেক বেশি প্রেরণা দেয়। চাঙ্গা করে তোলে।

ঘরে পৌঁছতে পৌঁছতেই শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা প্রায় ভুলেই গেল দীপনাথ।

বউদি, এই যে ধরে এনেছি। উনি মৌমাছির টেপ-রেকর্ডিং করছিলেন, খ্যাপা নিতাইয়ের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন।

তৃষা তার ঘরের টেবিলে খাবার সাজাচ্ছিল। লুচি, ডিমের ডালনা, মিষ্টি আরও কী কী যেন। ফিরে না তাকিয়েই বলল, খুব ভাল। এ জায়গা যাদের কাছে ভাল লাগে আমি তাদের খুব পছন্দ করি।

মণিদীপা তৃষার কাছ বরাবর এগিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, মৌমাছি কামড়ালে কী লাগাতে হয় জানেন?

তৃষা চট করে মুখ তুলে বলে, তোমাকে কামড়েছে নাকি?

না।

মণিদীপা ইঙ্গিতে দীপনাথকে দেখিয়ে দিয়ে বলে, ওঁকে। দেখুন চোখ কেমন ফুলে আছে।

তৃষা দীপনাথের দিকে চেয়ে দেখল। তার মুখে কোনও উদ্বেগ ফুটল না। শুধু বলল, মধু।

বলে নিজেই গিয়ে একটা বেঁটে জালের মিটসেফ খুলে ঢাকনা দেওয়া পাথরের বাটি বের করে আনল। তাতে টলটল করছে টাটকা মধু।

হুলের জায়গাগুলোতে আঙুল দিয়ে মধু ঘষে দিতে দিতে প্রায় কানে কানে তৃষা জিজ্ঞেস করে, কী করে কামড়াল?

গোপনে জিজ্ঞেস করার মতো ব্যাপার নয়। তব দীপনাথও মৃদু স্বরে বলল, গাছে উঠতে হল যে।

কেন?

টেপ-রেকর্ডার ঝোলাতে।

তৃষাকে বেশি বলতে হয় না। প্রখর বুদ্ধিবলে সে সব বুঝে নেয়। বলল, বসের বউ, তার ওপর আবার প্রেমেও পড়েছে, এটুকু জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু নয়।

তোমাকে একদিন এমন গাঁট্টা দেব না!

মণিদীপা বিছানার ধারে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। কিছু দেখছে না, শুধু চোখটা সরিয়ে রাখছে মাত্র।

দীপনাথ বলল, টেপ-রেকর্ডারটা আবার নামাতে হবে কিছুক্ষণ বাদে। কিন্তু সেটা আর আমার কম্মো নয়।

তৃষা বলল, কম্মোটায় যাওয়ার দরকার কী ছিল? বাড়িভরতি কাজের লোক রয়েছে, যে কেউ ওটুকু করে আসতে পারত। তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি লোক পাঠিয়ে নামিয়ে আনবখন।

মধু লাগানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বালাযন্ত্রণা অনেক কমে গেল। শুধু ফোলাটা রইল। কিছুক্ষণ থাকবে। সে জিজ্ঞেস করে, মেজদা খেয়েছে বউদি?

না, অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোতে দাও। যত ঘুমোবে তত টেনশন কেটে যাবে।

তৃষা হাসল, বোমা মারল আমাকে আর টেনশন হল তোমার মেজদার। এসব পুরুষকে নিয়ে চলা যে কী মুশকিল!

কে পুরুষ? পুরুষ তো তুমি!

তৃষা মৃদু হেসে চাপা গলায় বলে, এখানকার লোকেরাও সেই কথা বলে। আহা, আমার কী গৌরবের ব্যাপার!

তুমিই আমাদের গৌরব।

যাঃ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো। মেয়েরা মণিদীপার সঙ্গে গল্প করবে বলে বসে আছে। কেউ খেলতে পর্যন্ত যায়নি।

খাওয়ার সময়েও দীপনাথ লক্ষ করল মণিদীপা তার দিকে তাকাচ্ছে না, কথা বলছে না। দীপনাথ ঘাঁটাল না। নিঃশব্দে খেয়ে নিল দু'জনে। বোস সাহেব দিল্লি থেকে আমেদাবাদ গেছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। মণিদীপা রোজ অফিসে ফোন করে দীপনাথকে জ্বালাচ্ছিল, কবে রতনপুর যাচ্ছেন বলুন! আমার যে কলকাতায় পাগল-পাগল লাগছে। দীপনাথ ঠিক করেছিল, এবার বোস সাহেবের অনুমতি ছাড়া মণিদীপাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। বোস সাহেব অবশ্য প্রায়ই অফিসে ট্রাংকল করে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু কোনওবারেই দীপনাথ কথাটা তুলতে পারেনি সংকোচের বশে। কিন্তু মণিদীপার তাড়ায় পরশুদিন সে কাজের কথা হয়ে যাওয়ার পর বোস সাহেবকে খুব বিনীতভাবে বলল, মিসেস বোস একটু রতনপুরে যেতে চাইছেন।

কোথায়?

রতনপুর। কাছে। সেখানে আমার মেজদার বাড়ি।

ওঃ, অফকোর্স। যাক না, কে আটকাচ্ছে?

আপনার একটা পারমিশান—

বোস সাহেব খুব হাসল। বলল, আজ পর্যন্ত ক'টা ব্যাপারে দীপা আমার পারমিশান নিয়েছে তা তো আমি জানি।

উনি না নিলেও আমাকে তো নিতেই হয়। আপনার পারমিশান ছাড়া আমি ওঁকে কোথাও নিয়ে যেতে পারি না।

বোস সাহেব বলে, ইটস অলরাইট, টেক হার এনিহোয়ার শি লাইকস।

ধীর স্বরে তখন দীপনাথ বলল, ওভাবে বললে আমি সেটাকে পারমিশান বলে ধরতে পারি না মিস্টার বোস।

বোস সাহেব মেজাজ খারাপ করতে পারত। কিন্তু কোম্পানির বিজনেস খুব ভাল হওয়ায় বোসের মেজাজ শরিফ ছিল। খুব উদার গলায় বলল, এমনিতেও দীপা একাই বহু জায়গায় যাচ্ছে। এ তো আপনার মতো একজন চমৎকার গাইডের সঙ্গে যাবে। যাক না।

আমরা সকালে বা দুপুরে গিয়ে সন্ধেবেলাই ফিরে আসব।

ওঃ, আমি ভেবেছিলাম বুঝি উইক-এন্ড কাটাতে। তা হলে তো পারমিশনের দরকারই ছিল না চ্যাটার্জি। আপনি এত বেশি সংস্কার মেনে চলেন কেন বলুন তো! আচ্ছা ভদ্দরলোক মশাই আপনি! শুনলে দীপাও হাসবে।

আসার সময় হাওড়া স্টেশনে মণিদীপা বলেছিল, আমার যদি ভাল লাগে তা হলে আমি রতনপুরে দু'দিন থেকে যেতে পারি কিন্তু।

স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আপনার ফ্ল্যাট পাহারা দেবে কে?

পাহারা দেওয়ার কিছু নেই। বেয়ারা বাবুর্চি আছে। আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে ভালবাসি। আপনার দুশ্চিন্তা থাকলে আপনি গিয়ে পাহারা দিতে পারেন।

এখানে মণিদীপার কেমন লাগছে কিংবা সে থাকবে কি না তা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হলেও মুখের ভাব দেখে সাহস পেল না দীপনাথ। খেয়ে উঠে সে দীননাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মঞ্জু আর স্বপ্না এসে ধরে নিয়ে গেল মণিদীপাকে।

দেখা হতেই দীননাথ বলেন, তোমরা কেউ বুলুর খবর নাও না। সে কেমন আছে, বউমার কী হল কেউ আমাকে বলে না।

সোমনাথের খবর দীপনাথ নেয়নি বহুদিন ঠিকই। তবে সোমনাথও তার সঙ্গে দেখা করে না। সে একটু লজ্জা পেয়ে বলে, খুব কাজ পড়েছে।

ভাইয়ের খবর নেওয়াটাও কাজ।

আপনি একটা চিঠি দিলেও তো পারেন।

চিঠি স্বপ্নাকে দিয়ে বার দুই লেখালাম। আজকাল ডাকের পিয়নরা ঠিকমতো চিঠি দেয় না। বোধহয় পায়নি, তাই জবাবও দেয়নি।

আচ্ছা, আমি এবার গিয়ে খোঁজ নেব।

নিয়ো। বোলো, এখানে আমার ভাল লাগছে না।

কেন বাবা? এ জায়গা তো খুব ভাল।

ভাল আর কী? শ্রীনাথ খবরও নেয় না। তার কী সব খারাপ অভ্যাস হয়েছে শুনি। আমাদের বংশে এসব তো ছিল না। তার ওপর কাল বাতে নাকি ডাকাত পড়েছিল— এ ভারী গণ্ডগোলের জায়গা।

শীত পড়লে কলকাতায় যাবেন। এখন কিছুদিন থাকুন।

তুমি বিয়ে করলে আমার একটা আস্তানা হত। তিন ছেলের কাছে ঘুরেফিরে থাকতে পারতাম। বিলুও খোঁজ করে না। প্রীতম আছে কেমন?

ভাল। বিলু তো চাকরি করে।

শুনেছি। প্রীতম ভাল হয়ে গিয়ে থাকলে একবার যেন আসে। তার মুখটা তো ভুলতে বসেছি।

আসবে। এখানে আপনার আর কোনও অসুবিধে আছে?

এ আমার জুতের জায়গা নয়। কেমন সবই অচেনা অপরিচিত ঠেকছে। নিজের জায়গা বলে মনে হয় না।

দীননাথের সঙ্গে আর বেশিক্ষণ কথা বলল না দীপনাথ। মানিব্যাগ থেকে একশো টাকার নোট বের করে হাতে দিয়ে বলল, ইচ্ছেমতো খরচ করবেন।

দীননাথ সংকুচিত হয়ে বললেন, আমার আর খরচ কী? বরং বউমার হাতে দিয়ো।

না, আপনি রাখুন। কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছে হলে দেবেন।

দীননাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, এই বিবেচনাটুকু অন্য ছেলেদের যদি থাকত!

দীপনাথ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ভাবন-ঘরে গিয়ে বৃন্দার কাছে খবর নিয়ে জানল, কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার এসে শ্রীনাথকে দেখে গেছে। আবার বোধহয় ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে শ্রীনাথ।

দীপনাথ শ্রীনাথের সুন্দর বাগানটার ভিতরে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। শরৎকাল আসতে-না-আসতেই শ্রীনাথের বাগানে শিউলি এসে গেছে। অনাদরে মাটিতে ঝরে পড়া অজস্র শিউলি বাসি হচ্ছে। একটা স্থলপদ্ম গাছে ঝেঁপে পদ্ম ফুটেছে। মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে উড়ছে। বউদি কি জানে শ্রীনাথের নিজের হাতে তৈরি করা ফুল থেকেই মৌমাছি কুঞ্জবনে গিয়ে চাক বাঁধে, আর সেই মধুই টলটল করছে তার পাথরের বাটিতে? কথাটা বউদিকে বললে কেমন হবে? ভেবে আপনমনেই মাথা নাড়ল দীপনাথ, লাভ নেই। কোনও কোনও স্বামী-স্ত্রী বোধহয় তাদের সম্পর্কের বিষকেই বেশি উপভোগ করে। মধুর কথা তারা কানে নেবে না।

বেলা ঢলে পড়ল গাছগাছালির আড়ালে। চিকড়িমিকড়ি রোদ খেলছে বাগান জুড়ে।

দীপনাথ উঠে ভিতরবাড়িতে আসে।

বউদি, এবার যেতে হয়।

এক্ষুনি কী? আর-একটু থাকো। তোমার সঙ্গে কথাই তো হল না।

সঙ্গে বসের বউ, ফিরতে রাত হওয়া ঠিক নয়।

দীপু, তুমি কবে বুঝবে যে, আমি কত একা?

দীপনাথ একটু হেসে বলে, একদিন আমি আমার বসকে বলেছিলাম, বড় মানুষরা একটু একা

একটু নিঃসঙ্গ হয়। তোমাকেও বলি বউদি, মহীয়সীরা চিরকাল একা। তাদের সঙ্গী হওয়ার মতো যোগ্যতা ক'জনের থাকে বলো?

আমি মহীয়সী? অবাক করলে দীপু!

কেন? লোকে বলে না?

তোমার মতো চাটুকার তো সবাই নয়! মহীয়সী হলে আমাকে লোকে মারতে চাইবে কেন বলো! কেনই-বা আমার আপনজন বাজারে হাটে আমার কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াবে?

লোকের কথা দিয়ে কী হবে বউদি! আমি যা মনে করি তা তো পালটে ফেলব না।

তৃষা একটু হাসল। মুখের বিষণ্ণতা তাতে কাটল না। খুব গম্ভীর গলায় বলল, কোনওদিন যেন আর না শুনি তোমার মুখে যে, আমি খারাপ, আমি ভাল নই।

শুনবে না বউদি।

তোমার কাছে যেন আমি চিরকাল ভাল থাকি।

থাকবে। যে ছেলে দুটো কাল বোমা মেরেছিল তারা ধরা পড়েছে?

না। তবে নাম জানা গেছে। দু'জনেই ভাড়াটে গুন্ডা। কাছাকাছি মাধবগঞ্জে থাকে।

কারা তাদের পাঠিয়েছিল? তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

কী করে বলব? তবে হয়তো একদিন এইভাবে আমার মরণ হবে, দীপু। তখন খুব কম লোকই কাঁদবে আমার জন্য। আর কেউ না কাঁদুক, তুমি একটু কেঁদো। কান্না এমনিতে না এলে নিজেকে চিমটি কেটো।

॥ পঞ্চাশ ॥

কথা শুনে একটু গম্ভীর হতে গিয়েও অবশেষে একটু মুচকি হেসে ফেলে দীপনাথ। বলে, ওসব ছিঁচকাঁদুনে মেয়েলি সেন্টিমেন্টের কথা তোমার মুখে একদম মানায় না বউদি।

তৃষা চোখ বড় বড় করে বলে, তাই বুঝি? কাল রাতেই তো মাত্র বোমা মেরে গেল। তবু বলছ মেয়েলি সেন্টিমেন্ট? কাল রাতে কপালজোরে বেঁচে গেছি বলেই যে সব ক'টা ফাঁড়া কাটাতে পারব অত পুণ্যি তো করিনি!

প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দীপনাথ বলে, তুমি মরবে না। তুমি মরলে আমাদের চলবে কী করে?

চলবে কী করে তার আমি কী জানি! আমি অমর নই।

বিরক্ত হয়ে দীপনাথ বলে, বার বার মরার কথা বলে আবহাওয়া ভারী করতে চাইছ কেন বলো তো! এ রকম তো ছিলে না! বুড়ো হচ্ছ নাকি!

তোমার কাছে বুড়ো হব সাধ্য কী! এই না সেদিন রঙিন শাড়ি এনে পড়িয়ে ছাড়লে!

তবে? বুড়ো হওনি, শিগগির মরছও না। এখন যাও তো ভদ্রমহিলাকে ডেকে দাও। পরস্ত্রী ফেরত দিয়ে আসি।

কিন্তু পরস্ত্রীটি যে নড়তে চাইছে না!

কেন বলো তো?

আমার মেয়ে দুটোকে পলিটিকস শিখিয়ে মাথা খাচ্ছে।

তা হলে এক্ষুনি মাল ট্রান্সফার করো, নইলে সর্বনাশ। পলিটিকস অতি বিষাক্ত জিনিস।

নিজে থেকে না উঠলে তুলি কী করে?

ওর ওঠার তেমন ইচ্ছেও বোধহয় নেই। হাওড়া স্টেশনে আমাকে বলছিল দু'-একদিন এখানে থেকেও যেতে পারে।

তা থাকুক না। ক্ষতি তো নেই। স্বপ্না আর মঞ্জুর ঘরেই জায়গা হবে।
একটু ইতস্তত করে দীপনাথ বলে, কাজটা ঠিক হবে না বউদি। ওর হাজব্যান্ডের কাছে থাকার পারমিশান নেওয়া হয়নি।
হাজব্যান্ডকে কি ও মানে?
ও না মানুক, আমি তো ওর হাজব্যান্ড হিসেবে বোস সাহেবকে মানি!
হাজব্যান্ড তো এখানে নেইও শুনেছি।
তাতে কী? ফ্ল্যাটটা তো আছে।
সেখানে কি ও নিরাপদ, দীপু?
তার মানে?
মানে আবার কী? তোমার মরালিটির সেন্স দেখে হাসি পায়। একা ফ্ল্যাটে একটা ছুকরি মেয়ে কতগুলো বয়-বাবুর্চির হেফাজতে থাকে, সেটাই বা কোন ভাল ব্যাপার? ওর হাজব্যান্ডের উচিত ছিল কোনও বয়স্কা আত্মীয়াকে ফ্ল্যাটে রেখে যাওয়া বা ওকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া।
দীপনাথ ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখে নেয়। তারপর চিন্তিত মুখে বলে, আমি তোমার মতো করে ভাবিনি। তুমি হয়তো ঠিকই বলছ। তবু আমার দায়িত্ব তো ওকে রক্ষা করা নয়। আমার দায়িত্ব শুধু জায়গা মতো পৌঁছে দেওয়া।
তৃষা একটু হেসে বলে, অত আলগা কথা বোলো না, দীপু। ও তোমার ওপর আরও একটু নির্ভর করে।
দীপনাথ এসব ঠাট্টায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে লজ্জা পেল না। বলল, ইয়ারকি কোরো না। কারও ওপর নির্ভর করার মতো মেয়ে নয়।
তৃষা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, কেন মেয়েটাকে ঝোলাচ্ছ বলো তো তুমি! পরস্ত্রীকে ভাগিয়ে নেওয়ার লোক তো নও। তবে ওকে পাগল করছ কেন?
পাগল করছি! হাসালে বউদি। আমাকে পাত্তাই দেয় না।
বরং খুব বেশি পাত্তা দেয়। তোমাকে মৌমাছি কামড়েছে বলে মুখের ভাবখানা কী রকম হয়েছিল দেখোনি?
আচমকাই এবার লাল হল দীপনাথ। একটা শ্বাস ফেলে বলল, ওর চেয়ে তুমিই বেশি পাগল করলে আমায়। এখন যাও তো, যা বলছি করো তো। ডেকে দাও।
যাচ্ছি বাবা।
বলে তৃষা যায়। দীপনাথ অধৈর্যের সঙ্গে পায়চারি করতে থাকে বাগানের রাস্তায়। মেয়েদের বিদায় নিতে অনেক সময় লাগে। শেষ কথার রেশ ছিঁড়তে পারে না সহজে। দীপনাথ বার কয়েক ঘড়ি দেখল। জুতো ঘষল রাস্তার মোরমে। আজকের মৌমাছির হুল বহুকাল মনে থাকবে। কী জ্বালা! কী সুখ! চোখের কোল এখনও বেলুনের মতো ফুলে আছে। ঘাড়ে মাথায় এখনও তিনটে ঢিবি। অল্প ব্যথা। কাল ফোলা মিলিয়ে যাবে, ব্যথা থাকবে না। শুধু স্মৃতি থাকবে।
যখন শেষ অবধি উঠোনের সীমানা ডিঙিয়ে মণিদীপা বেরিয়ে এল তখন সন্ধে হয়-হয়। চারদিকে লঘু ছায়া পড়ে গেছে। হাওয়া দিচ্ছে খুব। দূরে মেঘ ডাকল।
মঞ্জু বলল, আর-একটু দেখে যাওয়া ভাল মণিকাকিমা, বৃষ্টি আসবে বোধহয়।
স্বপ্না মণিদীপার একটা হাত ধরেই ছিল। বলল, থেকে যাও না কাকিমা!
ওরা খুব জমিয়ে নিয়েছে, বুঝল দীপনাথ। অনায়াসে 'তুমি' করে বলছে। মেয়েরা এসব পারে।
মণিদীপা একবার জিজ্ঞাসু চোখে দীপনাথের দিকে তাকায়। দীপনাথ অস্বস্তির সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিয়ে মণিদীপার পিছনে দাঁড়ানো তৃষার দিকে তাকায়। তৃষা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। দীপনাথ চোখ নামিয়ে নেয়।

খুব সংকোচের সঙ্গে দীপনাথ মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি থাকতে চান?

ওরা ছাড়তে চাইছে না। আপনি কী বলেন?

স্বপ্না হাঁ করে কথা গিলছে। দীপনাথ কী বলবে? সে একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ইচ্ছে হলে থাকুন।

আপনি?

আমি? আমাকে যেতেই হবে।

কেন খুব কাজ?

খুব কাজ। আপনি থাকতে পারেন। কাল সকালে বা যখন আপনার ইচ্ছে বউদি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

লোকের দরকার নেই। একাই পারব।

তা হলে থাকছেন?

ভাবছি।

ভাববার সময় নেই। আপনি থাকুন, আমি চলি।

থাকবে! থাকবে!— বলে স্বপ্না আর মঞ্জু প্রায় আঁকড়ে ধরে মণিদীপাকে।

দৃশ্যটা দেখতে ভালই লাগে দীপনাথের। তবু মনে একটা কাঁটা ফুটে আছে। বোস সাহেবের অনুমতি নেওয়া হয়নি। সে তৃষার দিকে সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে বলে, যাই বউদি?

এসো। মণিদীপা আমাদের কাছে যত্নেই থাকবে।

আসি তা হলে।— বলে মণিদীপার দিকে একপলক চেয়ে দীপনাথ তার অভ্যস্ত বড় বড় পদক্ষেপে বেরিয়ে এল বাগানের ফটক খুলে।

স্টেশন অনেকটা পথ। দূরে মেঘ ডাকছে। শরতের দমকা বৃষ্টি এসে কখন ভিজিয়ে দেয় কে জানে। ছাতা নিয়ে কদাচিৎ পথে বেরোয় সে। ছাতা জিনিসটাই তার পছন্দ নয়।

চৌমাথা পেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে অনেকটা এসে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল দীপনাথ। খুব নির্জন। একটা মস্ত অশ্বত্থের ঘন ছায়া জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। চারদিকে অজস্র ঝোপঝাড়, বাড়িঘর নেই। এই জায়গাতেই সোমনাথকে মেরেছিল না গুন্ডারা! কেউ চিনিয়ে দেয়নি দীপনাথকে, তবু তার মনে হল, এই সেই জায়গা। সোমনাথকে কারা মেরেছিল তা আজও সঠিক জানে না দীপনাথ। এর ওর তার কাছে নানা কথা শুনেছে। সোমনাথ বড় বেশি আদরে মানুষ। কখনও শাসন করা হত না বলেই কি একটু অন্যরকম হল সে? কে বলবে? আবার বউদির গুন্ডারাই যদি তাকে মেরে থাকে তবে তারা শমিতার ওপর অত্যাচার করবে কেন? বউদি নিশ্চয়ই ওরকম জঘন্য কাজ করার হুকুম ওদের দেয়নি! ঘটনাটা তাই আজও কিছুতেই বুঝতে পারে না দীপনাথ।

খানিকক্ষণ ঝুঁঝকো ছায়ায় সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে। বিশ্লেষণ করে। কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারে না।

বৃষ্টি এল বলে। এখনও অনেকটা পথ। দীপনাথ খুব দ্রুত হাঁটতে থাকে। কখনও দৌড়পায়ে। স্টেশনের একেবারে কাছাকাছি তেমাথায় বৃষ্টি তার নাগাল পেয়ে গেল। দোকানে ঢোকা যেত, কিন্তু না ঢুকে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাকি পথটা দৌড়ে পার হল সে।

স্টেশনের চত্বরে উঠে ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে রুমালে মাথা ঘাড় মুছল। কলকাতার একখানা টিকিট কাটল। তারপর দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগল। স্টেশনে যাত্রী বলতে প্রায় কেউ নেই। সে একা। খবর নিয়ে জেনেছে কলকাতার ট্রেন আরও মিনিট দশেকের আগে নয়।

মণিদীপা রয়ে গেল। ঘটনায় স্বস্তি পাচ্ছে না দীপনাথ। আনমনে একবার চোখের কোলে ফোলা জায়গাটায় আঙুল রাখল। ফোলাটা অনেক কমে গেছে। ব্যথা নেই, জ্বালা নেই। তবু কী যেন একটু আছে। আঙুল ছোঁয়াতেই রোমাঞ্চ হল গায়ে।

বৃষ্টির মধ্যেই একটা রিকশা ঝড়েব বেগে ছুটে আসছে স্টেশনের দিকে। মোড়ের মাথায় ঘন্টি মারছিল ঘন ঘন। ফিরে দৃশ্যটা দেখছিল দীপনাথ।

কে আসে?

বুকের মধ্যে হঠাৎ দামামা বেজে ওঠে। এত বেসামাল বহুকাল লাগেনি দীপনাথের। অথচ সেই নিত্যদিনের মণিদীপাই তো! মহত্তর কিছু তো নয়, চমকপ্রদও তো কিছু নয়। বিরহ তো মাত্র আধ ঘণ্টার।

রিকশাওলাই একটা ছাতা ধরে স্টেশনে তুলে দিয়ে গেল মণিদীপাকে। দীপনাথের দিকে চেয়ে বলল, আপনাকে না পেলে দিদিমণিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

দীপনাথ জবাব দিল না। নিঃশব্দে গিয়ে আর একখানা কলকাতার টিকিট কেটে আনল।

মণিদীপাও সামান্য ভিজেছে। হাত বাড়িয়ে বলল, আপনার রুমালটা দিন তো। মাথাটা বড্ড ভিজে গেছে।

দীপনাথ রুমাল দিল না। তার শুচিতায় বাধে। পরস্ত্রী কেন অন্য পুরুষের রুমাল ব্যবহার করবে? আর বুকের ভিতরকার সেই দামামা? হ্যাঁ, তাও সত্যি। আর এই দুইকে কখনও মেলাতে পারে না বলেই তো দীপনাথ আজ বড় একা বোধ করে।

কই, রুমালটা দিলেন না!— মণিদীপা হাত বাড়িয়ে আছে।

শাড়ির আঁচলে মুছে নিন। আমার রুমাল নোংরা।

মণিদীপা কোনও কথা বলল না। আঁচলটা ঘুরিয়ে মাথাটা যথাসাধ্য মোছার চেষ্টা করল।

আপনি জানতেন যে, আমি চলে আসব?

না তো! কী করে জানব?— দীপনাথ অবাক হয়ে বলে।

না জানলে এতক্ষণে চলে যাননি কেন?

যেতাম, গাড়ি পেলে। এখনও গাড়ি আসেনি।

চল্লিশ মিনিটেও ট্রেন পেলেন না!

না। আপনাব কেন মনে হল আমি আপনার জন্যই যাইনি?

মণিদীপা কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বলে, এমনিই। আপনি চলে আসার পরই জায়গাটা এত বোরিং মনে হল যে থাকতে ইচ্ছে করল না।

দীপনাথের সুস্পষ্টই শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। বুকের মধ্যে তোলপাড়। এত অকপট কোনওদিন ছিল না মণিদীপা। আজ এসব হচ্ছেটা কী?

দীপনাথ কথা বলল না। মণিদীপা খু্ব দীন ভঙ্গিতে গিয়ে একটা ফাঁকা বেঞ্চে বসল। মাথা নিচু, চোখ নত।

ঘনঘোর বৃষ্টির শব্দের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে অতিকায় ট্রেন চলে এল।

দীপনাথ বলল, ট্রেন।

মণিদীপা উঠল। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে দু'জনে দৌড়ে এসে প্রথম যে কামরাটা পেল, উঠে পড়ল।

প্রায় ফাঁকা কামরা। আলো জ্বলছে। বাইরে ঘন অন্ধকারে অঝোর বৃষ্টি। কামরার মেঝেয় চিনেবাদামের খোসা, কাগজের ঠোঙা, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, দেশলাইয়ের ফাঁকা খোল। সব মিলিয়ে জনাপাঁচেক লোক এধারে সেধারে শুয়ে-বসে আছে। বেশির ভাগই চাষিবাসী শ্রেণির। মাঝপথেই কোথাও নেমে যাবে।

মুখোমুখি বসেও কেউ কারওর দিকে তাকাতে পারছিল না। আজ পরস্পরের কাছে তারা বড় বেশি ধরা পড়ে গেছে। লুকোনোর কিছু আর রইল না বোধহয়। না কি এখনও কিছু পরদার আড়ালে আছে?

বউদি কী বলল?— অনেকক্ষণ বাদে দীপনাথ আস্তে গলায় প্রশ্ন করে।

কী বলবে?

হঠাৎ চলে এলেন দেখে কিছুই বলল না?

না তো? কিছু বলার কথা নাকি?

কথাই তো। এভাবে চলে আসা ঠিক হয়নি। পাঁচজনে পাঁচ কথা ভেবে নেবে।

মণিদীপা অবাক হয়ে বলে, কী ভাববে?

আপনাকে নিয়ে আর পারি না।

বলুন না কী ভাববে!

দীপনাথ ম্লান একটু হাসে। হাল ছেড়ে দিয়ে আপনমনে মাথা নাড়ে একটু। তারপর বলে, মানুষের মনে কতরকম যে প্যাঁচ আছে।

বাট উই আর ফ্রেন্ডস।— বলে মণিদীপা উঠে এসে পাশে বসে।

অফ কোর্স। কিন্তু সেটা কি সবাই বুঝবে?

মণিদীপা অতিশয় ফিচেল হাসি হাসছিল। বলল, সবার আগে দেখা দরকার আপনি বা আমি পরস্পরকে বন্ধু মনে করি কি না।

আমি আপনার অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, বিশ্বাস করুন।

অবিশ্বাস একবারও করিনি।— মণিদীপার সুগন্ধি একটা শ্বাস এই কথার সঙ্গে দীপনাথের ঘাড় ছুঁয়ে গেল।

মণিদীপা এত কাছে ঘেঁষে বসে আছে যে, দীপনাথের অস্বস্তি হতে থাকে। সেই অস্বস্তির মধ্যে এক ধরনের তীব্র সুখ। তার শরীর শিউরে ওঠে।

দীপনাথ কিছু ভেবে না পেয়ে বলল, আমাকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই।

আপনার কথাই ওঠে না। আপনি কখনও নিয়ম ভাঙতে ভালবাসেন না। সেই সাহস আপনার নেইও। কাওয়ার্ডদের থাকে না। তাই অধিকাংশ কাওয়ার্ডই হয় নীতিবাগীশ।

তাই নাকি? আপনি খুব নিয়ম ভাঙতে ভালবাসেন, তাই না?

ভীষণ। আর যারা নিয়ম ভাঙে তাদেরই আমার বেশি পছন্দ। নীতিবাগীশরা আমার দু' চোখের বিষ।

বুঝলাম মিসেস বোস।

কিছুই বোঝেননি। নীতিবাগীশ আর আদর্শবাদীর মধ্যে অনেক তফাত। কিসের তফাত জানেন? নীতিবাগীশরা জীবনে কিছু করতে পারে-না, আদর্শবাদীরা পারে।— মণিদীপার গলার স্বরে রাগের উত্তাপ বাড়ছে।

বুঝলাম। এক্ষেত্রে আপনিই বোধহয় সেই আদর্শবাদী?

নিশ্চয়ই। আর আদর্শবাদীদেরও কিছু শুচিতার বোধ থাকে। কিন্তু আপনি বা বোস সাহেব কোনওদিন আমাকে সিরিয়াসলি নেননি। আপনারা শুধু জানেন আমি আপস্টার্ট, একস্ট্রাভ্যাগান্ট নটি। তার বেশি কিছু নয়।— মণিদীপা ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে।

আমি ভাবি না।— গোমড়া মুখে দীপনাথ বলে।

টু অফ ইউ আর ইন এ লিগ এগেইনস্ট মি।

না মিসেস বোস।

এ কথায় কী হল কে জানে, মণিদীপার মুখ-চোখ রাগে ফেটে পড়ল। ঘনশ্বাসের ঝোড়ো আওয়াজের সঙ্গে চাপা আক্রোশ ভরা গলায় 'আমি জানি, আমি জানি' বলতে বলতে আচমকা অপ্রত্যাশিত, দু' হাত বাড়িয়ে সে খামচে ধরে দীপনাথের জামা। টেনে প্রায় ছিঁড়ে দিতে দিতে বলে, কেন আপনারা ভালবাসেন না আমাকে? কেন বাসেন না? কেন?

শিলিগুড়ি গিয়ে অবধি দীপনাথকে চিঠি দেয়নি প্রীতম। তবে সে যে পৌঁছেছে সে খবর বিলুর কাছে শুনেছে দীপনাথ। আজ মেসে ফিরে প্রীতমের চিঠি পেল সে। বেশ দীর্ঘ চিঠি। হাতের লেখাটা অবশ্য প্রীতমের নয়। অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে, আমি ভাল আছি। কিন্তু এ জায়গাটা কী বিচ্ছিরি হয়ে গেছে বলো তো! মদের দোকান, স্মাগলিং, মারপিট, হই-চই, আগে জানলে কিছুতেই আসতাম না। তুমি কখনও বলোনি তো আমাকে!... বলো তো, গোটা দেশে একটাও কি শান্ত, নিরিবিলি, সুন্দর জায়গা নেই? সব পচে গেছে? সব নষ্ট হয়ে গেছে? বেঁচে থেকে তবে আর কী হবে? কলকাতায় এতকাল বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত ভেবেছি, আমার স্বপ্নের শিলিগুড়ি বুঝি গাছপালা পাহাড় নদী আর নির্জনতা সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে আমার জন্য। কোথায় কী? নোংরা হাটুরে চেহারার এই বিকট শহর আগাপাশতলা কলকাতার নকল। আমাকে একটা জায়গার সন্ধান দাও মেজদা।...

একটা শ্বাস ফেলে খামে আবার চিঠিটা ভাঁজ করে ভরে রাখে দীপনাথ।

সুখেন বহুদিন পর বাড়ি গেছে. পড়ুয়া ছেলেটাও দিন-দুই হল দেশে। ঘরে আজ দীপনাথ একা। রাতে সে কিছুই খেল না। বাতি নিভিয়ে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল। সে আর খুব বেশিদিন এই মেসে থাকবে না। আর-একটু ভালভাবে থাকার জন্য সে এবার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেবে। রান্নার লোক রাখবে।

ভাবতে ভাবতে টান টান হয়ে উঠে বসে সে। নিজেকেই প্রশ্ন করে, না হয় বাসা নিলাম, লোক রাখলাম, কিন্তু তারপর? তারপর কি জীবন আমূল পালটে যাবে? নতুন কিছু ঘটবে?

বুকের একটা জায়গায় অসাবধানে মণিদীপার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের তীক্ষ্ণ নখে সামান্য আঁচড় লেগেছিল। ঘামে ভিজে এখন সেই জায়গাটা সামান্য জ্বালা করছে। মৌমাছির হুলের জায়গাগুলো এখনও সামান্য ফুলে আছে। কী করবে দীপনাথ? কী করবে?

নিশিতে পাওয়ার মতো বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে। দরজা খুলে রাস্তায় নেমে আসে। নিশুত রাতে ফুরফুরে হাওয়া ছেড়েছে। কুকুররা ঝগড়া করছে মোড়ে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে দেখে এত রাতে ঠেলাগাড়িতে কাদের মাল যাচ্ছে কোথায়। আকাশভরা তারা ফুটে আছে। মাঝরাতে এইভাবে জেগে উঠে দীপনাথের কাছে আজ হঠাৎ আবার বহু দূরের এক মহাপর্বতের সংকেতবার্তা এসে পৌঁছোয়। মানুষের জীবন নানা পঙ্কিলতায় ভরা, যুক্তিহীন, পরিণতিহীন, আনন্দহীন— ওই জীবন ছেড়ে চলে এসো দীপু। আমি বহুকাল তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

যাবে দীপনাথ। বড় উচাটন হয়ে ওঠে মন। কোথায় কোন দুর্গম প্রান্তর, পাথুরে জমি, চড়াই-উতরাই ভেঙে যেতে হবে তার তো কোনও ঠিক নেই। কোন দিক থেকে সংকেত ভেসে আসছে, তা সে জানেও না ভাল মতো। শুধু তার পালে সেই পাহাড়-ছোঁয়া বাতাস এসে লাগে। বলে, উজানে যাও, উজানে যাও।

॥ একান্ন ॥

প্রীতম জিজ্ঞেস করে, তুই কোত্থেকে শিখলি এসব?

শতম লজ্জা পায়, শিখেছি, শিখেছি। দেখো না তোমাকে ভাল করে তুলবই।

তোর মনের জোর আছে। আমার নেই।

জোর-টোর নয়, আসলে তোমার ইচ্ছে নেই। তুমি কি বিশ্বাস করো না, যার মনে যত প্যাঁচ-ঘোঁচ, যত কুটিলতা জটিলতা তার তত ব্যারাম? খামোখা কারও ব্যারাম হয় না। রোগের প্রথম অঙ্কুর গজায় মনে। তারপর তা শরীরে ফুটে বেরোয়।

ম্লান হেসে প্রীতম বলে, আমার মনে বোধহয় অনেক প্যাঁচ-ঘোঁচ, অনেক জটিলতা কুটিলতা।

মাথা নেড়ে শতম বলে, তা নয়। তবে তোমার একটা রোগ-রোগ বাতিক ছিল দাদা। শরীর নিয়ে তুমি বড় বেশি ভেবেছ।

তা ভেবেছি।

তোমার কখনও ভাবতে ইচ্ছে করেনি যে, এই শরীর মানুষকে দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য! বসিয়ে বাখার জন্য নয়! যত শরীর-শরীর করবে তত আজ চুলকুনি, কাল পাঁচড়া, পরশু আর একটা না একটা কিছু এসে ধরবেই।

শরীরকে ভুলে যেতে বলছিস?

একদম। গতর পুষে রাখার জন্য তো নয়। মনের ওপর শরীরের সব ভালমন্দ। মনটাকে তাজা রাখো, শরীর উজ্জ্বল হবে। আর বসে বসে মরণের চিন্তা করো, শরীরে তাব ছায়া পড়ে যাবে। শরীরকে কখনও বিশ্রাম দিয়ো না। খাটাও, কেবল খাটিয়ে যাও।

প্রীতম হেসে বলে, বিশ্রাম নেব না?

নেবে। কেন নেবে না? তবে শরীরের বিশ্রাম কেমন জানো?

কেমন?

তুমি তো অ্যাকাউন্ট্যান্ট! রোজ হিসেব-নিকেশ করতে করতে যখন ক্লান্তি আসে তখন যদি হঠাৎ একটু টেবিল টেনিস খেলো বা কবিতা লেখো, কি একটু বাগান করলে, সেইটেই বিশ্রাম। রোজকার অভ্যস্ত কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করলে শরীর বিশ্রাম পায়।

ঘুমোব না?

ঘুমোবে। দিনে রাতে চার ঘণ্টা।

বলিস কী? ডাক্তাররা যে আট ঘণ্টার কথা বলে।

বলে তো কী? শরীরের জন্য চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। দেখো না কুলি-লাইনের পশ্চিমারা সারা দিন মাল বয়, অসুরের মতো খাটে, আবার কত রাত অবধি জেগে 'রামা হো' গান গায়। আবার ভোররাতে কাজে বেরিয়ে পড়ে। ক'ঘণ্টা ঘুমোয় বলো তো! তারা বেঁচে নেই? তোমার আমার চেয়ে ঢের ভালভাবে বেঁচে আছে। ওই যে চার ঘণ্টা ঘুমোয় সে ঘুম খুব গভীর, নিপাট, গায়ের ওপর দিয়ে মোষ হেঁটে গেলেও টের পাবে না তা জানো?

জানছি।

ভুল বললাম?

প্রীতম মাথা নেড়ে বলে, না। তবে এত সব ভাল করে কখনও লক্ষ করিনি।

এখন থেকে করো। শরীর নিয়ে ভেবো না।

রোজ সকালেই এরকম কিছু উজ্জীবক কথাবার্তা বলে শতম তার মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুধের গ্লাস হাতে আসে মা। শরীর নিয়ে কখনও কিছু বলে না। কথাবার্তা অনেকটা কমে গেছে। দুধের মধ্যে অনেকটা সর তুলে নিয়ে আসে। পাশে বসে চামচ দিয়ে ঘুঁটে ঘুঁটে সরটাকে দুধের মধ্যে মেশাতে থাকে। এতে নাকি বেশি পোষ্টাই।

কিন্তু এ সবই অনভ্যস্ত অস্বাভাবিক লাগে প্রীতমের কাছে। বিলুর সঙ্গে থেকে থেকে ওই একরকম অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। বিলু কোনওদিন তার দিকে বিশেষ নজর দেয়নি, মনোযোগী হয়নি। তবে মনকে সরিয়ে রেখে হৃদয়হীন কর্তব্য করে গেছে। আর তাইতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে প্রীতম। এখন তার প্রতি কেউ বেশি মনোযোগ দিলে, তাকে কেউ বেশি ভালবাসলে, ভারী অস্বস্তি বোধ করে সে। মাঝে মাঝে বাড়ির লোকের অতি আদরের অত্যাচারে সে বিরক্ত হয়। রেগেও যায়। মা বরাবরই তাকে খুব ভাল বোঝে। তার মুখ দেখেই মনের ভাব এঁচে নিতে পারে। তাই প্রীতমের জন্য আহা উঁহু সবচেয়ে কম করেছে মা।

সর ঘুঁটে দুধটা খাইয়ে নীরবে মা একটা তেল-পড়ার বোতল নিয়ে এসে হাতে পায়ে মালিশ করে দেয়। প্রথম-প্রথম বিচ্ছিরি লাগত, মাখতে চাইত না প্রীতম। আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার অসুখের প্রথম দিকে অফিসের এক কলিগ গৌরাঙ্গ বোস হাবড়ার এক ফকিরের কাছ থেকে বার দুই মন্ত্রপূত তেল এনে দিয়েছিলেন মালিশের জন্য। সে তেল আবার আগাগোড়া হাতে করে বয়ে আনতে হত, কোথাও রাখার নিয়ম ছিল না। গৌরাঙ্গবাবু ভিড়ের ট্রেনে ঘেমে চুপসে কষ্ট করে সে তেল আনতেন। বিলুকে পই পই করে বুঝিয়ে দিতেন, কী করে মালিশ করতে হবে। বিলু সে তেল রেখে দিত। কখনও মালিশ করেনি। একদিন প্রীতম বলেছিল, গৌরাঙ্গবাবু কষ্ট করে তেলটা আনলেন, ফেলে রাখবে?

ওসব বুজরুকি দিয়ে কী হবে? তেলপড়ায় অসুখ সারলে এত লোক ডাক্তারের কাছে যেত না।

খুবই যুক্তিপূর্ণ জবাব। অবশ্য প্রীতম নিজেও তেলপড়ার গুণে খুব বিশ্বাসী নয়। কিন্তু তার মন বলত, আমি যদি তোমার প্রিয়জনই হয়ে থাকি, তবে আমার কঠিন অসুখের সময় তুমি লজিক মেনে চলতে পারো কী করে? মানুষ যাকে ভালবাসে তার একটু কিছু হলেই সে পাগল হন্যে হয়ে যায়। তখন যুক্তি থাকে না, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকে না, সে তখন ডাক্তার বদ্যি, তাবিজ তাগা মাদুলি জলপড়া মাথাখোঁড়া ধরনা দেওয়া সব করে করে বেড়ায়। তাতে কাজ না হোক, উদ্বেগ আর ভালবাসার একটা জমজমাট প্রকাশ তো ঘটে। বিলুর ঠান্ডা মুখশ্রী আর ক্ষুরধার বুদ্ধির সামনে কচুকাটা হয়ে গেল প্রীতম। কিন্তু বিলু জানে না, সংসারে সব লড়াই জিততে নেই।

তেলের প্রথম শিশিটা কৌতূহলভরে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছিল লাবু। গৌরাঙ্গবাবু খবর পেয়ে আবার তেল এনেছিলেন। দ্বিতীয় শিশিটা আবার তাকে তোলা রইল। মাস দুই পরে একদিন শিশিটা নজরে পড়ায় গৌরাঙ্গবাবু প্রীতমকে একান্তে বললেন, আজকালকার ওয়াইফরা কেমন বলুন তো মশাই? এদের কাছে স্বামী কি কোনও ফ্যাক্টরই নয়? আমি বলে গেলাম আপনাকে, যদি বাঁচতে চান তা হলে নিজের মায়ের কাছে চলে যান।

এখন মা পায়ের গোছ থেকে উরু পর্যন্ত টান টান করে ভারী এবং দুর্গন্ধযুক্ত তেলটা মালিশ করে দিচ্ছে। মুখে কথা নেই। মা জানে, প্রীতমের মেজাজ এখানে এসে ভাল থাকছে না। এখানে মন বসতে সময় নেবে। এ জীবনে তো তার বহুকাল অভ্যাস নেই।

নিষ্ঠুর হোক, শীতল হোক তবু বিলুর প্রতি এক চোখভরা তীব্র আকর্ষণ আজও আছে প্রীতমের। শুধু আছে নয়, এখানে আসার পর তা আরও তীব্র হয়েছে। সব দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, তবু মন থেকে বিসর্জন দেওয়া গেল না। তেমনি বুকে ঢেউ দেয় লাবুর কথা মনে হলে। সারাদিন ভবানীপুরের সেই ঘরটার ছবি চোখে ভাসে। নাকে আসে লাবুর গায়ের গন্ধ। বিলুর স্পর্শ টের পায় যেন শরীরে।

প্রীতম ডাকল, মা!

উঁ!

শতমকে বলো, আবার আমায় কলকাতায় দিয়ে আসুক।

ভাল হ, যাবি।

আমার এখানে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু কলকাতায় থাকলে ঘরে বসেও আমি কিছু কাজ-টাজ পাই, রোজগার করতে পারি।

মা কথাটার কোনও জবাব দিল না, কিন্তু আপন মনে বলতে লাগল, বউ-মেয়ের জন্য মন তো কেমন করবেই। কিন্তু সেখানকার যা অবস্থা শুনি— কে কাকে দেখে।

প্রীতমের এসব কথাও ভাল লাগে না। চোখ ফিরিয়ে সে জানালার বাইরে কলকে ফুলের গাছটার দিকে চেয়ে থাকে। ঘন সবুজ পাতায় ঝোঁপ ফেলেছে জানালাটাকে। তার ওপাশে শরতের নীল আকাশ জুড়ে অফুরন্ত রোদ।

প্রীতম চুপ করে থাকে। তেল মালিশ করা শেষ হলে মা আবার নিঃশব্দেই চলে যায়।

বাড়ির লোক এ ঘরে কমই আসে। প্রীতমের বিরক্তি ও বদমেজাজ সবাই লক্ষ করেছে। এমনিতেও প্রীতমকে সবাই বরাবর একটু সমঝে চলে। বাবা একদমই ঘরে ঢোকে না। মেজো বোনটার সঙ্গে ভাব ছিল খুব এক সময়ে। সে মাঝে মাঝে আসে, গল্প করে বসে বসে। কিন্তু অল্পেই ক্লান্তি আসে প্রীতমের। তার কেবল ভবানীপুরের বাসার কথা ভাবতে ইচ্ছে করে, চুপচাপ শুয়ে থাকে।

বিলুকে একটা পৌঁছ-সংবাদ দিয়েছিল প্রীতম। তারপর বিলুর তিন-চারখানা চিঠি এসেছে। প্রীতম জবাব দেয়নি। মেজো বোন ছবি এসে বহুবার বলেছে, বউদিকে চিঠি দেবে, দাদা? দিলে বলো, লিখে নিচ্ছি।

প্রীতম মাথা নেড়ে বলেছে, তোরাই দে। আমার ইচ্ছে করছে না।

নিজে চিঠি না লিখলেও বিলুর চিঠির জন্য উৎকণ্ঠা থাকে সব সময়ে। আজকাল বিলু বাবাকে বা শতমকে বা ছবিকেই চিঠি দেয়। বেশ ঘন ঘন দেয়। প্রীতমের সব খবর খুঁটিয়ে জানতে চায়। ওরা কী জবাব দেয় তা জানে না প্রীতম! জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু বিলুর চিঠি যখন আসে তখন বুকটা কেঁপে ওঠে উত্তেজনায়, আবেগে।

বিলুর প্রতি নিজের এই অন্ধ ভালবাসা দেখে অবাক মানে প্রীতম। ওই ঠান্ডা, নিরুত্তাপ যুক্তিবাদী নিষ্ঠুর মহিলাকে এতকাল ধরে কী করে ভালবাসছে সে?

নিজেকেই প্রশ্ন করে প্রীতম, ও যে অরুণের সঙ্গে... তোমার ঘেন্না করে না প্রীতম?

নিজেই জবাব দেয়, করে তো! শিউরে উঠি, কেঁপে উঠি ঘেন্নায় লজ্জায়। তবু অন্ধ অবাধ্য এক মমতা কেন যে মনের মধ্যে টলটল করে!

নিজেকে বিষিয়ে ফেলো, প্রীতম। অব্যাহত রাখো ঘৃণাকে। কখনও ক্ষমা কোরো না, নরম হোয়ো নাকো।

বিষিয়ে গেছি। জ্বলছি। টানটান রাখছি নিজেকে। তবু স্পঞ্জের মধ্যে যেমন লুকোনো জল নিংড়োলেই বেরিয়ে আসে এই ভালবাসাও তেমনি।

অবিশ্বাসী স্ত্রীকে ভালবাসা কি ঠিক, প্রীতম?

শোনো শোনো। আমার লাবু যদি শত অন্যায়ও করে তবু কি আমি তাকে না ভালবেসে পারি? বলো! যা-ই করুক তবু মনে হবে, ও যে আমার লাবু! আমার ছোট্ট লাবু! বিলুর প্রতি আমার ভালবাসাও অবিকল সেরকম। যা-ই করুক, যেমনই হোক, ও যে বিলু।

তোমার বিলু?

হতাশায় মাথা নেড়ে প্রীতম বলে, তা বলছি না। বিলু কার তা কী করে বলব? কিন্তু মন! মনকে কী করে মেরে ফেলা যায় বলো তো! বিলুকে আমি এক ফোঁটাও ক্ষমা করিনি, জানো? তবু বিলুকে মন থেকে তাড়াবই বা কী করে? যায় না যে!

কিন্তু বড় জঘন্য যে তার পাপ!

মানুষ কখনও পাপ থেকে মুক্তি পায় না, না? কিছুতেই শুদ্ধ হয় না? মুক্ত হয় না?

উত্তেজিত প্রীতম কাত হয়ে দু'হাত ভর দিয়ে উঠে বসে বিছানায়। সারা গায়ে ঘন তেলের প্রলেপ। পায়জামাটা তেলে ভিজে সপসপ করছে। গায়ের বুকখোলা শার্টটা নিংড়োলে বোধহয় এক-পো তেল বেরোবে।

রাগের গলায় প্রীতম ডাকে, মা! মা!

ছবি দৌড়ে আসে। পরনে স্কুলের খয়েরি পাড় শাড়ি, চুল আঁচড়ানো, মুখে পাউডার। বলল, কী দাদা?

দেখ তো, কী বিচ্ছিরি তেল মাখিয়ে গেছে। গা-টা মুছিয়ে দেওয়ার কেউ নেই।

আমি দিচ্ছি, দাঁড়াও। মা গেছে কালীবাড়ি।

থাক গে, তুই স্কুলে যা।

কিছু হবে না, মুছে দিচ্ছি দাঁড়াও।— বলে দৌড়ে গিয়ে একটা গামছা আনে ছবি।

লজ্জা পেয়ে প্রীতম হাত বাড়িয়ে গামছাটা নিয়ে বলে, তুই যা, আমি পারব।

ছবি দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে থাকে একটু। আর চাপাচাপি করতে সাহস পায় না। দাদা হয়তো রেগে যাবে। বড্ড রেগে যায়।

আসছি তা হলে, দাদা!— বলে ছবি চলে যায়।

গামছাটা পায়ের কাছে মেঝেয় ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে প্রীতম। বুকের মধ্যে এক অক্ষম রাগের মাথা খোঁড়াখুঁড়ি। অভিমানের বান ভাসিয়ে নিচ্ছে তাকে।

গাড়োয়ান যেমনভাবে তার দুষ্টু অবাধ্য গোরুকে সামলায়, চাবুক মারে, পাঁচনের গুঁতো দেয়, ঠিক তেমনিভাবে নিজেকে লক্ষ করে প্রীতম বলে, র'-র'! শক্ত হও। শক্ত হও। তুমি কখনও এরকম ছিলে না। তুমি এরকম নও। মনে করো, পৃথিবীতে তোমার কেউ নেই। ইউ আর এ লোন বাস্টার্ড।

কিন্তু এই মনের খেলা বেশিক্ষণ খেলতে পারে না প্রীতম। বড় ক্লান্তি আসে, হতাশা, ধৈর্যহীনতা আসে।

দুপুরে শতম খেতে আসে। একবার উঁকি মারে ঘরে।

দাদা!

আয়।

ঘুমোওনি?

না।

বড় বেশি রেস্টলেস দেখছি তোমাকে।

না, না, ভাল আছি।

ভালই তো আছ। তবে কেন মাকে বলছ, কলকাতা যাবে!

ভাবছিলাম, চেষ্টা করলে হয়তো এখনও অডিটের কাজ করতে পারি ঘরে বসে। সময়ও কাটবে, কিছু টাকাও আসবে।

করবে? তা তার জন্য কলকাতা কেন, এখানেই কাজ দেব।

দিবি? দে না!

শতম দুপুরেই একগাদা কাগজপত্র সমেত গোটা তিনেক ফাইল প্রীতমের চৌকির পাশে একটা টেবিল এনে রেখে গেল। সঙ্গে রেখে গেল একটা টেপ-রেকর্ডার আর অনেকগুলো গানের ক্যাসেট। বলল, হিসেব করতে করতে টায়ার্ড লাগলে একটু গান শুনো। তুমি তো একটু-আধটু গাইতেও পারতে। গাও না কেন?

দুর, বরং হিসেব করলেই ভাল থাকব।

যা খুশি করো। শুধু মরার কথা ভেবো না।

প্রীতম অনাবিল হেসে বলে, আচ্ছা, তুই যা তো।

শিলিগুড়িতে বেশ শীত পড়ে গেছে এই শরতের শুরুতেই। দুপুরেও গায়ে একটা কিছু দিতে হয়। পায়ের জানালাটা দিয়ে রোদ আসে।

প্রীতম নির্জন দুপুরে খানিকক্ষণ ফাইলের কাগজপত্র দেখল। ছক কেটে অনেকগুলো এন্ট্রি করল। আস্তে আস্তে অ্যাকাউন্টেন্সির পুরনো নেশা খুব পেয়ে বসল তাকে। বিলু হলে বাধা দিত। এখানে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। দরজা ভেজানো। একটানা অনেকক্ষণ কাজ করে গেল সে। শতমের ব্যাবসার কাগজপত্র থেকে সে জানতে পারল, বছরে কম করেও শতম ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার করে। জেনে ভারী খুশি হল সে।

বিকেলের দিকে ক্লান্তি এল। চোখ বুজে শুয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে হঠাৎ শতমের সেই কথাটা মনে পড়ল, অভ্যস্ত কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করলে মানুষের বিশ্রাম হয়। ভেবে একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসল সে। তবু এক্সপেরিমেন্ট করতে উঠেও বসল সে।

গান গাইবে? গাইত এক সময়। অল্পস্বল্প। কতকাল গায় না! ভুলে গেছে কথা সুর।

বালিশে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে নিচু স্কেলে সে গুনগুন করল কিছুক্ষণ। অনেক বিস্মৃতি আর অনভ্যাসের পলিমাটি পড়েছে গলায়। তবু কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সে মোটামুটি সুরের ওপর রেখে গাইতে লাগল, দোলাও দোলাও দোলাও আমার হৃদয়...।

আশ্চর্য! ক্লান্তিটা ধীরে ধীরে কেটে গেল।

শতম অনেক রাতে এসে হানা দিল ঘরে। বলল, দেখি, কী করলে সারাদিন!

কাগজপত্র উলটেপালটে দেখে বলল, বাঃ! এ যে অনেকটা হিসেব করে ফেলেছ।— বলে খানিক চুপ করে শতম বলে, তোমাকে খাটাচ্ছি জানলে বউদি আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু না খাটালে যে হবে না। মানুষ নিজের ক্ষমতা টের পেলে বুঝত সে কতখানি। খাটতে খাটতে শরীর যখন ভেঙে পড়ে, হাত-পা চলতে চায় না, তখনও ইচ্ছে করলে জোর করে মানুষ ফ্যাটিগ লেয়ার পেরিয়ে যেতে পারে। তখন দেখা যায় ক্লান্তি ঝেড়ে সে আবার দ্বিগুণ কাজ করছে।

তোর অডিট আমিই করে দিতে পারব।

দিয়ো। তুমি থাকতে আমি অন্যের কাছে খামোখা যাব কেন?

আগের রিটার্নের রেকর্ডটা দেখলাম। সব কিছুই রিটার্নে দেখাস কেন? অনেকগুলো এন্ট্রি না দেখালেও চলত।

আমি কিছুই লুকোই না।

প্রীতম মাথা নাড়ল, বুঝেছে। শতম আর পাঁচজনের মতো নয়। সামান্য একটু অহংকার বুকের পালে এসে লাগে।

শতম বিছানায় বসে বলে, রোজ রাতে খাওয়ার পর আমি মা ছবি মরম রূপম পুঁচকি মিলে আড্ডা দিই। তা জানো?

না তো! টের পাই না।

তোমাকে কেউ ভয়ে আড্ডায় ডাকে না।

প্রীতমের অবশ্য এই পারিবারিক আড্ডা ভাল লাগার কথা নয়। একা ঘরে বসে ভবানীপুরের বাসার স্মৃতি আঁকড়ে গুমরে গুমরে উঠতেই সে বোধহয় আনন্দ পায় বেশি। তবু ভদ্রতাবশে সে বলল, ভয়ের কী? ডাকলেই পারতিস!

ডাকব না। মাঝে মাঝে সবাই মিলে তোমার ঘরেই চলে আসব।

বেশ তো।

আজ গান গেয়েছিলে? ছবি বলছিল, দাদার গলায় এখনও কী সুর!

ধ্যেত!

বউদির একটা চিঠি এসেছে আজ। দেখেছ?

না তো, কেউ দেয়নি আমাকে।

তোমাকে লেখা নয়। বাবাকে লেখা।

কী লিখেছে?

বউদি নভেম্বরের আগে আসতে পারবে না। ডিসেম্বরও হতে পারে।

ও।

এ মাসেই আসার কথা ছিল।

আর কোনও খবর নেই, না?

না।

প্রীতম বসে ছিল। আস্তে আস্তে শুয়ে চোখ বুজল।

॥ বাহান্ন ॥

সকালে দক্ষিণের খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে নরম কাঁথা বিছিয়ে বসানো হয় প্রীতমকে। চনচনে শীত পড়ে গেছে এখানে। গলা পর্যন্ত শাল দিয়ে ঢাকা থাকে তার। পায়ে মোজা। সামনের এই বারান্দাটা চমৎকার । সামনে কাঁচা নর্দমা আর কিছু অসুন্দর কাঠের বাড়ি বাদ দিলে চেয়ে থাকতে খারাপ লাগে না। রোদ এসে কোমর পর্যন্ত তপ্ত করে রাখে। এদিকে পাহাড় দেখা যায় না বটে, কিন্তু অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। খুব নীল, খুব গভীর। শুধু একটাই অসুবিধে। বারান্দায় বসলেই রাস্তা দিয়ে যত চেনা মানুষ যায় সবাই দাঁড়িয়ে কুশল প্রশ্ন করে, অসুখের ইতিবৃত্ত জানতে চায়। সেটা ভারী অস্বস্তিকর।

কয়েক রাত ভাল ঘুম হচ্ছে না প্রীতমের। বিলু শিগগির আসবে না। লাবুকে অনেকদিন দেখতে পাবে না সে। এসব ভাবনা আছে। আর নতুন এক রহস্যময় প্রশ্ন তাকে বড় জ্বালাতন করে। বিলুকে এখনও সে এত গভীরভাবে ভালবাসে কী করে? কেন বাসে? বিলুকে ছেড়ে এসে কেন শিলিগুড়ি একদম ভাল লাগছে না তার?

সামনে একটু বাগান ছিল। শতম তার ব্যাবসার কাজে একগাদা পাথরকুচি এনে ফেলেছিল। এখন বাগানময় সেই পাথরকুচি ছড়িয়ে রয়েছে। গাছপালা নেই-ই বলতে গেলে। শুধু ফটকের দু'ধারে দাউ দাউ করে জ্বলছে লালচে বোগেনভেলিয়া। এই বাগান, বোগেনভেলিয়া, নর্দমা, রাস্তা, বাড়িঘর সবই প্রীতমের সত্তায় জড়িয়ে রয়েছে। তবু হায়, এই সকালের রোদে বারান্দায় বসে কোনও শৈশবস্মৃতিই আসে না তার মনে। বরং জায়গাটাকে অচেনা, অনভ্যস্ত লাগে কেবল।

বসে থাকতে থাকতে রোদে চোখ জ্বালা করে। চোখ বুজলে নিদ্রাহীন রাত্রির প্রতিশোধ নিতে অসময়ের আচমকা তন্দ্রা এসে চোখ এঁটে ধরে। প্রায় রোজই এইভাবে ঘুমিয়ে পড়ে প্রীতম। ভয়ে কেউ তাকে জাগায় না। অনেক বেলায় শতম যখন ফেরে তখন ডাকে।

সকাল বিকেল এক ডাক্তার এসে দেখে যায় তাকে। নতুন কোনও ডাক্তার নয়। বাবুপাড়ার সেই পুরনো বয়স্ক ডাক্তার সেনগুপ্ত। প্রায় ছেলেবেলা থেকেই এঁর চিকিৎসায় বড় হয়েছে তারা। লম্বা চওড়া ডিগ্রি নেই, সাদামাটা এম বি বি এস। কিন্তু ভাল বিচক্ষণ ডাক্তার।

কলকাতার ডাক্তার যে কেস-হিস্ট্রি লিখে দিয়েছিল সেইটে পড়ার পর প্রথম দিনই ডাক্তার সেনগুপ্ত বলেছিলেন, এ রোগ বাঁধালে কী করে?

উদ্বিগ্ন শতম জিজ্ঞেস করে, আপনি পারবেন তো?

কালীভক্ত ডাক্তার সেনগুপ্ত একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বললেন, সবই মায়ের ইচ্ছে। দেখি কী হয়!

তলে তলে শতম এক হোমিয়োপ্যাথের কাছ থেকেও ওষুধ আনে। মালিশের তেল তো আছেই।

শতম যে একাই চেষ্টা করছে তা নয়। মরম কোত্থেকে একটা মাদুলি এনে মা'র হাতে দিয়েছে। মা সেটা বেঁধে দিয়েছে ডান হাতে। বাবা বিদেশের বিভিন্ন হেলথ রিসার্চ সেন্টারে চিঠি লিখছে। সবাই তটস্থ, সক্রিয়।

শুধু প্রীতমেরই মাঝে মাঝে মনে হয়, এত চেষ্টা সব বৃথা। সে আর কোনওদিনই ভাল হবে না। শেষ ক'টা দিন যদি কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারত!

পুজো এল, চলে গেল। চারদিকে ঢাকের বাদ্যি, লাউড স্পিকার, আলো, ভিড় একেবারেই স্পর্শ করল না প্রীতমকে। এ বাড়ির কাউকেই করল না তেমনভাবে। এমনকী এবার কারও জন্য

জামাকাপড়ও কেনা হল না পুজোয়। পুজোর দিন ক'টা শুধু একটু ছটফট করল প্রীতম। বিলুর অফিস ছুটি ছিল, আসতে পারত। বিলুর বদলে অবশ্য তার চিঠি আসে। তাতে কী লেখে তার খোঁজ নেয় না প্রীতম। বাবাকে লেখে, বোনকে লেখে, ওরাই জবাব দিয়ে দেয়। আর ক্বচিৎ কখনও আসে দীপনাথের চিঠি। খুব ব্যস্ত। উত্তরবাংলায় ট্যুরে আসার কথা ছিল, কিন্তু তা কেবলই স্থগিত হয়ে যাচ্ছে। তার বদলে দীপনাথ বাংগালোর, রাঁচি, দিল্লি ঘুরে এল। বড্ড ব্যস্ত, সময় নেই। প্রীতম যেন ভাল থাকে। চিঠি পড়ে প্রীতম ম্লান হাসে। তারই কোনও ব্যস্ততা নেই।

তবে কাজ আছে। আজকাল শতম তাকে অনেক হিসেবপত্রের কাজ গছিয়েছে। টুকটুক করে সেগুলো করেও ফেলছে প্রীতম। খুব খারাপ লাগছে না। পেনসিল বা কলম ধরতে কিছুদিন আগেও আঙুলে কিছু জড়তা ছিল। ক্রমে সেটা কমে যাচ্ছে বা সয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ তো ঠিক কাজ নয়। কাজ-কাজ খেলা। শতম তাকে খেলনা দিয়ে মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

সবচেয়ে ছোট ভাই রূপম। বছর সতেরো-আঠারো বয়স হবে। ভাইদের মধ্যে বোধহয় সে-ই একটু বখা-গোছের ছেলে। অনেককাল খোঁজ রাখেনি প্রীতম, তাই কে কেমন হয়ে উঠেছে তা সঠিক জানে না। তবে বার কয়েক কথা বলার সময় ওর মুখে সিগারেটের গন্ধ পেয়েছে। প্রায়ই বেশ রাত করে ফেরে। মাঝে মাঝে যেসব ছেলে তাকে এসে ডেকে নিয়ে যায় তাদের চেহারা-ছবি অন্য ধরনের। বখা ইয়ারবাজ ছেলে বলে মনে হয়। তারা কেউ বাড়ির মধ্যে ঢোকে না কখনও। এসব মিলিয়ে দুইয়ে দুইয়ে চার করল প্রীতম।

তবে এতেও তো তার কিছু যায় আসে না। সংসারের সঙ্গে যত না জড়িয়ে থাকা যায় সেই চেষ্টায় সে চোখ কান বন্ধ করে থাকে। যা ইচ্ছে হোক।

বিজয়া-দশমীর রাতে বাড়িতে একটা চাপা গন্ডগোল শুনেছিল প্রীতম। কে কাকে বকছে। গলাটা মা'র। কাকে বকছে তা বোঝেনি প্রথমে। সম্ভবত তার ভয়েই এইসব গুজ-গুজ ফুস-ফুস চাপাচাপি।

ঘটনাটা আরও স্পষ্ট হল কালীপূজার দিন। চৌ-পহর রূপম বাড়িতে নেই। সন্ধেবেলা বাসাটা ফাঁকাই ছিল। বাবা গেছেন কালীবাড়িতে মাকে নিয়ে আরতি দেখতে। অন্য ভাইবোনরাও বেরিয়েছে একটু। প্রীতম নিজের ঘরে বসে খাতাপত্র খুলে হিসেব কষছিল। এমন সময় খুব জোরে কড়া নড়ে উঠল। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক জোরে ঘটাং ঘটাং করে সে কী আওয়াজ! রান্নার জন্য যে বয়স্কা বিধবাটিকে রাখা হয়েছে সে গিয়ে দরজা খুলে দিল। তারপর একটা চিৎকার।

প্রীতম হতচকিত হয়ে কিছুক্ষণ নড়তে পারেনি। বাড়িতে ডাকাত পড়ল নাকি? আজকাল শিলিগুড়িতে ভীষণ ডাকাতি হয়।

একটু বাদেই রূপম এসে তার ঘরের দরজায় দাঁড়াল, আকণ্ঠ মদ খেয়েছে, চোখে মোদো চাউনি। চৌকাঠে ভর রেখে দাঁড়িয়ে বলল, দাদা, আমার শরীরটা খারাপ, কিছু মনে কোরো না। মা কোথায় বলো তো!

প্রীতম সবই বুঝল। কিন্তু সেই চেঁচানিতে যে বুকে কাঁপুনি উঠেছিল, সেটা তখনও রয়েছে। আড়ষ্ট শরীরে ভাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, চেঁচিয়েছিল কে বল তো!

ও তো রুমকির মা। আমি ভয় দেখাচ্ছিলাম। এমনি মজা করে বাঘের ডাক ডেকে উঠেছিলাম, হঠাৎ প্রায়ই করি ওরকম, কিছু হয়নি। তুমি আজ কেমন আছ দাদা, আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে, এমন একটা জরদা পান খাওয়াল কিন্তু আমি জরদা খাই না তো, আজ খুব লেগে গেল, তুমি বরং শুয়ে পড়ো, আমি মাকে খুঁজে দেখি।

মা বাড়িতে নেই।

ও, তা আর কী করা যাবে, তা হলে আমি বরং খুঁজে দেখিগে কোথায় গেছে, কালীবাড়ি-টারি হবে— ঠিক খুঁজে পেয়ে যাব। মেজদা বাড়ি ফেরেনি তো দাদা?

না। এখনও ফেরেনি।

তবে আমি যাই।— বলে পিছন ফিরল রূপম।

ভাই মদ খেয়েছে, এ ঘটনা তেমন স্পর্শ করে না প্রীতমকে। শুধু সে মনে মনে বলে, কলকাতায় আমি এর চেয়ে ঢের ভাল ছিলাম। সেখানে এই সব ঘটত না।

প্রীতমের যে প্রখর অনুভূতি কলকাতায় সক্রিয় ছিল তা এখানে আসার পর ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রীতম আজকাল চারদিকটাকে ভাল করে টের পায় না, লক্ষ করে না, পাত্তাও দেয় না।

রূপম চলে গেলে সে আবার হিসেবে মন দিতে চেষ্টা করল।

রূপম সেই রাতে ফিরল না। খাওয়ার সময় প্রীতম খুব উদাস গলায় মাকে জানাল, রূপম সন্ধেবেলা এসেছিল। তোমাকে খুঁজছিল।

মা একটু কেমন ফ্যাকাসে গলায় বলে, তোর ঘরে ঢুকেছিল নাকি?

ঠিক ঢোকেনি। দরজা থেকে কথা বলে গেল।

রাঁধুনিও বলছিল, এসেছিল।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

না তো!

না হয়ে ভালই হয়েছে।

মা কোনও প্রশ্ন করল না। কাঁচুমাচু হয়ে চেয়ে রইল প্রীতমের দিকে। মা'র মুখের ভাব দেখেই প্রীতম বুঝতে পারে, রূপমের ব্যাপারটা মা খুব ভালই জানে। কিন্তু প্রীতম জেনে গেছে বলে ভয় পাচ্ছে।

প্রীতম অবশ্য কথা বাড়াল না। এ বাড়ির সঙ্গে অলক্ষে তার একটা দূরত্ব রচিত হয়ে গেছে কবে থেকে যেন। এতকাল টের পায়নি। এখানে আসার পর থেকে পাচ্ছে। সেই দূরত্বটাকে প্রীতম আর পেরোতে চায় না। লাভ কী? কারও কোনও পরিণতিকেই তো আর সে ঠেকাতে পারবে না।

শোওয়ার পর প্রীতম অনেক রাত অবধি বাড়িতে একটা চাপা উত্তেজিত কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবশেষে চোখ বুজল সে। বাড়ির লোক হয়তো সবকিছু তাকে বলতে চাইছে না। সে তো ঠিক পুরোপুরি এ বাড়ির মানুষ নয়। তার খানিকটা গ্রাস করেছে কলকাতা, খানিকটা বিলু আর লাবু। এ বাড়িতে তার অধিকার সদরের চৌকাঠ অবধি। আর ভিতরে সে নিজেও ঢুকতে চায় না।

খুব ভোরবেলা, তার ঘুম ভাঙারও আগে, শতম এসে চুপ করে শিয়রে বসে তার মাথা স্পর্শ করে অনেকক্ষণ জপ করে যায়। কোনওদিন তা টের পায় প্রীতম, কোনওদিন পায় না। কিন্তু কে বলবে কেন, ওই জপটুকু তার আজকাল বড় জরুরি বলে মনে হয়। শরীরের মধ্যে, মনের মধ্যে কিছু একটা হয়। অনেক স্নিগ্ধ বোধ করে সে। সতেজ লাগে। বেলা বাড়লে আস্তে আস্তে অবশ্য সেই ভাবটুকু কেটে যায়।

আজও জপ করছিল শতম। প্রীতমের মনে কিছু অস্বস্তি ছিল কাল রাত থেকে, তাই ঘুম গভীর হয়নি। ভোররাতে শতমের জপের মাঝখানে সে চোখ চাইল। মশারির মধ্যে বালিশের পাশে সংকীর্ণ জায়গায় খুব কষ্ট করে মস্ত শরীরটাকে কুঁচকে শতম বসে আছে। শিরদাঁড়া সোজা, চোখ বন্ধ, মুখ গম্ভীর। সন্তের মতো এক উদাসীনতা আজকাল ছেয়ে থাকে শতমের মুখে। খুব গভীর ও শক্তিমান বলে মনে হয়। বোধহয় সেইজন্যই আজকাল প্রীতম একটু একটু নির্ভর করে ওর ওপর। নির্ভরতা আসছে। যদি সেই পথ বেয়ে নির্ভয়তাও আসে কোনও দিন!

চোখ চেয়ে শতমকে দেখে আবার চোখ বুজে থাকে প্রীতম। সে নাস্তিক না ঈশ্বরবিশ্বাসী তা সে নিজেও জানে না। কোনওদিন ওসব নিয়ে মাথাই ঘামায়নি। ভবানীপুরের বাসায় কোনও ঠাকুর-দেবতার ছবি পর্যন্ত নেই। এমনকী বিলু ভগবান মানে কি না তাও সে স্পষ্ট জানে না। সোজা কথা, এতকাল ভগবান নিয়ে ভাবার অবকাশই হয়নি তার। কঠিন এই অসুখে পড়েও ঈশ্বরের শরণ

নেয়নি সে। কিন্তু তা নাস্তিক বলে নয়, নেহাত মনে পড়েনি বলে।

বিলু কি নাস্তিক? তার অসুখ হওয়ার পর বিলু একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিল মনে পড়ে। তা ছাড়া আর কিছু মনে নেই। তবু বিলুর নাস্তিক হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ অরুণ ঘোর নাস্তিক, আর বিলু বরাবর অরুণেরই অনুগামী।

বুকের মধ্যে একটু জ্বালা করে ওঠে প্রীতমের। পুরুষের স্বাভাবিক অধিকারবোধ আর ঈর্ষা তাকে এখনও ছাড়েনি। কিন্তু ছাড়া উচিত ছিল। সে তো বিলুকে বলেই এসেছে, বিলু যেন অরুণকে বিয়ে করে। সেটা অবশ্য হয়ে উঠবে না। অরুণ বোধহয় এতদিনে বিয়ে করে ফেলেছে। তা হলে বিলু কী করবে? চিরকাল অরুণের উপপত্নী হয়ে থেকে যাবে না তো! ভেবে গা-টা একটু রি রি করে ওঠে তার।

আবার চোখ খোলে প্রীতম। ভোরের আলো আর-একটু স্পষ্ট হয়েছে। ধ্যানস্থ শতমকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে এই আলোয়। চলছে জপ, শব্দের তরঙ্গ। এইসব জিনিসের সঙ্গে কোনও যোগ নেই তার। তবু মাথা স্থির রেখে শুয়ে থাকে সে। ভাল কিছু, সুন্দর কিছু ভাববার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। একমাত্র লাবুর মুখখানা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। এই একমাত্র জন যার সঙ্গে তার সম্পর্ক শর্তহীন, জটিলতাহীন। লাবুর মুখখানাই মনে মনে আঁকড়ে থাকে সে।

জপ শেষ করে নিঃশব্দে চলে গেল শতম। আবার এল চায়ের কাপ হাতে অনেকক্ষণ বাদে। বলল, বেড়াতে যাবে দাদা?

আমি? আমি কী করে যাব?

খুব পারবে। আমরা তো সঙ্গেই থাকব।

কোথায়?

তুমি তো পাহাড় ভালবাসো না তেমন। পাহাড়ে এখন শীতও খুব। বীরপাড়ার কাছে আমার বন্ধু প্রত্যুষের এক চা-বাগান আছে। ভাল বাংলো। ক'দিন গিয়ে থেকে আসবে? সবাই যাব।

প্রীতম মাথা নাড়ে, না রে। নড়াচড়া ভাল লাগে না।

কিছুদিন একটু অন্য পরিবেশে মনটা অন্যরকম লাগত।

মন! না, কোথাও মন ভাল লাগে না।

শতম একটু গম্ভীর হয়ে বলে, এই শিলিগুড়িতেই তোমার জন্ম। এখানেই বড় হয়েছ। এখানে তোমার কত চেনা মানুষ, বন্ধুবান্ধব। এই জায়গা তোমার ভাল লাগে না কেন বলো তো?

বন্ধুবান্ধব আর চেনা লোককে তার আসার খবর দিতে বারণ করে দিয়েছে প্রীতম। তাই তেমন কেউ আসে না। কিন্তু শিলিগুড়ি কেন ভাল লাগে না প্রীতম বলবে কী করে? সে মাথা নেড়ে বলল, ভাল লাগবে না কেন? তবে সেই শিলিগুড়ি তো আর নেই।

সে তো ঠিকই। বউদি বা লাবুর জন্য মন কেমন করে বলে এমন মনমরা হয়ে থাকো না তো?

না, না। ওসব নয়। এখানেও তো তোরা আছিস।

শতম একটু অহংকারের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, আমরা আছি। যারা বরাবর তোমার পাশে থাকব। তুমি অত ভাবো কেন?

না, ভাবি না।

শোনো, রূপমটা বি কম পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়ে বদ বন্ধুদের সঙ্গে মিশছে। মেরে পাট পাট করেছি কয়েকবার। এখনও ভূত ছাড়েনি। আমি বাইরে বাইরে কাজে থাকি, নজর দিতে পারি না। ওকে তুমি একটু দেখো না!

প্রীতম শঙ্কিত হয়ে বলে, আমি! আমি কী দেখব?

তুমি ইনভলভড হতে চাইছ না। কেন? আমরা তোমার কেউ নই?

প্রীতম একটু লজ্জিত হয়। বলে, আমি ঠিক শাসন-টাসন করতে পারি না, তুই তো জানিস।

শাসন বলতে যদি বকাঝকা আর মারধর হয় তবে বলি, ওতে রূপুর কিছু হবে না। রাস্তায় ঘাটে ও বিস্তর মারপিট করে। মারে, মার খায়ও। ওসবে ওর ঘাঁটা পড়ে গেছে। আর সে রকম শাসনের জন্য তোমাকে দরকার কী? আমি আর বাবা ওকে কম আসুরিক শাসন তো করিনি। এখন ওকে অন্যরকমভাবে ট্রিট করতে হবে। কিন্তু রকমটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি ওর বড়দা, একটু দূরের লোক। কলকাতায় থাকো বলে ও তোমাকে খুব ভাল করে জরিপ করতে পারেনি এখনও। একটু সমীহও করে বোধহয়। দায়িত্ব নিলে হয়তো তুমি পারবে।

কথাগুলোর যৌক্তিকতা মনে মনে স্বীকার করে প্রীতম। কিন্তু ভিতরে কোনও আগ্রহ জাগে না তার। ছোট ভাইয়ের জন্য যেটুকু উদ্বেগ থাকা উচিত ছিল তাও তার নেই। উপরন্তু সে একটু ভয় পায়, কুঁকড়ে যায় মনে মনে। তবু বলে, ঠিক আছে। ওকে মাঝে মাঝে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।

মাঝে মাঝে নয়। আমি ভাবছি তোমার ঘরেই ওকে স্থায়ীভাবে থাকতে বলব। ও তোমার দেখাশোনাও করতে পারবে। অবশ্য যদি করে।

প্রস্তাবটা পছন্দ না হলেও প্রীতম বলল, আচ্ছা।

রূপমের টিকির নাগাল পেতে অবশ্য আরও দিন তিন-চার পেরিয়ে গেল। তারপর একদিন সন্ধেবেলা একটু কুণ্ঠিত পায়ে সে এসে ঘরে ঢুকল।

দাদা, ডেকেছ?

প্রীতম চোখ তুলে ভাইটিকে খুব মন দিয়ে দেখে। সবচেয়ে ছোট। ছেলেবেলায় এ ভাইটাকে খুব বেশি ভালবাসত প্রীতম। তারপর স্বার্থপরের মতো সেইসব ভালবাসা প্রত্যাহার করে নিয়েছে কবে।

রূপমের চেহারা খুব মজবুত নয়। অন্য ভাইদের চেয়ে বরং প্রীতমের সঙ্গেই তার চেহারার মিল বেশি। লম্বাটে গড়ন, রোগা। তবে প্রীতমের মুখে যে লাবণ্য ছিল তা এর নেই। কর্কশ শ্রীহীন মুখ। বোঝা যায়, শরীরের ওপর নেশার অত্যাচার বড় কম নয়। চোখে একটা তীব্রতা আছে, যা সব সময় কু-চিন্তা করলে হয়।

তাড়াতাড়ি প্রীতম লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কী বলা উচিত, কী বললে ভাল হয় তা ঠিক করতে পারল না সে। একটু বিভ্রান্ত বোধ করে এবং একটু বিরক্ত হয়েও সে বলল, একটু বাদে আসিস। মিনিট পনেরো পরে।

আচ্ছা।— বলে চলে গেল রূপু।

ততক্ষণ একটু দম ধরে থাকে প্রীতম। খুব বেশি আদর দেখালেও সন্দেহ করবে, খুব বেশি কঠোর হলে ছিটকে যাবে। তার চেয়ে সহজ, অকপট ব্যবহার ভাল। মনে মনে তৈরি হয়ে নিল প্রীতম।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই আবার এল রূপু।

প্রীতম খুব সরলভাবে বলল, তুই তো অ্যাকাউন্টেন্সি একটু বুঝিস। আমাকে একটু হেলপ করবি তো!

রূপু একটু হাসল। বলল, অ্যাকাউটেন্সি তো শিখিনি।

শিখতে সময় লাগে না। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিস শুনলাম।

কী হবে পড়ে? চাকরি পাব?

তা অবশ্য ঠিক।

তোমার মতো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হব তেমন মাথা আমার নেই।

তা হলে কী করতে চাস?

আমার আর্ট পড়বার ইচ্ছে ছিল। বাবা, মেজদা বারণ করল। বলল, বি কম করে কস্টিং পড়। আমার মাথায় কমার্স ঢোকে না। অবশ্য আর্টস পড়েও কিছু হত না।

আমার পাশে এসে বোস।

রূপু বিছানায় এসে বসে। পরনে প্যান্ট আর খয়েরি রঙের একটা হাতকাটা সোয়েটার। শিলিগুড়ির এই ভয়ংকর শীতের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ পোশাক।

এই পোশাকে বেরোচ্ছিলি? এখানে যা শীত!

আমার শীত লাগে না।

আমার একটা ভাল পুলওভার আছে। সুটকেসটা খোল গিয়ে, ওপরেই আছে। আমি তো পরি না, তুই পর।

থাক না। তোমার লাগবে।

লাগবে না। যা, বের করে গায়ে দে।

রূপু উঠে গিয়ে পুলওভারটা বের করে। ক্রিম রঙের নরম উলে বোনা। নিউ মার্কেট থেকে বছর দুই আগে কেনা। খুব বেশি গায়ে দেওয়ার সময় পায়নি প্রীতম।

গায়ে দিয়ে রূপু বলে, একটু লুজ হচ্ছে।

তখন আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল। তবু আমারও একটু বড় বড় হত। ভেবেছিলাম, মোটা তো হবই, বয়স হলে সবাই হয়। তাই একটু বড়ই কিনে রাখি।

এ কথায় হাসল রূপু। বলল, আমার মোটা হতে দেরি আছে। চাকরি না পেলে—

দূর বোকা! মোটা হওয়া কি ভাল! রোগা লোকেরাই চটপটে হয়। এটা কিন্তু তোকে মানিয়েছে।

আরম্ভটা এইভাবে মন্দ হল না। ঘুষ দেওয়ায় এবং নরম সুরে কথা বলায় রূপম বোধহয় তাকে অপছন্দ করল না তেমন। জানালার ধারে একটা দড়ির খাটিয়ায় বিছানা পেতে শুতেও লাগল রোজ রাতে। প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, দাদা তোমার কিছু লাগবে? কিছু করব তোমার জন্য?

দামি পুলওভারের ঋণ বোধহয় ভুলতে পরছে না সে। প্রীতম বলে, না, কী আর করবি? শুধু এই হিসেবপত্রের কাজে আমাকে একটু হেলপ করিস।

নভেম্বরের শেষ দিকে জমজমাট শীতের এক ভোরবেলা হঠাৎ বাড়িতে খুব হইচই। একটা চেনা গলার স্বর অনেক কুয়াশা আর দূরত্ব অতিক্রম করে এসে হানা দিল। কাঁপা বুকে উঠে বসেছিল প্রীতম।

দরজা ঠেলে ঘরে এল দীপনাথ।

বাঃ, তুই তো দারুণ ইমপ্রুভ করেছিস!— বলে ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার বাইরে চেয়ে ডাকল, বিলু! বিলু! দেখে যা তোর কর্তার চেহারা। চিনতে পারবি না।

॥ তিপান্ন ॥

বিলু কোনওদিনই খুব সুন্দরী ছিল না, তবে সাদামাটা চেহারার মধ্যেও কারও কারও যেমন এক-একটা অদ্ভুত আকর্ষণ থাকে, বিলুরও তাই। হয়তো সেই আকর্ষণটা নেহাতই একটা গজদন্তে বা চোখের পাতার একটা কালো আঁচিলের মতো তুচ্ছ জিনিসকে নিয়ে তৈরি হয়। বিলুরও সেইরকম একটা কিছু আছে, কিন্তু সেটা যে কী তা আজও স্পষ্ট করে ধরতে পারেনি প্রীতম।

বিলু যখন ঘরে এল তখন সেই পুরনো আকর্ষণটা আজ বঁড়শির মতো কণ্ঠায় আটকে টানছিল তাকে। টানছিল বিলুর দিকেই। কয়েক পলক বিলুর দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে নিল প্রীতম। কলকে ফুলের গাছটার দিকে চেয়ে রইল। বুকে একটু অস্বস্তি।

ঘরে ঢুকেই বিলু বলল, মেয়ে লজ্জায় আসতে চাইছে না তোমার কাছে। তুমি ডাকো।

থাক, লজ্জা ভাঙলে আসবে।

বিলু বিছানায় এসে বসল। দীপনাথ সামনেই চেয়ারে বসা। প্রীতম চোখ বুজে বলল, ছুটি পেলে তা হলে?

বিলুকেই বলা, একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বিলু বলে, অনেক কষ্টে, অরুণের বাবা নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে গ্রান্ট করিয়েছেন। চাকরি তো পাকা নয়, বছরও পোরেনি, এখনই ছুটি কি পাওনা হয়, বলো?

ক'দিনের?

আপাতত দশ দিন।

অরুণের বিয়েটা? হয়ে গেছে নাকি?

এ প্রশ্নটার জবাব দিতে কয়েক সেকেন্ড বেশি সময় নিল বিলু। গলার স্বরও এক পরদা নেমে একটু মিয়োনো শোনাল। বলল, ঠিক হয়ে আছে। মাঝখানে অরুণ দু'মাসের জন্য বাইরে গিয়েছিল হঠাৎ, তাই ক'দিন পিছোতে হয়েছে।

প্রীতম নীরবে শুনল, কিছু বলল না। অরুণের বিয়ের ব্যাপারটা তার কাছে আজও গুরুতর। অরুণ মাঝে মাঝে বিদেশে যায়। বিদেশে যাওয়ার নানা সুযোগও আছে তার। কিন্তু তাই বলে বিয়ে পিছোবে এমন কোনও কথা নেই। প্রীতম একটু বড় করে শ্বাস ফেলে বলে, যাও, তোমরা একটু জিরিয়ে-টিরিয়ে নাও। এখানে খুব ঠান্ডা। লাবু সম্পর্কে সাবধান।

যাই। সারা রাত ভাল ঘুম হয়নি।— বলে বিলু উঠে গেল। বোধহয় পালালই।

বিলু চলে গেলে প্রীতম দীপনাথের দিকে তাকায়। দীপনাথ ছোট একটা নোটবইতে ডটপেন দিয়ে কী লিখছে খুব মন দিয়ে।

কী করছ ওটা?

চোখ না তুলেই দীপনাথ বিরক্তির শব্দ করে বলে, আর বলিস না। থাকব মোটে দু'দিন, চোদ্দোটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট। দার্জিলিং, কালিম্পং, গ্যাংটক, জলপাইগুড়ি দৌড়াদৌড়ি।

বলতে বলতেই দীপনাথ ওঠে।

ও কী? চললে কোথায়?

পিসির বাড়িতে একবার দেখা করে বেলা দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই একটা জিপ নিয়ে দার্জিলিংটা আজ সেরে আসি।

আমি ভাবছিলাম, তুমি এবার আমাদের বাড়িতে থাকবে।

থাকার উপায় নেই। দার্জিলিং থেকেই আজ সোজা চলে যাব জলপাইগুড়ি। ওখান থেকেই কাল সকালে চলে যাব গ্যাংটক। পরশু কালিম্পং হয়ে ফিরব। পরদিনের ফ্লাইটে কলকাতা। তোর তো দুঃখের আর কিছু নেই রে, প্রীতম, বিলু তো এসেছে।

আমার দুঃখ কি শুধু বিলুর জন্য? তুমি যে পর হয়ে গেলে, বড় বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে গেলে, স্কেয়ারস হয়ে গেলে!

আমি? দূর বোকা, কোম্পানি চাকরের মতো খাটায়। আমিও খাটি। তোর চিকিৎসা কে করছে রে প্রীতম?

আমাদের সেই পুরনো ডাক্তার। তা ছাড়া শতম হোমিয়োপ্যাথিও দিচ্ছে কোত্থেকে এনে।

ভ্রু কুঁচকে দীপনাথ কী একটু ভেবে বলল, নট ব্যাড, নট অ্যাট অল ব্যাড।

তুমি কি আমাকে ভাল দেখছ, সেজদা?

অনেক ভাল। এত ভাল তোকে বহুকাল দেখিনি।

নিভে যাওয়ার আগে এটা শেষবারের জ্বলে ওঠা নয় তো?

তুই সহজে নিভে যাবি বলে মনে হচ্ছে না।

ঠিক বলছ?

ঠিকই বলছি।

যদি বাঁচি মেজদা, তবে কী করব জানো? অনেক অনেক দূর পর্যন্ত শুধু হাঁটব। হেঁটে হেঁটে বহুদূর চলে যাব।

দীপনাথ ঘড়ি দেখল। বাস্তবিকই সময় নেই।

উঠি রে।

দীপনাথ অবশ্য প্রীতমের বাড়ি থেকে সহজে ছাড়া পেল না। ঘর থেকে বেরোতেই প্রীতমের বোন আর শতম এসে ধরে নিয়ে গেল ভিতরবাড়িতে। এত সকালে দীপনাথ কিছু খেতে পারে না। তবু লুচি, আলুভাজা, সন্দেশ আর চা অনিচ্ছের সঙ্গে কোঁত কোঁত করে গিলতে হল খানিক।

দশটার মধ্যে পিসির বাড়ির সামনে জিপ হাজির থাকবে। মোটোয়ানিকে খবর দেওয়া আছে। দেরি করা চলে না।

কলকাতা যাওয়ার আগে দেখা করে যেয়ো সেজদা।— বিলু রওনা হওয়ার মুখে বলল।

যাব।

কলকাতায় গিয়ে বাসাটায় একবার হানা দিয়ো। বিন্দু একা রয়েছে। অচলাকে তো সঙ্গে নিয়ে এলাম।

অন্যমনে একটা হুঁ দিয়ে দীপনাথ গিয়ে রিকশায় উঠে পড়ল।

বেলা সাড়ে দশটায় যখন উত্তরমুখো পাহাড়ের দিকে জিপ ছাড়ল তখনই সত্যিকারের একা হতে পারল দীপনাথ। সঙ্গে মোটোয়ানিরও আসার কথা ছিল। এভারেস্ট হোটেলে লাঞ্চ দিচ্ছে শিবরামন। কিন্তু মোটোয়ানিরও কাজ পড়ে যাওয়ায় এল না। ফলে জিপটার ড্রাইভার ছাড়া শুধু দীপনাথ। সৌভাগ্যই বলতে হবে।

গাড়িটা অবশ্য ঠিক জিপ নয়। জোংগা ডিজেল। তার রাখঢাক আছে। কোলা জিপ হলে তিনধারিয়ায় পৌঁছোতে পৌঁছোতেই শীতে নাক-কান অবশ হয়ে যেত। এই ঢাকাওলা জোংগাতেও সেটা কম হচ্ছিল না। কিন্তু অবিরল পাহাড়ের মধ্যে যেতে যেতে সব অনুভূতি হারিয়ে যাচ্ছিল দীপনাথের। সে একদিন একা মহাপ্রস্থানে বেরিয়ে পড়বে। একা নির্জন সাদা এক মহাপর্বত অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। সেই সাদা মস্ত অপার্থিব পাহাড়ের কথা ভাবলে নিজের তুচ্ছতা ব্যর্থতা কামনা-বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বড় আবছা হয়ে আসে। এক নির্জনতা ঘিরে ধরে তাকে।

বার বার কান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে উচ্চতায় ওঠার জন্য। ঢোক গিলে কানের ছিপি খুলছে সে। ঠান্ডায় ক্রমে সিঁটিয়ে আসছে হাত-পা, চোখে জল আসছে, কান কনকন করছে ব্যথায়। তবু যাত্রাটি খুব উপভোগ করে দীপনাথ। রাস্তাঘাট ফাঁকা, নির্জন। এই শীতে ট্যুরিস্ট নেই বলে রাস্তায় গাড়ি খুব কম। মাঝে মাঝে একটু মেঘলা করে আসে। কুয়াশার মতো মেঘ নেমে আসে রাস্তায়। বাক্যহীন নেপালি ড্রাইভারটি সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে আছে জোংগা গাড়িটির সঙ্গে। অজস্র ঘুণচক্কর পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে গাড়ি। আরও নির্জনতা, আরও শীত, মহান পর্বতের আরও কাছাকাছি হওয়া। তিনধারিয়ায় একবার, কার্শিয়াঙে আর-একবার চা খেয়ে নিল দীপনাথ আর তার নেপালি ড্রাইভার। দীপনাথ স্বচ্ছন্দে নেপালি ভাষা বলতে পারে। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে ড্রাইভারটার সঙ্গে ভাব জমাল না। এই পথটুকু সে নীরব থাকতে চায়।

লাবুর সঙ্গে ভাব জমতে দুপুর হল। ভাব জমার পর অবশ্য লাবুকে আর থামায় কে! কথা আর শেষ হয় না। 'জানো বাবা!' বলে বারবার প্রীতমের থুতনি ধরে টেনে নিজের দিকে মুখখানা ফিরিয়ে নেয় আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব গল্প বলে যেতে থাকে।

তুমি আমাকে ভুলে যাওনি তো, লাবু?

তোমাকে? না তো। আমি তো সব সময়ে বাবা-বাবা করি, তাই মা বলে— যাঃ, তোকে বাবার কাছে শিলিগুড়িতেই রেখে আসব। আমি বাপ-সোহাগি তো।

তাই নাকি? তবে থাকবে আমার কাছে?

তোমাকে তো সবচেয়ে ভালবাসি বাবা, কিন্তু মাকে ছেড়ে যে থাকতে পারি না।

মা তো অফিসে যায়, তোমার একা লাগে না?

না তো! অচলা মাসি থাকে তো।

আর কে থাকে?

আর কেউ না।

অরুণ মামা মাঝে মাঝে আসে না?

রোজ আসে। আমরা অরুণ মামার গাড়িতে কত বেড়াই। রবিবারে জু, আইসক্রিম, লাঞ্চ।

লাঞ্চ! কোথায় লাঞ্চ করো?

পার্ক স্ট্রিটে।

তোমার অরুণ মামা তো খুব সুন্দর, না লাবু? আমার চেয়ে অনেক সুন্দর।

তুমি একটু রোগা। কিন্তু তুমি খুব সুন্দর।

আর অরুণ মামা?

অরুণ মামাও সুন্দর। আমাকেও সবাই খুব সুন্দর বলে, বাবা। আমি সুন্দর তো! না বাবা!

তুমি? তুমি ভীষণ সুন্দর। এ বাড়িটা তোমার কেমন লাগছে, লাবু?

খুব ভাল। অনেক বড় তো বাড়িটা! কত গাছ!

পাহাড় দেখেছ?

হ্যাঁ, ছোটকাকু ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখাল। আমাদের দার্জিলিং নিয়ে যাবে বড়কাকু, জানো বাবা?

দূরে একটা সাদা পাহাড় দেখেছ?

ওটা তো কাঞ্চনজঙ্ঘা। ছোটকাকু কী বলে জানো?

কী বলে?

বলে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা নাকি একটা মস্ত বড় আইসক্রিম। সত্যি, বাবা?

আইসক্রিম? না, ঠিক তা নয়। দুপুরে তুমি একটু ঘুমোবে না লাবু?

আজ আমি ঘুমোব না। বড়কাকু একটু বাদে আমাকে মোটরসাইকেলে চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

ও বাবা! যদি পড়ে-টড়ে যাও?

যাঃ! আমি তো সকালবেলায় বড়কাকুর সঙ্গে কতটা ঘুরে এলাম। তিলক ময়দান, নিউ মার্কেট, সেভক মোড়, পুরনো স্টেশন। শিলিগুড়ি খুব সুন্দর, না বাবা?

তোমার ভাল লাগলেই ভাল।

তোমার ভাল লাগে না?

কী করে লাগবে? এখানে যে তুমি থাকো না। একা কি ভাল লাগে?

আমি একটু বড় হলেই এখানে চলে আসব।

তখন মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

পারব। বিয়ে যখন হবে তখনও তো মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতেই হবে। বলো বাবা!

তা তো ঠিকই।

ছোটকাকুটা না ভীষণ বাজে কথা বলে।

কী বলে?

বলে এখানে নাকি কলকাতার চেয়েও উঁচু মনুমেন্ট আছে। আমি বললাম, কোথায় দেখাও। তখন না পাহাড়টা দেখিয়ে বলল, ওই তো আমাদের মনুমেন্ট, আছে তোদের কলকাতায় ওরকম মনুমেন্ট?

বটে!

হ্যাঁ, আর বলে কী জলদাপাড়ায় নাকি কলকাতার চেয়েও অনেক বড় জু আছে! সত্যি বাবা?

জলদাপাড়া একটা জঙ্গল।

তা হলে তো চিড়িয়াখানা হল না, বলো বাবা!

তা বটে।

শোনো না বাবা, আর বলে, কলকাতাটা পচা জায়গা। এখানে নাকি একটা দুধের পুকুর আছে, সেখানে ডুব দিলে সব অসুখ সেরে যায়। তোমাকে নাকি সেখানে নিয়ে গিয়ে চান করাবে. আর তুমি ভাল হয়ে যাবে। সত্যি, বাবা?

কে জানে!

চলো না বাবা, দুধের পুকুরটায় চান করে আসবে।

কথা বলতে বলতে একসময়ে লাবু পাশটিতে শুয়ে কখন বেখেয়ালে ঘুমিয়ে পড়ল। লেপটা ওর গায়ে ভাল করে টেনে দিল প্রীতম।

বাড়িটা নির্জন, চুপচাপ। শতম, মরম বা রূপম নিশ্চয়ই বাড়িতে নেই। বাবা অফিসে। মা বোন সবাই ঘুমোচ্ছে এই শীতের দুপুরে। এ সময়ে বিলু একবার আসবে কি?

প্রীতম কাগজপত্র টেনে নিয়ে হিসেব মেলাতে বসল। চোখ কান আনমনে প্রতীক্ষা করছিল বিলুর জন্য।

বিলু অবশ্য এল না। দোষ নেই, ট্রেনে ওর ভাল ঘুম হয়নি। দুপুরে ঘুমোচ্ছে একটু। বিলু এল বিকেল গড়িয়ে। ঘুমিয়ে চোখ-মুখ ফুলিয়েছে।

এসেই বলল, কী ঠান্ডা! আমার বোধহয় সর্দি লেগে গেল।

প্রীতম কোনও জবাব দিল না। তবে কাগজ-কলম সরিয়ে রেখে বালিশে হেলান দিয়ে বসল।

বিলু চেয়ার টেনে আনল কাছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কখন এসে তোমার কাছে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখো!

কলকাতায় কি লাবু আমার কথা বলে?

সারাক্ষণ।

আমাকে মনে রেখেছে তা হলে?

সে তো রেখেছেই, অন্যদেরও ভুলতে দিচ্ছে না।

ভুলতে কেউ চাইছে কি?

গম্ভীর হয়ে বিলু বলল, কে জানে বাবা!

প্রীতম একটু হাসল। বলল, অচলা একবারও এ ঘরে এল না তো!

বিলু তেমনি থমথমে মুখে বলে, এখানে তো তোমার জন্য ওর কিছু করার নেই। তুমি ডাকলে আসবে।

বিলুর অভিমান-টভিমান নেই। তাই হঠাৎ এই গাম্ভীর্যটা কেন তা প্রীতম ভেবে দেখছিল। গত কয়েক মাসে বিলুর স্বভাবের খুঁটিনাটি দিক অনেকটাই ভুলে গেছে সে। এ ক'দিন চোখের আড়ালের বিলুকে কল্পনায় যেরকম ভাবত, আসল বিলু তার চেয়ে অনেক বেশি বর্ণহীন, অনুত্তেজক।

প্রীতম বলল, চেয়ারটা টেনে বসো।

বসবার সময় নেই। পাড়াসুদ্ধ মেয়ে-বউ ঝেঁটিয়ে এসেছে দেখা করতে। সামনে না গেলে কী ভাববে! আমি বরং অচলাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে।

বিলু চলে গেলে প্রীতম ঘুমন্ত লাবুর গায়ে হাত রেখে গভীর চোখে মেয়ের টুলটুলে মুখখানা দেখল। শীতে ঠোঁট দু'খানা শুকিয়ে রয়েছে। গাল ফেটেছে। গা থেকে শিশু-শরীরের মাতলা গন্ধ আসছে। পৃথিবীর কোনও সুগন্ধই এর কাছে দাঁড়াতে পারবে না। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে প্রীতম আপনমনে ভাবল, তুমি আমার বড় আপন লাবু, বড় আপন।

কেমন আছেন?

আচমকা অচলার গলার স্বরে একটু চমকে গিয়েছিল প্রীতম। মুখ তুলে হাসল, ভাল। তুমি?

আপনি কিন্তু সত্যিই ভাল আছেন। চেহারা ফিরেছে।

মোটা হয়েছি বলছ?

না, তা নয়। তবে ফ্রেশ দেখাচ্ছে।

হয়তো চেঞ্জের ফল।

অচলা মাথা নেড়ে বলে, শুধু চেঞ্জ নয়।

বোসো।

বিছানায় তো বসবে না অচলা, চেয়ারেও নয়। তাই একটু ইতস্তত করে বিছানার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে লাবুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কলকাতায় আমরা রোজ রাতে আপনাকে নিয়ে গল্প করি।

আমাকে ভুলে যাওনি তো?

কী যে বলেন! আপনাকে ভোলা কি অত সহজ?

বিলু কি আমার কথা খুব বলে?

আমরা সবাই বলি।

রাতটা জলপাইগুড়িতেই কাটানোর কথা ছিল। কিন্তু রাত দশটার মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল. মোটোয়ানির জোংগাটা তখনও মজুদ রয়েছে। দীপনাথ তাই ভাবল, থেকে কী হবে!

জলপাইগুড়ির ঘোষমশাই অবশ্য বললেন, আরে আপনার জন্য গেস্টরুমে বিছানা করিয়ে রেখেছি, খামোখা এই ঠান্ডায় যাবেন কেন?

কিছু হবে না। শিলিগুড়িতে আমার রিলেটিভরা রয়েছে। তাদের তো সময় দিতে পারছি না। তাই রাতটা গিয়ে থাকি।

অনিচ্ছের সঙ্গে ঘোষ রাজি হলেন। অবশ্য বললেন. রাস্তা খুব নিরাপদ নয় কিন্তু। নিউ জলপাইগুড়ির তিন বাত্তির মোড়টা ডেঞ্জারাস।

দেশের সব জায়গাই ডেঞ্জারাস।

তা অবশ্য বটে।

কথা না বাড়িয়ে জোংগায় চেপে বসল দীপনাথ। নেপালি ড্রাইভার বোধহয় ঘরে ফেরার তাড়ায় প্রায় উড়িয়ে নিয়ে এল তাকে।

দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ির দু'টি অ্যাপয়েন্টমেন্টই খুব গুরুতর ছিল। বোস বলে দিয়েছে, সম্ভব হলে রাত্রেই আমাকে ট্রাংক কল করে জানাবেন কী হল।

জলপাইগুড়ি থেকে টেলিফোন করার সময় হয়নি। রাত পৌনে এগারোটায় দীপনাথ শিলিগুড়ি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে হানা দেয়। এখানে পুরনো বন্ধুরা রয়েছে। মোটামুটি সবাই চেনা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোসের বাড়ির লাইন পেয়ে গেল।

বোস সাহেব?

না. উনি এখনও ফেরেননি। আপনি কে বলছেন?

দীপনাথ হাসল। মণিদীপা তার গলা ভালই চেনে। তবে হয়তো বহু দূরের কল হওয়ায় গলাটা অন্যরকম শোনাচ্ছে।

সে একটু চেঁচিয়ে বলল, আমি দীপনাথ চ্যাটার্জি।

যাঃ! গলাটা অন্যরকম লাগছে কেন?

লাগলে কী করব? আমি তো নিজের গলাতেই কথা বলছি।

ঠান্ডা লাগিয়েছেন নাকি?

না। পাগলদের সর্দি হয় না, জানেন তো!

হয় না? যাঃ বাজে কথা। আমি অনেক পাগল দেখেছি, যাদের সর্দি হয়েছে।

তারা জেনুইন পাগল নয়।

আপনিও জেনুইন পাগল নন। সত্যিই আপনি তো! না কি অন্য কেউ নাম ভাঁড়িয়ে ইয়ারকি করছে।

আমিই।

প্রমাণ দিন।

সেই যে আপনার জন্য রতনপুরে মৌমাছির কামড় খেয়েছিল।

ওঃ মাই গড!

তার মানে?

আমিও এইমাত্র ওই ঘটনাটাই ভাবছিলাম।

তা হলে আমি জেনুইন দীপনাথ তো?

ভীষণ জেনুইন।

বোস সাহেব এলে একটা খবর দিতে পারবেন ওঁকে?

না। আমাদের নন-কমিউনিকেশন চলছে কাল থেকে!

হঠাৎ আবার কী হল?

হচ্ছে তো রোজই।

তা হলে খবরটা দেওয়ার কী হবে?

খুব জরুরি?

জরুরি না হলে রাত এগারোটায় কেউ ট্রাংক কল করে?

তা হলে মেসেজটা বলুন, আমি লিখে বেয়ারার হাত দিয়ে ওর ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

খবরটা যেন উনি আজই পান।

পাবেন। মণিদীপা কাজের ভার নিলে করে।

আপনি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছেন কেন?

মণিদীপার গা জ্বালানো হাসির শব্দটা এল। বলল, বিরহে। আপনি নর্থ বেঙ্গলে যাওয়ার পর থেকেই এই দশা।

আমি নর্থ বেঙ্গলে এসেছি তা কি আপনি জানতেন?

এমনিতে জানতাম না। তবে হৃদয়ে হৃদয়ে কি টেলিপ্যাথি হয় না?

যা একখানা ফাজিল তৈরি হয়েছেন-না! এবার লিখুন তো! হাতের কাছে কাগজ-কলম আছে?

আছে। বাঁদি তৈরি। বলুন।

ছি ছি। আচ্ছা লিখুন।

॥ চুয়ান্ন ॥

টেলিফোন রেখে মণিদীপা মেসেজটার দিকে তাকাল। কিছুই তেমন বুঝল না। কতকগুলো ব্যবসায়িক সংকেতবার্তা মাত্র। তবু আনমনে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাগজটা সে ঠিক দেখছে না, অন্য কথা ভাবছে। বেশ কিছুকাল আগে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে ব্যাগ থেকে টাকা বের কবতে গিয়ে অনেক টাকা ছড়িয়ে পড়েছিল মেঝেয়। দীপনাথ সেগুলো নিচু হয়ে কুড়িয়ে দিচ্ছে। মাথা নিচু

লোকটাকে দেখে সেদিন তার মনে হয়েছিল, লোকটার ব্যাকবোন নেই। আজও তাই মনে হয়। লোকটা পাহাড় ভালবাসে। একদিন বলেছিল খুব উঁচু একটা পাহাড়ে একদিন একা গিয়ে উঠবে। আর ফিরবে না। দীপনাথ এখন সেইসব উঁচু পাহাড়ের খুব কাছাকাছি। যদি না ফেরে?

বেয়ারাকে ডেকে মেসেজটা বোসের শোওয়ার ঘরে পাঠিয়ে দেয় মণিদীপা। বলে দেয়, সাহেব এলে মেসেজটার কথা বোলো।

নিষ্কর্মা বসে থাকতে বা কিছু নিয়ে ভাবতে মণিদীপা ভালবাসে না। বড্ড একঘেয়ে যাচ্ছে ক'দিন। তেলের দাম আর এক দফা বাড়ল। ফলে গাড়ি নিয়ে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছে বোস। গাড়ির চাবি নিজের স্টিলের আলমারিতে রেখেছে। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখছে না। এসব হচ্ছে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। মণিদীপা মার্কেটিং-এ যায় না বহুদিন। গাড়ি চালিয়ে বেড়ায় না প্রায় মাস দুই। ড্রাইভিং ভুলেই গেল বুঝি। কিন্তু এ নিয়ে বোসের সঙ্গে কথা বলতে রুচি হয় না। বললেই ঝগড়া লাগবে। আজকাল তাদের ঝগড়া বড় বেশি কুৎসিত পর্যায়ে চলে যায়। রেগে গেলে মণিদীপার ঝোড়ো মগজ থেকে যেসব কথা বেরোয় তা স্বাভাবিক অবস্থায় সে চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য, ঝগড়ার সময় ঠিক কথাগুলো জিভে চলে আসে।

রোজ ভাবে, এবার চলে যাব। আজ বা কাল। কিন্তু যাই-যাই করলেও মণিদীপার যাওয়ার জায়গা নেই। বাপের বাড়ির কথা সে ভাবতেই পারে না। নির্যাতিত এবং অবসরপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তার বাবা খুব সামান্য একটা ভাতা পায় পার্টি থেকে। বাড়িতে দু'খানা ঘর ভরতি তার ভাইবোন। একবেলা খাবার জুটলে অন্য বেলা জুটতে চায় না। এক দাদা মোটামুটি ভাল চাকরি করে। সংসারের হাঁ-মুখ দেখে সে মানে মানে নিজের বউ বাচ্চা নিয়ে অন্য জায়গায় সরে পড়েছে।

ছিল স্নিগ্ধদেব। সব জুড়ে ছিল তার। বিশ্বাস ছিল, সব আশ্রয় ছিন্ন হলে স্নিগ্ধদেব এগিয়ে আসবে ঠিক। বুদ্ধিমান ও সাহসী স্নিগ্ধদেবের অনেক গুণ। তবে সবচেয়ে বড় ছিল তার হৃদয়। ভারী নরম সুন্দর মানুষ।

দাঁতে দাঁত ঘষছিল মণিদীপা, অথচ চোখ ফেটে যাচ্ছে জলের তোড়ে। রাগ, একমাত্র পাগলা রাগটাকে খুঁচিয়ে তুললে তবেই এই ভাবাবেগের বৃথা কান্নাকে আটকানো যাবে।

দীপা!

ডাক শুনে মণিদীপা জানালার কাছ থেকে মুখটা সামান্য ফেরাল। তার চুলের গুছি মুখটাকে আড়াল করেছে। বুনু তার চোখের জল দেখতে পাবে না। মুখে কিছু বলল না সে।

চ্যাটার্জি আর কিছু বলেনি?

বুনো থেকে বুনু। এই নামে বিয়ের পর বেশ কিছুদিন স্বামীকে ডেকেছে মণিদীপা। তখন বন্য বরাহের মতোই প্রেম নিবেদন করত বুনু। মণিদীপা বোসের লম্বা থলথলে অপদার্থ চেহারা আর চরিত্রহীন মুখের দিকে চেয়ে বলল, না।

যদি কাল আবার ফোন করে—

কাল আমি বাড়ি থাকব না।—ঝেঁঝে ওঠে মণিদীপা।

ওঃ, দেন ইটস্ অলরাইট।

বোস চলে গেলে মণিদীপা খাবার ঘরে এল। বোস আজকাল প্রায়ই রাতে বাড়িতে কিছু খায় না। তাই টেবিলে সাজিয়ে গুছিয়ে খাবার দেওয়া নেই। ঢাকনা খুলে মণিদীপা চিংড়ির ঝোল আর ভাত নিজেই নিয়ে একা বসে খেল, ছড়াল। পাতের দিকে তাকিয়ে তার একটু ভয় হল, এই ভাতের অভাবে সে কখনও কষ্ট পাবে না তো!

এর চেয়ে চাকরি করলে কি সুখী হওয়া যেত? বোধহয় না। মণিদীপা ওই বাঁধা দশটা-পাঁচটার কাজ করতে পারত না কিছুতেই। তবে?

তবে নিয়ে ভাবতে ভাবতে শোওয়ার ঘরে এল সে। নিজস্ব কাঠের আলমারি খুলে শাড়ি ব্লাউজ

উলেন টেনে হিঁচড়ে ফেলতে লাগল মেঝেয়। কোথাও কোনও খাঁজে কোণে যদি কিছু টাকা খুঁজে পাওয়া যায়।

পেল কিছু। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ টাকাও নয়। এতে কী হবে?

আই মাস্ট সেল সামথিং। আই মাস্ট সেল।—বলে দাঁত দাঁত পিষে বিয়েতে বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া ট্রাংকটা খুলল সে। ট্রাংকটা এ বাড়ির পক্ষে খুবই বেমানান। তার রং গোলাপি এবং ডালায় একটু রঙিন নকশা। তবে মজবুত বলে মণিদীপা এর মধ্যে গয়না রাখে।

গয়না বলতে বাপের বাড়ি থেকে কিছুই প্রায় পায়নি সে। তার ওপর সোনার গয়নায় একটা ঘেন্না ছিল বলে তো বিয়ের পরও তেমন কিছু করায়নি। গয়না একে সেকেলে, তার ওপর গয়না রাখার অর্থ সোনা হোর্ডিং। আজ গয়নার কাঠের বাক্সটা বের করে সে কিন্তু হতাশ হল। দুটো বাউটি, চারগাছা চুড়ি, একটা পাতলা হালকা নেকলেস। বিয়েতে একছড়া হার দিয়েছিল শাশুড়ি, তাতে কিছু সোনা আছে। তবু সব মিলিয়ে সাত-আট ভরির বেশি নয়।

গয়নার ওপর এক বিন্দু মায়া নেই মণিদীপার। তবু আজ বাক্সটা খুলে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। চেয়ে দেখল, এই তার শেষ সম্বল।

বোসের সঙ্গে আপস করতে হবে নাকি? ঘেন্না করে যে! চলে যাবে? কিন্তু কোথায়?

এই কোথায় প্রশ্নটা আজকাল বিশাল হয়ে ডানা মেলে পথ আটকায়।

বুনুর কাছে বোধহয় আর টাকা চাওয়া যায় না। যায়? মাসের প্রথমে বুনু আজকাল তাকে চারশো টাকা হাতখরচা দেয়। তার বেশি দেওয়ার উপায় নেই, বলে দিয়েছে। চাইলে হয়তো দেবে. কিন্তু অপমান করবে। এখন একটুও অপমান সইতে পারবে না সে।

দীপনাথ বাগডোগরায় নিচু হয়ে টাকা কুড়োচ্ছে—দৃশ্যটা আবার দেখতে পেল সে। দীপনাথের সেই হাজার টাকার ঋণ আজও শোধ করতে পারেনি বুনু। তা নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাও কম হয়নি। অধস্তন কর্মচারী এবং প্রায় তার দয়ায় মানুষ একজন লোকের কাছে অধমর্ণ থাকাটা বুনুর কাছে এক বিরাট প্রেস্টিজের প্রশ্ন।

মণিদীপা গয়নার বাক্স বালিশের পাশে নিয়ে এল।

সকালে উঠে খানিকটা ভাবল সে, গয়না বেচতে লোকে কোথায় যায়? একবার বাপের বাড়িতে গেলে হয়। তার মা গয়না, ঘটি বাটি বেচে অভ্যস্ত, ঠিক গাইড করতে পারবে। কিন্তু সেইসঙ্গে প্রশ্ন উঠবে, মেয়ে কেন গয়না বেচছে?

থাক, অন্য কিছু ভাবাই ভাল।

এই সংসারে তার তেমন কোনও ইনভলভমেন্ট নেই। সে রাঁধে না, ঘর গোছায় না, আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখে না, বোস সাহেবের প্রতিও তার কোনও ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব নেই। যেমন তার প্রতি নেই বোস সাহেবেরও। বোস সকালে চা খায়, দাড়ি কামায়, স্নান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে অফিসে চলে যায়। তার মধ্যে মণিদীপার ভূমিকা কী-ই বা হতে পারে! কোনও কাজের জন্য অনুমতিরও দরকার নেই তার। তবু আজ সকালে সে বুনুর ওপর নজর রাখল। গয়না বিক্রির ব্যাপারটা ওর টের পাওয়া উচিত নয়। টের কোনওদিন যে পাবে না তাও জানে মণিদীপা। গয়নার খোঁজই ও রাখে না। তবু নতুন ধরনের এই কাজটা করতে গিয়ে বুনুর কথাই বারবার ভাবছে সে।

বোস অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল মণিদীপা। বাস-ট্রামে এখনও ভিড়, এখনও ট্যাক্সি সুলভ নয়।

বেরোল এগারোটা নাগাদ।

কোথায় গয়না বিক্রি হয় তা জানে না। ট্যাক্সি নিয়ে তাই সে এল অঞ্জুর কাছে।

বহুকাল দেখা নেই। দেখা হতে যে অঞ্জু খুব খুশি হল তাও নয়। অঞ্জু এখন খুবই ব্যস্ত মানুষ। বসন্ত রায় রোডে নিজেদের বাড়ির একতলায় প্রথমে একটা মেয়েদের বিউটি পার্লার খুলেছিল।

সেটা তেমন চলছিল না। এখন সে দোকান তুলে দিয়ে মেয়েদের দর্জির দোকান দিয়েছে। রমরম করে চলছে।

আজও কাউন্টারে কাঁচি হাতে দাঁড়িয়ে চশমা চোখে খুব মন দিয়ে কী কাটছিল একটা সবুজ সিল্কের কাপড় থেকে। ব্লাউজ বা জিনসের মাপ কিংবা ডেলিভারি নিতে কম করেও এই দুপুরে সাত-আট জন ছুঁড়ি থেকে বুড়ি অপেক্ষা করছে। তিনজন কর্মী মহিলা হিমশিম।

অঞ্জু ফর্সা মোটাসোটা এবং বেশ সুন্দরী। ব্যস্ত অঞ্জু প্রথমটায় প্রায় চিনতেই পারল না। ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে অনেকটা সময়ের ফাঁক দিয়ে বলল, ওঃ তুমি! কী খবর?

একদম ড্যাম্প গলা, উত্তাপ নেই। চোখ নামিয়ে কাজ করতে করতে বলল, কাটার পালিয়েছে, বুঝলে! যা দেমাক না আজকাল কাটারদের! এত মাইনে দিই তবু হুটহাট কিছু না বলে-কয়ে ঠিক পালিয়ে যাবে। রাইভ্যাল কনসার্নরা ভাগিয়ে নেয়।

তুমি তো আগে দর্জির কাজ জানতে না অঞ্জু!

ঠিকই তো। কবে শেখার সময় হল বলো! ভেবেছিলাম মাইনে করা লোক দিয়েই ব্যাবসা চলে যাবে। কিন্তু ভাল কাটারদের রাখা যে কী ঝামেলা! অর্ডারের স্তূপ জমে আছে, তার টিকির দেখা নেই। বহুকাল নাকাল হয়ে শেষে নিজেই শিখেছি প্রাণের দায়ে। এখন কারও পরোয়া করি না।

অঞ্জু ব্যস্ত, বিরক্ত, ক্লান্তও বোধহয়। কী করবে মণিদীপা ভেবে পাচ্ছিল না। বসারও জায়গা নেই। টুল বেঞ্চ সব ভর্তি। অঞ্জু ব্যাবসা করে, সুতরাং বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন, আর তাই তার কাছে আসা। একটু পরামর্শ দিতে পারত অঞ্জু। কোথায় গেলে গয়না বিক্রি করতে গিয়ে ঠকতে হবে না, তা বলে দিতে পারত।

বসবে? না কি অন দি ওয়ে?—অঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

একটু দরকার ছিল।

আমার কাছে?

হুঁ। কিন্তু তুমি তো ব্যস্ত।

ভীষণ। এ জন্মে আর বিশ্রাম নেই।

খুব রোজগার হচ্ছে তো?

হচ্ছে। খরচও আছে।

আহাঃ কী-ই বা খরচ! দোকানের তো ভাড়া লাগে না।

ভাড়াটাই যা বাদ। ট্যাক্স আছে, মাইনে আছে, মেনটেনেন্স আছে। কর্তা তো কিছু দেখবে না। কেবল বলে দোকান তুলে দাও।

বলে বলুক। তুমি তুলে দিয়ো না। এই বেশ রমরমে একটা দোকানঘরে সারাদিন কাটাতে মজা আছে। বোর করে না।

সেটাও ঠিক। কাজেরও আনন্দ আছে। আই ফিল ইম্পর্ট্যান্ট ডুয়িং সামথিং ফর আদারস্ অ্যান্ড ক্রিয়েটিং অলসো। আমি একটা সামার ড্রেস ডিজাইন বের করছি, জানো? নিউ মার্কেটের কানহাইয়ালাল কন্ট্রাক্ট করে গেছে।

অনেক টাকার কন্ট্র্যাক্ট?

টাকাই তো সব নয়। দেয়ার ইজ অলসো এ প্লেজার। তবে কানহাইয়ালাল টাকাও ভালই দিচ্ছে।

তোমার হাজব্যান্ড কি এখন ম্যাকনিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর?

না, দু' নম্বরে আছে। হয়ে যাবে শিগগিরই।

জানো তো, নকশালরা একসময়ে ঠিক করেছিল হাজব্যান্ড আর ওয়াইফদের একসঙ্গে রোজগার করা বন্ধ করে দেবে?

দে ওয়ার রোম্যান্টিক ভ্যাগাবন্ডস। আমার হাজব্যান্ড মাসে দশ হাজার টাকা মাইনে পায় বলেই কি আমার কিছু করার নেই? শোনো কথা! আমিও তো মানুষ।

কথা থামিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখছিল মণিদীপা। ভিতরে কাচের আলমারিতে বহু রকমের ড্রেস মেটিরিয়ালস সংগ্রহ করে রেখেছে অঞ্জু। কম করেও ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার জিনিস। দু'-দুটো এয়ারকুলার লাগানো। অবশ্য এখন শীতকাল বলে এগুলো চলছে না। কিন্তু সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'এয়ার কন্ডিশনড'। এতে কাজ দেয়, ইজ্জত বাড়ে।

বসবে?—অঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

এখানে তো বসার জায়গা নেই।

ভিতরে এসো না!—বলে নিজেই গিয়ে কাউন্টারের একপাশে পাটা উঠিয়ে ধরল, এসো।

ভিতরে গোটা চারেক গদিওলা উঁচু টুল। তার একটায় উঠে বসল মণিদীপা।

অঞ্জু বলল, একটু বোসো। হাতের কাজটা মেশিনে দিয়ে নিই।

তুমি কাজ করো না। আমি অপেক্ষা করছি। তাড়া নেই।

তোমার হাজব্যান্ডের কী খবর? গোয়িং আপ অ্যান্ড আপ?

হি ইজ অ্যামবিশাস।

পুরুষমানুষ মাত্রই জেলাস। মিসেসরা কিছু একটা করলেই তাদের গায়ে জ্বর আসে। অথচ নিজেরা! এক নম্বরের কেরিয়ারিস্ট।

তোমার হাজব্যান্ড একদম কো-অপারেট করেন না বুঝি?

না, তা করে। এমনকী ওর অফিসের বিগ বসদের মিসেসরা তো এখান থেকেই সব কিছু বানিয়ে নেয়। ও-ই ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে। এমনিতে হি ইজ প্রাউড অফ মি। কিন্তু কেবল ন্যাগ করবে, আমার বাচ্চারা তাদের মাকে পাচ্ছে না, হাইসহোল্ড ঠিক মতো চলছে না এটসেটরা। সবচেয়ে বড় কথা হি ওয়ান্টস টু ডোমিনেট মি। আমার একটা সেপারেট পার্সোনালিটি গড়ে উঠুক এটা ও চায় না।

আর ইউ আনহ্যাপি?

অঞ্জু মন দিয়ে একটা সূক্ষ্ম কাটার কাজ সারতে গিয়ে সময় নিল। কিন্তু প্রশ্নটা কানে গেছে ঠিকই। কাপড়টা সরিয়ে রেখে কপাল থেকে চুল সরিয়ে ক্লান্ত মুখে একটু হেসে বলল, আনহ্যাপি কি না তা ভেবে দেখারও সময় পাই না। তবে ও আমাকে অপছন্দ করে না তো, আই অলসো অ্যাডোর হিম। না মণি, উই আর নট আনহ্যাপি।

এই দোকান থেকে তোমার নিশ্চয়ই অনেক রোজগার হয় অঞ্জু!

তৃপ্তমুখে অঞ্জু বলে, হয়।

কত বলো তো!

ইনকাম ট্যাক্সে বলে দেবে না তো! ভালই হয়। এ ফিউ থাউজ্যান্ডস পার. মান্থ।

ফিউ থাউজ্যান্ডস!—মণিদীপা অবাক চোখে চেয়ে থাকে।

আমি লাকি।

তুমি খুব পরিশ্রমীও।

কাজ করতে আমি ভালবাসি।

আমিও বাসি। কিন্তু কী করব ঠিক বুঝতে পারি না।

অঞ্জু পাশের টুলে বসে বলে, আমি বলি, ডু সামথিং। আজকালকার পুরুষরা জানো তো, ভীষণ অবিশ্বাসী। আজ তোমার কাছে ফেথফুল আছে, কালই হয়তো থাকবে না। চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, বোঝোই তো! তাই মেয়েদের একটা ফুটিং থাকা ভাল। তাতে অন্তত হাজব্যান্ডরা বুঝবে যে, বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করে লাভ হবে না। ইন ফ্যাক্ট আমার কর্তাটি একসময়ে আমার ওপর খুব হম্বিতম্বি করত। আজকাল সমঝে চলে। ভয়ও পায়।

আমি তোমার মতো লাকি নই, অঞ্জু।

দোকানের কর্মী একটি এসে নিচু গলায় কী পরামর্শ করে গেল। আর-একজনের ব্লাউজের মাপ খাতায় লিখে নিতে হল। টুকটাক এসব কাজ সেরে চশমাটা খুলে একটা টুকরো কাপড়ে মুছতে মুছতে অঞ্জু বলে, তোমার একটা পলিটিক্যাল লাইন ছিল না?

ছিল। এখন নেই।

বেঁচেছ। হায়ার পলিটিকসে পয়সা আছে, শৌখিন পলিটিকসে কিছু নেই। বরং ঘরের পয়সা বেরিয়ে যায়। তাছাড়া টেনশন, ফ্রাস্ট্রেশন অ্যান্ড আদার হ্যাজার্ডস। তোমার বাবার কথাই ভেবে দেখো। লোয়ার পলিটিকস একদম নন-প্রোডাকটিভ। ডু সামথিং প্রোডাকটিভ। আর্ন মানি। লাইফ উইল বি ভেরি এনজয়েবল।

অঞ্জু, আই অ্যাম ইন মানি ট্রাবল!

কেন, তোমার হাজব্যান্ড—?

ওর সন্দেহ আমি এক্সট্রাভ্যাগেন্ট। আজকাল টাকা কন্ট্রোল করছে। মাসে মাসে মাত্র চারশো টাকা হাতখরচ দিচ্ছে।

চারশো!—বলে প্রায় নাক সিঁটকোল অঞ্জু।

তুমিই বলো আমার এখন কী করা উচিত।

আর্ন মানি, আর্ন মানি!—অঞ্জু ছড়া কাটার মতো করে বলে।

মণিদীপার চোখ জ্বালা করে। বুকের ভিতরটাও জ্বলছে রাগে আর আকাঙ্ক্ষায়! অঞ্জুর এত রবরবা, এত স্বাধীনতা, এত টাকা তার ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকে, টালমাটাল করে দেয়।

অঞ্জু মৃদু স্বরে বলল, আগে তুমি খুব গরিবদের জন্য ভাবতে। আমি বলি কী, ভাবো তাতে ক্ষতি নেই। এমনকী গরিবদের জন্য কিছু করাও ভাল, আমিও তো রেগুলার কিছু দানধ্যান করি। রামকৃষ্ণ মিশন, একটা অনাথ আশ্রম আর একটা ব্লাইন্ড স্কুলে টাকা দিই। গরিবদের জন্য ফিল করা ভাল, কিন্তু গরিব হওয়া ভাল নয়। পভার্টি আমার দু' চোখের বিষ।

মণিদীপা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে কথাটা সমর্থন করে। সে জানে, এটা খুব সত্যি। নইলে স্নিগ্ধদেব এত কিছু করে, এত দূর এগিয়ে, হাজার জনার চোখে বিপ্লবের কাজল পরিয়ে দিয়ে অবশেষে নিজেই কেন সরে পড়ে মার্কিন মুলুকে? আজ মণিদীপা তাই নেতৃত্বহীন, অস্থির, দ্বিধাগ্রস্থ।

অঞ্জু একটা সিনথেটিক কাপড় টেনে নিয়ে পটু হাতে দাগ দিয়ে দিয়ে কাটবার তোড়জোড় করছে।

মণিদীপা মৃদু স্বরে বলে, শোনো অঞ্জু, আমার খুব টাকার দরকার। আমি একটা হার বিক্রি করব।

বিক্রি করবে?—যেন এতটা বিশ্বাস করতে পারছে না এমনভাবে তাকায় অঞ্জু।

মণিদীপা একটু লজ্জা পায়, অহংকারেও লাগে। সে তাড়াতাড়ি বলল, অর্নামেন্টস তো পরি না। ঘরে রেখে কী লাভ বলো? প্রিমিটিভনেস।

সে তো ঠিকই। তবে সোনা একবার বিক্রি করলে আর কিন্তু কিনতে পারবে না। সোনার যা বাজার!

জানি। তবু করব। তোমার জানাশোনা স্যাকরা আছে?

আমি বহুকাল ওসব করাইনি। গয়না যা ছিল সব ব্যাংকের ভল্টে। তবে ভবানীপুরে অনেক দোকান আছে পুরনো গয়না কেনে।

তারা তো ঠকাবে।

চিন্তিত মুখে অঞ্জু বলে, অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি যে কাউকে চিনি না।

প্রসঙ্গটা আর টানার মানে হয় না বলে মণিদীপা টানল না। কিছুক্ষণ অন্য কথাবার্তা বলে উঠে পড়ল। কিন্তু বুকে তীব্র দহন। মাথা ফেটে যাচ্ছে রাগে, ঈর্ষায়।

॥ পঞ্চান্ন ॥

সাড়ে তিন ভরি আছে। পান বাদ যাবে।

পান বাদ দেবেন কেন? হারটা তো সুন্দর। একটু পালিশ করলে নতুন বলে বিক্রি হয়ে যাবে।—মণিদীপা বুদ্ধি খাটিয়ে বলল।

দোকানি গম্ভীর মুখে বলে, আমি শুধু সোনার দাম দিতে পারি।

মণিদীপার কিছু করার ছিল না। বলল, তাই দিন।

টাকা নিয়ে উঠল এবং ট্যাক্সি ধরল।

বাসায় ফিরে টাকার গোছটার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকা করে সে। এ টাকা দিয়ে কিছুই শুরু করা যায় না। আরও টাকার দরকার। অনেক টাকা।

টাকাটা অনিবার্যভাবে মার্কেটিং-এ যাওয়ার জন্য তাকে ঠেলছিল। কষ্টে লোভ সামলে নেয় মণিদীপা। অঞ্জুর মতো এন্টারপ্রাইজিং একটা কিছু করতে হবে। অনেক টাকার দরকার।

কাগজ-কলম নিয়ে সারাদিন ডাইনিং টেবিলে বসে অনেক হিসেব-নিকেশ করল। দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতন, ডেকোরেশন, ট্যাক্স। তবে অঞ্জুর মতো টেলারিং শপ না রেস্টুরেন্ট না হ্যান্ডিক্র্যাফটস তা ঠিক করতে পারল না। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে।

রাত আটটা নাগাদ যখন টেলিফোন বাজল তখনও মণিদীপার হুঁশ নেই। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে সে একটা ঝকঝকে দোকানঘর দেখতে পাচ্ছে। ভারী ব্যস্ত দোকান, ভীষণ জনপ্রিয়। প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার বিক্রি।

সেই ঘোরের মধ্যেই গিয়ে টেলিফোন ধরল।

বোস সাহেব আছেন?

গলাটা শুনে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল মণিদীপার। বুকে বড় জ্বালা, বড় ক্ষোভ হতাশা।

এখনও ফেরেনি। কোথা থেকে ফোন করা হচ্ছে?

শিলিগুড়ি। কালকের ফ্লাইটে যাচ্ছি। কিন্তু পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে, কাল আর বোস সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না, বলে দেবেন কাইন্ডলি।

বলব। আপনার সঙ্গে আমারও একটু দরকার ছিল যে! কবে দেখা হতে পারে বলবেন?

কাল নয়। পরশু চেষ্টা করব। কেন?

একটা কাজ হাতে নিয়েছি। এক্সপার্ট ওপিনিয়ন চাই।

আমি কোনও ব্যাপারেই এক্সপার্ট নই।

এক্সপার্ট বলেই তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পোস্টে আছেন।

পোস্টটা আমি পেয়েছি তেল দিয়ে। আপনি তো জানেন।

ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমি একটা দোকান দিচ্ছি।

দোকান? কিসের দোকান?

পান-বিড়ির।

ওঃ, তা হলে আমি ভাল অ্যাডভাইস দিতে পারব।

তা হলে পরশু? আফটার অফিস-আওয়ার্স?

হ্যাঁ। বোস সাহেবের গাড়িতেই চলে যাব আপনাদের ফ্ল্যাটে।

শুনুন। আপনাকে কিন্তু আমার পার্টনার হতে হবে।

কীরকম পার্টনার?

পার্টনার আবার কীরকম হয়? ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট ফিফটি-ফিফটি।

অর্থাৎ আপনি পান সাজবেন আর আমি বিড়ি বাঁধব?

শপ ম্যানেজমেন্ট আমার, আউটডোর আপনার।

আর কিছু?

আর কী?

ধরুন লাভটা আপনার, লোকসানটা আমার।

ফের ইয়ারকি?

না, ভাবছিলাম রাজনীতি কি একদম ছেড়ে দিলেন?

ছাড়ব কেন? এটাও এক ধরনের লড়াই। অপ্রেশনের বিরুদ্ধে।

আপনি ক্যাপিট্যাল পেলেন কোত্থেকে?

এখনও পাইনি। কী করে পাওয়া যায় তা আপনাকেই জিজ্ঞেস করব। শুনেছি আজকাল ব্যাংক ব্যাবসার জন্য লোন দেয়। সত্যি?

দেয়।

আমার সামান্য কিছু সোনা আছে। বেচে দিচ্ছি।

সর্বনাশ!

সর্বনাশ কেন?

সোনা বেচলে আর কিনতে পারবেন না কখনও। সোনা বেচতে নেই।

ওসব প্রিমিটিভনেস আমার নেই। সোনা আমার কোনও কাজে লাগে না।

ইতিমধ্যেই কি কিছু বেচে দেয়েছেন?

শুধু হারটা।

কতটা সোনা ছিল?

সাড়ে তিন ভরি।

দীপনাথ চুকচুক করে একটা আফসোসের শব্দ করে বলল, নিশ্চয়ই জানি আপনি ঠকেছেন। আজকাল সোনার দর জানেন?

না তো!

কত দিয়েছে আপনাকে?

তিন হাজারের মতো। সোনার পান বাদ দিল যে।

ওরা সব সময়েই পান বাদ দেয়। কিন্তু কথা তো তা নয়। ওর ওপরে বারগেন করতে হয়। আপনি নিশ্চয়ই তা করেননি!

আমি লোককে বিশ্বাস করি।—বলল মণিদীপা, কিন্তু গলার স্বরে তেজ ফুটল না। বরং করুণ শোনাল।

দীপনাথ হাসল।—আমি গিয়ে পৌঁছোনোর আগে আর কাউকে সোনা বিক্রি করবেন না। খুব ঠকে যাবেন। তাছাড়া বোস সাহেবের অ্যাডভাইস নিলেন না কেন?

ও জানলে রাগ করবে।

রাগ করাই উচিত।

সেইজন্যই এক্সপার্ট ওপিনিয়ন চেয়েছিলাম। এ সময়ে আপনি নর্থ বেঙ্গলে গিয়ে বসে রইলেন কেন বলুন তো!

আমাকে খেটে খেতে হয়, অন্যের হুকুমে চলতে হয়। আমি কি জানতাম আমি নর্থ বেঙ্গলে এলেই আপনি সোনা বেচবেন!

সোনা আমি সব বিক্রি করব। তবে এবার আপনার থ্রু-তে।

আমি ও দায়িত্ব নিতে পারব না।

তা হলে আমার হাত-খরচ চলবে কীসে?

কেন, বোস সাহেব হাত-খরচও বন্ধ করেছেন নাকি?

ঠিক তা নয়। যা দেয় তাতে চলে না। ট্যুর থেকে ফিরে এসেই ফিনানশিয়াল ব্যারিকেড তৈরি করেছে।

যতদূর জানি, আপনি চারশো টাকা পান।

বিস্মিত মণিদীপা বলে, আপনি জানেন? কী করে? ও কি আপনাকে বলেছে?

দীপনাথ থতমত খেয়ে বলে, ঠিক ওভাবে বলেননি। একবার কী একটা কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ ইনফরমেশনটা বেরিয়ে আসে।

কূট সন্দেহে চোখ ছোট করে মণিদীপা বলে, ও।

চারশো টাকা কিন্তু কম নয় মিসেস বোস।

কম বলছি না। কিন্তু আমি জানতে চাই আমার স্বাধীনতা নেই কেন? আজকাল বয় বাবুর্চির মাইনে পর্যন্ত বোস সাহেব দেয়, আগে আমার হাত দিয়ে দেওয়ানো হত। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা নেই। গাড়ি গ্যারাজে তালাবন্ধ। কিন্তু আপনাকে বলে কী হবে? আপনি পুরুষমানুষ, সবসময়ে পুরুষদের পক্ষ নেবেন। আই নো ইউ অল।

আপনিও তো অবলা নারী নন মিসেস বোস। চারশো টাকায় নিম্ন-মধ্যবিত্ত একটা পরিবারের চলে যায়। আর আপনার তো ওটা শুধু হাত-খরচ। খাওয়া থাকা বা পোশাক ওর বাইরে।

হাউ ডু ইউ নো সো মাচ? বোস সাহেব কি এসবও বলেছে?

না। তবে টেলিফোনে আর এসব প্রসঙ্গে না বলাই ভাল।

দেন টক অ্যাবাউট ওয়েদার।

এখানে ভীষণ ঠান্ডা। আজ গ্যাংটকে গিয়ে জমে গিয়েছিলাম।

মণিদীপা রাগ করে বলল, রিসিভার রেখে দিচ্ছি কিন্তু।

আরে, রেগে গেলেন যে! ওয়েদারের কথা আপনিই বললেন তো!

রাগ হওয়ার কথা নয় বুঝি? এ দেশ বলেই মেয়েদের এত সহজে বেকায়দায় ফেলা যায়। সভ্য দেশ হলে—

দেশটাকে সভ্য করে তুলুন না! কে আটকাচ্ছে?

আপনারাই আটকাবেন, মেয়েরা প্রগ্রেস করলে যাদের ইন্টারেস্ট হ্যামপার্ড হয়।

আমি তো আপনার পার্টনার। আপনি প্রগ্রেস করলে আমারও প্রগ্রেস।

এখনও পার্টনার হননি।

হচ্ছি তো! পরশুদিন।

আপনাকে পার্টনার করব কি না তা দু'বার ভাবতে হবে।

কোনও মেয়েকে পার্টনার করতে চান? জমবে না।

তার মানে?

মেয়েতে মেয়েতে কো-অপারেশন হয় না।

পুরুষে মেয়েতেও তো হচ্ছে না।

পরশু বরং আপনি আমার একটা ইন্টারভিউ নিন।

ইন্টারভিউ বহুবার নিয়েছি। কাওয়ার্ড, সেল্‌ফ কনটেন্ট।

আমি?

নয়তো কে? অলস ভিতু আনস্মার্ট।

তবু আমাকেই পার্টনার করতে চেয়েছিলেন একটু আগে।

এখন চাইছি না। আপনি আমাকে রাগিয়ে দিয়েছেন।

আপনি না রেগে কখন থাকেন বলুন তো! যখনই দেখা হয় তখনই দেখি রেগে আছেন।

আমি মোটেই রাগী নই।

আপনার ব্যাবসা যদি জমে যায় তা হলে কী হবে মণিদীপা?

নামটা মনে পড়েছে তা হলে?

পড়েছে। কিন্তু প্রশ্নের জবাবটা?

আমার ব্যাবসা জমবেই।

কিন্তু তারপর?

তারপর আবার কী? ইট উইল গ্রো বিগার। আমি একটা চেইন অফ শপ্‌স-এর কথা ভাবছি।

সে না হয় হল। কিন্তু আপনার সাংসারিক বা দাম্পত্যজীবনের কী হবে?

তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

আমি জানতে চাই আপনি সংসার ছাড়ার প্রোলোগ হিসেবে এসব ব্যাবসা-ট্যাবসার কথা ভাবছেন কি না।

আমি তো সংসারছাড়া হয়েই আছি। গেস্টদের মতো থাকি খাই।

তবু তো একটু হলেও আছেন।

সেটুকু বাদ গেলেও কারওর ক্ষতি হবে না। বরং ফ্রি হলে অনেক বেশি কাজ করতে পারতাম। আমাদের ডিভোর্সটা আপনার জন্যই হল না। কিন্তু তাতে লাভ কী হল বলুন তো!

লাভ-ক্ষতির হিসেব এখনও শেষ হয়নি। সময় হলেই ব্যালান্স শিট পেয়ে যাবেন।

বোস সাহেব উকিলকে একটা ভিজিটও দিয়েছিল শুনেছি। আপনার পরামর্শে নোটিশটা সার্ভ করেনি। কিন্তু এটা বালির বাঁধ।

দেখা যাক।

আমি কারওর করুণার পাত্রী হয়ে থাকা পছন্দ করি না। সব সময়েই মনে হয়, বোস ইচ্ছে করলেই আমাকে ডিভোর্স করতে পারে, দয়া করে করছে না। একজন আউটসাইডারের মতো এই থাকাটা কি খুব সম্মানজনক?

ধৈর্য ধরুন।

ধৈর্য ধরছি, তার কারণ অন্য। বোসের ফ্ল্যাট থেকে বেরোলে আমার কলকাতায় আর থাকার মতো জায়গা নেই। শুধু সেইজন্যেই—

জানি মণিদীপা।

আপনি জানেন বলেই বোধহয় ডিভোর্সটা আটকেছেন। কিন্তু ও ডিভোর্স না করলেও আমি মামলা আনব। তখন ঠেকাতে পারবেন না।

তারপর কী হবে মণিদীপা?

কিন্তু তার আগে বলুন, আপনি তিন মিনিটের টাইম-লিমিট কতক্ষণ আগে পার হয়েছেন?

অনেকক্ষণ। কিন্তু আমি এক্সচেঞ্জ থেকে কথা বলছি। এ জায়গা আমার চেনা। এমনকী পয়সাও লাগে না।

ও। হ্যাঁ, তারপর কী হবে জিজ্ঞেস করছিলেন। জেনে কী হবে? আমি ডিভোর্স করলেও তো কেউ মালা হাতে বসে থাকবে না। এ দেশের কাওয়ার্ড পুরুষরা ডিভোর্সি মেয়েদের ভয় পায়।

ঠিক তাই মণিদীপা।

কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না। কাজেই ও প্রশ্ন ওঠে না। আমি চাই কাজ। অনেক, হাজার কাজে ডুবে থাকব।

কাজ চাই? সেজন্য দোকান কেন? আপনার বিপ্লব কি শেষ হয়ে গেছে মণিদীপা?

মণিদীপা ভ্রূ কোঁচকায়, কেন শেষ হবে? যে লোকটা বিপ্লবীর জুতোয় পেরেক ঠুকে দেয় সেও বিপ্লবী। আপনি রিভোলিউশন অফ দি প্রোলেতারিয়েত কাকে বলে তাই জানেন না।

আপনি বোধহয় বিপ্লবীদের জন্যই গুন্ডি দিয়ে পান সাজবেন, আর আমি বিপ্লবী ব্র্যান্ডের বিড়ি লাল সুতোয় বেঁধে দেব?

কেন যে আপনি এত অশিক্ষিত!

দীপনাথ গা-জ্বালানো হাসি হাসছিল। দীপনাথের ওপর সে কখনও সত্যিকারের রাগ করেনি। আজ করল। হাসির মাঝখানে রেখে দিল ফোনটা।

বোস সাহেব ফিরল ন'টা নাগাদ। আজকাল সবসময়েই বাসায় ঢোকে গম্ভীর মুখে, ভ্রু কোঁচকানো। মণিদীপা তাতে ভয় পায় না বা গুরুত্ব দেয় না। লোকটাকে তার বোঝা হয়ে গেছে। এও জানে তারা দু'জনে কেউ নিজেকে বদলাবে না। যদি না বদলায় তবে মিলও হবে না কোনওদিন।

তবে আজ মণিদীপা আধঘণ্টা বাদে হানা দিল বোসের ঘরে। ততক্ষণে বোস গরম কাপড়ের ড্রেসিং গাউন পরে এক কাপ কালো কফি শেষ করেছে। বাইফোকাল চশমা চোখে কিছু কাগজপত্র দেখছিল লেখাপড়ার টেবিলের কাছে বসে।

মণিদীপা সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলার পাত্রী নয়। ঘরে ঢুকেই বলল, বুনু, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

বোস কাগজ সরিয়ে একটু অবাক চোখে মণিদীপাকে দেখে নিয়ে বিরক্ত গলায় বলে, আই নো। তোমার কথা মানেই টাকা। আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

অপমানটা খুব ঝাঁঝালো হয়ে মণিদীপার সর্বাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু তবু সে আজ মাথা ঠান্ডা রাখতে পারল। আর-একটা চান্স ওকে দেবে সে।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলে, টাকার কথা তোলাটা নিশ্চয়ই দোষের নয়।

দোষের হত যদি যথেষ্ট টাকা তুমি না পেতে।

আমি যথেষ্ট পাই না। তার চেয়েও বড় কথা, টাকার ব্যাপারে আমার কোনও স্বাধীনতা নেই।

স্বাধীনতা দেব এমন শর্ত ছিল না।

তা হলে আমাকে বউ সাজিয়ে রেখেছ কেন?

চলে যাও। দরজা সবসময়েই খোলা।

আমি যেতেই চাই। কিন্তু যাওয়ার জন্যও আমার কিছু থোক টাকার দরকার। আমাকেও বাঁচতে হবে তো।

সেটা কোর্টে ঠিক হবে।

তুমি কি ডিভোর্স স্যুট আনছ?

না। পাবলিসিটি আমি পছন্দ করি না। তবে তুমি মামলা করতে পারো। আমি লড়ব না।

আমি কেন মামলা করতে যাব? তোমার আমার মিল নেই, ছাড়াছাড়ি দরকার, সেটা কি কাছারির মুখ দিয়ে বলাতে হবে? কাছারিতে গিয়ে তো আমরা বিয়ে করিনি।

তা হলে আপসে সেপারেশন চাও?

চাই।

আর সেজন্যই টাকাটা তোমাকে দিতে হবে!

তাও নয়। তুমি মিন বলে অন্যরকম অর্থ করছ। চলে যাওয়ার প্রি-কন্ডিশন হিসাবে আমি টাকাটা চাইনি। আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট সামথিং ইমিডিয়েটলি। পরে আমি ব্যাংকের লোন পেয়ে যাব। তোমার টাকা তখন শোধ করে দেব।

তুমি কী স্টার্ট করতে যাচ্ছ আগে সেটা আমার জানা দরকার।

এখনও ঠিক করতে পারিনি। আই ওয়ান্ট টু ওপেন এ শপ।

শপ? মুদিখানা নাকি?

তোমার কালচার বেশি দূর ওঠে না, তাই যা খুশি ভাবতে পারো।
ভদ্রঘরের মেয়েরা কি দোকানদারি করে? কখনও শুনিনি।
করে এবং খুব ভাল ঘরের মেয়ে-বউও করে। আমার বন্ধু অঞ্জু কত বড় টেলারিং করেছে! ওর বর তোমার চেয়ে অনেক উঁচু পোস্টে কাজ করে।
অঞ্জু? সেটা কে?
ইউ নো হার ওয়েল। ন্যাকামি কোরো না।
বোস নিজেই নাকটাকে দু'আঙুলে চেপে ধরে একটু ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আই নো। বোধহয় বালিগঞ্জে ওর একটা ফ্যাশনের দোকান আছে, অ্যান্ড শি ইজ এ কাটথ্রোট।
তোমার অ্যাসেসমেন্ট তোমার নিজস্ব। তবে আমিও ওরকম কিছু করতে চাই।
আমি তোমাকে টাকা দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না। অঞ্জু যা পেরেছে তুমি তা না পারতেও পারো।
তবু তুমি তোমার টাকা ফেরত পাবে। আমি ধার হিসেবে কাগজপত্রে সই করে টাকা নেব। ইভন আই অ্যাম রেডি টু পে ইন্টারেস্ট।
বোস হাসল। খুবই শেয়ালমুখো হাসি, যা আসলে হাসি নয়। বলল, তুমি চলে গেলেও তো আমার লাভ হবে না। আইনত আমি বিবাহিতই থেকে যাচ্ছি।
তুমি কি আবার বিয়ে করতে চাও বুনু?
চাইলে দোষ কী?
আর একটা মেয়ের সর্বনাশ হবে। ঠিক আছে আমি মিউচুয়াল করে নিতে রাজি। কেস তো ইন ক্যামেরাও করা যায়।
যায়। তবু আমার ইচ্ছে কেসটা তুমি ফাইল করো।
তবে টাকা দেবে?
ভেবে দেখব।
মণিদীপা অত্যন্ত গভীর বুক-খালি-করা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, চ্যাটার্জি শিলিগুড়ি থেকে ফোন করেছিল।
কবে আসছে!
কাল। তবে কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।
জানি। তুমি যাও।
আর একটা কথা বুনু, চ্যাটার্জি আমার টাকার অসুবিধের কথা সবই জানে। তুমি যে আমাকে রেশনে রেখেছ তা ও জানল কী করে? তুমি বলেছ?
আমি!—বলে যেন একটু অবাক হয় বোস। তারপর সত্যিকারের একটু হাসে, ইন ফ্যাক্ট তোমাকে টাকার ব্যাপারে কন্ট্রোল করার কথা ওই আমাকে প্রথম বলে। হি ইজ এ রিয়্যাল ফ্রেন্ড। ব্যাংকরাপট্‌সি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।
দীপবাবু?
অবাক হওয়ার কিছু নেই। তুমি যখন আমাকে ফকির বানানোর মহান ব্রত নিয়েছিলে তখন আমার অবস্থা পাগলের মতো। অত টাকা আয় করেও কিছুই থাকে না। দীপনাথ ঠিক সেই সময়ে ইন্টারফেয়ার করে। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু হিম।
মণিদীপা হাত মুঠো করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে অন্ধের মতো, আচ্ছন্ন মাথায় নিজের ঘরে ফিরে এল।
তার কান্না আসে না সহজে। আজ এল। আসলে কান্না নয়। অসহায় দুর্দম রাগ তার ভিতরটাকে বিদীর্ণ করে দিল বুঝি। বালিশে মুখ চেপে ধরে নিজের শ্বাসরোধ করতে করতে হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে লাগল মণিদীপা।

॥ ছাপ্পান্ন ॥

তৃষা তার ঘরের উত্তরের জানালা দিয়ে দেখছিল। একটা ঝাঁপানো ফুলগাছের ইকড়িমিকড়ি চিকের মতো আড়াল করেছে জানালাটাকে। আর এবারকার হাড় কাঁপানো শীতের উত্তুরে হাওয়া এসে ডালপালায় হি-হি কাঁপুনি তুলছে মাঝে মাঝে। জানালাটা বন্ধ করতেই এসেছে তৃষা। বাইরে পাল্লার দিকে হাত বাড়িয়ে থেমে গেছে। দেখছে।

দেখছে একটা ভাঙাচোরা বুড়িয়ে যাওয়া মানুষের কাঠামো ভাবন-ঘরের বারান্দায় বসে আছে কাঠের চেয়ারে। সকালের অঢেল রোদ আর অবারিত শীত হাওয়ায় রোগা মূর্তিটা নড়ছে কি? পড়ে যাবে না তো! লোকটা ঠিক বসেও নেই। যেন কেউ বসিয়ে রেখে গেছে। গলা পর্যন্ত একটা কুটকুটে মোটা লোহি আলোয়ান। মাথা ঢাকা মাফলারে। ভাঙচুরগুলো বুঝতে তবু কষ্ট হয় না। এতদূর থেকে শুধু অল্প খোলা মুখটুকুর দিকে চাইলেই বোঝা যায়। তৃষাকে তো ভাল করে দেখতে হচ্ছে না এখন। তার তো সবটুকুই দেখা। পা তুলে কাঠের চেয়ারে বসে চেয়ে আছে অনড়, অটল। কাঠের চেয়ার! তৃষা একটু ভ্রু কোঁচকায়। কাউকে বললেই তো ইজিচেয়ারটা টেনে বের করে দিত বারান্দায়।

বউমা! বউমা!—উঠোন থেকে দীননাথ ডাকছেন।

তৃষা জানালাটা বন্ধ করে উঠোনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

দীননাথ রোদে দেওয়া একরাশ লেপ-তোশকের পাশে লাঠি হাতে উবু হয়ে বসে আছেন। তৃষাকে দেখে বললেন, কাউকে পাহারায় রাখোনি, বজ্জাত কাক চড়ুই সব নোংরা করে দেবে যে লেপ-তোশক।

করবে না। উঠোন দিয়ে তো আমরা অনবরত যাতায়াত করছি।

তবু সাবধান হওয়া ভাল। সকালবেলাটায় খবরের কাগজটা কোথায় যায় বলো তো! এই সময়টুকুতেই আমি যা একটু চোখে দেখতে পাই। ওরা সেই বেলা গড়িয়ে গেলে চাইতে চাইতে তবে দেয়। তখন বড় অক্ষর ছাড়া কিছু পড়তে পারি না।

খবরের কাগজ তো কেউ পড়ে না বাবা। দেখছি কোথায় আছে। বোধহয় আমার ঘরেই। দেখো তো। পেলে পাঠিয়ে দাও। রোদে বসে বসে পড়ি আর তোমার বিছানা পাহারা দিই।

নিজের ঘরে তৃষা স্টোভে চা বসিয়েছিল। সারাদিনে কয়েকবার সে নিজের হাতে তৈরি চা খায়। রান্নার ঠাকুর হুকুমমতো করে দেয় বটে, কিন্তু তৃষার রুচিমতো হয় না। ঘরে এসে তৃষা জল নামাল। অত্যন্ত দামি সুগন্ধী চা-পাতা ভিজিয়ে চা ছাঁকল। খেল। কিন্তু সারাক্ষণ ভ্রুজোড়া কোঁচকানো রইল তার। চায়ের তেমন স্বাদ পেল না।

খবরের কাগজটা মেঝেয় পড়ে ছিল। বারান্দার জানালার ধারে। সে নিজে কদাচিৎ খবরের কাগজ পড়ে। চা শেষ করে খবরের কাগজটা শ্বশুরকে পৌঁছে দিয়ে সে উঠোনের বেড়ার আগল ঠেলে বেরিয়ে এল।

ঝাঁটপাট দেওয়া পরিষ্কার রাস্তার ওপর আবার দুটো-একটা করে পাতা খসে পড়ছে। কিন্তু পোড়া পাতা আর ছাই উড়ে এসেছে নিতাইয়ের ঝোপড়ার দিক থেকে। রোজ সন্ধেবেলা সে আগুন পোহায়।

বাগানের দিকে মুখ করে বসে আছে শ্রীনাথ। চোখ ডুবে আছে বাগানে। এবার মেদিনীপুরের একটা লোক বাগান করছে। কাজ জানে। সারা বাগান জুড়ে রঙের বান ডাকিয়ে দিয়েছে। এই একটা জিনিস শ্রীনাথ বোঝে। গাছপালা। যে লোকটা বাগান করেছে সে যে গুণী তাতে সন্দেহ নেই। আজকাল শুধু এই লোকটার সঙ্গে শ্রীনাথ যা একটু কথাবার্তা বলে। কথা বলে ভারী আরাম পায়।

লোকটা পপি ফুলের বেড উসকে দিচ্ছে এখন। জল দিয়ে আসবে। সিঁড়িতে বসে দু'দণ্ড জিরোবে। কথা হবে। শ্রীনাথ কাঙালের মতো চেয়ে আছে।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস লিখেছিলেন, ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ...। শ্রীনাথ মরলে বঙ্গবাসী অবশ্য মঠ দেবে না। তবু শ্রীনাথের বড় ইচ্ছে, তাকে যেখানে পোড়ানো হবে সেখানে যেন ছোট্ট করে ঘিরে নিয়ে কয়েকটা গাছ লাগানো হয়। মৃত্যুর পর তার মতো পাপী লোকের আত্মার তো গতি হবে না। তার আত্মা থাকবে মাটির খুব কাছাকাছি নিম্নস্তরে। তখন ওই নিজের ভস্মীভূত দেহের রেণুমাখা গাছপালার মধ্যে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। কাউকে ভয় দেখাবে না, কিছু চাইবে না সে।

ইজিচেয়ারটা কাউকে বের করে দিতে বলোনি কেন?

কথাটা খুব ভাল শুনতে পেল না শ্রীনাথ। বাগানের মধ্যে ডুবে ছিল। শুধু আস্তে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, উঃ!

কাঠের চেয়ারে এভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে রোগা মানুষ?

এবার চমকাল শ্রীনাথ। তৃষা। তার সর্বাঙ্গে একটা অস্পষ্ট ভয়ের কাঁপুনি বয়ে যেতে থাকে। খুব অল্প অল্প করে বিষ ছড়িয়ে গেছে তার শরীরে। বিলম্বিত বিষ, কিন্তু অমোঘ। তার খাবারে, তার জলে, দুধে, তার ওষুধে পর্যন্ত। প্রতিবার ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে থেমে যায় সে। নিজেকে জিজ্ঞেস করে, খাব? এই বিষ! তার ভিতরে হতাশায় ভেঙে পড়া মানুষ প্রতিবার জবাব দিয়েছে, খাও, খাও, অনেক ভোগ করেছ জীবনে। মরতে তো হবেই। তাই খেয়েছে শ্রীনাথ। শুধু আয়ু নয়, বিষে আক্রান্ত তার আত্মবিশ্বাস, তার যৌনবোধ, তার মস্তিষ্ক, অনুভূতি। তৃষা বিষ চেনে। প্রয়োগের বিধিও জানে চমৎকার। বিষের প্রভাবেই বুঝি আজকাল তৃষা সকালে এলে সাপুড়ের মন্ত্রের মতো কাজ হয়, ফণা নেমে যায় শ্রীনাথের। ফণা নেমে যায়? না কথাটা ঠিক হল না। আজকাল সে আর ফণা তোলে কই?

শ্রীনাথের চাউনিটা খুব ভাল লাগল না তৃষার। চমকানোটাও লক্ষ করল। শ্রীনাথ কোনও দুর্জ্ঞেয় কারণে তাকে ভয় পায় তৃষা জানে। তাই সে আজকাল শ্রীনাথের সামনে আসে না। ভাবে, বোমার সেই শক ওকে খানিকটা অস্বাভাবিক করে ফেলেছে। আপনা থেকেই সেরে যাবে। যায়নি যদিও।

দাঁড়াও, মালিটাকে বলি ইজিচেয়ারটা বারান্দায় দিয়ে যাক।— বারান্দার ধারে গিয়ে তৃষা ডাকে, শ্রীপতি! এই শ্রীপতি!

খুব সংকোচের সঙ্গে শ্রীনাথ বলে, কিছু কষ্ট হচ্ছে না। বেশ আছি।

তৃষা গম্ভীর মুখটা ফিরিয়ে শ্রীনাথের দিকে চেয়ে বলে, না, ঠিক নেই।

শ্রীনাথ আর কিছু বলল না। শ্রীপতি দৌড়ে এসে ইজিচেয়ার বের করে রোদে পেতে দিল। শ্রীনাথ অস্বস্তির সঙ্গে সেটার ওপর আধশোয়া হল। চিত হয়ে ওপর পানে তাকিয়ে দেখল, তৃষাকে কত বিশাল বড় আর শক্তিময়ী দেখাচ্ছে। মাথাটা বারান্দার প্রায় ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। দুই চোখে বুদ্ধির ধার আর ক্রূরতা ঝলমল করছে সকালের রোদে। গায়ের পশমি চাদরটার রং শুকিয়ে যাওয়া রক্তের মতো কালচে লাল, তাতে সবুজ আর হলুদ ফুলের এমব্রয়ডারি। কিন্তু এতেই প্রায় রাজেন্দ্রাণীর মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওর পিছনেই রয়েছে শিকলে বাঁধা পোষা সিংহটা।

আজ বদ্রী তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

বদ্রী!— শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, কেন?

ও একটা ভাল জমির খোঁজ পেয়েছে। এক লপ্তে পাঁচ বিঘা।

জমির খোঁজ পেয়েছে? কিন্তু শ্রীনাথ বুঝতে পারে না তাতে তার কী।

তৃষা কোমল গলায় বলে, তুমিই তো ওকে জমির কথা বলেছিলে। বলোনি?

শ্রীনাথের মনে পড়ল। মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। বলেছিলাম। সে কতকাল আগে।

কতকাল আবার কী! বছরখানেক হবে।

তবু অনেক দিন। এখন জমি দিয়ে আমি কী করব?

তোমাকে কিছু করতে হবে না। লোক রেখে চাষ করাতে চাইলে করাবে।

বিষণ্ণ শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, তা তো আমি চাইনি। আমি ভেবেছিলাম নিজে চাষ করব, সঙ্গে লোকও খাটাব। ভেষজের চাষ তো সোজা নয়। ইচ্ছে ছিল জমির পাশে একটা কাঁচা ঘর তুলে থাকব।

তৃষা মৃদু স্বরে বলে, যদি তাই চাও তবে এখনও তো হতে পারে।

শ্রীনাথ মাথা নেড়েই যাচ্ছিল। বলল, আর কিছু করার নেই। আমার শরীর বিষে ভরে গেছে। আর বেশি দিন—

তৃষা রাগল না। হতাশার একটা শ্বাস ফেলে বলল, আমি শুনেছি, তোমাকে স্লো পয়জন করা হচ্ছে বলে তুমি সন্দেহ করো।

আতঙ্কে প্রায় সাদা হয়ে শ্রীনাথ তৃষার দিকে তাকায়। কিন্তু চোখে চোখ রাখতে পারে না বেশিক্ষণ। আবার মাথা নেড়ে বলে, ঠিক তা নয়। সন্দেহ করার কিছু নেই। তবে কোনও কারণে আমার মধ্যে বিষ ঢুকেছে।

কে তোমাকে বিষ দিতে পারে বলো তো! আমি?

শ্রীনাথ মনের দিক থেকে এতটাই দুর্বল যে এত স্পষ্ট কথা সহ্য করতে পারল না। বলল, ওই যে দেশি মদ খেতাম, হয়তো তাই থেকেই...

বলে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল তৃষা কথাটা বিশ্বাস করেছে কি না।

তৃষা মৃদু স্বরেই বলল, তোমার মনের কথা তো জানি না। তবে যদি সন্দেহই থেকে থাকে তবে সেই সন্দেহ নিয়ে তোমাকে এখানে থাকতেও বলি না। বদ্রী যে জমিটার খোঁজ আনবে সেটা কেনো। একটা ছোট বাড়ি তৈরি করে থাকো সেখানেই। কেউ বাধা দেবে না।

এ কথাটাও ভয়ংকর। এক বছর আগে এই প্রস্তাব মাথায় তুলে নিত সে। তৃষার বন্দিত্ব থেকে মুক্তি— সে এক অদ্ভুত সুখচিন্তা ছিল তখন। আজ সে কথা ভাবতেও ভয় করে। একা পাঁচ বিঘা জমি কোলে করে বসে থাকা। সে যাও বা দু'দিন বাঁচত তাও বাঁচবে না তা হলে। এরা বিষ দেয় বটে কিন্তু তবু ঘিরেও থাকে তাকে। একা থাকার কথা সে এখন ভাবতেও পারে না। একা হলেই সমস্ত পৃথিবীর ভার বুকে চেপে বসবে।

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, না না। থাকগে। এখন ওসব ভাবতে পারছি না। বদ্রীকে বারণ করে দিয়ো।

শ্রীনাথের শ্রীহীন বসে-যাওয়া শরীরের দিকে চেয়ে সামলে গেল তৃষা, না হলে তার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, বিষ তোমাকে কেউ দিচ্ছে না, বিষ তোমার মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে।

মুখে তৃষা বলল, যা ভাল বুঝবে করবে। আমি তোমার যাতে ভাল হয় তাই চাই।

তৃষার চাদরটায় রোদ পড়েছে। ভয়ংকর সেই শুকনো রক্তের রংটা চোখে বড় লাগে শ্রীনাথের। ভিতরটা চমকে ওঠে বার বার। সে প্রায় অস্ফুট গলায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, সেই তারা ধরা পড়েছে?

কারা?

ওই যারা তোমাকে বোমা মেরেছিল!

এ কথায় তৃষার চোখ দুটো ঝলসে ওঠে হঠাৎ। কিন্তু মুখে অন্য কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। স্বাভাবিক গলায় বলল, এখনও ধরা পড়েনি। তারা ফেরার।

কারা জানো?

জানি।

বড় দমে গেল শ্রীনাথ। ধরা পড়েনি অথচ তৃষা তাদের জানে। এর একটাই পরিণতি দাঁড়াতে পারে। পুলিশ ধরার আগেই তৃষার লোকেরা তাদের ধরবে। আবার চাদরের রংটার দিকে তাকায় শ্রীনাথ। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অভিনয় করার চেষ্টা করতে করতে শ্রীনাথ যা বলতে চায় না, তাই

বলে গেল, ছি ছি কী কাণ্ড! বাড়িতে ঢুকে অবলা মেয়েমানুষকে বোমা মারা! বেত মারা উচিত। ধরে চাবকানো দরকার।

বলতে বলতে চোখ বুজে থাকে শ্রীনাথ।

তৃষা বলে, ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। পুলিশ আছে. আইন আছে।

মাথা নেড়ে শ্রীনাথ মনে মনে বলে, তুমিও আছ।

তৃষা নিজের কথার খেই ধরে রেখে বলে, এখন বরং অন্য একটা জরুরি কথা বলে নিই। চিত্রার জন্য একটি ভাল পাত্র পাওয়া গেছে। এলাহাবাদেরই ছেলে। দিদি আমাদের মত চেয়ে চিঠি দিয়েছে।

কার পাত্র?

চিত্রার— আবার কার?

চিত্রার বিয়ে! চিত্রা! তার বিয়ে দেবে এখনই? বলো কী?

চিত্রার বয়স কত হল খেয়াল আছে?

শ্রীনাথ বেকুবের মতো বলে, কত হবে? তেরো! চৌদ্দ।

তোমার মাথা। আঠারো চলছে।

শ্রীনাথ তবু ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, তা হলেও বিয়ের বয়স নয়।

আমার বিয়ে হয়েছিল আরও কম বয়সে। ষোলো ভাল করে পেরোয়নি তখনও। মনে আছে?

শ্রীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার চোখ বোজে।

তৃষা বলে, তবু মানি বিয়ে আরও ক'দিন পরে দেওয়া যায়। কিন্তু মেয়ের বড় বাড়ন্ত গড়ন। পাত্রটিও ভীষণ ভাল। সুযোগটা ছাড়া উচিত হবে না।

তা বটে।

তোমার মত কী?

আমার মত!— শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, আমার মত কী আবার! চিত্রাকে তো মনেই পড়ে না, সে যে আমার মেয়ে তাই তো ভুলে গেছি।

তবু তো মেয়ে।

তা ঠিক। শ্রীনাথ চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে, বিয়ের আগে ওকে একবার আনাবে? দেখব! ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

তৃষা একটু অবাক হল। কিন্তু সহৃদয় গলায় বলল, দেখবে? তা হলে যাও না, এলাহাবাদ থেকে ক'দিন ঘুরে এসো। ওরা খুশি হবে।

এ কথায় দপ করে নিভে গেল শ্রীনাথ। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, না না। আমি কোথায় যাব? আমি পারব না অত দূরে যেতে।

কেন?

আমার ইচ্ছে করে না। ভয় করে। অনেক দূর।

তৃষা দাঁতে ঠোঁট চাপল। শ্রীনাথের ভাঙচুর দূর থেকে সে ভাল করে বোঝেনি। এখন যা দেখল, তা ভয়ংকর। এতটা সে কখনও ভাবেনি।

শ্রীনাথ চোখ বুজে আপন মনে নিঃশব্দে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ছিল।

তৃষা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেল। চলে যেতে যেতে একবার মুখ ফিরিয়ে আস্তে করে বলল, আসছি।

শ্রীনাথ সেকথা শুনতে পেল না, জবাবও দিল না।

তুমি কেন জোরে হাঁটছ না?

আমি অত জোরে পারি না।
পারো। নিশ্চয়ই পারো। ইচ্ছে করে হাঁটছ না।
না।— মাথা নাড়ে শ্রীনাথ, পারি না। আমার হাঁফ ধরে যায়।
তুমি কিন্তু বুড়ো হওনি। তোমার অসুখও সেরে গেছে।
একটা দীর্ঘশ্বাস আপনা থেকেই ঝরে গেল শ্রীনাথের।
সজল বাবার মুখের দিকে তাকাল। আজকাল বাবার মুখের দিকে তাকাতে তাকে বেশি মাথা উঁচু করতে হয় না। তার মাথা শ্রীনাথের কান ছুঁয়েছে। ক'দিনের মধ্যেই মাথায় মাথায় সমান হয়ে যাবে। তারপর শ্রীনাথকে ছাড়িয়ে উঠবে সে।
সজল বলল, রোজ যদি আসন করো তবে সব সেরে যাবে।
যোগাসন?
যোগাসন। বড়কাকা অনেক আসন জানে।
তুইও কি আসন করিস?
করি। আরও কত কী করি। ফ্রি হ্যান্ড, বক্সিং, কুংফু...।
গুন্ডা হবি নাকি?
না, গুন্ডাদের ধরে ধরে ঠ্যাঙাব।
আজকাল গুন্ডাদেরই সম্মান। সবাই তাদের খাতির করে।
সজল এ কথায় হাসল।
মাঠের ধারে রোজই এক গাছতলায় শ্রীনাথকে বসিয়ে রেখে সজল ক্রিকেট খেলে। শ্রীনাথ নড়ে না চড়ে না। চুপটি করে বসে আকাশপাতাল ভাবে। খেলা শেষ হলে সজল বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে।
তুমি আবার কবে থেকে অফিসে যাবে, বাবা?
রোজই ভাবি, কাল যাব। আর যাওয়া হয় না। শরীরটা ভাল নেই।
তোমার চাকরি যদি নট হয়ে যায়?
তা যাবে না। ওরা আমাকে খুব ভালবাসে।
প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে নেমে গেল সজল। একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় ঘাসের ওপর বসে থাকল শ্রীনাথ। দুর্বল, নির্জীব। তার ব্লাড সুগার ধরা পড়েছে। কিডনি ভাল না। লিভার ভাল না। কিন্তু সেসব তার এই নির্জীবতার কারণ নয়, শ্রীনাথ জানে। তাকে শেষ করে দিচ্ছে বিষ। আস্তে আস্তে শরীর ভরে যাচ্ছে বিষে। রেহাই নেই, পরিত্রাণ নেই।
ফেরার পথে সে বলল, শোন, আজকাল আমাকে কেউ কোনও খবর দেয় না। তুই একটা খবর কিন্তু আমাকে দিস।
কী খবর বাবা?
সেই যারা তোর মাকে বোমা মেরেছিল তারা যদি ধরা পড়ে তা হলে আমাকে জানাস।
সজল অবাক হয়ে বলল, তাদের তো ফাঁসি হয়ে গেছে।
যাঃ।— বলে ধমক দেয় শ্রীনাথ।
সজল হাসে, ধরা পড়লেই ফাঁসি হবে। আর ধরা তো পড়বেই।
সবাই কি ধরা পড়ে?
একজনকে কালিন্দীপুরে দেখেছে সখারামদা।
তারপর?
তাকে ফলো করা হচ্ছে কাল থেকে। আজকালের মধ্যেই অ্যারেস্ট হয়ে যাবে।
তুই জানলি কী করে?

মায়ের কাছে সব খবর আসে। তুমি মারদাঙ্গাকে ভয় পাও, বাবা?

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, মারপিটকে ঠিক ভয় পাই না। ভয় পাই তোদের। পৃথিবীতে আমার কোনও আপনজন নেই, এ কথা ভেবে মরতে বড় কষ্ট হবে।

আমরা আপন নই তোমার?

তোদের সঙ্গে যে আমার মেলে না। আমি খারাপ, তোরাও খারাপ। দু'পক্ষ দু'রকমের খারাপ। মেলে না যে! কী করে আপন হবি?

বাবা, একটা কথা বলবে?

কী বল তো!

তুমি আমার বাবা নও?

॥ সাতান্ন ॥

একদিন বিকেলে দুই বুড়োর দেখা হল গাছতলায়। মহানিমের বড় গাছ। বাগানের দক্ষিণ দিকে একটা পরিষ্কার জায়গায় গাছটা পুঁতেছিল মল্লিনাথ। তখন বন মহোৎসবের খুব ধুম। এখন সেই গাছের তলাটা বাঁধিয়ে দিয়েছে তৃষা। বিকেলের দিকে চমৎকার বসার জায়গা। দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা রাখার জন্য ওপাশে অনেকটা জমি কিনে নিয়েছিল মল্লিনাথ। সে জমি তৃষার আমলে আরও বেড়েছে। শীতের সবজির চাষ হয়। এমনিতে ভুঁইকুমড়ো, না হয় চিচিঙ্গে এমনি কিছু না কিছু সর্বদাই ফলছে। তবে তাতে দৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না। গাছতলায় বসলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। উদাস হয়ে বসে থাকা যায় অনেকক্ষণ।

শ্রীনাথ বসতে এসে দেখল জায়গাটায় আর একজন বসে। তার বাবা দীননাথ।

দীননাথের সঙ্গে শ্রীনাথের বহুকাল দেখা নেই। তাই দীননাথ হাঁ করে ছেলেকে দেখলেন অনেকক্ষণ। এই কি তার মেজো ছেলে শ্রীনাথ? হরি হে! গাল তোবড়ানো, মাথার শেষ ক'গাছি চুল শনের নুড়ি, চোখ ঘোলাটে। এটা কি শ্রীনাথ, সত্যি?

বাবা! ভাল আছেন তো?

ভালই। কিন্তু তোমাকে তো ভাল দেখছি না। কী হয়েছে? সবাই বলে বটে তোমার অসুখ করেছে। কিন্তু কী অসুখ বলে না।

স্ট্রোক মতো হয়েছিল একটু। সেরে গেছে।

সাবধানে থেকো। তোমার স্ট্রোক হওয়ার বয়স তো নয়!

ঠিক স্ট্রোক নয়। জানি না। ডাক্তাররা কিছু স্পষ্ট করে বলে না।

বলবে কী! জানেই না। আজকালকার ডাক্তাররা সব পেনিসিলিন চিনেছে। যাই হোক দেয় ঠুকে। মরলে মরল, বাঁচলে বাঁচল। দু'মাসের বাচ্চা থেকে আশির বুড়ো অবধি সবাইকে এক ওষুধ! বোসো, ভাল করে পা তুলে বোসো। চাদরে হাঁটু ঢেকে নাও, যা মশা এদিকটায়!

শীতকালে একটু মশা হয়।

বুলুর বাড়িতে মশা ছিল না। শীতটা কলকাতায় এত চেপে পড়েও না। এই দুটো মাস ওর কাছে থেকে আসতে পারলে ভাল হত। কতকাল আসে না ছেলেটা।

শ্রীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বাবা, আমাকে একটু শাসন করবেন তো মাঝে মাঝে।

শাসন!— বলে দীননাথ হাঁ করে শ্রীনাথের দিকে চেয়ে থাকেন, শাসন করব! বলো কী!

কেন, সেই যে ছেলেবেলায় যেমন করতেন!

সে তখন ছোট ছিলে করেছি। এখন আবার শাসনের কথা ওঠে কীসে?

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, ঠিক শাসন নয় বটে। মানে কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় তা তো

বুঝতাম না তখন। আপনি বা মা বলে দিতেন। আমার এখন আবার তেমনি ইচ্ছে করে। কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম সব একজন কেউ এসে চিনিয়ে দিক।

তোমার কথাবার্তা ভারী উল্টোপাল্টা লাগছে। এসব তো এখন তুমি নিজেই বুঝে নেবে।

বুঝতে পারছি না বলেই বলছি। আমাকে সৎ পরামর্শ দেওয়ার কেউ নেই। অথচ আয়ুও তো ফুরিয়ে এল।

বলো কী? এর মধ্যে আয়ু ফুরোনোর কী হল?

বাঃ! আমাকে স্লো পয়জন করা হচ্ছে না?

পাগল হয়েছ! বউমাকে ডেকে সব কথা খুলে বলো। উনি বুঝবেন। আমি এসব বুঝতে পারছি না।

শুনুন! সজল আমার ছেলে। ছেলে তো?

সজল তোমার ছেলে নয় তো কার?

শ্রীনাথ ওপর-নীচে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, আমারই। কিন্তু লোকে নানা কথা বলে মাথা ঘুলিয়ে দেয়।

লোকে মাথা ঘুলিয়ে দেবে কেন? কারা তারা?

আছে চারদিকে। আপনি শুধু বলুন, সজল আমার ছেলে?

তোমার ছেলেই তো!

সজলকে আমিও সেই কথা বলেছি। রোজ বলি। তুই আমার ছেলে।

ওসব কথা ভেবো না। মরার কথাও নয়। বুড়ো বয়সে আর-একটা পুত্রশোক আমার সহ্য হবে না। তুমি আজকাল চাকরিতে যাচ্ছ না?

আনমনে শ্রীনাথ কপিক্ষেতের ওপরে স্থির থম-ধরা বাতাসে ধোঁয়ার একটা ভাসন্ত স্তরের দিকে চেয়ে ছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, আপনার বউমা বলছে আমাকে দূরে এক জায়গায় পাঠাবে। সেখানে চাষবাস দেখব। একা থাকব।

তুমিও তাই চাও নাকি?

আগে চাইতাম। আজকাল দূরে যেতে ভয় করে।

চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছ?

না। তবে ছাড়তে তো সময় লাগবে না।

এ বাজারে চাকরি দুষ্প্রাপ্য। ভেবেচিন্তে ছেড়ো।

চাকরিটা কোনও প্রবলেম নয়।

এবার দীননাথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, প্রবলেম যে কী তাই তো মাথায় ঢোকে না। আমাদের আমলে জীবন ছিল সরল। সব বোঝা যেত। তোমাদের আমলে যত প্যাঁচঘোঁচ।

শ্রীনাথের চাদরে একটা কাক নোংরা ফেলেছে। সে ওপর দিকে চেয়ে বিশাল গাছটা দেখছিল। দাদা মল্লিনাথ এ গাছটা উপড়ে এনেছিল তায়েব নামে একটা লোকের উঠোন থেকে। তায়েব মল্লিনাথের মুরগি চুরি করেছিল, তারই পালটি। মল্লিনাথও পাগল কম ছিল না। বারো-চোদ্দোজন জোয়ান ধরাধরি করে শেকড়ছেঁড়া গাছটা এনে গর্ত খুঁড়ে দাঁড় করিয়ে দিল এখানে। বাঁচার কথা ছিল না, কিন্তু বেঁচে গেছে। এই গাছটা দিয়েই সেবার মল্লিনাথের বন মহোৎসব শুরু। তারপর বিস্তর গাছগাছালি লাগিয়েছিল। কিন্তু এই গাছটাকেই ভালবাসত সবচেয়ে বেশি। একটা মস্ত পাথর এনে ফেলেছিল তলায়। সেটার ওপর মাঝে মাঝে ঝুম হয়ে বসে থাকত এসে। বলত, এ হচ্ছে বিবেকানন্দ রক-এর মতো মল্লিনাথ রক। এখানে বসেই আমার একদিন রিয়ালাইজেশন হবে।

মহানিমের শুকনো পাতা একটি-দু'টি খসে পড়ছে। ভারী সুন্দর তাদের পড়া। বাতাসে ঘুরপাক খায়, কখনও খাড়া হয়, কখনও আড় হয়। একটু ডাইনে বাঁয়ে হেলাদোলা করে। তারপর প্রজাপতির

মতো অহংকার নিয়ে ঘাসের ওপর বা শানে বা শ্রীনাথের র‍্যাপারে আলগোছে বসে। বেশ লাগে দেখতে।

দীননাথ বললেন, আহ্নিকের সময় হল, উঠি।

হুঁ।— বলে শ্রীনাথ।

দীননাথ উঠলেন। উঠতে উঠতে বললেন, বুলু তোমার ছোট ভাই। তার এত বড় মিসহ্যাপ হয়ে গেল, তোমরা কেউ গেলে না!

মিসহ্যাপ? কিসের মিসহ্যাপ?

বউমার যে মরা বাচ্চা হল।

বেঁচেছে। জ্যান্ত হলে কষ্ট পেত। বড় কষ্ট বেঁচে থাকায়।

কী যে বলো সব, ঠিক নেই।

দীননাথ চলে যান।

চুপ করে বসে থাকে শ্রীনাথ। তার ডান দিকে বাড়ির ছাদের ওপর থেকে সূর্য পাটে বসে। ছায়া ঘনায়। শীত সাপের মতো শরীর বেয়ে উঠে আসে।

দূরে বেড়ার ওধারে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। এবার গলা খাঁকারি দিল। শ্রীনাথ তাকাল না।

একটু বাদে চাপা ডাক এল, শ্রীনাথবাবু! ও শ্রীনাথদা!

কে?— ম্লান স্বরে শ্রীনাথ জিজ্ঞেস করে।

শুনুন না! এই বেড়ার ধারে আসুন একটু।

শ্রীনাথ চটিতে পা গলিয়ে ওঠে। ক্ষেতের জমি ডিঙিয়ে এগিয়ে যায়।

চিনতে পারছেন?

রঘু স্যাকরা না!

যাক বাবা বাঁচালেন। লোকে বলে শ্রীনাথ চাটুজ্জেকে ওষুধ করে মাথা বিগড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ভয়ে ভয়ে ছিলাম।

কথাটা কী?

কথা আবার কী? এভাবে ফুর্তিবাজ মানুষ বাঁচে কখনও? চেহারায় তো সাতবুড়োর ছাপ ফেলে দিয়েছেন।

শরীরটা ভাল নেই।

দিব্যি আছে। একটু চাঙ্গা হওয়া দরকার শুধু। দেখবেন তেড়েফুঁড়ে স্বাস্থ্য এসে যাবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে। চোখে জ্যোতি বাড়বে।

দূর!

আপনার মুখে দূর শুনলে বল মা তারা দাঁড়াই কোথা! চলুন না একটু চেখে আসবেন। ভাল না লাগলে মাথার দিব্যি দিয়েছে কে!

শ্রীনাথ রঘু স্যাকরার দিকে অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার ভিতরে মদ খেয়ে ফুর্তি করার কোনও উৎসাহই নেই। তবু মনে হল, এই নেতিয়ে পড়ার হাত থেকে রেহাই মিলতেও পারে।

শ্রীনাথ ধুতির কোঁচাটা ভাল করে এঁটে হাঁচোর-পাঁচোর করে বাঁশের বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল।

ষষ্ঠীতলায় ম্যাচ খেলে এক দঙ্গল ছেলে চৌমাথা দিয়ে ফিরছে। হাতে হাতে ক্রিকেটের সরঞ্জাম। ছ'জনের হাতে ছ'টা স্টাম্প, দু'জনের কাঁধে ব্যাট, একজন বলটা লুফছে। ছ'জনের হাতে ছ'টা প্যাড, তাই দিয়ে মাঝে মাঝে পেটাপেটি করছে নিজেদের মধ্যে আপসে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে

সবাই। মাঝ বরাবর সকলের চেয়ে একমাথা উঁচু এবং দু'গুণ স্বাস্থ্যবান সজল। চোখে-মুখে আত্মপ্রত্যয় এবং গাম্ভীর্য। চাউনিতে কোনওরকম ভয়ের ছায়া নেই। দঙ্গল থেকে তাকে চোখের পলকে আলাদা করে চেনা যায়।

চৌমাথার বটতলায় গদাই নামে রোগা চেহারার একটা ছেলে বসে ছিল। দঙ্গলটাকে দেখেই সে দৌড়ে গেল।

সজল! সজল! তোর বাবাকে একটু আগে রঘু স্যাকরা নিয়ে গেল।

মুহূর্তে দঙ্গলটা ঘিরে ধরে গদাইকে, কোথায় নিয়ে গেল? কেন নিয়ে গেল?

গদাই উঁচু স্বরেই বলে, আমি ফলো করেছিলাম। স্টেশনের ওপাশে রামলাখনের বস্তিতে গিয়ে ঢুকল। রঘু স্যাকরা সজলের বাবার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঢুকল।

সজলের মুখে ভ্রুকুটি। মুখ থমথম করছে। বাবার যে মাথাটার ঠিক নেই ইদানীং তা সে একটু-আধটু টের পায়। তবু বাবা অনেক ভাল হয়ে গেছে এখন। মদ খায় না, রাত করে ফেরে না। বাবার সঙ্গে তার এখন খুব ভাল সম্পর্ক।

চারদিকে দঙ্গলটায় ফিসফাস চলছে। সকলের চোখ সজলের দিকে। লিডার যা বলবে তাই হবে।

সজল হাত বাড়িয়ে একটা ছেলের হাত থেকে একটা স্টাম্প নিয়ে নিল। বলল, শালা রঘু স্যাকরা আবার আমার বাবাকে খারাপ করছে। দেখাচ্ছি শালাকে।

প্রশ্ন উঠল, রামলাখন যদি লাঠি নিয়ে বেরোয়?

সজল গম্ভীরভাবে বলে, ক'টা লাঠি আছে ওর? আমরা এতগুলো আছি কী করতে?

চল!

আর কেউ কথা বলে না। সজলের পিছু পিছু নিঃশব্দে সবাই এগোয়। একটু ভয় পাচ্ছে তারা। একটু দ্বিধা আছে। তবে সজল আছে সামনে। একটা মজাও তো হবে। রামলাখনের ঝোপড়ায় মদ বিক্রি হয়, মেয়েমানুষের নাচ হয়, তারা শুনেছে। জায়গাটা একবার দেখাও হবে। সজলের পাগলা বাপটা কী করে তাও দেখা যাবে।

স্টেশন পেরিয়ে খালটার ধারে নেমে একটু এগিয়ে দঙ্গলটা থেমে গেল।

সজল মুখ ফিরিয়ে বলল, বাইরে থাকিস। আসছি।

লক্ষ্মীছাড়া চেহারার একটা বাচ্চা মেয়ে এক পাল হাঁস তাড়িয়ে নিয়ে উঠোনে ঢুকছিল। সজল তার পিছু পিছু ভিতরে পা দিল। কোথায় অনেকগুলো মুরগি ডাকছে কুক্ কুক্ করে। উঠোনের তিনদিকে তিনখানা মাটির ঘর। সব ক'টার চালেই লাউ ফলে আছে। উঠোনের এক কোণে গোটা দুই কাদামাখা মস্ত শুয়োর প্রাণপণে চিল্লাচ্ছে। চারদিকে বদ্ধ বাতাসে বিশ্রী পচা কটু একটা গন্ধ।

এক পলক চেয়েই কোন ঘরটায় বাবা আছে তা আন্দাজ করে নিল সজল। কোনও দ্বিধা এল না, বুক কাঁপল না, ভয় করল না, বরং অসহ্য রাগে আক্রোশে জ্বলতে জ্বলতে সে এক লাফে বারান্দায় উঠে নিচু দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

ভিতরের দৃশ্যটা প্রথমে ভুতুড়ে বলে মনে হয়। নিবু-নিবু টেমির আলোয় কিছুই দেখা যায় না। আবছা ছায়া-ছায়া জনা তিন-চার লোক বসে আছে চ্যাটাইতে।

সজল বোমাফাটানো গলায় গর্জন করল, বাবা!

লোকগুলো চমকে চায়। গেলাস থেকে মদ চলকে পড়ে।

কে রে বাবা ডাকে!— কে যেন মোদো গলায় বলে।

একদম কাছেই চ্যাটাইয়ের ওপর বসে থাকা কুঁজো মানুষটা মুখ তুলে চেয়ে থাকে।

বাবা!— আবার গর্জন করে সজল।

কুঁজো লোকটা অবাক হয়ে বলে, সজল! এই তো আমি এখানে! আয়, কী চাস?

সজল হাতের স্টাম্পটা এত জোরে চেপে ধরে যে গাঁটগুলো ব্যথা করে ওঠে। সে হামাগুড়ি দিয়ে নিচু হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকায়, কে তোমাকে এখানে এনেছে?

কেউ না। চল যাই।— বলে ওঠার চেষ্টা করে শ্রীনাথ। হাতের গেলাসটা সামনের লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এটা তুমিই মেরে দাও রঘু। আমার ছেলে এসে গেছে, আমি উঠি।

লোকটা খুব ছোট চোখে সজলকে নজর করছিল। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছে।

ওই লোকটা তোমাকে এনেছে, বাবা! রঘু স্যাকরা না?

আমাকে! আমাকে নিয়তি এনেছে। ও নিমিত্ত মাত্র।

কিন্তু তত্ত্বকথা শোনার মতো মেজাজ নেই সজলের। হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থাতেই সে হাত বাড়িয়ে লোকটার র‍্যাপার গলার কাছে মুঠো করে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে খাড়া দাঁড় করাল। পরমুহূর্তেই ফটাস করে তার হাতের স্টাম্পটা লোকটার হাঁটু ভেঙে দিল প্রায়।

বাইরে এসো শালা, এসো বাইরে! দেখাচ্ছি।

রামলাখন অদূরেই দাঁড়িয়ে। স্থির চোখে দেখছে। কিন্তু খদ্দেরকে বাঁচাতে সে এক পা-ও এগোল না, একটি শব্দও করল না। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-বলে সে বিপজ্জনক মানুষকে চিনতে পারে আজকাল। শ্রীনাথবাবুর এই ছেলেটা যদিও বাচ্চা কিন্তু এর চেহারাই বলে দিচ্ছে যে, এ একদম খুনি। রেগে গেলে দুনিয়া ওলট-পালট করে দিতে পারে।

রঘু চেঁচাচ্ছে, এ কী! এ কী! এসব কী হচ্ছেটা কি? বাবারে! ওফ! হাঁটুটা ভেঙে গেছে। উরে বাবা!

শ্রীনাথ হতবাক, স্তম্ভিত। সজল রঘুকে মারছে! অ্যাঁ! সজল রঘুকে মারছে! এত বড় লোকটাকে অতটুকু ছেলে!

রঘুকে বারান্দায় টেনে আনল সজল। তার গায়ের জোর রাগের ঠেলায় এখন তিনগুণ। রঘু টালমাটাল। বারান্দায় এনে স্টাম্পটা আর একবার চালায় সজল। লাগে গোড়ালির কাছ বরাবর।

রঘু উবু হয়ে গোড়ালি চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলে, কেন মারছিস রে বারোভাতারির পুত? কোথাকার পেল্লাদ এলি?

সজল একটা লাথি কষাতেই কাত হয়ে গেল রঘু। মাজা চেপে ধরে উপুড় হয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

শ্রীনাথের সংবিৎ এল এতক্ষণে। বেরিয়ে এসে দৃশ্যটা ক্ষণেক দেখেই ভারী রাগ হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে আচমকা ঠাস করে এক চড় বসাল ছেলের গালে, খুব গুন্ডামি শিখেছিস! অ্যাঁ! কে এসব করতে বলেছে তোকে?

সজল বাবার দিকে মুখোমুখি তাকায়। গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি এখানে এসেছ কেন?

কেন, এলে কী? কী করবি তোরা?— রুখে উঠে শ্রীনাথ বলে।

সজল এ কথার জবাব দেয় না। বন্ধুরা ফটকের বাইরে থেকে দেখছে। সে ওদের হাতের ইশারায় এগিয়ে যেতে বলে একটু অপেক্ষা করে। তারপর বাবার একটা হাত শক্ত করে ধরে বলে, বাড়ি চলো।

রঘু উঠে বসে মাজা ধরে হাঁফাচ্ছে। বলল, দেখলেন তো, দাদা! দরকারে যেন সত্যি কথাটা বলবেন।

নিঃশব্দে সজল ঘুরে কয়েক পলক রঘু স্যাকরার দিকে চেয়ে থাকে।

সজল ছোকরাটাকে এতদিন ভাল করে লক্ষ করেনি রঘু। আজ চোখের দিকে চেয়ে হিম হয়ে গেল সে। দিনান্তের ফ্যাকাসে আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাই যথেষ্ট। এই কলমের চারাটিকে যদি কেউ শিগগির নিকেশ না করে তবে রতনপুরের কপালে কষ্ট আছে। তৃষা তো এর কাছে ছেলেমানুষ।

কিন্তু সজলকে রঘুর দিকে এগোতে দিল না শ্রীনাথ। ধমক দিয়ে বলল, কান ছিঁড়ে ফেলব বাঁদরামি করলে। তুমি যে এত মাথায় উঠেছ তা আগে জানলে বেতিয়ে লাল করতাম। চলো বাড়ি।

শ্রীনাথ সজলের মধ্যে ভয়ংকর কিছুই দেখতে পায় না, যা রামলাখন দেখছে, রঘু দেখছে। তার কাছে সজল এখনও প্রায় কোলের ছেলে, অবোধ, দুষ্টু। ছেলেকে বকতে বকতে সে ছেলের হাত ধরেই রাস্তায় ওঠে। সজল সাবধানে বাবাকে রেললাইন পার করায়। তারপর রিকশা ডাকে।

সারা রাস্তা সজল একটাও কথা বলল না। শ্রীনাথ একতরফা মাঝে মাঝে রুখে উঠে তাকে বকাবকি করে গেল।

শ্রীনাথকে ভাবন-ঘরে পৌঁছে দিয়ে সজল বলল, আমি মাকে খবর দিতে যাচ্ছি।

শ্রীনাথ মুখ ভেঙিয়ে বলল, যাচ্ছি! যাও না! মাথা কিনে রেখেছে নাকি সবাই আমার?

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। গন্ধক পোড়ানোর গন্ধে উঠোনের বাতাসটা ভারী। মেজদি শাঁখে ফুঁ দিল পুবের ঘরে। সজল নিঃশব্দে মায়ের ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

প্লাস পাওয়ারের চশমা চোখে দিয়ে তৃষা কিছু কাগজপত্র দেখছে।

মা!

গম্ভীর তৃষা মুখ তুলে বলে, বলো।

বাবা আজ আবার রামলাখনের বস্তিতে গিয়েছিল।

তৃষা তেমন চমকাল না। অবাকও হল না। যেন একটু চিন্তিত মুখে চেয়ে বলল, তোকে কে বলল?

আমি গিয়ে ধরে আনলাম।

এবার তৃষা অবাক হয়ে তাকায়, তুই গিয়ে ধরে আনলি?

হ্যাঁ। গদাইয়ের কাছে খবর পেয়ে বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছিলাম।

তৃষা সত্যিকারের রেগে যায়। থমথমে মুখ করে বলে, ওসব নোংরা জায়গায় যেতে কে তোকে বলেছিল?

বাবা যখন যেতে পারে তখন আমার যেতে দোষ কী?

মুখে মুখে কথা বলছিস! খুব সাহস হয়েছে?

সজল চোখ নামিয়ে নেয়। মৃদু স্বরে বলে, আমি তো বাবাকে আনতে গিয়েছিলাম।

ঠিক কাজ করোনি। খবরটা আমাকে দিলে যা ব্যবস্থা করার আমিই করতাম। আর কখনও ওসব জায়গায় যেয়ো না।

বাবার জন্য ব্যবস্থা মা কোনওদিনই করেনি, কিন্তু সে কথা তুলল না সজল। একটু ইতস্তত করে বলল, রঘু স্যাকরা বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল।

তৃষা একটু কি চমকে উঠল? কিন্তু স্বাভাবিক গলাতেই বলল, ঠিক আছে, খোঁজ নিয়ে দেখব। তুমি এখন যাও।

আমি কিন্তু রঘু স্যাকরাকে মেরেছি।

তৃষা এবার বাস্তবিকই চোখে পড়ার মতো চমকে ওঠে, কী বললি? তুই মেরেছিস?

দরজার বাইরে আবছা অন্ধকারে সজলের লম্বাটে এবং চওড়া চেহারার ছায়াটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন তৃষার শরীর কেঁপে ওঠে শীতে। ভয়েও কি?

॥ আটান্ন ॥

কুঠে সামন্তর বাড়িটা এখন রোদে হাওয়ায় হাসছে। বাড়ির দাঁত নেই যে হাসবে। তবু কেন যেন ঠিক তাই মনে হয় নিতাইয়ের। চালে খড়, মাটির দেয়ালগুলোয় নতুন পলেস্তারা, উঠোনের দড়িতে একটা-আধটা শাড়ি কাপড় টাঙানো, বড় সুখের চেহারা বাড়িটার। রান্নাঘর থেকে রোজ ধোঁয়াও ওঠে।

সকালের দিকটায় প্রায়দিনই নিতাই এসে বাইরে থেকে হাঁক দেয়, কই গো!

কুঠে সামন্তর বউ এ সময়ে বাড়ি থাকে না। ধানকলে যায়। তো তার খোঁজে আসেও না নিতাই। যার খোঁজে আসে সে ভাইবোন সামলে, রান্না চাপিয়ে ভারী ব্যস্ত। তবু একটু হাসিপানা মুখ করে বেরিয়ে এসে বলে, এসো নিতাইদা।

দাদা ডাকটা নিতাই নিজেই শিখিয়েছে। প্রথমটায় কাকা ডাকতে লেগেছিল। সে ডাকটা নিতাই পছন্দ করেনি।

জড়িবুটির পোঁটলা পাশে রেখে নিতাই উঠোনে শীতের রোদে ঠ্যাং মেলে বসে যায়। জটার ঘা শুকোলেও উকুনের উৎপাত বড্ড হয়েছে। খাবলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে নিতাই সব খোঁজ-খবর নেয়, কী রান্না হচ্ছে? কেমন আছে সবাই? তারপর নিতাই নিজের কথা পেড়ে ফেলে, কালও এসেছিল ন-পাড়া থেকে একদল। বলে মন্ত্র দাও। কলা মুলো টাকা চাল ডাল পাহাড়-প্রমাণ এনে ফেলেছে। আমি বলি কী, মন্ত্র দেওয়া কী মুখের কথা! নিলেই হল? দিলেই হল? যাও গিয়ে তিন দিন হবিষ্যি করো, মন পবিত্র করো, কালীর থানে পুজো চড়াও, তারপর দেখা যাবে। তা কে শোনে কার কথা! পা দু'খানা ঠেসে ধরল।

বিনি, অর্থাৎ কুঠে সামন্তর ডাগর মেয়েটি, এসব কথার অর্থ বোঝে। নিতাই টোপ ফেলছে। ফিক করে হেসে বলে, জটা বড় বিচ্ছিরি। ও নিতাইদা, জটা ছাড়া তান্ত্রিক হওয়া যায় না?

নিতাইয়ের মুখ বেজার হয়। জটা ছাড়া তান্ত্রিক হয় কি না তা সে ভাল জানে না। তবে এটা জানে যে জটা ছাড়া ব্যাবসা হয় না। জটা রক্তাম্বর রুদ্রাক্ষ ত্রিশূল, রক্তচক্ষু এসব না হলে মানুষ ভড়কাবে কেন? আর না ভড়কালে মাথাই বা নোয়াতে যাবে কেন? তাই সে বলে, তা হয়। তবে কিনা আমার জটার অনেক গুণ। স্বয়ং মা গঙ্গা এই জটার মধ্যে সেঁধিয়ে রয়েছেন। কতবার নিংড়ে গঙ্গাজল বের করেছি। তা ছাড়া জটার চুল নিয়ে গিয়ে অনেকে কবচ করে। একগাছা চুল দশ পয়সা।

বলো কী?— বলে হাঁ করে থাকে বিনি। আর জটা ছাঁটাবার কথা মুখেও আনে না।

নিতাই মাতব্বরের মতো মাথা নেড়ে বলে, তান্ত্রিকরা যদি পয়সা চায় তবে টাকার বৃষ্টি করে দিতে পারে। তবে কিনা পয়সাকড়ির কথা আমরা ভাবি না, এই যা।

আমাকে একদিন টাকার বৃষ্টি দেখাবে?

দেখাব। তবে পাঁচজনের সামনে নয়। ভারী গুহ্য সাধনার ব্যাপার তো!

মেয়েটার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়েই নিতাই টের পায়, জমছে, খেলা জমছে। কিন্তু জমে লাভ কী? বউদিমণি যদি টের পায় তবে বাড়ি থেকে তাড়াবে। আর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে নিতাইয়ের ঠাঁই জুটবে কোথায়? সত্যি বটে, তার নামেও বউদি দশ বিঘে জমি কিনেছে, কিন্তু সে জমি কোথায় তা নিতাই জানে না, দলিলটাও চোখে দেখেনি। সে জমির নাগালও সে কোনওদিন পাবে না। তা হলে তার নিজের বলতে রইল কী? বউ নিয়ে উঠবে কোথায়? খাওয়াবেই বা কোন কাঁচকলা?

তোমার বউ কেন পালিয়েছিল গো, নিতাইদা? তুমি তো লোক খারাপ নও! মা বলে, নিতাইবাবার মনটা বড় ভাল।

সেটা আর সে বুঝল কই বলো? মড়ার খুলি দেখে ভয় পেল কিনা! তন্ত্র-সাধনার গুহ্য কথা কি মেয়েরা বোঝে?

বিনি চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা! বউ থাকতে তুমি তান্ত্রিক হয়েছিলে নাকি? লোকে তো বলে, বউ পালানোর পর হয়েছ!

নিতাই ধরা পড়েও ঘাবড়ায় না। আঙুল দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, পুরোপুরি ছিলাম না বটে। তবে একটু-আধটু নাড়াচাড়া করতাম।

তোমার সেই বউ খুব সুন্দরী ছিল?

ছিল এক রকম। নাকটা চাপা। তা ছাড়া ভালই।

নাক তো আমারও চাপা।

তোমার? যাঃ। তোমার বলে টিকলো নাক!

এইসব আগড়ম বাগড়ম বকতে বকতে বেলা চড়ে। নিতাই জানে, বেশিক্ষণ বসলে বিনি খেতে বলবে। সেটা ঠিক হবে না। গরিব মানুষ, একটা বাড়তি লোককে খাওয়াতে এদের যে কত কষ্ট হয়। তা ছাড়া খায়ই বা কী? কচু ঘেঁচু আর পাতা সেদ্ধ, একটু লবণ আর লংকা। তাই নিতাই বসে না। উঠে পড়ে।

বিনি খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বলে, আবার এসো। তুমি এলে ভারী ভাল লাগে।

একদিন দুপুরে সামন্তর বাড়ি থেকে ফেরার পথে রঘু স্যাকরা ডেকে বলল, চা খাবি নাকি?

বহুকাল রঘু স্যাকরার সঙ্গে দেখা নেই। একবার খামোখা খুব ঝামেলায় পড়েছিল। সেই থেকে আর ওপথ মাড়ায় না। তবে কেউ ডাকলে না গিয়েও পারে না নিতাই।

রঘুর নতুন বাড়ির দাওয়ায় বসে বলল, খুব টাকা হয়েছে তোমার দেখছি।

রঘুর মুখখানার চেহারা ভাল না। হাসি নেই, গোমড়াপানা। একটা বাটিতে অ্যাসিডে সোনা জ্বাল দিচ্ছে কাঠ-কয়লার আংরায়। গন্ধে কাশি আসে, পেট গুলোয়।

রঘু বাটিটা নামিয়ে রেখে কাছে এসে বসে বলল, খবর-টবর সব শুনেছিস?

কী শুনব?— সন্দেহের চোখে চায় নিতাই।

ও বাড়ির খবর। চাটুজ্জেবাড়ির।

খবর তো কিছু নেই। শুধু বড়দিদিমণির বিয়ে হবে শুনেছি। তা সে এখানেও নয়। এলাহাবাদে।

ও খবর নয়। শ্রীনাথ চাটুজ্জে যে আবার মাইফেলে যাচ্ছে, সে খবর শুনিসনি?

ওঃ। সে তো নতুন কিছু নয়।

শ্রীনাথের ছেলেটা তো খুব উঠেছে দেখছি।

সজলখোকা? সে আবার উঠবে কী?

উঠবে কী?— বলে মুখ ভেঙায় রঘু।— আলিসান চেহারা হয়েছে। ডাকাত-টাকাত হবে বড় হলে। তেমনি হাড়ে-হারামজাদা।

সজলখোকা আবার তোমার কী করল?

দিতুম সেদিনই ঠ্যাং ভেঙে। নেহাত ছেলেমানুষ, তা ছাড়া বাপটাও সামনে রয়েছে। কিছু বলিনি। কিন্তু সাবধান করে দিস। এর পর বাঁদরামি করলে পুঁতে ফেলব।

নিতাই হাসে তড়পানি দেখে। মাথা নেড়ে বলে, ব্যস ব্যস, অত লাফিয়ো না। সবাই কি আর নিতাইখ্যাপা? ঝেড়ে কাশো তো বাপ, ব্যাপারটা শুনি আগে।

রঘু রক্তচোখে চেয়ে বলে, ইঃ, কে আমার সালিশি এলেন! ওঁকে বলতে হবে!

চা খাওয়াবে বলছিলে যে!

রঘু উঠে গিয়ে বাটিটা আবার নেড়েচেড়ে দেখে। অ্যাসিডটা সাবধানে আর-একটা পাত্রে ঢেলে দিয়ে উঠে আসে। বলে, চা চা করে গলা শুকোচ্ছিস কেন? বলেছি যখন, হবে।

তো কথাটা কী?

কাউকে বলবি না?

কার দিব্যি কাটতে হবে বলো, কাটছি।
মা কালীর।
মা কালীর দিব্যি।
তোর দিব্যির কোনও দাম নেই। তবু বলছি, শ্রীনাথবাবুকে রামলাখনের ঘরে আমি নিজে থেকে নিয়ে যাইনি।
তাই নাকি?
মাইরি।
নিজে থেকে নাওনি, তবে কি বাবু নিজেই গেল?
তাও নয়।
গুহ্য কথাটা কী?
মাসটাক আগে ভটভটিয়া চেপে শ্রীনাথের শালা সরিৎ এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমি নারকোল গাছের গোড়ায় নুন দিচ্ছিলুম। দেখে ভটভটিয়া থামিয়ে নেমে এসে অনেক আগড়ম বাগড়ম কথা পাড়ল। ছোকরাকে আমার পছন্দ নয়, তবে মস্তান বলে কথা। খাতির রাখতে হয়। শেষমেশ বলে ফেলল, জামাইবাবুর অবস্থা তো জানেন। কেমনতরো পাগলা পাগলা ভাব। ডাক্তার বলেছে, আগের সব অভ্যাস হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় এরকমটা হয়েছে। তা আবার একটু ফুর্তিটুর্তি করলে সেরে যাবে। চিকিৎসাই একরকম।
তাই বটে!— চোখ কপালে তোলে নিতাই।
বললে কিন্তু কেটে ফেলব, নিতাই।
কালীর দিব্যি করেছি। নিশ্চিন্তে বলো।
কথা এটুকুই। বলল, জামাইবাবুকে মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে যাবেন। তবে কেউ যেন টের না পায়।
তুমি রাজি হলে?
রাজি না হয়ে উপায়? রামে মারে, রাবণেও মারে যে!
বউদি যদি জানতে পারে?
সে কথাও তুললাম। চোখ টিপে বলল, ডাক্তারের পরামর্শ তো, মেজদি কিছু মনে করবে না। তখনই বুঝলুম, চাটুজ্জেগিন্নির সায় আছে।
সরিৎ তোমাকে কিছু দিল-টিল?
না। কী দেবে?
কিছুই না?
জুতো খাবি কিন্তু, নিতাই।
নিতাই হেসে বলল, সাধু সেজো না। ক'দিন আগে একজোড়া বালা ভেঙে রতনচূড় করতে দেয়নি বউদি তোমাকে?
সে কি ঘুষ?
তা নয় তো কী? ও বাড়ির গয়না করে কলকাতার স্যাকরারা। তোমার মতো হাভাতে সোনার বেনেকে কে পোঁছে হে?
যা, তা হলে চা পাবি না।
তা হলে কথাটাও গোপন থাকবে না।
মা কালীর দিব্যি কাটলি যে!
তুমিও তো চা খাওয়াবে বলে ডেকেছিলে। রেখেছ সে কথা?
চা হবে রে বাপ, কথাটা ওভাবে ধরিসনি।

মাল ছাড়ো, কথা যেভাবে ধরতে বলবে সেভাবেই ধরব।

ধরাধরির কিছু নেই। শ্রীনাথবাবু এখন আবার একটু ফুর্তি করার জন্য আঁকুপাঁকু। বেচারার জন্য কষ্টও হয়। কিন্তু এ কালান্তক ছেলেটার জন্য ভয় পাই। সেদিন রামলাখনের ঘরে ঢুকে লঙ্কাকাণ্ড করে এসেছে। ওকে একটু বুঝিয়ে বলবি যে, দোষটা আমার নয়।

দোষটা কার ঘাড়ে চাপান দেব তা হলে?

ডাক্তারের ঘাড়ে। বলবি ডাক্তার বলেছে।

ও ছেলে অত সহজে ভুলবার নয়।

তবে ভবি ভুলবে কীসে?

সে ভার আমার। আমাকে একটা ঘর করার জায়গা দেবে? তোমার তো মেলা জায়গা, আধকাঠা পেলেও আমার হয়।

দূর শালা! ভাগ।

আচ্ছা, এখন তো চা খাওয়াও।— বলে নিতাই জুত করে বসে।

সজলের বন্ধুদের বলা আছে। তারা চারদিকে নজর রাখে। পাহারা দেয় সজল নিজেও। ইস্কুল থেকে ফিরেই সে আসে ভাবন-ঘরে, ঢুকে বাবাকে দেখে। যখন বিকেলে খেলতে যায় তখন তার হয়ে বাবাকে পাহারা দেয় খ্যাপা নিতাই বা নতুন মালি। সজল সবাইকে বলে রেখেছে, রঘু স্যাকরাকে কাছেপিঠে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই যেন তাকে খবর দেওয়া হয়।

সন্ধের পর বাড়ির মাস্টারমশাই চলে গেলে সে নিজেই বাবার কাছে চলে আসে। শ্রীনাথও তাকে দেখলে খুশি হয়।

আয়। মাস্টারমশাই চলে গেছেন?

হ্যাঁ।

বোস, কাছে এসে বোস। যা শীত।

এক লেপের তলায় গায়ে গায়ে বাপ-ব্যাটায় বসে গুটিসুটি হয়ে। সজল এখন মাথায় মাথায় শ্রীনাথের সমান লম্বা। শ্রীনাথের চেয়ে তার স্বাস্থ্য ভাল এবং গায়ের জোর অনেক বেশি। খুব হঠাৎ করেই সজলটা এমন ধাঁ বেড়ে উঠল। এই বেড়ে ওঠাটাকে খুব উপভোগ করে শ্রীনাথ। সে গাছপালার বেড়ে ওঠা লক্ষ করেছে। এমন সতেজ সহজ বাড়ন খুব সুলক্ষণ। গাছপালাকে কখনও একটু ছাঁটকাট করতে হয়। তাতে বাড় আরও ভাল, কিন্তু মানুষের ছাঁটকাট কীভাবে হবে তা তো সে জানে না।

সজলের বাড়ন্ত শরীরে নিজের শরীরের তাপ সঞ্চার করে দিতে দিতে শ্রীনাথ বলে, আজকাল আমি কেমনধারা হয়ে গেছি যেন। বোধহয় বেশিদিন বাঁচব না। তুই আমাকে দেখিস।

সজল গম্ভীর গলায় বলে, আর কখনও যাওনি তো, বাবা?

রামলাখনের ওখানে? দূর বোকা।

আমি কিন্তু চারদিকে পাহারা রেখেছি।

পাহারা!— বলে অবাক হয় শ্রীনাথ, সে কী রে! পাহারা কেন?

রঘু স্যাকরা যদি তোমাকে নিয়ে যায়।

শ্রীনাথ চুপ করে থাকে। তারপর অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বলে, রঘুর দোষ কী? নিমিত্ত মাত্র। আমিও তো ভাল নই। নইলে সে ডাকল আর আমিও কেন চলে গেলাম!

সজল মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলে, তুমি খুব ভাল বাবা।

দু'জনে আর-একটু নিবিড় হয়ে বসে। শ্রীনাথ একটু আবেগের ধরা গলায় বলে, ভালই তো ছিলাম একসময়ে। তারপর সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। কাঁচা পয়সা, নিশ্চিন্তের জীবন এসব ভাল নয়।

তুই একটু দুঃখে থাকিস, টানাটানিতে থাকিস, ভাল থাকবি।

সজল হঠাৎ লেপটা গা থেকে সরিয়ে চিতাবাঘের মতো দ্রুত গিয়ে এক ঝটকায় পশ্চিমের জানালাটা খুলে বলল, কে?

ভয়ার্ত গলায় জবাব এল, আমি।

সজল তেমনি বাঘের মতো গিয়ে দরজার হুড়কো খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সজলখোকা, আমি নিতাই।

কী চাও?

একটা কথা।

চালাকি কোরো না। স্পাইগিরি করছিলে?

চালাকি নয় গো।

কে তোমাকে লাগিয়েছে কথা শোনার জন্য?

মাইরি কেউ না।

সজল হঠাৎ বিকট স্বরে চেঁচিয়ে বলে, আমার বাবার ওপরে যে স্পাইং করবে তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে দেব।

নিতাই ভড়কে গিয়ে বলে, কথাটা শোনোই না। অত চেঁচালে যে লোক জুটে যাবে। সজল অবশ্য কথাটা নিতাইকে উদ্দেশ করে আর-কাউকে শোনাচ্ছিল। কেননা তার ক্রুদ্ধ চোখ ভিতরবাড়ির দিকে। চোখটা ফিরিয়ে অন্ধকারে কালো চাদরে মুড়ি দেওয়া নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, মিথ্যে কথা বলবে না তো!

না। তোমাকে মিথ্যে বলে কি মার খেয়ে মরব?

কী কথা?

রঘু স্যাকরার দোষ নেই। তোমার মামা তাকে লাগিয়েছিল বাবুকে রামলাখনের আড্ডায় নিয়ে যেতে। আমার নাম কোরো না কিন্তু। বলে গেলাম, এবার পালাই।

সজল খুব অবাক হল না। কিন্তু একা অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাগে বিদ্বেষে পাগল হয়ে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল।

ভিতর থেকে শ্রীনাথ ডাকল, সজল, আয়। কে রে?

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে সজল বলে, নিতাই।

আবার বাপ-ব্যাটায় কাছ ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে।

শ্রীনাথ বলে, তুই কি খুব ডাকাবুকো? দুষ্টু?

সজল হাসে। বলে, না। তবে আমাকে সবাই ভয় খায়।

তোকে? তুই তো একটুখানি ছেলে, তোকে ভয় খায় কেন?

কী জানি!

মারপিট করিস?

অন্যায় দেখলে। তাছাড়া নয়।

শ্রীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ওসব করিস না। চারদিকে শত্রু। কে কবে শোধ নিতে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তোকেও মেরে ফেলবে।

আমাকে মা অবধি ভয় পায়। জানো?

তোকে?—শ্রীনাথ অবাক, কই তোকে দেখে তো ভয়ের কিছু মনে হয় না।

সজল হাসে, একমাত্র তুমিই আমাকে ভয় পাও না। বরং আমিই তোমাকে ভয় পাই, বাবা।

দূর পাগল! আমাকে ভয়ের কী? কেউ আমাকে ভয় পায় না।

আমি পাই। আমি যে তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

॥ উনষাট ॥

ফেয়ারলি প্লেসে ব্ল্যাকারদের সঙ্গে হাতাহাতি করে, লাইন ম্যানেজ করে এবং বুকিং ক্লার্কদের সঙ্গে বিস্তর অর্থহীন কথা বলে সরিৎ এলাহাবাদের তিনটে সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারের টিকিট কেটে ফেলল। ঝাড়া ঘণ্টা চারেকের চেষ্টায়।

বেরিয়ে এসে টিকিটগুলোর দিকে চেয়ে চুকচুক করে একটু আফসোসের শব্দ করল। একেবারে ফালতু গচ্চা। এলাহাবাদ পর্যন্ত অনায়াসে বিনা টিকিটে যাওয়া যেত, খরচ লাগত অর্ধেকের কম। কিন্তু সেজদিকে সে কথা বলাই যায় না।

শেষবেলায় বাড়িতে ফিরে বিজয়ীর মতো হেসে সেজদির হাতে টিকিট দিয়ে বলল, ব্ল্যাকে কাটতে হয়নি। লাইনেই পেয়ে গেলাম।

তৃষা কোনও জবাব দিল না। থমথমে গম্ভীর মুখে টিকিটগুলো নিয়ে ঘরের আলমারিতে রেখে এল। বলল, সজলকে একটু ডেকে দিয়ে যাস তো। বোধহয় পুরনো গোয়ালঘরটায় আছে।

সরিৎ গিয়ে দেখে, মস্ত বালির বস্তায় হাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুসি চালাচ্ছে সজল। মুখ রক্তবর্ণ, সর্বাঙ্গে জবজবে ঘাম।

অবাক সরিৎ বলে, কী করছিস? বক্সিং?

সজল গম্ভীর মুখে বলে, হ্যাঁ।

কে শেখায় তোকে?

কেউ না। নিজে শিখছি।

সরিৎ নিজের কাজকর্ম এবং ভবিষ্যৎ তৈরি করতে ইদানীং এতই ব্যস্ত ছিল যে, সজলকে ভাল করে লক্ষই করেনি। আজ করল। এবং একটু অবাক হল।

তুই কত ফুট লম্বা রে?

পাঁচ নয়।

সজলের উচ্চতা ওরকমই হবে। বেশি ছাড়া কম নয়। তবে আরও লম্বা হবে। অনেক লম্বা। সরিতের নিজের হাইট মাত্র পাঁচ আট। কিন্তু সে আর বাড়বে না। শুধু লম্বাই নয়, সজলের কাঠামোটা আশ্চর্য রকমের মজবুত। কবজি দু'খানা চওড়া, হাত দু'খানা যেমন লম্বা তেমনি দ্রুতগতিসম্পন্ন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এবং সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার হল, সজলের দু'খানা চোখ।

বহুকাল বাদে হঠাৎ একটা অজানা ভয়ে বুকটা সামান্য কেঁপে উঠল সরিতের। এ ছেলেকে সামলানো মুশকিল হবে। এর ওপর আধিপত্য করা যাবে না কখনও। এসব সরিৎ এক নজরেই বোঝে।

সে তবু মুখে হাসি টেনে এনে বলল, খুব তিনঠ্যাঙা লম্বা হয়েছিস তো!

সজল ঘুসি থামিয়ে ঘরের বেড়ায় গোঁজা একটা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে ঘাম মোছে।

সরিৎ মস্ত বস্তাটায় হালকা দু'-একটি ঘুসি মেরেই বুঝতে পারে, এই ভারী কর্কশ বালিতে ধার হয়ে ওঠা বস্তায় একনাগাড়ে ঘুসি মারা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কবজি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, লিগামেন্ট ছিঁড়তে পারে।

সরিৎ ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, তোর পাঞ্জার কেমন জোর হয়েছে!

সজল একটু হাসল, তারপর হাত বাড়িয়ে সরিতের চেয়ে অন্তত দেড়গুণ বড় থাবায় চেপে ধরল হাতখানা।

সরিৎ বিস্তর মারপিট করে হাড্ডি পাকিয়ে ফেলেছে। তার হাতে ব্যথা লাগে না, তবু হাতখানা ধরে সে বুঝতে পারল, সজলের গায়ে জোর যে তার চেয়ে বেশি তাই নয়, বহু বহুগুণ বেশি। সরিৎ

না হয়ে অন্য কেউ হলে সজলের আঙুলের চাপে ককিয়ে উঠত। সরিৎ ককিয়ে উঠল না, কিন্তু আবার এক অজানা ভয়ে খানিকটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

সজলের পিঠ চাপড়ে সরিৎ বলে, ভাল তৈরি হয়েছিস। খুব ভাল। তোকে কয়েকটা শক্ত কায়দা শিখিয়ে দেব। কালিম্পং-এর একজন ব্রাউন বেল্টের কাছ থেকে শেখা।

সজল খুব উৎসাহ দেখাল না। উদাস মুখে বলল, দিয়ো।

এখন যা। তোকে সেজদি ডাকছে।

গায়ে গেঞ্জি ছিলই। বেড়ার গা থেকে জামাটা টেনে গায়ে চড়াল সজল। বলল, তুমি এগোও। যাচ্ছি।

চিন্তিত মুখে সরিৎ গিয়ে তার মোপেড চালিয়ে বাজারে গেল। ত্রয়ীতে নতুন মাল এসেছে। দাম ফেলতে হবে।

জামার ওপর হাতকাটা সোয়েটার চাপিয়ে সজল এসে মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়ায়।

তৃষা বেরিয়ে আসে।

শেষবেলায় শীতের ম্লান রোদ পড়েছে সজলের মুখে। মুখের ঘাম সবটা মরেনি এখনও।

লম্বা, সারবান চেহারা। চোখের দৃষ্টি এই বয়সেই যথেষ্ট স্থির এবং গভীর। নির্ভুল একজনের ছাপ পড়েছে সজলের চেহারায়। কিন্তু সেই লোকটিকেও দিনকালে এ ছেলে ছাড়িয়ে যাবে। তৃষা কিছুতেই আজকাল ছেলের সামনে সহজ বোধ করে না। কেমন অস্বস্তি হয়।

ডেকেছ?

তৃষা গম্ভীর মুখে বলে, সামনের সপ্তাহে আমরা এলাহাবাদ যাচ্ছি।

আমরা মানে!

আমি, তুই আর সরিৎ।

আমি গিয়ে কী করব? স্কুল কামাই হবে না?

মামি তোকে দেখতে চেয়েছে। আমরা বেশিদিন থাকব না।

সামনেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা।—সজল ঘাড় শক্ত রেখেই জবাব দেয়।

দু'-তিন দিনে কিছু হবে না।

বড়দির বিয়ের ব্যাপার, সেখানে আমাকে দিয়ে কী হবে?

কিছু হবে না। কিন্তু আমি তোমাকে একা বাড়িতে রেখে যেতে চাই না।

সজল অবাক হয়ে বলে, একা কেন? মেজদি, ছোড়দি আছে, বাবা আছে।

তাদের থাকা না-থাকা সমান। তুই কবে থেকে মুখে মুখে জবাব দিতে শিখলি?

তুমি বোকার মতো কথা বলছ বলেই জবাব দিচ্ছি।

বোকার মতো!—বলে স্তম্ভিত হয়ে তৃষা চেয়ে থাকে ছেলের দিকে। এত সাহস! এত সাহস এরা কোত্থেকে পায়?

কিছুক্ষণ তৃষা কথাই বলতে পারল না।

সজল অভ্যাসবশে একটু ভয় পেল। মা সম্পর্কে এখনও তার ভয়টা পুরোপুরি যায়নি। শক্ত কাঠামোর গম্ভীর ও আদরহীন তার এই মা তো গায়ের জোরে সবাইকে টিট করে রাখেনি। আর-একটু কিছু আছে। সেই রহস্যময় অজানা একটু কিছুকেই পেরোনো যায় না।

সজল চোখ নামিয়ে বলে, এখন আমি যেতে পারব না। তুমি মেজদি বা ছোড়দিকে নিয়ে যাও।

তৃষা কিছু বলল না। নিঃশব্দে ঘরে চলে গেল। ঘরের ঠিক মাঝখানে আবহাওয়ায় কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাগ হয় না, পরাজয়ের গ্লানিও বোধ করে না। শুধু এক শূন্যতা এসে তার ভিতরটাকে ফাঁকা বোধবুদ্ধিহীন করে দেয় কিছুক্ষণের জন্য।

সজল নিজের ঘরে গিয়ে জামা-প্যান্ট পালটায়। একটু চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

আগে সে মায়ের কাছে থাকত। তারপর জায়গা হল দুই দিদির ঘরে। সম্প্রতি তার একটা আলাদা ঘর হয়েছে। এ ঘরে সে একা থাকে। ভূতের ভয় পেত আগে। এখন পায় না। আজকাল খুব কম জিনিসকেই ভয় পায় সজল।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে সে এলাহাবাদ যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল। বেড়াতে যাওয়া খারাপ নয়, কিন্তু এখন তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হয় সে চলে গেলে বাবার বিপদ হবে।

পায়ে চটি গলিয়ে সজল ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভাবন-ঘরে এসে ঢোকে।

বাবা!

শ্রীনাথ বাগানের ধারের রাস্তায় বেড়াবে বলে গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে তৈরি হচ্ছিল। বলল, কী রে?

মা এলাহাবাদ যাচ্ছে।

জানি। চিত্রার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।

আমাকেও নিয়ে যেতে চাইছে।

শ্রীনাথ ভালমানুষের মতো বলে, যা না! ঘুরে আয়।

আমি বলেছি যাব না। সামনে পরীক্ষা।

ও। তাও তো বটে। তবে তোকে নিয়ে যেতে চায় কেন?

কী জানি। মার ধারণা, এ বাড়িতে একা থাকলে আমি বদমাইশি করব।

শ্রীনাথ মুখ বিকৃত করে বলে, বাজে কথা।

মা খুব রাগ করেছে। তুমি মাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?

কী বলব বল তো?

বোলো, আমি চলে গেলে তোমার অসুবিধে হবে।

তাতেও তো তোর মা রেগে যাবে।

সে আমি জানি না। তুমি যেমন করেই হোক যাওয়ার ব্যাপারটা কাটিয়ে দাও।

শ্রীনাথ চিন্তিত মুখে চেয়ে থেকে বলে, আমার কথার কি কোনও দাম আছে ওর কাছে? তবু বলে দেখব।

তুমি বললেই হবে।

খুবই গম্ভীর মুখে সরিৎকে নিয়ে পরের সপ্তাহে এলাহাবাদ রওনা হয়ে গেল তৃষা। তিনদিনের নাম করে গেল, সাতদিনও এল না বা চিঠি দিল না।

তৃষার খবরের জন্য এ বাড়ির কেউই উদ্বিগ্ন নয়। শুধু বুড়ো দীননাথ মাঝে মাঝে ডাক-খোঁজ করেন, ওরে বউমার পৌঁছন সংবাদ এল? ডাকঘরে একটু খোঁজ নে না তোরা। ওরা তো কত চিঠি হারিয়ে ফেলে, বিলি করে না।

প্রায় রোজই মঞ্জু আর স্বপ্নার সঙ্গে সজলের ঝগড়া হয় আজকাল। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। বাগানে প্রায়ই গোরু ঢোকে। বাড়ির গোরু দুয়ে দুধ অনেক কম হয়, গ্রাহকরা রাগারাগি করে। হাঁস মুরগিদের ডিমও কম পড়ছে আজকাল। উঠোনে শুকনো পাতা পড়ে থাকে। তৃষার ঘরের দাওয়ার নীচে বসে ইস্পাত রাতবিরেতে কেঁদে ওঠে প্রায়ই।

এই তক্কে একদিন মালাবদল সেরে নিশুতিরাতে চুপিচুপি বিনিকে এনে ঝোপড়ায় তুলে ফেলল খ্যাপা নিতাই।

পরদিন তাকে নিয়ে হইচই পড়ে গেল বাজারে। জটা নেই, টেরিকাটা মাথা। দাড়ি কামানো। প্রথমটায় লোকে চিনতেই পারেনি। গম্ভীর মুখে বাজার করছিল। একজন দু'জন করে চিনে ফেলতেই ভিড়ে ভিড়াক্কার।

নিতাই ভিড় ভালবাসে। তাকে নিয়ে লোকে হইচই করুক তাও চায়।

সে ভিড়ের দিকে হাত তুলে বরাভয় দেখিয়ে টিউবওয়েলের মাথায় উঠে দাঁড়াল। গলা ঝেড়ে বলল, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের পরিচিত নিত্যানন্দ মহারাজ এখনও নিত্যানন্দ মহারাজই আছেন। তন্ত্রসাধনা অতি গুহ্য সাধনা। এর স্বরূপ কেউ জানে না। গতকাল গুরুদেব স্বপ্নে আদেশ করলেন, ওরে নিতাই, অনেককাল ব্রহ্মচর্য হল। এবার একটু গেরস্থ হ। গৃহস্থ না হলে সংসারটাকে টের পাবি কী করে? তোর তো পনেরো আনাই হয়ে আছে, এইটে হলেই ষোলো আনা হয়...

শুনে লোকে হাততালি দিল।

পনেরো দিনের মাথায় এলাহাবাদ থেকে কাশী আর লক্ষ্ণৌ ঘুরে তৃষা ফিরে এল। নিতাই ঝোপড়ার দরজা আর দিনমানে খুললই না সেদিন।

তৃষা ফিরে আসার পরই গোরুর দুধ বেড়ে যায়, হাঁস-মুরগিরা উচিত মতো ডিম পাড়ে, উঠোন ঝকঝক করে, মঞ্জু স্বপ্না আর সজলের ঝগড়া মিটে যায়।

তবে তৃষার মুখ একটা কাঠের মুখের মতো গম্ভীর থাকে। সহজ হয় না, স্বাভাবিক হয় না।

পরদিন সকালে শ্রীনাথের ঘরে এসে তৃষা বলল, ছেলে আমার পছন্দ হয়েছে। মত দেব?

পছন্দ হলে মত দেবে না কেন?

তোমার মতও তো আছে!

আমার মত বলে কিছু নেই।

কিন্তু তুমি মেয়ের বাবা, চিঠিটাও তো তোমাকেই লিখতে হবে।

আমি আজকাল লিখতে পারি না। হাত কাঁপে। তুমি লিখে দাও বয়ানটা, আমি সই করে দিচ্ছি।

ছেলেটা কেমন তা জানতে চাইলে না?

তোমার যখন পছন্দ হয়েছে তখন ভালই হবে। সংসারের এসব ব্যাপার তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝো।

তৃষা চলে আসে।

ঝোপড়ার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দুই জোড়া ভিতু চোখ লক্ষ করছিল তৃষাকে। এখনও টের পায়নি। বিনি যে এ ঘরে আছে তা কারও জানা খবর নয়। ধরা পড়লে কী হবে তাও ভেবে ঠিক করতে পারছে না দু'জনে।

তৃষাকে কেউ কিছু বলেওনি। তবু আনমনে ভিতরবাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে তৃষা একবার আলতো দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ঝোপড়ার দিকে। তাকিয়েই ভ্রু কোঁচকাল। ঝোপড়ার উঠোনটা নিকোনো, ঘাস চাঁচা। একটা নতুন গামছা ঝুলছে দড়িতে।

ঘরে এসে সে মংলুকে ডেকে বলে, খ্যাপা নিতাইকে ধরে আন তো। আর দেখে আসবি ওর ঘরে কেউ আছে কি না।

বলেই পরমুহূর্তে আবার কী একটু ভেবে বলল, থাক এখন। বিকেলের দিকে ডেকে আনলেই হবে।

মংলু হাসিমুখে বলে, আজ্ঞে নিতাই জটা ছেঁটে ফেলেছে। দাড়িও চেঁচেছে।

তৃষা কাঠমুখেই বলল, ও। আচ্ছা যা। সজলকে বলিস, যেন স্কুলে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

প্লাস পাওয়ারের চশমা চোখে পাত্রপক্ষকে দেওয়ার চিঠিটা মুসাবিদা করতে বসল তৃষা। খুব বেশিকিছু লেখার নেই। তা হলেও অনেকটা সময় নিয়ে সে নির্ভুল করল চিঠিটাকে।

মা!

তৃষা তাকায়। দরজায় সেই মানুষটার ছায়া। সারাজীবনে যে একটি মাত্র মানুষকে ভালবাসতে পেরেছিল তৃষা। কিন্তু তার এই ছায়াকে সে কেন ভালবাসার চেয়েও ভয় পায় বেশি?

মা আর ছেলে মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে। দু'জনেই আজ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে, আমরা পরস্পরের শত্রু।

॥ ষাট ॥

সাতসকালে কে যেন 'শ্রীনাথবাবু! শ্রীনাথবাবু!' বলে ডাকাডাকি লাগিয়েছে। এ সময়টায় শ্রীনাথের ভারী একটা আমেজের ঘুম হয়। আধোঘুম আর আধো-জাগরণের মধ্যে সে ভারী একটা আয়েসি ব্যাপার। বিরক্ত হয়ে উঠে দরজা খুলে দেখে, প্রেসের আর এক প্রুফরিডার মানিক গুপ্ত। বহুকাল দেখা নেই।

কীরে? কী ব্যাপার? আয় ভিতরে এসে বোস।

জিভ কেটে মানিক বলে, বসব কী? স্বয়ং বদুবাবু বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। ঘরদোর একটু সামলে নিন। আপনার খবর করতে এসেছেন।

বলিস কী? বদুবাবু!—বলে শ্রীনাথ ভারী ব্যস্ত হয়ে লোকজন ডাকাডাকি করতে লাগল।

হাঁকডাকে বৃন্দা আর নতুন একটা কাজের লোক দৌড়ে এসে ঘরদোর সারতে লাগে। শ্রীনাথ কোনওক্রমে মুখ ধুয়ে কাপড় পালটে নেয়। তারপর ফটকের বাইরে দাঁড় করানো পুরনো প্রকাণ্ড হাডসন গাড়িটার কাছে এগিয়ে যায়।

আজ্ঞে, আপনি আসবেন ভাবতেই পারিনি।

বদুবাবুর বয়স শ্রীনাথের মতোই হবে। ফর্সা, গোলগাল বনেদি চেহারা। বাবা কষ্ট করে কারবার তৈরি করেছিল। এরাও ব্যাবসা জানে। প্রেস ছাড়াও অন্যান্য কারবার আছে। প্রচুর পয়সা।

বদুবাবুর পরনে পাঞ্জাবি আর ধুতি। কাঁধে শাল। মুখটা ব্যক্তিত্বময়, গম্ভীর। একটু হেসে বলে, আপনি সেই যে অসুখের খবর দিলেন, তারপর আর দেখা নেই। বাবার আমলের লোক, কী হল কী হল ভাবতে ভাবতে চলে এলাম।

আসুন, আসুন, বড় ভাগ্য।

বদুবাবুর সঙ্গে মানিক আর ড্রাইভার ছাড়াও বাড়ির চাকর এসেছে। সে একটা মাঝারি ঝুড়ি নামাল সামনের সিট থেকে। ফল-টল আছে, অনুমান করে শ্রীনাথ।

ভাবন-ঘর অল্প সময়ের মধ্যে ফিটফাট হয়ে গেছে। এমনকী টেবিলে ফ্লাওয়ার-ভাস-এ টাটকা ফুলও হাজির।

বদুবাবু চেয়ারে বসে বললেন, কী হয়েছিল বলুন তো!

স্ট্রোক মতো।

এখন কেমন আছেন?

এখন ভালই।

চেহারা কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না।

শ্রীনাথ একটু হেঁ হেঁ করল।

বদুবাবুর হাতে হীরের আংটি, মুক্তোর আংটি, পান্নার আংটি। গলায় সোনার চেনে গৃহবিগ্রহের লকেট। মৃদু একটু সুবাস ছড়াচ্ছে গা থেকে। শ্রীনাথ বিগলিত হৃদয়ে অবাক চোখে কেবল দেখল আর দেখল। স্বয়ং বদুবাবু তার বাড়িতে! বিশ্বাস হওয়ার কথা?

বদুবাবু বলে, শরীর যখন তেমন কিছু খারাপ নয় তখন কাল থেকে প্রেসে আসতে থাকুন না কেন! কাজটাজ তেমন কিছু করতে হবে না। সুপারভাইজ করবেন একটু।

ঘাড় চুলকে শ্রীনাথ বলে, শরীরের জন্য নয়। মনটাই কেমন হয়ে গেছে। দূরে যেতে ভয় ভয় করে।

বদুবাবু উদাস মুখে বলে, ভয় তো আমারও। বাবা মরে যাওয়ার পর থেকেই কেমন একটা

মরণের ভয় এসে ধরেছে। কেবল ভয় পাই, এই বুঝি কে কোথায় মরে গেল, আর বুঝি তার সঙ্গে ইহজন্মে পরজন্মে আর দেখা হল না। মনটা খুব দুর্বল হয়ে আছে সেই থেকে। গত দু'দিন কেবল আপনার কথাই মনে হচ্ছে। শ্রীনাথবাবু বেঁচে আছেন তো! তাই আজ ছুটে এসেছি।

দেখি একটু ভেবে।

ভাববার কিছু নেই। আপনার এখনও পঞ্চাশ পেরোয়নি, বুড়োও হননি। এই বয়সে অত ঘাবড়াবার কী আছে? চলে আসুন, বাদবাকি যে ক'দিন বাঁচি সবাই মিলেমিশে থাকি।

শ্রীনাথ এ কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তৃষা খবর পেয়ে ভিতরবাড়ি থেকে প্রচুর খাবার চা পাঠিয়েছে। বদুবাবু বসে বসে অনেকটা খেল। চায়ে চুমুক দিতে বলল, এ জায়গাটা বেশ ভাল।

বদুবাবু উঠল। শ্রীনাথ গাড়িতে তুলে দিয়ে এল তাকে। তারপর ঘরে এসে ভাবতে বসল। এখান থেকে কলকাতা আগে হাতের নাগালে মনে হত। আজকাল মনে হয়, কলকাতা বুঝি সাত সমুদ্দুরের পার। কী করে অতদূরে রোজ যাবে শ্রীনাথ?

বউদিমণি নোটিশ দিয়েছে, এ বাড়িতে আর থাকা চলবে না। নিতাই বাজারের দিকে বস্তিতে সস্তায় একখানা ঘর পেয়ে গেছে। তার নিজের এলেমে নয়। বউ পাঁচ বাড়ি ঠিকে ঝিয়ের কাজ করবে। তার রোজগারেই এই ঘর নেওয়া।

আজ নিতাই সকালে উঠেই ঝোপড়াটা ভাঙছিল। একটু আগে তার তল্পিতল্পা মাথায় করে বউ বস্তিতে রওনা হয়ে গেছে। ফাঁকা নড়বড়ে ঘরখানা ভাঙতে তেমন কষ্ট নেই। তবে চালের ওপর একটা সতেজ লাউডগা। সেটার জন্যই যা কষ্ট। কুশি কুশি লাউ ফলেছে মেলা।

বাঁশের খুঁটিগুলোর গোড়া নড়বড়ে, বেড়ার বাঁধন পচে গেছে কবে। চালে খড় পচে গোবর। পোকামাকড় বিস্তর বাসা করেছিল। নিতাইয়ের সঙ্গে সেগুলোরও আশ্রয় গেল।

লাউডগা সমেত চালের খড়গুলো নামিয়ে নিতাই ঘাম মোছে। গাছটা যদি বাঁচে এই আশায় বাঁশ-বাখারি দিয়ে চটপট একটা মাচান খাড়া করতে লেগে যায় সে। মংলু এসে তাড়া দেয়, হল তো? একটু বাদেই ভুঁইমালি এসে এ জায়গা চৌরস করবে। হাত চালা।

দাঁড়া তো। মাচানটা বেঁধে দিই আগে।

তোর ওই লাউগাছ থাকবে ভেবেছিস? মালি এসে একটানে উপড়ে ফেলে দেবে। খামোখা খাটছিস।

কথাটা সত্যিই। নিতাই দম ধরতে একটু জিরোয়। বলে, বিড়ি-টিড়ি কিছু আছে? দে না।

তা দেয় মংলু। লোকটা চলে যাচ্ছে। বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে বলে, বিয়ে করলি বলে জায়গাটা গেল তোর। দিব্যি ছিলি।

ভৈরবী ছাড়া সাধনভজন হয় শুনেছিস?

মংলু সঠিক বিশ্বাস করে না নিতাইকে। আবার পুরোপুরি অবিশ্বাস করতেও ভয় পায়। ব্যাটার বাণে কাজ হয় না ঠিকই। আবার যদি এক-আধটা লেগে যায়! তাই সে নিতাইয়ের মুখের ওপর তেমন ঠাট্টা-ইয়ারকি করে না। তারও বালবাচ্চা আছে। মংলু বলে, সামন্তর বেটি আবার ভৈরবী হল কবে থেকে?

ভৈরবী কি পেট থেকে পড়ে রে ব্যাটা? বানিয়ে নিতে হয়।

কবে আর বানাবি বাপ? নিজেই জটা কেটে দাড়ি কামিয়ে ভদ্রলোক বনে গেলি!

নিতাই বিড়িতে লম্বা টান মারে। নিমীলিত চোখে লাউগাছটার দিকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। বলে, পটাশপুরে এক মহান্ত এসেছে। কপাল থেকে জ্যোতি বেরোয়। সেই জ্যোতিতে হোমের আগুন জ্বালে। বিদ্যেটা শিখে আসতে হবে।

তোরও তো অনেক বিদ্যে শুনি।

দূর! এখনও কত শেখার আছে।—বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বউদিমণি তা হলে এখানে ক্ষেত করবে!

তাই তো বলল ভুঁইমালিকে।

ক্ষেত জ্বলে যাবে।

মংলু অবাক হয়ে বলে, কী করে জানলি?

এখানে পঞ্চমুন্ডির আসন ছিল রে ব্যাটা! বহুত ইলেকট্রিসিটি জমে আছে এখানে। গাছ কি বাঁচে?

তবে লাউগাছটা বাঁচল কী করে?

সে আমি ছিলাম বলে। আমি না থাকলে ভূতেরা তিনধা নাচন নাচতে লাগবে। দেখিস, বলে দিলাম।

মংলু একটু হাসে। অনিশ্চয়তার হাসি।

নিতাই বিড়িটা শেষ করে অন্যদিকে চেয়ে বলে, বাবু জানে?

তা কে বলবে?

বাবু জানতে পারলে রাগ করবে। আমাকে বাবু বড় ভাল চোখে দেখে।

মংলু উদাস মুখে বলে, বাবু রাগ করলেই বা কী? মা যখন বলেছে তখন সেইটেই হাকিমের আইন।

বড়দিদির বিয়েটা পর্যন্ত থাকতে পারলে বেশ হত। বউদিমণি বলেছিল আমাকে ফাইফরমাশ খাটতে এলাহাবাদ নিয়ে যাবে। ভেবেছিলাম, এলাহাবাদ থেকে হিমালয়টা কাছে হয়, একবার ঘুরে আসব। অঘোরীবাবার চরণ দু'খানাও দর্শন হয়ে যাবে।

অঘোরীবাবা কে রে?

নাম শুনিসনি? তিন হাজার বছর এক ঠাঁই বসে সাধনা করে যাচ্ছে। গায়ে পটপট করছে পোকা। জটা মাইলখানেক লম্বা।

বলিস কী?

শুধু কি তাই! সাপের মতো খোলস ছাড়েন একশো বছর পরপর। হিমালয়ে অঘোরীবাবার ঠিকানাটা আমাকে এক সাধু লিখে দিয়ে গিয়েছিল।

মংলু সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তা যাবে এলাহাবাদ, তাতে কী?

মুখখানা বেজার করে নিতাই বলে, আর তো যেতে বলছে না।

বলবে, বিয়ের দেরি আছে। সেই ফাল্গুনে।

ফাল্গুনের আর দেরি কী?

এলাহাবাদটা কোনদিকে বল তো!

হিমালয়ের গোড়ায়। সেখানকার জলহাওয়া খুব ভাল শুনেছি। মেলা সাধু আসে।

মংলু ওঠে। বলে, ঘর ভাঙা হয়ে গেলে ডাকিস। বাঁশবাখারিগুলো বাগানের উত্তরদিকে চালার নীচে জমা করে যাস।

তোকে ভাবতে হবে না। যা।

লাউডগাটা ভুঁইমালি এসে উপড়ে ফেলবে। তবু নিতাই সেটাকে ফেলে যেতে পারছে না। আবার উঠে মাচানটা বাঁধতে লেগে যায়। মালিটা মহা খোঁচড় লোক। কিছু বলতে গেলেই খেঁকিয়ে ওঠে। লাউডগাটার কথা তাকে সাহস করে বলবে কি না ভেবে পায় না নিতাই। বিড়ির একটু তামাক জিভ দিয়ে থুঃ করে ফেলে নিতাই আপনমনে বলে, দূর খ্যাপা! দুনিয়াটাই তো তোর নিজের। এ জায়গা ও জায়গা বাছিস কেন? সব সমান। বাজারের বস্তিও যা, চাটুজ্জেবাড়ির বাগানও তা।

ঝোপড়া ভেঙে জিনিসপত্র চালার নীচে সরিয়ে রেখে নিতাই মস্ত বকুল গাছটার তলায় বসে জিরোচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, যাওয়ার কথাটা বাবুকে জানানো দরকার।

যেই ভাবা সেই গিয়ে ভাবন-ঘরে উঁকি মারে নিতাই।

ইজিচেয়ারে বসে ইংরিজি একটা খবরের কাগজ কোলে নিয়ে পেনসিল দিয়ে কী যেন কাটাকুটি করছে বাবু। খবরের কাগজের পিছনে একটা সুন্দরমতো মেয়েছেলের ছবি।

বাবু!

উঁ!—শ্রীনাথ কাগজ নামিয়ে বলে, নিতাই নাকি?

আজ্ঞে। একটা কথা বলতে এলাম।

আমিও তোর কথাই ভাবছি। ভিতরে আয়।

নিতাই ভিতরে ঢুকে মেঝের ওপর বসে।

আমার তো ঝাটিপাটি ওঠাতে হল এখান থেকে।

কথাটা না বুঝে শ্রীনাথ বলে, কী বলছিস?

আজ্ঞে চলে যেতে হচ্ছে।

কোথায়?

বস্তিতে ঘর নিয়েছি।

সে কী! আমার যে তোকে ভীষণ দরকার। কাল থেকে প্রেসের চাকরিতে যাব। তুই রোজ আমার সঙ্গে গিয়ে সারাদিন থাকবি, আবার আমার সঙ্গেই ফিরে আসবি।

ঠিক এই সময়ে লাউগাছটার কথা মনে পড়ায় বড় হু-হু করে উঠল বুক। নিতাই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে।

কাঁদছিস কেন?

বউদিমণি তাড়িয়ে দিলেন যে!

তাড়ায় কেন?

বিয়ে করেছি বলে।

বিয়ে করেছিস? কই, বলিসনি তো!

আজ্ঞে লুকিয়ে-চুরিয়ে করেছি। বউদিমণির ভয়ে।

শ্রীনাথ বহুকাল বাদে একটু সত্যিকারের হাসি হাসল, বিয়ে করে বেশ করেছিস। আর একবারও তো করেছিলি। এবারকার বউটা কেমন?

খুব ভাল। অমন মেয়ে হয় না।

ভাল হলেই ভাল। কিন্তু বিয়ে করলি বলেই বউদি তাড়িয়ে দিচ্ছে, এ কেমন কথা?

আজ্ঞে সবাই বলছে বুড়ো বয়সে কচি মেয়ের সর্বনাশ করেছি।

বউটা খুব বাচ্চা নাকি?

বাচ্চা নয়. ডাঁটো মেয়ে।

তোর বয়স কত?

কত আর হবে! ঠিক বুঝতে পারছি না।

সে যা-ই হোক, কাল থেকে আমার সঙ্গে রোজ কলকাতায় টানা মারতে হবে, কথাটা মনে রাখিস। বরং আজই গিয়ে স্টেশন থেকে একটা মাস্থলি করে আয়। টাকা দিচ্ছি।

সে যাব। কিন্তু বউদিকে কথাটা একটু বলে রাখবেন বাবু। নইলে যা চটে আছে আমার ওপর!

তোকে বস্তিতে যেতে হবে না। ঝোপড়াতেই থাক। আমি তোর বউদিকে বলে দিচ্ছি!

ঝোপড়া ভাঙা হয়ে গেছে। মালি সেখানে চাষ দেবে।

শ্রীনাথ অবাক হল। বলল, তুই না দাদার আমলের লোক!

আজ্ঞে। এই বাড়ি ঘর সব আমার চোখের ওপর হয়েছে।

শ্রীনাথ একটু চিন্তিত হয়। একটু ভেবে বলে, ঝোপড়া ভেঙেছিস তো কী আছে! ভাবন-ঘরের পিছনদিকে ছাড়া জমি আছে। চালাঘরে বিস্তর টিন আর খুঁটি আছে। একটা ঘর বেঁধে নিগে যা।

কিন্তু বউদি?

বউদিকে আমি বলছি।

তৃষার কথা কোনওদিন ওলটায় না। যা বলে তাই হয়। কিন্তু আজ যখন গিয়ে শ্রীনাথ তাকে বলল, খ্যাপা নিতাইটাকে আমার বড় দরকার। কাল থেকে রোজ আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে। তখন তৃষা না করল না।

রঘু স্যাকরা বসে ছিল তৃষার ঘরে। তাকে বিয়ের গয়নার বরাত দিচ্ছিল তৃষা। শ্রীনাথের কথা মন দিয়ে শুনে বলল, ঠিক আছে, ওকে নতুন করে ঘর তুলে নিতে বলো গে।

॥ একষট্টি ॥

কোনও মহিলা যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চায় তবে তাতে বাধা দেওয়ার কী আছে?—বোস সাহেব খুব ক্লান্ত চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করে।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, মিসেস বোসকে আপনিও চেনেন, আমিও খানিকটা চিনি। প্রপার গাইডেন্স না থাকলে উনি সব টাকা-পয়সা নষ্ট করে ফেলবেন। ব্যাবসা বা দোকান চালানোর জন্য যে মন দরকার তা ওঁর নেই।

গাইডেন্স ও নেবে না।

আমাকে উনি পার্টনার করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এখন ও আপনার নামটাও সহ্য করতে পারছে না।

কেন বলুন তো!

ও জানে ওর চারশো টাকা অ্যালাউন্স আপনি ঠিক করে দিয়েছেন এবং ও যাতে সব টাকা ওড়াতে না পারে তার জন্য আপনিই নানারকম প্রিকশন নেওয়ার অ্যাডভাইস আমাকে দিয়েছেন।

কথাগুলো ওঁকে বলে ভাল করেননি।

বোস ক্লান্ত স্বরে বলে, আই অ্যাম টায়ার্ড অফ হার। আর কত অভিনয় করা যায় বলুন তো!

অভিনয় না করতে চাইলে কোর্টে যেতে হয়। সেটাও কি ভাল?

আমি এখন কোর্টে যেতে রাজি।

গেলে আপনি সহজেই ডিভোর্স পেয়ে যাবেন। কারণ মিসেস বোস মামলা লড়বেন না। কিন্তু তারপরে ওঁর অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভেবেছেন? ওঁর বাপের বাড়ির অবস্থাটা ভাল নয়, আত্মসম্মানবোধ বেশি বলে উনি নিজেও সেখানে যাবেন না। যতদূর খোঁজ রাখি ওঁকে আশ্রয় দেওয়ার মতো কেউ নেই। চাকরি যে চট করে পাবেন তারও নিশ্চয়তা নেই।

সেইজন্যই ওর দোকানের স্কিমটা আমি সাপোর্ট করছি।

দীপনাথ ম্লান হেসে বলে, উনি তিন মাসও দোকান চালাতে পারবেন না।

আচমকাই বোস সাহেব বলে, লেট হার ম্যারি এগেন। আবার বিয়ে করুক। সেই স্কাউন্ড্রেলটাকেই করুক, কী নাম যেন, স্নিগ্ধদেব না কি!

দীপনাথ থমথমে মুখে বলে, স্নিগ্ধদেব ম্যারেড ম্যান। তাছাড়া একটা বেশ বড়সড় স্কলারশিপ নিয়ে উনি এখন আমেরিকায়।

আমি তো এতসব জানিও না।

আমি জানি। স্নিগ্ধদেব বোধহয় এসব সমস্যায় জড়াতে চাইত না। বিয়ের কথা বলছেন? এ দেশে এখনও ডিভোর্সি মেয়েদের অত সহজে বিয়ে হয় না।

ফাইন্ড এ ওয়ে, চ্যাটার্জি। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিচ হার। কিন্তু ওকে আটকে রাখা মানে আমার নিজেরও আটকে থাকা। ইউ নো মাই প্রবলেমস।

দীপনাথ স্থির চোখে বোস সাহেবকে দেখছিল। উত্তরবাংলা থেকে ফিরে আসার কিছু পর থেকেই সে বোস সাহেবকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অধৈর্য দেখছে।

দীপনাথ মৃদু স্বরে বলে, আচ্ছা, আমি ভেবে দেখছি। দু'-একদিন সময় দিন।

বোস সাহেব জবাব দিল না।

দীপনাথ বোসের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে এল। অন্য তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের জন্য আলাদা তিনটে প্লাইউডের খুপরি তৈরি হয়েছে। শুধু দীপনাথই খুপরিতে যেতে রাজি হয়নি। তাই সে এখনও মস্ত হলঘরটার একপাশে খোলামেলা জায়গায় বসে।

টেবিলের কোণটার দিকে ভ্রুকুটি করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে দীপনাথ। উত্তরবাংলা থেকে ফিরে এসে বার দুই মণিদীপার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছে। মণিদীপা কথা বলেইনি। ক্রুদ্ধ অপমানকর গলায় বলেছে, আই হেট টু টক উইথ ইউ। অথচ মণিদীপার সঙ্গে এখন কথা বলার দরকার। বোকা মেয়েটা জানেও না, বা জানলেও বোঝে না যে, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। দীপনাথ বাইরে থেকে কতদিন বালির বাঁধ দিয়ে রাখবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপনাথ কাজে মন দেয়। কিন্তু আবার আনমনা হয়ে যায়। নিজের ভেতরকার এক পাপবোধ তাকে বড় অস্থির করছে, কুঁকড়ে দিচ্ছে, কাজে মন দিতে দিচ্ছে না। মণিদীপাকে কি সে-ই নষ্ট করেনি? স্নিগ্ধদেব হয়তো মণিদীপার নেতা ছিল, প্রেমিক ছিল না কিছুতেই। কিন্তু দীপনাথ জানে, মণিদীপাকে যদি সত্যিকারের বিভ্রান্ত কেউ করে থাকে তবে সেই ব্যক্তি সে নিজেই। এখন সে মণিদীপার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও লাভ নেই। তাতে ভাঙা সংসার জোড়া লাগবে না। দীপনাথ নিজেও দুর্বল। বড় দুর্বল। মণিদীপার কথা সে খুব কম সময়েই না ভাবে! এখনও এক তীব্র অদ্ভুত আনন্দ রয়েছে মণিদীপাকে মনে করার মধ্যে।

থাকতে না পেরে দীপনাথ বোস সাহেবদের বাড়িতে রিং করল। বাবুর্চি ফোন ধরে জানাল, মেমসাহেব বাড়ি নেই। লাঞ্চেও ফিরবে না বলে গেছে।

একা বেরিয়েছে?

না, একজন দালাল এসেছিল।

দালাল কিসের?

মনে হয় বাড়ির দালাল। মেমসাহেব একটা দোকানঘর খুঁজছে।

দীপনাথ ফোন রেখে দেয়।

বিকেল পর্যন্ত অনেক ফোন এল। অনেক কাজ করল দীপনাথ। কিন্তু মন কান সবই উৎকণ্ঠ রয়েছে অন্যদিকে।

বেলা চারটে নাগাদ ফোন বাজতেই তুলে মেয়েলি গলায় 'হ্যালো' শুনে সে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, মণিদীপা?

মণিদীপা? মণিদীপা আবার কে বলো তো সেজদা!

ওঃ, তুই বিলু? কবে ফিরলি?

আজই।

প্রীতম কেমন আছে?

ভালই তো। নিজের আপনজনদের কাছে ভাল থাকারই তো কথা।

ওভাবে বলছিস কেন? কিছু হয়েছে?

এসো, সব বলব।
আজ আসার সময় হবে না রে।
না হয় কাল অফিসের পর এসো। আসবে?
চেষ্টা করব।
মণিদীপাটা কে বলো তো!
ওঃ, বসের বউ। টেলিফোন করার কথা ছিল, তাই হঠাৎ মেয়েলি গলা শুনে ভাবলাম সে-ই।
তোমাকে আর তোমার বসের বউকে নিয়ে কিন্তু অনেক কথা রটেছে। জানো?
দীপনাথ ভীষণ চমকে গিয়ে বলে, সে কী?
এমনকী আমি শিলিগুড়িতেও শুনে এসেছি।
কে বলল?
এলে বলব। ফোনে কি সব বলা উচিত?
কোথা থেকে কথা বলছিস?
মাদ্রাজিদের ফ্ল্যাট থেকে। ছাড়ছি। কাল এসো।
বাকি সময়টা দীপনাথ গাড়লের মতো হতবুদ্ধি মুখে বসে রইল চেয়ারে। কিছুই করতে পারল না।
একসময়ে উঠে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। চারদিকে রথযাত্রার ভিড়। গায়ে গায়ে লোক। বাস ট্রাম ট্যাক্সিতে বাদুড়ঝোলা মানুষ। দীপনাথ পথে পথে অনেকক্ষণ হাঁটল। হাঁটতে হাঁটতে রেসকোর্স পেরিয়ে এল। ডাইনে, কখনও বাঁয়ে মোড় নিয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ধরে অবিরাম হেঁটে সে যখন নিউ আলিপুরে বোস সাহেবের ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছল তখন তার ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু মানসিক বিকলতায় সে দেহের ক্লান্তি টের পাচ্ছিল না।
সন্ধের গাঢ় অন্ধকার নেমে গেছে। শীতশেষের ঠান্ডার অন্তিম কামড় এবার বেশ তীব্র। দীপনাথ অবশ্য মাইল মাইল হেঁটে ঘেমে গেছে। আকণ্ঠ জলতেষ্টা পেয়েছে তার। তবে ক্ষুধাবোধ নেই। লোকে তার আর মণিদীপার কথা বলাবলি করে। সত্যিই করে। নইলে বিলু জানল কী করে? লজ্জা! লজ্জা!
কলিং বেল টিপতে হল না। দরজা খোলা ছিল। আর খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখা গেল, বাইরের সাজ পরা মণিদীপা বসার ঘরে কিছু কাগজপত্র আর একটা ডটপেন নিয়ে কিছু করছে। টেবিলে এককাপ কফি।
এবার বেশ কিছুদিন পর মণিদীপার সঙ্গে দেখা হল দীপনাথের। অনেক রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। চোখে-মুখে কিছু রুক্ষতা। সাজগোজে বেশ একটু অমনোযোগ।
দীপনাথকে দেখে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, এত ঘেমেছেন কেন?
আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।
কথা!—বলে ঠোঁট ওলটায় মণিদীপা, কথা তো অনেক হল। কথায় কিছু হয় না।
দীপনাথ একটা ক্রুদ্ধ শ্বাস ফেলে বলে, জরুরি কথা আছে। এটা ইয়ারকি নয়।
মণিদীপা এই ধমকটা আশা করেনি। তার স্বাভাবিক সতেজ অহংকারী ভাবটা সম্প্রতি নানা ঘটনায় বড় বেশি মার খেয়েছে। এসেছে ভয়, জীবনের অনিশ্চয়তা, ডাঙা জমির অভাববোধ।
মণিদীপা দীপনাথের সামনে একটু বিবর্ণ হল, একটু কুঁকড়ে গেল। এতই চোখে পড়ার মতো ব্যাপার যে, উদ্‌ভ্রান্ত দীপনাথেরও চোখ এড়াল না।
মণিদীপা হঠাৎ উঠে সিলিং পাখাটা আস্তে চালিয়ে দিয়ে এসে বলল, বসুন। কফি বলে আসি।
তার আগে কথাটা।
কথাটা তার পরে। আপনি বসুন।

দীপনাথ বসে চোখ বুজল। সিলিং পাখার হাওয়াটা এত মিষ্টি লাগল যে বলার নয়। মণিদীপার গায়ের সুগন্ধ বাতাসটাকে ভারী ঘন করে রেখেছে।

চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ শূন্য মাথায় বসে থাকার পর মণিদীপা ফিরে এল। বাবুর্চি নয়, নিজেই ট্রেতে কফি আর গোটা দুই চকোলেট কেক-এর টুকরো নিয়ে এসেছে।

দীপনাথ তাকিয়ে দেখল। তারপর হাত বাড়িয়ে কফির কাপটা তুলে নিয়ে বলল, টেলিফোনে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাননি কেন বলুন তো!

মণিদীপা জবাব দিল না। চুপ করে ফুলদানি থেকে ফুল তুলে তুলে আবার সাজাতে লাগল দীপনাথের দিকে পিছন ফিরে।

কথা বলবেন না?

মৃদু শান্ত স্বরে মণিদীপা বলে, কথা ঢের হয়েছে। আর আমার কথা ভাল লাগে না।

কথা ছাড়া কমিউনিকেট করার আর কী উপায় বলুন!

মণিদীপা মরালীর মতো শরীর বাঁকিয়ে একবার তাকায়। তারপর বলে, লাভ হ্যাজ ইটস ওন ল্যাঙ্গুয়েজ।

দীপনাথ মূক হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, আপনি কী চান একটু খুলে বলবেন?

একটা দোকান। খুব সুন্দর জায়গায়, ভদ্র পরিবেশে চালু একটা দোকান। আপাতত আর কিছু নয়।

আপনার মাথায় দোকানটা কে ঢোকাল বলুন তো?

দ্যাট ইজ নান অফ ইয়োর বিজনেস।

দীপনাথ নীরবে আঘাতটা সহ্য করে শান্ত স্বরেই বলে, দোকান যদি একান্তই দিতে হয় তবে আমার অ্যাপ্রুভ্যাল ছাড়া তা হওয়ার নয়। আপনি তো তা জানেন।

জানি। তাই আমি বোস সাহেবের কাছ থেকে কিছুই আর প্রত্যাশা করি না। আই অ্যাম অ্যারেঞ্জিং এ ক্যাপিট্যাল ফ্রম এলস্‌হোয়ার।

আপনি ভুল করেছেন মণিদীপা। ব্যাবসা আপনার ধাতে নেই।

দ্যাট ইজ অলসো নান অব ইয়োর হেডেক। বোস সাহেব যে ছুকরিটির সঙ্গে ঘোরাফেরা করছেন এখন থেকে আপনি তাকেই অ্যাডভাইজ দিতে শুরু করুন না!

দীপনাথের সংশয়টা ছিলই। খুব অবাক হল না। বলল, ছুকরিটি আবার কে?

ন্যাকামি করবেন না দীপনাথবাবু। ইউ নো।

বোস সাহেব কোথায়?

এ সময়ে বাড়ি থাকেন না। এই বয়সে টিন-এজারকে হাত করতে হলে একটু বেশি লেবার দিতে হয়। হি ইজ ডুয়িং একজ্যাক্টলি দ্যাট। আপনি তো সবই জানেন। উনি হয়তো এটাও আপনার পরামর্শেই করছেন।

দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য দীপনাথ হঠাৎ উঠে মণিদীপার কাছে এসে এক ঝটকায় তার কাঁধ ফিরিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করাল। বলল, আমি কিছু জানি না। এখন আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিন।

॥ বাষট্টি ॥

মণিদীপা অনেক পুরুষকে পার হয়ে এসেছে জীবনে। সে জানে, পুরুষমানুষের এই হঠাৎ রাগ থেকেই আসে আশ্লেষ। দীপনাথ তাকে এই থরো থরো রাগের চূড়ায় যে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়তে পারে অনুরাগে, চুমু খেতে পারে, এমনতরো ঘটনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু দীপনাথ পিছিয়ে গেল। ক্লান্ত স্বরে বলল, চারদিকে বদনাম রটে গেছে মিসেস বোস।

কিসের বদনাম?

আপনাকে আর আমাকে নিয়ে। আমার ছোটবোন পর্যন্ত জানে।

অবাক হয়ে মণিদীপা বলে, এইজন্য আপনি এত ডিস্টার্বড আজ?

ভীষণ ডিস্টার্বড।

বদনাম রটলে ক্ষতি তো মেয়েদের। আপনারা পুরুষমানুষ, আপনাদের বদনামটাই ফেম।

দীপনাথ মাথা নাড়ে, না। আপনি কবে বুঝবেন, নিজের জন্য আমি ততটা চিন্তিত নই, যতটা আপনার জন্য।

মণিদীপা আবার একটু অবাক হয়। তবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বদনামকে আমি তো ভয় পাই না। আমার নামে এ পর্যন্ত বহু বদনাম রটেছে। আপনি আমার জন্য অনর্থক ভাবছেন।

অনর্থক। তাই হবে।—বলে দীপনাথ সোফায় বসে অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে নিজের আঙুলগুলো দেখে। তারপর এক সময়ে বিবর্ণ বিভ্রান্ত মুখখানা তুলে বলে, আমার মাথার ঠিক ছিল না। আপনার সঙ্গে একটু রাফ ব্যবহার করে ফেলেছি।

মণিদীপা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই একদৃষ্টে দেখছিল দীপনাথকে। চোখের দৃষ্টি কোমল, স্বপ্নাচ্ছন্ন। কথাটা শুনে মৃদু একটু হাসল। বলল, রাফ ব্যবহার? একটুও নয়। আমি পুরুষদের সত্যিকারের রাফনেস দেখেছি। আপনি রাফ নন। তবে টাফ। ভেরি টাফ আর হেডস্ট্রং।

কফি ঠান্ডা হচ্ছিল। কয়েকটি ব্যগ্র চুমুকে কাপ শেষ করে দীপনাথ উঠল, আজ চলি।

হঠাৎ কেন উদয় হয়েছিলেন, বললেন না তো!

আপনার সঙ্গে একটা শো-ডাউনের জন্য। অনেকদিন ধরে আপনি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

শো-ডাউন কি হয়ে গেল?

ম্লান হেসে দীপনাথ বলে, হল আর কই? আপনার সামনে এলেই আমার সব গুলিয়ে যায়।

আমার বদনাম নিয়ে আপনি খুব চিন্তিত, কিন্তু একবারও বোস সাহেবের বদনাম নিয়ে ভাবছেন না তো!

দীপনাথ হেসে বলে, এই যে বললেন পুরুষমানুষের বদনাম মানেই ফেম।

তা ঠিক। তবু অ্যাজ এ ওয়েল-উইশার আপনার আর-একটু ইন্টারেস্টেড হওয়া উচিত। আজকাল শুনি বোস সাহেব আপনাকে জিজ্ঞেস না করে কোনও ডিসিশন নেন না।

অতটা সত্যি নয়। তবে কোনও কোনও ব্যাপারে উনি আমার অ্যাডভাইস নেন।

শুনেছি আমার মাসোহারা কত হওয়া উচিত তাও আপনিই ঠিক করে দিয়েছেন।

দীপনাথ অস্বস্তি বোধ করে বলে, আমাকে বোস সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি যা ভাল বুঝেছিলাম তাই বলেছি। আপনি কি তার জন্য রেগে আছেন?

আমি মাঝে মাঝে খামোখাই রেগে যাই। সে আমার স্বভাব। কিন্তু চারশো টাকা যে অনেক টাকা তাও আমি জানি।

আপনি রাগ করেছেন।

আমার রাগে আপনার কী আসে যায়! আপনি আমার কে? আমি শুধু ভাবছি বোস সাহেব কী করে এ কথাটা মেনে নিল! চারশো টাকার প্রশ্ন নয়, আমার হাত থেকে সব অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ডিসিশনটা ও মেনে নিল কী করে?

দীপনাথ মুখ তুলল না। কিন্তু শান্ত গলায় বলল, এই ডিসিশন না নিলে বোস সাহেব এতদিনে পথে দাঁড়াতেন। অফিসে ওঁর লোন কত ছিল জানেন?

ঠোঁট উলটে মণিদীপা বলে, জানতে চাই না। আমি জানতে চাই, বোস সাহেব যে মেয়েটাকে নিয়ে মাখামাখি করছে সেও আপনার রিক্রুট কি না।

দীপনাথ এবার মুখ তোলে। মুখ সামান্য লাল। শ্বাস গাঢ়। চাপা গলায় সে বলে, আমাকে আপনি কী ভাবেন বলুন তো!

এ ম্যান উইদাউট ব্যাকবোন অ্যান্ড ভয়েড অব পার্সোন্যালিটি! আপনার মতো মানুষ বসকে সন্তুষ্ট করতে সব পারে।

দীপনাথ উঠে দাঁড়াল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক আছে। কোনওদিন আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা যদি পালটায় তবে আবার দেখা হবে।

মণিদীপা তাকিয়েই ছিল। স্থির গভীর দৃষ্টি। একটু হাসল। বলল, আপনি আমার অনেক ক্ষতি করেছেন। আমার এত ক্ষতি আর কেউ কখনও করেনি। কিন্তু মুশকিল হল, সেটা আপনি টের পাচ্ছেন না।

দীপনাথ মণিদীপার দিকে চেয়ে বলে, সত্যিই জানি না। চারশো টাকা মাসোহারা বা অর্থনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপকে যদি ক্ষতি করা বলেন তবে ক্ষতি করেছি। কিন্তু তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। গত কয়েক মাসে বোস সাহেবের কিছু টাকা জমে গেছে। গল্‌ফ ক্লাবে একটা জমি বায়না করেছেন। এসব কি ক্ষতি?

মণিদীপা চেয়েই ছিল। ধীর স্বরে বলে, না, এসব বোস সাহেবের দিক থেকে খুবই ভাল খবর। নিজের বাড়িতে নতুন ছুকরি বউ নিয়ে থাকবে। কিন্তু তাতে মণিদীপার কী এসে যায়?

দীপনাথ গভীর শ্বাস ফেলে বলে, বিশ্বাস করুন, আমি বোস সাহেবের প্রণয়ঘটিত কোনও ব্যাপার আছে বলে জানি না।

মণিদীপা শান্ত স্বরে বলে, বিশ্বাস করছি। আপনি হয়তো এখনও অত নীচে নামেননি। তবে জেনে রাখুন, বোস সাহেব গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নন।

আমি খোঁজ করব। ইফ ইট ইজ ট্রু তা হলে আমি ওঁর সঙ্গে কথাও বলব।

তাতেও মণিদীপার কিছু যায় আসে না।—মণিদীপা তেমনি অকপটে চেয়ে থেকে বলে, তাতেও আমার ক্ষতিপূরণ হওয়ার নয়।

আমি আপনার আর কী ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি?

কী ক্ষতি তা জানেন না?

এতক্ষণে মণিদীপার এই অস্বাভাবিক শান্ত স্বর, স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি আর একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পেয়ে কেঁপে উঠল দীপনাথ। বলল, না, জানি না।

লোকে কি মিথ্যে বদনাম করে?

দীপনাথ চুপ করে চেয়ে থাকে।

বলুন, লোকে কি মিথ্যে মিথ্যেই কিছু রটায়?—মণিদীপা জিজ্ঞেস করে।

দীপনাথ মুখ নামিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলে, আমি জ্ঞানত আপনার কোনও ক্ষতি করিনি।

মণিদীপা যে সুখে নেই তা কি জানেন?

মাথা নাড়ে দীপ। জানে।

কেন, তা জানেন না?

মৃদু স্বরে দীপনাথ জিজ্ঞেস করে, আমি কি তার কারণ?

হিংস্র অস্ফুট চাপা স্বরে ক্রোধ হতাশা অপমানকে মুক্তি দিয়ে মণিদীপা বলে ওঠে, আপনি! শুধু আপনি! আর কেউ নয়। আর কিছু নয়। দয়া করে আমার আর ভাল করতে হবে না আপনাকে। এবার যান! যান!

এরকমভাবে ভেঙে পড়ার মেয়ে মণিদীপা নয়। দীপনাথ একটু অবাক হয়ে তাকাল। মণিদীপা পেছন ফিরে আবার ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছে। কাঁদছে কি না তা পিছন থেকে বোঝা গেল না।

প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে নিয়েছে দীপনাথ। গাঢ় এক ভালবাসা বহুকাল যাবৎ তার বুক থেকে ওই

কিশোরীপ্রতিম মেয়েটির দিকে বয়ে যাচ্ছে। এত লোভনীয় বহুকাল যাবৎ তার কাছে আর কেউ নয়। এই তো সময়। উঠে গিয়ে শুধু একবার স্পর্শ করে বলতে পারে যে, তোমাকে ভালবাসি মণিদীপা। তা হলেই ও বুকের মধ্যে ভেঙে পড়বে, আর কোনওদিকে চাইবে না, তার হয়ে যাবে চিরকালের মতো। বড় অসুখী মণিদীপা, বহুকাল এই পরের ঘরে বাস করছে।

লোভ হল, বড় লোভ হল আজ। সমস্ত শরীর পিপাসায় উন্মুখ। পলকা ডিমসুতোর মতো একটু নীতিবোধের বাধা আছে বটে, সেটুকু ছিঁড়তে কষ্ট নেই।

ঘর ভাঙবে দীপনাথ? ভিতরে ভিতরে সেই সিরিওকমিক স্বরটা আবার বহুকাল বাদে শুনতে পেল সে।

ঘরই কি সব? ভালবাসা কিছু নয়?

ভালবাসার মানে হল ভাল-তে বাস করা। বাস করতে ঘর চাই, দীপনাথ। পাকা ঘর। নইলে আবার কোন ভালবাসার ঘুঘু এসে তোমার ভিটেতেও চরবে। ওকে বরং এই ঘরে স্থিতু হতে দাও। নিজের সুখ-অসুখ বুঝতে দাও। সওয়া নেই, বওয়া নেই, বিয়ে কি চাট্টিখানি কথা! কত সুখ-দুঃখ সয়ে, কত ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে তবে স্বামী আর স্ত্রীর ভালবাসা হয়। ওদের সময় দাও আর-একটু।

দিলাম।

দীপনাথ ওঠে।

মিসেস বোস!

মণিদীপা খুব আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। বড় চোখ, অবাক দৃষ্টি।

আমি আজ আসি।

একটু হাসল মণিদীপা, অনেকক্ষণ ধরেই যাই-যাই করছেন। এত তাড়া কিসের?

আমিও সুখে নেই। বড় জ্বালা, এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না।

তাই বুঝি? আজ আমি কেবল ঝগড়া করলাম।

না। তা নয়। আপনার দুঃখ আমি বুঝি।

ধন্যবাদ। কিন্তু বেশি বুঝতে যাবেন না। তাতে বিপদ বাড়বে।

তার মানে?

বোস সাহেবকে ঘাটানোর দরকার নেই। ও আমাকে চায় না। আমি বরং চলেই যাব। আপনি শুধু কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিন ওকে বলে। আমার তো একটু ফুটিং চাই।

সেই দোকানের কথা এখনও মাথা থেকে যায়নি?

অন্য কোনও আইডিয়া আসছে না যে!

দোকান করাটা আমার পছন্দ নয় মিসেস বোস।

আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে মণিদীপা মৃদু হেসে বলে, তবে কী পছন্দ?

ভেবে দেখি। বলব। কিন্তু যা বলব শুনবেন তো?

মণিদীপা মাথা নাড়ে, শুনব। আমাকে কেউ তো গাইডেন্স দেয়নি এতকাল। আমি ভারী একা হয়ে গেছি। এত একা সহ্য হয় না।

আমি আপনার ভাল চাই। ভীষণভাবে চাই।

মণিদীপা সত্যিকারের লজ্জায় মাথা নত করে বলে, জানি। খুব জানি।

আজ যাই।

আসুন।— বলে একটু থেমে মণিদীপা আরও মৃদু স্বরে বলে, এবার ফোন করলে কথা বলব।

দীপনাথ বোস সাহেবকে এতটাই জানে যে, খুব বেশি খোঁজ-খবর না করেই সে মেয়েটির পাত্তা লাগিয়ে ফেলতে পারল পরদিন।

বোস সাহেব বোকা নয়। সন্ধের মুখে দীপনাথ হঠাৎ বিনা এত্তেলায় তার খুপরিতে ঢুকলে দীপনাথের মুখের দিকে চেয়েই বোস সাহেব বুঝতে পারে, সামথিং রং।

বসুন চ্যাটার্জি।

দীপনাথ বসে এবং বিনা ভূমিকায় বলে, মহুয়া আপনার কাজিন?

বোস স্তব্ধ ও স্থির হয়ে বসে থাকে। চোখ টেবিলে। বোস সাহেবের শরীরের যন্ত্রপাতি খুব ভাল নয়, দীপনাথ জানে। তাই ওই স্তব্ধতায় একটু ভয় পেল সে। কিন্তু তবু নীরবতা ভাঙল না। ব্যক্তিত্বের লড়াইতে প্রথম রাউন্ডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বোস সাহেব ঠিক এক মিনিট দশ সেকেন্ড বাদে বাঁ হাতের তর্জনীর ধার দিয়ে থুতনিটা ঘষে নিয়ে নড়ে বসল। তারপর খসখসে ভাঙা গলায় বলে, দরজাটা লক করে দিয়ে আসুন।

দরকার নেই। অফিস ফাঁকা।

বোস মাথা নাড়ল। মুখটা ফ্যাকাসে, অসহায়, ভিতু কেমন এক ধরনের হয়ে গেছে। হাতে একটা কাগজচাপা নিয়ে নাড়তে নাড়তে তেমনি অদ্ভুত গলায় বলে, দীপা কতটা জানে?

সামান্যই। অন্তত মহুয়ার কথা জানে না। শুধু জানে সামথিং ইজ কুকিং।

মহুয়া আমার ডিসট্যান্ট কাজিন।

তা হোক বোস সাহেব। ইট ইজ এ রং চয়েস।

উই হ্যাভ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফ্রম অলমোস্ট চাইল্ডহুড। কিন্তু পারিবারিক বাধায় বিয়ে হতে পারেনি। ওর বাবা ছিল ভীষণ কনজারভেটিভ।

বাট ইট ইজ নাউ এ ডেড কেস।

বোস মাথা নাড়ে, না, রিলেশন না থাক, উই অলওয়েজ হ্যাড দ্যাট ফিলিং ফর ইচ আদার।

বোস সাহেব!— দীপনাথের গলাটা ধমকের মতো শোনায়, ব্যাপারটা ইনএভিটেবল নয়, আমি জানি।

আমি তা বলিনি।

তবে? আপনি অতীতকে খুঁড়ে বের করছেন।

দীপার সঙ্গে আমার রিলেশন তো আপনি জানেন। অথচ আই নিড সামওয়ান। যাকে বিশ্বাস করা যায়, যার ওপর নির্ভব করা যায়।

বোস সাহেব, আপনার এক ভাই এই অফিসে কাজ করে।

বোস অবাক হয়ে বলে, ও কিছু বলেছে?

না। তবে ও শুনেছে। ওর মুখে ঘেন্নার ভাব দেখলেই তা বোঝা যায়।

বোস সাহেব পিছনে মাথা হেলিয়ে বলে, দীপা অলসো উইল হেট মি। চ্যাটার্জি, আই অ্যাম সরি। কিছু করার নেই।

দীপনাথ বিদায় নেওয়ার একটা নাটকীয় এবং জুতসই ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিল। একটা সাইকোলজিক্যাল মোমেন্ট। এই কথার পরই তা পেয়ে গেল সে। আচমকা উঠে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল।

॥ তেষট্টি ॥

নিজের টেবিলে এসে অপেক্ষা করছিল দীপনাথ। একটু বাদেই বোস তার লম্বা মেদবহুল চেহারাটা নিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল। মুখ ভীষণ ভাবালু, গম্ভীর। চোখে অনির্দিষ্ট দৃষ্টি।

বোস একটু ইতস্তত করে দীপনাথের টেবিলের কাছে আসে, চ্যাটার্জি, উঠবেন না?

এই যাব।

চলুন।

কোথায়?

চলুন, কোথাও যাওয়া যাক।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আজ আমার ছোট বোনের বাড়িতে যাওয়ার কথা।

আজ ক্যানসেল করুন।

দীপনাথ একটু দম ধরে থেকে বলে, মিস্টার বোস, আমি আপনাকে হেলপ করতে চাই, কিন্তু এখন দেখছি সব ব্যাপারেই আপনাকে হেলপ করা সম্ভব নয়। আই কানট হেলপ ইউ টু বি আনহ্যাপি।

বোস একটু হাসে, ইংরেজিটা আপনি মাঝে মাঝে ভালই বলেন। কিন্তু এখন আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বাসায় চলুন।

খুব জরুরি কথা কি?

খুব জরুরি।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা তুলে বিলুদের পাশের ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল। বিলুকে ডাকিয়ে বলে দিল, আজ নয়। কাল যাচ্ছি।

কত কথা জমে আছে তোমার সঙ্গে।

আজ একটু কাজ পড়ে গেল রে।

প্রীতম ঠিকই বলত, ভীষণ কাজের লোক হয়েছ তুমি আজকাল। আমি যে তোমার জন্যই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে খাবার তৈরি করাতে বসেছি।

একটু রাতের দিকে গেলে যেতে পারি। তবে ঠিক নেই।

দূর। থাকগে আজ। কবে আসবে?

কাল।

ঠিক তো?

ঠিক। কাল অফিস থেকে একবার ফোন করিস।

বোস সাহেব নীচে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছে। সামনে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বসে আছে। দু'জনে উঠল। গাড়ি নিউ আলিপুর রওনা হতেই বোস সাহেব বলে, আপনি আমার ওপর স্পাইং করছিলেন?

ওকথা কেন?

নইলে এত খবর আপনার জানার কথা নয়।

খবর নেওয়াটা দোষের, না খবর হওয়াটা?

বোস সাহেব মৃদু হাসে। বুঝদারের মতো খুব সামান্য একটু মাথা নেড়ে বলে, আমি অবশ্য ব্যাপারটা গোপন রেখেছি, কিন্তু সেটা পাপবোধ থেকে নয়। ডিসেন্সির জন্য। সময় হলেই মণিকে জানাতাম।

আমি কিন্তু মিসেস বোসকে খবর দিইনি। উনি আগে থেকেই জানতেন।

কতটা জানে?

খুব বেশি নয়। জানে, একটা মেয়ের সঙ্গে মিশছেন।

মেয়েদের সঙ্গে আমার মেলামেশায় তো বাধা নেই।

কিন্তু এবার একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ একজনের সঙ্গে মিশছেন।

সেটা দীপা জানতে পারে না। জানলে আমাকে বলত। ছেড়ে দিত না।

ডিভোর্স হবেই ধরে নিয়ে উনি হয়তো ততটা কিছু করতে চাইছেন না।

তা হলে হেডেকটা কার? আপনার?

আমার একটু হেডেক তো আছেই।

বোস হাসল আবার। এবারকার হাসি দেখে বোঝা গেল, বোস নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। বলল, স্ট্রেঞ্জ। তবু আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

হাসি এবং গলার স্বরটা দীপনাথের খুব ভাল লাগল না।

বোস একটু চাপা গলায় বলল, দীপার ওপর আমার আর কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তবু আমি ডিভোর্স করতে চাইছিলাম না। আপনাকে বলেছিলাম তো যে, আমি একটা লং-টুরে বাইরে চলে যাচ্ছি।

বলেছেন।

হয়তো তাই যেতাম। তবে শেষ পর্যন্ত আর-একটা অ্যাফেয়ার ঘটে যাওয়ায় মনে হল, জীবনটা আর-একবার গড়ে তোলা যায়।

বোস বোধ হয় দীপনাথের সমর্থন পাওয়ার জন্যই এ সময়ে একটু চুপ করে রইল। কিন্তু দীপনাথ জবাব দিল না। সে খুব সন্তর্পণে চাল দিচ্ছে। কথা বলার চেয়ে চুপ করে থাকাটাই এখন জরুরি। লেট হিম টক অ্যান্ড টক।

তাই এখন আমি ডিভোর্স চাই।

আবার চুপ করে থাকে বোস। দীপনাথ আবার নীরব।

বোস সাহেব একটু কাত হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে জিতানি সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে। সিগারেট ধরিয়ে বলে, দীপার অন্য ইন্টারেস্ট থাকলে আমার আপত্তি নেই। অন্য কেউ ওর প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকলেও বলার কিছু থাকবে না। ইন ফ্যাক্ট —

বোস সাহেব আবার অর্থপূর্ণভাবে দীপনাথের দিকে তাকায়। কিন্তু দীপনাথ নিজেকে সংযত রাখে। অনেক দিন বাদে এই লোকটার ওপর তার রাগ আর অল্প একটু ঘৃণা হচ্ছে।

ইন ফ্যাক্ট, কেউ কেউ দীপা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড বলেও আমি জানি।

দীপনাথ সামান্য একটু নড়ে বসে। অস্বস্তি বোধ করছে মনে মনে।

বোস সাহেব সিগারেটটা টানছে না। আঙুলে ধরে আছে মাত্র। বাইরের দিকে চেয়ে থেকে খুব আস্তে করে বলে, ইন ফ্যাক্ট, আপনি নিজেই যদি দীপা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন তবে আমি আপনাকে দোষ দিই না। দীপা ইজ মডারেটলি গুড লুকিং, ইন্টেলিজেন্ট। তার ওপর লোনলি।

দীপনাথের বুকটা ঝাঁৎ করে উঠল বটে। কিন্তু তেমনই উত্তেজিত হল না। পাথরের মতো মুখ করে বলল, আর আমি?

বোস অবাক হয়ে বলে, আপনি? আপনি কী?

আমি কেমন?

বোস হাসে, এলিজিবল। কোয়াইট এলিজিবল। হ্যান্ডসাম, ওয়েল-প্লেসড, ইন্টিগ্রেটেড। কোয়াইট এলিজিবল।

আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য কি ঠিক এ রকম পাত্রই খুঁজছেন বোস সাহেব?

কথাটার ভিতরকার মার বোসকে একটু কাহিল করে ফেলে। সিগারেটটা জানালা দিয়ে

ময়দানের ফাঁকা রাস্তায় ছুড়ে ফেলে বলে, পাত্র-পাত্রীরা পরস্পরকে খুঁজে পেয়ে থাকলে আমার আপত্তি নেই, আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আমি এখনও পাত্রী খুঁজে পাইনি। তবে পাত্রীর গার্জিয়ানের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। তাঁর পরিত্যক্ত স্ত্রীকে আমি বিয়ে করলে অফিসে তাঁর পজিশনটা কী দাঁড়াবে!

জিতানির প্যাকেটটা হাতেই ধরা ছিল, বোস সাহেব আর-একটা সিগারেট বের করে প্যাকেটের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলে, দেয়ার ইজ এ পয়েন্ট টু পন্ডার অন। দীপাকে আপনি বিয়ে করলে আমাদের এক অফিসে থাকা বোধ হয় ভাল দেখাবে না। দেয়ার উইল বি এ লট অফ টক।

সেক্ষেত্রে বোধ হয় আমাকেই সরে যেতে হবে।

বোস মাথা নেড়ে বলে, তার কোনও মানে নেই। বাংগালোরের অফারটা এখনও আমার কাছে ওপেন আছে।

দীপনাথ বিজ্ঞের মতো হেসে বলে, আর এবার বোধ হয় আপনি আমাকে বাংগালোরের সঙ্গী করতে চাইবেন না।

না।— বোস শ্বাস ফেলে বলে, ইন ফ্যাক্ট দীপাকে যদি আপনি নেন তা হলে আপনার এবং আমার এক শহরেও বসবাস করা উচিত হবে না।

আর মিসেস বোস যদি কাউকে বিয়ে না করতে চান, তা হলে কী হবে?

বোস কাঁধ তুলে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, নাথিং।

কিন্তু উনি কাউকে বিয়ে করলেই তো আপনার সুবিধে।

বোস একবার তাকিয়েই দীপনাথের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, তা কেন?

দীপনাথ চাপা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, তা হলে আপনাকে মাসোহারার টাকাটা গুনতে হবে না।

বোস এ কথায় চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, শুধু তা-ই নয়।

তা হলে আর কী?

বোস উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনে চেয়ে থেকে বলে, দীপা ছেলেমানুষ, ইমম্যাচিয়োর, রেস্টলেস, একস্ট্রাভ্যাগান্ড। একা থাকলে ও একদম শেষ হয়ে যাবে। আমি ওকে ট্যাকল করতে পারিনি বটে, কিন্তু আমার চেয়ে ইন্টিগ্রেডেড কোনও পুরুষ হয়তো পারবে।

পাত্রীর গার্জিয়ানের মতো কথা বলছেন না মিস্টার বোস। পাত্রপক্ষকে দোষের কথা শোনাতে নেই। শুধু গুণের কথা জানাতে হয়।

জিতানির ধোঁয়া গলায় লেগে বোস কিছুক্ষণ কাশে। কড়া ফরাসি সিগারেট, ধোঁয়া লাগতেই পারে। কেশে একটু ধরা গলায় বলে, আপনি বলেন খুব চমৎকার।

আপনি মিসেস বোসের জন্য এত চিন্তা করছেন কেন? ওঁর ভবিষ্যৎ ওঁকে ভাবতে দিন।

তা দিয়েছি। আমি কোনও ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করি না। আপনাকে কথাটা বলছি অন্য কাবণে।

কী কারণ?

আমি জানি, ইউ আর ইন লাভ উইথ হার, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা।

এ কথায় দীপনাথের পায়ের তলার ভিত একটু নড়ে যায়। কিন্তু ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। তাই সে সামলে নেয়। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনি হয়তো সত্যি কথাই বলছেন, ইয়েস, উই আর ইন লাভ।

বোস অবাক হয়ে বলে, ইউ অ্যাডমিট! কনগ্র্যাচুলেশনস।

থ্যাংকস। কিন্তু মুশকিল হল—

বোস সাগ্রহে একটু ঝুঁকে বলে, হ্যাঁ, মুশকিল হল—?

মুশকিল হল, আমি মিসেস বোসকে ভালবাসি বলেই তার ভাল চাই।

বটে তো। তাতে মুশকিল কী?

মুশকিল হল, কীসে মিসেস বোসের ভাল হবে তা আমি এখনও ভেবে পাইনি।

ভালবাসার একটাই এইম থাকে চ্যাটার্জি, ভালবাসার লোকটাকে কব্জা করা।

ঠিক। তবে যদি তাতে তার ভাল না হয়!

ভাল হবে। তাতেই ওর ভাল হবে।

আপনাকে এ ব্যাপারে বড় বেশি উৎসাহী মনে হচ্ছে বোস সাহেব।

বোস একটু বিরক্ত হয়ে বলে, আমাকে সাহেব সাহেব করেন কেন বলুন তো!

আপনি যে ভীষণ সাহেব, বোস সাহেব।

বোস আবার কাঁধ ঝাঁকায়। তারপর বলে, আমিও ওর ভাল চাই। আমি জানি কীসে ওর ভাল হবে।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, পাত্রীর ভাল দেখলেই তো হবে না। পাত্রের ভাল হবে কি না সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

আপনারও ভালই হবে। আপনাদের দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসেন, দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম।

ভালবাসি বলেই প্রবলেম। ভালবাসা মানে ভাল-তে বাস করা।

মানছি। কিন্তু আপনার প্রবলেমটা ধরতে পারছি না।

কী করে বুঝবেন? আপনি তো কখনও কাউকে ভালবাসেননি বোস সাহেব! বুঝতে গেলে ভালবাসতে হয়।

বোস একটু গুম হয়ে থাকে।

দীপনাথ দেখে, গাড়ি বাঁক নিয়ে আলিপুরে ঢুকে যাচ্ছে।

বোস সাহেব একটা শ্বাস ফেলে বলে, ইউ আর বিয়িং এ বিট ডিসেপটিভ। হয়তো দীপার প্রতি আপনার অ্যাটাচমেন্টটা ফিজিক্যাল। মে বি ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপ্লয়েট হার। মে বি ইউ হ্যাভ অলরেডি এক্সপ্লয়টেড হার।

দীপনাথের ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, কান জ্বালা করছে। তবু শুকনো হাসি হেসে সে বলে, যদি তাই করে থাকি তবু আপনার কিছু করার নেই বোস সাহেব। ইউ আর এ ম্যান উইদাউট ব্যাকবোন। আমার যদি স্ত্রী থাকত আর তার যদি পরপুরুষ জুটত, তবে আমি স্ত্রীকে ভালবাসি বা না বাসি সেই পরপুরুষের ঠ্যাং না ভেঙে ছাড়তাম না।

আপনি আমাকে আপনার ঠ্যাং ভাঙার জন্য ইনভাইট করছেন!

করছি। অ্যাট লিস্ট ইউ শুড ট্রাই।

বোস হেসে ওঠে।

গাড়ি এসে থামে ফ্ল্যাটের সামনে। দীপনাথ দেখতে পায় দোতলার বারান্দায় ম্লানমুখী মণিদীপা উদাস চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকটা কেঁপে ওঠে তার। ধড়াস ধড়াস করতে থাকে।

॥ চৌষট্টি ॥

এই ফ্ল্যাটে ঢুকতে আজ ভারী লজ্জা আর অস্বস্তি বোধ করে দীপনাথ। বহুকাল সে এরকম সংকটে পড়েনি। আজ তার পায়ের তলায় মৃদু ভূমিকম্প হয়ে চলেছে।

তারা গাড়ি থেকে নামতেই ওপরের বারান্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মণিদীপা।

বোস সাহেব বাড়িতে ঢুকবার আগে একটু সময় নিল। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মৃদু আন্তরিক

স্বরে বলল, আপনি আজ একটু রেগে আছেন। আমার প্রোপোজাল হল, লেট আস হ্যাভ এ ফ্রাংক ডিসকাসন অ্যান্ড ট্রাই টু সেটল থিংস।

দীপনাথের আজ চাকরির ভয় নেই, কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, সে মরিয়া। তাই চাপা গরগরে গলায় বলল, সবটাই তো আর একজিকিউটিভ মিটিং নয় বোস সাহেব।

বোস চিন্তিত মুখে দীপনাথের দিকে চেয়ে বলে, ইউ আর রিয়েলি অ্যারোগ্যান্ট। রিয়াল টাফ গাই। বাট লেট আস কিপ আওয়ার হেড টুডে।

দীপনাথ তেজের সঙ্গে বলল, দ্যাট ইজ ইয়োর হেডেক, নট মাইন। আপনি নিজের রিস্কে আমাকে এখানে এনেছেন। আমি কোনও কথা দিতে পারি না।

বোস সাহেবকে হঠাৎ খুব বিরক্ত আর ক্লান্ত দেখাল। মুখে-চোখে গভীর হতাশা। মৃদু স্বরে বলল, ঠিক আছে, আসুন।

বোস সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠছে। পিছনে দীপনাথ। দীপনাথ দেখতে পেল বোস রেলিং-এ প্রয়োজনের চেয়েও একটু বেশি ভর দিচ্ছে। প্রতিটি সিঁড়িতে উঠতেই যেন বেশ কষ্ট হচ্ছে বোস সাহেবের। মস্ত লম্বা শরীরের আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির অনেক তফাত। দীপনাথ টের পায়, বোস ভাল নেই। খুব তাড়াতাড়িই ওর ডাক্তার দেখানো উচিত।

দোতলার চাতালে উঠে বোস একবার নিজের বুকে হাত রাখে। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে হাঁ করে দম নেয়।

সদর দরজা খোলাই ছিল। ড্রয়িংরুমে ঢুকে বোস সাহেব মুখ ফিরিয়ে বলে, আমার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।

বোস সাহেবের ঘরটা দীননাথের অচেনা নয়। করিডোরের শেষে বাঁ-হাতি ঘরটা। আগে ডান দিকে মণিদীপার ঘর। বোস সাহেব বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই দীপনাথ মণিদীপার ঘরের বন্ধ দরজার নব ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকল। তারপর আস্তে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

মণিদীপা একদৃষ্টে দরজার দিকে চেয়ে ছিল। তাকে দেখে একটুও চমকাল না। কিন্তু চোখে একটা অদ্ভুত বিহ্বল দিশেহারা দৃষ্টি। যেন কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। যেন পৃথিবীর কোনও কিছুই সত্য বলে মনে হচ্ছে না। চুল এলো, মুখ শুকনো, তবু ভারী করুণ আর সুন্দর আর অসহায় এই জেদি মেয়েটিকে দেখে আজ শঙ্খের মতো আর্তনাদ করে ওঠে দীপনাথের হৃদয়। কী বলবে তা ভুলে গেল সে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

এক-একটা পাগলা মুহূর্ত আসে মানুষের জীবনে যখন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা থাকে না। দীপনাথের ঠিক সেই অবস্থা। পায়ের নীচে মৃদু ভূমিকম্প উঠল চৌদুনে। বোস সাহেব তার বউয়ের সঙ্গে দীননাথের মিলন চাইছে। এর চেয়ে সুখবর আর কী হতে পারে?

দীপনাথ নয়, তার ভিতরকার পাগলটা বিনা ভূমিকায় বলল, আমার সঙ্গে যাবে মণিদীপা?

মণিদীপা তেমনি বিহ্বলভাবে চেয়ে আছে।

দীপনাথ হাত বাড়িয়ে বলল, এসো। চলো যাই।

এ সমস্তই বলল দীপনাথ। কিন্তু, তীব্র শ্বাসের কষ্ট আর অসহনীয় আবেগের তাড়নায় তার কোনও কথাই মণিদীপার কানে পৌঁছল না। প্রায় ফিসফিসানির মতো তার নিজের শ্বাসবায়ুর সঙ্গে মিশে গেল মাত্র।

মণিদীপা বলল, ক'দিন ধরে ও যে কী পাগলামি শুরু করেছে!

দীননাথ আবেগের পাহাড়চূড়া থেকে নেমে এল। ভীষণ লজ্জা। ভীষণ গ্লানি। গলা যত দূর সম্ভব নরম করে এবং স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে সে বলে, কে পাগলামি করছে?

আপনাদের বোস সাহেব।

কী বলছে?

যা বলছে তা আপনাকে বলা যায় না।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমাকেও আজ কিছু অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছেন।

কিসের প্রস্তাব?

তাও আপনাকে বলা যায় না।

মণিদীপা করুণ মুখ করে বলে, তা হলে সেই কথাই। আমাকেও বলেছে, আপনাকেও বলেছে।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, হয়তো সেই উদ্দেশ্যেই আজ উনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

মণিদীপার মাজা রংও রাঙা হল এ কথায়। সে বলল, ছিঃ ছিঃ। ও কোথায় গেল?

বাথরুমে।— দীপনাথ একটু চুপ করে থেকে বলে, বাথরুমে উনি একটু সময় নেবেন বলে মনে হচ্ছে।

কেন? আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর জন্য সময় দিতে?

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, না। আমার সন্দেহ, উনি কোনও অসুখে ভুগছেন। ওঁর খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখানো উচিত। এর আগেও একদিন বলেছিলাম, উনি তখন পাত্তা দেননি।

মণিদীপা মাথা নাড়ে। একটু ভেবে বলে, এরকম একটা সন্দেহ আমারও হচ্ছিল।

বিয়ের সময় ও ছিল দারুণ শক্ত সমর্থ মানুষ। এখন কেমন ফ্যাটি, উইক। অসম্ভব স্ট্রেনও যাচ্ছে।

দীপনাথ বলে, হ্যাঁ। উনি কাজ ভালবাসেন। তা ছাড়া একটা প্রায় অসামাজিক লাভ অ্যাফেয়ারে পড়ে যাওয়ায় স্ট্রেনটা বেড়েছে।

মণিদীপা খুব ম্লান হয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর যখন মুখ তোলে সেই মুখ দেখে পাষণ্ডেরও মায়া হওয়ার কথা। আস্তে করে বলে, এটা আমার ডিফিট, তাই না?

দীপনাথ অবাক হয়ে বলে, কোনটা?

এই যে বোস সাহেব তার কাজিনের সঙ্গে প্রেম করছে এর মানে তো এই দাঁড়ায় যে, আই হ্যাভ ফেইলড টু অ্যাট্রাক্ট হিম।

দীপনাথ মৃদু হেসে বলে, তাই দাঁড়ায়।

আমি তা হলে ডিফিটেড?

খানিকটা। তবে লড়াই তো এখনও চলতে পারে।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলে, না। লড়াই শেষ। আমি হেরো।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আপনি ঠিক হারেননি।

তবে কি জিতেছি?

তাও নয়। আপনি আসলে যুদ্ধটাই মন দিয়ে করেননি যে।

আমার কী করার ছিল?

লোকটাকে আর-একটু বাজিয়ে দেখতে পারতেন।

লাভ নেই। বাজালে ফাঁকা আওয়াজ বেরোবে। ওর কোনও ডেপ্‌থ ছিল না কখনও।

আপনি কি ডেপথওয়ালা লোককেই চেয়েছিলেন?

মণিদীপা অবাক হয়ে বলে, কে না চায়?

আপনাকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না।

তা হলে কী মনে হয়?

মনে হয়, আপনি ভালবাসেন প্লে-বয় টাইপ।

বাঃ! চমৎকার সব ধারণা আমার সম্পর্কে আপনাদের।

মানুষের ভুল হতেই পারে।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলে, ভুল নয়। একজন মহিলার প্রতি আপনাদের প্রি-কনসিভড কিছু ধারণা ছিল। সেই ধারণাকে আপনারা ভাঙতে চান না। আর সেইটেই সব অশান্তির উৎস।

এই অবস্থাতেও দীপনাথ একটু হেসে বলে, আপনি বরাবর চমৎকার কথা বলেন।

আমার স্বভাবে আরও কিছু চমৎকার দিক ছিল। আপনি বা বোস সাহেব অন্ধ না হলে ঠিকই লক্ষ করতেন।

বিষণ্ণ দীপনাথ বলে, আমি তো চান্স পাইনি মণিদীপা। কিন্তু বোস সাহেব পেয়েছেন।

আপনিও অন্ধ। বোস সাহেবের কাছে আমাকে একটা ভ্যাম্পায়ার হিসেবে দাঁড় করাল কে?

আমি নই মণিদীপা।

কে আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কেড়ে নিতে বোস সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছিল?

আপনি রেগে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা রাগের সময় নয়। আমরা তিনজনই একটা বিশ্রী সিচুয়েশনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। এই অবস্থায় মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার।

মণিদীপা একবার শুধু দু'হাতের পাতায় মুখটা আড়াল করল। পরমুহূর্তেই আড়াল সরিয়ে সোজা দীপনাথের দিকে চেয়ে বলল, আপনি আমাকে কী করতে বলেন? বোস সাহেবের মন জয় করতে প্রেম-প্রেম খেলা শুরু করব?

না। আপনি ওঁর সঙ্গে আর সে খেলা খেলতে পারেন না। সেটা আমি জানি।

তবে কি অন্য কারও সঙ্গে পারি?

সে কথা বলিনি। বিয়ের পর অনেক বছর কেটে গেলে তো আর নতুন করে রহস্যময়ী হওয়া যায় না। প্রেম জমাতে গেলে একটু রহস্য আর একটু দূরত্ব থাকা দরকার যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্ভব নয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী সম্ভব তা কি একজন কনডেমড ব্যাচেলারের কাছ থেকে জানতে হবে?

ব্যাচেলাররাও কিছু কিছু বোঝে।

বোস সাহেব আপনার পরামর্শে চলে বলে কি মণিদীপাও চলবে ভেবেছেন?

না।— দীপনাথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি অত দুরাশা করিনি।

আপনার দুরাশা আর-একটু বেশি। আপনি বোধ হয় বোস সাহেবের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে চান।

দীপনাথ গাড়লের মতো চেয়ে থাকে। মুখে কোনও কথা আসে না।

মণিদীপা মৃদু একটু হেসে বলে, তুমি বোকা! বোকা! কেন বুঝতে চাইছ না যে, বোস সাহেব নয়, টাকা নয়, আমি যাকে ভালবাসি তাকেই চাই?

পিছনেই বন্ধ দরজা। দীপনাথ আস্তে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। বলে, কাকে?

তোমাকে! তোমাকে! তোমাকে!

এলো চুল ঝাঁপিয়ে পড়ল চারধারে। তরঙ্গের মতো উঠে এল মণিদীপা। চোখে পাগলের মতো দৃষ্টি। ঠোঁটে সম্মোহন। দীপনাথ ভাবল, এই যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?

তার পিঠে একটা, দুটো, তিনটে টোকা পড়ল। তারপর গলা খাঁকারির আওয়াজ।

চ্যাটার্জি! আই অ্যাম ওয়েটিং।

দীপনাথ তৎক্ষণাৎ ঘুরে দরজা খুলল। দরজার মাথা অবধি করাল বিশাল চেহারা নিয়ে বোস দাঁড়িয়ে। কিন্তু এক বৃদ্ধ, হতমান, রুগ্ন দৈত্য। তার না আছে নখ, না দাঁত, না হিংস্রতা।

আসুন, বোস সাহেব।

আর ইউ বিজি?

একটু। উই আর সরটিং আউট এ ফিউ থিংস।

দেন গো অ্যাহেড। আমি বরং আমার ঘরে...

না। এখানেই আসুন। এটা আপনার স্ত্রীর ঘর। আমি আউটসাইডার।

বোস একটু হাসে, কাঁধ তুলে ছেড়ে দেয়। তবে ঘরে ঢোকেও।

মণিদীপা হাত তিনেক দূরে থেমে আছে। নিস্তব্ধ তরঙ্গ। মুখ-চোখে অপমান ফাটো-ফাটো হয়ে আছে। থম ধরে আছে কান্না।

বোস মৃদু স্বরে বলে, আমি হয়তো ডিস্টার্ব করছি।

দীপনাথ তার হাসিমুখ তুলে বোস সাহেবের মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, পাত্রী আমার পছন্দ নয় বোস সাহেব। পাত্রীরও পাত্র পছন্দ নয়।

বোস গম্ভীর হয়ে বলে, আই থট আদারওয়াইজ।

আপনি ভুল ভেবেছিলেন। মণিদীপা খুব গভীর মনের মানুষ পছন্দ করেন। আমার সেই গভীরতা নেই। আর আমি হুইমজিক্যালদের পছন্দ করি না। কিন্তু মণিদীপা হুইমজিক্যাল।

বোস দাঁড়াতে পারছে না। শরীরের ভিতরকার কোনও অপ্রতিহত দুর্বলতা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। একটু আড়ষ্ট পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে বোস সাহেব মণিদীপার বিছানায় বসে। সাঁই সাঁই করে খানিক দম নিয়ে বলে, বেয়ারাকে একটু খাবার জল দিতে বলো তো দীপা।

মণিদীপা একবার বোস সাহেবের দিকে তাকায়। পালানোর এমন সুযোগ আর পাবে না। ত্বরিত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

একটু বাদে বেয়ারা ট্রে-তে একটা অস্বচ্ছ কাচের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢোকে। আর তখন করিডোরের প্রান্তে টেলিফোনে নির্ভুল ডায়ালের আওয়াজ পায় দীপনাথ।

মণিদীপা বলল, হ্যাল্লো! ডক্টর মুখার্জি আছেন? ইটস আর্জেন্ট! ভেরি আর্জেন্ট।

বোস সাহেব জলটা শেষ করে খালি গ্লাস হাতে নিয়ে শূন্য চোখে চেয়ে আছে।

দীপনাথ নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে। শূন্য, সব শূন্য লাগে তার এ বাড়ির। আস্তে আস্তে সে সিঁড়ি ভেঙে নামে। আর ফিরে তাকায় না।

শরীরে আবদ্ধ এই জীবন, তবু শরীরেই কি শেষ? এই যে এক জায়গায় থেকেও চেতনা দিয়ে কত দূর পর্যন্ত স্পর্শ করছে প্রীতম, এ কি সত্য নয়? এক দরজা জন্ম, আর-এক দরজা মৃত্যু, এ ছাড়া আর কোনও ফাঁক-ফোকর নেই যা দিয়ে জানা যাবে এই অস্তিত্বের কারণ।

একা একা বড় অস্থির হয় মাঝে মাঝে প্রীতম। তার সব যন্ত্রণার উৎস হল কয়েকটি মানুষের প্রতি তার আকণ্ঠ ভালবাসা। লাবু, বিলু, মা, বাবা, পরিজন। কাউকেই ছেড়ে দেওয়া যায় না, কাউকেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। তবু কেন এই নশ্বরতা? কেন ছেড়ে দিতে হয়? কেন ছেড়ে যেতে হবে?

মাঝরাতে এই অস্থিরতাবশে সে একদিন ডুকরে ওঠে, মরম! মরম!

জানলার পাশের বিছানা থেকে মরম তার ডাকে সাড়া দেয়, দাদা, ডাকছ?

ওঠ তো! ওঠ! আমার ভীষণ অস্থির লাগছে। মাকে ডাক, শতমকে ডাক! শিগগির!

মরম চকিতে ওঠে। কাছে এসে মশারি তুলে তাকে দু' হাতে ধরে বলে, কী হয়েছে, দাদা?

বাতিটা জ্বালা। এত অন্ধকার সহ্য হচ্ছে না।

মরম টিউবলাইটটা জ্বেলে দিয়ে কাছে এসে বসে। তাকে আবার জড়িয়ে ধরে বলে, ডাক্তারবাবুকে ডাকব?

ডাক্তার! ডাক্তার কী করবে? ডাক্তারের কাজ নয়। আমার মন বড় অস্থির।

আমি তোমাকে একটু হাওয়া করছি। শুয়ে থাকো।

শুতে পারছি না। শুলেই বুকে চাপ লেগে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দাঁড়াও।— বলে মরম উঠে গিয়ে টেবিল থেকে একটা অম্বলের ট্যাবলেট স্ট্রিপ থেকে ছিঁড়ে এনে হাতে দিয়ে বলে, এটা খেয়ে নাও। বোধহয় পেটে গ্যাস হচ্ছে তোমার।

প্রীতম ভাল ছেলের মতো ট্যাবলেটটা চিবোতে থাকে। বলে, তুই বসে থাক। আমার একা লাগছে।

মরম তাকে প্রায় বুকের সঙ্গে টেনে রেখে বলে, আমি আর ঘুমোব না।

হ্যাঁ রে, কলকাতার কোনও চিঠি এসেছে?

ও, তুমি লাবু আর বউদির কথা ভেবে অস্থির হয়েছ?

প্রীতম মাথা নাড়ে, না। শুধু ওরা নয়, আজকাল কেমন তোদের সকলের কথাই মনে হয় ভীষণ।

ভেবো না। আজই বউদির চিঠি এসেছে। সবাই ভাল আছে।

প্রীতমের চোখ জলে ভরে এল। হঠাৎ বিশীর্ণ হাতে মরমের গাল ছুঁয়ে বলল, তুই কেন খারাপ হয়ে গেলি রে, মরম?

মরম এ কথায় চুপ করে থাকে। মুখের ওপর এত সরলভাবে এই প্রশ্ন কেউ তাকে করেনি।

প্রীতম আবার তাড়া দেয়, বল কেন খারাপ হয়ে গেলি!

তুমি একটু বিশ্রাম করো না, দাদা!

না, তুই আগে বল।

খারাপ হয়ে গেলাম, কী করব বলো। তবে তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, আবার ভাল হয়ে যাব। একটু একটু হচ্ছিও তো!

তোর কি খুব টাকার দরকার?

কেন, তুমি দেবে?

দেব। কেন দেব না?

তুমি যে কী বলো তার ঠিক নেই। তোমার টাকা নিয়ে কি আমার চিরকাল চলবে? নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে না?

তুই শতমের সঙ্গে ব্যাবসা করিস না কেন?

মেজদা আমাকে বিশ্বাস করে না বোধহয়।

কেন করে না?

একবার কিছু টাকা নষ্ট করেছিলাম।

তা হলে তুই আলাদা ব্যাবসা কর। আমি টাকা দেব।

মরম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ব্যাবসা তো একটা করছিলাম। কিন্তু বাবা বা মেজদার পছন্দ নয়। অবশ্য ভদ্রলোকের ব্যাবসাও নয় সেটা।

কিসের ব্যাবসা?

নেপালের বর্ডার থেকে স্মাগলিং।

প্রীতম অস্থিরতা বোধ করে আবার। মাথা নেড়ে বলে, খবরদার না। ধরা পড়লে শেষ হয়ে যাবি।

মরম হেসে বলে, পুলিশ-টুলিশের ভয় নেই। ভয় স্মাগলিং গ্রুপের কিছু মস্তান ছেলেকে। প্রায়ই গ্রুপে গ্রুপে লেগে যায়। অনবরত মারপিট হয়।

আর খুন?

অনেক। রোজ একটা-দুটো স্ট্রে খুন হচ্ছে, দেখছ না?

হাতে পেলে তোকেও মারবে?

মরম হাসে, মারবে। কতগুলো পাড়ায় আমি যাই না।

তুই কাউকে মেরেছিস?

খুন? না, কাউকে না। তবে হাত-ফাত ভেঙেছি অনেক।

তোর রিভলভার আছে?

মরম একটু চুপ করে থেকে বলে, ওয়ান শট একটা জাপানি জিনিস কিনেছিলাম। দিয়ে দিয়েছি। তুমি রাতদুপুরে এসব নিয়ে এত ভেবো না তো!

প্রীতম সে কথায় কান না দিয়ে বলে, তুই কখনও মার খেয়েছিস?

অনেক। কয়েকবার খুন হতে হতে বেঁচে গেছি।

তোর অপমান লাগে না?

অপমান! না। সেসব নয়। মারের মধ্যে অপমানের কী আছে? মার খেয়েছি, উলটে মেরেছি।

আমি কাউকে কখনও মারিনি। জীবনে একবার ছাড়া দু'বার মার খাইনি।

তুমি ছিলে গুড বয়।

ওই যে রাস্তার শেষে বড় রাস্তার ড্রেন! ওখানে একবার মেজদা খুব মেরেছিল।

মেজদা মানে দীপুদা নাকি?

হ্যাঁ, সেই ছোটবেলায়।

দীপুদা একসময়ে শিলিগুড়ির মস্তান ছিল।

খুব মস্তান। কিন্তু আমাকে ভালবাসত খুব। আজও বাসে। মেজদার সেই মার আজও আমার শরীরে লেগে আছে। কিন্তু তাতে আমার খুব উপকার হয়েছিল। জড়তা, লজ্জা, সংকোচ সব কেটে গিয়েছিল।

মরম হাসতেই থাকে, আমরা অন্যরকম, মার খেয়ে কিছুই হয়নি।

তুই খারাপ হয়ে গেছিস।

তোমার কি সেজন্য মন খারাপ?

সেজন্যও। সব কিছুর জন্য। বেঁচে থাকার ওপর ঘেন্না এসে যায়। তোরা আমাকে বাঁচতে দিবি না।

ক্লান্ত প্রীতম বালিশে মাথা রাখলে মরম তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, একটা চাকরি হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখো।

তোকে কে চাকরি দেবে? ভাল করে লেখাপড়াই করলি না।

প্রীতম চোখ বুজে গভীর করে শ্বাস নেয়। বুকে দহন, মাথায় অস্থিরতা। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে, ফোঁটা ফোঁটা সময় পড়ছে টুপ টাপ করে করে। কারও জন্য কিছু করা হল না এই জীবনে।

মরম!

বলো দাদা।

নিজের জন্য ছাড়া আমি কখনও কারও জন্য কিছু করিনি। সেজন্য আজ বড় দুঃখ হয়। পৃথিবীটা কী বিশাল! আমি কেবল ছোট হয়ে থেকেছি। তুই ছোট হোস না।

আচ্ছা, দাদা।

শতমকে ডেকে দে। ও আমার মাথায় জপ করলে আমি বেশ ভাল থাকি।

মরম ঘড়ি দেখে বলে, সেজদা তো রাত তিনটে থেকে ধ্যানে বসে যায়। এখন সাড়ে তিনটে। ডাকলে আবার ক্ষতি হবে না তো?

প্রীতম একটু হাসে, তা হলে তুই জপ করে দে।

আমি! আমি তো মন্ত্র নিইনি।

নিসনি কেন?

কেউ কখনও বলেনি নিতে।

মনকে যা ত্রাণ করে তাই মন্ত্র। আগে এসব নিয়ে ভেবে দেখিনি, এখন খুব ভাবি। এখন থেকে তুই আমার মাথায় জপ করে দিবি রোজ।

মন্ত্র নিয়ে নেব তা হলে?

নে। নিলে ক্ষতি কী? নিয়ে দেখ কী হয়।

নেব।

শতমকে ডাক।

মরম উঠে যায়।

একটু বাদেই শতম এসে নিঃশব্দে প্রীতমের শিয়রে বসে।

প্রীতম তন্দ্রার মধ্যে ওর দাড়িয়াল মুখের দিকে চেয়ে অস্ফুট গলায় বলে, বড় কষ্ট।

কেমন কষ্ট?

মনটা বড় খারাপ। সকলের জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে।

জানি। কষ্টই তো ভাল। কষ্ট মানুষকে জাগিয়ে রাখে, চেষ্টাশীল রাখে। বড় বড় মানুষের জীবনী পড়ে দেখো, কী অমানুষিক কষ্ট গেছে তাদের।

আমি তো বড় মানুষ নই।

তুমি মস্ত মানুষ। সেটা আমরা জানি।

প্রীতম ক্ষীণ একটু হাসে। মাথা নাড়ে। বলে, না রে। না।

শতম তার অভ্যন্তরীণ নাম জপের স্রোত খুলে দিয়ে নিঃশব্দে প্রীতমের মাথা ছুঁয়ে বসে থাকে। শব্দের তড়িৎ প্রবাহিত হতে থাকে এক সত্তা থেকে অন্য সত্তায়। শব্দ দোলে, ঢেউ খায়, তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মহাসমুদ্রের দিকে। মহাজীবনের নিহিত সংকেতবার্তা বেজে যেতে থাকে চারদিকে। ত্রাতা ডাকে, অনাহত শব্দ ডাকে।

প্রীতম গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে। শতমেরও বাইরের চেতনা নেই। নাসামূলে ভ্রু-মধ্যের গভীবতায় তেসরা তিল। যেখানে দ্বিদলে ফুটে ওঠে এক অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের ছবি। সে একত্র করার অস্ফুট গলায় বলে উঠতে থাকে, ঠাকুর...দয়ালদেশ... ওই তো ইটারনাল থ্রোন!

সকালে যখন বারান্দায় এসে বসে প্রীতম তখন ভোরবেলাটা তার এত অদ্ভুত লাগে! এ রকম অলৌকিক সুন্দর সকাল সে আর কখনও দেখেনি। এত গভীর, এত রহস্যময়, এত অফুরান!

শেষ শীতের টান এখনও বাতাসে রয়েছে। আর আছে উপচে পড়া রোদ। সামনে একটু ফাঁকা জমি, বাড়ি-ঘর, আকাশ, এই দেখেই তো বড় হল প্রীতম। এই সেই একই শিলিগুড়ি। তবু কোত্থেকে এল এই অদ্ভুত এক সকাল। বার বার এক অসীম আনন্দের বাঁধা তারে কে আঙুল ছোঁয়ায়! আর শিউরে শিউরে ওঠে সে। আজ কোনও পিছুটান টের পাচ্ছে না সে, কারও জন্য কিছু কষ্ট নেই। এ কেমন?

তবে কি বহু কোটি বছর পর মৃত্যুশাসিত এই পৃথিবীকে এসে স্পর্শ করল মৃত্যুহীনতার আলো? আর কখনও কেউ মরবে না? না মানুষ। না গাছপালা। না কীটপতঙ্গ।

ছোট বোন টিউশানিতে যাওয়ার সময় বলে গেল, আসছি দাদা।

ভারী আনন্দে প্রীতম বলল, আয়। তাড়াতাড়ি আসিস।

মা দুধ নিয়ে এল রোজকার মতো। প্রীতম মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরল রোগা হাতে, মা!

কী রে? কাল রাতে নাকি ঘুমোসনি? মরম বলছিল।

প্রীতম কথার জবাব না দিয়ে আবার গম্ভীর গলায় ডাকে, মা।

মা এই ডাক বোঝে। গভীর হয়ে যায় চোখ, মুখে স্নিগ্ধতা নিবিড় হয়। মাথায় হাত রেখে বলে, চিন্তা করিস না। কাল বিলুর চিঠি এসেছে। ওরা ভাল আছে।

ভাল থাকবে। সবাই ভাল থাকবে।

দুধটা খেয়ে নে।

তুমি বোসো তো কাছে। খাইয়ে দাও।

মা বসে। খাইয়ে দেয়।

মা!

বলো।

ওই মাঠটায় তেজেনবাবুরা একবার দুর্গাপুজো করেছিল, মনে আছে?

হ্যাঁ। তারপর আর হয়নি। তুই তখন ছোট।

ওইখানে অষ্টমীর দিন একটা পাঁঠা বলি হয়েছিল।

হবে হয়তো।

হয়েছিল। ছোট্ট একটা পাঁঠা। ছেঁচড়ে যখন হাড়িকাঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ওঃ...জীবজন্তুরাও কাঁদে, জানো?

তা আর কাঁদে না! খুব কাঁদে।

আমার বার বার মনে হচ্ছে, সেই পাঁঠাটা বোধ হয় আজও ওইখানে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওই দেখো।

দূর পাগল! কী যে বলিস!

ভাবতে দোষ কী মা? তোমার কি ভাবতে ভাল লাগে না, যারা মরে গেছে, আসলে তারা কেউ মরেনি! অন্য একটা জায়গায় গিয়ে রয়েছে।

মরা মানে তো তাই-ই শুনি!

হ্যাঁ, তাই। মা, শতমের ঘর থেকে গীতাটা একটু নিয়ে এসো তো। তারপর আমার পাশে বসে শোনো। শুনবে?

ওমা! শুনব না? আমি কত বলি, কেউ একটু শোনায় না। বোস, নিয়ে আসি।

॥ ছেষট্টি ॥

গীতা পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে থামে প্রীতম, কোনও কোনও শ্লোক ব্যাখ্যা করে মাকে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু বেশিক্ষণ পারে না। হাঁফ ধরে আসে। অবসন্ন লাগে।

আজ থাক, আবার কাল পড়িস।— বলে মা হাত থেকে ছোট্ট গীতাটা খসিয়ে নিয়ে চলে যায়।

প্রীতম চুপ করে বসে থাকে। বেলা বাড়ে। প্রীতমের ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না। আনন্দের উৎস থেকে যে বান এসেছিল তা আস্তে আস্তে সরে যায়। কিন্তু তীরভূমিতে নতুন পলিমাটির স্তরও রেখে যায় সে। আনন্দের রেশ অনেকক্ষণ তার সঙ্গে থাকে পোষা বেড়ালের মতো।

সামনে চেয়ে ছিল প্রীতম। দেখার তেমন কিছু নেই। রাস্তার ওধারে মাঠ বাড়িঘর, অনেক কাঁঠাল গাছের ভিড়। কিন্তু এই তুচ্ছ দৃশ্যের মধ্যে এক আনন্দের আলো খেলা করে আজ। সদর স্ট্রিটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রবি ঠাকুরের যেমন একদা হয়েছিল, তেমনই কিছু কি এ? একটা ডিম ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে এক বিস্ফারিত বিস্ময়?

গরম জল করে মা যখন তাকে ধরে ধরে স্নানঘরে নিয়ে গেল তখনও তার মাথা আচ্ছন্ন হয়ে আছে, চোখে ঘোর। একটা জলচৌকিতে বসিয়ে মা তার গায়ে যখন কুসুম-গরম জল ঢেলে দিচ্ছে তখন সে স্পষ্টই অনুভব করে তার গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে অজস্র নির্ঝরিণী। ধুইয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন সমস্ত অসুখ। শরীরে আজ জীবাণুদের নিত্যকার কোলাহল নেই, মৃত্যুভয় নেই। পৃথিবীর দীন দরিদ্রতম ভিক্ষুক বা হতভাগ্যও মরার আগে কিছুক্ষণ সুখভোগ করে প্রকৃতির নিয়মে। তারও কি এই শেষ সুখ? হ্যাঁ, ভেবেচিন্তে তাই মনে হয়। হোক। এখনই যদি তার মৃত্যু

হয় তবে তার কোনও দুঃখ নেই। অজানা পথ ধরে সে এক আনন্দধামে চলে যাবে। মৃত্যু যদি এ রকম হয় তবে কী সুন্দর!

ছেলেবেলার কয়েকজন বন্ধু প্রায়ই দেখা করতে আসে। বহুকাল এই সব বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে। মানসিকতারও বিশাল ফারাক ঘটেছে। এখন এরা আর বন্ধু নয়, চেনা মানুষ মাত্র। প্রথম প্রথম ওরা দেখা করতে এলে বলার মতো কথা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুরিয়ে যেত। মফস্‌সলের মানুষের সঙ্গে কলকাতার লোকের তফাত তো থাকবেই। কিন্তু প্রথম দিককার সেই দূরত্ব কমে এসেছে এখন। বন্ধুদের সঙ্গে বলার মতো কথা সে অনেক খুঁজে পায়।

আজ বিকেলে এল ধীরাজ। ধূপকাঠির একটা ব্যাবসা আছে তার। রবীন্দ্রনগরের শেষ প্রান্তে খুব দীনদরিদ্র একটা বাড়ি আছে তার। বউ, দুই মেয়ে আর মা নিয়ে সংসার। সবাই সারাদিন ধূপকাঠি তৈরি করে, ধীরাজ সাইকেলে করে তা বিক্রি করতে বেরোয়। খুবই কাহিল অবস্থা। দিন চলে না।

এই দীনহীন ধীরাজকে বড় ভাল লাগে প্রীতমের। একটা দেশলাই কেনার আগেও ধীরাজকে দু'বার চিন্তা করতে হয়। এই যে কষ্টের বেঁচে থাকা, তা আস্তে আস্তে ধীরাজের সব অহংবোধ শুষে নিয়ে ভারী নরম এক মানুষ করে তুলেছে তাকে।

আজ বিকেলে ধীরাজ আসতেই প্রীতম একেবারে বোকা গেঁয়ো মানুষের মতো সরলভাবে বলে উঠল, বুঝলি ধীরাজ, আমার আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। ভীষণ আনন্দ।

সাইকেলটা বারান্দার নিচে দাঁড় করিয়ে উঠে এল ধীরাজ। সাইকেলের হ্যান্ডেলের দু'ধারে দু'টি প্রকাণ্ড থলে ভরতি ধূপকাঠি। ধীরাজ কাছে এসে বসলেই তার গা থেকে বিচিত্র নানা আতর বা মশলার সুবাস পাওয়া যায়।

আনন্দের কথায় ধীরাজের মুখেও ভারী খুশির হাসি দেখা গেল। মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল, আনন্দ হচ্ছে? তার মানে তুমি সেরে উঠছ। এ খুব ভাল লক্ষণ।

সেরে উঠছি কি না সেটা কোনও পয়েন্ট নয় রে ধীরাজ! আজই যদি প্রাণটা বেরিয়ে যায় তা হলেও ক্ষতি নেই।

ধীরাজ সম্ভবত এ ধরনের আনন্দের খবর রাখে না। তবে শিক্ষিত ও সফল এই বন্ধুটির যাবতীয় কথাকেই সে মূল্য দেয়। শুধু এই মরার কথাটাকে সইতে পারে না। বলল, মরবে কেন? তুমি এত ভাল মানুষ, এত কিছু শিখেছ, জেনেছি, তুমি মরলে চলবে কেন? ভগবানের ওরকম অবিচার নেই।

ভাল মানুষরা কি মরে না রে ধীরাজ?

ধীরাজের সরলতা যেমন, তেমনি তার বিশ্বাসের জোর। বলে, মরবে না কেন? মরে। কষ্টও পায়। তবে আমরা বাইরে থেকে একটা লোককে দেখে কতটুকু বুঝি বল? এই জন্মটা তো আর একটা মাত্র জন্ম নয়, অনেক জন্মের একটা যোগফল। কত জন্মে কত কী টেরাবেঁকা কাজ হয়েছে, এ জন্মে তার এফেক্ট পাচ্ছে মানুষ। আমরা যতটুকু দেখি তার এপারে ওধারে অনেক অজানা জিনিস রয়ে গেছে। জন্মের আগেও জীবন, মৃত্যুর পরেও জীবন। আমরা সংসারী মানুষ, স্বার্থপর ছোট মানুষ সব, আমাদের কাছে দুটো দরজাই বন্ধ। যারা জ্ঞানী-গুণী মহাপুরুষ ওই দুই দরজা তাদের কাছে খোলা। তারা অবারিত দেখতে পায়, জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়ে মানুষ চলেছে।

ভীষণ সরল মন, গেঁয়ো চাষাভুষোর মতো এই সব কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় প্রীতমের। খানিকটা বিশ্বাস আজকাল করেও সে। তবু বলে, শরীর ছাড়া কি বাঁচা যায়? আমি যে ভাবতেই পারি না। শরীর ছাড়া কি আমি বা তুই জন্মের আগেও ছিলাম, মরার পরেও থাকব?

ধীরাজ তেমনি অকপটে বলে, ছিলাম না? তা হলে আছি কী করে? আর আছি যখন, থাকতেও তো তখন হবেই।

ধূপকাঠির ঝাঁঝালো আতরের গন্ধটা আজ ভারী মিঠে লাগে তার। চুপ করে বহুক্ষণ বসে থাকে প্রীতম। সরল হওয়ার চেষ্টা করে, বিশ্বাসী হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এক ধরনের সচ্ছল শহুরে

জীবনের বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য গ্রহণ-বর্জনের রীতিতে অভ্যস্ত বলে পাশাপাশি মনের মধ্যে সন্দেহের কাঁটাও ফুটে থাকে। বিশ্বাস কি এত সোজা?

প্রীতম বলে, আমার ঠিক তোর মতো হতে ইচ্ছে করে। একটু টানাটানির সংসার থাকবে। ঘরে তৈরি জিনিস সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে দোরে দোরে বেড়াব। আনন্দই আলাদা।

দূর ব্যাটা, আমার জীবনটা কি সুখের? সকাল থেকে রাত অবধি বাড়ি বাড়ি, দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ানো, ওর মধ্যে কোনও আনন্দ নেই।

আমার যে বড় বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে রে ধীরাজ।

আমারও করে। কিন্তু আমার তো হবে না। জন্ম বয়সে কর্ম করেছিলাম একবার মাকে নিয়ে কামাখ্যা ঘুরে। এখন একেবারে কুয়োর ব্যাং। তোমার মতো লেখাপড়া শিখলাম না, চাকরি করলাম না।

চাকরি কি বেশি সুখের ব্যাপার নাকি? আমিই বরং রেগেমেগে কতবার চাকরি ছাড়ার কথা ভেবেছি।

তবুও আমাদের দিন আনি দিন খাই অবস্থার চেয়ে তো ভাল।

প্রীতম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

ধীরাজ বিস্ময়ের চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে। বলে, তুমি মাঝে মাঝে এমন সব দুঃখের কথা বলো যা শুনলে আমার অবাক লাগে। নিঃসঙ্গতা, নন-কমিউনিকেশন, মৃত্যুভয় এসব আমাদের কাছে কেতাবি ব্যাপার,বুঝলে? তোমার হয়তো ছাইরঙা আকাশ দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়, আমার কিছুই হয় না। তুমি হলে খুব সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। আর আমাদের সব মোটা দাগের ব্যাপার।

সূক্ষ্ম অনুভূতির নিকুচি করি। তোর মতো দায়ে পড়ে সংসারের ঘানিতে পেষাই হয়ে বেরোলে আমি বেশ একখানা ঝরঝরে মানুষ হতাম।

যাঃ, কী যে বলো!

তোর বাড়িতে একদিন নিয়ে যাবি?

তার আর কথা কী? কালই চলো। রিকশায় দশ মিনিটও নয়। তবে মাঝখানে সুভাষপল্লির রাস্তাটা একটু খারাপ, ঝাঁকুনি-টাকুনি লাগতে পারে।

ঝাঁকুনিতে কিছু হবে না। যাব।

ধীরাজ খুব খুশি হয়ে বলে, বাড়ির এমন অবস্থা যে কাউকে যেতে বলতে লজ্জা করে। তুমি নিজে থেকে যেতে চাওয়ায় এত ভাল লাগল!

প্রীতম প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলে, আজ ধূপকাঠি কীরকম বিক্রি হল?

উদাস হয়ে ধীরাজ বলে, বাঁধা গাহেক কিছু আছে, তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। বিক্রিবাটা ভাল নয়। প্রচণ্ড কম্পিটিশন। মালমশলার দামও চড়া।

অন্য কিছু ব্যাবসা করিস না কেন?

অনেক কিছু করার চেষ্টা কি আর করিনি? কয়লার দোকান দিলাম, চানাচুর বানালাম, আলুও বেচেছি, কিন্তু কোনওটাতেই মার্কেট পাওয়া গেল না। অল্প পুঁজির কারবার তো, চটপট রিটার্ন না পেলে পেটে গামছা বাঁধতে হয়। লগ্নীর টাকা পেট্রায় নমঃ হয়ে যায়। সবই তো বোঝো। তুমি কত বড় অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

প্রীতম ম্লান হাসল। ধীরাজের আয়-ব্যয়ের হিসেব কষতে বসলে সে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে দেখবে ডেবিট-ক্রেডিটে অনেক ভুতুড়ে এন্ট্রি, অনেক অলৌকিক যোগ-বিয়োগ। সে জানে, ধীরাজের আয় মাসে দুশো টাকাও নয়। দুই মেয়ে, এক ছেলে, বউ, মা নিয়ে সংসার। প্রীতম মাথা

নাড়ে, না, কোনও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের পক্ষেই সম্ভব নয় ওর ব্যালান্স শিট তৈরি করা। তার জন্য দরকার ম্যাজিক জানা।

ধীরাজ একটা শ্বাস ফেলে বলে, তবে সান্ত্বনা কী জানো, দুনিয়ায় আমার চেয়েও খারাপ অবস্থায় লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ বেঁচে আছে।

প্রীতম আনমনে মাথা নাড়ল। পৃথিবীতে কে কেমনভাবে বেঁচে আছে তা নিয়ে বহুকাল সে সত্যিকারের মাথা ঘামায়নি। দুঃখ-দুর্দশায় নাভিশ্বাস ওঠা এই দেশে যে সে নিজে সপরিবারে না খেয়ে মরবে না এবং মোটামুটি সুখেই থাকতে পারবে এটা বুঝেই তৃপ্ত ছিল। মাঝে মাঝে ভিখিরিকে ভিক্ষে দেওয়া, সমবেদনা বোধ করা এবং মানুষের জন্য কিছু করা উচিত বলে ভাবা, এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না তার।

ধীরাজ চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে সে পৃথিবীর মানুষজন নিয়ে ভাবল। বুকের মধ্যে ভারী একটা চাপ কষ্ট। মরেই যদি যেতে হয় তবে দুনিয়ার আরও কিছু মানুষের সঙ্গে চেনা-জানা হোক। সারাজীবনে মাত্র গুটিকয় মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, অথচ পৃথিবীতে কত কোটি কোটি মানুষ।

রাত্রিবেলা শতম তার মাথায় জপ করতে এলে প্রীতম গম্ভীর মুখে বলে, তোর নামজপে কাজ হচ্ছে। আমি অন্যরকম ফিল করছি।

শান্ত হাসিমুখে শতম বলে, জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধি ন সংশয়ঃ।

মানছি।

তবে এই নাম নিজেই নাও না কেন?

এক জায়গায় মাথা মুড়োতেই হবে?

শতম গম্ভীর হয়ে বলে, এই যে তুমি এত অ্যাকাউন্টেন্সি শিখেছ, এই তুমিও তো একদিন এক দুই লিখতে জানতে না, অ আ ক খ জানতে না। কেউ হাত ধরে দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে শিখিয়েছিল। তাই না? তখন তো সংশয় ছিল না! এখন জীবনের হিজিবিজি অনেক হিসেবনিকেশ জট পাকিয়েছে, কেউ যদি জট খুলতে শেখায় তবে আপত্তি কী?

প্রীতম চুপ করে চোখ বুজে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে আপন মনে বলে, জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধি ন সংশয়ঃ। শতম, ন সংশয়ঃ।

আনন্দের রেশটা রইল পরদিন সকালেও। ঘুম ভেঙে চারিদিকে আবছা ভোরের নরম আলোয় এক স্নিগ্ধ জগৎ দেখতে পায় সে। শরীরে জীবাণুদের কোলাহল নেই, একাকিত্বের বোধ নেই, মৃত্যুর বাঘ কোথাও ডাকেনি।

মরম! মরম! ওঠ, ওঠ।

ডাকছ দাদা?— বলে মরম উঠে পড়ে।

চল বাইরে। দেখ, কী সুন্দর ভোর! দরজা খুলে দে শিগগির।

খুলছি।— বলে মরম উঠে দরজা খোলে। প্রীতমের চেয়ারটা টেনে বের করে বারান্দায়।

বোসো দাদা।

প্রীতম বসে বলে, তুইও বোস। দেখ, চারদিকে চেয়ে দেখ।

মরম বারান্দার সিঁড়িতে বসে হাই তোলে। কথা বলে না। কিন্তু ঝুম হয়ে বসে সেও চেয়ে থাকে আকাশের দিকে।

প্রীতম মুগ্ধ সম্মোহিত চোখে চেয়ে থাকে। ভিতরে এক আনন্দের উৎস মুখ খুলে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে থাকে। কোথা থেকে আসে এত আনন্দ?

ভবানীপুরের বাসা, লাবু, বিলু, অরুণ, ভিতরের সেই বিছানা সব ছায়াছবির মতো চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। কিন্তু কিছুই স্পর্শ করে না তাকে।

মরম, একটা রিকশা ডেকে আন! আমি একটু বেড়াতে যাব।

বেড়াতে যাবে? পারবে?

পারব। যা।

আমি সঙ্গে যাব কিন্তু।

যাবি।

মা যদি বকে?

বকবে না। দেরি করিস না, যা।

মরম যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই রিকশা নিয়ে আসে।

বারান্দা থেকে প্রীতমকে ধরে ধরে নিয়ে রিকশায় তুলবে বলে হাত বাড়িয়েছিল মরম। প্রীতম হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, পারব। আজ পারব।

শুধু রিকশায় উঠবার সময় একটু ভর দিতে হল। কিন্তু স্বচ্ছন্দেই উঠে বসতে পারল প্রীতম।

আমি বরং সাইকেলটা নিয়ে আসি দাদা। রিকশায় দু'জন উঠলে তোমার কষ্ট হবে।— মরম বলে।

যা, নিয়ে আয়।— অন্যমনে বলে প্রীতম। জাগতিক কথাবার্তা তার ভাল লাগছে না। তার চেয়ে অনেক জরুরি হল বেরিয়ে পড়া। কী যে একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে জগৎ জুড়ে! তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

শিলিগুড়ির অতি পরিচিত হাকিমপাড়া ছাড়িয়ে তিলক ময়দান, রোড স্টেশন, সেবকের মোড় হয়ে মহানন্দার পাড়। পিছন থেকে মরম চেঁচিয়ে বলে, আরও যাবে বড়দা?

হ্যাঁ। আরও একটু।

হিলকার্ট রোড ধরে জনবিরল পিচ রাস্তা বেয়ে বহু দূর চলে আসে রিকশা। কুসুম-রঙা রোদ উঠল পুবে। প্রীতম শুধু দৃশ্যাবলী দেখছে না। এই পৃথিবীর গভীরতায় আজ পরতে পরতে ডুবে যাচ্ছে সে। মিশে যাচ্ছে এই রোদ, হাওয়া, গাছপালা ও শূন্যের মধ্যে।

যখন প্রীতম ফিরে এল তখন বাইরের বারান্দায় উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা, বাবা আর ছবি। রূপম স্কুটারে বেরিয়েছে খবর করতে। বাইরের রাস্তায় খালি গায়ে দাড়িওয়ালা শতম বুকে হাত দিয়ে বিশাল চেহারা সটান সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

মরম সাইকেল থেকে নামতে নামতে সভয়ে বলে, আমার দোষ নেই, বড়দা নিজেই গেল। আমি শুধু সঙ্গে—

মা ধমক দিয়ে বলে, তা আমাকে বলে যাবি তো! রোগা ছেলেটাকে নিয়ে বেরিয়েছিস। চিন্তায় আমার মধ্যে আর আমি নেই।

শতম শুধু প্রীতমের দিকে চেয়ে শান্ত মুখে একটু হাসল।

শরীর ভরে এমন দুর্বহ ক্লান্তি আগে ছিল না বিলুর। আজকাল সন্ধেবেলা যখন ফেরে তখন দম ফুরিয়ে যায় যেন। অনেকক্ষণ শুয়ে বসে বিশ্রাম না নিয়ে কোনও কাজে হাত দিতে পারে না।

প্রীতম যাওয়ার পর ফ্ল্যাটটাকে নতুন করে সাজিয়ে নিয়েছে বিলু। প্রীতম যে ঘরে থাকত সেটা এখন লাবুর ঘর। বড় চৌকিতে লাবু আর অচলা শোয়। আলাদা ঘরে বিলু একা। রাত্রিবেলা তার একটানা নির্বিঘ্ন ঘুম দরকার বলেই এই ব্যবস্থা। লাবু বড্ড হাত-পা ছড়িয়ে শোয়, ছটফট করে ঘুমের মধ্যে, দাঁত কিড়মিড় তো আছেই, ওকে নিয়ে শুলে বিলুর ঘুমের অসুবিধে হয়।

বিদেশ থেকে ঘুরে এসে অরুণ তাকে একদিন বলেছে, বিলু। ইউ নিড সেক্স।

বোকা-বোকা কথা বোলো না।

মুশকিল হল, তুমি নিজেই জানো না যে, ইউ নিড সেক্স।

না অরুণ, ওসব নয়। আমি এমনিতেই টায়ার্ড। আমার দরকার অনেক ঘুম।

তোমার ম্যালনিউট্রিশনও হচ্ছে। ডাক্তার দেখাবে?

দূর! কথায় কথায় কেউ ডাক্তার দেখায়? আমার অসুখ কোথায়?

তোমার অসুখ হয়েছে, জানতি পারতিছ না।

ইয়ারকি কোরো না।

তুমি রোজ কী খাও বলো তো?

সবাই যা খায়।

এনাফ অফ প্রোটিন ভিটামিন?

অত জানি না। মাছ মাংস ডিম মাখন তো কম গিলছি না বাপু। প্রোটিন-ট্রোটিন কতটা কী যাচ্ছে ভিতরে কে জানে!

হজম হয়?

আমার কোনওকালে হজমের প্রবলেম নেই।

তা হলে কেন টায়ার্ড? ফিলিং লোনলি?

কী করে বলব কেন টায়ার্ড। আর লোনলি ফিল করার মতো সময় পাই কোথায়?

ডাক্তার দেখাও। তবে আমার মতে ইউ নিড সেক্স, ব্রুটাল সেক্স।

তুমি এবার বাইরে গিয়ে অত্যন্ত অসভ্য হয়ে এসেছ।

সত্যি কথা বলব বিলু? তোমাদের পেটে খিদে আর মুখে লাজ আমার একদম পছন্দ নয়। সেইজন্য আমার বিদেশ বেশি ভাল লাগে, সেখানে প্রিটেনশন নেই। দে নিড ইট, দে ডু ইট।

বিলু ধমক দিয়ে বলে, আমার খিদে নেই, নিড নেই। আমি অন্য কোনও কারণে টায়ার্ড। আমার কাছে সবটাই ভীষণ মিনিংলেস হয়ে যাচ্ছে।

কোনটা?

সবকিছু। চাকরি, সংসার, ইভন বেঁচে থাকা।

দেন ফল ইন লাভ উইথ মি।

লাভ কী? তুমি তো ক'দিন বাদেই টোপর মাথায় দিয়ে ছাঁদনাতলায় গিয়ে বসবে।

নাও হতে পারে সেটা। আমি অনেক ভেবে দেখলাম ইট বেটার বি ইউ।

এ কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে বিলু। তারপর আচ্ছন্ন এক মুখ তুলে বলে, শুনে একটুও আনন্দ হল না, কেঁপে উঠলাম না, নতুন কিছু মনে হল না তো অরুণ!

তুমি ভীষণ ফ্রিজিড হয়ে যাচ্ছ। রাউজ, রাউজ ইয়োরসেলফ।

আমি ভীষণ টায়ার্ড। কিন্তু সেটা শরীরের ক্লান্তি নয়। মনটাই কেমন ব্ল্যাংক।

চলো, আজ তোমাকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাব।

তোমার বদমাইশির অ্যাপার্টমেন্টে আমি আর যেতে রাজি নই।

মোটেই বদমাইশি নয়। বিয়ে করে ঘর বাঁধব বলে এক কাঁড়ি টাকায় কেনা ফ্ল্যাট। ইয়ারকি কোরো না! চলো।

অপ্রতিরোধ্য অরুণকে ঠেকাবে কী করে বিলু? তাছাড়া এই যে ক্লান্তি, এই যে ফাঁকা মন এর জন্যও একটা ঝাঁকানি দরকার। হয়তো অরুণ ঠিকই বলছে। কে জানে!

ইচ্ছে-অনিচ্ছের মাঝামাঝি দোল খায় বিলু। আর সেই দ্বিধার রন্ধ্রপথে অরুণ তার পথ করে নেয়। সেই সাজানো সুন্দর ঈর্ষণীয় তিন ঘরের ফাঁকা পড়ে থাকা ফ্ল্যাটে নিজেকে বিসর্জন দেয় বিলু।

কিন্তু যখন একটু রাতে ভবানীপুরের বাসায় তাকে পৌঁছে দেয় অরুণ, তখন গলিপথটুকু একা হেঁটে আসতে আসতে সে টের পায়, ভূতের মতো তার ঘাড়ে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে সেই ক্লান্তি, সেই অবসাদ।

বহুদিন প্রীতমকে চিঠি লেখেনি সরাসরি। বাড়ির অন্য লোককে লিখেছে। আজ কী ভেবে রাতে বিলু একটা ইনল্যান্ডে প্রীতমকে লিখল, ভাবছি কিছুদিন ছুটি নিয়ে তোমার কাছে যাব। এখানে ভাল লাগছে না। তুমি কেমন আছ?...

॥ সাতষট্টি ॥

চিত্রার বিয়ে কেমন হল, জামাই পছন্দ হল কি না তা তো বললে না একবারও।—এলাহাবাদ থেকে বেনারসের ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পর এ কথা জিজ্ঞেস করল তৃষা।

শ্রীনাথ জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। একটু আনমনা। জীবনে সে কলকাতা ছেড়ে এতদূর আসেনি। অথচ আসার পর নতুন রকমের কিছুও বোধ হচ্ছে না। গোটা দেশটা, গোটা পৃথিবীটাই বোধহয় মোটামুটি একঘেয়ে রকমের। তবু নতুন কিছু বোধ করার খুব চেষ্টা করছিল সে। তৃষার প্রশ্ন শুনে মুখ ঘুরিয়ে বলল, জামাইয়ের মুখে পক্সের দাগ আছে, না?

একটু আছে। খুব বেশি নয়। তেমন চোখে পড়ে না।

কিসের ব্যাবসা ওদের?

কতবার তো বললাম, আবগারি।

আবগারি মানে গাঁজা আফিং এসব নাকি?

হ্যাঁ। তবে চার পুরুষের ব্যাবসা। অনেক টাকা। কত বনেদি নিজের চোখেই তো দেখলে।

হ্যাঁ, অনেক টাকা। টাকা না হলে তোমার মন সহজে ভেজাতে পারত না।

টাকা জিনিসটা কি খুব ফ্যালনা? ছেলের বিদ্যেও তো কম নেই!

শ্রীনাথ মাথা নাড়ল, ভাল। আমাদের আন্দাজে খুবই ভাল পাত্র।

তোমার মেয়েরও পছন্দ। কনভেন্টে পড়া, স্টাইলিস্ট মেয়ে যখন পছন্দ করেছে তখন বুঝতে হবে পাত্র ফ্যালনা নয়।

ফেলছে কে?

তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুশি হওনি। চিত্রা চলে যাওয়ার সময় একটু কাঁদলেও না।

কান্না না এলে কী করব?— বিরক্ত শ্রীনাথ বলে, আমার সহজে কান্না-টান্না পায় না।

চিত্রা দুঃখ পেয়েছে। ওকে তুমি ছোটবেলায় কী ভালটাই বাসতে!

শ্রীনাথ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে। তারপর বলে, দুঃখ পাওয়ার কিছু তো নেই। মাসির কাছে ছিল, শ্বশুরবাড়ি গেছে। আমার কাছে তো ছিল না, আমার কাছ থেকে চলেও যায়নি।

ওটা কোনও যুক্তি নয়। দূরে ছিল, তাতে কী? তবু তো তোমার মেয়েই ছিল। এখন গোত্র ছেড়ে অন্য বাড়ির মানুষ হয়ে গেল। মেয়েদের কাছে যে এটা কত বড় ঘটনা!

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, কী জানি! আমি তেমন দুঃখ-টুঃখ পাচ্ছি না। তবে ওর কথা যেমন মনে হত তেমনি মনে হবে। এলাহাবাদেই ছিল, সেখানেই রইল। দুঃখের যে কী আছে!

ওর বরের সঙ্গে তুমি একটাও কথা বলোনি।

বলিনি!—শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, না, মনে হচ্ছে বলেছি!

কী বলেছ?

ঠিক মনে নেই। তবে বিয়ের পরদিন সকালে ও একটা তোয়ালে খুঁজছিল বাথরুমে যাওয়ার জন্য! আমি একটা তোয়ালে বিছানা থেকে তুলে এনে দিয়েছিলাম। আর সেই সঙ্গে নীচতলার বাথরুমটাও দেখিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে।

শুধু এইটুকু?

শ্রীনাথ লজ্জিত হয়ে বলে, দরকার না হলে গায়ে পড়ে কথা বলার কী আছে?

শত হলেও সে তোমার জামাই। ছেলের মতো।

জামাই কথাটা হঠাৎ খুব অদ্ভুত লাগল শ্রীনাথের কাছে। তার জামাই, ভারী নতুন কথা। একদা নিজের বিয়ের পর সে যখন জামাই হয়েছিল তখনও তার ভারী নতুন রকমের লাগত কথাটা।

ফার্স্ট ক্লাস কামরায় এতক্ষণ কোনও ভিড় ছিল না। কিন্তু ক্রমে একটি-দু'টি স্টেশনে লোক উঠতে লাগল। লোকগুলোকে দেখেই মনে হয় বিনা টিকিটের যাত্রী।

লোক ওঠায় কথাবার্তা কমে গেল। উলটোদিকের সিটে জানালার পাশে বসা নিয়ে মঞ্জু, স্বপ্না আর সজল অনেকক্ষণ মৃদু স্বরে ঝগড়া করছে। অবশ্য সজলই জানালার ধার দখল করেছে শেষ পর্যন্ত। এপাশে জানালা ধারে শ্রীনাথ, পাশে তৃষা। সরিৎ, বৃন্দা, মংলু আর নিতাই অন্য কামরায় আছে।

শ্রীনাথ বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বলল, আমার মতামত বড় কথা নয়। আমি জানি, চিত্রার ভাল বিয়েই হয়েছে। এসব ব্যাপারে তোমার সহজে ভুল হবে না।

তৃষা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ একটু জ্বালাধরা গলায় বলল, চিত্রার বিয়েতে তোমার বাড়ির কেউ এল না। অন্তত দীপু আসবে বলে আশা করেছিলাম। কত করে চিঠি দিলাম, সরিৎ গিয়ে দু'দিন মেসবাড়ি থেকে ফিরে এল দেখা না পেয়ে। সে এলে সম্প্রদানটা তাকে দিয়েই করানোর ইচ্ছে ছিল।

বিয়ে যদি কলকাতায় দিতে তবে আসত। এলাহাবাদ কি সোজা দূর? দীপু কাজের মানুষ।

এমনকী বাবা পর্যন্ত আসতে রাজি হলেন না। ছোট ছেলের কাছে গিয়ে বসে রইলেন।। এসব সবাই লক্ষ করে।

বুড়ো মানুষটাকে টেনে এনে খামোখা কষ্ট দেওয়া।

তৃষা চুপ করে চেয়ে রইল সামনের দিকে।

শ্রীনাথ নরম সুরে বলল, তুমি অকারণে ভাবছ। চিত্রার বিয়ে খুব ভাল হয়েছে। আমি বহুকাল এমন ধুমধামের বিয়ে দেখিনি।

ধুমধাম তো মেজদির জন্য। কম করেও বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা ও নিজেই খরচ করেছে। আমাদের গায়ে আঁচ লাগতে দেয়নি।

শ্রীনাথ একটু অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি? আমি ভাবলাম—

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, চিত্রার জন্য আমাদের কোনও দায়ই পোয়াতে হল না। ও যে আমার মেয়ে তা টেরও পেলাম না।

শ্রীনাথ গম্ভীর হয়ে বলে, সে তো তোমার জন্যে। আমি ওকে এলাহাবাদে রাখা পছন্দ করিনি।

তৃষা ছোট্ট একটা ধমক দেয়. এখন ওসব কথা থাক।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি এসব জায়গায় এখনও বেশ শীত আছে। খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসছে। শ্রীনাথ জানালাটা অর্ধেক নামিয়ে দিয়ে র‍্যাপারে নাক ঢেকে ঢুলতে থাকে।

প্রেসের বুড়ো মালিক কাশীতে বহুকাল আগে বাড়ি করে রেখে গেছেন। মালিকের ছেলের কাছে চাইতেই চাবি দিয়ে দিলেন, সঙ্গে বাড়ির দারোয়ানকে লেখা চিঠি।

কাশীতে এসে তাই কোনও অসুবিধেই হল না তাদের। দিন দুই ভারী অদ্ভুত সুন্দর কেটে গেল। বিশ্বনাথ গলিতে ঢুকে শতেক গলির ধাঁধায় ঘুরে বেড়ানো, দশাশ্বমেধ ঘাট, বাজার, রাবড়ি, বেনারসির কারখানা, জর্দা, কাশীর বিখ্যাত বেগুন সব মিলিয়ে রতনপুরের বদ্ধ জীবন থেকে বিচিত্র এক মুক্তি। এ ক'দিন তাদের সম্পর্কের জটিলতাগুলো বোঝা গেল না, সবাই হাসিখুশি রইল।

বেনারস থেকে রিজার্ভেশন না পেয়ে সরিৎ মোগলসরাই থেকে রিজার্ভেশন করিয়ে আনল।

ফিরতেই হবে। চিত্রা আর তার বর দ্বিরাগমনে রতনপুর যাবে। তার আগেই পৌঁছনো দরকার।

যাওয়ার দিন সকালে উঠে গঙ্গাস্নান করে এসে তৃষা হঠাৎ শ্রীনাথকে বলল, কাশীতে একটা বাড়ি করবে?

শ্রীনাথ অবাক হয়ে বলে, কাশীতে?

ভারী ভাল জায়গা। বহু বাঙালির বাস।

শ্রীনাথ বলে, তা করতে পারো, যদি ইচ্ছে হয়।

আমার খুব ইচ্ছে। এর আগেরবার এসেই জায়গাটা এত পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। এখন যদি তোমার মত থাকে।

আমার মত!— শ্রীনাথ একটু বিরক্ত হয়ে বলে, সংসারে আবার আমার অনুমতির কথা উঠছে কবে থেকে?

তৃষা এই চিমটি গায়ে মাখল না। তার চোখ-মুখ অন্যরকম। একটা অদ্ভুত উদাসীন আনন্দ তাকে বাস্তবতা থেকে অনেকটা দূরে ঠেলে দিয়েছে যেন। সে শান্ত স্বরে বলল, তোমার অনুমতির কথা ওঠে, কারণ তোমাকেও এখানে এসে থাকতে হবে।

আমি থাকব? একা?

তৃষা মৃদু হেসে বলে, একা কেন? আমিও থাকব।

শ্রীনাথ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে, কাশীবাসী হতে চাও?

হলে দোষ কী? সংসারে তো তোমার আমার মিল হল না, যদি কাশীতে থেকে হয়।

মিল নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছ নাকি আজকাল?

তৃষা এলোচুলে গামছার ঝাপটা মেরে জল ঝরিয়ে কিছুক্ষণ জবাবটা এড়াল। তারপর বলল, তুমি বোধহয় মিল চাও না!

শ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলে, আর মিল দিয়ে কী হবে? বয়স চলে গেছে, সময় চলে গেছে।

মিলের সঙ্গে বয়সের কী সম্পর্ক বলো তো! মিলটা কি কেবল কম বয়সের ব্যাপার?

তা নয়। বলছিলাম, মিল থাকলে জীবনটা এমন শয্যাকণ্টকী হয়ে উঠত না তৃষা। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আর মিল হওয়ার নয়। এখন মন পেকে গেছে, রুচি পেকে গেছে, অভ্যাস পেকে গেছে, এখন আর কেউ কারও জন্য নিজেকে বদলাতে পারব না। আর ছাড়কাট না করতে পারলে কি মিল হয়?

আমার বিশ্বাস, এখানে এসে থাকলে আমরা দু'জনেই বদলে যাব।

দরকার কী? রতনপুরে তোমার বিষয়-সম্পত্তি আছে, ছেলেপুলে আছে, সেসব ছেড়ে আসতেও পারবে না। খামোখা স্বপ্ন দেখা।

তোমার পিছুটান নেই?

না। আমি বহুকাল আগে থেকেই আলাদা হয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

তোমার যদি পিছুটান না থাকে তবে আমারও নেই।

নেই? হাসালে।

তৃষা শ্রীনাথের পাশে বসে ক্লান্ত স্বরে বলে, আমি সংসারে সবকিছু ঘেঁটে দেখেছি। আমি জানি ও থেকে আমার কিছু পাওয়ার নেই। একজনেরও মন পাইনি, কেউ আমার জন্য একটু দুঃখ করে না, আমাকে নিয়ে ভাবে না।

ছেলেমেয়েদের কথা বলছ?

তোমার কথাও।

শ্রীনাথ হাসিমুখে বলে, কারও ভালবাসাটাসা তো তুমি কোনওকালে চাওনি। টাকা চেয়েছ। ক্ষমতা চেয়েছ। প্রভুত্ব চেয়েছ। সব পেয়ে গেছ।

প্রভুত্ব! তাই বা পেলাম কোথায়? আমার পেটের ছেলে আমাকে মানে না, জানো?

শ্রীনাথ তৃষার দুর্দশার কথায় খুশি হচ্ছিল। হচ্ছে, হচ্ছে। কর্মের ফল ফলছে আস্তে আস্তে। সে বলল, সজল তোমাকে মানে না বুঝি? ঠিক আছে আমি শাসন করে দেব।

তৃষা করুণ করে একটু হাসে, ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার, দুনিয়ায় সজল একমাত্র তোমাকেই মানে। কিন্তু তোমার ওকে শাসন করার দরকার নেই। শাসনে ওর ভিতরটা তো বদলাবে না।

ও কি তোমাকে ভয় পায় না?

ভয় পেতে বলিও না। কিন্তু আমাকে ঘেন্না করার মতো খারাপ কি আমি? ওকে কোনওদিন জিজ্ঞেস কোরো তো, কেন ও আমাকে ঘেন্না করে!

সজল তোমাকে ঘেন্না করে না। ভয় পায়।

ভয় কবে কেটে গেছে! তুমি জানো না। শুধু আমি জানি। হয়তো তুমিই আস্তে আস্তে ওর মধ্যে এই বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছ।

বিষ! শ্রীনাথের বুকে আচমকা খামচা দিয়ে ধরল এক ভয়। তাই তো! বিষের কথা সে ভুলে গিয়েছিল। প্রতিদিন তার খাবারে, তার জলে, তার শ্বাসবায়ুতে অল্প অল্প করে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে তৃষা। একটু একটু করে তার আয়ু কমে গেছে। বয়সের আগেই সে বুড়িয়ে গেছে কত।

গলা খাঁকারি দিয়ে শ্রীনাথ বলে, বিষের কথা মনে করিয়ে দিলে। আমার সর্বাঙ্গে বিষ। কী করে যে বেঁচে আছি!

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এইসব কথা বলেই না তুমি সজলকে বেয়াড়া তৈরি করেছ। ওরও সন্দেহ আমরা তোমার খাবারে বিষ দিই। বেশ কয়েকবার ও তোমার খাবার আর জলের নমুনা নিয়ে গিয়ে কেমিকেল টেস্ট করিয়েছে।

শ্রীনাথ উজ্জ্বল হয়ে বলে, কী পেয়েছে?

কী পাবে? বিষ তো তোমার মনে।

শ্রীনাথ চুপ করে থাকে।

তৃষা আস্তে করে বলে, সজলকে কেন আমার শত্রু করে তুললে বলো তো!

শ্রীনাথ করুণ হেসে বলে, আমি কাউকেই কিছু করার মধ্যে রাখি না। সজল যদি তোমার শত্রু হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে তোমার জন্যেই।

তৃষা হঠাৎ আবার উদাস হয়ে বলল, তাই হবে। একটা দিকে বাঁধ দিতে গিয়ে আমার অন্যদিকটা ভেসে গেছে।

তৃষা অনেকক্ষণ এলোচুলে বসে থাকে। তারপর বলে, কাশীতে বাড়ি করার কথাটা তা হলে কোথায় দাঁড়াল?

বাড়ি করবে করো।

তুমি?

আমি কী? তোমার সঙ্গে এসে থাকব কি না?

সেই কথাই তো বারবার জিজ্ঞেস করছি।

হঠাৎ কেন যে আমাকে তোমার দরকার হচ্ছে সেইটেই বুঝতে পারছি না।

তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আমার কোনও আশ্রয় নেই? কোনও অবলম্বন নেই?

শ্রীনাথ হেসে ফেলল, তুমি নিজেই কি বিশ্বাস করো? তুমি কত লোকের আশ্রয়দাত্রী, পালয়িত্রী! তোমার ডালে ডালে কত পাখি বাসা করে আছে, মৌমাছি চাক বেঁধেছে।

তৃষাও মৃদু হাসল। উঠে গরদের লালপেড়ে একটা শাড়ি পরতে পরতে বলল, চলো দু'জনে বিশ্বনাথের পুজো দিয়ে আসি।

পুজোয় আমার বিশ্বাস নেই। তুমি যাও।

আমারও নেই। কিন্তু কাশীতে এলে কেমন যেন ইচ্ছে হয়।

তৃষা বেরিয়ে যাচ্ছে। শ্রীনাথ সামনের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপিসাড়ে দেখল, লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরা বয়স্কা সুন্দরী মহিলা রিকশায় উঠছে। একটু ঘোমটা টানল। হাতে তোয়ালে দিয়ে ঢাকা একটা পিতলের রেকাব। দৃশ্যটা খুবই অভিনব। খুবই অদ্ভুত।

ছেলেমেয়েরা সরিতের সঙ্গে ইউনিভার্সিটি দেখতে গেছে। বাড়িতে থাকলে ওদের ডেকে দৃশ্যটা দেখাত শ্রীনাথ, দ্যাখ, কর্মফল মানুষকে কত নরম-সরম করে তোলে। দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ।

ফাঁকা বড় বাড়িটায় শ্রীনাথ একা একা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ হাসল। বৃন্দা আর মংলু রান্নার কাজে ব্যস্ত। ছাদে উঠে গেল শ্রীনাথ। মস্ত কেঁদো এক বাঁদর ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ছিল রেলিং-এ। একবার তাকাল শ্রীনাথের দিকে, তবে গ্রাহ্য করল না। শ্রীনাথ বাঁদরটার হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে নীচের দৃশ্য দেখল অনেকক্ষণ। মনটা হালকা লাগছে। ফুরফুরে লাগছে।

রাতে পাঞ্জাব মেল ধরে কলকাতা হয়ে রতনপুর পৌঁছনো পর্যন্ত এমনই ফুরফুরে রইল মনটা।

সারাক্ষণ আড়াল-আবডাল থেকে আজকাল সজলকে লক্ষ করে তৃষা। এই বড়সড়, শক্তসমর্থ, বুদ্ধিমান, রাগী, তেজি আর সাহসী ছেলেটিকে বুঝবার চেষ্টা করে। এই একটি মানুষের কাছে এসে হোঁচট খেয়েছে তৃষা।

কবে সেই শিশু সজলের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল এই অচেনা পুরুষ তা বুঝতে পারেনি তৃষা। বুঝতে পারলে আগে থেকে সাবধান হত, লাগাম টেনে ধরত। কিন্তু এখন আর সময় নেই, বড্ড বেশি দেরি হয়ে গেছে। বুদ্ধিমতী তৃষা জানে, এখন রাশ ধরতে গেলে যে বিস্ফোরণ ঘটবে তা সামলানোর ক্ষমতা তার নেই। এই সংসারে নিশ্চিতভাবে তার আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে এল।

সজল তার নিজস্ব কুংফু ক্লাব তৈরি করেছে। তার দলটি বিশাল। দাপট সাংঘাতিক। একদিন সজল এসে বলে, মা, স্কুলবাড়ির জমিটা পড়ে আছে, ওটা ক্লাবকে দেবে?

তৃষা কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে বলে, ক্লাবের জন্য জমির কী দরকার?

আমরা ক্লাবের নিজস্ব বাড়ি করব।

না, ওসব হবে না। স্কুলবাড়ির একটা ঘরে এমনিতে ক্লাব খোলো, নিজস্ব জমি-টমির দরকার নেই।

সজল কাকুতি-মিনতি করল না। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সামনে। ততক্ষণ তৃষা তার মুখের দিকে চাইতে সাহস পেল না।

নিজের সঙ্গে আজকাল এরকম লড়াই করছে তৃষা। অহর্নিশ। ভয় কাকে বলে সে এতকাল জানত না। এই পরিণত বয়সে সে নতুন ভয় পাওয়া শিখছে। তার এই অসময়ে এক দুপুরে এসে হাজির হল দীপনাথ। মুখে চওড়া অপরাধী হাসি, হাতে একটা শাড়ির প্যাকেট।

তোমার সঙ্গে কথা বলব না দীপু।

রাগ করেছ জানি। কিন্তু আমার অনেক কাজ ছিল।

ভাইঝির বিয়েটা কি কাজ নয়?

তোমারই তো দোষ। কেন এলাহাবাদে বিয়ে দিলে? এখানে দিলে আমরা সবাই থাকতে পারতাম।

উপায় ছিল না। চিত্রার মাসিই তো ওকে মানুষ করেছে। তার বড় ইচ্ছে, ওইখানেই বিয়ে হোক।

যাক হয়ে যে গেছে এই বেশ।

কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল, তুমি ওকে সম্প্রদান করো।

কে করল?

তোমার মেজদা। কিন্তু বাপকে নাকি সম্প্রদান করতে নেই।

ওসব কুসংস্কার ছাড়ো তো। এখন দেখো এই শাড়িটা চিত্রাকে মানাবে কি না।

শাড়ি দেখে অবাক তৃষা বলে, এটার তো অনেক দাম! এ যে খাঁটি কাতান বেনারসি, পাটা জরির কাজ! এক কাঁড়ি দাম নিয়েছে নিশ্চয়ই!

আর এইটে।—বলে দীপনাথ তার ফোলিও ব্যাগ থেকে একটা গয়নার বাক্স বের করে। তাতে অন্তত আড়াই ভরির একটা মটরদানা হার।

কী পাকা যে হয়েছ দীপু!—তৃষা হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ গয়নার বাক্স, শাড়ির প্যাকেট সব সরিয়ে রেখে আকুল গলায় বলে, শোনো দীপু, তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ জরুরি দরকার।

ভাত-টাত খাওয়াবে তো! না কি আগেই প্যান্ডোরার বাক্স খুলে বসবে?

খাওয়াব গো, অত ভেবো না। কিন্তু তোমার কথাই যে আমি সারাক্ষণ ভাবি। আমার যে আর কেউ নেই!

দীপনাথ একটু ম্লান হয়ে বলে, সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি, কখন শুনি পরকালের ডাক?

ছিঃ দীপু! পরকালের ডাক আমিই শুনছি। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না।

দীপনাথ একটু অবাক হয়। বউদিকে এরকম চঞ্চল, বিভ্রান্ত সে কোনওকালে দেখেনি।

॥ আটষট্টি ॥

তৃষা যখন তার জন্য চা করতে গেল তখন দীপনাথ সারা বাড়ি ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়ল।

তার মন ভাল নেই। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। হাঁফ ধরে যায়। জীবন থেকে কী একটা হারিয়ে গেল হঠাৎ। মনের মধ্যে একটা আলো জ্বলত এতদিন। সেটা নিভিয়ে কে যেন একটা ঘুম-আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। একটা লাবণ্য ছিল, একটা উগ্র আগ্রহ ছিল দিন যাপনের, বেঁচে থাকার। সেসব আর মনেই হয় না। সকাল থেকে কেবল গড়িমসি ভাব। দিন গড়িয়ে গড়িয়ে কাটে।

বোস সাহেবকে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়েছে। মাইল্ড স্ট্রোক। বিপদ তেমন কিছু নয়। তবু ডাক্তাররা সাবধান হচ্ছেন। ডাক্তার সেনগুপ্ত বলেছেন, মাইল্ড স্ট্রোকের পরের স্টেজেই মেজর স্ট্রোক হতে পারে।

মহুয়াকে আগে কখনও দেখেনি দীপনাথ। কাল নার্সিংহোমে দেখল। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। খুব সেজে এসেছিল বলেই কি না কে জানে, দারুণ সুন্দরী দেখাচ্ছিল। মহুয়া বোস সাহেবের কীরকম বোন তা জানে না দীপনাথ। রঞ্জন অতটা ভেঙে বলোনি। শুধু বলেছে, মহুয়াদির সঙ্গে অনেকদিনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ফ্যামিলির ব্যাপার বলে আমরা বাইরে এ নিয়ে আলোচনা করি না।

গম্ভীরভাবে দীপনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, মহুয়া কেমন মেয়ে?

খারাপ বলে কিছু শুনিনি কখনও। কিন্তু এ ব্যাপারটা ডেভেলপ করার পর সবই অন্যরকম হয়ে গেছে। মহুয়াদিকে কি আর ভাল বলা যায়!

দু'জনের মধ্যে কার ইনিশিয়েটিভ বেশি, জানো?

রঞ্জন মাথা নেড়েছে, যা ঘটবার তা ঘটেছে আমাদের অজ্ঞাতে।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, আমি এই ভেবে অবাক হচ্ছি, এতদিনের ব্যাপার, তবু আমি জানতে পারিনি কেন!

রঞ্জন হেসে ফেলে বলেছে, দীপুদা, এটা আপনার জানার কথাই নয়। মহুয়াদি আমার সেজো পিসির মেয়ে, ওদের বাড়িতে আমাদের ভীষণ যাতায়াত; তবু আমরাই ভাল করে জানি না। ভাসা ভাসা শুনেছি মাত্র।

মহুয়ার ঠিকানাটা আমাকে দেবে?

কেন? সেখানে যাবেন? গিয়ে লাভ নেই। মহুয়াদি ভীষণ রিজার্ভ মেয়ে। একটি কথাও বের করতে পারবেন না।

কাল নার্সিংহোমেও খুব রিজার্ভ দেখাচ্ছিল বটে মহুয়াকে। বেশি হাসে না, কথা বলে না। এম এসসি পাস করে পোকা-মাকড়ের ওপর শক্ত ধরনের রিসার্চ করছে বলে শুনেছে দীপনাথ। মুখে-চোখে পড়ুয়া ছাপটা আছে। বেশ লম্বা, ফর্সা, অভিজাত চেহারা। মুখখানা অসম্ভব মিষ্টি দেখতে। এই মেয়ে বোস সাহেবের প্রেমে কেন পড়বে তা বুঝতে পারছিল না দীপনাথ। রহস্যটা ভাঙতেই হবে।

মণিদীপা নার্সিংহোমে আসে সকালের দিকে। বিকেলে কখনওই নয়। বোধহয় বিকেলে দীপনাথ যায় বলেই। কিন্তু বিকেলে বোস সাহেবের বাড়ির লোক, আত্মীয়কুটুমরা আসে, আসে মণিদীপার বাড়ি থেকেও কখনও কেউ। বেশ ভিড় হয়ে যায় ঘরের মধ্যে। কালও ছিল এরকম ভিড়ের দিন।

বোস সাহেবকে কয়েকটা কুশল প্রশ্ন করে এবং মহুয়াকে খুব ভাল করে দেখে করিডোরে এসে অপেক্ষা করছিল দীপনাথ। মহুয়ার জন্য।

পৃথিবীর সব সমস্যারই সমাধান সে করতে পারবে, এমন কথা সে নিজেও ভাবে না। কিন্তু দীপনাথের এ যাবৎকালের জীবন কেবল কতগুলি প্রয়াস এবং চেষ্টার সমষ্টি। চেষ্টা করতে দোষ কী?

সবাই চলে যাওয়ার পরও আধ ঘণ্টা বেশি থেকেছিল মহুয়া। যখন বেরিয়ে এল তখন খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাকে। চোখ নিচুর দিকে, বটুয়াটা বুকের কাছে চেপে ধরা।

সিঁড়ির কাছ বরাবর দীপনাথ তার সঙ্গ ধরে বলল, আপনিই কি মহুয়া? নমস্কার। আমার নাম দীপনাথ চ্যাটার্জি। আমি বোস সাহেবের—

মহুয়া একটু থতমত খেয়ে অবাক হয়ে তাকায়। তারপর বলে, জানি। ওর কাছে শুনেছি।

কোনদিকে যাবেন?

মহুয়া একটু হাসল। বলল, আমাকে এগিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

মরিয়া দীপনাথ বলে, কিন্তু আপনার সঙ্গে যে আমার একটু জরুরি দরকার!

মহুয়া বোধহয় দরকারটা জানে। বোস সাহেবের কাছেই শুনে থাকবে। সংক্ষেপে বলল, আসুন। বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

নার্সিংহোমের গায়েই মিন্টো পার্ক। মাঝখানে পরিষ্কার চৌকো জলাশয়। মহুয়া বিনা ভূমিকায় পার্কে ঢুকল এবং প্রায় একবারও দীপনাথের দিকে না তাকিয়ে বলল, এইখানে কথা বলা যায়।

হ্যাঁ।—বলে দীপনাথ বসবার জায়গা খুঁজছিল।

মহুয়া ঘাসের ওপর বসে বলল, বলুন।

দূরত্ব রেখে দীপনাথ বসে এবং কোনওরকম দ্বিধা সংকোচ এসে বাধা দেওয়ার আগেই বলে, আপনি ভুল করছেন।

মহুয়া ন্যাকামি করল না, বিস্ময়ের ভান করল না, কিংবা জানতেও চাইল না কোন কাজটার কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। একটু চুপ করে থেকে মৃদু স্বরে বলল, আপনি খুব উদ্যোগী পুরুষ শুনেছি।

দীপনাথের স্বভাবে একটা ঠাট্টা-রসিকতার পুরনো রোগ আছে। সে জিজ্ঞেস করল, অধ্যবসায় আর উদ্যোগ শব্দের অর্থ কি এক?

না। একটু আলাদা।

তা হলে আমি উদ্যোগী নই। তবে অধ্যবসায়ী।

মহুয়া এ কথাটা বাঁকাভাবে ধরল না। খুবই সিরিয়াস গলায় বলল, আমাকে আপনার কথা বলুন।

কেন বলুন তো! আমার কথা জেনে কী হবে?

আমি ধৈর্যশীল অধ্যবসায়ী লোকদের কথা পছন্দ করি।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আমার জীবনে তো তেমন কোনও কিছু ঘটেনি!

ও আপনাকে খুব পছন্দ করে।

বোস সাহেব?— বলে দীপনাথ একটু হেসে বলে, আগে হয়তো বা করতেন। এখন করেন না।

আপনি কি রিজাইন করতে চেয়েছিলেন?

চেয়েছিলাম। বোস সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে না পড়লে হয়তো এর মধ্যেই কাজ ছেড়ে দিতাম। কিন্তু উনি নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ায় আমাকেই সব সামলাতে হচ্ছে।

জানি। সব শুনেছি। এও শুনেছি, ওর অসুখ সম্পর্কে আপনিই ওকে অনেকদিন আগে ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন!

আমার মনে হয়, ওঁর এই অসুখটা অনেকদিন ধরে পাকাচ্ছিল।

মহুয়া মৃদু স্বরে বলল, এসব অসুখ অনেকদিন ধরেই তৈরি হয়। কিন্তু আমরা যারা ওকে ভালবাসি বলে ক্লেম করি তারা কেউই এটা লক্ষ করিনি। আপনি করেছেন।

দীপনাথ একটু লজ্জা পেয়ে বলে, সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমার ওয়ার্নিং উনি পাত্তা দেননি।

পাত্তা দেয়নি নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণার ফলে। ও মনে করে ও খুব ফিট, খুব এফিসিয়েন্ট।

আমি কিন্তু বোস সাহেবের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে চাইছি না।

মহুয়া এ কথাতেও রাগল না। বলল, আপনাকে বলতে হবে না। আপনি কী জানতে চান তা আমি জানি।

দীপনাথ চুপ করে ছিল। মহুয়া উদাসভাবে কিছুক্ষণ জলের দিকে চেয়ে থেকে বলে, ভুল করছি তাও জানি। কিন্তু তবু তো এরকম কিছু ঘটে যায়। যাকে ঠেকানো যায় না!

ভুল কথাটা খুব নরম। এ ক্ষেত্রে শব্দটা হওয়া উচিত অন্যায়। আপনি তাও কি জানেন?

জানি। কিন্তু আমার দিক থেকেও কিছু বলার আছে।

বলুন। আমি শুনতেই চাইছি।

কিছু করতেও চাইছেন। ঠিক তো?

সম্ভব হলে।

মহুয়া মৃদু হেসে বলল, আমিও আপনাকে হেলপ করতে চাই। কিন্তু পারব কি না জানি না।

আপনার কথাটা বলুন।

আমার কথা হল, ও খুব হেলপলেস। দীপা বউদি ওকে কম্প্যানিয়নশিপ দিতে পারেনি। ওর দিক থেকেও একইরকম। যদি ওরা পারত তবে আমি সরেই দাঁড়াতাম।

আপনি সরে দাঁড়ালে কি পারবে?

বোধহয় না। আমি সরেই ছিলাম। বুধোদার সঙ্গে বহুকাল আমার কোনও সম্পর্কই ছিল না। অতীতে যে সফটনেস ছিল সেটা আমি জোর করে মন থেকে সরিয়ে রাখতাম। খুব কাজ করতাম। তারপর একদিন, খুব রিসেন্টলি. বুধোদা আমার কাছে গিয়ে বলল, জীবনের আর মোটে ক'টা দিন আমার অবশিষ্ট আছে। এ ক'টা দিন আমাকে একটু শান্তি দাও। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

সঙ্গে সঙ্গেই কি আপনি প্রস্তাবটা মেনে নিলেন?

না। বুধোদার কাছে সব আগে শুনলাম। অনেক ভেবে, বিশ্লেষণ করে বুঝলাম, বুধোদা হয়তো ঠিক কথাই বলেছে। একটা কথা বলে রাখি, ও কিন্তু দীপাবউদির কোনও নিন্দে করেনি আমার কাছে। বউদি কেমন তা আমরাও জানি।

কেমন বলুন তো!

একটু হেডস্ট্রং। একটু বেপরোয়া। খুব অহংকারী। বুধোদার দরকার ছিল ধীর স্থির বিবেচক একটি মেয়ে।

দীপনাথ সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে, কিন্তু বোস সাহেবই যে কিছুদিন আগে মিসেস বোসকে ডিভোর্স দিতে রাজি ছিলেন না!

মহুয়া শান্ত গলায় বলে, এখনও ঠিক রাজি নয়। ডিভোর্স মানেই পাবলিসিটি। ও তা পছন্দ করে না। তাই চায়নি। আর তাতেই প্রমাণ হয়, বুধোদার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

দীপনাথ গুম হয়ে থেকে কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোনও ফাইনাল ডিসিশন নিয়েছেন?

ওর অসুখ না হলে নিতাম। অসুখের জন্যই এখনও নিইনি।

ডিসিশনটা কি পজিটিভই হবে?

মহুয়া হেসে ফেলে বলে, আমি সিরিয়াসলিই আপনাকে হেলপ করতে চাই। বিশ্বাস করুন।

কথাটার মধ্যে কোনও বিদ্রুপ বা প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ ছিল না। মহুয়া যে ভাল জাতের মেয়ে তাতে কোনও সন্দেহ করেনি দীপনাথ। সে শুকনো মুখে বলল, আপনি যদি চেষ্টা করেন তবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মহুয়া ম্লান হেসে বলে, আমি তো এ ব্যাপারে একটি পার্টি। আমার চেষ্টায় আন্তরিকতা থাকবে না। বরং আপনার মাথায় যদি কোনও সাজেশন আসে তবে আমাকে বলবেন।

আপনি যদি বিয়ে করেন?

মহুয়া এ কথায় চটে উঠল না। তবে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, ও প্রসঙ্গটা থাক। মানুষ তো পুতুল নয়।

দীপনাথ লজ্জিত হয়ে বলল, মাপ করবেন, আমার বুদ্ধিসুদ্ধি একটু গুলিয়ে যাচ্ছে।

মহুয়া উঠল। বলল, আজ আসি।

সেই থেকে দীপনাথ আনমনা, বিমর্ষ। একা একা মেসবাড়িতে ফেরার সময় তার মনের মধ্যে নানা আবেগ, রাগ, হতাশা খেলা করে গেল। কিছু করার নেই তার? কিছু করা যাবে না?

ঘুরতে ঘুরতে দীপনাথ বাবার ঘরে এসে দাঁড়ায়। দরজাটা খোলা। বাবা অবশ্য এখানে নেই, সোমনাথের কাছে আছে। ফাঁকা ঘরটার দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকে সে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ায়।

বউদি!

তৃষা চা ছাঁকতে ছাঁকতে ফিরে চেয়ে বলল, কিছু বলছ?

বলছি, হারটা বাবার নাম করে চিত্রাকে আশীর্বাদি দিয়ো।

তোমার নামে নয়?

না, বাবার নাম করেই দিয়ো। বাবা হয়তো তেমন কিছু দিতে পারবে না। চিত্রার শ্বশুরবাড়িতে এ নিয়ে কথা হতে পারে।

তৃষা মুখ টিপে একটু হাসল। বলল, সংসারী বুদ্ধি তো দিব্যি টনটনে, বিয়ে না করলে কী হবে!

দীপনাথ একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, বিয়ে তো আর তোমরা দিলে না!

বিয়ে দিতে কি ইচ্ছে করে বলো! এমন ভাল দেওরটিকে কোন টগবগে মেয়ে এসে দখল করে নেবে, দেওর আর ফিরেও চাইবে না আমাদের দিকে। এখনই চায় না, বিয়ে হলে তো আরও।

মনে থাকবে তো বউদি? বাবার নাম করে দিয়ো।

থাকবে গো, থাকবে। তোমার মতো বুদ্ধি বিবেচনা বাপু আমারও নেই। কথাটা আমার মাথাতেও খেলেনি।

দীপনাথ ম্লান হেসে বলে, বাবাও যে সংসারের একজন এবং খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একজন সে কথা মনে না রাখাটা আমাদের পক্ষে গৌরবের নয় বউদি। ইন ফ্যাক্ট, আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি তো পরের মেয়ে।

এইখানে চা খাবে, না ঘরে?

এই তো বেশ। দাও উঠোনে দাঁড়িয়ে খাই।

বৃন্দাকে মোড়া পেতে দিতে বলি। দাঁড়াও।

বৃন্দা মোড়া দিয়ে যায়। দীপনাথ আর তৃষা চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসে।

দীপু!

বলো।

তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন বলো তো আজ?

মন ভাল নেই বউদি।

কেন?

সব কি বলা যায়?

আমাকে যায়। আমি তোমার পুরনো বন্ধু।

দীপনাথ একটু হেসে বলে, তোমাদের সংসার-টংসার অনেক দেখলাম বউদি। কিছু ভাল লাগে না, একদিন পাহাড়ে চলে যাব দেখো।

আবার পাহাড়? ওটা যে তোমার মাথায় একটা কী ঢুকেছে!

দীপনাথ চায়ে চুমুক দিতে দিতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। সেটা লক্ষ করে তৃষা আজ খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে দীপু?

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সংসারে কারও সঙ্গেই খুব একটা মাখামাখি করতে নেই বউদি, তা হলে দুঃখ পেতে হয়। যত জড়াবে তত অশান্তি। এই অশান্তির ভয়েই কত লোক সাধুসন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে যায়।

তুমিও কি সাধু হওয়ার কথা ভাবছ?

প্রবল একটা শ্বাস ফেলে দীপনাথ মাথা নাড়ে, না বউদি, সাধু হওয়ার মতো পজিটিভ মেটেরিয়াল আমার ভিতরে নেই। তবে একটা কিছু করব। আর ভাল লাগছে না।

দীপু, জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হয়। ব্যাপারটা কি হৃদয়ঘটিত?

আরে দূর! তা নয়। অন্তত আমার হৃদয়ের ব্যাপার নয়।

তবে কার হৃদয়?

দীপনাথ মৃদু একটু হাসল, পেটের কথা বার করতে চাও?

মুখে হতাশার ভাব দেখিয়ে তৃষা বলে, আমার কি সে সাধ্যি আছে?

দীপনাথ হাসিমাখা মুখেই চেয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, বরং তোমার কথা বলো। তোমাকে আগের মতো দেবী চৌধুরানি মার্কা লাগছে না কেন বলো তো? ব্রজেশ্বর কি তোমার ওপর ডাকাতি করেছে? হৃদয় ছিনতাই?

ভ্রু কুঁচকে তৃষা বলল, খুব রকবাজদের ভাষা শিখেছ তো! তোমার ব্রজেশ্বরের বয়েই গেছে আমার হৃদয় নিয়ে টানাটানি করতে।

তা হলে সেই দেবী চৌধুরানির মুখ-চোখ হাবভাব এমন প্রফুল্লময়ীর মতো হয়ে গেল কেন?

চেহারায় লাবণ্য এসেছে বলছ?

লাবণ্য তোমার বরাবর ছিল। ইয়ারকি কোরো না। কী বলবে বলছিলে যে!

তৃষা সত্যিই হয়তো আর আগের মতো নেই। নইলে তার হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস আসবে কেন? খানিকক্ষণ সে মুখ নিচু করে বসে রইল। তারপর বলল, দীপু, সংসার আর আমাকেও টানে না।

তোমার দাদাকে বলেছি, কাশীতে বাড়ি করে দু'জনে গিয়ে থাকব।

দু'জনে?—বলে হাঁ করে থাকে দীপনাথ। বলে, এক বাড়িতে দু'জনে থাকবে? তা হলে যে দু'দিন বাদে বাড়ি থেকে দুটো লাশ পাওয়া যাবে। দু'জনেই দু'জনকে খুন করে ফেলেছে।

আমরা দু'জনে কি দু'জনের অতটাই শত্রু দীপু?

দীপনাথ হাসতে হাসতে দুলতে থাকে, তা একটু আছ তোমরা।

একটু যে আছি তা অস্বীকার করছি না তো! তা বলে খুন করার মতো?

আরে না, না! ঠাট্টা করলেও দেখছি বিপদ!

তোমার দাদাও ওরকম কথা বলে প্রায়ই। তার খাবারে নাকি বিষ মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্লো পয়জন।

শ্রীনাথ চাটুজ্জে একটু বায়ুগ্রস্ত, জানোই তো! রাগ করো কেন?

আজকাল রাগ হয় না। সজলও বাবার কথা বিশ্বাস করে।

সজল! সজল কি তার বাপের ভক্ত হয়েছে নাকি আজকাল?

ভীষণ! বাপের জন্য সব পারে। দরকার হলে পরশুরামের মতো মাকে মেরে ফেলতেও, শুধু বাপ যদি হুকুম করে।

আচ্ছা!—বলে দীপনাথ খুব অবাক হয়ে ব্যাপারটা ভাবতে থাকে। যত ভাবে ততই অবিশ্বাস্য মনে হয়।

সজলের হাতেই একদিন আমি খুন হয়ে যাব, দেখো।

দীপনাথ কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বলে, সজল তোমাকে মারবে! কী যে বলো তুমি বউদি! তোমার মাথাটাই গেছে।

তৃষা হাসে না। বিষণ্ণ আর্তি মাখানো মুখে দীপনাথের দিকে চেয়ে বলে, আমার অবস্থায় না পড়লে কেউ আমার সমস্যা বুঝবে না জানি। কিন্তু আমার ভরসা ছিল, আর কেউ না বুঝুক, তুমি বুঝবে।

একটু অসহিষ্ণু গলায় দীপনাথ বলে, সেই যে কারা রাতে তোমাকে বোমা মেরে গেছে, সেই থেকে তুমি সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করেছ। আমি বলি, তুমি আরও কিছুদিন সংসার থেকে ছুটি নাও, দূরে কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে এসো। তোমার ভীষণ স্ট্রেন যাচ্ছে।

নিবু নিবু গলায় তৃষা বলে, যেখানেই যাই, কপাল আর কর্মফল তো সঙ্গেই যাবে।

দীপনাথ একটু হাসল, তোমার কপাল কি এতই খারাপ বউদি? বেশ তো আছ! জমজমাট তোমার সংসার। মেয়ের বিয়ে দিয়ে শাশুড়িও বনে গেছ।

তৃষা মৃদু স্বরে বলে, সংসারে কোথায় যে দাঁড়াব এখন সেই জায়গাটাই খুঁজে পাচ্ছি না যে। আজকাল কেন যে কেবলই মনে হয়, এসব আমার নয়, এরা আমার নয়, এখানে আমার কোনও জায়গা নেই। একদিন যদি মেরে না-ও ফেলে, তবুও ঘাড় ধরে বের করে দেবে। এরা কেউ কেন আমাকে দেখতে পারে না বলো তো? আমি কী করেছি?

কারা দেখতে পারে না?

তোমার মেজদা, স্বপ্না, মঞ্জু, সজল, কেউ না।

অভিমান নয়, তৃষার গলায় একটা সত্যিকারের আতঙ্ক স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে দীপনাথের কাছে। সে টক করে কিছু বলল না। একটু ভাবল। তারপর একটু লঘু স্বরে বলল, তোমার দাপট কি একটু কমে আসছে বউদি?

তৃষা মাথা নাড়ল। বলল, কমেনি দীপু। কমলে আজ এত ভাবনায় পড়তাম না। আসলে আজকাল আমাকে ওরা কেউ ততটা সমীহ করে না, ভয় পায় না। বিশেষ করে সজল। ওর সঙ্গে কথা বলতে আজকাল আমারই ভয়-ভয় করে। কী কথার কী জবাব দেবে তার ঠিক নেই।

দীপনাথ সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল, সজল কোথায়?

হিংস্র বন্য বিদ্বেষে ভরা দু'টি চোখ একটু আড়াল থেকে লক্ষ রাখছিল তৃষাকে। দীপনাথের শূন্য ঘরের দাওয়ার কাছ ঘেঁষে মস্ত এক নারকেল গাছ। তারই পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সজল। সে দূর থেকেই টের পাচ্ছিল, তার মা বড়কাকার কাছে চুকলি কাটছে। কীসের চুকলি তা সে জানে না। কিন্তু মায়ের যে সবসময়েই কিছু গোপন করার আছে তা সে জানে। মা বড়কাকাকে কী বলছে তা জানার জন্য সজল ছটফট করছিল। বলতে কী, বড়কাকাকে তার ভীষণ ভাল লাগে। মা যদি তার সম্পর্কে বড়কাকাকে আজেবাজে কথা বলে বিষিয়ে দেয় তবে সে মাকে ছেড়ে দেবে না। বড়কাকার কাছে মা'র সম্পর্কে সব বলে দেবে। যা জানে সব।

সজল নিজেও টের পায়, তার শরীরে রাগ বড় বেশি। এত রাগ যে, সারা গায়ে বিষ-বিছুটির জ্বালা ধরে যায় মাঝে মাঝে। আর তার বেশির ভাগ রাগই মায়ের ওপর। বাবার খাবারে মা বিষ মেশায় কি না তা সে সঠিক জানে না। কিন্তু বাবাকে রামলাখনের আড্ডায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মা যে রঘু স্যাকরাকে লাগিয়ে দিয়েছিল তা সে জানে। লোকমুখে ছেলেবেলাতেই সে শুনেছে, জ্যাঠামশাইয়ের এইসব বিষয়-সম্পত্তি মা খুব সৎভাবে পায়নি। ছোট কাকাকে মা যে গুন্ডা লাগিয়ে মার দিয়েছিল এও তার অজানা নয়। সবচেয়ে বড় হয়ে যে প্রশ্নটা তার মনে দেখা দেয় মাঝে মাঝে, তা হল, তার বাবা কে?

বড় হয়ে একদিন সে মাকে এই প্রশ্নটা করবে।

সজল দেখে, মা উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। বড়কাকা একটু ভ্রূ কুঁচকে বসে বসে কী যেন ভাবছে। মুখটা গম্ভীর। তারপর বড়কাকা দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে বারবাড়ির দিকে।

সজল গাছের আড়াল ছেড়ে ক্ষেতের মধ্যে নেমে দৌড়োতে থাকে। ঘুরপথে গিয়ে মুখোমুখি হবে।

খুব তাড়াতাড়িই চলে সজল। বড়কাকা সদ্য ভাবন-ঘরের কাছ বরাবর পৌঁছেছে।

তাকে দেখে খুব ক্ষীণ একটু হাসল বড়কাকা।

সজল ভাল মানুষের মতো জিজ্ঞেস করে, কখন এলে?

অনেকক্ষণ। তুই কোথায় ছিলি?

এইখানেই।

দীপনাথ হাত বাড়িয়ে তার কাঁধটা ধরে। বলে, কত লম্বা হয়েছিস!

এই কাঁধে একটু হাত রাখা আর কত লম্বা হয়েছিস প্রশ্নটুকুর মধ্যে এক অথৈ সমুদ্রের গভীরতা। সজল এইটুকু এ বয়সে বুঝতে পারে, কোনটা স্নেহ, কোনটা স্নেহ নয়। দীপনাথের হাতের স্পর্শটুকু আর গলার নরম কোমল লাবণ্য অনেকক্ষণ তার শরীর আর শ্রবণে কাজ করবে। সজল মুখ টিপে হেসে বলে, এখনও তোমার সমান হইনি।

দীপনাথ মুগ্ধ চোখে হাড়সার প্রাণবান চেহারার সজলকে দেখছিল। দেখে তার চোখ আর মন ভরে গেল। চোখে বুদ্ধির ঝিলিমিলি খেলা করছে, বেড়ে ওঠা শরীরে এখনও শিশুর লাবণ্য ও মুখশ্রীতে পৌরুষ সত্ত্বেও এক বিস্ময় মাখানো সরলতা দেখে ভারী খুশি হল। এই তাদের বংশধর, এখনও পর্যন্ত একমাত্র বংশধর। কাঁধে সস্নেহে হাতের ভর রেখে দীপনাথ বলে, আয় ওই বারান্দায় বসি।

ভাবন-ঘরের বারান্দায় পাশাপাশি বসে দীপনাথ বলে, খুব ইচ্ছে ছিল কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট

ভাড়া করে তোকে নিয়ে যাব। ভাল স্কুলে পড়াব। কিন্তু সে আর হল না।

কেন কাকা?

দীপনাথ একটা মস্ত শ্বাস ছেড়ে বলে, অনেক অসুবিধে রে। আমাকে মাঝে মাঝে লম্বা ট্যুরে যেতে হয়। রান্নাবান্নার লোক, কাজের লোকও বড় পাওয়া যায় না। তার চেয়ে ভাবছি তোকে নরেন্দ্রপুরে ভর্তি করে দিলে কেমন হয়।

সেখানে জিমনাসিয়াম আছে?

থাকারই কথা। তুই কি ব্যায়াম করতে ভালবাসিস?

সজল মুখ বিকৃত করে বলে, না। শরীর সাজাতে আমার ভাল লাগে না।

তবে?

আমি মার্শাল আর্টটা শিখতে চাই। আর বক্সিং।

সেসব ওখানে বোধহয় নেই। দেখব খোঁজ করে। ওসব শিখতে চাস কেন? সেলফ-ডিফেন্স, না গুন্ডামি করবি?

সজল হাসল, যারা অন্যায় করে আমি তাদের শিক্ষা দিতে চাই।

করুণ একটু হাসি ফোটে দীপনাথের মুখে। খুব ধীরে ধীরে সে বলে, সব অন্যায় কি শুধু গায়ের জোরে ঠেকানো যায়? আগে নিজে ন্যায়বান হতে হয়, সাহসী হতে হয়, মানুষকে ভালবাসতে হয়। মানুষ কোথা থেকে জোর পায় জানিস? ভালবাসা থেকে। মা-বাবাকে যদি ভালবাসিস, দিদিদের যদি ভালবাসিস, সবাইকে যদি ভালবাসিস তা হলে দেখবি গায়ের জোরের তত দরকার হয় না।

তোমার গায়ে কি খুব জোর বড়কাকা?

আমার গায়ে?— দীপনাথ প্রথমে অবাক হয়, পরে হাসে। বলে, দূর বোকা! আমি কি ব্যায়ামবীর, না বক্সার? আমার কোনও জোরই নেই। তবে তুই জোরওয়ালা মানুষ হলে আমাদের আর দুঃখ থাকবে না। তবে সেটা শুধু গায়ের জোর নয় কিন্তু।

গায়ের জোর কি খারাপ?

তা নয়। তবে বেশি গায়ের জোরের কথা মনে রাখলে মনটা শরীরমুখী হয়ে যায়। তখন আর মাথায় সূক্ষ্ম চিন্তা আসতে চায় না।

সজল মাথা নিচু করে চটির ডগা দিয়ে একটা কাঁকরকে মেঝেতে ঘষছিল। হঠাৎ বলল, তুমি আমাকে খারাপ ভাবো না তো বড়কাকা?

দীপনাথ অবাক হয়ে বলে, তোকে খারাপ ভাবব কেন?

কেউ যদি তোমার কাছে কিছু লাগায় তা হলে তো ভাববে!

তোর নামে আবার কী লাগাবে?

লাগাতে পারে।— বলে সজল একটু হাসল, কিন্তু তুমি বিশ্বাস কোরো না। বরং বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি খারাপ কি না।

দীপনাথ সস্নেহে হাসে। বলে, তোকে কেউ খারাপ ভাবে না।

সজল একটু ভ্রু কুঁচকে কী ভাবে। তারপর বলে, আমি বোর্ডিং-এ যাব না।

কেন রে? বোর্ডিং-এ কত মজা জানিস?

জানি। আমার যেতে ইচ্ছেও করে। কিন্তু আমি চলে গেলে বাবাকে দেখবে কে?

কেন, তোর বাবাকে দেখার লোকের অভাব আছে নাকি?

বাবা আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

দীপনাথ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সজল কি মেজদার ছেলে? না বড়দার? লোকে নানা কথা বলে। সেসব কি সত্যি? তবু শ্রীনাথের প্রতি সজলের এই প্রগাঢ় টান বড় ভাল লাগল দীপনাথের। শ্রীনাথের ছেলে যদি না-ও হয়ে থাকে সজল, তা হলেও এই বংশেরই ছেলে। দীপনাথ আর-একবার

মায়াভরে সজলের লম্বা চিকন চুলে ভরা মাথাটা একটু নেড়ে দেয়। বলে, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে থাকলে শুধু বাবাকে নিয়ে থাকলেই তো হবে না, মা তো ভেসে আসেনি। মাকে দেখবে কে?

বাঃ, মা'র তো বাবার মতো অবস্থা নয়। মাকে দেখার কী আছে?

সজলের চোখে হঠাৎ যে ঝলকানি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল তা বেশ লক্ষ করল দীপনাথ। ঘৃণা, বিদ্বেষ, আক্রোশ সব দগদগ করছে ভিতরে। কিন্তু ওইটুকু বাচ্চা ছেলের মন এত বিষিয়ে গেল কী করে তা ভেবে পেল না দীপনাথ। আবার সজলের জন্ম-রহস্য নিয়ে প্রশ্ন উঁকি দেয় মনের মধ্যে। বড়দা মল্লিনাথের ছিল বুনো শুয়োরের মতো গোঁ, খ্যাপা রাগ, ভয়ংকর সাহস। যার ওপর রেগে যেত তাকে পারলে খুন করে। সজলের চেহারায় এবং স্বভাবে নির্ভুল সেই বড়দার ছাপ।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল। মন ভাল নেই। কোথাও বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না।

সন্ধেবেলা বউদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে ফেরার ট্রেন ধরল। তৃষা অনেকবার তাকে আটকাতে চাইল, কিন্তু দীপনাথ থাকতে রাজি হল না। অনেক ভাঙচুরের টুকরো চারিদিকে ছড়ানো। জোড়া লাগানোর এক বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে সে। তবু চেষ্টাই তো জীবন!

হাওড়া থেকে সে সোজা চলে এল নার্সিংহোমে।

বোস সাহেব অনেকটা ভাল। ঘরে ভিজিটর কেউ নেই। একা বোস সাহেব আধশোয়া হয়ে একটা থ্রিলার পড়ার চেষ্টা করছে।

আজকাল দেখা হলে বোস আর তেমন খুশি হয় না। কেবল শূন্যগর্ভ এক দৃষ্টিতে দীপনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওই ভ্যাবলা দৃষ্টির অর্থ বোঝে না দীপনাথ। কিন্তু এটা টের পায়, বোসের ভিতরে খুব বড় রকমের একটা ভূমিক্ষয় ঘটে যাচ্ছে।

আজ কেমন আছেন?

তেমন কিছু খারাপ নয়। তবে এত ওষুধ খাওয়াচ্ছে যে, মুখটা বিস্বাদ।

এবার কিছুদিন কোথাও বেড়িয়ে আসুন।

কোথায় যাব?— হতাশার গলায় বোস বলে।

যে-কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায়।

বোস করুণ মুখ করে বিশাল জানালা দিয়ে বাইরে আদিগন্ত কলকাতার আলো-অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। গিয়ে লাভ নেই।

দীপনাথ কী বলবে, চুপ করে থাকে।

বোস সাহেব দূরের দিকে চেয়ে থেকেই বলে, আপনি আমার ভাল করতে চাইছেন. সে কথা শুনেছি। কিন্তু আমার কীসে ভাল হয় তা আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করাটা ঠিক নয়। তাতে ভাল না হয়ে খারাপও হতে পারে।

দীপনাথ আস্তে করে বলল, মণিদীপাকে আমি বিয়ে করলে যে ভাল হবে সেটাই বা আপনি তা হলে ধরে নিয়েছিলেন কেন?

বোস একটু হাসল। তবে কিছু বলল না বা দীপনাথের দিকে তাকালও না।

জুয়াড়ির মতো মুখ করে দীপনাথও চুপ করে বসে থাকে।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে বোস বলে, আপনারা দু'জনে হয়তো সুখী হতে পারতেন।

দীপনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যার ভালবাসা এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে শিফট করে তাকে আমি ভয় পাই বোস সাহেব।

বোস তেমনি দূরের দিকে চেয়ে বলে, দীপা আপনাকে সত্যিই ভালবাসে।

স্নিগ্ধদেবকেও বাসত।

ইউ আর বিয়িং ক্রুয়েল।

আই অ্যাম সামটাইমস্ ট্রুথফুল।

আপনাকে অ্যাভয়েড করতেই বোধহয় দীপা বিকেলের দিকে আসে না।

উনি কি রোজ আসেন?

বোস সাহেব একটা বড় শ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলে, তা আসে। মেকস মি টি, সার্ভস ব্রেকফাস্ট, সিগনিফাইং নাথিং।

দীপনাথ শেক্সপিয়রের ভাঙা উদ্ধৃতির অপব্যবহার শুনে একটু হাসল। বলল, আপনার কাজিনটি একসেপশনাল। কিন্তু তাকে বিয়ে করলেই যে আপনার সমস্যা মিটে যাবে এমন নয়। দেয়ার আর মোর দীপনাথস।

তার মানে?

আপনার যে বয়স এবং স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাতে অত্যন্ত যুবতী কোনও মেয়েকে তেমন কিছুই দেওয়ার নেই আপনার। কথাটা ভেবে দেখবেন।

বোস রাগল না। কিন্তু ঘাবড়ানো মুখে আবার ক্যাবলা চোখে তাকিয়ে রইল দীপনাথের দিকে।

নিঃশব্দে একজন কালো প্রায় কিশোরী নার্স ঘরে আসে। মৃদু ভদ্র স্বরে বলে, ভিজিটিং আওয়ার ইজ ওভাব। প্লিজ...

দীপনাথ ওঠে। দরজার কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে তাকায়। নার্স বড় বাতি নিভিয়ে দিয়েছে। সবুজ আলোর এক অপ্রাকৃত পরিমণ্ডলে বোস এখনও আধশোয়া। এই সবুজের মধ্যেও তার মুখের ফ্যাকাসে রং দেখা যাচ্ছে।

বোস অনুচ্চ স্বরে বলল, ইট ওয়াজ এ নক আউট।

দীপনাথ বেরিয়ে আসে।

পেল্লায় বড়লোকদের এই নার্সিংহোমের পিছল মেঝের ওপর দিয়ে লিফটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হয় সুখের এত উপকরণ সাজিয়েও মানুষকে সুখী করা যায় না তা হলে? অ্যাঁ!

অঞ্জু টেলিফোন করল সকালে. হ্যালো দীপা! তোমার জন্য একটা খবর আছে। ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপাশে একটা ঘর পাওয়া যাচ্ছে। নেবে? দু'লাখ সেলামি।

দু'লাখ!— বলে মণিদীপা ঢোঁক গেলে।

দু'লাখ চাইছে। বাট উই মে ট্রাই টু বারগেন। দেড় লাখের নীচে নামবে না ধরে রাখো।

তা হলে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট যে অনেক পড়বে!

এখন তো সব কিছুই কস্টলি। ইন্টিরিয়র ডেকোরেটররা এক-একটি কাটথ্রোট। তবে আমার চেনা শান্তিনিকেতনের একটি ছেলে আছে। সে অনেক কমে দোকান সাজিয়ে দেবে।

কম মানে কত?

হাজার কুড়ির মধ্যেই। তোমার তো বাপু কেবল শাড়ি বেচা নিয়ে কথা। আমাদের মতো ঝামেলার ব্যাপার তো নয়।

স্টক কিনতে কত লাগবে তোমার কোনও আইডিয়া আছে?

তুমি তো বাপু যোধপুরের বড়লোকদের ঘোল খাওয়াতে চাও। তা হলে কস্টলি শাড়ি বা এক্সক্লুসিভ চাই। দ্যাট উইল কস্ট ইউ মোর।

তবু শুনি।

আমার কোনও আইডিয়া নেই। রাফলি অ্যানাদার লাখ। সবশুদ্ধ আড়াই নিয়ে নেমে পড়ো।

আমি তোমার সঙ্গে শিগগিরই দেখা করব।

শিগগির নয়। কালই। কোনও স্পেস পড়ে থাকছে না। দেয়ার আর পিপল টু পে টু লাখস ফর দ্যাট শপ। ভাল কথা, তোমার হাজব্যান্ড কেমন?

ভাল।
কবে আনছ নার্সিংহোম থেকে?
দু'-এক দিনের মধ্যেই।
আজ ছাড়ছি। কাল সকালের দিকেই চলে এসো।
আচ্ছা।— বলে ফোন ছাড়ে মণিদীপা। তারপর সম্পূর্ণ বে-খেয়ালে সে একটা চেনা নম্বর ডায়াল করে।
হ্যালো!— বলেই জিভ কাটে মণিদীপা। মনে ছিল না, বিভ্রম। নইলে দীপনাথের সঙ্গে যে এখন তার টকিং টার্মসই নেই।
ওপাশ থেকে গম্ভীর গমগমে সেই কণ্ঠস্বর বলে ওঠে, হ্যালো। চ্যাটার্জি স্পিকিং, হ্যালো।
মণিদীপার গায়ে কাঁটা দেয়। বুক ঢিপঢিপ করে। সর্বোপরি গলা কেঁপে যায়।
একটু সময় নিয়ে সে বলে, হ্যালো!
দীপনাথ হঠাৎ বুঝি গলাটা চিনতে পারে। একটু হেসে বলে, কী হল? বলুন! আমি সেই দীন সেবক দীপনাথ।
বাজে বকবেন না।
কোনও প্রবলেম নাকি?
হুঁ। কিন্তু আপনাকে বলে লাভ কী?
এখনও কি মাথায় ব্যাবসা ঘুরে বেড়াচ্ছে?
বেড়াচ্ছে।
কী করতে হবে আমাকে? টাকার জোগাড়?
পারবেন?
কত?
ওঃ সে অনেক। থাক, বলব না।

॥ সত্তর ॥

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বিকেলে। অফিসের পর দীপনাথ সোজা চলে আসে নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে। আজ বোস সাহেব নেই। মণিদীপা একা রয়েছে। দীপনাথের আজ বুক কাঁপল না।
দরজা হাট করে খোলা। পরদা সরিয়ে দীপনাথ অতি পরিচিত বাসস্থানটিতে ঢুকল। আপাতদৃষ্টিতে মনোরমভাবে সাজানো, শান্ত ও সুন্দর এই বাসাটির ভিত ভিতরে ভিতরে কত ক্ষয়ে গেছে তা তার মতো নির্মমভাবে আর কে জানে!
তবু কয়েক দিনের অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও দুশ্চিন্তা করে আর একটি জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে দীপনাথ বুঝি কিছু প্রবীণ হয়েছে। বয়ঃসন্ধির সেই আবেগ আর নেই। বয়ঃসন্ধি! এই বয়সে কথাটা তার ক্ষেত্রে আর চলে না। তবে ভেবে দেখলে তার কৈশোরের বয়ঃসন্ধি তো আজও ঠিক মতো কাটেনি।
সাদা খোলের কালো নকশাপাড় একটা শাড়ি গায়ে আঁট করে জড়ানো, মিশমিশে কালো ব্লাউজ আর এলো খোঁপায় মণিদীপাকে আজ দারুণ ভাল দেখাল ভিতরের ঘর থেকে বসবার ঘরে ঢুকবার সময়। দীপনাথ মণিদীপার প্রবেশ থেকে বসা পর্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখল।
আজ দু'জনেই অস্বাভাবিক শান্ত।
দীপনাথ বিনা ভূমিকায় মৃদু স্বরে বলে, কী ঠিক করলেন?
মণিদীপা ততোধিক মৃদু স্বরে অপরাধী মুখে বলে, আমার এ ছাড়া উপায় নেই। গড়িয়াহাটা

ব্রিজের ওপাশে একটা দোকানঘর পাওয়া গেছে। অনেক টাকা সেলামি চাইছে।

কত টাকা?

শুনলে আপনি বকবেন।

দীপনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তা হলে না-ই বললেন। কারণ আপনার সোর্স অফ ক্যাপিটাল খুবই লিমিটেড।

মণিদীপা হাল ছাড়তে চায় না। তাই করুণ গলায় বলে, আমার কিছু গয়না আছে। বেচলে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। বাকিটা কোনও ব্যাংক বা কেউ দেবে না?

আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে এটুকু জানি, সেলামির খাতে কোনও লেজিটিমেট লোন থেকে টাকা পাওয়া অসম্ভব। আপনি সেলামির জন্য টাকা চাইছেন শুনলে কোন ব্যাংকার খুশি হবে বলুন!

আমি আপনার পরামর্শই চাইছি। শুধু শুধু কেন নেগেটিভ সাজেশন দিচ্ছেন!

আপনার দোকান যদি না চলে তা হলে টাকা পেলেও শোধ দেবেন কেমন করে?

চলবে। আমি জানি চলবে।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, আপনি জানেন না যে আপনি আসলে স্বপ্ন দেখছেন। এই হাড্ডাহাড্ডি কমপিটিশনের বাজারে আপনার মতো অনভিজ্ঞের পক্ষে দোকান চালানো কত শক্ত জানেন?

আমি পারব দেখবেন।

দীপনাথ আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনি আপনার না-হওয়া দোকানটাকে ইতিমধ্যেই ভালবেসে ফেলেছেন দেখছি।

আমার বাপের বাড়ি ওই এলাকায়। দরকার হলে আমার ভাইরাও হেলপ করতে পারবে। যোধপুর পার্কে আমার চেনাজানা অনেকে আছেন, তাঁরাও পেট্রনাইজ করবেন। দোকানটা চলবে। আপনি ভাববেন না।

দীপনাথ আচমকা জিজ্ঞেস করে, স্নিগ্ধদেব এখন কোথায়?

মণিদীপা একটু অবাক হয়ে বলে, কেন, আমেরিকায়! আপনাকে তো বলেইছি।

দীপনাথ একটু হাসল, জানি। শুধু আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম। এক বিপ্লবী আমেরিকায় দেদার টাকা কামাচ্ছে, আর এক বিপ্লবিনী যোধপুরে শাড়ির দোকান খুলতে সেলামির টাকা জোগাড় করছে। বিপ্লবকে একদম ডুবিয়ে দিলেন মিসেস বোস!

মণিদীপা একটু গম্ভীর হয়, শুনুন, কী একটা কথা আছে না! হাতি ফাঁদে পড়লে...

দীপনাথ শব্দ করে হাসল।

আমিই সেই চামচিকে তা হলে! যাকগে, নো অফেনস টেকন। আমি বলতে চাইছিলাম, টাকাটা তো অনায়াসেই স্নিগ্ধদেব আপনাকে পাঠাতে পারে। ধার হিসেবেই দিক। পরে দেশে এলে শোধ দিয়ে দেবেন।

স্নিগ্ধর টাকা নেব?

কেন নয়? এক সময়ে তাকে আপনি বিস্তর টাকা দিয়েছেন। কত টাকা তার হিসেব আছে?

মণিদীপা খুব গম্ভীর রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, স্নিগ্ধকে আমি যত টাকা দিয়েছি তা হিসেব করলে হয়তো এই সেলামির টাকার চেয়ে বেশি দাঁড়াবে। কিন্তু টাকাটা তো স্নিগ্ধ নেয়নি, পার্টির কাজে লেগেছে।

ঠিক জানেন?

মণিদীপা মাথা নেড়ে বলল, না। তবে স্নিগ্ধকে অবিশ্বাস করারও কিছু নেই।

পার্টির সঙ্গে আপনার ডাইরেক্ট যোগাযোগ ছিল না?

না। কোথায় ওদের আন্ডারগ্রাউন্ড সেন্টার তাও আমি জানি না।

টাকার কোনও রসিদ পেয়েছেন কখনও?

না। সেরকম নিয়ম নেই।

দীপনাথ আবার অন্য দিক থেকে সওয়াল শুরু করে, স্নিগ্ধদেব যখন আমেরিকায় গেল তখন ধরে নিতে হবে সে পার্টির আদর্শে অনুগত ছিল না। সে যে টাকাটা পার্টির ফান্ডেই জমা দিয়েছে এমন কথাও মনে করা যায় না। মোর ওভার, সে ছিল দরিদ্র স্কুলমাস্টার।

মণিদীপা তীক্ষ্ণ চোখে দীপনাথকে ভস্ম করে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, মানছি স্নিগ্ধ ইজ নাউ এ ফলেন গাই। কিন্তু বরাবরই সে এ রকম ছিল না।

আপনি কী করে জানেন, বোকা মেয়ে? স্নিগ্ধদেবের মতো সুপার ইনটেলিজেন্সের লোককে বুঝতে পারা কি সহজ?

আপনি বিচার করছেন কিছু না জেনেই। স্নিগ্ধদেবকে আপনি চোখেও দেখেননি কখনও।

আমি অভিজ্ঞতা থেকেই জানি।

মণিদীপা তার ঘাড় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নেড়ে বলে, না জানেন না। স্নিগ্ধ নিজের দরকারে টাকা চাইলেও আমি দিতাম। স্নিগ্ধ নিজের জন্য কখনও ভাবত না। তার ধ্যানজ্ঞান ছিল পার্টি এবং আদর্শ। বিপ্লবের জন্য অনেক টাকা দরকার। স্নিগ্ধদেব গরিব হলেও নিজের মাইনে থেকে একটা পারসেনটেজ বরাবর পার্টিতে ডোনেট করত।

ওঁর পতনের শুরু কবে থেকে তা কি আপনি জানেন?

না। ওর স্বভাব ভীষণ চাপা।

এমনও তো হতে পারে স্নিগ্ধদেবের পতন অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু আপনি টের পাননি। আপনি ওঁর বাইরের ছদ্মবেশেই মুগ্ধ ছিলেন, আর তখন স্নিগ্ধদেব পার্টির নাম করে আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিজের ঘর গোছাত!

এ রকম হতে পারে না তা বলছি না। কিন্তু হয়নি।

আপনি এখনও স্নিগ্ধদেবের প্রতি দুর্বল।

মণিদীপা মৃদু হেসে বলে, যেমন আপনি এখনও স্নিগ্ধ সম্পর্কে ভীষণ ভীষণ জেলাস।

দীপনাথ গাম্ভীর্য ঝেড়ে হেসে ফেলে। অত্যন্ত সরল প্রাণখোলা হাসি। তারপর বলে, তবু বলি স্নিগ্ধদেবের খপ্পরে পড়ে আপনি অর্ধেকটা জীবন নষ্ট করেছেন।

মুহূর্তে মণিদীপা জবাব দেয়, বাকি অর্ধেকটা নষ্ট করেছে কে জানেন? যে মূর্তিমানটি এখন আমার সামনে বসে জ্বালাচ্ছে।

দীপনাথ হাসল, লাল হল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, স্নিগ্ধদেব কিন্তু সত্যিই টাকাটা আপনাকে ধার হিসেবে দিতে পারেন। একটা চিঠি লিখে দেখুন না!

কিন্তু আমি যে স্নিগ্ধর টাকা চাই না। না খেতে পেয়ে মরলেও না।

কেন বলুন তো!— দীপনাথ সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করে।

দ্যাট ইজ মাই কনসেপশন অফ সেলফ-রেসপেক্ট। যাকে আমি এক সময়ে টাকা দিয়েছি, তার কাছে হাত পাততে আমার আত্মমর্যাদায় লাগে। থ্যাংক ফর দি সাজেশন, বাট ইট ইজ নট অ্যাকসেপটেবল।

দীপনাথ মৃদু হাসে। বলে, আমি অবশ্য জানতাম।

কী জানতেন?

আপনি স্নিগ্ধদেবের টাকা নেবেন না। অনেক দিন আগে আপনি একবার বলেছিলেন, বোস সাহেব ছাড়া অন্য কারও টাকা নিতে আপনার ঘেন্না করে।

মণিদীপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হ্যাঁ। আজও করে। আফটার হোয়াট হ্যাজ গন বিটউইন আস। কিন্তু আমরা প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গটা কী যেন?

সেলামির টাকা।
কত তা এখনও বলেননি।
দুই লাখ।
দীপনাথ হাঁ করে চেয়ে থেকে হঠাৎ চাপা আর্তস্বরে বলে উঠল, জল! জল! বাতাস!
মণিদীপা তড়িঘড়ি উঠতে গিয়েও থেমে হেসে ফেলে, খুব প্র্যাকটিক্যাল জোক শিখেছেন!
বাস্তবিকই আমার মাথা ঘুরছে।
ইয়ারকি মারবেন না! ইট ইজ এ কোশ্চেন অফ মাই এক্‌জিসটেনস।
দু'লাখ! আমি ভুল শুনিনি তো!
না। আর আপনি এও জানেন যে, দু'-তিন লাখে আজকাল কিছুই হয় না। আপনি এখন একটি বড় বিজনেস ফার্মের প্রায় হর্তা-কর্তা। আপনার না জানার কথা নয়।
দীপনাথকে আজ দীর্ঘশ্বাসে পেয়েছে। খুব জোরালো একটা শ্বাস ফেলে সে বলে, আমরা হচ্ছি চিনির বলদ। কিন্তু মিসেস বোস, আমি আপনাকে খুশি করতে আমার যা সাধ্য তা করব।
করবেন?
করব। আমার নিজের বোধহয় হাজার ত্রিশেক টাকা ব্যাংকে আছে। এল আই সি থেকেও কিছু রেইজ করতে পারি। অফিসও কিছু অ্যাডভানস দেবে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাট হাজার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর বেশি নয়।
আপনি দেবেন?— খুব অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে থাকে মণিদীপা।
দিলে আপনি নেবেন না?
মণিদীপা জবাব দিতে পারে না অনেকক্ষণ। দীপনাথ— দীপনাথই হয়তো তার সত্যিকারের সর্বনাশের মূল। তবু বহুকাল ধরে গোপনে গোপনে নদীর ভূমিক্ষয়ের মতো মণিদীপার সব অহংকার ভাসিয়ে নিয়েছে যে অনভিপ্রেত ভালবাসা তারই মোহনা ওই দীপনাথ। কোনওদিনই আর দীপনাথকে ভালবাসার কথা বলবে না মণিদীপা। কিন্তু ভাল না বেসেও তার উপায় নেই। কিন্তু দীপনাথের টাকাও যে নেওয়া যায় না। কিছুতেই না।
মণিদীপা ঠোঁট উলটে বলল, একজন শ্লেভের টাকা নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে দিতে চাই না।
প্রশ্নটা তা নয়। প্রশ্ন হল আমার টাকা নিতে আপনার কোনও শুচিবায়ু আছে কি না!
হয়তো আছে।
একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দীপনাথ বলে, বাঁচলাম। পৃথিবীতে এখনও এইজন্যই বুঝি চন্দ্র-সূর্য ওঠে।
কথাটার মানে কী?
মানে বুঝে আপনার দরকার নেই। আই ওয়াজ জাস্ট থিংকিং অ্যালাউড। কিন্তু টাকা না নিলে আপনার দোকানের কী হবে?
মণিদীপা হঠাৎ বসে বসে ছেলেমানুষের মতো ঠ্যাং দু'টি নাচাল একটু। তারপর নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল, হবে না।
হবে না?
না। কেউ যখন চাইছে না তখন না হওয়াই ভাল।
দীপনাথ ভ্রূ কুঁচকে একটু কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ একটু সরল হাসি হেসে বলে, কথাটা ঠিক হল না।
কোন কথাটা?
কেউ চাইছে না এমন কিন্তু নয়। অন্তত বোস সাহেব চেয়েছিলেন যে আপনি দোকান-টোকান কিছু করে সেলফ-সাফিসিয়েন্ট হোন।

বটে? বলেনি তো কখনও!

আমাকে বলেছিলেন। আমি তাঁকে অন্য পরামর্শ দিই।

মণিদীপাকে এই স্বীকারোক্তি খুব একটা স্পর্শ করে না। তবু আলগা গলায় জিজ্ঞেস করে, তারপর?

তারপর আর কথাটা এগোয়নি। তবে ভাবছি, এখন একবার বোস সাহেবকে অ্যাপ্রোচ করলে উনি হয়তো টাকাটা দিয়ে দেবেন আপনাকে।

দিয়ে দেবে ঠিকই। বাট হি উইল বাই হিজ লিবার্টি বাই দ্যাট মানি।

কিন্তু আপনিও লিবার্টি দিতেই চান।

চাই। কিন্তু সেটা টাকার বিনিময়ে নয়। আই উইল গিভ হিম লিবার্টি আউট অফ পিটি, আউট অফ হেট্রেড। টাকা নয়।

দীপনাথ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, বড্ড গোলমালে ফেললেন।

আমাকে নিয়ে আপনার অনেক গোলমাল চলছে, সরি দীপনাথবাবু।

এই সময়ে বেয়ারা ট্রে ভর্তি খাবার আনে এবং ক্ষুধার্ত দীপনাথ খেতে খেতে গোটা সমস্যাটাই ভুলে যায়।

॥ একাত্তর ॥

বহুদিন বাদে ছবির কাছে একটা আয়না চাইল প্রীতম, আয়নাটা দে তো ছবি, আজ আমি নিজেই দাড়িটা কামাব।

কেন বড়দা? হারু নাপিত তো কামাতে আসবেই।

না, আজ একটু সেলফ-সার্ভিস করে দেখি।

ছবি দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম এনে দেয়। আয়নাটা ভারী অদ্ভুত। প্ল্যাস্টিকের ফ্রেমে বাঁধানো ছোট আয়নাটার দুপিঠেই মুখ দেখা যায়। একপিঠে ম্যাগনিফাইং উত্তল কাচ থাকায় মুখটা বিরাট বড় দেখায়। এ জিনিসটা এই প্রথম দেখল প্রীতম। তার অসুস্থতার অবকাশে কত নতুন জিনিস বেরিয়ে গেছে। নিজের চার-পাঁচ গুণ বড় মুখের দিকে চেয়ে রইল প্রীতম। সে কতটা শীর্ণ, কতটা ফ্যাকাসে তা ঠিক বুঝতে পারল না। তবে সে যে দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড এবং বিপুল শক্তিমান সে কথা আয়নাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে করিয়ে দিয়ে লাগল যে, দু'-তিন বছর আগেও সে যেমন ছিমছাম স্মার্ট চেহারার মানুষ ছিল এখনও সেইরকমই আছে।

বিনা দুর্ঘটনায় দাড়ি কামিয়ে ফেলে প্রীতম বারান্দায় তার প্রিয় চেয়ারে গিয়ে বসে। হাতে আয়নাটা। আরও স্পষ্ট আলোয় আয়নাটা মুখের সামনে ধরে সে নিজেকে মিথ্যে মিথ্যে করে বলে, তুমি আগের চেয়ে ভাল আছ। তোমার উন্নতি হচ্ছে। তুমি মরবে না।

নিজেকে সে প্রশ্ন করতে লাগল:

জীবাণুদের কোলাহল?

নেই। বহুকাল শুনিনি।

সেই নিঃসঙ্গতার বাঘটা?

ডাকছে না।

মৃত্যুভয়?

একটু আছে। এত সামান্য যে ঠিক ভয় বলা যায় না। মৃত্যু-চিন্তাই হবে হয়তো।

তবে যাও প্রীতম, তুমি মুক্ত। যেখানে খুশি চলে যাও।

যাব?

যাও।

মরমের সাইকেলটা বারান্দায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। লক করা, কিন্তু চাবিটা খুলে নেয়নি মরম।

কিছু না ভেবেই প্রীতম চেয়ার ছেড়ে ওঠে। বারান্দা থেকেই উবু হয়ে চাপে সাইকেলের সিটে। লকটা খুলে নেয়। শরীর কাঁপে, পা কাঁপে। তবে খুব বেশি নয়। সিটে বসে সামান্যক্ষণ দম নেয় সে। প্যাডেলে ডান পা রেখে বাঁ পায়ে যতদূর সম্ভব জোরে একটা চাড় দেয় সে। হ্যান্ডেলটা বার দুই প্রচণ্ডভাবে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে গিয়ে আচমকা সোজা হয়।

একটু ঢালু মতো জায়গাটার ওপর দিয়ে হঠাৎ সাইকেলটা গড়িয়ে যেতে থাকে। ভীষণ কাঁপছে হাতল, ভীষণ দুলছে প্রীতম। কিন্তু চেষ্টাই তো জীবন। প্রাণপণে সে পা দিয়ে প্যাডল করতে চেষ্টা করে।

রাস্তার ধারে ড্রেনের ওপর পাতা কংক্রিটের অপ্রশস্ত সাঁকোটা শুধু কপালজোরে পেরোতে পারে সে। তারপর রাস্তা... বিপজ্জনক... ভয়ংকর... তবু মুক্তি!

আশ্চর্য এই, টলোমলো সাইকেলটা পড়েও গেল না। চৌপথী ছাড়িয়ে গড়গড়িয়ে চলতে লাগল। চলন্ত সাইকেলে প্যাডল করতে খুব বেশি কষ্ট নেই। কিন্তু কষ্ট হ্যান্ডেল সোজা রাখায়। এ পাড়ায় ক্বচিৎ কদাচিৎ এক-আধটা মোটরগাড়ি আসে। রিকশা অবশ্য অনেক। আর সাইকেল। প্রীতমের ভয় করছিল, হয় কোনও সাইকেল বা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খাবে, নয়তো রাস্তা ছেড়ে পাশের নর্দমায় গিয়ে পড়বে।

কিন্তু পড়ছিল না। চৌপথী ছাড়িয়ে মাঠের ধার অবধি চলে এল সে। পিছনে একটা হইচই শোনা যাচ্ছে। আশেপাশের লোক অবাক হয়ে দেখছে। আনন্দধামের বারান্দা থেকে পিনুর মা অবাক গলায় চেঁচাচ্ছেন, ওরে শম্ভু! ও তারক! শিগগির গিয়ে প্রীতমকে ধর। দেখ, কী সর্বনেশে কাণ্ড করছে ছেলেটা!

হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে, সে একটা সর্বনেশে কাণ্ডই করছে আজ। কিন্তু এই আধখানা বেঁচে থাকার নিরন্তর বন্দিত্ব থেকে মুক্তি আর খুব দূরে নয়। অনেকদিন তার জীবনে মৃত্যুর শাসন বড় গুরুভার হয়ে চেপে বসে আছে। সে তো জানে, মরবেই, তাই মৃত্যুর হাত থেকে এই ছুটি নেওয়া।

ওরা তাকে ধরে ফেলবে। পিছনে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ আসছে। কারা চেঁচিয়ে ডাকছে, প্রীতমদা! প্রীতমদা! থামুন! আমরা আসছি।

প্রীতম তার সর্বস্ব দিয়ে ভর দিল প্যাডেলে। তার দুর্বল পায়ে তেমন জোর নেই যে সাইকেলকে এরোপ্লেনের মতো ছোটাবে। তবু এই অবস্থায় যতখানি জোরে সম্ভব সাইকেল ছুটতে থাকে। হ্যান্ডেলের আঁকাবাঁকা হয়ে যাওয়াটা একটু কমে এল। স্থির হল। সরু রাস্তায় যথাসাধ্য ধার ঘেঁষেই প্রীতম চালিয়ে নিতে পারছে। উল্টোদিকের চারটি রিকশা অনেকটা তফাত দিয়ে পেরিয়ে গেল তাকে। একটা মোটরগাড়িও। উত্তরাভিমুখী প্রীতমের সাইকেল রইল বহমান। কিন্তু এ পাড়ার শতকরা পঞ্চাশজনই তাকে চেনে। অচেনারাও সাইকেলে রুগ্ন চেহারার লোকটাকে দেখে অবাক হয়। সুতরাং সে প্রবলভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। পিছন দিক থেকে একটা-দুটো স্বাস্থ্যবান ছেলে বেগবান সাইকেলে এসে এক্ষুনি তাকে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাও জানে প্রীতম। তাই সে যতদূর সম্ভব চেনা পরিচয়ের গন্ডি পেরিয়ে যাওয়ার জন্য দুটো বাঁক ফিরল। কিন্তু বুকে হাঁফ ধরে আসছে, গায়ে ঘাম, হাত-পায়ের প্রতিটি সন্ধিতে খিল-ধরার যন্ত্রণা। প্রচণ্ড রোদে তার চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টিও কিছুটা আবছা এখন।

তবু সব বাধাকে ছাড়িয়ে প্রীতম চলতে থাকে। খানিকটা অন্ধের মতো, খানিকটা যন্ত্রের মতো।

রাস্তা খুবই সরু। এত সরু যে একটা রিকশা উল্টোদিক থেকে এলেই সে বিপদে পড়বে। সাইকেলের ওপর তার এত নিয়ন্ত্রণ নেই যে, অল্প জায়গা দিয়ে গলে যেতে পারবে। তবু বেপরোয়া প্রীতম প্রবল শ্বাস ফেলতে ফেলতে হেলে প্যাডেলে চাপ দিয়ে সাইকেলটাকে যথাসাধ্য বেগবান রাখছিল।

আর-একটা মোড় ঘুরতে গিয়ে প্রীতম পড়ল। পড়বে, প্রীতম জানতও। কিন্তু তার জন্য কোনও প্রস্তুতি নেয়নি সে, সাবধান হয়নি। তাই জানা সত্ত্বেও পড়াটা হল আচমকা।

বাঁ হাতে আর-একটা পাথরকুচির রাস্তায় বাঁক নিয়েই সে দেখতে পায় সামনে ইট বোঝাই এক টাটা মারসিডিস লরি থেকে মাল খালাস হচ্ছে। নীরন্ধ্র অবরোধ। প্রীতমের সাইকেলে ব্রেক ছিল বটে, কিন্তু সেটাকে যথেষ্ট জোরে চেপে ধরার মতো শক্তি ছিল না তার হাতে। সুতরাং শুকনো একটা নর্দমার খাতে সাইকেল সুদ্ধু নেমে খানিকদূর গড়িয়ে গেল সে। তারপর ধাক্কা মারল ইটের পাঁজায়। বেঁকে গেল সাইকেল। আরও একটু নিয়ে গেল তাকে। ফাঁকা ঘাসজমির ওপর ঢলে পড়ে গেল প্রীতমকে নিয়ে।

ব্যথা-বেদনা টের পেল না প্রীতম। তবে চোখে অন্ধকার নেমে এল। গভীর শ্বাস ফেলে তৃপ্তিতে চোখ বুজল সে। মথিত ঘাস আর ভেজা মাটির গন্ধ, রোদের সুঘ্রাণে ভরে গেল তার শ্বাস। ঘাসপোকাদের শব্দ শুনতে শুনতে সে চেতনা হারাল।

খুব বেশিক্ষণের জন্য অবশ্য নয়। চোখে-মুখে প্রথম জলের ঝাপটা পড়তেই চোখ মেলে সে। হাত তুলে ওদের বারণ করে আর জল দিতে। হাসিমুখে ঘাসে শুয়ে থেকে সে উজ্জ্বল আলোয় মাখা অনেকখানি আকাশকে চেয়ে দেখে। এতখানি স্বাধীনতা বহুকাল ভোগ করেনি সে।

পাড়ার ছেলেরা তাকে ধরে তোলে, প্রীতমদা, এবার বাড়ি চলুন।

ওরা তাকে একটা রিকশায় তোলে। একজন তার পাশে বসে তাকে ধরে থাকে।

পাড়া ভিড়ে ভিড়াক্কার। ভারী লজ্জা করছিল প্রীতমের। আর তার মুখের ওই লাজুক হাসিটি দেখে অনেকেই অবাক মানল, তা হলে কি প্রীতম ভাল হয়ে উঠছে?

মা প্রীতমকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিল। শতম বলল, থাক মা। দাদা যা চাইছে তাই করো।

প্রীতম আবার বারান্দায় বসে। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না, অভিযোগ করে না, শাসন করে না। বোধহয় শতম সবাইকে বারণ করেছে।

খুবই ক্লান্ত ছিল প্রীতম। দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমোল। বিকেলে মনোরম আলোয় বারান্দায় এসে বসল আবার। ছবি চা দিতে এসে সহসা ফিরে গেল না। চেয়ারের পাশটিতে বসে উর্ধ্বমুখী হয়ে একগাল হেসে বলল, তোমার আর কলকাতার জন্য মন খারাপ হয় না, না দাদা?

প্রীতম কথাটা ভেবে দেখল। কলকাতার কথা তার খুব মনে পড়ে। কিন্তু না, প্রথম প্রথম যেমন হত, ফিরে যেতে ইচ্ছে করত, তেমনটা আর হয় না। সে মাথা নাড়ল।

তুমি কলকাতার লোক হয়ে যাওয়ার পর আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তুমি আমাদের পর হয়ে গেছ। এভাবে যে অনেকদিন আমাদের কাছে থাকতে পারবে তা কখনও ভাবতেই পারতাম না।

প্রীতম হেসে গভীর শ্বাসও ফেলল সেইসঙ্গে।

ছবি বলল, বউদির চিঠি আজও এসেছে। তোমার নামে। তুমি বউদির চিঠিগুলো কেন পড়েও দেখো না বলো তো! আগের চিঠিটাও আঁটা খামে তোমার টেবিলে পড়ে আছে। জবাব না দিলে, পড়তে দোষ কী?

প্রীতম উদাসমুখে চুপ করে থাকে। কী জবাব দেবে? বিলুর চিঠি তার পড়তে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, বিলুর চিঠির মধ্যে অনেক মিথ্যে সাজানো কথা থাকবে। ওইসব কথা তার এখন সহ্য হয় না।

প্রীতম বলে, তোদের কাছে তো চিঠি দেয়ই।

তা দেয়। তবু, তোমার কাছে তো আলাদা করে কিছু বলার থাকতে পারে।

থাকলে কী করব? আমার তো এখন আর ওর জন্য কিছু করার নেই।

তুমি ভীষণ অন্যরকম হয়ে গেছ।

কীরকম রে?

কেমন যেন। তোমাকে বাপু আজকাল ভয় করে।

ভয় পাস?

ভয় পাই তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না বলে। লাবুসোনার জন্যও তুমি আজকাল ভাবো না দাদা?

প্রীতম চট করে এ কথার জবাব দিল না। সারা গায়ে একটু ব্যথার টাটানি রয়েছে এখনও। তার অবশ প্রায় অনুভূতিহীন শরীরে এই ব্যথাটুকু খুব উপভোগ করছিল সে। দূরের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, লাবুকে নিয়ে ভাববার কিছু তো নেই। যদি কোনও অ্যাকসিডেন্ট বা অকালমৃত্যু না ঘটে তা হলে ওর জীবন তো নিরাপদই। ওর মা ভাল চাকরি করে, আমারও কিছু টাকা রয়ে গেছে। তার চেয়ে বরং স্বার্থপরের মতো এখন আমার নিজেকে নিয়েই চিন্তা করতে বেশি ভাল লাগে।

বলে প্রীতম একটু হাসল।

কথাটার অর্থ ছবি খুব ভাল ধরতে পারল না, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। বলল, কিন্তু বউদি যে আমাদের কথা বিশ্বাস করে না, তার কী করবে? প্রতি চিঠিতেই আমরা লিখি, দাদা ভাল আছে। কিন্তু বউদির সন্দেহ, তুমি ভাল নেই। ভাল থাকলে নিজের হাতেই চিঠি লিখতে।

খুব চিন্তা করে বুঝি?

খুব। লেখে, তোমরা আমাকে সব কথা জানাচ্ছ না।

এবার লিখে দিস, দাদার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। দাদার তো আয়ু বেশি নয়, তাই বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সেকেন্ড সে নিংড়ে নেয়। তার সময় কই যে তোমাকে চিঠি লিখবে?

ছবি হেসে বলে, এসব কথা লেখা যায় বুঝি!

প্রীতমও হাসে, তা হলে কিছুই লিখিস না।

বউদিকে নিজের হাতে তোমার একটু লেখা উচিত। একটিবার লেখো। ওই যা যা সব বললে তাই না হয় লেখো। অত ভাষা তো আর আমাদের কলমে আসবে না।

তোর বউদি যদি আমাকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে থাকে তবে একটু ভাবতে দে না। ভাবলে ভালবাসা বাড়ে।

সন্ধেবেলা ঘরে এসে টেবিলের ওপর বিলুর চিঠিটা পড়ে থাকতে দেখল প্রীতম। কিন্তু একবারও খুলে পড়তে ইচ্ছে হল না তার।

আগের মতো প্রীতম এখন ঘরবন্দি থাকে না। সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খায়। অনেক রাত অবধি পারিবারিক আড্ডায় জেগে অংশ নেয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে সেই শৈশবের শিলিগুড়িকে পেয়ে গেছে বুঝি। এখন আর তাই বিলুকে মনে পড়ে না, লাবুর জন্য চিন্তা নেই, মন কেমন করে না তেমন।

টেলিগ্রামটা এল বেশ রাতে। অ্যারাইভিং টুয়েলভথ্ অ্যাটেন্ড। বিলু।

টেলিগ্রামটা পিয়োনের হাত থেকে নিয়ে ঘরে এসেই মরম চেঁচায়, বউদি কাল আসছে। হুররে।

খবরটা মরমের মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই বাড়িতে একটা আনন্দের কোলাহল পড়ে যায়। মা খুশি, বাবা খুশি, ছবি খুশি। শুধু প্রীতমই এই খবরে তেমন উত্তেজনা বোধ করে না। বরং তার একটা ভ্রূ একটু ঊর্ধ্বমুখী হয়। বিলু, কে বিলু?

রাতে ঘুমঘোরে প্রীতমের মনে হয়, তার কোনও অভাব নেই। তার কিছু প্রয়োজন নেই। আর কাউকে ছাড়াও তার চলে যাবে। সকালে বাচ্চা নিয়ে যে মহিলাটি সামনে এসে দাঁড়াবে সে এই পৃথিবীর আর হাজার হাজার মহিলার মতোই একজন। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু লাবু! লাবু তো তার মেয়ে! প্রীতম আধোঘুমেই ভাবে, তাই বা ভাবছি কেন?

লাবু আমারই বা কেন হবে? লাবু এই পৃথিবীতে আসার একটি মাধ্যম খুঁজেছিল। প্রীতম সেই মাধ্যম মাত্র। সে তো লাবুর সৃষ্টিকর্তা নয়। লাবুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা যে, লাবু তারই। প্রীতম শুধু এক বিভ্রম এক মায়াবশে ভাবে, লাবু আমার মেয়ে। কিন্তু সত্য ঘটনা তো তা নয়।

খুব সকালেই স্কুটার হাঁকিয়ে বউদিকে আনতে নিউ জলপাইগুড়ি চলে গেল শতম। বাড়িতে গোছগাছ করতে লাগল ছবি আর মা।

গোছগাছের জন্যই সাতসকালে বিছানা ছাড়তে হয়েছে প্রীতমকে। ছবি তাকে ঠেলে তুলে বিছানা টানটান করে ভাল বেডকভার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। টেবিলে পেতেছে নিজের হাতে কাজ করা সবুজ ঢাকনা। আজ সব জানালায় দরজায় টানটান পরদা।

একটু বিরক্তমুখে কাচা ধুতি পরতে হয়েছে প্রীতমকে। গায়ে সাদা কটকটে গেঞ্জি। চুল পাট করে সেজেগুজে বসে আছে বারান্দায়। ছবি চা দিতে এলে তেতো মুখে বলল, আজ কি পাত্রীপক্ষ আমাকে দেখতে আসছে রে? তোরা যা শুরু করেছিস!

আসছেই তো দেখতে। যা অগোছালো হয়ে থাকো, বউদি দেখে গিয়ে আমাদের নিন্দে করবে।

এমনিতে বুঝি করে না?

করলে করে। তবু যতদূর পারি মন রাখার চেষ্টা করি।

তোর বউদি হল কলকাত্তাই মাল। কলকাত্তাইরা অত সহজে খুশি হয় না।

কী যে সব বলো না দাদা!

প্রীতম ভ্রু কুঁচকে চা খায়। তারপর হঠাৎ উদাসী এক হাওয়া আসে। প্রীতম চরাচরের দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে আলো আর ছায়া, সবুজ আর নীল, প্রাণ আর জীবনের খেলা দেখতে থাকে। সামনের মাঠে খোঁটায় বাঁধা গোরুর পাশে ছাগল চরছে। ঘাস পতঙ্গ পাখি, তুচ্ছ সব ওড়াউড়ি, অস্তিত্ব, শব্দ তাকে এক গভীর প্রাণের রাজ্যে নিয়ে যেতে থাকে। সেখানে নামহীন অস্তিত্ব আর বুদ্ধির জগৎ। বিলু নেই, লাবু নেই, কেউ নেই।

এই গভীর ধ্যানের মধ্যে স্কুটারের পিঁ শব্দ হঠাৎ হানা দেয়। স্কুটারের পিছু পিছু গুড়গুড় করে আসে একটি অটোরিকশা। বাড়ির সামনে থামে।

লাবু চেঁচিয়ে ডাকে, বাবা!

ভোরের সুন্দর আলোয়-ধোয়া মুখে একটু হাসে প্রীতম। হাত বাড়িয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বলে, আয়।

লাবুকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রীতম টের পায়, আজ এরকমই সস্নেহে সে একটি ছাগলছানাকেও কোলে নিতে পারে। তার স্নেহ অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক হয়েছে এখন।

লাবু অনেকটা লম্বা হয়েছে। অনেক বেশি সুন্দরও। তার মুখে এখন নিখুঁতভাবে প্রীতমের মুখের আদল চেপে বসেছে। খুব দামি আর সুন্দর একটা ফ্রক তার পরনে। দু'হাতে লাবুর মুখখানা তুলে নিবিষ্ট চোখে দেখছিল প্রীতম।

লাবুও মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে বাবার দিকে। বলল, তুমি ভাল আছ বাবা?

ভালই মা। তুমি?

আমিও ভাল আছি বাবা।

বাড়িসুদ্ধ লোক বেরিয়ে এসেছে বাইরে। মা বাবা ছবি মরম রূপম। ভাইরা সুটকেস, বাসকেট, বিছানা নামাচ্ছে অটোরিকশা থেকে। ছবি গিয়ে বউদির হাত ধরে টেনে আনছে।

ভারী সুন্দর এই দৃশ্য। কিন্তু প্রীতম নড়ল না। এক হাতে মেয়ের হাতটা ধরে নির্বিকার বসে রইল। বিলুর দিকে চেয়ে সে স্পষ্টই বুঝতে পারে, বিলু সেই আগের মতো নেই। সামান্য মেদবৃদ্ধির ফলে তার চেহারাটা পরিপূর্ণ শ্রীময়ী। মুখে ক্লান্তির আস্তরণের নীচে তৃপ্তির চিহ্ন। বিলু আর তার নেই।

প্রীতমের দীর্ঘশ্বাস এল না। দুঃখ হল না। উদাসীনতার এক গৈরিক রং আজ তার মন ছেয়ে আছে। সে দেখল। মনে মনে ক্ষমা করল। সবাইকে।

ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর বিলু শাড়ি পালটে, মুখ হাত ধুয়ে বারান্দায় আসে। আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলে, আমার একটা চিঠিরও জবাব দাওনি।

আমি ভাল আছি বিলু।

সে কথাটাও তো জানাতে পারতে!

তুমি কেন এত জানতে চাও?

চাইব না!— বিলু অবাক হয়, রোগা মানুষটাকে এতদূরে ফেলে রেখে কলকাতায় থাকি, জানতে চাইব না?

প্রীতম বিরক্ত হয় না, কিন্তু গভীর বিষণ্ণতার গলায় বলে, বেশ তো আছি।

বেশ আছ জানি। মাঝে মাঝে অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে পড়ো, তাও শুনেছি। কিন্তু আমি কেমন ছটফট করি, তা জানো?

প্রীতম কৌতূহলভরে বিলুর দিকে তাকায়। সন্দেহ নেই, প্রীতমের জন্য বিলুর উদ্বেগ আছে, দায়িত্ববোধ আছে, দুঃখ আছে। কিন্তু এও জানে প্রীতম, বিলুর জীবনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সে নেই। বিলুকে চাকরির ঘানিতে ঘোরাচ্ছে কে? বিলুকে কলকাতার জালে আটকে রেখেছে কে? সে কি এক শূন্যগর্ভ নিরাপত্তার বোধ? বিলু কি জানে না, কেউই কোথাও কখনওই নিরাপদ নয়?

প্রীতম বলল, চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না।

পড়তেও নয়? শুনলাম আমার চিঠি এলে তুমি নাকি তা খুলে পড়তেও চাও না।

ছবি বলেছে বুঝি! আসলে ভুলে যাই। মনে রাখলে কষ্ট পাব বলে জোর করে ভুলে যাই। নইলে তোমার চিঠি পড়তে লোভ হয় খুব। কিন্তু পড়লেই দুর্বল হয়ে যাব যে।

এ কথায় বিলু বোধহয় একটু ভিজে যায়। তবু বলে, ও কথার মানে হয় না। চিঠিতে কত জরুরি কথাও থাকতে পারে তো।

জরুরি! কী আর এমন জরুরি থাকতে পারে বলো তো জীবনে? ঘর-সংসার-সম্পর্ক সবই তো ছেলেখেলা বিলু।

সন্নিসি ঠাকুর, আমার মুখ চেয়ে না হয় একটু ছেলেখেলাই করলে। তোমার অসুখটা তো আমার কাছে ছেলেখেলা নয়। মেয়েটাও দিনের মধ্যে দশবার বাবার চিঠি এসেছে কি না জানতে চায়। ওকে কী বলি বলো তো!

তুমি বেশ সুন্দরী হয়েছ বিলু।

আচমকা এ প্রশংসায় একটু কুঁকড়ে গিয়ে বিলু বলে, যাক বাবা, আমাকে দেখেছ তা হলে। আমি তো ভাবলাম, সন্নিসির বুঝি বউয়ের মুখ দেখাও বারণ।

প্রীতম ক্ষীণ একটু হাসল। তারপর বলে, বেশ লাগে এখন তোমাকে দেখতে।

থাক, আর বলতে হবে না। নিজের দোষ ঢাকতে এখন এরকম অনেক মিথ্যে কথা তোমাকে বলতে হবে।

প্রীতম গম্ভীর মুখে হঠাৎ বলে, একটা কথা বলব বিলু?

বলো।

তোমার এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। আমার গেছে। কেন আমার স্মৃতি নিয়ে তোমার নিজের জীবনকে নষ্ট করছ?

বিলু নড়ে বসল। তারপর বলল, ওরকম একটা কথা তুমি আগেও বলেছ। আর বোলো না।

শোনো, আমি অভিমান থেকে বলছি না। আমারও একটুও ঈর্ষা হবে না, অধিকারবোধেও লাগবে না। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই।

যদি সুখী না হই? তুমি চাইলেই কি সুখের পাখি এসে আমার কোলে বসবে?

তবু আমি চাইছি।

বোলো না। আমি এখনও অত আত্মকেন্দ্রিক নই।

বিলু, তুমি বড় পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু যাকে পাপ বলে ভাবছ তা পাপ না-ও হতে পারে।

॥ বাহাত্তর ॥

প্রীতম নিজে থেকেই মাস দুই আগে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়েছে। ইদানীং ওষুধের প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল তার। পিঠের দিকে আর মাজায় ক্ষত দেখা দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে হাঁফানির মতো শ্বাসকষ্ট হত। অ্যালোপ্যাথি ওষুধের বেশিরভাগই কমবেশি বিষ জাতীয় জিনিস। ডাক্তারকে সে একদিন বলল, আমি আর ওষুধ খাব না।

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন, খাবে না? তা হলে কী করবে?

আমার ড্রাগ-রিঅ্যাকশন হচ্ছে।

ডাক্তার নিজেও সেটা জানেন। বিচক্ষণ প্রবীণ ডাক্তার। একটু ভেবে বললেন, খেয়ো না। ভগবানকে ডাকো। তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার আর কে আছেন?

পরদিন থেকেই একজন হোমিয়োপ্যাথ প্রীতমকে দেখছে। বেশ সাধু-সাধু চেহারার দাড়িওলা হাসিখুশি মানুষ। বলার চেয়ে শোনেন বেশি, আর তার চেয়েও বেশি হাসেন। লোকটাকে পছন্দ হল প্রীতমের। লোকটা একটু বাঙাল আর বাহে টানে খাঁটি উত্তরবঙ্গীয় বুলিতে শুধু বলে গেলেন, ভাল হইয়া যাইবেন গিয়া।

ছোট ছোট মিষ্টি গুলির ওষুধ খেতে আপত্তি নেই প্রীতমের। উপকার হোক না হোক, অপকারও নেই। ডাক্তার বড় একটা আসেন না, শতম গিয়ে অবস্থার বিবরণ দিয়ে ওষুধ নিয়ে আসে। তাতে কাজ হয় কি না বোঝা যায় না, কিন্তু শতম খুব নিয়ম করে ওষুধ খাওয়ায়। ওষুধের মাত্রা খুবই অবিশ্বাস্য রকমের কম। সাতদিনে মাত্র একদিন একটি ডোজ, খালিপেটে এবং সকালে।

এই চিকিৎসার ব্যবস্থায় মোটেই খুশি হল না বিলু। পরের দিনই সে নিজে দাড়িওলা ডাক্তারের বাড়িতে হানা দিল।

ডাক্তারবাবু, এই ওষুধে কি কাজ হবে?

ডাক্তারবাবু এই সাজগোজ করা বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে দেখে একটু তটস্থ হয়ে বললেন, হবে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। একটু দেরিতে ক্রিয়া হয়।

বিলু ভ্রু কুঁচকে বলে, আপনার কি মনে হয় না ওর এখনই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বন্ধ করাটা ঠিক হয়নি?

ডাক্তার একটু ফাঁপরে পরে বলেন, ওই চিকিৎসাতেও বিশেষ উপকার হইতেছিল না।

আপনি কি পারবেন?

ডাক্তার হেসে বললেন, রোগীর এখন-তখন অবস্থা না হইলে কেউ তো আর হোমিয়োপ্যাথের

কাছে আসে না। আমার সব রোগীই তাই মরুইন্যা। তাগো ভাল করতে সময় তো একটু লাগেই, মা। আপনে নিশ্চিন্তে যান গিয়া।

ডাক্তারের পসার বেশি নয়, তা বাইরের ঘরে বসেই টের পেল বিলু। সকালবেলার দিকেও রুগি বলতে ডাক্তারের বাইরের ঘরে প্রায় কেউই নেই। ডাক্তার নিজেও তার ক্ষেতির কাজ দেখছিল। খবর পেয়ে মাটিমাখা হাতেই উঠে এসেছে। দুটো ভাঙা আলমাবিতে রাজ্যের পুরনো হোমিয়োপ্যাথির বই আর জার্নাল। দুটো ছোট পুরনো আলমারিতে হাজারখানেক শিশি আর বোতল। দেয়ালে মহাত্মা হ্যানিম্যানের ছবিতে ঝুল পড়েছে। ডাক্তার গা-আদুড়, ধুতি হাঁটু অবধি তোলা। দাড়ির ফাঁকে হাসি।

বিলু খুশি হচ্ছিল না। বলল, কলকাতায় ওকে বড় বড় স্পেশালিস্ট দেখছিল। তারাই কিছু করতে পারল না।

ডাক্তার শুধুই হাসছিলেন।

বিলু অগত্যা উঠল। তার ইচ্ছে করছিল, এক্ষুনি প্রীতমকে কলকাতায় ফেরত নিয়ে যায়। এরকম অব্যবস্থায় বিনা চিকিৎসায় লোকটা মরেই যাবে।

বেরোনোর মুখে বিলু বাঁ হাতে ডাক্তারের বাগানটা দেখল। চোখ জুড়িয়ে যায়। কী সবুজ! কী সবুজ!

ওটা কি শশা নাকি?

শশাই, মা। খাইবেন? লইয়া যান কয়টা।—বলে ডাক্তার গিয়ে মাচান থেকে কয়েকটা দুধকচি শশা পেড়ে এনে বিলুর হাতে দেয়।

বিলু শশাগুলো নিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই প্রীতমকে বলল, এবারই আমার সঙ্গে তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

কেন?—প্রীতম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

এসব কী হচ্ছে শুনি! এ কি চিকিৎসা? লোকটা তো তেমন উঁচুদরের ডাক্তারও নয়। প্র্যাকটিসই নেই।

প্রীতম থম ধরে থেকে কিছুক্ষণ বাদে বলে, এর ওষুধে আমার কাজ হচ্ছে।

ছাই হচ্ছে! হাতি ঘোড়া গেল তল, এখন মশা বলে কত জল। আমি এসব পছন্দ করছি না। এবারই আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

নিয়ে কী করবে?

যদি হোমিয়োপ্যাথিই করাও তবে তার জন্যেও কলকাতায় ঢের বড় ডাক্তার আছে। এ লোকটা কিছু জানে না।

কী করে বুঝলে?

রুগিই নেই। কেমন ক্যাবলার মতো সবসময়ে হাসে।

ওগুলো যুক্তি নয়, বিলু।

কোনটা যুক্তি নয়?

ডাক্তারের বিচার করতে যেয়ো না। আমার রোগের কোনও চিকিৎসা এখনও অ্যালোপাথিতে নেই। কলকাতার ডাক্তাররা সে কথা আকারে-ইঙ্গিতে বলেই দিয়েছে। হোমিয়োপ্যাথিতে আছে কি না আমি জানি না। জানি না বলেই ভরসা করতে পারছি। এ লোকটা শতমের চেনা। ক্যাবলা হলে শতম ওকে দিয়ে আমার চিকিৎসা করাত না।

বিলু সাময়িকভাবে চুপ করে গেল বটে, কিন্তু যুক্তিটা মেনে নিল না।

বিকেলেই সে শতমকে বলল, এখানে তোমার দাদার ভাল চিকিৎসা হচ্ছে না। আমি ভাবছি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব।

এ কথায় একটু থতমত খেয়ে যায় শতম। সত্য বটে, দাদার দায়দায়িত্ব সে নিজের ঘাড়ে নিয়েছে, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দাদার ওপর অধিকার তার চেয়েও বউদিরই বেশি। পুরুষ মেয়ে উভয়পক্ষই বিয়ের পর আত্মীয়স্বজনের কাছে একটু পর হয়ে যায়। দাদা মরলে বউদিরই তো সবার আগে শাঁখা ভাঙবে, সিঁদুর মুছবে। কাজেই বউদির যতটা অধিকার তার ততটা নয়।

সে বলল, আবার কলকাতা!

কলকাতাই ভাল। এখানে কেউ তোমরা ওর ওপর ঠিক নজরও রাখতে পারছ না। শুনলাম, দু'দিন ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি আসবার আগের দিনই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। যদি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেত?

শতম একটু হাসল, আমাদের পাড়াটা তেমন কনজেসটেড নয়, তাই রক্ষা। যদি এ কাণ্ড দাদা কলকাতায় করে তা হলে কী হবে বউদি, বলো তো! তুমি অফিসে থাকো, লাবু ইস্কুলে, দু'জন মাইনে-করা লোক কতক্ষণ নজর রাখবে?

দরকার হলে আমিই ছুটি নিয়ে বাসায় থাকব।

ছুটি নেবে? কেন, চাকরিটা ছেড়ে দাও না!

দরকার হলে তাও ছাড়ব।—কয়েক মাস আগে শতম যে জবরদস্তিতে দাদাকে নিয়ে এসেছিল সেই অপমানটা ভোলেনি বিলু। আজ বহুদিন বাদে সেই শুষ্ক ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ টের পায় সে। বাঘিনীর মতো জিভ দিয়ে সেই রক্তের স্বাদ নেয় সে।

শতম বউদির চেহারায় বিদ্রোহের আভাস পাচ্ছিল। তাই কথা বাড়াল না। মৃদু স্বরে বলল, নিয়ে যেতে হয়, যাবে। তার আর কথা কী!

এত সহজে দুরন্ত শতম বাগ মানবে তা ভাবেনি বিলু। একটু ক্লান্ত স্বরে সে বলল, তিনটে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট করে দাও তা হলে।

দেব। মাকে আগে একটু জানিয়ে নাও।

নিজের ঘরে বা বারান্দায় বসে প্রীতম সবই টের পায়। কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারে তার কোনও মতামত আর চাইছে না বিলু। অর্থাৎ প্রীতমের মতামত এখন উপেক্ষা করলেও তার চলে। বাড়ির কেউই বিলুর প্রস্তাবে বাধা দিচ্ছে না। তার মানে কি, প্রীতমকে এরা কেউ চায় না? ঠান্ডা লড়াইটা বিলু জিতে গেছে তা হলে?

শতম একদিন একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপে রিজার্ভ করে এসে তিনটে টিকিট বউদির হাতে দিয়ে বলল, আগামী রবিবার।

বিলু টিকিট তিনটে তার ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিল।

এসবই ঘটল প্রীতমের চোখের সামনেই।

বাড়িতে আজকাল হইচই কমে গেছে। রাতে খাওয়ার পর আড্ডা নেই। ডাক্তার ওষুধ দেওয়া প্রায় বন্ধ করেছে।

একদিন সকালবেলা বারান্দায় বসে গোটা ব্যাপারটা ভেবে মৃদু মৃদু একটু হাসল প্রীতম। তার কেবলই মনে হচ্ছিল বিলু কোনওরকমে টের পেয়েছে যে, প্রীতম ভাল হয়ে উঠবে। আর যদি তা-ই হয় তবে সে কেন প্রীতমের আরোগ্যের ষোলো আনা কৃতিত্ব নিজে দাবি করবে না!

এত গভীরভাবে কথাটাকে বিশ্বাস করল প্রীতম যে সকালে প্রথম বিলুর সঙ্গে দেখা হতেই সে বলল, তাই না বিলু?

অবাক বিলু বলে, কিসের তাই না?

এই যে তুমি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছ, এর মূলে আছে একটা অন্য কথা।

কী কথা?

তুমি জানো যে, আমি ভাল হয়ে উঠছি। আর সেই ভাল হয়ে ওঠার জন্য তুমি নিজের কৃতিত্ব দাবি করতে চাও।

বিলু খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কঠিন মুখ করে বলে, তুমি ভাল হয়ে উঠছ, এ কথা কে বলল?

আমি টের পাই, তুমিও টের পাচ্ছ।

আমি পাচ্ছি না, তা ছাড়া অত ঘোরপ্যাঁচ আমার মনের মধ্যে ছিল না। তুমি এসব ভাবলে কী করে?

প্রীতম হতাশার শ্বাস ফেলে বলে, ছেড়ে দাও ওসব কথা। আইডল ব্রেন ইজ ডেভিলস ওয়ার্কশপ।

তাই দেখছি। কিন্তু ওসব নিয়ে ভাববার সময় আমার নেই। আমি তোমাকে নিয়েই কলকাতা যাব।

প্রীতম জবাব দিল না।

পরদিন সকালে মরম চেঁচিয়ে উঠল, দাদা নেই! দাদা কোথায় গেল?

সারা বাড়ি তৎক্ষণাৎ জেগে উঠল। তারপর খোঁজ খোঁজ।

কিন্তু আশেপাশে কোথাও প্রীতমকে পাওয়া গেল না। এক ঘণ্টা গেল, দু' ঘণ্টা গেল। সারাদিনটাই চলে গেল। প্রীতম ফিরল না।

বিলু ক্রমেই গম্ভীর আর থমথমে হয়ে উঠছিল। তারপর নিজের বাক্স-টাক্স গোছাতে লাগল আপনমনে।

দুপুরের মধ্যেই সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব জায়গা থেকে ঘুরে আসতে লাগল লোক। কোথাও প্রীতম নেই। থানা হাসপাতাল কোথাও না। ধারেকাছে জলপাইগুড়ি আর খোকসাডাঙায় প্রীতমের এক পিসি আর এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠা থাকে। সেখান থেকেও খবর এল প্রীতম যায়নি।

বিলুর মুখে দুশ্চিন্তা নেই, উদ্বেগ নেই, শুধু কঠোর লাবণ্যহীন একটা আক্রোশ জ্বলছে।

উদ্বেগে ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যাওয়ায় মা বিছানায় শোয়া। বাবা ঘর-বার করছে। ছবি দুপুরে ডালসেদ্ধ আর ভাত নামিয়ে রাখল কোনওক্রমে। কেউ খেল, কেউ খেল না, তবে কেউ কাউকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করল না। বিলু অবশ্য মেয়েকে নিয়ে খেতে বসল। খেতে খেতেই ছবিকে বলল, ওরা অত খোঁজাখুঁজি না করলেই পারত।

ছবি চমকে উঠে বলে, কেন বউদি?

তোমার দাদা তো আর অচেনা জায়গায় নেই। পাছে আমি কলকাতায় নিয়ে যাই সেই ভয়ে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এতটা না করলেই হত। তেমন আপত্তি থাকলে আমি না হয় ওকে নিয়ে যেতাম না।

ছবি অবাক হয়ে বলে, সরিয়ে দেওয়া হয়েছে! কে সরাল? আমরা?

তাও তোমরাই জানো। ওর মতো পঙ্গু লোকের পক্ষে খুব দূরে তো যাওয়া সম্ভব নয়।

ছবি অল্প বয়সের ধর্মেই একটু মুখিয়ে উঠে বলে, দাদাকে পঙ্গু বলছ কেন? যে হাঁটতে পারে, সাইকেল চালাতে পারে সে কি পঙ্গু মানুষ?

মোটেই পারে না। ওসব ও করে মরার জন্য। একদিন এভাবেই একটা অ্যাকসিডেন্ট করে মরবে, তোমরা তখনও চোখ বুজে থেকো।

এ কথার জবাব এল না ছবির মুখে। অসহায়ভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ডালের হাতাটা মেঝেয় রেখে সে দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসল।

ছবির মুখ থেকে কথাটা ছড়িয়ে পড়তেও বেশি দেরি হল না। দুপুরে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে বিকেলের দিকে বিলু যখন উঠল তখন তিন ভাই শ্মশানফেরত চেহারা নিয়ে বারান্দায় বসে আছে।

দুপুরে ডাক্তার ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়ে যাওয়ায় মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাবা বাড়ি নেই। ছবি চা করছে।

বিলুকে দেখে শতম উঠে এল। বিলুকে ঘরে ডেকে এনে বলল, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে, বউদি।

বলো।—খুব নিস্পৃহ স্বরে বিলু বলে।

তোমার মনে যত সন্দেহই থাক, দাদাকে আমরা কিন্তু সত্যিই লুকিয়ে রাখিনি।

বিলু এ কথার জবাব দিল না। কিন্তু মুখটা আরও গম্ভীর আর কঠিন হল।

দাদা শেষরাতে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে জানি না। ব্যাপারটা হালকাভাবে দেখো না। এর মধ্যে লুকোচুরি নেই।

বিলু নীরস গলায় বলে, প্রীতমকে খুঁজে বের করা খুব শক্ত কাজ নয় শতম, কোথায় যেতে পারে তা তোমাদের অজানা থাকার কথা নয়।

আমরা সব জায়গায় খুঁজেছি। দাদার সব বন্ধুর বাড়িতে গেছি। কোথাও পাইনি।

বিলু তবু বিশ্বাস করল না। মৃদু বিষ-গলায় বলল, একটা কথা তো মানবে। প্রীতম মোটর নিউরো ডিজেনারেশনের রুগি। তার পক্ষে স্বাভাবিক মানুষের মতো চলাফেরা সম্ভব নয়। সে কতদূর যেতে পারে?

তা তো জানি না।

এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

বলি। কারণ, কথাটা সত্যি। এমনকী আমরা রেললাইন ধরেও খুঁজেছি, যদি সুইসাইড করে থাকে। ধারেকাছে পুকুর-টুকুর নেই, থাকলে জলে লোক নামাতাম। খুঁজে দেখেছি, দাদা তার একটা হাতব্যাগ সঙ্গে নিয়ে গেছে। সেই হাতব্যাগে দাদার সব টাকাপয়সা থাকত।

বিলু চুপ করে রইল।

শতম মিনতি করে বলল, বিশ্বাস করো বউদি, লুকিয়ে রাখলে এতক্ষণে স্বীকার করতাম।

বিলু মৃদু স্বরে বলে, তা হলে ও নিজেই হয়তো লুকিয়ে আছে। তোমাদের আর খুঁজতে হবে না। আমি চলে গেলে ঠিক ফিরে আসবে।

শতম ভীষণ উদ্বেগের গলায় বলে, তুমি এ অবস্থায় চলে যাবে? দাদা ফিরে না এলেও?

আমি না গেলে যে ও ফিরবে না।

শতম একটু অবিশ্বাসভরে বউদির দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, যদি দাদা না ফেরে?

ফিরবে। যে সুইসাইড করতে যায় সে সঙ্গে টাকা নেয় না।

মানছি। কিন্তু দাদা তো সুস্থ সবল নয়। হয়তো রাস্তায় বিপদে পড়ে যাবে।

বিরক্ত বিলু বলে, তার আমি কী করব বলো তো?

কিছু করতে হবে না। আমরা চারদিকে হাল্লাক ফেলে দিয়েছি। দু'-চারদিনের মধ্যেই খবর এসে যাবে। যতদিন খবর না পাই ততদিন তুমি থাকো। নইলে পাঁচজনের চোখেই যে খারাপ দেখাবে।

লোকনিন্দার কথাটা রাগের মাথায় ভেবে দেখেনি বিলু। এখন ভাবল। লুকিয়েই থাক, আর যা-ই হোক, এই অবস্থায় তার কলকাতায় চলে যাওয়াটা খুবই বিসদৃশ।

বিলু অসহায় মুখে বলে, আমার যে ছুটি নেই!

ছুটি বউদি!—খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ শতম হেসে ফেলে, ছুটি নেই! হায় ঠাকুর, দুনিয়ায় ছুটি নেইটাই সবচেয়ে বড় কথা হল? দাদা যে নেই সেটা কিছু নয়?

বিলু এইসব খোঁচালো কথা সহ্য করতে পারে না। তবে এ সময়ে ঝগড়াও করল না সে। সে চুপচাপ চলে এল নিজের ঘরে।

লাবু ঘুম থেকে উঠে কেমন পাথরের মতো বসে আছে। অস্বাভাবিক একটা স্থিরতা। চোখ দুটোর

পলক পড়ছে না। দাঁত দিয়ে খুব জোরে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে রেখেছে। চোখের দৃষ্টি খানিকটা শূন্যতায় ভরা। কিছু দেখছে না।

বিলু তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে লাবুকে কোলে টেনে নিয়ে বলে. কী হয়েছে লাবু, শরীর খারাপ নয়তো!

লাবু অবাক হয়ে মাকে একটু দেখল। তারপর হঠাৎ শরীরে ঢেউ দিল তার। ঠোঁট কেঁপে উঠল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে হিক্কা তুলে সে বলল, বাবার জন্য ভীষণ মন কেমন করছে মা।

॥ তিয়াত্তর ॥

এক-একটা সর্বনাশের সময় আসে যখন সবকিছুকেই মনে হয় ভস্মাবশেষ ছাই। দীপনাথের কাছে তেমনি চারদিকটা ছাইরঙা হয়ে গেল।

বিলু প্রীতমের কথা শেষ করে মুখ নিচু করে কাঁদছে বিছানায় বসে। প্রীতমেরই বিছানা। কলকাতায় শেষদিন পর্যন্ত সে এই বিছানায় শুয়ে গেছে।

দীপনাথের কান্না আসছিল না। তার ভিতরটা বড় বেশি শুকনো, অনুভূতিহীন। তার চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা তার জিনিসপত্র সমেত ছাই হয়ে গেছে। পৃথিবীর আর কোনও বর্ণ নেই, অর্থ নেই।

বিলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, তুমি ওকে কত ভালবাসতে তা আমি জানি সেজদা। দুঃখ পাবে বলে শিলিগুড়ি থেকে ফিরে প্রথমে খবরটা দিইনি। কিন্তু আমি একা আর পারছি না। আজই শতমের চিঠি এল। এখনও কোনও খোঁজ নেই।

দীপনাথের আজ আবার দৃশ্যটা মনে পড়ে। বাচ্চা প্রীতম রোগাভোগা, নিরীহ, জীবনে কোনওদিন কারও কাছে মার খায়নি। সেই প্রীতমকে শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার রাস্তায় মারছে দীপনাথ। ভীষণ মারছে।

গলার কাছে একটা বাতাসের বল কিছুতেই গিলতে পারছে না দীপনাথ। অবরোধ ঠেলে অতি কষ্টে সে বলতে পারল, তুই চলে এলি কেন?

বিস্মিত বিলু বলে, বাঃ, আমার যে চাকরি।

তাই তো! ওঃ হ্যাঁ।—এইরকম অর্থহীন কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে দীপনাথ।

বিলু একটু ভয়ের গলায় বলে, তোমাকে কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে সেজদা! কী হল বলো তো তোমার? পায়ে পড়ি, ওরকম নার্ভাস হেয়ো না। তা হলে আমি দাঁড়াব কোথায়?

এটা হাসির সময় নয়। তবু দীপনাথ তার ঠোঁট রবারের মতো প্রসারিত করে বীভৎস একটু হাসবার চেষ্টা করল। বলল, ও কিছু নয়। এক গ্লাস জল দে।

বিলু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জল আনে।

দীপনাথ জলের গ্লাসটার অর্থহীনতার দিকে চেয়ে সেটাকে হাতে নিয়ে বসে থাকে। তারপর আপনমনে বলে, তোর মতো সাহসী ক'জন ছিল রে? তবে পালালি কেন?

এ কথা কাকে উদ্দেশ্য করে বলা তা জানে বিলু। তাই ফের ভয়ের গলায় বলে, তুমি ওরকম ভেঙে পোড়ো না সেজদা!

আবার রবারের ঠোঁট টেনে হাসে দীপনাথ। তারপর মাথা নেড়ে বলে, না। ভেঙে পড়ার কী আছে?

তবে ওরকম করছ কেন?

দীপনাথ গ্লাস থেকে জল হাতের কোষে ঢেলে নিয়ে নিজের চোখ কান ভিজিয়ে নেয়। কয়েক ঢোক খায়ও। তারপর আস্তে করে বলে, প্রীতম! ওঃ! প্রীতম!

হয়তো হঠাৎই কান্নার ঝড় আসত, ভেসে যেত দীপনাথ। কিন্তু হঠাৎ খুব রূঢ় এক ঝটকায় সে উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ?—আর্তস্বরে জিজ্ঞেস করে বিলু।

দার্জিলিং মেল।—প্রায় সাংকেতিক শব্দটা উচ্চারণ করেই সে ঘর থেকে বাইরের ঘরে চলে আসে।

পিছু পিছু বিলু এসে পথ আটকায়, পাগল হয়েছ! এখনই তো সাড়ে সাতটা বাজে। কখন দার্জিলিং মেল চলে গেছে।

তাই তো।—আবার সোফায় বসে পড়ে দীপনাথ, তোর কি মনে হয় প্রীতম বেঁচে নেই?

আমার বিশ্বাস ও কোথাও লুকিয়ে আছে গিয়ে।

কিন্তু কোথায়?

আমি তো শিলিগুড়ি বা নর্থ বেঙ্গলের সব চিনি না। কোথায় কোথায় ওর চেনা লোক আছে তাও জানি না। সেইজন্যই বলছি তুমি ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো। তুমি হয়তো ওকে খুঁজে বের করতে পারবে। রোগা শরীরে ও বেশিদুর যেতেই পারে না।

রোগা শরীর!—বলে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দীপনাথ। তারপর মাথা নেড়ে বলে, প্রীতমের যা মনের জোর তাতে রোগকে ও বহুদুর ছাড়িয়ে গেছে। রোগ ওকে রুখবে কী করে!

তবুও তো প্রীতম আর অতিমানুষ নয়।

তা নয়। কিন্তু আমি জানি ওই রোগটা খুব ভুল লোককে বেছে নিয়েছিল, যে লোক কখনও রোগের কাছে হার মানছে না। মরার দিন পর্যন্ত প্রীতম ঠিক হাসিমুখে বলে যাবে, ভাল আছি। খুব ভাল আছি।

বলতে বলতে প্রতিরোধ ভেঙে যাচ্ছিল। গলা কেঁপে উঠল দীপনাথের। ঠিক যেমন করে বমি আসে তেমনি অপ্রতিরোধ্য গতিতে কান্না উঠে আসছিল চোখে। দীপনাথ কয়েকবার ঢোক গিলল, হাতের মুঠো পাকিয়ে রইল শক্ত করে। কয়েকবার কেঁপে স্থির হল। বিপদের সময় স্থির থাকতে হয়।

দীপনাথের কথায় হঠাৎ প্রীতমের জন্য নতুন করে শোক উথাল-পাথাল হয়ে উঠল বুকে। বিলু সোফায় বসে কাঁদতে থাকে।

পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করে টিউটরের কাছে পড়ছিল লাবু। নিঃশব্দে দরজা খুলে পরদা সরিয়ে মুখে একটা আঙুল পুরে সে চেয়ে রইল। প্রীতমের মেয়ে। দীপনাথ কিছু না ভেবেই দু'হাত বাড়িয়ে দিল। ঠিক ছুটে এল না লাবু, কিন্তু একটু জড়তার সঙ্গে পায়ে পায়ে এল কাছে। একটু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কাছ ঘেঁষে। নিঃশব্দে তাকে জড়িয়ে ধরে থাকে দীপনাথ। এই ছোট মেয়েটার মধ্যে একটা বিদ্রোহ টের পাচ্ছিল।

বাবা আবার ফিরে আসবে লাবু। ভাবিস না।

লাবু কথা বলল না। শরীরের শক্ত ভাবটাও নরম হল না।

লাবু, বাবার কথা বুঝি সবসময় ভাবিস?

না, তোমরা কাঁদছিলে কেন?

কই আমি তো কাঁদিনি।

মা কাঁদছিল কেন?

এমনি। ব্যথা-ট্যাথা পেয়েছে বোধহয়।

লাবু ফের চুপ করে যায়।

তোর টিউটর চলে গেছে?

না। আমি বাথরুমে যাব বলে এসেছি।

তা হলে যাও। বাথরুম সেরে পড়তে চলে যাও।

লাবু তেমনি নিঃশব্দে গুটগুট করে চলে গেল।

ও কি বাবার কথা বলে রে বিলু?

বিলু লাল চোখ তুলে তাকাল। মুখে কথা এল না। মাথা নেড়ে জানাল, না। একটু সামলে নিয়ে বলল, মেয়েটা কেমন হয়ে গেছে। কথা বলে না, হাসে না। সবসময় শক্ত হয়ে থাকে। খুব ভাবে।

আমি কাল শিলিগুড়ি যাচ্ছি।—বলে দীপনাথ উঠে দাঁড়ায়।

আমি কী করব বলে যাও সেজদা।

তুই! তোর আর কী করার আছে?

বিলু আবার খানিকক্ষণ আঁচলে মুখ ঢেকে রেখে বলল, সবাই বোধহয় ভাবছে আমার জন্যই প্রীতম নিখোঁজ হল।

দীপনাথ আস্তে করে বলল, ওকে কলকাতায় আনার জন্য জোরাজোরি না করলেও পারতিস।

তুমিও কি ভাবো যে, প্রীতম সেজন্য পালিয়েছে?

অসম্ভব নয়। তবে ওর দেখা না পেলে তো সত্যি কথাটা কখনও জানা যাবে না। তুই ভেঙে পড়িস না। মেয়েটাকে দেখিস।

রুদ্ধ স্বরে বিলু বলে, ওকে নিয়েই তো আছি। এখন ওই আমার সব।

দীপনাথ বেরিয়ে পড়ে। বড় শূন্য লাগে আজ। চারদিক ছাইবর্ণ। প্রীতমের জন্য এতটা হবে বলে ভাবেনি কখনও। বলতে কী, প্রীতমের মৃত্যুর জন্য মনে মনে প্রস্তুতও ছিল সে একসময়। প্রীতম বেঁচে নেই। এমন কথা এখনও বলা যায় না। তবু বুকটা ধক ধক করে। বেঁচে থাকলে প্রীতম অন্তত তাকেও কি জানাত না যে, সে বেঁচে আছে!

মেসে ফিরে দেখল সুখেন বসে আছে তার জন্য। মুখটা কিছু করুণ, শুকনো। তাকে দেখে একটু চমকে উঠে বলে, কোনও খারাপ খবর নাকি দাদা?

দীপনাথ মাথা নাড়ল, খারাপ। খুব খারাপ।

কী হয়েছে?

জুতো মোজা ছাড়তে ছাড়তে সংক্ষেপে প্রীতমের ঘটনাটা বলল দীপনাথ। সুখেন মন দিয়ে শোনে। শুনতে শুনতে দুঃখের ভাব ফুটে ওঠে মুখে।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে দীপনাথ যখন নিজের বিছানায় চিতপাত হয়ে শোয় তখন সুখেন খুব সন্তর্পণে বলে, আমার একটা কথা ছিল।

কী কথা?

বীথি বহুদিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

বীথি?—বলে বিরক্তির ভাব দেখায় দীপনাথ, কেন?

ওর বাসায় একবার পায়ের ধুলো...

সুখেন!—বলে একটা ধমক দেয় দীপনাথ।

সুখেন কুঁকড়ে যায়। রুমমেট ছাত্রটি পরীক্ষার পর চলে গেছে। সিটটায় নতুন বোর্ডার আসেনি এখনও। তবে কাল বা পরশুই আসবে। তাই বাঁচোয়া।

সুখেন মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলে, অন্য কিছু নয়। কেবল একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া।

আমার মন ভাল নেই।

জানি। কিন্তু সেজন্য ঘরে বসে থেকেই বা কী হবে? বীথি আমাকে বলে দিয়েছে, আপনাকে আজই ধরে নিয়ে যেতে। ওর ছেলে আজ থাকছে না। আমরা তিনজন।

না সুখেন।—একটু দুর্বল গলায় বলে দীপনাথ। কিন্তু এক শূন্যতাবোধ, নিরবলম্ব সময়ের এই ফাঁকটুকু তার একাও থাকতে ইচ্ছে করে না। প্রীতমের খবর বুকে পাথর হয়ে জমে আছে। আজ

সারা রাত ঘুম হবে না। দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত হয়ে থাকবে সে। তাই বীথির নিমন্ত্রণ এক জটিল মানসিকতার ধাঁধার ভিতর দিয়ে তাকে টানে। বস্তুত বীথির কাছে কিছু পাওয়ার নেই তার। তাই বোধহয় যেতে ইচ্ছে করে। সেখানে শোক নেই। যা আছে তা তাৎক্ষণিক। দাগ কাটবে না।

সুখেন আরও মিনিট পাঁচেক ঘ্যান ঘ্যান করার পর দীপনাথ ওঠে। খুব বিরক্তি আর অনিচ্ছার ভাব দেখিয়েই ওঠে। এবং পোশাক পরে।

বেরোবার সময় সুখেন বলে, আজ রাতে আমরা না-ও ফিরতে পারি।

কথাটা শুনেও শুনল না দীপনাথ। গা তবু শিউরে উঠল একটু। টানা রিকশায় বসে সারা রাস্তাটা সে একটাও কথা বলল না।

বহুদিন পর বীথির সঙ্গে মুখোমুখি। যেমনি সুন্দরী, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে মেশানো নষ্টামি। দু'হাত বাড়িয়ে বলল, আজ যে কোনদিকে সূর্য উঠেছে!

দীপনাথ উদাস মুখে একটু হাসল।

আজ বৈঠকখানার সাজসজ্জা অন্যরকম। চমৎকার একগুচ্ছ ধূপকাঠি জ্বলছে। টাটকা রজনীগন্ধার গন্ধ। বীথির রান্নার লোকও আজ হাজির। দুর্দান্ত মাংসের গন্ধে পাড়া মাত। খুব আস্তে করে চালানো রেকর্ড-প্লেয়ারে সময়োচিত "এসো এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে..." বেজে যেতে থাকল। রবীন্দ্রনাথ সকলের জন্য লিখেছেন, তা জানে দীপনাথ, তা বলে বীথির ঘরে তার এই আগমনের জন্যও কি রবীন্দ্রনাথের কলম ধরার দরকার ছিল?

আগে চা। কেমন?—বলে বীথি উড়ে গেল ঘর থেকে ঠিক প্রজাপতির মতোই। শাড়িখানা দু'রকম ছাপা এবং খুবই নতুন ধরনের। বীথিকে মানিয়েছে এবং বয়সটাকে বছর দশেক কমিয়ে ফেলেছে।

সুখেন বীথির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে গিয়েছিল। কিছু বলে থাকবে। চায়ের ট্রে নিয়ে বীথি যখন ফের ঘরে ঢুকল তখন তার মুখে করুণা। বলল, আহা রে! আমার ধারণা আপনার ভগ্নিপতি কোথাও গিয়ে পালিয়ে আছে।

দীপনাথ এ কথায় কোনও রা কাড়ল না।

বীথি বলল, অত মন খারাপ করবেন না তো। আপনার ওই ভগ্নিপতির কথা সুখেন আমাকে বলেছে। ও মানুষ সহজে মরবার নন।

দীপনাথ এ কথাটা বিশ্বাস করে। তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বীথি চা বানিয়ে কাপ হাতে তুলে দিয়ে মৃদু স্বরে বলল, আগে জানলে আজ আপনাকে কষ্ট দিতে টেনে আনতাম না।

দীপনাথ বলল, আজ বোধহয় আমার একটু অন্যমনস্ক হওয়ারও দরকার ছিল।

সত্যি বলছেন?

সত্যিই।

কী যে ক'দিন ছটফট করেছি আপনার জন্য। কেবলই মনে হত, আপনি আর আসবেন না। ভীষণ রাগ করেছেন।

দীপনাথ মুখ নিচু করে চায়ে চুমুক দেয়।

বীথি আস্তে একটা হাত বাড়িয়ে দীপনাথের কপাল থেকে একটা চুলের গুছি সরিয়ে দিয়ে বলে, শরীরের দিকে একদম নজর দিচ্ছেন না।

দীপনাথের কাপের চা একটু চলকে যায়। সে চোখ বোজে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে বন্য জেদি একরোখা কিশোরীপ্রতিম মণিদীপা এসে দাঁড়ায়।

চোখ খুলে দীপনাথ বলে, খুব খাটুনি যাচ্ছে।

জানি। আপনি এখন বড় চাকরি করেন। আরও বড় চাকরিতে জয়েন করতে যাচ্ছেন।

সবই জানেন তা হলে!

বীথি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এও জানি এরপর বীথির ঘরে আর কখনও পায়ের ধুলো পড়বে না আপনার।

দীপনাথ এই ঘনিষ্ঠতাটা উপভোগ করছিল এবং সেজন্য অবাকও হচ্ছিল কম নয়। সে বলল, কেন ডেকেছেন বলুন তো?

ও মা!—বীথি চোখ কপালে তুলে বলে, সেসবও কি খুলে বলতে হবে নাকি?

দীপনাথ একটু রূঢ় স্বরে বলে, কেন?

আপনার মেজাজ আজ ভাল নেই। আমি কিন্তু একেবারে হৃদয়হীনা নই। কোনও কোনও মানুষকে আমি সত্যিই ভালবেসে ফেলি। আপনি বিশ্বাস করবেন না, তবু বলছি, কথাটা সত্যি।

দীপনাথ জানে, সে এক ভিখিরি। বহুকাল ধরে তাকে কেউ সত্যিকারের ভালবাসেনি। বীথির কাছেও সেই ভালবাসা নেই। তবু ভান তো আছে। তাৎক্ষণিক? পুরো জীবনটাই তো আপেক্ষিকভাবে তাই।

বীথির ঘরেই খুব ভোরে ঘুম ভাঙল দীপনাথের। জাগা মাত্রই শঙ্খধ্বনির মতো বুকে ঢাক বেজে উঠল—প্রীতম।

আর কোনওদিকে তাকাল না দীপনাথ। ছেড়ে রাখা পোশাক পরে নিয়ে তড়িৎ পায়ে নেমে এল নীচে। তারপর মেসবাড়ি। দাড়ি কামানো, স্নান।

সাড়ে ন'টায় সে বোস সাহেবের চেম্বারে ঢুকল।

আজই আমাকে শিলিগুড়ি যেতে হচ্ছে বোস সাহেব।

বোস একটু অবাক হয়। তারপর হেসে বলে, আপনি তো আমাদের ছেড়ে চলেই যাচ্ছেন। আবার এই উটকো ছুটি কেন?

ব্যক্তিগত জরুরি দরকার।

খারাপ কিছু?

খুব।

দেন মেক ইট অ্যান অফিসিয়াল ট্যুর।

তা হয় না।

হয়। নর্থ বেঙ্গলে আমাদের একটু কাজও আছে। কবে যাচ্ছেন?

আজকের ফ্লাইটে। আমি ব্যাগ গুছিয়ে এনেছি।

অফিসের গাড়ি নিয়ে চলে যান। মেক ইট অফিসিয়াল। নর্থ বেঙ্গলে আমাদের কী কাজ আছে তা আপনি তো জানেনই।

সময় পাব কি না সেটাই প্রশ্ন।

টেক ইয়োর টাইম। ফিরে এসে বিল করবেন।

দীপনাথ হাসল। বলল, জানি বোস সাহেব।

ভ্রূ কুঁচকেও বোস হাসল। সত্যিই তো। এই অফিসের দু'নম্বর লোকটা কি এসব প্রিলিমিনারিজ জানে না!

বোস বলল, চার্জটা কাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন?

যাকে বলবেন।

বোস একটু ভেবে বলে, থাকগে। আপনার অত সময়ও হবে না। আমি দেখে নেব।

পারবেন?

পারব। আই ফিল বেটার।

তা হলে যাই?

আসুন।

ঘণ্টা চারেক বাদে দীপনাথ শীততাপনিয়ন্ত্রিত সুগন্ধী বোয়িং-এর অভ্যন্তরে বসে গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজল। ভিতরটা কতখানি শূন্য তা টের পেল এতক্ষণে।

॥ চুয়াত্তর ॥

প্রীতমের বাবা-মা আরও বুড়ো হয়ে গেছেন। ভাইবোনদের চেহারা শ্রীহীন। বাড়িটায় জমাট বেঁধে আছে এক শোকের শূন্যতা।

দীপনাথকে যা বলবার তা বলল শতম, দাদা নিখোঁজ হওয়ার পর প্রায় একমাস কেটে গেছে। আমরা সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজেছি। এখন আপনিই বলুন আর কী করা যায়?

দীপনাথের মন এখন স্থির হয়েছে। মাথা ঠান্ডা। সে ধীর গলায় বলল, অসুখে প্রীতম বাঁধা পড়েনি। রোগা শরীরেও ও বহুদূর চলে যেতে পারে। কিন্তু বাধা হবে টাকা-পয়সা। কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকতে হলে টাকা চাই। প্রীতম কত টাকা সঙ্গে নিয়ে গেছে জানিস?

না। ওর কাছে কত টাকা ছিল তা জানি না।

দীপনাথ মাথা নাড়ল, জানলে ভাল হত। তবে আমার মনে হয় লুকিয়ে থাকলে একদিন না একদিন হাতের টাকা ফুরোবে। তখন ঠিক খবর দেবে।

কোথায় দাদা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

কোনও চেনা লোকের কাছে নয়। ওর এই রোগা শরীরে কোনও লোকই ওকে লুকিয়ে রাখবে না। চেনা লোক হলে খবর দেবেই।

আমাদের কি আর কিছু করার নেই দীপুদা?

দীপনাথ মৃদু একটু হেসে বলে, তোর তো ঠাকুরের ওপর অগাধ বিশ্বাস। তুই কেন তবে ভেঙে পড়ছিস? বিশ্বাসের জোর নেই?

এ কথায় হঠাৎ কেমন হয়ে গেল শতম। মুখের অসহায় ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে গেল। চোয়াল শক্ত হল। কপালে কিছু কুঞ্চন দেখা গেল। চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধক করে। একটা বড় মাপের শ্বাস ফেলে বলল, মাঝে মাঝে একটু ভেঙে পড়ি ঠিকই। কিন্তু ভেবো না। আমার মন বলছে, দাদার কিছু হবে না।

দীপনাথ এরকম সরল বিশ্বাস আজকাল কারও মধ্যে দেখে না। তার নিজের কোনও বিশ্বাসের জমি নেই। শতমের এই রূপান্তর দেখে সে বুঝি একটু খুশি হল। বলল. আমি একবার বীনাগুড়ি চা বাগানে যাব।. সেখানে আমাদের এক পুরনো বন্ধু আছে। দেখি যদি তার কাছে গিয়ে থাকে।

শতম গম্ভীর স্বরে বলল, দেখুন গিয়ে।

বীনাগুড়ি বেশিদূর নয়। পরদিন দুপুরেই সেখানে পৌঁছে গেল দীপনাথ।

শুভব্রত তাকে দেখে খুব অবাক হল না। বলল, আয়। প্রীতমের খোঁজে তুই যে আসবি তা প্রীতমই বলেছিল। আমার কথা কেউ না জানলেও তুই জানিস।

প্রীতম কোথায়?

তা কে জানে! মাসখানেক আগে দু'জন রাস্তার লোক ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়। দিন চারেক ছিল। আমি ওর বাড়ি খবর পাঠাব বলে ঠিক করলাম। পরদিন সকালেই হাওয়া। অনেক খুঁজেও পাইনি। আর পাইনি বলে খবরও পাঠাইনি। কী জানি ওরা হয়তো আমাকে ভুল বুঝবে।

যে চারদিন তোর কাছে ছিল সেই কয়দিন কী করত?

কিছুই না। বারান্দায় বসে থাকত। আমার বউয়ের সঙ্গে গল্প করত।

তোর বউকে ডাক।

শুভব্রতর বউ এল। মিষ্টি দেখতে। দীপনাথের জেরার মুখে পড়ে বলল, কোথায় যেতে পারে কিছু আন্দাজ করতে পারছি না। তবে কলকাতায় যাবে না নিশ্চয়ই। কলকাতার ওপর খুব রাগ।

এখানে থাকার সময় ওর শরীর কেমন ছিল?

যা রোগা! আমি তো ভয়ই পেতাম।

হাঁটাচলা করত?

করত। শরীরে কুলোত না, তবু মনের জোরেই বোধহয় খুব স্বাভাবিক চলাফেরার চেষ্টা করত।

কী নিয়ে কথা বলত?

ধর্ম নিয়ে। সব সময় কেবল ধ্যানের কথা বলত। গীতার অনেক শ্লোক ব্যাখ্যা করত। বেশ লাগত শুনতে। ক'দিন ওর সঙ্গ পেয়ে আমারও একটু ধর্মভাব এসে গিয়েছিল।—বলে শুভব্রতর বউ একটু হাসল। তারপর হঠাৎ খুব নিশ্চিন্তের মতো গলায় বলল, ওরকম মানুষের কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না আমার।

দীপনাথ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, ক্ষতি ওদেরই সবচেয়ে বেশি হয়। ও কখনও ওর বউ আর বাচ্চার কথা বলত না?

নিজে থেকে নয়। তবে আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে একটু-আধটু বলত।

দীপনাথের আর কিছু করার ছিল না। অসহায়তায় তার সমস্ত শরীর অবশ। একটা রাত সে শুভব্রতর কাছে থেকে পরদিন কুচবিহার রওনা হল। যদি দিলীপের কাছে গিয়ে থাকে। দিলীপ তাদের হারিয়ে যাওয়া এক বন্ধু। এইসব বন্ধুর কথা আর কেউ জানে না। হঠাৎ হঠাৎ বন্ধু হয়ে হারিয়ে গেছে কবে। দিলীপ ছবি আঁকত। কিন্তু যশ প্রতিষ্ঠা কিছুই পায়নি। পাগলা মতো। অনেকদিন যোগাযোগ নেই।

মড়াপোড়াদিঘির কাছে দিলীপের ডেরায় যখন পৌঁছোল দীপনাথ তখন বেলা বেশি হয়নি। দিলীপ বাড়িতে ছিল। ভারী রোগা হয়ে গেছে। চুলগুলো পেকে একশা। আর্টিস্ট হলেই মদ খেতে হয়, এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সেই স্কুলে থাকতেই মদ ধরেছিল। এখনও ধরে আছে। তবে শিল্প প্রায় ছেড়েই গেছে তাকে।

দিলীপ একটু সময় নিল চিনতে। তারপর বলল, ওঃ দীপু! তাই বল। না রে প্রীতম আসেনি। তবে আসবে বলে বহুকাল আগে একটা চিঠি দিয়েছিল।

কথাটা দীপনাথ বিশ্বাস করল না। কারণ, এতকাল বাদে দেখা হওয়া সত্ত্বেও দিলীপ তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছে না। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপনাথ ভারী ক্লান্ত। কাজেই কথার মারপ্যাচে গেল না। একটুক্ষণ চেয়ে রইল দিলীপের দিকে। তারপর বলল, তুই আজকাল কী করিস?

বাচ্চাদের ছবি আঁকা শেখাই। একটা স্কুল করেছি।

চলে সেটা?

চলে যায়।

এই বাড়িতে?

এই বাড়ি আর কোথায়! একখানা মোটে ঘর আমার।

বসতে বললি না?

বসবি?—খুব অনিচ্ছার সঙ্গে দিলীপ বলে, আয় তা হলে।

দিলীপ দরজা ছেড়ে ভিতরে সরে যাওয়ায় খুব হতাশ হল দীপনাথ। দরজা যখন ছেড়ে দিল তখন প্রীতম নেই। ঠিকই নেই।

প্রীতম ছিলও না। ঘরে এলোমেলো রঙের পাত্র, তুলি, ভাঙা গ্লাস আর কাপ, ক্যানভাস, ইজেল ছড়ানো। সরু চৌকিতে নোংরা বিছানা। একধারে জনতা স্টোভ, অ্যালুমিনিয়াম আর কলাই করা বাসন। দারিদ্র্যের গভীর ক্ষতচিহ্নগুলি চারদিকে ছড়ানো। একটা দেশি মদের বোতলের মুখে একটা রক্তজবা গুঁজে রেখেছে দিলীপ। বোধহয় প্রতীক।

কোমরে হাত রেখে আশাহীন চোখে চারদিকে চেয়ে দেখে দীপনাথ। প্রীতম এলেও এখানে বেশিদিন থাকতে পারত না। এই পরিবেশ সহ্য করার সাধ্য প্রীতমের নেই।

ভদ্রতাবশে খানিকক্ষণ বসে উঠে পড়ে দীপনাথ। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিঁড়ে গেছে কবে। এখন দেখা হলে কথা আসে না। কোনও আবেগ বোধ করে না।

দীপনাথ দুপুরে একটা বাস ধরে সন্ধেবেলা শিলিগুড়ি ফিরে এল। প্রীতমের বাড়িতে গেল না। পিসির বাড়িতে ফিরে একটু খেয়ে সন্ধে থেকে ভোর অবধি ঘুমোল। পরদিন একটা জিপ ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ল অফিসের কাজে। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি গ্যাংটক ছুটে বেড়াল দিন দুই। কিন্তু সারাক্ষণ মনটা 'প্রীতম প্রীতম' করে যায়। একবারও একটুক্ষণের জন্যও ভুলতে পারে না।

রওনা হওয়ার দিন সকালে প্রীতমের বাড়িতে একবার গেল দীপনাথ। বিমর্ষ মুখ। হতাশায় মনটা বড় ভারী।

শতম দরজা খুলে চুপ করে রইল।

দীপনাথ বলল, আজকের ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি। কোনও খবর পেলে জানাস।

শতম মাথা নাড়ল। জানাবে।

শতমের মুখ-চোখে বিমর্ষতা ভেদ করে একটা দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছিল। স্নায়ু খুব টান টান। সজাগ।

দীপনাথ বলল বীনাগুড়িতে শুভব্রতর বাড়িতে কয়েকদিন ছিল, জানিস?

শুনে চমকে ওঠে শতম, সত্যি?

সত্যি। শুভব্রতর বউ বলল, খুব নাকি ধর্মের কথা বলত।

বলত?—শতমের মুখে ভোরের মতো স্নিগ্ধ প্রসন্নতা।

সেখান থেকে কোথায় গেল?

মাথা নাড়ে দীপনাথ, জানি না। তবে পুলিশকে খবরটা দিলে ওরা হয়তো ট্রেস করতে পারে।

পুলিশ!—শতম বিরক্ত হয়ে বলে, ওরা কিছু করবে না। ওদের অনেক পলিটিক্যাল ঝামেলা সামলাতে হচ্ছে। দাদা তো আমার দাদা, সরকারের কে?

শুভব্রতর ঠিকানাটা সোজা। বীনাগুড়িতে গিয়ে শুভব্রত মজুমদারের নাম বললেই হবে। পারলে তুই একবার যাস।

আজই যাব।

দীপনাথ দুপুরে বাগডোগরা থেকে প্লেন ধরল। বড় শূন্যতা বুক জুড়ে। প্রীতম নেই। পুরনো চাকরি ছেড়ে নতুন কোম্পানিতে চলে যাচ্ছে সে। জীবন থেকে অনেক কিছুই কি হারিয়ে যাচ্ছে না? প্রীতম, মণিদীপা, বোস সাহেব!

প্লেন যখন উড়ছিল তখন উত্তরের মহামহিম পর্বতমালার দিকে নিস্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে ছিল দীপনাথ। পাহাড় অবিরল তাকে ডাকে। আয় আয় আয় আয়। যাওয়া হয় না যে!

যখন চাকরি ছিল না দীপনাথের, তখন বোস সাহেবের ফাই-ফরমাশ খেটে চাকরি রাখতে হয়েছে। কিন্তু আজকাল এ-বেলা ও-বেলা চাকরির টোপ ফেলে বিভিন্ন কোম্পানি। সে কলকাতায় ফেরার পরদিনই অফিসে টেলিফোন এল।

চ্যাটার্জি? আমি সান-ফ্লাওয়ার এজেন্সির মিত্র বলছি।

আরে বলুন, কী খবর?

অনেকদিন খবর নেন না। কেমন চলছে?

ওই একরকম।

শুনুন, একটু কথা আছে। জরুরি।

ফোনে বলা যাবে?

না। ছুটির পর ক্যালকাটা ক্লাবে চলে আসুন। আই উইল বি দেয়ার।

দীপনাথ জানে কী কথা। আরও ভাল অফার। আরও বেশি দায়-দায়িত্ব। তার বড় ক্লান্তি লাগে।

তবে মিত্র ভারী খুশি হল দীপনাথকে পেয়ে। ডিনারের পর গাড়িতে পৌঁছে দিল এসপ্ল্যানেড অবধি। গাড়িতেই কথা হয়।

আমাদের কোম্পানি ইন্টারন্যাশনাল, জানেনই তো।

জানি। সব কোম্পানিকেই জানি।—দীপনাথ ক্লান্ত গলায় বলে।

রজার্স আপনাকে যা দিতে চায় আমরা তাই দেব।

কিন্তু রজার্স আগে কনট্যাক্ট করেছে।

কথাটা আমি শেষ করিনি চ্যাটার্জি। রজার্স যা আপনাকে দিতে পারে না তা হল ছ'মাস নিউইয়র্কে পোস্টিং।

নিউইয়র্ক!—দীপনাথ সত্যিই চমকায়।

নিউইয়র্ক। ফর এ নমিনাল ট্রেনিং। অবশ্য তার জন্য একটা বন্ডও সই করতে হবে। তিনবছর কোম্পানিকে সার্ভ করবেন। রাজি?

রজার্সের খবর আপনাকে কে দিল?

মিত্র হাসে, খবর পাওয়া যায়। কিন্তু কথাটা হল, সান-ফ্লাওয়ার আপনাকে চায়।

ভেবে দেখি।

দেখুন। আমরা একমাস অপেক্ষা করব।

মিস্টার মিত্র, আমি খুব টায়ার্ড ফিল করি আজকাল। আমার মন ভাল নেই। পার্সোনাল কিছু ঘটনার জন্য। গিভ মি সাম মোর টাইম।

মিত্র খুবই ভদ্রলোক। তবু হঠাৎ বলে ফেলল, দ্যাট অ্যাফেয়ার উইথ মিসেস বোস?

আবার চমকায় দীপনাথ। কিন্তু কথা বলতে পারে না কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নেড়ে না জানায়।

মিত্র একটু লজ্জা পেয়ে বলে, সরি। কথাটা আনগার্ডেড মোমেন্টে বেরিয়ে গেছে। কিছু মনে করবে না। বাট দ্যাট ইজ দা টক অফ দি টাউন। অল বোগাস স্ক্যান্ডাল। যাকগে, ডিসিশন নিতে আপনার কত সময় লাগবে?

মে বি টুমরো, মে বি টু মানথ্স। আমার এক প্রিয়জন নিরুদ্দেশ। আমাকে খুঁজতে হবে।

ও বাবা! সে যে ইনডেফিনিট ব্যাপার। কে বলুন তো!

আমার ভগ্নিপতি। হি ওয়াজ ডেডলি সিক।

খবরেব কাগজে দিয়েছেন?

না তো!

সেইটেই সবার আগে দিন। অ্যান্ড মিসিং পার্সনস স্কোয়াড।

মাথায় খেলেনি তো কথাটা!

বাট ইউ হ্যাভ এ ফার্স্ট ক্লাস ব্রেন। ডোন্ট ওয়ারি। খবর পাবেন। বাট ডোন্ট মেক ইট অ্যান ইস্যু।

জয়েন করার ক'দিন পর আপনারা আমাকে আমেরিকায় পাঠাবেন?

ছ'মাসের মধ্যে। মে বি আর্লিয়ার।

দীপনাথ মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে একটু ভাবল। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে বলল, দি ডিসিশন ইজ মেড। আমি রাজি।

এসপ্ল্যানেডের মোড়ে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে মিত্র সত্যিকারের খুশির হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দীপনাথের হাত ধরল, ওয়াইজ ম্যান।

দীপনাথ ম্লান একটু হাসে। কথা বলে না।

মিত্র মৃদু স্বরে বলে, রজার্স আপনাকে দিয়ে অনেক নোংরা কাজ করাত। সান-ফ্লাওয়ার তা করাবে না। বিলিভ মি, ইউ হ্যাভ ডান দি রাইট থিং। কালই অ্যাপয়েন্টমেন্ট চলে যাবে আপনার ঠিকানায়। ঠিক আছে?

আছে।

বাই।

বাজারে কোনও কথাই গোপন থাকে না।

দিন তিনেক বাদে বোস সাহেব তার চেম্বারে ডাকে দীপনাথকে।

আমেরিকায় পাঠাচ্ছে সান-ফ্লাওয়ার?

দীপনাথ শুধু মাথা নাড়ে।

আপনার রেজিগনেশন নোটিশ পেয়েছি। পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন?

করব।

করে আমাকে বলবেন। যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় দেখব।

দীপনাথ একটু হাসে। পাসপোর্টের জন্য বোস সাহেবের সাহায্য তার বিশেষ দরকার নেই। তার নিজেরও চেনাজানা এতদিনে কিছু কম হয়নি। তবে সে কিছু বললও না।

বোস সাহেব গম্ভীর মুখে বলে, কাল দীপাকে খবরটা দিলাম।

কোন খবরটা?

আপনার খবর। দীপা খুব রিঅ্যাক্ট করল।

তাই নাকি?—গলাটা নিস্পৃহ রাখার চেষ্টা করে দীপনাথ।

ভীষণ। বলল, সবাই কেন আমেরিকায় যায় বলো তো!

একটু হাসে দীপনাথ। তাই তো! সবাই কেন আমেরিকায় যায়। কী আছে সেখানে?

বোস সাহেব বলে, আপনি চলে গেলে আই শ্যাল ফিল লোনলি। বাট দীপা উইল বি লোনলিয়ার।

প্রসঙ্গটা থাক বোস সাহেব।

বোস মাথা নাড়ে, না চ্যাটার্জি। কথাটা স্পষ্ট করে বলাই ভাল। আমি আপনাকে বলতে চাই, ইউ আর এ গ্রেট ম্যান। বি অলওয়েজ এ গ্রেট ম্যান।

দীপনাথ রাঙা হয়ে ওঠে। অস্ফুট গলায় বলতে চেষ্টা করে, আমি কেন গ্রেট হব বোস সাহেব?

রিয়েলি ইউ আর গ্রেট। বড় চাকরি অনেকেই করে, সেটা কথা নয়। আপনি একটা বড় চাকরি যে একদিন করবেন তা আমারও জানা ছিল। বাট দেয়ার ইজ সামথিং মোর ইন ইউ।

দীপনাথ মাথা নিচু করে থাকে।

বোস একতরফাই বলে, আপনি নাকি মাঝে মাঝে একটা পাহাড়ের কথা বলেন। দীপা বলছিল। আপনি বোধহয় একটা পাহাড়ে চলে যেতে চান, তাই না?

ও একটা চাইল্ডিশ ফ্যান্টাসি।

বোস মাথা নাড়ে, মে বি। মে বি নট। কে জানে? আমার তো মনে হয়, আপনি সত্যিই একদিন একটা মস্ত পাহাড়ে একা উঠে যাবেন। উই উইল রিমেন বিহাইন্ড উইথ আওয়ার লিটল পেট থিংস। আই উইশ ইউ ক্লাইম্ব দ্যাট হিল। ক্লাইম্ব ইট।

থ্যাংক ইউ।—বলে দীপনাথ উঠে পড়ে।

॥ পঁচাত্তর ॥

আকাশে অনেক ওপরে এক টুকরো অস্বাভাবিক মেঘকে দেখতে পেল শ্রীনাথ। মেঘটা গোল বলের মতো। রং লালচে। নীল আকাশ থেকে অনেকগুলো টুকরো মেঘের ভিতর থেকে এই অস্বাভাবিক গোল মেঘটা খুব দ্রুত বেগে নীচে নেমে আসছে।

খুব সঙ্গত কারণেই শ্রীনাথ বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। সে জানে এটা পৃথিবীর মেঘ নয়। এর জন্ম দূর মহাকাশে। আবহমান কাল ধরে মানুষের যত শত্রু পৃথিবীতে এসেছে এ তা থেকে আলাদা। খুব নিঃশব্দ যে মেঘ বা মেঘের ভ্রম নীচে আসছে তা আসলে একটা অতিকায় জলের ফোঁটা। ফোঁটা নয়, আসলে এক বিপুল জলের পিণ্ড। ঠিক আকাশের এক ফোঁটা অশ্রুর মতো দেখাচ্ছে।

দেখ-না-দেখ সেই জলপিণ্ড চলে এল কাছে! কী বিশাল তার ব্যাস! কী বিপুল তার আকার! স্তম্ভিত মূক হয়ে থাকতে হয় দৃশ্যটা দেখে। সর্বনাশ বটে, কিন্তু সেই সর্বনাশের বিশালতা দেখে কে না অতীত-ভবিষ্যৎ ভুলে যায়। বড় বিপদেরও এক প্রচণ্ড সম্মোহনশক্তি আছে।

জলের পিণ্ড এগিয়ে এল আরও কাছে। শ্রীনাথ ভেবেছিল খুব কাছেই কোথাও পড়বে। তা পড়ল না। যতক্ষণ ধরে শূন্য পেরোচ্ছিল ততক্ষণে আহ্নিক গতির বশে পৃথিবী একটু ঘুরে গেছে। তবু, খুব দূরে নয়, কাছেই কোথাও ঝম করে সেটা পড়ল। একটু কেঁপে উঠল কি পৃথিবী?

শ্রীনাথ চোখ বুজল। সমস্ত পৃথিবীকে ডুবিয়ে দেওয়ার পক্ষে ওই এক ফোঁটা জলই কি যথেষ্ট নয়? তবু চোখ খুলে সে দেখতে পায়, আকাশের সেই ঠিক একই জায়গায় আবার সেই একই রকম আর-এক ফোঁটা জল জন্ম নিল। নেমে আসতে লাগল।

ভাগ্যক্রমে শ্রীনাথ দাঁড়িয়ে আছে এক পাহাড়ের কোলে। দ্বিতীয় জলের ফোঁটা পৃথিবীতে পড়ার আগেই সে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যেতে লাগল ওপরের দিকে। পাহাড়চূড়ায় কয়েকটা খোড়ো ঘর, কিছু অসহায় মানুষ। শ্রীনাথ চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে ফিরে চেয়ে দেখল, এর মধ্যেই এত উঁচু পাহাড়টার অর্ধেকেরও বেশি জলের গ্রাসে চলে গেছে। আর-এক ফোঁটা জল পড়লে বাকি অর্ধেকও যাবে।

বাকি অর্ধেকও যাচ্ছিল। শ্রীনাথ চেয়ে থাকতে থাকতেই ঝম করে দ্বিতীয় জলপিণ্ডটাও নেমে আসে। অমনি নীচের জলরাশি বিপুল গর্জনে, ফেনায়িত অসম্ভব উঁচু ঢেউ তুলে ধেয়ে আসে ওপরের দিকে। নোংরা ঘোলা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ জলে ভাসছে মানুষের শব, ঘর, বাড়ি, তৈজসপত্র।

তবু শান্ত ধ্যানমগ্ন নীলিমায় ফের আর-এক ফোঁটা জল জন্ম নেয়। দেখে শ্রীনাথ। আর আতঙ্কে নীলবর্ণ হয়ে চেঁচাতে থাকে, কী হল? কী হচ্ছে অ্যাঁ!

ঠিক এই সময় তাকে ঠেলে তোলে সজল, বাবা! ও বাবা! কী হয়েছে?

ঘুম ভেঙে শ্রীনাথ উঠে বসে তড়াক করে। স্বপ্নের ঘোর এখনও কাটেনি।

বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে?— সে জিজ্ঞেস করে।

সজল অবাক হয়ে বলে, হচ্ছে তো। রাত থেকেই হচ্ছে। একটানা। তোমাকে বোবায় ধরেছিল বাবা?

শ্রীনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। কথা বলতে পারে না। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টির শব্দ। লক্ষণ ভাল নয়। বছর পাঁচেক আগে এ রকম সাংঘাতিক একটানা বৃষ্টির পর এ বাড়িতে কোমরসমান জল দাঁড়ায়। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে সপরিবারে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাকে। এই বৃষ্টিটাকে তাই শ্রীনাথ খুব সন্দেহ করে। স্বপ্নটাও জলেরই স্বপ্ন। কী হয় কে জানে!

শ্রীনাথ বলল, যা তো, উঠোনে কতটা জল জমেছে দেখে আয়।

সজল টর্চ হাতে উঠে দরজা খোলে, উঃ ব্বাস! খুব জল জমেছে গো বাবা। অনেক।

কতটা?— উদ্বেগে শ্রীনাথের গলা সরু হয়ে যায়।

দু'ফুট হবে।

দু'ফুট মানে অনেক জল। হাঁটুর ওপর হবে!— শ্রীনাথ উত্তেজিত গলায় বলল, তা হলে এখুনি আমাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া দরকার। ভিতরবাড়িতে ওরা কেউ কিছু টের পাচ্ছে না নাকি? তোর মাকে একটা খবর দে।

সজল বেশির ভাগ সময়েই শ্রীনাথের অকারণ উদ্বেগ দেখে হাসে। কিন্তু এখন হাসল না। বারান্দায় ফিরে গিয়ে উঠোনের জলে টর্চের আলো ফেলে সে দেখতে পেল স্রোত চলছে। স্রোতটা আসছে নদীর দিক থেকে। মাটির বাঁধটা যদি ভেঙে গিয়ে থাকে তবে ব্যাপারটা আর হাসিঠাট্টার নয়।

স্বপ্নটা এখনও শ্রীনাথকে তাড়া করছে। সে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে সজলের পাশে দাঁড়ায়।

ও বাবা! এ যে ভীষণ জল রে!

সজল বলে, তুমি অত ভেবো না তো বাবা।

তোর মাকে অনেক দিন আগেই আমি বলেছিলাম, দাদার ঘরের ওপর একটা দোতলা তুলতে। দোতলা হলে বানের জলে তেমন ভয় নেই।

এখন আর সে কথা বলে কী হবে?

জলটা বাড়ছে না? টর্চটা জ্বালা তো।

সজল টর্চ জ্বালল। জল বাড়ছে কি না বোঝা গেল না। তবে জল যে পাক খাচ্ছে, স্রোত চলছে তা বোঝা যাচ্ছিল।

ঘরের পিছন দিক থেকে বৃষ্টির শব্দের ভিতর দিয়েও একটা চেঁচামেচির শব্দ আসছিল। কান পেতে শব্দটা বোঝার চেষ্টা করছিল শ্রীনাথ। বলল, নিতাই চেঁচাচ্ছে না?

নিতাই বটে। একটু বাদে অন্ধকার ফুঁড়ে বৃষ্টি ভেদ করে দুই মূর্তি উঠে এল বারান্দায়। মাথায় পোঁটলা, হাঁড়ি, টিনের বাক্স।

নিতাই একগাল হেসে বলল, আগেই বুঝেছিলাম, এবারও খরা হবে। তাই সেই বোশেখ মাসে একটা বরুণ বাণ মেরে রেখেছিলাম। তাজ্জব কাণ্ড! সেই বাণে যে এতটা হবে তা বুঝতে পারিনি।

সজল টর্চটা ঘুরিয়ে নিতাইয়ের মুখে ফেলতেই নিতাই সামলে গেল। ঢোক গিলে বলল, ছোটকর্তা নাকি? হেঃ হেঃ, ভিজে একেবারে ঢোল হয়ে গেছি দেখুন।

গুল মারাটা বন্ধ করবে এবার থেকে?

নিতাই আবার ঢোক গিলল। বলতে নেই, কর্তামাকে সে ভয় খায় বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে ততটা গুড়গুড়ুনি ওঠে না। কিন্তু এই ছোকরার মুখোমুখি পড়লেই তার আজকাল পায়ের তলায় ভূমিকম্প হতে থাকে।

নিতাইয়ের বউ কথা বলছে না। ভেজা কাপড়ে বারান্দার এক ধারে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

শ্রীনাথের কষ্ট হল। জিজ্ঞেস করল, তোদের শুকনো জামাকাপড় নেই?

মেয়েটা মাথা নাড়ল, নেই।

ভেজা কাপড়ে এই হাওয়ায় বসে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে যে!

এ কথায় নিতাই আর তার বউ হেসে ফেলে। নিতাই বলে, বাবুর যেমন কথা! কোন দালানকোঠাওলা বাড়ির মেয়ে যে ঠান্ডা লাগবে! বরাবর বৃষ্টি হলেই ভিজেছে। ওসব সয়ে গেছে ওর।

তোর ঠান্ডা লাগে না?

সজল সামনে না থাকলে নিতাই এ কথায় হেসে উঠত। শোনো কথা! মহাযোগী নিতাই খ্যাপার নাকি ঠান্ডা লাগবে! কিন্তু সজল খোকা থাকায় নিতাই অতটায় গেল না। বিজ্ঞের মতো একটু হেসে বলল, আজ্ঞে, আমিও রোদে-জলে মানুষ। আপনি ভাববেন না।

কিন্তু শ্রীনাথ ভাবে। আগে পৃথিবীর সম্পর্কে খানিকটা উদাসীনতা ছিল তার। আজকাল সব কিছু নিয়ে উদ্বেগ। বলল, খুব বাহাদুর তোরা বুঝেছি। এখন ঘরে গিয়ে আলনায় দেখ, গোটা কয়েক জলে কাচা ধুতি আছে। পুরনোই। দু'জনে পরে নে। যা।

বউটা মৃদু স্বরে বলে, না বাবা, আপনার পরনের ধুতি পরতে পারব না। বড় পাপ হবে।

তোর মাথা হবে! গুরুজনদের কথা শুনতে হয়। যা।— শ্রীনাথ ধমক দেয়।

সজল টর্চের আলোটা নিতাইয়ের বউয়ের দিকে তাক করে বলল, যাও না ভৈরবীদি। বাবা বলছে যখন, যাও।

ভৈরবী ওর নাম নয়। কিন্তু নিতাইয়ের বউযের এ নামটাই চালু হয়ে গেছে। তান্ত্রিকের বউ বলেই বোধ হয়।

টর্চের আলোয় লজ্জা পেয়ে বউটি তার তেলে কাপড়ের ঘোমটার তলায় মুখ আড়াল করে বলে, আমার শীত লাগছে না।

নিতাই অবশ্য বাবুর দু'-দুটো ধুতি হাতানোর এই মওকাটা ছাড়তে চাইছিল না। বউয়ের দিকে চেয়ে বলল, বাবু হল ভগবানের মতো। তা ভগবানেব দেওয়া আলোটা বাতাসটা কলাটা মূলোটা নিলে আর দোষের কী? যাও কাপড়টা ছেড়ে ফেলো গিয়ে।

বউটা জেদি আছে। রাজি হল না। চক্ষুলজ্জায় নিতাইও গেল না।

টর্চ জ্বেলেই রেখেছে সজল। জল ইঞ্চিখানেক বেড়ে গেল দেখতে না দেখতেই।

নিতাই বলে, মাটির বাঁধটা গেছে। এই সেদিনও দেখি, পরাশর ঘর তুলবে বলে বাঁধ থেকে মাটি কাটিয়ে আনছে। পইপই করে বললুম, বাপু, তোমরা সবাই যদি বাঁধের মাটি চুরি করো তা হলে কিন্তু একদিন বিপদ আছে। এই নদীর চেহারা এমনিতে ভালমানুষের মতো কিন্তু খেপলে সমদ্দুরে।

ভিতরবাড়ির দিকে এতক্ষণে বাতি দেখা গেল। ইলেকট্রিক অনেকক্ষণ নেই। কয়েকটা হ্যারিকেন আর টর্চ ঘোরাফেরা করছে। দুটো ছাতা হাতে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে একটা গামছা মাথায় মংলু খপাৎ খপাৎ করে জল ভেঙে এসে বলল, মা বলছেন আপনারা সব ভিতরবাড়ির বড় ঘরটায় চলে আসুন। ওটার ভিত উঁচু আছে।

শ্রীনাথ হতাশ গলায় বলে, কত আর উঁচু? এই জলে যে সৃষ্টি ভেসে যাবে। এই হারে বাড়লে সকাল নাগাদ ঘরের চালে উঠেও রক্ষা পাওয়া যাবে না।

তবু যতটা পারা যায়। আমি আপনার ঘরেব কিছু জিনিসপত্র পাটাতনে তুলে রাখি গে। আয় রে নিতাই, একটু হাত লাগাবি।— বলে নিতাইকে নিয়ে মংলু ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সজল বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, চলো বাবা।

সজলের হাতটা অবশ্য ধরল না শ্রীনাথ কিন্তু জলে নেমে পড়ল। বলল, চল। দোতলাটা তুলে রাখলে আজ এই বিপদে কিছু হত না।

তৃষা তার ঘরের দাওয়ায় মস্ত টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে। পাশেই সরিৎ। তৃষার শাড়ি সপসপে ভেজা, চুল থেকে জল পড়ছে।

সজল জিজ্ঞেস করে, তুমি ভিজলে কী করে?

দুটো হাঁস বেরিয়ে গিয়েছিল। ধরে আনলাম।

ধরার লোক ছিল না?

কাকে ডাকব, কে শুনবে এই বৃষ্টিতে?— বলে তৃষা শ্রীনাথের দিকে চেয়ে বলে, বারান্দার ওই কোণে বালতিতে ভাল জল তোলা আছে। হাত-পা ধুয়ে ভাল করে জল মুছে বিছানায় গিয়ে বোসো। আমি চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি। মঞ্জু চা করে দেবে। সজলও যা।

শ্রীনাথ লক্ষ্মীছেলের মতো তাই করল। সজল শুধু ঠোঁট উলটে বলে, ঘরে বসে থাকার মানেই হয় না। আমি বরং আশপাশটা দেখে আসি, কে কী করছে।

তৃষা চাপা গলায় বলল, না। এই বৃষ্টিতে যাবে না। কাল সকালে সব খবর নিয়ো।

সজল তর্ক করল না। কিন্তু কোমরে হাত রেখে বারান্দায় বেপরোয়া এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

ভিতরে কেরোসিনের স্টোভে মঞ্জু চা করছে। বিছানায় পা তুলে বসল শ্রীনাথ। অল্প আলোতেও ঘরে মেলা ঘুরঘুরে পোকাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। বাইরে জল জমলেই এরা ঘরে ঢুকে পড়ে। বৃষ্টিটা কিছুতেই ধরছে না।

বাইরে বৃন্দাই বোধ হয় চেঁচিয়ে জানান দিল, পশ্চিমের ঘরে জল ঢুকছে।

তৃষা ঘরে আসে। তার মুখে কোনও উদ্বেগ নেই, তবে একটা কাঠিন্য আছে। ঘরের পাটাতনের সঙ্গে একটা কাঠের মই লাগানো। একটা বাক্স হাতে তৃষা তরতর করে পাটাতনে উঠে বাক্সটা রেখে নেমে এল আবার।

শ্রীনাথ বিরক্ত হয়ে বলে, কবেই তো তোমাকে বলেছিলাম, এবার দোতলাটা করো। এসব জায়গায় জল হবেই। রাতে আমি জল নিয়ে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি।

তৃষা তার বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, দোতলা? দোতলা দিয়ে কী হবে? আমরা তো এখানে চিরকাল থাকব না।

থাকব না! তা হলে কোথায় যাব?

তা জানি না। তবে এখানে নয়।

এখানে নয় কেন?

এ জায়গা আমার আর ভাল লাগছে না।

শ্রীনাথ খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার ভাল না লাগলেই হবে! আমরা কি সব তোমার হাতের পুতুল!

আমিও পুতুল। রাগ কোরো না। আমার মনে হয়, এখানে থাকলে আমাদের কারও ভাল হবে না।

সে তো এখন বলছ। কিন্তু এক সময়ে এখানে শেকড় গেড়ে বসার জন্য তুমিই জমিজমা কিনে গেছ অন্ধের মতো, দোকান দিয়েছ, ধানকল করেছ, সেগুলোর কী হবে?

শান্ত স্বরেই তৃষা বলে, আমিই যখন করেছি তখন সে দায়ভারও আমার। তুমি তো খবর রাখো না, ধানকল বেচে দিচ্ছি শিগগিরই। দোকানটার ভাল দাম পেলেই ছেড়ে দেব। জমিজমাও কিছু কিছু করে বিলি বন্দোবস্ত হচ্ছে।

শ্রীনাথ বিরক্ত হয়ে বলে, যা খুশি করো। আমার কী? আমার সম্পত্তি তো নয়।

তৃষা একটু হেসে বলল, না হলে কী হয়, খুব চিন্তায় তো পড়েছ দেখছি। অত চিন্তা কোরো না। লোকে আমার যত বদনামই করুক, কেউ অন্তত আমাকে বোকা ভাবে না।

শ্রীনাথ হঠাৎ বলল, কিন্তু আসলে তো তুমি বোকাই।

তাই নাকি?

বোকা নও? বোকা না হলে আজ তোমার সংসার এত সৃষ্টিছাড়া কেন? মেয়েমানুষের একটা সীমা আছে, গণ্ডি আছে। সেটা যে ডিঙিয়ে যায় সে নিশ্চয়ই বোকা।

তৃষার তর্ক আসে না। ঝগড়া করতে সে ভালবাসে না। উপরন্তু সে দেখতে পায়, সজল দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। চৌকাঠে ঠেসান, কোমরে হাত, চোখ দু'খানায় ঝলমলে কৌতুক। ওর পায়জামাটা উরু পর্যন্ত ভেজা, মাথার ঘন চুলে অজস্র ফোঁটা লেগে আছে।

তৃষা সজলের দিকে এক পলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, পায়জামাটা পালটে নাও। ঠান্ডা লাগবে।

আমার পায়জামা-টায়জামা সব পশ্চিমের ঘরে।

আমার একটা শাড়ি প্যাঁচ দিয়ে পরে থাকো। ওই আলনায় আছে।

সজল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমরা এ জায়গা ছেড়ে কোথায় যাব মা?

কোথাও যাব।
এ জায়গা আমি ছাড়ব না।
তোমার ইচ্ছেয় সব হবে নাকি?
এ জায়গায় যে আমরা সেট করে গেছি। অন্য কোথাও গেলে পুরনো বন্ধুদের কোথায় পাব?
নতুন বন্ধু হবে।
নতুন বন্ধু চাই না।
তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, না যেতে চাইলে তোমরা এখানেই থেকো।
তুমি থাকবে না?
না। আমি চলে যাব।
একা?
দরকার হলে একাই।
সজল হঠাৎ একটু হাসল, মেয়েরা একা থাকতে পারে নাকি? তোমার বাজার করে দেবে কে?
তৃষা ক্লান্ত মুখে ছেলের দিকে চেয়ে বলে, ওসব কথা এখন থাক। পায়জামাটা ছাড়বি কি না! ক'বার বলতে হবে?
আমি শাড়ি পরব না।
তা হলে মংলুকে বল, পশ্চিমের ঘর থেকে পায়জামা এনে দেবে।
আগে বলো তুমি কোথায় যাবে?
আমি তোদের সঙ্গে থাকব না। এখানেও থাকব না।
আমাদের কি তুমি দেখতে পারো না মা?
তৃষা এ কথার জবাব দিল না। খাটের তলা থেকে তোরঙ্গ টেনে বের করে ডালা খুলে জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগল।
সজল কিছুক্ষণ জবাবের জন্য অপেক্ষা করে বলল, বৃষ্টি কমে এসেছে। কেন খামোখা জিনিসগুলো ওপরে তুলছ?
বাস্তবিকই বাইরে বৃষ্টির ঝমাঝম শব্দ স্তিমিত রিমঝিম হয়ে বাজছে। কিন্তু তৃষা আপন মনে তার কাজ করে যেতেই লাগল।
মঞ্জু বাবাকে চা দিয়ে মায়ের কাপটা পাশে মেঝেয় রেখে বলল, মা, তোমার চা।
ভারী অস্বস্তি বোধ করছিল তৃষা। চায়ের কাপ তার অবলম্বন হল একটা। মেঝেয় বসে চায়ে চুমুক দিয়ে ছেলের দিকে চেয়ে বলল, বড়দের সব কথার মধ্যে থাকো কেন?
বড়দের কথা আবার কী? এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা বলছিলে, কানে এল, তাই বললাম।
তৃষা ভারী হতাশ ও বিষণ্ণ মুখে বসে থাকে। এই সংসার ছেড়ে তার কি সত্যিই যাওয়ার সময় হল?

॥ ছিয়াত্তর ॥

অন্ধকারে জল ভেঙে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় কিছু লোক এসে জড়ো হয়েছে এ বাড়ির উঠোনে। মংলু তাদের পুবের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়ে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন বলল, এ বৃষ্টির জল নয় গো। বেনোজল। স্রোতটা দেখ।
মৃতপ্রায় নদীটার বুকে পলিমাটি জমে এত উঁচু হয়েছে যে, ফি বর্ষাতেই জল উপচে আসে। এবারেও বৃষ্টিতে পুরনো মাটির বাঁধটা যে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। উঠোনের জল দাওয়া প্রায় গিলে ফেলেছে। কয়েক ইঞ্চি বাকি।

ঘরের মধ্যে উদ্বিগ্ন শ্রীনাথ বলে, অবস্থা তো ভাল দেখছি না। জিনিসপত্র এইবেলা পাটাতনে তোলো।

এতক্ষণ তাই করছিল তৃষা। কিন্তু এখন হঠাৎ তার মুখ পার্থিব বিষয় সম্পর্কে খুব নিরাসক্ত হয়ে গেছে। জানালার পাটায় বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে চুপচাপ।

শ্রীনাথ জানে, সজলের সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক ভাল নয়। তাতে এক সময়ে সে বেশ খুশিই বোধ করত। কিন্তু আজ অস্বস্তি হয় তার। চারদিকে এই জলের বিপদ, আর ঘরের মধ্যে মা-ছেলের মধ্যে থমথমে ভাব।

শ্রীনাথ একবার রাগের চোখে দরজায় দাঁড়ানো ছেলের দিকে চেয়ে বলে, তোর পায়জামাটা বদলাতে কী হয়? বড় ব্যাদড়া বাঁদর তৈরি হচ্ছিস তো! যা ছেড়ে ফেল গিয়ে।

শাড়ি পরব?

বিপদের দিনে অত বাছাবাছি কী? এটা কি বাবুয়ানির সময়? যা শিগগির।

সজল মা'র কথা শোনেনি, কিন্তু বাবার কথা শুনল। হয়তো ইচ্ছে করেই। পাটাতনের সিঁড়ির নীচে আলো গিয়ে পৌঁছোয়নি ভাল করে। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে একটা সাদা খোলের শাড়ি জড়াল কোমরে।

শ্রীনাথ বলল, জামাটাও ভিজেছে, ছেড়ে ফেল। মাথা মোছ।

সজল সবই ধীরেসুস্থে করে এবং তার মধ্যেই মায়ের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে। মুখ টিপে মাঝে মাঝে একটু হাসেও বোধ হয়।

তারপর লক্ষ্মীছেলের মতো সে শ্রীনাথের পাশটিতে এসে বসে।

এ সব মুখ না ঘুরিয়েও টের পায় তৃষা। তার সমস্ত অনুভূতি সজাগ। সে লক্ষ রাখছে। স্বপ্না আর মঞ্জুও বাপের পিছন দিকে বিছানায় শুয়ে মৃদু স্বরে কথা বলছে। বৃন্দা কেরোসিন ভরছে স্টোভে। বাড়ির কাজের লোকেরা ভিজে স্যাঁতা, তাদের জন্য চা হবে।

সরিৎ ঘরে ছিল না। বারান্দা থেকে এইমাত্র ঘরে এসে বলল, মেজদি, দোকানে নিশ্চয়ই জল ঢুকেছে।

তৃষা তার কঠিন মুখখানা এবার ফেরায়, কে বলল?

কে বলবে? ভিতটা তো নিচু। গতকালই নতুন মাল এসেছে। সব পড়ে আছে মেঝেয়। তোলার সময় হয়নি।

তৃষা একটা শ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে বলল, থাকগে।

অবাক সরিৎ বলে, থাকবে মানে? অন্তত চার-পাঁচ হাজার টাকার জিনিস। জল ঢুকলে একদম বরবাদ। আমি বরং গিয়ে একটা ব্যবস্থা করে আসি। চাবিটা দাও।

তৃষা আঁচলের গেরো থেকে চাবির গোছাটা মেঝেয় ছুড়ে দিয়ে বলে, লোহার আলমারিতে আছে। নিয়ে যা।

মেজদির মেজাজ দেখে সরিৎ অবাক হলেও কিছু বলল না। আলমারি খুলে দোকানের চাবি নিয়ে তৃষার হাতে আবার চাবির গোছাটা ফেরত দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। বারান্দা থেকে বলল. মংলু আর নিতাইকে নিয়ে যাচ্ছি! অনেক মাল, তুলতে লোক লাগবে।

তৃষা এ কথারও জবাব দিল না।

ঘরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে উঠছে। ছেলেমেয়েরা অবশ্য অতটা খেয়াল করল না। স্বপ্না, মঞ্জু আর সজল কোথা থেকে একটা লুডো বের করে হ্যারিকেনের আলোয় খেলতে বসে গেল। অস্বস্তিটা শুধু টের পাচ্ছিল শ্রীনাথ। তৃষার কোনও বিস্ফোরণ নেই, চেঁচামেচি নেই, কিন্তু তার ঠান্ডা রাগ নানা পন্থায় শোধ নেয়। শোধ নিতে তৃষা কখনও ভুল করেনি।

খুব চিন্তিত উদ্বিগ্ন মুখে সে তাই সজলের দিকে একবার তাকায়। বড় অবাধ্য হয়েছে ছেলেটা।

একদিন ওর খাদ্যে পানীয়েও না অজানা বিষ এনে মেশায়। এত সাহস কি ওর ভাল?

একটু ভাবল শ্রীনাথ। তারপর নিঃশব্দে উঠে তৃষার কাছে জানালায় এসে দাঁড়াল। তৃষা একবার দেখল তাকে, তারপর উঠবার চেষ্টা করতেই শ্রীনাথ বলে, বোসো, বোসো। বলছিলাম কী, সজল নিতান্ত ছেলেমানুষ।

আমি তো সেটা জানি।— তৃষা অবাক হয়ে বলে।

শ্রীনাথ তৃষার মুখের কঠিন আস্তরণটা লক্ষ করে এই আবছা আলোতেও। মনে মনে প্রমাদ গুনে গলাটা পরিষ্কার করে নিতে বার দুই গলা খাঁকারি দেয়। তারপর বলে, ওর ওপর রাগ পুষে রেখো না। এই বয়সটা বাঁধ ভাঙারই বয়স' আমি জানি, ও তোমাকে খুব ভালবাসে।

তৃষা জবাব দিল না। শ্রীনাথ জবাবের আশায় একটু সময় ফাঁক দিয়ে বলল, আর মায়ের শাসনকে একটা বয়সের পর ছেলেপুলেরা বড় একটা মানতে চায় না। আমরাই তো দেখো না, দশ-বারো বছর বয়স থেকে মাকে আর ভয়-টয় পেতাম না। মায়ের সঙ্গে ছেলেপুলেদেব সম্পর্কটাই ওরকম যে!

বলে শ্রীনাথ একটু মনভোলানো হাসি হাসল।

তৃষা চুপ করে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

শ্রীনাথ ভরসা দিল তাকে, তুমি ভেবো না। আমি ওকে শাসন করে দেব। আব যেন কখনও তোমার অবাধ্য না হয়।

তৃষার মুখের কঠিন আস্তরণটা যেমন ছিল রয়েই গেল। চারদিকের প্রাকৃতিক বিপদের কথা আর খেয়াল রইল না শ্রীনাথের। তৃষার মুখের দিকে চেয়ে বুকটা গুড়গুড় করছিল তার।

বাইরে থেকে কে চেঁচিয়ে বলল, বড় ঘরে জল ঢুকছে গো!

ঝিরঝির করে আবার বৃষ্টি নেমেছে। বাইরে এসে শ্রীনাথ দেখে দাওয়ার কানায় কানায় জল। আর একচুল বাকি। কিন্তু দৃশ্যটা সে খুব নিস্পৃহভাবে দেখে। কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। মুখ ঘুরিয়ে সে ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখে, হ্যারিকেনের আলোয় তিন ভাই-বোন লুডো খেলছে। সজলের মুখ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে পিছন ফেরানো। তার চওড়া কাঁধ, চুলে ভর্তি মাথার একটা ছায়া-শরীরের দিকে চিন্তিত ভাবে চেয়ে থাকে শ্রীনাথ। চারদিকের অনেক বিপদেব মধ্যে এ ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখাই এক সমস্যা। ওকে কি বেঁচে থাকতে দেবে?

এক ঝলক জল এসে পা ভিজিয়ে দিয়ে গেল শ্রীনাথের।

বড় ঘবও ডুবছে তা হলে! ডুবুক, ডুবে যাক, ভেসে যাক। শ্রীনাথ তার কোমর থেকে বিড়ির বান্ডিল আর দেশলাই বের করে বিড়ি ধরিয়ে নেয়। বারান্দায়, ঘরে মেলা পোকামাকড় ঘুরঘুব করছে। টর্চের আলোয় সে চারদিকটা দেখার চেষ্টা করে। বেনো ঘোলা জল তোড়ে ঢুকছে বিশাল উঠোনে। ঝোপঝাড় সব জলের তলায়। পুবের ঘরে বারান্দায় যারা এসে উঠেছে তারাও এখন গোড়ালি-ডুব জলে দাঁড়িয়ে বেকুবের মতো চুপ করে আছে।

বৃষ্টি এখন তেড়ে পড়ছে। টিনের চালে জোর শব্দ। গুপুস করে একটা নারকোল জলে পড়ে ভেসে গেল। চৌকাঠ ডিঙিয়ে কয়েক কোষ জল ঢুকল ঘরে।

লুডো থেকে মুখ তুলে স্বপ্না ভয়ের গলায় ডাকল, মা!

তৃষা তেমনি জানালায় বসে। জবাব দিল না, তবে মুখ ঘুরিয়ে কঠিন চোখে তাকাল।

স্বপ্না দরজার দিকটা দেখিয়ে বলে, জল ঢুকছে।

তৃষা মৃদু স্বরে বলল, দেখেছি।

সজল লুডোর ঘুঁটি চুরি করল এই ফাঁকে। একটা কাঁচা ঘুঁটি আঙুল দিয়ে পাকা ঘরে চালিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্তের গলায় বলে, ঢুকছে তো ঢুকছে। সাঁতার জানিস না?

বেশি পাকামি করিস না তো ভাই। শুধু সাঁতার জানলেই বুঝি হবে? ঘরদোর ডুবে গেলে কোথায় থাকব আমরা?

ডুবতে দে না।

মঞ্জু চুরি ধরতে পেরে সজলের কান টেনে একটা থাপ্পড় মেরে বলল, খুব না! চোর কোথাকার! ডাকাত।

সজল হি হি করে হাসে।

তৃষা কূট চোখে দৃশ্যটা লক্ষ করে। ছেলেটা ভয় পায় না। ভয় কাকে বলে জানে না। কিন্তু তৃষা রাগ চেনে। সে জানে, সজলের এই সাহস কোনও ভাল কাজে লাগবে না।

ঘরে হিলহিল করে জল ঢুকে পড়ছে এবার। এ ঘরের ভিত অনেক উঁচু। তবু ঢুকছে। তার অর্থ, কোথাও বোধহয় আর ডাঙা জমি নেই।

পুবের ঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো পুরুষ, মেয়ে, বউ বাচ্চারা ঘরের চালে উঠবার আয়োজন করছে। পাঁচ-সাতজন উঠেও গেছে, বাকিদের টেনে তুলছে ঢালু টিনের ওপর। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে ওই পিছল ঢালু টিনের ওপর কতক্ষণ কাটাতে হবে কে জানে। লক্ষণ ভাল নয়।

চারদিকে টর্চ মেরে দেখছিল শ্রীনাথ।

ঘরে এসে সে দেখে, খাটের বিছানা গুটিয়ে তার ওপর কিছু বাক্স-প্যাঁটরা তুলছে বৃন্দা। জলে ভিজে মালি আর দুটো কাজের লোক ঘরে এসে গেল।

তৃষা জানালা থেকে জলের মেঝেয় পা রেখে দাঁড়াল। বিশেষ কাউকে নয়, কিন্তু সকলকে উদ্দেশ করেই বলল, তোমরা আস্তে আস্তে পাটাতনে উঠে যাও।

সজল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, এখনই কী! আগে ঘরে গলা জল হোক, তারপর দেখা যাবে।

স্বপ্না আর মঞ্জু সভয়ে কাঠের মই বেয়ে ওপরে ওঠে। তাদের আগে আগে বৃন্দা।

শ্রীনাথ ইতস্তত করে বলে, আর-একটু দেখি। তুমি বরং উঠে পড়ো।

তৃষা টেবিলল্যাম্প জ্বেলে শিষটা বাড়িয়ে চারদিক দেখল একটু। তারপর বলল, পাটাতনে বিছানা পাতা আছে, খাওয়ার জল রাখা আছে। খাবার-দাবারও আছে। চিন্তা কোরো না। আমি যাচ্ছি।— বলে তৃষা মইয়ে পা রাখে।

শ্রীনাথ জানে, তৃষা দূরদর্শী। অনেক আগে থেকেই সে সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকে। তৃষার আধিপত্য মেনে নিলে কারও কোনও ভয় নেই, কষ্ট নেই। শ্রীনাথ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে তৃষার মই বেয়ে উঠে যাওয়া দেখছিল।

পিছনে সজল হঠাৎ বলে ওঠে, আরে! ওটা কী?

মাঝ-সিঁড়িতে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তৃষাও।

শ্রীনাথ ঘুরে তাকায়। আর তাকিয়েই দেখতে পায়। তৃষা যে জানালার পাটায় এতক্ষণ বসে ছিল ঠিক সেইখানে মস্ত এক চিত্রল কেউটে। চতুর, হিংস্র ফণাটা মাঝে মাঝে তুলে আবার মুখ নামিয়ে নিচ্ছে। লেজের খানিকটা এখনও বাইরে।

সম্মোহিতের মতো চেয়ে ছিল শ্রীনাথ। সাপের যে এক ধরনের সম্মোহন আছে তা সে ছেলেবেলায় শুনেছিল। আসলে আচমকা সাপ দেখা দিলে মানুষ বিমূঢ় হয়ে যায়। সেটাই কি সেই সম্মোহন? শ্রীনাথ হাঁ করে চেয়ে ছিল শুধু।

সবার আগে তৎপর হল সজল। হাত বাড়িয়ে সে খাটের ছতরি থেকে একটা আড়কাঠ তুলে নেয়।

আর তখনই সংবিৎ পেয়ে শ্রীনাথ বলে ওঠে, না! না! সজল, খবরদার!

বাপের এ কথাটা শুনল না সজল। ডান্ডাটা তৎপর হাতে তুলেই বিদ্যুৎবেগে বসিয়ে দিল। কিন্তু ছতরির অত লম্বা কাঠ দিয়ে এই ঘরের মতো অপরিসর জায়গায় লাঠির কাজটা হল না। ছাদের একটা কড়িকাঠে সেটা খটাং করে শব্দ করল, তারপর যদিও বা জানলার পাটা পর্যন্ত নামল তো সেটা সাপটার গায়ে লাগলই না। কিন্তু এই আক্রমণে ভয়ংকর সাপটা দুরন্ত ফণার ছোবল তুলল।

করছিস কি গাধা কোথাকার!— বলে হঠাৎ শ্রীনাথ জাপটে ধরে সজলকে, কামড়াবে তোকে। উঠে যা পাটাতনে। যা!

সজল মুখ ঘুরিয়ে বাবার দিকে চেয়ে হাসল, ছাড়ো বাবা, একটা সাপকে এত ভয় কী! দেখো না, মেরে ঠান্ডা করে দিচ্ছি।

এক পলকের এই সর্বনাশা অমনোযোগ, ওই সুযোগেই সাপটা হড়হড় করে নেমে এল মেঝেয়। তীব্র ফোঁসানির শব্দে সচকিত সজল চেয়ে দেখে, মাত্র তিন হাত দূরে সাপটার ফণা, আর তার পাল্লায় সে দাঁড়িয়ে। তাকে জাপটে আছে বাবা।

গোয়ালঘরে, বাগানে অনেক সাপ মেরেছে সজল। সাপে তার ভয় প্রায় নেই-ই। কিন্তু ঠিক এই অবস্থায় সাপের মুখোমুখি সে কখনও পড়েনি। তার ওপর বিপদ, বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে একটা অদ্ভুত গোঁ-গোঁ শব্দ করছে।

কিন্তু সজলের কাছে সাপের কোনও সম্মোহন নেই। তার মাথা পরিষ্কার। সহজেই সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। হাতের বিশাল ডান্ডাটা ফেলে গায়ের আসুরিক জোরে সে এক ঝটকায় বাবাকে ছিটকে ফেলে দিল।

সাপটা ছোবল দিতে একটু দেরি করেছিল। তারও তো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার আছে। বেনোজল থেকে মানুষের ঘরে উঠে এসে সেও একটু অপ্রতিভ।

সজল তাই এ যাত্রায় বেঁচে গেল। বাবাকে সরিয়ে প্রায় অন্ধের মতো একটা মাঝারি ট্রাংক দু'হাতে তুলে নিল চোখের পলকে। তুলেই সেটাকে মেঝেয় ফেলে লম্বালম্বি তড়িৎগতিতে ঠেলে নিয়ে গেল সাপটার দিকে। মেলট্রেনের মতো দ্রুতগামী সেই ট্রাংক সাপটাকে নড়ার সময় দিল না। সোজা দেয়ালের সঙ্গে চিঁড়ে-চ্যাপটা করে দেয়। দেয়ালে সাপটাকে ট্রাংক দিয়ে দুমদুম করে ঠুসতে থাকে সজল। প্রবল সেই প্রহারে সাপটার হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে যায়, চামড়া ছিঁড়ে যেতে থাকে। সজল সাপটাকে ঠুসতে ঠুসতে অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে, মর! মর! মর!

কিছুক্ষণ আগেকার ভয়ংকর কেউটে যখন প্রায় ছিবড়ে হয়ে এসেছে তখন তাকে ছাড়ল সজল।

শ্রীনাথ উঠে বসেছে। হাঁ করে দেখছে দৃশ্যটা। সিঁড়ির মাঝখানে স্থির স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে তৃষা। নির্নিমেষ চোখ। এতক্ষণ সে একটাও শব্দ করেনি।

সজল ট্রাংকটা আবার খাটে তুলে রাখে, তারপর বাবার দিকে ফিরে একগাল বাহাদুর হাসি হেসে বলে, তুমি যা ভিতু না! তোমার জন্যই আর-একটু হলে সাপটার ছোবল খেতাম।— বলে সে বাবাকে টেনে তোলে।

শ্রীনাথ কাঁপছিল। হাতে-পায়ে বশ নেই। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো সজলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হ্যাদানো গলায় বলল, তোর প্রাণের ভয় নেই হারামজাদা! ফের যদি কোনওদিন...

সজল একটু হেসে বলে, আমার চেয়ে মা'র বিপদ অনেক বেশি ছিল। ওই জানালায় মা বসে ছিল একটু আগে।

তা বটে। কিন্তু তৃষাকে সাপে কামড়াতে পারে এটা যেন বিশ্বাস হয় না শ্রীনাথের। এ বাড়ির সাপও হয়তো তৃষার অনুগত। এমনও হতে পারে যে, এই কেউটেটা তৃষার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেই সজলকে ছোবল তুলেছিল।

পাটাতনের ওপর থেকে এ সময়ে মুখ বাড়িয়ে মরা সাপটা দেখে স্বপ্না চেঁচিয়ে উঠল, উঃ বাবাগো! ভাই, তুই মারলি?

তৃষা কোনও কথা না বলে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার বলল, বৃন্দা, সাপটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে আয়।

কোঁচকানো ভ্রু আর কঠিন মুখ নিয়ে তৃষা আস্তে আস্তে পাটাতনে উঠে গেল। সাপটা তাকে কামড়াতে পারত, আর একটুক্ষণ যদি সে বসে থাকত জানালার পাটায়। কিন্তু সেজন্য কোনও

দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না তৃষার। এ বাড়িতে আসার পর বিস্তর সাপ বিছে পাগলা শেয়ালের সঙ্গে বসবাস করতে হয়েছে। কিন্তু এখন আরও বুদ্ধিমান, আরও হিংস্র, আরও তৎপর মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে হবে তাকে, যাদের ওপর কিছুতেই আধিপত্য বিস্তার করা যাবে না।

বড় ঘরটা বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত। জল ঢুকল বটে, কিন্তু এক-দেড় ইঞ্চির বেশি উঠল না। ভোর হতে না হতেই সেই জল নেমে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে।

সরিৎ সকালবেলা খবর আনল, নদীর ওপারের বাঁধ এপারের লোক গিয়ে কেটে দিয়ে এসেছে। ফলে জলটা আর বাড়তে পারেনি।

সকালে অগোছালো ঘরে সকলে জড়ো হয়ে বসে চা খাচ্ছিল।

পুবের ঘরের চাল থেকে লোক নেমে দাওয়ায় বসে আছে। বৃন্দা তাদের জন্য ধামাভর্তি চিঁড়ে বের করে দিচ্ছিল। বৃষ্টি এখনও হচ্ছে। রোদ ফোটেনি।

তৃষা একদমই কথা বলছে না রাত থেকে। এটা লক্ষ করেছে শ্রীনাথ। কথা বলানোর জন্য সে বলল, কাল রাতে তোমারও খুব ফাঁড়া গেছে। উঃ, যা একখানা সাইজ সাপটার!

তৃষা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মৃদু স্বরে বলল, ফাঁড়া এখনও যায়নি।

শ্রীনাথ চমকে উঠে বলে, তার মানে?

মানে কী তা তোমার বোঝা উচিত ছিল।— বলে তৃষা উঠে পড়ে। অনেক কাজ।

॥ সাতাত্তর ॥

মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির যত দোষ আছে সান-ফ্লাওয়ার তার কোনওটা থেকেই মুক্ত নয়। দীপনাথকে সান-ফ্লাওয়ারে ঢুকবার আগে একটা বন্ড সই করে দিতে হয়। সে যে শর্ত দিয়েছিল তার কোনওটাই কোম্পানি মানল না। তবে বেতনটা ঠিক রাখল। যাতায়াতের জন্য অফিসারদের নিজস্ব গাড়ি থাকলে ভাল কথা, নইলে চমৎকার একটা বাস সার্ভিস আছে। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অফিসারদের নিয়ে আসা বা পৌঁছে দেওয়া হয়। দীপনাথ সেই সুবিধাটুকু পেল। কোম্পানি কোনও বাড়ি দেবে না। তবে কালক্রমে বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার টাকা ঋণ দেবে।

এর চেয়ে রজার্স ভাল ছিল হয়তো। কিন্তু রজার্স দেশি কোম্পানি। সে টোপ ফেলে দীপনাথকে গেঁথে নিয়ে তাকে দিয়ে দু'নম্বরি কারবার করাত। তার চেয়ে সান-ফ্লাওয়ার ঢের ভাল। ছ'মাস বাদে আমেরিকায় ট্রেনিং-এ পাঠাবে। সেটাও দীপনাথের প্রতি বিশেষ দাক্ষিণ্যবশে নয়, বেশির ভাগ অফিসারকেই তারা আমেরিকায় নিয়ে একটু স্ট্রিমলাইনড করিয়ে আনে।

এত বড় কোম্পানিগুলি ভাত ছড়িয়ে বসে তু বলে ডাকলেই দীপনাথের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে কেজো লোক এসে জড়ো হয়ে লেজ নাড়ে; সুতরাং দীপনাথকে ডেকে চাকরি দেওয়ার দরকার ছিল না এদের। তবু দিয়েছে কেন সেটা দীপনাথ ভাল বুঝল না। প্রথম কয়েকটা দিন নতুন ধাঁচের কাজকর্ম বুঝতে সে হিমশিম খেল। অটোমেশন জিনিসটারও মুখোমুখি সে কখনও হয়নি। এখানে হল।

গুজরাটি কোম্পানি বোস সাহেবের যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে কাজে লাগাতে পারেনি। কিন্তু বোস সাহেব কাজের লোক। সান-ফ্লাওয়ারে ঢোকার আগে মাসখানেক বোস সাহেব দীপনাথকে অটোমেশন বুঝিয়েছে। চেনা বিভিন্ন কোম্পানিতে ইনট্রোডাকশন দিয়ে পাঠিয়েছে আই বি এম এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির কাজ দেখতে। সেই ঘরোয়া ট্রেনিংটা খুব কাজে লাগল দীপনাথের। হিমশিম খেলেও নতুন কাজে সে হাস্যকর কিছু করল না।

সাতদিন পর এক ছোকরা সাহেব তার টেবিলের সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, লাইক দি জব?

ইয়াঃ।— অনায়াসে বলতে পারল দীপনাথ।

আট্টা বয়।— বলে সাহেব হেসে চলে গেল।

বোস সাহেব মাঝে মাঝে ফোন করে খবর নেয়, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো, চ্যাটার্জি?

না। চালিয়ে নিচ্ছি।

আপনার হিসেবটা হয়ে গেছে। একদিন এসে টাকাটা নিয়ে যাবেন।

গুজরাটি কোম্পানিতে দীপনাথের কিছু পাওনা টাকা পড়ে আছে। খুব বেশি হবে না। বলল, যাব।

দেরি করবেন না। টাকাটা ব্যাংকে রাখলে সুদ পাবেন, এখানে খামোখা ফেলে রেখে লাভ কী?

দীপনাথ মৃদু হেসে বলে, সময় পাচ্ছি না যে। এই অফিস থেকে সহজে বেরোনো যায় না।

জানি। সান-ফ্লাওয়ার ইজ বিগ। ভেরি বিগ। আপনিও এখন বিগ। তবে আপনি যদি একটা ডেট বলেন তবে অফিস-আওয়ার্সের পর আমি টাকাটা রেডি রেখে দেব। ইউ জাস্ট ড্রপ ইন অ্যান্ড কালেক্ট।

আচ্ছা। মিসেস বোসের খবর কী?

নাথিং নিউ। নাইদার হ্যাপি নর আনহ্যাপি।

আপনি?

আমি? আমি জাস্ট ওকে।

কোম্পানি?

বুঝতে পারছি না। রিয়েলি বুঝতে পারছি না। ডুয়িং বিজনেস নো ডাউট। কিন্তু একসপানশান নেই।

আচমকাই দীপনাথ বলে, আপনি সান-ফ্লাওয়ারে আসবেন?

বোস বোধ হয় অবাক হয়। তারপর হেসে বলে, ও! নো।

কেন বোস সাহেব?

বোস সাহেব একটা ছোট শ্বাসের শব্দ করে বলে, সান-ফ্লাওয়ার অনেক আগেই আমাকে পিক করেছিল। কিন্তু কোনও বড় কোম্পানিতে আমার যাওয়ার উপায় নেই চ্যাটার্জি।

কেন?

কারণ আমি যে কনসার্নে কাজ করব আই মাস্ট বি দেয়ার নাম্বার ওয়ান ম্যান। আমি নাম্বার ওয়ান না হয়ে কোনও কোম্পানিতেই কাজ করিনি। বড় কোম্পানি আমাকে মস্ত পোস্ট দেবে, অনেক মাইনেও, কিন্তু প্রথমেই নাম্বার ওয়ান জায়গাটা ছাড়বে না। তাই আমার কপালে বড় কোম্পানি নেই।

এবার দীপনাথও একটু হাসে। বলে, আপনি যদি কখনও কোনও নিজস্ব কোম্পানি খোলেন তবে আমাকে ডাকবেন।

বোস আবার শ্বাস ছেড়ে বলে, সেসব আরও কম বয়সে শখ ছিল। এখন নেই। এখন আমি ফিজিক্যালি আনফিট। সাইকোলজিকালিও। কিন্তু আপনাকে একটা আডভাইস দিয়ে রাখি। চট করে কোনও লোভে পড়ে সান-ফ্লাওয়ার ছাড়বেন না। ইউ আর উইথ গুড পিপল। দে উইল ডু ইউ গুড। কমপিটিটর কোম্পানি অনেক সময় সাবোটাজ করার জন্য বড় কোম্পানি থেকে লোক ভাঙিয়ে নিয়ে আসে। যারা লোভে পা দেয় জেনারেলি এন্ড ইন দি গাটার। সান-ফ্লাওয়ারে থাকুন। দে উইল মেক ইউ ভেরি ভেরি এফিসিয়েন্ট।

ঠিক আছে। কথাটা মনে রাখব।

আই অলওয়েজ উইশ ইউ গুড।

সান-ফ্লাওয়ারে আসার মাস দুয়েক বাদে একদিন মণিদীপা ফোন করল।

গলাটা চেনা লাগছে, দীপনাথবাবু?

দীপনাথ মৃদু হেসে বলে, যে ভোলে ভুলুক কোটি মন্বন্তরে আমি ভুলিব না, আমি তারে ভুলিব না। কেমন আছেন?

চমৎকার। আপনি?

চমৎকার।

একটা চাকরি দেবেন আপনার কোম্পানিতে? আপনার পি-এ করে নিন না!

আমার পি-এ বলে কিছু নেই।

তা হলে আপনি কিসের বড় চাকরি করেন?

বড় চাকরি নয়। কিন্তু এই কোম্পানির বেয়ারাও এত বেশি মাইনে পায় যে অনেক সরকারি অফিসারও পাল্লা দিতে পারবে না।

তা হলে বেয়ারার চাকরিই দিন না।

কেন? ব্যাবসার কী হল?

কী আবার হবে? টাকা কই? ঢাকুরিয়ার এই দোকানটা এখন পঞ্চাশ হাজার সেলামিতেও রাজি। কিন্তু তাই বা আমাকে দেবে কে?

দু'লাখ থেকে পঞ্চাশ হাজারে নেমেছে? বলেন কী!

এমনিতে নামেনি মশাই, দোকানের মালিককে বেশ কয়েকটি কটাক্ষ উপহার দিতে হয়েছে।

তা হলে আরও গোটাকয় দিন। বিনি পয়সায় দিয়ে দেবে।

না। এখন দোকানের মালিক আর কটাক্ষে খুশি নয়। হি ওয়ান্টস সামথিং টানজিবল। হয় টাকা, না হয় কাইন্ডস।

কাইন্ডনেস নয় তো!

না। কাইন্ডস, একস্ট্রিমলি ফেমিনিন কাইন্ডস।

কুপ্রস্তাব করেছে বলছেন?

নট ইন সো মেনি ওয়ার্ডস। তবে আমরা মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারি।

ওর কাছে আর যাবেন না।

গিয়ে লাভও নেই। লোকটা বুঝে গেছে, আমি ক্যাশ বা কাইন্ডস কোনওটাই দিতে পারছি না। শুনুন, আমরা একটু পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছি। মে বি নৈনিতাল। না হয় সিমলা। আপনি কি ছুটি পাবেন?

পেলেও যাব না।

কেন? টু অ্যাভয়েড মি?

সেটাও হয়তো কারণ। তবে আমার ভয় এবার বড় পাহাড়ের কাছে গেলে আমি হয়তো ফিরতে পারব না।

ওমা! সে কী?

জানেন তো, প্রীতম আজও ফেরেনি?

জানি।

প্রীতম আমার কতটা ছিল তা তো আর জানেন না!

অনেকটা আন্দাজ করতে পারি।

অনেকটা, তবু সবটা নয়। প্রীতম ছিল এই পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের সবচেয়ে বড় কারণ, এখন তাই আমার কোনও পিছুটান নেই। বড় চাকরি, অনেক টাকা, এ সব কিছুই আমাকে টেনে রাখতে পারবে না। মাঝে মাঝে আজকাল নিশুত রাতে পাহাড় ডাকে।

যাঃ! কী যে কিম্ভুত একটা খেয়াল আছে আপনার মাথায়!

দীপনাথ তা জানে। কিন্তু কথাটা তো মিথ্যেও নয়। সারাদিন সান-ফ্লাওয়ার যতক্ষণ পারে মেদ

মজ্জা মাংস মস্তিষ্ক চিবিয়ে ছিবড়ে করে দেয়। কিন্তু তারপর যখন ক্লান্ত দীপনাথ তার হোটেলে ফিরে আসে তখনই আসে প্রীতমের শূন্যতা। বড় ভারহীন, বন্ধনহীন লাগে নিজেকে।

সব ক'টা বড় খবরের কাগজে দিনের পর দিন নিজের পয়সায় প্রীতমের ছবি সহ নিরুদ্দেশের খবর বের করেছে সে। শিলিগুড়িতে শতমও দাদাকে খুঁজতে তোলপাড় করছে আজও। কোথাও কোনও হদিশ মেলেনি।

হয়তো প্রীতম আছে। হয়তো নেই।

বিলুর হাবভাব একদম ভাল লাগে না দীপনাথের। বিলু চাকরিতে একটা লিফট পেয়েছে। বাসাটা সাজিয়েছে অনেক টাকা খরচ করে। প্রতি রবিবার অরুণ ওর বাসায় খায়। মাঝে মাঝে বেড়াতে যায় অরুণের সঙ্গে।

এ সব এক রকম চলছিল। খুব সম্প্রতি সে খবর পেয়েছে, বিলু একজন উকিলের পরামর্শ নিচ্ছে। খবরটা দিয়ে গিয়েছিল শতম। মাসখানেক আগে সে একটা টেন্ডার ধরতে কলকাতায় এসে দু'দিন বিলুর কাছে থেকে গিয়েছিল।

স্বামী নিরুদ্দেশ বলে একসপার্টি ডিভোর্স পেতে অসুবিধে হবে না বিলুর। কিন্তু ডিভোর্সই বা চাইবে কেন? প্রীতম মরে গেলেই কি সব শেষ হয়ে গেল?

কথাটা সরাসরি বিলুকে জিজ্ঞেস করতে তার লজ্জা করে। কিন্তু ভাবলেই লজ্জায় ঘেন্নায় ভিতরটা অস্থির হয়ে ওঠে তার। আর তখনই মনে হয়, এই জীবনটা নেহাতই একটা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। এর চেয়ে সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়া ভাল।

পাহাড় তো ডাকছেই। অবিরল ডাকে। এসো, চলে এসো দীপনাথ। এখানে নীরব মহান এক প্রস্থানপথ খোলা আছে। এখানে দীনতা নেই, নিম্নগতি নেই। স্বর্গের এই সিঁড়ির কাছে এসো। আমি কোলে তুলে নেব।

দীপনাথ বোস সাহেবের কাছে খবর পেল, ডাক্তারের পরামর্শে মণিদীপা আর বোস সাহেব নৈনিতাল বেড়াতে যাচ্ছে। যাক। ওরা এত সহজে মিশ খাবে না, তা জানে দীপনাথ। দু'জনের মধ্যে এখনও কাঁটাতারের বেড়া। তবু এভাবেই হয়তো একদিন একটু বেশি বয়সে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরবে অসহায়ের মতো। শেষ পর্যন্ত তো মানুষ অসহায়ই। সে বোসই হোক, মণিদীপাই হোক।

নৈনিতাল গেলেও হত। পাহাড়ের মতো আর-একটা দুর্নিবার ডাকও আছে দীপনাথের জীবনে। এখনও তার মূলসুদ্ধ কেঁপে ওঠে যদি মণিদীপা ডাকে।

দিনের মোটা একটা সময় কাজ-কাজ খেলা দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রেখেছে বলে সান-ফ্লাওয়ারের প্রতি বড় কৃতজ্ঞতা বোধ করে দীপনাথ। আরও ভাল হত যদি সে সারা রাত ধরে আর-একটা চাকরি করত। একমাত্র কাজই তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারে। টাকা নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, প্রোমোশন নয়, কেবল ভুলিয়ে রাখে বলে যত দিন যায় তত আরও বেশি কাজ-পাগল হয়ে ওঠে দীপনাথ।

অফিসের পর এই শূন্যতা এত অসহ্য লাগত যে, বেশ কিছুদিন তাকে বীথির কাছে যেতে হয়েছে। একটা কুৎসিত বদ অভ্যাস তৈরি হয়ে যাচ্ছিল তার। হঠাৎ একদিন সুখেন মেসে ফিরল হাতে আর মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে। মুখে করুণ হাসি।

চমকে উঠে দীপনাথ জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

ঘরে আর কেউ ছিল না। সুখেন কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে বলল, বীথির ছেলেকে দেখেছেন তো?

এক কি দুই দিন।

বীথি ভাল নয়, কিন্তু ছেলেটা মেরিটোরিয়াস। পলিটিকস করে, সোশ্যাল ওয়ার্ক করে।

জানি।

এতদিন কোনও ঝামেলা করেনি। বীথি ডিভোর্স পেয়ে গেছে, সুতরাং এখন যদি সে বিয়ে করে

তা হলেও ছেলের আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি আমাকে বিয়ে করায়। ছেলেটি মনে করে, আমি করাপটেড সরকারি কর্মচারী। আমাকে বিয়ে করা মানে সোশ্যাল ইনজাসটিসকে প্রশ্রয় দেওয়া।

তারপর? এই রক্তারক্তি কাণ্ডটা কখন হল?

আজ। উই হ্যাড অলটারকেশনস। আমার পেটে একটু মাল ছিল ঘড়াম করে মেরে দিয়েছিলাম এক ঘুসি। ছোকরাও পালটা ঘুসি ঝেড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়ে এই কাণ্ড।

তারপর?

তারপর আর কী? ক্ষমা চাওয়াচাওয়ি হল। কাল বীথির সঙ্গে আমার বিয়ে।

কালই?

কালই। শুভস্য শীঘ্রম।

রেজিস্ট্রি না সোশ্যাল?

সোশ্যাল হলে বিশ্রী দেখাবে। রেজিস্ট্রি আর তারপর কালীঘাট।

আপনি বীথির সঙ্গে ঘর করতে পারবেন?

পারব।

নোয়িং ফুললি যে, আমার সঙ্গেও বীথির...!

আমিই তো আপনাকে নিয়ে গেছি, সুতরাং জানব না কেন? শরীরের কোনও দোষ নেই। মনটা ঠিক থাকলেই হল।

এসব মেয়েদের মনও কি ঠিক থাকে?

সেসব পরে ভাবব। আমিও কিছু ভাল লোক নই। বীথিও নয়। সুতরাং ভেবে লাভ কী?

তা বটে।

তা হলে কাল। আপনি তৈরি থাকবেন। সাক্ষী দিতে হবে।

পরদিন রাতে বাস্তবিকই ঘটনাটা দীপনাথের চোখের সামনে বীথির ড্রয়িংরুমে ঘটে গেল। দীপনাথ সাক্ষী ছিল।

এই বিয়েতে এক রিকশায় বসে সুখেনের সঙ্গে গিয়েছিল দীপনাথ। ফিরল একা।

সুখেন রয়ে গেল। আর ফেরেনি। ফিরবেও না। হোটেলের ম্যানেজার নতুন বোর্ডার খুঁজছে। সুখেন চলে যাওয়ার পর এখন আরও বেশি একা লাগে দীপনাথের। নতুন বোর্ডার আসবে, সে কী রকম লোক হবে কে জানে! দীর্ঘদিন মেসে হোটেলে থেকে নতুন লোকের সঙ্গে সমঝোতা করার অভ্যাস হয়ে গেছে তার। তবু ইদানীং তার এ রকম হাটবাজারের মতো জায়গায় থাকতে ভাল লাগে না।

তার জিনিসপত্র খুব বেশি নেই। সামান্যই। ফ্ল্যাট ভাড়া করলে তা সাজানো গোছানোর ব্যাপার আছে। তার ওপর আর-কিছুদিন পরই তাকে আমেরিকা যেতে হচ্ছে। খামোখা ফ্ল্যাট ভাড়া করার মানে হয় না। ফাঁকা পড়ে থাকবে। অথচ এই ভারাক্রান্ত হৃদয়টিকে রাখার জন্য একটু সুন্দর নির্জনতা খুঁজছে সে মনে মনে।

অনেক হিসেব করে সে দেখল, তার বয়স এখন তেত্রিশ বা চৌত্রিশ। জন্মের সঠিক তারিখ জানা নেই। এই বয়সে প্রকৃতপক্ষে তার কোনও আপনজন নেই। ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই। এখন তার এই তেত্রিশ বা চৌত্রিশ বছর বয়সে একাকিত্বের ভূত কাঁধে চেপে ঠ্যাং দোলাচ্ছে আর রগড় দেখছে।

মাঝরাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় দীপনাথের। আর ঘুম আসতে চায় না। বরং আসে প্রীতম, মণিদীপা, শিলিগুড়ি, আসে সেই অচেনা মহান পর্বত। বিরহের এক শুষ্ক বাতাস বয়ে যায় বুকের পাঁজর ভেদ করে। তখন আলো জ্বেলে একটু বই টই কিছু পড়তে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু রুমমেটদের ঘুম ভেঙে যাবে ভেবে পারে না। একটু পায়চারি করলেও হয়তো ভাল লাগে। কিন্তু সেই পরিসর নেই।

মেস বদলাবে, একটা সিংগল-সিটেড ঘর দেখে চলে গেলে কেমন হয়?

এ সব ছেঁড়া টুকরো সমস্যা যখন তাকে বিব্রত করছিল তখনই রতনপুর থেকে বউদির চিঠি এল, ... আমি মরলে খাটে কাঁধ দেওয়ার জন্যও কি আসবে না?

সান-ফ্লাওয়ারে ফাইভ ডেজ উইক। শনি রবি ছুটি। কিন্তু প্রায়দিনই শনিবারে অফিস করতে হয় দীপনাথকে। তার জন্য মোটা ওভারটাইম আছে, কিন্তু সেজন্য নয়। দীপনাথ কাজ করার আগ্রহের বশে ফি শনিবার অফিসে চলে যায়। ইচ্ছে করলে এক শনি বা রবিবার সে চলে যেতে পারে রতনপুরে। কিন্তু তার ইচ্ছে হয় না। মেজদা ক্রমে এক জড়ভরত হয়ে যাচ্ছে। বউদি এতদিনে সংসারের পালটা মার খেতে শুরু করেছে। একমাত্র আকর্ষণ সজল। কিন্তু সজলকে তো নিজের মতো করে মানুষ করতে পারবে না দীপনাথ। অত সময় কোথায়? সজলও ক্রমে রতনপুরের প্রভাবে অন্য রকম হয়ে যাবে, যাকে ভালবাসা যাবে না। একমাত্র উপায় সজলকে বোর্ডিং-এ দেওয়া. মা-বাবার কু-প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

এক শনিবার শ্রীনাথের প্রেসে হানা দেয় দীপনাথ।

মেজদা!

আরে, কেমন আছিস?

তুমি কেমন?

ওই এক রকম।

দীপনাথ দেখে, গত এক বছরে শ্রীনাথের চেহারায় বুড়ো মানুষের ছাপ বড় বেশি পড়ে গেছে। সে বলে, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

বল না!

সজলের ব্যাপার কী ঠিক করলে?

সজলের কী হয়েছে?— একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে শ্রীনাথ।

কিছু হয়নি। কিন্তু রতনপুরে থাকলে ছেলেটা মানুষ হবে না।

তা হলে কোথায় থাকবে?

যদি বলো তা হলে বাইরে কোনও ভাল হোস্টেলে দিয়ে দিই।

হোস্টেল!— বলে শ্রীনাথ একটু ভাবে। তারপর অসহায় একটা মুখের ভাব করে করুণ গলায় বলে, সজল চলে গেলে আমার কী হবে বল তো!

তোমার আবার কী হবে?

তুই তো ঠিক বুঝবি না। বলতে কী, সজলই আমার একমাত্র অন্ধের নড়ি। ও যদি চলে যায় তবে আমার আয়ু চট করে ফুরিয়ে যাবে।

কত বাপ তাদের ছেলেকে হোস্টেলে দেয়, তারা থাকে কী করে?

আমাদের ব্যাপারটা তো অন্য সকলের মতো নয়। চারদিকে ষড়যন্ত্র, কূটকচালি। একমাত্র সজলই আমাকে বুক দিয়ে আগলে রাখে। যেই ও সরে যাবে অমনি আমাকে ছিঁড়ে খাবে সবাই।

কেন? তুমি কী করেছ যে ছিঁড়ে খাবে?

সে অনেক কথা। তোকে তো বহুবার বলেছি। তবে যদি সজলকে সরিয়ে দিতে চাস তা হলে আমাকেও সরিয়ে দে। ওখানে সজলও খুব নিরাপদ নয়।

কেন? কী হয়েছে?

তৃষার সঙ্গে ওর বনিবনা হয় না। তৃষা ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে।

তোমার মাথাটা একদম গেছে। মা হয়ে কেউ ছেলেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে?

তৃষা তো আর-পাঁচজন মায়ের মতো নয়। তুই সব বুঝবি না।

বউদিকে আমিও কম চিনি না মেজদা। অনেক দোষ থাকলেও বউদি অমানুষ নয়।

৭

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপনাথ উঠে পড়ল। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পরিবার লক্ষ লক্ষ রকমের নিজস্ব জীবনযাপন ও সম্পর্কের ছক তৈরি করে নিয়েছে। দীপনাথ আগন্তুকের মতো গিয়ে সেই সব ছক ভেঙে ফেলতে চাইলেই তো হবে না।

তৃষার চিঠিটার একটা এলেবেলে জবাব দিয়ে দিল সে। নিজে রতনপুরে গেল না। ইচ্ছে করল না। তার নিজের নানা রকম নিজস্ব ব্যথা-বেদনা রয়েছে। এখন মনকে আরও ভারী করার মানে হয় না।

দীপনাথ তার নতুন চাকরির কথা আত্মীয়স্বজনকে জানায়নি ভাল করে। সে কত মাইনে পায় তাও কারও জানার কথা নয়।

তবু গন্ধে গন্ধে একদিন সোমনাথ এসে হাজির।

সেজদা, আরেব্বাস, তুমি তো একখানা পেল্লায় চাকরি বাগিয়েছ।

দীপনাথ এ ধরনের কথায় বিরক্ত হয়। গম্ভীর মুখে বলে, বাবা কেমন আছে?

সেই কথাই বলতে এলাম। বাবার চোখটা এবার না কাটালেই নয়।

চোখ কাটানোর কথা অনেক আগে হয়ে গেছে। তখন কাটাসনি কেন?

টাকা ছিল না।

বাজে কথা। আমরা টাকা দিয়েছিলেন।

সেজদা, তুমিও আজকাল অন্য রকম হয়ে গেছ। কেবল টাকার কথা তুলে আমাকে খোঁটা দাও। আমার অবস্থা কী জানো না?

অবস্থা যা-ই হোক, স্বভাবটা ভাল কর। বাবার চোখ কাটানোর ব্যবস্থা কর, খরচ সব আমি দেব। কিন্তু সেটা আগাম তোর হাতে দেব না।

সোমনাথ গম্ভীর হল। তারপর ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, তুমি চার হাজার টাকার ওপর বেতন পাও। অনেক ক্ষমতা। তোমার মুখে সবই মানায়। ঠিক আছে, তাই হবে।

সোমনাথ চলে যাওয়ার পর দীপনাথ ভাবল, আমি কি একটু নিষ্ঠুর হয়ে গেছি!

॥ আটাত্তর ॥

আজকাল প্রায়ই সান-ফ্লাওয়ারের শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিশাল রিসেপশন ঘরে বুলু অর্থাৎ সোমনাথ এসে বসে থাকে দীপনাথের জন্য। কেন আসে তা জানে বলেই দীপনাথ বিরক্ত হয়। বুলু টাকার গন্ধ পেয়েছে। প্রায়ই বাবার নাম করে টাকা চায়। বলে, বাবার পুরনো চশমাটায় চলছে না। আমার অবস্থা তো জানোই। বাবা তোমারও। নিত্যি নতুন অজুহাত।

বুলুর বয়স বেশি নয়। ত্রিশের মধ্যেই। কিন্তু এর মধ্যেই জুলপি পেকেছে। চেহারায় সুস্পষ্ট মধ্যবয়সের ছাপ। দীপনাথের চেয়ে বয়সে চার-পাঁচ বছরের বড় বলে মনে হয়। কম বয়সে বিয়ে করলে কি মানুষ তাড়াতাড়ি বুড়োটে মেরে যায়?

বম্বে থেকে একটা শর্ট কোর্সের ট্রেনিং সেরে ফিরে এসে প্রথম দিন অফিসে পা দিয়েই রিসেপশনে বুলুকে দেখতে পায় দীপনাথ। বিরক্ত হতে গিয়েও হল না। থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। বুলুর পোশাক আজ অন্যরকম। পরনে ধড়া, চুল এলোমেলো. গালে অল্প একটু দাড়ি। দীপনাথকে দেখে উঠে কাছে এল।

আবেগহীন গলায় দীপনাথ বলে, বাবা?

বুলু মাথা নাড়ে, আজ সাত দিন।

দীপনাথ কোনও শোক বোধ করে না, বুকে কোনও কান্নার ঢেউ ভাঙল না, হাহাকারে ভরে গেল না ভিতরটা। তবু একটা কিছু হল। হঠাৎ বড় খাঁ খাঁ লাগল চারদিক। শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় মস্ত একটা গাছের তলায় তারা আড্ডা মারত। সেই গাছটা কেটে ফেলার পর জায়গাটা অদ্ভুত ন্যাড়া আর করুণ দেখাত। চারদিকটা এখন অনেকটা ওইরকম। কী যেন ছিল, এখন নেই। তবে দীননাথ কোনওদিনই বটবৃক্ষের মতো তাঁর তার সন্তান-সন্ততিকে আড়াল করে ছিলেন না। গাছের কথাটা দীপনাথের মনে এল শুধু ওই থাকা না-থাকার তফাতটুকুর জন্য।

বুলু কাপড়ের খুট তুলে চোখে চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। সান-ফ্লাওয়ারের দু'জন যুবতী রিসেপশনিস্ট দৃশ্যটা দেখছিল। বুলুর কান্না দেখে দীপনাথেরও ঠোঁট একটু কেঁপে উঠেছিল অজান্তে। সেটা প্রিটেনশনও হতে পারে। মা-বাপ মরলে কাঁদা উচিত এই সংস্কার থেকে। কিন্তু রিসেপশনিস্ট দু'জনের দিকে চেয়ে সামলে গেল দীপনাথ। গলার স্বর নামিয়ে প্রশ্ন করল, সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে?

বুলু পাজি হতে পারে, কিন্তু বাবার শোকে তার কান্নায় কোনও প্রিটেনশন নেই। ক'দিনে সে যে অনেক কেঁদেছে তার সুস্পষ্ট ছাপ তার ফোলা মুখে। এখনও চোখ দু'টি জলে ভরা, লাল। কথা না বলে মাথা নাড়ল সে, খবর দিয়েছে।

বিলুকে?

হ্যাঁ।

তুই একটু বোস। আসছি।

সান-ফ্লাওয়ারে দীপনাথের কোনও চেম্বার নেই। বড় হলঘরের মধ্যে একটু উঁচু কাঠের পাটাতনের মতো আয়ল্যান্ড অফিসারদের জন্য। এ রকম আয়ল্যান্ডের একটা দীপনাথের। সে তার দ্বীপটিতে উঠে চারদিকে একবার তাকাল। ভারী নিস্তব্ধ পরিচ্ছন্ন আধুনিক অফিস। রোজই সে এই অফিসটার আভিজাত্য লক্ষ করে এবং খুশি হয়। আজ এই শোকের দিনেও হল। নিজের চেয়ারে মিনিট দুয়েক নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। তারপর ব্রিফকেস খুলে কিছু জরুরি কাগজপত্র ফাইলে রেখে ডসন নামে তার ওপরওয়ালা সাহেবকে একটা ফোন করল। না, লম্বা ছুটি চাইল না সে। শুধু আজকের দিনটা। শ্রাদ্ধ আর ঘাট-কাজের জন্য আরও দু'দিন নেবে সেটাও জানিয়ে রাখল।

ডসন তার অদ্ভুত গভীর কণ্ঠস্বরে মার্কিন উচ্চারণে বলল, ইটস ওক্কে। আই সিমপ্যাথাইজ।

ফোন করার পরও কিছুক্ষণ বসে থাকে দীপনাথ। সে এত স্বাভাবিক কেন তা বুঝতে পারছিল না। সে তো আলবেয়ার কামুর নিস্পৃহ নায়ক নয়। ভেতো ভাবপ্রবণ বাঙালি। সত্য বটে, সে মানুষ হয়েছে পিসির কাছে, বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তবু বাবা তো! বুলুর মতো সে কেন কেঁদে উঠছে না?

নিজের জন্য নিজের কাছেই লজ্জা করছিল তার। অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে কাজকর্মের কিছু পরামর্শও দিল সে। খুবই স্বাভাবিকভাবে। বাবার মৃত্যুসংবাদটা সে অবশ্য প্রচার করল না।

বাইরে এসে দেখে, বুলু বসে সিগারেট ফুঁকছে। তাকে দেখেই তটস্থ হয়ে পেতলের স্ট্যান্ডওয়ালা ডাবরের মতো মস্ত অ্যাশট্রেতে সেটা ফেলে উঠে দাঁড়াল।

দীপনাথ শোক টের পাচ্ছে না ঠিকই। কিন্তু চারদিকে খাঁ খাঁ ভাবটা রয়েছে এখনও। ট্যাক্সিতে বসেও সেটা টের পাচ্ছিল। ভীষণ বৃষ্টি গেছে ক'দিন। উজ্জ্বল রোদ। ভ্যাপসা গরম। বুলুর গা থেকে কোরা কাপড়ের গা-গোলানো গন্ধ আসছে। বাবা নেই। প্রীতমও আর একভাবে নেই। মণিদীপাকে সে নিজেই দূরের মানুষ করে দিয়েছে। এই তো ভাল দীপনাথ! আস্তে আস্তে ঝরে যাচ্ছে পাতা।

রিক্ত হয়ে যাচ্ছে। এবার একদিন পাহাড়ের দিকে মুখ ঘোরাবে। তারপর চলতে থাকবে। পর্বতের তো মৃত্যু নেই। নিরুদ্দেশও হয় না।

বুলুর দু'-ঘরের বাসাটা খুবই ছোট। ভারী ঘিঞ্জি। বাইরের ঘরে একটা চৌকির ওপর শ্রীনাথ বসে আছে। চেহারাটা ভেঙেচুরে বিচ্ছিরি হয়েছে। ফর্সা গালে কাঁচা পাকা দাড়ি। চোখের কোলে জল ছিলই, দীপনাথকে দেখে 'বাবা নেই রে' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল।

বুলু চাপা গলায় বলে, মেজদা খুব ভেঙে পড়েছে। গত তিনদিন ধরে এখানেই আছে। সমানে কাঁদছে।

বউদি আসেনি?

প্রথম দিন খবর পেয়ে এসেছিল।

দীপনাথ জুতো ছাড়ল, তারপর গিয়ে শ্রীনাথের পাশে বসে গায়ে হাত রেখে বলে, কেঁদো না। কান্নার কী আছে! বুড়ো বয়সে বেঁচে থাকাও তো কষ্টের।

এই বলতে বলতেই দীপনাথের চোখে জল এসে গেল। এইটুকুর ভারী দরকার ছিল, নইলে 'ওরা' ভাবত, দীপনাথ বাবার জন্য দুঃখ পায়নি। চোখের জলটা সে রুমালে মুছল না। সবাই দেখুক।

কিন্তু কাঁদতে কাঁদতেও দীপনাথের যুক্তিবাদী মনে প্রশ্ন আসে। মেজদা শ্রীনাথ কি বাবাকে এতই ভালবাসত! কই, কখনও তো মনে হয়নি। বরং নিজের বাবা সম্পর্কে শ্রীনাথের ছিল নিষ্ঠুর উদাসীনতা। তবে এই কান্না আসছে কোথা থেকে? কেন এত শোক?

আসলে দুর্বলচিত্তরা অন্যের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর ভয়ে ভেঙে পড়ে, কেঁদে আকুল হয়। এর সঙ্গে শোক বা ভালবাসার সম্পর্কই নেই। সবটাই আত্মকেন্দ্রিক।

কাঁদতে কাঁদতে হিক্কার মতো অদ্ভুত শব্দ করছিল শ্রীনাথ। মাঝে মাঝে 'বাবা, বাবা গো' বলে আর্তনাদ। একবার মনে হল শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে বুঝি!

শমিতাকে খুব ভাল করে কখনও লক্ষ করেনি দীপনাথ। দেখাও হয়েছে কম। বেশ টান টান শ্যামলা।

এইরকম একটা সংকট সময়ে শমিতা একটা ছবি আঁকা টিনের ট্রে-তে চা নিয়ে এল। কিশোরী চেহারা। মুখটার মধ্যে শ্রী আছে বটে, তবে বড্ড রোখা-চোখা মনে হয়। বুদ্ধি রাখে কিন্তু হয়তো সবটাই সৎবুদ্ধি নয়। দীপনাথ শুনেছে এই মেয়েটাই নেপথ্যে থেকে সোমনাথকে পরিচালনা করে। মেয়েটির মুখচোখ দেখে কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হয় না। মেজোবউদির সঙ্গে এদের তুমুল আড়াআড়ি! কিন্তু দীপনাথ বুঝল, শমিতা যতই চালাক চতুর হোক, মেজোবউদির সঙ্গে পাল্লায় কিছুই নয়। বুদ্ধি ছাড়াও মেজোবউদির আর যে জিনিসটা আছে তা হল প্রবল ব্যক্তিত্ব। তা শমিতা কোথায় পাবে?

শমিতা ভারী যত্নে চা হাতে তুলে দিল। মাথায় ঘোমটাটি ঠিক মতোই টানা। ট্রে-টা একটা টেবিলে রেখে আঁচলে মুখ ঢেকে একটু কাঁদল। এই কান্নাটাকে খুব ফাঁকি বলে মনে হল না দীপনাথের। বাবা তো এরই হেফাজতে ছিল বহু দিন। বেড়াল পুষলেও মায়া হয়, দীননাথের মতো ঝামেলাহীন সাদামাটা মানুষের ওপর মায়া পড়তেই পারে।

কিন্তু এই সব কান্নাকাটি আর সহ্য হচ্ছিল না দীপনাথের। সংসার থেকে দূরে সরে থাকায় এইসব শোকদুঃখের সঙ্গে তার বেশি পরিচয় নেই। ভারী অস্বস্তিকর। গরম চায়ে তাড়াতাড়ি চুমুক দিতে দিতে সে বলল, শমিতা, আমি স্নান করব। তোমাদের বাথরুমে জল আছে?

আছে। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আর কোরা কাপড় চাই। কাছাকাছি দোকান-টোকান থাকলে বুলু বরং গিয়ে কিনে আনুক। টাকা দিচ্ছি।

বুলু বলল, ঘরের কাছেই দোকান।

দীপনাথ একশো টাকার নোট বের করে দিয়ে বলল, কী কী লাগে জানি না! সব আনিস। আর বিলুকে খবর দেওয়া হয়েছে তো?

হয়েছে। বিলু আসে প্রায় রোজই।

শ্রাদ্ধ কোথায় হবে?

বুলু কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, আমার অবস্থা তো জানো। আমি কালীঘাটেই করব ভাবছিলাম।

আলাদা করবি?

বুলু একটু হতচকিত হয়ে অসহায় গলায় বলে, একসঙ্গে করার কথা কেউ তো বলেনি।

দীপনাথ একটু বিরক্ত হয়ে বলে, এই তো আমিই বলছি।

তুমি বলছ!— বলে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকে বুলু।

শ্রীনাথ কান্না সামলে ধরা ভাঙা গলায় বলে, রতনপুরে যদি সবাই মিলে করি? বুলুর কি আপত্তি হবে?

বুলু ক্ষীণ একটু হাসির চেষ্টা করে বলে, তুমি বরং বউদির মতটা নাও। আমি গরিব মানুষ, তার ওপর তোমাদের ছোট, যা বলবে তাই করব।

অত লক্ষ্মী ছেলে অবশ্য বুলু নয়। তবু সে মত দেওয়ায় খুশি হল দীপনাথ। কিন্তু বুলু একটু চুপ করে থেকে আর-একটি যে কথা বলল তাতে খুশিটা কেটে গেল।

শমিতার দিকে একবার চেয়ে নরম গলাতেই বুলু বলল, রতনপুর তো আমাদের সকলেরই জায়গা। বাবারও খুব ইচ্ছে ছিল, সবাই মিলে সেখানে গিয়ে থাকি।

দীপনাথ গম্ভীর মুখে স্নান করতে গেল। ফিরে এসে ধড়া পড়ল। আসন পেতে বিছানায় বসল শ্রীনাথের পাশে। কিছুই আর করার নেই।

শমিতা এসে জিজ্ঞেস করে, সেজদা কি ভাত খেয়ে বেরিয়েছেন?

না। শুধু ব্রেকফাস্ট। দুপুরে অফিসেই লাঞ্চ খাওয়ার কথা।

তা হলে সকলের জন্যই হবিষ্যি চাপিয়ে দিই?

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলল, না। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

তা হলে ফল কেটে দিই?

পরে দিয়ো।

স্নান করে এলেন, এখন তা হলে একটু কফি খান।

দীপনাথের এত আপ্যায়ন ভাল লাগছিল না। উদাস গলায় বলল, দাও।

কফি খাওয়ার সময় বুলু কথাটা তুলল, সেজদা, তুমি তো একসঙ্গে কাজ করার কথা বললে। কিন্তু কার কী রকম শেয়ার হবে, কাজই বা কেমন করা হবে সেসব তো জানা দরকার। আমার অবস্থা তো জানোই।

দীপনাথ খুবই বিরক্ত বোধ করল। কিন্তু নিজের ওপর তার শক্ত নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই রাগ দেখাল না। শান্ত স্বরে বলল, বাবার খবরটা এইমাত্র পেয়েছি, এখনই ওসব কথা ভাবতে ভাল লাগছে না। পরে বলিস। খরচের জন্য ভাবনা নেই। বাবার জন্য তো আমি তেমন কিছু করিনি।

এ কথায় বুলুর শোকাতুর মুখেও কিছু উজ্জ্বলতা ফুটল।

শমিতা বলল, সেজদা তো মেসে থাকেন। সেখানে এসব নিয়ম পালনের অসুবিধা। আমি বলি, এই ক'টা দিন আপনি এখানেই থাকুন।

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলল, না। রতনপুরেই যদি বাবার কাজ করতে হয় তবে আমাদের সকলেরই রতনপুরে চলে যাওয়া দরকার আজই।

বুলু বলে, কিন্তু বউদির মতামত?

বউদি অমত করবে না। বরং খুশি হবে।

এ কথায় শমিতা বা বুলু খুব সন্তুষ্ট হল না। নিজেদের মধ্যে একটা তাকাতাকি করে চুপ করে রইল।

সংসারের এই সব পরস্পর-বিমুখ চোরাস্রোত থেকে সরে থাকবার জন্যই দীপনাথ সারাটা দুপুর পড়ে ঘুমুল। ঘুমটার খুবই দরকার ছিল তার।...

তার শ্রাদ্ধ যে এত ঘটা করে হবে তা বোধ হয় দীননাথ স্বপ্নেও ভাবেনি। দীপনাথ আর তৃষা মিলে খুব কম করেও হাজার দশেক টাকা খরচ করেছে। বুলু শ' দুই টাকা দিতে চেয়েছিল, নেয়নি। বাচ্চা ষাঁড় থেকে শুরু করে খাট বিছানা ছাতা লাঠি কিছুই বাদ রইল না দানসামগ্রীতে। অন্তত সাতশো লোক নিমন্ত্রিত ছিল। দীননাথের ভাগ্য ভালই যে, আজ বৃষ্টিও হয়নি। সন্ধের কিছু পরে ফুটফুটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে।

অনেক রাতে ক্লান্ত তিন ভাই আর বিলু ভাবন-ঘরে বসেছে। বহুকাল বাদে চার ভাই-বোন এই এক হওয়া। বিলু স্বভাবতই গম্ভীর, অথবা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু দীপনাথের মনে হয়, প্রীতম নিরুদ্দেশ হওয়ায় যতটা দুর্ভাবনা বা উদ্বেগ থাকার কথা ছিল বিলুর ততটা নেই। অফিস করছে, অরুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলছে। শুধু লোকের সামনে একটা গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে নেয় মাত্র।

ছোট ভাই বুলু অনেক সুযোগ খোঁজার পর এই প্রায় রাত বারোটার কাছাকাছি সময়ে সুযোগ পেয়ে বলছিল, দাদার সম্পত্তি দাবি করে আমি হয়তো ঠিক কাজ করিনি। বউদির কাছে মাপ চাইতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার অবস্থার কথা বিবেচনা করে যদি তোমরা সবাই মিলে একটা অংশ আমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করো তা হলে আমার খুব উপকার হবে।

দীপনাথ এই ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। সে মাথা নেড়ে বলে, তোর যখন যা দরকার আমাদের কাছে বলিস। সাধ্য মতো মেটানোর চেষ্টা করব। কিন্তু দাদার সম্পত্তির অংশ চাস কেন? দাদা যাকে ভাল বুঝেছে তাকে দিয়ে গেছে। এর ওপর আমাদের কোনও দাবি খাটে না।

দাবি করছি না তো। আর সব সময়ে তোমাদের গিয়ে ডিস্টার্ব করাও কি ভাল? মানুষ বিরক্ত হয়, খুশিমনে দেয় না। সে মায়ের পেটের ভাই হলেই কী!

এসব কথায় শ্রীনাথ বা বিলু যোগ দিচ্ছে না। চুপ করে বসে আছে।

দীপনাথ জিজ্ঞেস করে, তুই কী চাস? তোরা তো অল্প বয়সের দু'টি স্বামী-স্ত্রী, বাচ্চা-কাচ্চাও নেই, এখনই তোর এত অভাব কেন?

অভাব হলে কী করব বলো? বড়দা বেঁচে থাকতে আমাকে একবার বলেছিল, তুই রতনপুরে এসে থাক। তখন বিয়ে করিনি। ভাবলাম, গাঁয়ে এসে থাকার মানেই হয় না। কিন্তু যদি থাকতাম তা হলে এই গোটা বিষয়সম্পত্তি আমারই হত।

দীপনাথ জানে, মল্লিনাথ বোকা ছিল না। সে আর যাকেই হোক কিছুতেই বুলুকে এই সম্পত্তি লিখে দিয়ে যেত না। তবে কথাটা বলল না দীপনাথ। ঘুরিয়েই বলল, তা যখন দিয়ে যায়নি তখন নিজের ভাগ্যকে মেনে নেওয়াই তো পুরুষের কাজ।

বুলু তবু ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে, আমি বেশি কিছু চাই না। বিঘে দশেক ধানি জমি, একটু বাস্তুজমি আর কয়েক হাজার টাকা। তা হলেই আমার হয়ে যাবে।

দীপনাথ একটু হেসে বলে, সেটাই কি এই বাজারে কিছু কম?

দাদার সম্পত্তির তুলনায় কিছুই নয়। এটুকু বউদি অনায়াসে ছাড়তে পারে।

দীপনাথ ধীরে ধীরে রেগে উঠছিল। সে হয়তো এ কথার একটা কড়া জবাব দিত। কিন্তু ঠিক এই সময়ে বাইরে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। সেই সঙ্গে খুব দৌড়োদৌড়ি।

পুরনো স্কুলবাড়ির দিকে তৃষা যে তিনতলা বাড়িটা তুলছে সেই দিকেই টর্চ আর লম্ফের আলো দেখা যাচ্ছে অনেক। খুব ভিড়ও।

পুরনো স্কুলবাড়ির কাছেই মল্লিনাথ একটা তিনতলা বাড়ির ভিত গেঁথে রেখেছিল। বাড়িটা করে যেতে পারেনি। প্ল্যান স্যাংশন করাই ছিল। ক্রমে সেটা আগাছায় ঢেকে যায় আর লোকে ভুলেও যায় সে কথা। ভোলেনি তৃষা। আচমকা সেই বন্যার পরই সে জঙ্গল সাফ করিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ির কাজ শুরু করে দেয়। তিনতলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। এখন পলেস্তারা পড়বে, দরজা জানালা বসবে, মেঝেয় টালি পাতা হবে। অনেক কাজ বাকি। জ্যোৎস্নারাতে সেই অতিকায় অন্ধকার কাঠামোটা দাঁড়িয়ে থাকে পোড়ো বাড়ির মতো।

পরশু এখানে আসার পর থেকেই এই অসমাপ্ত বাড়িটা সম্পর্কে অসীম কৌতূহল শমিতার। বহুবার সে এসে ঘুরঘুর করে বাড়িটা দেখে। প্রতি তলায় তিনখানা করে শোওয়ার ঘর, ডাইনিং, ড্রয়িং, দুটো করে বাথরুম। একদম কলকাতার বড়লোকদের ফ্ল্যাটবাড়ির মতো ব্যবস্থা। কত টাকা যে খরচ হচ্ছে!

নিতাই খ্যাপা আবার তার মধ্যেই ইন্ধন জুগিয়ে এক ফাঁকে চুপি চুপি বলে গেল, ওই বাড়ির ভিতের নীচেই যে মল্লিবাবুর মেলা টাকা পোঁতা ছিল। বউদিমণি মাটি খুঁড়ে টাকা বের করেছে।

খুব বিশ্বাস না হলেও শমিতা জিজ্ঞেস করল, কত টাকা?

পাঁচ লাখ শুনেছি। মস্ত কাঠের বাক্স ভরা।

হতেও পারে। জমির দাম না ধরলেও এত বড় একটা বাড়ি করতে যে অনেক টাকার দরকার তা শমিতা জানে। এত সুন্দর ডিজাইন, এত ভাল প্ল্যানিং-এর বাড়িও বড় একটা দেখা যায় না। কাজ শেষ হলে বাড়িটা দেখতে হবে স্বপ্নের মতো।

এ বাড়ির তারা দু'টি মাত্র বউ। এই সম্পত্তি তাদের কারও স্বামীই অর্জন করেনি। মুফতে সম্পত্তিটা হাতিয়ে নিয়েছে মেজো জন। শমিতার সারা গা জ্বলে যায়। মাটির নীচে থেকে যদি সত্যিই এত টাকা পেয়ে থাকে তবে সেটা আরও একটা জ্বলুনির কারণ।

কাজের বাড়ির ভিড় পাতলা হওয়ার পর আবার কৌতূহলবশে হাঁটতে হাঁটতে জ্যোৎস্নায় এই স্বপ্নের বাড়িটার কাছে চলে এসেছিল শমিতা। এই রকম একটা বাড়ি যদি তার হত।

জ্যোৎস্নায় ধোয়া বাড়িটার চারদিকে বালি, পাথরের স্তূপ, ইটের পাঁজা, বাঁশ, কাঠ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে।

এই সময় হঠাৎ সে দেখতে পেল, তিনতলার আলসের ওপর কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কে? খুবই স্পষ্ট জ্যোৎস্না পড়েছে তার মুখে। তার চেয়েও বড় কথা, লোকটা মস্ত লম্বা, বিশাল চওড়া। পরনে সাদা পাজামা, বড় ঝুলের পাঞ্জাবি, বাবরি চুল।

প্রথমে বোবা হয়ে গিয়েছিল শমিতা। তারপর এক বিকট বিকারের গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ভূত! ভূত! ভূত!

॥ উনআশি ॥

শমিতা চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। লোকজন যখন এসে তাকে তুলল, তখন দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, দু' হাতে শক্ত মুঠো, গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা থেকে।

'ভূত! ভূত!' চিৎকারটা শুনেছিল অনেকেই। কিন্তু কী দেখে ভয় পেয়েছে তা কেউ বুঝতে পারছিল না।

চামচের উলটো দিক ঢুকিয়ে শমিতার দাঁত আলগা করে দিল বৃন্দা। গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া নুন খাওয়ানো হল। জলের ঝাপটা চলছিলই।

সকলেই উদ্বিগ্ন। কিন্তু সোমনাথ ক্রুদ্ধ। সে বার বার সেজদার কাছে মৃদু স্বরে নালিশ করছে,

কনস্‌পিরেসি! ওকে কেউ ভয় দেখিয়েছে। আমি এর শোধ নেব সেজদা।

মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যেই চোখ খুলল শমিতা। তবে চোখের দৃষ্টি বোবা, শূন্য। প্রকৃত চেতনা ফিরতে আরও অনেকটা সময় নিল সে।

সোমনাথ যত আস্তেই বলুক তার কথাগুলো কানে গেছে তৃষার। তার মুখ থমথমে। শমিতাকে প্রথম প্রশ্ন করল সে-ই, কাকে দেখেছিলি বল তো ছুটকি ঠিক করে? কী হয়েছিল?

শমিতা একটু শিউরে উঠে চোখ বুজল। তারপর চোখ খুলে বলল, নতুন বাড়ির আলসেয় বড়দা দাঁড়িয়েছিলেন।

বড়দা?

পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা। খুব লম্বা-চওড়া। বাবরি চুল।

স্পষ্ট দেখলি?

একদম স্পষ্ট।

তৃষা কাউকে কিছু বলল না। নিঃশব্দে গিয়ে নিজের বড় টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নতুন বাড়ির ভিতরে পাতলা অন্ধকার। তৃষা টর্চটা জ্বালল না। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। এ বাড়িতে এতকাল থেকেও সে কোনওদিন মল্লিনাথের ভূতকে দেখেনি। শমিতা ভাগ্যবতী, তাই দেখেছে, তবে ভূত নয়।

ছাদ পর্যন্ত উঠতে দমে টান পড়ল তৃষার, সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে একটু দম নিল সে। ছাদের একধারে জলের ট্যাংক সদ্য বসানো হয়েছে। বেশ বড় ট্যাংক।

তৃষা নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। তবে বুকটা সামান্য দুরদুর করে। সে তো জানে কে আছে আড়ালে। এই পৃথিবীতে একমাত্র একজনেরই মুখোমুখি হতে সে অস্বস্তি বোধ করে।

ডাকতে হল না। তৃষার নিঃশব্দ উপস্থিতি টের পেয়েই জ্যোৎস্নায় অকপটে বেরিয়ে এসে ভূতটা দাঁড়ায়। জ্যোৎস্নাতে তাকে আজ মল্লিনাথ বলে ভুল করতে ইচ্ছে হল তৃষারও।

তৃষা কিছু বলার আগেই সজল বলল, আমি কী করে জানব যে কাকিমা ওরকম ভয় পাবে?

তুই এখানে কী করছিলি?

হাওয়া খাচ্ছিলাম।

তৃষা জ্যোৎস্নায় তার সামনের বিভ্রমের দিকে চেয়েছিল। মল্লিনাথ যেন রূপ ধরে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে মা, তবু তার চোখেও ধাঁধা লেগে যায়।

তৃষা একটু তেতো গলায় বলে, তোর হঠাৎ পায়জামা-পাঞ্জাবি পরার শখ হল কেন?

বাঃ, এখন লম্বা হয়েছি না! হাফপ্যান্ট পরলে সবাই খ্যাপায়।

কথাটা ঠিক।

তৃষা মৃদু স্বরে বলল, আস্তে করে নেমে যা। সকলের চোখের সামনের যাওয়ার দরকার নেই। বিল্টুদের বাসায় গিয়ে পোশাক পালটে শুয়ে থাক।

সজল একটু মাথা উঁচু করে তেজি গলায় বলল, লুকোচুরির কী আছে? আমি তো কোনও খারাপ কাজ করিনি।

তৃষা তেতো গলায় বলে, খারাপ কাজ করিসনি তো কাকিমা যখন চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল তখন নেমে গিয়ে ধরিসনি কেন?

আমি বুঝতে পারিনি যে, কাকিমা আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি বরং চেঁচামেচি শুনে চারদিকে ভূতটাকে খুঁজলাম!

কথাটা পুরো সত্যি নয়, তৃষা জানে। তবে সে তর্ক না করে শুধু বলল, তবু এখন লোকের সামনে না যাওয়াই ভাল। সোমনাথের সন্দেহ, ছুটকিকে ইচ্ছে করে ভয় দেখানো হয়েছে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছিল। কথার আওয়াজ। একাধিক লোক ছাদে তদন্ত করতে আসছে।

তৃষা ছেলের দিকে চেয়ে বলল, কী করবি?

বিরক্ত গলায় সজল বলে, যাচ্ছি।

তারপরই অত্যন্ত লঘু অভ্যস্ত হাতে-পায়ে সে ছাদের পিছন দিকের বাঁশের ভারা বেয়ে চোখের পলকে নেমে হাওয়া হয়ে গেল। তৃষা ন্যাড়া ছাদটার পাশে গিয়ে উঁকি মেরে নিশ্চিন্ত হয়। তারপর টর্চ জ্বেলে চারদিকে দু'-তিনটে সিগারেটের অবশিষ্ট টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ফেলে দেয়।

দীননাথ আর সোমনাথ ছাদে এসে দাঁড়ায়।

দীপনাথ বলে, সাহস বটে তোমার। এইমাত্র একজন ভূতের ভয় পেল যেখানে, সেখানে তুমি একা এলে কোন সাহসে?

তৃষা গম্ভীর মুখ করে বলে, আমরা তো গাঁয়ের লোক, অত ভয় থাকলে আমাদের চলে না।

সোমনাথ জিজ্ঞেস করে, কাউকে দেখলে?

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ছুটকিটা ভুল দেখেছে।

সোমনাথ একটু রাগের গলায় বলে, ভুল তো বটেই। তবে দেখেছে না দেখানো হয়েছে সেইটাই প্রশ্ন।

গত দু'দিন ধরে সোমনাথ আর শমিতা এ বাড়িতে আছে বটে, কিন্তু তারা এখনও সজলকে দেখেনি, তৃষা জানে। পরীক্ষার পড়ার ক্ষতি হবে বলে শ্রাদ্ধের তিন-চারদিন আগেই সজল গিয়ে তার বন্ধু বিল্টুদের বাড়ি উঠেছে। সজল বেশি লোকজন সহ্য করতে পারে না। তাই ক'দিন বাড়িমুখো হয়নি। কী খেয়ালে আজ হঠাৎ যে চুপি চুপি এসে ছাদে উঠেছিল! সিগারেট খেতেই কি? ছোট্ট সজল যে খোলস ছেড়ে কতটা অন্য রকম হয়েছে তা দেখে তৃষাই চমকে যায়, শমিতা বা সোমনাথ তো যাবেই। কিন্তু সজলের কথাটা এখন ভাঙারও মানে হয় না।

তৃষা মৃদু স্বরে বলল, ছুটকিকে কে ভয় দেখাতে যাবে বলো তো? তুমি সব সময়ে অন্য রকম ভাবো কেন? স্বাভাবিক কিছু ভাবতে পারো না?

সোমনাথ তৃষার গলার স্বরে মৃদু ইস্পাতের স্পর্শ টের পেল ঠিকই। সেই মারের স্মৃতি সে ভুলে যায়নি। এখানে বউদির লোক তাকে মেরে পুঁতে ফেললেও কেউ কিছু করতে পারবে না। সোমনাথ সামলে গেল।

দীপনাথ চারদিকটা ঘুরে ঘুবে দেখছিল। হঠাৎ বলল, যেই হোক, এই সরু কার্নিশের ধারে তার দাঁড়িয়ে থাকাটা খুবই দুঃসাহসের কাজ।

কথাটার মানে সোমনাথ বুঝল না। তৃষা বুঝল।

দীপনাথ কী যেন একটা কুড়িয়ে নীচে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর বলল, না, কেউ ছিল বলে মনে হয় না। শমিতা উপোস-টুপোস করে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভুলই দেখেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় নানা রকম দেখা যায়।

তিনজন নেমে এল আস্তে আস্তে।

সোমনাথ তার ঘরে চলে গেল। দীপনাথ একটু পিছিয়ে তৃষার দিকে চেয়ে একটু রাগের গলায় বলল, ওকে ওরকম কার্নিশের ধারে দাঁড়াতে বারণ কোরো। পড়ে গেলে কী হত?

তৃষা বলে, বারণ শোনে নাকি?

কোন বাড়িতে গিয়ে পালিয়ে আছে যেন?

বিল্টুদের বাড়ি। কাছেই।

বুলু আর শমিতা কাল চলে যাবে। তার আগে যেন এ বাড়িতে না আসে, খবর পাঠিয়ে দিয়ো।

দেব।

সিগারেট খায় নাকি?

তাই তো দেখছি।

একটা টুকরো কুড়িয়ে পেলাম কার্নিশের ধারে।

আমিও পেয়েছি।

এ কথার পর দু'জনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে।

দীপনাথ হাসতে হাসতেই ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, আজকালকার ছেলে। যা-ই হোক, ওকে বোলো এই বয়সে সিগারেট ধরলে আর বক্সার বা কুং-ফু মাস্টার হওয়ার আশা নেই। এ কথাটা বললে কাজ হবে।

তৃষা বলল, তার চেয়ে বেশি কাজ হবে বড়কাকা বারণ করে গেছে বললে।

তবে তা-ই বোলো।

তৃষা আচমকাই বলে, আমেরিকা কবে যাচ্ছ?

খুব শিগগির। হয়তো সামনের মাসে।

ছ' মাস থাকবে?

তাই কথা আছে। তবে বেশি দিনও থাকতে হতে পারে।

চিরদিনের জন্য থেকে যাবে না তো?

থাকলে দোষ কী? আমার তো পিছুটান নেই।

তোমার নেই জানি। তোমার মায়া-মমতাও বড্ড কম। কিন্তু আমাদের তো তা নয়। তুমি গেলে আমার মনটা ভারী খারাপ হবে।

জানি বউদি।— বলে দীপনাথ হঠাৎ একদম চুপ হয়ে গেল।

মাঝরাতে সোমনাথের ঘরে আবার হানা দিল ভূত।

মাথা গরম ছিল বলে সোমনাথের ঘুম গাঢ় হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে জেগে উঠে জল আর সিগারেট ধরায়। আবার খানিকক্ষণ ঝিমুনির মতো আসে। তৃষার অন্যান্য বিষয়সম্পত্তি, শমিতার ভূত দেখা থেকে শুরু করে অতীতের সব স্মৃতি তাকে বড় জ্বালাচ্ছিল।

মাঝরাতে যখন বেশ লম্বা একটা ঝিমুনি এসেছে তখনই সে মৃদু ডাক শুনল, বুলু! এই বুলু!

চটকা ভেঙে চাইল সে। অবিকল বড়দার গলার স্বর। অবিকল। শিয়রের জানালায় শেষ রাতের একটু অবশিষ্ট জ্যোৎস্না ছিল। চোখ গেল সেদিকেই।

পাঞ্জাবি পরা বড়দা দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা।

সোমনাথ কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল ভয়ে। এমনকী চোখের পাতাটা পর্যন্ত ফেলতে পারল না। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বড়দা বলল, দাবি ছাড়িস না। এই সম্পত্তিতে তোরও অধিকার।

ব্যস, তারপরই বড়দা মিলিয়ে গেল জ্যোৎস্নায়।

যখন মিনিট দশেক পর সে শমিতাকে ডেকে তুলল তখন তার কথাবার্তা অসংলগ্ন। চোখ অস্বাভাবিক।

স্বামী-স্ত্রী বাকি রাতটা আর ঘুমোল না। বাতি জ্বেলে পরস্পর গা ঘেঁষে বসে রইল।

সোমনাথ বলল, বড়দা আজ আমাদের দু'জনকেই দেখা দিয়েছে।

শমিতা বড় অবাক এখনও। বলে, কেন বলো তো? আমার ভীষণ ভয় করছে।

বড়দা দাবি ছাড়তে বারণ করে গেল।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু এখন আমরা কী করব? দিদির হাতে যে অনেক গুন্ডা।

তা হোক। বড়দা যখন বলে গেছে তখন আমরা একদিন না একদিন সম্পত্তি পাবই।

সকাল হতেই সোমনাথ সবিস্তারে রাতের ঘটনা জনে জনে রটিয়ে বেড়াতে থাকে। কিন্তু বলতে বলতেও সে বুঝতে পারে, কথাটা কেউ খুব একটা বিশ্বাস করছে না।

সকালের চায়ের আসরে ঘটনাটা শোনার পর দীপনাথ একটু হেসে বলল, বড়দা যে কেন তোদের দু'জনকেই সম্পত্তির দাবি ছাড়তে বারণ করল সেটাই তো বুঝছি না। ভাইয়ের সম্পত্তিতে যদি ভাইয়ের দাবি থাকে তবে আমিও তো বাদ যাই না।

তোমার তো দরকার নেই সেজদা। তুমি চার হাজার টাকা মাইনে পাও।

মাইনের সঙ্গে দাবির কী সম্পর্ক তা বুঝল না দীপনাথ। তবে আড়ালে গিয়ে তৃষাকে বলল, সজলটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। ওর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।

পরে বোলো। ওরা চলে যাক।

আমাকেও যে সকালের গাড়িতেই যেতে হবে। ছুটি নেই।

রবিবারেও কাজ?

আমাকে রবিবারেও যেতে হয়।

দেরি করে যেয়ো। আমি সকালে ওর কাছে গিয়েছিলাম। মুখে গুচ্ছের পাউডার মেখে সাদা করেছিল রাত্রে। সেই পাউডার তখনও লেগে আছে।

কী বলল?

কিছু না। কোনও জবাব দিল না।

ও কি সোমনাথকে তোমার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতে চায়?

তৃষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বোধ হয় তাই।

কেন বলো তো বউদি?

তৃষা এক অদ্ভুত ক্লান্ত চোখে দীপনাথের দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে অনেকদিন আগেই তো বলেছি, আমার আপনজনেরা কেউই আমার বন্ধু নয়। তার মধ্যে ছেলেটা আরও বেশি শত্রু। আমি মরলে ও খুশি হয়।

দীপনাথ এ কথার জবাব দিল না। চেয়ে রইল।

আমেরিকা যাচ্ছ যাও। এসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমারই পাপের শাস্তি। একদিন হয়তো খবর পাবে, বউদি নেই।

সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছ বউদি।

না গো। আমি অত সহজে ভেসে যাই না। সহজে ভেসে যাবও না।

আমি সজলের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। বিল্টুদের বাড়ি কোন দিকে?

সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু গিয়ে লাভ হবে না। এতক্ষণে হয়তো বাসা থেকে বেরিয়েই গেছে।

সজলকে তুমি সামলাতে পারছ না, না বউদি?

না। এই একটি জায়গায় আমি হেরে যাচ্ছি।

ও একটু ওয়াইল্ড। কিন্তু ওর মধ্যে জিনিস আছে।

সে তোমরাই বুঝবে।

হি হ্যাজ পার্সোনালিটি।

হবে বোধহয়।

দীপনাথ একটু হাসল। আর কিছু বলল না। সাত-পাঁচ ভেবে সে বিল্টুদের বাড়িতেও হানা দিল না। দুনিয়ার সব বিবাদই যে অশুভ এমন নয়। হঠাৎ তার মনে হল আজ, এই যে বউদির সঙ্গে সজলের অ-বনিবনা এর মধ্যেও একটা অস্তিবাচক কিছু আছে। একনায়কতন্ত্রের বিস্তার ঠেকাতে যেমন শক্ত বিরোধীদের দরকার হয়, এও হয়তো তাই। তৃষার "পাপের শাস্তি" কথাটা সারাক্ষণ কানে লেগে আছে দীপনাথের। পাপ! কীরকম পাপ? পাপ বলতে কি মল্লিনাথের সঙ্গে সেই অবৈধ প্রণয়? সজল সেই প্রণয়ের মূর্তিমান জলজ্যান্ত প্রমাণ! আজ সজলের দিকে তাকালে, যারা মল্লিনাথকে চিনত তাদের আর কোনও সন্দেহ থাকবে না।

সেই পাপের একটু শাস্তি তো তৃষারও হওয়া দরকার। দীপনাথ তাই সজলের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করল না। যা হচ্ছে হোক। হয়তো ভালই হবে তাতে।

কয়েক দিনের মধ্যেই সোমনাথ একটা বেনামা চিঠি পেল: মহাশয়, আমি গোপনসূত্রে জানি মল্লিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি তিন ভাইয়ের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া একটি উইল রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীনাথবাবুর স্ত্রী-র সিন্দুকে সেই উইল লুকানো আছে। তিনি একটি জাল উইল দ্বারা সম্পত্তি দখল করিয়াছেন। মল্লিনাথবাবুর প্রেতাত্মা আপনাকে যে দেখা দিয়াছিলেন তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি...ইত্যাদি।

সেই চিঠি নিয়ে সেদিনই সোমনাথ হাজির হল দীপনাথের অফিসে।

দেখো সেজদা, কী বলেছিলাম!

দীপনাথ ভ্রু কুঁচকে চিঠিটা পড়ল। বুঝল, ঘটনা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আদালতে এই চিঠি বা ভূতের গল্প টিকবে না বটে, কিন্তু লোভী সোমনাথ বিস্তর ঝামেলা পাকাবে। তার ফলে সোমনাথই নিঃস্ব হয়ে যাবে, হেরে যাবে। তৃষারও শান্তি থাকবে না। সজল এ কেমন প্রতিশোধ নিচ্ছে?

দীপনাথের গলা ধরে গেল দুঃখে, হতাশায়। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তবু খুব দীন আন্তরিকতায় সে বলল, বুলু, ওসব ভুলে যা...। সম্পত্তির লোভে হুট করে কিছু করে বসিস না। তোর ক্ষতি হবে।

সোমনাথ গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, মামলায় অনেক টাকা চলে গেছে। আবার মামলা জিইয়ে তোলার মতো টাকাও আমার নেই।

মামলা করিস না বুলু। শেষ হয়ে যাবি।

এত বড় অন্যায় মেনে নেব?

মেনেই নে। ওই সম্পত্তি তুই রোজগার করিসনি। দুঃখের কী?

সোমনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বলল, সেজদা, কেন যে বরাবর তুমি বউদির পক্ষ নাও তা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না। লোকে বলে বউদি মারণ উচাটন বশীকরণ জানে। তোমাকে কি বউদি বশীকরণই করেছে?

দীপনাথ করুণ চোখে এই স্বার্থে অন্ধ ভাইটির দিকে চেয়ে রইল। তাদের জন্মসূত্র এক, তবু তারা কত আলাদা রকমের! সোমনাথের মতো সেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সোমনাথ চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কাজে মন দিতে পারল না সে। অনেকক্ষণ বসে বসে সে শ্রীনাথ, সোমনাথ আর বিলুর কথা ভাবল। একজন পাগল, একজন স্বার্থপর আর একজন দ্বিচারিণী। এদের পাশে নিজেকেও দাঁড় করাল সে। নিজেও কি সে ভাল? বীথির কথা মনে নেই? সুতরাং তার তিন ভাই-বোনের পাশে নিজেকেও দিব্যি মানিয়ে যেতে দেখল সে।

বহুদিন এত ভার হয়নি মন। আজ বিষণ্ণতার বাতাসে ভরে গেল তার পৃথিবী। এই কুৎসিত পৃথিবী থেকে যদি প্রীতম বিদায় নিয়ে থাকে তবে ভালই করেছে। এখানে তোকে মানাত না প্রীতম। একদম মানাত না।

পাশপোর্ট ভিসা প্লেনের টিকিট সবই তার হাতে এসে গেছে। ভেবেছিল রওনা দেওয়ার তারিখটা দিন সাতেক পিছিয়ে দেবে। একবার শিলিগুড়ি ঘুরে আসবে। কিন্তু আজ সে মত পরিবর্তন করল। তারিখ পিছানোর কোনও মানেই হয় না। বরং যত তাড়াতাড়ি পালানো যায় ততই ভাল। আর কখনও এ দেশে ফিরে আসতে না হলে আরও ভাল।

লাঞ্চের পর বোস সাহেবের ফোন এল।

চ্যাটার্জি, কবে ফ্লাইট?

তেরো।
আনলাকি ডেট। শুনুন, হাউ অ্যাবাউট এ ফেয়ারওয়েল ডিনার? সময় করতে পারবেন?
কবে?
আজ বললে আজই। আমার বাসায়।
বাসায়?
হ্যাঁ। দীপা নিজে রাঁধবে।
উনি রাঁধতে জানেন?
বোস খুব হাসল হোঃ হোঃ করে। বলল, জানে। তবে ভয় পাচ্ছে, আপনি বামুন হয়ে কায়েতের হাতে খাবেন কি না!
আগে খাইনি নাকি?
ওর রান্না তো খাননি!
আপনি খেয়েছেন?
আমি! ও আগে তো রাঁধত। খেয়েছি। কেন বলুন তো?
না, জিজ্ঞেস করছিলাম, ওর রান্না খাওয়া যায় তো?
দাঁড়ান ওকে গিয়ে বলব।
রক্ষে করুন।
তবে কি আজ আসবেন? আপনি গ্রিন সিগন্যাল দিলে আমি ওকে টেলিফোন করব। শি উইল অ্যারেঞ্জ।
আজ থাক। কাল হবে।
ওকে।
বোস সাহেব, আপনার গলা শুনে মনে হচ্ছে শরীর এখন বেশ ভাল আছে।
আছে। একজন যোগীর কাছে আসন করা শিখছি।
কাজকর্ম কেমন চলছে?
কম্প্যানি লিকুইডেশনে যায়নি এখনও। ভাল কথা, সান-ফ্লাওয়ারে আপনার কাজকর্মের খুব সুখ্যাতি হয়েছে শুনলাম।
কে বলল?
বাতাসে শোনা যায়। আই অ্যাম প্লিজড।
ধন্যবাদ।
সুখ্যাতি আপনার পাওনাই ছিল। দেন টিল টুমরো।
টিল টুমরো।
ফোন রেখে দেয় দীপনাথ। এবং হঠাৎ টের পায়, পৃথিবী থেকে বিষণ্ণতার বাতাস বিদায় নিয়েছে। চারদিকে যেন অজস্র আলো, প্রজাপতি, সুগন্ধ।
কাল মণিদীপার সঙ্গে দেখা হবে। কাল মণিদীপার সঙ্গে দেখা হবে। কাল মণিদীপার সঙ্গে...

॥ আশি ॥

ঘুম থেকে উঠে বিলুর হাতে বড় একটা সময় থাকে না। লাবু সকালে স্কুলে চলে যায়। অখণ্ড অবসর পেয়ে বিলু দ্বিতীয় দফা ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ওঠে তখন আটটা সাড়ে আটটা। তাই তখন খুব তাড়াহুড়ো করে অফিসের জন্য তৈরি হয়ে নেয় সে।

বলতে কী এই সকালের অতিরিক্ত ঘুম, মুক্ত বিহঙ্গের মতো অফিসে বেরিয়ে পড়া, চাকরি— এই সবটাই তার কাছে ভারী উপভোগ্য। ভারী স্বাধীন, একলাএকলি জীবন। দায়-দায়িত্ব উদ্বেগ দুশ্চিন্তা বা কারও ভার বওয়া নেই। ফুরফুরে হালকা দিন কাটানো। বলতে নেই, তার অঢেল যৌবন আছে এখনও। ইদানীং তার শরীর একটু ফিরেছেও। ঢলঢলে লাবণ্য এসেছে রুক্ষ মুখটায়।

আজ সকালে স্নান সেরে এসে চুল আঁচড়ানোর সময় সে আয়নায় নিজেকে দেখছিল। নিজেকে দেখে আজকাল সে নিজেই মুগ্ধ হয়। আজেবাজে সিঁদুর দেওয়ায় সিঁথিতে চুলকুনি থেকে ঘা হয়েছিল। সেই থেকে সিঁদুরের বদলে একটু কুমকুম দিত সে সিঁথিতে। আজকাল সামান্য লিপস্টিক ছোঁয়ায় মাত্র। আসলে তো সবটাই কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস।

প্রীতমের কথা প্রায় সারাক্ষণই তার মনে পড়ে। কিন্তু সে ঘটনাকে মেনে নিয়েছে। পৃথিবীতে কারও সঙ্গেই তো চিরস্থায়ী সম্পর্ক নয়। প্রীতমের নিরুদ্দেশের জন্য দায়ীও নয় সে। কাজেই অকারণ নিজেকে ভারাক্রান্ত করে লাভ কী?

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রীতম তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। যতদিন কাছে ছিল ততদিন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা পরিশ্রমে বিলু শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রীতম শিলিগুড়িতে থাকলেও তাকে কর্তব্যবশে মাঝে মাঝে যেতে হত সেখানে। এখন সেসব বালাই গেছে। সত্য বটে, প্রীতমের জন্য আজও তার কান্না পায়, কিন্তু সেই সঙ্গে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এক মুক্তির আনন্দও ঘিরে ধরে তাকে।

সেই আনন্দেই সে গুনগুন করে গান গায়।

অসুস্থ স্বামী নিরুদ্দেশ, বেঁচে আছে কি না ঠিক নেই, এই অবস্থায় তোমার কি আর-একটু বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়? এই বলে সে নিজেকে মাঝে মাঝে মৃদু ধমকও দেয়। কিন্তু তাতে কাজ হয় না। আজকাল এক আনন্দই তাকে ভাসিয়ে নেয় যে! সে কি অবৈধ আনন্দ?

বিলু খেতে বসতে যাচ্ছিল ঠিক এই সময়ে দরজায় কেউ মৃদু কড়া নাড়ল। রোজ না হলেও মাঝে মাঝেই অরুণ এসে তাকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দেয় অফিসে। কিন্তু অরুণের কড়া নাড়ার ধরন আলাদা। তাতে আত্মবিশ্বাস থাকে। এ রকম মৃদু ভীরু আওয়াজ তার নয়।

দেখ তো কে?— অচলাকে বলল বিলু।

লাবুকে ইস্কুল থেকে আনতে যাওয়ার জন্য পোশাক পরছিল অচলা। একটু সময় নিল। কিন্তু এই ফাঁকটুকুতে আর একবারও কড়ায় নাড়া পড়ল না। অরুণ নয়। সে হলে এর মধ্যে আরও বার চারেক কড়া নাড়ত।

অচলা দরজা খুলে অবাক গলায় বলল, ও মা! শতম দাদাবাবু!

বিলু একটু থমকে গেল খাওয়ার মাঝখানে। বুকটা কেঁপে উঠল জোরে। ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। খিদে ছিল খুব, কিন্তু হঠাৎ খিদের মাথায় জল ঢেলে দিল কে যেন।

উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত-পা একটু কাঁপছিল বলে টক করে উঠতে পারল না। তার আগেই শতম এসে ঢুকল। তেমনি দাড়িওলা মুখ। রুক্ষ জোয়ান শরীর। ব্যাগটা মেঝেয় রেখে একটু শুকনো হেসে বলল, কেমন আছো বউদি?

বিলু খানিকক্ষণ শতমের দিকে চেয়ে থাকে। খারাপ খবর থাকলে শতমের মুখ দেখেই বোঝা যাবে।

কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না বিলু।

মাঝখানের ঘরে প্রীতমের চৌকিটা এক কোণে সরিয়ে দিয়ে ডাইনিং টেবিলটা পাতা হয়েছে। চৌকিটায় আজকাল অচলা শোয়। শতম বিছানায় বসে একটা ক্লান্তির শ্বাস ছাড়ল। বলল, খাওয়া থামালে কেন? খাও।

বিলু অপলক চোখে শতমকে দেখছিল। হাত-পা শরীরে ঢুকে আসবে যেন। বলল, কোনও খবর পেলে?

শতম মাথা নাড়ল, না। তবে হাল ছাড়িনি।

বিলু মাথা নিচু করে প্লেটে আঙুল দিয়ে কয়েকটা দাগ কাটল। খিদে মরে গেছে। বলল, তোমাকে আচমকা দেখে এত ভয় পেয়েছিলাম।

শতম বিষণ্ণ মুখে বলে, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কোনও খবর পেলে টেলিগ্রাম বা ট্রাংককল করতাম। নিজে এসে সময় নষ্ট করতাম না। আমি এসেছি কাজে। আজই সন্ধের গাড়িতে চলে যাব।

আজই?

আজই। বাড়ি ছেড়ে থাকার উপায় নেই। মা-বাবার অবস্থা তো জানো। কেউই বেশিদিন বাঁচবে বলে মনে হয় না।

খুব ভেঙে পড়েছেন?

তোমাকে জানাইনি ইচ্ছে করেই। বাবার সেরিব্রেল অ্যাটাক হয়ে গেছে একটা। মা'র প্রেশার দুশোর নীচে নামছেই না। মরম একটা চাকরি পেয়ে গৌহাটি চলে গেছে। রূপমকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিয়েছি। সে বেলকোবার সাইটে রয়েছে ক্যাম্প করে। বাড়িতে শুধু ছবি।

ছবির বিয়ের কিছু হল?

সেই কথাই বলতে আসা। বিয়ে ঠিক হয়েছে।

যদিও প্রীতমের বাড়ির সঙ্গে বিলুর সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ তবু একটা গিঁট তো কোথাও আছে। ছবির যে বিয়ের আর দেরি করা উচিত নয় সেটা মাঝে মাঝে তারও মনে হয়। ছবি দেখতে সুন্দরী নয়। ভাল পাত্র পেলে সেটা কপাল। বিলু জিজ্ঞেস করল, পাত্র কেমন?

খুব কিছু নয়। দাদারই এক বন্ধু।

দাদার বন্ধু? তা হলে তো বয়সে অনেক বড় হবে।

শতম হাসল, আমরা পিঠোপিঠি ভাই বোন। বয়সের ফারাক খুব একটা নয়। বড় জোর বছর দশেক।

দশ বছর! বলো কী? সে তো ছবির জ্যাঠামশাই।

শতমের মুখ থেকে হাসি গেল না, দশ বছরও আমার মতে কম। স্বামী আর স্ত্রী-র মধ্যে বয়সের অনেকটা পার্থক্য না থাকলে ইয়ার-বন্ধুর মতো সম্পর্ক হয়। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিও থাকে না। জানো তো, পতি আর পিতা একই ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ?

ও বাবা, তুমি তো আবার শাস্ত্র পড়া মানুষ! কার সঙ্গে কী বলছিলাম!

শতম মাথা নেড়ে বলল, আমি হাওয়ায় ভেসে যেতে পছন্দ করি না। যা ভাল যা মঙ্গলপ্রদ সেটা লোকে উড়িয়ে দিলেও আমি পরীক্ষা করে দেখতে ভালবাসি।

বিয়েটা কী করে ঠিক হল?

আচমকা। দাদা নিরুদ্দেশ হওয়ায় আমরা ছবির বিয়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎই দাদার আর-এক বন্ধু সম্বন্ধটা আনল।

পাত্র কী করে?

ইঞ্জিনিয়ার। জলঢাকা প্রজেক্টে আছে।

বলো কী? তা হলে তো খুব ভাল পাত্র।

আমাদের তুলনায় ভালই। পাত্র এতদিন বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছিল। কিন্তু দাদার খবর

এবং আমাদের পরিবারের অবস্থা শুনে নিজেই ঠিক করে যে, ছবিকে বিয়ে করবে।

বাঃ, খুব ভাল লোক তো!

খুবই ভাল। কোনও ডিমান্ড নেই। বরং আমাদের সাফ জানিয়ে দিয়েছে কিছু দিলেও সে নেবে না।

তুমি চেনো ভদ্রলোককে?

ছেলেবেলায় দেখেছি। তারপর উনি বাইরে চলে যান।

বাইরে বলতে বিদেশে নাকি?

না। রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর আরও কোথায় যেন।

দেখতে কেমন?

কালো। তবে বেশ স্বাস্থ্যবান। লম্বাও অনেকটা।

মা-বাবা আছে?

মা আছে।

ভাইবোন?

অনেকগুলি। চারজন বিয়ের যুগ্যি মেয়ে রেখে বাবা মারা যান। শিবেনদা চাকরি করে বোনেদের বিয়ে দিয়েছেন। তিনটি ভাইও ভাল চাকরি করছে এখন।

ঘরবাড়ি?

কোন্নগরে বাড়ি করেছে ইদানীং।

ছবিকে কোথায় রাখবে?

অতশত জানি না। জিজ্ঞেস করিনি।

নামটা কী বললে? শিবেন?

হ্যাঁ।

বড্ড পুরনো নাম। অবশ্য নামে কীই-বা এসে যায়! ছবি খুশি?

খুশি হওয়ার মতো মনের অবস্থা নয়। মা-বাবা এখন-তখন, দাদা নিরুদ্দেশ, এই অবস্থায় আর কতটা খুশি হওয়া যায় বলো? বিয়েই করতে রাজি হচ্ছিল না। ওকে রাজি করাতেই বিস্তর ধকল গেছে।

বিয়ে না হলেই বা কী করত?

ওর ধারণা বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের আর দেখার কেউ থাকবে না।

বিলু মৃদু স্বরে বলল, কথাটা তো মিথ্যে নয়। বাড়িতে আর মেয়েমানুষ বলতে কে রইল বলো!

শতম মাথা নেড়ে বলে, ওসব ভাবলে চলবে কেন? ছবি না থাকলেও দেখো আমরা ঠিক চালিয়ে নেব।

কী ভাবে নেবে? দুই ভাই বাইরে, তুমিও মাঝে মাঝে বেরোও, মা-বাবাকে দেখবে কে?

লোক রাখব।

লোক পাওয়াই কি সোজা! এখন ববং সংসারের দিকে তাকিয়ে ছবির পর তোমারও একটা বিয়ে করা উচিত।

আমার বিয়ে!—বলে খুব হোঃ হোঃ করে হাসে শতম।

সেই হাসি শুনে অচলার চা চলকে গেল। এক ফাঁকে সে শতমের জন্য এক কাপ চা করে নিয়ে আসছিল।

প্লেটের চা-টুকু বেসিনে ঢেলে অচলা কাপটা এনে শতমের হাতে দেয়। বলে, আপনি কড়া লিকার পছন্দ করেন। তাই দিয়েছি।

শতম চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বলে, বাঃ।

অট্টহাসির রেশটা তখনও তার স্মিতমুখে লেগে আছে। সে নিজের কবজির ঘড়িটার দিকে চেয়ে

বলল, তোমার তো আজ অফিসের দেরিই হয়ে যাবে দেখছি। তো এক কাজ করো না!

কী কাজ?

আজ কামাই দাও।

দিয়ে?

ছবির নেকলেস আর বেনারসিটা এখান থেকে কিনে নিয়ে যাব ভাবছিলাম। দু'জনে মিলে চলো জিনিস দুটো কিনে ফেলি।

এক কথায় উজ্জ্বল হল বিলু। শাড়ি বা গয়না কেনার ব্যাপারে কোন মেয়েই বা খুশি না হয়? সে উঠে বেসিনে মুখ ধুয়ে বলল, শিগগির স্নান করে দুটো খেয়ে নাও আগে।

তা হলে কামাই করছ?

করছি। কিন্তু বিয়ে কবে সেটা তো বললে না?

সেটা বলতেই আসা। চিঠি দিলে সময়মতো পেতে না হয়তো। বিয়ের আর ঠিক ছ'দিন বাকি।

এত তাড়া?

তাড়া পাত্রপক্ষেরই। শিবেনদার এক বোন আমেরিকায় থাকে। সে ছুটি কাটাতে এসেছে। যাওয়ার সময় হয়ে এল। সে দাদার বিয়ে দিয়েই রওনা হবে। শ্রাবণের পঁচিশ তারিখের পর আর দিনও নেই।

আমেরিকার কথায় বিলুর মুখটা ম্লান হল, সেজদা আমেরিকায় যাচ্ছে জানো?

দীপুদা?

হ্যাঁ। অফিসের কাজে। সেজদা না থাকলে কী যে একা লাগবে আমার। আর তো বাপের বাড়ির কেউ খোঁজ নেয় না সেজদা ছাড়া।

দীপুদা একটা দারুণ চাকরি পেয়েছে শুনলাম।

হ্যাঁ। চার হাজার টাকা মাইনে।

বলো কী! ভাল মানে এত ভাল তা তো জানতাম না!

চাকরি তো ভাল কিন্তু কার জন্য? বিয়ের কথা বললেই রেগে যায়।

সেই যে কী একটা কেস হয়েছিল সেটা মিটে গেছে?

ও বাবা, কে জিজ্ঞেস করবে? যা সিরিয়াস মানুষ।

কেসটা কী?

আগের কোম্পানির বসের বউয়ের সঙ্গে জড়িয়ে একটা কথা রটেছিল। আমার মনে হয় সেটা তেমন বেশিদূর গড়ায়নি। সেজদা তো ভীষণ মরালিস্ট।

দীপুদা ভীষণ মরালিস্ট আমি জানি। তাই ঘটনাটা শুনে বিশ্বাস হয়নি।

কিছু একটা হয়েছিল। তুমি স্নানে যাও তো!

জামা-কাপড় পালটাতে পালটাতে শতম জিজ্ঞেস করে, তুমি কবে রওনা হবে বলো তো?

দেখি। কালই ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দেব।

কিন্তু ট্রেনের রিজার্ভেশন কি এত অল্প সময়ে পাবে?

পেয়ে যাব। নইলে প্লেন তো আছেই। ছবির বিয়েতে যেতে তো হবেই।

দীপুদাকেও নিয়ে যেতে হবে। আজই যাব একবার অফিসে। কোথায় বলো তো?

সান-ফ্লাওয়ার বোধহয় রাসেল স্ট্রিটে। ঠিক জানি না। খুব বড় কোম্পানি।

বিলু বউদিকে বহুকাল পর আবার খুব ভাল লাগল শতমের। কোনও মানুষই আগাপাশতলা নিষ্ঠুর বা খারাপ হতে পারে না। এই যে বউদি ছবির বিয়েতে যেতে আগ্রহ দেখাচ্ছে এতেই ভারী খুশি শতম। শিলিগুড়ি থেকে আসার সময় বউদি খুব খারাপ ব্যবহার করে এসেছিল। সেই মনোভাবটা কেটে গেছে।

শতম স্নান করল, খেল। তারপর পোশাক পরে বউদির সঙ্গে যখন বেরোল তখন মেঘলা কেটে রোদ উঠেছে।

বিলু বলল, কাল রাতেও বৃষ্টি হয়েছে। আজ তোমার ভাগ্যে রোদ উঠল।

শতম হাসল, হ্যাঁ, আমাদের ভাগ্য কত ভাল তা তো জানোই!

দুপুরবেলা কাজের খুব একটা চাপ ছিল না আজ। বস্তুতপক্ষে লাঞ্চের পর নিজের আরামদায়ক চেয়ারখানায় গা ছেড়ে কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বুজেছিল দীপনাথ। এমন সময় শতমের টেলিফোন এল।

ছবির বিয়ে শুনে ভীষণ তটস্থ হয়ে ওঠে সে, ছবির বিয়ে! তাই তো! এ তো আমারও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

সে জিজ্ঞেস করল, তুই কোথা থেকে ফোন করছিস?

গড়িয়াহাটা থেকে। সঙ্গে বউদিও আছে।

বিলু!—বলে হাঁফ ছাড়ল দীপনাথ। যাক তা হলে বিলু শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক এখনও চুকিয়ে ফেলেনি। সে বলল, আমাকে কিছু করতে হবে? বল তো।

না, না। আপনাকে শুধু একবার যেতে হবে।

যাব! ছুটি যে এখনও পাওনা হয়নি।

ট্যুর নিয়ে নিন না!

দূর পাগলা। ট্যুর নেওয়া যেত আগের কোম্পানিতে। এখানে ওরকম নিজের ইচ্ছেয় ট্যুর নেওয়া যায় না।

তা হলে কী হবে? ছবির বিয়েতে আপনি যাবেন না? আমাদের দাদা নেই—

শেষ দিকটায় গলা কেঁপে বেঁধে গেল শতমের। কিন্তু দীপনাথকে পাগল করার পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট। সে চাপা ক্রুদ্ধ গলায় ধমক দিল, দূর বোকা। যাব না কী রে? ছবির বিয়েতে যাবই। ভাবিস না।

শতমের হাত থেকে টেলিফোন নিয়ে বিলু বলে, সেজদা, তুমি কবে যাবে?

আর তো মোটে ছ'দিন সময়।

আমি তা হলে তোমার সঙ্গে যাব।

যাবি?

যাব না?

প্রীতমের কোনও খবর?

না, নেই।

ও। আচ্ছা তা হলে আমার সঙ্গে যাস।

রিজার্ভেশন কি তুমিই করবে?

হ্যাঁ। প্লেনে। তোর টিকিট আমি করে রাখব।

বাঁচলাম। ট্রেনে বাচ্চা নিয়ে একা যাওয়া যে কী ঝকমারি!

তা তোর বাচ্চাটা কেমন আছে?

ভাল। খুব পড়াশুনোয় মন হয়েছে।

গান শেখা, নাচ শেখা?

শিখছে।

শতমকে আবার টেলিফোনটা দে।

দিচ্ছি।

শতম ফোন ধরলে দীপনাথ চাপা গলায় বলে, হ্যাঁরে, কিছু টাকা দিতে পারি। নিবি?
না, তার দরকার নেই।
অনেক খরচ তো বিয়ের।
সে তো বটেই, কিন্তু হয়ে যাবে। আমি গোটা দুয়েক বড় পেমেন্ট পেয়েছি।
অসুবিধে হলে কিন্তু বলিস।
বলব।
আমার কাছে হার্ড ক্যাশ আছে। পাত্র কীরকম?
আপনি বোধহয় চেনেন।
কে বল তো?
আপনাদেরই বন্ধু। শিবেন চৌধুরি।
শিবেন! শিলিগুড়ির শিবেন নাকি?
হ্যাঁ। আগে ওঁরা শিলিগুড়িতেই থাকতেন।
খুব লম্বা? কালো?
হ্যাঁ, সেই।
দীপনাথ একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, প্রীতমের সঙ্গে গলাগলি ভাব ছিল। খুব ভাল ছেলে।
আপনি যাচ্ছেন তো?
যাচ্ছি।

॥ একাশি ॥

পৃথিবীর রং অনেকটাই পালটে গেছে। এখনও বিবর্ণ নয়, তবে বহু গাঢ় রং এখন ফিকে হয়ে আসছে দীপনাথের চোখে। এ কি বয়সের দোষ?

বয়সও কম হল না। বোধহয় পঁয়ত্রিশের এপারে বা ওপারে। সঠিক হিসেব জানত মা বা পিসিমা। তাঁরা কেউ নেই। তবু বয়সেরই সব দোষ হয়তো নয়। দোষ আছে জীবনযাপনেরও। এ কেমন এক নির্ভেজাল ঘটনাহীন জীবন বয়ে যাচ্ছে তার? কলকাতায় আজও তার সত্যিকারের বন্ধু হয়নি কেউ। তার কোনও আড্ডা নেই, অবসর বিনোদন নেই। সে শুধু এক কোম্পানি থেকে আর এক কোম্পানিতে ব্যক্তিগত গুডউইল নিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে কাজ জানে, আর কিছু জানে না। বৈধভাবে কোনও মেয়ের প্রেমেও সে পড়েনি বহুকাল।

একমাত্র মণিদীপা, যাকে পাওয়ার নয় বা পেয়েও লাভ নেই। মণিদীপার দোরগোড়ায় অফিসের গাড়িটা থেকে নেমে সে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নিজের দামি জুতোজোড়ার চাকচিক্যের দিকে চেয়ে নিজের অনুজ্জ্বলতার কথা ভাবল।

সে জানে, আজ তাকে অনুজ্জ্বল, ক্লান্ত এবং খানিকটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কিছু করার নেই।

ব্যালকনিতে কেউ ছিল না। কিন্তু ওপরে উঠে সে দেখে, বোস সাহেবের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। ভিতরে বেশ গমগমে আড্ডা হচ্ছে।

দোরগোড়ায় একটু দ্বিধাভরে দাঁড়ায় দীপনাথ। কথা ছিল, আজ তার একার নিমন্ত্রণ। কিন্তু তাই কি? বোধহয় কথাটা রাখেনি বোস সাহেব। পার্টিতে গিয়ে গিয়ে দীপনাথের অভ্যেস হয়ে গেছে। ভালও লাগে না, মন্দও লাগে না। ওই একরকম। কিন্তু বোসের বাসায় আজকের নিমন্ত্রণটা একটু অন্যরকম হতে পারত।

দরজার এপাশ থেকেই অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। কাচের সঙ্গে কাচের শব্দ।

বোস উচ্চৈঃস্বরে বলল, কাম ইন! কাম ইন! ইটস ইয়োর শো। আসুন দীপনাথবাবু। জয়েন দি ক্রাউড।

ভিতরে যারা বসে আছে তারা প্রায় সবাই দীপনাথের চেনা বা আধা-চেনা। একজন বোসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মুরলী। অন্যেরা অন্য সব মেজো সেজো কোম্পানির রাঘববোয়াল। মোট জনা দশেক। মৃদু স্বরে প্রায় সবাই দীপনাথকে স্বাগত জানায়।

বোসকে যতটা মাতাল ভেবেছিল, ততটা নয়। পাশে বসতেই বুঝল। বোস মৃদু স্বরে জানিয়ে দিল, এটা ককটেল মাত্র। ডিনারে কেউ থাকবে না।

দীপনাথের দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে আসে। ইদানীং দীপনাথ মদ খায় কালেভদ্রে। খেতে খেতে অধিকাংশ লোকেরই স্পৃহা বাড়ে। দীপনাথের হয়েছে ঠিক উলটো। মদ খেলে তার ভারী মাথা ধরে। মন ভার হয়, সব দুঃখের স্মৃতি এসে ঘিরে ধরে তাকে, চারিদিকটা ভারী বিমর্ষ হয়ে যায়।

ভদ্রতাবশে দীপনাথ গ্লাসটা হাতে নেয় মাত্র। তারপর এক ফাঁকে রেখে দেয়। কেউ তেমন লক্ষ করে না অবশ্য। অফিস নিয়ে তুলকালাম কূটকচালি গল্প হচ্ছে. এসব ককটেল মিট-এ যা সাধারণত হয়ে থাকে।

কাশ্মীরা এক্সপোর্টের গোস্বামী জিজ্ঞেস করল, আপনার গাড্ডাটি তো বিগ বিজনেস। সোমানি আছে না অ্যাকাউন্টসে?

দীপনাথ মাথা নাড়ল শুধু।

গোস্বামী বলল,সোমানি কৃষ্ণমূর্তিকে লাথি মেরে উঠে গেল কী করে জানেন?

দীপনাথ মৃদু হাসল শুধু। তারপর শুনে যেতে লাগল। কোম্পানির ক্লেদ, কলঙ্ক, গুপ্ত সব পাপের কথা। অবশ্য কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। বাইরে ভাল ঢাকনা দেওয়া কোম্পানিগুলির ভিতরকার ঘা পাঁচড়া সে বহুকাল ধরে দেখে আসছে। তার অবাধ্য চোখ খুব সাবধানে, গোপনে মণিদীপাকে খুঁজছিল। কান সতর্ক। মনে হল, রান্নাঘর থেকে একবার মৃদু কণ্ঠস্বরটি শোনা গেল, দইটা ভাল করে ঘোঁটা হয়নি সতীশ, গ্রেভিতে দইয়ের টুকরো ভেসে থাকবে। ঘুঁটে দাও।

একটু হাসল দীপনাথ। মণিদীপা রাঁধছে! সত্যিই রাঁধছে! সে এতটা আশা করেনি।

সাধারণত এসব ককটেল-মিলন ভারী একঘেয়ে আর বিরক্তিকর। বোস সাহেবের চামচা থাকাকালীন দীপনাথ বিস্তর ককটেল অ্যাটেন্ড করেছে। তখন সে এদের সমকক্ষ ছিল না, তাই তখন এদের সব কথা আর কূটকচালিকে ইম্পর্ট্যান্ট ভেবে হাঁ করে গিলত। আজ দীপনাথ এদের সমকক্ষ তো বটেই, বরং অনেকের চেয়ে তার পজিশন এবং বেতন ভাল।

লরেল-অশোক ভারী স্প্রিং তৈরিতে অগ্রণী কোম্পানি। তার টেকনিক্যাল ম্যানেজাব প্রসাদ জিজ্ঞেস করল, স্টেটসে আপনার ক'দিনের প্রোগ্রাম?

ছ'মাস আপাতত। তবে আরও বেশিদিন থাকতে হতে পারে।

ইউ আর লাকি। সান-ফ্লাওয়ার যাকে নেয় তার জন্য বহুত করে। আমাদের কোম্পানির মতো হারামি নয়।

দীপনাথ একটু ক্ষীণ হেসে বলে, লাক ইজ এ রিলেটিভ টার্ম।

ওকথা কেন বলছেন? আর ইউ নট হ্যাপি দেয়ার?

দীপনাথ এবার আর-একটু বড় করে হাসে, হ্যাপিনেসও রিলেটিভ।

আপনাকে নিয়ে মশাই পারা যায় না, ক্রনিক পেসিমিস্ট। সেই আগেও দেখেছি শুকনো মুখ, এখন সান-ফ্লাওয়ারের একজিকিউটিভ বনে আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছেন, তাও সেই শুকনো মুখ।

নিজের ভিতর হাসিখুশির অভাব দীপনাথও বড় বেশি টের পায়। সে হাসবার একটা চেষ্টা করে বলল, খুশি হওয়ার মতো কিছুই ঘটে না যে মিস্টার প্রসাদ।

কাট দ্যাট মিস্টার বিট। উই আর ফ্রেন্ডস। তা খুশি হওয়ার মতো কিছু ঘটিয়েই ফেলুন।

কী ঘটাব? বিয়ে?

দূর, দূর, বিয়েটা কোনও ফেনোমেনন নয়। টেক এ গার্ল, টেক এ লং ড্রাইভ টু গোপালপুর অন সি অর ডালটনগঞ্জ, টেক টু স্কচ উইথ ইউ। দ্যাটস হ্যাপিনেস।

স্টিল রিলেটিভ।—দীপনাথ হাসিটা ধরে রাখল।

বোস একটু অস্বস্তি নিয়ে চেয়ে ছিল দীপনাথের দিকে। সম্ভবত, দীপনাথ কেন সুখী বা খুশি নয় তার রহস্যময় কার্য-কারণটা ধরার চেষ্টা করছিল আজ। বলল, লিভ চ্যাটার্জি অ্যালোন। কিছু লোক আছে তারা কিছুতেই খুশি হয় না।

এই নিয়ে বোসের সঙ্গে প্রসাদের একটা ডিসকাশন শুরু হয়ে গেল। এখনকার মানুষের অসুখী হওয়ার কারণ নিয়ে।

দীপনাথ একটা হাই গোপন করল।

ককটেল শেষ হল আটটার মধ্যেই। সবাই বিদায় নেওয়ার পর বোস দরজা দিয়ে হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া ঘরটার টেবিলে আর মেঝেয় বোতল আর গ্লাস আর ভুক্তাবশিষ্টের পিরিচগুলোর দিকে ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইল একটু। তারপর দীপনাথের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, দি ককটেল ওয়াজ নট মাই আইডিয়া। আমি নিজে ড্রিংক খুব কমই করি আজকাল।

দীপনাথ একটু অবাক হয়ে বলে, তবে কার আইডিয়া?

ওদের। আপনার সঙ্গে ওরা নতুন করে ইনট্রোডিউসড হতে চেয়েছিল।

তার কারণ?

বিজনেস-ভালচারদের তো কারণ একটাই। দে ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট সান-ফ্লাওয়ার। সান-ফ্লাওয়ার মিনস বিগ বিজনেস, সান-ফ্লাওয়ার মিনস মাল্টিন্যাশনাল। ইউ হ্যাভ অলরেডি বিকাম অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট ম্যান ইন সান-ফ্লাওয়ার। ওদের দুশ্চিন্তা, পাছে আপনি ওদের ভুলে যান। সো ইট ইজ নেসেসারি দ্যাট ইউ আর রিমাইন্ডেড অফ দেম অ্যাফ্রেশ। রিনিউয়াল অফ রিলেশনশিপ। যা খুশি ভেবে নিতে পারেন। তবে আজকের এইসব আয়োজনের টার্গেট ছিলেন আপনিই। বুঝতে পারেননি?

দীপনাথ সততার সঙ্গেই ঘাড় নেড়ে বললে, না।

ইউ আর স্টিল অ্যান ইনোসেন্ট গায়। শুনলাম আপনি এখনও সেই পুরনো মেসবাড়িতে আছেন!

মেস নয়, বোর্ডিং।

তা হবে। আপনাদের বিগ বসের স্টেনো মিহির চৌধুরীকে চেনেন তো! একই বাসে বোধহয় আপনার সঙ্গে অফিসে যায়। সে বলছিল, মিস্টার চ্যাটার্জি খুব বিচ্ছিরি একটা জয়েন্টে থাকেন।

দীপনাথ বলল, আছি তো মোটে আর-কয়েকটা দিন। এ ক'দিনের জন্য আর ফ্ল্যাট নিয়ে কী হবে? বরং ফিরে এসে দেখা যাবে।

ফিরে এসেই তো আর ফ্ল্যাট পাবেন না। যদি বলেন তবে আপনার জন্য একটা ওনারশিপ ফ্ল্যাট বুক করে রাখতে পারি। আমার এক বন্ধু শঙ্কর লেক গার্ডেন্স-এ অনেক ফ্ল্যাট তৈরি করছে। বলব তাকে?

দীপনাথ জাগতিক বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ভাবতে ভালবাসে না। একা মানুষ কোথাও পড়ে থাকলেই হয়। জবাব দিচ্ছিল না তাই। বোস বলল, কলকাতার হাউসিং প্রবলেমটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার খোঁজ বোধহয় রাখেন না।

আমি একটা পুরো অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে কীই-বা করব! একা থাকলে রান্নাবান্নার ঝামেলা আছে। ফ্ল্যাট হলে আবার তার মেনটেনেন্স নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। ঘরদোর সাজাতেও হবে একটু। আমার যা জিনিসপত্র আছে তা দিয়ে একটা ছোট ঘরও ভরে না।

চিরকাল কি সমান যাবে?

আমার বোধহয় এমনিই কেটে যাবে।

ইউ আর নট বিয়িং প্র্যাকটিক্যাল। কলকাতায় কয়েক বছর আগেও ওনারশিপ ফ্ল্যাটের নামে লোক নাক সিঁটকোত। আজকাল একটা ফ্ল্যাট বুক করাই টাফ জব। বুক করে রাখুন। ফিরে এসে সোজা নিরাপদ নিজস্ব ফ্ল্যাটে ঢুকে যাবেন। সান-ফ্লাওয়ারের একজিকিউটিভ কেন থার্ড গ্রেড বোর্ডিং-এ থাকবে!

দীপনাথ একটু ভেবে বলল, আমি ভেবেছিলাম ফিরে এসে একটু ভাল কোনও বোর্ডিং-এ উঠব। বোর্ডিং-এ আর যা-ই হোক, লোনলি লাগে না। ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, ফ্লাটটা বুক করাই যাক।

বোস খুশি হয়। বলে, উইথ এ গ্যারেজ।

ওঃ বাবা!

ডোন্ট ন্যাগ। ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড এ কার নাউ। অফিস তো কার-অ্যালাউন্স দেবেই, অ্যাডভান্সও দেবে।

দীপনাথ কিছু বলল না। বোস সাহেব তার ভালই চায় বোধহয়। এখনও চায়। মণিদীপার সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার সেই পাগলাটে চেষ্টার পরও।

এতক্ষণ একবারও মণিদীপা দেখা দেয়নি। বহুকাল মণিদীপাকে দেখেনি দীপনাথ। বলতে নেই ওই পরস্ত্রীর জন্য এখনও বুকের মধ্যে এক ছোট্ট শূন্যতা রয়ে গেছে। কোনওদিনই সেই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। মেয়েমানুষের মধ্যে শাশ্বত কিছুই পাওয়ার নেই, দীপনাথ জানে। রোমিও-জুলিয়েট, লায়লা-মজনু এসব হল ইমোশনাল একসেস। অতিশয় বাড়াবাড়ি। নারীপ্রেম জীবনের কতটুকু? ভাবপ্রবণ পুরুষেরা ব্যাপারটাকে যতদুর সম্ভব ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলেছে। তবে এও ঠিক, যাকে পাওয়া গেল না, যাকে পাওয়ার নয়, সেই মেয়েটির জন্য দীর্ঘকাল স্মৃতিগন্ধময় বেদনার মতো কিছু থেকে যায়। সেটা হয়তো সঠিক প্রেম নয়, বকলমে নিজের আহত পৌরুষ। পুরুষ যেটাকে দখল করতে পারে না সেটাকেই মহিমান্বিত করে তোলার চেষ্টা করে।

বোস সাহেব হঠাৎ বলে, প্রসাদ খুব ভুল বলেনি। আপনাকে আজকাল একটু বেশিই বিষণ্ণ দেখায়। সামথিং পার্সোনাল? সেই আপনার ভগ্নিপতির নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটাই কী?

শুধু তা নয়। আসলে পৃথিবীটা আমি যেমন চাই, পৃথিবীটা তেমন নয়।

এ কথায় বোস হেসে উঠতে পারত কিন্তু হাসল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, আপনি একটা পাহাড়ে চলে যাবেন বলে মাঝে মাঝে আমাদের শাসাতেন। এটা তারই প্রোলোগ নয় তো!

পাহাড়! বলতেই দীপনাথের সামনে মহাকায় সেই উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের একটা ছায়া ভেসে ওঠে। হিম তুষারে ঢাকা, নির্জন, নিস্তব্ধ, প্রশান্ত। পৃথিবীতে তার কোনও তুলনা নেই। কোনওদিনই সেই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছবে না সে। শুধু আমৃত্যু আরোহণ করবে। সঙ্গে খাবার থাকবে না, জল থাকবে না, জাগতিক কোনও উপকরণ থাকবে না। সান-ফ্লাওয়ারের একজিকিউটিভের পায়ের তলায় জমি নড়ে উঠল হঠাৎ। মাঝে মাঝে সে যখন ডাকে তখন সব দড়িদড়া ছিঁড়ে যেতে চায় যে!

দীপনাথ মাথা নেড়ে বলে, না। সেটা হয়তো একটা রোমান্টিক চিন্তা। কিন্তু আমি সুখী নই অন্য কারণে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই অগভীর।

আপনি বরাবরই একটু ফিলজফার ধরনের। হাই থটস্। আই র‍্যাদার লাইক ইট। কিন্তু কথাটা হল, ফিলজফাররা জীবনে সুখী হয় খুব কমই। অবশ্য নন-ফিলজফাররাই যে সুখী হয় তাও নয়।

দীপনাথ একটু করুণভাবে হাসল। প্রসঙ্গটা পালটানোর জন্য একটু নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, ইজ দি হোমফ্রন্ট ও-কে?

বোস একটু অপ্রতিভ হয়। তারপর মৃদু মাথা নেড়ে বলে, সো সো। নাথিং হ্যাপেনস্।

তার মানে?

তার মানে নাথিং। রিং-এর মধ্যে দু'জন বক্সার, দু'জনেই ডেঞ্জারাস। ঘুরছে, ঘুরছে, পরস্পরের দিকে সতর্ক চোখ রাখছে, কিন্তু কেউ কাউকে হঠাৎ অ্যাটাক করতে সাহস পাচ্ছে না। দি অ্যাটমোসফিয়ার ইজ চার্জড উইথ হেট্রেড, ক্রুয়েলটি, রেজ, বাট দেয়ার অলসো ইজ এ ভ্যাকুয়াম অফ নো অ্যাকশন। এ লাল।

দীপনাথ একটু লজ্জা, সংকোচ আর ভয়ের সঙ্গে খুব মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, নো সেক্স রিলেশন?

বোস সামান্য অবাক হয়। তবে মৃদু গলায় সহজভাবেই বলে, আই অ্যাম নো গুড ফর সেক্স নাউ। ডাক্তারের বারণ। ফিজিক্যালিও আমি আনফিট। তবে ফিট থাকলেও হয়তো সেক্স রিলেশন হত না। সেক্স তো শুধু শরীর নয়, অনেকটাই মন।

দীপনাথ মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

বোস বলল, ডু ইউ থিংক উই শুড হ্যাভ সেক্স টাইম টু টাইম?

দীপনাথ একটু হাসল। তারপর বলল, দেয়ার ইজ এ পয়েন্ট টু পন্ডার। ইট মে হ্যাভ ইটস্ ইউজফুলনেস।

বোস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বুঝলাম। কিন্তু হাউ টু অ্যাপ্রোচ? শি মে রিফিউজ, শি মে ইনসাল্ট মি। বহুদিন আমাদের সম্পর্ক নেই। বহুদিন।

পরদার ওপাশ দিয়ে একটা সুগন্ধ হেঁটে গেল। দীপনাথ আর বোস চুপ করে যায়।

একটু বাদেই সুগন্ধটা ফিরে আসে। দাঁড়ায়। তারপর পরদা সরিয়ে নিঃশব্দে ভিতরে আসে।

এতদিনে সময় হল?

দীপনাথ চোখ তোলে। কিন্তু ভাল করে তাকায় না। হঠাৎ তার চোখ দুটো আবছা হয়ে আসে।

একটু হাসবার চেষ্টা করে সে বলে, এত কী রাঁধছেন?

একজন বিগ একজিকিউটিভকে নেমন্তন্ন করলে তার উপযুক্ত আয়োজন তো করতে হয়।

আমি আজকাল খেতে পারি না।

একজিকিউটিভরা খায় নাকি? ফেলে দেয় তো। আর তারা ফেলে দিয়ে ধন্য করবে বলেই তো এত যত্ন করে রান্না।

দীপনাথ মৃদু একটু হেসে বলল, ফেলব কেন? এ বাড়িতে তো কোনওদিন পাত পেড়ে খাইনি। আজ চেটেপুটে খেয়ে যাব।

এ কথায় লুকনো ছিল চোরা মার। এ কথা ঠিক, দীপনাথ এ বাড়িতে অনেক ডিনার দেখেছে, কিছু কিছু জোগানদারের কাজও করেছে একসময়। কিন্তু গরিব ও স্ট্যাটাসহীন দীপনাথকে বোস সাহেব ডিনারে ডাকার সাহস পায়নি কখনও।

হাসিখুশি হতে গিয়েও কেমন একটু ফ্যাকাসে হয় গেল মণিদীপা। কত লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে দীপনাথের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সে। এই তো সেদিন তার সঙ্গে দীপনাথকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল বুনু। কী লজ্জা! কিন্তু আজ তার চেয়েও বেশি লজ্জা পায় মণিদীপা। সে মানুষের সমানাধিকারে বিশ্বাস করে।

বোস সাহেব তার গ্লাসের তলানি একটু হুইস্কি গলায় ঢেলে বলল, এটাকে ঠিক ফুল ফ্লেজেড ডিনার বলা চলে না। ইটস এ পার্সোনাল অ্যাফেয়ার। ডিনার হল সোশ্যাল মিট। —বলে একটু হাসল বোস। বলল, আপনি বহুদূর চলে যাচ্ছেন। আজ চোখের জলে কিছু খাদ্যের সামনে বসে থাকা।

বোস এভাবে কথা বলে না কখনও। এই কথাটুকুর মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। গভীর ভালবাসা ছিল। তাই অস্বস্তিটা কেটে গেল আবহাওয়া থেকে।

দীপনাথ সহজভাবে বসে বলল, মণিদীপা, আপনি কি এখনও একজিকিউটিভদের ঘেন্না করেন?

আমি বর্ন-হেটার অফ একজিকিউটিভস।

ভালবাসা বা ঘেন্না দুটোই দীর্ঘদিনের অভ্যাসে রপ্ত হয়। কেউ ঘেন্না নিয়ে জন্মায় না। আপনাকে কেউ না কেউ ঘেন্না করতে শিখিয়েছে।

হবে।—বলে মণিদীপা মুখোমুখি বসে। পরনে মোটা তাঁতের শাড়ি এবং সেটারও খুব চিক্কণতা নেই, ভাঁজ নেই। চুল এলোমেলো। মুখে ঘাম। আঁচলে মুখ মুছে বলল, কেউ হয়তো শিখিয়েছে।

কিন্তু একজিকিউটিভদের ঘেন্না করার কিছু নেই। বরং তারাই সবচেয়ে করুণার পাত্র। মালিকরা তাদের বেশি মাইনের লোভানি দিয়ে লেলিয়ে দেয় নিজেদের ইচ্ছাপূরণে। দে বিকাম ডগস অফ দি ক্যাপিটালিস্টস। তারা যে চাকর সেটা ভুলে গিয়ে কিছুদিন ভুল অভিনয় করে যায় মাত্র। লম্বা বেতন পায় ঠিক, কিন্তু মদে পার্টিতে স্ট্যাটাসের পেছনে এত উড়িয়ে দেয় বা দিতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত দে বিকাম হ্যাভনটস। প্রলেতারিয়েতস। বিশ্বাস করেন?

আপনি কি তাই?

আমি এ লাইনে নতুন। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

বোস সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কথাটা ঠিক।

আসুন, খেতে দিই।—বলে মণিদীপা উঠল।

যখন খেতে বসার আগে বেসিনে হাত-মুখ ধুচ্ছিল দীপনাথ তখন মণিদীপা কাছে এল আচমকা। মৃদু স্বরে বলল, অনেক দূর। কেন যাচ্ছেন?

চাকরি।

মণিদীপা ঠোঁট কামড়ে একটু হাসে, আমেরিকায় না গেলেও দূরই তো ছিলেন। এ থাউজ্যান্ড লাইট-ইয়ারস।

দূরই ভাল।

ভুলে যাবেন?

সব কি ভোলা যায়? বোসকে দেখবেন। উনি খুব হেলপলেস।

জানি। আমিও তো হেলপলেস।

দু'জনেই হেলপলেস হলে আশা আছে। ইউ ক্যান হেলপ ইজ আদার।

ওসব থিয়োরি, থিয়োরি। জীবন ওরকম নয়।

॥ বিরাশি ॥

কী খাচ্ছে, রান্না কেমন হয়েছে এসব টের পাচ্ছিল না দীপনাথ। খেতে হবে বলে মুখ নিচু করে খাচ্ছে মাত্র। বহুদিন বাদে মণিদীপার সঙ্গে এই দেখাটা না হলে বুকের মধ্যে পুরোনো ক্ষতের মুখ নতুন করে খুলে যেত না। কষ্ট হত না।

সে বলেছিল, পাত্রী পছন্দ নয়। সেটা মিথ্যে কথা। মণিদীপাকে সে বহুকাল ধরে ভালবাসে। শুধু চৌকাঠ ডিঙোয়নি। ইচ্ছে করলেই ডিঙোনো যেত। আজও ওদের স্বামী-স্ত্রীর যা সম্পর্ক তাতে দীপনাথ এখনও চাইলে অনায়াসে মণিদীপাকে পেতে পারে। কিন্তু কোথায় একটা নৈতিক বাধা, বিবেকবোধ এসে পথ জুড়ে দাঁড়ায়। সজাগ হয়ে ওঠে নানারকম যুক্তিবুদ্ধি, বিধিনিষেধের বোধ। এই জন্যেই কি মাঝে মাঝে তাকে ব্যক্তিত্বহীন বলে গাল দিত মণিদীপা?

ডিনারটা যত আনন্দের হতে পারত ততটা হল না। বোস চুপ। মণিদীপা পরিবেশন করছে।

দীপনাথ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ একবার জিজ্ঞেস করল, আমেরিকায় স্নিগ্ধদেবের ঠিকানাটা জানেন?

মণিদীপা একটু শক্ত হয়ে গেল। বলল, কেন?

ভদ্রলোক যখন এ দেশে ছিলেন তখন দেখা হয়নি, এখন বিদেশে একবার দেখা করার চেষ্টা করব।

দেখা করবেন কেন?

দীপনাথ মুখে বিস্ময় ফোটানোর চেষ্টা করে বলে, কেন বলিনি আপনাকে? উনি যে আমারও লিডার ছিলেন।

মণিদীপা মাথা নেড়ে বললে, দেখা করবেন না দয়া করে।

কেন বলুন তো?

কী লিখেছে আমাকে জানেন?

কী?

লিখেছে ভারতবর্ষের প্রোলেতারিয়েতদের চরিত্র আলাদা। তাদের দিয়ে কিছুই হওয়ার নয়। এত অপদার্থ এলিমেন্ট পৃথিবীর কোথাও নেই। প্রতি তিনজন ভারতবাসীর একজন চোর, অন্যজন অলস, তৃতীয়জন কাপুরুষ। আরও লিখেছে, ভারতবর্ষে বিপ্লবী আর অ্যান্টিসোশ্যালের মধ্যে তফাত প্রায় নেই-ই। শুধু পারপাসটুকু আলাদা, নইলে দু'দলই একই কাজ করে। কিছু বুঝলেন?

দীপনাথ হাসিমুখে বলে, এসবই তো কঠোর সত্য। আমিও এরকমই ভেবে রেখেছিলাম। এখন লিডারের মুখে শুনে আরও পেত্যয় হল।

যাদের নিয়ে রসিকতা করা যায় স্নিগ্ধ তাদের দলে পড়ত না। আজ অবশ্য আপনি সবই বলতে পারেন।

আমি রসিকতা করছি না মিসেস বোস।

করলেও দোষ নেই। শুধু প্লিজ, ওর সঙ্গে দেখা করবেন না।

আমি শুধু ভাবছি এই তিনজনের মধ্যে আমি কোন জনা!

কে তিনজন?

ওই যে স্নিগ্ধ লিখেছেন একজন চোর, একজন অলস, একজন কাপুরুষ।

বোস সাহেব নিপাট ভালমানুষি মুখে শুনতে শুনতে এতক্ষণ একটা মাছের মাঝের কাঁটা চিবোচ্ছিল। হঠাৎ বোস বলে, তৃতীয়জন।

দেন কাওয়ার্ড।—বলে দীপনাথ বোস সাহেবের মুখের দিকে তাকায়।

বোস মাথা নাড়ে, দি টার্ম স্যুটস ইউ, স্যুটস মি, স্যুটস এভরিবডি।

মণিদীপা একটু ফ্যাকাসে হয়। এই কথার খেলার মধ্যে গোপনে একটু হুল দেওয়ার চেষ্টাও কি নেই! দীপনাথকে বুনু কেন কাওয়ার্ড বলবে?

মৃদু স্বরে মণিদীপা বলে, না, দীপনাথবাবু, আপনি কাওয়ার্ড নন।

নই! বলেন কী?

নন। আমি বলছি।

আপনিই তো এতকাল উলটো বলতেন।

মত পালটেছি।

পালটালেন কেন? কোনও বীরত্বের কাজ করেছি নাকি?

তাও করেননি।

তা হলে?

কিছু লোক থাকে, তারা কাওয়ার্ডও নয়, হিরোও নয়। নিস্পৃহ। নিস্পৃহদের কি কাওয়ার্ড বলা যায়?

নিস্পৃহ মানে কি ইন-অ্যাকটিভ?

পুরোপুরি নয়। কোনও কোনও ব্যাপারে ইন-অ্যাকটিভ।

একজ্যাক্টলি।—বলে বোস সাহেব একটু হাসে, আপনি নিজের কর্মক্ষেত্রে অসুরের মতো বলবান। কিন্তু অ্যাজ রিগ্যারডস আদার আর্থলি ম্যাটারস আপনি এক নম্বরের প্রাচীনপন্থী।

প্রাচীনপন্থী মানে কি ইন-অ্যাকটিভ?

তা নয়। কিন্তু এই বাঁধনছেঁড়া যুগে প্রাচীনপন্থীরা তো কিছুই করতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে তারা জীবনের স্রোত থেকে সরে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দ্যাট ইজ ইন-অ্যাকটিভনেস।

দীপনাথ মণিদীপার দিকে চেয়ে বলে, আমার আর কী কী ড্র-ব্যাক আছে বলবেন?

অনেক। কিন্তু বুনু যা বলল তা আমার কথা নয়। আমি প্রাচীনপন্থীদের পছন্দ করি। আপনি সেই হিসেবে প্রাচীনপন্থীও নন।

তা হলে?

আপনি নিজেই জানেন না কোনটা ভাল! রক্ষণশীলতা, না প্রগ্রেসিভনেস! তাই আপনার গোটা লাইফ-স্টাইলটাই দ্বিধায় জড়িত।

এটা কি আমার ফেয়ারওয়েল ডিনার, না অন্য কিছু?

এটা আপনার ফেয়ারওয়েল ডিনার নয়। ফেয়ারওয়েল আবার কী? ছ'মাসের জন্য যাচ্ছেন তো!

ছ'মাসের জন্য যাচ্ছি বটে, কিন্তু অফার পেলে সারাজীবন থেকে যাব।

কেন?

আমার তো পিছুটান নেই। দায়-দায়িত্ব নেই।

আর কিছু?

এই দেশ আমার ভালও লাগে না। স্নিগ্ধদেব তো মিথ্যে কথা লেখেননি। তবু তো স্নিগ্ধদেব এ দেশের মুক্তির জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি তাও করিনি। এখন জানি, করলেও কিছু হবে না। দিনের পর দিন মতলববাজদের পলিটিকস, মানুষের তৈরি করা মানুষের দুর্ভোগ, সবরকম অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা সহ্য করে থেকে যেতে হবে। তার চেয়ে সেই দেশ ভাল। সাদা মানুষরা সেখানে একটা মোটামুটি ভাল জায়গা তৈরি করে রেখেছে।

স্নিগ্ধদেব আর কী লিখেছে জানেন?

কী লিখেছে?

উনি আপনার লিডার তো?

একশোবার। স্নিগ্ধদেব লাল সেলাম।

শুনুন। স্নিগ্ধ লিখেছে, আমেরিকা প্রথম এক মাস বিস্ময়কর, দ্বিতীয় মাসে উপভোগ্য, তৃতীয় মাসে চমৎকার, চতুর্থ মাসে মৃদু উদ্বেগজনক, পঞ্চম মাসে আরও উদ্বেগজনক, ছ'মাসে বিরক্তিকর, এক বছর পর আমেরিকার মধ্যে একটা আফ্রিকার জঙ্গলের চেহারা ধরা পড়ে যায়।

ওঃ, ওসব কে না জানে! আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাধিক আলোচিত দেশ। সবাই আমেরিকার সব খবর রাখে।

তবু কথাটা কিন্তু আপনার লিডারের।

তা বটে। কিন্তু আমি এমন কথা বলিনি যে, উনি এখনও আমার লিডার। আমি বলেছি, উনি আমার লিডার ছিলেন।

মণিদীপা একটু ছটাকে হাসি হেসে বলে, উনি কখনও আপনার লিডার ছিলেন না। কেউ কখনও আপনার লিডার ছিল না। থাকলে আপনার আজ এত দ্বিধা দেখা দিত না জীবনে। কমিটমেন্ট না থাকলে মানুষের যেমন ফ্লোটিং নেচার হয় আপনার ঠিক তেমনি।

দীপনাথ একটু হেসে বলে, আপনি আজ সেই পুরনো ফর্মে আছেন।

কিন্তু আপনি তো সেই বেকার ভালমানুষ দীপনাথটি নেই। পালটে গেছেন, অনেক পালটে গেছেন।

খারাপ হয়ে গেছি নাকি?

ভাল কি ছিলেন?

বোস সাহেবের বিশাল দেহ থেকে একটি উদ্‌গার বেরিয়ে এল। রেফারির দায়িত্বটা নেওয়া উচিত মনে করে বোস বলল, রিসেস রিসেস। পরের রাউন্ড দীপার খাওয়ার পর।

মণিদীপার মুখ-চোখ থমথমে। বদ্ধ রাগে-আক্রোশে ফেটে পড়ছে।

দীপনাথ উঠে পড়ল। সঙ্গে বোস সাহেবও।

সামনের বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল। বোস আর দীপনাথ এসে বসল মুখোমুখি।

চুপচাপ অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পর বোস বলল, স্টেটসে আমি গিয়েছিলাম বছর দশেক আগে। এখন অনেক কিছু পালটে গেছে।

তাই হবে।—উদাসীন জবাব দেয় দীপনাথ।

একটা কথা বলব?

কী?

উই আর গ্রেটফুল টু ইউ ফর মেনি থিংস। কিন্তু আমি বা দীপা কেউ অকৃতজ্ঞ নই। থ্যাংকস ফর এভরিথিং ইউ হ্যাভ ডান অর ট্রায়েড টু ডু ফর আস।

দীপনাথ মৃদু হেসে বলে, আমার জীবন কিছু চেষ্টারই সমষ্টি মাত্র। কিন্তু কিছুই আমার দ্বারা হয়নি।

সব চিঁড় কি জোড় খায়? চেষ্টা কি আমরাও কম করেছি?

কী হবে বোস সাহেব?

আই অ্যাম প্যাসিভলি ওয়েটিং ফর সামথিং টু হ্যাপেন। কিন্তু সেটা যে কী তাও জানি না। হয়তো কিছু একটা হবে। হয়তো হবে।

হোক বোস সাহেব, হোক। আমি আজ উঠি।

দাঁড়ান, দীপা খেয়ে আসুক।

দীপনাথ মাথা নাড়ে, না। আমার একটু কাজ আছে।

বোস সাহেব বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, জানি, ইটস এ বিট সাফোকেটিং ফর ইউ। গুডনাইট দেন।

গুডনাইট।

লেক গার্ডেন্স-এর ফ্ল্যাটটা বুকড হয়ে গেছে কিন্তু।

ধন্যবাদ।

বেরিয়ে আসার সময় খাওয়ার ঘরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দীপনাথ। সে জানত, মণিদীপা এখন খাবে না। হয়তো আজ রাতেই খাবে না। ঠিক তাই। মণিদীপা নেই।

মুখ ঘুরিয়ে মণিদীপার ঘরের দরজাটা দেখল দীপনাথ। আঁট করে বন্ধ।

যা ত্যাগ করতে হবে তার দিকে আকৃষ্ট না হওয়াই ভাল। দীপনাথ নেমে আসে দোতলা থেকে। গাড়িতে ওঠে। তারপর মণিদীপার কাছ থেকে বহু দূরের পার্থক্য রচনা করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়।

একদিন সকালবেলা হঠাৎ দীপনাথের মনে হল, কেমন আছে সুখেন্দু আর বীথি?

সেইদিনই অফিসের পর তার গাড়ি এসে থামল গড়পাড়ে বীথির বাসার সামনে।

তাকে দেখে যেরকম হইচই পড়ে যাবে বলে ভেবেছিল দীপনাথ, তা হল না। যথারীতি দরজা খুলে বীথি বলল বটে "ওমা! কী ভাগ্যি!" কিন্তু গলায় সেই উত্তাপ এল না। সেই প্যাশন তো নয়ই।

সামনের ঘরেই লুঙ্গি পরে সুখেন বসে। মুখে ভারী অমায়িক হাসি। কিন্তু তা অমায়িকতার বেশি কিছু নয়। দীপনাথের মনে হল, এখন এ বাড়িতে চৌকাঠের গভীরে ঢোকা তার বারণ।

বীথি খাবার নিয়ে এল। মেলাই খাবার। মিষ্টি, কেক, ওমলেট। সেসব ছুঁলই না প্রায় দীপনাথ।
সুখেনকে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?
একটু আগেই বোধহয় বড় করে এক ডোজ টেনেছে সুখেন। মুখটা বিকৃত করে বলল, আর দাদা ভাল-মন্দ! সব সমান।
বীথি ঘরে ছিল না। দীপনাথ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, বিয়ে করে ভাল লাগছে না?
বিয়ে আবার কী! দাদার যে কথা। এসব আবার বিয়ে নাকি? একসঙ্গে থাকা, কনট্র্যাক্ট। আজ আছি, কালই যে যার পথ দেখব হয়তো।
বীথির স্বামীর খবর কী?
খবর গণ্ডগোলের। ছেলেও বিগড়েছে।
আপনি তা হলে সুখে নেই বলুন?
খুব সুখে আছি দাদা। খুব সুখে।—বলে সোফার পাশে মেঝেয় আড়ালে রাখা একটা বোতল তুলে অল্প একটু গলায় ঢেলে ছিপি আটকে সরিয়ে রাখে সুখেন। তারপর বলে, হারামির বাচ্চা জেল থেকে বেরিয়ে অবধি কেবল টাকা ঝাঁকছে।
কে বলুন তো?
বীথির হাজব্যান্ড।
টাকা কেন?
বলছে টাকা না পেলে কেস করবে।
ডিভোর্স হয়নি?
না। মামলা সবে কোর্টে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, ব্যাটা যখন ঘানি টানছে তখন আর চিন্তা কী? কিন্তু শালা তিন-তিনটে কেসে কী করে যে প্যারোল পেয়ে গেল! এদিকে আমরা আহাম্মকের মতো কাগজে সইসাবুদ করে বসে আছি।
লোকটা কি ভয় দেখাচ্ছে?
খুব দেখাচ্ছে। বীথিকে নয়, আমাকে। বলছে কী ওই ইংরিজি কথাটা—অ্যাডালটরি না কী যেন, তাইতে ঘানিতে ঘোরাবে।
ছেলে কী বলছে?
সে তো আর-এক কেলো। ছেলে আর বাপ হাত মিলিয়ে ফেলেছে।
হঠাৎ সন্দিহান দীপনাথ প্রশ্ন করে, শুধু ছেলে আর বাপ? ছেলের মাও নেই তো?
কে, বীথি? কী যে বলেন!
শুনুন সুখেন। আমি আমেরিকা চলে যাচ্ছি। বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। সারাজীবনেও না হতে পারে। তাই বলে যাচ্ছি, আপনি সবাইকে অতটা বিশ্বাস করবেন না।
বীথিকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দীপনাথ। বীথি তাকে দেহ দিয়েছিল। সেটা বড় কথা নয়। সেজন্য বীথির কাছে তার কোনও ঋণ নেই। কিন্তু সুখেনের কাছে আছে। সুখেন তাকে বড় ভালবাসত। এই লোকটা ছিবড়ে হয়ে যাক তা সে চায় না।
হাসির একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে দীপনাথ বলল, লোকটা এ পর্যন্ত কত টাকা নিয়েছে?
হাজার পাঁচেক।
আরও কত চায়?
তার কিছু ঠিক নেই। আমার সঙ্গে দেখা হয় না। বীথিকে এসে শাসায়।
শাসাক না! কোর্টে অ্যাডালটরি প্রমাণ করা কি খুব সোজা? আপনি টাকা দেওয়া বন্ধ করুন।
রান্নাঘরে কাপ-ডিশের শব্দটার দিকে কান রেখেছিল দীপনাথ। শব্দটা বন্ধ হতেই মুখে কুলুপ

আঁটল। বীথি আসছে।

চা নিয়ে বীথি ঘরে ঢুকতে তার মুখের দিকে খুব ভাল করে চেয়ে দেখে দীপনাথ। তার জীবনের প্রথম নষ্ট মেয়েমানুষ। এরই সঙ্গে তার জীবনের প্রথম আনন্দ। একে সে কখনও বিশ্বাস করেনি। করা যায়ও না। সুখেন অন্ধ, তাই বিশ্বাস করে।

কিন্তু এই খপ্পর থেকে সুখেনকে বের করে নেওয়ারও কোনও উপায় নেই। বোকাটা ছিবড়ে হবে।

চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় দীপনাথ। বলে, সুখেন, একটু এগিয়ে দেবেন নাকি শেষবারের মতো!

বীথি হাসল, এগিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা আছে কি না দেখুন। বিকেল থেকে টানা দু'ঘণ্টা ড্রিংক করেছে।

ওর ড্রিংক করা আপনি কমাতে পারেন না?—বীথিকে খুব হালকা গলায় জিজ্ঞেস করে দীপনাথ।

কথা শুনলে তো!

ঠিকমতো বারণ করুন, শুনবে।

বীথি কথাটা নিল না। মোড় ফিরে বলল, আমাদের জন্য কী পাঠাবেন ওখান থেকে?

কী পাঠালে খুশি হবেন?

যা আপনার খুশি। মনে রাখতে পারি এমন কিছু।

কেন? এমনিতে মনে থাকবে না?

কী যে বলেন! থাকবে না আবার! সুখেন তো এখনও সারাদিন আপনার কথা বলে।

বলে?

ভীষণ বলে।

সুখেন টপ করে উঠে গিয়ে লুঙ্গি ছেড়ে একটা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরে বেরিয়ে এল, চলুন দাদা। বীথি, আমার ফিরতে রাত হবে।

কোথায় চললে?

দাদা দূর দেশে চলে যাচ্ছেন। কোথাও গিয়ে একটু বসে সুখ-দুঃখের কথা বলে আসি।

সে তো এখানে বসে বললেই হয়।

না গো, সে আমাদের আলাদা জায়গা আছে।

বলে দেরি না করে দীপনাথকে একদম ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে আসে সুখেন। তারপর অভ্যাসবশে টানা রিকশা ভাড়া করে।

একটু হেসে দীপনাথ বলে, মোড়ে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চলুন।

গাড়ি! ওঃ বাব্বাঃ!

অবাক হওয়ার কিছু নেই। অফিসের গাড়ি।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুখেন বলে, আমার টানা রিকশার মতো ভাল আর-কিছুকে লাগে না।

গাড়িতে উঠে দীপনাথ জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

সেই চিনে রেস্তোরাঁয় চলুন।

আমার যে খিদে নেই।

খিদে নেই! তার মানে দাদার এখন টাকা হয়েছে।

তা নয়। খিদের সঙ্গে টাকার সম্পর্ক কী?

আছে। সে পরে হবে'খন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

তা হলে চলুন। কথাটা কী?

ওঃ সে অনেক কথা। আমি জীবনে আর কোনও আনন্দ পাচ্ছি না। পাওয়ার কথাও নয় যে!

॥ তিরাশি ॥

সুখেনের সঙ্গে সন্ধেটা কাটল একই সঙ্গে আনন্দে বিষাদে। সুখেন একটু মাতাল ছিলই, আরও হল। ফেরার সময় গাড়িতে বসে বলল, আমি আজ আর বীথির কাছে ফিরব না দাদা। আপনার কাছে থাকতে দেবেন?

বীথি চিন্তা করবে না?

কিসের চিন্তা! আমি নেশাখোর মানুষ, আমার জন্য চিন্তা কী?

নেশা করেন কেন?

নেশা করে ভাল আছি। কোনও ঝামেলায় মনটা জড়ায় না।

আপনার কি খুব ঝামেলা?

মেলা। গায়ে মাখি না বলে।

বীথিকে এখন কেমন লাগছে?

ভাল নয়। আপনার কথাই বোধহয় ঠিক। টাকা খেঁচবার ব্যাপারটায় বীথিও থাকতে পারে। তবে মুখে মাখন।

যদি বীথির নেশা কেটে গিয়ে থাকে, তবে এবার কেটে পড়ুন না!

সুখেন অসহায়ভাবে নিজের কোলে মুখের এক দলা নাল ফেলে বলে, কোথায় যাব? পড়ে থাকার একটা জায়গা চাই তো। একটা মেয়েছেলে দেখাশোনাও করছে।

কিন্তু টাকার ব্যাপারটা?

সে বীথির স্বামী-ছেলে নেয়, অন্যেও নিত। আমার তো সব ঘুষের পয়সা, যায় যাক। ঘুষের পয়সা এমনিতেও থাকে না।

সুখেন, ইউ আর ইন এ ট্র্যাপ, সেটা কি জানেন?

সুখেন পাকা মাতাল। অনেকটা টেনেও যুক্তিবুদ্ধি হারায়নি। দীপনাথের দিকে চেয়ে বলে, খানিকটা টের পাচ্ছি।

সেই ট্র্যাপে আপনি আমাকেও ফেলতে চেয়েছিলেন, বিয়িং এ ফ্রেন্ড।

সুখেন মাথা নাড়ল। বলল, তা নয়। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, মেয়েমানুষের অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে আপনার একটা ভালমানুষি রোগ হয়েছে কি না।

কী দেখলেন?

তা নয়। আপনার ভালমানুষিটা খাঁটি। কিন্তু তবু একটা খটকা।

কিসের খটকা?

আপনি দাদা ভালমানুষ বটে, কিন্তু বীথির সঙ্গে শুলেন কেন?

দীপনাথ মদ খায়নি। তবু যেন মাথাটা ঝিম করল হঠাৎ। কপালটা চেপে ধরে বলল, তা আমিও জানি না। হয়তো বীথি সুন্দরী বলে।

সুখেন গম্ভীর হয়ে বলে, আপনি অত সস্তা লোক নন। অন্তত আমার মতো তো নন। বীথির মতো সুন্দরী গন্ডায় গন্ডায় আছে। তো কী?

দীপনাথ ড্রাইভারকে সোজা মেসে ফিরতে বলেনি। ময়দানে গাড়ি ঘুরপাক খাচ্ছে নানা পথে। ড্রাইভার এসব কথা শুনতে পাচ্ছে বলে লজ্জা করল দীপনাথের। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে গাড়ি থামিয়ে তারা নামে এবং মাঠের ঘাসে বসে পাশাপাশি। এ সময়টুকু দীপনাথ তার পদস্খলনের কথা ভাবল। কিছু ভেবে পেল না। এত সহজে অচেনা এক মেয়েমানুষের সঙ্গে সে যে শুতে পারে, তাও জীবনের প্রথম মহিলা সংসর্গ, তা তার বিশ্বাস ছিল না। নিজের ওপর তার আর-একটু নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা। বীথি সুন্দরী বলে নয়, বীথি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বলেও নয়, খুব সম্ভব সেই

সময়টায় মণিদীপা তাকে প্রায়ই গা-জ্বালানো কথা বলত। হয়তো সেই সময়টায় তার হতাশা এবং ব্যর্থতার কথা সে বড় বেশি ভাবত।

সুখেন মদ খেলেও নিজেকে চমৎকার রাশ টেনে রেখেছে। প্রায় স্বাভাবিক গলায় বলল, বীথির সঙ্গে যা করেছেন সেটা এমন কিছু সাংঘাতিক কাণ্ড নয়। রোজ হাজারে হাজারে লোক প্রাকৃতিক কাজ সারতে মেয়েছেলের কাছে যায়, দরাদরি করে, একেবারে বাজারহাট করার মতো ইজি জিনিস। কিন্তু আপনি যেই কাণ্ডটা করলেন অমনি আমার ভিতরে কী যে একটা হল!

কী হল বলুন তো?

একটা বিশ্বাস ভেঙে গেল। মনে হল সবাই তা হলে রক্তমাংসের মানুষ। আমার মতোই।

আমি তো তাই-ই।

সে তো জানি। তবু কাউকে একটু ওপরের মানুষ ভাবতে ভাল লাগে তো। পৃথিবীর সবাই আমার মতো দোষে-গুণে মানুষ, এটা যদি সত্যিও হয় তা হলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না।

পৃথিবীর সবাই আপনার আমার মতো নয় সুখেন। ওপরের মানুষ অনেক আছে। কিন্তু সে দলের আমি নই।

কেন হলেন না দাদা?— বলে সুখেন দীপনাথের একটা হাত আলতো করে ধরে। বলে, পরদিন আমার এমন রাগ হয়েছিল বীথির ওপর যে, খামোখা একটু কথা-কাটাকাটি লাগিয়ে একটা থাপ্পড় কষিয়েছিলাম গালে।

বীথির তো সব দোষ নয়।

জানি। কিন্তু আমার বিশ্বাসটা যে চলে গেল তার জন্য কারওর ওপর তো ঝাল ঝাড়তে হবে।

দীপনাথ একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলে, সেই সময়ে আমি স্বাভাবিক ছিলাম না।

আপনাকে আমার এখনও ভক্তি হয়। বীথি আর আমি আপনার কথা অনেক বলি। আপনি বীথির সঙ্গে শুয়েছেন বলে হিংসে-টিংসে করব এমন বালাই আমার নেই। মাতাল মানুষ, আমার কোনও টানও তেমন নেই। বীথি যে এখনও কেবল আমাকে নিয়েই আছে তা নয়।

বীথি কি এখনও—?

কথাটা শেষ করল না দীপনাথ। একটু বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল।

সুখেন বলে, নয় কেন? মেলা টাকা, মেলা সুযোগ, মেলা প্রভাব রোজগার করছে বীথি। ওর হাড়ে-হারামজাদা স্বামী কি এমনি-এমনি ছাড়া পেল জেল থেকে? বীথি কলকাঠি না নাড়লে?

আপনি চুপ করে থাকেন?

আমার কিছু করার নেই। কী করব, কেনই বা করব? আমার তো পড়ে থাকার একটা জায়গা আর একটা দেখাশোনার একজন মানুষ, তা পেয়ে গেছি। বাদবাকিটা আনইমপর্ট্যান্ট।

আমি আপনার মতো নির্বিকার মানুষ দেখিনি।

নির্বিকার? না ঘোর বিকার? ব্রহ্মজ্ঞানীরা দুনিয়ার সব কিছুকে মায়ার খেলা বলে মনে করে, আমার মতন লোকদের ফিলিংও তাই প্রায়। আমার কাছে সবটাই তামাশার মতো লাগে।

কিন্তু বীথি কি চিরকাল আপনার দেখাশোনা করবে? টাকা যখন বন্ধ হবে তখন?

ওঃ, সে অনেক পরের কথা। এখনও আমি দু'হাতে রোজগার করি, চার হাতে ওড়াই। বীথি আমাকে এখনও কিছুদিন যত্নআত্তি করবে। তারপর তাড়াবে একদিন বোধ হয়। আবার না-ও তাড়াতে পারে।

বীথির ওপর আপনার এখনও একটা বিশ্বাস আছে তা হলে।

সুখেন মাথা নেড়ে বলে, না। তবে বীথির বয়স চল্লিশ পার। দিনে দিনে বুড়ো তো হচ্ছে। তারপর স্বভাবগুণে বাজারটা এমনই করে ফেলেছে যে, কেউ ওকে বিশ্বাস করে না। এসব মেয়েছেলে বুড়ো বয়সে ভারী একা আর অসহায় হয়ে পড়ে। তখন আর কাউকে না পেলে হয়তো আমাকেই আঁকড়ে

ধরে থাকবে।

সেই আশা?

না, আশা-টাশা নয়! আমি সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত। যা হওয়ার হবে। ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

চলুন মেসে ফিরি।

চলুন। আমার ঘুম পাচ্ছে।

আমার ওখানেই যাবেন?

সুখেন হাসল, ইচ্ছে করলে আপনিও আমার ওখানে আসতে পারেন। আমেরিকা যাওয়ার আগে বীথির সঙ্গে যদি আর-একবার ঘনিষ্ঠতা করতে চান।

সুখেন!— একটা ধমক দিল দীপনাথ।

সুখেন খুব হেসে নিয়ে বলল, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।

এ কথায় রেগে যেতে পারত দীপনাথ। কিন্তু রাগল না। সত্যিই তো। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন ভেবেই কি প্রথমবারের পরও আরও বার কয়েক বীথির কাছে যায়নি! প্রথমবারই খিলটা খুলে দিতে যা বাধা ছিল। তারপর অবারিত দ্বার। রাগল না বটে, কিন্তু দীপনাথের একটু দুঃখ হল। সুখেনের কাছে সে এক সময়ে অতিমানব ছিল, আজ আর নেই। না রেগে তাই সে একটু করুণ করে হাসল।

পরদিন সকালে সুখেন ঘুম থেকে উঠে গদাই লস্করি চালে চা খেল, প্রাতঃকৃত্য সারল। তারই ফাঁকে ফাঁকে বলল, তার কোনও দুঃখ নেই। দীপনাথ যেন তার জন্য চিন্তা না করে।

দীপনাথ তার পুরনো বিলিতি কম্বলটা আর কিছু বই, একটা পুরনো পার্কার কলম উপহার দিতে চাইল সুখেনকে। সুখেন নিল না। বলল, ও তো আমি নিলেও রাখতে পারব না। বীথির স্বামী বা ছেলে এসে এক ফাঁকে নিয়ে যাবে। এই সেদিন পঁচানব্বই টাকা দিয়ে এক জোড়া চপ্পল কিনেছিলাম। হাপিস।

দীপনাথের অফিসের গাড়িতে উঠেই এসপ্লানেড অবধি এল সুখেন। তারপর নেমে গেল। দীপনাথের মনে হল, সুখেনের সঙ্গে এই শেষ দেখা। আর হয়তো দেখা হবে না। ওরকম অদ্ভুত জীবনযাপন করতে করতে সুখেন শেষ অবধি কোথায় পৌঁছবে তা ভাবতে ভাবতে বড় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল দীপনাথের মন।

জীবনে প্রথম প্লেনে উঠতে ভয় পাচ্ছিল বিলু। মুখ শুকনো, চোখে দুশ্চিন্তা।

প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে আনমনে বসে থেকেও দীপনাথ বিলুকে লক্ষ করল। একটু হাসল। প্লেনে প্রথম প্রথম উঠতে একটু ভয় সকলেরই করে। অস্বাভাবিক নয়। তবে বিলুর তো ভয় থাকার কথা নয়। যার অসুস্থ রোগা স্বামী নিরুদ্দেশ, জীবনে তার আর ভয় পাবার কী আছে!

লাবু লাউঞ্জের কাচে মুখ লাগিয়ে এয়ারোড্রমে দাঁড়ানো প্লেন দেখছিল। মাঝে মাঝে ছুটে এসে দীপনাথকে জিজ্ঞেস করছে, এত বড় প্লেনগুলো সব ওড়ে? কী করে ওড়ে মামা, পড়ে যায় না?... ওই সাদা প্লেনটা বিলেতে যাবে?... আমেরিকায়?... আমরা কখন উঠব?

অবশেষে প্লেন যখন আকাশে উঠল তখন ভয় অনেকটা কেটে গেছে বিলুর। লাবুকে খাবার খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দীপনাথ চা ছাড়া কিছুই ছুঁল না।

বিলু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ছবির জন্য কী নিলে?

একটা হার।

কত পড়ল?

হাজার চারেক বোধ হয়।

বাব্বাঃ। কীরকম হার?

নেকলেস।

তা বলবে তো! হার আর নেকলেস কি এক?

ওই হল।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। চার হাজার দাম নিল, সোনা কতটা আছে?

জিজ্ঞেস করিনি। তবে ভাল দোকান থেকে কেনা। ঠকায়নি।

তোমাকে তো টাকা কামড়ায়। আমাকে নিয়ে গেলে পারতে। পছন্দ করে দিতাম।

খেয়াল হয়নি।

কী হয়েছে বলো তো! অমন কাঠ-কাঠ জবাব দিচ্ছ কেন?

কলকাতার আকাশ পেরিয়ে প্লেন উত্তরবাংলায় ঢুকে গেছে এই খানিকক্ষণ হল। আকাশের গায়ে নীলাভ পাহাড়ের পর পাহাড়। একটু পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা। রূপালি মৃত্যুহিম মহান পর্বত। জনবসতি নেই, গাছপালা নেই, হাজার হাজার বছরের জমাট তুষার রয়েছে। গ্র্যানাইট স্তরের মতো কঠিন। পরতে পরতে ঢাকা পড়ে আছে ছোট্ট পাখি, পতঙ্গ, বা শীতের দেশের পশুদের জীবাশ্ম।

স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ ফিরিয়ে বিরক্তির গলায় দীপনাথ বলে, কী বলছিলি?

দীপনাথের মুখ দেখে কথাটা আবার বলতে সাহস হয় না বিলুর। মাঝে মাঝে সেজদাকে ভূতে পায়, বিলু জানে।

একটা জিপ নিয়ে এয়ারপোর্টে হাজির ছিল শতম। লাবুকে বুকে তুলে নিল।

অনেকদিন বাদে প্রীতমদের বাড়িটা গমগম করছিল উৎসবে। কাল বিয়ে। আজ ম্যারাপ বাঁধা শেষ। টুনি বালবের মালা সর্বাঙ্গে জড়ানো বাড়িটার। রঙিন কাপড়ের ফটক। লাউডস্পিকারে সানাই বাজছে।

বিলুকে পৌঁছে দেওয়ার পর পিসির বাড়িতে দীপনাথকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জিপের মুখ ঘোরানো হলে শতম বলল, পাত্রকে একবার দেখে যাবেন নাকি? কাছেই বাড়ি। আপনাদের বন্ধু যখন।

দীপনাথ হাসল। বলল, চল। তবে বদুকে আমার মনে আছে। এ সেলফ-মেড ম্যান। সেলফ-মেড ম্যানরা বেশির ভাগ সময়েই ভাল হয়।

জিপ এসে হাকিমপাড়ায় একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ায়।

বাইরের ঘরেই বদু। বিয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, কাজেই আসবাবপত্র নেই। একটা বড় শতরঞ্চির একধারে বসল দীপনাথ।

বদুর চেহারাটা কালোর মধ্যে বেশ। বয়সটা বোঝা যায় না তেমন। খুব জোয়ান। চোখের দৃষ্টি আত্মস্থ।

কংগ্র্যাচুলেশনস বদু।

একটু হেসে বদু নিরাভরণ ভাষায় বলে, দুর! এতে কী আছে! বিয়ে তো একটা করতে হতই। না হয় প্রীতমের বোনকেই করলাম। বেচারা!

প্রীতম থাকলে 'বেচারা' কথাটা সহ্য করতে পারত না। নিজেকে কখনও বেচারা ভাবেনি প্রীতম। লড়েছে, লড়তে লড়তে হয়তো নেপথ্যে গিয়ে হেরেছে এতদিনে।

পুরনো দিনের কথা উঠে পড়ল অনেক। কিন্তু সারাক্ষণ দীপনাথের মনে হতে লাগল, যে সাহস বদু দেখাল সেই সাহস তো সে নিজেও দেখাতে পারত। ছবিকে বিয়ে করার কথা তার কখনও মনে হয়নি। দেখতে সুন্দর নয় ছবি, আবার হ্যাক ছি করার মতোও কিছু নয়। বোধ হয় প্রীতমের এই বোনটিকে তারই বিয়ে করা উচিত ছিল নৈতিক দিক দিয়ে। যা হোক, বদু— মহৎ বদু তো করছে!

বদুর মা ভাই বোন সব কোন্নগর আর অন্যান্য জায়গা থেকে এসেছে। তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে অনেকটা সময় কাটাল দীপনাথ।

বদু নিজের পরিবারের সবাইকে ডেকে হেঁকে শুনিয়ে দিল, আমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যা চাকরি করছি দীপুদা তার চেয়ে ঢের বড় চাকরি করে। আমেরিকা যাচ্ছে, জানো?

খুবই নির্ঝঞ্ঝাটে বিয়েটা হয়ে গেল ছবির। শ্বশুরবাড়ি রওনা হওয়ার সময় শুধু কাঁদতে কাঁদতে বেহেড পাগলের মতো আচরণ করল কিছুক্ষণ ছবি। দু'-দু'বার অজ্ঞান হয়ে গেল।

কেবল বিলাপ করে, আমার দাদা কোথায় গেল?... আমার মা বাবাকে কে দেখবে?

বিলু কুড়ি দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। দীপনাথের থাকার উপায় নেই। বউভাতের পরদিন ফেরার প্লেনে বসে জানালা দিয়ে পাহাড়ের দিকে তৃষিতের মতো চেয়ে থেকে সে ভাবল, প্রীতমের পর্ব কি শেষ হয়ে গেল তবে? আর কি প্রীতমের জন্য আমার কোনও দায় থাকল না? শুধু ঈষদুষ্ণ কিছু স্মৃতি ছাড়া?

কোথায় গেলি? এই দীর্ঘশ্বাস আর-একবার বুক ভেঙে বেরিয়ে এল, ঠিক এক মাস পর যখন রাত্রে কলকাতা-বোম্বাই ফ্লাইটে আমেরিকার পথে পাড়ি দিল দীপনাথ। নীচে অন্ধকার ভারতবর্ষ। বিশাল এবং বিপুল। এই দেশের সীমা আগে কখনও ডিঙোয়নি দীপনাথ। এখন ডিঙোতে চলেছে। এই দেশকে সে কখনও আপন বলে ভাবতে পারেনি, এখানে তার কোনও পিছুটানও নেই। তবু বুকের মধ্যে এক-একটা পাক দেয় মাঝে মাঝে।

কী ফেলে যাচ্ছে সে? কাকে রেখে যাচ্ছে? ছেলেবেলা থেকে সে পিসির কাছে মানুষ। নিজের মা-বাপকে ভাল করে চেনেনি। ভাই-বোনের সঙ্গে সে রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। না ছিল গভীর কোনও অবিচ্ছেদ্য ভালবাসা। মণিদীপা? তাকে সে নতুন করে কি সম্প্রদান করে আসেনি বোস সাহেবের হাতে?

অনেক হিসেব করল দীপনাথ। না, কেউ নেই, যার জন্য আবার তার এই দেশে ফিরে আসতে হবে। তবে কেন এই বুকের মধ্যে অকারণ উথাল-পাথাল?

পুব থেকে পশ্চিম প্রান্তে পাড়ি দিতে দিতে অন্ধকার ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে ছিল দীপনাথ। দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে সেই হিম পাহাড়ের ঢেউ। মাঝখানে মোটা থেকে সরু হয়ে আসা এক দেশ। এ দেশ তো তার নয়। সে যেখানেই বীজ বপন করবে সেইখানেই বৃক্ষের উৎপত্তি দেখবে। তবে?

সব মানুষই এক অসমাপ্ত কাহিনি। কোনও মানুষই তার জীবনের সব ঘটনা, সব কাজ শেষ করে যায় না তো! তার নিজের জীবন এখনও অনেকখানি বাকি। অনেকখানি বাকি ছিল প্রীতমেরও।

ওই নীচে অন্ধকার ভূখণ্ডে আরও কত কাহিনি রচিত হচ্ছে, যার সবটুকু শেষ হওয়ার নয়। জীবনের অনেকটা বাকি থাকতে থাকতেই অনেকে খেলার মাঠ ছেড়ে চলে যাবে। দেনা-পাওনার হিসেব মিলবে না। এই খেলার একজন খেলুড়ি তো সেও। কারও জন্যই তার দুঃখ করার কিছু নেই।

তবু বুকের মধ্যে মৃদু ঢেউ। দোল দিচ্ছে। ঘা মারছে। বলছে, কপাট খোলো।

উত্তরে এই অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ও বহু বহু দূর। তবু দীপনাথ টের পায়, স্বদেশ নয়, শেষ পর্যন্ত এক মহা পর্বতই কোল পেতে বসে থাকবে তার জন্য। যেদিন তার কোলে যাবে দীপনাথ, সেই দিন পরম পিতার মতো সেই পাহাড় নিজের তুষারস্তূপের পরতে পরতে দীপনাথকে মিশিয়ে নেবে। আদরে সোহাগে। দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা, অপমান, স্মৃতিভার থেকে শীতল মুক্তি।

কাগজের ন্যাপকিনটা হাতে ধরা ছিল দীপনাথের। সন্তর্পণে সেইটে তুলে দু'চোখের কোল মুছে নিল।